গল্প ১০১

এ কথা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সত্যজিতের প্রধান সৃষ্টির জগৎ চলচ্চিত্রের জগৎ। এখানে তাঁর সিদ্ধি বিশ্বমানের এবং অবিস্মরণীয়। এমন একজন স্রষ্টা যখন সাহিত্যসৃষ্টিতেও শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন, তখন আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ করি সিনেমার সঙ্গে তিনি সাহিত্যভাবনাতেও ব্যাপ্ত হয়েছিলেন। মগ্ন হয়েছিলেন অন্য এক দিগন্ত রচনায়। বাংলা দেশের এক সম্মানিত সাহিত্যভবন ও সাহিত্যপরিবারের ঐতিহ্য ছিল সত্যজিতের রক্তে। এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল তাঁর প্রতিভা, মেধা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কল্পনা, উদ্ভাবনী মন আর অকৃত্রিম গদ্যশৈলী। গল্প রচনার সূচনালগ্ন থেকেই সত্যজিৎ পাঠকের মন জয় করে নিয়েছিলেন। শুরু থেকেই তিনি লিখেছেন গল্পের মধ্যে জমাটি গল্প। এদিক থেকে বোধ হয় তিনি স্যার ফিলিপ সিডনির তত্ত্বে বিশ্বাসী। সর্বপ্রথমে যা গল্প, সব শেষেও তা গল্প। কোনও জটিল তত্ত্ব নয়, ছোটগল্পে তিনি খুঁজে নিয়েছেন মুক্তি ও বিস্ময়। সুধী সমালোচকের ভাষায়, 'আমাদের খণ্ডিত অস্তিত্বের সমস্যাসঙ্কুল জগৎটা সেখানে মাথা চাড়া দেয় না। তার বদলে পাই মহাকাশের সংকেত, অতল সমুদ্রের ডাক, মরু বা মেরুর ইশারা অথবা মানুষের, একান্তই ছাপোষা সাধারণ মানুষের অশেষত্বের ঠিকানা। প্রযুক্তি পারঙ্গম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে-মানুষের গল্প তিনি শোনান সে-মানুষ গাণিতিক সিদ্ধির জগতে গণিতের অতীত মানুষ।'

জগৎ ও জীবনকে সত্যজিৎ এমনই শিল্পীস্বভাবে দেখেছেন আগাগোড়া। ফলে তাঁর গল্পের কিশোরপাঠ্য ও বয়স্কপাঠ্যের বিভাজন রেখা মুছে গেছে অনায়াসে। সব বয়সী পাঠককে তাঁর গল্পের জগতে সত্যজিৎ টেনে আনতে পেরেছেন। এই সিদ্ধি ও কৃতিত্ব খুব কম সংখ্যক গল্প-লেখকেরই আছে।

সময়জয়ী এই গল্পগুলি যে-ভাষায় সত্যজিৎ লিখেছেন তা একান্তভাবে তাঁর নিজের ভাষা। তাঁর গদ্যশৈলী অননুকরণীয়। 'এ গদ্যে কোথাও ফেনা নেই। পাতাবাহার নেই। নিষ্পত্র অথচ ফলবতী লতার মতো মনোজ্ঞ সে গদ্য।' আবার শব্দ দিয়ে তৈরি করেছেন ছবি। প্রয়োজন মতো সে-ছবিতে রং ধরিয়ে চাক্ষুষ করেও তুলেছেন।

সত্যজিতের আশিতম জন্মবর্ষপূর্তিতে শঙ্কু ও ফেলুদার কাহিনীগুলি বাদ দিয়ে তাঁর সমস্ত গল্প, দুটি উপন্যাস ও একটি নাট্যকাহিনী নিয়ে একত্রে প্রকাশিত হল 'গল্প ১০১'।

ISBN 81-7756-168-5

বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রস্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের জন্ম উত্তর কলকাতার গড়পার রোডে ২ মে ১৯২১ সালে। সুকুমার রায় ও সুপ্রভা রায়ের একমাত্র সন্তান। স্কুলের শিক্ষা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাম্মানিক স্নাতক (১৯৪০)। ওই বছরই শান্তিনিকেতন কলাভবনে ভর্তি হন। কিন্তু '৪২-এ শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসেন। চাকুরিজীবনের শুরু (১৯৪৩) বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমার-এ। বিবাহ ১৯৪৯-এ।
এই সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন বইয়ের প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কনের জন্য পুরস্কার লাভ করেছেন। রচনা করেছেন বেশ কয়েকটি চিত্রনাট্য। ১৯৫৫-তে তাঁর 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'পথের পাঁচালী' পায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। 'অ্যাবস্ট্রাকশান' নামে একটি ইংরেজি গল্প দিয়ে লেখার জগতে সত্যজিতের আত্মপ্রকাশ (১৯৪১)।
'সন্দেশ' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ (১৯৬১) উপলক্ষে বাংলা সাহিত্য রচনা শুরু। প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে প্রথম গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি'।
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রোফেসর শঙ্কু' (১৯৬৫)। বইটি ১৯৬৭-তে শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য গ্রন্থরূপে অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' (১৯৬৫) ফেলুদা সিরিজের সূচনা-গল্প।
তাঁর অবিস্মরণীয় সৃজনশীলতার স্বীকৃতি স্বরূপ সত্যজিৎ বহু সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভারতরত্ন ও লিজিয়ন অফ অনার (ফ্রান্স) সম্মান। পুরস্কারের মধ্যে আনন্দ, বিদ্যাসাগর, গোল্ডেন লায়ন (ভেনিস) এবং 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট'-এর জন্য বিশেষ অস্কার।
কল্পবিজ্ঞান কাহিনী, গোয়েন্দাকাহিনী, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, চিত্রনাট্য, সম্পাদিত, সংকলিত ও অনূদিত গ্রন্থ মিলিয়ে সত্যজিতের বইয়ের সংখ্যা ষাটের অধিক।
মৃত্যু ২৩ এপ্রিল ১৯৯২।

....

প্রচ্ছদ সমীর সরকার
লেখকের আলোকচিত্র বিবেক দাস

গল্প ১০১

সত্যজিৎ রায়

আনন্দ

কৃতজ্ঞতা
'রায় সোসাইটি'

প্রথম সংস্করণ মে ২০০১ থেকে দ্বিতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৬০০০
তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০০২ মুদ্রণ সংখ্যা ৩০০০

অলংকরণ
সত্যজিৎ রায়
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, দেবাশিস দেব, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য
প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, পার্থ দাশ, সমীর দাশ

ISBN 81-7756-168-5

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫০.০০

প্রকাশকের নিবেদন

ফেলুদা এবং শঙ্কু কাহিনী ব্যতীত সত্যজিৎ রায়ের লেখা যাবতীয় গল্প এই সংকলনে গ্রথিত হল। যেহেতু ফেলুদা-র গল্পগুলি ইতিমধ্যেই অন্য সংকলন গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে এবং শঙ্কুকাহিনীগুলি নিয়ে শীঘ্রই একটি সংকলন প্রকাশ করার পরিকল্পনা আমাদের আছে, তাই ওই কাহিনীগুলি এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই সংকলনে সত্যজিৎ রায়ের গল্পসমূহ প্রথম প্রকাশের ক্রমানুযায়ী গ্রন্থিত হল।

ইতিপূর্বে রচনার শ্রেণী বিন্যাসে 'ফটিকচাঁদ' ও 'মাস্টার অংশুমান' উপন্যাস হিসাবে এবং 'হাউই' নাটক হিসাবে চিহ্নিত হলেও সত্যজিৎ রায়ের কাহিনীগুলি যাতে পাঠকেরা একটিমাত্র গ্রন্থে পড়ার সুযোগ পান সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই তিনটি রচনাকে বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'পুরস্কার' ও 'বর্ণান্ধ' গল্প দুটি লেখকের মূল ইংরেজি কাহিনী Abstraction ও Shades of Grey-র অনুবাদ, মূল গল্প অমৃতবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে যথাক্রমে ১৮ মে ১৯৪১ ও ২২ মার্চ ১৯৪২-এ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীমতী বিজয়া রায়ের সৌজন্যে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৪০২ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায়।

এই সংকলনটির আর একটি বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন গল্পের সঙ্গে লেখক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা যেসব ছবি পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল সেগুলি এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

সূচিপত্র

পুরস্কার • ১
বর্ণান্ধ • ৬
বঙ্কুবাবুর বন্ধু • ১১
টেরোড্যাকটিলের ডিম • ১৯
সেপ্টোপাসের খিদে • ২৯
সদানন্দের খুদে জগৎ ৪০
অনাথবাবুর ভয় ৪৯
দুই ম্যাজিশিয়ান ৫৬
শিবু আর রাক্ষসের কথা ৬৫
পটলবাবু ফিল্মস্টার ৭৫
বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম ৮৫
বাদুড় বিভীষিকা ৯২
নীল আতঙ্ক ৯৯
রতনবাবু আর সেই লোকটা ১০৭
ফ্রিৎস ১১৮
ব্রাউন সাহেবের বাড়ি ১২৫
প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌ ১৩৩
বাতিকবাবু ১৪৫
খগম ১৫৩
বারীন ভৌমিকের ব্যারাম ১৬৪
ভক্ত ১৭৫
ফটিকচাঁদ ১৮৩
বিষফুল ২১৯
অসমঞ্জবাবুর কুকুর ২৩০
লোডশেডিং ২৪১
ক্লাস ফ্রেন্ড ২৪৬
সহদেববাবুর পোর্ট্রেট ২৫২
মিঃ শাসমলের শেষরাত্রি ২৫৯
পিন্টুর দাদু ২৬৪
বৃহচ্চঞ্চু ২৬৮
চিলেকোঠা ২৭৯
ভুতো ২৮৫

অতিথি ২৯৪
ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট ৩০২
ফার্স্ট ক্লাস কামরা ৩১০
ডুমনিগড়ের মানুষখেকো ৩১৮
ধাপ্পা ৩২৫
কনওয়ে কাস্‌লের প্রেতাত্মা ৩৩১
অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু ৩৪০
শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত ৩৫০
স্পটলাইট ৩৫৯
তারিণীখুড়ো ও বেতাল ৩৬৬
বহুরূপী ৩৭৫
মানপত্র ৩৮৫
অপদার্থ ৩৯০
সাধনবাবুর সন্দেহ ৩৯৫
গগন চৌধুরীর স্টুডিও ৪০১
লখ্‌নৌর ডুয়েল ৪০৯
ধুমলগড়ের হান্টিং লজ ৪১৬
লাখপতি ৪২১
খেলোয়াড় তারিণীখুড়ো ৪২৮
টলিউডে তারিণীখুড়ো ৪৩৫
আমি ভূত ৪৪১
রামধনের বাঁশি ৪৪৫
জুটি ৪৪৮
মাস্টার অংশুমান ৪৫৩
নিধিরামের ইচ্ছাপূরণ ৪৮৩
কানাইয়ের কথা ৪৮৬
রতন আর লক্ষ্মী ৫০৩
গঙ্গারামের কপাল ৫১৩
সুজন হরবোলা ৫২১
নিতাই ও মহাপুরুষ ৫৩৩
মহারাজা তারিণীখুড়ো ৫৩৭
হাউই ৫৪৩
প্রতিকৃতি ৫৪৮
তারিণীখুড়ো ও ঐন্দ্রজালিক ৫৫৩
অনুকূল ৫৫৭
কাগ্‌তাড়ুয়া ৫৬২
নরিস সাহেবের বাংলো ৫৬৬
কুটুম-কাটাম ৫৭৩
টেলিফোন ৫৭৭

গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্ট্রেট ৫৮১
মৃগাঙ্কবাবুর ঘটনা ৫৮৬
নতুন বন্ধু ৫৯২
শিশু সাহিত্যিক ৫৯৭
মহিম সান্যালের ঘটনা ৫৯৯
গণৎকার তারিণীখুড়ো ৬০৪
গল্পবলিয়ে তারিণীখুড়ো ৬০৮
নিতাইবাবুর ময়না ৬১১
রণ্টুর দাদু ৬১৪
সহযাত্রী ৬১৭
ব্রজবুড়ো ৬২২
দুই বন্ধু ৬২৯
শিল্পী ৬৩৪
অক্ষয়বাবুর শিক্ষা ৬৪১
প্রসন্ন স্যার ৬৪৫
অভিরাম ৬৪৮

অনুবাদ

ব্লু-জন গহ্বরের বিভীষিকা ৬৫৫
মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প ৬৬৭
মোল্ল নাসিরুদ্দিনের আরো গল্প ৬৭৫
মোল্লা নাসিরুদ্দিনের আরো গল্প ৬৭৯
আবার মোল্লা নাসিরুদ্দিন ৬৮৫
আর এক দফা মোল্লা নাসিরুদ্দিন ৬৯১
ব্রেজিলের কালো বাঘ ৬৯৩
মঙ্গলই স্বর্গ ৭০৬
ঈশ্বরের ন' লক্ষ কোটি নাম ৭১৯
ইহুদির কবচ ৭২৬

পিকুর ডায়রি ও অন্যান্য

ময়ূরকণ্ঠি জেলি ৭৪৫
সবুজ মানুষ ৭৫৭
আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু ৭৫৯
পিকুর ডায়রি ৭৬৬

পুরস্কার

বয়স চব্বিশ, লম্বা, রোগাটে। হাত-পা রোগা, মুখখানা শীর্ণ, পকেটের দশা আরও কাহিল। লোকটি একজন শিল্পী।

গল্পের সূচনায় তাকে তেপায়া একটি চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। যেভাবে বসে আছে, তাতে মনে হয়, নড়াচড়া করবার উদ্যমটুকু পর্যন্ত নেই। ঠোঁট থেকে খুবই বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে একটা আধ-খাওয়া সিগারেট। হাতে একখানা বই। লোকটির তাবৎ মনোযোগ মনে হচ্ছে ওই বইখানাতেই নিবদ্ধ।

এই যে দৃশ্য, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু কারও চোখে পড়বে না। একটু নজর করে দেখলে অবশ্য ভিন্ন কথা। তখন যা দেখা যাবে, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। বইখানা উলটো করে ধরা।

এইভাবে কি বই পড়া যায় নাকি? কী ব্যাখ্যা এর? ব্যাখ্যা আর কিছুই নয়, লোকটি আদৌ পড়ছে না। এমনকী, বইয়ের দিকে চোখই নেই তার। আসলে, যাকে 'মাঝামাঝি দূরত্ব' বলা যায়, সেইরকমের একটা ব্যবধান থেকে লোকটি ওই বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে মাত্র। চোখের দৃষ্টি শূন্য। তার মানে লোকটি কিছু ভাবছে। সত্যি তা-ই। ওর মাথায় রয়েছে একটি প্রদর্শনীর চিন্তা।

আজ সকালেই কাগজে বেরিয়েছে এই প্রদর্শনীর খবর। এবারকার চারুকলা প্রদর্শনী নাকি এতবড় আকারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, আর মিডিয়াম, বা মাধ্যম ব্যবহারের ব্যাপারেও কোনও বিধিনিষেধ নেই, শিল্পী ওটা বেছে নিতে পারবেন তাঁর আপন ইচ্ছা অনুযায়ী। এই প্রদর্শনীর এ-দুটোই হচ্ছে মস্ত বৈশিষ্ট্য। এর ফলে শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভার পরিচয় একেবারে অবাধে দিতে পারবেন।

প্রদর্শনীর এই যে বিজ্ঞপ্তি, এটা নিয়েই এখন ভাবছে আমাদের শিল্পী। ছাপার অক্ষরে যা কিনা একেবারেই ঠাণ্ডা ও নেহাতই একটা খবর মাত্র, তা-ই তাকে আলোড়িত, উত্তেজিত করে তুলেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ সে তো ধৈর্য ধরে এইরকম একটা সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিল। তুলির ব্যবহারে তার দক্ষতা যে কতখানি, সে চাইছিল যে, লোকে সেটা জানুক, তাকে কিছুটা স্বীকৃতি দিক। সেই স্বীকৃতি পাওয়ার এই হচ্ছে একমাত্র সুযোগ। নিজের প্রতিভা সম্পর্কে কোনও অলীক ধারণা তার একেবারেই নেই। প্রদর্শনীতে বেশ মোটা অঙ্কের যেসব নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে, সেসবের কোনওটাই যে সে পাবে, এমন কথা সে কল্পনাও করে না; তার কাজের জন্য উদ্যোক্তাদের একটা প্রশংসাপত্র পেলেই সে খুশি হয়ে যায়। তাও যে পাবে, এমন ভরসা তার নেই। কিন্তু তবু সে চাইছে যে, প্রদর্শনীতে তার ছবি টাঙানো হোক, লোকে তার কাজ দেখুক।

তা ছাড়া, ভিতরে-ভিতরে একটা আশা যে নেই, তাও হয়তো নয়। বলা তো যায় না, শিল্প-প্রদর্শনী নিয়ে কাগজে-কাগজে যেসব লেখা বেরোয়, তাতে তার কাজের একটা উল্লেখ হয়তো থাকতেও পারে। কোনও সমালোচক হয়তো লিখতেও পারেন, "শ্রী—এর 'আ ফ্যামিলি গ্রুপ' চিত্রখানির আবেদনও কম নয়। তাঁর কম্পোজিশন চিত্তাকর্ষক, রঙের নির্বাচনেও বেশ মুনশিয়ানার ছাপ রয়েছে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শরীরে আলস্য, হাতের মধ্যে উলটে-ধরা বই, লোকটি এখন চিন্তামগ্ন। কী হবে তার ছবির বিষয়বস্তু, তা-ই নিয়ে সে ভাবছে।

শিল্পের ব্যাপারে যদি তার কোনও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থেকেই থাকে, তো বলব যে, সে রিয়্যালিজম বা বাস্তবতার অনুরাগী। যা বাস্তব, তার সঙ্গে সে একেবারে আঠার মতো সেঁটে থাকে। প্রকৃতিকে ভেঙেচুরে বিকৃত করে দেখানোই তো আধুনিক শিল্পের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তার

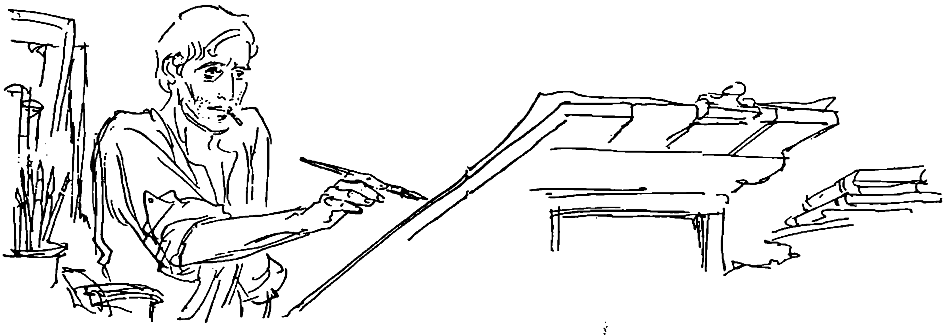

সৌন্দর্যবোধ তাতে পীড়িত হয়। শিল্পে যা স্যারিয়ালিজম বা অধিবাস্তববাদ বলে চলছে, তা তার ভীতি উদ্রেক করে। তা ছাড়া, রেখা আর আকৃতি নিয়ে ওই যেসব পাগলামির খেলা, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যাবস্ট্র্যাকশন' বা বিমূর্ত শিল্প, ওটা তার মনে আদৌ কোনও সাড়া জাগায় না। তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই শিল্প নিয়ে বড়-বড় সব কথা বলে। তাদের কেউ-বা শখের সমালোচক, কেউ-বা নিজেই চিত্রশিল্পী। তারা তার সংকীর্ণ মনোভাবের নিন্দা করে বলে, "তোমার কথা শুনলে হাসি পায় হে!" বলে, "ওইসব বস্তাপচা পুরনো ধারণা নিয়ে আর চলবে না। আধুনিক শিল্পীদের কাজগুলো সব ভাল করে দ্যাখো, তার তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করো। এটা তোমাকে করতেই হবে, না-করে উপায় নেই। এই যে সব জিনিয়াস, এঁদের তুমি উপেক্ষা করবে কী করে?" বলেই তারা একগাদা নাম আউড়ে যায়। খটোমটো সব নাম। শুনে তার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে। কিন্তু মতের কোনও বদল ঘটে না।

আধুনিক শিল্পকলার উপরে যেসব বই রয়েছে, তা যে সে কখনও পড়ে দেখবার চেষ্টা করেনি, তা নয়। চেষ্টা করেছে একাধিকবার। কিন্তু সেই বইগুলির মধ্যে যেসব ছবি রয়েছে, তা এতই কিম্ভূত ঠেকেছে তার কাছে যে, পড়া আর এগোয়নি। এইরকম একটা ছবির কথা মনে পড়ছে তার। ছবিখানা দেখে মনে হয়েছিল, কাঁচা হাতে কেউ নিআনডারথাল বা পুরোপলীয় যুগের এমন এক আদি মানবীর ছবি এঁকেছে, যার সম্ভবত গোদ হয়ে থাকবে, সেইসঙ্গে যার গলাটা একেবারে জিরাফের মতো লম্বা। অথচ সেই ছবির নাম কী দেওয়া হয়েছে? না, 'আদর্শ নারী'। ভাবা যায়? তার মনে হয়েছিল, এর চেয়ে অদ্ভুত রসিকতা আর কিছুই হতে পারে না।

পরদিনই সে ছবি আঁকতে লেগে যায়। ওয়াটার কালারে সে সিদ্ধহস্ত। এটাও সে ওয়াটার কালারেই আঁকবে। ছবির বিষয়বস্তু কী হবে, অনেক ভেবেচিন্তে আগের দিন সন্ধ্যাতেই সে তা ঠিক করে ফেলেছিল। শেকসপিয়রের নাটকের যেসব দৃশ্য তার প্রিয়, এটা হবে তারই একটির চিত্ররূপ। ঘুমন্ত অবস্থায় লেডি ম্যাকবেথ হাঁটছেন, এই হবে তার ছবি। ছবির নাম দেবে 'দ্য সমন্যামবুলিস্ট'। অর্থাৎ 'স্বপনচারিণী'।

ছবি আঁকার ব্যাপারে এখনকার মতো উৎসাহ সে এর আগে কখনও পায়নি। আলাদা একটা কাগজের উপর তুলি দিয়ে হরেক রঙ মেলাতে-মেলাতে সে দেখে নিচ্ছে যে, ঠিক কোন কোন রঙের মিশ্রণ তার ছবির পক্ষে জুতসই হবে। রঙের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবার পরে সে আসল কাজে হাত দিল। এটা যে তার একটা সেরা ছবি হবে, তাতে তার সন্দেহ নেই।

ছবিটা শেষ করতে মোট দশদিন সময় লাগল। নোংরা, মলিন, ছোট্ট যে ঘরখানিকে সে তার স্টুডিয়ো হিসেবে ব্যবহার করে, এর মধ্যে সেই ঘর ছেড়ে তাকে বড়-একটা বেরোতে দেখা যায়নি। এই প্রথম সে তার মনপ্রাণ একেবারে ঢেলে দিয়েছে একটা ছবির মধ্যে। যে ধৈর্য আর উদ্যম নিয়ে সে এঁকেছে এই ছবি, তার মতো ঢিলেঢালা আর অগোছালো প্রকৃতির মানুষের পক্ষে সেটাকে একটু অস্বাভাবিকই বলতে হবে।

ছবির কাজ মোটামুটি হয়ে যাওয়ার পরেও তো এখানে-ওখানে একটু-আধটু তুলির ছোঁয়া লাগাতেই হয়। সেটা শেষ হল পাঁচই জানুয়ারি তারিখে। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। তুলি রেখে সে টানটান করে হাত ছড়িয়ে দিল। কাজের উত্তেজনায় দপদপ করছে তার পেশিগুলি। তারা এখন বিশ্রাম চায়।

একটু বাদেই কাজটা কেমন হয়েছে, ঠিকমতো সেটা বুঝে নেওয়ার জন্য, কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সে তার ছবির দিকে তাকাল।

তাকিয়ে রইল পুরো পাঁচ মিনিট। চোখ দুটি আধবোজা, মাথাটা একপাশে একটু হেলানো। ছবিখানিকে যত দ্যাখে, ততই ভাল লেগে যায়। রঙ, অভিব্যক্তি, কম্পোজিশন, সবই সাক্ষ্য দিচ্ছে সেই প্রেরণার, ভিতরে যার তাগিদ ছিল বলেই এই ছবিখানা সে এইভাবে আঁকতে পেরেছে।

হঠাৎই তার মনে হল যে, নিজেকেই সে অতিক্রম করে এসেছে। যা সে তার চোখের সামনে দেখছে, তেমন ছবি যে সে আঁকতে পারবে, নিজের সম্পর্কে এমন ধারণাই তো তার ছিল না। এখন সে দারুণ তৃপ্ত। সে বুঝতে পারছে যে, দশদিন ধরে এই যে এত পরিশ্রম করেছে সে, জলে যায়নি।

কিন্তু নিজের সৃষ্টি নিয়ে আত্মতৃপ্ত হয়ে বসে থাকবার মতো সময় তো নেই। প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাবার আজই শেষ দিন। আজ রাত্তিরেই সে তার ছবি ডাকে পাঠিয়ে দেবে। নিজের ছবিতে সে যা দেখেছে, সমালোচকদেরও সেটা দেখা চাই। আসলে তাদের দেখাটাই তো বেশি জরুরি।

ইজেল থেকে ছবিখানা সে নামিয়ে রাখল। তারপর খোঁজে লেগে গেল সুতো আর মোড়কের কাগজের।

ডাকঘর থেকে সে যখন বেরিয়ে এল, তার চোখ তখন টনটন করছে। রগও দপদপ করছে। যা পরিশ্রম গেল, তাতে তো এমনটা হতেই পারে।

পা দুটো যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে। ধীরে-ধীরে পা ফেলে হাঁটতে লাগল। শহরের যে-অংশটা একটু নির্জন, ফাঁকা, এখন সে সেইখানে যাবে। তার এখন একটু খোলা হাওয়ায় শ্বাস নেওয়া দরকার।

সন্ধ্যার হাওয়ায় সুস্থ বোধ করল সে। ঘণ্টাখানেক বাদে সে যখন ঘরে ফিরল, তখন তার ক্লান্তি অনেকটাই কেটে গেছে।

পরদিন সকালে মনে হল, ক্লান্তির শেষ রেশটুকুও আর নেই। সে এখন একেবারে টাটকা তাজা একটা মানুষ। ব্রেকফাস্ট করতে-করতে কাগজ পড়ছিল সে। সেই সময়ে সোসাইটি অব ফাইন আর্টসের ছোট্ট একটা বিজ্ঞপ্তি তার চোখে পড়ে। সোসাইটি জানাচ্ছে যে, প্রদর্শনীতে এবারে প্রচুর ছবি এসেছে। এবারকার প্রদর্শনী যে দারুণ সফল হবে, তাতে তাদের সন্দেহ নেই।

একবার তার মনে হল, এবারে স্টুডিয়োটাকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা দরকার। এত জঞ্জাল জমে গেছে যে, সেসব সাফ না-করলেই নয়! তারপরেই আবার আলস্য তাকে পেয়ে বসল। বসে-বসে সে ভাবতে লাগল, উঠবে কি উঠবে না। শেষ পর্যন্ত মনে হল, সাফসুতরোর কাজটা পরে করলেও চলবে।

সেদিন সে যখন ফের তার স্টুডিয়োয় গিয়ে ঢুকল, তখন সন্ধে উতরে গেছে। ঘর অন্ধকার। তারই মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে সে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। স্টুডিয়োটা একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের অগোছালো হয়ে আছে। এখানে-ওখানে পড়ে আছে রঙের টিউব। তুলিগুলোও যে কোনটা কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাড়াতাড়ি কাজ করতে হয়েছে তো, তাই যেখানে যেটা রাখার কথা, সেখানে সেটা রাখেনি। মেঝের উপরে ছেঁড়া ন্যাকড়া আর কাগজের ডাঁই।

স্টুডিয়োর এই বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখতে-দেখতেই হঠাৎ একখানা কাগজের উপরে চোখ পড়ল তার। ইজেলের ঠিক নীচেই কাগজখানা পড়ে আছে। বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠল। এটা তার চেনা কাগজ। নিচু হয়ে কাগজখানা সে তুলে নিল।

তারপরেই যেন অন্ধকার হয়ে গেল গোটা পৃথিবী। ইজেলটাকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে কোনওমতে সে সামলে নিল। হাতের মধ্যে যে কাগজখানা আঁকড়ে ধরে রয়েছে, সেটা তো সামান্য একখানা কাগজমাত্র নয়, সেটাই যে তার সেরা ছবি—দ্য সমন্যামবুলিস্ট। স্বপনচারিণী। এত পরিশ্রম করে, এত যত্ন নিয়ে যাঁর ছবি সে এঁকেছে, সেই লেডি ম্যাকবেথ এখন তাঁর ঘুমন্ত, ভাষাহীন কাচের মতো চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ওই চোখ দুটিও তো তারই দেওয়া।

বিস্ময়ের প্রাথমিক প্রবল ধাক্কাটা কেটে যেতেই একটা ভয়ঙ্কর হতাশায় সে ডুবে গেল। গণ্ডগোল যে কোথায় হয়েছে, সেটা বুঝতে তার বিশেষ সময় লাগেনি। এবারও তার অন্যমনস্কতাই তাকে ডুবিয়েছে। তার জীবনে এ তো নতুন-কিছু নয়। অতীতেও একাধিকবার এমন ঘটনা ঘটেছে তার জীবনে। তবে কিনা সেই অন্যমনস্কতার পরিণাম বড়জোর হাসির খোরাক জোগাত, কখনওই এমন সর্বনাশ তার ফলে ঘটেনি।

এবারে সেই সর্বনাশটাই ঘটল। নিদারুণ, নিষ্ঠুর সর্বনাশ।

মনে হল, প্রবল একটা গ্লানি যেন তার ভিতর থেকে উঠে আসছে। সে ভীষণ অসুস্থ বোধ করছে। কমিটির হাতে কী পৌঁছে দিয়েছে সে? পার্সেল খুলে একখানা কাগজ, আর সেইসঙ্গে শিল্পী ও ছবির নাম ছাড়া তো আর কিছুই তারা পায়নি। ছবির বদলে স্রেফ একখানা কাগজ পেয়ে তারা নিশ্চয় হেসে খুন হচ্ছে।

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কীই-বা একে বলা যায়। দাঁতে দাঁত ঘষে, নিরুপায় আক্রোশে সে নিজেকে আর তার ভাগ্যকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগল।

ছবিখানাকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল সে। ছেঁড়া টুকরোগুলোকে নিক্ষেপ করল বাজে-কাগজের ঝুড়ির মধ্যে।

পরের সপ্তাহে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল এই বিপর্যয়ের কথা ভুলে যেতে। ভুলে যাওয়ার জন্য রঙ আর তুলি দিয়ে এমন সমস্ত কাজ করতে লাগল, যে-ধরনের কাজ সে এর আগে কখনও করেনি। আসলে এ তো আর কিছুই নয়, নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা। সে যখন এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আর বিপর্যয়ের ব্যাপারটা সত্যিই ভুলতে বসেছে, ঠিক তখনই, পনেরোই জানুয়ারির—অর্থাৎ প্রদর্শনীর যেদিন উদ্বোধন হবে, সেই দিনটিরই সকালে একখানা চিঠি তার কাছে এসে পৌঁছল। সে তার ব্রেকফাস্ট সেরে নিচ্ছে, এই সময় চিঠিখানা সে হাতে পায়। নীল রঙের লম্বাটে খাম। তার উপরে পরিচ্ছন্ন প্রতীক। কারা এ-চিঠি পাঠিয়েছে, তা ওই প্রতীক দেখেই বোঝা যায়। চিঠি পাঠিয়েছে সোসাইটি অব ফাইন আর্টস।

খাম খুলে চিঠি বার করবার আগে এক মুহূর্ত সে ভাবল যে, চিঠিতে কী থাকতে পারে। তার মনে হল, 'রহস্যজনক' পার্সেলটি সম্পর্কে সোসাইটি নিশ্চয়ই কিছু জানতে চাইছে। সম্ভবত এটা নিয়মরক্ষার ব্যাপার মাত্র, সোসাইটি যা হামেশা করে থাকে।

স্থিরভাবে খামের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চিঠিখানা সে বার করে আনল।

চিঠির সূচনা এইরকম: "প্রিয় মহাশয়, আমরা আপনাকে সানন্দ অভিনন্দন জানাই..." কিন্তু এ তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সংক্ষেপে, আধা-আনুষ্ঠানিক ভাষায়, সোসাইটি তাকে জানাচ্ছে যে, তার ছবি 'দ্য সমন্যামবুলিস্ট' এবার একটি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। চিঠির উপসংহারে রয়েছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, প্রদর্শনীর উদ্বোধন-দিবসের অনুষ্ঠানে তার উপস্থিত থাকা চাই।

তার মাথা ঘুরছিল। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। খুশি হবে কী, সে বিভ্রান্ত বোধ করছিল। প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পর সে বুঝতে পারল যে, কোথাও কিছু-একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। নয়তো এমন হয় না, এমন হতে পারে না।

আধঘণ্টা বাদে সে যখন টাউন হলে গিয়ে পৌঁছল, নিরুদ্ধ উত্তেজনায় তখন তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

টাউন হলের মস্ত ফটক সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রদর্শনী দেখবার জন্য লোক আসছে লাইন বেঁধে। অকারণে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে দুই বিপুলকায় শিল্প-বোদ্ধা। তাঁদের ঠেলেঠুলে কোনওরকমে সে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

প্রদর্শনী দোতলায়। সিঁড়িতে চমৎকার গালচে পাতা। তার উপর দিয়ে এক-একবারে তিন ধাপ করে সিঁড়ি টপকে সে দোতলায় গিয়ে পৌঁছল।

যে-হলে প্রদর্শনী, রঙের বাহারে সেটা ঝলমল করছে। চার দেয়াল জুড়ে নানা আকারের অসংখ্য ছবি। তার মধ্যে যেমন আছে ছোট্ট-ছোট্ট সব মিনিয়েচার, তেমনই আছে বিশাল সব ক্যানভাস।

উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে ধকধক করছে, ঘুরে-ঘুরে সে ছবি দেখতে লাগল। যেসব ছবি পুরস্কার পেয়েছে, তার প্রতিটির তলায় পরিচ্ছন্ন একটি লেবেল আঁটা। তাতে শিল্পী আর ছবির নাম। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সেই লেবেলগুলো দেখে যাচ্ছে সে।

উত্তর, পুব আর দক্ষিণের দেয়াল শেষ করতে তার পুরো একটি ঘণ্টা লেগেছে। ল্যান্ডস্কেপ, ফিগার, স্টিল লাইফ, নানান মাধ্যমে করা স্কেচ, কোনওটাই সে বাদ দেয়নি। এ যেন তার দৃষ্টিশক্তির অগ্নিপরীক্ষা। চোখ লাল, ব্যথাও করছে। কিন্তু তা হোক, রহস্যের সমাধান না-করে সে ছাড়বে না।

সে যখন পশ্চিমের দেয়ালে গিয়ে দাঁড়াল, তখন তার উৎসাহ অবশ্য অনেকটাই ঝিমিয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখল, তাতে তার উৎসাহের যেটুকু যাও-বা অবশিষ্ট ছিল, তাও তার আর রইল না। দেয়াল জুড়ে ঝুলছে, ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো সব ছবি, যার নাম কিনা অ্যাবস্ট্র্যাকশন বা বিমূর্ত শিল্প।

প্রথম ছবিটাই প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। নেহাতই অনিচ্ছায়, প্রায় যন্ত্রের মতো সে ছবিখানার লেবেলের উপরে চোখ রাখল।

নামটা চেনা-চেনা মনে হল। আরে, এ তো তারই নাম। আর ছবির নাম? ওটাও তার চেনা—'দ্য সমন্যামবুলিস্ট'।

কিন্তু এটা কীসের ছবি? তুলি দিয়ে এই যে রঙ-বেরঙের ছোপ লাগনো হয়েছে, এরই বা অর্থ কী? এরকম কিছু তো সে কস্মিনকালেও আঁকেনি।

একেবারে বিদ্যুচ্চমকের মতোই ব্যাপারটা সে বুঝে গেল। ছবি নয়, এটা সেই কাগজখানা, ছবিতে যে-যে রঙ ব্যবহার করবে, তার মিশেল ঠিক করবার আগে এরই উপরে সে তার তুলি দিয়ে হরেক রঙের ছোপ লাগিয়েছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮ মে ১৯৪১

বর্ণান্ধ

দুষ্প্রাপ্য বইখানাকে বগলে গুঁজে পুরনো বইয়ের দোকানের ভ্যাপসা মলিন পরিবেশ থেকে আমি বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। অগস্ট মাস। বিষণ্ণ গুমোট সন্ধেগুলি যেন এই সময়ে একটা ভারী বোঝার মতো মানুষের বুকের উপরে চেপে বসে। কিন্তু বাড়ির পথে বেশ ফুর্তি নিয়েই হাঁটছিলাম আমি। আগের দিন আমার মনটা বিশেষ ভাল ছিল না। বুঝতে পারছিলাম যে, ইতিমধ্যে সেই মনমরা ভাবটাও দিব্যি কেটে গেছে। কেনই বা কাটবে না? কপাল ভাল বলতে হবে, পুরনো বইয়ের দোকানে ঢুকে তাকের ধুলো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে একেবারে হঠাৎই এমন একটি রত্ন পেয়ে গেছি, যার খোঁজ পেলে যে-কোনও রসিক ব্যক্তির জিভ দিয়ে জল ঝরবে। রত্নটি আর কিছুই নয়, চিনের মৃৎশিল্প নিয়ে ফরাসি ভাষায় লেখা দুষ্প্রাপ্য একখানা গবেষণাগ্রন্থ। মোটা বই, ছবিগুলোও চমৎকার। তার উপরে আবার বইখানা পেয়েও গেছি একেবারে জলের দরে। এসব বই যারা বেচে, কী বেচছে তাও কি তারা জানে না?

আপাতত এই বইয়ের মধ্যে যে হপ্তা দুয়েক ডুবে থাকা যাবে, এই কথাটা ভাবতে-ভাবতে রোজকার মতো আজও আমি পোস্ট আপিসের কাছে মোড় ফিরেছিলাম। কোনও কিছু ভাবতে ভাবতে যারা হাঁটে, তাদের তো আর অন্য কোনওদিকে খেয়াল থাকে না, আমারও ছিল না। ফুটপাথে চোখ রেখেই হাঁটছিলাম আমি। তবে কিনা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেও তো একটা ব্যাপার আছে, সেটা নিশ্চয়ই কাজ করছিল, তা নইলে আর মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কেন চোখ তুলে তাকাব। তাকিয়ে দেখলাম, আমার থেকে কয়েক গজ আগে আর-একটা লোক খুবই মন্থর গতিতে, যেন বা পা টেনে-টেনে হাঁটছে। আর-একটু নজর করে দেখে মনে হল, লোকটা হয়তো একেবারে অচেনাও নয়। ঝুঁকে পড়ে হাঁটার এই ভঙ্গিটা আমি চিনি। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ঠিক এইভাবেই হাঁটত। কিন্তু সেই বন্ধুটির সঙ্গে তো বছর দশেক হল কোনও যোগাযোগই আমার নেই। লোকটি সত্যিই আমার সেই বন্ধু কিনা, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, দীর্ঘকাল যার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না, সেই বন্ধুটিই বটে! চেহারা আর সেই আগের মতো নেই, শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে, তবে চেনা যায়। কাঁধে হাত রাখতে সে চমকে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কী ভীষণ পালটে গেছে আমার বন্ধুটি, এ তো ভাবাই যায় না! আগে তাকে যা দেখেছি, এখন সে যেন তার ছায়া মাত্র। আমাকে দেখে আবেগে সে কথাই বলতে পারছিল না। আমার অবস্থাও তথৈবচ। কাছেই একটা চায়ের দোকান। বন্ধুটিকে টেনে নিয়ে আমি সেই দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তারপর এমন একটা কোণ বেছে নিয়ে সেখানে গিয়ে বসলাম, যেখানে আলো তত জোরালো নয় আর পরিবেশটাও একটু নিরিবিলি। আমাদের কারও মুখেই কোনও কথা সরছিল না।

চা খেতে-খেতে অতীতের কথা মনে পড়ল আমার।

একই ইস্কুলে পড়তাম আমরা। তারপর একই কলেজে। সেই সময়েই যে আমরা পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, তার কারণ আমরা দু'জনেই ছিলাম শিল্পপ্রেমিক। যখন আমরা কলেজের ছাত্র, তখনই দেখতাম যে, ক্যানভাসের উপরে রঙের তুলি বুলোতে বুলোতে কত অনায়াসে সে একটার পর একটা আশ্চর্য ছবি তৈরি করে তোলে। আমি ছিলাম তার সমালোচক। নির্ভীক, নিরপেক্ষ সমালোচক। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার ছবিগুলিকে দেখতাম আমি, তারপর যা মনে হত, খোলাখুলি বলতাম। রঙের ব্যবহারে তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ, মনে হত সে যেন রঙের জাদুকর। পুরো ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে, যেন সেসব গ্রাহ্যের মধ্যে না এনেই এমন নির্লিপ্ত অথচ নিশ্চিত ভঙ্গিতে

সে ক্যানভাসের উপরে রঙ চড়িয়ে যেত যে, আমি অবাক হয়ে যেতাম। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে তার পুরো কাজটাও হত অসাধারণ।

কিন্তু—এবং এই 'কিন্তু'টা খুবই তাৎপর্যময়—একালের তাবৎ প্রগতিশীল তরুণ বুদ্ধিজীবীর মতো সেও ছিল 'বামপন্থী'। আর শিল্পের ক্ষেত্রে বামপন্থী হওয়ার যে পরিণাম, তার বেলাতেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। এখানে তখন আয়েসি রক্ষণশীলরাই তো দলে ভারী, তাদের কাছে সে একেবারে অচ্ছুত হয়ে গেল। এটা কোনও আশ্চর্য ব্যাপার নয়, এরকম যে হবে, তা তো জানাই ছিল, ব্যাপারটাকে সে তাই ধর্তব্যের মধ্যে আনল না, এটাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে সে এঁকে যেতে লাগল তার ছবি। একমাত্র আমিই জানি যে, এর পর থেকে অ্যাকাডেমির নামগন্ধও সে সহ্য করতে পারত না।

শিল্পের ব্যাপারে তার প্রগতিশীল মতামতগুলি কিন্তু আমি খুবই সমর্থন করতাম। তার কারণ আমিও এ-ক্ষেত্রে ছিলাম পুরোপুরি 'আধুনিক'। তার তাবৎ ছবির পিছনে যে একটা সজীব মন কাজ করে যাচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারতাম। বুঝে খুশিও হতাম খুব। আমার মনে পড়ে যে, একবার সে তার ছবির এক প্রকাশ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। কিন্তু দর্শক একেবারেই না-আসায় সেটা খুবই করুণ একটা তামাশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তারও পুরোপুরি মোহভঙ্গ হয়। সে বুঝতে পারে যে, সাধারণ দর্শকসমাজের শিল্পবুদ্ধি এখনও অতি নিচু স্তরে আটকে আছে, তার উপরে আর উঠতে পারছে না। এর পর থেকে সে তার স্টুডিয়োর মধ্যেই প্রদর্শনীর আয়োজন করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যেত যে, একমাত্র আমিই তার দর্শক, আমিই তার সমালোচক।

সে শিল্পী, আর আমি তার শিল্পের অনুরাগী। যেন পরস্পরের পরিপূরক আমরা দু'জনে। এইভাবে আমাদের জীবন নেহাত মন্দ কাটছিল না। টাকা রোজগারের কোনও গরজ ছিল না তার। বাবা ছিলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী, ছেলের জন্য বিস্তর টাকাকড়ি তিনি রেখে গেছেন, সুতরাং ছবি এঁকে টাকা রোজগার করতে হবে এমন কথা তাকে ভাবতে হয়নি, আর তাই আর্ট ফর আর্টস সেক অর্থাৎ কলাকৈবল্যের সেবক হয়েই দিব্যি সে দিন কাটাতে পারছিল। আমার অবস্থা অন্যরকম, যে-কলেজে পড়তাম, গ্র্যাজুয়েট হবার পরে সেখানেই আমি লাইব্রেরিয়ানের চাকরিটা পেয়ে যাই। খুব একটা ভাল চাকরি নয়। কিন্তু তা না-ই হোক, আমার শিল্পচর্চায় তো এর দ্বারা কোনও ব্যাঘাত ঘটছে না, এতেই আমি খুশি।

যে-ক'টা বছর তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটাই, তারই মধ্যে তাকে আমি অতি দ্রুত এক পরিণত শিল্পী হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। যা দিয়ে একজন সত্যিকারের প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীকে চেনা যায়, সেই লক্ষণগুলি ইতিমধ্যেই অতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল তার কাজে। আমি বুঝতে পারছিলাম, শিল্পকলার জগতে শ্রেষ্ঠ এক বহুমুখী প্রতিভা হিসাবে হঠাৎই সে বিখ্যাত হয়ে উঠবে। তার আর দেরিও বিশেষ

নেই। সাগ্রহে সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি।

কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। ভীষণ ভুল করেছিলাম। হঠাৎই এমন একটা ঘটনা ঘটে যায়, যা ঘটবে বলে আগে বুঝতে পারিনি। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই আমরা। এমন একটা জায়গায় সে চলে যায়, খ্যাতি, শিল্প, এমনকী আমাদের এই চেনা জগতের সঙ্গেও যার ব্যবধান অতি দুস্তর।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল নিছক ঠাট্টাতামাশার ভিতর দিয়ে। সন্ধের দিকে প্রায়ই তার ফ্ল্যাটে আমি আড্ডা দিতে যেতাম। বছর দশেক আগে জানুয়ারির এক সন্ধেয় সেইরকম আড্ডা দিতে গিয়েছি। মায়োপিয়ায় ভুগত বলে সন্ধের দিকে সে ছবি আঁকার কাজ বড় একটা করত না। সেদিন কিন্তু সে বেশ বড় একটা ক্যানভাসে খুব বিভোর হয়ে রঙ ধরাচ্ছিল। কাজটা এতই তন্ময় হয়ে করছিল যে, আমি যে ঘরে ঢুকেছি, তাও সে টের পায়নি। কৌতূহলী হয়ে আমি ইজেলটাকে দেখব বলে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াই। ক্যানভাসে যা তাকে আঁকতে দেখি, তাতে আমার কৌতূহল আরও বেড়েই গেল। পৃথুলা, লাস্যময়ী একটি নারীমূর্তি, এমনভাবে আমার বন্ধুটি তাকে এঁকে চলেছে যে, রেনোয়ার ছবির কথা মনে পড়ে যায়। মনে হচ্ছিল, সে যেন তার সমস্ত কামনা ওই ছবির মধ্যে উজাড় করে দিচ্ছে। গলাটাকে খাঁকরে নিয়ে জিজ্ঞেস করি, ছবিতে যাঁকে লীলায়িত ভঙ্গিমায় দেখা যাচ্ছে, তিনি কে? এ কি তার কল্পনার নারী, না কি বাস্তব? আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে সে হাসল। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি। কথা বলে যা বোঝানো যেত, ওই হাসি থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝে নেওয়া গেল।

একটু চাপাচাপি করতেই বেরিয়ে পড়ল আসল কথাটা। আমার বন্ধুটি যে প্রেমে পড়তে পারে, আগে তা ভাবিনি। না-ভাবাটা ভুল হয়েছিল। মহিলাটিকে প্রথমবার দেখেই সে যে চলে গিয়েছিল, সেটা বোঝা গেল। এও বুঝলাম যে, নিজেকে সামলে নেবার কোনও চেষ্টাই সে করেনি, ফলে তাকে এখন হাবুডুবু খেতে হচ্ছে। সবটা শুনে প্রথমে বেশ মজাই লেগেছিল আমার। তাকে সে-কথা বললামও। আসলে, তখনও আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না যে, ছেলে ধরাই যেসব মেয়ের স্বভাব, আমার এই বন্ধুটি শেষ পর্যন্ত তাদেরই একজনের খপ্পরে পড়তে পারে। কিন্তু তা-ই ঘটে গেল।

আসলে যা ঘটল, তা আরও অনেক বেশি মারাত্মক। সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটা যে এতখানি গড়াবে, তা আমি ভাবতে পারিনি। হপ্তাখানেক বাদে আমার বন্ধুটির কাছ থেকে একখানা চিঠি পাই। তাড়াহুড়ো করে লেখা চিঠি। তাতে সে জানাচ্ছে যে, আগের দিন তাদের বিয়ে হয়ে গেছে, এখন তারা চলে যাচ্ছে অখ্যাত এক দ্বীপে। তবে সেখান থেকে সে আমাকে চিঠি লিখবে।

সেসব চিঠিপত্র কখনও পাইনি। তার বদলে হঠাৎই একদিন এমন একটা খবর আমার চোখে পড়ে যে, আমি চমকে যাই। মৃত্যুর খবর। বন্ধুপত্নী মারা গেছেন। "সাঁতার কাটতে গিয়ে তিনি মারা যান।"

খবর পড়ে ভাবতে থাকি যে, আমার বন্ধুটি এখন কী করছে। কী হল তার। ভেবে-ভেবে কূল পাই না। এই একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস আমার ছিল যে, সুবুদ্ধির উদয় হলেই সে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু বছরের পর বছর যায়, সে আর ফেরে না। আমিও ফের শিল্প নিয়ে পড়াশুনা করতে লেগে যাই। তবে কিনা একেবারেই একা-একা।

এতদিন বাদে সেই মানুষটি আবার ঘরে ফিরেছে। বিষণ্ণ, গম্ভীর, শীর্ণ একটি মানুষ। এ যেন সেই মানুষ নয়, তার প্রেতমূর্তি। স্ত্রীকে সে যে এত গভীরভাবে ভালবাসত, তার মৃত্যুতে যে সে এত শোকাবহভাবে পাল্টে যাবে, তা তো আমি ভাবতেও পারিনি।

বন্ধুটি তার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে, আর আমি তাকে দেখছি। আগে সে কত উজ্জ্বল, কত প্রাণবন্ত ছিল। আর আজ? সেই উচ্ছলতা, সেই টগবগে স্ফূর্তির ভাবটাকেই কে যেন তার ভিতর থেকে নিংড়ে বার করে নিয়েছে। বন্ধুটির বয়েস তো পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। অথচ তাকে দেখাচ্ছে যেন এমন এক প্রৌঢ়ের মতো, যার শরীর-স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে।

এই অবস্থায় কথাবার্তা শুরু করা খুবই শক্ত ব্যাপার। তবু আমাকেই সেটা শুরু করতে হল। জিজ্ঞেস করলাম, কবে সে ফিরেছে।

"আজই সকালে।" কথার মধ্যে প্রাণের কোনও স্পর্শ নেই।

কোথায় উঠেছে? তার সেই আগের ফ্ল্যাটে?

এবারও সে একই রকমের নিষ্প্রাণ গলায় বলল, "না।"

আরও কিছু প্রশ্ন করে যা জানা গেল, তা এই যে, তার অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। টাকাপয়সা কিছু নেই। যেটুকু যা ছিল, ফেরার ভাড়া জোগাড় করতেই তা ফতুর হয়ে গেছে। সারাদিনে তার পেটে কিছু পড়েনি। এখানে তার কোনও আশ্রয়ও নেই। রাতটা যে কোথায় কাটাবে, তাও সে জানে না।

তাকে আমি আমার ফ্ল্যাটে এনে তুললাম। একদিন যে ছিল আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, এটুকু তো তার জন্য করতেই হবে।

কিন্তু তার পরেও তার কোনও পরিবর্তন হল না। পথের মধ্যে হঠাৎ যখন দেখা হয়, তখন যেমন দেখেছিলাম, সেইরকমই রয়ে গেল সে। চুপচাপ কী যেন ভাবে। প্রাণের কোনও সাড়া মেলে না। ঘুমোয় কম, খায় আরও কম, কথাও বিশেষ বলে না। অথচ আমি তো তাকে সেই আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চাই। ফেরানো যাতে সম্ভব হয়, তারই জন্য যা-কিছু শিল্পসামগ্রী এতদিন ধরে একটি-একটি করে আমি জোগাড় করেছি, তার সবকিছু তার সামনে সাজিয়ে ধরি আমি। ভাবি, এসব দেখলে হয়তো তার শিল্পী-মন আবার জেগে উঠবে। কিন্তু কোথায় কী, শিল্পের নাম শোনামাত্র এমন বিরক্তিভরে সে ফিরিয়ে নেয় তার মুখ যে, আমি হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। ভাবি যে, আস্তে-আস্তে সে সেরে উঠবে, এখন চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

এরই মধ্যে একটা সুযোগ এসে যায়। তাতে মনে হয় যে, তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। শিল্প নিয়ে ইতিমধ্যে আর মাথা ঘামাতে পারিনি, লাইব্রেরিতে খুব কাজের চাপ যাচ্ছিল, তবু এই সময়ে হঠাৎই একদিন একটা পোস্টারের উপরে চোখ পড়তে আমার সেই পুরনো ভাবনাটা আবার চাগাড় দিয়ে ওঠে। গ্যালারির কর্তৃপক্ষ, তাঁদের ঐতিহ্য অনুযায়ী ফরাসি চিত্রকলার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, সেখানে সেজান ও তাঁর পরবর্তী শিল্পীদের ছবি দেখানো হবে।

পোস্টারটা দেখেই পুরনো দিনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সেইসব দিনের কথা, যখন গ্যালারির দেয়ালে টাঙানো বিখ্যাত সব ছবির দিকে আমরা দুই বন্ধু মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। বন্ধুটি আমাকে ছেড়ে যাবার পরেও একা আমি ফি বছর তাদের প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছি। তবে কিনা, সে যখন সঙ্গে থাকত, আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে সেও কিছু মন্তব্য করত, সেই সময়কার আনন্দই ছিল আলাদা রকমের। পরে একা-একা গিয়ে আর তেমন আনন্দ পাইনি।

ফ্ল্যাটে ফিরে দেখলাম, শূন্য চোখে ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে একটা ইজিচেয়ারে চুপ করে সে বসে আছে। পা দুটি সামনে ছড়ানো, দু'হাত দু'দিকে ঝুলছে।

বেশি কথার মধ্যে না-গিয়ে তাকে প্রদর্শনীর খবর দিলাম।

বললাম, "গ্যালারি তো আবার সবাইকে মাতিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে হে!"

ভেবেছিলাম অন্তত এই কথাটা শুনে তার ভাবান্তর হবে। কিন্তু হল না।

"কী বললে?" সেই একই রকমের শূন্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

গোটা ব্যাপারটা অতএব খুলে বলতে হল।

"গ্যালারিতে প্রদর্শনী হচ্ছে। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের ফরাসি চিত্রকলা। বিস্তারিত জানতে চাও তো...আরে, ফি বছরই তো ওরা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে, তোমার মনে নেই?"

"প্রদর্শনী?" সন্দিগ্ধ, দ্বিধাজড়িত গলায় সে জিজ্ঞেস করল। দৃষ্টিতে সুদূরের ছোঁয়া লেগেছে। যেন সে মনে করতে চাইছে পুরনো দিনের কথা।

ব্যাপার কী? সবকিছুই সে কি ভুলে গেছে? এ যে অবিশ্বাস্য! তাকে সে-কথা আমি বললামও।

"বাঃ, গ্যালারিতে সেই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা ছবি দেখে কাটাতাম...কত আনন্দ, কত উত্তেজনা...সেসব কিচ্ছু তোমার মনে নেই? সব ভুলে মেরে দিয়েছ? আর তা-ই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আরে, মাতিসের সেই বিখ্যাত ছবি ওদালিসক, যা দেখে কী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলে তুমি, তাও মনে করতে পারছ না?"

তবুও সে কিছু বলছে না দেখে এমনভাবে আমার সিদ্ধান্তটা আমি জানিয়ে দিলাম যে, এর আর

কোনও নড়চড় হবার নয়। বললাম, "যা-ই হোক, কাল বিকেলে আমার সঙ্গে তুমি এই প্রদর্শনীতে যাচ্ছ। তখন বিশেষ ভিড়ভাট্টা থাকবে না।"

স্যুরার একখানা দুর্দান্ত ছবির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যেরকম সূক্ষ্ম, প্রায় বৈজ্ঞানিক, পরিমিতিবোধের পরিচয় রয়েছে এই ছবিখানার বর্ণ-সংগতির মধ্যে, তাতে সঙ্গীতের সূক্ষ্ম সুর-সংগতির কথাই আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমার চারদিকে বিখ্যাত সব ছবি। এত তন্ময় হয়ে, এত বিভোর হয়ে সেইসব ছবি আমি দেখছিলাম যে, বন্ধুটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। কী অপরূপ সব ছবি,—আমার মুখ দিয়ে কোনও কথাই সরছিল না।

সেজানের একখানা দারুণ ছবির উপরে চোখ পড়তে অবশ্য নিজেকে আর সামলানো গেল না। উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি ছবিখানির প্রশংসা করতে শুরু করে দিই।

কতক্ষণ ধরে প্রশংসা করছিলাম, কিচ্ছু আমার মনে নেই। কিন্তু হঠাৎই আমার খেয়াল হল যে, হল-এ ঢুকবার পর থেকে আমার বন্ধু এতক্ষণের মধ্যে একটিও কথা বলেনি। তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখে যে অভিব্যক্তি দেখলাম, তাতে আমার বাক্যস্রোত একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল।

বন্ধুর যে চেহারা আমার চোখে পড়ল, তেমন করুণ চেহারা আর কখনও আমি দেখিনি। এত ফ্যাকাশে, এত নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছিল তাকে যে, আমার ভয় হল, যে-কোনও মুহূর্তে সে হয়তো মূর্ছিত হয়ে পড়বে।

হাত ধরে আস্তে-আস্তে তাকে আমি গেটের কাছে নিয়ে এলাম। তারপর গেট পেরিয়ে রাস্তায়।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আকাশের কিউমুলাস মেঘের পুঞ্জে লেগেছে অপার্থিব কমলা রঙের ছোঁয়া। এতক্ষণ যে আমরা ওই হল-এর মধ্যে ছিলাম, তা আমি বুঝতেই পারিনি।

"তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?" জিজ্ঞেস করলাম, "দেখে তো মোটেই ভাল ঠেকছে না?"

ফিরে আসার পর এই প্রথম সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাল সে।

তারপর বলল, "সব কথা তোমাকে খুলে বলাই ভাল।" কণ্ঠস্বর গম্ভীর, তাতে এমন একটা দ্যোতনাও যেন রয়েছে, যা খুব শুভ নয়। "ভেবেছিলাম, কিছু না-বলে স্রেফ চুপ করে থাকব। কিন্তু এই কষ্ট আর আমি সহ্য করতে পারছি না।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইল সে। মস্ত বড় একটা শ্বাস নিল। তারপর বলল, "তুমি হয়তো ভাবছ যে, স্ত্রী মারা যাওয়াতেই এইভাবে বদলে গিয়েছি আমি। কিন্তু না, তা নয়।...সে ছিল অতি নচ্ছার মেয়ে!...না না, তার মৃত্যুর সঙ্গে আমার এই বদলে যাবার কোনও সম্পর্ক নেই। সে যে মরেছে, তাতে বরং আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। আসলে তার পরে একটা ব্যাপার ঘটে...।"

আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইল সে। মনে হল, যা সে বলতে চায়, তা সে সহজে বলতে পারছে না, বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

"তার মৃত্যুর পরে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার মনে হল, অদ্ভুত এক পৃথিবীর দিকে আমি তাকিয়ে আছি। চারপাশে যা-কিছু দেখছি, তার সবই কেমন যেন অদ্ভুত ছাতা-পড়া। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আমি আয়নার সামনে দাঁড়াই। মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগল। মনে হল, আমার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে।

"মারাত্মক ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল, আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তক্ষুনি এক চোখের ডাক্তারের কাছে আমি ছুটে যাই।

"ডাক্তার আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন, চোখ দেখলেন, নানারকম প্রশ্নও করলেন। তারপর কী বললেন ভাবতে পারো? বললেন যে, না, আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি না...না না, এটা অত খারাপ কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, আমি বর্ণান্ধ হয়ে যাচ্ছি বটে।...ভেবে দ্যাখো! ব্যাপারটা একবার ভেবে দ্যাখো!...রঙই তো আমার ভাষা, আর সেই আমি কিনা বর্ণান্ধ হতে চলেছি!...

"কী ভাবছ তুমি? ভাবছ আমি দুর্বল! ভাবছ যে, ভাগ্যের চাকার তলায় সেইজন্যই আমি গুঁড়িয়ে গেছি! নিজের কথা বলতে পারি, আমি যে আত্মহত্যা করিনি কেন, এই কথা ভেবেই আমি অবাক হয়ে যাই। কারণটা হয়তো এই যে, বাঁচতে আমার ভারী ভাল লাগে, আর নয়তো আমি ভিতু, কাপুরুষ। হয়তো সেটাই সত্যি কথা। নইলে দ্যাখো আজ আমার কাছে জীবনের কী অর্থ? শিল্পের কী অর্থ? যে লোক ধূসর ছাড়া...হরেক রকমের একঘেয়ে ধূসর ছাড়া কোনও রঙই দেখতে পায় না, সেজন্য মাতিস আর রেনোয়ার ছবিরই বা তার কাছে কী অর্থ?"

অমৃতবাজার পত্রিকা, ২২ মার্চ ১৯৪২

বঙ্কুবাবুর বন্ধু

বঙ্কুবাবুকে কেউ কোনওদিন রাগতে দেখেনি। সত্যি বলতে কি, তিনি রাগলে যে কীরকম ব্যাপারটা হবে, কী যে বলবেন বা করবেন তিনি, সেটা আন্দাজ করা ভারী শক্ত।

অথচ রাগবার যে কারণ ঘটে না তা মোটেই নয়। আজ বাইশ বছর তিনি কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল বা বাংলা পড়িয়ে আসছেন; এর মধ্যে কত ছাত্র এল-গেল, কিন্তু বঙ্কুবাবুর পিছনে লাগা—ব্ল্যাকবোর্ডে তাঁর ছবি আঁকা, তাঁর বসবার চেয়ারে গাবের আঠা মাখিয়ে রাখা, কালীপুজোর রাত্রে তাঁর পিছনে ছুঁচোবাজি ছেড়ে দেওয়া—এ-সবই এই বাইশ বছর ধরে ছাত্র-পরম্পরায় চলে

আসছে।

বঙ্কুবাবু কিন্তু কখনও রাগেননি। কেবল মাঝে মাঝে গলা খাঁকরিয়ে বলেছেন—ছিঃ!

এর একটা কারণ অবিশ্যি এই যে, তিনি যদি রাগটাগ করে মাস্টারি ছেড়ে দেন তো তাঁর মতো গরিব লোকের পক্ষে এই বয়সে আর-একটা মাস্টারি বা চাকরি খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত হবে। আর-একটা কারণ হল, ক্লাসভর্তি দুষ্টু ছেলের মধ্যে দু-একটা করে ভাল ছাত্র প্রতিবারেই থাকে; বঙ্কুবাবু তাদের সঙ্গে ভাব করে তাদের পড়িয়ে এত আনন্দ পান যে তাতেই তাঁর মাস্টারি সার্থক হয়ে যায়। এইসব ছাত্রদের তিনি কখনও কখনও নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর বাটি করে মুড়কি খেতে দিয়ে গল্পচ্ছলে দেশবিদেশের আশ্চর্য ঘটনা শোনান। আফ্রিকার গল্প, মেরু আবিষ্কারের গল্প, ব্রেজিলের মানুষখেকো মাছের গল্প, সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়া আটলান্টিস মহাদেশের গল্প, এ-সবই বঙ্কুবাবু চমৎকার করে বলতে পারেন।

শনি-রবিবার সন্ধ্যাবেলাটা বঙ্কুবাবু যান গ্রামের উকিল শ্রীপতি মজুমদারের আড্ডায়। অনেকবার ভেবেছেন আর যাবেন না, এই শেষবার, আর না। কারণ ছাত্রদের টিটকিরি গা-সওয়া হয়ে গেলেও, বুড়োদের পিছনে লাগাটা যেন কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। এই বৈঠকে তাঁকে নিয়ে যে ধরনের ঠাট্টা-তামাশা চলে সেটা সত্যিই মাঝে মাঝে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এই তো সেদিন, দু' মাসও হয়নি, ভূতের কথা হচ্ছিল। বঙ্কুবাবু সচরাচর মুখ খোলেন না। সেদিন কী জানি হল, হঠাৎ বলে ফেললেন যে, তাঁর ভূতের ভয় নেই। আর যায় কোথা! এমন সুযোগ কি এসব লোকে ছাড়ে? রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে বঙ্কুবাবুকে যাচ্ছেতাই ভাবে নাজেহাল হতে হল। মিত্তিরদের তেঁতুলগাছটার তলায় কে এক লিকলিকে লম্বা লোক ভুসোটুসো মেখে অন্ধকারে তাঁর পিঠের উপর পড়ল ঝাঁপিয়ে। এই আড্ডারই কারও চক্রান্ত আর কি!

ভয় অবিশ্যি পাননি বঙ্কুবাবু। তবে চোট লেগেছিল। তিনদিন ঘাড়ে ব্যথা ছিল। আর সবচেয়ে যেটা বিশ্রি—তাঁর নতুন পাঞ্জাবিটা কালিটালি লেগে ছিঁড়েটিঁড়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ঠাট্টার এ কী রকম রে বাপু!

এ ছাড়া ছোটখাটো পিছনে লাগার ব্যাপার তো লেগেই আছে। এই যেমন ছাতাটা জুতোটা লুকিয়ে রাখা, পানে আসল মশলার বদলে মাটির মশলা দেওয়া, জোর করে ধরে-বেঁধে গান গাওয়ানো ইত্যাদি।

কিন্তু তাও আড্ডায় আসতে হয়। না হলে শ্রীপতিবাবু কী ভাববেন! একে তো তিনি গাঁয়ের গণ্যমান্য লোক, দিনকে রাত করতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁর, তার উপরে আবার তাঁর বঙ্কুবাবু না হলে চলেই না। তিনি বলেন, একজন থাকবে যাকে নিয়ে বেশ রসিয়ে রগড় করা চলবে, নইলে আর আড্ডা! ডাকো বঙ্কুবিহারীকে।

আজকের আড্ডার সুর ছিল উচ্চগ্রামের; অর্থাৎ স্যাটিলাইট নিয়ে কথা হচ্ছিল। আজই সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ পরেই উত্তর দিকের আকাশে একটি চলন্ত আলো দেখা গেছে। মাসতিনেক আগেও একবার ওইরকম আলো দেখা গিয়েছিল এবং তাই নিয়ে আড্ডায় বিস্তর গবেষণা চলেছিল। পরে জানা যায় ওটা একটা রাশিয়ান স্যাটিলাইট। খটকা না ফোসকা এই গোছের কী একটা নাম। সেটা নাকি ৪০০ মাইল ওপর দিয়ে বনবন করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এবং তার থেকে নাকি বৈজ্ঞানিকেরা অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছেন।

আজকের আলোটা বঙ্কুবাবু প্রথম দেখেছিলেন। তারপর তিনিই সেটা নিধু মোক্তারকে ডেকে দেখান।

কিন্তু আড্ডায় এসে বঙ্কুবাবু দেখলেন যে, নিধুবাবু অম্লানবদনে প্রথম দেখার ক্রেডিটটা নিজেই নিয়েছেন, এবং সেই নিয়ে খুব বড়াই করছেন। বঙ্কুবাবু কিছু বললেন না।

স্যাটিলাইট সম্বন্ধে এখানে কেউই বিশেষ কিছু জানেন না, তবে এসব কথা বলতে তো আর টিকিট লাগে না, বা বললে পুলিশেও ধরে না, তাই সবাই ফোড়ন দিচ্ছেন।

চণ্ডীবাবু বললেন, 'যাই বলো বাপু, এসব স্যাটিলাইট-ফ্যাটিলাইট নিয়ে খামোখা মাথা ঘামানো আমাদের শোভা পায় না। আমাদের কাছে ও-ও যা, সাপের মাথার মণিও তাই। কোথায় আকাশের

কোন কোণে আলোর ফুটকি দেখছ, তাই নিয়ে খবরের কাগজ লিখছে, আর তাই পড়ে তুমি বৈঠকখানায় বসে পান চিবুতে চিবুতে বাহবা দিচ্ছ। যেন তোমারই কীর্তি, তোমারই গৌরব। হাততালিটা যেন তোমারই পাওনা। হুঁ।'

রামকানাই-এর বয়সটা কম। সে বলল, 'আমার না হোক, মানুষের তো। সবার উপরে মানুষ সত্য।'

চণ্ডীবাবু বললেন, 'রাখো রাখো। যতসব...মানুষ না তো কি বাঁদরে বানাবে স্যাটিলাইট? মানুষ ছাড়া আর আছে কী?'

নিধু মোক্তার বললেন, 'আচ্ছা বেশ। স্যাটিলাইটের কথা ছেড়েই দিলাম। তাতে না-হয় লোকটোক নেই, কেবল একটা যন্ত্র পাক খাচ্ছে। তা সে তো লাট্টুও পাক খায়। সুইচ টিপলে পাখাও ঘোরে। যাকগে। কিন্তু রকেট? রকেটের ব্যাপারটা তো নেহাত ফেলনা নয় ভায়া!'

চণ্ডীবাবু নাক সিঁটকে বললেন, 'রকেট! রকেট ধুয়ে কোন জলটা খাবে শুনি? রকেট! তাও বুঝতাম যদি হ্যাঁ, এই আমাদের দেশেই তৈরি হল, গড়ের মাঠ থেকে ছাড়লে সেটা চাঁদে-টাঁদে তাগ করে, আমরা গিয়ে টিকিট কিনে দেখে এলুম, তাও একটা মানে হয়।'

রামকানাই বলল, 'ঠিক বলেছেন। আমাদের কাছে রকেটও যা, ঘোড়ার ডিমও তাই।'

ভৈরব চক্কোত্তি বললেন, 'ধরো যদি অন্য গ্রহ-ট্রহ থেকে একটা কিছু পৃথিবীতে এল...'

'এলেই বা কী? তুমি-আমি তো আর সেটাকে দেখতে পাব না।'

'তা বটে!'

আড্ডার সবাই চায়ের পেয়ালায় মুখ দিলেন। এর পর তো আর কথা চলে না।

এই অবসরে বঙ্কুবাবু খুক করে একটু কেশে নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'ধরুন যদি এইখানেই আসে।

নিধুবাবু অবাক হবার ভান করে বললেন, 'ব্যাঁকা আবার কী বলছে হে, অ্যাঁ? কে আসবে এইখানে? কোত্থেকে আসবে?'

বঙ্কবাবু আবার মৃদুস্বরে বললেন, 'অন্য গ্রহ থেকে কোনও লোক-টোক...'

ভৈরব চক্কোত্তি তাঁর অভ্যাসমতো বঙ্কবাবুর পিঠে একটা অভদ্র চাপড় মেরে দাঁত বার করে বললেন, 'বাঃ বঙ্কুবিহারী, বাঃ! অন্য গ্রহ থেকে লোক আসবে এইখানে? এই গণ্ডগ্রামে? লন্ডন নয়, মস্কো নয়, নিউ ইয়র্ক নয়, মায় কলকেতাও নয়—একেবারে এই কাঁকুড়গাছি? তোমার তো শখ কম নয়!'

বঙ্কুবাবু চুপ করে গেলেন। কিন্তু তাঁর মন বলতে লাগল, সেটা আর এমন অসম্ভব কী? বাইরে থেকে যারা আসবে, তাদের তো পৃথিবীতে আসা নিয়ে কথা। অত যদি হিসেব করে না-ই আসে? কাঁকুড়গাছিতে না-আসা যেমন সম্ভব, আসাও তো ঠিক তেমনই সম্ভব।

শ্রীপতিবাবু এতক্ষণ কিচ্ছু বলেননি। এবার তিনি নড়েচড়ে বসতেই সকলে তাঁর মুখের দিকে চাইল। তিনি চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বিজ্ঞের মতো ভারী গলায় বললেন, 'দেখো, বাইরের গ্রহ থেকে যদি লোক আসেই, তবে এটা জেনে রেখো যে তারা এই পোড়া দেশে আসবে না। তাদের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই! আর অত বোকা তারা নয়। আমার বিশ্বাস তারা সাহেব, এবং এসে নামবে ওই সাহেবদেরই দেশে পশ্চিমে। বুঝেছ?'

এ-কথায় এক বঙ্কুবাবু ছাড়া সকলেই একবাক্যে সায় দিলেন।

চণ্ডীবাবু নিধু মোক্তারের কোমরে খোঁচা মেরে ইশারায় বঙ্কুবাবুকে দেখিয়ে ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বললেন, 'আমার কিন্তু বাবা মনে হয় যে, বঙ্কু ঠিকই বলেছেন। বঙ্কুবিহারীর মতো লোক যেখানে আছে সেখানে আসাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কী বলো নিধু? ধরো যদি একটা স্পেসিমেন নিয়ে যেতে হয়, তা হলে বঙ্কুর মতো দ্বিতীয় মানুষ কোথায় পাচ্ছে শুনি?'

নিধু মোক্তার সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক ঠিক। বুদ্ধি বলো, চেহারা বলো, যাই বলো, ব্যাঁকা একেবারে আইডিয়াল।'

রামকানাই বলল, 'একেবারে জাদুঘরে রাখার মতো। কিংবা চিড়িয়াখানায়।'

বঙ্কুবাবু মনে মনে বললেন, স্পেসিমেন যদি বলতে হয় তো এঁরাই বা কী কম? ওই তো শ্রীপতিবাবু—উটের মতো থুতনি। আর ওই ভৈরব চক্কোত্তি—কচ্ছপের মতো চোখ, ওই নিধু মোক্তার ছুঁচো, রামকানাই ছাগল, চণ্ডীবাবু—চামচিকে। চিড়িয়াখানায় যদি রাখতে হয় তো...

বঙ্কুবাবুর চোখে জল এল। তিনি উঠে পড়লেন। আজ অন্তত আড্ডাটা ভাল লাগবে ভেবেছিলেন। হল না। মনটা ভারী হয়ে গেছে। আর থাকা চলে না!

'সে কী, উঠলে নাকি হে?' শ্রীপতিবাবু যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'হ্যাঁ, রাত হল।'

'কই রাত? কাল তো ছুটি! বোসো, চা খাও।'

'নাঃ। আজ আসি। পরীক্ষার খাতা আছে কিছু। নমস্কার।'

রামকানাই বলল, 'দেখবেন বঙ্কুদা। আজ আবার অমাবস্যা। মঙ্গলবার। মানুষ কিন্তু ভূতেরও বাড়া।'

বঙ্কুবাবু আলোটা দেখতে পেলেন পঞ্চা ঘোষের বাঁশবাগানের মাঝবরাবর এসে।. তাঁর নিজের হাতে আলো ছিল না। শীতকাল, তাই সাপের ভয় নেই; তা ছাড়া পথও খুব ভাল ভাবেই চেনা। এ পথে এমনিতে বড় একটা কেউ আসে না, কিন্তু বঙ্কুবাবুর শর্টকাট হয় বলেই তিনি এই পথে যান।

কিছুক্ষণ থেকেই তাঁর কেমন জানি খটকা লাগছিল। অন্যদিনের চেয়ে কী-জানি একটা অন্যরকম ভাব। কিন্তু সেটা যে কী, তা বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ খেয়াল হল যে, বাঁশবনে আজ ঝিঁঝি ডাকছে না। একদম না। সেইটেই তফাত। অন্যদিন যতই বনের ভিতর ঢোকেন ততই ঝিঁঝির ডাক বাড়ে। আজ ঠিক তার উলটো। তাই এমন থমথমে ভাব। ব্যাপার কী? ঝিঁঝিগুলো সব ঘুমোচ্ছে নাকি?

ভাবতে ভাবতে হাত বিশেক গিয়ে পুব দিকে চোখ যেতেই আলোটা দেখতে পেলেন।

প্রথমে মনে হল বুঝি আগুন লেগেছে। বনের মধ্যিখানের ফাঁকটায় যেখানে ডোবাটা রয়েছে তার চারপাশের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে গাছের ডালে ও পাতায় একটা গোলাপি আভা। আর নীচে, ডোবার সমস্ত জায়গাটা জুড়ে উজ্জ্বল গোলাপি আলো। কিন্তু আগুন নয়, কারণ আলোটা স্থির।

বঙ্কুবাবু এগোতে লাগলেন।

কানের মধ্যে একটা শব্দ আসছে। কিন্তু সেটা যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। হঠাৎ কানে তালা লাগলে যেমন শব্দ হয়—রী রী রী রী—এ যেন ঠিক সেইরকম।

বঙ্কুবাবুর গা একটু ছমছম করে থাকলেও, একটা অদম্য কৌতূহলবশে তিনি এগিয়ে চললেন।

ডোবার থেকে ত্রিশ হাত দূরে বড় বাঁশঝাড়টা পেরোতেই তিনি জিনিসটা দেখতে পেলেন। একটা অতিকায় উপুড়-করা কাচের বাটির মতো জিনিস সমস্ত ডোবাটাকে আচ্ছাদন করে পড়ে আছে এবং তার প্রায়-স্বচ্ছ ছাউনির ভিতর থেকে একটা তীব্র অথচ স্নিগ্ধ গোলাপি আলো বিচ্ছুরিত হয়ে চতুর্দিকের বনকে আলো করে দিয়েছে।

এমন অদ্ভুত দৃশ্য বঙ্কুবাবু স্বপ্নেও কখনও দেখেননি।

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বঙ্কুবাবু লক্ষ করলেন যে, জিনিসটা স্থির হলেও যেন নির্জীব নয়। অল্প অল্প স্পন্দনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে মানুষের বুক যেমন ওঠে-নামে, কাচের ঢিবিটা তেমনই উঠছে-নামছে।

বঙ্কুবাবু ভাল করে দেখবার জন্য আর হাত চারেক এগিয়ে যেতেই হঠাৎ যেন তাঁর শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। আর তার পরমুহূর্তেই তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর হাত-পা যেন কোনও অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তাঁর শরীরে আর শক্তি নেই। তিনি না পারেন এগোতে, না পারেন পিছোতে।

কিছুক্ষণ এইভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বঙ্কুবাবু দেখলেন যে, জিনিসটার স্পন্দন আস্তে আস্তে থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সেই অদ্ভুত কানে-তালা-লাগার শব্দটা। তারপর হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে, কতকটা মানুষের মতো কিন্তু অত্যন্ত মিহি গলায় চিৎকার এল—মিলিপিপ্পিং খ্রুক, মিলিপিপ্পিং খ্রুক!

বঙ্কুবাবু চমকে গিয়ে থ'। এ আবার কী ভাষা রে বাবা! আর যে বলছে সেই-বা কোথায়?

দ্বিতীয় চিৎকার শুনে বঙ্কুবাবুর বুকটা ধড়াস করে উঠল।

'হু আর ইউ? হু আর ইউ?'

এ যে ইংরিজি! হয়তো তাঁকেই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে প্রশ্নটা।

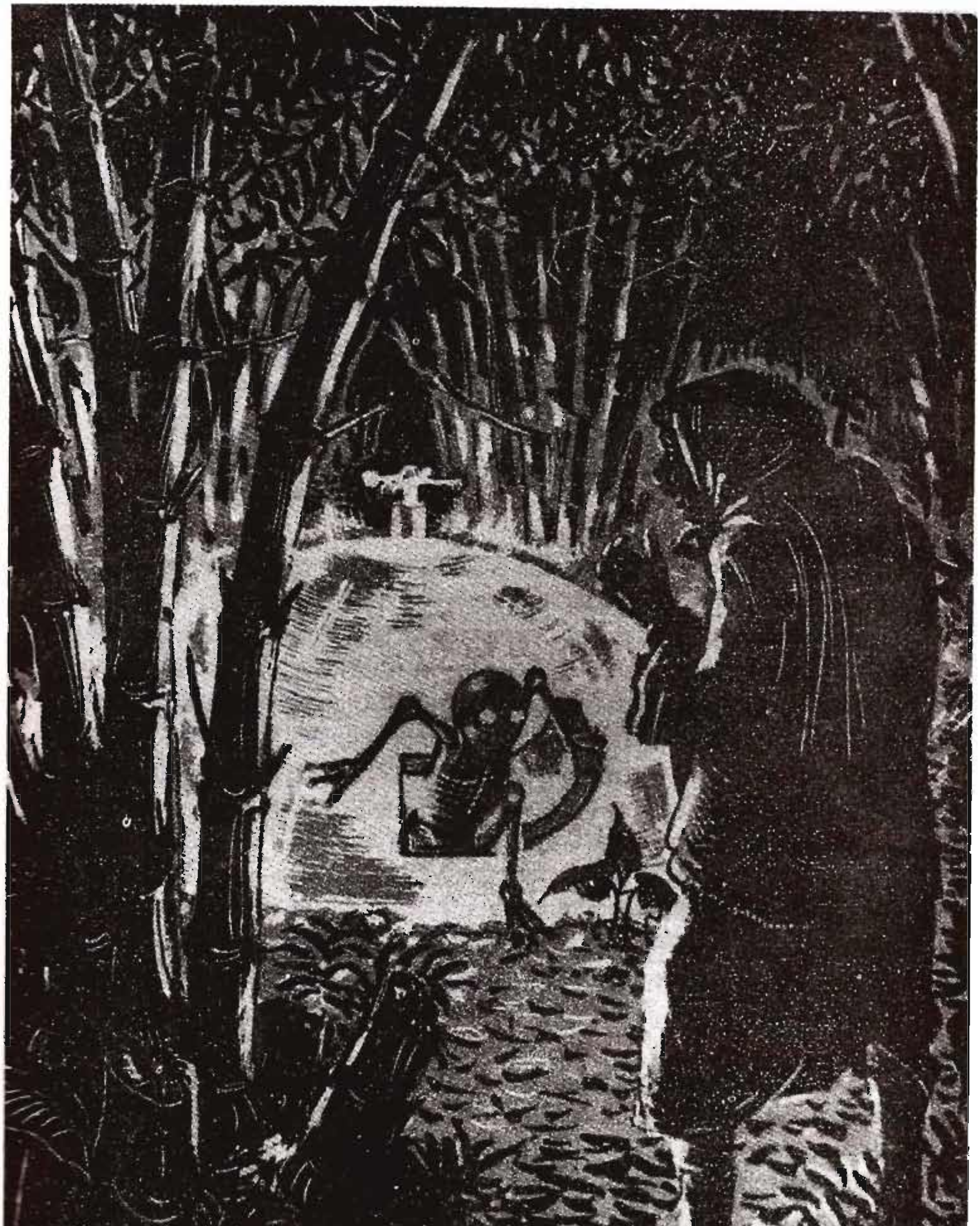

বঙ্কুবাবু ঢোক গিলে বলে উঠলেন, 'আই অ্যাম বঙ্কুবিহারী দত্ত স্যার—বঙ্কুবিহারী দত্ত।'

প্রশ্ন এল, 'আর ইউ ইংলিশ? আর ইউ ইংলিশ?'

বঙ্কুবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'নো স্যার। বেঙ্গলি কায়স্থ স্যার।'

একটুক্ষণ চুপচাপের পর পরিষ্কার উচ্চারণে কথা এল, 'নমস্কার।'

বঙ্কুবাবু হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'নমস্কার।' বলার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করলেন যে, তাঁর হাত-পায়ের অদৃশ্য বাঁধনগুলো যেন আপনা থেকেই আলগা হয়ে গেল। তিনি ইচ্ছা করলেই পালাতে পারেন, কিন্তু পালালেন না। কারণ তিনি দেখলেন, সেই অতিকায় কাচের ঢিবির একটা অংশ আস্তে আস্তে দরজার মতো খুলে যাচ্ছে।

সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল প্রথমে একটা মসৃণ বলের মতো মাথা, তারপর একটা অদ্ভুত প্রাণীর সমস্ত শরীরটা।

লিকলিকে শরীরের মাথা বাদে সমস্তটাই একটা চকচকে গোলাপি পোশাকে ঢাকা।

মুখের মধ্যে কান ও নাকের জায়গায় দুটো করে এবং ঠোঁটের জায়গায় একটা ফুটো। লোম বা চুলের লেশমাত্র নেই। হলদে গোলগাল চোখদুটো এমনই উজ্জ্বল যে, দেখলে মনে হয় আলো জ্বলছে।

লোকটা আস্তে আস্তে বঙ্কুবাবুর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর তিন হাত দূরে থেকে তাঁকে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। বঙ্কুবাবুর হাতদুটো আপনা থেকেই জোড় হয়ে এল।

প্রায় এক মিনিট দেখার পর লোকটা সেইরকম বাঁশির মতো মিহি গলায় বলল, 'তুমি মানুষ?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'হুঁ।'

লোকটা বলল, 'এটা পৃথিবী?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'হুঁ।'

'ঠিক ধরেছি—যন্ত্রপাতিগুলো গোলমাল করছে। যাবার কথা ছিল প্লুটোয়। একটা সন্দেহ ছিল মনে, তাই তোমাকে প্রথমে প্লুটোর ভাষায় প্রশ্ন করলাম। যখন দেখলাম তুমি উত্তর দিলে না তখন বুঝতে পারলাম যে, পৃথিবীতেই এসে পড়েছি। পণ্ডশ্রম হল। ছি-ছি-ছি, এতদূরে এসে। আরেকবার এরকম হয়েছিল। বুধ যেতে বৃহস্পতি গিয়ে পড়েছিলাম। একদিনের তফাত আর কি, হেঃ হেঃ হেঃ।'

বঙ্কুবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তা ছাড়া ওঁর এমনিতেই অসোয়াস্তি লাগছিল। কারণ লোকটা সরু সরু আঙুল দিয়ে ওঁর হাত-পা টিপে টিপে দেখতে আরম্ভ করেছে।

টেপা শেষ করে লোকটা বলল, 'আমি ক্রেনিয়াস গ্রহের অ্যাং। মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী।'

এই লিকলিকে চার ফুট লোকটা মানুষের চেয়ে উচ্চস্তরের প্রাণী? বললেই হল? বঙ্কুবাবুর হাসি পেল।

লোকটা কিন্তু আশ্চর্যভাবে বঙ্কুবাবুর মনের কথা বুঝে ফেলল। সে বলল, 'অবিশ্বাস করার কিছু নেই। প্রমাণ আছে।...তুমি ক'টা ভাষা জানো?'

বঙ্কুবাবু মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'বাংলা, ইংরিজি, আর ইয়ে...হিন্দিটা...মানে...'

'মানে আড়াইটে।'

'হ্যাঁ...'

'আমি জানি চোদ্দো হাজার। তোমাদের সৌরজগতে এমন ভাষা নেই যা আমি জানি না। তা ছাড়া আরও একত্রিশটি বাইরের গ্রহের ভাষা আমার জানা আছে। এর পঁচিশটি গ্রহে আমি নিজে গিয়েছি। তোমার বয়স কত?'

'পঞ্চাশ।'

'আমার আটশো তেত্রিশ। তুমি জানোয়ার খাও?'

বঙ্কুবাবু এই সেদিন কালীপুজোয় পাঁঠার মাংস খেয়েছেন—না বলেন কী করে।

অ্যাং বলল, 'আমরা খাই না। বেশ কয়েকশো বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। আগে খেতাম। হয়তো তোমাকেও খেতাম।'

বঙ্কুবাবু ঢোক গিললেন।

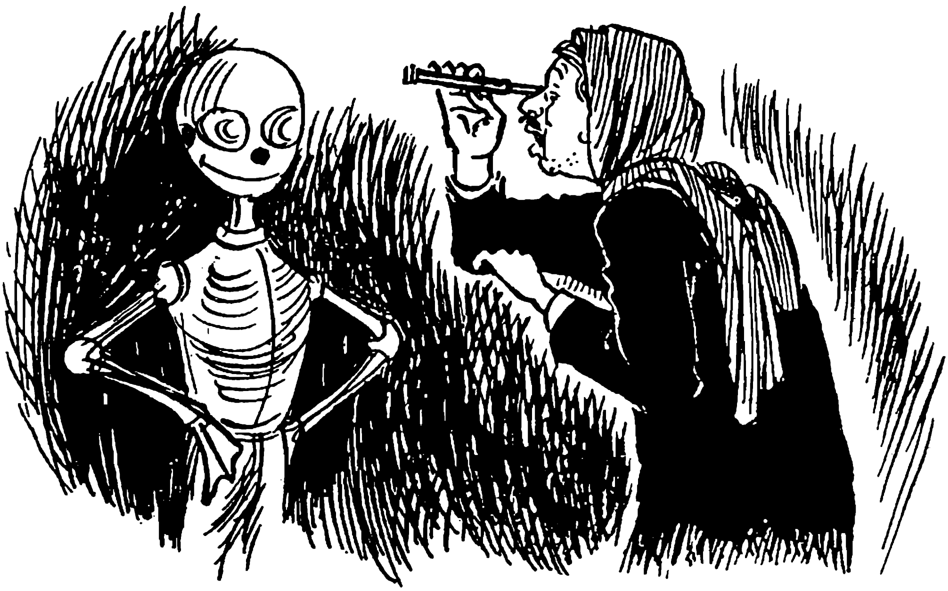

'এই জিনিসটা দেখছ?'

অ্যাং একটা নুড়িপাথরের মতো ছোট জিনিস বঙ্কুবাবুর হাতে দিল। সেটা হাতে ঠেকতেই বঙ্কুবাবুর সর্বাঙ্গে আবার এমন একটা শিহরণ খেলে গেল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ভয়ে পাথরটা ফেরত দিয়ে এলেন।

অ্যাং হেসে বলল, 'এটা আমার হাতে ছিল বলে তুমি তখন এগোতে পারোনি। কেউ পারে না। শত্রুকে জখম না করে অক্ষম করার মতো এমন জিনিস আর নেই।'

বঙ্কুবাবু এবার সত্যিই অবাক হতে শুরু করেছেন।

অ্যাং বলল, 'এমন কোনও জায়গা বা দৃশ্য আছে যা তোমার দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু হয়ে ওঠে না?'

বঙ্কুবাবু ভাবলেন, সারা পৃথিবীটাই তো দেখা বাকি। ভূগোল পড়ান, অথচ বাংলাদেশের গুটিকতক গ্রাম ও শহর ছাড়া আর কী দেখেছেন তিনি? বাংলাদেশেরই বা কী দেখেছেন? হিমালয়ের বরফ দেখেননি, দিঘার সমুদ্র দেখেননি, সুন্দরবনের জঙ্গল দেখেননি, এমনকী শিবপুরের বাগানের সেই বটগাছটা পর্যন্ত দেখেননি।

মুখে বললেন, 'অনেক কিছুই তো দেখিনি। ধরুন গরম দেশের মানুষ, তাই নর্থ পোলটা দেখতে খুব ইচ্ছে করে।'

অ্যাং একটা ছোট কাচ-লাগানো নল বার করে বঙ্কুবাবুর মুখের সামনে ধরে বলল, 'এইটেয় চোখ লাগাও।'

চোখ লাগাতেই বঙ্কুবাবুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এও কী সম্ভব? তাঁর চোখের সামনে ধু-ধু করছে অন্তহীন বরফের মরুভূমি, তার মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে আছে পাহাড়ের মতো এক-একটা বরফের চাঁই। উপরে গাঢ় নীল আকাশে রামধনুর রঙে রঙিন বিচিত্র নকশা সব ক্ষণে ক্ষণে রূপ পালটাচ্ছে— অরোরা বোরিয়ালিস। ওটা কী? ইগলু! ওই পোলার বেয়ারের সারি। ওই পেঙ্গুইনের দল। ওটা কোন বীভৎস জানোয়ার? ভাল করে দেখে বঙ্কু চিনলেন—সিন্ধুঘোটক। একটা নয়, দুটো—প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। মুলোর মতো জোড়া দাঁত একটা আর-একটার গায়ে বসিয়ে দিল। শুভ্র বরফের গায়ে লাল রক্তের স্রোত!...

পৌষ মাসের শীতে বরফের দৃশ্য দেখে বঙ্কুবাবুর ঘাম ঝরতে শুরু করল।

অ্যাং বলল, 'ব্রেজিলে যেতে ইচ্ছে করে না?'

বঙ্কুবাবুর মনে পড়ে গেল—সেই মাংসখেকো পিরান্‌হা মাছ। আশ্চর্য। লোকটা তাঁর মনের কথা টের পায় কী করে?

বঙ্কুবাবু আবার চোখ লাগালেন।

গভীর জঙ্গল। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে গলে আসা ইতস্তত রোদের ছিটেফোঁটা, একপাশে একটা প্রকাণ্ড গাছ, তা থেকে ঝুলছে ওটা কী? সর্বনাশ! এতবড় সাপ বঙ্কুবাবু জীবনে কখনও কল্পনাও করতে পারেননি। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল কোথায় যেন পড়েছেন ব্রেজিলের অ্যানাকোন্ডা। অজগরের বাবা। কিন্তু মাছ কই? ওই যে একটা খাল। দু'পাশে ডাঙায় কুমির রোদ পোয়াচ্ছে। সার সার কুমির—তার একটা নড়ে ওঠে। জলে নামবে। ওই নেমে গেল সড়াত—বঙ্কুবাবু যেন শব্দটাও শুনতে পেলেন। কিন্তু এ কী ব্যাপার? কুমিরটা এমন বিদ্যুদ্বেগে জল ছেড়ে উঠে এল! কেন? কিন্তু এ কি সেই একই কুমির? বঙ্কুবাবু বিস্ফারিত চোখে দেখলেন যে, কুমিরটার তলার অংশটায় মাংস বলে প্রায় কিছুই নেই, খালি হাড়। আর শরীরের বাকি অংশটা গোগ্রাসে গিলে চলেছে পাঁচটি দাঁতালো রাক্ষুসে মাছ। পিরান্‌হা মাছ!

বঙ্কুবাবু আর দেখতে পারলেন না। তাঁর হাত-পা কাঁপছে, মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

অ্যাং বলল, 'এখন বিশ্বাস হয় আমরা শ্রেষ্ঠ?'

বঙ্কুবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, 'তা তো বটেই! নিশ্চয়ই। বিলক্ষণ। একশোবার।'

অ্যাং বলল, 'বেশ। তোমায় দেখে এবং তোমার হাত-পা টিপে মনে হচ্ছে যে তুমি নিকৃষ্ট প্রাণী হলেও, মানুষ হিসেবে খারাপ নও। তবে তোমার দোষ হচ্ছে যে তুমি অতিরিক্ত নিরীহ, তাই তুমি জীবনে উন্নতি করোনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা বা নীরবে অপমান সহ্য করা এসব শুধু মানুষ কেন, কোনও প্রাণীরই শোভা পায় না। যাক, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার কথা ছিল না, হয়ে ভালই লাগল। তবে পৃথিবীতে বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি বরং আসি।'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'আসুন অ্যাংবাবু। আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব—'

বঙ্কুবাবুর কথা আর শেষ হল না, চক্ষের পলকে কখন যে অ্যাং রকেটে উঠে পড়ল এবং কখন যে সেই রকেট পঞ্চা ঘোষের বাঁশবন ছেড়ে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল, তা যেন বঙ্কুবাবু টেরই পেলেন না। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে, আবার ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে। রাত হয়ে গেল অনেক।

বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে বঙ্কুবাবু তাঁর মনে একটা আশ্চর্য ভাব অনুভব করলেন। কতবড় একটা ঘটনা যে তাঁর জীবনে ঘটে গেল, এই কিছুক্ষণ আগেও তিনি সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। কোথাকার কোন সৌরজগতের এক গ্রহ, তার নামও হয়তো কেউ শোনেনি, তারই একজন লোক—লোক তো নয়, অ্যাং—তাঁর সঙ্গে এসে আলাপ করে গেল। কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! সারা পৃথিবীতে আর কারও সঙ্গে নয়, কেবল তাঁর সঙ্গে। তিনি, শ্রীবঙ্কুবিহারী দত্ত, কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল ও বাংলার শিক্ষক। আজ, এই এখন থেকে অন্তত একটা অভিজ্ঞতায়, তিনি সারা পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয়।

পরদিন রবিবার। শ্রীপতিবাবুর বাড়িতে জোর আড্ডা। কালকের আলোর খবর আজ কাগজে বেরিয়েছে, তবে নেহাতই নগণ্যের পর্যায়ে। বাংলাদেশের মাত্র দু-একটা জায়গা থেকে আলোটা দেখতে পাবার খবর এসেছে। তাই সেটাকে ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত পিরিচের মতো গুজবের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আজ পঞ্চা ঘোষ আড্ডায় এসেছেন। তাঁর চল্লিশ বিঘের বাঁশবনের মধ্যে যে ডোবাটা আছে, তার চারপাশের দশটা বাঁশঝাড় নাকি রাতারাতি একেবারে নেড়া হয়ে গেছে। শীতকালে বাঁশের শুকনো পাতা ঝরে বটে, কিন্তু এইভাবে হঠাৎ নেড়া হয়ে যাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক, এই বিষয়েই কথা হচ্ছিল, এমন সময় ভৈরব চক্কোত্তি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আজ বঙ্কুর দেরি কেন?'

তাই তো, এতক্ষণ কারও খেয়াল হয়নি।

নিধু মোক্তার বললেন, 'ব্যাঁকা কি আর সহজে এ-মুখো হবে? কাল মুখ খুলতে গিয়ে যা দাবড়ানি খেয়েছে!'

শ্রীপতিবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তা বললে চলবে কেন? বঙ্কুকে যে চাই। রামাকানাই, তুমি একবার যাও তো দেখি ধরে নিয়ে আসতে পারো কিনা।'

রামকানাই 'চা-টা খেয়েই যাচ্ছি' বলে সবে পেয়ালায় চুমুক দিতে গেছে এমন সময় বঙ্কুবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।

ঢুকলেন বললে অবিশ্যি কিছুই বলা হল না। একটা ছোটখাটো বৈশাখী ঝড় যেন একটি বেঁটেখাটো মানুষের বেশে প্রবেশ করে সবাইকে থমথমিয়ে দিল।

তারপরে ঝড়ের খেলা। প্রথমে পুরো এক মিনিট ধরে বঙ্কুবাবু অট্টহাসি হাসলেন—যে হাসি এর আগে কেউ কোনওদিন শোনেনি, তিনি নিজেও শোনেননি।

তারপর হাসি থামিয়ে একটা প্রচণ্ড গলা-খাঁকরানি দিয়ে গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন, "বন্ধুগণ! আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আজ এই আড্ডায় আমার শেষদিন। আপনাদের দলটি ছাড়ার আগে আমি কয়েকটি কথা আপনাদের বলে যেতে চাই এবং তাই আজ এখানে আসা। এক নম্বর—সেটা সকলের সম্বন্ধেই খাটে—আপনারা সবাই বড্ড বাজে বকেন। যে বিষয়ে জানেন না, সে বিষয়ে বেশি কথা বললে লোকে বোকা বলে। দুই নম্বর—এটা চণ্ডীবাবুকে বলছি—আপনাদের বয়সে পরের ছাতা-জুতো লুকিয়ে রাখা শুধু অন্যায় নয়, ছেলেমানুষি। দয়া করে আমার ছাতাটা ও খয়েরি ক্যাম্বিসের জুতোটা কালকের মধ্যে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। নিধুবাবু, আপনি যদি আমাকে ব্যাঁকা বলে ডাকেন তবে আমি আপনাকে ছ্যাঁদা বলে ডাকব, আপনাকে সেইটেই মেনে নিতে হবে। আর শ্রীপতিবাবু—আপনি গণ্যমান্য লোক, আপনার মোসাহেবের প্রয়োজন হবে বইকী! কিন্তু জেনে রাখুন যে, আজ থেকে আমি আর ও-দলে নেই; যদি বলেন তো আমার পোষা হুলোটাকে পাঠিয়ে দিতে পারি—ভাল পা চাটতে পারে।...ওহো, পঞ্চাবাবুও এসেছেন দেখছি—আপনাকেও খবরটা দিয়ে রাখি—কাল রাত্রে ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে একটি অ্যাং এসে আপনার বাঁশবাগানের ডোবাটির মধ্যে নেমেছিল। আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। লোকটি—থুড়ি, অ্যাংটি—ভারী ভাল।"

এই বলে বঙ্কুবাবু তাঁর বাঁ হাত দিয়ে ভৈরব চক্কোত্তির পিঠে একটা চাপড় মেরে বিষম খাইয়ে সদর্পে শ্রীপতিবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই রামকানাই-এর হাত থেকে চা-ভর্তি পেয়ালাটা পড়ে গিয়ে সব্বাই-এর কাপড়ে-চোপড়ে গরম চা ছিটিয়ে চুরমার হয়ে গেল।

সন্দেশ, মাঘ ১৩৬৮

টেরোড্যাকটিলের ডিম

বদনবাবু আপিসের পর আর কার্জন পার্কে আসেন না।

আগে ছিল ভাল। সুরেন বাঁড়ুজ্যের স্ট্যাচুর পাশটায় ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে বিশ্রাম করে তারপর ট্রামের ভিড়টা একটু কমলে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় শিবঠাকুর লেনে বাড়ি ফিরতেন।

এখন ট্রামের লাইন ভিতরে এসে পড়ায় পার্কে বসার আর সে আনন্দ নেই। অথচ এই ভিড়ে গলদঘর্ম অবস্থায় ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফেরাই বা যায় কী করে?

আর শুধু তাই নয়। দিনের মধ্যে একটা ঘণ্টা অন্তত একটু চুপচাপ বসে থেকে কলকাতার যেটুকু খোলামেলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে সেটুকু উপভোগ করা—এ না হলে বদনবাবুর যেন জীবনই বৃথা। কেরানি হলেও কল্পনাপ্রবণ তিনি। এই কার্জন পার্কেই বসে মনে মনে তিনি কত গল্পই ফেঁদেছেন। কিন্তু

লেখা হয়ে ওঠেনি কোনওদিন। সময় কোথায়? লিখলে হয়তো নামটাম করতে পারতেন এমন বিশ্বাস তাঁর আছে।

অবিশ্যি গল্পগুলো যে সবই মাঠে মারা গেছে তা নয়।

তাঁর পঙ্গু ছেলে বিলটু এখন বড় হয়েছে। সাত বছর বয়স তার। সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ফলে তার অনেকখানি সময় হয় মা'র কাছে না-হয় বাবার কাছে গল্প শুনে কাটে। জানা গল্প, ছাপা গল্প, ভূতের গল্প, হাসির গল্প, দেশবিদেশের রূপকথা, উপকথা, প্রায় সবই তার গত তিন বছরে শোনা হয়ে গেছে। কম করে হাজার গল্প। ইদানীং বদনবাবু তাকে রোজ রাত্রে শোয়ার আগে একটি করে নতুন গল্প বানিয়ে বলেছেন। এ গল্প তাঁর কার্জন পার্কে বসেই বানানো।

কিন্তু গত একমাসে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে অনেকবার। যে-ক'টি গল্প বলেছেন তাও যে তেমন জমেনি তা বিলটুর মুখ দেখেই বোঝা গেছে। তা হবে না-ই বা কেন? একে তো এমনিতেই আপিসে কাজের চাপ, তার উপরে বিশ্রামের জায়গাটির সঙ্গে চিন্তার সুযোগটিও যে লোপ পেয়েছে।

কার্জন পার্ক ছাড়ার পর ক'দিন লালদিঘির ধারটায় গিয়ে বসেছিলেন। ভাল লাগেনি। টেলিফোনের ওই অতিকায় রাক্ষুসে বাড়িটা আকাশের অনেকখানি খেয়ে ফেলে সব মাটি করে দিয়েছে।

তারপরে অবিশ্যি লালদিঘির মাঠেও চলে এসেছে ট্রামের রাস্তা এবং বদনবাবুও বিশ্রামের অন্য জায়গা খুঁজতে বাধ্য হয়েছেন।

আজ তিনি এসেছেন গঙ্গার ধারে।

আউটরাম ঘাটের দক্ষিণে, রেললাইনের ধার দিয়ে পোয়াটাক পথ গিয়ে এই বেঞ্চি। ওই দেখা যাচ্ছে তোপের কেল্লা। লোহার শিকের মাথায় বলটা এখনও রয়েছে। যেন কাঠির ডগায় আলুর দম।

বদনবাবুর ইস্কুলের কথা মনে পড়ে গেল। একটা বাজলেই গুড়ুম করে তোপের শব্দ, আর টিফিনের ছুটি, আর হেডমাস্টার হরিনাথবাবুর ট্যাঁকঘড়ি মেলানো।

জায়গাটা ঠিক নির্জন বলা চলে না। সামনেই নদীতে সার-সার নৌকো বাঁধা আর তার উপরে মাঝিমাল্লাদের কথাবার্তা। দূরে একটা ছাই-রঙের জাপানি জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে। আরও দূরে, খিদিরপুরের দিকটায়, সন্ধ্যায় আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাস্তুল আর কপিকলের ঝাড়।

বাঃ, বেশ জায়গা।

বেঞ্চিটায় বসা যাক।

ওই যে শুকতারা, স্টিমারের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে আবছা আবছা দেখা যায়।

বদনবাবুর মনে হল যেন অনেকদিন তিনি এতখানি আকাশ একসঙ্গে দেখেননি। আহা, কী বিরাট, কী বিশাল! এমন না হলে কল্পনার পাখি ডানা মেলে উড়বে কী করে?

বদনবাবু ক্যাম্বিসের জুতোটা খুলে পা তুলে বাবু হয়ে বসলেন।

আজ তিনি, একটা কেন, অনেকগুলো গল্পের প্লট ফাঁদবেন এখানে বসে। এতদিনের অভাব মিটিয়ে নেবেন।

বিলটুর খুশি-ভরা মুখটা তিনি যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন।

'নমস্কার!'

এই রে! এখানেও ব্যাঘাত?

বদনবাবু ফিরে দেখলেন একটি লিকলিকে রোগা লোক, বছর পঞ্চাশেক বয়স, পরনে খয়েরি কোট-প্যান্ট, কাঁধে চটের থলি। সন্ধ্যার ফিকে আলোয় মুখ ভাল বোঝা যাচ্ছে না, তবে চোখের দৃষ্টি যেন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ।

আর ওটা কী? স্টেথোস্কোপ নাকি?

ভদ্রলোকের বুকের কাছে একটি ঝোলায়মান যন্ত্র থেকে দু'টি রবারের নল বেরিয়ে তাঁর কানের মধ্যে ঢুকেছে।

আগন্তুক মৃদু হেসে বললেন, 'ডিসটার্ব করছি না তো? কিছু মনে করবেন না। আপনাকে এখানে

আগে কখনও দেখিনি, তাই...'

বদনবাবু বেজায় বিরক্ত হলেন। বেশ তো নিরিবিলি ছিলাম রে বাপু! কেন মিছে গায়ে পড়ে আলাপ করা? সব মাটি হয়ে গেল। বেচারি বিলটুকে কী কৈফিয়ত দেবেন তিনি?

মুখে বললেন, 'আগে আসিনি, তাই দেখেননি আর কি। এতবড় শহরে দেখার চেয়ে না-দেখার লোকের সংখ্যাই বেশি নয় কি?'

আগন্তুক বদনবাবুর শ্লেষ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'আমি আসছি আজ চার বছর ধরে, সমানে।'

'ও।'

'ঠিক এইখানে। এই একই জায়গায়। এই বেঞ্চিতে। এটাই আমার এক্সপেরিমেন্টের জায়গা কিনা!'

এক্সপেরিমেন্ট? গঙ্গার ধারে খোলা মাঠে আবার এক্সপেরিমেন্ট কী? লোকটা ছিটগ্রস্ত নাকি? কিংবা যদি অন্য কিছু হয়? গুণ্ডা-টুণ্ডা জাতীয় কিছু? কলকাতা শহর তো, কিছুই বলা যায় না।

সর্বনাশ! বদনবাবু আজ মাইনে পেয়েছেন। ট্যাঁকে রুমালে বাঁধা দু'খানা কড়কড়ে একশো টাকার নোট। তা ছাড়া পকেটে মানিব্যাগে নোট-খুচরো মিলিয়ে পঞ্চান্ন টাকা বত্রিশ নয়া পয়সা।

বদনবাবু উঠে পড়লেন। সাবধানের মার নেই।

'সে কী মশাই? চললেন? রাগ করলেন নাকি?'

'না। না।'

'তবে? এই তো বসলেন। এর মধ্যেই উঠছেন?'

সত্যিই তো! তিনি এমন ছেলেমানুষি করছেন কেন? ভয় কীসের? ত্রিশ গজ দূরে সামনের

নৌকোগুলোতে অন্তত শ'খানেক লোক।

বদনবাবু তাও বললেন, 'যাই, দেরি হল।'

'দেরি? সবে তো সাড়ে-পাঁচটা।'

'অনেকখানি পথ যেতে হবে।'

'কতখানি?'

'সেই বাগবাজারে।'

'আরে রাম রাম। তাও যদি বলতেন শ্রীরামপুর কি চুঁচড়ো—কি নিদেনপক্ষে দক্ষিণেশ্বর।'

'তাও কম কী? ট্রামে করে পাক্কা চল্লিশ মিনিট। তার উপর দশ মিনিটের হাঁটা তো আছেই।'

'তা বটে!'

আগন্তুক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'চল্লিশ প্লাস দশ—পঞ্চাশ।...আমি আবার মিনিট-ঘণ্টার হিসেবটায় ঠিক অভ্যস্ত নই। আমাদের হচ্ছে...বসুন না! একটুক্ষণ বসে যান।'

বদনবাবু বসলেন।

আগন্তুকের গলার স্বর আর চোখের চাহনির মধ্যে কী জানি একটা আছে যার জন্য বদনবাবু তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন, একেই বোধহয় বলে হিপ্‌নটিজম।

আগন্তুক বললেন, 'আমি যাকে-তাকে আমার পাশে বসতে বলি না। আপনাকে দেখে মনে হল আপনি ভাবুক লোক। কেবলমাত্র টাকা-আনা-পাই-এর হিসেব নিয়ে পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন না, যেমন আর নিরানব্বুই পয়েন্ট নাইন রেকারিং পারসেন্ট লোকে থাকে।...কেমন, ঠিক বলিনি?'

বদনবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'আজ্ঞে মানে...'

'আপনি বিনয়ীও বটে! সেও ভাল। বড়াই আমি পছন্দ করি না। বড়াই করতে চাইলে আমার চেয়ে বেশি কেউ করতে পারত না।'

আগন্তুক থামলেন। তারপর কান থেকে নল দুটো খুলে যন্ত্রটা পাশে বেঞ্চির উপর রেখে বললেন, 'ভয় হয়। অন্ধকারে অসাবধানে সুইচে হাত পড়ে গেলেই কেলেঙ্কারি।'

বদনবাবুর ঠোঁটের ডগায় একটা প্রশ্ন এসে আটকে ছিল, এবার বেরিয়ে পড়ল। —

'আপনার ও যন্ত্রটা কি স্টেথোস্কোপ, না অন্য কিছু?'

ভদ্রলোক প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে গেলেন। ভারী অভদ্র তো! উত্তরের বদলে একটা অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি লেখেন?'

'লিখি মানে—গল্প?'

'গল্প হোক, প্রবন্ধ হোক, যা-ই হোক। ব্যাপারটা হচ্ছে, ও জিনিসটা আমার ঠিক আসে না। অথচ এতসব কীর্তি, এত অভিজ্ঞতা, এত গবেষণা—এগুলো সব ভবিষ্যতের জন্য লিখে যেতে পারলে ভাল হত।'

অভিজ্ঞতা? গবেষণা? লোকটা বলে কী?

'পর্যটক ক'রকম দেখেছেন?'

লোকটার প্রশ্নগুলোর সত্যিই কোনও মাথামুণ্ড নেই। পর্যটক একটা দেখবারই বা সৌভাগ্য কতজনের হয়?

বদনবাবু বললেন, 'পর্যটক যে একরকমের বেশি হয় তাই তো জানতাম না।'

'সে কী! তিনরকম যে-কেউ বলতে পারে। জলচর, স্থলচর আর ব্যোমচর। প্রথম দলে ভাস্কো-ডা-গামা, ক্যাপ্টেন স্কট, কলম্বাস ইত্যাদি। স্থলে হিউয়েন সাং, মাঙ্গো পার্ক, লিভিংস্টোন, মায় আমাদের গ্লোব ট্রটার উমেশ ভট্‌চায পর্যন্ত। আর আকাশে—ধরুন, প্রফেসর পিকার্ড, যিনি বেলুনে পঞ্চাশ হাজার ফুট উঠেছিলেন, আর এই সেদিনের ছোকরা গাগারিন। অবিশ্যি এগুলো সবই খুব মামুলি। আমি যে ধরনের পর্যটকের কথা বলছি সেটা জলেও নয়, মাটিতেও নয়, আকাশেও নয়।'

'তবে?'

'কালে!

'মানে?'

'কালের মধ্যে ঘোরাফেরা। অতীত কালে পাড়ি, আগামী কালে সফর। ইচ্ছেমতো ভূত ভবিষ্যতে বিচরণ। বর্তমানে তো আছিই, তাই ওটা নিয়ে আর মাথা ঘামাই না।'

এতক্ষণে বদনবাবুর কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। বললেন, 'এইচ. জি. ওয়েল্স-এর কথা বলছেন তো? টাইম মেশিন? সেই যে একটা সাইকেলের মতো জিনিসে চেপে একটা হ্যান্ডেল টানলেই অতীত যুগে, আর আরেকটা টানলেই ভবিষ্যতে চলে যায়? সেই যে-গল্পটা নিয়ে একটা বিলিতি বায়োস্কোপ হয়েছিল?'

ভদ্রলোক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'সে তো গল্প। আমি বলছি সত্যি ঘটনা। আমার ঘটনা। আমার অভিজ্ঞতা। আমার মেশিন। কোনও সাহেব-লিখিয়ের মনগড়া গাঁজাখুরি গল্প নয়।'

কোথায় যেন একটা স্টিমারের ভোঁ বেজে উঠল।

বদনবাবু ঈষৎ চমকে হাত দুটোকে চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে জড়সড় হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ বাদে নৌকোর বাতিগুলো ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যাবে না।

ঘনায়মান অন্ধকারে আরেকবার আগন্তুকের মুখের দিকে চাইলেন বদনবাবু। সন্ধ্যার আকাশের শেষ রঙটুকু তাঁর চোখের মণিতে।

আগন্তুক আকাশের দিকে মুখটা তুলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'হাসি পায়। তিনশো বছর আগে, এইখানে, ঠিক এই বেঞ্চিটার জায়গায়, একটা কুমির ও তার মাথার উপর একটি বক বসে রোদ পোহাচ্ছিল। ওই খড়ের নৌকোটার জায়গায় একটা পাল-তোলা ওলন্দাজ জাহাজের ডেক থেকে এক নাবিক একটি গাদা বন্দুক দিয়ে কুমিরটাকে মারে। এক গুলিতেই কুমির শেষ। বকটি ঝটপটিয়ে উড়ে পালাবার সময় তার একটি পালক খসে আমার পায়ের সামনে পড়ে। এই সেই পালক।'

আগন্তুক থলির ভিতর থেকে একটা ধবধবে সাদা পালক বার করে বদনবাবুর হাতে দিলেন।

'লাল ছিটেফোঁটাগুলো কী?'

বদনবাবুর গলা ধরে এসেছে।

আগন্তুক বললেন, 'কুমিরের রক্ত খানিকটা ছিটকে বকটার গায়ে পড়েছিল।'

বদনবাবু পালকটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

আগন্তুকের চোখের আলো মিলিয়ে আসছে। গঙ্গার স্রোতে কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছিল। এখন আর প্রায় দেখা যায় না। জল মাটি আকাশ সব ঘোলাটে একাকার হয়ে আসছে।

'এটা বুঝতে পারছেন কী জিনিস?'

বদনবাবু হাতে নিয়ে দেখলেন—একটা লোহার ছোট্ট তিনকোনা ফলক, মাথাটা ছুঁচলো।

আগন্তুক বললেন, 'দু' হাজার বছর আগে, নদীর মাঝামাঝি—ওই বয়াটার কাছ দিয়ে—একটা মকরমুখো জাহাজ বাহারের ফুলকাটা পাল তুলে সমুদ্রের দিকে চলেছে। সওদাগরি জাহাজ বোধহয়। বলিদ্বীপ-টলিদ্বীপ কোথাও বাণিজ্য করতে চলেছে। পশ্চিমের বাতাসে বত্রিশ দাঁড়ের ছপছপানি শুনতে পাচ্ছি এইখান থেকে।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ। আমি না তো কে? এইখানে—ঠিক এই বেঞ্চিটার জায়গায়—একটা বটগাছের পাশে লুকিয়ে আছি।'

'লুকিয়ে কেন?'

'বাধ্য হয়ে। এত বিপদসঙ্কুল জায়গা, তা তো জানা ছিল না। ইতিহাসের পাতায় তো আর এসব লেখেনি।'

'বাঘ-টাঘের কথা বলছেন?'

'বাঘের বাড়া। মানুষ। আমার এই কোমর অবধি উঁচু নাকথ্যাবড়া মিশকালো বন্য মানুষ। কানে কড়ি, নাকে আংটা, গায়ে উলকি। হাতে তীরধনুক। তীরের ডগায় বিষাক্ত ফলা।'

'বলেন কী?'

'ঠিকই বলছি। একবর্ণ মিথ্যে নেই।'

'আপনি দেখলেন?'

'শুনুন না! বোশেখ মাস। ঝড় উঠল। আদিম ঝড়। এমন ঝড় আর ওঠে না। সেই মকরমুখো জাহাজ চোখের সামনে জলের তলায় তলিয়ে গেল।'

'তারপর?'

'তার থেকে একটি লোক ভাঙা তক্তায় চেপে হাঙর কুমিরের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কপালজোরে ডাঙায় এসে—ওরে বাব্বা!...'

'কী?'

'সেই বন্য মানুষ তার কী দশা করল সে আপনি নিজের চোখে না দেখলে...অবিশ্যি আমিও শেষ পর্যন্ত দেখতে পারিনি। একটা তীর বটের গুঁড়িটায় এসে বিঁধেছিল। সেইটেকে নিয়ে সুইচ টিপে বর্তমানে ফিরে আসি।'

বদনবাবু হাসবেন, না কাঁদবেন, না অবাক হবেন, তা বুঝতে পারলেন না। ওই সামান্য যন্ত্র আর ওই দুটো নলের মধ্যে এত জাদু আছে নাকি? এও কি সম্ভব?

আগন্তুক বদনবাবুর মনের প্রশ্নটা হয়তো আন্দাজ করেই বললেন, 'এই যে দেখছেন যন্ত্রটি—কানের ভিতর নল দুটো ঢুকিয়ে এই ডান দিকের সুইচ টিপলেই ভবিষ্যতে, আর বাঁ দিকের টিপলেই অতীতে চলে যাওয়া যায়। কোন যুগের কোন সময়টিতে যেতে চান সেটাও এই দাগ-কাটা সন-লেখা চাকার উপর কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নেওয়া যায়। অবিশ্যি বিশ-ত্রিশ বছর এদিক-ওদিক হয়ে যায় মাঝে মাঝে—কিন্তু তাতে বিশেষ এসে যায় না। সস্তার জিনিস তো—তাই অত অ্যাকিউরেট নয় আর কি!'

'সস্তা বুঝি?' এবার বদনবাবু সত্যিই অবাক!

'সস্তা মানে অবিশ্যি কেবল পয়সার দিক দিয়েই। এর পিছনে রয়েছে পাঁচ হাজার বছরের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, বিদ্যে, বুদ্ধি। আজকাল লোকে ভাবে বিজ্ঞানের যত কারসাজি সবই বুঝি পশ্চিমে, এদেশে আর কী হচ্ছে? আরে বাপু, এদেশে যা হচ্ছে তা কি আর ঢাক পিটিয়ে হচ্ছে? তা হচ্ছে সব গোপনে, অগোচরে, লোকচক্ষুর আড়ালে। নাম জাহির করার ব্যাপারটা আমাদের দেশে কোনওকালেই ছিল না। এখনও নেই। আসল যারা গুণী তাদের হয়তো দেখাই পাবেন না কোনওদিন। দেখুন-না ইতিহাসের দিকে। অজন্তা গুহার ছবি কে বা কারা এঁকেছেন তাঁদের নাম জানেন? হাজার বছরের পুরনো পাহাড়ের গা থেকে খোদা এলোরার মন্দির কে গড়ল তার নাম জানে কেউ? ভৈরবী রাগ কার সৃষ্টি? ঋগ্বেদ লিখল কে? মহাভারত বেদব্যাসের নামে চলেছে—আর আমরা বলি বাল্মীকির রামায়ণ। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে কত শতসহস্র নাম-না-জানা লোকের হাত আছে, মাথা আছে তার হিসেব রাখে কেউ? এই যে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা বড় বড় অঙ্ক কষে ফরমুলা কষে সব বড় বড় আবিষ্কার করে নাম কিনছেন—এই অঙ্কের গোড়ার কথাটা জানেন?'

গোড়ার কথা? কী গোড়ার কথা? বদনবাবু তা জানেন না।

আগন্তুক বললেন, 'শূন্য।'

'শূন্য?'

'শূন্য। Zero।'

বদনবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

'ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন—জিরো। এই দশটার বেশি আর সংখ্যা নেই। শূন্য—অর্থাৎ ফক্কা। অথচ একের পিঠে শূন্য দিলে হল গিয়ে দশ, নয়ের এক বেশি। ম্যাজিক! ভাবলে কূলকিনারা পাবেন না। অথচ আমরা মেনে নিচ্ছি। কেন মানছি তাও বুঝতে পারবেন না। কিন্তু এই ন'টি সংখ্যা আর শূন্য এই দিয়ে রাজ্যির যত অঙ্ক, যত হিসেব, যত ফরমুলা। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ত্রৈরাশিক ভগ্নাংশ ডেসিম্যাল আলজেব্রা এরিথমেটিক ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যাস্ট্রনমি, মায় অ্যাটম রকেট রিলেটিভিটি—এর একটিও এই দশটি সংখ্যা ছাড়া হবার জো নেই। আর এই সংখ্যা এল কোত্থেকে জানেন? ভারতবর্ষ। এখান থেকে আরবদেশ, আরব থেকে ইউরোপ এবং তারপর সারা পৃথিবী। বুঝেছেন? এর আগে কী ছিল জানেন?'

বদনবাবু আবার ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। সত্যি, তাঁর জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ!

আগন্তুক বললেন, 'আগে ছিল রোম্যান কায়দা। সংখ্যা নেই। কেবল অক্ষর। এক হল I, দুই হল II, তিন হল III, কিন্তু চার হয়ে গেলে আবার দু' অক্ষর—IV। আর পাঁচ হল এক অক্ষর—V। নিয়মের কোনও মাথামুণ্ড নেই। বাংলায় উনিশশো বাষট্টি লিখতে চার অক্ষর লাগে। আর রোম্যানে কত জানেন?'

'কত?'

'সাত। MCMDCII; বুঝলেন কিছু? আটশো আটাশি লিখতে বাংলার তিন অক্ষরের জায়গায় রোম্যানে কত লাগে জানেন! এক ডজন।

DCCCLXXXVIII। এই হারে বিজ্ঞানের বড় বড় ফরমুলা লিখতে বৈজ্ঞানিকদের কী অবস্থা হত ভাবতে পারেন? ত্রিশ পেরোতে না পেরোতে দেখতেন, হয় সব চুল পেকে গেছে, না হয় টাক পড়ে গেছে। আর চাঁদে রকেট পাঠানোর ব্যাপারটা তো নির্ঘাত আরও হাজার বছর পিছিয়ে যেত। ভেবে দেখুন, আমাদেরই দেশের একটি অখ্যাত অজ্ঞাত লোকের আশ্চর্য বুদ্ধির জোরে অঙ্কের ভোল পালটে গেল।'

আগন্তুক দম নেবার জন্য থামলেন।

গির্জার ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ ভেসে আসছে। ছ'টা বাজল।

আলো হঠাৎ বাড়ল কেন?

বদনবাবু পুবদিকে চেয়ে দেখলেন গ্র্যান্ড হোটেলের ছাতের পিছন দিয়ে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে।

আগন্তুক বললেন, 'আগে যেমন, এখনও তাই। দেশে ঢের লোক আছে যাদের নামধাম কেউ জানেও না, জানবেও না; কিন্তু তাদের বিদ্যেবুদ্ধি পশ্চিমের কোনও বৈজ্ঞানিকের চেয়ে একচুল কম নয়। এঁদের সাধারণত কাগজ পেনসিল বইপত্তর ল্যাবরেটরি-ট্যাবরেটরির কোনও দরকার হয় না। এঁরা নিরিবিলি চুপচাপ বসে ভাবেন, আর মাথার মধ্যে ভারী ভারী ফরমুলা কষে ভারী ভারী সমস্যার সমাধান করেন।'

আগন্তুক থামতে বদনবাবু মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনি কি তাঁদেরই মধ্যে একজন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না। তবে এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ বরাতজোরে একবার আমি পেয়েছিলাম। এখানে নয় অবিশ্যি। এ তল্লাটে নয়। জোয়ান বয়সে পায়ে হেঁটে অনেক ঘুরেছি পাহাড়ে-টাহাড়ে। তাদেরই একটাতে। অসাধারণ পুরুষ। নাম গণিতানন্দ। ইনি অবিশ্যি লিখেই অঙ্ক কষতেন। ইনি যেখানে থাকতেন তার আশেপাশে ত্রিশ মাইলের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে যতগুলি পাথরের চাঁই ছিল তার প্রত্যেকটির পা থেকে মাথা অবধি অঙ্কের হিজিবিজিতে ভরা। খড়ি দিয়ে লেখা। তাঁর যিনি গুরু, তাঁর কাছ থেকেই গণিতানন্দ অতীত-ভবিষ্যতে বিচরণের রহস্য জানতে পেরেছিলেন। আমি গণিতানন্দের কাছ থেকেই জেনেছিলুম যে, এভারেস্টের চেয়েও পাঁচ হাজার ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের চুড়ো ছিল হিমালয়ে। আজ থেকে সাতচল্লিশ হাজার বছর আগে একটা প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে এই পাহাড়ের অর্ধেকটা নাকি মাটির ভিতরে ঢুকে যায়। এবং এই একই ভূমিকম্পে নাকি উত্তর-হিমালয়ের একটি পাহাড়ে ফাটল ধরে তার থেকে একটি ঝরনা বেরিয়ে এই যে নদীটি বয়ে যাচ্ছে আমাদের সামনে দিয়ে, সেটির সৃষ্টি করে।'

আশ্চর্য, আশ্চর্য!

বদনবাবু চাদরের খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'আপনার ওই যন্ত্রটি কি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া?'

আগন্তুক বললেন, 'হ্যাঁ। মানে, ঠিক পাওয়া নয়। উনি উপাদান বলে দিয়েছিলেন। আমি সেইসব মালমশলা সংগ্রহ করে যন্ত্রটি নিজেই তৈরি করে নিয়েছি। এই যে নলটা দেখছেন, এটা কিন্তু রবার নয়। এটা একরকম পাহাড়ি গাছের ডাল। এই যন্ত্রের একটি জিনিসের জন্যও আমাকে কোনও দোকানে বা কারিগরের কাছে যেতে হয়নি। এর সমস্তই প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি। ডায়ালটায় দাগ কেটে নম্বর বসিয়েছি আমি নিজে হাতে। তবে, নিজের হাতের তৈরি বলেই হয়তো মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। ভবিষ্যতের সুইচটা তো ক'দিন হল কাজই করছে না।'

'আপনি ভবিষ্যতে গেছেন?'

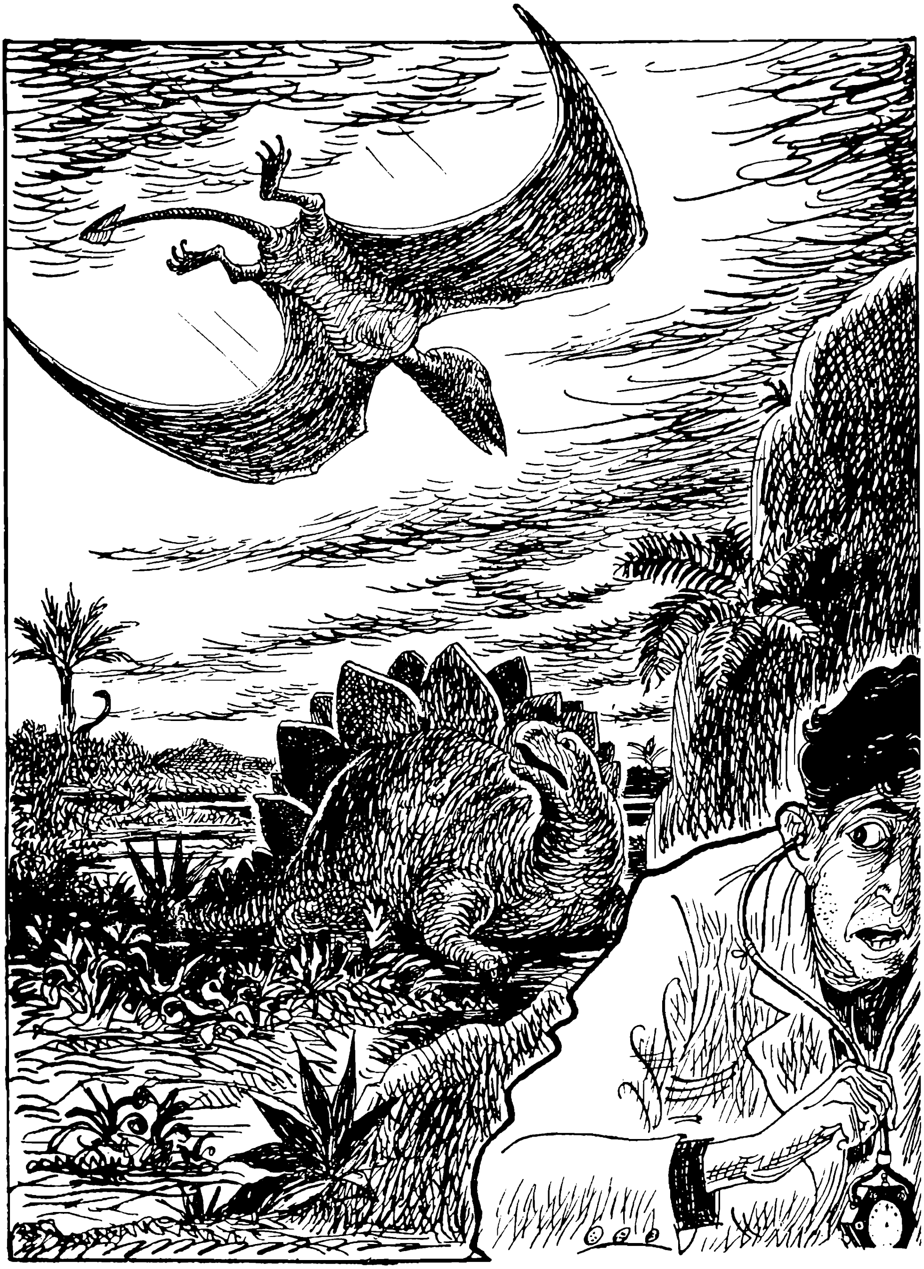

'একবারই। তবে বেশি দূরে না। ত্রিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি।'

'কেমন দেখলেন?'

'দেখব কী? এইখানে তখন বিরাট রাস্তা আর আমি একমাত্র মানুষ পায়ে হাঁটছি। এক উদ্ভট গাড়ির তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেসলাম। তারপর আর যাইনি।'

'আর অতীতে কতদূর গেছেন?'

'ওই আরেকটা গোলমাল। আমার এই যন্ত্রে সৃষ্টির গোড়ায় পৌঁছনো যায় না।'

'বটে?'

'না। আমি অনেক চেষ্টা করেও সবচেয়ে পিছনে যা গেছি তখন অলরেডি সরীসৃপেরা এসে গেছে।'

বদনবাবুর গলা শুকিয়ে এল। বললেন, 'কী সরীসৃপ? সাপ...?'

'আরে না না। সাপ তো ছেলেমানুষ।'

'তবে?'

'এই ধরুন, ব্রন্টোসরাস, টিরানোসরাস, ডাইনোসরাস, এইসব আর কি!'

'তার মানে আপনি কি ওদেশেও গেছেন নাকি?'

'ওই তো ভুল! ওদেশে কেন? আপনার কি ধারণা এসব জিনিস আমাদের দেশে ছিল না?'

'ছিল নাকি?'

'ছিল মানে? এই ঠিক এইখানটাতেই ছিল। এই বেঞ্চির পাশটাতেই।'

বদনবাবুর মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল।

আগন্তুক বললেন, 'গঙ্গা নামেনি তখনও। এইসব জায়গায় তখন ছিল এবড়ো-খেবড়ো পাথরের টিপি, আর লতাপাতা গাছপালার জঙ্গল। সে দৃশ্য ভুলব না। ওই জেটির জায়গাটায় একটা শেওলাভরা ডোবা। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। একটা আলেয়া ধক করে জ্বলে উঠে মিনিটখানেক দুলে দুলে নিভে গেল। তারই আলোয় দেখলাম দুটো ভাঁটার মতো চোখ। চাইনিজ ড্রাগনের ছবি দেখেছেন তো? এও ঠিক তাই। বইয়ে ছবি দেখা ছিল। বুঝলাম এই সেই স্টেগোসরাস। কীসের জানি পাতা চিবুতে চিবুতে জলার উপর দিয়ে ছপছপ করে এগিয়ে আসছে। মানুষ খাবে না জানি, কারণ এরা উদ্ভিদজীবী, কিন্তু তাও দেখি ভয়ে ঢোক গিলতে পারছি না। বর্তমানে ফিরে আসার সুইচটা টিপতে যাব, এমন সময় আমার মাথার উপর হঠাৎ একটা ঝটাপট শব্দ শুনে চমকে চেয়ে দেখি একটা টেরোড্যাকটিল—সে না পাখি, না জানোয়ার, না বাদুড়—জন্তুটার দিকে গোঁত খেয়ে ধাওয়া করে গেল। এ আক্রোশের কারণ বুঝলাম হঠাৎ আমার পাশেই পাথরের ঢিবিটার দিকে চোখ পড়াতে। পাথরের গায়ে একটা বেশ বড় ফাটলে দেখি একটা সাদা গোল চকচকে ডিম। টেরোড্যাকটিলের ডিম। দেখে ভয়ের মধ্যেও লোভ সামলাতে পারলুম না। ওদিকে লড়াই বেধেছে, আর এদিকে আমি দিব্যি ডিমটি বগলস্থ করে নিয়ে...হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।'

বদনবাবুর কিন্তু হাসি পেল না। গল্পের জগতের বাইরে হয় নাকি এসব?

'যন্ত্রটা আপনাকে পরীক্ষা করতে দিতাম, কিন্তু—'

বদনবাবুর কপালের শিরা দপদপ করে উঠল। ঢোক গিলে বললেন, 'কিন্তু কী?'

'ফল পাবার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'কে-কেন?'

'তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। লাভ না-হলেও ক্ষতির সম্ভাবনা তো নেই।'

বদনবাবু গলা বাড়িয়ে দিলেন। জয় মা জগত্তারিণী! নিরাশ কোরো না মা!

আগন্তুক নলের মুখ দুটি বদনবাবুর দু' কানে গুঁজে দিয়ে সুইচটা টিপে খপ করে তাঁর ডান হাতের কবজিটা ধরে ফেললেন।

'নাড়িটা দেখতে হবে।'

বদনবাবু বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে মিহি গলায় বললেন, 'অতীত, না ভবিষ্যৎ?'

আগন্তুক বললেন, 'অতীত। সিক্স থাউসেন্ড বি. সি.। চোখটা চেপে বন্ধ করুন।'

বদনবাবু অধীর উৎকণ্ঠায় মিনিটখানেক চোখ বুজে বসে থেকে বললেন, 'কই, কিছু হচ্ছে না তো।'

আগন্তুক যন্ত্রটা খুলে নিলেন।

'হবার সম্ভাবনা ছিল কোটিতে এক।'

'কেন?'

'আমার মাথার আর আপনার মাথার চুলের সংখ্যা যদি এক হত তা হলেই আপনার ক্ষেত্রে যন্ত্রটা কাজ করত।'

বদনবাবু ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেলেন। হায় হায় হায়! এমন সুযোগটা এভাবে নষ্ট হল?

আগন্তুক আবার থলির ভিতর হাত ঢোকালেন।
চাঁদের আলোয় এখন চারিদিক বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।
'একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি?' বদনবাবু কথাটা জিজ্ঞেস করার লোভ সামলাতে পারলেন না।
আগন্তুক সাদা গোল চকচকে জিনিসটা এগিয়ে দিলেন।
বেশ ভারী। আর আশ্চর্য মসৃণ।
'দিন। এবার উঠতে হয়। রাত হল।'
বদনবাবু ডিমটা ফিরিয়ে দিলেন। আরও কত অভিজ্ঞতা আছে এঁর কে জানে! বললেন, 'কাল আবার আসছেন তো এইখানে?'
'দেখি। কাজ তো পড়ে আছে অনেক। বইয়ে লেখা ঐতিহাসিক তথ্যগুলো তো এখনও কিছুই যাচাই করা হয়নি। কলকাতার গোড়াপত্তনের ব্যাপারটাও দেখতে হবে একবার। চার্নক বাবাজিকে নিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করেছে এরা।...আজ আসি। জয় গুরু!'

ট্রামে উঠে বদনবাবুকে একটা বাজে অজুহাতে আবার নেমে যেতে হল। কারণ পকেটে হাত দিয়েই তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন।
মানিব্যাগটা উধাও।
বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুঝেছি। যখন চোখ বন্ধ করেছিলাম, আর লোকটা হাত ধরল নাড়ি দেখতে...ইস, ছি ছি ছি! কী বেকুবই না বনেছি আজ!'

বাড়ি যখন পৌঁছলেন তখন আটটা।
বাবাকে দেখে বিলটুর মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।
এতক্ষণে কিন্তু বদনবাবুও অনেকটা হালকা বোধ করছেন।
জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, 'আজ তোকে একটা ভাল গল্প বলব।'
'সত্যিই তো? অন্যদিনের মতো নয় তো?'
'না রে! সত্যিই।'
'কীসের গল্প বাবা?'

'টেরোড্যাকটিলের ডিম। আর তা ছাড়া আরও অনেক। একদিনে ফুরোবে না।'

সত্যি বলতে কী, বিলটুর খুশির খোরাক আজ একদিনে যত পেয়েছেন তিনি, তার দাম কি অন্তত পঞ্চান্ন টাকা বত্রিশ নয়া পয়সাও হবে না?

সন্দেশ, ফাল্গুন ১৩৬৮

সেপ্টোপাসের খিদে

কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে আপনা থেকেই মুখ থেকে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল।

বিকেল থেকে এই নিয়ে চারবার হল; মানুষে কাজ করে কী করে? কার্তিকটাও সেই যে বাজারে গেছে আর ফেরার নামটি নেই।

লেখাটা বন্ধ করে নিজেকেই উঠে যেতে হল।

দরজা খুলে আমি তো অবাক! আরে, এ যে কান্তিবাবু!

বললাম, 'কী আশ্চর্য! আসুন, আসুন...'

'চিনতে পেরেছ?'

'প্রায় চেনা যায় না বললেই চলে!'

ভদ্রলোককে ভিতরের ঘরে এনে বসালাম। সত্যি, দশ বছরে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন হয়েছে কান্তিবাবুর চেহারায়। এঁকেই নাইনটিন ফিফ্‌টিতে আসামের জঙ্গলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখেছি। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তখনই। কিন্তু একটি চুলও পাকেনি। আর ওই বয়সে উৎসাহ ও এনার্জির যা নমুনা দেখেছিলাম, তা সচরাচর আমাদের তরুণদের মধ্যেও দেখা যায় না।

'তোমার অর্কিডের শখ এখনও আছে দেখছি।'

আমার ঘরের জানলায় একটা টবের মধ্যে কান্তিবাবুরই দেওয়া একটা অর্কিড ছিল। শখ এখনও আছে বললে অবিশ্যি ভুল বলা হবে। কান্তিবাবুই গাছপালা সম্পর্কে একটা কৌতূহল আমার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তারপর উনি দেশছাড়া হবার পর থেকে ক্রমে সে শখটা আপনা থেকেই উবে গেছে—যেমন অন্য শখগুলোও গেছে। এখন লেখা নিয়েই থাকি। ইদানীং দিনকাল বদলেছে। বই লিখেও আজকাল রোজগার হয়। তিনটি বইয়ের বিক্রির টাকাতেই তো প্রায় সংসার চলে যাচ্ছে আমার! অবিশ্যি সংসার বলতে আমি, আমার বিধবা মা, আর চাকর কার্তিক। চাকরি একটা আছে বটে, তবে আশা আছে বই থেকে তেমন-তেমন রোজগার হলে চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে কেবল লিখব, আর লেখার অবসরে দেশভ্রমণ করব।

কান্তিবাবু বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ শিউরে উঠলেন।

বললাম, 'ঠাণ্ডা লাগছে? জানলাটা বন্ধ করে দেব? এবার কলকাতায় শীতটা...'

'না, না। ওরকম আজকাল মাঝে মাঝে হয়। বয়স হয়েছে তো? তাই নার্ভগুলো ঠিক...'

অনেক প্রশ্ন মাথায় আসছিল। কার্তিক ফিরেছে। ওকে চা আনতে বললাম।

কান্তি বললেন, 'বেশিক্ষণ বসব না। তোমার উপন্যাস হাতে এসেছিল একখানা। তোমার প্রকাশকের কাছ থেকেই ঠিকানা সংগ্রহ করে এখানে এলুম। এসেছি একটা বিশেষ দরকারে।'

'বলুন না! তবে তার আগে—মানে, কবে দেশে ফিরলেন, কোথায় ছিলেন, কোথায় আছেন, এসবগুলো জানতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'ফিরেছি দু' বছর। ছিলুম আমেরিকায়। আছি বারাসাতে।'

'বারাসাত?'

'একটি বাড়ি কিনেছি।'

'বাগান আছে?'
'আছে।'
'আর গ্রিন-হাউস?'
কান্তিবাবুর আগের বাড়ির বাগানে একটি চমৎকার গ্রিন-হাউস বা কাচের ঘর ছিল, যাতে তিনি তাঁর দুষ্প্রাপ্য গাছপালাগুলিকে তোয়াজে রাখতেন। কতরকম অদ্ভুত গাছ যে দেখেছি সেখানে তার ঠিক নেই! এই অর্কিডই তো প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি রকমের। তার ফুলের বৈচিত্র্য উপভোগ করেই একটা পুরো দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যেত।
কান্তিবাবু একটু ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ। একটা গ্রিন-হাউসও আছে।'
'আপনার গাছপালার শখ তা হলে এই দশ বছরে কিছু কমেনি?'
'না।'
কান্তিবাবু আমার ঘরের উত্তরের দেয়ালের দিকে চেয়ে রয়েছেন দেখে আমারও চোখ সেইদিকে গেল। মাথাসমেত একটি রয়াল বেঙ্গলের ছাল সেখানে ঝোলানো রয়েছে। বললাম, 'চিনতে পারছেন?'
'এটা সেই বাঘটাই তো?'
'হ্যাঁ। ওই দেখুন কানের পাশটায় বুলেটের ফুটোটাও রয়েছে।'
'আশ্চর্য টিপ ছিল তোমার। এখনও চালাতে পারো ওরকম অব্যর্থ গুলি?'
'জানি না। অনেকদিন পরীক্ষা করিনি। শিকার ছেড়েছি প্রায় পাঁচ-সাত বছর।'
'কেন?'
'অনেক তো মারলাম। বয়স হয়েছে, তাই আর প্রাণিহত্যা...'
'মাছ-মাংস ছেড়েছ নাকি? নিরামিষ খাচ্ছ?'
'না।'
'তবে? এ তো শুধু হত্যা। বাঘ মারলে, কি কুমির মারলে, কি মোষ মারলে—ছাল ছাড়িয়ে মাথা স্টাফ করে, কি শিং মাউন্ট করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলে। ঘরের শোভা বাড়ল, এসে কেউ আঁতকে উঠল, কেউ বাহবা দিল, তোমারও জোয়ান বয়সের অ্যাডভেঞ্চারের কথা মনে পড়ে গেল। আর মুরগি ছাগল ইলিশ মাগুর যে নিজে চিবিয়ে খেয়ে ফেলছ হে! শুধু প্রাণিহত্যা নয়, প্রাণী হজম—অ্যাঁ?'
কী আর বলি! অস্বীকার করতে পারলাম না।
কার্তিক চা দিয়ে গেল।
কান্তিবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে হঠাৎ আবার শিউরে উঠে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলেন।
চুমুক দিয়ে বললেন, 'জীবে জীবে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক সে তো সৃষ্টির গোড়ার কথা হে! ওই যে টিকটিকিটা ওত পেতে রয়েছে, দেখেছ?'
দেখলাম কিং কোম্পানির ক্যালেন্ডারটার ঠিক উপরেই একটা টিকটিকি তার থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে একটা উচ্চিংড়ের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। তারপর দেখতে দেখতে গুটিগুটি করে অতীব সন্তর্পণে পোকাটার দিকে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ তীরের মতো এক ছোবলে সেটাকে মুখে পুরে নিল।
কান্তিবাবু বললেন, 'ব্যস। চলল ডিনার। খালি খাওয়া আর খাওয়া। খাওয়াটাই সব। বাঘে মানুষ খাচ্ছে, মানুষ ছাগল খাচ্ছে, আর ছাগল কী না খাচ্ছে! ভাবতে গেলে কী বন্য, কী আদিম, কী হিংস্র মনে হয় বলো তো! অথচ এই হল নিয়ম। এ ছাড়া গতি নেই। এ না হলে সৃষ্টি অচল হয়ে যাবে।'
'নিরামিষ খাওয়াটা বোধহয় এর চেয়ে অনেক...ইয়ে?'
'কে বললে তোমায়? শাক-সবজি তরি-তরকারি এসবের কি প্রাণ নেই?'
'তা তো আছেই! জগদীশ বোস আর আপনার দৌলতে সে-কথা সবসময়ই মনে থাকে। তবে, মানে ঠিক সেরকম প্রাণ নয় তো! গাছপালা আর জীবজন্তু কি এক?'
'তোমার মতে কি দুয়ে অনেক প্রভেদ?'
'প্রভেদ নয়? যেমন ধরুন—গাছ হেঁটে বেড়াতে পারে না, শব্দ করতে পারে না, মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না—এমনকী, মন বলে যে কিছু আছে তাই তো বোধহয় বোঝবার কোনও উপায় নেই।

তাই নয় কি?'

কান্তিবাবু কী জানি বলতে গিয়েও বললেন না।

চা-টা শেষ করে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থেকে অবশেষে আমার দিকে চোখ তুলে চাইলেন। তাঁর চোখের করুণ সংশয়াকুল দৃষ্টি দেখে আমার মনটা হঠাৎ কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল। সত্যি, ভদ্রলোকের চেহারায় কী আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে!

কান্তিবাবু ধীরকণ্ঠে বললেন, 'পরিমল, আমার বাড়ি এখান থেকে একুশ মাইল। আটান্ন বছর বয়সে নিজে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করে যখন এখানে এসেছি, তখন নিশ্চয়ই তার একটা গূঢ় কারণ আছে। এটা বুঝতে পারছ তো? না কি ওইসব আজেবাজে রঙ চড়ানো গল্পগুলো লিখে সে বুদ্ধিটাও হারিয়েছ? ভাবছ—লোকটা একটা টাইপ বটে! একটা গল্পে লাগাতে পারলে বেশ হয়!'

লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কান্তিবাবু ভুল বলেননি। তাঁকে একটা গল্পের চরিত্র হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা মনের আনাচে-কানাচে সত্যিই ঘোরাফেরা করছিল।

ভদ্রলোক বললেন, 'জীবনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হলে যা-ই লেখো না কেন, সব ফাঁকা আর ফাঁকি হয়ে যাবে। আর এটাও মনে রেখো যে তুমি কল্পনায় যতই রঙ চড়াও না কেন, বাস্তবের চেয়ে কখনওই তা বেশি বিস্ময়কর হতে পারবে না।...যাক গে, আমি তোমায় উপদেশ দিতে আসিনি। আমি এসেছি, সত্যি বলতে কি, তোমার সাহায্য ভিক্ষে করতে।'

কান্তিবাবু আবার বাঘটার দিকে চাইলেন। কী সাহায্যের কথা বলছেন ভদ্রলোক?

'তোমার বন্দুকটা আছে, না বিদেয় করে দিয়েছ?'

আমি একটু চমকে গিয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। বন্দুকের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

বললাম, 'আছে। তবে মরচে ধরেছে বোধহয়; কিন্তু কেন?'

'কাল ওটা নিয়ে আমার বাড়িতে একবার আসতে পারবে?'

আমি আবার ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। না, রসিকতার কোনও ইঙ্গিত নেই তাঁর দৃষ্টিতে।

'অবিশ্যি কেবল বন্দুক না। টোটাও লাগবে।'

কান্তিবাবুর এ অনুরোধে কী বলব চট করে ভেবে পেলাম না। একবার মনে হল, কথা শুনে হয়তো বুঝতে পারছি না, কিন্তু আসলে হয়তো ভদ্রলোকের মাথাখারাপ হয়ে গেছে। খামখেয়ালি, সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। নইলে আর জীবন বিপন্ন করে উদ্ভট গাছপালার উদ্দেশে কেউ বনবাদাড়ে ধাওয়া করে?

বললাম, 'বন্দুক নিয়ে যেতে আমার কোনও আপত্তি নেই, তবে কারণটা জানার জন্য বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে। আপনাদের ও অঞ্চলে জন্তু-জানোয়ার কি চোর-ডাকাতের উপদ্রব হচ্ছে নাকি?'

কান্তিবাবু বললেন, 'সেসব তুমি এলে পরে বলব। বন্দুকের প্রয়োজন শেষ পর্যন্ত না-ও হতে পারে। আর যদি-বা হয়ও, এটুকু বলে রাখছি যে, তোমায় কোনও দণ্ডনীয় অপরাধের দায়ে পড়তে হবে না।

কান্তিবাবু উঠে পড়লেন। তারপর আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোমার কাছেই এসেছি, কারণ শেষ যা দেখেছি তোমায়, তাতে মনে হয়েছিল যে, আমার মতো তোমারও নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। তা ছাড়া আমার লোকসমাজে যাতায়াত আগেও কম ছিল, এখন প্রায় নেই বললেই চলে; এবং চেনা-পরিচিতের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে ক'জন আছে, তোমার বিশেষ গুণগুলি তাদের কারও মধ্যেই নেই।'

অতীতে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে যে বিশেষ উত্তেজনাটা শিরায় শিরায় অনুভব করতাম, আজ এই মুহূর্তে আবার যেন তার কিছুটা অনুভব করলাম।

বললাম, 'কোথায় কখন কীভাবে যাব যদি বলে দেন...'

'সে বলে দিচ্ছি। যশোর রোড দিয়ে সোজা গিয়ে বারাসাত স্টেশনে পৌঁছে ওখানকার যে-কোনও লোককে মধুমুরলীর দিঘির কথা জিজ্ঞেস করবে। সেটা স্টেশন থেকে মাইল চারেক। সেই দিঘির পাশে একটা পুরনো ভাঙা নীলকুঠি আছে। তার পাশেই আমার বাড়ি। তোমার গাড়ি আছে তো?'

'না। তবে আমার এক বন্ধুর আছে।'

'কে বন্ধু?'

'অভিজিৎ। কলেজে সহপাঠী ছিল।'

'কেমন লোক সে? আমি চিনি?'

'চেনেন না বোধহয়। তবে লোক ভাল। মানে, আপনি যদি বিশ্বস্ততার কথা বলেন, তবে হি ইজ অল রাইট।'

'বেশ তো। তাকে নিয়েই যেও। তবে যেও নিশ্চয়ই। ব্যাপারটা জরুরি সেটা বলা বাহুল্য। বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে যেতে চেষ্টা কোরো।'

আমার বাড়িতে টেলিফোন নেই। রাস্তার মোড়ে 'রিপাবলিক কেমিস্ট' থেকে অভিজিতের বাড়িতে ফোন করলাম। বললাম, 'চলে আয় এক্ষুনি। জরুরি কথা আছে।'

'তোর নতুন গল্প পড়ে শোনাবি তো? আবার ঘুমিয়ে পড়ব কিন্তু।'

'আরে না না। অন্য ব্যাপার।'

'কী ব্যাপার? অত আস্তে কথা বলছিস কেন?'

'একটা ভাল ম্যাস্টিফের বাচ্চার সন্ধান আছে। লোক বসে আছে আমার বাড়িতে।'

কুকুরের টোপ না ফেললে আজকাল অভিজিৎকে তার বাড়ি থেকে বার করা খুব শক্ত। পাঁচটি মহাদেশের এগারো জাতের কুকুর আছে অভিজিতের কেনেলে। তার মধ্যে তিনটি প্রাইজ-প্রাপ্ত। পাঁচ বছর আগেও এরকম ছিল না। ইদানীং কুকুরই তার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা।

কুকুরপ্রীতির বাইরে অভিজিতের গুণ হল—আমার বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস। আমার প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকদের মনঃপূত না হওয়ায় শেষটায় অভিজিতের অর্থানুকূল্যে ছাপা হল। সে বলেছিল, 'আমি কিস্যু বুঝি না। তবে তুই যখন লিখেছিস, তখন একেবারে রাবিশ হতেই পারে না। পাবলিশারগুলো গবেট।' যাই হোক, সে বই পরে ভালই কেটেছিল, এবং নামটাও কিনেছিল। ফলে আমার প্রতি অভিজিতের আস্থার ভিত আরও দৃঢ় হয়েছিল।

ম্যাস্টিফের বাচ্চার ব্যাপারটা নিছক মিথ্যে হওয়ার দরুন একটা বড়রকম অভিমার্কা রদ্দা আমার পাওনা হল, এবং পেলামও। কিন্তু আসল প্রস্তাবটা সাদরে গৃহীত হওয়ায় রদ্দার চনচনি ভুলে গেলাম।

অভি সোৎসাহে বললে, 'অনেকদিন আউটিং-এ যাইনি। শেষ সেই সোনারপুরের ঝিলে স্নাইপ-শুটিং। কিন্তু লোকটি কে? ব্যাপারটা কী? একটু খুলে বল না বাছাধন!'

'খুলে সে নিজেই যখন বললে না, তখন আমি কী করে বলি? একটু রহস্য না-হয় রইলই। জমবে ভাল। কল্পনাশক্তিকে এক্সারসাইজ করানোর এই তো সুযোগ!'

'আহা, লোকটি কে তাই বল না!'

'কান্তিচরণ চ্যাটার্জি। বুঝলে কিছু? এককালে কিছুদিন বটানির প্রোফেসর ছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। প্রোফেসারি ছেড়ে দুষ্প্রাপ্য গাছপালার সন্ধানে ঘুরতেন, সে বিষয়ে রিসার্চ করতেন, প্রবন্ধ লিখতেন। ভাল কালেকশন ছিল গাছপালার—বিশেষত অর্কিডের।'

'তোর সঙ্গে আলাপ কীভাবে?'

'আসামে কাজিরাঙা ফরেস্ট বাংলোতে। আমি বাঘ মারার তাক করছি, আর উনি খুঁজছেন নেপেন্‌থিস্‌।'

'কী খুঁজছেন?'

'নেপেন্‌থিস্‌। বটানিক্যাল নাম। সোজা কথায় "পিচার প্লান্ট" বা কলসিগাছ। আসামের জঙ্গলে পাওয়া যায়। পোকা ধরে ধরে খায়। আমি নিজে অবিশ্যি দেখিনি। কান্তিবাবুর মুখেই যা শোনা।'

'কীটখোর? পোকা খায়? গাছ পোকা খায়?'

'তোর বটানি ছিল না বোধহয়?'

'না।'

'বইয়ে ছবি দেখেছি। অবিশ্বাস করার কিছু নেই।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? ভদ্রলোক সে গাছ পেয়েছিলেন কিনা জানি না, কারণ শিকার শেষ করে আমি

চলে আসি, উনি থেকে যান। আমার তো ভয় ছিল, কোনও জন্তু-জানোয়ার কি সাপখোপের হাতে ওঁর প্রাণ যাবে বলে। গাছের নেশায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন। কলকাতায় ফিরে এসে দু-একবারের বেশি দেখা হয়নি, তবে ওঁর কথা মনে হত প্রায়ই, কারণ সাময়িকভাবে অর্কিডের নেশা আমাকেও ধরেছিল। বলেছিলেন, আমেরিকা থেকে কিছু ভাল অর্কিড আমায় এনে দেবেন।'

'আমেরিকা? ভদ্রলোক আমেরিকা গেছেন নাকি?'

'বিলিতি কোনও-এক বটানির জার্নালে উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটা লেখা বেরোনোর পর ওঁর বেশ খ্যাতি হয় ওদেশে। কোন-এক উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কনফারেন্সে ওঁকে নেমন্তন্ন করেছিল আমেরিকায়। সেও প্রায় ফিফটি-ওয়ান টু-তে। তারপর এই দেখা।'

'এতদিন কী করেছেন ওখানে?'

'জানি না। তবে কাল জানা যাবে বলে আশা করছি।'

'লোকটার মাথায় ছিট-টিট নেই তো?'

'তোর চেয়ে বেশি নেই এটুকু বলতে পারি। তোর কুকুর পোষা আর ওঁর গাছ পোষা...'

অভিজিতের স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে করে আমরা যশোর রোড দিয়ে বারাসাত অভিমুখে চলেছি।

আমরা বলতে আমি আর অভিজিৎ ছাড়া আরও একটি প্রাণী সঙ্গে রয়েছে, সে হল অভিজিতের কুকুর 'বাদশা'। আমারই ভুল; অভিজিৎকে না বলে দিলে সে যে সঙ্গে করে তার এগারোটি কুকুরের একটিকে নিয়ে আসবেই, এটা আমার বোঝা উচিত ছিল।

বাদশা জাতে রামপুর হাউন্ড। বাদামি রঙ, বেজায় তেজিয়ান। গাড়ির পুরো পিছনদিকটা একাই দখল করে জাঁকিয়ে বসে জানলা দিয়ে মুখটা বার করে দিগন্তবিস্তৃত ধানখেতের দৃশ্য উপভোগ করছে এবং মাঝে মাঝে এক-একটা গ্রাম্য নেড়ি কুকুরের সাক্ষাৎ পেয়ে মুখ দিয়ে একটা অবজ্ঞাসূচক মৃদু শব্দ করছে।

বাদশাকে অভিজিতের সঙ্গে দেখে একটা আপত্তিকর ইঙ্গিত দেওয়ায় অভি বলল, 'তোর বরকন্দাজির উপর আর ভরসা নেই, তাই ওকে আনলাম। এতদিন বন্দুক ধরিসনি। বিপদ যদি আসেই তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো বাদশাই কাজ করবে বেশি। ওর ঘ্রাণশক্তি অসাধারণ, আর সাহসের তো কথাই নেই!'

কান্তিবাবুর বাড়ি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হল না। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় আড়াইটে। গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে খানিকটা রাস্তা গিয়ে একতলা বাংলো-ধাঁচের বাড়ি। বাড়ির পিছনদিকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে একটা প্রকাণ্ড পুরনো শিরীষ গাছ এবং তার পাশেই বেশ বড় একটা কারখানা গোছের টিনের ছাতওয়ালা ঘর। বাড়ির মুখোমুখি রাস্তার উলটোদিকে বাগান এবং বাগানের পরে একটা লম্বা টিনের ছাউনি দেওয়া জায়গায় চকচক করছে একসারি কাচের বাক্স।

কান্তিবাবু আমাদের অভ্যর্থনা করে বাদশাকে দেখে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বললেন, 'এ কি শিক্ষিত কুকুর?'

অভি বলল, 'আমার খুব বাধ্য। তবে কাছাকাছি অন্য শিক্ষিত কুকুর থাকলে কী করবে বলা যায় না। আপনার এখানে কোনও কুকুর-টুকুর...?'

'না। কুকুর নেই। তবে ওটাকে আপাতত বসবার ঘরের ওই জানলাটার গরাদটায় বেঁধে রাখুন।'

অভিজিৎ আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে চোখ টিপে বাধ্য ছেলের মতো কুকুরটাকে জানলার সঙ্গে বেঁধে দিল। বাদশা দু-একটা মৃদু আপত্তি জানিয়ে আর কিছু বলল না।

আমরা সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসার পর কান্তিবাবু বললেন, 'আমার চাকর প্রয়াগের ডান হাত জখম, তাই আমি নিজেই সকাল সকাল তোমাদের জন্য ফ্লাস্কে চা করে রেখেছি। যখন দরকার হয় বোলো।'

এই শান্ত নিরিবিলি জায়গায় কী বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে সেটা আমার মাথায় আসছিল না। দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া আর তো কোনও শব্দই নেই। বন্দুকটা হাতে নিয়ে কেমন বোকা-বোকা লাগছিল নিজেকে, তাই সেটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে দিলাম।

অভি ছটফটে মানুষ—নেহাতই শহুরে। গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা, অশথপাতার হাওয়ার ঝিরঝির শব্দ, নাম-না-জানা পাখির ডাক—এসব তার মোটেই ধাতে সয় না। সে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে উসখুস করে বলে উঠল, 'পরিমলের কাছে শুনছিলাম আপনি নাকি আসামের জঙ্গলে এক বিদঘুটে গাছ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায় বাঘের খপ্পরে পড়েছিলেন?'

অভির অভ্যাসই হল রঙ চড়িয়ে নাটকীয়ভাবে কথা বলা। ভয় হল কান্তিবাবু বুঝি ফস করে রেগে ওঠেন। কিন্তু ভদ্রলোক কেবল হেসে বললেন, 'বিপদ বলতেই আপনাদের বাঘের কথা মনে হয়, না? সেটা অবিশ্যি আশ্চর্য নয়। অধিকাংশের তাই। তবে—না। বাঘের কবলে পড়িনি। জোঁকের হাতে কিছুটা নাকাল হতে হয়েছিল বটে, তাও তেমন কিছু নয়।'

'সে গাছ পেয়েছিলেন?'

এ প্রশ্নটা আমারও মাথায় ঘুরছিল।

কান্তিবাবু বললেন, 'কোন গাছ?'

'সেই যে হাঁড়ি কলসি না কী গাছ জানি...'

'ও। নেপেন্‌থিস্। হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। এখনও আছে। দেখাচ্ছি আপনাদের। এখন আর অন্য কোনও গাছে তেমন ইন্টারেস্ট নেই। কেবল কার্নিভোরাস্ প্লান্টস। অর্কিডগুলোও অধিকাংশই বিদেয় করে দিয়েছি।'

কান্তিবাবু উঠে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। আমি আর অভি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কার্নিভোরাস্ প্লান্টস—অর্থাৎ মাংসাশী গাছ। পনেরো বছর আগে পড়া বটানির বইয়ের একটি পাতা ও কয়েকটি ছবি আবছাভাবে মনে পড়ে গেল।

কান্তিবাবু বেরোলেন হাতে একটি বোতল নিয়ে।

বোতলটা আমাদের সামনে ধরতে দেখলাম, তাতে উচ্চিংড়ে জাতীয় নানান সাইজের সব পোকা ঘোরাফেরা করছে। বোতলের ঢাকনায় গোলমরিচদানের ঢাকনার মতো ছোট ছোট ফুটো।

কান্তিবাবু হেসে বললেন, 'ফিডিং টাইম। এসো আমার সঙ্গে।'

আমরা কান্তিবাবুর পিছন পিছন টিনের ছাউনি দেওয়া লম্বা ঘরটার দিকে গেলাম।

গিয়ে দেখি সারবাঁধা কাচের বাক্সগুলোর মধ্যে এক-একটায় এক-একরকম গাছ; তার কোনওটাই এর আগে চোখে দেখিনি।

কান্তিবাবু বললেন, 'এর কোনওটাই বাংলাদেশে পাবে না—অবিশ্যি ওই নেপেন্‌থিস্ ছাড়া। একটা আছে নেপাল থেকে আনানো। একটা আফ্রিকার। অন্য সবক'টাই প্রায় মধ্য আমেরিকার।'

অভিজিৎ বলল, 'এসব গাছ এখানে বেঁচে রয়েছে কী করে? এখানকার মাটিতে কি—?'

'মাটির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এদের।'

'তবে?'

'এরা মাটি থেকে প্রাণ সঞ্চয় করে না। মানুষ যেমন ঠিকমতো খাদ্য পেলে নিজের দেশের বাইরে অনেক জায়গাতেই স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে—এরাও তেমনই ঠিকমতো খেতে পেলেই বেঁচে থাকে, সে যেখানেই হোক।'

কান্তিবাবু একটা কাচের বাক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভিতরে এক আশ্চর্য গাছ। ইঞ্চি দুই লম্বা সবুজ পাতাগুলোর দু'পাশে সাদা সাদা দাঁতের মতো খাঁজ-কাটা।

বাক্সটার সামনের দিকে কাচের গায়ে একটা ছিটকিনি-দেওয়া বোতলের মুখের সাইজের গোল দরজা। কান্তিবাবু দরজাটা খুললেন। তারপর বোতলের ঢাকনিটা খুলে ক্ষিপ্র হস্তে বোতলের মুখটা দরজার ভিতরে গলিয়ে দিলেন।

উচ্চিংড়েটা এদিক-ওদিক লাফিয়ে গাছটার পাতার উপর বসল, এবং বসতেই তৎক্ষণাৎ পাতাটা মাঝখান থেকে ভাঁজ হয়ে গিয়ে পোকাটাকে জাপটে ধরল। অবাক হয়ে দেখলাম যে, দু'দিকের দাঁত পরস্পরের খাঁজে খাঁজে বসে যাওয়ায় এমন একটি খাঁচার সৃষ্টি হয়েছে, যার থেকে উচ্চিংড়ে বাবাজির আর বেরোবার কোনও রাস্তাই নেই।

প্রকৃতির এমন তাজ্জব, এমন বীভৎস ফাঁদ আমি আর কখনও দেখিনি।

অভি ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'পোকাটা যে ওই পাতাটাতেই বসবে তার কোনও গ্যারান্টি আছে কি?'

কান্তিবাবু বললেন, 'আছে বইকী! গাছগুলো থেকে এমন একটা গন্ধ বেরোয় যেটা পোকা অ্যাট্র্যাক্ট করে। এটা হল Venu's Fly Trap। মধ্য আমেরিকা থেকে আনা। বটানির বইয়েতে এর কথা পাবে।'

আমি অবাক বিস্ময়ে উচ্চিংড়ের দশা দেখছিলাম। প্রথমে কিছুক্ষণ ছটফট করেছিল। এখন দেখলাম একেবারে নির্জীব। আর দেখলাম যে পাতার চাপ ক্রমশ বাড়ছে। টিকটিকির চেয়ে এ গাছ কম হিংস্র কীসে?

অভি কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'এঃ—এমন গাছ একটা বাড়িতে থাকলে তো পোকামাকড়ের উৎপাত থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যেত। আরশোলার জন্য আর ডি-ডি-টি পাউডার ছড়াতে হত না।'

কান্তিবাবু বললেন, 'এ গাছ আরশোলা হজম করতে পারবে না। তা ছাড়া এর পাতার আয়তনও ছোট। আরশোলার জন্য অন্য গাছ। এই যে—এদিকে।'

পাশের বাক্সের সামনে গিয়ে দেখি লিলির মতো বড় বড় লম্বা পাতাওয়ালা একটা গাছ। প্রত্যেকটা পাতার ডগা থেকে একটি করে ঢাকনা সমেত থলির মতো জিনিস ঝুলছে। এটার ছবি মনে ছিল, তাই আর চিনিয়ে দিতে হল না।

কান্তিবাবু বললেন, 'এই হল নেপেন্‌থিস্ বা পিচার প্ল্যান্ট। এর খাঁই অনেক বেশি। প্রথম যখন গাছটি পাই তখন ওই থলির মধ্যে একটা ছোট্ট পাখিকে ছিবড়ে অবস্থায় পেয়েছিলাম।

'বাপরে বাপ!' অভির তাচ্ছিল্যের ভাব ক্রমশই অন্তর্হিত হচ্ছিল। 'এখন ওটা কী খায়?'

'আরশোলা, প্রজাপতি, শুঁয়োপোকা—এইসব আর কি! মাঝে আমার কলে একটা ইঁদুর ধরা পড়েছিল। সেটাও খাইয়ে দেখেছিলাম, আপত্তি করেনি। তবে গুরুপাকের ফলে এসব গাছ অনেক সময়ে মরে যায়। অত্যন্ত লোভী তো! কোন অবধি ভোজন সইবে সেটা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারে না।'

ক্রমবর্ধমান বিস্ময়ে এ-বাক্স থেকে ও-বাক্স ঘুরে গাছগুলো দেখতে লাগলাম। বাটারওয়ার্ট, সানডিউ, ব্লাডারওয়ার্ট, অ্যারজিয়া—এগুলোর ছবি আগে দেখেছি। তাই মোটামুটি চিনতেও পারলাম। কিন্তু অন্যগুলো একেবারে নতুন, একেবারে তাজ্জব, একেবারে অবিশ্বাস্য। প্রায় বিশ রকমের মাংসাশী গাছ কান্তিবাবু সংগ্রহ করেছেন, তার কোনও-কোনওটা পৃথিবীর অন্য কোনও কালেকশনেই নাকি নেই।

এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর গাছ যেটি—সানডিউ—তার ছোট্ট পাতাগুলোর চারপাশে সরু লম্বা লম্বা রোঁয়ার ডগায় জলবিন্দু চকচক করছে।

কান্তিবাবু একটি সুতোর ডগায় এলাচের দানার সাইজের একটুকরো মাংস ঝুলিয়ে সুতোটাকে আস্তে আস্তে পাতাটির কাছে নিয়ে যেতে খালি চোখেই দেখতে পেলাম, রোঁয়াগুলো সব একসঙ্গে লুব্ধ ভঙ্গিতে মাংসখণ্ডটার দিকে উঁচিয়ে উঠল।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে কান্তিবাবু বললেন, 'মাংসটা পেলে পাতাটা Fly Trap-এর মতোই ওটাকে জাপটে ধরে নিত। তারপর পুষ্টিকর যা-কিছু শুষে নিয়ে অকেজো ছিবড়েটাকে ফেলে দিত। তোমার-আমার খাওয়ার সঙ্গে কোনও তফাত নেই, কী বলো?'

আমরা শেড থেকে বেরিয়ে বাগানে এলাম।

শিরীষ গাছের ছায়াটা লম্বা হয়ে বাগানের উপর পড়েছে। ঘড়িতে দেখলাম চারটে বাজে।

কান্তিবাবু বললেন, 'এর অধিকাংশ গাছের কথাই তোমার বটানির বইয়ে পাবে। তবে আমার যেটি সবচেয়ে আশ্চর্য সংগ্রহ, সেটির কথা আমি না লিখলে কোনও বইয়ে থাকবে না। সেটির জন্যই আজ তোমাদের এখানে আসতে বলা। চলো পরিমল। চলুন অভিজিৎবাবু।'

কান্তিবাবুর পিছন পিছন এবার আমরা বড় কারখানা-ঘরটার দিকে এগোলাম।

টিনের দরজাটা তালা দিয়ে বন্ধ। দু'দিকে দুটো জানলা রয়েছে। তারই একটা হাত দিয়ে ঠেলে খুলে নিজে উঁকি মেরে আমাদের বললেন, 'দেখো।'

অভি আর আমি জানলায় মুখ লাগালাম।

ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়ালের উপর দিকের দুটো কাচের জানলা যা স্কাইলাইট দিয়ে রোদ আসায় ভিতরটা কিছু আলো হয়েছে।

ঘরের মধ্যে যে জিনিসটা রয়েছে, হঠাৎ দেখলে সেটাকে গাছ বলে মনে হওয়ার কথা নয়। বরং একাধিক শুঁড়বিশিষ্ট কোনও আজব জানোয়ার বলে মনে হতে পারে। ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, গুঁড়ি একটা আছে। সেটা পাঁচ-ছ' হাত উঠে একটা মাথায় শেষ হয়েছে, এবং সেই মাথার হাতখানেক নীচে মাথাটাকে গোল করে ঘিরে কতগুলো শুঁড়ের উৎপত্তি হয়েছে। গুনে দেখি সাতটা শুঁড়।

গাছের গা পাংশুটে মসৃণ, এবং সর্বাঙ্গে ব্রাউন চাকা চাকা দাগ।

শুঁড়গুলো আপাতত মাটিতে নুয়ে পড়ে আছে। কেমন যেন নির্জীব ভাব। কিন্তু তাও গা-টা ছমছম করে উঠল।

অন্ধকারে চোখটা অভ্যস্ত হলে আরও একটা জিনিস লক্ষ করলাম। ঘরের মেঝেতে গাছের চারিদিকে পাখির পালক ছড়িয়ে আছে।

কতক্ষণ চুপ করে ছিলাম জানি না। কান্তিবাবুর গলার স্বরে আবার যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম।

'গাছটা এখন ঘুমোচ্ছে। ওঠবার সময় হল বলে।'

অভি অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'ওটা কি সত্যিই গাছ?'

কান্তিবাবু বললেন, 'মাটি থেকে গজাচ্ছে যখন, তখন গাছ ছাড়া আর কী বলবেন বলুন! হাবভাব অবিশ্যি গাছের মতো নয়। অভিধানে এর উপযুক্ত কোনও নাম নেই।'

'আপনি কী বলেন?'

'সেপ্টোপাস। অথবা বাংলায় সপ্তপাশ। পাশ—অর্থাৎ বন্ধন; যেমন নাগপাশ।'

আমরা বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। বললাম, 'এ গাছ পেলেন কোথায়?'

'মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়া হ্রদের কাছেই গভীর জঙ্গল আছে; তার ভিতরে।'

'অনেক খুঁজতে হয়েছে বলুন?'

'ওই অঞ্চলেই যে আছে সেটা জানা ছিল। তোমরা বোধহয় প্রোফেসর ডানস্টান-এর কথা শোনোনি? উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও পর্যটক ছিলেন। মধ্য আমেরিকায় গাছপালার সন্ধান করতে গিয়ে প্রাণ হারান। ঠিক কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয় কেউ জানতে পারেনি; মৃতদেহ সম্পূর্ণ নিখোঁজ হয়ে যায়। তাঁর তৎকালীন ডায়রির শেষের দিকে এ গাছটার উল্লেখ পাওয়া যায়।

'আমি তাই প্রথম সুযোগেই নিকারাগুয়ার দিকে চলে যাই। গুয়াটেমালা থেকেই স্থানীয় লোকের কাছে এ গাছের বর্ণনা শুনতে থাকি। তারা বলে শয়তান গাছ। শেষটায় অবিশ্যি এমন গাছ একাধিক চোখে পড়ে। বাঁদর, আরমাডিলো, অনেক কিছু খেতে দেখেছি এ গাছকে। অনেক খোঁজার পর একটা অল্পবয়স্ক ছোটখাটো চারাগাছ পেয়ে সেটাকে তুলে আনি। দু' বছরে গাছের কী সাইজ হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ।'

'এখন কী খায় গাছটা?'

'যা দিই তাই খায়। কলে ইঁদুর ধরে খেতে দিয়েছি। তারপর প্রয়াগকে বলে দিয়েছিলাম—বেড়াল কুকুর চাপা পড়লে ধরে আনতে, তাও দিয়েছি। তারপর তুমি আমি যা খাই তাও দিয়েছি—অর্থাৎ মুরগি, ছাগল। ইদানীং খিদেটা খুব বেড়েছে। খাবার জুগিয়ে উঠতে পারছি না। বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙার পর ভয়ানক ছটফট করে। কাল তো একটা কাণ্ডই হয়ে গেল। প্রয়াগ গিয়েছিল একটা মুরগি দিতে। হাতিকে যেভাবে খাওয়ায় সেভাবেই খাওয়াতে হয়। প্রথমে গাছটার মাথায় একটা ঢাকনা খুলে যায়। তারপর শুঁড় দিয়ে খাবারটা হাত থেকে নিয়ে মাথার গর্তের মধ্যে পুরে দেয়। একটা যে-কোনও খাবার পেটে পুরলে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তারপর আবার শুঁড়গুলো দোলাতে আরম্ভ করলে বোঝা যায় যে, আরও খেতে চাইছে।

'এতদিন দুটো মুরগি অথবা একটি কচি পাঁঠায় একদিনের খাওয়া হয়ে যেত। কাল থেকে তার ব্যতিক্রম হচ্ছে। কাল দ্বিতীয় মুরগিটা দিয়ে প্রয়াগ দরজা বন্ধ করে চলে এসেছিল। অস্থির অবস্থায় শুঁড়গুলো আছড়ালে একটা শব্দ হয়। দ্বিতীয় মুরগির পরেও হঠাৎ সেই আওয়াজটা পেয়ে প্রয়াগ

গিয়েছিল অনুসন্ধান করতে।

'আমি তখন ঘরে বসে ডায়রি লিখছি। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি সেপ্টোপাস্-এর একটি শুঁড় প্রয়াগের ডান হাতটা আঁকড়ে ধরেছে। প্রয়াগ প্রাণপণে সেটা টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেইসঙ্গে সেপ্টোপাস্-এর আর একটি শুঁড় লকলক করে প্রয়াগের দিকে এগোচ্ছে।

'আমি দৌড়ে গিয়ে আমার লাঠি দিয়ে শুঁড়টায় এক প্রচণ্ড আঘাত করে দু' হাত দিয়ে প্রয়াগকে টেনে কোনওমতে তাকে উদ্ধার করি। তবে চিন্তার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রয়াগের হাতের খানিকটা মাংস সেপ্টোপাস্ খাবলে নিয়েছিল, এবং সেটাই সে পেটের মধ্যে পুরেছে, এ আমার নিজের চোখে দেখা।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে বারান্দায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। কান্তিবাবু একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'সেপ্টোপাস্-এর যে মানুষের প্রতি লোভ বা আক্রোশ থাকতে পারে তার কোনও ইঙ্গিত এতদিন পাইনি। কাল যখন পেলাম, তারপরে, এটাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না। কাল একবার খাবারে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু কী আশ্চর্য বুদ্ধি গাছটার—সে-খাবার ও শুঁড়ে নিয়েই ফেলে দিল। একমাত্র উপায় হল গুলি করে মারা। পরিমল, তোমায় কেন ডেকেছি সেটা বুঝতে পারছ তো!'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'গুলি করলে ও মরবে কিনা সেটা আপনি জানেন?'

কান্তিবাবু বললেন, 'মরবে কিনা জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, ব্রেন বলে ওর একটা জিনিস আছে। ওর চিন্তাশক্তি যে আছে তার তো প্রমাণই পেয়েছি, কারণ আমি তো কতবার ওর কত কাছে গেছি—ও তো আমাকে কোনওদিন আক্রমণ করেনি। আমাকে চেনে—যেমন কুকুর তার মনিবকে চেনে। প্রয়াগের উপর আক্রোশের কারণ হচ্ছে যে, প্রয়াগ কয়েকবার ওর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করেছে। খাবারের লোভ দেখিয়ে, দেয়নি; কিংবা শুঁড়ের ডগার কাছে নিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে নিয়েছে। মস্তিষ্ক ওর আছেই, এবং আমার বিশ্বাস, সেটা যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে—অর্থাৎ ওর মাথায়। যেখানে ঘিরে শুঁড়গুলো বেরিয়েছে সেখানেই তোমায় তাগ করে গুলি ওর মাথাতেই মারতে হবে।'

অভি ফস করে বলল, 'সে আর এমন কী! সে তো এক মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। পরিমল, তোর বন্দুকটা—'

কান্তিবাবু হাত তুলে অভিকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'শিকার যদি ঘুমিয়ে থাকে, তখন কি তাকে মারা চলে? পরিমলের হান্টিং কোড কী বলে?'

আমি বললাম, 'ঘুমন্ত শিকারকে গুলি করা একেবারেই নীতিবিরুদ্ধ। বিশেষত শিকার যেখানে চলেফিরে বেড়াতে পারে না, সেখানে তো এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না।'

কান্তিবাবু ফ্লাস্কে এনে চা পরিবেশন করলেন। চা-পান শেষ হতে না হতে মিনিট পনেরোর মধ্যেই সেপ্টোপাসের ঘুম ভাঙল।

বাদশা পাশের ঘরে কিছুক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। হঠাৎ একটা খচমচ আর গোঙানির শব্দ পেয়ে অভি আর আমি উঠে গিয়ে দেখি বাদশা দাঁত দিয়ে প্রাণপণে তার বকলসটাকে ছেঁড়বার চেষ্টা করছে। অভি ধমক দিয়ে বাদশাকে নিরস্ত করতে গেছে, এমন সময় কারখানা-ঘর থেকে একটা সপাত শব্দ আর তার সঙ্গে একটা উগ্র গন্ধ পেলাম। গন্ধটা এমন, যার তুলনা দেওয়া মুশকিল। ছেলেবেলায় টনসিল অপারেশনের সময় ক্লোরোফর্ম শুঁকতে হয়েছিল, তার সঙ্গে হয়তো কিছুটা মিল আছে।

কান্তিবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'চলো, সময় হয়েছে।'

আমি বললাম, 'গন্ধটা কীসের?'

'সেপ্টোপাস্-এর। এই গন্ধ ছড়িয়েই ওরা শিকার—'

কান্তিবাবুর কথা শেষ হল না। বাদশা প্রচণ্ড এক টানে বক্‌লস ছিঁড়ে ধাক্কার চোটে অভিকে উলটিয়ে ফেলে তীরবেগে পাগলের মতো ছুটল ওই গন্ধের উৎসের দিকে।

অভিও কোনওমতে উঠে 'সর্বনাশ' বলে ছুটল বাদশার পিছনে।

আমি গুলিভরা বন্দুক নিয়ে কারখানা-ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে দেখি, বাদশা এক বিরাট লাফে একমাত্র খোলা জানলার উপর উঠল এবং অভির বাধা দেবার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে ঘরের ভিতর

ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কান্তিবাবু চাবি দিয়ে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম রামপুর হাউন্ডের মর্মান্তিক আর্তনাদ।

ঢুকে দেখি—এক শুঁড়ে শানাচ্ছে না; একের পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শুঁড় দিয়ে সেপ্টোপাস্ বাদশাকে মরণপাশে আবদ্ধ করেছে।

কান্তিবাবু চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'তোমরা আর এগিও না! পরিমল, চালাও গুলি!'

বন্দুক উঁচিয়েছি এমন সময় চিৎকার এল, 'থামো।'

অভিজিতের কাছে তার কুকুরের মূল্য কতখানি তা এবার বুঝতে পারলাম। সে কান্তিবাবুর বারণ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ছুটে গিয়ে সেপ্টোপাস্-এর তিনটে শুঁড়ের একটাকে আঁকড়ে ধরল।

তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

তিনটে শুঁড়ই একসঙ্গে বাদশাকে ছেড়ে দিয়ে অভিকে আক্রমণ করল। আর অন্য চারটে শুঁড় যেন মানুষের রক্তের লোভেই হঠাৎ সজাগ হয়ে লোলুপ জিহ্বার মতো লকলক করে উঠল।

কান্তিবাবু আবার বললেন, 'চালাও—চালাও গুলি! ওই যে মাথা।'

সেপ্টোপাস্-এর মাথায় দেখলাম একটা ঢাকনি আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। ঢাকনির নীচে গহ্বর। আর অভিসমেত শুঁড়গুলি শূন্যে উঠে সেই গহ্বরের দিকে চলেছে।

অভির মুখ রক্তহীন ফ্যাকাশে, তার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

চরম সংকটের মুহূর্তে—আমি এর আগেও দেখেছি—আমার স্নায়ুগুলো সব যেন হঠাৎ কেমন ম্যাজিকের মতো সংযত, সংহত হয়ে যায়।

আমি নিষ্কম্প হাতে বন্দুক নিয়ে সেপ্টোপাস্-এর মাথার দুটি চক্রের মধ্যিখানে অব্যর্থ নিশানায় গুলি ছুড়লাম।

ছোড়ার পরমুহূর্তেই, মনে আছে, ফিনকি দিয়ে গাছের মাথা থেকে লাল রক্তের ফোয়ারা। আর মনে আছে, শুঁড়গুলো অভিকে মুক্তি দিয়ে মাটিতে নেতিয়ে পড়ছে, আর সেইসঙ্গে আগের সেই গন্ধটা হঠাৎ তীব্রভাবে বেড়ে উঠে আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন, অবশ করছে।...

আগের ঘটনার পর চার মাস কেটে গেছে। এতদিনে আবার আমার অসমাপ্ত উপন্যাসটা নিয়ে পড়েছি।

বাদশাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তবে অভি ইতিমধ্যে একটি ম্যাস্টিফ ও একটি তিব্বতী কুকুরের বাচ্চা সংগ্রহ করেছে এবং আরেকটি রামপুর হাউন্ডের সন্ধান করছে। অভির পাঁজরের দু'খানা হাড় ভেঙেছিল। দু' মাস প্লাস্টারে থাকার পর জোড়া লেগেছে।

কান্তিবাবু কাল এসেছিলেন। বললেন কীটখোর গাছপালা সব বিদেয় করে দেবার কথা ভাবছেন। 'বরং সাধারণ শাক-সবজি নিয়ে একটু গবেষণা করলে ভাল হয়। ঝিঙে, উচ্ছে, পটল—এইসব আর কি! যদি বলো, তোমায় কিছু গাছ দিতে পারি। তুমি আমার এত উপকার করলে! এই ধরো একটা নেপেন্থিস্; তোমার ঘরের পোকাগুলোকে অন্তত—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না। ওসব আপনি ফেলে দিতে চান তো ফেলে দিন। পোকা ধরার জন্য আমার গাছের দরকার নেই।'

কিং কোম্পানির ক্যালেন্ডারের পিছন দিক থেকে শব্দ এল, 'ঠিক ঠিক ঠিক।'

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৬৯

সদানন্দের খুদে জগৎ

আজ আমার মনটা বেশ খুশি-খুশি, তাই ভাবছি এইবেলা তোমাদের সব ব্যাপারটা বলে ফেলি। আমি জানি তোমরা বিশ্বাস করবে। তোমরা তো আর এদের মতো নও। এরা বিশ্বাস করে না। এরা ভাবে আমার সব কথাই বুঝি মিথ্যে আর বানানো। আমি তাই আর এদের সঙ্গে কথাই বলি না।

এখন দুপুর, তাই এরা কেউ আমার ঘরে নেই। বিকেল হলেই আসবে। এখন আছি কেবল আমি আর আমার বন্ধু লালবাহাদুর। লালবাহাদুর সিং! উঃ—কাল কী ভাবনাটাই ভাবিয়েছিল ও আমাকে! ও যে আবার ফিরে আসবে তা ভাবতেই পারিনি। ওর ভীষণ বুদ্ধি, তাই ও পালিয়ে বেঁচেছে। আর কেউ হলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেত।

এই দেখো, বন্ধুর নামটা বলে দিলাম, আর আমার নিজের নামটাই বলা হল না!

আমার নাম শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী। শুনলেই দাড়িওয়ালা বুড়ো বলে মনে হয় না? আসলে আমার বয়স কিন্তু তেরো। নাম যদি বুড়োটে হয় তা সে আমি কী করব? আমি তো আর নিজের নাম নিজে দিইনি, দিয়েছিলেন আমার ঠাকুমা।

অবিশ্যি উনি যদি আগে থেকে টের পেতেন যে নামটার জন্য আমার খুব মুশকিল হবে, তা হলে নিশ্চয়ই অন্য নাম দিতেন। উনি তো আর জানতেন না যে, সবাই খালি আমার পিছনে লাগবে আর বলবে, 'তোর নাম না সদানন্দ? তবে তুই অমন গোমড়া ভূত কেন রে? মুখে হাসি বুঝি তোর কুষ্ঠীতে নেই?'

সত্যি, এদের যদি একটুও বুদ্ধি থাকে! খালি খ্যাঁক খ্যাঁক করে খ্যাঁকশেয়ালের মতো হাসলেই বুঝি আনন্দ বোঝায়? সবরকম আনন্দে কি আর হাসা যায়, না হাসা উচিত?

যেমন ধরো, তুমি হয়তো কিছু না-ভেবে মাটিতে একটা কাঠি পুঁতেছ, আর হঠাৎ দেখলে একটা ফড়িং খালি খালি উড়ে উড়ে এসেই কাঠির ডগায় বসছে—এটা তো ভীষণ মজার ব্যাপার! কিন্তু তাই বলে তুমি সেটা দেখে যদি হো হো করে হাসো, তা হলে তো লোকে পাগল বলবে! যেমন আমার এক পাগলা দাদু ছিলেন। আমি অবিশ্যি তাঁকে দেখিনি, কিন্তু বাবার কাছে শুনেছি তিনি নাকি কারণ-টারণ না থাকলেও হো হো করে হাসতেন। এমনকী শেষে যখন পাগলামি খুব বাড়ার দরুন বাবা, ছোটকাকা, অবিনাশকাকা, এরা সব মিলে তাঁকে শেকল দিয়ে বাঁধছিল, তখনও নাকি তাঁর হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার জোগাড়।

আসল কথা কী জানো? আমি যেসব জিনিসে মজা পাই, সেসব জিনিস হয়তো বেশির ভাগ লোকের চোখেই পড়ে না। আমার বিছানায় শুয়ে শুয়েই তো কত মজার জিনিস দেখি আমি। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে শিমুলের বিচি ঘরে উড়ে আসে। তাতে লম্বা রোঁয়া থাকে, আর সেটা এদিক-ওদিক শূন্যে ভেসে বেড়ায়। সে ভারী মজা। একবার হয়তো তোমার মুখের কাছে নেমে এল, আর তুমি ফুঁ দিতেই হুশ করে চলে গেল কড়িকাঠের কাছে।

আর জানলার মাথায় যদি একটা কাক এসে বসে, তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তো ঠিক যেন মনে হয় সার্কাসের সং। আমি তো কাক এসে বসলেই নড়াচড়া বন্ধ করে কাঠ হয়ে পড়ে থাকি, আর আড়চোখ দিয়ে কাক বাবাজির তামাশা দেখি।

অবিশ্যি আমায় যদি জিজ্ঞেস করো যে সবচেয়ে বেশি মজা কীসে পাই তা হলে আমি বলব—পিঁপড়ে। এখন অবিশ্যি শুধু মজা বললে ভুল হবে, কারণ এখন—না, থাক। আগেই যদি আশ্চর্য ব্যাপারগুলো বলে দিই তা হলে সব মাটি হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং শুরু থেকেই বলি।

আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে আমার একবার খুব জ্বর হয়েছিল। সেটা যে কিছু নতুন জিনিস তা নয়। জ্বর আমার প্রায়ই হত। সর্দি-জ্বর। মা বলতেন সকাল-সন্ধে মাঠে ঘাটে ভিজে মাটি আর ভিজে ঘাসে বসে থাকার ফল।

অন্যবারের মতো এবারও জ্বরের প্রথম দিকটা বেশ ভাল লাগছিল। কেমন একটা শীত-শীত, গ মড়ামড়ি, কুঁড়েমির ভাব। তা ছাড়া ইস্কুল কামাইয়ের মজা তো আছেই। বিছানায় শুয়ে জানলার বাইরে মাদার গাছটায় একটা কাঠবিড়ালির খেলা দেখছিলাম, এমন সময় মা এসে একটা খুব তেতো ওষুধ খেতে দিলেন। আমি লক্ষ্মী ছেলের মতো ওষুধটা খেয়ে, ঢকঢক করে গেলাস থেকে খানিকটা জল খেয়ে বাকি জলটা কুলকুচি করে জানলা দিয়ে ফেলে দিলাম। মা খুশি হয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন।

তারপর চাদরটা ভাল করে টেনে মুড়ি দিয়ে পাশবালিশটা জড়িয়ে আরাম করে শুতে যাব, এমন সময় একটা জিনিস চোখে পড়ল।

দেখলাম কুলকুচির খানিকটা জল জানলার উপর পড়েছে, আর সেই জলে একটা ছোট্ট কালো পিঁপড়ে ভীষণ হাবুডুবু খাচ্ছে।

ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত লাগল যে, আমি আরও ভাল করে দেখবার জন্য আমার চোখ দুটো পিঁপড়ের একদম কাছে নিয়ে গেলাম।

দেখতে দেখতে হঠাৎ কীরকম জানি মনে হল যে, পিঁপড়েটা আর পিঁপড়ে নয়, সেটা মানুষ। না, শুধু মানুষ নয়, সেটা যেন ঝন্টুর জামাইবাবু, মাছ ধরতে গিয়ে কাদায় পিছলে পুকুরে পড়ে গেছেন, আর ভাল সাঁতার জানেন না বলে খাবি খাচ্ছেন আর হাত-পা ছুড়ছেন। মনে পড়ল ঝন্টুর জামাইবাবুকে বাঁচিয়েছিল ঝণ্টুর বড়দা আর ওদের চাকর নরহরি।

যেই মনে পড়া, অমনই ইচ্ছে হল আমিও পিঁপড়েটাকে বাঁচাই।

জ্বর নিয়ে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে পাশের ঘরে ছুটলাম। সেখানে বাবার রাইটিং প্যাড থেকে খানিকটা ব্লটিং পেপার ছিঁড়ে নিয়ে একদৌড়ে ঘরে ফিরে এসে একলাফে খাটে উঠে ব্লটিং পেপারের টুকরোটা জলে ঠেকিয়ে দিলাম। ঠেকাতেই চোঁ করে সব জলটুকু কাগজে উঠে এল।

আর পিঁপড়েটা হঠাৎ বেঁচে গিয়ে কেমন জানি থতমত খেয়ে দু-একবার এদিক-ওদিক ঘুরে সোজা নর্দমার ভিতর চলে গেল।

সেদিন আর পিঁপড়ে আসেনি।

পরের দিন জ্বরটা বাড়ল। দুপুরের দিকে মা কাজটাজ সেরে ঘরে এসে বললেন, 'ড্যাবড্যাব করে জানলার দিকে চেয়ে আছিস কেন? এত জ্বর—ঘুম আসুক বা না আসুক, একটু চোখ বুজে চুপ করে পড়ে থাক না।'

মাকে খুশি করার জন্য চোখ বুজলাম, কিন্তু মা বেরিয়ে যেতেই আবার চোখ খুলে নর্দমার দিকে দেখতে লাগলাম।

বিকেলের দিকে সূর্যি যখন প্রায় মাদার গাছটার পিছনে চলে এসেছে, তখন দেখি একটা পিঁপড়ে নর্দমার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে।

হঠাৎ সেটা সুড়ুত করে বাইরে এসে জানলায় পায়চারি আরম্ভ করে দিল। এটা সেই কালকের নাকানি-চোবানি খাওয়া পিঁপড়েটা। আমি বন্ধুর কাজ করেছিলাম, সেটা মনে রেখে সাহস করে আবার আমার কাছে এসেছে।

আমার আগে থেকেই ফন্দি আঁটা ছিল। ভাঁড়ারঘর থেকে লুকিয়ে এক চিমটে চিনি এনে কাগজে মুড়ে আমার বালিশের পাশে রেখে দিয়েছিলাম। তার থেকে একটা বেশ বড় দানা বার করে জানলার উপরে রাখলাম।

পিঁপড়েটা হঠাৎ থমকে থেমে গেল। তারপর আস্তে আস্তে দানাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে বার কয়েক এদিক থেকে ওদিক গুঁতিয়ে দেখল। তারপর হঠাৎ কী জানি ভেবে বোঁ করে ঘুরে নর্দমার ভিতর চলে গেল।

আমি ভাবলাম, বা রে বা, এমন সুন্দর খাবার জিনিসটা দিলাম, আর পিঁপড়েভায়া সেটা ফেলেটেলে উধাও? তা হলে আসবারই কী দরকার ছিল?

কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তারবাবু এলেন। এসে আমার নাড়ি দেখলেন, জিভ দেখলেন, আর বুকে পিঠে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে দেখলেন। দেখেটেখে বললেন যে তেতো, ওষুধটা আরও দু'বার খেতে হবে, আর খেলে নাকি দু'দিনের মধ্যেই জ্বর ছেড়ে যাবে।

আমার তো শুনে মনই খারাপ হয়ে গেল। জ্বর-ছাড়া মানেই ইস্কুল, আর ইস্কুল মানেই দুপুরটা মাটি। দুপুরবেলাই যে যত পিঁপড়ে আসে আমার জানলা দিয়ে।

যাই হোক, ডাক্তারবাবু ঘর থেকে বেরোনোমাত্র আবার জানলার দিকে চাইতেই আমার মন আবার ভাল হয়ে গেল।

এবার একটা নয়, একেবারে সারবাঁধা পিঁপড়ের দল বেরিয়ে আসছে নর্দমা দিয়ে। নিশ্চয়ই সামনের পিঁপড়েটা আমার চেনা পিঁপড়ে, আর নিশ্চয়ই ও-ই গিয়ে চিনির খবরটা দিয়ে অন্য পিঁপড়েগুলোকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

একটুক্ষণ চেয়ে থাকতেই পিঁপড়ের বুদ্ধির নমুনাটা নিজের চোখেই দেখলাম। পিঁপড়েগুলো সবাই একজোটে চিনির দানাটাকে ঠেলতে ঠেলতে নর্দমার দিকে নিয়ে চলল। সে যে কী মজার ব্যাপার তা না দেখলে বোঝা যায় না। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, আমি যদি পিঁপড়ে হতাম তা হলে নিশ্চয়ই শুনতাম ওরা বলছে—'মারো জোয়ান, হেঁইও! আউর ভি থোড়া, হেঁইও! চলে ইঞ্জিন, হেঁইও!'

জ্বর ছাড়ার পর প্রথম কয়েক দিন ইস্কুলে খুব খারাপ লাগত। ক্লাসে বসে খালি খালি আমার জানলার কথা মনে হত। না-জানি কত রকম পিঁপড়ে সেখানে আসছে আর যাচ্ছে। অবিশ্যি আমি আসার আগে রোজই দু-তিনটে চিনির দানা জানলায় রেখে আসতাম, আর বিকেলে ফিরে গিয়ে দেখতাম সেগুলো আর নেই।

ক্লাসে আমি বেশিরভাগ দিন বসতাম মাঝখানের একটি বেঞ্চিতে। আমার পাশে বসত শীতল। একদিন পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছে, আর গিয়ে দেখি শীতলের পাশে ফণী বসে আছে। আমি আর কী করি, পিছনের দিকে দেয়ালের সামনে একটা খালি জায়গা ছিল, সেখানেই বসলাম।

টিফিনের আগের ক্লাসটা ছিল ইতিহাসের। হারাধনবাবু তাঁর সরু গলায় হ্যানিবলের বীরত্বের কথা বলছিলেন। হ্যানিবল নাকি কার্থেজ থেকে সৈন্য নিয়ে পুরো আল্পস পাহাড়টা ডিঙিয়ে ইতালি আক্রমণ করেছিলেন।

শুনতে শুনতে হঠাৎ কীরকম জানি মনে হল যে, হ্যানিবলের সৈন্য এই ঘরের মধ্যেই রয়েছে আর আমার খুব কাছ দিয়েই চলেছে।

এদিক-ওদিক চাইতেই আমার পিছনের দেয়ালে চোখ পড়ল। দেখলাম একটা বিরাট লম্বা পিঁপড়ের লাইন দেয়াল বেয়ে নেমে আসছে। ঠিক সৈন্যের মতো সারি সারি অসংখ্য কালো কালো খুদে খুদে পিঁপড়ে, একটানা একভাবে চলেছে তো চলেইছে।

নীচের দিকে চেয়ে দেখি মেঝের কাছে দেয়ালে একটা ফাটল, আর সেই ফাটল দিয়ে পিঁপড়েগুলো বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই দৌড়ে চলে গেলাম বাইরে, আমাদের ক্লাসের পিছন দিকটায়। গিয়ে সেই ফাটলটা খুঁজে বার করলাম। দেখলাম পিঁপড়েগুলো ফাটল দিয়ে বেরিয়ে ঘাসের ফাঁক দিয়ে সোজা চলেছে পেয়ারা গাছটার দিকে।

পিঁপড়ের লাইন ধরে গিয়ে পেয়ারা গাছের গুঁড়ির কাছেই যে জিনিসটা বেরোলো, সেটাকে দুর্গ ছাড়া আর কী বলব?

স্পষ্ট দেখলাম একটা দুর্গের মতো উঁচু মাটির ঢিবি, তার তলার দিকে একটা গেট, আর সেই গেট দিয়ে সার বেঁধে ভিতরে ঢুকছে পিঁপড়ের সৈন্যদল।

আমার ভীষণ ইচ্ছে হল দুর্গের ভিতরটা একটু দেখি।

পকেটে আমার পেনসিলটা ছিল, তার ডগাটা দিয়ে ঢিবির উপরের মাটিটা আস্তে আস্তে একটু একটু করে সরাতে লাগলাম।

প্রথমে কিছুই বেরোল না, কিন্তু তারপর যা দেখলাম তাতে সত্যিই আমি অবাক! দুর্গের ভিতর

অসংখ্য ছোট ছোট খুপরি আর সেই খুপরির একটা থেকে আরেকটায় যাবার জন্য অসংখ্য কিলবিলে সুড়ঙ্গ। কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত! এই খুদে খুদে হাত-পা দিয়ে এরকম ঘর বানাল কী করে এরা? এত বুদ্ধি হল কী করে এদের? এদেরও কি ইস্কুল আছে, মাস্টার আছে? এরাও কি লেখাপড়া শেখে, অঙ্ক কষে, ছবি আঁকে, কারিগরি শেখে? তা হলে কি মানুষের সঙ্গে এদের কোনওই তফাত নেই, খালি চেহারা ছাড়া? কই, বাঘ ভাল্লুক হাতি ঘোড়া এরা তো নিজের বাড়ি নিজেরা তৈরি করতে পারে না। এমনকী ভুলোর মতো পোষা কুকুরও পারে না।

অবিশ্যি পাখিরা বাসা করে। কিন্তু তাদের একটা বাসাতে আর ক'টা পাখি থাকতে পারে? এদের মতো দুর্গ বানাতে পারে পাখি, যাতে হাজার হাজার পাখি একসঙ্গে থাকবে?

দুর্গের খানিকটা ভেঙে যাওয়াতে পিঁপড়েদের মধ্যে খুব গোলমাল পড়ে গিয়েছিল। আমার খুব কষ্ট হল। মনে মনে ভাবলাম, এদের যখন ক্ষতি করেছি, তখন এবার উলটে কোনও উপকার করতে হবে। তা না হলে আমাকে ওরা শত্রু বলে ভাববে, আর আমি সেটা মোটেই চাই না। আসলে তো আমি ওদের বন্ধু!

তাই পরদিন ইস্কুল যাবার সময় মা আমাকে যে সন্দেশটা খেতে দিয়েছিলেন তার অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা একটা শালপাতায় মুড়ে প্যান্টের পকেটে নিয়ে নিলাম।

ইস্কুলে পৌঁছে ক্লাসের ঘণ্টা পড়ার আগেই সেটা পিঁপড়ের ঢিবির পাশে রেখে এলাম। বেচারাদের নিশ্চয়ই খাবার খুঁজতে অনেকদূর যেতে হয়। আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখবে খাবারের পাহাড়। এটা কি কম উপকার হল?

এর কিছুদিন পরেই আমাদের গরমের ছুটি হয়ে গেল, আর আমারও পিঁপড়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা বেশ ভাল জমে উঠল।

পিঁপড়েদের দেখে দেখে তাদের বিষয় যেসব আশ্চর্য জিনিস জানতে পারছিলাম সেগুলো মাঝে মাঝে বড়দের বলতাম। কিন্তু ওরা কোনও গা-ই করত না। সবচেয়ে রাগ হত যখন ওরা আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিত। তাই একদিন ঠিক করলাম যে এবার থেকে আর কাউকে কিছু বলব না। যা করব নিজেই করব, আর যা জানব নিজেই জানব।

একদিন একটা ব্যাপার হল।

তখন দুপুরবেলা। আমি ঝণ্টুদের বাড়ির পাঁচিলের গায়ে একটা লাল পিঁপড়ের ঢিবির পাশে বসে পিঁপড়েদের খেলা দেখছি। অনেকে বলবে লাল পিঁপড়ের ঢিবির পাশে তো বেশিক্ষণ বসা যায় না, কারণ পিঁপড়ে কামড়াবে যে। এটা ঠিকই যে, আগে লাল পিঁপড়ের কামড় আমি খেয়েছি, কিন্তু কিছুদিন থেকে দেখছি ওরা আর আমাকে কামড়ায় না। তাই বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসে পিঁপড়ে দেখছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখি ছিকু আসছে।

ছিকুর কথা আগে বলিনি। ওর ভাল নাম শ্রীকুমার। আমাদের ক্লাসেই পড়ে, কিন্তু আমাদের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বড়, কারণ ওর গোঁফদাড়ি বেরিয়ে গেছে। ছিকু খালি সর্দারি করে, তাই ওকে কেউ ভালবাসে না। আমিও না। কিন্তু তাই বলে আমি কখনও ওর সঙ্গে লাগতে যাই না, কারণ জানি যে ওর গায়ে খুব জোর।

ছিকু আমায় দেখতে পেয়ে বলল, 'এই ক্যাবলা, ওখানে ওত পেতে বসে কী হচ্ছে?'

আমি ছিকুর কথায় কান দিইনি, কিন্তু ও দেখলাম আমার দিকেই এগিয়ে আসছে।

আমি পিঁপড়েগুলোর দিকে দেখতে লাগলাম। ছিকু আমার কাছে এসে আবার বলল, 'কী, হচ্ছে কী? হাবভাব দেখে সুবিধের লাগছে না তো!'

আমি আর লুকোবার চেষ্টা না করে সত্যি কথাটাই বলে দিলাম।

ছিকু শুনে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'পিঁপড়ে দেখছিস মানে? ওর মধ্যে আবার দেখবার কী আছে? আর পিঁপড়ে কি তোর নিজের বাড়িতে নেই যে, এখানে আসতে হবে?'

আমার ভারী রাগ হল। আমি যাই করি না কেন, তোর তাতে কী রে বাপু? সবটাতে নাক গলানো আর সর্দারি!

আমি বললাম, 'আমার দেখতে ভাল লাগে তাই দেখছি। পিঁপড়ের ব্যাপার তুমি বুঝবে না। তোমার নিজের যা ভাল লাগে তাই করো না গিয়ে। এখানে জ্বালাতে এলে কেন?'

ছিকু আমার কথা শুনে বেড়ালের মতো ফ্যাঁশ করে উঠে বলল, 'ও, দেখতে ভাল লাগে? পিঁপড়ে দেখতে ভাল লাগে? তবে দ্যাখ, দ্যাখ, দ্যাখ!'—এই বলতে বলতে আমি কিছু করবার আগেই ছিকু তিন লাথিতে পিঁপড়ের ঢিবিটা একেবারে থ্যাবড়া করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল। আর সেইসঙ্গে বোধহয় কম করে পাঁচশো পিঁপড়ে থেঁতলে-ভেঁতলে মরে-টরে একাকার হয়ে গেল।

লাথি মেরেই ছিকু হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় আমার মাথার মধ্যে হঠাৎ কী জানি একটা হয়ে গেল।

আমি একলাফে ছিকুর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চুলের মুঠি ধরে তার মাথাটা দুমদুম করে চার-পাঁচবার ঝণ্টুদের পাঁচিলে ঠুকে দিলাম।

তারপর ছিকুকে ছেড়ে দিতে সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে চলে গেল।

আমি নিজে যখন বাড়ি ফিরলাম, তার আগেই ছিকু এসে নালিশ করে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, মা আমাকে প্রথমটা মারেনওনি, বকেনওনি। আসলে বোধহয় মা বিশ্বাসই করেননি, কারণ আমি তো এর আগে কারুর গায়ে কখনও হাত তুলিনি। তা ছাড়া মা জানতেন যে আমি ছিকুকে ভয় পাই।

কিন্তু মা যখন আমায় ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলেন তখন আমি মিথ্যে কথা বলতে পারলাম না।

মা তো শুনে অবাক! বললেন, 'বলিস কী! তুই সত্যিই ছিকুর মাথা ফাটিয়ে দিইচিস?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, দিয়েছি। শুধু ছিকু কেন? যে পিঁপড়ের বাসা ভাঙবে, তারই মাথা ফাটিয়ে দেব।'

এটা শুনে মা সত্যিই ভীষণ রেগে আমায় অনেকগুলো কিলচড় মেরে ঘরে দরজা বন্ধ করে রেখে দিলেন।

সেদিন শনিবার ছিল। বাবা তাড়াতাড়ি কোর্ট থেকে ফিরলেন। ফিরে মা-র কাছে সব শুনেটুনে আমার ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা-চাবি দিয়ে দিলেন।

আমার কিন্তু মার-টার খাওয়ার জন্য পিঠে একটু ব্যথা করলেও, মনে কোনও দুঃখ ছিল না। আমার কেবল দুঃখ হচ্ছিল ওই পিঁপড়েগুলোর জন্য। সেবার পরিমলদিদের সাহেবগঞ্জের কাছে দুটো রেলগাড়িতে ভীষণ কলিশন লেগে শুনেছিলাম প্রায় তিনশো লোক মরে গিয়েছিল! আর আজ ছিকুর তিন লাথিতেই এত পিঁপড়ে মরে গেল?

কী অন্যায়, কী অন্যায়, কী অন্যায়!...

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে মাথাটা কেমন ঝিমঝিম, আর গাটা শীত-শীত করতে লাগত। আমি চাদরটা টেনে মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

খুব সরু, মিহি একটা শব্দ—ভারী সুন্দর, কতকটা গানের মতো, তালে তালে উঠছে আর নামছে।

আমি এদিক-ওদিক কান পেতেও বুঝতে পারলাম না শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে। খুব দূরে কোথাও গান-টান হচ্ছে বোধহয়। কিন্তু এরকম গান তো এর আগে কখনও শুনিনি!

এই দেখো, গান শুনতে শুনতে কখন যে এর মধ্যে নর্দমা দিয়ে ইনি এসে হাজির হয়েছেন তা তো টেরই পাইনি!

এবার ঠিক চিনলাম এ আমার সেই চেনা পিঁপড়ে—যাকে জল থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আমার দিকে চেয়ে সামনের দুটো পা মাথায় ঠেকিয়ে নমস্কার করছে! কী নাম দেওয়া যায় এর? কালী? কেষ্ট? কালাচাঁদ? ভেবে দেখতে হবে। বন্ধু অথচ নাম নেই, সে কী করে হয়!

আমি আমার হাতের তেলোটা চিত করে জানলার উপর রাখলাম। পিঁপড়েটা সামনের পা দুটো মাথা থেকে নামিয়ে আস্তে আস্তে আমার হাতের দিকে এগিয়ে এল। তারপর আমার কড়ে আঙুল বেয়ে হাতের উপর উঠে আমার তেলোর হিজিবিজি মাপের নদীর মতো লাইনগুলোর উপর চলেফিরে বেড়াতে লাগল।

এমন সময় দরজায় হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হওয়াতে আমি চমকে উঠলাম, আর পিঁপড়েটাও হুড়মুড়িয়ে হাত থেকে নেমে নর্দমার ভিতর চলে গেল।

তারপর মা দরজার চাবি খুলে ঘরে এসে আমায় একবাটি দুধ খেতে দিলেন, আর আমার চোখ দেখে আর কপালে হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন যে জ্বর এসেছে।

পরদিন সকালে ডাক্তারবাবু এলেন। মা বললেন, 'সদু সারারাত ছটফট করেছে আর "কালী" "কালী" বলেছে।' মা বোধহয় ভাবলেন যে আমি ঠাকুরের নাম করছিলাম! মা তো আর আসল ব্যাপারটা জানতেন না।

ডাক্তারবাবু যখন আমার পিঠে স্টেথোস্কোপ লাগিয়েছেন তখন আমি আবার কালকের মতো মিহি গলায় গান শুনতে পেলাম। এবার কালকের চেয়ে জোরে, আর সুরটা বোধহয় একটু অন্যরকম। আর ঠিক মনে হল যেন জানলার দিক থেকেই গানটা আসছে। কিন্তু ডাক্তারবাবু চুপ করে থাকতে বলেছিলেন, তাই ঘুরে দেখতে পারলাম না।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন, আর আমিও আড়চোখে জানলার দিকে চেয়ে দেখি—ও বাবা, আজ আবার নতুন বন্ধু—ডেঁয়ো পিঁপড়ে! আর এ-ও দেখি নমস্কার করছে! সব পিঁপড়েই কি তা হলে আমার বন্ধু?

আর গানটা কি তা হলে ওই পিঁপড়েটাই করছে নাকি?

কিন্তু মা তো গানের কথা কিছুই বলছেন না! তা হলে কি উনি শুনতে পাচ্ছেন না?

আমি জিজ্ঞেস করব ভেবে মা-র দিকে ফিরতেই দেখি উনি চোখ বড় বড় করে জানলার দিকে চেয়ে আছেন। তারপর হঠাৎ টেবিল থেকে আমার অঙ্কের খাতাটা টেনে নিয়ে আমার উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে খাতাটা দিয়ে এক চাপড় মেরে পিঁপড়েটাকে মেরে ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে গানটাও থেমে গেল।

মা মুখে বললেন, 'বাব্বাঃ—কী উপদ্রবই হয়েছে পিঁপড়ের। বালিশ বেয়ে উঠে কানের মধ্যে ঢুকে কামড় দিলেই হবে চিত্তির।'

ডাক্তারবাবু একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে চলে যাবার পর আমি খুন-হওয়া পিঁপড়েটার দিকে চাইলাম। আর এমন সুন্দর গানটা গাইতে গাইতে সে মরে গেল? এ যেন ঠিক আমার সেই ইন্দ্রনাথ দাদুর মতো। উনিও খুব ভাল গান গাইতেন। অবিশ্যি আমরা বেশি বুঝতাম না, তবে বড়রা বলত যে খুব ভাল ওস্তাদি গান। উনিও ঠিক এইভাবেই একদিন তানপুরা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ মরে গেলেন। তাঁকে যখন শ্মশানঘাটে নিয়ে যায় তখন শহর থেকে আনা কীর্তনের দল হরিনাম গাইতে গাইতে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। আমি দেখেছিলাম, আর আমার এখনও মনে আছে, যদিও আমি তখন খুব ছোট।

আর আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। ইঞ্জেকশন নিয়ে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম যে একটা বিরাট পিঁপড়ের দল মরা পিঁপড়েটাকে ঠিক ইন্দ্রনাথ দাদুর মতো করে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। দশ-বারোটা পিঁপড়ে তাকে কাঁধে নিয়েছে আর বাকি পিঁপড়েগুলো পিছনে সারিবেঁধে ঠিক কীর্তনের মতো গান গাইতে গাইতে চলেছে।

বিকেলে মা কপালে হাত দিতেই ঘুমটা ভেঙে গেল।

জানলার দিকে চেয়ে দেখলাম যে, মরা পিঁপড়েটা আর সেখানে নেই।

সেবার জ্বরটা সহজে ছাড়ছিল না। ছাড়বে কী করে, দোষ তো এদেরই। বাড়ির সব লোক যে পিঁপড়ে মারতে আরম্ভ করেছিল। সারাদিন যদি ওরকম পিঁপড়ের চিৎকার শুনতে হয় তা হলে তো মনখারাপ হয়ে জ্বর বাড়বেই।

আবার আরেকটা মুশকিল। এরা যখন ওদিকে ভাঁড়ারঘরে কিংবা উঠোনে পিঁপড়ে মারত, আমার জানলায় তখন অন্য পিঁপড়ের দল এসে ভীষণ কান্নাকাটি করত। বেশ বুঝতাম যে এরা চাইছে তাদের হয়ে আমি একটু কিছু করি—হয় পিঁপড়ে মারা বন্ধ করি, না-হয় যারা মারছে তাদের শাসন করি—কিন্তু আমার যে অসুখ, তাই আমার গায়ে তেমন জোর ছিল না। আর থাকলেও বড়দের কি আর ছোটরা শাসন করতে পারে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন একটা ব্যবস্থা করতেই হল।

সেটা ঠিক কোনদিন তা আমার মনে নেই, খালি মনে আছে যে সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, আর ঘুম ভাঙতেই শুনতে পেলাম ফটিকের মা চেঁচিয়ে বলছে যে তার কানের ভিতর নাকি রাত্রিবেলা একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে ঢুকে কামড়ে দিয়েছে।

এটা শুনে অবিশ্যি আমার খুব হাসি পেয়েছিল, কিন্তু তার পরেই ঝাঁটাপেটার আওয়াজ আর চিৎকার শুনে বুঝলাম যে পিঁপড়ে মারা আরম্ভ হয়ে গেছে।

তারপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। হঠাৎ মিহি গলায় শুনতে পেলাম কারা যেন বলছে—'বাঁচাও! বাঁচাও! আমাদের বাঁচাও!' জানলার দিকে চেয়ে দেখি পিঁপড়ের দল এসে গেছে আর ভীষণ ব্যস্তভাবে জানলার উপর ঘোরাফেরা করছে।

পিঁপড়ের মুখে এই কথা শুনতে পেয়ে আমি আর থাকতে পারলাম না। অসুখবিসুখ ভুলে গিয়ে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে গেলাম। প্রথমটা বুঝতে পারলাম না কী করব, তারপর

হাতের কাছে একটা কলসি দেখে সেটাকে আছাড় মেরে ভেঙে ফেললাম।

তারপর আর যা-কিছু ভাঙবার মতন ছিল সব ভাঙতে আরম্ভ করলাম।

ফন্দিটা ভালই এঁটেছিলাম, কারণ আমার কাণ্ড দেখে পিঁপড়ে মারা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই মা, বাবা, ছোটপিসিমা, সাবিদি যে যে-ঘরে ছিল সব হাঁ-হাঁ করে বেরিয়ে এসে আমায় জাপটে ধরে কোলপাঁজা করে তুলে এনে খাটের উপর ফেলে ঘরের দরজা আবার তালা-চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিল।

আমি মনে মনে খুব হাসলাম, আর আমার জানলার পিঁপড়েগুলো আনন্দে নাচতে নাচতে আর 'শাবাশ' 'শাবাশ' বলতে বলতে বাড়ি ফিরে গেল।

এর পরে আমি আর খুব বেশিদিন বাড়িতে ছিলাম না, কারণ একদিন ডাক্তারবাবু এসে দেখে-টেখে বললেন যে বাড়িতে আমার চিকিৎসার সুবিধা হবে না, তাই আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।

আমি এখন যেখানে আছি সেটা একটা হাসপাতালের ঘর। চারদিন হল আমি এখানে এসেছি।

প্রথম দিন আমার ঘরটা খুবই খারাপ লেগেছিল, কারণ এত পরিষ্কার ঘর যে দেখলেই মনে হয় এখানে পিঁপড়ে থাকতেই পারে না। নতুন ঘর কিনা, তা ফাটল-টাটল কিছু নেই। একটা বড় আলমারিও নেই যার তলায় বা পিছনে পিঁপড়ে থাকবে। নর্দমা একটা আছে বটে, কিন্তু সেটাও ভীষণ পরিষ্কার। তবে হ্যাঁ, ঘরে একটা জানলা আছে আর জানলার ঠিক বাইরেই একটা আমগাছের মাথা, আর তার একটা ডাল জানলার বেশ কাছে এসে পড়েছে।

বুঝলাম, পিঁপড়ে যদি থাকে তো ওই ডালেই থাকবে।

কিন্তু প্রথম দিন জানলার কাছে যাওয়াই হল না। কী করে যাব? সারাদিন ধরেই হয় ডাক্তার, না-হয় নার্স, না-হয় বাড়ির কোনও লোক আমার ঘরের মধ্যে ঘুরঘুর করছে।

দ্বিতীয় দিনেও একই ব্যাপার।

মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। একটা ওষুধের বোতল তো ছুড়ে ভেঙেই ফেললাম, আর তাতে নতুন ডাক্তারবাবু বেশ চটে গেলেন। এ ডাক্তারবাবু যে বেশি ভাল লোক না, সে তাঁর গোঁফ আর চশমাটা দেখেই বুঝতে পারা যায়।

তিনদিনের দিন একটা ব্যাপার হল।

তখন ঘরে আর কেউ ছিল না, খালি একজন নার্স কোনার চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিল। আমি চুপচাপ শুয়ে কী যে করব তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না। এমন সময় একটা ধমকের আওয়াজ পেয়ে নার্সের দিকে চেয়ে দেখি ওর হাত থেকে বইটা কোলে পড়ে গেছে, আর ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি তাই না দেখে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে জানলার দিকে গেলাম।

তারপর জানলার নীচের দিকের খড়খড়িতে পা দিয়ে উঠে খানিকটা উঁচু হয়ে শরীরটা যতখানি পারি জানলা দিয়ে বার করে হাত বাড়িয়ে আমগাছের ডালটা ধরে টানতে লাগলাম। এমন সময় আমার ডান পা-টা খড়খড়ি থেকে হড়কে গিয়ে একটা খট করে আওয়াজ হল, আর সেই আওয়াজ শুনেই নার্সটার ঘুম ভেঙে গেল।

আর যায় কোথা!

একটা বিকট চিৎকার দিয়ে নার্সটা ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে টেনে হিঁচড়ে বিছানায় নিয়ে ফেলল। আর সেইসঙ্গে আরও অন্য লোকও এসে পড়ল, তাই আমিও আর কিচ্ছু করতে পারলাম না।

ডাক্তারবাবু চটপট আমাকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলেন।

আমি ওদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম যে ওরা ভেবেছিল আমি বুঝি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে গিয়েছিলাম। কী বোকা ওরা! অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়লে তো মানুষ হাত-পা ভেঙে মরেই যাবে।

ডাক্তারবাবু চলে গেলে পর আমার ঘুম পেতে লাগল, আর বাড়ির জানলাটার কথা মনে করে ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। কবে যে আবার বাড়ি ফিরে যাব কে জানে!

ভাবতে ভাবতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি এমন সময় মিহি গলায় শুনলাম, 'সিপাহি হাজির হুজুর! সিপাহি হাজির!'

চোখ খুলে দেখি আমার খাটের পাশের টেবিলের সাদা চাদরে, ওষুধের বোতলটার ঠিক পাশে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো লাল কাঠপিঁপড়ে।

নিশ্চয়ই গাছ থেকেই আমার হাতে উঠে এসেছিল ওরা—আর আমি টেরই পাইনি।

আমি বললাম, 'সেপাই?'

জবাব এল, 'হাঁ, হুজুর।'

বললাম, 'কী নাম তোমাদের?'

একজন বলল, লালবাহাদুর সিং। আর একজন বলল, লালচাঁদ পাঁড়ে।

আমি তো মহা খুশি। কিন্তু তাও ওদের দু'জনকে সাবধান করে দিলাম যে ওরা যেন বাইরের লোক এলে একটু লুকিয়ে-টুকিয়ে থাকে, তা না হলে মারা পড়তে পারে। লালচাঁদ আর লালবাহাদুর মস্ত সেলাম ঠুকে বলল, 'বহুত আচ্ছা, হুজুর!'

তারপর ওরা দু'জনে মিলে একটা চমৎকার গান আরম্ভ করে দিল। আর আমিও সেই গানটা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এবার তাড়াতাড়ি কালকের ঘটনাটা বলে নিই, কারণ ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল; ডাক্তারবাবুর আসার সময় হয়ে গেছে।

কাল হয়েছে কী, বিকেলের দিকে শুয়ে শুয়ে লালবাহাদুর আর লালচাঁদের কুস্তি দেখছি—আমি বিছানায়, আর ওরা টেবিলে। দুপুরবেলা আমার ঘুমোবার কথা, কিন্তু কাল ওষুধ খেয়ে আর ইঞ্জেকশন নিয়েও ঘুম আসেনি। কিংবা এও বলতে পারি যে, ঘুম আমিই ইচ্ছে করেই আনিনি। দুপুরবেলা ঘুমোলে

আর আমার পিঁপড়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করব কখন!

কুস্তি খুব জোর চলছিল, কে যে জিতবে তা বোঝা যাচ্ছিল না, এমন সময় হঠাৎ খটখট করে জুতোর আওয়াজ পেলাম। এই রে, ডাক্তারবাবু আসছেন!

আমি বন্ধুদের দিকে ইশারা করতেই লালবাহাদুর চট করে টেবিলের নীচে চলে গেল।

কিন্তু লালচাঁদ বেচারা কুস্তি করতে করতে চিৎ হয়ে পড়ে হাত-পা ছুড়ছিল। তাই সে অত তাড়াতাড়ি পালাতে পারল না। আর তার জন্য একটা বিশ্রি কাণ্ড হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু এসে টেবিলের উপর লালচাঁদকে দেখে ইংরেজিতে কী একটা রাগী কথা বলেই হাত দিয়ে এক ঝাপটা দিয়ে ওকে টেবিল থেকে মাটিতে ফেলে দিলেন।

লালচাঁদ যে ভীষণ জখম হল সে আমি ওর চিৎকার শুনেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি আর কী করব? ডাক্তারবাবু ততক্ষণে নাড়ি দেখবেন বলে আমার হাত ধরে নিয়েছেন। একবার হাত ঠেলে উঠতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাই দেখে আবার নার্স অন্যদিক থেকে এসে আমায় চেপে ধরল।

পরীক্ষা শেষ হলে ডাক্তারবাবু রোজকার মতো আজও গোমড়া মুখ করে গোঁফের পাশটা চুলকোতে চুলকোতে দরজার দিকে ফিরেছেন, এমন সময় হঠাৎ কী কারণে যেন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে মুখ দিয়ে তিন-চার রকম বাংলা-ইংরেজি মেশানো বিশ্রি শব্দ করলেন—ঈঃ! উ! আউচ!'

তারপর সে এক কাণ্ড! স্টেথোস্কোপ ছিটকে গেল, চশমা পড়ে ভেঙে গেল, কোট খুলতে গিয়ে বোতাম ছিঁড়ল, টাই খুলতে গিয়ে গলায় ফাঁস লেগে বিষম লাগল, শেষকালে শার্ট খোলায় গেঞ্জির ফুটো অবধি বেরিয়ে পড়ল—তবু ডাক্তারবাবুর লাফানি আর চেঁচানি থামল না। আমি অবাক!

নার্স বলল, 'কী হয়েছে, স্যার?'

ডাক্তার লাফাতে লাফাতে বললেন, 'অ্যান্ট! রেড অ্যান্ট! আস্তিন বেয়ে—উঃ! উঃ!'

হুঁ হুঁ বাবা। আমি কি আর বুঝতে পারিনি? এখন বোঝো ঠেলা! আস্তিন বেয়ে উঠছে লালবাহাদুর সিং—বন্ধুর হয়ে প্রতিশোধ নিতে!

তখন যদি এরা আমায় দেখত, তা হলে আর বলত না যে, সদানন্দ হাসতে জানে না।

সন্দেশ, আশ্বিন ১৩৬৯

অনাথবাবুর ভয়

অনাথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ট্রেনের কামরায়। আমি যাচ্ছিলাম রঘুনাথপুর, হাওয়াবদলের জন্য। কলকাতায় খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি। গত ক'মাস ধরে কাজের চাপে দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তা ছাড়া আমার লেখার শখ, দু-একটা গল্পের প্লটও মাথায় ঘুরছিল, কিন্তু এত কাজের মধ্যে কি আর লেখার ফুরসত জোটে? তাই আর সাত-পাঁচ না ভেবে দশদিনের পাওয়া ছুটি আর দিস্তেখানেক কাগজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এত জায়গা থাকতে রঘুনাথপুর কেন তারও অবিশ্যি একটা কারণ আছে। ওখানে বিনা-খরচায় থাকার একটা ব্যবস্থা জুটে গেছে। আমার কলেজের সহপাঠী বীরেন বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে রঘুনাথপুরে। কফি হাউসে বসে, ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায়, এই আলোচনাপ্রসঙ্গে বীরেন খুব খুশি হয়ে ওর বাড়িটা অফার করে বলল, 'আমিও যেতুম, কিন্তু আমার এদিকে ঝামেলা, বুঝতেই তো পারছিস। তবে তোর কোনওই অসুবিধা হবে না। আমাদের পঞ্চাশ বছরের পুরনো চাকর ভরদ্বাজ রয়েছে ও বাড়িতে। ও-ই তোর দেখাশুনো করবে। তুই চলে যা।'

গাড়িতে যাত্রী ছিল অনেক। আমার বেঞ্চিতে আমারই পাশে বসে ছিলেন অনাথবন্ধু মিত্র। বেঁটেখাটো মানুষটি, বছর পঞ্চাশেক আন্দাজ বয়স। মাঝখানে টেরিকাটা কাঁচাপাকা চুল, চোখের চাহনি

তীক্ষ্ণ, আর ঠোঁটের কোণে এমন একটা ভাব যেন মনের আনাচে কানাচে সদাই কোনও মজার চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ করলাম; ভদ্রলোককে হঠাৎ দেখলে মনে হবে তিনি যেন পঞ্চাশ বছরের পুরনো কোনও নাটকের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সেজেগুজে তৈরি হয়ে এসেছেন। ওরকম কোট, ও ধরনের শার্টের কলার, ওই চশমা, আর বিশেষ করে ওই বুট জুতো—এসব আর আজকালকার দিনে কেউ পরে না।

অনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম তিনিও রঘুনাথপুর যাচ্ছেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কিংবা এও হতে পারে যে, ট্রেনের শব্দের জন্য তিনি আমার প্রশ্ন শুনতে পাননি।

বীরেনের পৈতৃক ভিটেটি দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল। বেশ বাড়ি। সামনে একফালি জমি—তাতে সবজি ও ফুলগাছ দুই-ই হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে অন্য কোনও বাড়িও নেই, কাজেই পড়শির উৎপাত থেকেও রক্ষা।

আমি আমার থাকার জন্য ভরদ্বাজের আপত্তি সত্ত্বেও ছাতের চিলেকোঠাটি বেছে নিলাম। আলো, বাতাস এবং নির্জনতা, তিনটেই অপর্যাপ্ত পাওয়া যাবে ওখানে। ঘর দখল করে জিনিসপত্র গোছাবার সময় দেখি আমার দাড়ি কামানোর খুর আনতে ভুলে গিয়েছি। ভরদ্বাজ শুনে বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে খোকাবাবু। এই তো কুণ্ডুবাবুর দোকান, পাঁচ মিনিটের পথ। সেখানে গেলেই পাবে'খন বিলেড।'

বিকেল চারটে নাগাদ চা-টা খেয়ে কুণ্ডুবাবুর দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি সেটি একটি ভাল আড্ডার জায়গা। দোকানের ভিতর দুটি বেঞ্চিতে বসে পাঁচ-সাতটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রীতিমতো গল্প জমিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিত ভাবে বলছেন, 'আরে বাপু, এ তো আর শোনা কথা নয়! এ আমার নিজের চোখে দেখা। আর তিরিশ বছর হয়ে গেল বলেই কি সব মন থেকে মুছে গেল? এসব স্মৃতি অত সহজে ভোলবার নয়, আর বিশেষ করে যখন হলধর দত্ত ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার মৃত্যুর জন্য আমি যে কিছু অংশে দায়ী, সে বিশ্বাস আমার আজও যায়নি।'

আমি এক প্যাকেট সেভন-ও-ক্লক কিনে আরও দু-একটা অবান্তর জিনিসের খোঁজ করতে লাগলাম। ভদ্রলোক বলে চললেন, 'ভেবে দেখুন, আমারই বন্ধু আমারই সঙ্গে মাত্র দশ টাকা বাজি ধরে রাত কাটাতে গেল ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটাতে। পরদিন ফেরে না, ফেরে না, ফেরে না—শেষটায় আমি, জিতেন বক্সি, হরিচরণ সা, আর আরও তিন-চারজন কে ছিল ঠিক মনে নেই—গেলুম হালদার-বাড়িতে হলধরের খোঁজ করতে। গিয়ে দেখি বাবু ওই ঘরের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে মরে কাঠ হয়ে আছে, তাঁর চোখ চাওয়া, দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে। আর সেই দৃষ্টিতে ভয়ের যে নমুনা দেখলুম, তাতে ভূত ছাড়া আর কী ভাবব বলুন? গায়ে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই, বাঘের আঁচড় নেই, সাপের ছোবল নেই, কিচ্ছু নেই। আপনারই বলুন এখন কী বলবেন।'

আরও মিনিট পাঁচেক দোকানে থেকে আলোচনার বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হল। ব্যাপারটা এই—রঘুনাথপুরের দক্ষিণপ্রান্তে হালদারবাড়ি বলে একটি দুশো বছরের পুরনো ভগ্নপ্রায় জমিদারি প্রাসাদ আছে। সেই প্রাসাদে—বিশেষ করে তার দোতলার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে—না কি অনেককালের পুরনো একটি ভূতের আনাগোনা আছে। অবশ্য সেই ত্রিশ বছর আগে ভবতোষ মজুমদারের বন্ধু হলধর দত্তের মৃত্যুর পর আজ অবধি নাকি কেউ সে বাড়িতে রাত কাটায়নি। কিন্তু তাও রঘুনাথপুরের বাসিন্দারা ভূতের অস্তিত্ব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে। আর বিশ্বাস করার কারণও আছে যথেষ্ট। একে তো হলধর দত্তের রহস্যজনক মৃত্যু, তার উপর এমনিতেই হালদারবংশের ইতিহাসে নাকি খুনখারাপি, আত্মহত্যা ইত্যাদির অনেক নজির পাওয়া যায়।

মনে মনে হালদারবাড়ি সম্পর্কে বেশ খানিকটা কৌতূহল নিয়ে দোকানের বাইরে এসেই দেখি আমার ট্রেনের আলাপি অনাথবন্ধু মিত্র মশাই হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে বললেন, 'শুনছিলেন ওদের কথাবার্তা?'

বললাম, 'তা কিছুটা শুনেছি।'

'বিশ্বাস হয়?'

'কী? ভূত?'

'হ্যাঁ?'

'ব্যাপার কী জানেন—ভূতের বাড়ির কথা তো অনেকেই শুনলাম, কিন্তু সেসব বাড়িতে থেকে নিজের চোখে ভূত দেখেছে এমন লোক তো কই আজ অবধি একটিও মিট করলাম না। তাই ঠিক—'

অনাথবাবু একটু হেসে বললেন, 'একবার দেখে আসবেন নাকি?'

'কী?'

'বাড়িটা।'

'দেখে আসব মানে—'

'বাইরে থেকে আর কি। বেশিদূর তো নয়। বড়জোর মাইলখানেক। এই রাস্তা দিয়ে সোজা গিয়ে জোড়াশিবের মন্দির ছাড়িয়ে ডানহাতি রাস্তায় ঘুরে পোয়াটাক পথ।'

ভদ্রলোককে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। আর তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে কী করব? তাই চললাম তাঁর সঙ্গে।

হালদারদের বাড়িটা দূর থেকে দেখা যায় না, কারণ বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল। তবে বাড়ির গেটের মাথাটা দেখা যেতে থাকে পৌঁছনোর প্রায় দশ মিনিট আগে থেকেই। বিরাট ফটক, মাথার উপর ভগ্নপ্রায় নহবতখানা । ফটকের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকদূর রাস্তা গিয়ে তবে সদর দালান। দু-তিনটে মূর্তি আর ফোয়ারার ভগ্নাবশেষ দেখে বুঝলাম যে বাড়ির আর ফটকের মাঝখানের এই জায়গাটা আগে বাগান ছিল। বাড়িটি অদ্ভুত। কারুকার্যের কোনও বাহার নেই তার কোনও জায়গায়। কেমন যেন একটা বেঢপ চৌকো-চৌকো ভাব। বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে তার শেওলাবৃত দেয়ালে।

মিনিটখানেক চেয়ে থাকার পর অনাথবাবু বললেন, 'আমি যতদূর জানি, রোদ থাকতে ভূত বেরোয় না।' তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, 'একবার চট করে সেই ঘরটা দেখে এলে হত না?'

'সেই উত্তর-পশ্চিমের ঘর? যে ঘরে—'

'হ্যাঁ। যে ঘরে হলধর দত্তের মৃত্যু হয়েছিল।'

ভদ্রলোকের তো এসব ব্যাপারে দেখছি একটু বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহ!

অনাথবাবু বোধহয় আমার মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরেই বললেন, 'খুব আশ্চর্য লাগছে, না? আসলে কী জানেন? আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই—আমার রঘুনাথপুর আসার একমাত্র কারণই হল ওই বাড়িটা।'

'বটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা যে ভূতের বাড়ি, আমি কলকাতায় থাকতে সে খবরটা পেয়ে ওই ভূতটিকে দেখব বলে এখানে এসেছি। আপনি সেদিন ট্রেনে আমার আসার কারণটা জানতে চাইলেন। আমি উত্তর না দিয়ে অভদ্রতা করলাম বটে, কিন্তু মনে মনে স্থির করেছিলাম যে, উপযুক্ত সময় এলে—অর্থাৎ আপনি কীরকম লোক সেটা আরেকটু জেনে নিয়ে, আসল কারণটা নিজে থেকেই বলব।'

'কিন্তু তাই বলে ভূতের পিছনে ধাওয়া করে একেবারে কলকাতা ছেড়ে—'

'বলছি, বলছি। ব্যস্ত হবেন না। আমার কাজটা সম্বন্ধেই তো বলা হয়নি এখনও আপনাকে। আসলে আমি ভূত সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। আজ পঁচিশ বছর ধরে এ ব্যাপার নিয়ে বিস্তর রিসার্চ করেছি। শুধু ভূত কেন—ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউল্ফ, ভুডুইজম ইত্যাদি যা কিছু আছে তার সম্বন্ধে বইয়ে যা লেখে তার প্রায় সবই পড়ে ফেলেছি। সাতটা ভাষা শিখতে হয়েছে এসব বই পড়ার জন্য। পরলোকতত্ত্ব নিয়ে লন্ডনের প্রফেসার নর্টনের সঙ্গে আজ তিন বছর ধরে চিঠি লেখালেখি করছি। আমার লেখা প্রবন্ধ বিলেতের সব নামকরা কাগজে বেরিয়েছে। আপনার কাছে বড়াই করে কী লাভ, তবে এটুকু বলতে পারি যে, এদেশে এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী লোক বোধহয় আর নেই।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে তিনি যে মিথ্যে বলছেন বা বাড়িয়ে বলছেন এটা আমার একবারও মনে হয়

না। বরং তাঁর সম্বন্ধে খুব সহজেই একটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল।

অনাথবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভারতবর্ষের অন্তত তিনশো ভূতের বাড়িতে আমি রাত কাটিয়েছি।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ। আর সেসব কীরকম জায়গায় জানেন? এই ধরুন—জব্বলপুর, কার্সিয়াং, চেরাপুঞ্জি, কাঁথি, কাটোয়া, যোধপুর, আজিমগঞ্জ, হাজারিবাগ, সিউড়ি, বারাসাত, আর কত চাই? ছাপ্পান্নোটা ডাকবাংলো আর কম করে ত্রিশটা নীলকুঠিতে আমি রাত্রিযাপন করেছি। এ ছাড়া কলকাতা এবং তার কাছাকাছির মধ্যে অন্তত পঞ্চাশখানা বাড়ি তো আছেই। কিন্তু—'

অনাথবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'ভূত আমায় ফাঁকি দিয়েছে। হয়তো, ভূতকে যারা চায় না, ভূত তাদের কাছেই আসে। আমি বারবার হতাশ হয়েছি। মাদ্রাজে ত্রিচিনপল্লীতে দেড়শো বছরের পুরনো একটা সাহেবদের পরিত্যক্ত ক্লাব-বাড়িতে ভূত একবার কাছাকাছি এসেছিল। কীরকম জানেন? অন্ধকার ঘর, একফোঁটা বাতাস নেই, যতবারই মোমবাতি ধরাব বলে দেশলাই জ্বালাচ্ছি, ততবারই কে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে। শেষটায় তেরোটা কাঠি নষ্ট করার পর বাতি জ্বলল, এবং আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ভূতবাবাজি সেই যে গেলেন আর এলেন না। একবার কলকাতার ঝামাপুকুরের এক হানাবাড়িতেও একটা ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমার মাথায় তো এত চুল দেখছেন? অথচ, এই বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে ভূতের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে মাঝরাত্তির নাগাদ হঠাৎ ব্রহ্মতালুর কাছটায় একটা মশার কামড় খেলাম। কী ব্যাপার? অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটি চুলও নেই! একেবারে মসৃণ মাথাজোড়া টাক! এ কি আমারই মাথা, না অন্য কারুর মাথায় হাত দিয়ে নিজের মাথা বলে মনে করেছি? কিন্তু মশার কামড়টা তো আমিই খেলাম। টর্চটা জ্বেলে আয়নায় দেখি টাকের কোনও চিহ্নমাত্র নেই। আমার যে-চুল সে-চুলই রয়েছে আমার মাথায়। ব্যস, এই দুটি ছাড়া আর কোনও ভুতুড়ে অভিজ্ঞতা এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হয়নি। তাই ভূত দেখার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলুম, এমন সময় একটা পুরনো বাঁধানো 'প্রবাসী'তে রঘুনাথপুরের এই বাড়িটার একটা উল্লেখ পেলাম। তাই ঠিক করলাম একটা শেষ চেষ্টা দিয়ে আসব।'

অনাথবাবুর কথা শুনতে শুনতে কখন যে বাড়ির সদর দরজায় এসে পড়েছি সে খেয়াল ছিল না। ভদ্রলোক তাঁর ট্যাঁকঘড়িটা দেখে বললেন, 'আজ পাঁচটা একত্রিশে সূর্যাস্ত। এখন সোয়া পাঁচটা। চলুন, রোদ থাকতে থাকতে একবার ঘরটা দেখে আসি।'

ভূতের নেশাটা বোধহয় সংক্রামক, কারণ আমি অনাথবাবুর প্রস্তাবে কোনও আপত্তি করলাম না। বরঞ্চ বাড়ির ভিতরটা, আর বিশেষ করে দোতলার ওই ঘরটা দেখবার জন্য বেশ একটা আগ্রহ হচ্ছিল।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি বিরাট উঠোন ও নাটমন্দির। একশো-দেড়শো বছরে কত উৎসব, কত অনুষ্ঠান, কত পূজা-পার্বণ, যাত্রা, কথকতা এইখানে হয়েছে, তার কোনও চিহ্ন আজ নেই।

উঠোনের তিনদিকে বারান্দা। আমাদের ডাইনে বারান্দার যে অংশ, তাতে একটি ভাঙা পালকি পড়ে আছে, এবং পালকিটি ছাড়িয়ে হাত দশেক গিয়েই দোতলায় যাবার সিঁড়ি।

সিঁড়িটা এমনই অন্ধকার যে, উঠবার সময় অনাথবাবুকে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটি টর্চ বার করে জ্বালাতে হল। প্রায়-অদৃশ্য মাকড়সার জালের ব্যূহ ভেদ করে কোনওরকমে দোতলায় পৌঁছনো গেল। মনে মনে বললাম, এ বাড়িতে ভূত থাকা অস্বাভাবিক নয়!

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিসাব করে দেখলাম বাঁ দিক দিয়ে সোজা চলে গেলে ওই যে ঘর, ওটাই হল উত্তর-পশ্চিমের ঘর। অনাথবাবু বললেন, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলুন এগোই।'

এখানে বলে রাখি, বারান্দায় কেবল একটি জিনিস ছিল—সেটি একটি ঘড়ি। যাকে বলে গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। কিন্তু তার অবস্থা খুবই শোচনীয়—কাচ নেই, বড় কাঁটাটিও উধাও, পেন্ডুলামটি ভেঙে কাত হয়ে পড়ে আছে।

উত্তর-পশ্চিমের ঘরের দরজাটি ভেজানো ছিল। অনাথবাবু যখন তাঁর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সন্তর্পণে ঠেলে দরজাটি খুলছিলেন, তখন বিনা কারণেই আমার গা-টা ছমছম করছিল।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করলাম না। দেখে মনে হয় এককালে বৈঠকখানা

ছিল। ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট টেবিল, তার কেবল পায়া চারখানাই রয়েছে, উপরের তক্তাটা নেই। টেবিলের পাশে জানলার দিকে একটি আরাম কেদারা। অবিশ্যি এখন আর সেটি আরামদায়ক হবে কিনা সন্দেহ, কারণ তার একটি হাতল ও বসবার জায়গায় বেতের খানিকটা অংশ লোপ পেয়েছে।

উপরের দিকে চেয়ে দেখি ছাত থেকে ঝুলছে একটি টানাপাখার ভগ্নাংশ। অর্থাৎ তার দড়ি নেই, কাঠের ডান্ডাটা ভাঙা এবং ঝালরের অর্ধেকটা ছেঁড়া।

এ ছাড়া ঘরে আছে একটি খাঁজকাটা বন্দুক রাখার তাক, একটি নলবিহীন গড়গড়া, আর দু'খানা সাধারণ হাতলভাঙা চেয়ার।

অনাথবাবু কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মনে হল খুব মনোযোগ দিয়ে কী একটা অনুভব করার চেষ্টা করলেন। প্রায় মিনিটখানেক পরে বললেন, 'একটা গন্ধ পাচ্ছেন?'

'কী গন্ধ?'

'মাদ্রাজি ধূপ, মাছের তেল, আর মড়াপোড়ার গন্ধ মেশানো একটা গন্ধ?'

আমি বার দু-এক বেশ জোরে জোরে শ্বাস টানলাম। অনেকদিনের বন্ধ ঘর খুললে যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়, সে গন্ধ ছাড়া আর কোনও গন্ধই পেলাম না। তাই বললাম, 'কই, ঠিক বুঝতে পারছি না তো।'

অনাথবাবু আরও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি মেরে বললেন, 'বহুত আচ্ছা! এ গন্ধ আমার চেনা গন্ধ। এ বাড়িতে ভূত অবশ্যম্ভাবী। তবে বাবাজি দেখা দেবেন কি না দেবেন সেটা কাল রাত্রের আগে বোঝা যাবে না। চলুন।'

অনাথবাবু স্থির করে ফেললেন যে, পরদিনই তাঁকে এ ঘরে রাত্রিবাস করতে হবে। ফেরার পথে বললেন, 'আজ থাকলুম না কারণ কাল অমাবস্যা—ভূতের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত তিথি। তা ছাড়া দু-একটি জিনিস সঙ্গে রাখা দরকার। সেগুলো বাড়িতে রয়ে গেছে, কাল নিয়ে আসব। আজ সার্ভেটা করে গেলুম আর কি।'

ভদ্রলোক আমায় বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, 'আর কাউকে আমার এই প্ল্যানের কথা বলবেন না যেন। এদের কথাবার্তা তো শুনলুম আজকে—যা ভয় আর যা প্রেজুডিস এদের, জানলে পরে হয়তো বাধাটাধা দিয়ে আমার প্ল্যানটাই ভেস্তে দেবে। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে বললুম না বলে কিছু মনে করবেন না। এসব ব্যাপার, বুঝলেন কিনা, একা না হলে ঠিক জুতসই হয় না।'

পরদিন দুপুরে কাগজকলম নিয়ে বসলেও লেখা খুব বেশিদূর এগোলো না। মন পড়ে রয়েছে হালদারবাড়ির ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটায়। আর রাত্রে অনাথবাবুর কী অভিজ্ঞতা হবে সেই নিয়ে একটা অশান্তি আর উদ্বেগ রয়েছে মনের মধ্যে।

বিকেলে অনাথবাবুকে হালদারবাড়ির ফটক অবধি পৌঁছে দিলাম। ভদ্রলোকের গায়ে আজ একটা কালো গলাবন্ধ কোট, কাঁধে জলের ফ্লাস্ক আর হাতে সেই কালকের তিন সেলের টর্চ। ফটক দিয়ে ঢুকবার আগে কোটের দু' পকেটে দু' হাত ঢুকিয়ে দুটো বোতল বার করে আমায় দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন—এটিতে রয়েছে আমার নিজের ফরমুলায় তৈরি তেল—শরীরের অনাবৃত অংশে মেখে নিলে আর মশা কামড়াবে না। আর এই দ্বিতীয়টিতে হল কারবলিক অ্যাসিড, ঘরের আশেপাশে ছড়িয়ে দিলে সাপের উৎপাত থেকে নিশ্চিন্ত।' এই বলে বোতল দুটো পকেটে পুরে, টর্চটা মাথায় ঠেকিয়ে আমায় একটা সেলাম ঠুকে ভদ্রলোক বুটজুতো খটখটিয়ে হালদারবাড়ির দিকে চলে গেলেন।

রাত্রে ভাল ঘুম হল না।

ভোর হতে না হতে ভরদ্বাজকে বললাম আমার থার্মস ফ্লাস্কে দু'জনের মতো চা ভরে দিতে। চা এলে পর ফ্লাস্কটি নিয়ে আবার হালদারবাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

হালদারবাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছে দেখি চারিদিকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। অনাথবাবুর নাম ধরে ডাকব, না সটান দোতলায় যাব তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম—'ও মশাই, এই যে এদিকে।'

এবার দেখতে পেলাম অনাথবাবুকে—প্রাসাদের পুবদিকের জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে হেঁটে আসছেন। তাঁকে দেখে মোটেই মনে হয় না যে, রাত্রে তাঁর কোনও ভয়াবহ বা অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আমার কাছে এসে হাসতে হাসতে হাতে একটা নিমের ডাল দেখিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না মশাই! আধঘণ্টা বনেবাদাড়ে ঘুরছি এই নিমডালের খোঁজে। আমার আবার দাঁতনের অভ্যেস কিনা।'

ফস করে রাত্রের কথাটা জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকল। বললাম, 'চা এনেছি। এখানেই খাবেন, না বাড়ি যাবেন?'

'চলুন না, ওই ফোয়ারার পাশটায় বসে খাওয়া যাক।'

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তিসূচক 'আঃ' শব্দ করে আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে অনাথবাবু বললেন, 'খুব কৌতূহল হচ্ছে, না?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে, তা একটু—'

'বেশ। তবে বলছি শুনুন। গোড়াতেই বলে রাখি—এক্সপিডিশন হাইলি সাকসেসফুল। আমার এখানে আসা সার্থক হয়েছে।' অনাথবাবু এক মগ চা শেষ করে দ্বিতীয় মগ ঢেলে তাঁর কথা শুরু

করলেন :

'আপনি যখন আমায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন তখন পাঁচটা। আমি বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে এই আশপাশটা একটু সার্ভে করে নিলুম। অনেক সময় ভূতের চেয়ে জ্যান্ত মানুষ বা জানোয়ার থেকে উপদ্রবের আশঙ্কা বেশি থাকে। যাই হোক, দেখলুম কাছাকাছির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু নেই।

'বাড়িতে ঢুকে একতলার ঘরগুলোর মধ্যে যেগুলো খোলা হয়েছে সেগুলোও একবার দেখে নিলুম। জিনিসপত্তর তো আর অ্যাদ্দিন ধরে বিশেষ পড়ে থাকার কথা নয়। একটা ঘরে কিছু আবর্জনা, আর আরেকটার কড়িকাঠে গুটি চারেক ঝুলন্ত বাদুড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। বাদুড়গুলো আমায় দেখেও নড়ল না। আমিও তাদের ডিসটার্ব করলুম না।

'সাড়ে ছ'টা নাগাদ দোতলার ওই আসল ঘরটিতে ঢুকে রাত কাটানোর আয়োজন শুরু করলুম। একটা ঝাড়ন এনেছিলুম, তাই দিয়ে প্রথমে আরাম-কেদারাটিকে ঝেড়েপুঁছে সাফ করলুম। কদ্দিনের ধুলো জমেছিল তাতে কে জানে?

'ঘরের মধ্যে একটা গুমোট ভাব ছিল, তাই জানলাটা খুলে দিলুম। ভূতবাবাজি যদি সশরীরে আসতে চান তাই বারান্দার দরজাটাও খোলা রাখলুম। তারপর টর্চ ও ফ্লাস্কটা মেঝেতে রেখে ওই বেতছেঁড়া আরাম-কেদারাতেই শুয়ে পড়লুম। অসোয়াস্তি হচ্ছিল বেশ, কিন্তু এর চেয়েও আরও অনেক বেয়াড়া অবস্থায় বহুবার রাত কাটিয়েছি, তাই কিছু মাইন্ড করলুম না।

'আশ্বিন মাস, সাড়ে পাঁচটায় সূর্য ডুবেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা বেশ জমাট বেঁধে উঠল। আর সেইসঙ্গে সেই গন্ধটাও ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি এমনিতে খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, সহজে বড় একটা এক্সাইটেড হই না, কিন্তু কাল যেন ভিতরে ভিতরে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলুম।

'সময়টা ঠিক বলতে পারি না, তবে আন্দাজে মনে হয় ন'টা কি সাড়ে ন'টা নাগাদ জানলা দিয়ে একটা জোনাকি ঘরে ঢুকেছিল। সেটা মিনিটখানেক ঘোরাঘুরি করে আবার জানলা দিয়েই বেরিয়ে গেল।

'তারপর কখন যে শেয়াল, ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে, আর কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়াল নেই।

'ঘুমটা ভাঙল একটা শব্দে। ঘড়ির শব্দ। ঢং ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। মিঠে অথচ বেশ জোর আওয়াজ। জাত ঘড়ির আওয়াজ, আর সেটা আসছে বাইরের বারান্দা থেকে।

'কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমটা ছুটে গিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে আরও দুটো জিনিস লক্ষ করলুম। এক—আমি আরাম-কেদারায় সত্যিই খুব আরামে শুয়ে আছি। ছেঁড়াটা তো নেইই, বরং উলটে আমার পিঠের তলায় কে যেন একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে গেছে। আর দুই—আমার মাথার উপর একটি চমৎকার ঝালর সমেত আস্ত নতুন টানাপাখা, তা থেকে একটি নতুন দড়ি দেয়ালের ফুটো দিয়ে বারান্দায় চলে গেছে, এবং কে জানি সে দড়িতে টান দিয়ে পাখাটি দুলিয়ে আমায় চমৎকার বাতাস করছে।

'আমি অবাক হয়ে এইসব দেখছি আর উপভোগ করছি, এমন সময় খেয়াল হল অমাবস্যার রাত্তিরে কী করে জানি ঘরটা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারপর নাকে এল একটা চমৎকার গন্ধ। পাশ ফিরে দেখি কে জানি একটা আলবোলা রেখে গেছে, আর তার থেকে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে একেবারে সেরা অম্বুরী তামাকের গন্ধ।'

অনাথবাবু একটু থামলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, 'বেশ মনোরম পরিবেশ নয় কি?'

আমি বললাম, 'শুনে তো ভালই লাগছে। আপনার রাতটা তা হলে মোটামুটি আরামেই কেটেছে?'

আমার প্রশ্ন শুনে অনাথবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বললাম, 'তা হলে কি সত্যি আপনার কোনও ভয়ের কারণ ঘটেনি? ভূত কি আপনি দেখেননি?'

অনাথবাবু আবার আমার দিকে চাইলেন। এবার কিন্তু আর ঠোঁটের কোণে সে হাসিটা নেই। ধরা গলায় ভদ্রলোকের প্রশ্ন এল, 'পরশু যখন আপনি ঘরটায় গেলেন, তখন কড়িকাঠের দিকটা ভাল করে লক্ষ করেছিলেন কি?'

আমি বললাম, 'তেমন ভাল করে দেখিনি বোধহয়। কেন বলুন তো?'

অনাথবাবু বললেন, 'ওখানে একটা বিশেষ ব্যাপার রয়েছে, সেটা না দেখলে বাকি ঘটনাটা বোঝাতে পারব না। চলুন।'

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনাথবাবু কেবল একটি কথা বললেন: 'আমার আর ভূতের পিছনে ধাওয়া করতে হবে না সীতেশবাবু। কোনওদিনও না। সে শখ মিটে গেছে।'

বারান্দা দিয়ে যাবার পথে ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম সেরকমই ভাঙা অবস্থা।

ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে অনাথবাবু বললেন, 'চলুন।'

দরজাটা ভেজানো ছিল। আমি হাত দিয়ে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। তারপর দু'পা এগিয়ে মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আমার সমস্ত শরীরে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল।

বুট জুতো পরা ও কে পড়ে আছে মেঝেতে?

আর বারান্দার দিক থেকে কার অট্টহাসি হালদারবাড়ির আনাচে-কানাচে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার রক্ত জল করে আমায় জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা সব লোপ পাইয়ে দিচ্ছে? তা হলে কি—?

আর কিছু মনে নেই আমার।

যখন জ্ঞান হল, দেখি ভরদ্বাজ আমার খাটের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমায় হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন ভবতোষ মজুমদার। আমার চোখ খুলতে দেখে ভবতোষবাবু বললেন, 'ভাগ্যে সিধুচরণ আপনাকে দেখেছিল ও বাড়িতে ঢুকতে, নইলে যে কী দশা হত আপনার জানি না। ওখানে গেসলেন কোন আক্কেলে?'

আমি বললাম, 'অনাথবাবু যে রাত্রে—'

ভবতোষবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আর অনাথবাবু! কাল যে অতগুলো কথা বললুম সে সব বোধহয় কিছুই বিশ্বাস করেননি ভদ্রলোক। ভাগ্যে আপনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাত কাটাতে যাননি ও বাড়িতে। দেখলেন তো ওঁর অবস্থা। হলধরের যা হয়েছিল, এঁরও ঠিক তাই। মরে একেবারে কাঠ, আর চোখ ঠিক সেইভাবে চাওয়া, সেই দৃষ্টি, সেই কড়িকাঠের দিকে।'...

আমি মনে মনে বললাম, না, মরে কাঠ নয়। মরে কী হয়েছেন অনাথবাবু তা আমি জানি। কালও সকালে গেলে দেখতে পাব তাঁকে—গায়ে কালো কোট, পায়ে বুট জুতো—হালদারবাড়ির পুব দিকের জঙ্গল থেকে নিমের দাঁতন হাতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন।

সন্দেশ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

দুই ম্যাজিশিয়ান

'পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো।'

সুরপতি ট্রাঙ্কগুলো গুনে নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট অনিলের দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক আছে। দাও, গাড়ি পাঠিয়ে দাও সব ব্রেকভ্যানে। আর মাত্র পঁচিশ মিনিট।'

অনিল বলল, 'আপনার গাড়িও ঠিক আছে স্যার। কুপে। দুটো বার্থই আপনার নামে নেওয়া আছে। কোনও অসুবিধে হবে না।' তারপর মুচকি হেসে বলল, 'গার্ডসাহেবও আপনার একজন ভক্ত। নিউ এম্পায়ারে দেখেছেন আপনার শো। এই যে স্যার—আসুন এদিকে।'

গার্ড বীরেন বক্সি মশাই একগাল হেসে এগিয়ে এসে তাঁর ডান হাতখানা সুরপতির দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'আসুন স্যার, যে-হাতের সাফাই দেখে এত আনন্দ পেইচি, সে-হাত একবারটি শেক করে নিজেকে কেতাত্থ করি!'

সুরপতি মণ্ডলের এগারোটি ট্রাঙ্কের যে-কোনও একটির দিকে চাইলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'Mondol's Miracles' কথাটা পরিষ্কার বড় বড় অক্ষরে লেখা প্রতিটি ট্রাঙ্কের পাশে এবং ঢাকনার উপর। এর বেশি আর পরিচয়ের দরকার নেই—কারণ ঠিক দু'মাস আগেই কলকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে মণ্ডলের জাদুবিদ্যার প্রমাণ পেয়ে দর্শক বারবার করধ্বনি করে তাদের বাহবা জানিয়েছে। খবরের কাগজেও প্রশংসা হয়েছে প্রচুর। এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম ভিড়ের ঠেলায় চলেছে চার সপ্তাহ। তাও যেন লোকের আশ মেটেনি। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধেই মণ্ডলকে কথা দিতে হয়েছে যে, বড়দিনের ছুটিতে আবার শো করবে সে।

'কোনও অসুবিধে-টসুবিধে হলে বলবেন স্যার।'

গার্ডসাহেব সুরপতিকে তাঁর কামরায় তুলে দিলেন। সুরপতি এদিকে ওদিকে দেখে নিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বেশ কামরা।

'আচ্ছা স্যার, তা হলে...'

'অনেক ধন্যবাদ!'

গার্ড চলে যাবার পর সুরপতি তার বেঞ্চের কোণে জানলার পাশটায় ঠেস দিয়ে বসে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করল। এই বোধহয় তার বিজয় অভিযানের শুরু। উত্তরপ্রদেশ : দিল্লি, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাশী, লক্ষ্ণৌ। এ যাত্রা এই ক'টিই—তারপর আরও কত প্রদেশ পড়ে আছে, কত নগর কত উপনগর। আর শুধু কি ভারতবর্ষই? তার বাইরেও যে জগৎ রয়েছে একটা—বিরাট বিস্তীর্ণ জগৎ। বাঙালি বলে কি আর অ্যাম্বিশন নেই? সুরপতি দেখিয়ে দেবে। এককালে যে-দেশের জাদুকর হুডিনির কথা পড়ে তার গায়ে কাঁটা দিত, সেই আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে তার খ্যাতি। বাংলার ছেলের দৌড় কতখানি, তা সে প্রমাণ করবে বিশ্বের লোকের কাছে। যাক না ক'টা বছর! এ তো সবে শুরু।

অনিল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, 'সব ঠিক আছে স্যার। এভরিথিং।'

'তালাগুলো চেক করে নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'গুড।'

'আমি দুটো বগি পরেই আছি।'

'লাইন ক্লিয়ার দিয়েছে?'

'এই দিল বলে! আমি চলি।...বর্ধমানে চা খাবেন কি?'

'হলে মন্দ হয় না।'

'আমি নিয়ে আসব'খন।'

অনিল চলে গেল। সুরপতি সিগারেটটা ধরিয়ে জানলার বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে কুলি যাত্রী ফেরিওয়ালার দু'মুখো কলমুখর স্রোত বয়ে চলেছে। সুরপতি সেদিকে দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। স্টেশনের কোলাহল মিলিয়ে এল। মনটা তার চলে গেল অনেক দূরে, অনেক পিছনে। এখন তার বয়স তেত্রিশ, তখন সাত কি আট। দিনাজপুর জেলার ছোট একটি গ্রাম—পাঁচপুকুর। শরতের এক শান্ত দুপুর। এক বুড়ি চটের থলি নিয়ে বসেছে বটতলায় মতি মুদির দোকানের ঠিক সামনে। তাকে ঘিরে ছেলেবুড়োর ভিড়। কত বয়স বুড়ির? ষাটও হতে পারে, নব্বুইও হতে পারে। তোবড়ানো গালে অজস্র হিজিবিজি বলিরেখা, হাসলেই সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। আর ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথার খই ফুটছে।

ভানুমতীর খেল!

ভানুমতীর খেল দেখিয়েছিল বুড়ি। সেই প্রথম আর সেই শেষ। কিন্তু যা দেখেছিল তা সুরপতি কোনওদিন ভোলেওনি, ভুলবেও না। তার নিজের ঠাকুরমার বয়সও তো পঁয়ষট্টি; ছুঁচে সুতো পরাতে গেলে সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপে। আর ওই বুড়ির কোঁকড়ানো হাতে এত জাদু! চোখের সামনে নাকের সামনে হাত-দু'হাতের মধ্যে জিনিসপত্তর সব ফুসমন্তরে উধাও করে দিচ্ছে, আবার পরক্ষণেই ফুসমন্তরে বার করে দিচ্ছে—টাকা, মার্বেল, লাট্টু, সুপরি, পেয়ারা! কালুকাকার কাছ থেকে একটা টাকা

নিয়ে বুড়ি ভ্যানিশ করে দিলে, তাতে কাকার কী রাগ আর তম্বি! তারপর খিলখিল হাসি হেসে বুড়ি যখন আবার সেটি বার করে ফেরত দিল, তখন কাকার চোখ ছানাবড়া।

সুরপতির বেশ কিছুদিন ভাল করে ঘুম হয়নি এই ম্যাজিক দেখে। আর তারপর যখন ঘুমিয়েছে তখনও নাকি মাস কয়েক ধরে মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে ম্যাজিক-ম্যাজিক বলে চেঁচিয়ে উঠেছে।

এর পরে গাঁয়ে যখনই মেলা-টেলা বসেছে, সুরপতি ম্যাজিক দেখার আশায় ধাওয়া করেছে সেখানে। কিন্তু তেমন অবাক-করা কিছুই আর চোখে পড়েনি।

ষোলো বছর বয়সে সুরপতি চলে আসে কলকাতার বিপ্রদাস স্ট্রিটে কাকার বাড়িতে থেকে ইন্টারমিডিয়েট পড়বে বলে। কলেজের বইয়ের সঙ্গে পড়া চলেছিল ম্যাজিকের বই। কলকাতায় আসার দু-এক মাসের মধ্যেই সুরপতি সেসব বই কিনে নিয়েছিল, আর কেনার কিছুদিনের মধ্যেই বইয়ের সব ম্যাজিকই তার শেখা হয়ে গিয়েছিল। তাসের প্যাকেট কিনতে হয়েছিল অনেকগুলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক অভ্যাস করতে হয়েছিল তাকে। কলেজের সরস্বতী পুজোয়, বন্ধুবান্ধবের জন্মদিন-টন্মদিনে সুরপতি এসব ম্যাজিক মাঝে মাঝে দেখাত।

সে যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, তখন তার বন্ধু গৌতমের বোনের বিয়েতে তার নেমন্তন্ন হয়। সুরপতির ম্যাজিক শেখার ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় দিন, কারণ এই বিয়েবাড়িতেই তার প্রথম দেখা হয় ত্রিপুরাবাবুর সঙ্গে। সুইনহো স্ট্রিটের বিরাট বিরাট বাড়ির পিছনের মাঠে শামিয়ানা পড়েছে; তারই এক কোণে একটা ফরাসে অতিথি-অভ্যাগত-পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন ত্রিপুরাচরণ মল্লিক। হঠাৎ দেখলে নেহাত নগণ্য লোক বলেই মনে হয়। বছর আটচল্লিশ বয়স, কোঁকড়ানো টেরিকাটা চুল, হাসি-হাসি মুখ, ঠোঁটের দু'কোণে পানের দাগ। রাস্তায় ঘাটে এরকম কত লোক দেখা যায় তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তার ঠিক সামনেই ফরাসের উপর যে কাণ্ডটা ঘটছে সেটা দেখলে লোকটির সম্বন্ধে মত পালটাতে হয়। সুরপতি প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারেনি। একটা রুপোর আধুলি গড়িয়ে গড়িয়ে তিন হাত দূরে রাখা একটি সোনার আংটির কাছে গেল, তারপর আংটিটাকে সঙ্গে নিয়ে

আবার গড়গড়িয়ে ত্রিপুরাবাবুর কাছেই ফিরে এল। সুরপতি এতই হতভম্ব যে, তার হাততালি দেবার সামর্থ্য নেই। এদিকে পরমুহূর্তেই আবার আরেক তাজ্জব জাদু। গৌতমের জ্যাঠামশাই ম্যাজিক দেখতে দেখতে চুরুট ধরাতে গিয়ে তাঁর দেশলাইয়ের কাঠি সব বাক্স থেকে মাটিতে ফেলে বসলেন। তাঁকে উপুড় হতে দেখে ত্রিপুরাবাবু বললেন, 'আপনি আর কষ্ট করে ওগুলো তুলছেন কেন স্যার? আমাকে দিন। আমি তুলে দিচ্ছি।'

তারপর কাঠিগুলো ফরাসের এক কোণে স্তূপ করে রেখে নিজের বাঁ হাতে বাক্সটা নিয়ে ত্রিপুরাবাবু ডাকতে লাগলেন—'আঃ তুতুতু আঃ আঃ আঃ...' আর কাঠিগুলো ঠিক পোষা বেড়াল-কুকুরের মতোই একে একে গুটি গুটি এসে বাক্সের ভিতর ঢুকে যেতে লাগল।

সেই রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর সুরপতি ভদ্রলোককে একটু একা পেয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে। সুরপতির ম্যাজিকে আগ্রহ দেখে ভদ্রলোক খুবই অবাক হন। বলেন, 'বাঙালিরা ম্যাজিক দেখেই খালাস, দেখাবার লোক তো কই বড় একটা দেখি না। তোমার এদিকে ইন্টারেস্ট দেখে আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি।'

এর দু'দিন পরেই সুরপতি ত্রিপুরাবাবুর বাড়ি যায়। বাড়ি বললে ভুল হবে। মির্জাপুর স্ট্রিটের একটি মেস-বাড়ির একটি জীর্ণ ছোট্ট ঘর। অভাব-অনটনের এমন স্পষ্ট চেহারা সুরপতি আর দেখেনি। ভদ্রলোক সুরপতিকে তাঁর জীবিকার কথা বলেছিলেন। পঞ্চাশ টাকা করে ম্যাজিক দেখানোর 'ফি' তাঁর। মাসে দুটো করে বায়না জোটে কিনা সন্দেহ। চেষ্টায় হয়তো আরও কিছুটা হতে পারত, কিন্তু সুরপতি বুঝেছিল ভদ্রলোকের সে চেষ্টাই নেই। এত গুণী লোকের এমন অ্যাম্বিশনের অভাব হতে পারে, সুরপতি তা ভাবতে পারেনি। এর উল্লেখ করাতে ভদ্রলোক বললেন, 'কী হবে? ভাল জিনিসের কদর করবে কেউ এ পোড়া দেশে? ক'টা লোক সত্যিকারের আর্ট বোঝে? খাঁটি আর মেকির তফাত ক'টা লোকে ধরতে পারে? সেদিন যে বিয়ের আসরে ম্যাজিকের তুমি এত তারিফ করলে, কই, আর তো কেউ করল না! যেই খবর এল পাত পড়েছে, সব সুড়সুড় করে চলে গেল ম্যাজিক ছেড়ে পেটপুজো করতে।'

সুরপতি কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে অনুষ্ঠানে ত্রিপুরাবাবুর ম্যাজিকের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। কিছুটা কৃতজ্ঞতা এবং বেশিটাই একটা স্বাভাবিক স্নেহবশত ত্রিপুরাবাবু সুরপতিকে তাঁর ম্যাজিক শেখাতে রাজি হয়েছিলেন। সুরপতি টাকার কথা তোলাতে তিনি তীব্র আপত্তি করেন। বলেন, 'তুমি ও-কথা তুলো না। আমার একজন উত্তরাধিকারী হল, এইটেই বড় কথা। তোমার যখন এত শখ, এত উৎসাহ, তখন আমি শেখাব। তবে তাড়াহুড়ো কোরো না। এটা একটা সাধনা। তাড়াহুড়োয় কিচ্ছু হবে না। ভাল করে শিখে নিলে একটা সৃষ্টির আনন্দ পাবে। খুব বেশি টাকা বা খ্যাতির আশা কোরো না। অবিশ্যি আমার দুর্দশা তোমার কোনওদিনই হবে না, কারণ তোমার মধ্যে অ্যাম্বিশন আছে, আমার নেই...'

সুরপতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সব ম্যাজিক শেখাবেন তো? ওই আধুলি আর আংটির ম্যাজিকটাও শেখাবেন তো?'

ত্রিপুরাবাবু হেসে বলেছিলেন, 'ধাপে ধাপে উঠতে হবে। ব্যস্ত হোয়ো না। লেগে থাকো। সাধনা চাই। এসব পুরাকালের জিনিস। মানুষের মনে যখন সত্যিকারের জোর ছিল, একাগ্রতা ছিল, তখন উদ্ভব হয় এসব ম্যাজিকের। আজকের মানুষের পক্ষে মনকে সে-স্তরে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়! আমায় কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে জানো?'

ত্রিপুরাবাবুর কাছে যখন প্রায় ছ' মাস তালিম নেওয়া হয়ে গেছে সেই সময় একটা ব্যাপার ঘটে।

একদিন কলেজ যাবার পথে সুরপতি চৌরঙ্গির দিকে লক্ষ করল, চারিদিকে দেয়ালে, ল্যাম্পপোস্টে আর বাড়ির গায়ে রঙিন বিজ্ঞাপন পড়েছে—'শেফাল্লো দি গ্রেট।' কাছে গিয়ে বিজ্ঞাপন পড়ে সুরপতি বুঝল শেফাল্লো একজন বিখ্যাত ইতালীয় জাদুকর—কলকাতায় আসছেন তাঁর খেলা দেখাতে। সঙ্গে আসছেন সহজাদুকরী মাদাম প্যালার্মো।

নিউ এম্পায়ারেই এক টাকার গ্যালারিতে বসে শেফাল্লোর ম্যাজিক দেখেছিল সুরপতি। আশ্চর্য

চোখ-ধাঁধানো মন-বাঁধানো ম্যাজিক সব। এতদিন এসব ম্যাজিকের কথা সুরপতি কেবল বইয়ে পড়েছে। চোখের সামনে গোটা গোটা মানুষ ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার আলাদিনের প্রদীপের ভেলকির মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। একটি মেয়েকে কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরে বাক্সটাকে করাত দিয়ে কেটে আধখানা করে দিলেন শেফাল্লো, আবার পাঁচ মিনিট পরেই মেয়েটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল অন্য আরেকটা বাক্সের ভিতর থেকে—তার গায়ে একটি আঁচড়ও নেই। সুরপতির হাতের তেলো সেদিন লাল হয়ে গিয়েছিল হাততালির চোটে।

আর শেফাল্লোকে লক্ষ করে বারবার অবাক হচ্ছিল সেদিন সুরপতি। লোকটা যেমন জাদুকর, তেমনই অভিনেতা। পরনে কালো চকচকে স্যুট, হাতে ম্যাজিক-ওয়ান্ড, মাথায় টপ-হ্যাট। সেই হ্যাটের ভিতর থেকে জাদুবলে কীই না বার করলেন শেফাল্লো! একবার খালি হ্যাটে হাত ঢুকিয়ে কান ধরে একটা খরগোশ টেনে বার করলেন। বেচারা সবে কানঝাড়া শেষ করেছে এমন সময় বেরোল পায়রা—এক, দুই, তিন, চার। ফরফর করে স্টেজের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল ম্যাজিক পায়রা। ওদিকে শেফাল্লো ততক্ষণে সেই একই হ্যাটের ভিতর থেকে চকোলেট বের করে দর্শকদের মধ্যে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছেন।

আর এর সবকিছুর সঙ্গে চলেছে শেফাল্লোর কথা। যাকে বলে কথার তুবড়ি। সুরপতি বইয়ে পড়েছিল যে, একে বলে 'প্যাটর'। এই 'প্যাটর' হল ম্যাজিশিয়ানদের একটা প্রধান অবলম্বন। দর্শক যখন এই প্যাটরের স্রোতে নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন, ম্যাজিশিয়ান সেই ফাঁকে হাতসাফাইয়ের আসল কাজগুলো সেরে নিচ্ছেন।

কিন্তু এর আশ্চর্য ব্যতিক্রম হলেন মাদাম প্যালার্মো। তাঁর মুখে একটি কথা নেই। নির্বাক কলের পুতুলের মতো খেলা দেখিয়ে গেলেন তিনি। তা হলে তাঁর হাতসাফাইগুলো হয় কোন ফাঁকে? এর উত্তরও সুরপতি পরে জেনেছিল। স্টেজে এমন ম্যাজিক দেখানো সম্ভব যাতে হাত সাফাইয়ের কোনও প্রয়োজন হয় না। সেসব ম্যাজিক নির্ভর করে কেবল যন্ত্রের কারসাজির উপর এবং সেসব যন্ত্র চালানোর জন্য স্টেজের কালো পর্দার পিছনে লোক থাকে। মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করে কেটে আবার জুড়ে দেওয়া, বা ধোঁয়ার ভিতর অদৃশ্য করে দেওয়া—এ সবই কলকব্জার ব্যাপার। তোমার যদি পয়সা থাকে, তুমিও সেসব কলকব্জা কিনে বা তৈরি করিয়েই সেসব ম্যাজিক দেখাতে পারো। অবিশ্যি ম্যাজিকগুলো জমিয়ে, রসিয়ে সাজপোশাকের বাহারে চিত্তাকর্ষক করে দেখানোর মধ্যেও একটা বাহাদুরি আছে, আর্ট আছে। সবাইয়ের সে আর্ট জানা নেই, কাজেই পয়সা থাকলেই বড় ম্যাজিশিয়ান হওয়া যায় না। সবাই কি আর—

সুরপতির স্মৃতিজাল হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ট্রেনটা একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়েছে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজা খুলে কামরার মধ্যে ঢুকেছে—এ কী! সুরপতি হাঁ-হাঁ করে উঠে বাধা দিতে গিয়ে থেমে গেল।

এ যে সেই ত্রিপুরাবাবু! ত্রিপুরাচরণ মল্লিক!

এরকম অভিজ্ঞতা সুরপতির আরও কয়েকবার হয়েছে। একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে হয়তো অনেককাল দেখা নেই। হঠাৎ একদিন তাঁর কথা মনে পড়ল বা তাঁর বিষয়ে আলোচনা হল, আর পরমুহূর্তেই সশরীরে সেই লোক এসে হাজির।

কিন্তু তাও সুরপতির মনে হল যে, ত্রিপুরাবাবুর আজকের এই আবির্ভাবটা যেন আগের সব ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে।

সুরপতি কয়েক মুহূর্ত কোনও কথাই বলতে পারল না। ত্রিপুরাবাবু ধুতির খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে হাতের একটা পোঁটলা মেঝেতে রেখে সুরপতির বেঞ্চের বিপরীত কোণটাতে বসলেন। তারপর সুরপতির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'অবাক লাগছে, না?'

সুরপতি কোনওমতে ঢোক গিলে বলল, 'অবাক মানে—প্রথমত, আপনি যে বেঁচে আছেন তাই আমার ধারণা ছিল না।'

'কীরকম?'

'আমি আমার বি.এ. পরীক্ষার কিছুদিন পরেই আপনার মেসে যাই। গিয়ে দেখি তালা বন্ধ।

ম্যানেজারবাবু—নাম ভুলে গেছি—বললেন যে, আপনি নাকি গাড়ি চাপা পড়ে...'

ত্রিপুরাবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'সেরকম হলে তো বেঁচেই যেতাম! অনেক ভাবনাচিন্তা থেকে রেহাই পেতাম।'

সুরপতি বলল, 'আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—আমি কিছুদিন আগেই আপনার কথা ভাবছিলাম।'

'বলো কী?' ত্রিপুরাবাবুর চোখেমুখে যেন একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। 'আমার কথা ভাবছিলে? এখনও ভাবো আমার কথা? শুনে আশ্চর্য হলাম।'

সুরপতি জিভ কাটল। 'এটা আপনি কী বলছেন ত্রিপুরাবাবু! আমি কি অত সহজে ভুলি? আমার হাতেখড়ি যে আপনার হাতেই। আজ বিশেষ করে পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল। আজ বাইরে যাচ্ছি 'শো' দিতে। এই প্রথম বাংলার বাইরে।—আমি যে এখন পেশাদারি ম্যাজিশিয়ান তা আপনি জানেন কী?'

ত্রিপুরাবাবু মাথা নাড়লেন।

'জানি। সব জানি। সব জেনেশুনেই, তোমার সঙ্গে দেখা করব বলেই আজ এসেছি। এই বারো বছর তুমি কী করেছ না করেছ, কীভাবে তুমি বড় হয়েছ, এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছ—এর কোনওটাই আমার অজানা নেই। সেদিন নিউ এম্পায়ারে ছিলাম আমি, প্রথম দিন। একেবারে পিছনের বেঞ্চিতে। সবাই তোমার কলাকৌশল কেমন অ্যাপ্রিসিয়েট করল তা দেখলাম। কিছুটা গর্ব হচ্ছিল বটেই। কিন্তু—'

ত্রিপুরাবাবু থেমে গেলেন। সুরপতিও কিছু বলার খুঁজে পেল না। কীই-বা বলবে সে? ত্রিপুরাবাবু যদি কিছুটা ক্ষুণ্ণ বোধ করেন তা হলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সত্যিই উনি গোড়াপত্তনটা না করিয়ে দিলে সুরপতির আজ এতটা উন্নতি হত না। আর তার প্রতিদানে সুরপতি কীই-বা করেছে? বরং উলটে এই বারো বছরে ক্রমশ তার মন থেকে ত্রিপুরাবাবুর স্মৃতি মুছে এসেছে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাবটাও যেন কমে এসেছে।

ত্রিপুরাবাবু আবার শুরু করলেন, 'গর্ব আমার হয়েছিল তোমার সেদিনের সাকসেস দেখে। কিন্তু তার সঙ্গে আফসোসও ছিল। কেন জানো? তুমি যে রাস্তা বেছে নিয়েছ, সেটা খাঁটি ম্যাজিকের রাস্তা নয়। তোমার ব্যাপারটা অনেকখানি লোকভুলানো রং-তামাশা, অনেকখানি যন্ত্রের কৌশল। তোমার নিজের কৌশল নয়। অথচ আমার ম্যাজিক মনে আছে তোমার?'

সুরপতি ভোলেনি। কিন্তু সেইসঙ্গে এও মনে হচ্ছিল তার যে, ত্রিপুরাবাবু যেন তাঁর সেরা ম্যাজিকগুলো তাকে শেখাতে দ্বিধা বোধ করতেন। তিনি বলতেন, 'এখনও সময় লাগবে।' সেই সময় আর কোনওদিন আসেনি। তার আগেই এসে পড়ল শেফাল্লো। শেফাল্লোর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে সে অনেক স্বপ্নজাল বোনে। দেশে দেশে ম্যাজিক দেখিয়ে রোজগার করবে, নাম করবে, লোককে আনন্দ দেবে, লোকের হাততালি পাবে, বাহবা পাবে।

ত্রিপুরাবাবু অন্যমনস্কভাবে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। সুরপতি তাঁকে একবার ভাল করে দেখল। ভদ্রলোককে সত্যিই দুস্থ বলে মনে হচ্ছে। মাথার চুল প্রায় সমস্ত পেকে গেছে, গালের চামড়া আলগা হয়ে এসেছে, চোখ ঢুকে গেছে কোটরের ভিতরে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি কি ম্লান হয়েছে কিছু? মনে তো হয় না। আশ্চর্য তীক্ষ্ণ চাহনি ভদ্রলোকের।

ত্রিপুরাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অবিশ্যি তুমি কেন এ-পথ বেছে নিয়েছ জানি। আমি জানি তুমি বিশ্বাস করো—হয়তো আমিই তার জন্য কিছুই দায়ী—যে খাঁটি জিনিসের কদর নেই। স্টেজে ম্যাজিক চালাতে গেলে একটু চটক চাই, চাকচিক্য চাই। তাই নয় কী?'

সুরপতি অস্বীকার করল না। শেফাল্লো দেখার পর থেকেই তার এ ধারণা হয়েছিল। কিন্তু জাঁকজমক মানেই কি খারাপ? আজকাল দিনকাল বদলেছে। বিয়ের আসরে ফরাসের উপর বসে ম্যাজিক দেখিয়ে কীই-বা রোজগার করবে তুমি, আর কেই-বা জানবে তোমার নাম? ত্রিপুরাবাবুর অবস্থাটা তো সে নিজের চোখেই দেখেছে। খাঁটি ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে যদি মানুষের পেট না চলে তো সে ম্যাজিকের সার্থকতা কোথায়?

সুরপতি ত্রিপুরাবাবুকে শেফাল্লোর কথা বলল। যে জিনিস হাজার হাজার দর্শক দেখে আনন্দ পাচ্ছে, তারিফ করছে, তার কি কোনও সার্থকতা নেই? খাঁটি ম্যাজিক তো সুরপতি অশ্রদ্ধা করছে না। কিন্তু সে

পথে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। তাই সুরপতি এই পথ বেছে নিয়েছে।

ত্রিপুরাবাবু হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বেঞ্চির উপর পা তুলে দিয়ে তিনি সুরপতির দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

'শোনো সুরপতি, তুমি যদি সত্যিই বুঝতে পারতে আসল ম্যাজিক কী জিনিস তা হলে তুমি নকলের পিছনে ধাওয়া করতে না। হাতসাফাই তো ওর শুধু একটামাত্র অঙ্গ। অবিশ্যি তারও যে কত শ্রেণীবিভাগ আছে তার শেষ নেই। যৌগিক ক্রিয়ার মতো সেসব সাফাই মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু এ ছাড়াও তো আরও কত কী আছে। হিপনটিজম! কেবল চোখের চাহনির জোরে মানুষকে সম্পূর্ণ তোমার বশে এনে ফেলতে পারবে। এমন বশ করবে যে, সে তোমার হাতে কাদা হয়ে যাবে। তারপর ক্লেয়ারভয়েন্স, বা টেলিপ্যাথি, বা থটরিডিং। অপরের চিন্তার জগতে তুমি অবাধ চলাফেরা করতে পারবে। একজনের নাড়ি টিপে বলে দেবে সে কী ভাবছে। তেমন তেমন শেখা হয়ে গেলে পরে তাকে স্পর্শও করতে হবে না। কেবল মিনিটখানেক তার চোখের দিকে চেয়ে থাকলেই তার মনের কথা, পেটের কথা সব জেনে ফেলবে। এসব কি ম্যাজিক? জগতের সব সেরা ম্যাজিকের মূল হচ্ছে এইসব জিনিস। এতে কলকব্জার কোনও ব্যাপারই নেই। আছে শুধু সাধনা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা।'

ত্রিপুরাবাবু দম নেবার জন্য থামলেন। ট্রেনের শব্দের জন্য তাঁকে গলা উঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছিল। তাতে বোধ হয় তিনি আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবারে তিনি সুরপতির দিকে আরও এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি তোমাকে এর সবকিছুই শেখাতে চেয়েছিলুম, কিন্তু তুমি গ্রাহ্য করলে না। তোমার তর সইল না। একজন বিদেশি বুজরুকের বাইরের জাঁকজমক তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিল। আসল পথ ছেড়ে যে পথে চট করে অর্থ হয়, খ্যাতি হয়, সেই পথে চলে গেলে তুমি।'

সুরপতি নির্বাক। সত্যি করে এর কোনও অভিযোগেরই প্রতিবাদ সে করতে পারে না।

ত্রিপুরাবাবু এবার সুরপতির কাঁধে একটা হাত রেখে গলার স্বর একটু নরম করে বললেন, 'আমি তোমার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি সুরপতি। আমায় দেখে বুঝেছ কিনা জানি না—আমার অবস্থা খুবই খারাপ। এত জাদু জানি, কিন্তু টাকা করার জাদুটা এখনও অজানা রয়ে গেছে। অ্যাম্বিশনের অভাবই আমার কাল হয়েছে, না হলে কি আর আমার অন্নচিন্তা করতে হয়? আমি এখন মরিয়া হয়েই এসেছি তোমার কাছে সুরপতি। আমি নিজে যে নিজের পায়ে দাঁড়াব সে শক্তি আর নেই, বয়সও নেই। কিন্তু আমার এটুকু বিশ্বাস আছে যে আমার এ দুর্দিনে তুমি আমাকে—কিছুটা স্যাক্রিফাইস করেও—সাহায্য করবে। ব্যস—তারপর আর আমি তোমাকে বিরক্ত করব না।'

সুরপতির মনটা ধাঁধিয়ে উঠল। কী সাহায্য চাইছেন ভদ্রলোক?

ত্রিপুরাবাবু বলে চললেন, 'তোমার কাছে হয়তো প্ল্যানটা একটু রূঢ় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। মুশকিল হচ্ছে কি, আমার যে শুধু টাকারই প্রয়োজন তা নয়। বুড়ো বয়সে একটা নতুন শখ হয়েছে, জানো। একসঙ্গে অনেকগুলো লোকের সামনে আমার সেরা খেলাগুলো একবার দেখাতে ইচ্ছে করছে। হয়তো এই প্রথম এবং এই শেষবার, কিন্তু তাও এ শখটাকে কিছুতেই দমন করতে পারছি না সুরপতি!'

একটা অজানা আশঙ্কা সুরপতির বুকটাকে কাঁপিয়ে দিল।

ত্রিপুরাবাবু এবার তাঁর আসল প্রস্তাবটা পাড়লেন।

'লক্ষ্ণৌতে তোমার ম্যাজিক দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। তুমি সেখানেই যাচ্ছ। ধরো যদি শেষ মুহূর্তে তোমার অসুখ করে! দর্শককে একেবারে হতাশ করে ফিরিয়ে দেবার চেয়ে ধরো যদি তোমার জায়গায় আর কেউ...।'

সুরপতি হকচকিয়ে গেল। ত্রিপুরাবাবু বলেন কী! সত্যিই মরিয়া হয়েছেন ভদ্রলোক, না হলে এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করেন কী করে?

সুরপতি চুপ করে আছে দেখে ত্রিপুরাবাবু বললেন, 'অনিবার্য কারণ হেতু তোমার বদলে তোমার গুরু ম্যাজিক দেখাবেন—এইভাবেই খবরটা দিয়ে দেবে তুমি। এতে কি লোক খুব হতাশ হবে বলে মনে হয়? আমার তো তা মনে হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার ম্যাজিক লোকের ভালই লাগবে। কিন্তু তাও আমি প্রস্তাব করি যে, প্রথম দিনের হিসেবে তোমার যা টাকা পাওনা হত, তার অর্ধেক তুমিই

পাবে। তাতে আমার ভাগে যা থাকবে তাতেই আমার চলে যাবে। তারপর তুমি যেমন চলছ চলো। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না। কেবল এই একদিনের সুযোগটুকু তোমাকে করে দিতেই হবে সুরপতি!'

সুরপতির মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

'অসম্ভব! আপনি কী বলছেন আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন না ত্রিপুরাবাবু। বাংলার বাইরে এই আমার প্রথম প্রদর্শনী। লক্ষ্ণৌয়ের 'শো'-এর উপর কত কিছু নির্ভর করছে তা আপনি বুঝতে পারছেন না? আমার কেরিয়ারের গোড়াতেই আমি একটা মিথ্যের আশ্রয় নেব? কী করে ভাবছেন আপনি এমন কথা?'

ত্রিপুরাবাবু স্থির দৃষ্টিতে সুরপতির দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ট্রেনের শব্দের উপর দিয়ে তাঁর ধীর, সংযত কণ্ঠস্বর সুরপতির কানে ভেসে এল।

'সেই আধুলি আর আংটির ম্যাজিকের উপর তোমার এখনও লোভ আছে কি?'

সুরপতি চমকে উঠল। কিন্তু ত্রিপুরাবাবুর চাহনিতে কোনও পরিবর্তন নেই।

'কেন?'

ত্রিপুরাবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি হও তা হলে আমি তোমায় ম্যাজিকটা শিখিয়ে দেব। যদি এখন কথা দাও তো এখনই। আর যদি না দাও—'

হুইস্‌ল-এর বিকট শব্দ করে একটা হাওড়াগামী ট্রেন সুরপতিদের ট্রেনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার কামরার আলোয় ত্রিপুরাবাবুর চোখ বারবার ধকধক করে জ্বলে উঠল। আলো আর শব্দ মিলিয়ে গেলে পর সুরপতি জিজ্ঞেস করল, 'আর যদি রাজি না হই?'

'তা হলে ফল ভাল হবে না সুরপতি। তোমার একটা কথা জানা দরকার। আমি যদি দর্শকের মধ্যে উপস্থিত থাকি তা হলে ইচ্ছা করলে আমি যে কোনও জাদুকরকে অপদস্থ, নাকাল, এমনকী একেবারে অকেজো করে দিতে পারি।'

ত্রিপুরাবাবু তাঁর কোটের পকেট থেকে একজোড়া তাস সুরপতির দিকে এগিয়ে দিলেন।

'দেখাও তো দেখি তোমার হাতসাফাই! কঠিন কিছু না। একেবারে প্রাথমিক সাফাই। পিছনের এই গোলামটা সামনের এই তিরির উপর নিয়ে এসো দেখি হাতের ঝাঁকানিতে।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ষোলো বছর বয়সে সুরপতির এই সাফাইটা আয়ত্ত করতে লেগেছিল মাত্র সাতদিন।

আর আজ?

সুরপতি তাস হাতে নিয়ে দেখল তার আঙুল অবশ হয়ে আসছে। শুধু আঙুল নয়,—আঙুল, কব্জি, কনুই—একেবারে পুরো হাতটাই অবশ। ঝাপসা চোখে সুরপতি দেখল ত্রিপুরাবাবুর ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি; এক অমানুষিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তিনি সুরপতির চোখের দিকে। সুরপতির কপাল ঘেমে গেল, সর্বাঙ্গে একটা কাঁপুনির লক্ষণ অনুভব করল সে।

'এবার বুঝেছ আমার ক্ষমতা?'

সুরপতির হাত থেকে তাসের প্যাকেটটা আপনা থেকেই পড়ে গেল বেঞ্চির উপরে। ত্রিপুরাবাবু তাসগুলো গোছ করে তুলে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'রাজি আছ?'

সুরপতির অসুস্থ অবশ ভাবটা কেটে গেছে।

সে ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাজিকটা শেখাবেন তো?'

ত্রিপুরাবাবু তাঁর ডান হাতের তর্জনী সুরপতির নাকের সামনে তুলে ধরে বললেন, 'লক্ষ্ণৌয়ের প্রথম শোতে তোমার অসুস্থতাহেতু তোমার পরিবর্তে তোমার গুরু ত্রিপুরাচরণ মল্লিক তাঁর জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করবেন। তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তুমি তোমার প্রাপ্য টাকার অর্ধেক আমাকে দেবে। ঠিক তো?'

'ঠিক।'

'তবে এসো।'

সুরপতি পকেট হাতড়ে একটা আধুলি, আর নিজের আঙুল থেকে পলাবসানো আংটিটা খুলে ত্রিপুরাবাবুকে দিল।...

বর্ধমানে গাড়ি থামতে চা নিয়ে তার 'বস'-এর কামরার সামনে এসে অনিল দেখে সুরপতি ঘুমে অচেতন। অনিল একটু ইতস্তত করে একবার 'স্যার' বলে মৃদু শব্দ করতেই সুরপতি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

'কী...কী ব্যাপার?'

'আপনার চা এনেছি স্যার। ডিসটার্ব করলুম, কিছু মনে করবেন না।'

'কিন্তু...?' সুরপতি উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে কামরার এদিক-ওদিক দেখতে লাগল।

'কী হল স্যার?'

'ত্রিপুরাবাবু...?'
'ত্রিপুরাবাবু?' অনিল হতভম্ব।
'না, না...উনি তো সেই ফিফটি-ওয়ানে...বাস চাপা পড়ে...কিন্তু আমার আংটি?'
'কোন্ আংটি স্যার? আপনার পলাটা তো হাতেই রয়েছে।'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর...'
সুরপতি পকেটে হাত দিয়ে একটা আধুলি বার করল। অনিল লক্ষ করল সুরপতির হাত থরথর করে কাঁপছে।
'অনিল, ভেতরে এসো তো একবার। চট করে এসো। ওই জানলাগুলো বন্ধ করো তো। হ্যাঁ, এইবার দেখো।'
সুরপতি বেঞ্চির এক মাথায় আংটি আর অন্য মাথায় আধুলিটা রাখল। তারপর ইষ্টনাম জপ করে যা-থাকে-কপালে করে স্বপ্নে-পাওয়া কৌশল প্রয়োগ করল আধুলির দিকে তীব্র সংহত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।
আধুলিটা বাধ্য ছেলের মতো গড়িয়ে আংটির কাছে গিয়ে সেটাকে সঙ্গে নিয়ে সুরপতির কাছে গড়িয়ে ফিরে এল।
অনিলের হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা পড়ে যেত যদি না সুরপতি অদ্ভুত হাতসাফাইয়ের বলে সেটাকে পড়ার পূর্বমুহূর্তেই নিজের হাতে নিয়ে নিত।
লক্ষ্ণৌয়ে জাদুপ্রদর্শনীর প্রথম দিন পর্দা উঠলে পর সুরপতি মণ্ডল সমবেত দর্শকমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্বর্গত জাদুবিদ্যাশিক্ষক ত্রিপুরাচরণ মল্লিকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল।
আজ প্রদর্শনীর শেষ খেলা—যেটাকে সুরপতি খাঁটি দেশি ম্যাজিক বলে অ্যাখ্যা দিল—হল আংটি ও আধুলির খেলা।

সন্দেশ, চৈত্র ১৩৬৯

শিবু আর রাক্ষসের কথা

'অ্যাই শিবু—এদিকে শোন।'
শিবুর ইস্কুল যাবার পথে ফটিকদা তাকে প্রায়ই এইভাবে ডাকে।
ফটিকদা মানে পাগলা ফটিক।
জয়নারায়ণ বাবুদের বাড়ি ছাড়িয়ে চৌমাথার কাছটায় যেখানে একটা পুরনো মরচে-ধরা স্টিম রোলার আজ দশ বছর ধরে পড়ে আছে, তার ঠিক সামনেই ফটিকদার ছোট্ট টিনের চালওয়ালা বাড়ি। অষ্টপ্রহর দাওয়ায় বসে কী-যে খুটুর খুটুর কাজ করে ফটিকদা তা ও-ই জানে। শিবু শুধু জানে ফটিকদা খুব গরিব, আর লোকে বলে যে এককালে খুব বেশি পড়াশুনো করেই ফটিক পাগল হয়ে গেছে। শিবুর কিন্তু তার এক-একটা কথা শুনে মনে হয় যে, তার মতো বুদ্ধিমান লোক খুব কমই আছে।
তবে এটা ঠিক যে, ফটিকদার বেশিরভাগ কথাই আজগুবি আর পাগলাটে। 'হ্যাঁ রে, কাল চাঁদের পাশটা লক্ষ করেছিলি—বাঁ দিকটায় কেমন একটা শিং-এর মতো বেরিয়েছিল?' 'ক'দিন থেকে কাকগুলো কেমন নাকি-নাকি সুরে ডাকছে শুনেছিস? সব হোলসেল সর্দি লেগেছে!'
শিবুর হাসিও পায়, আবার মাঝে মাঝে বিরক্তিও লাগে। যেসব কথার কোনও জবাব নেই, যার সত্যি করে কোনও মানে হয় না, সেসব কথা শুনে তো খালি সময় নষ্ট। তাই এক-একদিন ফটিক ডাকলেও শিবু যায় না। 'আজ সময় নেই ফটিকদা, আরেকদিন আসব,' বলে সে সটান চলে যায় ইস্কুলে।
আজও সে ভেবেছিল যাবে না, কিন্তু ফটিকদা আজ যেন একটু বেশি চাপ দিল।

'তোকে যা বলতে চাই, সেটা না শুনলে তোর ক্ষতি হবে।'

শিবু শুনেছে পাগলরা নাকি মাঝে মাঝে এমন সব সত্যি কথা বলে যা এমনি লোকেদের পক্ষে সম্ভবই না। তাই সে ক্ষতির কথা ভেবে ভয়ে ভয়ে ফটিকদার দিকে এগিয়ে গেল।

একটা হুঁকোর মধ্যে ডাবের জল ভরতে ভরতে ফটিক বলল, 'জনার্দনবাবুকে লক্ষ করেছিস?'

জনার্দনবাবু শিবুদের নতুন অঙ্কের মাস্টার। দিন দশেক হল এসেছেন।

শিবু বলল, 'রোজই তো দেখছি। আজও তো প্রথমেই অঙ্কের ক্লাস।'

ফটিক জিভ দিয়ে ছিক্ করে একটা বিরক্তি হওয়ার শব্দ করে বলল, 'দেখা আর লক্ষ করা এক জিনিস নয়, বুঝেছিস? বল তো, তুই যে বেল্টটা পরেছিস তাতে ক'টা ফুটো, শার্টটার ক'টা বোতাম? না দেখে বল তো?'

শিবু কোনওটারই ঠিকমতো জবাব দিতে পারল না।

ফটিক বলল, 'ওই দ্যাখ—তোর নিজের জিনিস, নিজে পরে আছিস, অথচ লক্ষই করিসনি। তেমন জনার্দনবাবুকেও লক্ষ করিসনি তুই।'

'কী লক্ষ করব? কোন জিনিসটা?'

হুঁকোতে কলকে লাগিয়ে গুড়ুক গুড়ুক করে দুটো টান দিয়ে ফটিক বলল, 'এই ধর—দাঁত।'

'দাঁত?'

'হুঁ, দাঁত।'

'কী করে লক্ষ করব? উনি যে হাসেন না।'

কথাটা ঠিক। রাগী না হলেও, ওরকম গম্ভীর মাস্টার শিবুদের ইস্কুলে আর নেই।

ফটিক বলল, 'ঠিক আছে। এর পর যেদিন হাসবেন সেদিন ওঁর দাঁতগুলো খালি লক্ষ করিস। তারপর আমায় এসে বলে যাস, কী দেখলি।'

আশ্চর্য ব্যাপার! ঠিক সেইদিনই অঙ্কের ক্লাসে জনার্দনবাবুর একটা হাসির কারণ ঘটে গেল।

জ্যামিতি পড়াতে পড়াতে শঙ্করকে চতুর্ভুজ মানে জিজ্ঞেস করাতে শঙ্কর বলল, 'ঠাকুর, স্যার! নারায়ণ, স্যার!'—আর তাই শুনে জনার্দনবাবু খ্যাক খ্যাক করে রাগী হাসি হেসে উঠলেন, আর শিবুর চোখ তৎক্ষণাৎ চলে গেল তাঁর দাঁতের দিকে।

বিকেলে ফেরার পথে ফটিকদার বাড়ির সামনে পৌঁছে শিবু দেখলে সে হামানদিস্তায় কী যেন ছেঁচছে। শিবুকে দেখে ফটিক বলল, 'এই ওষুধটা যদি উতরে যায় তো দেখিস বহুরূপীর মতো রঙ চেঞ্জ করতে পারব।'

শিবু বলল, 'ফটিকদা, দেখেছি।'

'কী দেখেছিস?'

'দাঁত।'

'ও। কীরকম দেখলি?'

'এমনি সব ঠিক আছে, খালি পানের দাগ, আর দুটো দাঁত একটু বড়।'

'কোন দুটো?'

'পাশের। এইখানের।' শিবু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

'হুঁ। ওখানের দাঁতকে কী বলে জানিস?'

'কী?'

'শ্বদন্ত। কুকুরে-দাঁত।'

'ও।'

'এতবড় কুকুরে-দাঁত মানুষের পাটিতে দেখেছিস এর আগে?'

'না বোধহয়।'

'কুকুরে-দাঁত কাদের বড় হয় জানিস?'

'কুকুরের?'

'ইডিয়ট! শুধু কুকুরের কেন? সব মাংসাশী জন্তু-জানোয়ারেরই শ্বদন্ত বড় হয়। ওই দাঁত দিয়েই তো কাঁচামাংস ছিঁড়ে হাড়গোড় চিবিয়ে খায় ওরা। বিশেষ করে হিংস্র জানোয়ারেরা।'

'ও।'

'আর কার বড় হয় শ্বদন্ত?'

শিবু আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। আর কার হবে আবার? মানুষ আর জন্তু-জানোয়ার—এ ছাড়া দাঁতওয়ালা জিনিস আর আছেই বা কী?

ফটিকদা তার হামানদিস্তায় একটা আখরোট আর এক চিমটে কালোজিরে ফেলে দিয়ে বলল, 'জানিস না তো? রাক্ষস।'

রাক্ষস? রাক্ষসের সঙ্গে জনার্দনবাবুর কী? আর আজকের দিনে রাক্ষসের কথা কেন? সে তো ছিল রূপকথার বইয়ের পাতার মধ্যে। রাক্ষস-খোক্কসের গল্প তো শিবু কত শুনেছে, পড়েছে। তাদের মুলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো—

শিবু চমকে উঠল।

কুলোর মতো পিঠ!

জনার্দনবাবুর পিঠটা তো ঠিক সিধে নয়। কেমন যেন কুঁজো-কুঁজো কুলো-কুলো ভাব। শিবু কাকে যেন বলতে শুনেছে যে, জনার্দনবাবুর বাতের রোগ, তাই পিঠ টেনে চলতে পারেন না।

মুলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো পিঠ—আর? আর যেন কী হয় রাক্ষসের?

আর ভাঁটার মতো চোখ।

জনার্দনবাবুর চোখ কি শিবু লক্ষ করেছে? না, করেনি। করা সম্ভব নয়।

কারণ জনার্দনবাবু চশমা পরেন, আর সে চশমার কাচ ঘোলাটে। চোখের রঙ লাল কি বেগ্‌নি কি সবুজ তা বোঝবার কোনও উপায় নেই।

শিবু অঙ্কেতে খুব ভাল। লসাগু, গসাগু, সিঁড়িভাঙা, বৃদ্ধির অঙ্ক—কোনওটাতেই সে ঠেকে না। অন্তত কিছুদিন আগে অবধি সে ঠেকত না। প্যারীচরণবাবু যখন অঙ্কের মাস্টার ছিলেন তখন তো রোজ সে দশে দশ পেয়েছে। কিন্তু এই দু'দিন থেকে শিবুর একটু গণ্ডগোল হচ্ছে। কাল সে মনের জোরে অনেকটা সামলে নিয়েছিল নিজেকে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে মনে মনে বলতে আরম্ভ করেছিল, 'রাক্ষস হতে পারে না। মানুষ রাক্ষস হয় না। আগে হলেও, এখন হয় না। জনার্দনবাবু রাক্ষস নয়, জনার্দনবাবু মানুষ।' ক্লাসে বসে বসেও সে মনে মনে এই কথাগুলো আওড়াচ্ছিল। এমন সময় একটা ব্যাপার হয়ে গেল।

জনার্দনবাবু ব্ল্যাকবোর্ডে একটা অঙ্ক লিখেই কেমন জানি অন্যমনস্ক হয়ে তাঁর চশমাটা খুলে সেটা চাদরের খুঁট দিয়ে মুছতে লাগলেন। আর ঠিক সেই সময় তাঁর সঙ্গে শিবুর চোখাচোখি হয়ে গেল।

শিবু যা দেখলে তাতে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

জনার্দনবাবুর চোখের সাদাটা সাদা নয়। সেটা লাল। টকটকে লাল। পল্টুর পেনসিলটার মতো লাল।

এটা দেখার পরে শিবুর পর পর তিনটে অঙ্ক ভুল হয়ে গেল।

এমনিতেই শিবু ছুটির পরে সোজা বাড়ি ফেরে না। সে প্রথমে যায় মিত্তিরদের বাগানে। ছাতিম গাছটার গুঁড়ির আশপাশটায় যে লজ্জাবতী লতাগুলো আছে, সেগুলোর প্রত্যেকটাকে সে আঙুলে টোকা মেরে মেরে ঘুম পাড়ায়। তারপর সে যায় সরলদিঘির পাড়ে। দিঘির জলে রোজ সে খোলামকুচি দিয়ে ব্যাঙবাজি করে। সাতবারের বেশি লাফ খাইয়ে যদি খোলামকুচি ওপারে পৌঁছতে পারে তবেই সে হরেনের রেকর্ড ব্রেক করবে। সরলদিঘির পরেই ইটখোলার মাঠ। সেখানে থরে থরে কোনাকুনিভাবে মাঠ পেরিয়ে বাড়ির খিড়কি দরজায় এসে পৌঁছয়।

আজ সে মিত্তিরদের বাগানে এসে দেখল লজ্জাবতী লতাগুলো নেতিয়ে পড়ে আছে। এরকম হল কেন? কেউ কি হেঁটে গেছে লতাগুলোর উপর দিয়ে? এ পথে তো বড় একটা কেউ আসে না।

শিবুর আর ইচ্ছে করল না বাগানে থাকতে। কেমন যেন একটা থমথমে-ছমছমে ভাব। সন্ধেটা যেন আজ একটু তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসছে। কাকগুলো কি রোজই এত চেঁচায়—না আজ কোনও কারণে

ভয় পেয়েছে?

সরলদিঘির পাড়ে বইগুলো হাত থেকে নামিয়ে রেখেই শিবুর মনে হল আজ আর ব্যাঙবাজি করা উচিত হবে না। আজ বেশিক্ষণ বাইরে থাকাই তার উচিত নয়। থাকলে হয়তো বিপদ হবে।

একটা বিরাট কী যেন মাছ দিঘির মাঝখানে ঘাই মেরে ঘপাৎ করে ডুবে গেল।

শিবু বইগুলো হাতে তুলে নিল। ওপারের অশ্বত্থগাছটায় বাদুড়গুলি ঝুলে গাছটা একেবারে কালো করে দিয়েছে। একটু পরেই ওদের ওড়ার সময় হবে। ফটিকদা বলেছে বাদুড়ের মাথায় কেন রক্ত ওঠে না সেটা একদিন বুঝিয়ে দেবে।

জামরুল গাছটার পেছনের ঝোপড়াটা থেকে একটা তক্ষক ডেকে উঠল—'খোক্কস! খোক্কস! খোক্কস!'

শিবু বাড়ির দিকে রওনা দিল।

ইটখোলার কাছাকাছি আসতেই সে দেখতে পেল জনার্দনবাবুকে।

ইটের পাঁজাগুলোর হাত বিশেক দূরেই একটা কুলগাছ। তার পাশেই দুটো ছাগলছানা খেলা করছে, আর জনার্দনবাবু বই আর ছাতা হাতে একদৃষ্টে ছাগলদুটোর খেলা দেখছেন।

শিবু প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে কোনও শব্দ না করে একটা ইটের পাঁজার উপর উঠে দুটো ইটের মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে তার মাথাটা যতদূর যায় গলিয়ে জনার্দনবাবুকে দেখতে লাগল।

সে লক্ষ করল যে, ছাগলগুলোকে দেখতে দেখতে জনার্দনবাবু দু'বার তাঁর ডান হাতটা উপুড় করে ঠোঁটের নীচে বুলোলেন।

জিভ দিয়ে জল না পড়লে মানুষ কখনও ওভাবে ঠোঁটের নীচটা মোছে না।

তারপর শিবু দেখল জনার্দনবাবু ওত পাতার মতো করে নিচু হলেন।

তারপর হঠাৎ হাত থেকে বই ছাতা ফেলে দিয়ে খপ করে একটা ছাগলের বাচ্চাকে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিলেন। আর সেইসঙ্গে শিবু শুনতে পেল ছাগলছানার চিৎকার, আর জনার্দনবাবুর হাসি।

শিবু একলাফে ইটের পাঁজা থেকে নেমে আরেক লাফে আরেকটা পাঁজা টপকাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে চিৎপটাং।

'কে ওখানে?'

কোনওমতে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠতে গিয়ে শিবু দেখে জনার্দনবাবু হাত থেকে ছাগল নামিয়ে

তার দিকে এগিয়ে আসছেন।

'কে, শিবরাম? চোট পেয়েছ নাকি? ওখানে কী করছিলে?'

শিবু কথা বলতে গিয়ে দেখল তার গলা শুকিয়ে গেছে। তার ইচ্ছে করছিল উলটে জনার্দনবাবুকে জিজ্ঞেস করে—আপনি ওখানে কী করছিলেন? আপনার কোলে ছাগল কেন? আপনার জিভে জল কেন?

জনার্দনবাবু শিবুর কাছে এসে বললেন, 'ধরো, আমার হাত ধরো।'

শিবু কোনওমতে হাত না ধরেই উঠে দাঁড়াল।

'তোমার বাড়ি তো কাছেই, না?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ওই লালবাড়িটা কী?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ও।'

'আমি যাই স্যার।'

'ও কি, রক্ত নাকি?'

শিবু দেখল তার হাঁটু ছড়ে গিয়ে সামান্য একটু রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, আর জনার্দনবাবু একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে রয়েছেন, আর তাঁর চশমার কাচ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

'আমি যাই স্যার।'

শিবু কোনওমতে বইগুলো খচমচিয়ে মাটি থেকে তুলে নিল।

'শোনো শিবরাম।'

জনার্দনবাবু এগিয়ে এসে শিবুর পিঠে একটা হাত রাখলেন। শিবুর বুকে কে যেন দুরমুশ পিটতে লাগল।

'তোমাকে একা পেয়ে ভালই হয়েছে। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। তোমার অঙ্কের ব্যাপারে কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি? আজ এত সহজ সহজ অঙ্ক ভুল হল কেন? যদি কোনও অসুবিধে হয় তো ছুটির পর আমার বাড়িতে এসো-না, আমি তোমায় দেখিয়ে দেব'খন। অঙ্কেতে যে ফুলমার্কস পাওয়া যায়। পরীক্ষায় ভাল করতে হলে অঙ্কেতে তো ভাল করতেই হবে। তুমি আসবে আমার বাড়ি?'

শিবু কোনওমতে দু' পা পিছিয়ে জনার্দনবাবুর হাত পিঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে ঢোক গিলে বলল, 'না স্যার। আমি নিজেই পারব স্যার। কালই ঠিক হয়ে যাবে!'

'বেশ। তবে অসুবিধে হলে বোলো। আর আমাকে এত ভয় পাও কেন, অ্যাঁ। এত ভয় পাও কেন? আমি কি রাক্ষস যে, কামড়ে দেব? অ্যাঁ? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ...'

ইটখোলা থেকে এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে এসে শিবু দেখল সামনের ঘরে হীরেনজ্যাঠা এসেছেন। হীরেনজ্যাঠা কলকাতায় থাকেন, মাছ ধরার খুব শখ। বাবা আর হীরেনজ্যাঠা প্রায়ই রবিবার রবিবার মাছ ধরতে যান সরলদিঘিতে। এবারও বোধহয় যাবেন, কেননা শিবু দেখল পিঁপড়ের ডিম দিয়ে মাছের চার বানানো রয়েছে।

শিবু আরও দেখল যে, হীরেনজ্যাঠা এবার বন্দুকও এনেছেন। সোনারপুরের ঝিলে নাকি চখা মারতে যাবেন বাবা আর হীরেনজ্যাঠা। বাবাও বন্দুক চালান, তবে হীরেনজ্যাঠার মতো অত ভাল টিপ নেই।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া করে শোয়ার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে শিবু ভাবতে লাগল। জনার্দনবাবু যে রাক্ষস সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই তার মনে। ভাগ্যিস ফটিকদা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। না হলে আজকে ইটখোলাতেই হয়তো...। শিবু আর ভাবতে পারল না।

বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ভজুদের বাড়ি অবধি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সামনে শিবুর পরীক্ষা, তাই রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে ভোরে উঠে পড়তে হয় ওকে। বাতি না নিভোলে ওর আবার ঘুম আসে না। অবিশ্যি চাঁদনি রাত না হলে আজ সে বাতি জ্বালিয়ে রাখত, কারণ তা না হলে বোধহয় তার ভয়ে ঘুম

আসত না। মা-ও এখনও ঘরে আসেননি। বাবা আর হীরেনজ্যাঠা সবে খেতে বসেছেন, মা তাঁদের খাওয়াচ্ছেন।

জানলার বাইরে জ্যোৎস্নার আলোয় চিকচিকে বেলগাছটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শিবুর ঘুম এসে গিয়েছিল, এমন সময় একটা জিনিস দেখে তার ঘুম ছুটে গিয়ে হাতের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল।

দূর থেকে একটা লোক তারই জানলার দিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটা একটু কুঁজো, আর তার চোখে চশমার কাচটা চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে।

জনার্দনবাবু।

শিবুর গলা আবার শুকিয়ে এল।

জনার্দনবাবু পা টিপে টিপে বেলগাছটা পেরিয়ে ক্রমশ তার জানলার খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। শিবু তার পাশবালিশটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে একটু ইতস্তত করে জনার্দনবাবু ডেকে উঠলেন, 'শিঁবরাম আঁছ?'

এ কী? গলাটা এমন খোনা কেন জনার্দনবাবুর? রাত্তিরে কি তাঁর রাক্ষুসে ভাবটা আরও বেড়ে যায়?

আবার ডাক এল—'শিঁবরাম!'

এবারে শিবুর মা দাওয়া থেকে বলে উঠলেন, 'অ শিবু! বাইরে কে ডাকছে যে! এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

জনার্দনবাবু জানলা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মিনিটখানেক পর শিবু তাঁর গলা শুনতে পেল, 'শিবরাম তার জ্যামিতির বইটা ইটখোলায় ফেলে এসেছিল । কাল আবার রবিবার তো, ইস্কুলে দেখা হবে না, আর ও তো আবার সকালে উঠে পড়বে, তাই—'

তারপর কিছুক্ষণ বিড়বিড় ফিসফিস কী কথা হল শিবু শুনতে পেল না। শুধু শেষটায় শুনল বাবার কথা, 'হ্যাঁ, তা যদি বলেন সে তো ভালই। আপনার ওখানেই না হয় পাঠিয়ে দেব।...হ্যাঁ কাল থেকে।'

শিবুর ঠোঁট নড়ল না, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না, কিন্তু তার মন চিৎকার করে বলতে লাগল, না, না, না! আমি যাব না, কিছুতেই না। তোমরা কিছু জানো না। উনি যে রাক্ষস! গেলেই যে আমায় খেয়ে ফেলবেন!

পরদিন রবিবার হলেও শিবু সকালেই চলে গেল ফটিকদার বাড়ি। কত কী যে বলার আছে তার ফটিকদাকে!

ফটিকদা তাকে দেখে বলল, 'স্বাগতম্! তোর বাড়ির কাছে ফণিমনসা আছে না? আমায় কিছু এনে দিস তো দা দিয়ে কেটে। একটা নতুন রান্না মাথায় এসেছে।'

শিবু ধরা গলায় বলল, 'ফটিকদা!'

'কী?'

'তুমি যে বলছিলে না জনার্দনবাবু রাক্ষস—'

'কে বলল?'

' তুমিই তো বললে।'

'মোটেই না। তুই আমার কথাগুলোও লক্ষ করিস না।'

'কেন?'

'আমি বললাম তুই জনার্দনবাবুর দাঁতগুলো লক্ষ করিস। তারপর তুই এসে বললি তাঁর কুকুরে-দাঁতগুলো বড় বড়। তারপর আমি বললাম ওরকম কুকুরে-দাঁত রাক্ষসেরও হয় বলে শুনেছি। তার মানে কি জনার্দনবাবু রাক্ষস?'

'তা হলে উনি রাক্ষস নন?'

'তা তো বলিনি।'

'তবে?'

ফটিকদা দাওয়া থেকে উঠে একটা মস্ত হাই তুলে বলল, 'তোর জ্যাঠাকে যেন দেখলাম আজ। মাছ ধরতে এসেছেন বুঝি? ছিপ দিয়ে বাঘ ধরেছিল একবার ম্যাক্‌কার্ডি সাহেব। সে গল্প জানিস?'

শিবু মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'ফটিকদা, কী আজেবাজে বকছ তুমি? এদিকে জনার্দনবাবু যে সত্যিই রাক্ষস। আমি জানি তিনি রাক্ষস। আমি অনেক কিছু দেখেছি আর শুনেছি।'

তারপর শিবু গত দু'দিনের ঘটনা ফটিককে বলল। ফটিক সব শুনেটুনে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ। তা তুই এ ব্যাপারে কী করবি কিছু ঠিক করেছিস?'

'তুমি বলে দাও না ফটিকদা! তুমি তো সব জানো।'

ফটিক মাথা হেঁটে করে ভাবতে লাগল।

শিবু ফাঁক পেয়ে বলল, 'আমার বাড়িতে এখন একটা বন্দুক আছে।'

ফটিক দাঁত খিঁচিয়ে উঠল।

'তোর যেমন বুদ্ধি! বন্দুক আছে তো কী হয়েছে? বন্দুক দিয়ে রাক্ষস মারবি? গুলি রিবাউন্ড করে এসে যে মারছে তারই গায়ে লাগবে।'

'তাই বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বোকসন্দর!'

'তা হলে?' শিবুর গলা মিহি হয়ে আসছিল। 'তা হলে কী হবে ফটিকদা? আমাকে যে আবার বাবা আজ থেকে—'

'মেলা বকিসনি। বকে বকে কানের চিংড়ি নড়িয়ে দিলি।'

প্রায় দু' মিনিট ভাবার পর ফটিক শিবুর দিকে ফিরে বলল, 'যেতেই হবে।'

'কোথায়?'

'জনার্দনবাবুর বাড়ি।'

'সে কী?'

'ওঁর কুষ্ঠিটা জানতে হবে। আমি এখনও শিওর নই। কুষ্ঠি দেখলে সব বেরিয়ে যাবে। বাক্স-প্যাঁটরা ঘাঁটলে কুষ্ঠিটা বেরোবে নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু—'

'তুই থাম। আগে প্ল্যানটা শোন। আমরা দু'জনে যাব দুপুরবেলা। আজ রোববার, লোকটা বাড়ি থাকবে। তুই বাড়ির পিছন দিকটায় গিয়ে জনার্দনবাবুকে ডাকবি। বাইরে এলে বলবি অঙ্ক বুঝতে এসেছিস। তারপর দু'-একটা আজেবাজে বকে লোকটাকে আটকে রেখে দিবি। আমি সেই ফাঁকে বাড়ির সামনের দিক দিয়ে ভিতরে গিয়ে কুষ্ঠিটা বের করে নিয়ে আসব। তারপর তুই এদিক দিয়ে পালাবি, আমি ওদিক দিয়ে পালাব। ব্যস।'

'তারপর?' শিবুর যে প্ল্যানটা খুব ভাল লেগেছিল তা নয়, কিন্তু ফটিকদার উপর নির্ভর করা ছাড়া তো আর কোনও রাস্তাই নেই।

'তারপর তুই বিকেলে আবার আমার বাড়ি আসবি। আমি ততক্ষণে কুষ্ঠিটা দেখে কিছু পুরনো পুঁথিপত্তর ঘেঁটে একেবারে রেডি থাকব। যদি দেখি জনার্দনবাবু সত্যিই রাক্ষস, তা হলে তার ব্যবস্থা আমার জানা আছে। তুই ঘাবড়াস না। আর যদি দেখি রাক্ষস নয়, তা হলে তো আর ভাববার কিছুই নেই।'

ফটিকদা বলেছিল দুপুরে বেরোবে। শিবু তাই খাওয়া-দাওয়া করে গিয়ে ফটিকের বাড়ি হাজির হল। মিনিট পাঁচেক পর ফটিকদা বেরিয়ে এসে বলল, 'আমার হুলোটার আবার নস্যির বাতিক হয়েছে। ঝামেলা কি কম?' শিবু লক্ষ করল ফটিকদার হাতে একজোড়া ছেঁড়া চামড়ার দস্তানা, আর একটা সাইকেলের ঘণ্টা। ঘণ্টাটা সে শিবুর হাতে দিয়ে বলল, 'এটা তুই রাখ। বিপদ হলে বাজাস। আমি এসে তোকে বাঁচাব।'

পুবপাড়ার একেবারে শেষমাথায় দোলগোবিন্দবাবুদের বাড়ির পরেই জনার্দন মাস্টারের বাড়ি। একা মানুষ, বাড়িতে চাকর পর্যন্ত নেই। বাইরে থেকে বাড়িতে যে একটা রাক্ষস আছে সেটা বোঝবার কোনও উপায় নেই।

কিছুটা রাস্তা বাকি থাকতেই শিবু আর ফটিকদা আলাদা হয়ে গেল।

বাড়ির পিছনে পৌঁছে শিবু বুঝল যে, তার আবার গলা শুকিয়ে আসছে। জনার্দনবাবুকে ডাকতে

গিয়ে তার যদি গলা দিয়ে আওয়াজ না বেরোয়?

বাড়ির পিছনে পাঁচিল, তার গায়ে একটা দরজা, আর দরজার কাছেই একটা পেয়ারা গাছ। গাছের আশপাশ আগাছার জঙ্গলে ভরা।

শিবু পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। আর বেশি দেরি করলে কিন্তু ওদিকে ফটিকদার সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

আরেকটু বেশি সাহস পাবার জন্য শিবু পেয়ারা গাছটায় একটা হাত দিয়ে ভর করে 'মাস্টারমশাই' বলে ডাকতে যাবে, এমন সময় একটা খচমচ শব্দ পেয়ে সে চমকে নীচের দিকে চেয়ে দেখে একটা কালভৈরবী লতার ঝোপের ভিতর একটা গিরগিটি চলে গেল। আর গিরগিটিটা যেখান দিয়ে গেল তার ঠিক পাশেই সাদা সাদা কী যেন পড়ে রয়েছে।

একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঝোপটা ফাঁক করতেই শিবুই দেখল—সর্বনাশ! এ যে হাড়! জন্তুর হাড়! কী জন্তু? বেড়াল, না কুকুর—না ছাগল?

'কী দেখছ ওখানে শিবরাম?'

শিবুর শিরদাঁড়ায় একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে পিছন ফিরে দেখল জনার্দনবাবু খিড়কি দরজা ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে তার দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে।

'কিঁছু হাঁরিয়েছ নাকি?'

'না স্যার...আ-আমি...'

'তুঁমি কি আমার কাঁছেই আঁসছিলে? তা হলে পিঁছনের দঁরজা দিয়ে কেন? এসো—ভিঁতরে এসো।'

শিবু পিছোতে গিয়ে দেখল তার একটা পা লতায় জড়িয়ে গেছে।

'আঁমার আবার কাঁল থেকে একটু সঁর্দিজ্বর হয়েছে। রাত্রে আবার তোঁমার বাড়ি গেঁলাম তো! তুমি তঁখন ঘুমোচ্ছিলে।'

শিবুর এত তাড়াতাড়ি পালানো চলবে না। ওদিকে ফটিকদার যে কাজই শেষ হবে না। মাঝখান থেকে হয়তো সে ধরাই পড়ে যাবে। একবার মনে হল ঘণ্টাটা বাজাবে। তারপর মনে হল, এখনও তো সত্যি করে তার বিপদ কিছু হয়নি। ফটিকদা হয়তো রেগেই যাবে।

'তুঁমি নিচু হয়ে কী দেখছিলে বঁলো তো?'

শিবু চট করে কোনও উত্তর পেল না। জনার্দনবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'জায়গাটা বড় ময়লা, ওঁদিকে না যাওয়াই ভাঁল। ভুলো কুঁকুরটা কোত্থেকে মাংসের হাড়গোড় এনে ফেঁলে ওখানে। এঁক-এঁকবার ভাবি ধমক দেব—কিন্তু পাঁরি না। আমার আবার জন্তু-জানোয়ার ভীঁষণ ভাঁল লাগে কিনা!'

জনার্দনবাবু তাঁর হাতের পিছন দিয়ে ঠোঁটের নীচটা মুছলেন।

'তুমি ভিঁতরে চলো শিবু—তোমার অঙ্কের ব্যাঁপারটা—'

আর দেরি নয়! শিবু 'আজ থাক, কাল আসব' বলে, উলটোমুখো হয়ে এক দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে, নীলুর বাড়ি, কার্তিকের বাড়ি, হরেনের বাড়ি পেরিয়ে একেবারে সা-বাবুদের পোড়োবাড়ির গেটের রোয়াকে এসে বসে হাঁফ ছাড়ল। আজকের ব্যাপারটা সে কোনওদিন ভুলবে না। তার যে এত সাহস হতে পারে, সে নিজেই ভাবতে পারেনি।

বিকেল হতে না হতে শিবু ফটিকের বাড়ি হাজির হল। না জানি কুষ্ঠি থেকে কী বার করেছে ফটিকদা!

শিবুকে দেখেই ফটিক মাথা নাড়ল।

'সব গোলমাল হয়ে গেছে রে!'

'কেন ফটিকদা? কুষ্ঠি পাওনি?'

'তা পেয়েছি। তোর অঙ্কের মাস্টার যে রাক্ষস সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু রাক্ষস নয়—পিরিন্ডি রাক্ষস। সাংঘাতিক ব্যাপার। এরা পুরোপুরি রাক্ষস ছিল সাড়ে-তিনশো পুরুষ আগে। কিন্তু এত তেজ যে, এক-আধটা হাফ-রাক্ষস এখনও বেরিয়ে পড়ে এদের মধ্যে। পুরো রাক্ষস তো এখন সভ্য দেশে কোথাও নেই—এক আছে আফ্রিকার কোনও কোনও অঞ্চলে, আর ব্রেজিল, বোর্নিও এইসব

জায়গায়। তবে হাফ-রাক্ষস এখনও কচিৎ-কদাচিৎ সভ্যদেশে পাওয়া যায়। জনার্দনবাবু ওই ওদের মধ্যে একজন।'

'তা হলে গোলমাল কেন?' শিবুর গলাটা একটু কেঁপে গেল। ফটিকদা হাল ছেড়ে দিলে সে চোখে অন্ধকার দেখবে। 'তুমি যে সকালে বললে তোমার ব্যবস্থা জানা আছে?'

'আমার জানা নেই এমন জিনিস নেই।'

'তবে?'

ফটিকদা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, 'মাছের পেটে কী থাকে?'

এই রে! ফটিকদার আবার পাগলামি আরম্ভ হয়েছে। শিবু এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'ফটিকদা, রাক্ষসের কথা হচ্ছিল, তুমি আবার মাছ আনলে কেন?'

'কী থাকে?' ফটিক গর্জন করে উঠল।

'প-পট্‌কা?' ফটিকদার গলা শুনে শিবুর রীতিমতো ভয় লাগতে আরম্ভ করেছিল।

'তোর মাথা! এত কম বিদ্যে দিয়ে তো তুই বকের বকলসটাও লাগাতে পারবি না। শোন। আড়াই বছর বয়সে একটা শ্লোক শিখেছিলাম, এখনও মনে আছে—

নর কি বানর কিংবা অন্য জানোয়ার
জেনে রাখো হৃৎপিণ্ডে রহে প্রাণ তার।
রাক্ষসের প্রাণ জেনো মৎস্যের উদরে,
সেই হেতু রাক্ষস সহজে না মরে॥'

তাই তো! শিবু তো কত রূপকথার গল্পে পড়েছে মাছের পেটে থাকে রাক্ষসের প্রাণ। এটা তো তার মনে হওয়া উচিত ছিল!

শ্লোকটা আওড়ে ফটিক বলল, 'দুপুরে যখন গেলি ওর বাড়ি, জনার্দন রাক্ষসকে কেমন দেখলি?'

'বলল সর্দিজ্বর হয়েছে।'

'হবেই তো!' ফটিকদার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'হবে না? প্রাণ নিয়ে টানাটানি যে! যেই কাতলা উঠেছে ছিপে, অমনই জ্বর! এ তো হবেই।'

তারপর শিবুর দিকে এগিয়ে এসে তার শার্টের সামনেটা খপ করে হাতের মুঠোয় খামচে ধরে ফটিকদা বলল, 'এখনও হয়তো সময় আছে। তোর জ্যাঠা এই আধঘণ্টা আগে সরলদিঘির ওই আধমনি কাতলাটা ধরে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। আমি দেখেই আন্দাজ করেছি যে, ওটার পেটের মধ্যেই আছে জনার্দন রাক্ষসের প্রাণ। এখন জ্বরের কথাটা শুনে আরও শিওর মনে হচ্ছে। ওই মাছটাকে চিরে দেখতে হবে।'

'কিন্তু সেটা কী করে হবে ফটিকদা?'

'সহজে হবে না। তোরই ওপর নির্ভর করছে। আর এটা না করতে পারলে যে তোর কী বিপদ হতে পারে সেটা ভাবতেও আমার ঘাম ছুটছে।'

ঘণ্টাখানেক পরে শিবু একটা দড়ির মাথায় সরলদিঘির আধমনি কাতলাটাকে বেঁধে সেটাকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফটিকের বাড়ির সামনে এসে হাজির হল।

ফটিক বলল, 'কেউ জানতে পারেনি তো?'

শিবু বলল, 'না। বাবা চান করছিলেন, জ্যাঠামশাই শ্রীনিবাসকে দিয়ে দলাইমলাই করাচ্ছিলেন, আর মা সন্ধে দিচ্ছিলেন। নারকোলের দড়ি খুঁজতে দেরি হল। আর উঃ, যা ভারী!'

'কুছ পরোয়া নেই। মাস্‌ল হবে।'

ফটিক মাছ নিয়ে ভিতরে চলে গেল। শিবু ভাবল—কী আশ্চর্য বুদ্ধি আর জ্ঞান ফটিকদার! ওর জন্যই বোধহয় শিবু এ যাত্রা রক্ষা পাবে। হে ভগবান—জনার্দন রাক্ষসের প্রাণটা যেন থাকে মাছটার পেটে!

মিনিট দশেক পরে ফটিক বেরিয়ে এসে শিবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'নে। এটা হাতছাড়া করবি না কখনও। রাত্রে বালিশের নীচে নিয়ে শুবি। ইস্কুলে যাবার সময় প্যান্টের বাঁ পকেটে নিয়ে নিবি। এটা হাতে থাকলে রাক্ষস কেঁচো, আর হামানদিস্তায় গুঁড়িয়ে ফেললে রাক্ষস ডেড। আমার মতে গুঁড়োবার

দরকার নেই, হাতে রাখলেই যথেষ্ট। কারণ অনেক সময় দেখা গেছে পিরিণ্ডি রাক্ষস চুয়ান্ন বছর বয়সের পর থেকে পুরো মানুষ হয়ে গেছে। তোর জনার্দন মাস্টারের বয়স এখন তিপ্পান্ন বছর এগারো মাস ছাব্বিশ দিন।'

শিবু এবার সাহস করে তার হাতের তেলোর দিকে চেয়ে দেখল—একটা ভিজে-ভিজে মিছরির দানার মতো পাথর নতুন-ওঠা চাঁদের আলোয় চকচক করছে।

পাথরটাকে পকেটে নিয়ে শিবু বাড়ির দিকে ঘুরল। পিছন থেকে ফটিকদা বলল, 'হাতে আঁশটে গন্ধ রয়েছে তোর। ভাল করে ধুয়ে নিস। আর বোকা সেজে থাকিস, নইলে ধরা পড়ে যাবি।'

পরদিন অঙ্কের ক্লাসে জনার্দনবাবু ঠিক ঢোকবার আগে একটা হাঁচি দিলেন, আর তার পরেই চৌকাঠে ঠোক্কর খেয়ে তাঁর জুতোর সুকতলা হাঁ হয়ে গেল। শিবুর বাঁ হাত তখন তার প্যান্টের বাঁ পকেটের ভিতর।

ক্লাসের শেষে শিবু অনেকদিন পরে অঙ্কে দশে দশ পেল।

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৭০

পটলবাবু ফিল্মস্টার

পটলবাবু সবে বাজারের থলিটা কাঁধে ঝুলিয়েছেন এমন সময় বাইরে থেকে নিশিকান্তবাবু হাঁক দিলেন, 'পটল আছ নাকি হে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দাঁড়ান, আসছি।'

নিশিকান্ত ঘোষ মশাই নেপাল ভট্চাজ্যি লেনে পটলবাবুর তিনখানা বাড়ির পরেই থাকেন। বেশ আমুদে লোক।

পটলবাবু থলে নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার? সক্কাল-সক্কাল?'

'শোনো, তুমি ফিরছ কতক্ষণে?'

'এই ঘণ্টাখানেক। কেন?'

'তারপর আর বেরোনোর ব্যাপার নেই তো? আজ তো ট্যাগোরস বার্থডে। আমার ছোট শালার সঙ্গে কাল নেতাজি ফার্মেসিতে দেখা হল। সে ফিল্মে কাজ করে—লোকজন জোগাড় করে দেয়। বললে কী জানি একটা ছবির একটা সিনের জন্য একজন লোক দরকার। যেরকম চাইছে, বুঝেছ—বছর পঞ্চাশ বয়স, বেঁটেখাটো, মাথায় টাক—আমার টক করে তোমার কথা মনে পড়ে গেল। তাই তোমার হদিস দিয়ে দিলুম। বলেছি সোজা তোমার সঙ্গে এসে কথা বলতে। আজ সকালে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে। তোমার আপত্তি নেই তো? ওদের রেট হিসেবে কিছু পেমেন্টও দেবে অবিশ্যি...'

সক্কালবেলা ঠিক এই ধরনের একটা খবর পটলবাবু আশাই করেননি। বাহান্ন বছর বয়সে ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব আসতে পারে এটা তাঁর মতো নগণ্য লোকের পক্ষে অনুমান করা কঠিন বইকী! এ যে একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার!

'কী হে, হ্যাঁ কি না বলে ফেলো। তুমি তো অভিনয়-টভিনয় করেছ এককালে, তাই না?'

'হ্যাঁ, মানে 'না', বলার আর কী আছে? সে আসুক, কথাটথা বলে দেখি! কী নাম বললেন আপনার শালার?'

'নরেশ। নরেশ দত্ত। বছর ত্রিশেক বয়স, লম্বা দোহারা চেহারা। দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে।'

বাজার করতে গিয়ে আজ পটলবাবু গিন্নির ফরমাশ গুলিয়ে ফেলে কালোজিরের বদলে ধানিলঙ্কা

কিনে ফেললেন। আর সৈন্ধব নুনের কথাটা তো বেমালুম ভুলেই গেলেন। এতে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এককালে পটলবাবুর রীতিমতো অভিনয়ের শখ ছিল। শুধু শখ কেন—নেশাই বলা চলে। যাত্রায়, শখের থিয়েটারে, পুজোপার্বণে, পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠানে তাঁর বাঁধা কাজ ছিল অভিনয় করা। হ্যান্ডবিলে কতবার নাম উঠেছে পটলবাবুর। একবার তো নীচের দিকে আলাদা করে বড় অক্ষরে নাম বেরুল—"পরাশরের ভূমিকায় শ্রীশীতলাকান্ত রায় (পটলবাবু)।" তাঁর নামে টিকিট বিক্রি হয়েছে বেশি, এমনও সময় গেছে এককালে।

তখন অবিশ্যি তিনি থাকতেন কাঁচরাপাড়ায়। সেখানেই রেলের কারখানায় চাকরি ছিল তাঁর। উনিশশো চৌত্রিশ সনে কলকাতার হাডসন অ্যান্ড কিম্বার্লি কোম্পানিতে আরেকটু বেশি মাইনের একটা চাকরি, আর নেপাল ভট্চাজ্যি লেনে এই বাড়িটা পেয়ে পটলবাবু সস্ত্রীক কলকাতায় চলে আসেন। ক'টা বছর কেটেছিল ভালই। আপিসের সাহেব বেশ স্নেহ করতেন পটলবাবুকে। তেতাল্লিশ সনে পটলবাবু সবে একটা পাড়ায় থিয়েটারের দল গড়ব-গড়ব করছেন এমন সময় যুদ্ধের ফলে আপিসে হল ছাঁটাই, আর পটলবাবুর ন' বছরের সাধের চাকরিটি কর্পূরের মতো উবে গেল।

সেই থেকে আজ অবধি বাকি জীবনটা রোজগারের ধান্দায় কেটে গেছে পটলবাবুর। গোড়ায় একটা মনিহারি দোকান দিয়েছিলেন, সেটা বছর পাঁচেক চলে উঠে যায়। তারপর একটা বাঙালি আপিসে কেরানিগিরি করেছিলেন কিছুদিন, কিন্তু বড়কর্তা বাঙালি সাহেব মিস্টার মিটারের ঔদ্ধত্য আর অকারণ চোখ-রাঙানি সহ্য করতে না পারায় নিজেই ছেড়ে দেন সে চাকরি। তারপর এই দশটা বছর ইনসিওরেন্সের দালালি থেকে শুরু করে কী-না করেছেন পটলবাবু! কিন্তু যে-অভাব, যে-টানাটানি, সে আর দূর হয়নি কিছুতেই। সম্প্রতি তিনি একটা লোহালক্কড়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করছেন; তাঁর এক খুড়তুতো ভাই বলেছে সেখানে একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

আর অভিনয়? সে তো যেন আর-এক জন্মের কথা! অজান্তে এক-একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবছা আবছা মনে পড়ে যায়, এই আর কি! নেহাত পটলবাবুর স্মরণশক্তি ভাল, তাই কিছু ভাল ভাল পার্টের ভাল ভাল অংশ এখনও মনে আছে!—'শুন পুনঃপুনঃ গাণ্ডীবঝঙ্কার, স্বপক্ষ আকুল মহারণে। জিনি শত পবন-হুঙ্কার, পর্বত-আকার গদা করিছে ঝঙ্কার—বৃকোদর সঞ্চালনে!'...ও! ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

নরেশ দত্ত এলেন ঠিক সাড়ে-বারোটার সময়। পটলবাবু প্রায় আশা ছেড়ে দিয়ে নাইতে যাবার তোড়জোড় করছিলেন, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

'আসুন, আসুন!' পটলবাবু দরজা খুলে আগন্তুককে প্রায় ঘরের ভিতর টেনে এনে তাঁর হাতল ভাঙা চেয়ারটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন—'বসুন!'

'না, না। বসব না। নিশিকান্তবাবু আপনাকে আমার কথা বলেছেন বোধহয়...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি অবিশ্যি খুবই অবাক হয়েছি। এতদিন বাদে...'

'আপনার আপত্তি নেই তো?'

পটলবাবুর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল।

'আমাকে দিয়ে...হেঁ হেঁ...মানে চলবে তো?'

নরেশবাবু গম্ভীরভাবে একবার পটলবাবুর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'বেশ চলবে। খুব চলবে। কাজটা কিন্তু কালই।'

'কাল? রবিবার?'

'হ্যাঁ...কোনও স্টুডিয়োতে নয় কিন্তু। জায়গাটা বলে দিচ্ছি আপনাকে। মিশন রো আর বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ের ফ্যারাডে হাউসটা দেখেছেন তো? সাততলা বিল্ডিং একটা? সেইটের সামনে ঠিক সাড়ে-আটটায় পৌঁছে যাবেন। ওইখানেই কাজ। বারোটার মধ্যে ছুটি হয়ে যাবে আপনার।'

নরেশবাবু উঠে পড়লেন। পটলবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কিন্তু পার্টটা কী বললেন না?'

'পার্ট হল গিয়ে আপনার...একজন পেডেস্ট্রিয়ানের, মানে পথচারী আর কি! একজন অন্যমনস্ক, বদমেজাজি পেডেস্ট্রিয়ান।...ভাল কথা, আপনার গলাবন্ধ কোট আছে কি?'

'তা আছে বোধহয়।'

'ওটাই পরে আসবেন। ডার্ক রঙ তো?'

'বাদামি গোছের। গরম কিন্তু।'

'তা হোক না। আর আমাদের সিনটাও শীতকালের, ভালই হবে...কাল সাড়ে-আটটা, ফ্যারাডে হাউস।'

পটলবাবুর ধাঁ করে আরেকটা জরুরি প্রশ্ন মাথায় এসে গেল।

'পার্টটায় ডায়ালগ আছে তো? কথা বলতে হবে তো?'

'আলবত! স্পিকিং পার্ট!...আপনি আগে অভিনয় করেছেন তো?'

'হ্যাঁ...তা, একটু-আধটু...'

'তবে! শুধু হেঁটে যাবার জন্য আপনার কাছে আসব কেন? সে তো রাস্তা থেকে যে-কোনও একটা পেডেস্ট্রিয়ান ধরে নিলেই হল!...ডায়ালগ আছে বইকী এবং সেটা কাল ওখানে গেলেই পেয়ে যাবেন। আসি...'

নরেশ দত্ত চলে যাবার পর পটলবাবু তাঁর গিন্নির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললেন।

'যা বুঝছি—বুঝলে গিন্নি—এ পার্টটা হয়তো তেমন একটা বড় কিছু নয়; অর্থপ্রাপ্তি অবিশ্যি আছে সামান্য, কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, থিয়েটারে আমার প্রথম পার্ট কী ছিল মনে আছে তো? মৃত সৈনিকের পার্ট। স্রেফ হাঁ করে চোখ বুজে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা; আর তার থেকেই আস্তে আস্তে কোথায় উঠেছিলাম মনে আছে তো? ওয়াটস সাহেবের হ্যান্ডশেক মনে আছে? আর আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান চারু বিশ্বাসের দেওয়া সেই মডেল? অ্যাঁ? এ তো সবে সিঁড়ির প্রথম ধাপ! কী বলো অ্যাঁ? মান যশ প্রতিপত্তি খ্যাতি, যদি বেঁচে থাকি ভবে, হে মোর গৃহিণী, এ সবই লভিব আমি!...'

পটলবাবু বাহান্ন বছর বয়সে হঠাৎ তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে উঠলেন। গিন্নি বললেন, 'করো কী?'

'কিচ্ছু ভেবো না গিন্নি। শিশির ভাদুড়ি সত্তর বছর বয়সে চাণক্যের পার্টে কী লাফখানা দিতেন মনে আছে? আজ যে পুনর্যৌবন লাভ করেছি।'

'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল! সাধে কি তোমার কোনওদিন কিচ্ছু হয় না?'

'হবে হবে! সব হবে! ভাল কথা—আজ বিকেলে একটু চা খাব, বুঝেছ? আর সঙ্গে একটু আদার রস, নইলে গলাটা ঠিক...'

পরদিন সকালে মেট্রোপলিটান কোম্পানির ঘড়িতে যখন আটটা বেজে সাত মিনিট তখন পটলবাবু এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট ও মিশন রো-এর ফ্যারাডে হাউসে পৌঁছতে লাগল আর মিনিট দশেক।

বিরাট তোড়জোড় চলেছে আপিসের গেটের সামনে। তিন-চারখানা গাড়ি, তার একটা বেশ বড়—প্রায় বাস-এর মতো—তার মাথায় আবার সব জিনিসপত্তর। রাস্তার ঠিক ধারটায় ফুটপাথের উপর একটা তেপায়া কালো যন্ত্রের মতো জিনিস; তার পাশে কয়েকজন লোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। গেটের ঠিক মুখটাতে একটা তেপায়া লোহার ডাণ্ডার মাথায় আরেকটা লোহার ডাণ্ডা আড়াআড়িভাবে শোয়ানো রয়েছে, আর তার ডগা থেকে ঝুলছে একটা মৌমাছির চাকের মতো দেখতে জিনিস। এ ছাড়া ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে জনা ত্রিশেক লোক, যাদের মধ্যে অবাঙালিও লক্ষ করলেন পটলবাবু; কিন্তু এদের যে কী কাজ সেটা ঠাহর করতে পারলেন না।

কিন্তু নরেশবাবু কোথায়? একমাত্র তিনি ছাড়া তো পটলবাবুকে কেউই চেনেন না!

দুরুদুরু বুকে পটলবাবু এগিয়ে চললেন আপিসের গেটের দিকে।

বৈশাখ মাস; গলাবন্ধ খদ্দরের কোটটা গায়ে বেশ ভারী বোধ হচ্ছিল। গলার কলারের চারপাশ ঘিরে বিন্দু বিন্দু ঘাম অনুভব করলেন পটলবাবু।

'এই যে অতুলবাবু—এদিকে!'

অতুলবাবু? পটলবাবু ঘুরে দেখেন আপিসের বারান্দায় একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে নরেশবাবু

তাঁকেই ডাকছেন। নামটা ভুল করেছেন ভদ্রলোক। অস্বাভাবিক নয়। একদিনের আলাপ তো! পটলবাবু এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বললেন, 'আমার নামটা বোধহয় ঠিক নোট করা নেই আপনার। শ্রীশীতলাকান্ত রায়। অবিশ্যি পটলবাবু বলেই জানে সকলে। থিয়েটারেও ওই নামেই জানত।'

'ও! তা আপনি তো বেশ পাংচুয়াল দেখছি।'

পটলবাবু মৃদু হাসলেন।

'ন' বছর হাডসন কিম্বার্লিতে চাকরি করেছি; লেট হইনি একদিনও। নট এ সিঙ্গল ডে।'

'বেশ, বেশ। আপনি এক কাজ করুন। ওই ছায়াটায় গিয়ে একটু ওয়েট করুন। আমরা এদিকে একটু কাজ এগিয়ে নিই।'

তেপায়া যন্ত্রটার পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'নরেশ!'

'স্যার?'

'উনি কি আমাদের লোক?'

'হ্যাঁ স্যার। ইনিই...মানে, ওই ধাক্কার ব্যাপারটা...'

'ও। ঠিক আছে। এখন জায়গাটা ক্লিয়ার করো তো; শট নেব।'

পটলবাবু আপিসের পাশেই একটা পানের দোকানের ছাউনির তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বায়স্কোপ তোলা তিনি এর আগে কখনও দেখেননি। তাঁর কাছে সবই নতুন। থিয়েটারের সঙ্গে কোনও মিলই তো নেই! আর কী পরিশ্রম করে লোকগুলো। ওই ভারী যন্ত্রটাকে পিঠে করে নিয়ে এখান থেকে ওখানে রাখছে একটি একুশ-বাইশ বছরের ছোকরা। বিশ-পঁচিশ সের ওজন তো হবেই যন্ত্রটার।

কিন্তু তাঁর ডায়ালগ কই? আর তো সময় নেই বেশি। অথচ এখনও তাঁকে যে কী কথা বলতে হবে তাই জানেন না পটলবাবু।

হঠাৎ যেন একটু নার্ভাস বোধ করলেন পটলবাবু। এগিয়ে যাবেন নাকি? ওই তো নরেশবাবু; একবার তাঁকে গিয়ে বলা উচিত নয় কি? পার্ট ছোটই হোক আর বড়ই হোক, ভাল করে করতে হলে তাঁকে তো তৈরি করতে হবে সে পার্ট! না হলে এতগুলো লোকের সামনে তাঁকে যদি কথা গুলিয়ে ফেলে অপদস্থ হতে হয়? আজ প্রায় বিশ বচ্ছর অভিনয় করা হয়নি যে!

পটলবাবু এগিয়ে যেতে গিয়ে একটা চিৎকার শুনে থমকে গেলেন।

'সাইলেন্স!'

তারপর নরেশবাবুর গলা পাওয়া গেল—'এবার শট নেওয়া হবে! আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন! কথাবার্তা বলবেন না, জায়গা ছেড়ে নড়বেন না, ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসবেন না!'

তারপর আবার সেই প্রথম গলায় চিৎকার এল—'সাইলেন্স! টেকিং!' এবার পটলবাবু লোকটিকে দেখতে পেলেন। মাঝারি গোছের মোটাসোটা ভদ্রলোকটি তেপায়া যন্ত্রটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন; গলায় একটা চেন থেকে দূরবিনের মতো একটা জিনিস ঝুলছে। ইনিই কি পরিচালক নাকি? কী আশ্চর্য, পরিচালকের নামটাও যে তাঁর জেনে নেওয়া হয়নি!

এবারে পর পর আরও কতগুলো চিৎকার পটলবাবুর কানে এল—'স্টার্ট সাউন্ড!' 'রানিং!' 'অ্যাকশন!'

অ্যাকশন কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই পটলবাবু দেখলেন চৌমাথার কাছ থেকে একটা গাড়ি এসে আপিসের সামনে থামল, আর তার থেকে একটি মুখে-গোলাপি-রঙ-মাখা স্যুট-পরা যুবক দরজা খুলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে নেমে হনহনিয়ে আপিসের গেট পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। পরক্ষণেই পটলবাবু চিৎকার শুনলেন 'কাট', আর অমনই সাইলেন্স ভেঙে গিয়ে জনতার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

পটলবাবুর পাশেই এক ভদ্রলোক তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছোকরাটিকে চিনলেন তো?'

পটলবাবু বললেন, 'কই, না তো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'চঞ্চলকুমার। তরতরিয়ে উঠছে ছোকরা। একসঙ্গে চারখানা বইয়ে অভিনয় করছে।'

পটলবাবু বায়স্কোপ খুবই কম দেখেন, কিন্তু এই চঞ্চলকুমারের নাম যেন শুনেছেন দু-একবার।

কটিবাবু বোধহয় এই ছেলেটিরই প্রশংসা করছিলেন একদিন। বেশ মেক-আপ করেছে ছেলেটি! ওই বিলিতি স্যুটের বদলে ধুতি চাদর পরিয়ে ময়ূরের পিঠে চড়িয়ে দিলেই একেবারে কার্তিক ঠাকুর। কাঁচড়াপাড়ায় মনোতোষ ওরফে চিনুর চেহারা কতকটা ওইরকমই ছিল বটে; বেড়ে ফিমেল পার্ট করত চিনু!

পটলবাবু এবার পাশের ভদ্রলোকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আর পরিচালকটির নাম কী মশাই?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী, আপনি তাও জানেন না? উনি যে বরেন মল্লিক—তিনখানা ছবি পর পর হিট করেছে!'

যাক। কতগুলো দরকারি জিনিস জানা হয়ে গেল। নইলে গিন্নি যদি জিজ্ঞেস করতেন কার ছবিতে কার সঙ্গে অভিনয় করে এলে, তা হলে মুশকিলেই পড়তেন পটলবাবু।

নরেশ একভাঁড় চা নিয়ে পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন স্যার, গলাটা একটু ভিজিয়ে আলগা করে নিন। আপনার ডাক পড়ল বলে!'

পটলবাবু এবার আসল কথাটা না বলে পারলেন না।

'আমায় ডায়ালগটা যদি এই বেলা দিতেন তো—'

'ডায়ালগ? আসুন আমার সঙ্গে।'

নরেশ তেপায়া যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল, পিছনে পটলবাবু।

'এই শশাঙ্ক!'

একটি হাফশার্ট-পরা ছোকরা এগিয়ে এল নরেশের দিকে। নরেশ তাকে বলল, 'এই ভদ্রলোক ওঁর ডায়ালগ চাইছেন। একটা কাগজে লিখে দে তো। সেই ধাক্কার ব্যাপারটা...'

শশাঙ্ক পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন দাদু...এই জ্যোতি, তোর কলমটা একটু দে তো! দাদুকে ডায়ালগটা দিয়ে দিই।'

জ্যোতি ছেলেটি তার পকেট থেকে একটা লাল কলম বার করে শশাঙ্কর দিকে এগিয়ে দিল। শশাঙ্ক তার হাতের খাতা থেকে একটা সাদা পাতা ছিঁড়ে কলম দিয়ে তাতে কী জানি লিখে কাগজটা পটলবাবুকে দিল।

পটলবাবু কাগজটার দিকে চেয়ে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে—'আঃ!'

আঃ?

পটলবাবুর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। কোটটা খুলে ফেলতে পারলে ভাল হয়। গরম হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠেছে।

শশাঙ্ক বলল, 'দাদু যে গুম মেরে গেলেন? কঠিন মনে হচ্ছে?'

এরা কি তা হলে ঠাট্টা করছে? সমস্ত ব্যাপারটাই কি একটা বিরাট পরিহাস? তাঁর মতো নিরীহ নির্বিবাদী মানুষকে ডেকে এনে এতবড় শহরের এতবড় রাস্তার মাঝখানে ফেলে রঙতামাশা? এত নিষ্ঠুরও কি মানুষ হতে পারে?

পটলবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন বলুন তো?'

'শুধু "আঃ"? আর কোনও কথা নেই?'

শশাঙ্ক চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলেন কী দাদু? এ কি কম হল নাকি? এ তো রেগুলার স্পিকিং পার্ট! বরেন মল্লিকের ছবিতে স্পিকিং পার্ট—আপনি বলছেন কী? আপনি তো ভাগ্যবান লোক মশাই! জানেন, আমাদের এই ছবিতে আজ অবধি প্রায় দেড়শো লোক পার্ট করে গেছে যারা কোনও কথাই বলেনি। শুধু ক্যামেরার সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। অনেকে আবার হাঁটেওনি, স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকেছে। কারুর কারুর মুখ পর্যন্ত দেখা যায়নি। আজকেও দেখুন না—এই যে ওঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন, ল্যাম্পপোস্টের পাশে; ওঁরা সবাই আছেন আজকের সিনে, কিন্তু একজনেরও একটিও কথা নেই। এমনকী আমাদের যে নায়ক চঞ্চলকুমার—তারও আজ কোনও ডায়ালগ নেই। কেবলমাত্র আপনার কথা, বুঝেছেন?'

এবার জ্যোতি বলে ছেলেটি এগিয়ে এসে পটলবাবুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শুনুন দাদু—ব্যাপারটা বুঝে নিন। চঞ্চলকুমার হলেন এই আপিসের বড় চাকুরে। সিনটায় আমরা দেখাচ্ছি যে আপিসে একটা ক্যাশ ভাঙার খবর পেয়ে উনি হন্তদন্ত হয়ে এসে দৌড়ে আপিসে ঢুকছেন। ঠিক সেই সময় সামনে পড়ে গেছেন আপনি—একজন পেডেস্ট্রিয়ান—বুঝেছেন? লাগছে ধাক্কা—বুঝেছেন? আপনি ধাক্কা খেয়ে বলছেন 'আঃ', আর চঞ্চল আপনার দিকে দৃকপাত না করে ঢুকে যাচ্ছে আপিসে। আপনাকে অগ্রাহ্য করাতে তার মানসিক অবস্থাটা ফুটে বেরুচ্ছে—বুঝেছেন? ব্যাপারটা কত ইম্পর্ট্যান্ট ভেবে দেখুন!'

এবার শশাঙ্ক এগিয়ে এসে বলল, 'শুনলেন তো? যান, এবার একটু ওদিকটায় যান দিকি! এদিকটায় ভিড় করলে কাজের অসুবিধা হবে। আরেকটা শট আছে, তারপর আপনার ডাক পড়বে।'

পটলবাবু আস্তে আস্তে আবার পানের দোকানটার দিকে সরে গেলেন। ছাউনির তলায় পৌঁছে হাতের কাগজটার দিকে আড়দৃষ্টিতে দেখে, আশেপাশের কেউ তাঁর দিকে দেখছে কি না দেখে কাগজটা কুণ্ডলী পাকিয়ে নর্দমার দিকে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

'আঃ!'

একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস পটলবাবুর বুকের ভিতর থেকে উপরে উঠে এল।

শুধু একটিমাত্র কথা—কথাও না, শব্দ—আঃ।

গরম অসহ্য হয়ে আসছে। গায়ের কোটটার মনে হয় যেন মনখানেক ওজন। আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না; পা অবশ হয়ে গেছে।

পটলবাবু এগিয়ে গিয়ে পানের দোকানের ওদিকের আপিসটার দরজার সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন। সাড়ে-ন'টা বাজে। করালীবাবুর বাড়িতে শ্যামাসংগীত হয় রবিবার সকালে; পটলবাবু নিয়মিত গিয়ে শোনেন। বেশ লাগে। সেইখানেই যাবেন নাকি চলে? গেলে ক্ষতিটা কী? এইসব বাজে, খেলো লোকের সংসর্গে রবিবারের সকালটা মাটি করে লাভ আছে কিছু? আর অপমানের বোঝাটাও যে বইতে হবে সেইসঙ্গে।

'সাইলেন্স!'

দুর! নিকুচি করেছে তোর সাইলেন্সের। যা-না কাজ, তার বত্রিশ গুণ ফুটুনি আর ভড়ং। আর চেয়ে থিয়েটারের কাজ—

থিয়েটার...থিয়েটার...

অনেককাল আগের একটা ক্ষীণ স্মৃতি পটলবাবুর মনের মধ্যে জেগে উঠল। একটা গম্ভীর সংযত অথচ সুরেলা কণ্ঠস্বরে বলা কতগুলো অমূল্য উপদেশের কথা—'একটা কথা মনে রেখো পটল। যত ছোট পার্টই তোমাকে দেওয়া হোক, তুমি জেনে রেখো তাতে কোনও অপমান নেই। শিল্পী হিসেবে তোমার কৃতিত্ব হবে সেই ছোট্ট পার্টটি থেকেও শেষ রসটুকু নিংড়ে বার করে তাকে সার্থক করে তোলা। থিয়েটারের কাজ হল পাঁচজনে মিলেমিশে কাজ। সকলের সাফল্য জড়িয়েই নাটকের সাফল্য।'

পাকড়াশি মশাই দিয়েছিলেন এ উপদেশ পটলবাবুকে। গগন পাকড়াশি। পটলবাবুর নাট্যগুরু ছিলেন তিনি। আশ্চর্য অভিনেতা ছিলেন গগন পাকড়াশি, অথচ দম্ভের লেশমাত্র ছিল না তাঁর মনে। ঋষিতুল্য মানুষ আর শিল্পীর সেরা শিল্পী।

আরও একটা কথা বলতেন পাকড়াশি মশাই—'নাটকের এক-একটি কথা হল এক-একটি গাছের ফল। সবাই নাগাল পায় না সে-ফলের। যারা পায় তারাও হয়তো তার খোসা ছাড়াতে জানে না। কাজটা আসলে হল তোমার—অভিনেতার। তোমাকে জানতে হবে কী করে সে ফল পেড়ে তার খোসা ছাড়িয়ে তার থেকে রস নিংড়ে বার করে সেটা লোকের কাছে পরিবেশন করতে হয়।'

গগন পাকড়াশির কথা মনে হতে পটলবাবুর মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে এল।

সত্যিই কি তাঁর আজকের পার্টটার মধ্যে কিছুই নেই? একমাত্র কথা তাঁকে বলতে হবে—'আঃ'। কিন্তু একটি কথা বলেই কি এককথায় তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ—পটলবাবু বারবার নানান সুরে কথাটাকে আওড়াতে লাগলেন। আওড়াতে আওড়াতে ক্রমে তিনি একটি আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করলেন। ওই আঃ কথাটাই নানান সুরে নানান ভাবে বললে মানুষের মনের নানান অবস্থা প্রকাশ করছে। চিমটি খেলে মানুষে যেভাবে আঃ

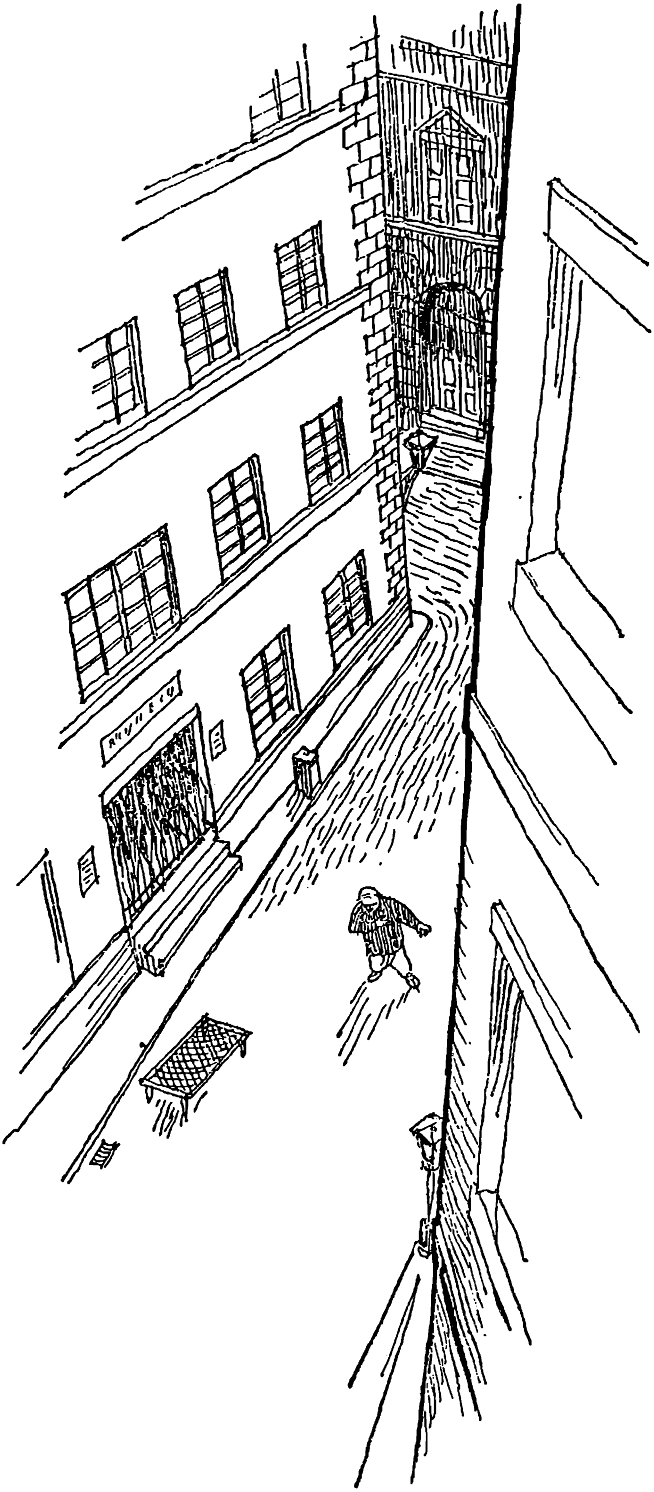

বলে, গরমে ঠাণ্ডা শরবত খেয়ে মোটেই সেভাবে আঃ বলে না। এ দুটো আঃ একেবারে আলাদা রকমের; আবার আচমকা কানে সুড়সুড়ি খেলে বেরোয় আরও আরেক রকম আঃ। এ ছাড়া আরও কতরকম আঃ রয়েছে—দীর্ঘশ্বাসের আঃ, তাচ্ছিল্যের আঃ, অভিমানের আঃ, ছোট করে বলা আঃ, লম্বা করে বলা আ—ঃ, চেঁচিয়ে বলা আঃ, মৃদুস্বরে আঃ, চড়া গলায় আঃ, খাদে গলায় আঃ, আবার 'আ'-টাকে খাদে শুরু করে বিসর্গটায় সুর চড়িয়ে আঃ—আশ্চর্য! পটলবাবুর মনে হল তিনি যেন ওই একটি কথা নিয়ে একটা আস্ত অভিধান লিখে ফেলতে পারেন।

এত নিরুৎসাহ হচ্ছিলেন কেন তিনি? এই একটা কথা যে একেবারে সোনার খনি। তেমন তেমন অভিনেতা তো এই একটা কথাতেই বাজিমাত করে দিতে পারে!

'সাইলেন্স!'

পরিচালক মশাই ওদিকে আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন। পটলবাবু দেখলেন জ্যোতি ছোকরাটি তাঁর কাছেই ভিড় সরাচ্ছে। ছোকরাকে একটা কথা বলা দরকার। পটলবাবু দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তার কাছে।

'আমার কাজটা হতে আর কতক্ষণ দেরি ভায়া?'

'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন দাদু? একটু ধৈর্য ধরতে হয় এসব ব্যাপারে। আরও আধ ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করুন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! অপেক্ষা করব বইকী! আমি এই কাছাকাছিই আছি।'

'দেখবেন, আবার সটকাবেন না যেন।'

জ্যোতি চলে গেল।

'স্টার্ট সাউন্ড!'

পটলবাবু পা টিপে টিপে শব্দ না করে রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকের একটা নিরিবিলি গলিতে ঢুকে পড়লেন। ভালই হল। হাতে সময় পাওয়া গেছে কিছুটা! এরা যখন রিহার্সাল-টিহার্সালের বিশেষ ধার ধারছে না, তখন তিনি নিজেই নিজের অংশটা অভ্যাস করে নেবেন। গলিটা নির্জন। একে আপিসপাড়া—বাসিন্দা এমনিতেই কম—তায় রবিবার। যে ক'জন লোক ছিল সবাই ফ্যারাডে হাউসের দিকে বায়স্কোপের তামাশা দেখতে চলে গেছে।

পটলবাবু গলা খাঁকরে নিয়ে আজকের এই বিশেষ দৃশ্যের বিশেষ 'আঃ' শব্দটি আয়ত্ত করতে আরম্ভ করলেন। আর সেইসঙ্গে আচমকা ধাক্কা খেলে মুখটা কীরকম বিকৃত হতে পারে, হাতদুটো কতখানি বেঁকে কীরকম ভাবে ছিটিয়ে উঠতে পারে, আঙুলগুলো কতখানি ফাঁক হতে পারে, আর পায়ের অবস্থা কীরকম হতে পারে—এই সবই একটা কাচের জানলায় নিজের ছায়া দেখে ঠিক করে নিতে লাগলেন।

ঠিক আধঘণ্টা পরেই পটলবাবুর ডাক পড়ল; এখন আর তাঁর মনে কোনও নিরুৎসাহের ভাব নেই। উদ্বেগও কেটে গেছে তাঁর মন থেকে। রয়েছে কেবল একটা চাপা উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ; পঁচিশ বছর আগে স্টেজে অভিনয় করার সময় একটা বড় দৃশ্যে নামবার আগে যে ভাবটা তিনি অনুভব করতেন, সেই ভাব।

পরিচালক বরেন মল্লিক পটলবাবুকে কাছে ডেকে বললেন, 'আপনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ। আমি প্রথম বলব "স্টার্ট সাউন্ড"। তার উত্তরে ভেতর থেকে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট বলবে "রানিং"। বলামাত্র ক্যামেরা চলতে আরম্ভ করবে। তারপর আমি বলব "অ্যাকশন"! বললেই আপনি ওই থামের কাছটা থেকে এইদিকে হেঁটে আসতে শুরু করবেন, আর নায়ক এই গাড়ির দরজা থেকে যাবে ওই আপিসের গেটের দিকে। আন্দাজ করে নেবেন যাতে ফুটপাথের এইরকম জায়গাটায় কলিশনটা হয়। নায়ক আপনাকে অগ্রাহ্য করে ঢুকে যাবে আপিসে, আর আপনি বিরক্ত হয়ে 'আঃ' বলে আবার হাঁটতে শুরু করবেন। কেমন?'

পটলবাবু বললেন, 'একটা রিহার্সাল...?'

'না না,' বরেনবাবু বাধা দিলেন। 'মেঘ করে আসছে মশাই। রিহার্সালের টাইম নেই। রোদ থাকতে থাকতে নেওয়া দরকার শটটা।'

'কেবল একটা কথা...'

'আবার কী?'

গলিতে রিহার্সাল দেবার সময় পটলবাবুর একটা আইডিয়া মাথায় এসেছিল, সেটা সাহস করে বলে ফেললেন।

'আমি ভাবছিলাম—ইয়ে, আমার হাতে যদি একটা খবরের কাগজ থাকে, আর আমি যদি সেটা পড়তে পড়তে ধাক্কাটা খাই...মানে, অন্যমনস্কতার ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে—'

বরেন মল্লিক তাঁর কথাটা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, 'বেশ তো...ও মশাই, আপনার যুগান্তরটা এই ভদ্রলোককে দিন তো...হ্যাঁ। এইবার এই থামের পাশে আপনার জায়গায় গিয়ে রেডি হয়ে যান। চঞ্চল, তুমি রেডি?'

গাড়ির পাশ থেকে নায়ক উত্তর দিলেন, 'ইয়েস স্যার।'

'গুড। সাইলেন্স!'

বরেন মল্লিক হাত তুললেন, তারপর হঠাৎ তক্ষুনি হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওহো-হো, এক মিনিট। কেষ্ট, ভদ্রলোককে একটা গোঁফ দিয়ে দাও তো চট করে। ক্যারেক্টারটা পুরোপুরি আসছে না।'

'কীরকম গোঁফ স্যার? ঝুঁপো, না চাড়া-দেওয়া, না বাটারফ্লাই? রেডি আছে সবই।'

'বাটারফ্লাই, বাটারফ্লাই। চট করে দাও, দেরি কোরো না।'

একটি কালো বেঁটে ব্যাকব্রাশ-করা ছোকরা পটলবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতের একটা টিনের বাক্স থেকে একটা ছোট্ট চৌকো কালো গোঁফ বার করে আঠা লাগিয়ে পটলবাবুর নাকের নীচে সেঁটে দিল।

পটলবাবু বললেন, 'দেখো বাপু, ধাক্কাধাক্কিতে খুলে যাবে না তো?'

ছোকরা হেসে বলল, 'ধাক্কা কেন? আপনি দারা সিং-এর সঙ্গে কুস্তি করুন না—তাও খুলবে না।'

লোকটার হাতে আয়না ছিল, পটলবাবু টুক করে তাতে একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিলেন। সত্যিই তো! বেশ মানিয়েছে তো! খাসা মানিয়েছে। পটলবাবু পরিচালকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে মনে মনে তারিফ না করে পারলেন না।

'সাইলেন্স! সাইলেন্স!'

পটলবাবুর গোঁফ পরা দেখে দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, বরেন মল্লিকের হুঙ্কারে সেটা থেমে গেল।

পটলবাবু লক্ষ করলেন সমবেত জনতার বেশিরভাগ লোকই তাঁরই দিকে চেয়ে আছে।

'স্টার্ট সাউন্ড!'

পটলবাবু গলাটা খাঁকরিয়ে নিলেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ পা আন্দাজ হাঁটলে পর পটলবাবু ধাক্কার জায়গায় পৌঁছবেন। আর চঞ্চলকুমারের হাঁটতে হবে বোধহয় চার পা। সুতরাং দু'জনে যদি একসঙ্গে রওনা হন, তা হলে পটলবাবুকে একটু বেশি জোরে হাঁটতে হবে তা না হলে—

'রানিং।'

পটলবাবু খবরের কাগজটা তুলে মুখের সামনে ধরলেন। দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে ছ'আনা বিস্ময় মিশিয়ে আঃ-টা বললে পরেই—

'অ্যাকশন!'

জয় গুরু!

খচ খচ খচ খচ খচ—ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্‌! পটলবাবু হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলেন। নায়কের মাথার সঙ্গে তাঁর কপালের ঠোকাঠুকি লেগেছে। একটা তীব্র যন্ত্রণা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই এক প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে আশ্চর্যভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে পটলবাবু দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে তিন আনা বিস্ময় ও তিন আনা যন্ত্রণা মিশিয়ে 'আঃ' শব্দটা উচ্চারণ করে কাগজটা সামলে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলেন।

'কাট!'

'ঠিক হল কি?' পটলবাবু গম্ভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বরেনবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন।

'বেড়ে হয়েছে! আপনি তো ভাল অভিনেতা মশাই!...সুরেন, কালো কাচটা একবার চোখে লাগিয়ে দেখো তো মেঘের কী অবস্থা।'

শশাঙ্ক এসে বলল, 'দাদুর চোট লাগেনি তো?'

চঞ্চলকুমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে এসে বললেন, 'ধন্যি মশাই আপনার টাইমিং! বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়—ওঃ!'

নরেশ ভিড় ঠেলে এসে বলল, 'আপনি এই ছায়াটায় দাঁড়ান একটু। আরেকটা শট নিয়েই আপনার ব্যাপারটা করে দিচ্ছি।'

পটলবাবু ভিড় ঠেলে ঘাম মুছতে মুছতে আবার পানের দোকানের ছায়াটায় এসে দাঁড়ালেন। মেঘে সূর্য ঢেকে গরমটা একটু কমেছে; কিন্তু পটলবাবু তাও কোটটা খুলে ফেললেন। আঃ, কী আরাম! একটা গভীর আনন্দ ও আত্মতৃপ্তির ভাব ধীরে ধীরে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

তাঁর আজকের কাজ সত্যিই ভাল হয়েছে। এতদিন অকেজো থেকেও তাঁর শিল্পীমন ভোঁতা হয়ে যায়নি। গগন পাকড়াশি আজ তাকে দেখলে সত্যিই খুশি হতেন। কিন্তু এরা কি সেটা বুঝতে পেরেছে? পরিচালক বরেন মল্লিক কি তা বুঝেছেন? এই সামান্য কাজ নিখুঁতভাবে করার জন্য তাঁর যে আগ্রহ আর পরিশ্রম, তার কদর কি এরা করতে পারে? সে ক্ষমতা কি এদের আছে? এরা বোধহয় লোক ডেকে এনে কাজ করিয়ে টাকা দিয়েই খালাস। টাকা! কত টাকা? পাঁচ, দশ, পঁচিশ? টাকার তাঁর অভাব ঠিকই—কিন্তু আজকের এই যে আনন্দ, তার কাছে পাঁচটা টাকা আর কী?...

মিনিট দশেক পরে নরেশ পানের দোকানের কাছে পটলবাবুর খোঁজ করতে গিয়ে ভদ্রলোককে আর পেল না। সে কী, টাকা না নিয়েই চলে গেল নাকি লোকটা? আচ্ছা ভোলা মন তো!

বরেন মল্লিক হাঁক দিলেন, 'রোদ বেরিয়েছে ! সাইলেন্স! সাইলেন্স!...ওহে নরেশ, চলে এসো, ভিড় সামলাও!'

সন্দেশ, শ্রাবণ ১৩৭০

বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম

নিউ মার্কেটের কালীচরণের দোকান থেকে প্রতি সোমবার আপিস-ফেরতা বই কিনে বাড়ি ফেরেন বিপিন চৌধুরী। যত রাজ্যের ডিটেকটিভ বই, রহস্যের বই আর ভূতের গল্প। একসঙ্গে অন্তত খান পাঁচেক বই না কিনলে তাঁর এক সপ্তাহের খোরাক হয় না। বাড়িতে তিনি একা মানুষ। লোকের সঙ্গে মেলামেশা তাঁর ধাতে আসে না, আড্ডার বাতিক নেই, বন্ধুপরিজনের সংখ্যাও কম। সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যেসব কাজের লোক আসেন, তাঁরা কাজের কথা সেরে উঠে চলে যান। যাঁরা ওঠেন না বা উঠতে চান না, বিপিনবাবু তাঁদের সোয়া আটটা বাজলেই বলেন—'আমার ডাক্তারের আদেশ আছে—সাড়ে আটটায় খাওয়া সারতে হবে। কিছু মনে করবেন না...।' খাওয়ার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম, তারপর গল্পের বই হাতে নিয়ে সোজা বিছানায়। এই নিয়ম যে কতদিন ধরে চলেছে বিপিনবাবুর নিজেরই তার হিসেব নেই।

আজ কালীচরণের দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিপিনবাবুর খেয়াল হল আরেকটি লোক যেন তাঁর পাশে কিছুক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। বিপিনবাবু মুখ তুলে দেখেন একটি গোলগাল অমায়িক চেহারার ভদ্রলোক তাঁরই দিকে চেয়ে হাসছেন।

'আমায় চিনতে পারছেন না বোধহয়?'

বিপিনবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত বোধ করলেন। কই, এঁর সঙ্গে তো কোনওদিন আলাপ হয়েছে বলে তাঁর মনে পড়ে না। এমন কোনও মুখও তো মনে পড়ছে না তাঁর।

'অবিশ্যি আপনি কাজের মানুষ। অনেক রকম লোকের সঙ্গে দেখা হয় তো রোজ—তাই বোধহয়...'

'আমার কি আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে এর আগে?' বিপিনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রলোক যেন এবার একটু অবাক হয়েই বললেন, 'আজ্ঞে সাতদিন দু'বেলা সমানে দেখা হয়েছে। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলুম—সেই গাড়িতে আপনি হুড্রু ফল্‌স দেখতে গেলেন। সেই নাইনটিন ফিফ্‌টি-এইটে—রাঁচিতে। আমার নাম পরিমল ঘোষ।'

'রাঁচি?' বিপিনবাবু এবার বুঝলেন যে, ভুল তাঁর হয়নি, হয়েছে এই লোকটিরই। কারণ বিপিনবাবু কোনওদিন রাঁচি যাননি। যাবার কথা হয়েছে অনেকবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এবার বিপিনবাবু একটু হেসে বললেন, 'আমি কে তা আপনি জানেন কী?'

ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে জিভ কেটে বললেন, 'আপনি কে তা জানব না? বলেন কী? বিপিন চৌধুরীকে কে না জানে?'

বিপিনবাবু এবার বইয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'কিন্তু তাও আপনার ভুল হয়েছে। ওরকম হয় মাঝে মাঝে। আমি রাঁচি যাইনি কখনও।'

ভদ্রলোক এবার বেশ জোরে হেসে উঠলেন।

'কী বলছেন মিস্টার চৌধুরী? ঝরনা দেখতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে আপনার হাঁটু ছড়ে গেল। আমিই শেষটায় আয়োডিন এনে দিলুম। পরদিন নেতারহাট যাবার জন্য আমি গাড়ি ঠিক করেছিলুম—আপনি পায়ের ব্যথার জন্য যেতে পারলেন না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না? আপনার চেনা আরেকজন লোকও তো গেস্‌লেন সেবার—দীনেশ মুখুজ্যে। আপনি ছিলেন একটা বাংলো ভাড়া করে—বললেন হোটেলের খাবার আপনার ভাল লাগে না—তার চেয়ে বাবুর্চি দিয়ে রান্না করিয়ে নেওয়া ভাল। দীনেশ মুখুজ্যে ছিলেন তাঁর বোনের বাড়িতে। আপনাদের দু'জনের সেই তর্ক লেগেছিল একদিন চাঁদে যাবার ব্যাপার নিয়ে—মনে নেই? সব ভুলে গেলেন? আরও বলছি—আপনার কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ

ছিল—তাতে গল্পের বই থাকত। বাইরে গেলে নিয়ে যেতেন। কেমন—ঠিক কি না?'

বিপিনবাবু এবার গম্ভীর সংযত গলায় বললেন, 'আপনি ফিফ্‌টি-এইটের কোন মাসের কথা বলছেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মহালয়ার ঠিক পরেই। হয় আশ্বিন, নয় কার্তিক।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না। পুজোয় সে বছর আমি ছিলুম কানপুরে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। আপনি ভুল করলেন। নমস্কার।'

কিন্তু ভদ্রলোক গেলেন না। অবাক অপলক দৃষ্টিতে বিপিনবাবুর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলে যেতে লাগলেন, 'কী আশ্চর্য! একদিন সন্ধ্যাবেলা আপনার বাংলোর দাওয়ায় বসে চা খেলুম। আপনি আপনার ফ্যামিলির কথা বললেন—বললেন, আপনার ছেলেপিলে নেই, আপনার স্ত্রী বারো-তেরো বছর আগে মারা গেছেন। একমাত্র ভাই পাগল ছিলেন, তাই আপনি পাগলা গারদ দেখতে যেতে চাইলেন না। বললেন, ভাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়...'

বিপিনবাবু যখন বইয়ের দামটা দিয়ে দোকান থেকে বেরোচ্ছেন তখনও ভদ্রলোক তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন।

বারট্রাম স্ট্রিটে লাইটহাউস সিনেমার গায়ে বিপিন চৌধুরীর বুইক গাড়িটা লাগানো ছিল। তিনি গাড়িতে পৌঁছে ড্রাইভারকে বললেন, 'একটু গঙ্গার ধারটায় ঘুরে চলো তো সীতারাম।'

চলন্ত গাড়িতে বসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতেই বিপিনবাবুর আফসোস হল। বাজে ভণ্ড লোকটাকে এতটা সময় কেন মিছিমিছি দিলেন তিনি! রাঁচি তো তিনি যাননি, কখনওই যেতে পারেন না। মাত্র ছ-সাত বছর আগেকার স্মৃতি মানুষে অত সহজে ভুলতে পারে না, এক যদি না—

বিপিনবাবুর মাথা হঠাৎ বন করে ঘুরে গেল।

এক যদি না তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তাই বা হয় কী করে? তিনি তো দিব্যি আপিসে কাজ করে যাচ্ছেন। এত বিরাট আপিস—এত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কোথাও তো কোনও ত্রুটি হচ্ছে বলে তিনি জানেন না। আজও তো একটা জরুরি মিটিং-এ আধঘণ্টার বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। আশ্চর্য! অথচ—

অথচ লোকটা তাঁর এত খবর রাখল কী করে? এ যে একেবারে নাড়ি-নক্ষত্র জেনে বসে আছে। বইয়ের ব্যাগ, স্ত্রীর মৃত্যু, ভাইয়ের মাথা খারাপ! ভুল করেছে কেবল ওই রাঁচির ব্যাপারে। ভুল কেন—জেনেশুনে মিথ্যে বলছে। আটান্ন সালের পুজোয় তিনি রাঁচি যাননি; গিয়েছিলেন কানপুরে, তাঁর বন্ধু হরিদাস বাগচির বাড়িতে। হরিদাস লিখলেই—নাঃ, হরিদাসকে লেখার উপায় নেই।

বিপিনবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল হরিদাস বাগচি আজ মাসখানেক হল সস্ত্রীক জাপানে গেছেন তাঁর ব্যবসার ব্যাপারে। জাপানের ঠিকানা বিপিনবাবু জানেন না। কাজেই চিঠি লিখে প্রমাণ আনানোর রাস্তা বন্ধ।

কিন্তু প্রমাণের প্রয়োজনটাই বা কোথায়। এমন যদি হত যে, উনিশশো আটান্ন সালের আশ্বিন মাসে রাঁচিতে কোনও খুনের জন্য পুলিশ তাঁকে দায়ী করার চেষ্টা করছে, তখনই তাঁর চিঠির প্রয়োজন হত হরিদাস বাগচির কাছ থেকে। এখন তো প্রমাণের কোনও দরকার নেই। তিনি নিজে জানেন তিনি রাঁচি যাননি। ব্যস, ল্যাঠা চুকে গেল।

গঙ্গার হাওয়াতে বিপিন চৌধুরীর মাথা অনেক ঠাণ্ডা হলেও, মনের মধ্যে একটা খটকা, একটা অসোয়াস্তি বোধ যেন থেকেই গেল!

হেস্টিংস-এর কাছাকাছি এসে বিপিনবাবু তাঁর প্যান্টের কাপড়টা গুটিয়ে উপরে তুলে দেখলেন যে, ডান হাঁটুতে একটা এক ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগ রয়েছে। সেটা কবেকার দাগ তা বোঝবার কোনও উপায় নেই। ছেলেবেলায় কি কখনও হোঁচট খেয়ে হাঁটু ছড়েনি বিপিনবাবুর? অনেক চেষ্টা করেও সেটা তিনি মনে করতে পারলেন না।

চড়কডাঙার মোড়ের কাছাকাছি এসে তাঁর দীনেশ মুখুজ্যের কথাটা মনে পড়ল। লোকটা বলছিল দীনেশ মুখুজ্যে ছিল রাঁচিতে ওই একই সময়ে। তা হলে দীনেশকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়। সে থাকে কাছেই—বেণীনন্দন স্ট্রিট। এখনই যাবেন কি তার কাছে? কিন্তু যদি রাঁচি যাবার ব্যাপারটা মিথ্যেই

হয়—তা হলে দীনেশকে সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে তো সে বিপিনবাবুকে পাগল ঠাওরাবে। না না—এ ছেলেমানুষি তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। নিজেকে সেধে সেধে এইভাবে বোকা বানানো কোনওমতেই চলতে পারে না। আর দীনেশের বিদ্রূপ যে কত নির্মম হতে পারে তার অভিজ্ঞতা বিপিনবাবুর আছে।...

বাড়ি এসে ঠাণ্ডা ঘরে ঠাণ্ডা শরবত খেয়ে বিপিনবাবুর উদ্বেগটা অনেক কম বলে মনে হল। যতসব বাউন্ডুলের দল। নিজেদের কাজকর্ম নেই, তাই কাজের লোকদের ধরে ধরে বিব্রত করা।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে নতুন বইটা পড়তে পড়তে বিপিনবাবু নিউ মার্কেটের ভদ্রলোকটির কথা ভুলেই গেলেন।

পরদিন আপিসে কাজ করতে করতে বিপিনবাবু লক্ষ করলেন যে, যতই সময় যাচ্ছে ততই যেন গতকালের ঘটনাটা তাঁর স্মৃতিতে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে আসছে। সেই গোলগাল মুখ, সেই ঢুলুঢুলু অমায়িক চাহনি, আর সেই হাসি। তাঁর এত ভিতরের খবরই যদি লোকটা নির্ভুল জেনে থাকে, তবে রাঁচির ব্যাপারটায় সে এত ভুল করল কী করে?

লাঞ্চের ঠিক আগে—অর্থাৎ একটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময়—বিপিনবাবু আর থাকতে না পেরে টেলিফোনের ডিরেক্টরিটা খুলে বসলেন। দীনেশ মুখুজ্যেকে ফোন করতে হবে একটা। ফোনই ভাল। অপ্রস্তুত হবার সম্ভাবনাটা কম।

টু-থ্রি-ফাইভ-সিক্স-ওয়ান-সিক্স।

বিপিনবাবু ডায়াল করলেন।

'হ্যালো।'

'কে, দীনেশ? আমি বিপিন কথা বলছি।'

'কী খবর?'

'ইয়ে ফিফটি এইটের একটা ঘটনা তোমার মনে আছে কিনা জানবার জন্য ফোন করছি।'

'ফিফটি এইট? কী ঘটনা?'

'সে বছরটা কি তুমি কলকাতাতেই ছিলে? আগে সেইটে আমার জানা দরকার।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। ফিফটি এইট—আটান্ন...দাঁড়াও, আমার ডায়েরি দেখি। একটু ধরো।'

একটুক্ষণ চুপচাপ। বিপিনবাবু তাঁর বুকের ভিতরে একটা দুরুদুরু কাঁপুনি অনুভব করলেন। প্রায় এক মিনিট পরে আবার দীনেশ মুখুজ্যের গলা পাওয়া গেল।

'হ্যাঁ, পেয়েছি। আমি বাইরে গেসলাম—দু'বার।'

'কোথায়?'

'একবার গেসলাম ফেব্রুয়ারিতে—কাছে—কেষ্টনগর—আমার এক ভাগনের বিয়েতে। আরেকবার—ও, এটা তো তুমি জানোই। সেই রাঁচি। সেই যে যেবার তুমিও গেলে। ব্যস। কিন্তু কেন বলো তো?'

'না। একটা দরকার ছিল। ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ...'

বিপিনবাবু টেলিফোনটা রেখে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর কান ভোঁ ভোঁ করছে, হাত পা যেন সব কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সঙ্গে টিফিনের বাক্সে স্যান্ডউইচ ছিল, সেটা আর তিনি খেলেন না। খাবার কোনও ইচ্ছেই হল না। তাঁর খিদে চলে গেছে।

লাঞ্চ টাইম শেষ হয়ে যাবার পর বিপিনবাবু বুঝতে পারলেন, এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে আপিসে বসে কাজ করা অসম্ভব। তাঁর পঁচিশ বছরের কর্মজীবনে এর আগে এরকম কখনও হয়নি। নিরলস কর্মী বলে বিপিনবাবুর একটা খ্যাতি ছিল। কর্মচারীরা তাঁকে বাঘের মতো ভয় করত। যত বিপদই আসুক, যতবড় সমস্যারই সামনে পড়তে হোক, বিপিনবাবুর কোনওদিন মতিভ্রম হয়নি। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করে সবসময়ে সব বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন তিনি।

আজ কিন্তু তাঁর সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে!

আড়াইটের সময় বাড়ি ফিরে, শোয়ার ঘরের সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে মনটাকে

প্রকৃতিস্থ করে, কী করা উচিত সেটা ভাববার চেষ্টা করলেন বিপিনবাবু। মানুষ মাথায় চোট খেয়ে বা অন্য কোনওরকম অ্যাক্সিডেন্টের ফলে মাঝে মাঝে পূর্বস্মৃতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আর সব মনে আছে, শুধু একটা বিশেষ ঘটনা মনে নেই—এর কোনও উদাহরণ তিনি আর কখনও পাননি। রাঁচি যাবার ইচ্ছে তাঁর অনেকদিন থেকেই ছিল। সেই রাঁচিই গেছেন, অথচ গিয়ে ভুলে গেলেন, এ একেবারে অসম্ভব!

বাইরে কোথাও গেলে বিপিনবাবু তাঁর বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু এখন যে বেয়ারাটা আছে সে নতুন লোক। সাত বছর আগে তাঁর বেয়ারা ছিল রামস্বরূপ। তিনি রাঁচি গিয়ে থাকলে সেও নিশ্চয়ই যেত, কিন্তু এখন সে আর নেই, তিন বছর হল নেই।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপিনবাবু একাই কাটালেন তাঁর ঘরে। মনে মনে স্থির করলেন আজ কেউ এলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না।

সাতটা নাগাদ চাকর এসে খবর দিল তাঁর সঙ্গে ধনী ব্যবসায়ী শেঠ গিরিধারীপ্রসাদ দেখা করতে এসেছেন। জাঁদরেল লোক গিরিধারীপ্রসাদ। কিন্তু বিপিনবাবুর মানসিক অবস্থা তখন এমনই যে, তিনি বাধ্য হয়ে চাকরকে বলে দিলেন যে, তাঁর পক্ষে নীচে নামা সম্ভব নয়। চুলোয় যাক গিরিধারীপ্রসাদ!

সাড়ে সাতটায় আবার চাকরের আগমন। বিপিনবাবুর তখন সবে একটা তন্দ্রার ভাব এসেছে, একটা দুঃস্বপ্নের গোড়াটা শুরু হয়েছে, এমন সময় চাকরের ডাকে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আবার কে এল? চাকর বলল, চুনিবাবু! বলছে ভীষণ জরুরি দরকার।

দরকার যে কী তা বিপিনবাবু জানেন। চুনি তাঁর স্কুলের সহপাঠী। সম্প্রতি দুরবস্থায় পড়েছে, ক'দিন থেকেই তাঁর কাছে আসছে একটা কোনও চাকরির আশায়। বিপিনবাবুর পক্ষে তার জন্য কিছু করা সম্ভব নয়, তাই প্রতিবারই তিনি তাকে না বলে দিয়েছেন, আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক তুমি চুনি!

বিপিনবাবু অত্যন্ত বিরক্তভাবে চাকরটাকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে, শুধু আজ নয়—বেশ কিছুদিন তাঁর পক্ষে চুনির সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না।

চাকর ঘর থেকে চলে যেতেই বিপিনবাবুর খেয়াল হল যে, চুনির হয়তো আটান্নর ঘটনা কিছুটা মনে থাকতে পারে। তাকে একবার জিজ্ঞেস করাতে দোষ কী?

বিপিনবাবু তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈঠকখানায় হাজির হলেন। চুনি যাবার জন্য উঠে পড়েছিল, বিপিনবাবুকে নেমে আসতে দেখে সে যেন একটু আশান্বিত হয়েই ঘুরে দাঁড়াল।

বিপিনবাবু ভণিতা না করেই বললেন, 'শোনো চুনি, তোমার কাছে একটা—মানে, একটু বেখাপ্পা প্রশ্ন আছে। তোমার তো স্মরণশক্তি বেশ ভাল ছিল বলে জানি—আর আমার বাড়িতে তো তুমি অনেক বছর ধরেই মাঝে মাঝে যাতায়াত করছ। ভেবে দেখো তো মনে পড়ে কিনা—আমি কি আটান্ন সালে রাঁচি গিয়েছিলাম?'

চুনি বলল, 'আটান্ন? আটান্নই তো হবে। না কি উনষাট?'

'রাঁচি যাওয়াটা নিয়ে তোমার কোনও সন্দেহ নেই?'

চুনি এবার রীতিমতো অবাক হয়ে গেল।

'তোমার কি যাবার ব্যাপারটা নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে?'

'আমি গিয়েছিলাম? তোমার ঠিক মনে আছে?'

চুনি সোফা থেকে উঠেছিল, সেটাতেই আবার বসে পড়ল। তারপর সে বিপিন্‌ চৌধুরীর দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, 'বিপিন, তুমি কি নেশাটেশা ধরেছ নাকি আজকাল? এদিকে তো তোমার কোনও বদনাম ছিল না! তুমি কড়া মেজাজের লোক, পুরনো বন্ধুদের প্রতি তোমার সহানুভূতি নেই—এ সবই তো জানতুম! কিন্তু তোমার তো মাথাটা পরিষ্কার ছিল; অন্তত কিছুদিন আগে অবধি ছিল!'

বিপিনবাবু কম্পিতস্বরে বললেন, 'তোমার মনে আছে আমার যাবার কথা?'

চুনি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটা পালটা প্রশ্ন করে বসল। সে বলল—

'আমার শেষ চাকরি কী ছিল মনে আছে তোমার?'

'বিলক্ষণ। তুমি হাওড়া স্টেশনে বুকিং ক্লার্ক ছিলে।'

'তোমার সেটা মনে আছে, আর আমিই যে তোমার রাঁচির বুকিং করে দিলাম সেটা মনে নেই? তোমার যাবার দিন তোমার কামরায় গিয়ে দেখা করলাম, ডাইনিং কারে বলে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করে দিলাম, তোমার কামরায় পাখা চলছিল না—সেটা লোক ডেকে চালু করে দিলাম—এসব তুমি ভুলে গেছ? তোমার হয়েছে কী?'

বিপিনবাবু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন।

চুনি বলল, 'তোমার কি অসুখ করেছে? তোমার চেহারাটা তো ভাল দেখছি না।'

বিপিনবাবু বললেন, 'তাই মনে হচ্ছে। ক'দিন কাজের চাপটা একটু বেশি পড়েছিল। দেখি একটা স্পেশালিস্ট-টেশালিস্ট...'

বিপিনবাবুর অবস্থা দেখেই বোধহয় চুনি আর চাকরির উল্লেখ না করে আস্তে আস্তে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

পরেশ চন্দ্রকে ইয়াং ডাক্তার বলা চলে, চল্লিশের নীচে বয়স, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বিপিনবাবুর ব্যাপার শুনে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিপিনবাবু তাঁকে মরিয়া হয়ে বললেন, 'দেখুন ডক্টর চন্দ্র, আমার এ ব্যারাম আপনাকে সারিয়ে দিতেই হবে। আপিস কামাই করার ফলে যে কী ক্ষতি হচ্ছে আমার ব্যবসার তা আমি বোঝাতে পারব না। আজকাল তো অনেক ওষুধ বেরিয়েছে। আমার এ ব্যারামের জন্য কি কিছুই নেই? আমি যত টাকা লাগে দেব। যদি বিদেশ থেকে আনাবার দরকার হয় তারও ব্যবস্থা করব। কিন্তু এ রোগ আপনাকে সারাতেই হবে।'

ডাক্তার একটু ভেবেচিন্তে মাথা নেড়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন মিস্টার চৌধুরী? আমার কাছে এ রোগ একেবারে নতুন জিনিস; আমার অভিজ্ঞতার একেবারে বাইরে। তবে একটামাত্র উপায় আমি বলতে পারি। ফল হবে কিনা জানি না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ক্ষতির কোনও আশঙ্কা নেই।'

বিপিনবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলেন।

ডাক্তার বললেন, 'আমার যতদূর মনে হচ্ছে—এবং আমার বিশ্বাস আপনারও এখন তাই ধারণা যে, আপনি সত্যিই রাঁচি গিয়েছিলেন, কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, এই যাবার ব্যাপারটা আপনি বেমালুম ভুলে গেছেন। আমি সাজেস্ট করছি যে আপনি আরেকবার রাঁচি যান। তা হলে হয়তো জায়গাটা দেখে আপনার আগের ট্রিপ-এর কথাটা মনে পড়ে যাবে। এটা অসম্ভব নয়। আজ এই মুহূর্তে তো বেশি কিছু করা সম্ভব নয়! আমি আপনাকে একটি বড়ি লিখে দিচ্ছি—সেটা খেলে হয়তো ঘুমটা হবে। ঘুমটা দরকার, তা না হলে আপনার অশান্তি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অসুখও বেড়ে যাবে। আপনি একটা কাগজ দিন, আমি ওষুধটা লিখে দিচ্ছি।'

বড়ির জন্যই হোক, বা ডাক্তারের পরামর্শের জন্যই হোক, বিপিনবাবু পরদিন সকালে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করলেন।

প্রাতঃকালীন জলযোগ সেরে আপিসে টেলিফোন করে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে সেইদিনই রাত্রের জন্য রাঁচির টিকিট কিনলেন।

পরদিন রাঁচি স্টেশনে নেমেই তিনি বুঝলেন এ জায়গায় তিনি কস্মিনকালেও আসেননি।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ি করে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে বুঝলেন যে এখানের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মোরাবাদি পাহাড়, হোটেল, বাংলো, কোনওটার সঙ্গেই তাঁর বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। হুড্রু ফল্‌স কি তিনি চিনতে পারবেন? জলপ্রপাতের দৃশ্য দেখলেই কি তাঁর পুরনো কথা সব মনে যাবে?

নিজে সে-কথা বিশ্বাস না করলেও, পাছে কলকাতায় ফিরে অনুতাপ হয় তাই একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দুপুরের দিকে হুড্রুর দিকে রওনা দিলেন।

সেইদিনই বিকেল পাঁচটার সময় হুড্রুতে একটি পিকনিকের দলের দুটি গুজরাটি ভদ্রলোক বিপিনবাবুকে অজ্ঞান অবস্থায় একটি পাথরের ঢিপির পাশে আবিষ্কার করল। এই দুই ভদ্রলোকের শুশ্রূষার ফলে জ্ঞান ফিরে পেতেই বিপিনবাবু প্রথম কথা বললেন—'আমি রাঁচি আসিনি। আমার সব গেল! আর কোনও আশা নেই...'

পরদিন সকালে বিপিন চৌধুরী কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, যদি না তিনি এই

রহস্যের উদ্ঘাটন করতে পারেন, তবে তাঁর আর সত্যই কোনও আশা নেই। তাঁর কর্মক্ষমতা, তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর উৎসাহ বুদ্ধি বিবেচনা সবই তিনি ক্রমে ক্রমে হারাবেন। শেষে কি তা হলে তাঁকে সেই রাঁচির...?

এর পরে আর বিপিনবাবু ভাবতে পারেন না, ভাবতে চান না।...

বাড়ি ফিরে কোনওরকমে স্নান করে মাথায় বরফের থলি চাপা দিয়ে বিপিন চৌধুরী শয্যা নিলেন। চাকরকে বললেন ডাক্তার চন্দ্রকে ডেকে নিয়ে আসতে। চাকর যাবার আগে তাঁর হাতে একটি চিঠি দিয়ে বলল, কে জানি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে গেছে। সবুজ খাম, তার উপর লাল কালিতে লেখা—'শ্রীবিপিনবিহারী চৌধুরী। জরুরি, একান্ত ব্যক্তিগত।'

অসুস্থতা সত্ত্বেও বিপিনবাবুর কেন জানি মনে হল যে, চিঠিটা তাঁর পড়া দরকার। খাম খুলে দেখেন এই চিঠি—

'প্রিয় বিপিন,

হঠাৎ বড়লোক হবার কুফল যে তোমার মধ্যে এভাবে দেখতে পাব তা আশা করিনি। একজন দুস্থ বাল্যবন্ধুর জন্য একটা উপায় করে দেওয়া কি সত্যিই তোমার পক্ষে এত অসম্ভব ছিল? আমার টাকা নেই, তাই ক্ষমতা সামান্যই। যে জিনিসটা আছে আমার, সেটা হল কল্পনাশক্তি। তারই সামান্য কিছুটা খরচ করে তোমার উপর সামান্য প্রতিশোধ নিলাম। নিউ মার্কেটের সেই ভদ্রলোকটি আমার প্রতিবেশী; বেশ ভাল অভিনেতা। দীনেশ মুখুজ্যে তোমার প্রতি সদয় নন, তাই তাকে হাত করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। হাঁটুর দাগটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে—সেই চাঁদপাল ঘাটে আছাড় খাওয়া—উনিশ শো ছত্রিশ সনে?...

আর কী? এবার সেরে উঠবে। আমার একটি উপন্যাস এক প্রকাশকের পছন্দ হয়েছে। কয়েকটা মাস তাতেই কোনওরকমে চালিয়ে নেব। ইতি—

তোমার বন্ধু চুনিলাল।'

ডাক্তার চন্দ্র আসতেই বিপিনবাবু বললেন, 'ভাল আছি। রাঁচি স্টেশনে নেমেই সব মনে পড়ে গেল।'

ডাক্তার বললেন, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ! আপনার কেসটা একটা ডাক্তারি জার্নালে ছাপিয়ে দেব ভাবছি।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আপনাকে যেজন্য ডাকা—দেখুন তো, আমার কোমরের হাড়টাড় ভাঙল কিনা। রাঁচিতে হোঁচট খেয়েছিলাম। টনটন করছে।'

সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৭০

বাদুড় বিভীষিকা

বাদুড় জিনিসটা আমার মোটেই ধাতে সয় না। আমার ভবানীপুরের ফ্ল্যাটের ঘরে মাঝে মাঝে যখন সন্ধের দিকে জানলার গরাদ দিয়ে নিঃশব্দে এক-একটা চামচিকে ঢুকে পড়ে, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। বিশেষত গ্রীষ্মকালে যখন পাখা ঘোরে, তখন যদি চামচিকে ঢুকে মাথার উপরই বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকে আর খালি মনে হয় এই বুঝি ব্লেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে ছটফট শুরু করবে, তখন যেন আমি একেবারে দিশেহারা বোধ করি। প্রায়ই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। আর আমার চাকর বিনোদকে বলি, ওটাকে তাড়াবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করো। একবার তো বিনোদ আমার ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটের এক বাড়িতে একটা চামচিকে মেরেই ফেলল। সত্যি বলতে কি, কেবলমাত্র যে অসোয়াস্তি হয় তা নয়; তার সঙ্গে যেন একটা আতঙ্কের ভাবও মেশানো থাকে। বাদুড়ের চেহারাটাই আমার বরদাস্ত হয় না—না পাখি, না জানোয়ার, তার উপরে ওই যে মাথা নিচু করে পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়িয়ে ঝুলে থাকা, এইসব মিলিয়ে মনে হয় বাদুড় জীবটার অস্তিত্ব না থাকলেই বোধহয় ভাল ছিল।

কলকাতায় আমার ঘরে চামচিকে এতবার ঢুকেছে যে, আমার তো এক-এক সময় মনে হয়েছে আমার উপর বুঝি জানোয়ারটার একটা পক্ষপাতিত্ব রয়েছে! কিন্তু তাই বলে এটা ভাবতে পারিনি যে, সিউড়িতে এসে আমার বাসস্থানটিতে ঢুকে ঘরের কড়িকাঠের দিকে চেয়েই দেখব সেখানেও একটি বাদুড় ঝোলায়মান। এ যে রীতিমতো বাড়াবাড়ি। ওটিকে বিদেয় না করতে পারলে তো আমার এ ঘরে থাকা চলবে না!

এই বাড়িটার খোঁজ পাই আমার বাবার বন্ধু তিনকড়িকাকার কাছ থেকে। এককালে ইনি সিউড়িতে ডাক্তারি করতেন। এখন রিটায়ার করে কলকাতায় আছেন। বলা বাহুল্য, সিউড়িতে এঁর অনেক জানাশোনা আছে। তাই আমার যখন দিন সাতেকের জন্য সিউড়িতে যাবার প্রয়োজন হল, আমি

তিনকড়িকাকার কাছেই গেলাম। তিনি শুনে বললেন, 'সিউড়ি? কেন? সিউড়ি কেন? কী করা হবে সেখানে?'

আমি বললাম যে, 'বাংলাদেশের প্রাচীন পোড়া ইটের মন্দিরগুলো সম্বন্ধে আমি গবেষণা করছি। একটা বই লেখার ইচ্ছে আছে। এমন সুন্দর সব মন্দির চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, অথচ সেই নিয়ে কেউ আজ অবধি একটা প্রামাণ্য বই লেখেনি।'

'ওহো, তুমি তো আবার আর্টিস্ট। তোমার বুঝি ওইদিকে শখ? তা বেশ বেশ। কিন্তু শুধু সিউড়ি কেন? ওরকম মন্দির তো বীরভূমে অনেক রয়েছে। সুরুল, হেতমপুর, দুবরাজপুর, ফুলবেরা, বীরসিংপুর—এসব জায়গাতেই তো ভাল ভাল মন্দির আছে। তবে সেসব কি এতই ভাল যে, তাই নিয়ে বই লেখা যায়?'

যাই হোক—তিনকড়িকাকা একটা বাড়ির সন্ধান দিয়ে দিলেন আমায়।

'পুরনো বাড়িতে থাকতে তোমার আপত্তি নেই তো? আমার পেশেন্ট থাকত ও বাড়িতে। এখন কলকাতায় চলে এসেছে। তবে যতদূর জানি, দরোয়ান-গোছের লোক একটি থাকে সেখানে দেখাশোনা করবার। বেশ বড় বাড়ি। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। পয়সাকড়িও লাগবে না—কারণ পেশেন্টটিকে আমি একেবারে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম, তিন-তিনবার। দিন সাতেকের জন্য তার বাড়ির একটা ঘরে একজন গেস্ট থাকবে, আমি এমন অনুরোধ করলে সে খুশি হয়েই রাজি হবে।'

হলও তাই। কিন্তু সাইকেল রিকশা করে স্টেশন থেকে মালপত্র নিয়ে বাড়িটায় পৌঁছে ঘরে ঢুকেই দেখি বাদুড়।

বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক বৃদ্ধ দরোয়ান-গোছের লোকটিকে হাঁক দিলাম:

'কী নাম হে তোমার?'

'আজ্ঞে, মধুসূদন।'

'বেশ, তা মধুসূদন—ওই বাদুড়বাবাজি কি বরাবরই এই ঘরে বসবাস করেন, না আজ আমাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন?'

মধুসূদন কড়িকাঠের দিকে চেয়ে মাথা চুলকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে তা তো খেয়াল করিনি বাবু। এ ঘরটা তো বন্ধই থাকে; আজ আপনি আসবেন বলে খোলা হয়েছে।'

'কিন্তু ইনি থাকলে তো আবার আমার থাকা মুশকিল।'

'ও আপনি কিছু ভাববেন না বাবু। ও সন্ধে হলে আপনিই চলে যাবে।'

'তা না হয় গেল। কিন্তু কাল যেন আবার ফিরে না আসে তার একটা ব্যবস্থা হবে কি?'

'আর আসবে না। আর কি আসে? এ তো আর বাসা বাঁধেনি যে, আসবে। রাত্তিরে কোন সময় ফস করে ঢুকে পড়েছে। দিনের বেলা তো চোখে দেখতে পায় না, তাই বেরুতে পারেনি।'

চা-টা খেয়ে বাড়ির সামনের বারান্দাটায় একটা পুরনো বেতের চেয়ারে এসে বসলাম।

বাড়িটা শহরের এক প্রান্তে। সামনে উত্তর দিকে কার যেন মস্ত আমবাগান। গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে দূরে দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত দেখা যায়। পশ্চিম দিকে একটা বাঁশঝাড়ের উপর দিয়ে একটা গির্জার চুড়ো দেখা যায়। সিউড়ির এটি একটি বিখ্যাত প্রাচীন গির্জা। রোদটা পড়লে একটু ওদিকটায় ঘুরে আসব বলে স্থির করলাম। কাল থেকে আবার কাজ শুরু করব। খোঁজ নিয়ে জেনেছি সিউড়ি এবং তার আশপাশে বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে অন্তত খান ত্রিশেক পোড়া ইটের মন্দির আছে। আমার সঙ্গে ক্যামেরা আছে, এবং অপর্যাপ্ত ফিল্ম। এইসব মন্দিরের গায়ের প্রতিটি কারুকার্যের ছবি তুলে ফেলতে হবে। ইটের আয়ু আর কতদিন? এসব নষ্ট হয়ে গেলে বাংলাদেশ তার এক অমূল্য সম্পদ হারাবে।

আমার রিস্টওয়াচের দিকে চেয়ে দেখি সাড়ে পাঁচটা। গির্জার মাথার পিছনে সূর্য অদৃশ্য হল। আমি আড় ভেঙে চেয়ার ছেড়ে উঠে সবে বারান্দার সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় আমার কান ঘেঁষে শনশন শব্দ করে কী যেন একটা উড়ে আমবনের দিকটায় চলে গেল।

শোয়ার ঘরে ঢুকে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে দেখি—বাদুড়টা আর নেই।

যাক—বাঁচা গেল। সন্ধেটা অন্তত নির্বিঘ্নে কাটবে। হয়তো বা আমার লেখার কাজও কিছুটা এগিয়ে

যেতে পারে। বর্ধমান, বাঁকুড়া আর চব্বিশ পরগনার মন্দিরগুলো এর আগেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো সম্পর্কে লেখার কাজটা সিউড়িতে থাকতে থাকতেই আরম্ভ করব ভেবেছিলাম।

রোদটা পড়তে আমার টর্চটা হাতে নিয়ে গির্জার দিকটায় বেরিয়ে পড়লাম। বীরভূমের লাল মাটি, অসমতল জমি, তাল আর খেজুর গাছের সারি—এ সবই আমার বড় ভাল লাগে। তবে সিউড়িতে আমার এই প্রথম আসা। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার উদ্দেশ্যে যদিও আসিনি তবুও এই সন্ধেটায় লাল গির্জার আশপাশটা ভারী মনোরম লাগল। হাঁটতে হাঁটতে গির্জা ছাড়িয়ে পশ্চিমদিকে আরও খানিকটা পথ এগিয়ে গেলাম। সামনে দেখলাম খানিকটা জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা। দূর থেকে কারও বাগান বলে মনে হয়। একটা লোহার গেটও রয়েছে বলে মনে হয়।

আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম—বাগান নয়, গোরস্থান। খান ত্রিশেক খ্রিস্টানদের কবর রয়েছে গোরস্থানটায়। কোনওটির উপর কারুকার্য-করা পাথর বা ইটের স্তম্ভ। আবার কোনওটিতে মাটিতে শোয়ানো পাথরের ফলক। এগুলো যে খুবই পুরনো তাতে কোনও সন্দেহ নেই। স্তম্ভগুলিতে ফাটল ধরেছে। আবার ফাটলের মধ্যে এক-একটাতে অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে।

গেটটা খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকে ফলকের উপর অস্পষ্ট লেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করলাম। একটায় দেখলাম সন ১৭৯৩। আরেকটায় ১৭৮৮। সবই সাহেবদের কবর, ইংরেজ রাজত্বে গোড়ার যুগে ভারতবর্ষে এসে নানা মহামারীর প্রকোপে অধিকাংশেরই অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়েছে। একটা ফলকে লেখাটা একটু স্পষ্ট আছে দেখে আমার টর্চ জ্বালিয়ে ঝুঁকে সেটা পড়তে যাব, এমন সময় আমার পিছনেই যেন একটা পায়ের শব্দ পেলাম। ঘুরে দেখি একটি মাঝবয়সি বেঁটে-গোছের লোক হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আমারই দিকে হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছে। লোকটার পরনে একটা কালো আলপাকার কোট, একটা ছাইরঙের পেন্টুলুন আর হাতে একটা তালি-দেওয়া ছাতা।

'আপনি বাদুড় জিনিসটাকে বিশেষ পছন্দ করেন না—তাই না?'

ভদ্রলোকের কথায় চমকে উঠলুম। এটা সে জানল কী করে? আমার বিস্ময় দেখে ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ভাবছেন, কী করে জানলুম? খুবই সোজা। আপনি যখন আপনার বাড়ির দরোয়ানটিকে আপনার ঘরের বাদুড়টাকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলছিলেন, তখন আমি কাছাকাছিই ছিলুম।'

'ওঃ, তাই বলুন।'

ভদ্রলোক এইবার আমাকে নমস্কার করলেন।

'আমার নাম জগদীশ পার্সিভ্যাল মুখার্জি। আমাদের চার পুরুষের বাস এই সিউড়িতে। খ্রিস্টান তো—তাই সন্ধের দিকটা গির্জা-গোরস্থানের আশপাশটায় ঘুরতে বেশ ভাল লাগে।'

অন্ধকার বাড়ছে দেখে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা ফেরালুম। ভদ্রলোক আমার সঙ্গ নিলেন। কেমন যেন লাগছিল লোকটিকে। এমনিতে নিরীহ বলেই মনে হয়—কিন্তু গলার স্বরটা যেন কেমন কেমন—মিহি, অথচ রীতিমতো কর্কশ। আর গায়ে পড়ে যেসব লোক আলাপ করে তাদের আমার এমনিতেই ভাল লাগে না।

টর্চের বোতাম টিপে দেখি সেটা জ্বলছে না। মনে পড়ল হাওড়া স্টেশনে একজোড়া ব্যাটারি কিনে নেব ভেবেছিলাম—সেটা আর হয়নি। কী মুশকিল! রাস্তায় সাপখোপ থাকলে তো দেখতেও পাব না।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি টর্চের জন্য চিন্তা করবেন না। অন্ধকারে চলাফেরার অভ্যাস আছে আমার। বেশ ভালই দেখতে পাই। সাবধান—একটা গর্ত আছে কিন্তু সামনে!'

ভদ্রলোক আমার হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে বাঁ দিকে সরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে জানেন?'

সংক্ষেপে বললুম, 'জানি।'

ভ্যাম্পায়ার কে না জানে? রক্তচোষা বাদুড়কে বলে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। ঘোড়া গোরু ছাগল ইত্যাদির গলা থেকে রক্ত চুষে খায়। আমাদের দেশে এ বাদুড় আছে কিনা জানি না, তবে বিদেশি বইয়ে ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের কথা পড়েছি। শুধু বাদুড় কেন—বিদেশি ভুতুড়ে গল্পের বইয়ে পড়েছি, মাঝ রাত্তিরে কোনও কোনও কবর থেকে মৃতদেহ বেরিয়ে এসে জ্যান্ত ঘুমন্ত মানুষের গলা থেকে রক্ত চুষে খায়। তাদেরও বলে 'ভ্যাম্পায়ার'। কাউন্ট ড্রাকুলার রোমহর্ষক কাহিনী তো ইস্কুলে থাকতেই পড়েছি।

আমার বিরক্ত লাগল এই ভেবে যে, বাদুড়ের প্রতি আমার বিরূপ মনোভাবের কথা জেনেও ভদ্রলোক আবার গায়ে পড়ে বাদুড়ের প্রসঙ্গ তুলছেন কেন!

এর পরে দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আমবাগানটা পাশ কাটিয়ে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতে ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ আনন্দিত হলুম। আছেন তো ক'দিন?'

বললুম, 'দিন সাতেক।'

'বেশ বেশ—তা হলে তো দেখা হবেই।' তারপর গোরস্থানের দিকটায় আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'সন্ধের দিকটায় ওদিক পানে এলেই আমার দেখা পাবেন। আমার বাপ-পিতামহর কবরও ওখানেই আছে। কাল আসবেন, দেখিয়ে দেব।'

মনে মনে বললুম, তোমার সঙ্গে যত কম দেখা হয় ততই ভাল। বাদুড়ের উৎপাত যেমন অসহ্য, বাদুড় সম্পর্কে আলোচনাও তেমনই অতৃপ্তিকর। অনেক অন্য বিষয়ে চিন্তা করার আছে।

বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় পিছন ফিরে দেখলুম ভদ্রলোক অন্ধকার আমবনটার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বনের পিছনের ধানখেতের দিক থেকে তখন শেয়ালের কোরাস আরম্ভ হয়ে গেছে।

আশ্বিন মাস—তাও যেন কেমন গুমোট করে রয়েছে। খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে ভাবলুম বাদুড়ের ভয়ে জানলা-দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলুম—সেগুলো খুলে দিলে বোধহয় কিছুটা আরাম হতে পারে।

কিন্তু দরজাটা খুলতে ভরসা হল না। বাদুড়ের জন্য নয়। দরোয়ান বাবাজির ঘুম যদি হালকা হয়, চোরের উপদ্রব থেকেও বোধহয় রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু এইসব মফস্বল শহরে মাঝে মাঝে দেখা

যায়—দরজা খোলা রাখলে রাস্তার কুকুর ঘরে ঢুকে চটিজুতোর দফারফা করে দিয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা আমার আগে অনেকবার হয়েছে। তাই অনেক ভেবে দরজা দুটো না খুলে পশ্চিম দিকের জানলাটা খুলে দিলুম। দেখলুম বেশ ঝিরঝির করে হাওয়া আসছে।

ক্লান্ত থাকায় ঘুম আসতে বেশি সময় লাগল না।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলুম জানলার গরাদে মুখ লাগিয়ে সন্ধেবেলার সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়ে হাসছেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বলে সবুজ, আর দাঁতগুলো কেমন যেন সরু সরু আর ধারালো। তারপর দেখলুম ভদ্রলোক দু' পা পিছিয়ে গিয়ে হাতদুটোকে উঁচু করে এক লাফ দিয়ে গরাদ ভেদ করে ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন। ভদ্রলোকের পায়ের শব্দেই যেন আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

চোখ মেলে দেখি ভোর হয়ে গেছে। কী বিদঘুটে স্বপ্ন রে বাবা!

বিছানা ছেড়ে উঠে মধুসূদনকে একটা হাঁক দিয়ে বললুম চা দিয়ে যেতে। সকাল সকাল খেয়ে বেরিয়ে না পড়লে কাজের অসুবিধে হবে।

মধুসূদন বারান্দায় বেতের টেবিলে চা রেখে চলে যাবার সময় লক্ষ করলুম তাকে যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বললুম, 'কী হল মধুসূদন? শরীর খারাপ নাকি? না রাত্রে ঘুম হয়নি?'

মধু বলল, 'না বাবু, আমার কিছুই হয়নি। হয়েছে আমার বাছুরটার।'

'কী হল আবার?'

'কাল রাত্তিরে সাপের কামড় খেয়ে মরে গেছে।'

'সে কী! মরেই গেল?'

'আজ্ঞে, তা আর মরবে না? এই সবে সাতদিনের বাছুর! গলার কাছটায় মেরেছে ছোবল, কী জানি গোখরো না কী।'

মনটা কেমন জানি খচ করে উঠল। গলার কাছে? গলায় ছোবল? কালই যেন—

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। জন্তু জানোয়ারের গলা থেকে রক্ত শুষে নেয় ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল—সাপের ছোবলে বাছুর মরবে এতে আর আশ্চর্য কী? আর বাছুর যদি রাত্রে শুয়ে থাকে, তা হলে গলায় ছোবল লাগাটা তো কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়! আমি মিছিমিছি দুটো জিনিসের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছি।

মধুসূদনকে সান্ত্বনা দেবার মতো দু-একটা কথা বলে কাজের তোড়জোড় করব বলে ঘরে ঢুকতেই দৃষ্টিটা যেন আপনা থেকেই কড়িকাঠের দিকে চলে গেল।

কালকের সেই বাদুড়টা আবার কখন জানি তার জায়গায় এসে আশ্রয় নিয়েছে।

ওই জানলাটা খোলাতেই এই কাণ্ডটা হয়েছে। ভুলটা আমারই। মনে মনে স্থির করলুম আজ রাত্রে যত গুমোটই হোক না কেন, দরজা জানলা সব বন্ধ করেই রেখে দেব।

সারাদিন মন্দির দেখে বেশ আনন্দেই কাটল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর এই পোড়া ইটের মন্দিরের গায়ে কাজ দেখে সত্যিই স্তম্ভিত হতে হয়।

হেতমপুর থেকে বাসে করে ফিরে সিউড়ি এসে যখন পৌঁছলুম তখন সাড়ে চারটে।

বাড়ি ফেরার পথ ছিল গোরস্থানটার পাশ দিয়েই। সারাদিনের কাজের মধ্যে কালকের সেই ভদ্রলোকটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, তাই গোরস্থানের বাইরে সজনেগাছটার নীচে হঠাৎ তাঁকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলুম। পরমুহূর্তেই মনে হল লোকটাকে না-দেখতে পাওয়ার ভান করে এড়িয়ে যেতে পারলে খুব সুবিধে হয়। কিন্তু সে আর হবার জো নেই। মাথা হেঁট করে হাঁটার স্পিড যেই বাড়িয়েছি, অমনই ভদ্রলোক লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে ফেললেন।

'রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল ভাল?'

আমি সংক্ষেপে 'হ্যাঁ' বলে এগোতে আরম্ভ করলুম, কিন্তু দেখলুম আজও ভদ্রলোক আমার সঙ্গ ছাড়বেন না। আমার দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'আমার আবার কী বাতিক জানেন? রাত্রে আমি একদম ঘুমোতে পারি না। দিনের বেলাটা কষে ঘুমিয়ে নিই, আর সন্ধে থেকে সারা রাতটা এদিক ওদিকে বেড়িয়ে বেড়াই। এই ঘোরায় যে কী আনন্দ তা আপনাকে কী করে

বোঝাব? এই গোরস্থানের ভিতরে এবং আশেপাশে যে কত দেখবার ও শোনবার জিনিস আছে তা আপনি জানেন? এই যে এরা সব মাটির তলায় কাঠের বাক্সের মধ্যে বছরের পর বছর বন্দি অবস্থায় কাটিয়ে দিচ্ছে, এদের অতৃপ্ত বাসনার কথা কি আপনি জানেন? এরা কি কেউ এইভাবে বন্দি থাকতে চায়? কেউ চায় না। সকলেই মনে মনে ভাবে—একবারটি যদি বেরিয়ে আসতে পারি! কিন্তু মুশকিল হল কী জানেন?—এই বেরোনোর রহস্যটি সকলের জানা নেই। সেই শোকে তারা কেউ কাঁদে, কেউ গোঙায়, কেউ বা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মাঝ রাত্তিরে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়, শেয়াল যখন ঘুমিয়ে পড়ে, ঝিঁঝিপোকা যখন ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন যাদের শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ—এই যেমন আমার—তারা এইসব মাটির নীচে কাঠের বাক্সে বন্দি প্রাণীদের শোকোচ্ছ্বাস শুনতে পায়। অবিশ্যি—ওই যা বললাম—কান খুব ভাল হওয়া চাই। আমার চোখ কান দুটোই খুব ভাল। ঠিক বাদুড়ের মতো...'

মনে মনে ভাবলুম, মধুসূদনকে এই লোকটির কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। এঁকে জিজ্ঞেস করে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে বলে ভরসা হয় না। কদ্দিনের বাসিন্দা ইনি? কী করেন ভদ্রলোক? কোথায় এঁর বাড়ি?

আমার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোক বলে চললেন, 'আমি সকলের সঙ্গে বিশেষ একটা এগিয়ে এসে আলাপ করি না, কিন্তু আপনার সঙ্গে করলাম। আশা করি যে-ক'টা দিন আছেন, আপনার সঙ্গ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

আমি এবার আর রাগ সামলাতে পারলুম না। হাঁটা থামিয়ে লোকটির দিকে ঘুরে বললুম, 'দেখুন মশাই, আমি সাতদিনের জন্য এসেছি এখানে। বিস্তর কাজ রয়েছে আমার। আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার সুযোগ হবে বলে মনে হয় না।'

ভদ্রলোক যেন প্রথমটা আমার কথা শুনে একটু মুষড়ে পড়লেন। তারপর মৃদু অথচ বেশ দৃঢ় কণ্ঠে ঈষৎ হাসি মাখিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে সঙ্গ না দিলেও আমি তো আপনাকে দিতে পারি! আর আপনি যে সময়টা কাজ করেন—অর্থাৎ দিনের বেলা—আমি সে সময়টার কথা বলছিলাম না।'

আর বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সংক্ষেপে 'নমস্কার' বলে আমি বাড়ির দিকে পা চালালুম।

রাত্রে খাবার সময় মধুসূদনকে লোকটির কথা জিজ্ঞেস করলুম। মধু মাথা চুলকে বললে, 'আজ্ঞে জগদীশ মুখুজ্জে বলে কাউকে—' তারপর একটু ভেবে বললে, 'ও, হ্যাঁ—দাঁড়ান। বেঁটেখাটো মানুষ? কোট-প্যান্টলুন পরেন? গায়ের রঙ ময়লা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ও—আরে, তার তো বাবু মাথা খারাপ। সে তো হাসপাতালে ছিল এই কিছুদিন আগে অবধি। তবে এখন শুনছি তার ব্যামো সেরেছে। তাকে চিনলেন কী করে বাবু? তাকে তো অনেকদিন দেখিনি! ওর বাপ নীলমণি মুখুজ্জে ছিলেন পাদ্রী সাহেব। খুব ভাল লোক। তবে তিনিও শুনেছিলুম মাথার ব্যামোতেই মারা গিয়েছিলেন।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না, কেবল বাদুড়টার কথা সকালে বলা হয়নি, সেটা বলে বললাম, 'অবিশ্যি দোষটা আমারই। জানলাটা খুলে দিয়েছিলাম। ওটার যে মাঝের গরাদটা নেই, সেটা খেয়াল ছিল না।'

মধু বলল, 'এক কাজ করব বাবু। কাল ওই ফাঁকটা বন্ধ করে দেব। আজকের রাতটা বরং জানলাটা ভেজানোই থাক।'

সারাদিন মন্দির নিয়ে যেসব কাজ করেছি, রাত্রে খাতা খুলে সেইগুলো সম্বন্ধে একপ্রস্থ লিখে ফেললাম। ক্যামেরায় আর ফিল্ম ছিল না। বাক্স খুলে আগামীকালের জন্য নতুন ফিল্ম ভরলাম। জানলার দিকে বাইরে তাকিয়ে দেখি গতকালের জমা মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের আলোয় বাইরেটা তকতক করছে।

লেখার কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বেতের চেয়ারটায় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। এগারোটার কাছাকাছি উঠে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে বিছানায় এসে শুলাম। মনে মনে ভাবলাম, আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে জগদীশবাবুর কথাগুলো সত্যিই হাস্যকর। স্থির করলাম, হাসপাতালে জগদীশবাবুর কী চিকিৎসা হয়েছিল এবং কোন ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন সেটা একবার খোঁজ নিতে

হবে।

মেঘ কেটে গিয়ে গুমোট ভাবটাও কেটে গিয়েছিল, তাই জানলা দরজা বন্ধ করাতেও কোনও অসুবিধা লাগছিল না। বরঞ্চ পাতলা চাদর যেটা এনেছিলাম সেটা আজ গায়ে দিতে হল। চোখ বোজার অল্পক্ষণের মধ্যেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ক'টার সময় যে ঘুমটা ভাঙল জানি না—আর ভাঙার কিছুক্ষণ পরে পর্যন্ত কেন যে ভাঙল সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তারপর হঠাৎ পুবদিকের দেয়ালে একটা চতুষ্কোণ চাঁদের আলো দেখেই বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল।

জানলাটা কখন জানি খুলে গেছে, সেই জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে দেয়ালে পড়েছে।

তারপর দেখলাম, চতুষ্কোণ আলোটার উপর দিয়ে কীসের একটা জানি ছায়া বারবার ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে ঘাড়টা ফিরিয়ে উপর দিকে চাইতেই বাদুড়টাকে দেখতে পেলাম।

আমার খাটের ঠিক উপরেই বাদুড়টা বনবন করে চরকি পাক ঘুরছে এবং ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ নীচে আমার দিকে নামছে।

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে যতটা সাহস সঞ্চয় করা যায় করলাম। এ অবস্থায় দুর্বল হলে অনিবার্য বিপদ। বাদুড়টার দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে আমার ডানহাতটা খাটের পাশের টেবিলের দিকে বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে আমার শক্ত-বাঁধাই খাতাটা তুলে নিলাম।

তিন-চার হাতের মধ্যে বাদুড়টা যেই আমার কণ্ঠনালীর দিকে তাক করে একটা ঝাঁপ দিয়েছে—আমিও সঙ্গে সঙ্গে খাতাটা দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত করলাম।

বাদুড়টা ছিটকে গিয়ে জানলার গরাদের সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে একেবারে ঘরের বাইরে মাঠে গিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই একটা খচমচ শব্দে মনে হল কে যেন ঘাসের উপর দিয়ে দৌড়ে পালাল।

জানলার কাছে গিয়ে ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখলাম—কোথাও কিচ্ছু নেই, বাদুড়টারও চিহ্নমাত্র নেই।

বাকি রাতটা আর ঘুমোতে পারলাম না।

সকালে রোদ উঠতেই রাত্রের বিভীষিকা মন থেকে অনেকটা কেটে গেল। এ বাদুড় যে ভ্যাম্পায়ার, এখনও পর্যন্ত তার সঠিক কোনও প্রমাণ নেই। আমার দিকে বাদুড়টা নেমে আসছিল মানেই যে আমার রক্ত খেতে আসছিল, তারও সত্যি কোনও প্রমাণ নেই। ওই বিদঘুটে লোকটি ভ্যাম্পায়ারের প্রসঙ্গ না তুললে কি আর আমার ও-কথা মনেও আসত? কলকাতায় যেমন বাদুড় ঘরে ঢোকে, এ বাদুড়কেও তারই সমগোত্রীয় বলে মনে হত।

যাই হোক, হেতমপুরের কাজ বাকি আছে। চা-পান সেরে সাড়ে ছ'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম।

গোরস্থানের কাছাকাছি আসতে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। স্থানীয় কয়েকটি লোক জগদীশবাবুকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। দেখে মনে হল জগদীশবাবু অজ্ঞান, আর তাঁর কপালে যেন চাপ-বাঁধা রক্তের দাগ। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে সামনের লোকটি হেসে বললে, 'বোধ হয় গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মাথাটি ফাটিয়ে অজ্ঞান।'

বললাম, 'সে কী—গাছ থেকে পড়বেন কেন?'

'আরে মশাই—এ লোক বদ্ধ পাগল। মাঝে একটু সুস্থ হয়েছিল—তার আগে সন্ধেবেলা এ-গাছে সে-গাছে উঠে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকত —ঠিক বাদুড়ের মতো।'

সন্দেশ, মাঘ ১৩৭০

নীল আতঙ্ক

আমার নাম অনিরুদ্ধ বোস। আমার বয়স ঊনত্রিশ। এখনও বিয়ে করিনি। আজ আট বছর হল আমি কলকাতার একটা সদাগরি আপিসে চাকরি করছি। মাইনে যা পাই তাতে একা মানুষের দিব্যি চলে যায়। সর্দার শঙ্কর রোডে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছি, দোতলায় দু'খানা ঘর, দক্ষিণ খোলা। দু'বছরই হল একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি কিনেছি—সেটা আমি নিজেই চালাই। আপিসের কাজের বাইরে একটু-আধটু সাহিত্য করার শখ আছে। আমার তিনখানা গল্প বাংলা মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছে, চেনা মহলে প্রশংসাও পেয়েছে। তবে এটা আমি জানি যে, কেবলমাত্র লিখে রোজগার করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। গত কয়েক মাসে লেখা একদম হয়নি, তবে বই পড়েছি অনেক। আর তার সবই বাংলাদেশে নীলের চাষ সম্পর্কে। এ বিষয়ে এখন আমাকে একজন অথরিটি বলা চলে। কবে সাহেবরা এসে আমাদের দেশে প্রথম নীলের চাষ শুরু করল, আমাদের গ্রামের লোকদের উপর তারা কীরকম অত্যাচার করত, কীভাবে 'নীল বিদ্রোহ' হল, আর সব শেষে কীভাবে জার্মানি কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরি করার ফলে এদেশ থেকে নীলের পাট উঠে গেল—এ সবই এখন আমার নখদর্পণে। যে সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে নীল সম্পর্কে এই কৌতূহল জাগল, সেটা বলার জন্যই আজ লিখতে বসেছি।

এখানে আগে আমার ছেলেবেলার কথা একটু বলা দরকার।

আমার বাবা মুঙ্গেরে নামকরা ডাক্তার ছিলেন। ওখানেই আমার জন্ম আর ওখানের এক মিশনারি স্কুলে আমার ছেলেবেলার পড়াশুনা। আমার এক দাদা আছেন, আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। তিনি বিলেতে গিয়ে ডাক্তারি পাশ করে লন্ডনের কাছেই গোল্ডার্স গ্রিন বলে একটা জায়গায় হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছেন; দেশে ফেরার বিশেষ ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না। আমার যখন ষোলো বছর বয়স তখন বাবা মারা যান। তার কয়েকমাস পরেই আমি মা-কে নিয়ে কলকাতায় এসে আমার বড়মামার বাড়িতে উঠি। মামাবাড়িতে থেকেই আমি সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে বি. এ. পাশ করি। তারপর একটা সাময়িক ইচ্ছে হয়েছিল সাহিত্যিক হবার, কিন্তু মা-র ধমকানিতে চাকরির চেষ্টা দেখতে হল। বড়মামার সুপারিশেই চাকরিটা হল, তবে আমারও যে কিছুটা কৃতিত্ব ছিল না তা নয়। ছাত্র হিসেবে আমার রেকর্ডটা ভালই, ইংরিজিটাও বেশ গড়গড় করে বলতে পারি, আর তা ছাড়া আমার মধ্যে একটা আত্মনির্ভরতা ও স্মার্টনেস আছে যেটা ইন্টারভিউ-এর সময় আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিল।

মুঙ্গেরে ছেলেবেলার কথাটা বললে হয়তো আমার চরিত্রের একটা দিক বুঝতে সাহায্য করবে। কলকাতায় একনাগাড়ে বেশিদিন থাকতে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এত লোকের ভিড়, ট্রামবাসের ঘরঘরানি, এত হইহল্লা, জীবনধারণের এত সমস্যা—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এইসবের থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে যাই। আমার গাড়িটা কেনার পর কয়েকবার এটা করেওছি। ছুটির দিনে একবার ডায়মন্ড হারবারে, একবার পোর্টক্যানিং, আর একবার দমদমের রাস্তা দিয়ে সেই একেবারে হাসনাবাদ পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। একাই গিয়েছি প্রতিবার, কারণ এ ধরনের আউটিং-এ উৎসাহ প্রকাশ করার মতো কাউকে খুঁজে পাইনি।

এ থেকে বোঝাই যাবে যে, কলকাতা শহরে সত্যি করে বন্ধু বলতে আমার তেমন কেউ নেই। তাই প্রমোদের চিঠিটা পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। প্রমোদ ছিল আমার মুঙ্গেরের সহপাঠী। আমি কলকাতায় চলে আসার পর বছর চারেক আমাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখি চলেছিল, তারপর বোধহয় আমার দিক থেকেই সেটা বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন আপিস থেকে ফিরতেই চাকর গুরুদাস বলল

মামাবাড়ি থেকে লোক এসে একটা চিঠি দিয়ে গেছে। খামের উপর লেখা দেখেই বুঝলাম প্রমোদ। দুমকা থেকে লিখছে—'জংলি আপিসে চাকরি করছি...কোয়ার্টার্স আছে...দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে চলে আয়...।'

ছুটি পাওনা ছিল বেশ কিছুদিনের, তাই যত শীঘ্র সম্ভব আপিসের কাজ গুছিয়ে নিয়ে, গত ২৭শে এপ্রিল—তারিখটা আজীবন মনে থাকবে—তল্পিতল্পা গুটিয়ে, কলকাতার জঞ্জাল ও ঝঞ্ঝাট পিছনে ফেলে রওনা দিলাম দুমকার উদ্দেশে।

প্রমোদ অবিশ্যি মোটরযোগে দুমকা যাবার কথা একবারও বলেনি। ওটা আমারই আইডিয়া। দু'শো মাইল রাস্তা, বড়জোর পাঁচ-সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার ধাক্কা। দশটার মধ্যে ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ব, দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছে যাব, এই ছিল মতলব।

কাজের বেলা গোড়াতেই একটা হোঁচট খেতে হল। রান্না তৈরি ছিল ঠিক সময়, কিন্তু ভাত খেয়ে সবে মুখে পানটা পুরেছি, এমন সময় বাবার পুরনো বন্ধু মোহিতকাকা এসে হাজির। একে ভারভার্তিক লোক, তার উপর প্রায় দশ বছর পরে দেখা; মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারলাম না আমার তাড়া আছে। ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে হল, তারপর ঝাড়া একঘণ্টা ধরে তাঁর সুখদুঃখের কাহিনী শুনতে হল।

মোহিতকাকাকে বিদায় দিয়ে গাড়িতে মাল তুলে যখন নিজে উঠতে যাচ্ছি, তখন দেখি আমার একতলার ভাড়াটে ভোলাবাবু তাঁর চার বছরের ছেলে পিণ্টুর হাত ধরে কোত্থেকে যেন বাড়ি ফিরছেন। আমায় দেখে বললেন, 'একা একা কোথায় পাড়ি দিচ্ছেন?'

আমার উত্তর শুনে ভদ্রলোক একটু উদ্বিগ্নভাবেই বললেন, 'এতটা পথ মোটরে একা যাবেন? অন্তত এই ট্রিপটার জন্য একটা ড্রাইভার-ট্রাইভারের বন্দোবস্ত করলে হত না?'

আমি বললাম, 'চালক হিসেবে আমি খুব হুঁশিয়ার, আর আমার যত্নের ফলে গাড়িটাও প্রায় নতুনই রয়েছে, তাই ভাবনার কিছু নেই।' ভদ্রলোক 'বেস্ট অফ লাক' বলে ছেলের হাত ধরে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন।

গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি—পৌনে এগারোটা।

হাওড়া দিয়ে না গিয়ে বালি ব্রিজের রাস্তা নেওয়া সত্ত্বেও, চন্দননগর পৌঁছতেই লাগল দেড় ঘণ্টা। এই তিরিশটা মাইল পেরোতে এত ঝক্কি, রাস্তা এত বাজে ও আন্‌রোমান্টিক যে, মোটরযাত্রার প্রায় ষোলো আনা উৎসাহ উবে যায়। কিন্তু তার ঠিক পরেই শহর পিছনে ফেলে গাড়ি যখন ছোটে মাঠের মধ্যে দিয়ে, তখন সেটা কাজ করে একেবারে ম্যাজিকের মতো। মন তখন বলে—এর জন্যই তো আসা! কোথায় ছিল অ্যাদ্দিন এই চিমনির ধোঁয়া-বর্জিত মসৃণ আকাশ, এই মাটির গন্ধ মেশানো মনমাতানো বিশুদ্ধ মেঠো বাতাস?

দেড়টা নাগাদ যখন বর্ধমানের কাছাকাছি পৌঁছেছি, তখন পেটে একটা খিদের ভাব অনুভব করলাম। সঙ্গে কমলালেবু আছে, ফ্লাস্কে গরম চা আছে, কিন্তু মন চাইছে অন্য কিছু। রাস্তার পাশেই স্টেশন; গাড়ি থামিয়ে রেস্টোর‍্যান্টে গিয়ে দুটো টোস্ট, একটা অমলেট ও এক পেয়ালা কফি খেয়ে আবার রওনা দিলাম। পথ বাকি এখনও একশো তিরিশ মাইল।

বর্ধমান থেকে পঁচিশ মাইল গিয়ে পানাগড় পড়ে। সেখান থেকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে ইলামবাজারের রাস্তা নিতে হবে। ইলামবাজার থেকে সিউড়ি হয়ে ম্যাসানজোর পেরিয়ে দুমকা।

পানাগড়ের মিলিটারি ক্যাম্পগুলো সবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, এমন সময় আমার গাড়ির পিছনের দিক থেকে একটা বেলুন ফাটার মতো শব্দ হল, আর সেইসঙ্গে গাড়িটা একপাশে একটু কেদ্‌রে গেল। কারণ অবিশ্যি সহজেই বোধগম্য।

গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলাম শহর এখনও কয়েক মাইল দূরে। কাছাকাছির মধ্যে মেরামতির দোকানের আশাটা মন থেকে মুছে ফেলতে হল। সঙ্গে যে 'স্টেপনি' ছিল না তা নয়, আর জ্যাক দিয়ে গাড়ি তুলে ফাটা টায়ার খুলে ফেলে তার জায়গায় নতুন টায়ার পরানো আমার অসাধ্য কিছু নয়। তবু, এক্ষেত্রে পরিশ্রম এড়ানোর ইচ্ছেটা অস্বাভাবিক নয়। আর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাড়িতে টায়ার পরাব—পাশ দিয়ে হুশ্ হুশ্ করে অন্য কত গাড়ি বেরিয়ে যাবে, আর আমার শোচনীয় হাস্যকর অবস্থাটা তারা দেখে ফেলবে—এটা ভাবতে মোটেই ভাল

লাগছিল না। কিন্তু কী আর করা? দশ মিনিট এদিক ওদিক চেয়ে ঘোরাফেরা করে গঙ্গা বলে কাজে লেগে পড়লাম।

নতুন টায়ার লাগিয়ে ফাটা টায়ার ক্যারিয়ারে ভরে ডালা বন্ধ করে যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, তখন শার্টটা ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেছে। ঘড়িতে দেখি আড়াইটা বেজে গেছে। আবহাওয়াতে একটা গুমোট ভাব। ঘণ্টাখানেক আগেও সুন্দর হাওয়া বইছিল; গাড়ি থেকে দেখছিলাম বাঁশঝাড়ের মাথাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। এখন চারিদিক থমথমে। গাড়িতে ওঠার সময় পশ্চিমের আকাশে নীচের দিকে দূরের গাছপালার মাথায় একটা কালচে নীলের আভাস লক্ষ করলাম। মেঘ। ঝড়ের মেঘ কি? কালবৈশাখী? ভেবে লাভ নেই। স্পিডোমিটারের কাঁটা আরও চড়াতে হবে। ফ্লাস্কটা খুলে খানিকটা গরম চা মুখে ঢেলে আবার রওনা দিলাম।

ইলামবাজার পেরোতে না পেরোতেই ঝড়টা এসে পড়ল। ঘরে বসে যে জিনিস চিরকাল সানন্দে উপভোগ করেছি—যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছি, গান করেছি—সেই জিনিসই খোলা মাঠের মধ্যে পিচের রাস্তায় চলন্ত গাড়িতে যে কী বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারে তা কল্পনা করতে পারি না। ওটাকে প্রকৃতির একটা শয়তানি বলে মনে হয়। অসহায় মানুষকে এক নির্মম রসিকতায় নাজেহাল করার ভাব নিয়ে যেন এই বাজের খেলা। এদিকে ওদিকে আচমকা বৈদ্যুতিক শরনিক্ষেপ, আর পরমুহূর্তেই কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা দামামা গর্জন—গুড় গুড় গুড় গুড় কড়কড় কড়াৎ! এক এক সময় মনে হচ্ছে যে, আমার এই নিরীহ অ্যাম্বাসাডার গাড়িকেই তাগ করে বিদ্যুৎবাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, এবং আরেকটু মনোযোগ দিয়ে কাজটা করলেই লক্ষ্যভেদ হয়ে যাবে।

এই দুর্যোগের মধ্যেই কোনওমতে যখন সিউড়ি ছাড়িয়ে ম্যাসানজোরের পথে পড়েছি, তখন হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল যেটাকে কোনওমতেই বজ্রপাত বলে ভুল করা চলে না। বুঝলাম আমার গাড়ির আরেকটি টায়ার কাজে ইস্তফা দিলেন।

হাল ছেড়ে দিলাম। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। গত বিশ মাইল স্পিডোমিটারের কাঁটাকে পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে রাখতে হয়েছে। না হলে এতক্ষণ ম্যাসানজোর ছাড়িয়ে যাবার কথা। কোথায় এসে পৌঁছলাম? সামনের দিকে চেয়ে কিছু বোঝার উপায় নেই। কাচের উপর জলপ্রপাত। ওয়াইপারটা সপাৎ সপাৎ শব্দ করে চলেছে, কিন্তু সেটাকে কাজ না বলে খেলা বলাই ভাল। নিয়মমতো এপ্রিল মাসে এখনও সূর্যের আলো থাকার কথা, কিন্তু ভাব দেখে মনে হয় রাত হল বলে!

আমার ডানপাশের দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে চাইলাম। যা দেখলাম তাতে মনে হল কাছাকাছির মধ্যে ঘন বসতি না থাকলেও, দু-একটা পাকাবাড়ি যেন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে যে একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখব তার উপায় নেই। তবে সেটা না দেখেও যে জিনিসটা বলা যায় সেটা হল এই যে, মাইলখানেকের মধ্যে বাজার বা দোকান বলে কোনও পদার্থ নেই।

আর আমার সঙ্গে বাড়তি টায়ারও আর নেই।

মিনিট পনেরো গাড়িতে বসে থাকার পর একটা প্রশ্ন মনে জাগল; এতখানি সময়ের মধ্যে একটি গাড়ি বা একটি মানুষও আমার গাড়ির পাশ দিয়ে গেল না। তবে কি ভুল পথে এসে পড়েছি? সঙ্গে রোড ম্যাপ আছে। সিউড়ি পর্যন্ত ঠিকই এসেছি জানি, কিন্তু তারপরে যদি কোনও ভুল রাস্তায় মোড় ঘুরে থাকি? এই চোখধাঁধানো বৃষ্টিতে সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু যদি ভুল হয়ে থাকে—এটা তো আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল নয় যে, দিশেহারা হয়ে পড়তে হবে! যেখানেই এসে থাকি না কেন, এটা বীরভূমেরই মধ্যে, শান্তিনিকেতন থেকে মাইল পঞ্চাশের বেশি দূর নয়, বৃষ্টি থামলেই সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে, এমনকী হয়তো মাইলখানেকের মধ্যে একটা গাড়ি মেরামতের দোকানও পেয়ে যাব।

পকেট থেকে উইল্‌স-এর প্যাকেট আর দেশলাই বার করে একটা সিগারেট ধরালাম। ভোলাবাবুর কথা মনে পড়ল। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ভুক্তভোগী—নইলে এমন খাঁটি উপদেশ দেন কী করে? ভবিষ্যতে—

প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক্!

একটা তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল, হর্নের শব্দে সজাগ হয়ে উঠে বসলাম। বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। তবে অন্ধকারে গাঢ়তর।

প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক্।

পিছন ফিরে দেখি একটা লরি এসে দাঁড়িয়েছে। হর্ন দিচ্ছে কেন? আমি কি রাস্তার পুরোটা দখল করে আছি নাকি?

দরজা খুলে নেমে দেখি লরির দোষ নেই। টায়ার ফাটার সময় গাড়িটা খানিকটা ঘুরে গিয়ে রাস্তার পুরোটা না হলেও প্রায় আধখানা আটকে রেখেছে—লরি যাবার জায়গা নেই।

'গাড়ি সাইড কিজিয়ে—সাইড কিজিয়ে!'

আমার অসহায় ভাব দেখেই বোধ হয় পাঞ্জাবি ড্রাইভারটি নেমে এলেন।

'কেয়া হুয়া? পাংচার?'

আমি ফরাসি কায়দায় কাঁধ দুটোকে একটু উঁচিয়ে আমার শোচনীয় অবস্থা বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, 'আপনি যদি একটু হাত লাগান তা হলে এটাকে একপাশে সরিয়ে আপনার যাবার জায়গা করে দিতে পারি।'

এবার লরি থেকে পাঁইজির সহকারী নেমে এলেন। তিনজনে ঠেলে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে একপাশে করে দিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, এটা দুমকার রাস্তা নয়। আমি ভুল পথে এসে গেছি, তবে সেটা মাইল তিনেকের বেশি নয়। কাছাকাছির মধ্যে সারানোর কোনও দোকান নেই।

লরি চলে গেল। তার ঘরঘর শব্দ মিলিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল নৈঃশব্দ্যের সৃষ্টি হল, আর আমি বুঝলাম যে, আমি অকুল পাথারে পড়েছি।

আজ রাত্রের মধ্যে দুমকা পৌঁছনোর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, এবং রাতটা কীভাবে কাটবে তার কোনও ইঙ্গিত নেই।

আশেপাশের ডোবা থেকে ব্যাঙের কোরাস আরম্ভ হয়েছে। বৃষ্টিটা কমের দিকে। অন্য সময় হলে মাটির সোঁদা গন্ধে মনটা মেতে উঠত, কিন্তু এ অবস্থায় নয়!

আবার গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু তাতেই বা কী লাভ? হাত পা ছড়িয়ে আরাম করার পক্ষে অ্যাম্বাসাডার গাড়ির মতো অনুপযুক্ত আর কিছু আছে কি? বোধ হয়, না।

আরেকটা সিগারেট ধরাতে যাব, এমন সময় হঠাৎ পাশের জানলা দিয়ে একটা ক্ষীণ আলো এসে স্টিয়ারিং হুইলটার উপর পড়ল। আবার দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে দেখি গাছের ফাঁক দিয়ে একটা আলোর চতুষ্কোণ দেখা যাচ্ছে। বোধহয় জানলা। ধোঁয়ার কারণ আগুন, কেরোসিনের আলোর কারণ মানুষ। কাছাকাছি বাড়ি আছে, এবং তাতে মানুষ আছে।

টর্চটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। আলোর দূরত্ব বেশি নয়। আমার উচিত এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করা। একটা রাস্তাও রয়েছে, অপরিসর পথ, সেটা বোধহয় আলোরই দিক থেকে, আমি যে রাস্তায় আছি সেটায় এসে পড়েছে। পথের দু'পাশে গাছপালার বন, তলার দিকে আগাছার জঙ্গল।

কুছ পরোয়া নেহি। গাড়ির দরজা লক্ করে রওনা দিলাম।

যতদূর সম্ভব খানাখন্দ বাঁচিয়ে জলকাদার মধ্যে দিয়ে ছপাৎ ছপাৎ করে খানিকদূর হেঁটে একটা তেঁতুলগাছ পেরোতেই বাড়িটা চোখে পড়ল। বাড়ি বলা ভুল হবে—একখানা কি দেড়খানা ইটের ঘরের উপর একটা টিনের চালা। ফাঁক করা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর একটা জ্বালানো লণ্ঠন, একটা ধোঁয়াটে ভাব, আর একটা খাটিয়ার কোণ লক্ষ করলাম।

'কোই হ্যায়?'

একটা মাঝবয়সি বেঁটে গোঁফওয়ালা লোক বেরিয়ে এসে আমার টর্চের আলোর দিকে ভুরু কুঁচকে চাইল। আমি আলোটা নামিয়ে নিলাম।

'কাঁহাসে আয়া বাবু?'

আমার দুর্ঘটনার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বললাম, 'এখানে কাছাকাছির মধ্যে রাত কাটানোর কোনও বন্দোবস্ত হতে পারে? যা পয়সা লাগে আমি দেব।'

'ডাকবাংলামে?'

ডাকবাংলো? সে আবার কোথায়?

প্রশ্নটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বোকামোটা বুঝতে পারলাম। এতক্ষণ কেবল লণ্ঠন আর টর্চের আলোর দিকে দৃষ্টি থাকার ফলে আশেপাশে কী আছে দেখিইনি। এবার টর্চটাকে ঘুরিয়ে আমার বাঁ দিকে ফেলতেই একটা বেশ বড় একতলা পুরনো বাড়ি চোখে পড়ল। সেটা দেখিয়ে বললাম, 'এটাই ডাকবাংলো?'

'হাঁ বাবু। লেকিন বিস্তারা উস্তারা কুছ নেহি হ্যায়, খানা ভি নেহি মিলেগা।'

'বিছানা আমার সঙ্গে আছে। খাট হবে তো?'

'খাটিয়া হোগা।'

'আর তোমার ঘরে তো উনুন ধরিয়েছ দেখছি। তুমি নিজে খাবে নিশ্চয়ই।'

লোকটা হেসে ফেলল। তার হাতের সেঁকা মোটা রুটি, আর তার বউয়ের রান্না উরুৎ কা ডাল কি আমার চলবে? বললাম, খুব চলবে। সবরকম রুটিই আমার চলে, আর উরুৎ কা ডাল তো আমার অতি প্রিয় খাদ্য!

এককালে কী ছিল জানি না, এখন নামেই ডাকবাংলো। তবে পুরনো সাহেবি আমলের বাড়ি, তাই ঘরের সাইজ বড় আর সিলিংটা পেল্লায় উঁচু। আসবাব বলতে একটি পুরনো নেয়ারের খাট, একপাশে একটা টেবিল, আর তার সামনে হাতল ভাঙা একটা চেয়ার।

চৌকিদার আমার জন্য একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে এনে টেবিলের উপর রাখল। বললাম, 'তোমার নাম কী হে?'

'সুখনরাম, বাবুজি।'

'এ বাংলোয় লোকজন কোনওকালে এসেছে, না আমিই প্রথম?'

সুখনরামের রসবোধ আছে। সে হেসে ফেলল। বললাম, 'ভূতটুত নেই তো?'

'আরে রাম, রাম! কত লোকই তো এসে থেকে গেছে।—কই, এমন অপবাদ তো কেউ দেয়নি।'

এ-কথায় একটু যে আশ্বস্ত হইনি তা বলতে পারি না। ভূতে বিশ্বাস করি বা না করি, এটুকু অন্তত জানি যে, যদি ভূত থাকেই এ বাংলোতে, তা হলে সে সবসময়ই থাকবে, আর না থাকলে কোনও সময়ই থাকবে না। বললাম, 'এটা কদ্দিনের পুরনো বাড়ি?'

সুখন আমার বেডিং খুলে দিতে দিতে বলল, 'পহিলে ইয়ে নীল কোঠি থা। এক নীলকা ফেক্টরি ভি থা নজদিগমে। উস্‌কা এক চিমনি আভি তক্ খাড়া হ্যায়; আউর সব টুট গিয়া।'

এ অঞ্চলে যে এককালে নীলের চাষ হত সেটা জানতাম। মুঙ্গেরের আশেপাশেও ছেলেবেলায় পুরনো ভাঙা নীলকুঠি দেখেছি।

সুখনের তৈরি রুটি আর কলাইয়ের ডাল খেয়ে নেয়ারের খাটে বিছানা পেতে যখন শুলাম তখন রাত সাড়ে দশটা। প্রমোদকে আজ বিকেলে পৌঁছব বলে টেলিগ্রাম করেছিলাম, ও একটু চিন্তিত হবে অবশ্যই। কিন্তু সে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। একটা আস্তানা যে পেয়েছি, এবং বেশ সহজেই পেয়েছি, সেটা কম ভাগ্যের কথা নয়! ভবিষ্যতে ভোলাবাবুর উপদেশ মেনে চলব। উচিত শিক্ষা হয়েছে আমার। তবে এটাও ঠিক যে, এমনি শেখার চেয়ে ঠেকে শেখার দাম অনেক বেশি।

লণ্ঠনটা পাশের বাথরুমে রেখে এসেছি। দরজার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো এসেছে তাই যথেষ্ট। ঘরে বেশি আলো থাকলে আমার ঘুম আসে না, অথচ এখন যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হল ঘুম। গাড়ি থেকে জিনিসপত্র সব বার করে নিয়ে সেটা লক করে এসেছি, বলাই বাহুল্য। এটুকু জোর গলায় বলতে পারি যে, আজকালকার দিনে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি ফেলে রাখা যতটা বিপজ্জনক, গ্রামের রাস্তায় তার চেয়ে হয়তো কিছুটা কমই।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ থেমে গেছে। ব্যাঙ আর ঝিঁঝির সমবেত কণ্ঠস্বরে রাত মুখর হয়ে উঠেছে। শহরের জীবনটা এত দূরে আর এত পিছনে সরে গেছে যে, সেটাকে একটা প্রাগৈতিহাসিক পর্ব বলে মনে হচ্ছে। নীলকুঠি!...দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের কথা মনে পড়ল। কলেজে থাকতে অভিনয় দেখেছিলাম...কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের কোনও এক পেশাদারি থিয়েটারে...

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। কতক্ষণ পরে তা জানি না।

দরজায় একটা খচমচ শব্দ হচ্ছে। ভেতরে হুড়কো দেওয়া; বুঝলাম বাইরে থেকে কুকুর বা শেয়াল জাতীয় একটা কিছু নখ দিয়ে সেটাকে আঁচড়াচ্ছে। মিনিটখানেক পরে আওয়াজটা থেমে গেল। আবার সব চুপচাপ।

চোখ বুজলাম, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। একটা কুকুরের ডাকে ঘুমটা একেবারে গেল।

বাংলার গ্রাম্য নেড়িকুত্তার ডাক এটা নয়। এ হল বিলিতি হাউন্ডের হুঙ্কার। এ ডাক আমার অচেনা নয়। মুঙ্গেরে আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই মার্টিন সাহেবের বাড়ি থেকে রাত্রে এ ডাক শুনতে পেতাম। এ তল্লাটে এমন কুকুর কে পুষবে? একবার মনে হল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি—কারণ কুকুরটা ডাকবাংলোর খুব কাছেই রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তারপর মনে হল, সামান্য একটা কুকুরের ডাক নিয়ে এতটা মাথা ঘামানোর কোনও মানেই হয় না। তার চেয়ে আবার ঘুমনোর চেষ্টা দেখা যাক। রাত ক'টা হল?

জানলা দিয়ে অল্প চাঁদের আলো আসছে। শোয়া অবস্থাতেই বাঁ হাতটা তুলে মুখের সামনে আনতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।

হাতে ঘড়ি নেই।

অথচ অটোম্যাটিক ঘড়ি যত পরে থাকা যায় ততই ভাল বলে ওটা শোয়ার সময় কখনও খুলে শুই না। ঘড়ি কোথায় গেল? শেষটায় কি ডাকাতের আস্তানায় এসে পড়লাম নাকি? তা হলে আমার গাড়ির কী হবে?

বালিশের পাশে হাতড়িয়ে টর্চটা খুঁজতে গিয়ে দেখি সেটাও নেই।

একলাফে বিছানা থেকে উঠে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে খাটের নীচে তাকিয়ে দেখি সুটকেসটাও উধাও।

মাথা গরম হয়ে এল। এর একটা বিহিত করতেই হবে। হাঁক দিলাম—'চৌকিদার!'

কোনও উত্তর নেই।

বারান্দায় যাব বলে দরজার দিকে এগিয়ে খেয়াল হল যে হুড়কোটাকে যেমনভাবে লাগিয়ে শুয়েছিলাম, ঠিক তেমনই আছে। জানলাতেও গরাদ—তবে চোর এল কোথা দিয়ে?

দরজার হুড়কোটা খুলতে আমার নিজের হাতের উপর চোখ পড়ে কেমন জানি খট্‌কা লাগল।

হাতে কি দেয়াল থেকে চুন লেগেছে—না পাউডার জাতীয় কিছু? এমন ফ্যাকাশে লাগছে কেন?

আর আমি তো গেঞ্জি পরে শুয়েছিলাম—তা হলে আমার গায়ে লম্বাহাতা সিল্কের শার্ট কেন?

মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। দরজা খুলে বাইরে এলাম।

'ছাউখিডা-র!'

নিজের গলার স্বর চিনতে পারলাম না। উচ্চারণও না। যতই মিশনারি ইস্কুলে পড়ি না কেন—বাংলা উচ্চারণে উগ্র সাহেবিয়ানা আমার কোনওদিন ছিল না।

আর চৌকিদারই বা কোথায়, আর কোথায়ই বা তার ঘর! বাংলোর সামনে ধু-ধু করছে মাঠ। দূরে আবছা একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তার পাশে একটা চিমনির মতন স্তম্ভ। চারিদিকে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা।

আমার পরিবেশ বদলে গেছে।

আমি নিজেও বদলে গেছি।

ঘর্মাক্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে এলাম। চোখটা অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ঘরের সব কিছুই এখন দেখতে পাচ্ছি। খাট আছে—তাতে মশারি নেই—অথচ আমি মশারি টাঙিয়ে শুয়েছিলাম। বালিশ যেটা রয়েছে সেটাও আমার নয়। আমারটা ছিল সাধারণ, এটার পাশে বাহারের কুঁচি দেওয়া বর্ডার। খাটের ডান দিকের দেয়ালের সামনে সেই টেবিল, সেই চেয়ার—কিন্তু তাতে প্রাচীনত্বের কোনও চিহ্ন নেই। আবছা আলোতেও তার বার্নিশ করা কাঠটা চকচক করছে। টেবিলের উপর রাখা রয়েছে—লণ্ঠন নয়—বাহারের শেডওয়ালা কাজ করা কেরোসিন ল্যাম্প।

আরও জিনিসপত্র রয়েছে ঘরে—সেগুলো ক্রমে দৃষ্টিগোচর হল। এক কোনায় দুটো ট্রাঙ্ক। দেয়ালে একটা আলনা, তা থেকে ঝুলছে একটা কোট, একটা অদ্ভুত অচেনা ধরনের টুপি, আর একটা হান্টার

চাবুক। আলনার নীচে একজোড়া হাঁটু অবধি উঁচু জুতো—যাকে বলে goloshes।

জিনিসপত্র ছেড়ে আরেকবার আমার নিজের দিকে দৃষ্টি দিলাম। এর আগে শুধু সিল্কের শার্টটা লক্ষ করেছিলাম। এখন দেখলাম তার নীচে রয়েছে সরু চাপা প্যান্ট। আরও নীচে মোজা। পায়ে জুতো নেই, তবে খাটের পাশেই দেখলাম একজোড়া কালো চামড়ার বুট রাখা রয়েছে।

আমার ডান হাতটা এবার আমার মুখের উপর বুলিয়ে বুঝতে পারলাম, শুধু গায়ের রঙ ছাড়াও আমার চেহারার আরও পরিবর্তন হয়েছে। এত চোখা নাক, এত পাতলা ঠোঁট আর সরু চোয়াল আমার নয়। মাথায় হাত দিয়ে দেখি ঢেউখেলানো চুল পিছনে কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। কানের পাশে ঝুলপি নেমে এসেছে প্রায় চোয়াল পর্যন্ত।

বিস্ময় ও আতঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র কৌতূহল হল আমার নিজের চেহারাটা দেখার জন্য। কিন্তু আয়না? আয়না কোথায়?

রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে এক ধাক্কায় বাথরুমের দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

আগে দেখেছিলাম একটিমাত্র বালতি ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। এখন দেখি মেঝের এককোণে একটা টিনের বাথটব, তার পাশে চৌকি আর এনামেলের মগ। যে জিনিসটা খুঁজছিলাম সেটা রয়েছে আমার ঠিক সামনেই—একটা কাঠের ড্রেসিং টেবিলের উপর লাগানো একটা ওভাল শেপের আয়না। আমি জানি আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি—কিন্তু যে চেহারাটা তাতে প্রতিফলিত হয়েছে সেটা আমার নয়। কোনও এক বীভৎস ভৌতিক ভেলকির ফলে আমি হয়ে গেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন সাহেব—তার গায়ের রঙ ফ্যাকাশে ফরসা, চুল সোনালি, চোখ কটা এবং সে চোখের চাহনিতে ক্লেশের সঙ্গে কাঠিন্যের ভাব অদ্ভুত ভাবে মিশেছে। কত বয়স এ সাহেবের? ত্রিশের বেশি নয়, তবে দেখে মনে হয় অসুস্থতা কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অকালেই বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে।

কাছে গিয়ে আরও ভাল করে 'আমার' মুখটা দেখলাম। চেয়ে থাকতে থাকতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর থেকে উঠে এল।

'ওঃ!'

এ কণ্ঠস্বর আমার নয়। এই দীর্ঘশ্বাসও সাহেবেরই মনের ভাব ব্যক্ত করছে—আমার নয়।

এর পরে যা ঘটল, তাতে বুঝলাম যে, শুধু গলার স্বর নয়, আমার হাত পা সবই অন্য কারুর অধীনে কাজ করছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আমি—অনিরুদ্ধ বোস—যে বদলে গেছি—সে জ্ঞানটা আমার আছে। অথচ এই পরিবর্তনটা ক্ষণস্থায়ী না চিরস্থায়ী, এ থেকে নিজের অবস্থায় ফিরে আসার কোনও উপায় আছে কিনা, তা আমার জানা নেই।

বাথরুম থেকে শোয়ার ঘরে ফিরে এলাম।

আবার রাইটিং টেবিলের দিকে চোখ পড়ল। ল্যাম্পটা এখন জ্বলছে। ল্যাম্পের নীচে খোলা অবস্থায় একটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতা। তার পাশে একটা দোয়াতে ডোবানো রয়েছে একটা খাগের কলম।

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। খাতার খোলা পাতায় কিছু লেখা হয়নি। কোনও এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দোয়াত থেকে কলমটা আমার ডান হাত দিয়ে তুলিয়ে দিল। সে হাত এবার বাঁ দিকে সাদা পাতার দিকে অগ্রসর হল। ঘরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে খসখস করে শব্দ করে খাগের কলম লিখে চলল:

২৭শে এপ্রিল, ১৮৬৮

কানের কাছে আবার সেই রাক্ষুসে মশার বিনবুনুনি আরম্ভ হয়েছে। শেষটায় এই সামান্য একটা পোকার হাতে আমার মতো একটা জাঁদরেল ব্রিটিশারকে পরাহত হতে হল? ভগবানের এ কেমন বিধি? এরিক পালিয়েছে। পার্সি আর টোনিও আগেই ভেগেছে। আমার বোধহয় এদের চেয়েও বেশি টাকার লোভ, তাই বারবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সত্ত্বেও নীলের মোহ কাটাতে পারিনি। না—শুধু তাই নয়। ডায়রিতে মিথ্যে কথা বলা পাপ। আরেকটা কারণ আছে। আমার দেশের লোক আমাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। সেখানে থাকতেও তো কম কুকীর্তি করিনি—আর তারা সে-কথা ভোলেওনি। তাই ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার সাহস নেই। বুঝতে পারছি এখানেই থাকতে হবে। আর এখানেই মরতে হবে। মেরি আর আমার তিন বছরের শিশুসন্তান টোবির কবরের পাশেই আমার স্থান হবে। এত অত্যাচার করেছি

এখানকার স্থানীয় নেটিভদের উপর যে, আমার মৃত্যুতে চোখের জল ফেলার মতো একটি লোকও নেই এখানে। এক যদি মীরজান কাঁদে। আমার বিশ্বস্ত অনুগত বেয়ারা মীরজান!

আর রেক্স—আসল ভাবনা তো রেক্সকে নিয়েই। হায় প্রভুভক্ত কুকুর! আমি মরে গেলে তোকে এরা আস্ত রাখবে না রে! হয় ঢিল মেরে, না হয় লাঠির বাড়ি মেরে তোর প্রাণ শেষ করবে এরা। তোর যদি একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারতাম!...

আর লিখতে পারলাম না। হাত কাঁপছে। আমার হাত নয়—ডায়রি-লেখকের।

কলম রেখে দিলাম।

এবার আমার ডান হাতটা টেবিলের উপর থেকে নেমে কোলের কাছে এসে ডান দিকে গেল।

একটা দেরাজের হাতল।

হাতের টানে দেরাজ খুলে গেল।

ভিতরে একটা পিনকুশন, একটা পিতলের পেপার ওয়েট, একটা পাইপ, কিছু কাগজপত্র।

আরও খানিকটা খুলে গেল দেরাজ। একটা লোহার জিনিস চকচক করে উঠল। পিস্তল! তার হাতলে হাতির দাঁতের কাজ।

আমার হাত পিস্তলটা বার করে নিল। হাতের কাঁপুনি থেমে গেল।

বাইরে শেয়াল ডাকছে। সেই শেয়ালের ডাকের প্রত্যুত্তরেই যেন গর্জিয়ে উঠল হাউন্ডের কণ্ঠস্বর—ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে গেলাম। দরজা খুলে বাইরে।

সামনের মাঠে চাঁদের আলো।

বাংলোর বারান্দা থেকে হাত বিশেক দূরে ছাই রঙের একটা প্রকাণ্ড গ্রে হাউন্ড ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি বাইরে আসামাত্র আমার দিকে ফিরে লেজ নাড়তে লাগল।

'রেক্স!'

সেই গম্ভীর ইংরেজ কণ্ঠস্বর। দূরে বাঁশবন ও নীলের ফ্যাক্টরির দিক থেকে ডাকটা প্রতিধ্বনিত হয়ে এল—রেক্স!...রেক্স...

রেক্স এগিয়ে এল—তার লেজ নড়ছে।

ঘাস থেকে বারান্দায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাত কোমরের কাছে উঠে এল—পিস্তলের মুখ কুকুরের দিকে। রেক্স যেন থমকে গেল। তার জ্বলন্ত চোখে একটা অবাক ভাব।

আমার ডান তর্জনী পিস্তলের ঘোড়া টিপে দিল।

বিস্ফোরণের সঙ্গে একটা চোখ ঝলসানো আলো, একটা ধোঁয়া আর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া বারুদের গন্ধ।

রেক্সের দেহের সামনের অংশ বারান্দার উপর ও পিছনটা ঘাসের উপর এলিয়ে পড়েছে।

পিস্তলের শব্দ শুনে কাক ডেকে উঠেছে দূরের গাছপালা থেকে । ফ্যাক্টরির দিক থেকে কিছু লোক যেন ছুটে আসছে বাংলোর দিকে।

ঘরে ফিরে এসে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে খাটের উপর এসে বসলাম। বাইরে লোকের গোলমাল এগিয়ে আসছে।

পিস্তলের নলটা আমার কানের পাশে ঠেকাতে বুঝলাম সেটা বেশ গরম।

তারপর আর কিছু জানি না।

দরজা ধাক্কানিতে ঘুম ভেঙে গেল।

'চা লিয়ায়া বাবুজি!'

ঘরে দিনের আলো। চিরকালের অভ্যাসমতো দৃষ্টি আপনা থেকেই বাঁ হাতের কবজির দিকে চলে গেল। ছ'টা বেজে তেরো মিনিট। ঘড়ি চোখের আরও কাছে আনলাম—কারণ তারিখটাও দেখা যায় এতে। আটাশে এপ্রিল।

বাইরে থেকে সুখনরাম বলছে, 'আপকা গাড়ি ঠিক হো গিয়া বাবুজি।'

বীরভূমের নীলকর সাহেবের মৃত্যুশত বার্ষিকীতে আমার অভিজ্ঞতার কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৭৫

রতনবাবু আর সেই লোকটা

ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে এদিক ওদিক দেখে রতনবাবুর মনে একটা খুশির ভাব জেগে উঠল। জায়গাটা তো ভাল বলেই মনে হচ্ছে। স্টেশনের পিছনে শিরীষ গাছটা কেমন মাথা উঁচিয়ে রয়েছে, তার ডালে আবার একটা লাল ঘুড়ি আটকে রয়েছে। লোকজনের মধ্যে ব্যস্ততার ভাব নেই, বাতাসে কেমন একটা সোঁদা গন্ধ—সব মিলিয়ে দিব্যি মনোরম পরিবেশ।

সঙ্গে একটা ছোট হোল্ডল আর চামড়ার একটা ছোট সুটকেস। কুলির দরকার নেই; রতনবাবু সেগুলো দু'হাতে তুলে নিয়ে স্টেশনের গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাইরে সাইকেল-রিকশা পেতে কোনও অসুবিধা হল না। ডোরাকাটা হাফপ্যান্ট পরা ছোকরা চালক জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন বাবু?'

রতনবাবু বললেন, 'নিউ মহামায়া হোটেল—জানো?'

ছোকরা ছোট্ট করে মাথা নেড়ে বলল, 'উঠুন।'

ভ্রমণ জিনিসটা রতনবাবুর একটা বাতিক বলেই বলা যেতে পারে। সুযোগ পেলেই তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও ঘুরে আসেন। অবিশ্যি সুযোগ যে সবসময় আসে তা নয়, কারণ রতনবাবুর একটা চাকরি আছে। কলকাতার জিয়োলজিকাল সার্ভের আপিসে তিনি একজন কেরানি। আজ চব্বিশ বচ্ছর ধরে তিনি এই চাকরি করছেন। তাই বাইরে বেড়িয়ে আসার মতো সুযোগ তাঁর বছরে একবারই আসে। পুজোর ছুটির সঙ্গে তাঁর বাৎসরিক পাওনা ছুটি জুড়ে নিয়ে তিনি প্রতি বছরই কোথাও না কোথাও ভ্রমণ করে আসেন।

এই বেড়ানোর ব্যাপারে রতনবাবু সঙ্গে আর কাউকে নেন না, বা নেবার ইচ্ছেটাও তাঁর মনে জাগে না। প্রথম প্রথম যে সঙ্গীর অভাব বোধ করতেন না তা নয়; তাঁর পাশের টেবিলের কেশববাবুর সঙ্গে এককালে তাঁর এই নিয়ে কথা হয়েছিল, মহালয়ার কয়েকদিন আগে। রতনবাবু তখন সবে ছুটির প্ল্যান করেছেন; তিনি বলেছিলেন, 'আপনিও তো মশাই একা মানুষ—চলুন না এবার পুজোয় দু'জনে একসঙ্গে কোথাও ঘুরে-টুরে আসি।'

কেশববাবু তাঁর কলমটা কানে গুঁজে হাত দুটোকে জড়ো করে তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'আপনার পছন্দর সঙ্গে আমার পছন্দ কি মিলবে? আপনি যাবেন সব উদ্ভট নাম-না-জানা জায়গায়। সেখানে না আছে দেখবার কিছু, না আছে থাকা-খাওয়ার সুবিধে। আমায় মাফ করবেন। আমি যাচ্ছি হরিনাভিতে আমার ভায়রাভাইয়ের কাছে।'

ক্রমে রতনবাবু বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে বন্ধু পাওয়া খুবই শক্ত। তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ব্যাপারটা সাধারণ লোকের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। কাজেই বন্ধু পাওয়ার আশাটা পরিত্যাগ করাই ভাল।

সত্যিই রতনবাবুর স্বভাব চরিত্রে বেশ একটা অভিনবত্ব ছিল। যেমন এই চেঞ্জে যাওয়ার ব্যাপারটা। কেশববাবু মোটেই ভুল বলেননি। লোকে সচরাচর যেসব জায়গায় চেঞ্জে যায়, রতনবাবু সেদিকে দৃষ্টিই দিতেন না। তিনি বলতেন, 'আরে মশাই—পুরীতে সমুদ্র আছে, জগন্নাথের মন্দির আছে; দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়; হাজারিবাগে পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, রাঁচির কাছে হুড্রু ফল্‌স আছে এসব কথা তো সকলেই জানে। আর লোকমুখে একটা জিনিসের বর্ণনা বারবার শোনা মানে তো সে জিনিস প্রায় দেখাই হয়ে গেল।'

রতনবাবুর যেটা দরকার সেটা হল রেলের স্টেশনের ধারে একটি ছোট্ট শহর। ব্যস—আর কিচ্ছু না! প্রতি বছরই ছুটির আগে টাইম টেবল খুলে, খুব বেশি দূরে নয় এমন একটি জায়গার নাম বের করে তিনি দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় গেলেন কী দেখলেন, তা কেউ জিজ্ঞেস করে না, বা কাউকে তিনি বলেনও না। এমন অনেকবার হয়েছে যে, যেখানে গেছেন সে জায়গার নাম তিনি আগে শোনেনইনি। আর যেখানেই গেছেন, সেখানেই এমন একটা কিছু খুঁজে পেয়েছেন যার ফলে তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠেছে। অন্যদের চোখে হয়তো এসব জিনিস খুবই সামান্য—যেমন রাজাভাতখাওয়ায় একটা বুড়ো অশ্বত্থ গাছ—যেটা একটা কুলগাছ আর একটা নারকেল গাছকে পাকিয়ে উঠেছে, মহেশগঞ্জে একটা নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ, ময়নাতে একটা মিষ্টির দোকানের ডালের বরফি...

এবারে রতনবাবু যেখানে এসেছেন সে জায়গাটার নাম সিনি। টাটানগর থেকে পনেরো মাইল দূরে এই শহর। এ জায়গাটা অবশ্য টাইম টেবল থেকে বার করেননি তিনি। আপিসের অনুকূল মিত্তির বলেন জায়গাটার কথা। নিউ মহামায়া হোটেলের নামটাও তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া।

রতনবাবুর চোখে হোটেলটাকে বেশ ভালই বলে মনে হল। ঘরটা ছোট—তবে তাতে কিছু এসে যায় না। পুব দক্ষিণ দু'দিকে দুটো জানলা রয়েছে—তাই দিয়ে বেশ চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। পঞ্চা চাকরটিকেও বেশ অমায়িক বলে মনে হল। রতনবাবু শীত-গ্রীষ্ম দু'বেলা গরম জলে স্নান করেন, পঞ্চা তাঁকে আশ্বাস দিল তার জন্য কোনও চিন্তা করতে হবে না। হোটেলের রান্নাটা মোটামুটি চলনসই, এবং সেটাই যথেষ্ট, কারণ খাওয়ার ব্যাপারেও রতনবাবু মোটেই খুঁতখুঁতে নন। শুধু একটি বায়না তাঁর কাছে—ভাত আর হাতের রুটি—এ দুটোই একসঙ্গে না হলে তাঁর খাওয়া হয় না। মাছের ঝোলের সঙ্গে ভাত, আর ডাল তরকারির সঙ্গে রুটি—এটাই তাঁর রেওয়াজ। হোটেলে এসেই পঞ্চাকে তিনি কথাটা

জানিয়ে দিয়েছেন, এবং পঞ্চাও সে খবর ম্যানেজারকে পৌঁছে দিয়েছে।

নতুন জায়গায় এলে প্রথম দিনই বিকেলে হেঁটে না বেরোনো পর্যন্ত রতনবাবু সোয়াস্তি বোধ করেন না।

সিনিতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। চারটের সময় পঞ্চার এনে দেওয়া চা খেয়েই রতনবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

শহর থেকে বেরোলেই খোলা অসমতল প্রান্তর। তার মধ্যে দিয়ে আবার এদিক ওদিক হাঁটা-পথ চলে গেছে। এই পথের একটা দিয়ে মাইলখানেক গিয়ে রতনবাবু একটা ভারী মনোরম জিনিস আবিষ্কার করলেন। একটা ছোট্ট ডোবা পুকুর,—তার মধ্যে কিছু শালুক ফুটে আছে, আর তার চারিদিকে অজস্র পাখির জটলা। বক, ডাহুক, কাদাখোঁচা, মাছরাঙা—এগুলো রতনবাবুর চেনা; বাকিগুলো এই প্রথম তিনি দেখলেন।

প্রতিদিন বিকেলবেলাটা এই ডোবার ধারে বসেই হয়তো রতনবাবু বাকি ছুটিটা কাটিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিন আরও কিছু আবিষ্কারের আশায় রতনবাবু অন্য আরেকটা পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

মাইলখানেক যাবার পর পথে একপাল ছাগল পড়ার দরুন তাঁর হাঁটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখতে হল। রাস্তা খালি হবার পর আরও মিনিটপাঁচেক হাঁটতেই দেখলেন সামনে একটা কাঠের পুল দেখা যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গিয়ে বুঝলেন সেটা একটা ওভারব্রিজ। তার নীচ দিয়ে চলে গেছে রেলের লাইন। পুবদিকে দূরে স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে, আর পশ্চিমদিকে যতদূর চোখ যায় সোজা চলে গেছে সমান্তরাল দুটো লোহার পাত। এখন যদি হঠাৎ একটা ট্রেন এসে পড়ে, আর ব্রিজের তলা দিয়ে সেটা যদি যায় তা হলে কী অদ্ভুত ব্যাপার হবে, সেটা ভাবতেই রতনবাবুর গায়ে কাঁটা দিল।

একদৃষ্টে রেললাইনের দিকে দেখছিলেন বলেই বোধহয় কখন যে আরেকটি লোক এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে সেটা রতনবাবু খেয়াল করেননি, তাই পাশে তাকাতেই তাঁকে চমকে উঠতে হল।

লোকটির পরনে ধুতি শার্ট, কাঁধে একটা নস্যি রঙের র‍্যাপার, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, চোখে বাইফোক্যাল চশমা। রতনবাবুর কেমন জানি খটকা লাগল। এঁকে কি আগে দেখেছেন কোথাও? চেনা চেনা মনে হচ্ছে না? মাঝারি হাইট, গায়ের রঙও মাঝারি, চোখের দৃষ্টিতে কেমন উদাস ভাবুক ভাবুক ভাব। বয়স কত হবে? পঞ্চাশের বেশি নয় নিশ্চয়ই। চুলে বিশেষ পাক ধরেনি। অন্তত সন্ধ্যার আলোতে তো তাই মনে হয়।

আগন্তুক একটা ঠাণ্ডা হাসি হেসে রতনবাবুকে নমস্কার করলেন। রতনবাবু হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার করতে গিয়ে হঠাৎ বুঝে ফেললেন কেন তাঁর খটকা লাগছিল। লোকটিকে চেনা চেনা মনে হবার কারণ আর কিছুই না—এই ধাঁচের একটি চেহারা রতনবাবু বহুবার দেখেছেন—এবং সেটা তাঁর আয়নায়। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে তাঁর নিজের চেহারার আশ্চর্য মিল। মুখের চৌকোনা ভাব, চুলের টেরি, গোঁফের ধাঁচ, থুতনির মাঝখানে খাঁজ, কানের লতি—এসবই প্রায় হুবহু এক। তবে গায়ের রঙ আগন্তুকের যেন একটু বেশি ময়লা, ভুরু একটু বেশি ঘন, আর মাথার পিছনের চুল যেন একটু বেশি লম্বা।

এবার আগন্তুকের গলার স্বর শুনেও রতনবাবু চমকে উঠলেন। একবার তাঁর পাড়ার ছেলে সুশান্ত একটা টেপ রেকর্ডারে রতনবাবুর গলা রেকর্ড করে শুনিয়েছিল। সে গলা আর এই লোকটির গলায় কোনও তফাত নেই বললেই চলে।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম মণিলাল মজুমদার। আপনি তো বোধহয় নিউ মহামায়া হোটেলে উঠেছেন, তাই না?'

রতনলাল—মণিলাল। নামেও কেমন আশ্চর্য মিল। রতনবাবু কোনওরকমে অবাক ভাবটা কাটিয়ে তাঁর নিজের পরিচয়টা দিলেন।

আগন্তুক বললেন, 'আপনার বোধহয় আমাকে মনে পড়বে না—আমি কিন্তু এর আগেও আপনাকে দেখেছি।'

'কোথায় বলুন তো?'

'আপনি গত পুজোয় ধুলিয়ান যাননি?'
রতনবাবুর ভুরু কপালে তুলে বললেন, 'আপনিও সেখানে গেসলেন নাকি?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি প্রতিবারই পুজোয় কোথাও না কোথাও যাই। একা মানুষ, বন্ধুবান্ধবও বিশেষ নেই। আর নতুন নতুন জায়গায় একা একা বেড়াতে দিব্যি লাগে। সিনির কথাটা আমার আপিসের এক সহকর্মী আমাকে বলেন। বেশ জায়গা—কী বলেন?'
রতনবাবু ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। কেমন যেন অবিশ্বাস আর অসোয়াস্তি মেশানো একটা ভাব বোধ করছেন তিনি।
'ওদিকের পুকুরটা দেখেছেন—যার পাশে পাখির জটলা হয় বিকেলবেলার দিকটা?' মণিলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন।
রতনবাবু বললেন, হ্যাঁ, দেখেছেন।
'মনে হল কিছু ভিন্‌দেশের পাখিও জড়ো হয়েছে ওখানে। কিছু পাখি দেখলাম যা বাংলাদেশে আগে দেখিনি। আপনার কী মনে হল?'
এতক্ষণে রতনবাবু খানিকটা স্বাভাবিক বোধ করছেন। বললেন, 'আমারও তাই ধারণা। আমিও কতগুলো পাখি দেখে চিনতে পারিনি।'
দূর থেকে একটা গুম্‌ গুম্‌ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ট্রেন আসছে। পুব দিকে চেয়ে দেখলেন দূরে সার্চলাইট দেখা যাচ্ছে। আলোটা ক্রমশ বড় হয়ে এগিয়ে আসছে। রতনবাবু আর মণিলালবাবু দু'জনেই ব্রিজের রেলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিরাট শব্দ করে ব্রিজটাকে থরথর করে কাঁপিয়ে ট্রেনটা উলটো দিকে চলে গেল। দু'জন ভদ্রলোকই হেঁটে ব্রিজটার উলটোদিকে গিয়ে যতক্ষণ না ট্রেনটা অদৃশ্য হয় ততক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইলেন। রতনবাবুর মনে ছেলেমানুষি রোমাঞ্চের ভাব জেগে উঠেছে। মণিলালবাবু বললেন, 'আশ্চর্য! এত বয়স হল, তবু ট্রেন দেখার আনন্দটা গেল না!'
বাড়ি ফেরার পথে রতনবাবু জানালেন যে, মণিলালবাবু তিনদিন হল সিনিতে এসেছেন, আর কালিকা হোটেলে উঠেছেন। কলকাতাতেই তাঁর পৈতৃক বাড়ি, কাজও করেন তিনি কলকাতার এক সওদাগরি আপিসে। মাইনের কথাটা কেউ কাউকে সাধারণত জিজ্ঞেস করে না, কিন্তু রতনবাবু একটা অদম্য ইচ্ছের ফলে লজ্জার মাথা খেয়ে সেটা জিজ্ঞেস করে ফেললেন। উত্তর যা পেলেন তাতে তাঁর কপালে ঘাম ছুটে গেল। এমনও কি সম্ভব? মণিলালবাবু আর রতনবাবুর মাইনে এক—দু'জনেই পান চারশো সাঁইত্রিশ টাকা, দু'জনেই ঠিক একই বোনাস পেয়েছেন পুজোয়।
লোকটা যে তাঁর নাড়িনক্ষত্র কোনও ফিকিরে আগে থেকেই জেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা ধাপ্পাবাজির খেলা খেলছে, এ-কথাটা রতনবাবু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। প্রথমত, তাঁর রোজকার জীবনে কী ঘটনা না-ঘটছে তা নিয়ে কেউ কোনওদিন মাথা ঘামায়নি। তিনি নিজের তালে নিজেই ঘোরেন। আপিসের বাইরে বাড়ির চাকর ছাড়া কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, কারুর বাড়িতে গিয়ে কখনও আড্ডা মারেন না। মাইনের ব্যাপারটা না হয় বাইরে জানাজানি হতে পারে, কিন্তু তিনি রাত্রে কখন ঘুমোন, কী খেতে ভালবাসেন, কোন খবরের কাগজটা পড়েন, কোন থিয়েটার বা কোন বাংলা সিনেমা তিনি ইদানীং দেখেছেন—এসব তো তিনি নিজে ছাড়া আর কেউই জানে না। অথচ এর সবকিছুই যে ভদ্রলোকের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে!
রতনবাবু কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে মণিলালবাবুকে বলতে পারলেন না। সারা রাস্তা তিনি শুধু মণিলালবাবুর কথাই শুনলেন, আর নিজের সঙ্গে মিল দেখে বারবার অবাক হলেন, চমকে উঠলেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি এগিয়ে গিয়ে কিছুই বললেন না।
রতনবাবুর হোটেলটাই আগে পড়ে। হোটেলের সামনে এসে মণিলালবাবু বললেন, 'আপনার এখানে খাওয়া-দাওয়া কেমন?'
রতনবাবু বললেন, 'মাছের ঝোলটা মন্দ করে না। বাকি সব চলনসই।'
'আমার হোটেলে রান্নাটা আবার তেমন সুবিধের নয়। শুনেছি এখানে জগন্নাথ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নাকি ভাল লুচি আর ছোলার ডাল করে। আজ রাতের খাওয়াটা সেখানে সারলে কেমন হয়?'
রতনবাবু বললেন, 'বেশ তো, আমার আপত্তি নেই। ধরুন এই আটটা নাগাদ?'

'ঠিক আছে। আমি ওয়েট করব আপনার জন্য। তারপর একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

মণিলালবাবু চলে যাবার পর রতনবাবু হোটেলে না ঢুকে কিছুক্ষণ বাইরে রাস্তায় পায়চারি করলেন। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। আকাশ পরিষ্কার—এতই পরিষ্কার যে, তারার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া ছায়াপথটাকে পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য! এতকাল রতনবাবুর আফসোস ছিল যে তাঁর সঙ্গে মনের আর মতের মিল হয় এমন কোনও বন্ধু তিনি খুঁজে পাননি; অথচ এই সিনিতে এসে হঠাৎ এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছেন যাকে তাঁরই একটি ডুপ্লিকেট সংস্করণ বলা যেতে পারে। চেহারায় খানিকটা তফাত থাকলেও, স্বভাবে আর রুচিতে এমন মিল যমজ ভাইদের মধ্যেও দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

তার মানে কি এতদিনে তাঁর বন্ধুর অভাব মিটল?

রতনবাবু এ প্রশ্নের উত্তর চট করে খুঁজে পেলেন না। হয়তো মণিলালবাবুর সঙ্গে আরেকটু মিশলে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। একটা জিনিস তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর একা ভাবটা যেন কেটে গেছে। এ পৃথিবীতে ঠিক তাঁরই মতো আরেকটি লোক এতদিন ছিল, আর তিনি আকস্মিকভাবে তার সাক্ষাৎ পেয়ে গেছেন।

জগন্নাথ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে টেবিলের দু'দিকে মুখোমুখি বসে খেতে খেতে রতনবাবু লক্ষ করলেন যে, তাঁরই মতো মণিলালবাবুও বেশ পরিষ্কার করে চেটেপুটে খেতে ভালবাসেন, তাঁরই মতো খাবার মাঝখানে জল খান না, তাঁরই মতো ডালের মধ্যে পাতিলেবু কচলে নেন। সব খাবার পরে দই না খেলে রতনবাবুর চলে না, মণিলালবাবুরও না।

খাবার সময় রতনবাবুর একটু অসোয়াস্তি লাগছিল এই কারণে যে, তাঁর সবসময়ই মনে হচ্ছিল যে, অন্য টেবিলের লোকেরা তাঁদের দিকে ফিরে ফিরে দেখছে। এরা কি তাঁদের দু'জনের মধ্যে মিলটা লক্ষ করেছে? এই মিলটা কি এতই স্পষ্ট যে, বাইরের লোকের চোখেও ধরা পড়ে?

খাবার পরে রতনবাবু আর মণিলালবাবু চাঁদনি রাতে রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। একটা প্রশ্ন রতনবাবুর মাথায় অনেকক্ষণ থেকে ঘুরছিল, এক ফাঁকে সেটা বেরিয়ে পড়ল। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে?'

মণিলালবাবু হেসে বললেন, 'এই পেরোলো বলে। এগারোই পৌষে পঞ্চাশ কমপ্লিট করব।'

রতনবাবুর মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। দু'জনের জন্মও একই দিনে—১৩২৩ সালের এগারোই পৌষ!

আধঘণ্টাখানেক পায়চারি করার পর বিদায় নেবার সময় মণিলালবাবু হেসে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ পেলুম। আমার সঙ্গে সহজে কারুর একটা বনে না—কিন্তু আপনার বেলা সে-কথাটা খাটে না। বাকি ছুটিটা বেশ আনন্দে কাটবে বলে মনে হচ্ছে।'

অন্যান্য দিন রতনবাবু দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। সঙ্গে দু-একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা নিয়ে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ পাতা ওলটানোর পর আপনা থেকেই ঘুমে চোখ বুজে আসে। শোয়া অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে বাতির সুইচটা পাওয়া যায়, সেটা নেভানোর মিনিটখানেকের মধ্যেই রতনবাবুর নাক ডাকতে শুরু করে। আজ কিন্তু তিনি দেখলেন যে, তাঁর ঘুম আসতে চাইছে না। পড়বারও ইচ্ছে নেই। পত্রিকাটা হাতে তুলে নিয়ে আবার পাশের টেবিলে রেখে দিলেন।

মণিলাল মজুমদার...

রতনবাবু কোথায় যেন পড়েছিলেন যে, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কোথাও এমন কোনও দু'জনকে পাওয়া যাবে না যাদের চেহারা হুবহু একরকম। অথচ চোখ কান নাক হাত পা ইত্যাদির সংখ্যা সকলেরই এক। চেহারার হুবহু মিল না হয় অসম্ভব, কিন্তু দু'জনের মনের এই আশ্চর্য মিল কি সম্ভব? শুধু মন কেন—বয়স, পেশা, গলার স্বর, হাঁটা ও বসার ভঙ্গি, চোখের চশমার পাওয়ার ইত্যাদি আরও অনেক কিছু হুবহু মিলে যাচ্ছে। ভাবলে মনে হয় অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু সেটাও যে সম্ভব হয়েছে তার প্রমাণ তো গত চার ঘণ্টায় রতনবাবু অনেকবার পেয়েছেন।

রাত বারোটা নাগাদ রতনবাবু বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের কুঁজো কাত করে আঁজলা করে খানিকটা

জল নিয়ে নিজের মাথায় দিলেন। তাঁর মাথা গরম হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ঘুম আসবে না। ভিজে মাথায় আলতো করে গামছাটা একবার বুলিয়ে নিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুলেন। বালিশটা ভিজে গেল। ভালই। যতক্ষণ না শুকোয় ততক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা থাকবে।

পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। একটা প্যাঁচা বিকট স্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে হোটেলের পাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে বিছানায় পড়েছে। কখন জানি আপনা থেকেই রতনবাবুর মন থেকে ভাবনা মুছে গিয়ে তাঁর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

রাত্রে ঘুমোতে দেরি হবার ফলে রতনবাবুর সকালে ঘুম ভাঙতে প্রায় আটটা হয়ে গেল। ন'টায় মণিলালবাবুর আসার কথা। আজ মঙ্গলবার। মাইলখানেক দূরে একটা জায়গায় আজ হাট বসবে। গতকাল খেতে খেতে দু'জনে প্রায় একসঙ্গেই হাটে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কেনার বিশেষ কিছু নেই, খালি ঘুরে দেখা আর কি।

চা খেতে খেতেই প্রায় ন'টা বাজল। সামনে প্লেটে রাখা মৌরির খানিকটা মুখে পুরে হোটেল থেকে বাইরে বেরোতেই রতনবাবু দেখলেন মণিলালবাবু হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন।

কাছে এসে মণিলালবাবুর প্রথম কথা এল, 'আপনার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল সে-কথা ভাবতে ভাবতে কাল ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গেল। উঠে দেখি আটটা বাজতে পাঁচ। এমনিতে ঠিক ছ'টায় উঠি।'

রতনবাবু এ-কথার কোনও জবাব দিলেন না। দু'জনে হাটের দিকে রওনা দিলেন। পাড়ার কতগুলো ছোকরা জটলা করছিল; রতনবাবুরা তাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় তাদের মধ্যে একজন টিটকিরির সুরে বলে উঠল, 'মানিকজোড়!' রতনবাবু যথাসম্ভব কথাটাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চললেন। মিনিট কুড়ির মধ্যে দু'জনে হাটে পৌঁছে গেলেন।

বেশ গমগমে হাট। ফলমূল শাকসবজি তরিতরকারি থেকে বাসনকোসন হাঁড়িকুঁড়ি জামাকাপড় মুরগিছাগল ইত্যাদি সবকিছুরই দোকান বসেছে। ভিড়ও হয়েছে বেশ। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এ-দোকান সে-দোকান দেখতে দেখতে রতনবাবু আর মণিলালবাবু এগিয়ে চললেন।

ওটা কে? পঞ্চা না? রতনবাবু কেন জানি তাঁর হোটেলের চাকরটাকে সামনে ভিড়ের মধ্যে দেখে তাঁর দৃষ্টি নামিয়ে মুখটাকে আড়াল করে দিলেন। ছোকরাদের 'মানিকজোড়' কথাটা কানে যাওয়া অবধি তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে লোকেরা মনে মনে হাসে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় আচমকা রতনবাবুর মনে একটা চিন্তার উদয় হল। হঠাৎ কেন জানি মনে হল যে, তিনি একাই ছিলেন ভাল। বন্ধুর তাঁর কোনও দরকার নেই। আর বন্ধু হলেও, সে লোক যেন মণিলালবাবুর মতো না হলেই ভাল। মণিলালবাবুর সঙ্গে তিনি যতবারই কথা বলেছেন, ততবারই তাঁর মনে হয়েছে তিনি যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন। প্রশ্ন করলে কী উত্তর পাওয়া যাবে সেটা যেন আগে থেকেই জানা, তর্ক করার কোনও সুযোগ নেই, আলোচনার প্রয়োজন নেই, ঝগড়াঝাঁটির কোনও সম্ভাবনাই নেই। এটা কি বন্ধুত্বের লক্ষণ? তাঁর অফিসের কার্তিক রায়ের সঙ্গে মুকুন্দ চক্কোত্তির তো গলায় গলায় ভাব; কিন্তু তা বলে কি দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় না? আলবত হয়। কিন্তু তবু তো তারা বন্ধু, সত্যি করেই বন্ধু।

সবকিছু মিলিয়ে তাঁর বারবার মনে হতে লাগল যে মণিলাল মজুমদার লোকটি তাঁর জীবনে না এলেই যেন ভাল ছিল। ঠিক একই রকম দু'জন লোক যদি জগতে থাকেও, তাদের পরস্পরের কাছাকাছি আসাটা কোনও কাজের কথা নয়। সিনি থেকে কলকাতা ফিরে গিয়েও মণিলালবাবুর সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে এ-কথা ভাবতেই রতনবাবু শিউরে উঠলেন।

একটা দোকানে বাঁশের লাঠি বিক্রি হচ্ছিল। রতনবাবুর অনেকদিনের শখ একটা লাঠি কেনার, কিন্তু মণিলালবাবু দর করছেন দেখে রতনবাবু অনেক কষ্টে তাঁর লোভ সংবরণ করলেন। শেষটায় দেখেন কি মণিলালবাবু নিজেই একটার জায়গায় দুটো লাঠি কিনে তার একটি তাঁকে উপহার দিলেন। দেবার সময় আবার বললেন, 'এই সামান্য লাঠিটা বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসাবে নিতে আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।'

হাটের পর হোটেলের দিকে ফেরার পথে মণিলালবাবু অনেক কথা বললেন। তাঁর ছেলেবেলার কথা, তাঁর মা-বাবার কথা, তাঁর ইস্কুল কলেজের কথা। রতনবাবুর শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে, তাঁর

নিজের জীবনকথাই যেন কেউ তাঁকে গড়গড় করে শুনিয়ে যাচ্ছে।

বিকেলবেলা চা খেয়ে দু'জনে মাঠের মাঝখানের পথ দিয়ে ব্রিজের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রতনবাবুর মাথায় ফন্দিটা এল। কথা তাঁকে বেশি বলতে হচ্ছে না, তাই মাথাটা কাজ করছিল ভাল। দুপুর থেকেই মনে হচ্ছে এই লোকটাকে হটাতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু উপায়টা মাথায় আসছিল না। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিমের আকাশে কালো মেঘটা চোখে পড়তেই রতনবাবু উপায়টা যে তাঁর চোখের সামনে জ্বলজ্যান্ত দৃশ্য হিসাবে দেখতে পেলেন।

তিনি দেখলেন যে, তাঁরা দু'জন যেন ওভারব্রিজের রেলিং-এর ধারটায় দাঁড়িয়ে আছেন। দূরে পশ্চিম দিক থেকে ছ'টার মেল ট্রেনটা ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে। এঞ্জিনটা যখন বিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন তিনি মণিলালবাবুর কাঁধে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে—

রতনবাবু হাঁটা অবস্থাতেই চোখ বন্ধ করলেন। তারপর চোখ খুলে আড়চোখে একবার মণিলালবাবুর দিকে দেখে নিলেন। মণিলালবাবুকে কিছুমাত্র চিন্তিত বলে মনে হল না। কিন্তু দু'জনের মধ্যে যদি এতই মিল হয়, তা হলে মণিলালবাবুও হয়তো মনে মনে তাঁকে হটাবার কোনও ফন্দি আঁটছেন!

কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে তা মনে হল না। সত্যি বলতে কি, ভদ্রলোক দিব্যি মনের আনন্দে গুন্‌গুন করে গান গাইছেন। হিন্দি সিনেমার এই গানের সুরটা রতনবাবুও মাঝে মাঝে গুনগুন করে থাকেন।

পশ্চিমের কালো মেঘটা এগিয়ে এসেছে, সূর্য মেঘের পিছনে ঢাকা। বোধহয় আর কয়েক মিনিটেই অস্ত যাবে। রতনবাবু চারিদিকে চেয়ে ত্রিসীমানায় আর অন্য কোনও মানুষের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। ভালই হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে তাঁর প্ল্যান ভেস্তে যেত।

আশ্চর্য—একটা মানুষকে খুন করার কথা ভেবেও রতনবাবু নিজেকে দোষী মনে করতে পারলেন না। মণিলালবাবুর যদি কোনও বিশেষত্ব থাকত—এমনকী তাঁর স্বভাবচরিত্র যদি রতনবাবুর চেয়ে সামান্য অন্যরকমও হত—তা হলে রতনবাবু তাঁকে মারবার কথা কল্পনাই করতে পারতেন না। রতনবাবুর বিশ্বাস হয়েছে যে, একই রকম দু'জন লোকের একসঙ্গে বেঁচে থাকার কোনও সার্থকতা নেই। তিনি নিজে আছেন, নিজে থাকবেন এটাই যথেষ্ট! মণিলালবাবু থেকেও যদি তাঁর থেকে দূরে থাকতে পারতেন—যেমন এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন—তাতে তাঁর আপত্তি করার কিছু ছিল না। কিন্তু এখন এই আলাপের পর সেটা সম্ভব নয়, তাই তাঁকে সরিয়ে ফেলা নেহাতই দরকার।

দুই ভদ্রলোক এসে ওভারব্রিজটায় পৌঁছলেন।

'বেশ গুমোট করেছে', মণিলালবাবু বললেন। 'রাত্রের দিকে বৃষ্টিও হতে পারে। আর তার মানেই কাল থেকে জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়বে।'

রতনবাবু এই ফাঁকে একবার ঘড়িটা দেখে নিলেন। ছ'টা বাজতে বারো মিনিট। ট্রেনটা নাকি খুব টাইমে যাতায়াত করে। আর বেশিক্ষণ নেই। রতনবাবু তাঁর জড় ভাবটা ঢাকবার জন্য একটা হাই তুলে বললেন, 'বৃষ্টি হলেও ঘণ্টা চার-পাঁচের আগে কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।'

'সুপুরি খাবেন?'

মণিলালবাবু পকেট থেকে একটা গোল টিনের কৌটো বার করে ঢাকনা খুলে রতনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। রতনবাবুর পকেটেও একটা কৌটোতে সুপুরি ছিল। তিনি সেটা আর বার না করে, সেটার কথা উল্লেখও না করে মণিলালবাবুর কৌটো থেকে একটা সুপুরি নিয়ে মুখে পুরে দিলেন।

আর প্রায় সেই মুহূর্তেই ট্রেনের আওয়াজটা শোনা গেল।

আজ ট্রেনটা ছ'টার একটু আগেই চলে এসেছে।

মণিলালবাবু রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'সাত মিনিট বিফোর টাইম।'

পশ্চিমে মেঘ থাকার জন্য আজ অন্যদিনের চেয়ে চারিদিক একটু বেশি অন্ধকার, তাই হেডলাইটের আলোটা আরও বেশি উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে। এখনও অনেক দূরে ট্রেন, তবে আলোটা দ্রুত বেড়ে চলেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে চোখে জল এসে যায়।

'ক্রিং ক্রিং!'

সাইকেল চেপে একটা লোক রাস্তা দিয়ে ব্রিজের দিকে এসেছে। সর্বনাশ! লোকটা থামবে নাকি?

না, রতনবাবুর আশঙ্কা ভুল। লোকটা তাঁদের পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে উলটোদিকের রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ট্রেনটা প্রচণ্ড দাপটে এগিয়ে এসেছে। চোখ-ঝলসানো হেডলাইটে দূরত্ব আন্দাজ করা কঠিন। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওভারব্রিজ কাঁপতে শুরু করবে।

ট্রেনের শব্দে কান পাতা যায় না।

মণিলালবাবু রেলিংধারে দাঁড়িয়ে ট্রেনের দিকে চেয়ে আছেন। একটা বিদ্যুতের চমক—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রতনবাবু তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দু' হাত দিয়ে মণিলালবাবুর পিঠে মারলেন ধাক্কা। তার ফলে মণিলালবাবুর দেহটা দু' হাত উঁচু কাঠের রেলিং-এর উপর দিয়ে উলটে সটান চলে গেল নীচে একেবারে রেললাইনের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই রতনবাবু বুঝতে পারলেন যে, ওভারব্রিজটা কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

রতনবাবু আজ আর ট্রেন চলে যাবার দৃশ্য দেখার জন্য অপেক্ষা করলেন না। কাঠের ব্রিজটার মতোই তাঁর মধ্যেও একটা কাঁপুনি শুরু হয়েছে। পশ্চিমের মেঘটা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে—আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক।

রতনবাবু র‍্যাপারটা বেশ ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা দিলেন।

বৃষ্টির প্রথম পশলাটা এড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় শেষের রাস্তাটুকু প্রায় দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রতনবাবু হোটেলে ঢুকলেন।

ঢুকেই তাঁর কেমন যেন খটকা লাগল।

এটা কোথায় এলেন তিনি? মহামায়া হোটেলের সামনে ঘরটা তো এরকম নয়। এরকম টেবিল, এরকমভাবে চেয়ার সাজানো, দেয়ালে এরকম ছবি...!

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ দেয়ালে একটা কাঠের বোর্ড তাঁর চোখে পড়ল। কী বিদঘুটে ভুল রে বাবা! এ যে কালিকা হোটেলে এসে ঢুকেছেন তিনি! এইখানেই তো মণিলালবাবু ছিলেন না?

'বৃষ্টিতে ভিজলেন নাকি?'

কে একজন প্রশ্ন করল তাঁকে। রতনবাবু ঘুরে দেখলেন মাথায় কোঁকড়া চুল সবুজ র‍্যাপার গায়ে দেওয়া একজন লোক—বোধহয় এই হোটেলেরই বাসিন্দা—তাঁর দিকে মুখ করে হাতে চায়ের পেয়ালা

নিয়ে বসে আছে। রতনবাবুর মুখ দেখে ভদ্রলোক যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'সরি—ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে দেখে হঠাৎ মণিলালবাবু বলে মনে হয়েছিল!'

এই প্রশ্নটা শুনে এই প্রথম রতনবাবুর মনে একটা সন্দেহ জাগল—তিনি যে খুনটা করলেন—সেটা সবদিক বিচার করে আটঘাট বেঁধে করেছেন কি? তাঁরা দু'জন যে একসঙ্গে বেরিয়েছেন সেটা হয়তো অনেকেই দেখেছে; কিন্তু দেখা মানেই কি লক্ষ করা? যারা দেখেছে তাদের কি কথাটা মনে থাকবে? আর যদি থাকেও, তার মানেই কি সন্দেহটা তাঁর উপরেই পড়বে? হাট থেকে বেরিয়ে খোলা রাস্তায় পড়বার পর আর তাঁদের কেউ দেখেনি—এ-কথা রতনবাবু খুব ভালভাবেই জানেন। আর ওভারব্রিজে পৌঁছনোর পর—ও হ্যাঁ—সেই সাইকেলওয়ালা তো তাঁদের দুজনকে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। কিন্তু তখন রীতিমতো অন্ধকার হয়ে এসেছে। ওইভাবে দ্রুতবেগে সাইকেল চালিয়ে যাবার সময় কি সে লোক তাঁদের মুখ চিনে মনে করে রেখে দিয়েছে? অসম্ভব!

রতনবাবু যতই ভাবলেন, ততই তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগলেন। মণিলালবাবুর মৃতদেহ আবিষ্কার হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তার ফলে রতনবাবুর উপর সন্দেহ পড়বে, তাঁর বিচার হবে, শাস্তি হবে, তাঁকে খুনি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে—এসব কথা রতনবাবুর কিছুতেই বিশ্বাস হল না।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে দেখে রতনবাবু কালিকা হোটেলে বসে এক পেয়ালা চা খেলেন। সাড়ে সাতটা নাগাদ বৃষ্টি থামল। রতনবাবু সটান নিউ মহামায়ায় চলে এলেন। কী অদ্ভুতভাবে ভুল করে তিনি ভুল হোটেলে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন সেটা ভাবতেও তাঁর হাসি পাচ্ছিল।

রাত্রে পেটভরে খেয়ে বিছানায় শুয়ে 'দেশ' পত্রিকা খুলে অস্ট্রেলিয়ার বুনো জাতিদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়ে রতনবাবু ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজলেন। আবার তিনি একা এবং অদ্বিতীয়। তাঁর সঙ্গী নেই, সঙ্গীর কোনও প্রয়োজনও নেই। তিনি এতকাল যেমনভাবে কাটিয়েছেন, আবার ঠিক তেমনিভাবেই কাটাবেন। এর চেয়ে আরাম আর কী হতে পারে?

বাইরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর তার সঙ্গে বিদ্যুতের চমক আর মেঘের গর্জন। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ রতনবাবুর নাক ডাকতে শুরু করেছে।

•

পরদিন সকালে চা দেবার সময় পঞ্চা বলল, 'ওই লাঠিটা কাল হাটে কিনলেন নাকি বাবু?'

রতনবাবু বলেন, 'হ্যাঁ।'

'কত নিল?'

রতনবাবু দাম বললেন। তারপর গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে বললেন, 'তুমি গিয়েছিলে হাটে?'

পঞ্চা একগাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ বাবু। দ্যাখলাম তো আপনাকে। আপনি আমায় দেখতে পাননি?'

'কই, না তো!'

এর পরে পঞ্চার সঙ্গে তাঁর আর কোনও কথা হয়নি।

চা খাওয়া শেষ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি কালিকা হোটেলের সামনে এসে পৌঁছলেন। কালকের সেই কোঁকড়া চুলওয়ালা ভদ্রলোকটি আরও কয়েকজন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে কথাবার্তা বলছেন। মণিলালবাবুর নাম, আর 'সুইসাইড' কথাটা রতনবাবুর কানে এল। তিনি ভাল করে শোনার জন্য আরেকটু এগিয়ে গেলেন। শুধু তাই না—একটা প্রশ্নও করে বসলেন।

'কে আত্মহত্যা করল মশাই?'

গতকালের ভদ্রলোক বললেন, 'কাল আপনাকে দেখে যে লোক বলে ভুল করেছিলুম, তিনি।'

'সুইসাইড?'

'সেইরকমই তো মনে হচ্ছে। রেললাইনের ধারে লাশ পাওয়া গেছে। একটা ওভারব্রিজ আছে, তারই ঠিক নীচে। মনে হয় উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক এমনিতেই একটু অদ্ভুত গোছের ছিলেন। কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। আমরা ওঁকে নিয়ে বলাবলি করতুম।'

'ডেডবডি—?'

'পুলিশের জিম্মায়। চেঞ্জে এসেছিলেন ভদ্রলোক। চেনাশুনা কেউ নেই এখানে। কলকাতা থেকে এসেছিলেন। এর বেশি আর কিছুই নাকি জানা যায়নি।'

রতনবাবু সহানুভূতির ভঙ্গিতে বার দুয়েক মাথা নেড়ে চুক চুক করে শব্দ করে আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

সুইসাইড! তা হলে খুনের কথাটা কারুর মাথাতেই আসেনি। কী আশ্চর্য সৌভাগ্য তাঁর। খুন জিনিসটা তো তা হলে ভারী সহজ! লোকে এত ভয় পায় কেন?

রতনবাবু মনে মনে ভারী হালকা বোধ করলেন। দু'দিন পরে আজ তিনি আবার একা বেড়াতে পারবেন। ভাবতেও আনন্দ লাগে।

গতকাল মণিলালবাবুকে ঠেলা দেবার সময়ই বোধহয় রতনবাবুর শার্টের একটা বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছিল। একটা দরজির দোকান খুঁজে বার করে তিনি বোতামটা লাগিয়ে নিলেন। তারপর একটা মনিহারি দোকান থেকে একটা নিম টুথপেস্ট কিনলেন—নাহলে কাল সকালে দাঁত মাজা হবে না। যেটা রয়েছে সেটা টিপে টিপে একেবারে চ্যাপটার শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে কিছুদূর যেতেই একটা বাড়ির ভিতর থেকে কীর্তনের আওয়াজ এল রতনবাবুর কানে। রতনবাবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কীর্তন শুনলেন। তারপর শহরের বাইরে একটা নতুন রাস্তা দিয়ে মাইলখানেক হেঁটে এগারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এসে স্নান খাওয়া সেরে দিবানিদ্রার উদ্যোগ করলেন।

যথারীতি তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙল, আর ভাঙামাত্র রতনবাবু বুঝতে পারলেন যে তাঁর মন চাইছে আজ সন্ধ্যায় আরেকবার ওভারব্রিজটায় যেতে। গতকাল খুব স্বাভাবিক কারণেই রতনবাবু ট্রেনের দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারেননি। আকাশে মেঘ অবিশ্যি কাটেনি, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। আজ তিনি ট্রেন আসা থেকে শুরু করে চলে যাবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত'আরাম করে দেখবেন।

পাঁচটার সময় চা খেয়ে রতনবাবু নীচে নামলেন। সামনেই ম্যানেজার শম্ভুবাবু বসে আছেন। রতনবাবুকে দেখে বললেন, 'যে ভদ্রলোকটি কাল মারা গেছেন তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল নাকি মশাই?'

রতনবাবু প্রথমটা কিছু না বলে অবাক হবার ভান করে শম্ভুবাবুর দিকে চাইলেন। তারপর বলেন, 'কেন বলুন তো?'

'না—ইয়ে—মানে, পঞ্চা বলছিল হাটে আপনাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছে!'

রতনবাবু অল্প হেসে শান্তভাবে বললেন, 'আলাপ আমার এখানে কারুর সঙ্গেই হয়নি। হাটে এক-আধজনের সঙ্গে কথা হয়েছে বটে, তবে কি জানেন—কোন লোকটি যে মারা গেছেন সেটাই তো আমি জানি না।'

'ও হো!' শম্ভুবাবু হাসলেন। ভদ্রলোক বেশ আমুদে। 'উনিও আপনারই মতো হাওয়া বদলাতে এসেছিলেন। কালিকা হোটেলে উঠেছিলেন।'

'ও, তাই বুঝি!'

রতনবাবু আর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে পড়লেন। প্রায় দু' মাইল পথ, আর বেশি দেরি করলে ট্রেন দেখা যাবে না।

রাস্তায় তাঁর দিকে আর কেউ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিল না। গতকাল যে ছেলেগুলো জটলা করছিল, তাদের কাউকেই আজ আর দেখা গেল না। ওই 'মানিকজোড়' কথাটা রতনবাবুর ভাল লাগেনি। ছেলেগুলো কোথায় গেল? একটা ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন রতনবাবু। পাড়ায় পুজো আছে। ছেলেগুলো নির্ঘাত সেখানেই গেছে। রতনবাবু নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চললেন।

খোলা প্রান্তরের মাঝখানের পথে আজ তিনি একা। মণিলালবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার আগেও তিনি নিশ্চিন্ত মানুষ ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর নিজেকে যেমন হালকা মনে হচ্ছে, তেমন হালকা এর আগে কখনও মনে হয়নি।

ওই যে বাবলা গাছ। ওটা পেরিয়ে মিনিটখানেক হাঁটলেই ওভারব্রিজ। আকাশ মেঘে ভরা, তবে ঘন

কালো মেঘ নয়, ছাইয়ের মতো ফিকে মেঘ। বাতাস নেই, তাই সমস্ত মেঘ যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওভারব্রিজটা দেখতে পেয়ে রতনবাবুর মন আনন্দে নেচে উঠল। তিনি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলেন। বলা যায় না—ট্রেন যদি কালকের চেয়েও বেশি তাড়াতাড়ি এসে পড়ে! মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক বক উড়ে গেল। ভিনদেশের বক কিনা কে জানে!

ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাটা রতনবাবু বেশ ভাল করে বুঝতে পারলেন। খুব মন দিয়ে কান পাতলে ক্ষীণ ঢাকের শব্দ শহরের দিক থেকে শোনা যায়। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

রতনবাবু রেলিঙের পাশটায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ওই যে দূরে সিগন্যাল, আর ওই যে আরও দূরে স্টেশন। রেলিং-এর নীচের দিকের কাঠের ফাটলে কী যেন একটা জিনিস চকচক্ করছে। রতনবাবু উপুড় হয়ে হাত বাড়িয়ে জিনিসটাকে বার করে আনলেন। সেটা একটা গোল টিনের কৌটো, তার ভিতরে এলাচ আর সুপুরি। রতনবাবু একটু হেসে সেটাকে ব্রিজের উপর থেকে নীচের লাইনে ফেলে দিলেন। ঠুং করে একটা মৃদু শব্দও পেলেন তিনি। কদ্দিন ওইখানে পড়ে থাকবে ওই সুপুরির কৌটো কে জানে!

কীসের আলো ওটা?

ট্রেন আসছে। এখনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আলো এগিয়ে আসছে।

রতনবাবু অবাক হয়ে আলোটা দেখতে লাগলেন। হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে তাঁর কাঁধ থেকে র‍্যাপারটা খসে পড়ল। রতনবাবু সেটাকে আবার বেশ ভাল করে জড়িয়ে নিলেন।

এবারে শব্দ পাচ্ছেন তিনি। গুড় গুড় গুড় গুম গুম গুম গুম গুম—যেন একটা ঝড় এগিয়ে আসছে, আর সঙ্গে ক্রমাগত একটা মেঘের গর্জন।

রতনবাবুর হঠাৎ মনে হল তাঁর পিছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময় ট্রেনের দিক থেকে চোখ ফেরানো মুশকিল—কিন্তু তাও তিনি একবার চারিদিক চট করে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন। কেউ কোথাও নেই। আজ কালকের চেয়ে অন্ধকার কম, তাই দেখতে অসুবিধে নেই। শুধু তিনি আর ওই দ্রুত ধাবমান জাঁদরেল ট্রেনটা ছাড়া মাইলখানেকের মধ্যে আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।

ট্রেন এখন একশো গজের মধ্যে। রতনবাবু রেলিঙের দিকে আরও এগিয়ে গেলেন। আগেকার দিনের স্টিম এঞ্জিন হলে এতটা এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ হত না; চোখে মুখে কয়লার ধোঁয়া ঢুকে যাবার বিপদ ছিল। এ ট্রেন ডিজেল ট্রেন, তাই ধোঁয়া নেই। শুধু বুক কাঁপানো গুরুগম্ভীর শব্দ আর চোখ ঝলসানো হেডলাইটের আলো।

ওই এসে পড়ল ট্রেন ব্রিজটার নীচে।

রতনবাবু তাঁর দু' কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে দুটো হাত এসে তাঁর পিঠে মারল এক প্রচণ্ড ধাক্কা। রতনবাবু টাল সামলাতে পারলেন না, কারণ রেলিংটা ছিল মাত্র দু'হাত উঁচু।

মেল ট্রেনটা সশব্দে ব্রিজ কাঁপিয়ে চলে গেল পশ্চিম দিকে, যেদিকের আকাশে রক্তের রঙ এখন বেগুনি হয়ে এসেছে।

রতনবাবু এখন আর ব্রিজের উপরে নেই, তবে তাঁর চিহ্নস্বরূপ একটি জিনিস এখনও রেলিং-এর কাঠের একটা ফাটলে আটকে রয়েছে। সেটা সুপুরি আর এলাচে ভরা একটি অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো।

সন্দেশ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

ফ্রিৎস

জয়ন্তর দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে তাকে প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

'তোকে আজ যেন কেমন মনমরা মনে হচ্ছে? শরীর-টরীর খারাপ নয় তো?'

জয়ন্ত তার অন্যমনস্ক ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে একটা ছেলেমানুষি হাসি হেসে বলল, 'নাঃ! শরীর তো খারাপ নয়ই, বরং অলরেডি অনেকটা তাজা লাগছে। জায়গাটা সত্যিই ভাল।'

'তোর তো চেনা জায়গা। আগে জানতিস না ভাল?'

'প্রায় ভুলে গেসলাম।' জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'অ্যাদ্দিন বাদে আবার ক্রমে ক্রমে মনে পড়ছে। বাংলোটা তো মনে হয় ঠিক আগের মতোই আছে। ঘরগুলোরও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ফার্নিচারও কিছু কিছু সেই পুরনো আমলেরই রয়েছে বলে মনে হয়। যেমন এই বেতের টেবিল আর চেয়ারগুলো।'

বেয়ারা ট্রেতে করে চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। সবে চারটে বাজে, কিন্তু এর মধ্যেই রোদ পড়ে এসেছে। টি-পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কদ্দিন বাদে এলি?'

জয়ন্ত বলল, 'একত্রিশ বছর। তখন আমার বয়স ছিল ছয়।'

আমরা যেখানে বসে আছি সেটা বুন্দি শহরের সার্কিট হাউসের বাগান। আজ সকালেই এসে পৌঁছেছি। জয়ন্ত আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা এক স্কুলে ও এক কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। এখন ও একটা খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি করে, আর আমি করি ইস্কুল মাস্টারি। চাকরি জীবনে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান এসে গেলেও বন্ধুত্ব টিকে আছে ঠিকই। রাজস্থান ভ্রমণের প্ল্যান আমাদের অনেকদিনের। দু'জনের একসঙ্গে ছুটি পেতে অসুবিধা হচ্ছিল, অ্যাদ্দিনে সেটা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ লোকেরা রাজস্থান গেলে আগে জয়পুর-উদয়পুর-চিতোরটাই দেখে—কিন্তু জয়ন্ত প্রথম থেকেই বুন্দির উপর জোর দিচ্ছিল। আমিও আপত্তি করিনি, কারণ ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'বুঁদির কেল্লা' নামটার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, সে কেল্লা এতদিনে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হবে সেটা ভাবতে মন্দ লাগছিল না। বুন্দি অনেকেই আসে না; তবে তার মানে এই নয় যে এখানে দেখার তেমন কিছুই নেই। ঐতিহাসিক ঘটনার দিক দিয়ে বিচার করলে উদয়পুর, যোধপুর, চিতোরের মূল্য হয়তো অনেক বেশি, কিন্তু সৌন্দর্যের বিচারে বুন্দি কিছু কম যায় না।

জয়ন্ত বুন্দি সম্পর্কে এত জোর দিয়ে বলতে প্রথমে একটু অদ্ভুত লেগেছিল; ট্রেনে আসতে আসতে কারণটা জানতে পারলাম। সে ছেলেবেলায় একবার নাকি বুন্দিতে এসেছিল, তাই সেই পুরনো স্মৃতির সঙ্গে নতুন করে জায়গাটাকে মিলিয়ে দেখার একটা ইচ্ছে তার মনে অনেকদিন থেকেই ঘোরাফেরা করছে। জয়ন্তর বাবা অনিমেষ দাশগুপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে কাজ করতেন, তাই তাঁকে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়াতে হত। এই সুযোগেই জয়ন্তর বুন্দি দেখা হয়ে যায়।

সার্কিট হাউসটা সত্যিই চমৎকার। ব্রিটিশ আমলের তৈরি, বয়স অন্তত শ'খানেক বছর তো বটেই। একতলা বাড়ি, টালি বসানো ঢালু ছাত, ঘরগুলো উঁচু উঁচু, উপর দিকে স্কাইলাইট দড়ি দিয়ে টেনে ইচ্ছেমতো খোলা বা বন্ধ করা যায়। পুব দিকে বারান্দা। তার সামনে প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডে কেয়ারি করা বাগানে গোলাপ ফুটে রয়েছে। বাগানের পিছন দিকটায় নানারকম বড় বড় গাছে অজস্র পাখির জটলা। টিয়ার তো ছড়াছড়ি। ময়ূরের ডাকও মাঝে মাঝে শোনা যায়, তবে সেটা কম্পাউন্ডের বাইরে থেকে।

আমরা সকালে পৌঁছেই আগেই একবার শহরটা ঘুরে দেখে এসেছি। পাহাড়ের গায়ে বসানো বুন্দির বিখ্যাত কেল্লা। আজ দূর থেকে দেখেছি, কাল একেবারে ভিতরে গিয়ে দেখব। শহরে ইলেকট্রিক

পোস্টগুলো না থাকলে মনে হত যেন আমরা সেই প্রাচীন রাজপুত আমলে চলে এসেছি। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা, বাড়ির সামনের দিকে দোতলা থেকে ঝুলে পড়া অদ্ভুত সব কারুকার্য করা বারান্দা, কাঠের দরজাগুলোতে নিপুণ হাতের নকশা—দেখে মনেই হয় না যে আমরা যান্ত্রিক যুগে বাস করছি।

এখানে এসে অবধি লক্ষ করেছি জয়ন্ত সচরাচর যা বলে তার চেয়ে একটু কম কথা বলছে। হয়তো অনেক পুরনো স্মৃতি তার মনে ফিরে আসছে। ছেলেবেলার কোনও জায়গায় অনেকদিন পরে ফিরে এলে মনটা উদাস হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আর জয়ন্ত যে সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি ভাবুক সেটা তো সকলেই জানে।

চায়ের পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে রেখে জয়ন্ত বলল, 'জানিস শঙ্কর, ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত।

প্রথমবার যখন এখানে আসি, তখন মনে আছে এই চেয়ারগুলিতে আমি পা তুলে বাবু হয়ে বসতাম। মনে হত যেন একটা সিংহাসনে বসে আছি। এখন দেখছি চেয়ারগুলো আয়তনেও বড় না, দেখতেও অতি সাধারণ। সামনের যে ড্রয়িংরুম, সেটা এর দ্বিগুণ বড় বলে মনে হত। যদি এখানে ফিরে না আসতুম, তা হলে ছেলেবেলার ধারণাটাই কিন্তু টিকে যেত।'

আমি বললাম, 'এটাই তো স্বাভাবিক। ছেলেবেলায় আমরা থাকি ছোট; সেই অনুপাতে আশেপাশের জিনিসগুলোকে বড় মনে হয়। আমরা বয়সের সঙ্গে বাড়ি, কিন্তু জিনিসগুলো তো বাড়ে না!'

চা খাওয়া শেষ করে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে জয়ন্ত হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে বলে উঠল—'দেবদারু।'

কথাটা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম। জয়ন্ত আবার বলল, 'একটা দেবদারু গাছ—ওই ওদিকটায় থাকার কথা।'

এই বলে সে দ্রুতবেগে গাছপালার মধ্যে দিয়ে কম্পাউন্ডের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ একটা দেবদারু গাছের কথা জয়ন্ত মনে রাখল কেন?

কয়েক সেকেন্ড পরেই জয়ন্তর উল্লসিত কণ্ঠস্বর পেলাম—'আছে! ইটস হিয়ার! ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই—'

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'গাছ যদি থেকে থাকে তো সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। গাছ তো আর হেঁটেচলে বেড়ায় না!'

জয়ন্ত একটু বিরক্তভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'সেখানেই আছে মানে এই নয় যে আমি ভেবেছিলাম এই ত্রিশ বছরে গাছটা জায়গা পরিবর্তন করেছে। সেখানে মানে আমি যেখানে গাছটা ছিল বলে অনুমান করেছিলাম, সেইখানে।'

'কিন্তু একটা গাছের কথা হঠাৎ মনে পড়ল কেন তোর?'

জয়ন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে গাছের গুঁড়ির দিকে চেয়ে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা এখন আর কিছুতেই মনে পড়ছে না। কী একটা কারণে জানি গাছটার কাছে এসেছিলাম—কী একটা করেছিলাম। একটা সাহেব...'

'সাহেব?'

'না, আর কিছু মনে পড়ছে না। মেমারির ব্যাপারটা সত্যিই ভারী অদ্ভুত...'

এখানে বাবুর্চির রান্নার হাত ভাল। রাত্রে ডাইনিংরুমে ওভাল-শেপের টেবিলটায় বসে খেতে খেতে জয়ন্ত বলল, 'তখন যে বাবুর্চিটা ছিল, তার নাম ছিল দিল্‌ওয়ার! তার বাঁ গালে একটা কাটা দাগ ছিল, ছুরির দাগ—আর চোখ দুটো সবসময় জবাফুলের মতো লাল হয়ে থাকত। কিন্তু রান্না করত খাসা।'

খাবার পরে ড্রয়িংরুমের সোফাতে বসে জয়ন্তর ক্রমে আরও পুরনো কথা মনে পড়তে লাগল। তার বাবা কোন সোফায় বসে চুরুট খেতেন, মা কোথায় বসে উল বুনতেন, টেবিলের ওপর কী কী ম্যাগাজিন পড়ে থাকত—সবই তার মনে পড়ল।

আর এইভাবেই শেষে তার পুতুলের কথাটাও মনে পড়ে গেল।

পুতুল বলতে মেয়েদের ডল পুতুল নয়। জয়ন্তর এক মামা সুইজারল্যান্ড থেকে এনে দিয়েছিলেন দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা সুইসদেশীয় পোশাক পরা একটা বুড়োর মূর্তি। দেখতে নাকি একেবারে একটি খুদে জ্যান্ত মানুষ। ভিতরে যন্ত্রপাতি কিছু নেই, কিন্তু হাত পা আঙুল কোমর এমনভাবে তৈরি যে ইচ্ছামতো বাঁকানো যায়। মুখে একটা হাসি লেগেই আছে। মাথার উপর ছোট্ট হলদে পালক গোঁজা সুইস পাহাড়ি টুপি। এ ছাড়া পোশাকের খুঁটিনাটিতেও নাকি কোনওরকম ভুল নেই—বেল্ট বোতাম পকেট কলার মোজা—এমনকী জুতোর বকলসটা পর্যন্ত নিখুঁত।

প্রথমবার বুন্দিতে আসার কয়েকমাস আগেই জয়ন্তর মামা বিলেত থেকে ফেরেন, আর এসেই জয়ন্তকে পুতুলটা দেন। সুইজারল্যান্ডের কোনও গ্রামে এক বুড়োর কাছ থেকে পুতুলটা কেনেন তিনি। বুড়ো নাকি ঠাট্টা করে বলে দিয়েছিল, 'এর নাম ফ্রিৎস। এই নামে ডাকবে একে। অন্য নামে ডাকলে কিন্তু জবাব পাবে না।'

জয়ন্ত বলল, 'আমি ছেলেবেলায় খেলনা অনেক পেয়েছি। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে ছিলাম বলেই বোধহয় তাঁরা এই ব্যাপারে আমাকে কখনও বঞ্চিত করেননি। কিন্তু মামার দেওয়া এই ফ্রিৎস-কে পেয়ে কী যে হল—আমি আমার অন্য সমস্ত খেলনার কথা একেবারে ভুলে গেলাম। রাতদিন ওকে নিয়েই পড়ে থাকতাম; এমনকী শেষে একটা সময় এল যখন আমি ফ্রিৎস-এর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিব্যি আলাপ চালিয়ে যেতাম। এক তরফা আলাপ অবিশ্যি, কিন্তু ফ্রিৎস-এর মুখে এমন একটা হাসি, আর ওর চোখে এমন একটা চাহনি ছিল যে, মনে হত যেন আমার কথা ও বেশ বুঝতে পারছে। এক-এক সময় এমনও মনে হত যে, আমি যদি বাংলা না বলে জার্মান বলতে পারতাম, তা হলে আমাদের আলাপটা হয়তো একতরফা না হয়ে দু'তরফা হত। এখন ভাবলে ছেলেমানুষি পাগলামি মনে হয়, কিন্তু তখন আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল ভীষণ 'রিয়েল'। বাবা-মা বারণ করতেন অনেক, কিন্তু আমি কারুর কথা শুনতাম না। তখন আমি ইস্কুল যেতে শুরু করিনি, কাজেই ফ্রিৎসকে দেবার জন্য সময়ের অভাব ছিল না আমার।'

এই পর্যন্ত বলে জয়ন্ত চুপ করল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত সাড়ে ন'টা। বুন্দি শহর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমরা সার্কিট হাউসের বৈঠকখানায় একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে আছি।

আমি বললাম, 'পুতুলটা কোথায় গেল?'

জয়ন্ত এখনও যেন কী ভাবছে। উত্তরটা এত দেরিতে এল যে, আমার মনে হচ্ছিল প্রশ্নটা বুঝি ওর কানেই যায়নি।

'পুতুলটা বুন্দিতে নিয়ে এসেছিলাম। এখানে নষ্ট হয়ে যায়।'

'নষ্ট হয়ে যায়?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'কীভাবে?'

জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'একদিন বাইরে বাগানে বসে চা খাচ্ছিলাম আমরা। পুতুলটাকে পাশে ঘাসের ওপর রেখেছিলাম। কাছে কতগুলো কুকুর জটলা করছিল। তখন আমার যা বয়স, তাতে চা খাবার কথা নয়, কিন্তু জেদ করে চা নিয়ে খেতে খেতে হঠাৎ পেয়ালাটা কাত হয়ে খানিকটা গরম চা আমার প্যান্টে পড়ে যায়। বাংলোয় এসে প্যান্ট বদল করে বাইরে ফিরে গিয়ে দেখি পুতুলটা নেই। খোঁজাখুঁজির পর দেখি আমার ফ্রিৎসকে নিয়ে দুটো রাস্তার কুকুর দিব্যি টাগ-অফ-ওয়ার খেলছে। জিনিসটা খুবই মজবুত ছিল তাই ছিঁড়ে আলগা হয়ে যায়নি। তবে চোখমুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে জামাকাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, আমার কাছে ফ্রিৎস-এর আর অস্তিত্বই ছিল না। হি ওয়াজ ডেড।'

'তারপর?' ভারী আশ্চর্য লাগছিল জয়ন্তর এই কাহিনী।

'তারপর আর কী? যথাবিধি ফ্রিৎস-এর সৎকার করি।'

'তার মানে?'

'ওই দেবদারু গাছটার নীচে ওকে কবর দিই। ইচ্ছে ছিল কফিন জাতীয় একটা কিছু জোগাড় করা—সাহেব তো! একটা বাক্স থাকলেও কাজ চলত, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পেলাম না। তাই শেষটায় এমনিই পুঁতে ফেলি।'

এতক্ষণে দেবদারু গাছের রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হল।

দশটা নাগাদ ঘুমোতে চলে গেলাম।

একটা বেশ বড় বেডরুমে দুটো আলাদা খাটে আমাদের বিছানা। কলকাতায় হাঁটার অভ্যেস নেই, এমনিতেই বেশ ক্লান্ত লাগছিল, তার উপর বিছানায় ডানলোপিলো। বালিশে মাথা দেবার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে গেল।

রাত তখন ক'টা জানি না, একটা কীসের শব্দে জানি ঘুমটা ভেঙে গেল। পাশ ফিরে দেখি জয়ন্ত সোজা হয়ে বিছানার উপর বসে আছে। তার পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে, আর সেই আলোয় তার চাহনিতে উদ্বেগের ভাবটা স্পষ্ট ধরা পড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে আমাকে একটা পালটা প্রশ্ন করল—'সার্কিট হাউসে বেড়াল বা ইঁদুর জাতীয় কিছু আছে নাকি?'

বললাম, 'থাকাটা কিছুই আশ্চর্য না। কিন্তু কেন বল তো?'

'বুকের উপর দিয়ে কী যেন একটা হেঁটে গেল। তাই ঘুমটা ভেঙে গেল।'

আমি বললাম, 'ইঁদুর জিনিসটা সচরাচর নর্দমা-টর্দমা দিয়ে ঢোকে। আর খাটের উপর ইঁদুর ওঠে বলে তো জানা ছিল না।'

জয়ন্ত বলল, 'এর আগেও একবার ঘুমটা ভেঙেছিল, তখন জানলার দিক থেকে একটা খচখচ শব্দ পাচ্ছিলাম।'

'জানলায় যদি আওয়াজ পেয়ে থাকিস তা হলে বেড়ালের সম্ভাবনাটাই বেশি।'

'কিন্তু তা হলে...'

জয়ন্তর মন থেকে যেন খটকা যাচ্ছে না। বললাম, 'বাতিটা জ্বালার পর কিছু দেখতে পাসনি?'

'নাথিং। অবিশ্যি ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গেই বাতিটা জ্বালিনি। প্রথমটা বেশ হকচকিয়ে গেসলাম। সত্যি বলতে কি, একটু ভয়ই করছিল। আলো জ্বালার পর কিছুই দেখতে পাইনি।'

'তার মানে যদি কিছু এসে থাকে তা হলে সেটা ঘরের মধ্যেই আছে?'

'তা...দরজা যখন দুটোই বন্ধ...'

আমি চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের আনাচে কানাচে, খাটের তলায়, সুটকেসের পিছনে একবার খুঁজে দেখে নিলাম। কোথাও কিচ্ছু নেই। বাথরুমের দরজাটা ভেজানো ছিল; সেটার ভিতরেও খুঁজতে গেছি, এমন সময় জয়ন্ত চাপা গলায় ডাক দিল।

'শঙ্কর!'

ফিরে এলাম ঘরে। জয়ন্ত দেখি তার লেপের সাদা ওয়াড়টার দিকে চেয়ে আছে। আমি তার দিকে এগিয়ে যেতে সে লেপের একটা অংশ ল্যাম্পের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা কী দ্যাখ তো।'

কাপড়টার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখি তাতে হালকা খয়েরি রঙের ছোট ছোট গোল গোল কীসের জানি ছাপ পড়েছে। বললাম, 'বিড়ালের থাবা হলেও হতে পারে।'

জয়ন্ত কিছু বলল না। বেশ বুঝতে পারলাম কী কারণে জানি সে ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এদিকে রাত আড়াইটে বাজে। এত কম ঘুমে আমার ক্লান্তি দূর হবে না, তা ছাড়া কালকেও সারাদিন ঘোরাঘুরি আছে। তাই, আমি পাশে আছি, কোনও ভয় নেই, ছাপগুলো আগে থেকেই থাকতে পারে, ইত্যাদি বলে কোনওরকমে তাকে আশ্বাস দিয়ে বাতি নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার কোনও সন্দেহ ছিল না যে, জয়ন্ত যে অভিজ্ঞতার কথাটা বলল সেটা আসলে তার স্বপ্নের অন্তর্গত। বুন্দিতে এসে পুরনো কথা মনে পড়ে ও একটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে, আর তার থেকেই বুকে বেড়াল হাঁটার স্বপ্নের উদ্ভব হয়েছে।

রাত্রে আর কোনও ঘটনা ঘটে থাকলেও আমি সে বিষয়ে কিছু জানতে পারিনি, আর জয়ন্তও সকালে উঠে নতুন কোনও অভিজ্ঞতার কথা বলেনি। তবে তাকে দেখে এটুকু বেশ বুঝতে পারলাম যে, রাত্রে তার ভাল ঘুম হয়নি। মনে মনে স্থির করলাম যে, আমার কাছে যে ঘুমের বড়িটা আছে, আজ রাত্রে শোয়ার আগে তার একটা জয়ন্তকে খাইয়ে দেব।

আমার প্ল্যান অনুযায়ী আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে ন'টার সময় বুন্দির কেল্লা দেখতে গেলাম। গাড়ির ব্যবস্থা করা ছিল আগে থেকেই। কেল্লায় পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে গেল প্রায় সাড়ে ন'টা।

এখানে এসেও দেখি জয়ন্তর সব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে তার পুতুলের কোনও সম্পর্ক নেই। সত্যি বলতে কি, জয়ন্তর ছেলেমানুষি উল্লাস দেখে মনে হচ্ছিল সে বোধহয় পুতুলের কথাটা ভুলে গেছে। এককেটা জিনিস দেখে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—'ওই যে গেটের মাথায় সেই হাতি! ওই যে সেই গম্বুজ! এই সেই রুপোর খাট আর সিংহাসন! ওই যে দেয়ালে আঁকা ছবি!...'

কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই তার ফুর্তি কমে এল। আমি নিজে এত তন্ময় ছিলাম যে, প্রথমে সেটা বুঝতে পারিনি। একটা লম্বা ঘরের ভিতর দিয়ে হাঁটছি আর সিলিং-এর দিকে চেয়ে ঝাড় লণ্ঠনগুলো দেখছি, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল জয়ন্ত আমার পাশে নেই। কোথায় পালাল সে?

আমাদের সঙ্গে একজন গাইড ছিল, সে বলল বাবু বাইরে ছাতের দিকটায় গেছে।

দরবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি জয়ন্ত বেশ খানিকটা দূরে ছাতের উলটো দিকের পাঁচিলের পাশে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে আপন চিন্তায় এমনই মগ্ন যে, আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেও তার অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। শেষটায় আমি নাম ধরে ডাকতে সে চমকে উঠল। বললাম, 'কী হয়েছে তোর ঠিক করে বল তো। এমন চমৎকার জায়গায় এসেও তুই মুখ ব্যাজার করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবি—এ আমার বরদাস্ত হচ্ছে না।'

জয়ন্ত শুধু বলল, 'তোর দেখা শেষ হয়েছে কি? তা হলে এবার...'

আমি একা হলে নিশ্চয়ই আরও কিছুক্ষণ থাকতাম, কিন্তু জয়ন্তর ভাবগতিক দেখে সার্কিট হাউসে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

পাহাড়ের গা দিয়ে বাঁধানো রাস্তা শহরের দিকে গিয়েছে। আমরা দু'জনে চুপচাপ গাড়ির পিছনে বসে আছি। জয়ন্তকে সিগারেট অফার করতে সে নিল না। তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ করলাম, যেটা প্রকাশ পাচ্ছিল তার হাত দুটোর অস্থিরতায়। হাত একবার গাড়ির জানলায় রাখছে, একবার কোলের ওপর, পরক্ষণেই আবার আঙুল মটকাচ্ছে, না হয় নখ কামড়াচ্ছে। জয়ন্ত এমনিতে শান্ত মানুষ। তাকে এভাবে ছটফট করতে দেখে আমার ভারী অসোয়াস্তি লাগছিল।

মিনিট দশেক এইভাবে চলার পর আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, 'তোর দুশ্চিন্তার কারণটা আমায় বললে হয়তো তোর কিছুটা উপকার হতে পারে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, 'বলে লাভ নেই, কারণ বললে তুই বিশ্বাস করবি না।'

'বিশ্বাস না করলেও, বিষয়টা নিয়ে অন্তত তোর সঙ্গে আলোচনা করতে পারব।'

'কাল রাত্রে ফ্রিৎস আমাদের ঘরে এসেছিল। লেপের ওপর ছাপগুলো সব ফ্রিৎসের পায়ের ছাপ।'

এ-কথার পর অবিশ্যি জয়ন্তর কাঁধ ধরে দুটো ঝাঁকুনি দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার থাকে না। যার মাথায় এমন একটা প্রচণ্ড আজগুবি ধারণা আশ্রয় নিয়েছে, তাকে কি কিছু বলে বোঝানো যায়? তবু বললাম, 'তুই নিজের চোখে তো দেখিসনি কিছুই।'

'না—তবে বুকের উপর যে জিনিসটা হাঁটছে সেটা যে চারপেয়ে নয়, দু' পেয়ে, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।'

সার্কিট হাউসে এসে গাড়ি থেকে নামার সময় মনে মনে স্থির করলাম জয়ন্তকে একটা নার্ভ টনিক গোছের কিছু দিতে হবে। শুধু ঘুমের বড়িতে হবে না। ছেলেবেলার সামান্য একটা স্মৃতি একটা সাঁইত্রিশ বছরের জোয়ান মানুষকে এত উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলবে—এ কিছুতেই হতে দেওয়া চলে না।

ঘরে এসে জয়ন্তকে বললাম, 'বারোটা বাজে, স্নানটা সেরে ফেললে হত না!'

জয়ন্ত 'তুই আগে যা' বলে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

স্নান করতে করতে আমার মাথায় ফন্দি এল। জয়ন্তকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বোধহয় এই একমাত্র রাস্তা।

ফন্দিটা এই—ত্রিশ বছর আগে যদি পুতুলটাকে একটা বিশেষ জায়গায় মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়ে থাকে, আর সেই জায়গাটা কোথায় যদি জানা থাকে, তা হলে সেখানে মাটি খুঁড়লে আস্ত পুতুলটাকে আগের অবস্থায় না পেলেও, তার কিছু অংশ এখনও নিশ্চয়ই পাবার সম্ভাবনা আছে। কাপড় জামা মাটির তলায় ত্রিশ বছর থেকে যেতে পারে না; কিন্তু ধাতব জিনিস—যেমন ফ্রিৎসের বেল্টের বকলস বা কোটের পেতলের বোতাম—এসব জিনিসগুলো টিকে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। জয়ন্তকে যদি দেখানো যায় যে তার সাধের পুতুলের শুধু ওই জিনিসগুলোই অবশিষ্ট আছে, আর সব মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তা হলে হয়তো তার মন থেকে উদ্ভট ধারণা দূর হবে। এ না করলে প্রতিরাত্রেই সে আজগুবি স্বপ্ন দেখবে, আর সকালে উঠে বলবে ফ্রিৎস আমার বুকের উপর হাঁটাহাঁটি করছিল। এইভাবে ক্রমে তার মাথাটা বিগড়ে যাওয়া অসম্ভব না।

জয়ন্তকে ব্যাপারটা বলাতে তার ভাব দেখে মনে হল ফন্দিটা তার মনে ধরেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সে বলল, 'খুঁড়বে কে? কোদাল কোথায় পাবে?'

আমি হেসে বললাম, 'এতবড় বাগান যখন রয়েছে তখন মালিও একটা নিশ্চয়ই আছে। আর মালি থাকা মানেই কোদালও আছে। লোকটাকে কিছু বকশিশ দিলে সে মাঠের এক প্রান্তে একটা গাছের

গুঁড়ির পাশে খানিকটা মাটি খুঁড়ে দেবে না—এটা বিশ্বাস করা কঠিন।'

জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ রাজি হল না। আমিও আর কিছু বললাম না। আরও দু-একবার হুমকি দেবার পর সে স্নানটা সেরে এল। এমনিতে খাইয়ে লোক হলেও, দুপুরে সে মাত্র দু'খানা হাতের রুটি আর সামান্য মাংসের কারি ছাড়া আর কিছুই খেল না। খাওয়া সেরে বাগানের দিকের বারান্দায় গিয়ে বেতের চেয়ারে বসে রইলাম দু'জনে। আমরা ছাড়া সার্কিট হাউসে কেউ নেই। দুপুরটা থমথমে। ডানদিকে নুড়ি ফেলা রাস্তার ওপাশে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে কয়েকটা হনুমান বসে আছে, মাঝে মাঝে তাদের হুপ্ হুপ্ ডাক শোনা যাচ্ছে।

তিনটে নাগাদ একটা পাগড়ি পরা লোক হাতে একটা ঝারি নিয়ে বাগানে এল। লোকটার বয়স হয়েছে। চুল গোঁফ গালপাট্টা সবই ধবধবে সাদা।

'তুমি বলবে, না আমি?'

জয়ন্তর প্রশ্নতে আমি তার দিকে আশ্বাসের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে ইশারা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা চলে গেলাম মালিটার দিকে।

মাটি খোঁড়ার প্রস্তাবে মালি প্রথমে কেমন জানি অবাক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বোঝা গেল এমন প্রস্তাব তাকে এর আগে কেউ কোনওদিন করেনি। তার 'কাহে বাবু?' প্রশ্নতে আমি তার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললাম, 'কারণটা না হয় নাই জানলে। পাঁচ টাকা বকশিশ দেব—যা বলছি করে দাও।'

বলা বাহুল্য, মালি তাতে শুধু রাজিই হল না, দন্ত বিকশিত করে সেলাম টেলাম ঠুকে এমন ভাব দেখাল যেন সে আমাদের চিরকালের কেনা গোলাম।

বারান্দায় বসা জয়ন্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। সে চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। কাছে এলে বুঝলাম তার মুখ অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আশা করি খোঁড়ার ফলে পুতুলের কিছুটা অংশ অন্তত পাওয়া যাবে।

মালি ইতিমধ্যে কোদাল নিয়ে এসেছে। আমরা তিনজনে দেবদারু গাছটার দিকে এগোলাম।

গাছের গুঁড়িটার থেকে হাত দেড়েক দূরে একটা জায়গার দিকে হাত দেখিয়ে জয়ন্ত বলল, 'এইখানে।'

'ঠিক মনে আছে তো তোর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

জয়ন্ত মুখে কিছু না বলে কেবল মাথাটা একবার নাড়িয়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল।

'কতটা নীচে পুঁতেছিলি?'

'এক বিঘত তো হবেই।'

মালি আর দ্বিরুক্তি না করে মাটিতে কোপ দিতে শুরু করল। লোকটার রসবোধ আছে। খুঁড়তে খুঁড়তে একবার জিজ্ঞেস করল মাটির নীচে ধনদৌলত আছে কিনা, এবং যদি থাকে তা হলে তার থেকে তাকে ভাগ দেওয়া হবে কিনা। এ-কথা শুনে আমি হাসলেও, জয়ন্তর মুখে কোনও হাসির আভাস দেখা গেল না। অক্টোবর মাসে বুন্দিতে গরম নেই, কিন্তু কলারের নীচে জয়ন্তর শার্ট ভিজে গেছে। সে একদৃষ্টে মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে। মালি কোদালের কোপ মেরে চলেছে। এখনও পুতুলের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কেন?

একটা ময়ূরের তীক্ষ্ণ ডাক শুনে আমি মাথাটা একবার ঘুরিয়েছি, এমন সময় জয়ন্তর গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেয়ে আমার চোখটা তৎক্ষণাৎ তার দিকে চলে গেল। তার নিজের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পরক্ষণেই তার কম্পমান ডান হাতটা সে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিয়ে তর্জনীটাকে সোজা করে গর্তটার দিকে নির্দেশ করল। আঙুলটাকেও স্থির রাখতে পারছে না সে।

তারপর এক অস্বাভাবিক শুকনো ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন এল—

'ওটা কী!'

মালির হাত থেকে কোদালটা মাটিতে পড়ে গেল।

মাটির দিকে চেয়ে যা দেখলাম তাতে ভয়ে, বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে আপনা থেকেই আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

দেখলাম, গর্তের মধ্যে ধুলোমাখা অবস্থায় চিত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একটি দশ-বারো ইঞ্চি ধবধবে সাদা নিখুঁত নরকঙ্কাল!

সন্দেশ, পৌষ-মাঘ ১৩৭৭

ব্রাউন সাহেবের বাড়ি

ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটি হাতে আসার পর থেকেই ব্যাঙ্গালোর যাবার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। সেটা এল বেশ অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমাদের বালিগঞ্জ স্কুলের বাৎসরিক রি-ইউনিয়নে দেখা হয়ে গেল আমার পুরনো সহপাঠী অনীকেন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে। অনীক বলল সে ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে চাকরি করছে। 'একবার ঘুরে যা না এসে আমার ওখানে। দ্য বেস্ট প্লেস ইন ইন্ডিয়া! একটা বাড়তি ঘরও আছে আমার বাড়িতে। আসবি?'

অনীক স্কুলে থাকতে আমার খুবই বন্ধু ছিল। তারপর যা হয় আর কি। কলেজ হয়ে গেল দু'জনের আলাদা। তা ছাড়া ও বিজ্ঞান আর আমি আর্টস। দু'জনে প্রায় উলটোমুখো রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। মাঝে ও আবার চলে গেল বিলেতে। ফলে ক্রমে দু'জনের বন্ধুত্বের মধ্যেও অনেকটা ব্যবধান এসে পড়ল। আর আজ প্রায় বারো বছর পর তার সঙ্গে দেখা। বললাম, 'গিয়ে পড়তে পারি। কোন সময়টা ভাল?'

'এনি টাইম। ব্যাঙ্গালোরে গরম নেই। সাধে কি জায়গাটা সাহেবদের এত প্রিয়? তুই যখনই আসতে চাস আসিস। তবে সাতদিনের নোটিশ পেলে ভাল হয়।'

যাক, তা হলে ব্রাউন সাহেবের বাড়িটা দেখার সৌভাগ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু তার আগে সাহেবের ডায়রিটার কথা বলা দরকার।

আমি হলাম যাকে বলে পুরনো বইয়ের পোকা। ব্যাঙ্কে কাজ করে প্রতি মাসে যা রোজগার হয়, তার অন্তত অর্ধেক টাকা পুরনো বই কেনার পিছনে খরচ হয়। ভ্রমণকাহিনী, শিকারের গল্প, ইতিহাস, আত্মজীবনী, ডায়রি—কতরকম বই না গত পাঁচ বছরে জমে উঠেছে আমার। পোকায় কাটা পাতা, বার্ধক্যে ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া পাতা, ড্যাম্পে বিবর্ণ হওয়া পাতা—এসবই আমার কাছে অতি পরিচিত এবং অতি প্রিয় জিনিস। আর পুরনো বইয়ের গন্ধ—এর জুড়ি নেই। অগুরু কস্তুরী গোলাপ হাসনুহানা—মায় ফরাসি সেরা পারফিউমের সুবাস এই দুটো গন্ধর কাছে হার মেনে যায়।

এই পুরনো বই কেনাই আমার একমাত্র নেশা, আর পুরনো বই কিনতে গিয়েই পাওয়া ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটা। বলে রাখি এ ডায়রি কিন্তু ছাপা ডায়রি নয়—যদিও সেরকম ডায়রিও আমার আছে। এ ডায়রি একেবারে খাগের কলমে লেখা আসল ডায়রি। লাল চামড়ায় বাঁধানো সাড়ে তিনশো পাতার রুলটানা খাতা। ছ' ইঞ্চি বাই সাড়ে চার ইঞ্চি। মলাটের চারপাশে সোনার জলের নকশা করা বর্ডার, তার মাঝখানে সোনার ছাপার অক্ষরে লেখা সাহেবের নাম—জন মিডলটন ব্রাউন। মলাট খুললে প্রথম পাতায় সাহেবের নিজের হাতে নাম সই, তার নীচে সাহেবের ঠিকানা—এভারগ্রিন লজ, ফ্রেজার টাউন, ব্যাঙ্গালোর—আর তার নীচে লেখা—জানুয়ারি, ১৮৫৮। অর্থাৎ এ ডায়রির বয়স হল একশো তেরো। এই ব্রাউন সাহেবের নাম লেখা অন্য আরও খানকতক বইয়ের সঙ্গে ছিল এই লাল চামড়ায় বাঁধানো খাতাটা। নামকরা বইয়ের তুলনায় দাম খুবই কম। মকবুল চাইল কুড়ি, আমি বললাম দশ, শেষটায় বারো টাকার বিনিময়ে বইটা আমার সম্পত্তি হয়ে গেল। ব্রাউন যদি নামকরা কেউ হতেন তা হলে এই বইয়ের দাম হাজার টাকা হতে পারত।

ডায়রিটাতে তখনকার দিনের ভারতবর্ষে সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনের বাইরে আর কিছু জানতে পাব এমন আশা করিনি। সত্যি বলতে কি, প্রথম শ'খানেক পাতা পড়ে তার বেশি পাইওনি। ব্রাউন সাহেবের পেশা ছিল ইস্কুলমাস্টারি। ব্যাঙ্গালোরের কোনও একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সাহেব নিজের কথাই বেশি বলেছেন; মাঝে মাঝে ব্যাঙ্গালোর শহরের বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় তখনকার বড়লাটের গিন্নি লেডি ক্যানিং-এর ব্যাঙ্গালোর আসার ঘটনা বলেছেন, ব্যাঙ্গালোরের ফুল ফল গাছপালা

ও তাঁর নিজের বাগানের কথা বলেছেন। এক এক জায়গায় আবার ইংল্যান্ডের সাসেক্স অঞ্চলে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, আর তাঁর পিছনে-ফেলে আসা আত্মীয়স্বজনের কথা বলেছেন। তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথের উল্লেখও আছে, তবে স্ত্রীটি কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন।

সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সাইমন নামে কোনও এক ব্যক্তির বারংবার উল্লেখ। এই সাইমন যে কে ছিলেন—তাঁর ছেলে না ভাই না ভাগ্নে না বন্ধু না কী—সেটা বোঝার কোনও উপায় ডায়রিতে নেই। তবে সাইমনের প্রতি ব্রাউন সাহেবের যে একটা গভীর টান ছিল সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। সাইমনের বুদ্ধি, সাইমনের সাহস, সাইমনের রাগ অভিমান দুষ্টুমি খামখেয়ালিপনা ইত্যাদির কথা বারবার আছে ডায়রিতে। সাইমন অমুক চেয়ারটায় বসতে ভালবাসে, আজ সাইমনের শরীরটা ভাল নেই, সাইমনকে আজ সারাদিন দেখতে পাইনি বলে মনখারাপ—এই ধরনের সব খুঁটিনাটি খবরও আছে। আর আছে সাইমনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। ২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বজ্রাঘাতে সাইমনের মৃত্যু হয়। পরের দিন ভোরবেলা ব্রাউন সাহেবের বাগানে একটা বাজে ঝলসে যাওয়া ইউক্যালিপটাস গাছের পাশে সাইমনের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

এর পর থেকে একটা মাস ডায়রিতে প্রায় আর কিছুই লেখা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তার মধ্যে শোক আর হতাশার কথা ছাড়া আর কিছু নেই। ব্রাউন সাহেব দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন—কিন্তু সাইমনের আত্মা থেকে দূরে সরে যেতে তাঁর মন চায়নি। সাহেবের স্বাস্থ্যও যেন অল্প অল্প ভেঙে পড়েছে। 'আজও স্কুলে গেলাম না' কথাটা পাঁচ জায়গায় বলা হয়েছে। লুকাস বলে একজন ডাক্তারের উল্লেখও আছে। তিনি ব্রাউন সাহেবকে পরীক্ষা করে ওষুধ বাতলে গেছেন।

তারপর হঠাৎ—২রা নভেম্বর—ডায়রিতে এক আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ; এবং এই ঘটনাই আমরা কাছে ডায়রির মূল্য হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রাউন সাহেব এ ঘটনাটা লিখেছেন রোজকার নীলের বদলে লাল কালিতে। তাতে বলছেন (আমি বাংলায় অনুবাদ করছি)—'আজ এক অভাবনীয় আশ্চর্য ঘটনা! আমি বিকালে লালবাগে গিয়েছিলাম গাছপালার সান্নিধ্যে আমার মনটাকে একটু শান্ত করার জন্য। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি—সাইমন ফায়ারপ্লেসের পাশে তার প্রিয় হাই-ব্যাকড চেয়ারটিতে বসে আছে। সাইমন! সত্যিই সাইমন! আমি তো দেখে আনন্দে আত্মহারা। আর শুধু যে বসে আছে তা নয়—সে একদৃষ্টে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে তার স্নেহমাখানো চোখ দুটি দিয়ে। এদিকে ঘরে বাতি নেই। আমার ফাঁকিবাজ খানসামা টমাস এখনও ল্যাম্প জ্বালেনি। তাই সাইমনকে আরেকটু ভাল করে দেখব বলে আমি পকেট থেকে দেশলাইটা বার করলাম। কাঠি বার করে বাক্সের গায়ে ঘষতেই আলো জ্বলে উঠল—কিন্তু কী আফসোস! এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সাইমন উধাও! অবিশ্যি সাইমনকে যে কোনওদিন আবার দেখতে পাব সেটাই তো আশা করিনি! এইভাবে ভূত অবস্থাতেও যদি মাঝে মাঝে সে দেখা দিয়ে যায়, তা হলে আমার মন থেকে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। সত্যি আজ এক অপূর্ব আনন্দের দিন। সাইমন মরে গিয়েও আমাকে ভোলেনি; এমনকী তার প্রিয় চেয়ারটিকেও সে ভোলেনি। দোহাই সাইমন—মাঝে মাঝে দেখা দিও—আর কিছু চাই না আমি তোমার কাছে। এইটুকু পেলেই আমি বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারব।'

এর পরে ডায়রি আর বেশিদিন চলেনি। যেটুকু আছে তার মধ্যে কোনও দুঃখের ছাপ নেই, কারণ সাইমনের সঙ্গে ব্রাউন সাহেবের প্রতিদিনই একবার করে দেখা হয়েছে। সাইমনের ভূত সাহেবকে হতাশ করেনি।

ডায়রির শেষ পাতায় লেখা আছে—'যে আমাকে ভালবাসে, তার মৃত্যুর পরেও যে তার সে-ভালবাসা অটুট থাকে, এই জ্ঞান লাভ করে আমি পরম শান্তি পেয়েছি।'

ব্যস্—এই শেষ। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে—ব্রাউন সাহেবের এই বাড়ি—ব্যাঙ্গালোরের ফ্রেজার টাউনের এভারগ্রিন লজ—এখনও আছে কি? আর সেখানে এখনও সন্ধ্যাকালে সাইমন সাহেবের ভূতের আগমন হয় কি? আর সে ভূত কি অচেনা লোককে দেখা দেয়? আমি যদি সে-বাড়িতে গিয়ে একটা সন্ধ্যা কাটাই—তা হলে সাইমনের ভূতকে দেখতে পাব কি?

ব্যাঙ্গালোরে এসে প্রথম দিন অনীককে এসব কিছুই বলিনি। সে আমাকে তার অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে করে সমস্ত ব্যাঙ্গালোর শহর ঘুরিয়ে দেখিয়েছে—এমনকী ফ্রেজার টাউনও। ব্যাঙ্গালোর সত্যিই সুন্দর জায়গা, তাই শহরটা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে আমার কোনও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি। শুধু সুন্দর

নয়—কলকাতার পর এমন একটা শান্ত কোলাহলশূন্য শহরকে প্রায় একটা অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের মতো মনে হয়।

দ্বিতীয় দিন ছিল রবিবার। সকালে অনীকের বাগানে রঙিন ছাতার তলায় বসে চা খেতে খেতে প্রথম ব্রাউন সাহেবের প্রসঙ্গটা তুললাম। ও শুনেটুনে হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে বেতের টেবিলের উপর রেখে বলল, 'দ্যাখ রঞ্জন—যে বাড়ির কথা বলছিস সে বাড়ি হয়তো থাকলেও থাকতে পারে, একশো বছর আর এমন কী বেশি। তবে সেখানে গিয়ে যদি ভূতটুত দেখার লোভ থেকে থাকে তোর, তা হলে আমি ওর মধ্যে নেই। কিছু মনে করিসনি ভাই—আমি চিরকালই একটু অতিরিক্ত সেন্‌সিটিভ। এমনি দিব্যি আছি—আজকের দিনের শহরের কোনও উপদ্রব নেই এখানে—ভূতের পিছনে ছোটা মানে সাধ করে উপদ্রব ডেকে আনা। ওর মধ্যে আমি নেই!'

অনীকের কথা শুনে বুঝলাম এই বারো বছরে ও বিশেষ বদলায়নি। ইস্কুলে ভিতু বলে ওর বদনাম ছিল বটে। মনে পড়ল একবার আমাদের ক্লাসেরই জয়ন্ত আর আরও কয়েকটি ডানপিটে ছেলে ওকে এক সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের রাইডিং স্কুলের কাছটাতে আপাদমস্তক সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল। অনীক এই ঘটনার পর দু'দিন ইস্কুলে আসেনি, এবং অনীকের বাবা নিজে হেডমাস্টার বীরেশ্বর বাবুর কাছে এসে ব্যাপারটা নিয়ে কমপ্লেন করেছিলেন।

আমি এ বিষয়ে কিছু বলার আগেই অনীক হঠাৎ বলে উঠল, 'তবে নেহাতই যদি তোর যেতে হয়, তা হলে সঙ্গীর অভাব হবে না। আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।'

পিছন ফিরে দেখি একটি বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক অনীকের বাগানের গেট দিয়ে ঢুকে হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, প্রায় ছ' ফুট হাইট, পরনে ছাই রঙের হ্যান্ডলুমের প্যান্টের উপর গাঢ় নীল টেরিলিনের বুশশার্টের গলায় সাদা-কালো বাটিকের ছোপ মারা সিল্কের মাফলার।

অনীক পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু রঞ্জন সেনগুপ্ত—মিস্টার হৃষীকেশ ব্যানার্জি।'

ভদ্রলোক শুনলাম ব্যাঙ্গালোরে এয়ারক্রাফট ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন, বহুদিন বাংলাদেশ ছাড়া, তাই কথার মধ্যে একটা অবাঙালি টান এসে পড়েছে, আর অজস্র ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন।

অনীক বেয়ারাকে ডেকে আর এক পেয়ালা চায়ের কথা বলে দিয়ে একেবারে সোজাসুজি ব্রাউন সাহেবের বাড়ির কথাটা পেড়ে বসল। কথাটা শুনে ভদ্রলোক এমন অট্টহাস্য করে উঠলেন যে, কিছুক্ষণ থেকে যে কাঠবিড়ালিটাকে দেখছিলাম আমাদের টেবিলের আশেপাশে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করছে, সেটা ল্যাজ উঁচিয়ে একটা দেবদারু গাছের গুঁড়ি বেয়ে সটান একেবারে মগডালে পৌঁছে গেল।

'গোস্টস? গোস্টস? ইউ সিরিয়াসলি বিলিভ ইন গোস্টস? আজকের দিনে? আজকের যুগে?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'একটা কৌতূহল থাকতে ক্ষতি কী? এমনও তো হতে পারে যে, ভূতেরও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, যেটা দশ বছরের মধ্যে জানা যাবে।'

ব্যানার্জির হাসি তবুও থামে না। লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের দাঁতগুলো ভারী ঝকঝকে ও মজবুত।

অনীক বলল, 'যাই হোক মিস্টার ব্যানার্জি—গোস্ট অর নো গোস্ট—এমন বাড়ি যদি একটা থেকেই থাকে, আর রঞ্জনের যদি একটা উদ্ভট খেয়াল হয়েই থাকে—একটা সন্ধেবেলা ওকে নিয়ে খানিকটা সময়ের জন্য ও বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারেন কিনা সেইটে বলুন। ও কলকাতা থেকে এসেছে, আমার গেস্ট—ওকে তো আর আমি একা যেতে দিতে পারি না সেখানে। আর সত্যি বলতে কি—আমি নিজে মানুষটা একটু অতিরিক্ত, যাকে বলে, সাবধানী। আমি যদি নিয়ে যাই তা হলে বোধহয় ওর সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই হবে বেশি।'

মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর শার্টের পকেট থেকে একটা বাঁকা পাইপ বার করে তার মধ্যে তামাক গুঁজতে গুঁজতে বললেন, 'আমার আপত্তি নেই—তবে আমি যেতে পারি কেবল একটা কন্ডিশনে—আমি সঙ্গে শুধু একজনকে নেব না, দু'জনকেই নেব।'

কথাটা শেষ করে ব্যানার্জি আবার হাসলেন, আর তার ফলে এবার আশেপাশের গাছ থেকে চার-পাঁচরকম পাখির চিৎকার ও ডানা-ঝাপটানির আওয়াজ শোনা গেল। অনীকের মুখ কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে দেখালেও, সে আপত্তি করতে পারল না।

'কী নাম বললেন বাড়িটার?' ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

'এভারগ্রিন লজ।'
'ফ্রেজার টাউনে?'
'তাই তো বলছে ডায়রিতে।'
'হুঁ...' ভদ্রলোক পাইপে টান দিলেন। 'ফ্রেজার টাউনে সাহেবদের কিছু পুরনো বাড়ি আছে বটে, কটেজ টাইপের। এনিওয়ে—যেতেই যদি হয় তো দেরি করে লাভ কী? হোয়াট অ্যাবাউট আজ বিকেল? এই ধরুন চারটে নাগাদ?'

ইঞ্জিনিয়ার হলে কী হবে—মেজাজটা একেবারে পুরোদস্তুর মিলিটারি এবং সাহেবি। ঘড়ি ধরে চারটের সময় হৃষীকেশ ব্যানার্জি তাঁর মরিস মাইনর গাড়িটি নিয়ে হাজির। গাড়িতে যখন উঠছি তখন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'সঙ্গে কী কী নিলেন?'
অনীক ফিরিস্তি দিল—একটা পাঁচসেলের টর্চ, ছ'টা মোমবাতি, ফার্স্ট-এড বক্স, একটা বড় ফ্লাস্ক ভর্তি গরম কফি, এক বাক্স হ্যাম স্যান্ডউইচ, এক প্যাকেট তাস, মাটিতে পাতবার চাদর, মশা তাড়ানোর জন্য এক টিউব ওডোমস।
'আর অস্ত্রশস্ত্র?' ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।
'ভূতকে কি অস্ত্র দিয়ে কিছু করা যায়? কী রে রঞ্জন—তোর সাইমনের ভূত কি সলিড নাকি?'
'যাই হোক,' মিস্টার ব্যানার্জি গাড়ির দরজা বন্ধ করে বললেন, 'আমার কাছে একটি ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্র আছে, সুতরাং সলিড-লিকুইড নিয়ে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই।'
গাড়ি ছাড়ার পর ব্যানার্জি বললেন, 'এভারগ্রিন লজের ব্যাপারটা একেবারে কাল্পনিক নয়।'
আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'আপনি কি এর মধ্যেই খোঁজ নিয়েছেন নাকি?'
ব্যানার্জি রীতিমতো কসরতের সঙ্গে দুটো সাইকেল চালককে পর পর পাশ কাটিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম এ ভেরি মেথডিক্যাল ম্যান, মিস্টার সেনগুপ্ত। যেখানে যাচ্ছি, সে জায়গাটা অ্যাট অল আছে কিনা সেটার সম্বন্ধে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রাখা উচিত নয় কি? ও দিকটায় শ্রীনিবাস দেশমুখ থাকে—আমরা একসঙ্গে গল্‌ফ খেলি—অনেকদিনের আলাপ। সকালে এখান থেকে ওর বাড়িতেই গেসলাম। বলল এভারগ্রিন লজ বলে একটা একতলা কটেজ নাকি প্রায় পঞ্চাশ বছর থেকে খালি পড়ে আছে। বাড়ির বাইরের বাগানে বছর দশেক আগে পর্যন্ত লোকে পিকনিক করতে যেত, এখন আর যায় না। খুব নিরিবিলি জায়গায় বাড়িটা। আগেও নাকি একটানা বেশিদিন কেউ ও বাড়িতে থাকেনি। তবে হন্টেড হাউস বলে কেউ কোনওদিন অপবাদ দেয়নি বাড়িটার। বাড়ির ফার্নিচার সব বহুদিন আগেই নিলাম হয়ে গেছে। তার কিছু নাকি কর্নেল মার্সারের বাড়িতে আছে। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। তিনিও ফ্রেজার টাউনেই থাকতেন। সব শুনেটুনে, বুঝেছেন মিস্টার সেনগুপ্ত, মনে হচ্ছে আমাদেরও এই পিকনিক জাতীয়ই একটা কিছু করে ফেরত আসতে হবে। অনীকেন্দ্র তাসটা এনে ভালই করেছে।'
ব্যাঙ্গালোরের পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে বারবারই মনে হচ্ছিল যে শহরটা এতই অভুতুড়ে যে, এখানে একটা হানাবাড়ির অস্তিত্বই কল্পনা করাই কঠিন।
কিন্তু তার পরেই আবার মনে পড়ে যাচ্ছিল ব্রাউন সাহেবের ডায়রির কথা। লোকে নেহাত পাগল না হলে ডায়রিতে আজগুবি কথা বানিয়ে লিখবে কেন? সাইমনের ভূত ব্রাউন নিজে দেখেছেন। একবার নয়, অনেকবার। সে ভূত কি আমাদের জন্য একবার দেখা দেবে না?

বিলেতে আমি যাইনি, কিন্তু বিলেতের কটেজের ছবি বইয়ের পাতায় ঢের দেখেছি। এভারগ্রিন লজের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল সত্যিই যেন ইংল্যান্ডের কোনও গ্রামাঞ্চলের একটা পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে এসে পড়েছি।
কটেজের সামনেই ছিল বাগান। সেখানে ফুলের কেয়ারির বদলে এখন শুধু ঘাস আর আগাছা। একটা ছোট্ট কাঠের গেট (যাকে ইংরেজিতে বলে wicket) দিয়ে বাগানে ঢুকতে হয়। সেই গেটের গায়ে একটা ফলকে খোদাই করে এখনও লেখা রয়েছে বাড়ির নামটা। তবে হয়তো কোনও চড়ুইভাতির দলেরই

কেউ রসিকতা করে এভারগ্রিন কথাটার আগে একটা N জুড়ে দিয়ে সেটাকে নেভারগ্রিন করে দিয়েছে।

আমরা গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ির দিকে এগোলাম। চারিদিকে অজস্র গাছপালা। ইউক্যালিপটাসও গোটা তিনেক রয়েছে দেখলাম। আর যা গাছ আছে তার অনেকগুলোরই নাম আমার জানা নেই, চোখেও দেখিনি এর আগে কোনওদিন। ব্যাঙ্গালোরের জলমাটির নাকি এমনই গুণ যে, সেখানে যে-কোনও দেশের যে-কোনও গাছই বেঁচে থাকে।

কটেজের সামনে একটা টালির ছাউনি দেওয়া পোর্টিকো, তার বাঁকা থামগুলো বেয়ে লতা উঠেছে ওপর দিকে। ছাউনির অনেক টালিই নেই, ফলে ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সামনের দরজার একটা পাল্লা ভেঙে কাত হয়ে আছে। বাড়ির সামনের দিকের দরজা-জানলার কাচ অধিকাংশই ভাঙা। দেয়ালের ওপর শেওলা ধরে এমন অবস্থা হয়েছে যে বাড়ির আসল রঙটা যে কী ছিল তা আজ বোঝার উপায় নেই।

দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম আমরা।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ। পিছন দিকে একটা ভাঙা দরজার ভিতর দিয়ে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। আমাদের ডাইনে-বাঁয়েও ঘর। ডাইনেরটাই বেশি বড় বলে মনে হল। আন্দাজে বুঝলাম এটাই হয়তো বৈঠকখানা ছিল। মেঝেতে বিলিতি কায়দায় কাঠের তক্তা বসানো—তার কোনওটাই প্রায় আস্ত নেই। সাবধানে পা ফেলতে হয়, এবং প্রতি পদক্ষেপে খুটখাট খচখচ শব্দ থাকে।

আমরা ঘরটাতে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর, ফার্নিচার না থাকাতে আরও খাঁ খাঁ করছে। পশ্চিম আর উত্তর দিকে জানলার সারি। একদিকের জানলা দিয়ে গেট সমেত বাগান, আর অন্যদিক দিয়ে গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। এরই একটাতে কি বাজ পড়েছিল? সাইমন দাঁড়িয়েছিল সেই গাছের নীচে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। ভাবতে গা-টা ছমছম করে উঠল।

এবারে দক্ষিণ দিকের জানলাবিহীন দেয়ালের দিকে চাইলাম। বাঁ কোণে ফায়ারপ্লেস। এই ফায়ারপ্লেসের পাশেই ছিল সাইমনের প্রিয় চেয়ারখানা।

ঘরের সিলিং-এর দিকে চাইতে চোখে পড়ল ঝুল আর মাকড়সার জাল। এককালে সুদৃশ্য এভারগ্রিন লজের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়।

মিস্টার ব্যানার্জি প্রথমদিকে লা লা করে বিলিতি সুর ভাঁজছিলেন, এখন নতুন করে পাইপ ধরিয়ে বললেন, 'কী খেলা আসে আপনাদের? ব্রিজ, না পোকার, না রামি?'

অনীক হাতের জিনিসপত্র মেঝেতে সাজিয়ে চাদরটা বিছিয়ে মাটিতে বসতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা শব্দ কানে এল।

অন্য কোনও ঘরে কেউ জুতো পায়ে হাঁটছে।

অনীকের দিকে চেয়ে দেখলাম সে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

পায়ের শব্দটা থামল। মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিয়ে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'ইজ এনিবডি দেয়ার?' সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনে প্যাসেজের দিকে এগোলাম। অনীক আলতো করে আমার কোটের আস্তিনটা ধরে নিয়েছে।

এবার জুতোর শব্দটা আবার শুরু হল। আমরা বাইরে প্যাসেজে গিয়ে পড়তেই ডানদিকের ঘরটা থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে সামনে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকটি ভারতীয়। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ সত্ত্বেও ইনি যে ভদ্র এবং শিক্ষিত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যালো।'

আমরা কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না, এমন সময় আগন্তুক নিজেই আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করলেন।

'আমার নাম ভেঙ্কটেশ। আই অ্যাম এ পেন্টার। আপনারা কি এই বাড়ির মালিক না খদ্দের?'

ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'দুটোর একটাও না। আমরা এমনি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি।'

'আই সী। আমি ভাবছিলাম এই বাড়িটা যদি পাওয়া যেত তা হলে আমার কাজের জন্য একটা স্টুডিও হতে পারত। ভাঙাচোরায় আমার আপত্তি নেই। মালিক কে জানেন না বোধহয়?'

'আজ্ঞে না। সরি।' ব্যানার্জি বললেন। 'তবে আপনি কর্নেল মার্সারের ওখানে খোঁজ করে দেখতে

পারেন। সামনের রাস্তা ধরে বাঁ দিকে চলে যাবেন। মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে মিস্টার ভেঙ্কটেশ বেরিয়ে চলে গেলেন।

গেট খোলার এবং বন্ধ করার শব্দ পাবার পর ব্যানার্জি আবার তাঁর অট্টহাসি হেসে বললেন, 'মিস্টার সেনগুপ্ত, ইনি নিশ্চয়ই আপনার সাইমন বা ওই জাতীয় কোনও ভূতটুত নন!'

আমি হেসে বললাম, 'সবেমাত্র সোয়া পাঁচটা, এর মধ্যেই আপনি ভূতের আশা করেন কী করে? আর ইনি ভূত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চয়ই নন, কারণ তা হলে পোশাকটা অন্যরকম হত।'

আমরা ইতিমধ্যে বৈঠকখানায় ফিরে এসেছি। অনীক মাটিতে পাতা চাদরের উপর বসে পড়ে বলল, 'মিথ্যে কল্পনার প্রশ্রয় দিয়ে নার্ভাসনেস বাড়ানো! তার চেয়ে তাস হোক।'

'আগে মোমবাতি খানকতক জ্বালাও দেখি,' ব্যানার্জি বললেন, 'এখানে বড় ঝপ্ করে সন্ধে নামে।'

দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে কাঠের মেঝেতে দাঁড় করিয়ে ফ্লাস্কের ঢাকনিতে কফি ঢেলে তিনজনে পালা করে খেয়ে নিলাম। একটা কথা আমার কিছুক্ষণ থেকে মনে আসছিল সেটা আর না বলে পারলাম না। ভূতের নেশা যে আমার ঘাড়ে কীভাবে চেপেছে সেটা আমার এই কথা থেকেই বোঝা যাবে। ব্যানার্জিকে উদ্দেশ করে বললাম, 'আপনি বলেছিলেন কর্নেল মার্সার এ-বাড়ির ফার্নিচার কিছু কিনেছিলেন। তিনি যদি এতই কাছে থাকেন তা হলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে একটা জিনিসের খোঁজ করে আসা যায় কি?'

'কী জিনিস?' ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন।

'একটা বিশেষ ধরনের হাই-ব্যাক্ড চেয়ার।'

অনীক যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, 'কেন বল্ তো? হঠাৎ এখন হাই-ব্যাক্ড চেয়ারের খোঁজ করে কী হবে?'

'না, মানে, ব্রাউন সাহেব বলেছেন ওটা নাকি সাইমনের খুব প্রিয় চেয়ার ছিল। সে ভূত হয়েও ওটাতে এসে বসত। ওটা থাকত ওই ফায়ারপ্লেসটার পাশে। হয়তো ওটা ওখানে এনে রাখতে পারলে—'

অনীক বাধা দিয়ে বলল, 'তুই ব্যানার্জি সাহেবের ওই মরিস গাড়িতে করে হাই-ব্যাক্ড চেয়ার নিয়ে আসবি? না কি আমরা তিনজনে ওটাকে কাঁধে করে আনব? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

ব্যানার্জি এবার হাত তুলে আমাদের দু'জনকেই থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কর্নেল মার্সার যা কিনেছেন তার মধ্যে ওরকম চেয়ার নেই এটা আমি জানি। তাঁর বাড়িতে আমার যথেষ্ট যাতায়াত আছে। ওটা থাকলে আমার চোখে পড়ত। আমি যতদূর জানি উনি কিনেছিলেন দুটো বুক কেস, দুটো অয়েল পেন্টিং, খানকতক ফুলদানি, আর শেল্‌ফে সাজিয়ে রাখার জন্য গুটিকতক শখের জিনিস, যাকে আর্ট অবজেক্টস বলে।'

আমি দমে গেলাম। অনীক তাস বার করে সাফল করতে আরম্ভ করেছে। ব্যানার্জি বললেন, 'রামিই হোক। আর এসব খেলা জমে ভাল যদি পয়সা দিয়ে খেলা যায়। আপনাদের আপত্তি আছে কি?'

বললাম, 'মোটেই না। তবে আমি ব্যাঙ্কের সামান্য চাকুরে, বেশি হারাবার সামর্থ্য আমার নেই।'

বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। আমরা খেলায় মন দিলাম। আমার তাসের ভাগ্য কোনওদিনই ভাল না। আজও তার ব্যতিক্রম লক্ষ করলাম না। আমি জানি অনীক মনে মনে নার্ভাস হয়ে আছে, সুতরাং সে জিতলে পরে আমি অন্তত একটু নিশ্চিন্ত হতাম, কিন্তু তারও কোনও লক্ষণ দেখলাম না। কপাল ভাল একমাত্র মিস্টার ব্যানার্জির। গুনগুন করে বিলিতি সুর ভাঁজছেন, আর দানের পর দান জিতে চলেছেন। খেলতে খেলতে নিস্তব্ধতার মধ্যে একবার একটা বেড়ালের ডাক শুনলাম। তার ফলে আমার মনটা আরও যেন একটু দমে গেল। হানাবাড়িতে বেড়ালেরও থাকা উচিত নয়। কথাটা বলাতে ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'বাট ইট ওয়াজ এ ব্ল্যাক ক্যাট—ওই প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে গেল। ব্ল্যাক ক্যাট তো ভূতের সঙ্গে যায় ভালই—তাই না?'

খেলা চলতে থাকল। বেশ কিছুক্ষণের জন্য একবার মাত্র একটা অজানা পাখির কর্কশ ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ, দৃশ্য বা ঘটনা আমাদের একাগ্রতায় বাধা পড়তে দেয়নি।

ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা, বাইরের আলো নেই বললেই চলে, আমি একটু ভাল তাস পেয়ে পর পর দু'বার জিতেছি, আর এক রাউন্ড রামি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, এমন সময় হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক শব্দ কানে এল।

কে যেন বাইরের দরজায় টোকা মারছে।
আমাদের তিনজনেরই হাত তাসসুদ্ধ নীচে নেমে এল।
টক টক্ টক্ টক্।
অনীক এবার আরও ফ্যাকাশে। আমার বুকের ভিতরেও মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্যানার্জি দেখলাম সত্যিই ঘাবড়াবার লোক নন। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করে তাঁর বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হু ইজ ইট?'
আবার দরজায় টোকা—টক্ টক্ টক্।
ব্যানার্জি তদন্ত করার জন্য তড়াক করে উঠে পড়লেন। আমি খপ করে ভদ্রলোকের প্যান্টটা ধরে চাপা গলায় বললাম, 'একা যাবেন না।'
তিনজনে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরোলাম। প্যাসেজে এসে বাঁ দিকে চাইতেই দেখলাম দরজার বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে—তার পরনে সুট ও হাতে একটা লাঠি। অন্ধকারে তাকে চেনার কোনও উপায় নেই। অনীক আবার আমার আস্তিন চেপে ধরল। এবার আরও জোরে। ওর অবস্থা দেখেই বোধহয় আমার মনে আপনা থেকেই একটা সাহসের ভাব এল।

ব্যানার্জি ইতিমধ্যে আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও-হ্যালো, ডক্টন লার্কিন! আপনি এখানে?'

এবার আমিও প্রৌঢ় সাহেবটিকে বেশ ভালভাবেই দেখতে পেলাম। অমায়িক সাহেবটি তাঁর সোনার চশমার পিছনে নীল চোখ দুটোকে কুঁচকে হেসে বললেন, 'তোমার মরিস গাড়িখানা দেখলাম বাইরে। তারপর দেখি বাড়ির জানলা দিয়ে মোমবাতির আলো দেখা যাচ্ছে। তাই ভাবলাম একবার ঢুঁ মেরে দেখে যাই তুমি কী পাগলামি করছ এই পোড়ো বাড়ির ভেতর।'

ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'আমার এই যুবক বন্ধু দুটির একটু উদ্ভট ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের শখ। বলল এভারগ্রিন লজে বসে তাস খেলবে, তাই আর কি!'

'ভেরি গুড, ভেরি গুড! যুবা বয়সটাই তো এ-ধরনের পাগলামির সময়। আমরা বুড়োরাই কেবল নিজেদের বাড়ির কৌচে বসে রোমন্থন করি। ওয়েল ওয়েল—হ্যাভ এ গুড টাইম!'

লার্কিন সাহেব হাত তুলে গুডবাই করে লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে চলে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার ভূতের আশা পরিত্যাগ করতে হল। কী আর করি, আবার তাসে মনোনিবেশ করলাম। প্রথমদিকে প্রায় সাড়ে চার টাকার মতো হারছিলাম, গত আধঘণ্টায় তার খানিকটা ফিরে পেয়েছি। সাইমনের ভূত না দেখলেও, শেষ পর্যন্ত তাসে কিছু জিতে বাড়ি ফিরতে পারলেও আজকের আউটিংটা কিছুটা সার্থক হয়।

ঘড়ির দিকে মাঝে মাঝেই চোখটা চলে যাচ্ছিল। আসল ঘটনাটা কখন ঘটেছিল তার টাইম আমার জানা আছে। ব্রাউন সাহেবের ডায়রি থেকে জেনেছিলাম যে সন্ধ্যার এই সময়টাতেই বাজ পড়ে সাইমনের মৃত্যু হয়।

আমি তাস বাঁটছি, মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন, অনীক সবেমাত্র স্যান্ডউইচ খাবার মতলবে প্যাকেটটাতে হাত লাগিয়েছে, এমন সময় তার চোখের চাহনিটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

তার দৃষ্টি দরজার বাইরে প্যাসেজের দিকে। বাকি দু'জনের চোখও স্বভাবতই সেদিকে চলে গেল। যা দেখলাম তাতে আমারও কয়েক মুহূর্তের জন্য গলা শুকিয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে প্যাসেজের অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফসফরাসের মতো ফিকে সবুজ আর হলদে মেশানো একটা আভা এই নিষ্পলক চাহনিতে।

মিস্টার ব্যানার্জির ডানহাতটা ধীরে ধীরে তাঁর কোটের ভেস্ট পকেটের দিকে চলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন ম্যাজিকের মতো আমার কাছে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আমার মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দিল। বললাম, 'আপনার পিস্তলের দরকার নেই মশাই—এটা সেই কালো বেড়ালটা।'

আমার কথায় অনীকও যেন ভরসা পেল। ব্যানার্জি পকেট থেকে তাঁর হাত বার করে এনে চাপা গলায় বললেন, 'হাউ রিডিকুলাস।'

এবার জ্বলন্ত চোখ দুটো আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে এল। চৌকাঠ পেরোতেই মোমবাতির আলোতে প্রমাণ হল আমার কথা। এটা সেই কালো বেড়ালটাই বটে!

চৌকাঠ পেরিয়ে বেড়ালটা বাঁ দিকে ঘুরল। আমাদের দৃষ্টি তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, তাকে অনুসরণ করছে।

এবারে আমাদের তিনজনের গলা দিয়ে একসঙ্গে একটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল। আচমকা বিস্ময়ের ফলে যে-শব্দ আপনা থেকেই মানুষের মুখ থেকে বেরোয়—এ সেই শব্দ। এই শব্দের কারণ আর কিছুই না—আমরা যতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাস খেলেছি তারই ফাঁকে কীভাবে কোত্থেকে জানি একটা গাঢ় লাল মখমলে মোড়া হাই-ব্যাক্ড চেয়ার এসে ফায়ার প্লেসের পাশে তার জায়গা করে নিয়েছে।

অমাবস্যার রাতের অন্ধকারের মতো কালো বেড়ালটা চেয়ারটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। তারপর এক মুহূর্ত সেটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা নিঃশব্দ লাফে সেটার ওপর উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। কোনও এক অশরীরী বৃদ্ধের খিলখিলে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বারবার উচ্চারিত হচ্ছে—"সাইমন সাইমন সাইমন সাইমন"—আর তার সঙ্গে ছেলেমানুষি খুশি হওয়া হাততালি।

একটা আর্তনাদ শুনে বুঝলাম অনীক অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর মিস্টার ব্যানার্জি? তিনি অনীককে কোলপাঁজা করে তুলে উর্ধ্বশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে দরজার দিকে ছুটছেন।

আমিও আর থাকতে পারলাম না। তাস মোমবাতি ফ্লাস্ক চাদর স্যান্ডউইচ সব পড়ে রইল। দরজা পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে গেট, গেট পেরিয়ে ব্যানার্জির মরিস মাইনর।

ভাগ্যে ব্যাঙ্গালোরের রাস্তায় লোক চলাচল কম, নইলে আজ একটিমাত্র পাগলা গাড়ির পাগলা ছুটে ক'টা লোক যে জখম হতে পারত তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

অনীকের জ্ঞান গাড়িতেই ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার মুখে কোনও কথা নেই। প্রথম কথা বললেন মিস্টার ব্যানার্জি। অনীকের বেয়ারার হাত থেকে ব্র্যান্ডির গেলাসটা ছিনিয়ে নিয়ে এক ঢোকে অর্ধেকটা নামিয়ে দিয়ে ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'সো সাইমন ওয়াজ এ ক্যাট!'

আমার নিজেরও কিছুই বলার অবস্থা নেই, কিন্তু আমার মন তাঁর কথায় সায় দিল।

সত্যিই, ব্রাউন সাহেবের বুদ্ধিমান, খামখেয়ালি, অভিমানী, অনুগত, আদরের সাইমন—যার মৃত্যু হয় বজ্রাঘাতে আজ থেকে একশো তেরো বছর আগে—সেই সাইমন ছিল আমাদের আজকের দেখা একটি পোষা কালো বেড়াল!

সন্দেশ, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৮

প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্

আমার ঘটনাটা কেউ বিশ্বাস করবে বলে বিশ্বাস হয় না। না করুক—তাতে কিছু এসে যায় না। নিজে চোখে না দেখা অবধি অনেকেই অনেক কিছু বিশ্বাস করে না। যেমন ভূত। আমি অবিশ্যি ভূতের কথা লিখতে বসিনি। সত্যি বলতে কি, এটাকে যে কীসের ঘটনা বলা চলে সেটা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে, আর আমার জীবনেই ঘটেছে। তাই আমার কাছে সেটা সত্যি, আর তাই সেটার বিষয় লেখা আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক।

আগেই বলে রাখি, যাঁকে নিয়ে এই ঘটনা তাঁর আসল নামটা আমি জানি না। তিনি বললেন তাঁর কোনও নামই নেই। শুধু তাই না, নাম নিয়ে একটা ছোটখাটো লেকচারই দিয়ে ফেললেন আমাকে। বললেন—

'নাম দিয়ে কী হবে মশাই? নাম একটা ছিল এককালে। সেটার আর প্রয়োজন নেই বলে বাদ দিয়ে দিয়েছি। আপনি এলেন, আলাপ করলেন, নিজের নামটা বললেন, তাই নামের প্রশ্নটা উঠছে। এমনিতে কেউ তো আসে না, আর তার মানে কারুর আমাকে নাম ধরে ডাকার প্রয়োজনও হয় না। চেনাশোনা কেউ নেই, কাউকে চিঠিপত্র লিখি না, কাগজে লেখা ছাপাই না, ব্যাঙ্কে চেক সই করি না—কাজেই নামের প্রশ্নটাই আসে না। একটা চাকর আছে, সেটাও বোবা। বোবা না হলেও সে নাম ধরে ডাকত না; বলত বাবু। ব্যস্ ফুরিয়ে গেল। এখন কথা উঠতে পারে আপনি কী বলে ডাকবেন। এটা নিয়েই ভাবছেন তো?...'

শেষটায় অবিশ্যি তাঁকে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্ বলে ডাকাই ঠিক হল। কেন, সেটা পরে সময়মতো বলছি। আগে একটু গোড়ার কথা বলে নেওয়া দরকার।

ঘটনাটা ঘটে গোপালপুরে। উড়িষ্যার গঞ্জম ডিস্ট্রিক্টে বহরমপুর স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট শহর গোপালপুর। গত তিন বছর আপিসের কাজের চাপে ছুটি নেওয়া হয়নি। এবার তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এই না-দেখা অথচ নাম-শোনা জায়গাটাতেই যাওয়া স্থির করলাম। আপিসের কাজের বাইরে আমার আরেকটা কাজ আছে, সেটা হল অনুবাদের কাজ। আজ পর্যন্ত আমার করা সাতখানা ইংরিজি রহস্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ বাজারে বেরিয়েছে। প্রকাশক

বলেন বইগুলোর কাটতি ভাল। কতকটা তাঁরই চাপে নিতে হয়েছে ছুটিটা। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে একটা গোটা বই অনুবাদ করার দায়িত্ব আমার স্কন্ধে রয়েছে।

গোপালপুরে আগে কখনও আসিনি। বাছাইটা যে ভালই হয়েছে সেটা প্রথম দিন এসেই বুঝেছি। এমন নিরিবিলি অথচ মনোরম জায়গা কমই দেখেছি। নিরিবিলি আরও এইজন্য যে, এটা হল অফ্ সীজ্ন—এপ্রিল মাস। হাওয়া-বদলের দল এখনও এসে পৌঁছয়নি। যে হোটেলে এসে উঠেছি, তাতে আমি ছাড়া আছেন আর একটিমাত্র প্রাণী—এক বৃদ্ধ আর্মেনিয়ান—নাম মিস্টার অ্যারাটুন। তিনি থাকেন হোটেলের পশ্চিম প্রান্তের ঘরে, আর আমি থাকি পূর্ব প্রান্তে। হোটেলের লম্বা বারান্দায় ঠিক নীচ থেকেই শুরু হয়েছে বালি; একশো গজের মধ্যেই সমুদ্রের ঢেউ এসে সেই বালির উপর আছড়ে পড়ছে। লাল কাঁকড়াগুলো মাঝে মাঝে বারান্দায় উঠে এসে ঘোরাফেরা করে। আমি ডেক-চেয়ারে বসে দৃশ্য উপভোগ করি আর লেখার কাজ করি। সন্ধ্যায় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য কাজ বন্ধ রেখে বালির ওপর হাঁটতে বেরোই।

প্রথম দু'দিন সমুদ্রের তীর ধরে পশ্চিম দিকটায় গেছি; তৃতীয় দিন মনে হল একবার পুব দিকটাতেও যাওয়া দরকার; বালির ওপর আদ্যিকালের নোনাধরা পোড়া বাড়িগুলো ভারী অদ্ভুত লাগে। মিস্টার অ্যারাটুন বলছিলেন এগুলো নাকি প্রায় তিন-চারশো বছরের পুরনো। এককালে গোপালপুর নাকি ওলন্দাজদের একটা ঘাঁটি ছিল। এসব বাড়ির বেশিরভাগই নাকি সেই সময়কার। দেয়ালের ইটগুলো চ্যাপটা আর ছোট ছোট, দরজা জানলার বাকি রয়েছে শুধু ফাঁকগুলো, আর ছাত বলতেও ছাউনির চেয়ে ফাঁকটাই বেশি। একটা বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখেছি, ভারী থমথমে মনে হয়।

পুব দিকে কিছুদূর গিয়ে দেখলাম এক জায়গায় বালির অংশটা অনেকখানি চওড়া হয়ে গেছে, আর তার ফলে শহরটাও সমুদ্র থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছে। প্রায় সমস্ত জায়গাটা জুড়ে কাত করে শোয়ানো রয়েছে অন্তত শ'খানেক নৌকো। বুঝলাম এইগুলোতেই নুলিয়ারা সকালে সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোয়। নুলিয়াগুলোকেও দেখলাম এখানে ওখানে বসে জটলা করছে, কিছু বাচ্চা নুলিয়া জলের কাছটাতে গিয়ে কাঁকড়া ধরছে, খানচারেক শুয়োর এদিকে ওদিকে ঘোঁতঘোঁত করে বেড়াচ্ছে।

এরই মধ্যে আবার দেখলাম একটা উপুড় করা নৌকোর ওপর বসে আছেন দুটি প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক। একজনের চোখে চশমা, তিনি হাতে একটি বাংলা খবরের কাগজ হাওয়ার মধ্যে ভাঁজ করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। আরেকজন বুকের কাছে হাত দুটোকে জড়ো করে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বিড়ি খাচ্ছেন। আমি একটু কাছে যেতে কাগজওয়ালা ভদ্রলোকটি সেধে আলাপ করার ভঙ্গিতে বললেন—

'নতুন এলেন?'

'হ্যাঁ...এই...দু'দিন...'

'সাহেব হোটেলে উঠেছেন?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আপনারা এখানেই থাকেন?'

ভদ্রলোক এতক্ষণে কাগজটাকে সামলাতে পেরেছেন। বললেন, 'আমি থাকি। ছাব্বিশ বছর হল গোপালপুরে। নিউ বেঙ্গলিটা আমারই হোটেল। ঘনশ্যামবাবু অবিশ্যি আপনার মতো চেঞ্জে এসেছেন।'

আমি 'আচ্ছা' বলে আলাপ শেষ করে এগোতে যাব এমন সময় ভদ্রলোক আরেকটা প্রশ্ন করে বসলেন—

'ওদিকটায় যাচ্ছেন কোথায়?'

বললাম, 'এমনি...একটু বেড়াব আর কি।'

'কেন বলুন তো?'

আচ্ছা মুশকিল তো! বেড়াতে যাচ্ছি কেন সেটাও বলতে হবে?

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আলো কমে আসছে। আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা কালচে নীল মেঘের চাব্ড়া জমাট বাঁধছে। ঝড় হবে নাকি?

ভদ্রলোক বললেন, 'বছরখানেক আগে হলে কিছু বলার ছিল না। যেখানে মন চায় নির্ভয়ে ঘুরে আসতে পারতেন। গত সেপ্টেম্বরে পুবদিকে নুলিয়া বস্তি ছাড়িয়ে মাইলখানেক দূরে একটি প্রাণী এসে

আস্তানা গেড়েছেন। ওই পোড়োবাড়িগুলো দেখছেন, ওরই মতন একটি বাড়িতে। আমি অবিশ্যি নিজে দেখিনি সে বাড়ি। এখানকার পোস্টমাস্টার মহাপাত্র বলছিল দেখেছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সাধু-সন্ন্যাসী গোছের কেউ?'

'আদপেই না।'

'তবে?'

'তিনি যে কী, সেটা মশাই জানতে পারিনি। মহাপাত্র বললে, বাড়িটার ফাটাফুটো নাকি সব তেরপল দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। ভেতরে কী হয় কেউ জানে না। তবে ছাতের একটা ফুটো দিয়ে বেগ্‌নে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেছে। বাড়িটা না দেখলেও লোকটাকে আমি নিজে দেখেছি দু'বার। আমি ঠিক এইখেনটেতেই বসে, আর ও হেঁটে যাচ্ছিল আমার ঠিক সামনে দিয়েই। পরনে হলদে রঙের কোট প্যান্টুলুন। গোঁফদাড়ি নেই, মাথায় গুচ্ছের ঝাঁকড়া চুল। হাঁটবার সময় কী জানি বিড়বিড় করছিল আপনমনে। এমনকী একবার যেন গলা ছেড়ে হাসতেও শুনলুম। কথা বললুম, কথার জবাব দিলে না। হয় অভদ্র, নয় পাগল। বোধহয় দুটোই। ওঁর আবার একটি চাকরও আছে। তাকে অবিশ্যি সকালের দিকটায় বাজারে দেখা যায়। এমন ষণ্ডামার্কা লোক দেখিনি মশাই। মাথায় কদমছাঁট চুল। ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা। কতকটা ওই শুয়োরের মতোই। লোকটা হয় বোবা, নয় মুখ বন্ধ করে থাকে। জিনিস কেনার সময়ও মুখ খোলে না। দোকানদারকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়। মনিব যেমন লোকই হোন না কেন, অমন চাকর যে বাড়িতে আছে, তার কাছাকাছি না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?'

ঘনশ্যাম ভদ্রলোকটিও ইতিমধ্যে উঠে পড়েছেন। বিড়িটাকে বালির ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'চলুন মশাই।' দুই ভদ্রলোক তাঁদের হোটেলের দিকে রওনা দেবার আগে ম্যানেজারবাবুটি জানিয়ে গেলেন যে তাঁর নাম রাধাবিনোদ চাটুজ্যে, এবং আমি একবার তাঁর হোটেলে পায়ের ধুলো দিলে তিনি খুবই খুশি হবেন।

রহস্য গল্প অনুবাদ করে করে রহস্য সম্পর্কে যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আমার মনে গড়ে উঠেছে সেটা তো আর নিউ বেঙ্গলি হোটেলের ম্যানেজারবাবু জানেন না! আমি বাড়ি ফেরার কথা একবারও চিন্তা না করে পুবদিকেই আরও এগোতে লাগলাম।

এখন ভাটার সময়। সমুদ্রের জল পিছিয়ে গেছে। ঢেউও অল্প। পাড়ের যেখানে এসে ঢেউ ফেনা কাটছে, তার কাছেই কয়েকটা কাক লাফালাফি করছে, ফেনাগুলো সরসর করে এগিয়ে এসে পিছিয়ে যাচ্ছে, আর তারপরেই ফেনার বুড়বুড়িতে ঠোকর দিয়ে কাকগুলো কী যেন খাচ্ছে। নুলিয়া গ্রাম ছাড়িয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর দূর থেকে ভিজে বালির ওপর একটা চলন্ত লাল চাদর দেখে প্রথমটা বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম; কাছে গিয়ে বুঝলাম সেটা একটা কাঁকড়ার পাল, জল সরে যাওয়াতে দলে-দলে তাদের বাসায় ফিরে যাচ্ছে।

আর পাঁচ মিনিট পথ যেতেই বাড়িটাকে দেখতে পেলাম। তেরপলের তাপ্পির কথা আগেই শুনেছিলাম, তাই চিনতে অসুবিধা হল না। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি শুধু তেরপল নয়, বাঁশ, কাঠের তক্তা, মরচে ধরা করুগেটেড টিন, এমনকী পেস্ট বোর্ডের টুকরো পর্যন্ত বাড়ি মেরামতের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখে মনে হল, এক যদি ছাত ভেদ করে বৃষ্টির জল না পড়ে, তা হলে এ বাড়িতে একজন লোকের পক্ষে থাকা এমন কিচ্ছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই লোকটি কোথায়?

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে মনে হল, সে যদি সত্যি ছিটগ্রস্ত হয়, আর তার যদি সত্যিই একটা ষণ্ডামার্কা চাকর থেকে থাকে, তা হলে আমি যেভাবে উগ্র কৌতূহল নিয়ে বাড়িটার দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছি, সেটা বোধহয় খুব বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না। তার চেয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করলে কেমন হয়? এতদূর এসে লোকটাকে একবার অন্তত চোখের দেখা না দেখেই ফিরে যাব?

এইসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ খেয়াল হল যে, বাড়ির সামনের দরজার ফাঁকটার পিছনে অন্ধকারের মধ্যে কী যেন একটা নড়ে উঠল। আর তারপরেই একটি ছোট্টখাট্টো বেঁটে লোক বাইরে বেরিয়ে এল। বুঝতে বাকি রইল না যে, ইনিই বাড়ির মালিক, আর ইনি বেশ কিছুক্ষণ থেকেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

'আপনার হাতে যে ছ'টা আঙুল দেখছি!—হেঃ হেঃ!' হঠাৎ মিহি গলায় কথা এল।

কথাটা ঠিকই। আমার হাতে বুড়ো আঙুলের পাশে জন্ম থেকেই একটা বাড়তি আঙুল রয়েছে, যেটা কোনও কাজ করে না। কিন্তু ভদ্রলোক অতদূর থেকে সেটা বুঝলেন কী করে?

এবার আরও কাছে এলে পর বুঝলাম তাঁর হাতে রয়েছে একটা আদ্যিকালের একচোখা দূরবিন, আর সেইটে দিয়েই নির্ঘাত এতক্ষণ তিনি আমাকে স্টাডি করছিলেন।

'অন্যটা নিশ্চয়ই বুড়ি আঙুল? তাই নয় কী? হেঃ হেঃ!'

ভদ্রলোকের গলার স্বর অত্যন্ত মিহি। এত বয়সের লোকের এমন গলা আমি কখনও শুনিনি।

'আসুন না—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?'

কথাটা শুনে আমি রীতিমতো অবাক হলাম। রাধাবিনোদবাবুর কথায় আমার লোকটা সম্পর্কে একেবারে অন্যরকম ধারণা হয়েছিল; এখন দেখছি দিব্যি খোশমেজাজি ভদ্র ব্যবহার।

আমার চেয়ে এখনও হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক। সন্ধ্যার আলোতে তাঁকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না, অথচ দেখার ইচ্ছেটাও প্রবল, তাই তাঁর অনুরোধে আপত্তি করলাম না।

'একটু সাবধানে, আপনি লম্বা মানুষ, আমার দরজাটা আবার...'

হেঁট হয়ে মাথা বাঁচিয়ে ভদ্রলোকের আস্তানায় প্রবেশ করা গেল। একটা পুরনো মেটে গন্ধর সঙ্গে সমুদ্রের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, আর আরেকটা কী জানি অচেনা গন্ধ মিশে এই পাঁচমেশালি জোড়াতালি বাড়ির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে।

'বাঁদিকে আসুন। ডানদিকটা আমার—হেঃ হেঃ—কাজের ঘর।'

ডানদিকের দরজার ফাঁকটা দেখলাম একটা বড় কাঠের তক্তা দিয়ে বেশ পোক্তভাবেই বন্ধ করা রয়েছে। আমরা বাঁদিকের ঘরে ঢুকলাম। এটাকে বোধহয় বৈঠকখানা বলা চলে। এক কোণে একটা কাঠের টেবিলের ওপর কিছু মোটা মোটা খাতাপত্র, গোটাতিনেক কলম, একটা দোয়াত, একটা আঠার শিশি, একটা বড় কাঁচি। টেবিলের সামনে একটা মরচে ধরা টিনের চেয়ার, একপাশে একটা বড় উপুড় করা প্যাকিং কেস, আর ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট চেয়ার। এই শেষের আসবাবটি থাকা উচিত ছিল কোনও রাজবাড়ির বৈঠকখানায়। জাঁদরেল কাঠের ওপর জাঁদরেল কারুকার্য, বসবার জায়গায় গাঢ় লাল মখমলের ওপর ফুলকারি।

'আপনি ওই বাক্সটায় বসুন, আমি চেয়ারে বসছি।'

এই প্রথম একটা খটকা লাগল। লোকটা বদ্ধ পাগল না হলেও, একটু বেয়াড়া রকমের খামখেয়ালি তো বটেই। তা না হলে একজন বাইরের লোককে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে প্যাকিং বাক্সে বসতে দিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে?

অথচ জানলায় তেরপলের ফাঁক দিয়ে আসা সন্ধ্যার আলোতে তো তাঁর চোখে কোনও পাগলামির লক্ষণ দেখছি না। বরং বেশ একটা ছেলেমানুষি হাসিখুশি ভাব। আর সেই কারণেই লোকটার বেয়াড়া অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর ওপর কোনও বিরক্তির ভাব এল না। আমি প্যাকিং কেসটার ওপরে বসলাম।

'তারপর বলুন,' ভদ্রলোক বললেন।

কী বলব? আসলে তো কিছুই বলতে আসিনি, শুধু দেখতেই এসেছিলাম, তাই ফস করে বলুন বললে বেশ মুশকিলেই পড়তে হয়। শেষটায় আর কিছু ভেবে না পেয়ে নিজের পরিচয়টাই দিয়ে ফেললাম—

'আমি এসেছি ছুটিতে, কলকাতা থেকে। আমি, মানে, একজন লেখক। আমার নাম হিমাংশু চৌধুরী। এদিকে এসেছিলাম বেড়াতে, আপনার বাড়িটা চোখে পড়ল...'

'বেশ বেশ। পরিচয়টা পেয়ে খুশি হলাম। তবে আমার কিন্তু নাম-টাম নেই।'

আবার খটকা। নাম নেই মানে? নাম তো একটা সকলেরই থাকে; এঁর বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

কথাটা তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক নামের উপর লেকচারটা দিয়ে দিলেন। সেটা শেষ হবার পর আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, 'আমার কথাগুলো বোধহয় আপনার মনঃপূত হল না। একটা কথা তা হলে বলি আপনাকে—আমি নিজে কিন্তু মনে মনে আমার

একটা নাম ঠিক করে রেখেছি। অবিশ্যি এ নামটা কাউকে বলিনি, কিন্তু আপনার কিনা ছ'টা আঙুল, তাই আপনাকে বলতে আপত্তি নেই।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইলাম। ঘরে আলো ক্রমশ কমে আসছে। চাকরটাকে দেখছি না কেন? অন্তত একটা মোমবাতি বা কেরোসিনের আলো তো এই সময় ঘরে এনে রাখা উচিত।

ভদ্রলোক এবার হঠাৎ তাঁর মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার কানটা লক্ষ করেছেন কি?'

এতক্ষণ করিনি, কিন্তু এবার চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

মানুষের এরকম কান আমি কখনও দেখিনি। উপর দিকটা গোল না হয়ে ছুঁচোলো ঠিক যেমন শেয়াল কুকুরের হয়। এরকম হল কী করে?

কান দেখিয়ে আমার দিকে ফিরে ভদ্রলোক হঠাৎ আরেকটা তাজ্জব ব্যাপার করে বসলেন। তাঁর নিজের মাথার চুলটা ধরে দিলেন এক টান, আর তার ফলে সেটা হাতে খুলে এল। অবাক হয়ে দেখি—এক ব্রহ্মতালুর কাছে আর কানের পাশটাতে ছাড়া সারা মাথার কোথাও একগাছি চুল নেই। এই নতুন চেহারা, আর তার সঙ্গে মিটিমিটি চাহনিতে দুষ্টু হাসির ভাব দেখে আমার মুখ থেকে আপনা থেকেই একটা নাম বেরিয়ে পড়ল—হিজিবিজ্‌বিজ্‌!'

'এক্‌জ্যাক্টলি!' ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে খিল্‌খিল করে হেসে উঠলেন। 'আপনি ইচ্ছে করলে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন।'

বললাম, 'দরকার নেই। হিজিবিজ্‌বিজের চেহারা ছেলেবেলা থেকেই মনে গেঁথে আছে।'

'বেশ, বেশ, বেশ! আপনি চান তো স্বচ্ছন্দে এ নামটা ব্যবহার করতে পারেন। এমনকী নামটার আগে একটা প্রোফেসর জুড়ে দিলে আরও ভাল হয়। অবিশ্যি এটা কাউকে বলবেন না। যদি বলেন তা হলে কিন্তু—হেঃ হেঃ হেঃ...'

এই প্রথম যেন আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগল। লোকটা নিঃসন্দেহে পাগল। কিংবা বেয়াড়া রকমের ছিটগ্রস্ত। এ ধরনের লোককে বরদাস্ত করা ভারী কঠিন। সবসময়ই কী বলবে কী করবে ভেবে তটস্থ হয়ে থাকতে হয়।

দু'জনের একসঙ্গে চুপ করে থাকাটাও ভাল লাগছিল না; তাই বললাম, 'আপনার কানের ছুঁচোলো অংশটার রঙ একটু অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে?'

'তা তো হবেই', ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা তো আর আমার নিজের নয়। জন্মের সময় তো আর আমার এরকম কান ছিল না।'

'তা হলে কি ওটা আপনার চুলের মতোই নকল? টানলে খুলে আসবে নাকি?'

ভদ্রলোক আবার সেই খিল্‌খিলে হাসি হেসে বললেন, 'মোটেই না, মোটেই না, মোটেই না!'

ন্যাঃ। লোকটা নির্ঘাত পাগল। বললাম, 'তা হলে ওটা কী?'

'দাঁড়ান। আগে আমার চাকরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। একেও হয়তো আপনি চিনতে পারবেন।'

এতক্ষণ লক্ষ করিনি; কোন ফাঁকে জানি আরেকটি লোক পিছনের দরজা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা কেরোসিনের বাতি। এই সেই চাকর, যার কথা রাধাবিনোদবাবু বলেছিলেন।

ভদ্রলোক হাতছানি দিয়ে ডাকলে পর সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর কেরোসিনের বাতিটা রাখল। সত্যিই, এরকম ষণ্ডামার্কা লোক এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লোকটার গায়ে একটা ডোরাকাটা ফতুয়া আর একটা খাটো করে পরা ধুতি। পায়ের গুলি, হাতের মাস্‌ল, কবজির বেড়, বুকের ছাতি, গর্দানের বহর দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। অথচ লম্বায় লোকটা পাঁচ ফুট দু-তিন ইঞ্চির বেশি নয়।

'কারুর কথা মনে পড়ছে কি আমার চাকরকে দেখে?' জিজ্ঞেস করলেন হিজিবিজ্‌বিজ্‌।

লোকটা বাতি নামিয়ে রেখে তার মনিবের দিকে ফিরে আদেশের অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মিনিটখানেক তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মিলটা মনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে বললাম, 'আরে, এ যে ষষ্ঠিচরণ!'

'ঠিক ধরেছেন, ঠিক ধরেছেন!' ভদ্রলোক খুশিতে বসে-বসেই নেচে উঠলেন।

'খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ হাতি লোফেন যখন তখন
দেহের ওজন উনিশটি মন, শক্ত যেন লোহার গঠন...'

অবিশ্যি ওর ওজন ঠিক উনিশ মন নয়, সাড়ে তিনের একটু বেশি। অন্তত সিক্সটি সেভেনে তাই ছিল। আর হাতি লোফাটার কথা জানি না, কিন্তু এখানে এসে অবধি ও প্রতিদিন সকালে দুটো আস্ত ধেড়ে শুয়োর নিয়ে লোফালুফি করে, এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এই যে আমার চেয়ারটা, এটা তো ও এক হাতে তুলে নিয়ে এসেছে।'

'কোত্থেকে?'

'হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—সেটা আর নাই শুনলেন। যাও তো ষষ্ঠি—দুটো ডাব নিয়ে এসো তো আমাদের জন্য।'

ষষ্ঠি আজ্ঞা পালন করতে চলে গেল।

বাইরে মেঘের গর্জন। একটা দমকা হাওয়ায় তেরপলগুলো পটপট শব্দে নড়ে উঠল। এইবারে না উঠলে দুর্যোগে পড়তে হতে পারে।

'আমার কানটার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?' ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা আসলে একটা বনবেড়ালের কান আর আমার ওরিজিন্যাল কান মিশিয়ে তৈরি।'

কথাটা শুনে হাসিই পেয়ে গেল। বললাম, 'মেশালেন কী করে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কেন—একটা মানুষের হৃৎপিণ্ড আরেকটা মানুষের শরীরে বসিয়ে দিচ্ছে, আর একটা জানোয়ারের আধখানা মাত্র কান একটা মানুষের কানের ওপর বসিয়ে দেওয়া যাবে না?'

'আপনি কি আগে ডাক্তারি করতেন? প্লাস্টিক সার্জারি জাতীয় কিছু?'

'তা তো বটেই। করতাম কেন—এখনও করি, হেঃ হেঃ। তবে সে যেমন তেমন প্লাস্টিক সার্জারি

নয়। এই যেমন ধরুন—আপনার ওই যে বাড়তি বুড়ো আঙুলটা—ওটা যদি আপনার না থাকত, তা হলে প্রয়োজনে ওটা লাগিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে হত জলের মতো সোজা।'

লোকটাকে অনেক চেষ্টা করলাম বড় ডাক্তার হিসেবে কল্পনা করতে, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। অথচ কানটার দিকে চোখ গেলে সত্যিই ভারী অদ্ভুত লাগছিল। কী বেমালুমভাবে জোড়া লাগিয়েছে! বোঝার কোনও উপায় নেই।

ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারি আর বিজ্ঞানের বই ছাড়া জীবনে কেবলমাত্র দুটি বই পড়েছি আমি—আবোল-তাবোল আর হ-য-ব-র-ল। আর দুটোর মধ্যেই যে ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে মনে ধরেছে সেটা হচ্ছে ওই প্রাণীগুলো—যাদের বলা হয় আজগুবি কিম্ভূত। এই যে সাধারণের বাইরে কিছু হলে বা করলে বা বললেই লোকে পাগলামি আর আজগুবি বলে উড়িয়ে দেয়, এটার কোনও মানেই হয় না। আমি ছেলেবেলা মোমবাতি চুষে খেতাম জানেন। দিব্যি লাগে খেতে। আর মাছি যে কত খেয়েছি ধরে ধরে তার কোনও গোনাগুনতি নেই।'

ষষ্ঠিচরণ ডাব নিয়ে এসেছে, তাই ভদ্রলোককে একটু থামতে হল। দুটো কলাইকরা গেলাস টেবিলের উপর রেখে তার উপর একটার পর একটা ডাব ধরে দু' হাতের তেলো দিয়ে চাপ দিতেই সেগুলো মট মট করে ভেঙে ভিতরের জল পড়ল গিয়ে ঠিক গেলাসের ভিতর। ষষ্ঠিচরণ আমাদের হাতে গেলাস ধরিয়ে দিল।

ডাবের জলে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারি পড়ে প্লাস্টিক সার্জারিতে স্পেশালাইজ করলাম কেন বলুন তো?'

'কেন?' আমার কৌতূহল বাড়ছিল। সেটা আর কিছুই না—ভদ্রলোকের কল্পনার দৌড় কদ্দূর সেটা জানবার জন্য।

হিজিবিজ্‌বিজ্ বললেন, 'কারণ, শুধু ছবি দেখে মন ভরত না। খালি ভাবতাম এমন জানোয়ার যদি সত্যি করে থাকত! কোথাও যে আছেই ওসব প্রাণী, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি তাদের চাইছিলাম আমার ঘরের মধ্যে, আমার হাতের কাছে, আমার চোখের সামনে—বুঝেছেন?'

আমি বললাম, 'না মশাই, বুঝিনি। কোন সব প্রাণীর কথা বলছেন আপনি?'

'এই ধরুন—বকচ্ছপ কি গিরগিটিয়া, কি হাঁসজারু।'

বললাম, 'বুঝেছি। তারপর?'

'তারপর আর কী! শুরু করলাম গিরগিটিয়া দিয়ে। দুটোই হাতের কাছে ছিল। টিয়ার মুড়ো আর গিরগিটির ল্যাজ। ঠিক যেমন বইয়ে আছে। প্রথম বাজিতেই কিস্তিমাত। বেমালুম জোড়া লেগে গেল। কিন্তু জানেন—'

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'বেশিদিন বাঁচল না। খেতেই চায় না কিচ্ছু! না খেলে বাঁচবে কী করে? আসলে যা লেখা আছে সেটাই ঠিক—শরীরে শরীরে মিলে গেলেও মনের সন্ধিটা হতে চায় না। তাই এখন ধড়ে-মুড়ো সন্ধিটা ছেড়ে অন্য এক্সপেরিমেন্ট ধরেছি।'

ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ভাগ্যে ডাব খেতে দিয়েছে! চা বিস্কুট হলে সাহস করে মুখে পোরা যেত না। ষষ্ঠিচরণ কোথায় গেল কে জানে! একটা খুটখাট শব্দ পাচ্ছি। যেদিক থেকে আসছে, তাতে মনে হয় হয়তো ভদ্রলোক যেটাকে তাঁর কাজের ঘর বললেন, তার দরজাটা খোলা হচ্ছে।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মেঘের গুড়গুড়ুনিটাও ভাল লাগছে না। আর বসা যায় না। ফিরে গিয়ে কাজে বসতে হবে। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম।

'চললেন? কিন্তু আপনার কাছে যে একটা জিজ্ঞাসা ছিল।'

'বলুন—'

'ব্যাপার কী জানেন—সবই জোগাড় হয়েছে—শজারুর কাঁটা, রামছাগলের শিং, সিংহের পিছনের দুটো পা, ভাল্লুকের লোম, সবকিছুই। কিন্তু খানিকটা অংশ যে আবার মানুষের—আর সেখানে তো ছবির সঙ্গে মিল থাকা উচিত, তাই নয় কি? সেরকম মানুষ আপনার চোখে কেউ পড়েছে কিনা জানতে

পারলে সুবিধে হত।'

এই বলে ভদ্রলোক তাঁর টেবিলের উপর রাখা খাতাপত্রের নীচ থেকে একটা আদ্যিকালের আবোল-তাবোল বার করে সেটার একটা পাতা খুলে আমার চোখের সামনে ধরলেন। চেনা ছবি অবশ্যই। হাতে মুগুর নিয়ে একটা অদ্ভুত প্রাণী একটি পলায়নরত গোবেচারা মানুষের দিকে কটমট করে চেয়ে আছে—

ভয় পেয়ো না ভয় পেয়ো না—তোমায় আমি মারব না,
সত্যি বলছি তোমার সঙ্গে কুস্তি করে পারব না...

'কেমন চমৎকার হবে বলুন তো এমন একটি প্রাণী তৈরি করতে পারলে! কিছুই না—তোড়জোড় সব হয়েই আছে, তলার দিকের খানিকটা জোড়াও লেগে গেছে, এখন দরকার কেবল একটি এইরকম চেহারার মানুষ।'

আমি বললাম, 'অত গোল গোল চোখ কি মানুষের হয়?'

'আলবত!' ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। 'চোখ তো গোলই হয়! চোখের পাতা দিয়ে গোলের অনেকটা ঢাকা থাকে বলে অতটা গোল মনে হয় না।'

আমি দরজার দিকে রওনা দিলাম। একে পাগল, তায় নাছোড়বান্দা, তায় আবার কথার ঝুড়ি।

'ঠিক আছে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্, কাউকে নজরে পড়লে জানাব।'

'অতি অবশ্যই জানাবেন। বড্ড উপকার হবে। আমি অবিশ্যি নিজেও খুঁজছি। আপনি কোথায় উঠেছেন সেটা বললেন না তো?'

শেষের প্রশ্নটা না শোনার ভান করে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। আর বেরিয়েই দৌড়। ভিজতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে যে বালি ওড়ে সেটা নাকে চোখে ঢুকে বড় বিশ্রি অসুবিধার সৃষ্টি করে।

কোনওরকমে হাত দুটো মুখের সামনে ধরে চোখটাকে বাঁচিয়ে হোটেলে যখন ফিরেছি তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে দেখি বাতি জ্বলছে না। বারান্দায় বেরিয়ে হাঁক দিয়ে বেয়ারাকে ডাকতে যাব, কিন্তু সেটার আর প্রয়োজন হল না। বেয়ারা মোমবাতি নিয়ে আমার ঘরের দিকেই আসছে। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে বলল, বেশি ঝড় বৃষ্টি হলে বাতি নিভে যাওয়াটা নাকি গোপালপুরে একটা সাধারণ ঘটনা।

আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে খাটে বসে টিমটিমে আলোকে লেখার কাজ শুরু করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটছে। মনটা বারবার চলে যাচ্ছে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজের দিকে। তিনশো বছরের পুরনো ঝুরঝুরে বাড়িতে জোড়াতালি দিয়ে (এখানেও সেই আবোল-তাবোলের থুড়থুড়ে বুড়িটার কথাই মনে পড়ে!) কীভাবে রয়েছে লোকটা। বদ্ধ পাগল না হলে কি কেউ এরকম করে? আর ষষ্ঠিচরণ? কোত্থেকে এমন এক ষাঁড়ের মতো চাকর জোগাড় করলেন তিনি? আর সত্যিই কি তিনি এই পুবদিকের বন্ধ ঘরটায় একটা অদ্ভুত কিছু করছেন? লোকটার কথার কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে? পুরোটাকেই অবশ্য পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু গোলমাল করছে ওর ওই কান দুটো। ওগুলো যে শুধু বেমালুম জোড়া হয়েছে তা নয়; আসবার সময় কেরোসিনের আলোতে লক্ষ করেছি একটা কানের ছুঁচলো অংশটাতে আবার একটা ফোস্‌কা পড়েছে। তার মানে সে কান শরীরেরই অংশ, আর শরীরের অন্য সব জায়গার মতো সেখানেও শিরা আছে, স্নায়ু আছে, রক্ত চলাচল আছে, সবই আছে।

সত্যি, যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে যে, ওই কানটা না থাকলে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

পরদিন সকালে সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে দেখি রাতারাতি মেঘ কেটে গেছে। চা খেতে বসে হিজিবিজ্‌বিজের কথা মনে হতে হাসি পেল। ব্যাপারটা আর কিছুই না—আবছা অন্ধকারে কেরোসিনের আলোয় অর্ধেক দেখেছি, অর্ধেক কল্পনা করেছি। হোটেলে ফিরে এসেও পেয়েছি সেই একই অন্ধকার, তাই মন থেকে খটকার ভাবটা কাটবার সুযোগ পায়নি। আজ বালির উপর সকালের রোদ আর শান্ত

সমুদ্রের চেহারা দেখে মনে হল লোকটা খ্যাপা ছাড়া আর কিছুই না।

পায়ের তলায় গোড়ালির কাছে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছিলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম একটা জায়গায় ছোট্ট একটা কাটার দাগ। বুঝলাম কাল অন্ধকারে বালির উপর দিয়ে দৌড়ে আসার সময় ঝিনুক জাতীয় কিছুর আঁচড় লেগেছে। সঙ্গে ডেটল আয়োডিন কিছুই আনিনি, তাই ন'টা নাগাদ একবার বাজারের দিকে গেলাম।

বাজারে যাবার রাস্তাটা নিউ বেঙ্গলি হোটেলের সামনে দিয়ে গেছে। হোটেলের সামনেই বারান্দায় কালকের ঘনশ্যামবাবুকে দেখলাম একজন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একটা প্রবাল নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখছেন। আমার পায়ের আওয়াজ শুনে ভদ্রলোক মুখ তুললেন, আর তুলতেই আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করে উঠল।

এ যে সেই আবোল-তাবোলের মুখ—যে মুখের খোঁজ করছেন ওই উন্মাদ প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ!

কোনও সন্দেহ নেই: সেই থ্যাবড়া নাকের নীচে দু'পাশে ছিটকে থাকা লম্বা পাকা গোঁফ, লম্বা গলার দু'পাশে ঠিক ছবির মতো করে বেরিয়ে থাকা শিরা, এমনকী চ্যাপটা থুতনির নীচে কয়েক গোছা মাত্র চুলের ছাগলা দাড়িটা পর্যন্ত। আসলে কাল কেন জানি লোকটার হাবভাব পছন্দ হয়নি বলে ওর মুখের দিকে ভাল করে তাকাইনি। আজকে চোখাচুখিটা হল বটে, আর আমি একটা নমস্কারও করলাম, কিন্তু ভদ্রলোক দেখলাম সেটা গ্রাহ্যই করলেন না। ভারী অভদ্র।

কিন্তু তাও লোকটার জন্য দুশ্চিন্তা হল। ওই পাগলের খপ্পরে কখনওই পড়তে দেওয়া যায় না একে। হিজবিজ্‌বিজ্ বা তার চাকর যদি একে দেখে, তা হলে নির্ঘাত বগলদাবা করে নিয়ে যাবে ওই ঝুরঝুরে বাড়িতে। আর তারপর যে কী করবে সেটা মা গঙ্গাই জানেন।

ঠিক করলাম বাজার ফেরতা একবার রাধাবিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বলব। তাঁকে সাবধান করে দেব তাঁর হোটেলের একমাত্র অতিথিকে যেন তিনি একটু চোখে চোখে রাখেন।

কিন্তু ডেটল কিনতে কিনতেই আমার সঙ্কল্পটা যেন আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেল। রাধাবিনোদবাবুকে যেসব উদ্ভট কথা আমাকে বলতে হবে, সেগুলো কি তিনি বিশ্বাস করবেন? মনে তো হয় না। এমনকী সেসব শুনে শেষটায় হয়তো আমাকেই পাগল ঠাওরাবেন। তা ছাড়া আমি যে তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করে হিজিবিজ্‌বিজের বাড়ি গেছি, সেটাও নিশ্চয় তাঁর মনঃপূত হবে না।

ফেরার পথে আরেকবার ঘনশ্যামবাবুকে দেখে মনে হল—আমার চোখে যাকে ওই ছবির মতো মনে হচ্ছে, হিজিবিজ্‌বিজের চোখে সেটা নাও হতে পারে। সুতরাং যতটা ভয়ের কারণ আছে বলে ভাবছি, আসলে হয়তো ততটা নেই। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে এদের কিছু না বলা, আর প্রোফেসরকেও ঘনশ্যামবাবু সম্বন্ধে কিছু না বলা। এবার থেকে শুধু পশ্চিম দিকটায় বেড়াতে যাব, আর বাকি সময়টা হোটেলের ঘরে বসে লেখার কাজ করব।

হোটেলে ফিরতেই বেয়ারা বলল একটি ভদ্রলোক আমার খোঁজে এসেছিলেন। আমাকে না পেয়ে তিনি নাকি একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

অত্যন্ত খুদে খুদে প্রায় পিঁপড়ের মতো অক্ষরে লেখা চিঠিটা হচ্ছে এই—

প্রিয় ষড়াঙ্গুল মহাশয়,

আজ সন্ধ্যাবেলা অবশ্যই একবার আমার গৃহে আসিবেন। সিংহের পশ্চাৎভাগের সহিত শজারুর কাঁটা এবং ভাল্লুকের লোম নিখুঁতভাবে জোড়া লাগিয়াছে। মুদ্গরও একটি তৈয়ার হইয়াছে চমৎকার। শৃঙ্গ তিনটি মস্তকের অপেক্ষায় আছে। এখন শুধুমাত্র মস্তক ও হস্তদ্বয় সংগ্রহ হইলেই হয়। ষষ্ঠিচরণ জনৈক ব্যক্তির সন্ধান আনিয়াছে; মূল চিত্রের সহিত তাহার নাকি যথেষ্ট সাদৃশ্য। আশা করি আজই আমার পরীক্ষা সফল হইবে। অতএব সন্ধ্যায় একবার কিংকর্তব্যবিমূঢ়ে পদার্পণ করিলে যারপরনাই আহ্লাদিত হইব।

ইতি ভবদীয়
এইচ, বি. বি.

মনে পড়ল বাড়ির নাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাখার কথাটা হ-য-ব-র-ল-তে হিজিবিজ্‌বিজ্‌ই বলেছিল। চিঠিটা পড়ে মনে আবার দুশ্চিন্তা দেখা দিল, কারণ মন বলছে ষষ্ঠিচরণ হয়তো ঘনশ্যামবাবুকেই দেখেছে।

সারা দুপুর যতদূর সম্ভব মন দিয়ে লেখার কাজ করলাম। বিকেলের দিকে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে দেখতে দেখতে মনটা অনেকটা হালকা হয়ে এল। উত্তর-পশ্চিম থেকে হাওয়া এসে এগিয়ে আসা ঢেউগুলোর গায়ে লাগছে, আর তার ফলে ঢেউয়ের মাথার ফেনাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ লাগছে দেখতে।

ছ'টা নাগাদ হঠাৎ দেখি রাধাবিনোদবাবু কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব নিয়ে বালির উপর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আমাদের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—

'আমার সেই গেস্টটিকে কি এদিক দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছেন?'

'কে, ঘনশ্যামবাবু?'

'আরে হ্যাঁ মশাই। কাল যেখানে ছিলুম আমরা, সেখানেই ওয়েট করার কথা আমার জন্য। এখন এসে দেখছি নেই। কাছাকাছির মধ্যে একটা লোক নেই যাকে জিজ্ঞেস করি। এদিকে আমার হোটেলেও হাঙ্গামা—আমার সোনার ঘড়িটি চুরি গেছে—চাকরটাকে জেরা করতে দেরি হয়ে গেল। আপনার এদিক দিয়ে যায়নি বোধহয়?'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

'না, এদিক দিয়ে যায়নি', আমি বললাম, 'তবে একটা সন্দেহ হচ্ছে আমার। একটা জায়গায় গেলে হয়তো খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। আপনার হাতের লাঠিটা বেশ মজবুত তো?'

রাধাবিনোদবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'লাঠি? হ্যাঁ...তা...লাঠি তো আমার সেই ঠাকুরদার...কাজেই...'

আমার সঙ্গে আর কিছুই নেই—একটা করাত মাছের দাঁত কিনেছিলাম প্রথম দিন এসেই, সেইটে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। অন্য হাতে নিলাম আমার টর্চটা।

পুবদিকে যাচ্ছি দেখে রাধাবিনোদবাবু ধরা গলায় বললেন, 'নুলিয়া বস্তি ছাড়িয়ে যাবেন কি?'

'হ্যাঁ। তবে বেশিদূর নয়—মাইলখানেক।'

সারা রাস্তা রাধাবিনোদবাবু শুধু একটি কথাই বার তিনেক বললেন—'কিছুতেই বুঝতে পারছি না মশাই।'

প্রায় দেড় মাইল পথ এক প্রৌঢ়কে সঙ্গে নিয়ে বালির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে লেগে গেল ঘণ্টাখানেক। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়ির কাছ অবধি না যাওয়া পর্যন্ত তাতে কেউ আছে কিনা বোঝা অসম্ভব। বাড়িটার দিকে যতই এগোচ্ছি ততই দেখছি রাধাবিনোদবাবুর উৎসাহ কমে আসছে। শেষটায় দশ হাত দূরে পৌঁছে হঠাৎ একেবারে থেমে গিয়ে বললেন, 'আপনার মতলবটা কী বলুন তো?'

বললাম, 'এতদূরই যখন এলেন, তখন আর মাত্র দশটা হাত যেতে আপত্তি কীসের?'

অগত্যা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমার পিছন পিছন।

বাড়ির সামনে এসে টর্চ জ্বালতে হল, কারণ ভিতরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কালকের কেরোসিনের বাতি এতক্ষণে জ্বলে যাবার কথা, কিন্তু জ্বলেনি।

সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে টর্চের আলোতে প্রথমেই দেখলাম একটা লোক মাটিতে হুমড়ি দিয়ে পড়ে আছে। লোকটা মরেনি, কারণ তার বিশাল বুকটা নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ওঠানামা করছে।

'এ যে সেই চাকরটা!' ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠলেন রাধাবিনোদবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ষষ্ঠিচরণ।'

'আপনি নামটাও জানেন নাকি?'

এ-কথার উত্তর না দিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলাম। ঘর খালি। প্রোফেসরের কোনও চিহ্নই নেই। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম কাজের ঘরের দিকে।

দরজাটা অর্ধেক খোলাই ছিল। ষষ্ঠিচরণকে ডিঙিয়ে তবে ভিতরে ঢুকতে হল।

বৈঠকখানার মতোই ঘরের আয়তন। একদিকে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত সরঞ্জাম—শিশি বোতল

কাঁটাছুরি, ওষুধপত্র ইত্যাদি। একটা উগ্র গন্ধে ঘরটা ভরে রয়েছে। এ গন্ধ আমি চিনি। ছেলেবেলায় চিড়িয়াখানায় জন্তুর খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে এ গন্ধ পেয়েছি।

'আরে—সে লোকটার পাঞ্জাবিটা রয়েছে দেখছি এখানে!' রাধাবিনোদবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

আজ সকালে পাঞ্জাবিটা আমিও দেখেছি। তিন কোয়ার্টার হাতা ব্রাউন রঙের পাঞ্জাবি, বুকে সাদা বোতাম। এটা যে ঘনশ্যামবাবুরই পাঞ্জাবি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আর এই পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে এই ছমছমে অবস্থাতেও রাধাবিনোদবাবু চমকে উঠে হাঁফ ছাড়লেন। তিনি তাঁর সোনার ঘড়ি ফিরে পেয়েছেন।

'কিন্তু এখানে এসব কী হচ্ছে বলুন তো! কীসের সরঞ্জাম ওগুলো? পাঞ্জাবি রয়েছে, পকেটে ঘড়ি রয়েছে, কিন্তু সে ব্যাটা মানুষটা গেল কোথায়? আর সে বুড়োটাই বা কোথায় গেল?'

বললাম, 'বাড়ির ভিতরে নেই সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। চলুন বাইরে।'

ষষ্ঠিচরণ এখনও অজ্ঞান। তাকে আবার ডিঙিয়ে পেরিয়ে আমরা বাড়ির বাইরে বালির উপর এলাম। এবারে সমুদ্রের দিকে চাইতেই আবছা অন্ধকারে একটা মানুষকে দেখতে পেলাম। সে এইদিকেই আসছে। আরেকটু কাছে আসতে হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে তার উপর ফেললাম। প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ।

'ষড়াঙ্গুল মশাই কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি হিমাংশু চৌধুরী।'

'আরেকটু আগে এলেন না।' ভদ্রলোক যেন গভীর আক্ষেপের সঙ্গে কথাটা বললেন।

'কেন বলুন তো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ও তো চলে গেল! ছবির মতো মানুষ পেলাম। এক ঘণ্টায় জোড়া লেগে গেল, দিব্যি চলেফিরে বেড়াল, পরিষ্কার কথা বলল, ষষ্ঠিচরণ ভয় পাচ্ছিল বলে ওর মাথায় মুগুরের বাড়ি মারল, আর তারপর চলে গেল সোজা সমুদ্রের দিকে। একবার ভাবলুম ডাকি, কিন্তু নাম তো নেই, কী বলে ডাকব!...মানুষের মাথা, সিংহের পা, শজারুর পিঠ, রামছাগলের শিং...অথচ জলে যে গেল কেন সেটা বুঝতেই পারলাম না...'

কথাটা বলতে বলতে ভদ্রলোক তাঁর অন্ধকার বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন। আমার হাতের টর্চটা এতক্ষণ তাঁর উপর ফেলা ছিল, এখন হাতটা নীচে নামতে চোখে পড়ল বালির উপর পায়ের ছাপ। টাটকা পায়ের ছাপ। পা তো নয়, থাবা।

ছাপ ধরে আলো ফেলে এগিয়ে গেলাম। ক্রমে ভিজে বালি এল, তাতে ছাপ আরও গভীর। কাঁকড়ার গর্তের পাশ দিয়ে, অজস্র ঝিনুকের উপর দিয়ে থাবার ছাপ ক্রমে জলের দিকে গিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে গেছে।

এতক্ষণে রাধাবিনোদবাবু কথা বললেন।

'সবই তো বুঝলুম। ইনি তো বদ্ধ পাগল, আপনি হয়তো হাফ-পাগল, কিন্তু আমার হোটেলের বাসিন্দা ওই বাটপাড়টা গেল কোথায়?'

হাত থেকে করাত মাছের দাঁতটা জলে ফেলে দিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়িয়ে বললাম, 'সেটা না হয় পুলিশকে তদন্ত করতে বলুন। পাঞ্জাবিটা যখন এখানে পাওয়া গেছে, তখন এখানেই দেখতে বলুন। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, রহস্যের কূলকিনারা করতে গিয়ে পুলিশবাবাজিরও শেষটায় না আমার দশাই হয়—অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।'

আনন্দমেলা, পূজাবার্ষিকী ১৩৭৮

বাতিকবাবু

বাতিকবাবুর আসল নামটা জিজ্ঞেস করাই হয়নি। পদবি মুখার্জি। চেহারা একবার দেখলে ভোলা কঠিন। প্রায় ছ' ফুট লম্বা, শরীরে চর্বির লেশমাত্র নেই, পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা, হাতে পায়ে গলায় কপালে অজস্র শিরা উপশিরা চামড়া ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। টেনিস কলারওয়ালা সাদা শার্ট, কালো ফ্ল্যানেলের প্যান্ট, সাদা মোজা সাদা কেডস—দার্জিলিঙের গ্রীষ্মকালে এই ছিল তাঁর মার্কামারা পোশাক। এ ছাড়া তাঁর হাতে থাকত মজবুত লাঠি। বনবাদাড়ে এবড়ো-খেবড়ো জমিতে ঘোরা অভ্যাস বলেই হয়তো লাঠিটার প্রয়োজন হত।

আমার সঙ্গে বাতিকবাবুর আলাপ দশ বছর আগে। কলকাতায় ব্যাঙ্কে চাকরি করি, দিন দশেকের ছুটি জমেছে, বৈশাখের মাঝামাঝি গিয়ে হাজির হলাম আমার প্রিয় দার্জিলিং শহরে। আর প্রথমদিনই দর্শন পেলাম বাতিকবাবুর। কী করে সেটা হল বলি।

চা খেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়েছি বিকেল সাড়ে চারটায়। দুপুরে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আবার কখন হবে বলা যায় না, তাই রেনকোটটা গায়ে দিয়েই বেরিয়েছি। দার্জিলিঙের সবচেয়ে মনোরম, সবচেয়ে নিরিবিলি রাস্তা জলাপাহাড় রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখি হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা মোড়ের মাথায় একটি ভদ্রলোক রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠির উপর ভর করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ভারী মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছেন। দৃশ্যটা তেমন কিছু অস্বাভাবিক বলে মনে হল না। জংলি ফুল বা পোকামাকড় সম্বন্ধে আগ্রহ থাকলে লোক ওইভাবে ঘাসের দিকে চেয়ে থাকতে পারে। আমি ভদ্রলোকের দিকে একটা মৃদু কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়ে আবার এগোতে শুরু করলাম।

কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছনোর পর মনে হল ব্যাপারটাকে যতটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল ততটা নয়। অবাক লাগল ভদ্রলোকের একাগ্রতা দেখে। আমি পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর হাবভাব লক্ষ করছি, অথচ উনি আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সেই একই ভাবে সামনে ঝুঁকে ঘাসের দিকে চেয়ে আছেন। শেষটায় বাঙালি বুঝে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'কিছু হারালেন নাকি?'

কোনও উত্তর নেই। লোকটা কি কালা?

আমার কৌতূহল বাড়ল। ঘটনার শেষ না দেখে যাব না। একটা সিগারেট ধরালাম। মিনিট তিনেক পরে ভদ্রলোকের অনড় দেহে যেন প্রাণসঞ্চার হল। তিনি আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে তাঁর ডান হাতটা ঘাসের দিকে বাড়ালেন। ঘন ঘাসের ভিতর তাঁর হাতের আঙুলগুলো প্রবেশ করল। তারপর হাতটা উঠে এল। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে একটা ছোট্ট গোল চাকতি। ভাল করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা বোতাম। প্রায় একটা আধুলির মতো বড়। সম্ভবত কোটের বোতাম।

ভদ্রলোক বোতামটা চোখের সামনে এনে প্রায় মিনিটখানেক ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে জিভ দিয়ে চারবার ছিকছিক করে আক্ষেপের শব্দ করে সেটাকে শার্টের বুকপকেটে পুরে আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ম্যালের দিকে চলে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা ফেরার পথে ম্যালের মুখে ফোয়ারার ধারে দার্জিলিঙের পুরনো বাসিন্দা ডাঃ ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হল। ইনি কলেজে বাবার সহপাঠী ছিলেন, আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁকে আজ বিকেলের ঘটনাটা না বলে পারলাম না। ভৌমিক শুনেটুনে বললেন, 'চেহারা আর হাবভাবের বর্ণনা থেকে তো বাতিকবাবু বলে মনে হচ্ছে।'

'বাতিকবাবু?'

'স্যাড কেস। আসল নাম ঠিক মনে নেই, পদবি মুখার্জি। বছর পাঁচেক হল দার্জিলিঙে রয়েছে। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের কাছেই একটা বাড়িতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকে। কটকের র‍্যাভেনশ্ কলেজে ফিজিক্স পড়াত। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আছে। শুনেছি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। চাকরি-বাকরি ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। পৈতৃক সম্পত্তি কিছু আছে বোধহয়।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?'

'গোড়ার দিকে একবার আমার কাছে এসেছিল। রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে সেপটিক হবার জোগাড়। সারিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু বাতিকবাবু নামটা...?'

ভৌমিক হো হো করে হেসে উঠলেন। 'সেটা হয়েছে ওর এক উদ্ভট শখের জন্য। অবিশ্যি নামকরণটা কে করেছে বলা শক্ত।'

'শখটা কী?'

'তুমি তো নিজের চোখে দেখলে—রাস্তা থেকে একটা বোতাম তুলে পকেটে নিয়ে নিল। ওইটেই ওর শখ বা হবি। যেখান-সেখান থেকে জিনিস তুলে নিয়ে এসে সযত্নে রেখে দেয়।'

'যে-কোনও জিনিস?' কেন জানি না, আমার লোকটা সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ছিল।

ডাঃ ভৌমিক বললেন, 'আমরা বলব যে-কোনও জিনিস, কিন্তু ভদ্রলোক ক্লেম করবেন সেগুলো অত্যন্ত প্রেশাস, কারণ সেসব জিনিসের সঙ্গে নাকি একেকটা ঘটনা জড়িয়ে আছে।'

'কিন্তু সেটা উনি জানেন কী করে?'

ডাঃ ভৌমিক তাঁর হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'সেটা তুমি ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখো না। উনি ভিজিটর পেলে খুশিই হন—কারণ ওঁর গল্পের স্টক প্রচুর। ওঁর কালেকশনের প্রত্যেকটি জিনিসকে নিয়ে একেকটি গল্প তো! ওয়াইল্ড ননসেন্স, বলা বাহুল্য, তবে উনি সেগুলো বলতে পারলে খুশিই হন। অবিশ্যি তুমি শুনে খুশি হবে কিনা সেটা আলাদা কথা...'

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের কাছে বাতিকবাবুর বাড়ি চিনে বার করতে বিশেষ অসুবিধা হল না, কারণ পাড়ার সকলেই ভদ্রলোককে চেনে। সতেরো নম্বর বাড়ির দরজায় টোকা মারতেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, এবং আশ্চর্য এই যে, আমায় দেখেই চিনলেন।

'কাল আপনি আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আমার তখন উত্তর দেবার অবস্থা ছিল না। ওই সময়টা কন্‌সেনট্রেশন নষ্ট হতে দিলেই সর্বনাশ! ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল আলমারি। বাঁ দিকের দেয়ালের অর্ধেকটা অংশ জুড়ে একটা কাচে ঢাকা আলমারির প্রতিটি তাকে পাশাপাশি রাখা অতি সাধারণ সব জিনিস, যেগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার কোনও সম্পর্ক নেই। একবার চোখ বুলিয়ে একটা শেল্‌ফে পাশাপাশি চোখে পড়ল—একটা গাছের শেকড়, একটা মরচে ধরা তালা, একটা আদ্যিকালের গোল্ড ফ্লেকের টিন, একটা উল বোনার কাঁটা, একটা জুতোর বুরুশ, একটা টর্চলাইটের ব্যাটারি। আমি অবাক হয়ে এইসব দেখছি, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, 'ওগুলো দেখে আপনি বিশেষ আনন্দ পাবেন না, কারণ ওসব জিনিসের মূল্য কেবল আমিই জানি।'

আমি বললাম, 'শুনেছি এসব জিনিসের সঙ্গে নাকি একেকটা বিশেষ ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে।'

'আছে বইকী!'

'কিন্তু সেরকম তো সব জিনিসের সঙ্গেই থাকে। যেমন আপনি যে ঘড়িটা হাতে পরেছেন—'

ভদ্রলোক হাত তুলে আমার কথা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'ঘটনা জড়িয়ে থাকে অবশ্যই, কিন্তু সব জিনিসের উপর সে ঘটনার ছাপ থেকে যায় না। ক্বচিৎ কদাচিৎ একেকটা জিনিস মেলে, যার মধ্যে সে ছাপটা থাকে। যেমন কালকের এই বোতামটা—'

ঘরের ডানদিকে একটা রাইটিং ডেস্কের উপর বোতামটা রাখা ছিল। ভদ্রলোক সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। খয়েরি রঙের কোটের বোতাম। তার মধ্যে কোনওরকম বিশেষত্ব আমার চোখে ধরা পড়ল না।

'কিছু বুঝতে পারছেন?'

বাধ্য হয়েই না বলতে হল। বাতিকবাবু বললেন, 'এই বোতাম একটি সাহেবের কোট থেকে এসেছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে জলাপাহাড় রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি, রাইডিং-এর পোশাক পরা, সবল সুস্থ মিলিটারি চেহারা। যেখানে বোতামটা পেলুম, সেইখানটায় এসে ভদ্রলোকের স্ট্রোক হয়। ঘোড়া থেকে পড়ে যান। দু'জন পথচারী দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসে, কিন্তু তিনি অলরেডি ডেড। ঘোড়া থেকে পড়ার সময়ই বোতামটা কোট থেকে ছিঁড়ে রাস্তার ধারে পড়ে যায়।'

'এসব কি আপনি দেখতে পান?'

'ভিভিডলি। যত বেশি মনঃসংযোগ করা যায়, তত বেশি স্পষ্ট দেখি।'

'কখন দেখেন?'

'এই জাতীয় বিশেষ গুণসম্পন্ন কোনও বস্তুর কাছে এলেই আমি প্রথমে একটা মাথার যন্ত্রণা অনুভব করি। তারপর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে, মনে হয় পড়ে যাব, সাপোর্ট দরকার। কিন্তু তারপরেই দৃশ্য দেখা শুরু হয়, আর পাও স্টেডি হয়ে যায়। এই এক্সপিরিয়েন্সের ফলে আমার শরীরের টেম্পারেচার বেড়ে যায়। প্রতিবার। কাল প্রায় রাত আটটা পর্যন্ত একশো দুই জ্বর ছিল। অবিশ্যি জ্বরটা বেশিক্ষণ থাকে না। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

ব্যাপারটা আজগুবি হলেও আমার বেশ মজা লাগছিল। বললাম, 'আরও দু-একটা উদাহরণ দিতে পারেন?'

বাতিকবাবু বললেন, 'আলমারি ভর্তি উদাহরণ। ওই যে খাতা দেখছেন, ওতে প্রত্যেকটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। আপনি কোনটা জানতে চান বলুন।'

আমি কিছু বলার আগে ভদ্রলোক আলমারির কাচ সরিয়ে তাক থেকে দুটো জিনিস বার করে

টেবিলের উপর রাখলেন—একটা বহু পুরনো চামড়ার দস্তানা, আর একটা চশমার কাচ।

'এই যে দস্তানাটা দেখছেন,' বাতিকবাবু বললেন, 'এটা আমার প্রথম পাওয়া জিনিস; অর্থাৎ আমার সংগ্রহের প্রথম আইটেম। এটা পাই সুইজারল্যান্ডের লুসার্ন শহরের বাইরে একটা বনের মধ্যে। তখন আমার মারবুর্গে পড়া শেষ হয়েছে, আমি দেশে ফেরার আগে একটু কন্টিনেন্টটা ঘুরে দেখছি। লুসার্নে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছি। নির্জন বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। একটু বিশ্রাম নেব বলে একটা বেঞ্চিতে বসেছি, এমন সময় পাশেই একটা গাছের গুঁড়ির ধারে ঘাসের ভিতর দস্তানার বুড়ো আঙুলটা চোখে পড়তেই মাথা দপ্ দপ্ করতে আরম্ভ করল। তারপর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এল: তারপর চোখের সামনে ভেসে উঠল ছবি। একটা সুবেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, মুখে লম্বা বাঁকানো সুইস পাইপ। দস্তানা পরা হাতে ছড়ি নিয়ে হেঁটে চলেছেন রাস্তা দিয়ে। আচমকা ঝোপের পিছন থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এসে তাঁকে আক্রমণ করল। ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে হাত পা ছুড়লেন। ধস্তাধস্তির ফাঁকে তিনি তাঁর হাতের দস্তানাটি হারালেন, দুর্বৃত্তেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁর কোটের পকেট থেকে টাকাকড়ি ও হাত থেকে সোনার ঘড়িটি নিয়ে পালাল।'

'সত্যিই এরকম কোনও ঘটনা ঘটেছিল কি?'

'আমি তিনদিন হাসপাতালে ছিলুম। জ্বর, ডিলিরিয়াম, আর আরও অনেক কিছু। ডাঃ স্টাইনিটস রোগ ধরতে পারেননি। তারপর আপনিই সেরে উঠে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে অনুসন্ধান আরম্ভ করি। দু'বছর আগে ওই বনে ঠিক ওই জায়গায় কাউন্ট ফার্ডিনান্ড মুস্যাপ বলে একজন ধনী ব্যক্তি ঠিক ওইভাবেই খুন হয়। তার ছেলে দস্তানাটা চিনতে পারে।'

ভদ্রলোক এমন সহজভাবে ঘটনাটা বলে গেলেন যে, তাঁর কথা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। বললাম, 'আপনি সেই তখন থেকেই আপনার সংগ্রহ শুরু করেন?'

বাতিকবাবু বললেন, 'এই দস্তানাটা পাবার পর প্রায় দশ বছর আর ও ধরনের কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি। ততদিনে আমি দেশে ফিরে কটকের কলেজে প্রফেসারি আরম্ভ করেছি। ছুটিতে এখানে-ওখানে বেড়াতে যেতাম। একবার ওয়ালটেয়ারে গিয়ে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটা হয়। সমুদ্রের তীরে একটা পাথরের খাঁজে এই চশমার কাচটা পাই। দেখতেই পাচ্ছেন প্লাস পাওয়ারের কাচ। একটি মাদ্রাজি ভদ্রলোক চশমা খুলে রেখে জলে নেমেছিলেন স্নান করতে। তিনি আর জল থেকে ফেরেননি। পায়ে ক্র্যাম্প ধরার ফলে তাঁর সলিল সমাধি হয়। জলের ভিতর থেকে হাত তুলে হেল্প হেল্প চিৎকার—ভারী মর্মান্তিক। তাঁরই চশমার এই কাচটি চার বছর পরে আমি পাই। এটাও যে সত্যি ঘটনা সেটা আমি যাচাই করে জেনেছি। ওয়েল নোন ড্রাউনিং কেস। মৃত ব্যক্তি কোয়েম্বাটোরে থাকতেন, নাম শিবরমণ।'

ভদ্রলোক দস্তানা ও চশমার কাচ যথাস্থানে রেখে আবার জায়গায় এসে বসলেন। 'আমার এই আলমারিতে কতগুলো জিনিস আছে জানেন? একশো বাহাত্তরটা। আমার গত ত্রিশ বছরের সংগ্রহ। বলুন তো, এরকম সংগ্রহের কথা আর শুনেছেন কী?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'আপনার এই হবিটি যে একেবারে ইউনিক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার প্রত্যেকটি জিনিসের সঙ্গেই কি মৃত্যুর একটা সম্পর্ক রয়েছে?'

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন, 'তাই তো দেখছি। শুধু মৃত্যু নয়—আকস্মিক, অস্বাভাবিক মৃত্যু। খুন, আত্মহত্যা, অপঘাত মৃত্যু, হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া—এই জাতীয় ঘটনার সঙ্গে যোগ থাকলে তবেই একেকটা জিনিস আমার মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।'

'এগুলোর সবই কি রাস্তায় বা মাঠে-ঘাটে পাওয়া?'

'অধিকাংশই। আর বাকিগুলো পাওয়া চোরাবাজারে, নিলামে, কিউরিওর দোকানে। এই যে কাট-গ্লাসের সুরাপাত্রটি দেখছেন, এটা পাই কলকাতার রাসেল স্ট্রিটের একটা নিলামের দোকানে। এই পাত্রতে ব্র্যান্ডির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি বিশালবপু সাহেবের মৃত্যু হয় কলকাতা শহরে।'

আমি কিছুক্ষণ থেকেই আলমারির জিনিসপত্র ছেড়ে ভদ্রলোকের নিজের চেহারার দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলাম। অনেক লক্ষ করেও তাঁর মধ্যে ভণ্ডামির কোনও চিহ্ন ধরা পড়ল না। পাগলামির কোনও লক্ষণ রয়েছে কী। মনে তো হয় না। চোখে উদাস ভাবটা যেমন পাগলদের মধ্যে সম্ভব, তেমনই কবি,

ভাবুক বা সাধকদের মধ্যেও সম্ভব।

আমি আর বেশিক্ষণ বসলাম না। বিদায় নিয়ে চৌকাঠ পেরোবার সময় ভদ্রলোক বললেন, 'আবার আসবেন। আপনাদের মতো লোকের জন্য আমার দরজা সবসময়েই খোলা। কোথায় উঠেছেন আপনি?'

'অ্যালিস ভিলা হোটেলে।'

'ও। তা হলে তো দশ মিনিটের হাঁটাপথ। বেশ লাগল আপনার সঙ্গ। কোনও কোনও লোককে আদৌ বরদাস্ত করতে পারিনি। আপনাকে সহৃদয় সমঝদার বলে মনে হয়।'

বিকেলে ডাঃ ভৌমিক চায়ে বলেছিলেন। আমি ছাড়া নিমন্ত্রিত আরও দুটি ভদ্রলোক। চায়ের সঙ্গে চানাচুর আর কেক খেতে খেতে বাতিকবাবুর প্রসঙ্গটা না তুলে পারলাম না। ভৌমিক বললেন, 'কতক্ষণ ছিলে?'

'ঘণ্টাখানেক।'

'ওরে বাবা!' ডাঃ ভৌমিকের চোখ কপালে। 'এক ঘণ্টা ধরে ওই বুজরুকের কচকচি শুনলে?'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'যা প্যাচপেচে বৃষ্টি—স্বচ্ছন্দে বেড়ানোর তো উপায় নেই। হোটেলের ঘরে বন্দি হয়ে থাকার চেয়ে ওর গল্প শোনা বোধহয় ভাল।'

'কার কথা হচ্ছে?'

প্রশ্নটা এল একটি বছর চল্লিশেকের ভদ্রলোকের কাছ থেকে। মিস্টার খাস্তগির বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ডাঃ ভৌমিক। বাতিকবাবুর বাতিকের বর্ণনা শুনে খাস্তগির একটা বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'এসব লোককে এখানে আস্তানা গাড়তে দিয়ে দার্জিলিঙের বায়ু দূষিত করেছেন কেন ডাঃ ভৌমিক?'

ডাঃ ভৌমিক হালকা হেসে বললেন, 'এতবড় একটা শহরের বায়ু দূষিত করার ক্ষমতা কি লোকটার আছে? বোধহয় না।'

মিস্টার নস্কর নামক তৃতীয় ভদ্রলোকটি ভারতবর্ষে বুজরুকদের কুপ্রভাব সম্বন্ধে একটা ছোটখাট বক্তৃতাই দিয়েছিলেন। শেষকালে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, বাতিকবাবু যেহেতু নেহাতই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন, তাঁর বুজরুকির প্রভাব আর পাঁচজনের উপর পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ভৌমিক দার্জিলিঙে রয়েছেন প্রায় ত্রিশ বছর। খাস্তগিরও অনেকদিনের বাসিন্দা। শেষ পর্যন্ত এঁদের দু'জনকে উদ্দেশ্য করে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না। 'জলাপাহাড় রোডে কোনও অশ্বারোহী সাহেব হার্টফেল করে মারা যায়, এমন কোনও ঘটনা জানা আছে আপনাদের?'

'কে, মেজর ব্র্যাডলে?' প্রশ্ন করলেন ডাঃ ভৌমিক। 'সে তো বছর আষ্টেক আগেকার ঘটনা। স্ট্রোক হয়েছিল। সম্ভবত জলাপাহাড় রোডেই। হাসপাতালে এনেছিল, কিন্তু তার আগেই মারা যায়। কেন বলো তো?'

আমি বাতিকবাবুর বোতামের কথাটা বললাম। মিস্টার খাস্তগির একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'লোকটা এইসব বলে অলৌকিক ক্ষমতা ক্লেম করছে নাকি? এ তো একের নম্বরের শয়তান দেখছি হে! সে নিজে দার্জিলিঙে রয়েছে অ্যাদ্দিন। ঘোড়ার পিঠে সাহেব মরেছে সে খবর তো এমনিতেই তার কানে পৌঁছতে পারে। সেখানে অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োজনটা আসছে কোত্থেকে?'

কথাটা অবিশ্যি আমারও মনে হয়েছিল। দার্জিলিঙে থেকে দার্জিলিঙেরই একটি ঘটনার কথা জানতে পারা বাতিকবাবুর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। আমি তাই আর প্রসঙ্গটা বাড়ালাম না।

চায়ের পর্ব এবং পাঁচরকম এলোমেলো কথাবার্তা শেষ হবার পর আমি ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মিস্টার নস্করও উঠে পড়লেন। বললেন উনিও অ্যালিস ভিলার দিকটাতেই থাকেন, তাই আমার সঙ্গে একসঙ্গেই হেঁটে ফিরবেন। আমরা ডাঃ ভৌমিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে সন্ধে হয়ে এসেছে। আমি দার্জিলিঙে আসার পর এই প্রথম দেখলাম আকাশের ঘন মেঘে ফাটল ধরেছে, আর সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি মঞ্চের স্পটলাইটের মতো শহর ও তার আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে পড়েছে।

মিস্টার নস্করকে দেখে বেশ মজবুত মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি চড়াই উঠতে তাঁর বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। হাঁপানির মধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার এই ভদ্রলোকটি কোথায় থাকেন?'

বললাম, 'দেখা করবেন নাকি?'

'না না। এমনি কৌতূহল হচ্ছিল।'

বাতিকবাবুর বাড়ির হদিস দিয়ে বললাম, 'ভদ্রলোক বেড়াতে-টেড়াতে বেরোন। হয়তো পথেই দেখা হয়ে যেতে পারে।'

কী আশ্চর্য, হলও তাই। কথাটা বলার দু' মিনিটের মধ্যেই একটা মোড় ঘুরতেই সামনে বিশ হাত দূরে দেখি বাতিকবাবু ডান হাতে তাঁর লাঠি আর বাঁ হাতে একটা খবরের কাগজের মোড়ক নিয়ে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছেন। আমাকে সামনেই দেখতে পেয়ে ভদ্রলোকের মুখের যে ভাবটা হল সেটাকে যদিও হাসি বলা চলে না, কিন্তু সেটা অপ্রসন্নভাব নয় নিশ্চয়ই। বললেন, 'বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে ভাই, তাই মোমবাতি কিনে নিয়ে যাচ্ছি।'

ভদ্রতার খাতিরে মিস্টার নস্করের সঙ্গে আলাপটা না করিয়ে পারলাম না। 'মিস্টার নস্কর—মিস্টার মুখার্জি।'

নস্কর দেখলাম সাহেবি মেজাজের লোক। নমস্কার না করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। বাতিকবাবু মুখে কোনওরকম সৌজন্য প্রকাশ না করে হাতটা ধরে হ্যান্ডশেক করলেন। তারপর যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনই দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার তো বটেই, মিস্টার নস্করেরও নিশ্চয়ই বেশ অপ্রস্তুত লাগছিল। প্রায় আধ মিনিট চুপ করে থাকার পর আর না পেরে নস্কর বললেন, 'ওয়েল—আমি তা হলে এগোই। আপনার কথা শুনছিলাম, লাকিলি আলাপ হয়ে গেল।'

'চলি, মিস্টার মুখার্জি।' আমাকেও বাধ্য হয়েই কথাটা বলতে হল। বাতিকবাবুকে এবার সত্যিই পাগল বলে মনে হচ্ছিল। রাস্তার মাঝখানে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে কী যে ভাবছেন তা উনিই জানেন। আমাদের দু'জনের বিদায় নেওয়াটা উনি যেন গ্রাহ্যই করলেন না। নস্করকে না হয় পছন্দ না হতে পারে, আমার সঙ্গে তো আজ সকালেই দিব্যি ভাল ব্যবহার করেছেন। ভদ্রলোককে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম তিনি এখনও ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন। নস্কর মন্তব্য করলেন, 'আপনার কাছে শুনে যতটা ছিটগ্রস্ত মনে হয়েছিল, এখন দেখছি তার চেয়েও বেশ কয়েক কাঠি বেশি।'

রাত ন'টা। সবেমাত্র ডিনার শেষ করে একটা পান মুখে দিয়ে গোয়েন্দা উপন্যাসটা নিয়ে বিছানায় ঢুকব ভাবছি, এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিল একজন লোক নাকি আমার খোঁজ করছে। বাইরে বেরিয়ে এসে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম। এত রাত্রে বাতিকবাবু আমার কাছে কেন? আজই সন্ধেবেলা ভদ্রলোকের যে মুহ্যমান ভাবটা দেখেছিলাম, সেটা যেন এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। বললেন, 'একটু বসবার জায়গা হবে ভাই—নিরিবিলি? বাইরে দাঁড়াতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে।'

ভদ্রলোককে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। চেয়ারে বসে হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'পালসটা একবার দেখো তো। তোমায় তুমি বলছি, কিছু মনে কোরো না।'

গায়ে হাতে দিয়ে চমকে উঠলাম। রীতিমতো জ্বর। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'একটা অ্যানাসিন দেব? আমার সঙ্গেই আছে।'

বাতিকবাবু হেসে বললেন, 'কোনও সিনেই কাজ দেবে না। জ্বর থাকবে এ রাতটা। কাল রেমিশন হয়ে যাবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা জ্বর নয়। তোমার কাছে চিকিৎসার জন্য আসিনি। আমার যেটা দরকার সেটা ওই আংটিটা।'

আংটি? কোন আংটির কথা বলছেন ভদ্রলোক?

আমার হতভম্ব ভাব দেখে ভদ্রলোক যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললেন, 'ওই যে লস্কর না তস্কর কী নাম বললে? তাঁর হাতের আংটিটা দেখোনি? সস্তা আংটি—পাথর-টাথর নেই, কিন্তু ওটি আমার চাই।'

এখন মনে পড়ল মিস্টার নস্করের ডান হাতে একটা রুপোর সিগনেট রিং লক্ষ করেছিলাম বটে!

বাতিকবাবু বলে চলেছেন, 'হ্যান্ডশেকের সময় হাতের তেলোয় ঠেকে গেল আংটিটা। মনে হল শরীরের ভেতর একটা এক্সপ্লোশান হয়ে গেল। তারপর যা হয় তাই। রাস্তার মাঝখানে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখতে আরম্ভ করেছিলুম, এমন সময় উলটোদিক থেকে একটা জিপ এসে দিলে সব মাটি করে।'

'তার মানে ঘটনাটা আপনার দেখা হয়নি?'

'যতদূর দেখেছি তাতেই যথেষ্ট। খুনের ব্যাপার। আততায়ীর মুখ দেখিনি। আংটিসমেত হাতটা এগিয়ে যাচ্ছে একটা লোকের গলার দিকে। ভিকটিম অবাঙালি। মাথায় রাজস্থানি টুপি, চোখে সোনার চশমা। চোখ বিস্ফারিত। চেঁচাবে বলে মুখ খুলেছে। তলার পাটির একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো...ব্যস, এই পর্যন্ত। ও আংটি আমার চাই।'

আমি কয়েক মুহূর্ত বাতিকবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বাধ্য হয়েই বললাম, 'দেখুন মিস্টার মুখার্জি— আংটির যদি আপনার প্রয়োজন হয় তো আপনি নিজেই মিস্টার নস্করের কাছে চেয়ে দেখুন না! আমার সঙ্গে তার আলাপ সামান্যই। আর যতদূর বুঝেছি, তিনি আপনার হবির ব্যাপারটা তেমন সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন না।'

'তা হলে আমি চেয়ে কী লাভ সেটা বলুন? তার চেয়ে বরং—'

'ভেরি সরি মিস্টার মুখার্জি—' আমি ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে স্পষ্ট কথাটা না বলে পারলাম না— 'আমি চাইলেও কোনও ফল হবে বলে মনে হয় না। এসব আংটি-টাংটির প্রতি একেক সময় মানুষের কীরকম মমতা থাকে সেটা তো আপনি জানেন। উনি যদি জিনিসটা ব্যবহার না করতেন তা হলে তবু...'

ভদ্রলোক আর বসলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে এই টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যেই অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন। আমি মনে মনে বললাম, ভদ্রলোকের আবদারটা একটু বেয়াড়া রকমের। রাস্তা থেকে জিনিস কুড়িয়ে নেওয়া একটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু লোকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস নিয়ে তার কালেকশন বাড়ানোর প্রয়াসটা অন্যায় প্রয়াস। এ ব্যাপারে কেউই তাকে সাহায্য করত না, আমিই বা করি কী করে? আর নস্কর এমনিতেই বেশ কাঠখোট্টা লোক। তার কাছে চেয়ে ওই আংটি পাবার আশা করাটাই ভুল।

পরদিন সকালে মেঘ কেটে গিয়ে দিন ফরসা হয়েছে দেখে চা খেয়ে বার্চ হিলের উদ্দেশে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম। খটখটে দিন। ম্যাল লোকে লোকারণ্য, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ও চেঞ্জারদের সঙ্গে কোলিশন বাঁচিয়ে ক্রমে গিয়ে পড়লাম অবজারভেটরি হিলের পশ্চিম দিকে অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তাটায়। কাল রাত থেকেই মাঝে মাঝে বাতিকবাবুর করুণ মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, আর মনে মনে একটা ইচ্ছে দানা বাঁধছিল যদি ঘটনাচক্রে নস্করের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তা হলে একবার আংটির কথাটা বলে দেখব। হয়তো আংটিটার প্রতি তাঁর তেমন টান নেই, চাইলে দিয়ে দেবেন। সেটা বাতিকবাবুর হাতে তুলে দিতে পারলে তাঁর মুখের ভাব যে কেমন হবে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। ছেলেবেলায় ডাকটিকিট জমাতাম, কাজেই হবির নেশা যে কী জিনিস সেটা আমার জানা ছিল। আর বাতিকবাবু লোকটা সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নিজের উদ্ভট শখ নিয়ে নিজেই মেতে আছেন। গায়ে পড়ে কাউকে দলে টানবার চেষ্টা করছেন না, হয়তো জীবনে এই প্রথম অন্যের একটা জিনিসের প্রতি লোভ দেখাচ্ছেন— তাও সেটা এমন মহামূল্য কিছুই নয়। সত্যি বলতে কি, কাল রাত্রের পরে আমার ধারণা হয়েছে যে, ভদ্রলোকের অলৌকিক ক্ষমতা-টমতা কিছুই নেই, ওঁর শখের সমস্ত ব্যাপারটাই ওঁর আধপাগলা মনের কল্পনার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তাতেই যদি এই নিঃসঙ্গ লোকটি খুশি থাকে, তাতে আর কী এসে যাচ্ছে? কিন্তু বার্চ হিলের রাস্তায় ঘণ্টাদুয়েক ঘুরেও নস্করের সঙ্গে দেখা হল না। ম্যালে যখন এসে পৌঁছেছি তখন প্রায় সাড়ে দশটা। ভিড় তখনও রয়েছে, কিন্তু যাবার সময় যেমন দেখে গেছি, তার চেয়ে যেন একটু তফাত। এদিকে-ওদিকে ইতস্তত ছড়ানো দশ-বিশ জনের জটলা, এবং সেই জটলার মধ্যে কী নিয়ে যেন উত্তেজিত আলোচনা চলেছে। এগিয়ে যেতে 'পুলিশ' 'তদন্ত' 'খুন' ইত্যাদি কথাগুলো কানে আসতে লাগল। একটি অপরিচিত প্রৌঢ় বাঙালিকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার মশাই? কিছু হয়েছে-টয়েছে নাকি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কলকাতা থেকে কে এক সাসপেক্টেড ক্রিমিন্যাল নাকি এখানে এসে গা-ঢাকা দিয়েছিল। তাকে ধাওয়া করে পুলিশ এসেছে, খানাতল্লাশি চলেছে!'

'লোকটার নাম জানেন?'

'আসল নাম জানি না। এখানে নাকি নস্কর বলে পরিচয় দিয়েছে।'

আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। একটিমাত্র লোকই আসল খবরটা দিতে পারবেন—ডাঃ

ভৌমিক।

তাঁর বাড়ি পর্যন্ত আর যেতে হল না। লেডেন-লা রোডে রিকশার স্ট্যান্ডের কাছে খাস্তগির ও ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললেন, 'ভাবতে পারো! লোকটা কাল বিকেলে আমার বাড়িতে বসে চা খেয়ে গেল। পেটে একটা পেন হচ্ছে বলে তিনদিন আগে আমার কাছে এসেছিল চিকিৎসার জন্য, আমি ওষুধ দিয়েছি। একা লোক, নতুন এসেছে, তাই তাকে বাড়িতে খেতে ডাকলাম, আর আজ এই ব্যাপার!'

'লোকটা ধরা পড়েছে?' উদ্‌গ্রীব ভাবে প্রশ্ন করলাম।

'এখনও পড়েনি। সকাল থেকে মিসিং। পুলিশ খুঁজে চলেছে। তবে এই শহরেই তো আছে, যাবে আর কোথায়। কিন্তু কী সাংঘাতিক ব্যাপার বলো তো!...'

ভৌমিক আর খাস্তগির চলে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার নাড়ি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শুধু নস্কর ক্রিমিন্যাল বলে নয়, বাতিকবাবুর আংটির প্রতি লোভের কথা ভেবে। খুনির হাতের আংটি— ভদ্রলোক বলেছিলেন। তা হলে কি সত্যিই লোকটার মধ্যে একটা অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে?

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে ইচ্ছে করল বাতিকবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করি। ভদ্রলোক কি খবরটা পেয়েছেন? একবার খোঁজ করে দেখা দরকার।

কিন্তু সতেরো নম্বর বাড়ির দরজায় বার তিনেক টোকা দিয়েও কোনও উত্তর পেলাম না। এদিকে আবার মেঘ করে এসেছে। আমি দ্রুত পা চালিয়ে আমার হোটেলে চলে এলাম। আধঘণ্টার মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ঝলমলে সকালটা এক নিমেষে একটা সুদূর অতীতের ঘটনায় পরিণত হল। পুলিশ সার্চ চালিয়ে চলেছে। কোথায় গা-ঢাকা দিলেন মিস্টার নস্কর? কাকে খুন করলেন ভদ্রলোক? কীভাবে খুন?

সাড়ে তিনটার সময় আমাদের হোটেলের ম্যানেজার মিঃ সোন্ধি খবরটা আনলেন। নস্কর যে বাড়িটায় ছিল, তার ঠিক পিছনেই পাহাড়ের খাদে ত্রিশ হাত নীচে মাথা থেঁতলানো অবস্থায় নস্করের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। আত্মহত্যা, মস্তিষ্কবিকৃতি, পালাতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি নানারকম কারণ অনুমান করা হচ্ছে। ব্যবসাগত ব্যাপারে পার্টনারের সঙ্গে শত্রুতা। সেই থেকে খুন, মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলে দার্জিলিঙে এসে গা-ঢাকা, পুলিশ কর্তৃক কলকাতায় মৃতদেহ আবিষ্কার, ইত্যাদি।

নাঃ—বাতিকবাবুর সঙ্গে একবার দেখা না করলেই নয়! লোকটাকে আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সুইজারল্যান্ড ওয়ালটেয়ারের ঘটনা মনগড়া হতে পারে, দার্জিলিঙের ঘটনা তিনি আগে থেকে জেনে থাকতে পারেন, কিন্তু নস্কর যে খুনি সেটা তিনি জানলেন কী করে?

পাঁচটা নাগাদ বৃষ্টি একটু ধরতেই তাঁর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। বাতিকবাবু হেসে বললেন, 'এসো ভায়া, ভেতরে এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

ভেতরে ঢুকলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাতিকবাবুর টেবিলের উপর টিমটিম করে একটা মোমবাতি জ্বলছে! 'আজও ইলেকট্রিসিটি আসেনি', ম্লান হাসি হেসে বললেন ভদ্রলোক। আমি বেতের চেয়ারে বসে বললাম, 'খবর পেয়েছেন?'

'তোমার সেই তস্করের খবর? খবরে আর আমার কী হবে বলো, আমি সবই জানতে পেরেছিলাম। তবে, আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'কৃতজ্ঞ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমার সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি সে আমাকে দিয়ে গেছে।'

'দিয়ে গেছে?' আমার গলা শুকনো।

'ওই দেখো না টেবিলের উপর।'

আবার টেবিলের দিকে চাইতে মোমবাতির পাশেই খোলা খাতার সাদা পাতার উপর আংটিটা চোখে পড়ল।

'ঘটনার বর্ণনাটা লিখে রাখছি। আইটেম নম্বর ওয়ান সেভেন থ্রি', বাতিকবাবু বললেন। আমার মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরছে। 'দিয়ে গেছে মানে? কখন দিয়ে গেল?'

'এমনিতে কি দিতে চায়?' বাতিকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'জোর করে নিতে হল।'

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। ঘরের ভিতর একটা টাইমপিস টিক টিক করে বেজে চলেছে।

'তুমি এসে ভালই হল,' বাতিকবাবু বললেন, 'একটা জিনিস তোমাকে দিচ্ছি, সেটা তোমার কাছেই রেখে দিয়ো।'

বাতিকবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের উলটোদিকে অন্ধকার কোণটায় চলে গেলেন। সেখান থেকে খুটখুট শব্দ এল, আর তার সঙ্গে তাঁর কথা—

'এটাও আমার সংগ্রহে রাখার উপযুক্ত, কিন্তু এটার প্রভাব আমি সহ্য করতে পারছি না। বারবার জ্বর আসছে, আর একটা ভারী অপ্রীতিকর দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।'

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ডান হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে রয়েছেন তিনি। সেই হাতে ধরা রয়েছে তাঁর অতি পরিচিত লাঠিটা।

মোমবাতির এই ম্লান আলোতেও বুঝতে পারলাম যে, লাঠির হাতলের মাথায় যে লাল দাগটা রয়েছে, সেটা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ ছাড়া আর কিছুই না।

সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৭৯

খগম

পেট্রোম্যাক্সের আলোতে বসে ডিনার খাচ্ছি, সবেমাত্র ডালনার ডিমে একটা কামড় দিয়েছি, এমন সময় চৌকিদার লছমন জিজ্ঞেস করল, 'আপলোগ ইমলি-বাবাকো দর্শন নেহি করেঙ্গে?'

বলতে বাধ্য হলাম যে, ইমলিবাবার নামটা আমাদের কাছে একেবারেই নতুন, তাই দর্শন করার প্রশ্নটা ওঠেইনি। লছমন বলল, জঙ্গল বিভাগের যে জিপটা আমাদের জন্য মোতায়েন হয়েছে তার ড্রাইভারকে বললেই সে আমাদের বাবার ডেরায় নিয়ে যাবে। জঙ্গলের ভিতরেই তার কুটির, ভারী মনোরম পরিবেশ, সাধু হিসেবেও নাকি খুব উঁচু স্তরের; ভারতবর্ষের নানান জায়গা থেকে গণ্যমান্য লোকেরা এসে তাঁকে দেখে যান, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া আর যে ব্যাপারটা শুনে আরও কৌতূহল হল সেটা হল এই যে, বাবার নাকি একটা পোষা কেউটে আছে, সেটা বাবার কুটিরের কাছেই একটা গর্তে থাকে, আর রোজ সন্ধেবেলা গর্ত থেকে বেরিয়ে বাবার কাছে এসে ছাগলের দুধ খায়।

ধূর্জটিবাবু সব শুনেটুনে মন্তব্য করলেন যে, দেশটা বুজরুকিতে ছেয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা দিন দিন বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। পশ্চিমে যতই বিজ্ঞানের প্রভাব বাড়ছে, আমাদের দেশটা নাকি ততই আবার নতুন করে কুসংস্কারের অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে।—'হোপলেস ব্যাপার মশাই। ভাবলে মাথায় রক্ত উঠে যায়।'

কথাটা বলে ধূর্জটিবাবু হাত থেকে কাঁটা চামচ নামিয়ে রেখে পাশ থেকে ফ্লাই-ফ্ল্যাপ বা মক্ষিকা-মারণ দণ্ডটা তুলে নিয়ে টেবিলের উপর এক অব্যর্থ চাপড়ে একটা মশা মেরে ফেললেন। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। বেঁটে রোগা ফরসা চোখাচোখা চেহারা, চোখ দুটো রীতিমতো কটা। আমার সঙ্গে আলাপ এই ভরতপুরে এসে। আমি এসেছি আগ্রা হয়ে, যাব জয়পুরে মেজদার কাছে দু হপ্তার ছুটি কাটাতে। এখানে এসে ডাকবাংলোয় বা টুরিস্ট লজে জায়গা না পেয়ে শেষটায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শহরের বাইরে এই ফরেস্ট রেস্ট হাউসে এসে উঠেছি। তাতে অবিশ্যি আক্ষেপের কিছু নেই, কারণ জঙ্গলে ঘেরা রেস্ট হাউসে থাকার মধ্যে বেশ একটা রোমাঞ্চকর আরাম আছে।

ধূর্জটিবাবু আমার একদিন আগে এসেছেন। কেন এসেছেন তা এখনও খুলে বলেননি, যদিও নিছক বেড়ানো ছাড়া আর কোনও কারণ থাকতে হবে এমন কোনও কথা নেই। আমরা দু'জনে একই জিপে

ঘোরাফেরা করছি। কাল এখান থেকে ২২ মাইল পুবে দীগ বলে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম সেখানকার কেল্লা আর প্রাসাদ দেখতে। ভরতপুরের কেল্লাও আজ সকালে দেখা হয়ে গিয়েছে, আর বিকেলে গিয়েছিলাম কেওলাদেওয়ের ঝিলে পাখির আস্তানা দেখতে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সাত মাইলের উপর লম্বা ঝিল, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মতো ডাঙা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে, আর সেই ডাঙার প্রত্যেকটিতে রাজ্যের পাখি এসে জড়ো হয়েছে, তার অর্ধেকের বেশি আমি কোনওকালে চোখেই দেখিনি। আমি অবাক হয়ে পাখি দেখছি, আর ধূর্জটিবাবু ক্ষণে ক্ষণে গজগজ করে উঠছেন আর হাত দুটোকে অস্থিরভাবে এদিকে-ওদিকে নাড়িয়ে মুখের আশপাশ থেকে উন্‌কি সরাবার চেষ্টা করছেন। উন্‌কি হল একরকম ছোট্ট পোকা। ঝাঁকে ঝাঁকে এসে মাথার চারপাশে ঘোরে আর নাকেমুখে বসে। তবে পোকাগুলো এতই ছোট যে, তাদের অনায়াসে অগ্রাহ্য করে থাকা যায়; কিন্তু ধূর্জটিবাবু দেখলাম বারবার বিরক্ত হয়ে উঠছেন। এত অধৈর্য হলে কি চলে?

সাড়ে আটটার সময় খাওয়া শেষ করে সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে চাঁদনি রাতে জঙ্গলের শোভা দেখতে দেখতে ধূর্জটিবাবুকে বললাম, 'ওই যে সাধুবাবার কথা বলছিল—যাবেন নাকি দেখতে?'

ধূর্জটিবাবু তাঁর হাতের সিগারেটটা একটা ইউক্যালিপটাস গাছের গুঁড়ির দিকে তাগ করে ছুড়ে ফেলে বললেন, 'কেউটে পোষ মানে না, মানতে পারে না। সাপ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। ছেলেবেলায় জলপাইগুড়িতে থাকতাম, নিজে হাতে অজস্র সাপ মেরেছি। কেউটে হচ্ছে বীভৎস শয়তান সাপ, পোষ মানানো অসম্ভব; কাজেই সাধুবাবার খবরটা কতটা সত্যি সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

আমি বললাম, 'কাল তো বিকেলে এমনিতে কোনও প্রোগ্রাম নেই, সকালে বায়ানের কেল্লা দেখে আসার পর থেকেই তো ফ্রি।'

'আপনার বুঝি সাধুসন্ন্যাসীদের উপর খুব ভক্তি?' প্রশ্নটার পিছনে বেশ একটা খোঁচা রয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি জবাবটা দিলাম খুব সরলভাবেই।

'ভক্তির কথা আর আসছে কী করে, কারণ সাধুসংসর্গের তো কোনও সুযোগই হয়নি এখন পর্যন্ত। তবে কৌতূহল যে আছে সেটা অস্বীকার করব না।'

'আমারও ছিল এককালে, কিন্তু একটা অভিজ্ঞতার পর থেকে আর...'

অভিজ্ঞতাটা হল—ধূর্জটিবাবুর নাকি ব্লাড প্রেসারের ব্যারাম, বছর দশেক আগে তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের পাল্লায় পড়ে তিনি এক সাধুবাবার দেওয়া টোটকা ওষুধ খেয়ে নাকি সাতদিন ধরে অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন, আর তার ফলে তাঁর রক্তের চাপও নাকি গিয়েছিল বেড়ে। সেই থেকে ধূর্জটিবাবুর ধারণা হয়েছে ভারতবর্ষের শতকরা নব্বুই ভাগ সাধুই হচ্ছে আসলে ভণ্ড অসাধু।

ভদ্রলোকের বাবা-বিদ্বেষটা বেশ মজার লাগছিল, তাই তাঁকে খানিকটা উসকোনোর জন্যই বললাম, 'কেউটের পোষ মানার কথা যে বলছেন, আমি আপনি পোষ মানাতে পারব না নিশ্চয়ই, কিন্তু হিমালয়ের কোনও কোনও সাধু তো শুনেছি একেবারে বাঘের গুহায় বাঘের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করে।'

'শুনেছেন তো, দেখেছেন কি?'

স্বীকার করতেই হল যে, দেখিনি।

'দেখবেন না। এ হল আষাঢ়ে গপ্পোর দেশ। শুনবেন অনেক কিছুই, কিন্তু চাক্ষুষ দেখতে চাইলে দেখতে পাবেন না। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতই দেখুন না। বলছে ইতিহাস, কিন্তু আসলে আজগুবি গপ্পোর ডিপো! রাবণের দশটা মাথা, হনুমান ল্যাজে আগুন নিয়ে লঙ্কা পুড়োচ্ছে, ভীমের অ্যাপিটাইট, ঘটোৎকচ, হিড়িম্বা, পুষ্পক রথ, কুম্ভকর্ণ—এগুলোর চেয়ে বেশি ননসেন্স আর কী আছে? আর সাধু-সন্ন্যাসীদের ভণ্ডামির কথা যদি বলেন সে তো এইসব পুরাণ থেকেই শুরু হয়েছে। অথচ সারা দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকে অ্যাদ্দিন ধরে এইসব গিলে খাচ্ছে!'

বায়ানের কেল্লা দেখে রেস্ট হাউসে ফিরে লাঞ্চ ও বিশ্রাম সেরে ইমলিবাবার ডেরায় পৌঁছতে চারটে বেজে গেল। ধূর্জটিবাবু এ ব্যাপারে আর আপত্তি করেননি। হয়তো তাঁর নিজেরও বাবা সম্পর্কে একটু কৌতূহল হচ্ছিল। জঙ্গলের মধ্যে একটা দিব্যি পরিষ্কার খোলা জায়গায় একটা বিরাট তেঁতুলগাছের

নীচে বাবার কুটির। গাছের থেকেই বাবার নামকরণ, আর সেটা করেছে স্থানীয় লোকেরা। বাবার আসল নাম কী তা কেউ জানে না।

খেজুরপাতার ঘরে একটিমাত্র চেলা সঙ্গে নিয়ে ভাল্লুকের ছালের উপর বসে আছেন বাবা। চেলাটির বয়স অল্প, বাবার বয়স কত তা বোঝার জো নেই। সূর্য ডুবতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি, কিন্তু তেঁতুলপাতার ঘন ছাউনির জন্য এ জায়গাটা এখনই বেশ অন্ধকার। কুটিরের সামনে ধুনি জ্বলছে, বাবার হাতে গাঁজার কলকে। ধুনির আলোতেই দেখলাম কুটিরের একপাশে একটা দড়ি টাঙানো, তাতে একটা গামছা আর একটা কৌপীন ছাড়া ঝোলানো রয়েছে গোটা দশেক সাপের খোলস।

আমাদের দেখে বাবা কল্‌কের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলেন। ধূর্জটিবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'বৃথা সময় নষ্ট না করে আসল প্রসঙ্গে চলে যান। দুধ খাওয়ার সময়টা কখন জিজ্ঞেস করুন।'

'আপ বালকিষণসে মিল্‌না চাহ্‌তে হেঁ?'

ইমলিবাবা আশ্চর্য উপায়ে আমাদের মনের কথা জেনে ফেলেছেন। কেউটের নাম যে বালকিষণ সেটা আমাদের জিপের ড্রাইভার দীনদয়াল কিছুক্ষণ আগেই আমাদের বলেছে। ইমলিবাবাকে বলতেই হল যে, আমরা তাঁর সাপের কথা শুনেছি, এবং পোষা সাপের দুধ খাওয়া দেখতে আমাদের ভারী আগ্রহ। সে সৌভাগ্য হবে কি?

ইমলিবাবা আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। বললেন, বালকিষণ রোজই সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাবার ডাক শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে কুটিরে এসে দুধ খেয়ে যায়, দু'দিন আগে পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু গতকাল থেকে তার শরীরটা নাকি তেমন ভাল নেই। আজ পূর্ণিমা, আজও সে আসবে না। আসবে আবার কাল থেকে।

সাপের শরীর খারাপ হয় এ খবরটা আমার কাছে নতুন। তবে পোষা তো—হবে নাই বা কেন! গোরু ঘোড়া কুকুর ইত্যাদির জন্য তো হাসপাতালই আছে।

বাবার চেলা আরও একটা খবর দিল। একে তো শরীর খারাপ, তার উপর কিছু কাঠ পিঁপড়ে নাকি তার গর্তে ঢুকে বালকিষণকে বেশ কাবু করে ফেলেছিল। সেইসব পিঁপড়ে নাকি বাবার অভিশাপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। কথাটা শুনে ধূর্জটিবাবু আমার দিকে আড়চোখে চাইলেন। আমি কিন্তু ইমলিবাবার দিকেই দেখছিলাম। চেহারায় তেমন কোনও বিশেষত্ব নেই। পরনে সাধারণ একটা গেরুয়া আলখাল্লা। মাথায় জটা আছে, কিন্তু তাও তেমন জবড়জং কিছু নয়। দু'কানে দুটো লোহার মাকড়ি, গলায় গোটা চারেক ছোট-বড় মালা, ডান কনুইয়ের উপরে একটা তাবিজ। অন্য পাঁচটা সাধুবাবার সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই। কিন্তু তাও সন্ধ্যার পড়ন্ত আলোয় ধুনির পিছনে বসা লোকটার দিক থেকে কেন জানি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেখে চেলাটি দুটো চাটাই বার করে এনে বাবার হাত দশেক দূরে বিছিয়ে দিল। কিন্তু বাবার পোষা কেউটেকেই যখন দেখা যাবে না তখন আর বসে কী হবে? বেশি দেরি করলে আবার ফিরতে রাত হয়ে যাবে। গাড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা, আর আশেপাশে জন্তু-জানোয়ারেরও অভাব নেই। হরিণের পাল তো রোজই দেখছি। তাই শেষ পর্যন্ত আর বসলাম না। বাবাকে নমস্কার করতে তিনি মুখ থেকে কলকে না সরিয়ে চোখ বুজে মাথা হেঁট করে প্রতিনমস্কার জানালেন। আমরা দু'জনে শ'খানেক গজ দূরে রাস্তার ধারে রাখা জিপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। কিছু আগেও চারিদিকের গাছগুলো থেকে বাসায়-ফেরা পাখির কলরব শুনতে পাচ্ছিলাম, এখন সব নিস্তব্ধ।

কুটির থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গিয়ে ধূর্জটিবাবু হঠাৎ থেমে বললেন, 'সাপটা না হয় নাই দেখা গেল, তার গর্তটা অন্তত একবার দেখতে চাইলে হত না?'

আমি বললাম, 'তার জন্য তো ইমলিবাবার কাছে যাবার কোনও দরকার নেই, আমাদের ড্রাইভার দীনদয়াল তো বলছিল ও গর্তটা দেখেছে।'

'ঠিক কথা।'

গাড়ি থেকে দীনদয়ালকে নিয়ে আমরা আবার ফিরে এলাম। এবার কুটিরের দিকে না গিয়ে একটা বাদাম গাছের পাশ দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা পথ ধরে খানিকদূর এগিয়ে যেতেই সামনে একটা কাঁটাঝোপ পড়ল। আশেপাশে পাথরের টুকরো পড়ে থাকতে দেখে মনে হল এককালে এখানে হয়তো একটা

দালান জাতীয় কিছু ছিল। দীনদয়াল বলল ওই ঝোপটার ঠিক পিছনেই নাকি সাপের গর্ত। এমনি দেখে কিছু বোঝার নেই, কারণ আলো আরও কমে এসেছে। ধূর্জটিবাবু তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট টর্চ বার করে ঝোপের ওপর আলো ফেলতেই পিছনে গর্তটা দেখা গেল। যাক, গর্তটা তা হলে সত্যিই আছে। কিন্তু সাপ? সে কি আর অসুস্থ অবস্থায় আমাদের কৌতূহল মেটানোর জন্য বাইরে বেরোবে? সত্যি বলতে কি, সাধুবাবার হাতে কেউটের দুধ খাওয়া দেখার বাসনা থাকলেও সেই কেউটের গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দর্শন করার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ধূর্জটিবাবুর কৌতূহল দেখলাম আমার চেয়েও বেশি। আলোয় যখন কাজ হল না তখন ভদ্রলোক মাটি থেকে ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো ঝোপের ওপর ফেলতে আরম্ভ করলেন।

এই বাড়াবাড়িটা আমার ভাল লাগল না। বললাম, 'কী হল মশাই? আপনার দেখি রোখ চেপে গেছে। আপনি তো বিশ্বাসই করছিলেন না যে সাপ আছে।'

ভদ্রলোক এবার একটা বেশ বড় ঢেলা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'এখনও করছি না। এই ঢেলাতেও যদি ফল না হয় তা হলে বুঝব বাবাজি সম্বন্ধে এক শ্রেফ গাঁজাখুরি গল্প প্রচার করা হয়েছে। লোকের ভুল বিশ্বাস যত ভাঙানো যায় ততই মঙ্গল।

ঢেলাটা একটা ভারী শব্দ করে ঝোপের উপর পড়ে কাঁটাসমেত পাতাগুলোকে তছনছ করে দিল। ধূর্জটিবাবু টর্চটা ধরে আছেন গর্তের উপর। কয়েক মুহূর্ত সব চুপ—কেবল বনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ঝিঁঝি সবেমাত্র ডাকতে আরম্ভ করেছে। এবার তার সঙ্গে আরেকটা শব্দ যোগ হল। একটা শুকনো সুরহীন শিসের মতো শব্দ। তারপর পাতার খস্‌খসানি, আর তারপর টর্চের আলোয় দেখা গেল একটা কালো মসৃণ জিনিসের খানিকটা। সেটা নড়ছে, সেটা জ্যান্ত, আর ক্রমেই সেটা গর্তের বাইরে বেরিয়ে আসছে।

এবার ঝোপের পাতা নড়ে উঠল, আর তার পরমুহূর্তেই তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা সাপের মাথা। টর্চের আলোয় দেখলাম কেউটের জ্বলজ্বলে চোখ, আর তার দু'ভাগে চেরা জিভ, যেটা বারবার

মুখ থেকে বেরিয়ে এসে লিকলিক্ করে আবার সুড়ুত করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। দীনদয়াল কিছুক্ষণ থেকেই জিপে ফিরে যাবার জন্য তাগাদা করছিল, এবার ধরা গলায় অনুনয়ের সুরে বলল, 'ছোড় দিজিয়ে বাবু!—আব্ তো দেখ লিয়া, আব্ ওয়াপস চলিয়ে।'

টর্চের আলোর জন্যই বোধহয় বালকিষণ এখনও মাথাটা বার করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে জিভ বার করছে। আমি সাপ দেখেছি অনেক, কিন্তু এত কাছ থেকে এভাবে কালকেউটে কখনও দেখিনি। আর কেউটে আক্রমণের চেষ্টা না করে চুপচাপ চেয়ে রয়েছে, এরকমও তো কখনও দেখিনি। হঠাৎ টর্চের আলোটা কেঁপে উঠে সাপের উপর থেকে সরে গেল। তারপর যে কাণ্ডটা ঘটল সেটার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ধূর্জটিবাবু হঠাৎ একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে চোখের নিমেষে সেটা বালকিষণের মাথার দিকে তাগ করে ছুড়ে মারলেন। আর তারপরেই পর পর আরও দুটো। একটা বিশ্রি আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে আমি বলে উঠলাম, 'আপনি এটা কী করলেন ধূর্জটিবাবু!'

ভদ্রলোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চাপা গলায় বেশ উল্লাসের সঙ্গেই বললেন, 'ওয়ান কেউটে লেস!'

দীনদয়াল হাঁ করে বিস্ফারিত চোখে ঝোপটার দিকে চেয়ে আছে। ধূর্জটিবাবুর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে আমিই এবার গর্তের উপর আলো ফেললাম। বালকিষণের অসাড় দেহের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ঝোপের পাতায় লেগে রয়েছে সাপের মাথা থেকে ছিটকিয়ে বেরোনো খানিকটা রক্ত।

এর মধ্যে কখন যে ইমলিবাবা আর তার চেলা এসে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে তা বুঝতেই পারিনি। ধূর্জটিবাবুই প্রথম পিছন ফিরলেন। তারপর আমিও ঘুরে দেখি বাবা হাতে একটি যষ্টি নিয়ে আমাদের থেকে হাত দশেক দূরে একটা বেঁটে খেজুর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ধূর্জটিবাবুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। বাবা যে এত লম্বা সেটা বসা অবস্থায় বুঝতে পারিনি। আর তাঁর চোখের চাহনির বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, বিস্ময়, ক্রোধ আর বিদ্বেষ মেশানো এমন চাহনি আমি কারও চোখে দেখিনি।

বাবার ডান হাতটা এবার সামনের দিকে উঠে এল। এখন সেটা নির্দেশ করছে ধূর্জটিবাবুর দিকে। হাতের তর্জনীটা এবার সামনের দিকে বেরিয়ে এসে নির্দেশটা আরও স্পষ্ট হল। এই প্রথম দেখলাম বাবার আঙুলের এক-একটা নখ প্রায় দু' ইঞ্চি লম্বা। কার কথা মনে পড়ছে বাবাকে দেখে? ছেলেবেলায় দেখা বিডন স্ট্রিটে আমার মামাবাড়ির দেয়ালে টাঙানো রবি বর্মার আঁকা একটা ছবি। দুর্বাসা মুনি অভিশাপ দিচ্ছেন শকুন্তলাকে। ঠিক এইভাবে হাত তোলা, চোখে ঠিক এই চাহনি।

কিন্তু অভিশাপের কথা কিছু বললেন না ইমলিবাবা। তাঁর গম্ভীর চাপা গলায় হিন্দিতে তিনি যা বললেন তার মানে হল—একটা বালকিষণ গেছে তাতে কী হল? আরেকটা আসবে। বালকিষণের মৃত্যু নেই। বালকিষণ অমর।

ধূর্জটিবাবু তাঁর ধুলোমাখা হাত রুমালে মুছে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'চলুন।' বাবার চেলা এসে গর্তের মুখ থেকে কেউটের মৃতদেহটা বার করে নিল—বোধহয় তার সৎকারের ব্যবস্থার জন্য। সাপের দৈর্ঘ্য দেখে আমার মুখ থেকে আপনা থেকেই একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। কেউটে যে এত লম্বা হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। ইমলিবাবা ধীরে ধীরে তাঁর কুটিরের দিকে চলে গেলেন। আমরা তিনজন গিয়ে জিপে উঠলাম।

রেস্ট হাউসে ফেরার পথে ধূর্জটিবাবুকে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে তাঁকে একটা কথা না বলে পারলাম না। বললাম, 'সাপটা যখন লোকটার পোষা, আর আপনার কোনও অনিষ্টও করছিল না, তখন ওটাকে মারতে গেলেন কেন?'

ভেবেছিলাম ভদ্রলোক বুঝি সাপ আর সাধুদের আরও কিছু কড়া কথা শুনিয়ে নিজের কুকীর্তি সমর্থন করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু তিনি সেসব কিছুই না করে উলটে আমাকে একটা সম্পূর্ণ অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন—

'খগম কে বলুন তো মশাই, খগম?'

খগম? নামটা আবছা আবছা চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় শুনেছি বা পড়েছি মনে পড়ল না।

ধূর্জটিবাবু আরও বার দু-এক আপনমনে খগম খগম করে শেষটায় চুপ করে গেলেন। রেস্ট হাউসে যখন পৌঁছলাম তখন সাড়ে ছ'টা বাজে। ইমলিবাবার চেহারাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ছে—দুর্বাসার মতো চোখ পাকিয়ে হাত তুলে রয়েছেন ধূর্জটিবাবুর দিকে। ভদ্রলোকের কেন যে এমন মতিভ্রম হল কে জানে! তবে মন বলছে, ঘটনার শেষ দেখে এসেছি আমরা, কাজেই ও নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। বাবা নিজেই বলেছেন বালকিষণের মৃত্যু নেই। ভরতপুরের জঙ্গলে কি আর কেউটে নেই? কালকের মধ্যে নিশ্চয়ই বাবার চেলা-চামুণ্ডারা আরেকটা কেউটে ধরে এনে বাবাকে উপহার দেবে।

ডিনারে লছমন মুরগির কারি রেঁধেছিল, আর তার সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা হাতের রুটি আর উরুৎকা ডাল। সারাদিনের ঘোরাফেরার পর খিদেটা দিব্যি হয়। কলকাতায় রাত্রে যা খাই তার ডবল খেয়ে ফেলি অক্লেশে। ধূর্জটিবাবু ছোটখাট মানুষ হলে কী হবে—তিনিও বেশ ভালই খেতে পারেন। কিন্তু আজ যেন মনে হল ভদ্রলোকের খিদে নেই। শরীর খারাপ লাগছে কিনা জিজ্ঞেস করাতে কিছু বললেন না। আমি বললাম, 'আপনি কি বালকিষণের কথা ভেবে আক্ষেপ করছেন?'

ধূর্জটিবাবু আমার কথায় মুখ খুললেন বটে, কিন্তু যা বললেন সেটাকে আমার প্রশ্নের উত্তর বলা চলে না। পেট্রোম্যাক্সের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গলাটাকে ভীষণ সরু আর মোলায়েম করে বললেন, 'সাপটা ফিস্‌ফিস্ করছিল...ফিস্‌ফিস্...করছিল...'

আমি হেসে বললাম, 'ফিস্‌ফিস্, না ফোঁস ফোঁস?'

ধূর্জটিবাবু আলোর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, ফিস্‌ফিস্।... সাপের ভাষা সাপের শিস, ফিস্‌ফিস্ ফিস্‌ফিস্...'

কথাটা বলে ভদ্রলোক নিজেই জিভের ফাঁক দিয়ে সাপের শিসের মতো শব্দ করলেন কয়েকবার। তারপর আবার ছড়া কাটার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'সাপের ভাষা সাপের শিস, ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্! বালকিষণের বিষম বিষ, ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্!...এটা কি? ছাগলের দুধ?'

শেষ কথাটা অবিশ্যি ছড়ার অংশ নয়। সেটা হল সামনে প্লেটে রাখা পুডিংকে উদ্দেশ্য করে।

লছমন শুধু দুধটা বুঝে ছাগল-টাগল না বুঝে বলল, 'হাঁ বাবু, দুধ হ্যায় আউর অ্যান্ডে ভি হ্যায়।'

দুধ আর ডিম দিয়ে যে পুডিং হয় সে কে না জানে?

ধূর্জটিবাবু লোকটা স্বভাবতই একটু খামখেয়ালি ও ছিটগ্রস্ত, কিন্তু ওঁর আজকের হাবভাবটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল। তিনি নিজেই হয়তো সেটা বুঝতে পেরে যেন জোর করেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বড় বেশি রোদে ঘোরা হয়েছে ক'দিন, তাই বোধহয় মাথাটা...কাল থেকে একটু সাবধান হতে হবে।'

আজ শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে, তাই খাবার পরে আর বাইরে না বসে ঘরে গিয়ে আমার সুটকেসটা গোছাতে লাগলাম। কাল সন্ধ্যার ট্রেনে ভরতপুর ছাড়ব। মাঝরাত্তিরে সওয়াই মাধোপুরে চেঞ্জ, ভোর পাঁচটায় জয়পুর পৌঁছনো।

অন্তত এটাই ছিল আমার প্ল্যান। কিন্তু সে প্ল্যান ভেস্তে গেল। মেজদাকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিতে হল যে, অনিবার্য কারণে যাওয়া একদিন পিছিয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হল সেটাই এখন বলতে চলেছি। ঘটনাগুলো যথাসম্ভব স্পষ্ট ও অবিকলভাবে বলতে চেষ্টা করব। এ ঘটনা যে সকলে বিশ্বাস করবে না সেটা জানি। প্রমাণ যাতে হতে পারত, সে জিনিসটা ইমলিবাবার কুটিরের পঞ্চাশ হাত উত্তরে হয়তো এখনও মাটিতে পড়ে আছে। সেটার কথা ভাবলেও আমার গা শিউরে ওঠে, কাজেই সেটা প্রমাণ হিসেবে হাতে করে তুলে নিয়ে আসতে পারিনি তাতে আর আশ্চর্য কী? যাক গে—এখন ঘটনায় আসা যাক।

সুটকেস গুছিয়ে, লণ্ঠনটাকে কমিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আড়ালে রেখে, রাতের পোশাক পরে বিছানায় উঠতে যাব, এমন সময় পুব দিকের দরজায় টোকা পড়ল। এই দরজার পিছনেই ধূর্জটিবাবুর ঘর।

দরজা খুলতেই ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, 'আপনার কাছে ফ্লিট জাতীয় কিছু আছে? কিংবা মশা তাড়ানোর অন্য কোনও ওষুধ?'

আমি বললাম, 'মশা এল কোত্থেকে? আপনার ঘরের দরজা-জানলায় জাল দেওয়া নেই?'

'তা আছে।'

'তবে?'

'তাও কী যেন কামড়াচ্ছে।'

'সেটা টের পাচ্ছেন আপনি?'

'হাতে মুখে দাগ হয়ে যাচ্ছে।'

দরজার মুখটায় অন্ধকার, তাই ভদ্রলোকের চেহারাটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। বললাম, 'আসুন ভিতরে। দেখি কী দাগ হল।'

ধূর্জটিবাবু ঘরের ভিতরে এলেন। লণ্ঠনটা সামনে তুলে ধরতেই দাগগুলো দেখতে পেলাম। রুহিতন মার্কা কালসিটের মতো দাগ। এ জিনিস আগে কখনও দেখিনি, আর দেখে মোটেই ভাল লাগল না। বললাম, 'বিদ্‌ঘুটে ব্যারাম বাধিয়েছেন। অ্যালার্জি থেকে হতে পারে। কাল সকালে উঠেই ডাক্তারের খোঁজ করতে হবে। আপনি বরং ঘুমোতে চেষ্টা করুন। ও নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। আর এটা পোকার ব্যাপার নয়, অন্য কিছু। যন্ত্রণা হচ্ছে কী?'

'উঁহুঁ।'

'তাও ভাল। যান, শুয়ে পড়ুন।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন, আর আমিও বিছানায় উঠে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়লাম, রাত্রে ঘুমোবার আগে বিছানায় শুয়ে বই পড়ার অভ্যাস, এখানে লণ্ঠনের আলোয় সেটা আর পড়া সম্ভব হচ্ছে না। আর সত্যি বলতে কি, সেটার প্রয়োজনও নেই। সারাদিনের ক্লান্তির পর বালিশে মাথা দেবার দশ মিনিটের মধ্যে ঘুম এসে যায়।

কিন্তু আজ আর সেটা হল না। একটা গাড়ির শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল। সাহেবের গলা শুনতে পাচ্ছি, আর একটা অচেনা কুকুরের ডাক। টুরিস্ট এসেছে রেস্ট হাউসে। কুকুরটা ধমক খেয়ে চেঁচানো থামাল। সাহেবরাও বোধহয় ঘরে ঢুকে পড়েছে। আবার সব নিস্তব্ধ। কেবল বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে! না, শুধু ঝিঁঝি নয়। তা ছাড়াও আরেকটা শব্দ পাচ্ছি। আমার পুব দিকের প্রতিবেশী এখনও সজাগ। শুধু সজাগ নয়, সচল। তার পায়ের শব্দ পাচ্ছি। অথচ দরজার তলার ফাঁক দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি লণ্ঠনটা হয় নিভিয়ে দেওয়া হল না হয় পাশের বাথরুমে রেখে আসা হল। অন্ধকার ঘরে ভদ্রলোক পায়চারি করছেন কেন?

এই প্রথম আমার সন্দেহ হল যে, ভদ্রলোকের মাথায় হয়তো ছিটেরও একটু বেশি কিছু আছে। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র দু'দিনের। তিনি নিজে যা বলেছেন তার বাইরে তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত, যাকে পাগলামো বলে, তার কিন্তু কোনও লক্ষণ আমি ধূর্জটিবাবুর মধ্যে দেখিনি। দীগ আর বায়ানের কেল্লা দেখতে দেখতে তিনি যে ধরনের কথাবার্তা বলছিলেন তাতে মনে হয় ইতিহাসটা তাঁর বেশ ভালভাবেই পড়া আছে। শুধু তাই নয়, আর্ট সম্বন্ধেও যে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে সেটার প্রমাণও তিনি তাঁর কথাবার্তায় দিয়েছেন। রাজস্থানের স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলমান কারিগরদের কাজের কথা তিনি রীতিমত উৎসাহের সঙ্গে বলছিলেন। নাঃ— ভদ্রলোকের শরীরটাই বোধহয় খারাপ হয়েছে। কাল একজন ডাক্তারের খোঁজ করা অবশ্যকর্তব্য।

আমার ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে তখন বলছে পৌনে এগারোটা। পুবের দরজায় আবার টোকা পড়ল। এবার বিছানা থেকে না উঠে একটা হাঁক দিলাম।—

'কী ব্যাপার ধূর্জটিবাবু?'

'শ্‌-শ্‌-শ্‌-শ্‌...'

'কী বলছেন?'

'শ্‌-শ্‌-শ্‌-শ্‌...'

বুঝলাম ভদ্রলোকের কথা আটকে গেছে। এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি! আবার বললাম, 'কী বলছেন ঠিক করে বলুন।'

'শ্‌-শ্‌-শ—শুনবেন একটু?'

অগত্যা উঠলাম। দরজা খুলতে ভদ্রলোক এমন একটা ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করলেন যে, আমার বেশ বিরক্তই লাগল।

'আচ্ছা স-স্-স্-সাপ কি দন্ত্য স?'
আমি আমার বিরক্তি লুকোবার কোনও চেষ্টা করলাম না।
'আপনি এইটে জানবার জন্য এত রাত্রে দরজা ধাক্কালেন?'
'দন্ত্য স?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ। সাপ মানে যখন সর্প, স্নেক, তখন দন্ত্য স।'
'আর তালব্য শ?'
'সেটা অন্য শাপ। তার মানে—'
'—অভিশাপ।'
'হ্যাঁ, অভিশাপ।'
'থ্যাঙ্ক ইউ। শ্‌শ্‌শ্‌-শুয়ে পড়ুন।'

ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে আমার একটু একটু মায়া হচ্ছিল। বললাম, 'আপনাকে বরং একটু ঘুমের ওষুধ দিই। ও জিনিসটা আছে আমার কাছে। খাবেন?'

'না। শ্‌শ্‌শ্‌-শীতকালে এমনিতেই ঘুমোই। শ্‌-শ্‌-শুধু স্‌-স্‌ সন্ধ্যায় স্‌-স্‌-সূর্যাস্তের স্‌-স্‌ সময়—'

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনার জিভে কিছু হয়েছে নাকি? কথা আটকে যাচ্ছে কেন? আপনার টর্চটা একবার দিন তো।'

ভদ্রলোকের পিছন পিছন আমিও ওঁর ঘরে ঢুকলাম। টর্চটা ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা ছিল। সেটা জ্বেলে ভদ্রলোকের মুখের সামনে ধরতেই তিনি হাঁ করে জিভটা বার করে দিলেন। জিভে কিছু যে একটা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটু সরু লাল দাগ ডগা থেকে শুরু করে জিভের মাঝখান পর্যন্ত চলে গেছে।

'এটাতেও কোনও যন্ত্রণা নেই বলছেন?'
'কই, না তো।'

কী যে ব্যারাম বাধিয়ে বসেছেন ভদ্রলোক সেটা আমার বোঝার সাধ্য নেই।

এবারে ভদ্রলোকের খাটের দিকে চোখ গেল। বিছানার পরিপাটি ভাব দেখে বুঝলাম তিনি এখনও পর্যন্ত খাটে ওঠেননি। বেশ কড়া সুরে বললাম, 'আপনাকে শুতে দেখে তারপর আমি নিজের ঘরে যাব। আর জোড়হাত করে অনুরোধ করছি আর দরজা ধাক্কাবেন না। কাল ট্রেনে ঘুম হবে না জানি, তাই আজকের রাতটা ঘুমিয়ে নিতে চাই।'

ভদ্রলোক কিন্তু খাটের দিকে যাবার কোনওরকম আগ্রহ দেখালেন না। লণ্ঠনটা বাথরুমে রাখা হয়েছে, তাই ঘরে প্রায় আলো নেই বললেই চলে। বাইরে পূর্ণিমার চাঁদ; উত্তরের জানলা দিয়ে ঘরের মেঝেতে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, তারই প্রতিফলিত আলোয় ধূর্জটিবাবুকে দেখতে পাচ্ছি। স্লিপিং সুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর মাঝে মাঝে ঠোঁট ফাঁক করে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করছেন। আমি আসবার সময় কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে এসেছি, অথচ ধূর্জটিবাবু দিব্যি গরমটরম কিচ্ছু না পরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক শেষটায় যদি সত্যিই একটা গোলমেলে ব্যারাম বাধিয়ে বসেন তা হলে তো তাঁকে ফেলে আমার পক্ষে যাওয়াও মুশকিল হবে। বিদেশে বিভুঁইয়ে একজন বাঙালি বিপদে পড়লে আরেকজন তার জন্য কিছু না করে সরে পড়বে, এ তো হতে পারে না।

আরেকবার তাঁকে বিছানায় শুতে বলেও যখন কোনও ফল হল না তখন বুঝলাম ওঁর হাতটা ধরে টেনে নিয়ে জোর করে শুইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। তিনি যদি অবাধ্য শিশু হতে চান, আমাকে তাঁর গুরুজনের ভূমিকা নিতেই হবে।

কিন্তু তাঁর হাতটা ধরামাত্র আমার শরীরে এমন একটা প্রতিক্রিয়া হল যে, আমি চমকে তিন হাত পিছিয়ে গেলাম।

ধূর্জটিবাবুর শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা। জ্যান্ত মানুষের শরীর এত ঠাণ্ডা হতে পারে এ আমি কল্পনাই করতে পারিনি।

আমার অবস্থা দেখেই বোধহয় ধূর্জটিবাবুর ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ভাব ফুটে উঠল। তাঁর কটা চোখ দিয়ে তিনি এখন আমার দিকে চেয়ে মিচকি মিচকি হাসছেন। আমি ধরা গলায় বললাম, 'আপনার

কী হয়েছে বলুন তো!'

ধূর্জটিবাবু আমার দিক থেকে চোখ সরালেন না। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন প্রায় মিনিট খানেক ধরে। অবাক হয়ে দেখলাম যে, একটিবারও তাঁর চোখের পাতা পড়ল না। এরই মধ্যে তাঁর জিভটা বার কয়েক ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরোল। তারপর তিনি ফিস্‌ফিস্‌ গলায় বললেন, 'বাবা ডাকছেন—বালকিষণ! বালকিষণ!...বাবা ডাকছেন...'

তারপর ভদ্রলোকের হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। তিনি প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর শরীরটাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ের উপর ভর করে নিজেকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে খাটের তলায় অন্ধকারে চলে গেলেন।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে, হাত পা ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ভদ্রলোক সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা কেটে গিয়ে এখন যেটা অনুভব করছি সেটা অবিশ্বাস আর আতঙ্কে মেশানো একটা অদ্ভুত ভয়াবহ ভাব।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

দরজাটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর কাঁপুনিটা কমল, চিন্তাটা একটু পরিষ্কার হল। ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং চোখের সামনে যা ঘটতে দেখেছি তা থেকে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় সেটা একবার ভেবে দেখলাম। আজ বিকেলে আমার সামনে ধূর্জটিবাবু ইমলিবাবার পোষা কেউটেকে পাথরের ঘায়ে মেরে ফেললেন। তারপরেই ইমলিবাবা ধূর্জটিবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—একটা বালকিষণ গেছে, তার জায়গায় আরেকটা বালকিষণ আসবে। সেই দ্বিতীয় বালকিষণ কি সাপ, না মানুষ?

না কি সাপ-হয়ে-যাওয়া মানুষ?

ধূর্জটিবাবুর সর্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগগুলো কী?

জিভের দাগটা কী?

সেটা কি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবার আগের অবস্থা?

তাঁর শরীর এত ঠাণ্ডা কেন?

তিনি খাটে না শুয়ে খাটের তলায় ঢুকলেন কেন?

হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকের মতো একটা জিনিস মনে পড়ে গেল। খগম! ধূর্জটিবাবু জিজ্ঞেস করছিলেন খগমের কথা। নামটা চেনা চেনা লাগছিল, কিন্তু বুঝতে পারিনি। এখন মনে পড়ে গেছে। ছেলেবেলায় পড়া মহাভারতের একটা গল্প। খগম নামে এক তপস্বী ছিলেন। তাঁর শাপে তাঁর বন্ধু সহস্রপাদ মুনি ঢোঁড়া সাপ হয়ে যান। খগম—সাপ—শাপ...সব মিলে যাচ্ছে। তবে তিনি হয়ে ছিলেন ঢোঁড়া, আর ইনি কী—?

আমার দরজায় আবার কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। উপরদিকে নয়, তলার দিকে। চৌকাঠের ঠিক উপরে। একবার, দু'বার, তিনবার। আমি বিছানা থেকে নড়লাম না। দরজা আমি খুলব না। আর না!

আওয়াজ বন্ধ হল, আমি দমবন্ধ করে কান পেতে আছি। এবার কানে এল শিসের শব্দ। দরজার কাছ থেকে ক্রমে সেটা দূরে সরে গেল। এবার আমার নিজের হৃৎস্পন্দন ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

ওটা কী? একটা চিঁ চিঁ শব্দ। একটা তীক্ষ্ণ মিহি আর্তনাদ। ইঁদুর নাকি? এখানে ইঁদুর আছে। প্রথম রাত্রেই দেখেছি আমার ঘরে। পরদিন লছমনকে বলাতে সে রান্নাঘর থেকে একটা ইঁদুর-ধরা কলে জ্যান্ত ইঁদুর দেখিয়ে নিয়ে গেল। বলল 'চুহা' তো আছেই, 'ছুছুন্দর'ও আছে।

আর্তনাদ ক্রমে মিলিয়ে এসে আবার নিস্তব্ধতা। দশ মিনিট গেল। ঘড়ি দেখলাম। পৌনে একটা। ঘুম যে কোথায় উধাও হয়েছে জানি না। জানলা দিয়ে বাইরের গাছপালা দেখা যাচ্ছে। চাঁদ বোধহয় ঠিক মাথার উপরে।

একটা দরজা খোলার শব্দ। পাশের ঘরে ধূর্জটিবাবু বারান্দায় যাবার দরজাটা খুলেছেন। আমার ঘরের যেদিকে জানলা বারান্দায় যাবার দরজাও সেইদিকে। ধূর্জটিবাবুর ঘরেও তাই। বারান্দা থেকে নেমে বিশ হাত গেলেই গাছপালা শুরু হয়।

ধূর্জটিবাবু বারান্দায় বেরিয়েছেন। কোথায় যাচ্ছেন তিনি? কী মতলব তাঁর? আমি একদৃষ্টে জানলার দিকে চেয়ে রইলাম।

শিসের শব্দ পাচ্ছি। সেটা ক্রমশ বাড়ছে। এবার সেটা ঠিক আমার জানলার বাইরে। জানলাটা ভাগ্যিস জালে ঢাকা, নইলে...

একটা কী যেন জিনিস জানলার তলার দিক থেকে ওপরে উঠছে। খানিকটা উঠে থেমে গেল। একটা মাথা। লণ্ঠনের আবছা আলোয় দুটো জ্বলজ্বলে কটা চোখ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চোখ দুটো আমার দিকে চেয়ে আছে।

প্রায় মিনিটখানেক এইভাবে থাকার পর একটা কুকুরের ডাক শোনামাত্র মাথাটা বাঁ দিকে ঘুরে পরক্ষণেই আবার নীচের দিকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুকুরটা ডাকছে। পরিত্রাহি চিৎকার। এবার একটা ঘুম-জড়ানো সাহেবি গলায় ধমকের আওয়াজ পেলাম। একটা কাতর গোঙানির সঙ্গে কুকুরের ডাকটা থেমে গেল। তারপর আর কোনও শব্দ নেই। আমি মিনিট দশেক ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রেখে শুয়ে রইলাম। কানের মধ্যে আজই রাত্রে শোনা একটা ছড়া বারবার ফিরে ফিরে আসছে—

সাপের ভাষা সাপের শিস
ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস!
বালকিষণের বিষম বিষ
ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস!

ক্রমে সেই ছড়াটাও মিলিয়ে এল। বুঝতে পারলাম একটা ঝিমঝিমে অবসন্ন ভাব আমাকে ঘুমের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমটা ভাঙল সাহেবদের চেঁচামেচিতে। ঘড়িতে দেখি ছ'টা বাজতে দশ। কিছু একটা গণ্ডগোল বেধেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গায়ে একটা গরম কাপড় চাপিয়ে বাইরে এসে শ্বেতাঙ্গ আগন্তুকদের সাক্ষাৎ পেলাম। দুই যুবক, আমেরিকান—ডাকনাম ব্রুস আর মাইকেল— তাদের পোষা কুকুরটা কাল রাত্রে মারা গেছে। কুকুরটাকে নিজেদের ঘরেই নিয়ে শুয়েছিল, তবে ঘরের দরজা বন্ধ করেনি। ওরা সন্দেহ করছে রাত্রে বিছে বা সাপ জাতীয় বিষাক্ত কিছু এসে কামড়ানোর ফলে এই দশা। মাইকেলের ধারণা কাঁকড়াবিছে, কারণ শীতকালে সাপ বেরোয় না সেটা সকলেই জানে।

আমি আর কুকুরের উপর সময় নষ্ট না করে বারান্দার উলটো দিকে ধূর্জটিবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। দরজা খোলা রয়েছে, ঘরের মালিক ঘরে নেই। লছমন রোজ ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল গরম করে। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল ধূর্জটিবাবুকে দেখেনি।

নানারকম আশঙ্কা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। যে করে হোক ভদ্রলোককে খুঁজে বার করতেই হবে। পায়ে হেঁটে আর কতদূর যাবেন তিনি! কিন্তু চারপাশের জঙ্গলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

সাড়ে দশটায় জিপ এল। আমি ড্রাইভারকে বললাম পোস্ট অফিস যাব—জয়পুরে টেলিগ্রাম করতে হবে। ধূর্জটিবাবুর রহস্য সমাধান না করে ভরতপুর ছাড়া যাবে না।

মেজদাকে টেলিগ্রাম করে, ট্রেনের টিকিট একদিন পিছিয়ে, রেস্ট হাউসে ফিরে এসে শুনলাম তখনও পর্যন্ত ধূর্জটিবাবুর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আমেরিকান দুটি তাদের মরা কুকুরটাকে কবর দিয়ে এর মধ্যেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে উধাও।

সারা দুপুর রেস্ট হাউসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করলাম। জিপটা আমার আদেশ মতোই আবার বিকেলে এসে হাজির হল। একটা মতলব ছিল মাথায়; মন বলছিল সেটায় হয়তো ফল হবে। ড্রাইভারকে বললাম, 'ইমলিবাবার কাছে চলো।'

কাল যেমন সময় এসেছিলাম, আজও প্রায় সেই একই সময়ে গিয়ে পৌঁছলাম বাবার কুটিরে। বাবা কালকের মতো ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। শিষ্য আজ আরও দুটি বেড়েছে, তার মধ্যে একজন মাঝবয়সি, অন্যটি ছোকরা।

বাবা আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নমস্কার জানালেন। কালকের সেই ভস্মকরা চাহনির সঙ্গে আজকের চাহনির কোনও মিল নেই। আমি আর সময় নষ্ট না করে বাবাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, আমার সঙ্গে কাল যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁর কোনও খবর তিনি দিতে পারেন কিনা। বাবার মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল। বললেন, 'খবর আছে বইকী, তোমার দোস্ত আমার আশা পূর্ণ করেছে, সে আমার বালকিষণকে আবার ফিরিয়ে এনেছে।'

এই প্রথম চোখে পড়ল বাবার ডান পাশে রাখা রয়েছে একটা পাথরের বাটি। সেই বাটিতে যে সাদা তরল পদার্থটা রয়েছে সেটা দুধ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সাপ আর দুধের বাটি দেখতে তো আর আমি এতদূর আসিনি। আমি এসেছি ধূর্জটিপ্রসাদ বসুর খোঁজে। লোকটা তো আর হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। তার অস্তিত্বের একটা চিহ্নও যদি দেখতে পেতাম তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

ইমলিবাবা মানুষের মনের কথা বুঝে ফেলতে পারেন এটা আগেও দেখেছি। গাঁজার কলকেতে বড়রকম একটা টান দিয়ে সেটা পাশের প্রৌঢ় চেলার হাতে চালান দিয়ে বললেন, 'তোমার বন্ধুকে তো তুমি আর আগের মতো ফিরে পাবে না, তবে তার স্মৃতিচিহ্ন সে রেখে গেছে। সেটা তুমি বালকিষণের ডেরার পঞ্চাশ পা দক্ষিণে পাবে। সাবধানে যেয়ো, অনেক কাঁটাগাছ পড়বে পথে।'

বাবার কথামতো গেলাম বালকিষণের গর্তের কাছে। সে গর্তে এখন সাপ আছে কিনা সেটা জানার আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আকাশে ডুবু ডুবু সূর্যের দিকে চেয়ে হিসেব করে দক্ষিণ দিক ধরে এগিয়ে গেলাম। ঘাস, কাঁটাঝোপ, পাথরের টুকরো আর চোরকাঁটার ভেতর দিয়ে গুনে গুনে পঞ্চাশ পা এগিয়ে গিয়ে একটা অর্জুন গাছের গুঁড়ির ধারে যে জিনিসটা পড়ে থাকতে দেখলাম, সেরকম জিনিস এই কয়েক মিনিট আগেই ইমলিবাবার কুটিরে দড়ি থেকে ঝুলছে দেখে এসেছি।

সেটা একটা খোলস। সারা খোলসের উপর রুহিতন মার্কা নকশা।

সাপের খোলস কী? না, তা নয়। সাপের শরীর কি এত চওড়া হয়? আর তার দু'পাশ দিয়ে কি দুটো

হাত, আর তলা দিয়ে কি একজোড়া পা বেরোয়?

আসলে এটা একটা মানুষের খোলস। সেই মানুষটা এখন আর মানুষ নেই। সে এখন ওই গর্তটার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সে জাতে কেউটে, তার দাঁতে বিষ।

ওই যে তার শিস শুরু হল। ওই যে সূর্য ডুবল। ওই যে ইমলিবাবা ডাকছে—'বালকিষণ...বালকিষণ...বালকিষণ...'

সন্দেশ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৯

বারীন ভৌমিকের ব্যারাম

কন্‌ডাকটরের নির্দেশমতো 'ডি' কামরায় ঢুকে বারীন ভৌমিক তাঁর সুটকেসটা সিটের নীচে ঢুকিয়ে দিলেন। ওটা পথে খোলার দরকার হবে না। ছোট ব্যাগটা হাতের কাছে রাখা দরকার। চিরুনি, বুরুশ, টুথ-ব্রাশ, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, ট্রেনে পড়ার জন্য হ্যাডলি চেজের বই—সবই রয়েছে ওই ব্যাগে আর আছে থ্রোট পিলস। ঠাণ্ডা ঘরে ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেলে কাল গান খুলবে না। চট করে একটা বড়ি মুখে পুরে দিয়ে বারীন ভৌমিক ব্যাগটাকে জানলার সামনে টেবিলটার উপর রেখে দিলেন।

দিল্লিগামী ভেস্টিবিউল ট্রেন, ছাড়তে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি, অথচ তাঁর কামরায় আর প্যাসেঞ্জার নেই কেন? এতখানি পথ কি তিনি একা যাবেন? এতটা সৌভাগ্য কি তাঁর হবে? এ যে একেবারে আয়েশের পরাকাষ্ঠা! অবস্থাটা কল্পনা করে বারীন ভৌমিকের গলা থেকে আপনিই একটা গানের কলি বেরিয়ে পড়ল—বাগিচায় বুলবুল তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল!

বারীন ভৌমিক জানলা দিয়ে বাইরে হাওড়া স্টেশন প্ল্যাটফর্মের জনস্রোতের দিকে চাইলেন। দুটি ছোকরা তাঁর দিকে চেয়ে পরস্পরে কী যেন বলাবলি করছে। বারীনকে চিনেছে তারা। অনেকেই চেনে। অন্তত কলকাতা শহরের, এবং অনেক বড় বড় মফস্বল শহরের অনেকেই শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর নয়, তাঁর চেহারার সঙ্গেও পরিচিত। প্রতি মাসেই পাঁচ-সাতটা ফাংশনে তাঁর ডাক পড়ে। বারীন ভৌমিক—গাইবেন নজরুলগীতি ও আধুনিক। খ্যাতি ও অর্থ—দুই-ই এখন বারীন ভৌমিকের হাতের মুঠোয়। অবিশ্যি এটা হয়েছে বছর পাঁচেক হল। তার আগে কয়েকটা বছর তাঁকে বেশ, যাকে বলে, স্ট্রাগলই করতে হয়েছে। গানের জন্য নয়। গাইবার ক্ষমতাটা তাঁর সহজাত। কিন্তু শুধু গাইলেই তো আর হয় না। তার সঙ্গে চাই কপালজোর, আর চাই ব্যাকিং। উনিশশো সাতষট্টি সালে উনিশ পল্লীর পুজো প্যান্ডেলে ভোলাদা—ভোলা বাঁড়ুজ্যে—তাঁকে দিয়ে যদি না জোর করে 'বসিয়া বিজনে' গানখানা গাওয়াতেন...

বারীন ভৌমিকের দিল্লি যাওয়াটাও এই গানেরই দৌলতে। দিল্লির বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে ফার্স্ট ক্লাসের খরচ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের জুবিলি অনুষ্ঠানে নজরুলগীতি পরিবেশনের উদ্দেশ্যে। থাকার ব্যবস্থাও অ্যাসোসিয়েশনই করবে। দু'দিন দিল্লিতে থেকে তারপর আগ্রা-ফতেপুর-সিক্রি দেখে ঠিক সাতদিন পরে আবার কলকাতায় ফিরবেন বারীন ভৌমিক। তারপর পুজো পড়ে গেলে তাঁর আর অবসর নেই; প্রহরে প্রহরে হাজিরা দিতে হবে গানের আসরে, শ্রোতাদের কানে মধুবর্ষণ করার জন্য।

'আপনার লাঞ্চের অর্ডারটা সার...'

কনডাক্‌টার গার্ড এসে দাঁড়িয়েছেন।

'কী পাওয়া যায়?' বারীন প্রশ্ন করলেন।

'আপনি নন-ভেজিটেরিয়ান তো? দিশি খাবেন না ওয়েস্টার্ন স্টাইল? দিশি হলে আপনার...'

বারীন নিজের পছন্দমতো লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে সবেমাত্র একটি থ্রিকাস্‌লস ধরিয়েছেন, এমন সময় আরেকটি প্যাসেঞ্জার এসে কামরায় ঢুকলেন, এবং ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লির গাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে তার যাত্রা শুরু করল।

নবাগত যাত্রীটির সঙ্গে চোখাচুখি হতেই তাঁকে চেনা মনে হওয়ায় বারীনের মুখে একটা হাসির আভাস দেখা দিয়ে আগন্তুকের দিক থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। বারীন কি তা হলে ভুল করলেন? ছি ছি ছি! এই অবিবেচক বোকা হাসিটার কী দরকার ছিল। কী অপ্রস্তুত! মনে পড়ল একবার রেসের মাঠে একটি ব্রাউন পাঞ্জাবি-পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোককে পিছন দিক থেকে 'কী খ্‌খবো-র ত্রিদিবদা' বলে পিঠে একটা প্রচণ্ড চাপড় মারার পরমুহূর্তেই বারীন বুঝেছিলেন তিনি আসলে ত্রিদিবদা নন। এই লজ্জাকর ঘটনার স্মৃতি তাঁকে অনেকদিন ধরে যন্ত্রণা দিয়েছিল। মানুষকে অপদস্থ করার জন্য কত রকম ফাঁদ যে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে!

বারীন ভৌমিক আরেকবার আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি দিলেন। ভদ্রলোক স্যান্ডাল খুলে সিটের ওপর পা ছড়িয়ে বসে সদ্য কেনা ইলাস্‌ট্রেটেড উইক্‌লিটা নেড়েচেড়ে দেখছেন। কী আশ্চর্য! আবার মনে হচ্ছে তিনি লোকটিকে আগে দেখেছেন। নিমেষের দেখা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশিক্ষণের দেখা। কিন্তু কবে? কোথায়? ঘন ভুরু, সরু গোঁফ, পমেড দিয়ে পালিশ করা চুল, কপালের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট আঁচিল। এ মুখ তাঁর চেনা। নিশ্চয়ই চেনা। তিনি যখন সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফে চাকরি করতেন তখনকার চেনা কি? কিন্তু এক তরফা চেনা হয় কী করে? তাঁর হাবভাব দেখে তো মনে হয় না যে, তিনি কস্মিনকালেও বারীন ভৌমিককে দেখেছেন।

'আপনার লাঞ্চের অর্ডারটা...'

আবার কনডাকটর গার্ড। বেশ হাসিখুশি হৃষ্টপুষ্ট অমায়িক ভদ্রলোকটি।

'শুনুন', আগন্তুক বললেন, 'লাঞ্চ তো হল—আগে এক কাপ চা হবে কি?'

'সার্টেনলি।'

'শুধু একটা কাপ আর লিকার দিলেই হবে। আমি র' টি খাই।'

বারীন ভৌমিকের হঠাৎ মনে হল তাঁর তলপেট থেকে নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে গিয়ে জায়গাটা একদম খালি হয়ে গেছে। আর তার পরেই মনে হল তাঁর হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ হাত-পা গজিয়ে ফুসফুসের খাঁচাটার মধ্যে লাফাতে শুরু করেছে। শুধু গলার স্বর নয়, ওই গলার স্বরে বিশেষভাবে বিশেষ জোর দিয়ে বলা শুধু একটি কথা—র টি—ব্যস। ওই একটি কথা বারীনের মনের সমস্ত অনিশ্চয়তাকে এক ধাক্কায় দূর করে দিয়ে সেই জায়গায় একটি স্থির প্রত্যয়কে এনে বসিয়ে দিয়েছে।

বারীন যে এই ব্যক্তিটিকে শুধু দেখেছেন তা নয়, তাঁর সঙ্গে ঠিক এই একইভাবে দিল্লিগামী ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরায় মুখোমুখি বসে একটানা প্রায় আটঘণ্টা ভ্রমণ করেছেন। তিনি নিজে যাচ্ছিলেন পাটনা, তাঁর আপন মামাতো বোন শিপ্রার বিয়েতে। তার তিনদিন আগে রেসের মাঠে ট্রেবল টোটে এক সঙ্গে সাড়ে সাত হাজার টাকা জিতে তিনি জীবনে প্রথমবার প্রথম শ্রেণীতে ট্রেনে চড়ার লোভ সামলাতে পারেননি। তখনও তাঁর গাইয়ে হিসেবে নাম হয়নি; ঘটনাটা ঘটে সিক্সটি-ফোরে।—ন' বছর আগে। ভদ্রলোকের পদবিটাও যেন আবছা-আবছা মনে পড়ছে। 'চ' দিয়ে। চৌধুরী? চক্রবর্তী? চ্যাটার্জি?...

কনডাকটর গার্ড লাঞ্চের অর্ডার নিয়ে চলে গেলেন। বারীন অনুভব করলেন তিনি আর এই লোকটার মুখোমুখি বসে থাকতে পারছেন না। বাইরে করিডরে গিয়ে দাঁড়ালেন, দরজার মুখ থেকে পাঁচ হাত ডাইনে, 'চ'-এর দৃষ্টির বেশ কিছুটা বাইরে। কোইন্সিডেন্সের বাংলা বারীন ভৌমিক জানেন না, কিন্তু এটা জানেন যে, প্রত্যেকের জীবনেই ও জিনিসটা বারকয়েক ঘটে থাকে। কিন্তু তা বলে এইরকম কোইন্সিডেন্স?

কিন্তু 'চ' কি তাঁকে চিনেছেন? না-চেনার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, হয়তো 'চ'-এর স্মরণশক্তি কম; দুই, হয়তো এই ন'বছর বারীনের চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের চলমান দৃশ্যের দিকে দেখতে দেখতে বারীন ভাবতে চেষ্টা করলেন, তাঁর ন'বছর আগের চেহারার সঙ্গে আজকের চেহারার কী তফাত থাকতে পারে।

ওজন বেড়েছে অনেক, সুতরাং অনুমান করা যায় তাঁর মুখটা আরও ভরেছে। আর কী? চশমা ছিল না, চশমা হয়েছে। গোঁফ? কবে থেকে গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন তিনি? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খুব বেশিদিন নয়। হাজরা রোডের সেই সেলুন। একটা নতুন ছোকরা নাপিত। দু'পাশের গোঁফ মিলিয়ে কাটতে পারল না। বারীন নিজে ততটা খেয়াল করেননি, কিন্তু আপিসের সেই গোপপে, লিফ্‌টম্যান শুকদেও থেকে শুরু করে বাষট্টি বছররে বুড়ো ক্যাশিয়ার কেশববাবু পর্যন্ত যখন সেই নিয়ে মন্তব্য করলেন তখন বারীন মরিয়া হয়ে তাঁর সাধের গোঁফটি কামিয়ে ফেলেন। সেই থেকে আর রাখেননি। এটা চার বছর আগের ঘটনা।

গোঁফ বাদ, গালে মাংসযোগ, চোখে চশমাযোগ। বারীন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার কামরায় এসে ঢুকলেন।

বেয়ারা একটা ট্রেতে চায়ের কাপ আর টি-পট 'চ'-এর সামনে পেতে দিয়ে চলে গেল। বারীনও পানীয়ের প্রয়োজন বোধ করছিলেন—ঠাণ্ডা হোক, গরম হোক—কিন্তু বলতে গিয়েও বললেন না।

যদি গলার স্বরে চিনে ফেলে!

আর চিনলে পরে যে কী হতে পারে সেটা বারীন কল্পনাও করতে চান না। অবিশ্যি সবই নির্ভর করে 'চ' কীরকম লোক তার ওপর। যদি অনিমেষদার মতো হন, তাহলে বারীন নিস্তার পেতেও পারেন। একবার বাসে একটা লোক অনিমেষদার পকেট হাতড়াচ্ছিল। টের পেয়েও লজ্জায় তিনি কিছু বলতে

পারেননি। মানিব্যাগ সমেত চারটি দশ টাকার করকরে নোট তিনি পকেটমারটিকে প্রায় একরকম দিয়েই দিয়েছিলেন। পরে বাড়িতে এসে বলেছিলেন, 'পাবলিক বাসে একগাড়ি লোকের ভিতর একটা সিন হবে, আর তার মধ্যে একটা প্রমিনেন্ট পার্ট নেব আমি—এ হতে দেওয়া যায় না।' এই লোক কি সেই রকম? না হওয়াটাই স্বাভাবিক; কারণ অনিমেষদার মতো লোক বেশি হয় না। তাছাড়া চেহারা দেখেও মনে হয় এ-লোক সে-রকম নয়। ওই ঘন ভুরু, ঠোক্কর খাওয়া নাক, সামনের দিকে বেরিয়ে থাকা থুতনি—সব মিলিয়ে মনে হয়, এ-লোক বারীনকে চিনতে পারলেই তার লোমশ হাত দিয়ে সার্টের কলারটা খামচে ধরে বলবে, 'আপনিই সেই লোক না?—যিনি সিক্সটি-ফোরে আমার ঘড়ি চুরি করেছিলেন? স্কাউন্ড্রেল! এই ন'বছর ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। আজ আমি তোমার...'

আর ভাবতে পারলেন না বারীন ভৌমিক। এই ঠাণ্ডা কামরাতেও তাঁর কপাল ঘেমে উঠেছে। রেলওয়ের রেক্সিনে মোড়া বালিশে মাথা দিয়ে তিনি সটান সিটের উপর শুয়ে পড়ে বাঁ হাতটা দিয়ে চোখটা ঢেকে নিলেন। চোখ দেখেই সবচেয়ে সহজে মানুষকে চিনতে পারা যায়। বারীনও প্রথমে চোখ দেখেই 'চ'-কে চিনতে পেরেছিলেন।

প্রত্যেকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর মনে পড়ছে। শুধু 'চ'-এর ঘড়ি চুরির ঘটনা না। সেই ছেলেবয়েসে যার যা কিছু চুরি করেছেন সব তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। একেক সময় খুবই সামান্য সে জিনিস। হয়তো একটা সাধারণ ডটপেন (মুকুলমামার), কিংবা একটা সস্তা ম্যাগনিফাইং গ্লাস (তাঁর স্কুলের সহপাঠী অক্ষয়ের), অথবা ছেনিদার একজোড়া হাড়ের কাফ-লিংকস, যেটার কোনও প্রয়োজন ছিল না বারীনের, কোনওদিন ব্যবহারও করেননি। চুরির কারণ এই যে, সেগুলো হাতের কাছে ছিল, এবং সেগুলো অন্যের জিনিস। বারো বছর বয়স থেকে শুরু করে পঁচিশ বছর পর্যন্ত কমপক্ষে পঞ্চাশটা পরের জিনিস বারীন ভৌমিক কোনও না কোনও উপায়ে আত্মসাৎ করে নিজের ঘরে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। একে চুরি ছাড়া আর কী বলা যায়? চোরের সঙ্গে তফাত শুধু এই যে, চোর চুরি করে অভাবের তাড়নায়, আর তিনি করেছেন অভ্যাসের বশে। লোকে তাঁকে কোনওদিন সন্দেহ করেনি, তাই কোনওদিন ধরা পড়তে হয়নি। বারীন জানেন যে এইভাবে চুরি করাটা একটা ব্যারাম বিশেষ। একবার কথাচ্ছলে এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে তিনি ব্যারামের নামটাও জেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন মনে পড়ছে না।

তবে ন' বছর আগে 'চ'-এর ঘড়ি নেওয়ার পর থেকে আজ অবধি এ কাজটা বারীন আর কখনও করেননি। এমনকী করার সেই সাময়িক অথচ প্রবল আকাঙ্ক্ষাটাও অনুভব করেননি। বারীন জানেন যে, এই উৎকট রোগ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

তাঁর অন্যান্য চুরির সঙ্গে ঘড়ি চুরির একটা তফাত ছিল এই যে, ঘড়িটায় তাঁর সত্যিই প্রয়োজন ছিল। রিস্টওয়াচ না; সুইজারল্যান্ডে তৈরি একটি ভারী সুন্দর ট্র্যাভেলিং ক্লক। একটা নীল চতুষ্কোণ বাক্স, তার ঢাকনাটা খুললেই ঘড়িটা বেরিয়ে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অ্যালার্ম ঘড়ি, আর সেই অ্যালার্মের শব্দ এতই সুন্দর যে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কান জুড়িয়ে যায়। এই ন'বছর সমানে সেটা ব্যবহার করেছেন বারীন ভৌমিক। তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই সঙ্গে গেছে ঘড়ি।

আজকেও সে ঘড়ি তাঁর সঙ্গেই আছে। জানলার সামনে ওই টেবিলের উপর রাখা ব্যাগের মধ্যে।

'কদ্দূর যাবেন?'

বারীন তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন। লোকটা তাঁর সঙ্গে কথা বলছে, তাঁকে প্রশ্ন করছে।

'দিল্লি।'

'আজ্ঞে?'

'দিল্লি।'

প্রথমবার অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে একটু বেশি আস্তে উত্তর দিয়ে ফেলেছিলেন বারীন।

'আপনার কি ঠাণ্ডায় গলা বসে গেল নাকি।'

'নাঃ।'

'ওটা হয় মাঝে মাঝে। অ্যাকচুয়েলি এয়ার কন্ডিশনিং-এর একমাত্র লাভ হচ্ছে ধুলোর হাত থেকে

রেহাই পাওয়া। নাহলে আমি এমনি ফার্স্ট ক্লাসেই যেতুম।'

বারীন চুপ। পারলে তিনি 'চ'-এর দিকে তাকান না, কিন্তু 'চ' তাঁর দিকে দেখছে কিনা সেটা জানার দুর্নিবার কৌতূহলই তাঁর দৃষ্টি বার বার ভদ্রলোকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'চ' নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত। অভিনয় কী? সেটা বারীন জানেন না। সেটা জানতে হলে লোকটিকে আরও ভাল করে জানা দরকার। বারীন যেটুকু জানেন সেটা তাঁর গতবারের জানা। এক হল দুধ-চিনি ছাড়া চা-পানের অভ্যাস। আরেক হল স্টেশন এলেই নেমে গিয়ে কিছু না কিছু খাবার জিনিস কিনে আনা। নোনতা জিনিস, মিষ্টি নয়। মনে আছে গতবার বারীন ভৌমিকের অনেক রকম মুখরোচক জিনিস খাওয়া হয়ে গিয়েছিল 'চ'-এর দৌলতে।

এ ছাড়া তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিক প্রকাশ পেয়েছিল পাটনা স্টেশনের কাছাকাছি এসে। এটার সঙ্গে ঘড়ির ব্যাপারটা জড়িত। তাই ঘটনাটা বারীনের স্পষ্ট মনে আছে। সেবার গাড়িটা ছিল অমৃতসর মেল। পাটনা পৌঁছবে ভোর পাঁচটায়। কন্‌ডাক্টর এসে সাড়ে চারটেয় তুলে দিয়েছেন বারীনকে। 'চ'ও আধ-জাগা, যদিও তিনি যাচ্ছেন দিল্লি। গাড়ি স্টেশনে পৌঁছবার ঠিক তিন মিনিট আগে হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। ব্যাপার কী? লাইনের উপর দিয়ে ল্যাম্প ও টর্চের ছুটোছুটি দেখে মনে হল কোনও গোলমাল বেধেছে। শেষটায় গার্ড এসে বললেন একটা বুড়ো নাকি লাইন পার হতে গিয়ে এঞ্জিনে কাটা পড়েছে। তার লাশ সরালেই গাড়ি চলবে। 'চ' খবরটা পাওয়ামাত্র ভারী উত্তেজিত হয়ে স্লিপিং সুট পরেই অন্ধকারে নেমে চলে গেলেন ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখে আসতে।

এই সুযোগেই বারীন তাঁর বাক্স থেকে ঘড়িটা বার করে নেন। সেই রাত্রেই 'চ'কে দেখেছিলেন সেটায় দম দিতে। লোভও যে লাগেনি তা নয়, তবে সুযোগের অভাব হবে জেনে ঘড়ির চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে সে সুযোগ এসে পড়তে সে-লোভ এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, বাঙ্কের উপর অন্য একটি ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জার থাকা সত্ত্বেও তিনি ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেননি। কাজটা করতে তাঁর লাগে মাত্র পনেরো-বিশ সেকেন্ড। 'চ' ফিরলেন প্রায় পাঁচ মিনিট পরে।

'হরিব্‌ল ব্যাপার! ভিখিরি। ধড় একদিকে, মুড়ো একদিকে। সামনে কাউক্যাচার থাকতে কাটা যে কেন পড়ে বুঝতে পারি না মশাই। ওটার উদ্দেশ্য তো লাইনে কিছু পড়লে সেটাকে ঠেলে বাইরে ফেলে দেওয়া!...'

পাটনায় নেমে স্টেশন থেকে বেরিয়ে মেজোমামার মোটরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বারীন ভৌমিকের তলপেটের অসোয়াস্তিটা ম্যাজিকের মতো উবে যায়। তাঁর মন বলে, ঘড়ির মালিকের সঙ্গে এতকাল যে ব্যবধান ছিল—কেউ কারুর নাম শোনেনি, কেউ কাউকে দেখেনি—গত আট ঘণ্টার আকস্মিক সান্নিধ্যের পর আবার সেই ব্যবধান এসে পড়েছে। এর পরে আবার কোনও দিন পরস্পরের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কোটিতে এক। কিংবা হয়তো তার চেয়েও কম।

কিন্তু এই তিলপ্রমাণ সম্ভাবনাই যে ন'বছর পরে হঠাৎ সত্যে পরিণত হবে সেটা কে জানত? বারীন মনে মনে বললেন, এই ধরনের ঘটনা থেকেই মানুষ কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে।

'আপনি কি দিল্লির বাসিন্দা, না কলকাতার?'

বারীনের মনে পড়ল সেবারও লোকটা তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করেছিল। এই গায়ে পড়া আলাপ করার বাতিকটা বারীন পছন্দ করেন না।

'কলকাতা', বারীন জবাব দিলেন। তাঁর অজান্তেই তাঁর স্বাভাবিক গলার স্বরটা বেরিয়ে পড়েছে। বারীন নিজেকে ধিক্কার দিলেন। ভবিষ্যতে তাঁকে আরও সতর্ক হতে হবে।

কিন্তু এ কী! ভদ্রলোক তাঁর দিকে এভাবে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন কেন? সহসা এ হেন কৌতূহলের কারণ কী? বারীন অনুভব করলেন তাঁর নাড়ি আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

'আপনার কি রিসেন্টলি কোনও ছবি বেরিয়েছে কাগজে?'

বারীন বুঝলেন এ ব্যাপারে সত্য গোপন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, ট্রেনে অন্যান্য বাঙালি যাত্রী রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ তাঁকে চিনে ফেললেও ফেলতে পারে। এর কাছে নিজের পরিচয়টা দিলে ক্ষতি কী? বরং বারীন যে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি সেটা জানলে পরে ন'বছর আগের সেই ঘড়ি-চোরের সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখা 'চ'-এর পক্ষে আরও অসম্ভব হবে।

'কোথায় দেখেছেন আপনি ছবি?' বারীন পালটা প্রশ্ন করলেন।
'আপনি গান করেন কি?' আবার প্রশ্ন।
'হ্যাঁ, তা একটু-আধটু...'
'আপনার নামটা...?'
'বারীন্দ্রনাথ ভৌমিক।'
'তাই বলুন বারীন ভৌমিক। তাই চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। আপনি তো রেডিওতেও গেয়ে থাকেন মাঝে মাঝে?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
'আমার স্ত্রী আপনার খুব ভক্ত। দিল্লি যাচ্ছেন কি গানের ব্যাপারে?'
'হ্যাঁ।'
বেশি ভেঙে বলবেন না বারীন। শুধু হ্যাঁ বা না-য়ে যদি উত্তর হয়, তবে তাই বলবেন।
'দিল্লিতে এক ভৌমিক আছে—ফিনান্সে। স্কটিশে পড়ত আমার সঙ্গে। নীতীশ ভৌমিক। আপনার কোনও ইয়ে-টিয়ে নাকি?'
ইয়ে-টিয়েই বটে। বারীনের খুড়তুতো দাদা। কড়া সাহেবি মেজাজের লোক, তাই বারীনের আত্মীয় হলেও সমগোত্রীয় নয়।
'আজ্ঞে না। আমি চিনি না।'
এখানে মিথ্যে বলাটাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন বারীন। লোকটা এবার কথা বন্ধ করলে পারে। এত জেরা কেন রে বাপু!
যাক, লাঞ্চ এসে গেছে। আশা করি কিছুক্ষণের জন্য প্রশ্নবাণ বন্ধ হবে।

হলও তাই। 'চ' ভোজনরসিক। একবার মুখে খাদ্য প্রবেশ করলে কথার রাস্তা যেন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বারীন ভৌমিকের ভয় খানিকটা কেটে গেলেও একটা অসোয়াস্তি এখনও রয়ে গেছে। এখনও বিশ ঘণ্টার পথ বাকি। মানুষের স্মৃতিভাণ্ডার বড় আশ্চর্য জিনিস। কীসে খোঁচা মেরে কোন আদ্যিকালের কোন স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলবে তার কিচ্ছু ঠিক নেই। ওই যেমন 'র' টি। বারীনের বিশ্বাস, ওই বিশেষ কথাটা না শুনলে যে সেই ন'বছর আগের ঘড়ির মালিক 'চ' সে ধারণা কিছুতেই ওর মনে বদ্ধমূল হত না। সেরকম বারীনেরও কোনও কথায় বা কাজে যদি তাঁর পুরনো পরিচয়টা 'চ'-এর কাছে ধরা পড়ে যায়?
এইসব ভেবে বারীন স্থির করলেন যে, তিনি কথাও বলবেন না, কাজও করবেন না। খাবার পর মুখের সামনে হ্যাডলি চেজের বইটা খুলে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে রইলেন। প্রথম পরিচ্ছেদটা শেষ করে সাবধানে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন যে, 'চ' ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্তত দেখলে তাই মনে হয়। ইলাসট্রেটেড উইকলিটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে, চোখ দুটো হাতে ঢাকা, কিন্তু বুকের ওঠানামা দেখে ঘুমন্ত লোকের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ নিশ্বাস বলেই মনে হয়। বারীন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেন। মাঠ-ঘাট, গাছপালা খোলার বাড়ি মিলিয়ে বিহারের রুক্ষ দৃশ্য। জানলার ডবল কাচ ভেদ করে ট্রেনের শব্দ প্রায় পাওয়াই যায় না। 'যেন দূর থেকে শোনা অনেক মৃদঙ্গে একই সঙ্গে একই বোল তোলার শব্দ—ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্ ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্ ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্...
এই শব্দের সঙ্গে এবার যোগ হয় আরেকটি শব্দ, 'চ'-এর নাসিকাধ্বনি।
বারীন ভৌমিক অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। নজরুলের একটা বাছাই করা গানের প্রথম লাইনটা গুনগুন করে দেখলেন। সকালের মতো অতটা মসৃণ না হলেও, গলাটা তাঁর নিজের কানে খারাপ লাগল না। এবার বেশি শব্দ না করে গলাটা খাঁকরে তিনি গানটা আবার ধরলেন। এবং ধরেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে থেমে যেতে হল।
একটা চরম বিভীষিকাজনক শব্দ তাঁর গলা শুকিয়ে দিয়ে গান বন্ধ করে দিয়েছে।
ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজার শব্দ।
তাঁর ব্যাগের মধ্যে রাখা সুইস ঘড়িতে কেমন করে জানি অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। এবং বেজেই

চলেছে। বারীন ভৌমিকের হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। তাঁর দেহ কাষ্ঠবৎ। তাঁর দৃষ্টি ঘুমন্ত 'চ'-এর দিকে নিবদ্ধ।

'চ'-এর হাত যেন একটু নড়ল। বারীন প্রমাদ গুনলেন।

'চ'-এর ঘুম ভেঙেছে। চোখের ওপর থেকে হাত সরে এল।

'গেলাসটা বুঝি? ওটাকে নামিয়ে রাখুন তো—ভাইব্রেট করছে।'

বারীন ভৌমিক দেয়ালে লাগানো লোহার আংটার ভেতর থেকে গেলাসটা তুলতেই শব্দটা থেমে গেল। সেটা টেবিলে রাখার আগে তার ভিতরের জলটুকু খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে তিনি খানিকটা আরাম পেলেন। তবু গানের অবস্থায় আসতে দেরি আছে।

হাজারিবাগ রোডের কিছু আগে চা এল। পর পর দু' পেয়ালা গরম চা খেয়ে এবং 'চ'-এর কাছ থেকে আর কোনওরকম জেরা বা সন্দেহের কোনও লক্ষণ না পেয়ে বারীনের গলা আরও অনেকটা খোলসা হল। বাইরে বিকেলের পড়ন্ত রোদ আর দূরের টিলার দিকে চেয়ে গাড়ির ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে একটা আধুনিক গানের খানিকটা গুনগুন করে গেয়ে আসন্ন বিপদের শেষ আশঙ্কাটুকু তাঁর মন থেকে কেটে গেল।

গয়াতে 'চ' তাঁর ন'বছরের আগের অভ্যাস অনুযায়ী প্ল্যাটফর্মে নেমে সেলোফোনে মোড়া দু প্যাকেট চানাচুর কিনে এনে তার একটা বারীন ভৌমিককে দিলেন। বারীন দিব্যি তৃপ্তির সঙ্গে সেটা খেলেন। গাড়ি ছাড়ার মুখে সূর্য ডুবে গেল। ঘরের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে 'চ' বলল—

'আমরা কি লেট রান করছি? আপনার ঘড়িতে কটা বাজে?'

এই প্রথম বারীন ভৌমিকের খেয়াল হল যে, 'চ'-এর হাতে ঘড়ি নেই। ব্যাপারটা অনুধাবন করে তিনি বিস্মিত হলেন এবং হয়তো সে বিস্ময়ের খানিকটা তাঁর চাহনিতে প্রকাশ পেল। পরমুহূর্তেই খেয়াল হল 'চ'-এর প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়নি। নিজের ঘড়ির দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'সাতটা পঁয়ত্রিশ।'

'তা হলে তো মোটামুটি টাইমেই যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ।'

'আমার ঘড়িটা আজই সকালে...এইচ এম টি...দিব্যি টাইম দিচ্ছিল...বিছানার চাদর ধরে এমন এক টান দিয়েছে যে ঘড়ি একেবারে...'

বারীন চুপ। তটস্থ। ঘড়ির প্রসঙ্গ তাঁর কাছে ষোলো আনা অপ্রীতিকর অবাঞ্ছনীয়।

'আপনার কী ঘড়ি?'

'এইচ এম টি।'

'ভাল সার্ভিস দিচ্ছে?'

'হুঁ।'

'আসলে আমার ঘড়ির লকটাই খারাপ।'

বারীন ভৌমিক একটা হাই তুলে নিজেকে নিরুদ্বিগ্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসাড়তা চোয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মুখ খুলল না। শ্রবণশক্তি লোপ পেলে তিনি সবচেয়ে খুশি হতেন, কিন্তু তা হবার নয়। 'চ'-এর কথা দিব্যি তাঁর কানে প্রবেশ করছে—

'একটা সুইস ঘড়ি, জানেন—সোনার—ট্র্যাভলিং ক্লক—জিনিভা থেকে এনে দিয়েছিল আমার এক বন্ধু—একমাসও ব্যবহার করিনি...ট্রেনে যাচ্ছি দিল্লি—বছর আষ্টেক আগে—এই যে আমি-আপনি ট্র্যাভল করছি, সেইরকম একটা কামরায় আমরা দুজন—আমি আর একটি ভদ্রলোক—বাঙালি...কী ডেয়ারিং ভেবে দেখুন! হয়তো বাথরুমে-টাথরুমে গেছি, কি স্টেশন এসেছে, প্ল্যাটফর্মে নেমেছি—আর সেই ফাঁকে ঘড়িটাকে বেমালুম ঝেপে দিল! অথচ দেখে বোঝার জো নেই—ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছে, দিব্যি ভদ্রলোকের মতো চেহারা। খুন-টুন যে করে বসেনি এই ভাগ্যি! তারপর থেকে তো আর ট্রেনেই চড়িনি। এবারও প্লেনেই যেতুম, কিন্তু পাইলটদের স্ট্রাইকটা দিল ব্যাগড়া...'

বারীন ভৌমিকের গলা শুকনো, ঠোঁটের চারপাশটা অবশ। অথচ তিনি বেশ বুঝতে পারছেন যে এতগুলো কথার পর কিছু না বললে অস্বাভাবিক হবে, এমনকী সন্দেহজনকও হতে পারে। প্রাণান্ত চেষ্টা করে, অসীম মনোবল প্রয়োগ করে, অবশেষে কয়েকটি কথা বেরোলো মুখ দিয়ে—

'আপনি খোঁ-খোঁজ করেননি?'

'আ-র খোঁজ! এসব কি আর খোঁজ করে ফেরত পাওয়া যায়? তবে লোকটার চেহারা মনে রেখেছিলুম অনেক দিন। এখনও আবছা-আবছা মনে পড়ে। মাঝারি রঙ, গোঁফ আছে, আপনারই মতো হাইট হবে, তবে রোগা। আর একটিবার যদি সাক্ষাৎ পেতুম তো বাপের নাম ভুলিয়ে দিতুম। এককালে বক্সিং করতুম, জানেন? লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান ছিলুম। সে লোকের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে, আর দ্বিতীয়বার আমার সামনে পড়েনি...'

ভদ্রলোকের নামটাও মনে পড়ে গেছে। চক্রবর্তী। পুলক চক্রবর্তী। আশ্চর্য! ওই বক্সিং-এর কথাটা বলামাত্র নামটা সিনেমার টাইটেলের মতো যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন বারীন ভৌমিক। গতবারও বক্সিং নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন পুলক চক্রবর্তী।

কিন্তু নামটা জেনেই বা কী হবে? ইনি তো আর কোনও অপরাধ করেননি। অপরাধী বারীন নিজে। আর সেই অপরাধের বোঝা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। সব স্বীকার করলে কেমন হয়? ঘড়িটা ফেরত দিলে কেমন হয়? হাতের কাছে ব্যাগটা খুললেই তো—

দূর—পাগল! এসব কী চিন্তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বারীন ভৌমিক? নিজেকে চোর বলে পরিচয় দেবেন? প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী তিনি, তিনি না বলিয়া পরের দ্রব্য নেওয়ার কথা স্বীকার করবেন? তার ফলে তাঁর নাম যখন ধুলোয় লুটোবে তখন আর গানের ডাক আসবে কোত্থেকে? তাঁর ভক্তের দলই বা কী ভাববে, কী বলবে? ইনি নিজেই যে সাংবাদিক নন, বা সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত নন, তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? না। স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না।

হয়তো স্বীকার করার প্রয়োজনও নেই। পুলক চক্রবর্তী ঘন ঘন চাইছেন তাঁর দিকে। আরও ষোলো ঘণ্টা আছে দিল্লি পৌঁছতে। কোনও এক বীভৎস মুহূর্তে ফস্ করে চিনে ফেলার দীর্ঘ সুযোগ পড়ে আছে সামনে। আরে এই তো সেই লোক!—বারীন কল্পনা করলেন তাঁর গোঁফ খসে পড়ে গেছে, গাল থেকে মাংস ঝরে গেছে, চোখ থেকে চশমা খুলে গেছে; পুলক চক্রবর্তী এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে তাঁর ন' বছর আগের চেহারাটার দিকে, তাঁর ঈষৎ কটা চোখের দৃষ্টি ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে আসছে, তাঁর ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি ফুটে উঠছে। হুঁ হুঁ বাছাধন! পথে এসো এবার! অ্যাদ্দিন বাদে বাগে পেয়েছি তোমায়! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ তো দেখোনি...

দশটা নাগাদ বারীন ভৌমিকের কম্প দিয়ে জ্বর এল। গার্ডকে বলে তিনি একটি অতিরিক্ত কম্বল

চেয়ে নিলেন। তারপর দুটি কম্বল একসঙ্গে পা থেকে নাক অবধি টেনে নিয়ে শয্যা নিলেন। পুলক চক্রবর্তী কামরার দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। বাতি নেভাতে গিয়ে বারীনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। ওষুধ খাবেন? ভাল বড়ি আছে আমার কাছে, দুটো খেয়ে নিন। এয়ারকন্ডিশনিং-এর অভ্যাস নেই বোধহয়?'

ভৌমিক বড়ি খেলেন। একমাত্র ভরসা যে, ঘড়ি-চোর বলে চিনতে পারলেও তাঁকে অসুস্থ দেখে অনুকম্পাবশত পুলক চক্রবর্তী কঠিন শাস্তি থেকে বিরত হবেন। একটা ব্যাপার তিনি ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছেন। পুলক তাঁকে চিনতে না পারলেও, কাল দিল্লি পৌঁছবার আগে কোনও এক সুযোগে সুইস ঘড়িটা তার আসল মালিকের বাক্সের মধ্যে চালান দিতে হবে। যদি সম্ভব হয় তো মাঝরাত্রেই কাজটা সারা যেতে পারে। কিন্তু জ্বরটা না কমলে কম্বলের তলা থেকে বেরোনো সম্ভব হবে না। এখনও মাঝে মাঝে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠছে।

পুলক তাঁর মাথার কাছে রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁর হাতে খোলা একটা পেপারব্যাক বই। কিন্তু তিনি কি সত্যিই পড়ছেন, না বইয়ের পাতায় চোখ রেখে অন্য কিছু চিন্তা করছেন? বইটা একভাবে ধরা রয়েছে কেন? পাতা উলটোচ্ছেন না কেন? কতক্ষণ সময় লাগে পাশাপাশি দুটো পাতা পড়তে?

এবার বারীন লক্ষ করলেন যে, পুলকের দৃষ্টি বইয়ের পাতা থেকে সরে আসছে। তাঁর মাথাটা ধীরে ধীরে পাশের দিকে ঘুরল। দৃষ্টি ঘুরে আসছে বারীনের দিকে। বারীন চোখ বন্ধ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। এখনও কি পুলক চেয়ে আছেন তাঁর দিকে? খুব সাবধানে চোখের পাতা দুটোকে যৎসামান্য ফাঁক করলেন বারীন। আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে নিলেন। পুলক সটান চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। বারীন অনুভব করলেন তাঁর বুকের ভিতরে সেই ব্যাঙটা আবার লাফাতে শুরু করেছে। পাঁজরার হাড়ে আবার ধাক্কা পড়ছে—ধুকপুক...ধুকপুক...ধুপপুক্...ধুকপুক্...। দাদ্‌রার ছন্দ। ট্রেনের চাকার গম্ভীর ছন্দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সে ছন্দ।

একটা মৃদু 'খচ' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বারীন বুঝতে পারলেন যে কামরার শেষ বাতিটাও নিভে গেছে। এবার সাহস পেয়ে চোখ খুলে বারীন দেখলেন যে দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা ক্ষীণ আলো কামরার অন্ধকারকে জমাট বাঁধতে দেয়নি। সেই আলোয় দেখা গেল পুলক চক্রবর্তী তাঁর হাতের বইটা বারীনের ব্যাগের পাশে রাখলেন। তারপর কম্বলটাকে একেবারে থুতনি অবধি টেনে নিয়ে পাশ ফিরে বারীনের মুখোমুখি হয়ে একটা সশব্দ হাই তুললেন।

বারীন ভৌমিক টের পেলেন তাঁর হৃৎস্পন্দন ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কাল সকালে—হ্যাঁ, কাল সকালে—পুলকের ট্র্যাভলিং ক্লক তাঁর নিজের ব্যাগ থেকে পুলকের সুটকেসের জামা-কাপড়ের তলায় চালান দিতে হবে। সুটকেসে চাবি লাগানো নেই। একটুক্ষণ আগেই পুলক স্লিপিং সুট বার করে পরেছে। বারীনের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেছে। বোধহয় ওষুধে কাজ দিয়েছে। কী ওষুধ দিলেন ভদ্রলোক? নামটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। অসুস্থতার ফলে দিল্লির সংগীত-রসিকদের বাহবা থেকে যাতে সঞ্চিত না হন, সেই আশায় অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে পুলক চক্রবর্তীর দেওয়া বাড়ি গিলেছেন তিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...

নাঃ, এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবেন না তিনি। গেলাসের ঠুনঠুনিকে অ্যালার্ম ক্লক ভেবে কী অবস্থা হয়েছিল। এসবের জন্য দায়ী তাঁর অপরাধবোধ-জর্জরিত অসুস্থ মন। কাল সকালে তিনি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। মন খোলসা না হলে গলা খুলবে না, গান বেরোবে না। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন...

চায়ের সরঞ্জামের টুংটাং শব্দে বারীন ভৌমিকের ঘুম ভাঙল। বেয়ারা এসেছে ট্রে নিয়ে চা রুটি মাখন ডিমের অমলেট। এসব তাঁর চলবে কি? জ্বর আছে কি এখনও? না, নেই। শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে। মোক্ষম ওষুদ দিয়ে ছিলেন পুলক চক্রবর্তী। ভদ্রলোকের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাব জেগে উঠল বারীনের মনে।

কিন্তু তিনি কোথায়? বাথরুমে বোধহয়। নাকি করিডরে? বেয়ারা চলে গেলে পর বারীন বাইরে

বেরোলেন। করিডর খালি। কতক্ষণ হল বাথরুমে গেছেন ভদ্রলোক? একটা চান্স নেওয়া যায় কি?

বারীন চান্সটা নিলেন বটে, কিন্তু সফল হলেন না। ব্যাগ থেকে ঘড়ি বার করে পুলক চক্রবর্তীর সুটকেস টেনে বার করার জন্য নিচু হতে না হতেই ভদ্রলোক তোয়ালে ও ক্ষৌরীর সরঞ্জাম হাতে কামরায় এসে ঢুকলেন। বারীন ভৌমিক তাঁর ডান হাতটা মুঠো করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'কেমন আছেন? অলরাইট?'

'হ্যাঁ। ইয়ে...এটা চিনতে পারছেন?'

বারীন তাঁর মুঠো খুলে ঘড়ি সমেত হাতটা পুলকের সামনে ধরলেন। তবে মনে এখন একটা আশ্চর্য দৃঢ়তা এসেছে। চুরির ব্যারাম তিনি অনেক দিন কাটিয়ে উঠেছেন, কিন্তু এই যে লুকোচুরি, সেটাও তো চুরি! এই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কিন্তু-কিন্তু করছি-করব ভাব, এই তলপেট-খালি, গলা-শুকনো, কান-গরম, বুক-ধুক্‌পুক্‌—এটাও তো একটা ব্যারাম। এটাকে কাটিয়ে না উঠলে নিস্তার নেই, সোয়াস্তি নেই।

পুলক চক্রবর্তী হাতের তোয়ালের একটা অংশ তাঁর ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে সবেমাত্র কানের মধ্যে গুঁজেছিলেন, এমন সময় বারীনের হাতে ঘড়িটা দেখে হাত তাঁর কানেই রয়ে গেল। বারীন বললেন, 'আমিই সেই লোক। মোটা হয়েছি, গোঁফটা কামিয়েছি, আর চশমা নিয়েছি। আমি পাটনা যাচ্ছিলাম, আপনি দিল্লি। সিক্সটি-ফোরে। সেই যে একটি লোক কাটা পড়ল, আপনি দেখতে নামলেন, সেই সুযোগে আমি ঘড়িটা নিয়ে নিই।'

পুলকের দৃষ্টি এখন ঘড়ি থেকে সরে গিয়ে বারীনের চোখের ওপর নিবদ্ধ হল। বারীন দেখলেন তাঁর কপালের মাঝখানে নাকের উপর দুটো সমান্তরাল খাঁজ, চোখের সাদা অংশটা অস্বাভাবিক রকম প্রকট, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গিয়ে কিছু বলার জন্য তৈরি হয়েও কিছু বলতে পারছে না। বারীন বলে চললেন—

'আসলে ওটা আমার একটা ব্যারাম, জানেন। মানে, আমি আসলে চোর নই। ডাক্তারিতে এর একটা নাম আছে, এখন মনে পড়ছে না। যাই হোক, এখন আমি একেবারে, মানে, নরম্যাল। ঘড়িটা অ্যাদ্দিন ছিল, ব্যবহার করেছি, আজও সঙ্গে রয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখে হয়ে গেল—প্রায় মিরাক্‌লের মতো—তাই আপনাকে ফেরত দিচ্ছি। আশা করি আপনার মনে কোনও...ইয়ে থাকবে না।'

পুলক চক্রবর্তী একটা অস্ফুট 'থ্যাঙ্কস' ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর হারানো ঘড়ি তাঁর নিজের কাছে ফিরে এসেছে, হতভম্ব ভাবে সেটি হাতে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বারীন তাঁর ব্যাগ থেকে দাঁতের মাজন, টুথব্রাশ ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম বার করে তোয়ালেটা র‍্যাক থেকে নামিয়ে নিয়ে কামরার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নজরুলের 'কত রাতি পোহায় বিফলে' গানের খানিকটা গেয়ে বুঝলেন যে, তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক সাবলীলতা তিনি ফিরে পেয়েছেন।

ফাইনান্সের এন. সি. ভৌমিককে টেলিফোনে পেতে প্রায় তিন মিনিট সময় লাগল। শেষে একটা পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠে শোনা গেল 'হ্যালো।'

'কে, নীতীশদা? আমি ভোঁদু।'

'কী রে, তুই এসে গেচিস? আজ যাব তোর গলাবাজি শুনতে। তুইও একটা কেউকেটা হয়ে গেলি শেষটায়? ভাবা যায় না!...যাক, কী খবর বল। হঠাৎ নীতীশদাকে মনে পড়ল কেন?'

'ইয়ে—পুলক চক্রবর্তী বলে কাউকে চিনতে? তোমার সঙ্গে নাকি স্কটিশে পড়ত। বক্সিং করত।'

'কে, ঝাড়ুদার?'

'ঝাড়ুদার?'

'ও যে সব জিনিসপত্তর ঝেড়ে দিত। এর-ওর ফাউন্টেন পেন, লাইব্রেরির বই, কমন-রুম থেকে টেবিল টেনিস ব্যাট। আমার প্রথম রনসনটা তো ও-ই ঝেড়েছিল। অথচ অভাব-টভাব নেই, বাপ রিচ ম্যান। ওটা একধরনের ব্যারাম, জানিস তো?'

'ব্যারাম?'

'জানিস না? ক্লেপ্টোমেনিয়া। কে-এল-ই-পি...'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বারীন ভৌমিক তাঁর খোলা সুটকেসটার দিকে দেখলেন। হোটেলে এসে সুটকেস খুলতেই কিছু জিনিসের অভাব তিনি লক্ষ করেছেন। এক কার্টন থ্রি কাসলস সিগারেট, একটা জাপানি বাইনোকুলার, পাঁচটা একশো টাকার নোটসমেত একটা মানিব্যাগ।

ক্লেপ্টোমেনিয়া। বারীন নামটা জানতেন, কিন্তু ভুলে গেছিলেন। আর ভুলবেন না।

আনন্দমেলা, পূজাবার্ষিকী ১৩৮০

ভক্ত

অরূপবাবু—অরূপরতন সরকার—পুরী এসেছেন এগারো বছর পরে। শহরে কিছু কিছু পরিবর্তন চোখে পড়েছে—কিছু নতুন বাড়ি, নতুন করে বাঁধানো কয়েকটা রাস্তা, দু-চারটে ছোট-বড় নতুন হোটেল—কিন্তু সমুদ্রের ধারটায় এসে বুঝতে পারলেন এ জিনিস বদলাবার নয়। তিনি যেখানে এসে উঠেছেন, সেই সাগরিকা হোটেল থেকে সমুদ্র দেখা না গেলেও, রাত্তিরে বাসিন্দাদের কলরব বন্ধ হয়ে গেলে দিব্যি ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দ শুনে কাল তো অরূপবাবু বেরিয়ে পড়লেন। কালই তিনি পুরীতে এসেছেন; দিনে কিছু কেনাকাটার ব্যাপার ছিল তাই আর সমুদ্রের ধারে যাওয়া হয়নি। রাত্তিরে গিয়ে দেখলেন অমাবস্যার অন্ধকারেও ঢেউয়ের ফেনা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অরূপবাবুর মনে পড়ল ছেলেবেলায় কোথায় জানি পড়েছিলেন যে সমুদ্রের জলে ফসফরাস থাকে, আর সেই কারণেই অন্ধকারেও ঢেউগুলো দেখা যায়। ভারী ভাল লাগল অরূপবাবুর এই আলোমাখা রহস্যময় ঢেউ দেখতে। কলকাতায় তাঁকে দেখলে কেউ ভাবুক বলে মনে করবে না। তা না করুক। অরূপবাবু নিজে জানেন তাঁর মধ্যে এককালে জিনিস ছিল। সেসব যাতে কাজের চাপে একেবারে ভোঁতা না হয়ে যায় তাই তিনি এখনও মাঝে মাঝে গঙ্গার ধারে, ইডেন বাগানে গিয়ে বসে থাকেন, গাছ দেখে জল দেখে ফুল দেখে আনন্দ পান, পাখির গান শুনে চিনতে চেষ্টা করেন সেটা দোয়েল না কোয়েল না পাপিয়া। অন্ধকারে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে তাঁর মনে হল যে, ষোলো বছরের চাকরি জীবনের অনেকখানি অবসাদ যেন দূর হয়ে গেল।

আজ বিকেলেও অরূপবাবু সমুদ্রের ধারে এসেছেন। খানিকদূর হেঁটে আর হাঁটতে মন চাইছে না, কে এক গেরুয়াধারী সাধুবাবা বা গুরুগোছের লোক হনহনিয়ে বালির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, তার পিছনে একগাদা মেয়ে পুরুষ চেলা-চামুণ্ডা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, অরূপবাবুর কাছে এ দৃশ্য পরম উপভোগ্য বলে মনে হচ্ছে, এমন সময় তাঁর বাঁ দিক থেকে কচি গলায় একটি প্রশ্ন হাওয়ায় ভেসে তাঁর কানে এল—

'"খোকনের স্বপ্ন" কি আপনার লেখা?'

অরূপবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একটি সাত-আট বছরের ছেলে, পরনে সাদা শার্ট আর নীল প্যান্ট, হাতের কনুই অবধি বালি। সে ঘাড় উঁচিয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। অরূপবাবুর উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছেলেটি বলল, 'আমি "খোকনের স্বপ্ন" পড়েছি। বাবা জন্মদিনে দিয়েছিল। আমার...আমার...'

'বলো, লজ্জা কী, বলো!'

এবার একটি মহিলার গলা।

ছেলেটি যেন সাহস পেয়ে বলল, 'আমার খুব ভাল লেগেছে বইটা।'

এবার অরূপবাবু মহিলাটির দিকে দৃষ্টি দিলেন। বছর ত্রিশ বয়স, সুশ্রী চেহারা, হাসি হাসি মুখ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন, আর এক পা দু' পা করে এগিয়ে আসছেন।

অরূপবাবু ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'না খোকা, আমি কোনও বইটই লিখিনি। তুমি বোধহয় ভুল করছ।'

ভদ্রমহিলা যে ছেলেটির মা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দুজনের চেহারায় স্পষ্ট আদল আছে, বিশেষ করে খাঁজকাটা থুতনিটায়।

অরূপবাবুর কথায় কিন্তু মহিলার মুখের হাসি গেল না। তিনি আরও এগিয়ে এসে আরও বেশি হেসে বললেন, 'আমরা শুনেছি আপনি লোকজনের সঙ্গে মিশতে ভালবাসেন না। আমার এক দেওর আপনাকে একটা অনুষ্ঠানে সভাপতি হবার অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিল; আপনি উত্তরে জানিয়েছিলেন ওসব আপনার একেবারেই পছন্দ না। এবারে কিন্তু আমরা আপনাকে ছাড়ছি না। আপনার লেখা আমাদের ভীষণ ভাল লাগে। যদিও ছোটদের জন্য লেখেন কিন্তু আমরাও পড়ি।'

"খোকনের স্বপ্ন" বইয়ের লেখক যিনিই হন না কেন, মা ও ছেলে দু'জনেই যে তাঁর সমান ভক্ত সেটা বুঝতে অরূপবাবুর অসুবিধা হল না। এমন একটা বেয়াড়া অবস্থায় তাঁকে পড়তে হবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। এদের ধারণা যে ভুল সেটা জানানো দরকার, কিন্তু সরাসরি কাঠখোট্টাভাবে জানালে এঁরা কষ্ট পাবেন ভেবে অরূপবাবু কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়লেন। আসলে অরূপবাবুর মনটা ভারী নরম। একবার তাঁর ধোপা গঙ্গাচরণ তাঁর একটা নতুন আদ্দির পাঞ্জাবিতে ইস্তিরির দাগ লাগিয়ে সেটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। অন্য কেউ হলে গঙ্গাচরণকে দু-এক ঘা কিল চড় খেতে হত নির্ঘাত। অরূপবাবু কিন্তু ধোপার করুণ কাঁচুমাচু ভাব দেখে শুধু একটিবার মোলায়েমভাবে 'ইস্তিরিটা একটু সাবধানে করবে তো' বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর এই দরদী মনের জন্যই আপাতত আর কিছু না বলে বললেন, 'ইয়ে—আমি যে খোকনের স্বপ্নের লেখক সে-বিষয় আপনি এতটা শিওর হচ্ছেন কী করে?'

মহিলা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বাঃ—সেদিনই যুগান্তরে ছবি বেরোলো না! বাংলাভাষায় বছরের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে আপনি আকাদেমি পুরস্কার পেলেন, রেডিওতে বলল, আর তার পরদিনই তো কাগজে ছবি বেরোলো। এখন শুধু আমরা কেন, অনেকেই অমলেশ মৌলিকের চেহারা জানে।'

অমলেশ মৌলিক! নামটা শোনা, কিন্তু ছবিটা অরূপবাবু দেখেননি। এতই কি চেহারার মিল? অবিশ্যি আজকালকার খবরের কাগজের ছাপায় মুখ অত পরিষ্কার বোঝা যায় না।

'আপনি পুরীতে আসবেন সে খবর রটে গেছে যে,' মহিলা বলে চললেন। 'আমরা সেদিন সি-ভিউ হোটেলে গেলাম। আমার স্বামীর এক বন্ধু কাল পর্যন্ত ওখানে ছিলেন। তাঁকে হোটেলের ম্যানেজার নিজে বলেছেন যে আপনি বিষ্যুদবার আসছেন। আজই তো বিষ্যুদ। আপনি সি-ভিউতে উঠেছেন তো?'

'অ্যাঁ? ও—না। আমি, ইয়ে, শুনেছিলাম ওখানের খাওয়াটা নাকি তেমন সুবিধের না।'

'ঠিকই শুনেছেন। আমরাও তো তাই ভাবছিলাম—এত হোটেল থাকতে আপনার মতো লোক ওখানে উঠছেন কেন। শেষ অবধি কোথায় উঠলেন?'

'আমি আছি...সাগরিকাতে।'

'ওহো। ওটা তো নতুন। কেমন হোটেল?'

'চলে যায়। কয়েকদিনের ব্যাপার তো।'

'কদিন আছেন?'

'দিন পাঁচেক।'

'তা হলে একদিন আমাদের ওখানে আসুন। আমরা আছি পুরী হোটেলে। কত লোক যে আপনাকে দেখবার জন্য বসে আছে। আর বাচ্চাদের তো কথাই নেই। ও কি, আপনার পা যে ভিজে গেল!'

ঢেউ যে এগিয়ে এসেছে সেদিকে অরূপবাবুর খেয়ালই নেই। শুধু পা ভিজছে বললে ভুল হবে; এই হাওয়ার মধ্যে অরূপবাবু বুঝতে পারছেন তাঁর সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। প্রতিবাদ করার

সুযোগটা যে কখন কেমন করে ফসকে গেল সেটা তিনি বুঝতেই পারলেন না। এখন যেটা দরকার সেটা হল এখান থেকে সরে পড়া। কেলেঙ্কারিটা কতদূর গড়িয়েছে সেটা নিরিবিলি বসে ভাবতে না পারলে বোঝা যাবে না।

'আমি এবার...আসি...'

'নতুন কিছু লিখছেন নিশ্চয়।'

'নাঃ। এখন, মানে, বিশ্রাম।'

'আবার লেখা হবে। আমার স্বামীকে বলব। কাল বিকেলে আসছেন তো এদিকে?'

সি-ভিউ-এর ম্যানেজার বিবেক রায় সবেমাত্র গালে একটা গুণ্ডিপান পুরেছেন এমন সময় অরূপবাবু তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

'অমলেশ মৌলিক মশায়ের কি এখানে আসার কথা আছে?'

'উঁ।'

'এখনও আসেননি?'

'উঁহুঁ।'

'কবে...আসবেন...সেটা?'

'মোঙ্গোবা। টেরিগ্‌গাঁ এয়েহে। ক্যাঁও?'

মঙ্গলবার। আজ হল বিষ্যুদ। অরূপবাবু আছেন ওই মঙ্গলবার পর্যন্তই। টেলিগ্রাম এসেছে মানে মৌলিকমশাই বোধহয় শেষ মুহূর্তে কোনও কারণে আসার তারিখ পেছিয়েছেন।

ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে অরূপবাবু জানলেন তাঁর অনুমান ঠিকই, আজই সকালে আসার কথা ছিল অমলেশ মৌলিকের।

বিবেকবাবুর 'ক্যাঁও'-এর উত্তরে অরূপবাবু বললেন যে তাঁর অমলেশবাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিল। তিনি মঙ্গলবার দুপুরে এসে খোঁজ করবেন।

সি-ভিউ হোটেল থেকে অরূপবাবু সোজা চলে গেলেন বাজারে। একটি বইয়ের দোকান খুঁজে বার করে অমলেশ মৌলিকের লেখা চারখানা বই কিনে ফেললেন। খোকনের স্বপ্ন পাওয়া গেল না; কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। এই চারখানাই যথেষ্ট। দুটো উপন্যাস, দুটো ছোটগল্পের সংকলন।

নিজের হোটেলে ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল সাড়ে ছ'টা। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা ঘর, তার বাঁ দিকে ম্যানেজারের বসার জায়গা, ডান দিকে একটা দশ ফুট বাই আট ফুট জায়গায় একটা বেঞ্চি ও দুটো চেয়ার পাতা। চেয়ার দুটিতে দু'জন ভদ্রলোক বসা, আর বেঞ্চিতে দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে, তাদের কারুরই বয়স দশের বেশি না। ভদ্রলোক দু'জন অরূপবাবুকে দেখেই হাসি হাসি মুখ করে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে ঘাড় নাড়তেই তারা সলজ্জ ভাবে অরূপবাবুর দিকে এগিয়ে এসে টিপ টিপ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। অরূপবাবু বারণ করতে গিয়েও পারলেন না।

এদিকে ভদ্রলোক দুটিও এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমরা পুরী হোটেল থেকে আসছি। আমার নাম সুহৃদ সেন, আর ইনি মিস্টার গাঙ্গুলি। মিসেস ঘোষ বললেন আজ আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, আর আপনি এইখেনে আছেন, তাই ভাবলুম...'

ভাগ্যে বইগুলো ব্রাউন কাগজে বেঁধে দিয়েছিল, নাহলে নিজের বই দোকান থেকে কিনে এনেছে জানতে পারলে এরা না-জানি কী ভাবত!

অরূপবাবু এদের সব কথাতেই ঘাড় নাড়লেন। প্রতিবাদ যে এখনও করা যায় না তা নয়। এখন আর কী? শুধু বললেই হল—'দেখুন মশাই, একটা বিশ্রি গণ্ডগোল হয়ে গেছে। আমি নিজে অমলেশ মৌলিকের ছবি দেখিনি, তবে ধরে নিচ্ছি তাঁর সঙ্গে আমার চেহারার কিছুটা মিল আছে। হয়তো তাঁরও সরু গোঁফ আছে, তাঁরও কোঁকড়া চুল, তাঁরও চোখে এই আমারই মতো চশমা। এটাও ঠিক যে, তাঁরও পুরীতে আসার কথা আছে। কিন্তু দোহাই আপনাদের, আমি সে-লোক নই। আমি শিশুসাহিত্যিক নই। আমি কোনও সাহিত্যিকই নই। আমি লিখিই না। আমি ইনসিওরান্সের আপিসে চাকরি করি। নিরিবিলিতে ছুটি ভোগ করতে এসেছি, আপনারা দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। আসল অমলেশ

মৌলিক মঙ্গলবার সি-ভিউতে আসছেন। আপনারা সেখানে গিয়ে খোঁজ করে দেখতে পারেন।'

কিন্তু সত্যিই কি এইটুকু বললেই ল্যাঠা চুকে যায়? একবার যখন এদের মগজে ঢুকেছে যে, তিনিই অমলেশ মৌলিক, আর প্রথমবারের প্রতিবাদে যখন কোনও কাজ হয়নি, তখন সি-ভিউ-এর ম্যানেজার টেলিগ্রাম দেখালেই কি এদের ভুল ভাঙবে? এরা তো ধরে নেবে যে ওটা হল মৌলিক মশায়ের একটা কারসাজি। আসলে তিনিই ছদ্মনামে এসে রয়েছেন সাগরিকায়, আর আসার আগে সি-ভিউকে একটা ভাঁওতা টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন নিজের নামে, লোকের উৎপাত এড়ানোর জন্য।

প্রতিবাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বাধার সৃষ্টি করল ওই তিনটি বাচ্চা। তারা তিনজনে হাঁ করে পরম ভক্তিভরে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে অরূপবাবুর দিকে। প্রতিবাদের নামগন্ধ পেলে এই তিনটি ছেলেমেয়ের আশা আনন্দ উৎসাহ মুহূর্তে উবে যাবে।

'বাবুন, তোমার কী জানবার আছে সেটা জেনে নাও অমলেশবাবুর কাছে!' দুটি ছেলের মধ্যে যেটি বড় তাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বললেন সুহৃদ সেন।

অরূপবাবু প্রমাদ গুনলেন। আর পালাবার রাস্তা নেই। বাবুন ছেলেটি ঘাড় কাত করে দু'হাতের আঙুল পরস্পরের সঙ্গে পেঁচিয়ে প্রশ্ন করার জন্য তৈরি।

'আচ্ছা, খোকনকে যে বুড়োটা ঘুম পাড়িয়ে দিল সে কি ম্যাজিক জানত?'

চরম সংকটের মধ্যে অরূপবাবু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে তাঁর মাথায় আশ্চর্যরকম বুদ্ধি খেলছে। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বাবুনের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয় জানত।'

অন্য দুটি বাচ্চাও সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ জানত, ম্যাজিক জানত!'

'ঠিক কথা!' অরূপবাবু এখন সটান সোজা।—'তোমরা যেরকম বুঝবে, সেটাই ঠিক। আমার যা বলার সে তো আমি লিখেই দিয়েছি। বোঝার কাজটা তোমাদের। যেরকম বুঝলে পরে গল্পটা তোমাদের ভাল লাগবে, সেটাই ঠিক। আর সব ভুল।'

তিন বাচ্চাই অরূপবাবুর কথায় ভীষণ খুশি হয়ে গেল। যাবার সময় সুহৃদ সেন অরূপবাবুকে নেমন্তন্ন করে গেলেন। পুরী হোটেলে এসে রাত্তিরে খাওয়া। আটটি বাঙালি পরিবার সেখানে এসে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে আছে যারা সকলেই অমলেশ মৌলিকের ভক্ত। অরূপবাবু আপত্তি করলেন না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছেন যে অন্তত সাময়িকভাবে তাঁকে অমলেশ মৌলিকের ভূমিকায় অভিনয় করতেই হবে। তার পরিণাম কী হতে পারে সেটা ভাববার সময় এখন নেই। শুধু একটা কথা তিনি বারবার বলে দিলেন সুহৃদবাবুকে—

'দেখুন মশাই, আমি সত্যিই বেশি হইচই পছন্দ করি না। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যেসটাই নেই। তাই বলছি কি—আমি যে এখানে রয়েছি সে খবরটা আপনারা দয়া করে আর ছড়াবেন না।'

সুহৃদবাবু কথা দিয়ে গেলেন যে, আগামীকাল নেমন্তন্নের পর তাঁরা অরূপবাবুকে আর একেবারেই বিরক্ত করবেন না। আর অন্যেও যাতে না করে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

রাত্রে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে বিছানায় শুয়ে অরূপবাবু অমলেশ মৌলিকের 'হাবুর কেরামতি' বইখানা পড়তে শুরু করলেন। এ ছাড়া অন্য তিনটে বই হল— টুটুলের অ্যাডভেঞ্চার, কিস্তিমাত ও ফুলঝুরি। শেষের দুটো ছোটগল্প সংকলন।

অরূপবাবু সাহিত্যিক না হলেও, চাকরি জীবনের আগে, বিশেষ করে ইস্কুলে থাকার শেষ তিনটে বছর, দেশি ও বিদেশি অনেক ছোটদের গল্পের বই পড়েছেন। অ্যাদ্দিন পরে ঊনচল্লিশ বছর বয়সে নতুন করে ছোটদের বই পড়ে তাঁর আশ্চর্য লাগল এই দেখে যে ছেলেবেলায় পড়া অনেক গল্পই তাঁর এখনও মনে আছে, আর সেসব গল্পের সঙ্গে মাঝে মাঝে অমলেশ মৌলিকের গল্পের এখানে-সেখানে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

বড় বড় হরফে ছাপা একশো সোয়াশো পাতার চারখানা বই শেষ করে অরূপবাবু যখন ঘরের বাতিটা নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন ততক্ষণে সাগরিকা হোটেল নিঝুম নিস্তব্ধ। সমুদ্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত কত হল? বালিশের পাশ থেকে হাত ঘড়িটা তুলে নিলেন অরূপবাবু। তাঁর বাবার ঘড়ি। সেই আদ্যিকালের

রেডিয়াম ডায়াল। সমুদ্রের ফেনার মতোই অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। বেজেছে পৌনে একটা।

সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পাওয়া শিশুসাহিত্যিক অমলেশ মৌলিক। ভাষা ঝরঝরে, লেখার কায়দা আছে, গল্পগুলো একবার ধরলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। কিন্তু তাও বলতে হয় মৌলিক মশায়ের মৌলিকত্বের অভাব আছে। কতরকম লোক, কতরকম ঘটনা, কতরকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা তো আমরা হামেশাই শুনি; আমাদের নিজেদের জীবনেও তো কতরকম ঘটনা ঘটে; সেইসবের সঙ্গে একটু কল্পনা মিশিয়ে দিলেই তো গল্প হয়ে যায়। তা হলে অন্যের লেখা থেকে এটা-ওটা তুলে নেবার দরকার হয় কেন?

অরূপবাবুর মনে অমলেশ মৌলিক সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাটা জমে উঠেছিল, তার খানিকটা কমে গেল। সেইসঙ্গে তাঁর মনটাও খানিকটা হালকা হয়ে গেল। কাল থেকে তিনি আরেকটু স্বচ্ছন্দে মৌলিকের অভিনয়টা করতে পারবেন।

পুরী হোটেলের পার্টিতে অমলেশ মৌলিকের ভক্তদের ভক্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। অরূপবাবু ইতিমধ্যে আরেকটি দোকান থেকে খোকনের স্বপ্ন বইটা জোগাড় করে পড়ে ফেলেছিলেন। ফলে তেরোজন শিশু ভক্তের তিনশো তেত্রিশ রকম প্রশ্নের উত্তর নিজের মনের মতো করে দিতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি। পার্টি শেষ হবার আগেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে মধুচাটাবাবু বলে ডাকতে আরম্ভ করল, কারণ অরূপবাবু তাদের শেখালেন যে মৌ মানে মধু, আর 'লিক' হল ইংরেজি কথা, যার মানে চাটা। এটা শুনে ডক্টর দাশগুপ্ত মন্তব্য করলেন, 'মধু তো আপনি সৃষ্টি করছেন, আর সেটা চাটছে তো এইসব ছেলেমেয়েরা।' তাতে আবার তাঁর স্ত্রী সুরঙ্গমা দেবী বললেন, 'শুধু ওরা কেন, আমরাও!'

খাওয়া-দাওয়ার পরে দুটো ব্যাপার হল। এক, বাচ্চারা অরূপবাবুকে ধরে বসল তাঁকে অন্তত একটা গল্প বলতেই হবে। তাতে অরূপবাবু বললেন মুখে মুখে বানিয়ে গল্প বলার অভ্যাস তাঁর নেই, তবে তিনি তাঁর নিজের ছেলেবেলার একটা মজার ঘটনা বলবেন। ছেলেবেলায় অরূপবাবুরা থাকতেন বাঞ্ছারাম অক্রুর দত্ত লেনে। তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁদের বাড়ি থেকে একদিন একটা দামি

ট্যাঁক ঘড়ি চুরি যায়। চোর ধরার জন্য অরূপবাবুর বাবা বাড়িতে এক 'কুলোঝাড়া' ডেকে আনেন। এই কুলোঝাড়া একটা কাঁচিকে চিমটের মতো ব্যবহার করে তাই দিয়ে একটা কুলোকে শূন্যে তুলে ধরে তার উপর মুঠো মুঠো চাল ছুড়ে মন্ত্র পড়ে বাড়ির নতুন চাকর নটবরকে চোর বলে ধরে দেয়। অরূপবাবুর মেজোকাকা যখন নটবরের চুলের মুঠি ধরে তার পিঠে একটা কিল বসাতে যাবেন, ঠিক সেই সময় ট্যাঁক ঘড়িটা বেরিয়ে পড়ে একটা বিছানার চাদরের তলা থেকে।

হাততালির মধ্যে গল্প শেষ করে অরূপবাবু বাড়ি যাবেন মনে করে চেয়ার ছেড়ে উঠতেই চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, যাবেন না যাবেন না!' তারপর তারা দৌড়ে গিয়ে যে যার ঘর থেকে অমলেশ মৌলিকের লেখা সাতখানা নতুন কেনা বই এনে তাঁর সামনে ধরে বলল, 'আপনার নাম লিখে দিন, নাম লিখে দিন!'

অরূপবাবু বললেন, 'আমি তো ভাই বইয়ে নাম সই করি না!—কখনও করিনি। আমি এগুলো নিয়ে যাচ্ছি; প্রত্যেকটাতে একটা করে ছবি এঁকে দেব। তোমরা পরশু বিকেলে সাড়ে চারটের সময় আমার হোটেলে এসে বইগুলো নিয়ে যাবে।'

যাদের বই তারা আবার সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।—'সইয়ের চেয়ে ছবি ঢের ভাল, অনেক ভাল!'

অরূপবাবু ইস্কুলে থাকতে দু'বার ড্রইংয়ে প্রাইজ পেয়েছিলেন। সেই থেকে যদিও আর আঁকেননি, কিন্তু একদিন একটু অভ্যেস করে নিলে কি মোটামুটি যা হোক কিছু এঁকে দেওয়া যাবে না?

পরদিন শনিবার ভোরবেলা অরূপবাবু তাঁর ডটপেন আর বইগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নুলিয়া বস্তির দিকে গিয়ে দেখলেন সেখানে দেখে দেখে আঁকবার অনেক জিনিস আছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেল। একটা বইয়ে আঁকলেন কাঁকড়ার ছবি, একটাতে আঁকলেন তিনটে ঝিনুক পাশাপাশি বালির ওপর পড়ে আছে, একটাতে আঁকলেন দুটো কাক, একটাতে মাছধরা নৌকো, একটাতে নুলিয়ার বাড়ি, একটাতে নুলিয়ার বাচ্চা, আর শেষেরটায় আঁকলেন চোঙার মতো টুপি পরা একটা নুলিয়া মাছ ধরার জাল বুনছে।

রবিবার বিকেলে ঠিক সাড়ে চারটের সময় তাঁর হোটেলে এসে ঝুনি, পিন্টু, চুমকি, শান্তনু, বাবুন, প্রসেনজিৎ আর নবনীতা যে যার বই ফেরত নিয়ে ছবি দেখে ফুর্তিতে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে অরূপবাবু হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মনের খুশি ভাবটা চলে গিয়ে তার জায়গায় একটা দুশ্চিন্তার ভাব বাসা বেঁধেছে। 'আমি অমলেশ মৌলিক'—এ-কথাটা যদিও তিনি একটি বারও কারুর সামনে নিজের মুখে উচ্চারণ করেননি, তবুও তিনি বুঝতে পারলেন যে, যে-কাজটা তিনি এই তিনদিন ধরে করলেন সেটা একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই না। পরশু মঙ্গলবার সকালে আসল অমলেশ মৌলিক এসে পৌঁছবেন। অরূপবাবু এ ক'দিনে এই ক'টি ছেলেমেয়ে এবং তাদের বাপ-মা মাসি-পিসির কাছে যে আদরযত্ন ভক্তি ভালবাসা পেলেন, তার সবটুকুই আসলে ওই মঙ্গলবার যিনি আসছেন তাঁরই প্রাপ্য। মৌলিক মশায়ের লেখা যেমনই হোক না কেন, এদের কাছে তিনি একজন হিরো। তিনি যখন সশরীরে এসে পৌঁছবেন, এবং সি-ভিউ হোটেলের ম্যানেজার বিবেক রায় যখন সগর্বে সেই খবরটি প্রচার করবেন, তখন যে কী একটা বিশ্রি অবস্থার সৃষ্টি হবে সেটা ভাবতেই অরূপবাবুর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল।

তাঁর পক্ষে কি তা হলে একদিন আগে পালানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে? না হলে মঙ্গলবার সকাল থেকে রাত্তির অবধি তিনি করবেনটা কী? গা-ঢাকা দেবেন কী করে? আর সেটা না করতে পারলে এরা তাঁকে ছাড়বে কেন? ভণ্ড জোচ্চোর বলে তাঁর পিঠের ছালচামড়া তুলে দেবে না? ষণ্ডামার্কা সাহিত্যিক কি হয় না? আর পুলিশ? পুলিশের ভয় তো আছে। এ ধরনের ধাপ্পাতে জেলটেল হয় কিনা সেটা অরূপবাবুর জানা নেই, তবে হলে তিনি আশ্চর্য হবেন না। বেশ একটা বড়রকমের অপরাধ যে তিনি করে ফেলেছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

দুশ্চিন্তায় ঘুম না হবার ভয়ে অরূপবাবু একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেললেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অরূপবাবু মঙ্গলবার রাত্রের ট্রেনেই যাওয়া স্থির করলেন। আসল অমলেশ

মৌলিককে একবার চোখের দেখা দেখবার লোভটা তিনি কিছুতেই সামলাতে পারলেন না। সোমবার সকালে নিজের হোটেলেই খোঁজ করে তিনি গত মাসের যুগান্তরের সেই সংখ্যাটি পেয়ে গেলেন যাতে অমলেশ মৌলিকের ছবি ছিল। সরু গোঁফ, কোঁকড়ানো চুল, মোটা ফ্রেমের চশমা—এ সবই আছে, তবে মিলের মাত্রাটা সঠিক বুঝতে গেলে আসল মানুষটাকে চোখের সামনে দেখতে হবে, কারণ ছাপা পরিষ্কার নয়। যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তা থেকে তাঁকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধে হবে না। অরূপবাবু স্টেশনে যাবেন। শুধু চাক্ষুষ দেখা নয়, সম্ভব হলে দুটো কথাও বলে নেবেন ভদ্রলোকের সঙ্গে; এই যেমন—'আপনি মিস্টার মৌলিক না? আপনার ছবি দেখলাম সেদিন কাগজে। আপনার লেখা পড়েছি। বেশ ভাল লাগে—' ইত্যাদি। তারপর তাঁর মালপত্তর স্টেশনে রেখে অরূপবাবু শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন। কোনারকটা দেখা হয়নি। মন্দির দেখে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে সোজা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চাপবেন। গা-ঢাকা দেবার এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই।

মঙ্গলবার পুরী এক্সপ্রেস এসে পৌঁছল বিশ মিনিট লেটে। যাত্রী নামতে শুরু করেছে, অরূপবাবু একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রথম শ্রেণীর দুটো পাশাপাশি বগির দিকে লক্ষ রাখছেন। একটি দরজা দিয়ে দু'জন হাফপ্যান্ট পরা বিদেশি পুরুষ নামলেন, তারপর একটি স্থূলকায় মারোয়াড়ি। আরেকটি দরজা দিয়ে একটি বৃদ্ধা, তাঁকে হাত ধরে নামাল একটি সাদা প্যান্ট পরা যুবক। যুবকের পিছনে একটি বৃদ্ধ, তার পিছনে—হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই, ইনিই অমলেশ মৌলিক। অরূপবাবুর সঙ্গে চেহারার মিল আছে ঠিকই, তবে পাশাপাশি দাঁড়ালে যমজ মনে হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। মৌলিক মশাইয়ের হাইট অরূপবাবুর চেয়ে অন্তত দু ইঞ্চি কম, আর গায়ের রঙ অন্তত দু পোঁচ ময়লা। বয়সও হয়তো সামান্য বেশি, কারণ জুলপিতে দিব্যি পাক ধরেছে, যেটা অরূপবাবুর এখনও হয়নি।

ভদ্রলোক নিজের সুটকেস নিজেই হাতে করে নেমে একটি কুলিকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন। কুলির সঙ্গে সঙ্গে অরূপবাবুও এগিয়ে গেলেন।

'আপনি মিস্টার মৌলিক না?'

ভদ্রলোক যেন একটু অবাক হয়েই অরূপবাবুর দিকে ফিরে ছোট্ট করে মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

কুলি সুটকেসটা মাথায় চাপিয়েছে। এছাড়া মাল রয়েছে অরূপবাবুর কাঁধে একটি ব্যাগ ও একটি ফ্লাস্ক। তিনজনে গেটের দিকে রওনা দিলেন। অরূপবাবু বললেন—

'আমি আপনার বই পড়েছি। কাগজে আপনার পুরস্কারের কথা পড়লাম, আর ছবিও দেখলাম।'

'ও।'

'আপনি সি-ভিউতে উঠছেন?'

অমলেশ মৌলিক এবার যেন আরও অবাক ও খানিকটা সন্দিগ্ধভাবে অরূপবাবুর দিকে চাইলেন। অরূপবাবু মৌলিকের মনের ভাবটা আন্দাজ করে বললেন, 'সি-ভিউয়ের ম্যানেজার আপনার একজন ভক্ত। তিনিই খবরটা রটিয়েছেন।'

'ও।'

'আপনি আসছেন শুনে এখানকার অনেক ছেলেমেয়েরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।'

'উঁ।'

লোকটা এত কম কথা বলে কেন? তার হাঁটার গতিও যেন কমে আসছে। কী ভাবছেন ভদ্রলোক?

অমলেশ মৌলিক এবার একদম থেমে গিয়ে অরূপবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'অনেকে জেনে গেছে?'

'সেইরকমই তো দেখলাম। কেন, আপনার কি তাতে অসুবিধে হল?'

'না, মানে, আমি আবার একটু একা থাকতে পপ্—পপ্—পপ্—'

'পছন্দ করেন?'

'হ্যাঁ।'

তোতলা। অরূপবাবুর মনে পড়ে গেল অষ্টম এডওয়ার্ড হঠাৎ সিংহাসন ত্যাগ করার ফলে তাঁর পরের ভাই জর্জ ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন তোতলা, অথচ তাঁকেই রাজা হতে হবে, আর হলেই বক্তৃতা দিতে হবে।

কুলি মাল নিয়ে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে দেখে দুজনে আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

'একেই বলে খ্যাখ্—খ্যাতির বি—ইড়ম্বনা।'

অরূপবাবু কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন এই তোতলা সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ করে ঝুনি পিন্টু চুম্‌কি শান্তনু বাবুন প্রসেনজিৎ আর নবনীতার মুখের অবস্থা কীরকম হবে। কল্পনায় যেটা দেখলেন সেটা তাঁর মোটেই ভাল লাগল না।

'একটা কাজ করবেন?'—গেটের বাইরে এসে অরূপবাবু প্রশ্ন করলেন।

'কী?'

'আপনার ছুটিটা ভক্তদের উৎপাতে মাঠে মারা যাবে এটা ভাবতে মোটেই ভাল লাগছে না।'

'আমারও না।'

'আমি বলি কি আপনি সি-ভিউতে যাবেন না।'

'তাৎ-তা হলে?'

'সি-ভিউয়ের খাওয়া ভাল না। আমি ছিলাম সাগরিকায়। এখন আমার ঘরটা খালি। আপনি সেখানে চলে যান।'

'ও।'

'আর আপনি নিজের নামটা ব্যবহার করবেন না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আপনি গোঁফটা কামিয়ে ফেলতে পারেন।'

'গোঁ-গোঁ—?'

'এক্ষুনি। ওয়েটিং রুমে চলে যান, দশ মিনিটের মামলা। এটা করলে আপনার নির্ঝঞ্ঝাট ছুটিভোগ কেউ রুখতে পারবে না। আমি বরং কাল কলকাতায় ফিরে আপনার নামে সি-ভিউতে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেব আপনি আসছেন না।'

প্রায় বিশ সেকেন্ড লাগল অমলেশ মৌলিকের কপাল থেকে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হতে। তারপর তাঁর ঠোঁটের আর চোখের দুপাশে নতুন রেখা দেখা দিল। মৌলিক হাসছেন।

'আপনাকে যে কিক্—কি বলে ধ-ধ-ধ—'

'কিচ্ছু বলতে হবে না। আপনি বরং এই বইগুলোতে একটা করে সই দিন। আসুন এই নিমগাছটার পিছনে—কেউ দেখতে পাবে না।'

গাছের আড়ালে গিয়ে ভক্তের দিকে চেয়ে একটা মোলায়েম হাসি হেসে পকেট থেকে লাল পার্কার কলমটি বার করলেন অমলেশ মৌলিক। প্রাইজ পাবার দিনটি থেকে শুরু করে অনেক কাগজ অনেক কালি খরচ করে তিনি একটি চমৎকার সই বাগিয়েছেন। পাঁচটি বইয়ে পাঁচটি সই। তিনি জানেন যে তাঁর জিভ তোতলালেও কলম তোতলায় না।

সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৮১

ফটিকচাঁদ

ও যে কখন চোখ খুলেছে, ও জানে না। চোখে কিছু দেখার আগে ও বুঝেছে ওর শীত করছে, ওর গা ভিজে, ওর পিঠের তলায় ঘাস, ওর মাথার নীচে একটা শক্ত জিনিস। আর তার পরেই বুঝেছে ওর গায়ে অনেক জায়গায় ব্যথা। তবু ডান হাতটাকে তুলে আস্তে আস্তে ভাঁজ করে মাথার পিছনে নিতেই হাতে ঠাণ্ডা পাথর ঠেকল। বড় পাথর, হাত দিয়ে সরাতে পারবে না। তার চেয়ে মাথাটা সরাই না কেন ? ও তাই করল, আর তাতে ও আর একটু চিত হয়ে গেল।

এবার ও বুঝল, ও দেখতে পাচ্ছে। এতক্ষণ পায়নি তার কারণ এখন রাত, আর ও শুয়ে আছে আকাশের নীচে, আর আকাশে মেঘ ছিল। এখন মেঘ সরে যাচ্ছে আর জ্বলজ্বলে তারাগুলো বেরিয়ে আসছে।

ও বুঝতে চেষ্টা করল, ওর কী হয়েছে। এখন ও উঠবে না। আগে বুঝে নেবে ওর কী হয়েছে ;—ও কেন ঘাসের উপর শুয়ে আছে, কেন ওর গায়ে ব্যথা, কেন ওর মাথাটা দপদপ করছে।

ওটা কীসের শব্দ হচ্ছে একটানা ?

একটু ভাবতেই ওর মনে পড়ল। ওটাকে বলে ঝিঁঝি পোকা। ঝিঁঝি ডাকছে। ঝিঁঝি ডাকে কি ? না, ডাকে না। ঝিঁঝি পাখি নয়, ঝিঁঝি পোকা। এটা ও জানে। কী করে জানল ? কে বলেছে ওকে ? ওর মনে নেই।

ও ঘাড়টা একটু কাত করল। মাথাটা ঝনঝন করে উঠল। তা করুক। ও বেশি না নড়ে এদিক-ওদিক দেখে নেবে। ও এখন এ-সময়ে এখানে কেন, সেটা জানতে হবে।

ওটা কী ? তারাগুলো আকাশ থেকে নেমে এল নাকি ?

না। মনে পড়েছে। ওগুলো জোনাকি। জোনাকি অন্ধকারে দপদপ করে জ্বলে আর ঘুরে ঘুরে ওড়ে। জোনাকির আলো ঠাণ্ডা আলো। হাতে নিলে গরম লাগে না। কে বলেছে ওকে ? মনে নেই।

জোনাকি মানে ওখানে গাছ। গাছের আশেপাশেই জোনাকি ঘোরে। আর ঝোপেঝাড়ে ঘোরে জোনাকি। ওখানে অনেক জোনাকি। ওই যে কাছে, আবার একটু দূরে, আবার অনেক দূরে। তার মানে অনেক গাছ। অনেক গাছ একসঙ্গে থাকলে কী বলে ? মনে পড়ছে না।

ও এবার অন্য দিকে মাথা ঘোরাল। আবার মাথাটা টনটন করে উঠল।

ওদিকেও অনেক গাছে অনেক জোনাকি। গাছের মাথা আকাশে মিশে গেছে, দুটোই এত কালো। আকাশে তারা এক জায়গায় থেমে জ্বলজ্বল করছে, গাছে জোনাকি ঘুরে ঘুরে জ্বলজ্বল করছে।

ওদিকের গাছগুলো দূরে, কারণ মাঝখানে রাস্তা। রাস্তায় ওটা কী ? আগে দেখেনি, এখন দেখছে, ক্রমে দেখছে।

একটা গাড়ি। দাঁড়িয়ে আছে। না, দাঁড়িয়ে না ; একপাশে কাত হয়ে আছে। গাড়ির পিছনটা এখন ওর দিকে।

ওটা কার গাড়ি ? ও ছিল কি ওটার মধ্যে ? কোথাও যাচ্ছিল কি ? ও জানে না। ওর মনে নেই।

গাড়িটাকে দেখে কেন জানি ভয় করল ওর। শুধু ও আর গাড়ি—আর কেউ নেই। কোনও

মানুষ নেই ; শুধু ও নিজে মানুষ। আর গাড়িটা কাত হয়ে ওর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ও জানে, উঠলে ব্যথা লাগবে। তাও ও উঠল। উঠেই আবার পড়ে গেল। তারপর আবার উঠে এগিয়ে গেল গাছের দিকে, গাড়ির উলটো দিকে।

এটা জঙ্গল। একে বলে জঙ্গল। মনে পড়েছে। এখনও রাত। এখনও অন্ধকার। তাও বোঝা যায় জঙ্গল। একটু একটু দেখতে পাচ্ছে ও। তারার আলোয় তা হলে দেখা যায়। চাঁদের আলোয় আরও বেশি। সূর্যের আলোয় সব কিছু।

ও তিনটে গাছ পেরিয়ে চারের পাশে এসে থেমে গেল। ওর সামনে শুধু গাছ নয়, আরও কিছু আছে। একটু দূরে। ও গাছের গুঁড়ির পিছনে নিজেকে আড়াল করে মাথাটা বার করে ভাল করে দেখল।

একপাল জন্তু। তারা একসঙ্গে হাঁটছে, তাই খসখস শব্দ হচ্ছে। ঝিঁঝির শব্দ কমে এসেছে, তাই পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওই যে মাথায় শিং—একটার, দুটোর...আর-একটার। ওগুলোকে হরিণ বলে। ওর মনে আছে। একটা হরিণ হঠাৎ থেমে মাথা তুলে দাঁড়াল। অন্যগুলোও দাঁড়াল। কী যেন শুনছে।

এবার ও-ও শুনল। একটা গাড়ির আওয়াজ। দূর থেকে এগিয়ে আসছে গাড়িটা।

হরিণগুলো পালাল। লাফ দিয়ে দৌড় দিয়ে পালাল। এই ছিল, এই নেই। সবগুলো একসঙ্গে।

গাড়িটা এগিয়ে আসছে। এবার ও অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে। পিছনের আকাশ আর তেমন কালো নেই। গাছের মাথা আকাশ থেকে আলগা হয়ে গেছে। তারাগুলো ফিকে হয়ে গেছে।

ও আবার উলটো দিকে ঘুরল। এবার বোধহয় গাড়িটাকে দেখা যাবে। ও এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে, কিন্তু জোরে হাঁটতে পারল না। ওর পায়ে বেশ ব্যথা। খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

গাড়িটা এসে চলে গেল। একে বলে লরি। সবুজ রঙের লরি, তাতে বোঝাই করা মাল।

কাত-হওয়া গাড়িটার পাশে এসে লরিটা একটু আস্তে চলল, কিন্তু থামল না।

পা টেনে টেনে ও আবার রাস্তায় পৌঁছল। এখন আলো বেড়েছে, তাই পরিষ্কার দেখল গাড়িটাকে। গাড়ির সামনেটা দুমড়ে তুবড়ে কুঁচকে আছে। ঢাকনাটা আধখোলা হয়ে বেঁকে ভেঙে হাঁ হয়ে আছে। সামনের দরজাটা খোলা। একটা মানুষের মাথার চুল। মানুষটা চিত হয়ে আছে। তার মাথাটা খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে আছে। মাথার নীচে রাস্তাটা ভিজে।

গাড়ির পিছনেও একটা লোক। তার শুধু হাঁটুটা দেখা যাচ্ছে জানলা দিয়ে। তার প্যান্টের রঙ কালো। গাড়িটার রঙ হালকা নীল। গাড়ির আশেপাশে রাস্তার অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাচ। টুকরো টুকরো কাচ টুকরো টুকরো আকাশ। আকাশে এখন আলো।

ঝিঁঝি আর ডাকছে না। একটা পাখি ডাকল। তিনবার ডাকল। সরু শিসের মতো ডাক।

ও আবার গাড়িটাকে দেখে ভয় পেল। রাস্তায় কাচ আর লাল দেখে ভয় পেল। লাল আর কোথাও নেই। হ্যাঁ, আছে। ওর জামায় আছে, হাতে আছে, মোজায় আছে। ও আর থাকবে না এখানে। ওই যে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। দূরে বোধহয় বন শেষ হয়েছে, কারণ ওদিকটা অনেক খোলা।

ও এগিয়ে চলল যেদিকে বনের শেষ হয়েছে, সেইদিকে। ও পারবে যেতে। ও এটা বুঝেছে যে, ও খুব বেশি জখম হয়নি। জখম হয়েছে ওই দুটো লোক। কিংবা মরে গেছে। ওর নিজের মাথার ব্যথাটা যদি কমে যায়, আর কনুইয়ের কাটাটা যদি শুকিয়ে সেরে যায়, আর পা যদি খুঁড়িয়ে চলতে না হয়, তা হলে কেউ ওকে 'কেমন আছো' জিজ্ঞেস করলে ও বলতে পারবে—ভালই।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ওর যে কেন কিছু মনে পড়ছে না সেটা ও বুঝতেই পারছে না। আজ এই কিছুক্ষণ আগে আকাশে তারা দেখার আগের কোনও কথাই ওর মনে নেই। এমনকী, ওর নিজের নামটাও না। ও শুধু জানে ওখানে একটা ভাঙা গাড়ি, তাতে দুটো লোক পড়ে আছে আর নড়ছে না। ও জানে এটা রাস্তা, ওটা ঘাস, ওগুলো গাছ, মাথার উপর আকাশ, আকাশের একটা দিক এখন লাল, তার মানে সূর্য উঠবে, তা হলে এটা সকাল।

ও হাঁটছে। পাখির ডাকে কান পাতা যায় না। এবার গাছগুলো চেনা যাচ্ছে। ওটা বট, ওটা আম, ওটা শিমুল, ওটা—ওটা কী ? পেয়ারা না ? ওই তো পেয়ারা হয়ে আছে।

পেয়ারা চিনেই ওর খিদে পেল। ও গাছটার দিকে এগিয়ে গেল রাস্তা থেকে নেমে। ভাগ্যিস পেয়ারা, ভাগ্যিস আম না। আমগাছে আম আছে, কিন্তু ও জানে ওর গায়ে ব্যথা, ও গাছে চড়তে পারবে না। পেয়ারাটা হাতের কাছে। পরপর দুটো খেল ও।

বনের শেষে রাস্তা আর-একটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। কোনদিকে যাবে ও ? ও জানে না। শেষে না ভেবে ডাইনে ঘুরে কিছুদূর গিয়ে আর না পেরে ও একটা নাম-না-জানা গাছের নীচে বসে পড়ল। গাছের গুঁড়িতে সাদা-কালো ডোরা কাটা। শুধু এ গাছটায় নয়, রাস্তার দু' দিকে যতদূরে যত গাছ দেখা যায় সবটাতে ডোরা কাটা। কে দিয়েছে, কেন দিয়েছে সাদা-কালো রঙ, তা ও অনেক ভেবেও বুঝতে পারল না।

আর ভাবতে চায় না ও। মাথাটা আবার দপদপ করছে। আর সেই সঙ্গে বুঝতে পারল, ওর নাকটা কুঁচকে যাচ্ছে, ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

একটা জোরে শ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখটা জলে ভরে গেল। আর তারপরেই ওর চোখের সামনে থেকে গাছ, রাস্তা, সাদা-কালো হলদে-সবুজ সব মিশে মুছে হারিয়ে ফুরিয়ে গেল।

॥ ২ ॥

ওর সামনে একটা মানুষের মাথা নড়ছে। দাড়িওয়ালা পাগড়িওয়ালা মানুষের মাথা। না, মানুষটা নড়ছে না, আসলে ও নিজেই নড়ছে। মানুষটা ওর গা ধরে নাড়া দিচ্ছে।

'দুধ পী লো বেটা—গরম দুধ।'

লোকটার হাতে একটা কাচের গেলাসে দুধ থেকে একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

এবার ও বুঝল। একটা লরির পিছনে ও শুয়ে আছে। লরিতে মাল, মালের একপাশে, যেদিকটা খুলে যায় লরির, সেইদিকে একটুখানি জায়গাতে ও একটা চাদরের উপর শুয়ে আছে। ওর গায়েও একটা চাদর, আর মাথার নীচে পুঁটলি-করা কিছু কাপড়।

লোকটার কাছ থেকে গেলাসটা নিয়ে ও উঠে বসল। লরির একপাশে রাস্তা, অন্যদিকে একটা খাবারের দোকান। দোকানের সামনে কয়েকটা বেঞ্চি পাতা, তাতে তিনজন লোক বসে চা খাচ্ছে। আরও দোকান রয়েছে রাস্তার দু' ধারে। একটায় বোধহয় গাড়ি মেরামত হয়; সেখান থেকে ঠুকঠাক আওয়াজ আসছে। দোকানটার সামনে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে একজন শার্ট আর প্যান্ট পরা লোক রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছছে।

পাগড়ি-পরা লোকটা দোকানের দিকে চলে গিয়েছিল, আবার ওর দিকে এগিয়ে এল। ওর পিছন পিছন বেঞ্চির লোকগুলোও এগিয়ে এল।

'কেয়া নাম হ্যায় তুম্‌হারা?' পাগড়িওয়ালা লোকটা জিজ্ঞেস করল। ওর হাতে এখনও দুধের গেলাস, অর্ধেক খাওয়া হয়েছে। খুব ভাল দুধ, খুব ভাল লাগছে খেতে।

ও বলল, 'জানি না।'

'কেয়া জানি না? তুম বাংগালি আছে?'

ও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। নিশ্চয়ই বাঙালি। এতক্ষণ অবধি ও যা ভেবেছে সবই তো বাংলাতে।

'তোমার ঘর কুথায়? চোট লাগা ক্যায়সে? সাথে আউর আদমি ছিল? তারা কুথায় গেল?'

'জানি না, আমার মনে নেই।'

'কী ব্যাপার? ছেলেটি কে?'

সেই কালো গাড়ির লোকটা এগিয়ে এসেছে লরির দিকে। মাথায় বেশি চুল নেই, কিন্তু বয়স বেশি না। লোকটা চোখ কুঁচকে একদৃষ্টে দেখছে ওর দিকে। পাগড়িওয়ালা হিন্দিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। খুব সহজ। রাস্তার ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লরিতে তুলে নিয়ে আসে। পরিচয় পেয়ে যদি দেখে কলকাতার ছেলে, তা হলে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেবে।

বাঙালি ভদ্রলোক এবার আরও কাছে এলেন।

'তোমার নাম কী?'

নামটা ভুলে গিয়ে ওর খুব মুশকিল হয়েছে। ওকে আবার 'জানি না' বলতে হল, আর পাগড়িওয়ালা হো-হো করে হেসে উঠল। '—জানি না, জানি না ছোড়কে আউর কুছ বোলতা হি নেহি।'

'জানি না মানে কী? ভুলে গেছ?'

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক ওর কনুইয়ের জখমটা দেখলেন।

'আর কোথায় লেগেছে?'

ও হাঁটুর ছড়াটা দেখিয়ে দিল।

'মাথায় লেগেছে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখি, মাথা হেঁট করো।'

ও হেঁট করলে পর ভদ্রলোক ফোলা জায়গাটা ভাল করে দেখলেন। হাত দিতে ব্যথা লাগায় ও শিউরে উঠেছিল।

'একটু কেটেওছে বোধহয়। চুলের মধ্যে রক্ত জমে আছে মনে হচ্ছে।...তুমি নামতে পারবে? দেখো তো—এসো।'

ও হাতের গেলাস পাগড়িওয়ালাকে দিয়ে পা ঝুলিয়ে হাত বাড়াতেই ভদ্রলোক ওকে খুব সাবধানে ব্যথা না লাগিয়ে নামিয়ে নিলেন। তারপর পাগড়িওয়ালার সঙ্গে ভদ্রলোক কথা বলে নিলেন।

খড়্গপুর আর ত্রিশ মাইল দূর। ওখানে ডিসপেনসারিতে গিয়ে ওকে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক ওকে সঙ্গে করে সোজা চলে যাবেন কলকাতা।

'সিধা থানা মে লে যাইয়ে,' পাগড়িওয়ালা বলল। 'কুছ গড়বড় হুয়া মালুম হোতা।'

থানা যে কী জিনিস, সেটা বুঝতে ওর কিছুটা সময় লাগল। তারপর 'পুলিশ' কথাটা কানে আসতে ওর বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে উঠল। পুলিশ চোর ধরে। শাস্তি দেয়। ও চুরি করেছে বলে তো ও জানে না!

ভদ্রলোক নিজেই গাড়ি চালান। সামনে ওকে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। গাড়ি ছাড়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই দোকান ঘর-বাড়ি শেষ হয়ে গিয়ে খোলা মাঠ পড়ল। ও বুঝতে পারছিল যে, ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আড়চোখে ওর দিকে দেখছেন। কিছুক্ষণ পরেই উনি আবার প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন।

'তুমি কলকাতায় থাকো?'

ও তাতেও বলল, 'জানি না।'

'তোমার বাপ মা ভাই বোন কারুর কথা মনে পড়ছে না?'

'না।'

তারপর ও নিজে থেকেই রাত্তিরের ঘটনাটা বলল। ভাঙা গাড়ির কথাটা বলল। দুটো লোকের কথা বলল।

'গাড়ির নম্বরটা দেখেছিলে?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'লোকগুলো কী রকম দেখতে, মনে আছে?'

ওর যা মনে আছে, বলল। বাকি রাস্তা ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে রইলেন, আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

এখন দুটো বেজেছে, সেটা ও ভদ্রলোকের হাতঘড়িটা দেখে জেনে নিয়েছে। একবার ভেবেছিল ও বলবে যে, ওর খিদে পেয়েছে, শুধু দুটো পেয়ারা আর এক গেলাস দুধে পেট ভরেনি; কিন্তু সেটা আর বলার দরকার হল না। যেখানে রাস্তার ধারে 'খড়্গপুর ১২ কিলোমিটার' লেখা পাথরটা রয়েছে, তার পাশেই একটা গাছের তলায় ভদ্রলোক গাড়িটা দাঁড় করিয়ে একটা সাদা কাগজের বাক্স খুলে তার থেকে লুচি আর আলুর তরকারি বার করে ওকে দিলেন, আর নিজেও নিলেন। চ্যাপ্টা সাদা গোল জিনিসটার নাম যে লুচি, সেটা ওর কিছুতেই মনে পড়ছিল না, শেষে আকাশে অনেকগুলো পাখিকে একসঙ্গে উড়তে দেখে 'চিল' মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'লুচি' মনে এসে গেল।

পাথরের ফলকের নম্বর বারো থেকে কমতে কমতে দুই হবার পরেই খড়্গপুর শহর দেখা গেল। ভদ্রলোক বললেন, 'খড়্গপুর এসেছ কখনও?'

ওর খড়্গপুর নামটাই মনে নেই, এসেছে কিনা জানবে কী করে? দেখে মনে হল ও কোনও দিন এখানে আসেনি। ভদ্রলোক বললেন, 'এখানে একটা বড় ইস্কুল আছে, তাকে বলে আই আই টি।'

আই আই টি কথাটা ওর মাথার মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে শহরের শব্দ বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল।

একটা চৌমাথায় একটা পুলিশ দেখেই ওর বুকটা আবার কেঁপে উঠল, আর ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'আমার পুলিশ ভাল লাগে না।'

ভদ্রলোক রাস্তার দিকে চোখ রেখেই বললেন, 'পুলিশে খবর দিতেই হবে। ও নিয়ে তুমি কথা বোলো না। তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে, তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়। তোমার বাপ-মা আছেন নিশ্চয়ই। তুমি তাঁদের ভুলে গেলেও তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাকে ভোলেননি। তুমি কে, সেটা জানতে হলে পুলিশের কাছে যেতেই হবে, আর তারাই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে। পুলিশ তো খারাপ নয়। পুলিশ অনেক ভাল কাজ করে।'

শংকর ফার্মেসির ডাক্তার ওর ছড়ে-যাওয়া জায়গাগুলোতে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন, মাথায় বরফ

লাগিয়ে দিলেন, কনুইয়ের উপর ওষুধ দিয়ে তুলো লাগিয়ে তার উপর একটা আঠাওয়ালা তাপ্পি মেরে দিলেন। এবার যিনি ওকে এনেছিলেন, তিনি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের এখানে থানাটা কোথায় ?'

ডাক্তার কিছু বলার আগেই ও বলল, 'আমি একটু বাথরুমে যাব।'

'এসো আমার সঙ্গে,' বলে ডাক্তারবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

ডাক্তারখানার পিছন দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা বারান্দা। সেই বারান্দার শেষ মাথায় একটা দরজা দেখিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু।

ও দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিল। তারপর সত্যি করেই বাথরুমের কাজ সেরে আর-একটা বন্ধ দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এটা একটা গলি। ডাইনে গেলেই বড় রাস্তা। তার মানে ধরা পড়ার ভয়। ও বাঁয়ে ঘুরল। কোথায় যাচ্ছে জানে না, তবে পুলিশের কাছে নয় এটা ভেবেই ফুর্তি। ওর কনুইয়ের ব্যান্ডেজ, ময়লা কাপড়, রক্তের দাগ, খুঁড়িয়ে হাঁটা—এই সবের জন্যেই বোধহয় রাস্তার কিছু লোক ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না ওকে।

ও এগিয়ে চলল। ট্রেনের ভোঁ শোনা যাচ্ছে।

গলিটা শেষ হতেই একটা বেশ বড় রাস্তা পড়ল। এ রাস্তায় অনেক লোক, সবাই ব্যস্ত, কেউ ওর দিকে চাইছে না। বাঁ দিকে লোহার রেলিং-এর ওপারে রেলের লাইন। অনেকগুলো পাশাপাশি লাইন ; তার মধ্যে একটাতে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিনের ভোঁ শোনা যাচ্ছে খুব জোরে আর কাছে। সামনে লাইনের পাশে একটা লোহার ডাণ্ডার মাথায় অনেকগুলো আড়াআড়ি ছোট ডাণ্ডা, তাদের গায়ে লাল-সবুজ গোল গোল আলো। কী যেন বলে ওগুলোকে ? ওর মনে পড়ল না।

ওই যে সামনে স্টেশন। বেশ বড় স্টেশন। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে প্ল্যাটফর্মে লোকের ভিড়।

ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্টেশনের ভিতর গিয়ে ঢুকল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা। ভোঁ বেজে উঠল ইঞ্জিনের দিক থেকে। ওর মনটা ছটফটিয়ে বলে উঠল—তোমাকে উঠতে হবে এই গাড়িতে। এই সুযোগ। এইবেলা উঠে পড়ো!

ওর সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে লোক ছুটোছুটি করছে। পিছন থেকে একটা পুঁটলির ধাক্কায় ও প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে সামলে এগিয়ে গিয়েই দেখল, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। গাড়িগুলো সরে সরে যাচ্ছে ওর সামনে দিয়ে। ও আরও এগোল। সব দরজা বন্ধ। খোলা দরজা না পেলে ও উঠবে কী করে ?

ওই একটা দরজা খোলা। ও কি পারবে উঠতে ? পারবে না। ওর হাতে জোর নেই। পায়ে জোর নেই। তবু মন বলছে এই সুযোগ, এগিয়ে যাও।

ও এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে দিল। ওই যে দরজা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হবে। তারপর হাতল ধরে লাফ। পা হড়কালেই ফসকে গিয়ে একেবারে—

ওর পা আর মাটিতে নেই। পা ফসকায়নি। একটা হাত কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ওর কোমর জাপটে ধরে হুশ করে ওকে কামরায় তুলে নিল। আর তারপরেই শুনল ও ধমক—

'ইয়ার্কি হচ্ছে ? মারব নাকি ল্যাঙা ঠ্যাঙে ঠ্যাঙার বাড়ি ?'

॥ ৩ ॥

ও এখন বেঞ্চিতে বসে হাঁপাচ্ছে। এত জোরে শ্বাস নিতে হচ্ছে যে, কথা বলতে চাইলেও পারবে না। ও লোকটার দিকে চেয়ে আছে। ধমক দিলে কী হবে—মুখ দেখে মনে হয় না খুব বেশি রাগ করেছে। কিংবা হয়তো প্রথমে রেগেছিল, এখন ওকে ভাল করে দেখে রাগটা কমে গেছে। এখন ওর চোখে চালাক হাসি, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতগুলোতে রোদ পড়ে হাসি আরও খোলতাই হয়েছে।

দেখে মনে হয় লোকটার মাথায় হাজার বুদ্ধি কিলবিল করে, আর সেগুলো খাটিয়ে সারাটা জীবন সে চালিয়ে দিতে পারে।

কামরায় আরও লোক রয়েছে, কিন্তু ওদের বেঞ্চিতে কেবল ওরা দু'জন। সামনের বেঞ্চিতে তিনজন বুড়ো পাশাপাশি বসে আছে। একজন বসে বসেই ঘুমোচ্ছে, একজন এইমাত্র এক-চিমটে কালো গুঁড়ো নিয়ে নাকের ফুটোর সামনে ধরে হাতটাকে ঝাঁকি দিয়ে শ্বাস টেনে নিল। আর-একজন খবরের কাগজ পড়ছে। ট্রেনের দুলুনি যত বাড়ছে, তাকে তত বেশি শক্ত করে কাগজটাকে ধরে চোখের কাছে নিয়ে আসতে হচ্ছে।

'এবার বলো তো চাঁদ, মতলবখানা কী ?'

লোকটার গলা গম্ভীর, কিন্তু হাসিটা এখনও যায়নি। সে এমনভাবে চেয়ে আছে ওর দিকে, যেন চাহনির জোরেই ওর মনের সব কথা জেনে যাবে।

ও চুপ করে রইল। মতলব তো পুলিশের কাছ থেকে পালানো ; কিন্তু সেটা ও বলতে পারল না।

'পুলিশ ?'—ওর মনের কথা জেনে তাক্ করে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'চালের ব্যাপার ?'—লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল। এই নিয়ে পর পর তিনটে প্রশ্ন করল, যার একটারও উত্তর ও দেয়নি।

'উঁহু। তুমি ভদ্দরলোকের ছেলে। চালের থলি কাঁধে নিয়ে ছুটবে এমন তাগদ নেই তোমার।'

ও এখনও চুপ করে আছে। লোকটাও ওর দিকে সেইভাবেই চেয়ে আছে।

'পেটে বোমা মারতে হবে নাকি ?'—এবার বলল লোকটা। তারপর কাছে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'আমাকে বলতে কী ? আমি কাউকে বলব না। আমিও ঘর-পালানো ছেলে, তোমার মতন।'

ও জানত যে, এবার লোকটা ওর নাম জিজ্ঞেস করবে, তাই ও উলটে ওকেই ওর নাম জিজ্ঞেস করে ফেলল। লোকটা বলল, 'আমার নামটা পরে হবে, আগে তোমারটা শুনি।'

বারবার 'জানি না' বলতে ওর মোটেই ভাল লাগছিল না। খড়্গপুর ডাক্তারখানার উলটো দিকে একটা দোকানের দরজার উপরে ও একটুক্ষণ আগেই একটা নাম দেখেছে। সাদা টিনের বোর্ডে কালো দিয়ে লেখা—'মহামায়া স্টোর্স', আর তার নীচে 'প্রোঃ ফটিকচন্দ্র পাল'। ও তাই ফস করে বলে দিল—'ফটিক'।

'ডাক-নাম না ভাল-নাম ?'

'ভাল নাম।'

'পদবি কী ?'

'পদবি ?'

পদবি কথাটার মানের জন্য ওকে কিছুক্ষণ মাথার মধ্যে হাতড়াতে হল।

'পদবি বোঝো না ?'—লোকটা বলল। 'তুমি কি সাহেব ইস্কুলে পড়ো নাকি ? সারনেম। সারনেম বোঝো ?'

সারনেম ও আরওই বোঝে না।

'নামের শেষে যেটা থাকে,' লোকটা ধমক দিয়ে বলল। 'যেমন রবির শেষে ঠাকুর।...তুমি সত্যিই বোকা, না বোকা সেজে রয়েছ, সেটা আমাকে জানতে হবে।'

'নামের শেষে' বলাতেই ও বুঝে ফেলেছে। বলল, 'পাল। পদবি পাল। আর মাঝখানে চন্দ্র। ফটিকচন্দ্র পাল।'

লোকটা একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল। তারপর তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যে লোকটা ঝড়াকসে নিজের একটা নাম বানিয়ে বলতে পারে, সেও আর্টিস্ট। এসো, হারুনের সঙ্গে হাত মেলাও ফটিকচাঁদ পাল। হারুন, মাঝখানে অল, শেষে রসিদ। বোগ্‌দাদের খলিফা, জগ্‌লরের বাদশা।'

ও হাতটা বাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু লোকটা ওর বানানো নাম বিশ্বাস করল না বলে ওর একটু রাগ

হল।
'তুমি যে-বাড়ির ছেলে', লোকটা সটান ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেসব বাড়ি থেকে ফটিক নামটা উঠে গেছে সিরাজদ্দৌলার আমল থেকে। —দেখি তোমার হাতের তেলো।'
ও কিছু বলার আগেই লোকটা ওর ডান হাতটা খপ্ করে ধরে তেলোটা দেখে নিয়ে বলল, 'হুঁ...বাসের রড ধরে ঝুলতে হয়নি কস্মিনকালেও।...শার্টের দাম কম-সে-কম ফর্টি ফাইভ চিপ্‌স...টেরিকটের প্যান্ট..নো মাদুলি...লাস্ট টিকে-টা উঠেছিল কি ? হুঁ...সেলুনে ছাঁটা চুল, খুব বেশিদিন না...পার্ক স্ট্রিটের সেলুন কি ? তাই তো মনে হচ্ছে ?...'
লোকটা আবার চেয়ে আছে ওর দিকে ; হয়তো চাইছে ও কিছু বলুক। ও বাধ্য হয়েই বলল, 'আমার কিচ্ছু মনে নেই।'
লোকটার চোখ দুটো হঠাৎ খুদে খুদে আর জ্বলজ্বলে হয়ে গেল।
'বোগ্‌দাদের খলিফের সঙ্গে ফচকেমো করতে এসো না চাঁদ। ওসব কারচুপি খাটবে না আমার কাছে। তুমি অনেক ভাজা মাছ উলটে খেয়েছ। সাহেবি ইস্কুলের তালিম তোমার, হুঁ-হুঁ ! ব্যাড কোম্পানি হয়ে এখন বাপের খপ্পর থেকে ছট্‌কে বেরিয়ে এসেছ। আমি কি আর বুঝি না ? কনুইয়ে চোট লাগল কী করে ? মাথা ফুলেচে কেন ? ল্যাংচাচ্চ কেন ? যা বলবার সাফ বলে ফেলো তো চাঁদ ! নইলে ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব জকপুরে গাড়ি থামলেই। ...বলো, বলে ফেলো।'
ও বলল। সব বলল। ওর মনে হল, একে বলা যায়। এ লোকটা ক্ষতি করবে না ওর, ওকে পুলিশে দেবে না। আকাশে তারা দেখা থেকে আরম্ভ করে বাথরুমের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব বলল।
লোকটা শুনে-টুনে কিছুক্ষণ চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরের চলন্ত মাঠঘাটের দিকে চেয়ে ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার তো তা হলে একটা ডেরা লাগবে কলকাতায়। আমি যেখানে থাকি, সেখানে তো তোমার থাকা পোষাবে না।'
'তুমি কলকাতায় থাকো ?'
'আগে থেকেছি। এখন আবার থাকব। ডেরা একটা আছে আমার এন্টালিতে। মাঝে-মধ্যে এদিক-সেদিক ঘুরতে বেরোই বাক্স নিয়ে। রথের মেলা, চড়কের মেলা, শিবরাত্তিরের মেলা। বিয়ে-শাদিতেও বায়না জুটে যায় টাইম টু টাইম। এখন আসছি কোয়েম্বাটোর থেকে। কোয়েম্বাটোর জানো ? মাদ্রাজে। তিন হপ্তা স্রেফ ইডলি-দোসা। এক সার্কাস কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে এসেছি। ভেঙ্কটেশ ট্রাপিজ দেখায় গ্রেট ডায়মন্ডে, আমার সঙ্গে দোস্তি হয়েছে। বলেছে চান্স হলেই জানাবে। আপাতত কলকাতা। শহিদ মিনারের নীচে ঘাসের উপর একফালি জায়গা, ব্যস্।'
'তুমি ঘাসের উপর থাকবে ?' ও জিজ্ঞেস করল। ও নিজে অনেকক্ষণ ঘাসের উপর শুয়ে ছিল, সেটা ওর মনে আছে।
লোকটা বলল, 'থাকব না, খেল দেখাব। ওই যে বেঞ্চির নীচে বাক্সটা দেখছ, ওর মধ্যে আমার খেলার জিনিস আছে। জাগ্‌লিং-এর খেলা। একটি জিনিসও আমার নিজের কেনা নয়। সব ওস্তাদের দেওয়া।'—ওস্তাদ কথাটা বলেই লোকটা তিনবার কপালে হাত ঠেকাল। —'তিয়াত্তর বছর বয়স অবধি খেল দেখিয়েছিল। তখনও চিরুনি দিয়ে দু' ভাগ করে আঁচড়ানো দাড়ির অর্ধেক কাঁচা। নমাজ পড়ার মতো করে বসে লাট্টু ছুড়েছে আকাশে, তারপর তেলোটা চিত করে হাতটা বাড়িয়েছে ধরবে বলে—হঠাৎ দেখি, ওস্তাদ হাত টেনে নিয়ে দু' হাত দিয়ে বুক চেপে দুমড়ে গেল। লাট্টু আকাশ থেকে নেমে এসে ওস্তাদের পিঠের দুই পাখনার মধ্যিখানে শিরদাঁড়ার উপর পড়ে ঘুরতে লাগল—পাবলিক ক্ল্যাপ দিচ্ছে, ভাবছে বুঝি নতুন খেলা—কিন্তু ওস্তাদ আর সোজা হল না।'
লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে জানলার বাইরে চেয়ে থেকে বোধহয় ওস্তাদের কথাই ভাবল। তারপর বলল, 'উপেনদাকে বলে দেখব, যদি তোমার একটা হিল্লে করে দিতে পারেন। অবিশ্যি পুলিশ লাগবে তোমার পেছনে, সেটা বলে দিলাম।'
ওর মুখ আবার শুকিয়ে গেল। লোকটা বলল, 'নিয়মমতো তোমাকে আমার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।'

'না-না !'—ও এবার বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল।

'ভয় নেই,' লোকটা একটু হেসে বলল, 'আর্টিস্টের নিয়মগুলো একটু আলাদা। নিয়ম যদি মানতাম গোড়া থেকেই, তা হলে তোমার সঙ্গে আজ এইভাবে থার্ড কেলাসে বসে কথা বলতে হত না। নিয়ম মানলে এই আপিস ভাঙার টাইমে অরুণ মুস্তাফি হয়তো ফিয়াট গাড়ি হাঁকিয়ে বি বি ডি বাগ থেকে বালিগঞ্জে ফিরত।'

একটা লোকের নাম ওর মাথায় ঘুরছিল। ও জিজ্ঞেস করল, 'উপেনদা কে ?'

লোকটা বলল, 'উপেনদা হল উপেন গুঁই। বেনটিং ইস্ট্রিটে চায়ের দোকান আছে।'

'হিল্লে কাকে বলে ?'

'হিল্লে মানে গতি। যাকে বলে ব্যবস্থা। —তুমি নিঘ্ঘাৎ সাহেব ইস্কুলে পড়েছ।'

॥ ৪ ॥

দারোগা দীনেশ চন্দ আর একবার রুমালটা বার করে কপালের ঘামটা মুছে একটা কেঠো হাসি হেসে বললেন, 'আপনি অতটা ইয়ে হবেন না স্যার। আমরা তো অনুসন্ধান চালিয়েই যাচ্ছি। আমরা—'

'মুণ্ডু !'—হেঁকে উঠলেন মিস্টার সান্যাল। 'আমার ছেলে কী অবস্থায় আছে সেটাই বলতে পারছেন না আপনারা !'

'মানে, ব্যাপারটা—'

'আপনি থামুন। আমাকে বলতে দিন। আমি আপনাদের কথাই বলছি। —চারজন লোক, এ গ্যাঙ অফ ফোর, বাবলুকে কিডন্যাপ করেছিল। তারা একটা নীল রঙের চোরাই অ্যামবাসাডরে করে ওকে নিয়ে ঘাটশিলা ছাড়িয়ে সিংভূমের দিকে যাচ্ছিল।'

'ইয়েস স্যার।'

'ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার করার দরকার নেই, আমাকে শেষ করতে দিন।...পথে একটা লরি ওদের গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালায়। মাঝরাত্তিরে। লরিটাকে পরে আপনারা ধরেছেন।'

'ইয়েস—' দারোগা সাহেব স্যারের আগে ব্রেক কষে নিজেকে কোনওমতে সামলে নিলেন।

'অ্যাকসিডেন্টে দু'জন লোক মারা যায়। সেই চারজনের মধ্যে দু'জন।'

'বঙ্কু ঘোষ আর নারায়ণ কর্মকার।'

'কিন্তু দলের পাণ্ডা বেঁচে আছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী নাম তার ?'

'তার আসল নামটা ঠিক জানা নেই।'

'চমৎকার।—কী নামে জানেন তাকে ?'

'স্যামসন।'

'আর অন্যটি ?'

'রঘুনাথ।'

'এও ছদ্মনাম ?'

'হতে পারে।'

'যাক্‌গে।...স্যামসন আর রঘুনাথ বলছেন বেঁচে আছে—অ্যাকসিডেন্টের পরে তারা পালায়। আর আপনারা বলছেন, বাবলু গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে।—'

'আজ্ঞে, দশ-বারো বছরের ছেলের সাইজের একটা জুতোর সোলের খানিকটা পাওয়া গেছে গাড়ি থেকে সাত হাত দূরে। রাস্তার পাশটা খানিকটা ঢালু হয়ে জঙ্গলের দিকে নেমে গেছে, সেই স্লোপের নীচের দিকে। তা ছাড়া রক্তের দাগও পাওয়া গেছে তার আশেপাশে। আর একটি নতুন ক্যাডবেরি চকোলেটের প্যাকেট।'

'কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি।'

'না স্যার।'

'জঙ্গলের ভিতর সার্চ করা হয়েছে ? না কি বাঘের ভয়ে সেটা বাদ গেছে ?'

দারোগাবাবু হালকাভাবে হাসতে গিয়ে না পেরে কেশে বললেন, 'ও জঙ্গলে বাঘ নেই স্যার। জঙ্গলে তো সার্চ করেইছি, এমনকী কাছাকাছির গ্রামক'টাও বাদ দিইনি।'

'তা হলে আপনারা কী রিপোর্ট করতে এসেছেন আমার কাছে ? সমস্ত ব্যাপারটা তো জলের মতো পরিষ্কার। স্যামসন আর রঘুনাথ বাবলুকে নিয়েই পালিয়েছে।'

দারোগা হাত তুলে মিস্টার সান্যালের কথা বন্ধ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মনে করে হাতটা নামিয়ে বললেন, 'আশার আলো দেখা গেছে, সেইটেই আপনাকে—'

'ওসব আলো-টালো থিয়েটারি বাদ দিয়ে সোজাসুজি বলুন।'

দারোগাবাবু আর একবার কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, 'অমরনাথ ব্যানার্জি বলে এক ভদ্রলোক—জুট কর্পোরেশনে কাজ করেন—ঘাটশিলা থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মোটরে করে ওই অ্যাকসিডেন্টের পরের দিন। উনি ঘাটশিলায় বাড়ি করেছেন ; বউ আর ছেলেকে—'

'ফ্যাকড়া বাদ দিন।'

'হ্যাঁ স্যার, স্যরি স্যার।—খড়্গপুর থেকে ত্রিশ মাইল আগে একটা লরিতে একটি ছেলেকে দেখেন। তার হাতে-পায়ে ইনজুরি ছিল। লরির ড্রাইভার বলে, ছেলেটিকে নাকি রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় কুড়িয়ে পায়, অ্যাকসিডেন্টের জায়গা থেকে মাইলখানেক উত্তরে, মেন রোডে। ভদ্রলোক ছেলেটিকে নিয়ে খড়্গপুরে একটা ডাক্তারখানায় যান। সেখানে ফার্স্ট এড দেবার পর ছেলেটি বাথরুমে যাবার নাম করে পালায়। ভদ্রলোক পুলিশে রিপোর্ট করেন।'

দারোগাবাবু থামলেন। মিস্টার সান্যাল এতক্ষণ তাঁর কাচের ছাউনি দেওয়া প্রকাণ্ড টেবিলটার উপর দৃষ্টি রেখে ভুরু কুঁচকে কথাগুলো শুনছিলেন, এ বার দারোগাবাবুর দিকে চোখ তুলে বললেন, 'এত কথা বললেন, আর ছেলেটি তার নামটা বলেছে কিনা বললেন না ?'

'ওইখানে একটা মুশকিল হয়েছে স্যার। ছেলেটির বোধহয় লস অফ মেমরি হয়েছে।'

'লস অফ মেমরি ?'—অবিশ্বাসে মিস্টার সান্যালের নাক চোখ ভুরু সব একসঙ্গে কুঁচকে গেল।

'সে নিজের নাম, আপনার নাম, কোথায় থাকে, কিচ্ছু নাকি বলতে পারেনি।'

'ননসেন্স !'

'অথচ চেহারার বর্ণনায় দস্তুরমতো মিল আছে।'

'কীরকম ? রঙ ফরসা, দোহারা চেহারা, চুল কোঁকড়া—এই তো ?'

'আজ্ঞে নীল প্যান্ট আর সাদা শার্টের কথাও বলেছে।'

'আর কোমরে জন্মদাগ বলেছে ? থুতনির নীচে তিলের কথা বলেছে ?'

'না স্যার।'

মিস্টার সান্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর হাতঘড়িটার দিকে দেখে বললেন, 'আজকে আমাকে কোর্টে যেতেই হবে। এ তিনদিন পারিনি দুশ্চিন্তায়। আমার তিন ছেলেকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। একটি আবার খড়্গপুরে আছে—আই আই টি-তে। ফোন করেছিল—আজই আসবে। অন্য দুটি বম্বে আর ব্যাঙ্গালোরে। আসবে নিশ্চয়ই, হয়তো দু-একদিন দেরি হবে। চিন্তা সবচেয়ে বেশি মাকে নিয়ে। বাবলুর মা নয়, আমার মা। বাবলুর মা বেঁচে থাকলে এ শক্ সইতে পারত না। আমি রাস্তা ঠিক করে ফেলেছি। ওই লোক দুটো যদি বাবলুকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে টাকা ডিমান্ড করবেই। যদি করে তো আমি সে টাকা দেব, দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে নেব। তারপর তারা ধরা পড়ল কি না-পড়ল, সেটা আপনাদের লুক-আউট, আই ডোন্ট কেয়ার।'

কথাটা বলে কলকাতার জাঁদরেল ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যাল তাঁর তিনদিক বইয়ে-ঠাসা আপিস-ঘরের শ্বেতপাথরের মেঝেতে জুতোর আওয়াজ তুলে দারোগা দীনেশ চন্দের কপালে নতুন করে ঘাম ছুটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

উত্তর কলকাতার একটা অখ্যাত চুল-ছাঁটাইয়ের দোকানে (প্রোঃ নরহরি দত্তরায়) দুটি লোক ঢুকে দুটো পাশাপাশি চেয়ারে বসে বিশ মিনিটের মধ্যে নিজেদের চেহারা সম্পূর্ণ পালটে নিল। যে বেশি জোয়ান আর বেশি লম্বা, যার কাঁধ দুটো ধরে পরেশ নাপিত চমকে উঠেছিল, তার ছিল চাপদাড়ি আর গোঁফ, আর মাথায় কাঁধ অবধি চুল। তার দাড়ি-গোঁফ বেমালুম সাফ হয়ে গেল, তার মাথার চুল হয়ে গেল দশ বছর আগে বেশিরভাগ লোক যেরকম চুল রাখত—সেই রকম। অন্য লোকটির ঝুলপি বাদ হয়ে গেল, সিঁথি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের জায়গায় রয়ে গেল শুধু একটা সরু গোঁফ। পরেশ আর পশুপতি তাদের পাওনার উপরি বাবদ ষণ্ডা লোকটার কাছ থেকে এমন একটা মুখ-বন্ধ-করা চাহনি পেল, যেটা তারা কোনওদিন অমান্য করতে পারবে না।

চুল ছাঁটার বিশ মিনিট পরে লোক দুটি শোভাবাজারের একটা গলিতে একটা ঘুণ-ধরা একতলা বাড়ির কড়া নাড়ল। দরজা খুললেন একজন বেঁটে শুকনো বুড়ো ভদ্রলোক। ষণ্ডা লোকটি তাঁর বুকের উপর পাঁচটা আঙুলের ডগার চাপ দিয়ে তাঁকে ভিতরে ঠেলে দিয়ে নিজেও ঢুকে গেল, আর সেইসঙ্গে অন্য লোকটাও ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। সময়টা সন্ধ্যা, ঘরে টিমটিম করে জ্বলছে একটা বিশ পাওয়ারের বাল্‌ব।

'চিনতে পারছ, দাদু ?'—বলল ষণ্ডা লোকটা বুড়োর উপর ঝুঁকে পড়ে।

বুড়োর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মাথার কাঁপুনির চোটে ইস্পাতের ফ্রেমের আদ্যিকালের চশমাটা নাকের উপর নেমে আসছে।

'কই-কে-কই না তো...'

ষণ্ডা লোকটা একটা বিশ্রী হাসি হেসে বলল, 'দাড়ি কামিয়েছি যে !—এই দ্যাখো—'

লোকটা বুড়োর মাথাটা টেনে এনে চশমাসুদ্ধু নাকটা নিজের গালে ঘষে দিল।

'গন্ধ পাচ্ছ না দাদু ? শেভিং সোপের খুশবু ? আমার নাম যে স্যামসন। এবার মনে পড়েছে ?'

বৃদ্ধ এবার কাঁপতে কাঁপতে তক্তপোশে বসে পড়লেন, কারণ লোকটা তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে।

'তোমার হুঁকো খাবার সময় ডিসটার্ব দিলুম—ভেরি স্যরি দাদু !'

স্যামসন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো হুঁকোটাকে তুলে নিয়ে কলকেটা মাথা থেকে খুলে নিল। তক্তপোশের উপর একটা ডেস্ক, তার উপর একটা খোলা পাঁজি। পাঁজির পাতার উপর চাপা-দেওয়া একটা ছ' কোনা পাথরের পেপারওয়েট। স্যামসন পেপারওয়েটটা সরিয়ে কলকেটা পাঁজির উপর ধরে উপুড় করতেই টিকেগুলো পাঁজির পাতার উপর পড়ল। তারপর কলকেটা ঘরের কোণে ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার টেনে নিয়ে তক্তপোশের সামনে বুড়োর মুখোমুখি বসে বলল, 'এবার বলো তো দিকি দাদু—গাঁট যদি কাটার ইচ্ছে থাকে তো সোজাসুজি কাটলেই হয় ; গনৎকারীর ভড়ং ধরেছ কেন ?'

বুড়ো কোন্‌দিকে চাইবে বুঝতে পারছে না। পাঁজির পাতা থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকে ঘরটার কড়িবরগার দিকে, পাতায় কালশিটে পড়ে গর্ত হয়ে যাচ্ছে, তামাকের গন্ধের সঙ্গে পোড়া কাগজের গন্ধ মিশে যাচ্ছে।

স্যামসন তার ঝাঁঝালো ফিসফিসে গলায় বলে চলল, 'সেদিন যে এলুম—এসে বললুম একটা বড় কাজে হাত দিতে যাচ্ছি, একটা ভাল দিন দেখে দাও। তুমি বই দেখে হিসেব করে বললে, আষাঢ়ের সাতুই। লোকে বলে, বাড়ির আলসেতে কাগ এসে বসলে ভৈরব ভট্‌চায তার ভাগ্য গুনে দিতে পারে। আমরাও বিশ্বাস করে এলুম, তুমি বলে-টলে গাঁট থেকে দশটি টাকা বার করে নিয়ে তোমার ওই কাঠের বাক্সের মধ্যে গুঁজে রেখে দিলে। তারপর কী হয়েছে জানো ?'

গনৎকার মশাই পাঁজি থেকে চোখ সরাতে পারছেন না বলেই বোধহয় রঘুনাথ লোকটি তাঁর থুতনি ধরে মুখটা ঘুরিয়ে স্যামসনের দিকে করে দিল। আর সেইসঙ্গে দুটো চোখের পাতাও আঙুল দিয়ে টেনে খুলে রাখল, যাতে ভট্‌চায মশাই স্যামসনের মুখ থেকে চোখ সরাতে না পারেন। চোখের ব্যাপারটা করার আগে অবিশ্যি ভট্‌চাযের চশমাটি খুলে তক্তপোশের উপর ফেলে দিয়েছিল

রঘুনাথ।

'বলছি শোনো,' বলল স্যামসন, 'যে গাড়িতে করে মাল নিয়ে যাচ্ছিলাম, এক শালা লরি তাতে মারে ধাক্কা। গাড়ি খোলামকুচি। লরি ভাগলওয়া। দো পার্টনার খতম। স্পট ডেড। আমার লোহার শরীর, তাই জানে বেঁচে গেছি। তাও মালাইচাকি ডিসলোকেট হতে হতে হয়নি। আর এই যে—এ আমার পার্টনার—এর তিন জায়গা জখম, ডান পাশে ফিরে ঘুমুতে পারছে না! ওদিকে যার জন্য এত মেহনত—সে মালটিও খতম। ...এসব তুমি গুনে পাওনি কেন?'

'আমরা তো বাবা ভগবান—'

'চ্যাওপ্!'

রঘুনার বুড়োর মাথাটা ছেড়ে তাকে খানিকটা রেহাই দিল, কারণ বাকি খেলাটা স্যামসন একাই খেলবে।

'এবার বার করো তো দেখি দাদু দশ ইনটু দশ।'

'আ-আমি—'

'চ্যাওপ্!'

স্যামসনের চাপা চিৎকারের সঙ্গেই তার হাতে একটা ছুরি এসে গেল, আর তার ভাঁজ-করা অদৃশ্য ফলাটা হাতলে একটা বোতাম টেপার ফলে 'সড়াৎ' শব্দে খুলে গেল।

ছুরি-সমেত হাতটা গনৎকারের দিকে এগিয়ে এল।

'দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি।'

ভৈরব জ্যোতিষীর থরথরে হাত প্রথমে তার ট্যাঁক, তারপর তার তেলচিটে-পড়া কাঠের ক্যাশবাক্সটার দিকে এগিয়ে গেল।

॥ ৬ ॥

এই পাঁচ দিনে ফটিক তার কাজ বেশ কিছুটা শিখে নিয়েছে। উপেনবাবু লোক ভাল হওয়াতে অবিশ্যি খুব সুবিধে হয়েছে। তিনি ফটিককে বারো টাকা মাইনে, থাকার জায়গা, আর খেতে দেবেন। এক মাসের মাইনে আগাম দিয়েছেন। উপেনবাবু যে লোক ভাল, সেটা ফটিক সত্যি করে বুঝেছে গতকাল। কাছেই একটা পানের দোকান থেকে উপেনবাবুর জন্য পান আনতে গিয়ে বিশু নামে আর-একটা পানের দোকানের ছেলের সঙ্গে ফটিকের আলাপ হয়। বিশুও সবে মাসখানেক হল কাজে ঢুকেছে। ঢোকার দু'দিনের মধ্যে সে একটা চায়ের কাপ ভাঙে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার একগোছা চুল মালিক বেণীবাবুর হাতে উঠে আসে, আর তারপরেই এক রাবুণে গাঁট্টার চোটে মাথায় আলু বেরিয়ে যায়। উপেনবাবু মারেন না। তিনি ধমক দেন, আর ধমকটা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে, আর ক্রমে সেটা বদলে গিয়ে একঘেয়ে উপদেশ হয়ে যায়। এই উপদেশটা খেপে খেপে দিনের শেষ অবধি চলতে থাকে। দ্বিতীয় দিনে ফটিক যখন কাচের গেলাসটা ভাঙল, তখন উপেনবাবু প্রথমে মেঝেতে ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর ফটিক যখন টুকরোগুলো গামছায় তুলছে, তখন তিনি মুখ খুললেন—

'কাচের জিনিসটা যে ভাঙলে, কিনতে পয়সা লাগে না? পয়সাটা দিচ্ছে কে? তুমি না আমি? এসব কথাগুলো কাজের সময় খেয়াল রেখো। কাজে ফুর্তি চাই ঠিকই, তার মানে এই নয় যে, হাতে গেলাস নিয়ে লাফাতে হবে। দোকানের জিনিসপত্তর হাতে নিয়ে ভোজবাজি করার জিনিস নয়।'

উপদেশের কথাগুলো যে উপেনবাবু ঠিক শোনাবার জন্য বলেন, তা নয়। দোকানের গোলমালের মধ্যেই ফটিক লক্ষ করেছিল ওঁর ভুরু কুচকানো আর ঠোঁট দুটো নড়ছে। খদ্দেরের অর্ডার নিয়ে ওদিকে যেতে ওঁর দু-একটা কথা ফটিকের কানে এসে গেছিল। উপদেশ দেবার সময় উপেনবাবু কাজ থামান না, এটা ফটিক লক্ষ করেছে।

দোকানে নতুন মুখ যে রোজ দেখা যায়, তা নয়। বেশিরভাগই যারা আসে তারা রোজই আসে, আর তাদের খাবার সময়টা বাঁধা। শুধু সময় না, অর্ডারটাও বাঁধা। কেউ শুধু চা, কেউ চা-টোস্ট,

কেউ চা-ডিম-টোস্ট—এইরকম আর কি। ডিম মানে হয় ডিম পোচ, না-হয় ডিমের মামলেট। কে কী অর্ডার দেয়, সেটা ফটিক এর মধ্যেই বুঝে ফেলতে শুরু করেছে। আজ সকালে সেই রোগা লিকলিকে লোকটা—যে ভীষণ দুঃখ-দুঃখ মুখ করে থাকে—সে এসে তিন নম্বর টেবিলে বসতেই ফটিক তার কাছে গিয়ে বলল, 'চা আর মাখন-ছাড়া টোস্ট ?' লোকটা সেইরকমই দুঃখ-দুঃখ মুখ করে বলল, 'চিনে ফেলেছিস এর মধ্যেই ?'

লোক চিনে রাখার মধ্যে ফটিক একটা বেশ মজা পেয়ে গেছে। তবে একটু সাবধানে চলতে হবে, কারণ আজই দুপুরে ও একটা ভুল করে বসেছিল। একজন হলদে শার্ট-পরা মোটা লোককে দেখে চেনা মনে করে যেই বলেছে, 'চা আর ডবল ডিমের মামলেট ?'—অমনই লোকটা হাতের খবরের কাগজ সরিয়ে ফটিকের দিকে ভুরু তুলে বলল, 'তোর মর্জিমাফিক খেতে হবে নাকি ?'

যেটা ফটিকের সবচেয়ে ভাল লাগছে সেটা হল যে, কাপ-ডিশ নিয়ে চলাফেরাটা ওর ক্রমে সহজ হয়ে আসছে। হারুনদা বলেছিল, 'দেখবি, এসব আস্তে আস্তে কেমন সড়গড় হয়ে আসবে। তখন দেখবি, কাজটা একেবারে নাচের ছকে বাঁধা হয়ে গেছে। আসলে এটাও একটা আর্ট। সেই আর্টটা যদ্দিন রপ্ত না হচ্ছে, তদ্দিন মাঝে মাঝে দু'-একটা করে জিনিসপত্তর ভাঙবেই।'

হারুনদা রোজই বিকেলে একবার আসে। উপেনবাবুকে অবিশ্যি আসল ব্যাপার কিছু বলেনি। ফটিক হয়ে গেছে হারুনের দূর সম্পর্কের ভাই, মেদিনীপুরে থাকে, বাপ-মা কেউ নেই, এক খিটখিটে খুড়ো আছে, যে গাঁজা খায় আর ফটিককে ধরে বেধড়ক মারে।—'দেখছেন উপেনদা—লোকটা স্রেফ খামচে দিয়ে কনুইয়ের ছাল-চামড়া তুলে দিয়েছে। মাথায় ফোলাটা দেখছেন ?—চ্যালাকাঠের বাড়ি।' উপেনবাবুও এককথায় রাজি। যে ছেলেটি আছে, তাকে নাকি আর রাখা যাচ্ছে না। সে নাকি পর পর তিন দিন ফাঁকি দিয়ে হিন্দি ফিলিম দেখতে গিয়ে রাত করে ফিরে, ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলে দোষ ঢাকতে গিয়েছিল।

ফটিকের চেহারার বদল হয়েছে। তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল কাটিয়ে ছোট করে দিয়েছে হারুনদা। তাতে অবিশ্যি ফটিক কোনও আপত্তি করেনি। চুল ছাঁটার পরে হারুনদা যখন ওকে একজোড়া নতুন হাফপ্যান্ট, দুটো শার্ট, দুটো হাত-কাটা গেঞ্জি আর একজোড়া চটি কিনে দিয়ে বলল, 'কাজের সময় গেঞ্জি পরবি, তবে পরার আগে একটু চায়ের জলে চুবিয়ে শুকিয়ে নিবি'—তখন ফটিকের হঠাৎ কেন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। বোধহয় 'কাজ' কথাটা শুনে নিজেকে বড় মনে হওয়ার জন্যেই। কাজটা তার অভ্যেস হয়ে যাবে এটা ফটিক জানে। সকাল সাড়ে-আটটা থেকে রাত আটটা অবধি হপ্তায় পাঁচ দিন। শনিবার চারটে অবধি, আর রবিবার ছুটি। দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে উপেনবাবুর ছোট কাঠের ঘর, আর সেই ঘরের দরজার বাইরে টিনের ছাউনির তলায় ফটিকের নিজের শোবার জায়গা। প্রথম রাত মশার কামড়ে ঘুম হয়নি, তাই চাদরটা পা থেকে মাথা অবধি জড়িয়ে নিয়েছিল, কিন্তু নিশ্বাসের কষ্ট হওয়াতে বেশিক্ষণ সেভাবে থাকতে পারেনি। পরদিন উপেনবাবুকে বলাতে উনি একটা মশারি এনে দিলেন। তারপর থেকে ঘুম ভালই হচ্ছে। কনুইয়ের ঘা-টা শুকিয়ে এসেছে, মাথার ব্যথাটা মাঝে মাঝে চলে যায়, আবার মাঝে মাঝে ফিরে আসে। যেটা একেবারেই ফিরে আসে না, সেটা হল—সে দিন সেই আকাশে তারা দেখার আগের ঘটনাগুলো। ও বুঝেছে, ও নিয়ে ভেবে কোনও লাভ নেই। হারুনদাও বলেছে যে, যে-জিনিসটা নেই, যেটা শুন্যি, সেটা নিয়ে ভাবা যায় না। 'মনে পড়লে আপনিই পড়বে রে ফটিক !'

আসল মজা হয়েছিল গতকাল। গতকাল ছিল রবিবার। হারুনদা বলে দিয়েছিল, তাই ফটিক দোকানেই ছিল। হারুনদা এল দুটোর সময়, সঙ্গে কাঁধে ঝোলানো একটা থলি। অনেক রঙচঙে কাপড়ের টুকরো পাশাপাশি সেলাই করে তৈরি হয়েছে থলিটা। ফটিক হারুনের সঙ্গে উপেনবাবুর দোকান থেকে বেরিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল শহিদ মিনার।

এরকম যে একটা জায়গা থাকতে পারে, সেটা ফটিক ভাবতেই পারেনি। মিনারের একটা দিকে মানুষ ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এত মানুষ এক জায়গায় একসঙ্গে কী করতে পারে, সেটা ফটিকের মাথায় ঢুকল না। হারুন বলল, 'মিনারের চূড়োয় যদি উঠতে পারতিস—তা হলে দেখতিস,

এই ভিড়টার মধ্যে একটা নকশা আছে। দেখতিস ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা গোল চক্করের মতো ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকটার প্রত্যেকটাতে একটা কিছু ঘটছে, আর সেইটে দেখবার জন্য গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়েছে।'

'রোজ এত লোকের ভিড় হয় এখানে ?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

'ওনলি সানডে', বলল হারুন, 'চ' তোকে দেখাচ্ছি। দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবি।'

ফটিক দেখল বটে, কিন্তু বুঝল বললে একটু বেশি বলা হবে। এত বিরাট ব্যাপার সহজে বোঝা যায় না। এতরকম কাজ, এত রকম খেলা, এতরকম ভাষা, এতরকম রঙ আর এতরকম শব্দ এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে যে, ফটিকের চোখ-কান-মাথা সব একসঙ্গে ধাঁধিয়ে গেল। শুধু যে খেলা হচ্ছে, তা তো নয়। একটা দিকে কেবল জিনিস ফেরি হচ্ছে—দাঁতের মাজন, দাদের মলম, বাতের ওষুধ, চোখের ওষুধ, নাম-না-জানা শুকিয়ে যাওয়া শেকড়-বাকড়, আরও কত কী। এক জায়গায় একটা টিয়াপাখি একগোছা কাগজের মধ্য থেকে একটা করে কাগজ ঠোঁট দিয়ে টেনে বার করে লোকের ভাগ্য বলে দিচ্ছে। একজন লোক কথার তুবড়ি ছেড়ে এক রকম আশ্চর্য সাবানের তারিফ করছে—লোকটার মাথায় পাগড়ি, গায়ে খাকি প্যান্ট আর দু'-হাতে গোলাপি সাবানের ফেনা। একদিকে একটা লোক গলায় একটা ইয়া মোটা লোহার শিকল ঝুলিয়ে হাত-পা নেড়ে কী যেন বলছে, আর তার চারদিকের লোক হাঁ করে তার কথা শুনছে। তার কাছেই একটা সিমেন্ট-বাঁধানো জায়গার উপর পা ছড়িয়ে বসে একটা ভীষণ ময়লা কাপড়-পরা কুচকুচে কালো ঝাঁকড়া-চুলো পাগলা-গোছের লোক লাল, কালো আর সাদা খড়ি দিয়ে আশ্চর্য সুন্দর দেব-দেবীর ছবি আঁকছে। লোক চারপাশ থেকে ছুড়ে ছুড়ে পয়সা ফেলছে, সেগুলো ঠং ঠং করে হনুমানের ল্যাজে, রামচন্দ্রের মুকুটে, রাবণের মাথার উপর পড়ছে, কিন্তু লোকটা সেগুলোর দিকে দেখছেই না।

তবে এটা ফটিক দেখল যে, যেসব জিনিস হচ্ছে—তার মধ্যে খেলাটাই সবচেয়ে বেশি। কেবল একটা জিনিসকে ফটিক খেলা বলবে না কী বলবে ভেবেই পেল না—ফটিকের চেয়েও কয়েক বছরের ছোট একটি ছেলে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর মাথার চার পাশে মাটি চাপা দিয়ে বাতাস ঢোকার ফাঁকটাও বন্ধ করে দিয়েছে আর-একটি বাচ্চা ছেলে। এইভাবে ছেলেটা চিত হয়ে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। ফটিক কিছুক্ষণ দেখে ঢোক গিলে বলল, 'ও হারুনদা, ও যে মরে যাবে !'

'এখানে কেউ মরতে আসে না রে ফটকে', বলল হারুন,—'এখানে আসে বাঁচতে। ও-ও বেঁচে যাবে। ও যা করছে, সেটা স্রেফ অভ্যাসের ব্যাপার। অভ্যাসে কী যে হয়, সেটা খালিফ হারুনের খেলা দেখলে বুঝবি।'

হারুন ওকে নিয়ে গেল ভিড়ের মধ্য দিয়ে, যেখানে ও আগে খেলা দেখাত, সেই জায়গায়। সেখানে এখন একটা মেয়ে খেলা দেখাচ্ছে। দড়ির উপর ব্যালান্সের খেলা। মাটি থেকে প্রায় সাত-আট হাত উঁচুতে টান করে বাঁধা দড়ির উপর দিয়ে দিব্যি এ-মাথা থেকে ও-মাথা চলে যাচ্ছে মেয়েটা। 'মাদ্রাজের মেয়ে', বলল হারুনদা।

আর একটা জায়গায় একটা শূন্যে ঝোলানো লোহার রিং-এর গায়ে আট-দশটা জায়গায় আগুন জ্বলছে দেখে ফটিক হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওর ভিতর দিয়ে একটা লোক লাফাবে বুঝি ?'

হারুন হাঁটা থামিয়ে ওর দিকে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোর মনে পড়ে গেছে ? তুই আগে দেখেছিস এ জিনিস ?'

ফটিক 'হ্যাঁ' বলতে গিয়েও পারল না। একটা আলো-বাজনা-ভিড় মেশানো ছবি এক মুহূর্তের জন্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু সামনে যা দেখতে পাচ্ছে, তাই।

হারুন আবার এগিয়ে গেল, ফটিক তার পিছনে।

যে জায়গাটায় হারুন খেলা দেখাবে, সেখানে এখন কেউ নেই। ডান দিকে একটা ভিড়ের পিছন থেকে ডুগডুগির শব্দ আসছে, ফটিক মানুষের পায়ের ফাঁক দিয়ে ভাল্লুকের কালো লোম দেখতে পেয়েছে। ডুগডুগি আর ঢোলক এখানে সব খেলাতেই বাজায়, কিন্তু হারুন থলি থেকে যেটা বার

করল, সেটা ও দুটোর একটাও নয়। সেটা একটা বাঁশি ; যেটার পিছন দিকটা সরু আর সামনের দিকটা চওড়া আর ফুল-কাটা। সাতবার পর পর ফুঁ দিল বাঁশিটায় হারুনদা। ফটিক জানে যে, সব শব্দ ছাপিয়ে বাঁশির শব্দ শোনা গেছে ময়দানের এ-মাথা থেকে ওমাথা।

এবার বাঁশিটা ওয়েস্ট-কোটের পকেটে রেখে হারুন একটা চিৎকার দিয়ে চমকে দিল ফটিককে।

'ছু-উ-উ-উ-উ !
ছু-ছু-ছু-ছু-ছু-উ-উ-উ !'

এই এক ডাক আর বাঁশির আওয়াজেই এখান থেকে ওখান থেকে ছেলের দল ছুটে আসতে আরম্ভ করেছে হারুনের দিকে। তারা এসে দাঁড়াতেই হারুন একটা কান-ফাটানো তালি দিয়ে তিনবার পাক খেয়ে একটা ডিগবাজি আর একটা পেল্লায় লাফ দিয়ে তার আশ্চর্য লোক-ডাকার মন্ত্রটা শুরু করে দিল—

'ছু-ছু-ছু-ছু-ছু-উ-উ-উ !
ছু মন্তর যন্তর ফন্তর
হর্ বিমারি দূর করন্তর
সাত সমন্দর বারা বন্দর
চালিস চুহা ছে ছুছুন্দর
ছু-উ-উ-উ !'

'ছু' বলেই বাঁশিতে আর-একটা লম্বা ফুঁ দিয়ে, আর-একটা তালি আর আর একটা ডিগবাজির পর আবার ধরল হারুনদা—

'কাম্ ! কাম্ ! কাম্ ! কাম !
'কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্ !
কাম্ সি কাম্ সি চমকদারি
হর্ কিস্‌ম্ কি জাদুকারি
কলকত্তে কি খেল-খিলাড়ি
লম্বি দাড়ি লং সুপারি
কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্ !

কাম্ কামান্ডর ওয়ান্ডর ওয়ান্ডর
জাগ্‌লর জোকার জাম্পিং ওয়ান্ডর
ওয়ান্ডর খালিফ হারুন ওয়ান্ডর
ভেল্‌কি ভেলকাম্ কাম্ কমাকম
কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্ !

কাম-বয় গুড-বয় ব্যাড-বয় ফ্যাট-বয়
হ্যাট-বয় কোট-বয় দিস-বয় দ্যাট-বয়
কালিং অল-বয়, অল-বয় কালিং
কালিং কালিং কালিং কালিং
কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্ !'

বাপ্‌রে, ভাবল ফটিক, কী গলার জোর, কী লোক-ডাকার কায়দা ! এরই মধ্যে বেশ লোক জমে গেছে হারুনদাকে ঘিরে। হারুন তার থলি থেকে একটা চকরা-বকরা আসন বার করে ঘাসের উপর বিছাল। তারপর তার উপর বসে থলিতে যা কিছু খেলার সরঞ্জাম ছিল, সব একে একে বার করে নিজের দু'পাশে সাজিয়ে রাখল।

ফটিক দেখল, চারটে নকশা-করা ঝকঝকে পিতলের বল, দুটো প্রকাণ্ড লাট্টু, তার জন্য মানানসই

লেত্তি, তিন-চারটে লাল নীল পালক লাগানো বাঁশের কঞ্চি, পাঁচরকম নকশা-করা টুপি—যার একটা হারুনদা মাথায় পরে নিল। ফটিক এতক্ষণ হারুনকে জিনিস সাজিয়ে রাখতে সাহায্য করছিল, এবার হারুন বলল, 'তুই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়া, এক-একটা খেলা যেই শেষ হবে, অমনই তালি দিবি।'

প্রথম দুটো খেলার পর ফটিকই তালি শুরু করল, তারপর অন্যরা দিল। তিন নম্বর খেলা থেকে ফটিককে আর ধরিয়ে দেবার দরকার হয়নি। সত্যি বলতে কি, সে হারুনের কাণ্ড-কারখানা দেখে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, তালি দেবার কথা আর মনেই ছিল না। শুধু হাতেরই যে কায়দা, তা তো নয়। হারুনের কোমর থেকে উপরের সমস্ত শরীরটাই যেন জাদু। নমাজ-পড়ার মতো করে গোড়ালির উপর বসে অতবড় লাট্টুটায় দড়ি পেঁচিয়ে সেটাকে সামনের দিকে ছুড়ে লেত্তি ফুরোবার ঠিক আগে পিছন দিকে একটা হ্যাঁচকা টান দিলে সেটা যে কী করে শূন্য দিয়ে ঘুরে এসে আবার হারুনদারই হাতের তেলোয় পড়ছিল—বারবার ঠিক একই ভাবেই একই জায়গায় পড়ছিল—সেটা ফটিকের মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না। আর সেখানেই তো শেষ না! লাট্টুটা হাতের তেলো থেকে ওই পালক-লাগানো কাঠির মাথায় বসিয়ে দিল হারুনদা, আর ওই বোমা লাট্টুটা ঘুরতে লাগল ওই পেনসিলের মতো সরু কাঠিটার মাথায়। ফটিক ভাবল এটাই বুঝি খেলার শেষ, এখানেই বুঝি হাততালি দিতে হবে, কিন্তু ও মা—হারুনদা মাথা চিত করে ঘুরন্ত লাট্টু সমেত কাঠিটা বসিয়ে দিয়েছে ওর থুতনির ঠিক মাঝখানে! তারপর হাত সরিয়ে নিতে লাট্টুর সঙ্গে সঙ্গে কাঠিটাও ঘুরতে লাগল থুতনির উপর দাঁড়িয়ে—আর সেই সঙ্গে তার গায়ে লাগানো রঙিন পালকগুলো। তারও পরে ফটিক অবাক হয়ে দেখল যে, কাঠিটা আবার মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ঘুরছে, কিন্তু লাট্টুটা ঘুরে চলেছে একটানা।

পিতলের বলের খেলায় আরও বেশি হাততালি পেল হারুন। দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার বল-এ চলে গেল জাগ্‌লিং দেখাতে দেখাতে। বিকেলের রোদে এমনিতেই বলগুলো ঝলমল করে উঠছে; সেগুলো থেকে আবার আলো ঠিকরে বেরিয়ে হারুনের মুখে পড়াতে মনে হচ্ছে, যেন তার

মুখ থেকেই বারবার আলো বেরুচ্ছে।

সূর্য ডুবে যাওয়া অবধি খেলা চলল। শেষের দিকে পাশের খেলা থেকে অনেক লোক চলে এসেছিল হারুনের খেলা দেখতে। ফটিক অবাক হয়ে দেখছিল, বাচ্চারা পর্যন্ত কীরকম পয়সা ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে হারুনের চার পাশে। হারুন কিন্তু খেলার সময় সেগুলোর দিকে দেখছেই না। খেলার শেষে ফটিককে ডেকে বলল, 'ওগুলো তোল তো।'

হারুন যতক্ষণে তার ভোজবাজির সরঞ্জাম থলিতে তুলেছে, তার আগেই ফটিকের পয়সা তোলা হয়ে গেছে। গুনে হল আঠারো টাকা বত্রিশ পয়সা। থলি কাঁধে ঝুলিয়ে হারুন বলল, 'চল্, আজ তোকে খাওয়াব—পাঞ্জাবি রুমালি রুটি আর তরখা। নিঘ্‌ঘাৎ এ জিনিস তুই কোনও দিন খাসনি। তারপর মিষ্টি কী খাওয়া যায়, সেটা তখন ভেবে দেখা যাবে।'

॥ ৭ ॥

ফটিক তার শোবার জায়গার পাশের দেওয়ালে কাত্যায়নী স্টোর্সের একটা ক্যালেন্ডার টাঙিয়ে দিয়েছে। তাতে পেনসিল দিয়ে প্রত্যেক দিনের শেষে সেই দিনের তারিখটার উপর একটা দাগ কেটে দেয়। এইভাবে দাগ গুনে সে হিসেব করে, ক'দিন হল তার চাকরি। আট দিনের দিন, তার মানে বিষ্যুদবার, দুপুরে সাড়ে-বারোটার সময় উপেনবাবুর দোকানে একজন লোক এল, যেরকম ষণ্ডা লোক ফটিক কোনও দিন দেখেনি। দোকানের আটটা বেঞ্চির মধ্যে যেটা দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে—মানে যেটা উপেনবাবুর বসার জায়গা থেকে সবচেয়ে দূরে—সেখানে বসেছে লোকটা। তার সঙ্গে অবিশ্যি আর একজন লোক আছে; তার চেহারা মোটেই চোখে পড়ার মতো নয়। ষণ্ডা লোকটা বেঞ্চিতে বসেই একটা 'অ্যাই' করে হাঁক দিয়েছে। ফটিক বুঝল যে, তাকেই ডাকা হচ্ছে। থুতনিতে শ্বেতিওয়ালা ভদ্রলোক, যিনি রোজ এই সময় এসে এক কাপ চা সামনে নিয়ে আধঘন্টা ধরে খবরের কাগজ পড়েন, তিনি এইমাত্র উঠে গেছেন। ফটিক তাঁর পেয়ালা তুলে নিয়ে টেবিলটা ঝাড়ন দিয়ে মুছছিল, তার মধ্যে ষণ্ডা লোকটা আবার হাঁক দিয়ে উঠল।

'দুটো মামলেট আর দুটো চা এদিকে। জলদি।'

'দিচ্ছি বাবু।'

কথাটা বলতে ফটিকের গলাটা যে কেন একটু কেঁপে গেল, আর তার সঙ্গে হাতের কাপটাও, সেটা ও বুঝতে পারল না। অর্ডারটা কিচেনে কেষ্টদাকে চালান দিয়ে, হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে শ্বেতিওয়ালা লোকের পয়সাটা উপেনবাবুর কাছে দিয়ে, ফটিক আর একবার আড়চোখে ষণ্ডা লোকটার দিকে দেখে নিল। ওকে আগে দেখেছে বলে মনে পড়ল না ওর। তা হলে ওর গলা শুনে এমন হল কেন? লোক দুটো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, রোগা লোকটা ষণ্ডাটাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে।

ফটিক ওদের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর হাতের ঝাড়নটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে গেল পান্নাবাবুর টেবিলের উপর রুটির গুঁড়ো পরিষ্কার করতে। অন্য যারা এ দোকানে আসে, পান্নাবাবু তাদের চেয়ে অনেক বেশি ভাল জামাকাপড় পরেন। উনি এলে উপেনবাবুও উঠে গিয়ে খাতির-টাতির করেন। আর কেউ যেটা করে না, সেটা দু'দিন পান্নাবাবু করেছেন; ফটিককে দশ পয়সা করে বকশিশ দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা 'দশ' আজকে এই পাঁচ মিনিট আগে পেয়েছে ফটিক। ও ঠিক করেছে, বকশিশের পয়সা জমিয়ে ও হারুনদার ধার শোধ করবে।

অমলেট তৈরি হচ্ছে। সবাই বলে মামলেট, কেবল হারুনদা বলে অমলেট, আর সেটাই নাকি ঠিক। ফটিকও তাই মনে মনে অমলেট বলে। কেষ্টদা দু'কাপ চা এগিয়ে দিল, ফটিকও স্টাইলের মাথায় কাপ দুটো হাতে নিয়ে একটুও চা পিরিচে না-ফেলে সে দুটোকে এক নম্বর টেবিলের উপর ষণ্ডা আর রোগাটার সামনে রেখে দিল। একটা জিনিস ও দু' দিন থেকে করতে আরম্ভ করছে। যেটা দিচ্ছে, সেটা বলে দেয় আর যেটা বাকি, সেটাও বলে—তারপরে একটা 'কামিং' জুড়ে দেয়। আজ যেমন বলল, 'মামলেট কামিং।'

কথাটা বলে ষণ্ডাটার দিকে চাইতেই ফটিক দেখল মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেছে, আর সেই হাঁ-এর ভিতর সিগারেটের না-ছাড়া ধোঁয়াটা পাক খেয়ে আপনা থেকেই ফিতের মতো বেরিয়ে আসছে।

ধোঁয়াটা দেখবার জন্যই ফটিক বোধহয় পাঁচ সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল, এবার উলটো ঘুরতেই লোকটা কথা বলল।

'অ্যাই—'

ফটিক থামল।

'তুই কদ্দিন কাজ করছিস ?'

পুলিশ !

হতেই হবে পুলিশ। না হলে ও-রকম জিজ্ঞেস করছে কেন ? ফটিক ঠিক করে নিল, বানিয়ে বলবে—কিন্তু আস্তে বলবে, যাতে উপেনবাবু শুনতে না পান। আড়চোখে একবার উপেনবাবুর দিকে চাইতেই দেখল, তিনি নেই। যাক্, বাঁচা গেল।

'অনেকদিন বাবু।'

'তোর নাম কী ?'
'ফটিক।'
ফটিক তো ওর নিজের বানানো নাম, তাই সেটা বললে কোনও ক্ষতি নেই।
'চুল ছেঁটেছিস কবে ?'
'অনেকদিন বাবু।'
'কাছে আয়।'
ও দিক থেকে কেষ্টদা জানান দিচ্ছে মামলেট রেডি।
'আপনার মামলেট আনি বাবু।'
ফটিক কেষ্টদার কাছ থেকে প্লেট এনে লোক দুটোর সামনে রাখল। তার পর দু' নম্বর থেকে নুন-মরিচ এনে তারপাশে রাখল। ষণ্ডা আর অন্য লোকটা এখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, ওর দিকে দেখছে না। ফটিক চার নম্বরের দিকে চলে গেল। খদ্দের এসেছে।
লোক দুটো খাওয়া শেষ করে যখন ফটিককে পয়সা দেবে, তখন ষণ্ডা লোকটা বলল, 'তোর হাতে চোট লাগল কী করে ?'
'দেয়ালে ঘষটা লেগেছিল।'
'দিনে ক'টা মিথ্যে বলা হয় চাঁদু ?'
লোকটাকে না চিনলেও, ওর কথাগুলো শুনতে ফটিকের ভাল লাগছিল না। ও ঠিক করল, হারুনদা এলে ওকে বলবে।
'জবাব দিচ্ছ না যে ?'
লোকটা এখনও একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে। ঠিক এই সময় উপেনবাবু রাস্তার দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলেন। ফটিককে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হওয়াতে বললেন, 'কী হয়েছে ?'
ফটিক বলল, 'বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন—'
'কী ?'
'আমি কদ্দিন এখানে কাজ করছি, তাই।'
উপেনবাবু ষণ্ডার দিকে চেয়ে বেশ নরম ভাবেই বললেন, 'কেন মশাই, কী দরকার আপনাদের ?'
ষণ্ডা কিছু না বলে পয়সাটা টেবিলের উপর রেখে উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে অন্য লোকটাও। কাজের চাপে বিকেল হতে-না-হতে ফটিক লোক দুটোর কথা প্রায় ভুলেই গেল।

॥৮॥

বিকেল চারটে নাগাদ হারুন উপেনবাবুর দোকানে এল। সে ক'দিন থেকেই বলে রেখেছে, সে কোথায় থাকে সেটা ফটিককে দেখিয়ে দেবে। উপেনবাবুকে বলাতে উনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'বাকি ঘণ্টা-তিনেকের কাজ কেষ্টর ছেলে সতু চালিয়ে নিতে পারবে। সতু মাসে তিনবার করে জ্বরে পড়ে ; না হলে কাজ যে একেবারে জানে না, তা নয়।
হারুন দোকান থেকে বেরিয়ে ফটিককে বলল, 'আজ এমন একটা আর্ট দেখাব তোকে যে, তুই ব্যোম্‌কে যাবি।' কথাটা শুনে ফটিকের মন এমন নেচে উঠল যে, উলটো দিকের ফুটপাথের পানের দোকানের সামনে সকালের সেই দুটো লোককে ও দেখতেই পেল না।
হারুনদা ঝুলে ঝুলে বাসে চড়ে না, কারণ তাতে তার হাতের ক্ষতি হতে পারে। 'হাত না চললে পেট চলবে না রে ফটকে, তাই পদব্রজেই বেস্ট।'
অনেক অলিগলি ছোট বড় মাঝারি রাস্তা পেরিয়ে হারুন আর ফটিক শেষটা ব্রিজের উপর পৌঁছল, যেটার তলা দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন যায়। ব্রিজ থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গিয়ে একটা বস্তিতে পড়েছে। এই বস্তিতেই থাকে হারুনদা। ফটিক ব্রিজের উপর থেকেই দেখল, অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে বস্তিটা। দূরে এখানে-ওখানে কারখানার চিমনি দাঁড়িয়ে আছে নারকেল গাছের উপর মাথা তুলে। বস্তিটাকে দেখে ফটিকের মনে হল, সেটা যেন একটা ধোঁয়ার কম্বল মুড়ি দিয়ে

রয়েছে। হারুনদা বলল, সেটা উনুনের ধোঁয়া ; সন্ধের মুখে ঘরে ঘরে উনুন জ্বলেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হারুন বলল, 'এখানে হিন্দু মুসলমান কেরেস্তান সবরকম লোক থাকে, জানিস। আর তাদের মধ্যে এমন এক-একটা আর্টিস্ট আছে না—দেখলে তাক লেগে যায়। জামাল বলে একটা কাঠের মিস্তিরি আমার ঘরে এসে গান শুনিয়ে যায় মাঝে মাঝে, আমি আমার চৌকিতে ঠেকা দিই। কোথায় আছি ভুলে যাই, এমনি তার আর্টের ভেল্‌কি।'

দু'দিকে খোলার ছাতওয়ালা বাড়ির মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে হারুনের বাড়ির দিকে। হারুন আর ফটিক পাশাপাশি হাঁটছে, আর এদিক-সেদিক থেকে আট-দশ-বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েরা হারুনকে দেখে লাফাচ্ছে, তালি দিচ্ছে, আর তার নাম ধরে ডেকে উঠছে। হারুন সব্বাইকে হাতছানি দিয়ে ডেকে সঙ্গে নিয়ে নিল ; বলল, 'আজ নতুন খেলা !' 'হো !—নতুন খেলা !'— বলে তারাও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। হারুনদার যে এত বন্ধু আছে, সেটা ফটিক জানতই না।

হারুনের ছোট্ট একটা ঘর, তাতে আলো বেশি আসে না, তাই বোধহয় হারুনদা এতরকম রঙচঙে জিনিস ঘরে সাজিয়ে টাঙিয়ে বিছিয়ে রেখেছে। কাপড়, কাগজ, পুতুল, ছবি, নকশা, ঘুড়ি সবকিছুই আছে। কিন্তু তাও দেখলে দোকান বলে মনে হয় না। যেখানে যেটা রাখলে মানায়, সেইটুকুই—তার বেশিও নয়, কমও নয়। ফটিক মনে মনে ভাবল, এটাও নিশ্চয়ই একটা দারুণ আর্ট। এ ছাড়া অবিশ্যি কাজের জিনিসও যতটুকু দরকার, ততটুকু আছে। আর আছে হারুনের সেই বাক্স আর সেই থলি।

এত সব জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিল, এবার বাতিটা জ্বালতেই সেটার দিকে চোখ গেল ফটিকের।

'ওটা কার ছবি হারুনদা ?'

বাতিটার ঠিক নীচেই বেশ বড় ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছোট্ট ছবি। গোঁফে চাড়া দেওয়া ঢেউ-খেলানো চুলওয়ালা একজন লোক সোজা ফটিকের দিকে চেয়ে আছে। তার তলায় খুব ধরে ধরে পরিষ্কার করে কালো কালিতে লেখা—এন্‌রিকো রাস্‌টেলি।

হারুন একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ও আমার আর-এক গুরু। চোখে দেখিনি কখনও। ইতালিয়ান সাহেব। আমি যে খেলা দেখাই, ও-ও সেই খেলা দেখাত। জাগ্‌লিং। প্রায়

একশো বছর আগে। একটা ম্যাগাজিন থেকে ছবিটা কেটে রেখেছিলুম। আমাকে তো চারটে বল নিয়ে খেলতে দেখলি—ও খেলত একসঙ্গে দশটা বল নিয়ে। ভাবতে পারিস ? পাঁচটা নয়, সাতটা নয়—একেবারে দশটা ! লোকে দেখে একেবারে পাগলা হয়ে যেত।'

হারুনদা জাগ্‌লিং নিয়ে পড়াশুনা করেছে শুনে ফটিক অবাক হয়ে গেল। ও কি তা হলে ইংরিজি পড়তে পারে ? 'ক্লাস এইট অবধি পড়েছিলুম ইস্কুলে,' বলল হারুন—'চন্দননগরে বাড়ি ছিল আমাদের। বাপের ছিল কাপড়ের দোকান। মাহেশের রথের মেলায় ভাল ভোজবাজি হচ্ছে শুনে চলে গেলুম দেখতে। দু' দিনের জন্য হাওয়া। ফাস্ কেলাস জাগ্‌লিং, জানিস। কিন্তু ফিরে আসতে বাপ দেখিয়ে দিলেন আর একরকম জাগ্‌লিং। কাপড় কাটার ঢাউস কাঁচি হয় দেখেচিস ? এই দ্যাখ তার রেজাল্ট।'

হারুন শার্ট তুলে পিঠে একটা গর্ত দেখিয়ে দিল।

'তিন হপ্তা লেগেছিল ঘা শুকুতে। তারপর একদিন মওকা বুঝে পকেটে এগারোটি টাকা আর কাঁধে পুঁটলি নিয়ে দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়লুম কাউকে কিচ্ছু না বলে। তিনবার ট্রেন বদল করে বিনি-টিকিটে ঝ্যাকড় ঝ্যাকড় করে তিন দিন তিন রাত্তির স্রেফ চা-বিস্কুট খেয়ে শেষটায় একদিন কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি তাজমহল দেখা যাচ্ছে। নেমে পড়লুম। শহরে ঘুরতে ঘুরতে কেল্লায় গিয়েও হাজির হলুম। পিছনে মাঠ, তার পিছনে যমুনা, আর তারও পেছনে দূরে আবার দেখলুম তাজমহল। তারপরেই আমার চোখ গেল উলটো দিকে। কেল্লার গায়ে উপর দিকে বারান্দা, তার নীচে বাইরে ঘাসের উপর খেলা হচ্ছে। একপাশে সাপ খেলছে, একপাশে ভাল্লুক নাচছে, আর মধ্যিখানে, আসাদুল্লা দু' হাতে বল নাচাচ্ছে—তার চোখ রুমাল দিয়ে বাঁধা !...ভক্তি কি সাধে হয় রে ফটকে ? গায়ের লোম খাড়া হয়ে চোখে জল এসে গেস্‌ল। মানুষের এত খ্যামতা হয় ?'

'কারা দেখছিল সেই খেলা ?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

'সাহেব, মেমসাহেব,' বলল হারুন। 'ওই উঁচুতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, আর নীচের দিকে দশ টাকা পাঁচ টাকার করকরে নোট পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে—কেউ সাপের দিকে, কেউ ভাল্লুকের দিকে, কেউ বল খেলার দিকে। বেশিরভাগ বলের দিকেই ছুড়ছে। এক ব্যাটা সাহেবের মাথা মোটা, সে ব্যাটা না-পাকিয়েই ছুড়েছে একটা দশ টাকার নোট বলের দিকে, আর দমকা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে সেটাকে ফেলেছে একেবারে ফণা-তোলা গোখরোর ঝাঁপির মধ্যে। ওস্তাদ তখন চোখের বাঁধন খুলে ফেলেছে। সাহেব উপর থেকে চেঁচাচ্ছে, আমি বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে ঝাঁপির ভেতর ঘপাৎ করে হাত ঢুকিয়ে নোট বার করে এনে ওস্তাদের হাতে গুঁজে দিলাম। ওস্তাদ 'শাবাশ বেটা—জিতে রহো' বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আমি হিন্দি-ফিন্দি জানি না—পকেট থেকে দুটো কাঠের বল বার করে এই তিনদিনে শেখা লোফালুফির খেলা দেখিয়ে দিলাম। ব্যস্—সেইদিন থেকে ওঁর দেহ রাখার দিনটা অবধি আমি ওর ছায়ায়। তবু অ্যাদ্দিনেও লোকের সামনে সাহস করে চোখ বেঁধে খেলা দেখাতে পারিনি। আজ সেইটেই একবার চেষ্টা করে দেখব।'

বস্তির ছেলে-মেয়ের দল হারুনের দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল। হারুন থলি নিয়ে বেরোল, ফটিক তার পিছনে। বাঁ দিকে ঘুরল হারুন। আট-দশটা ঘর পেরিয়ে একটা খোলা জায়গা, তার পিছনে একটা ডোবা, আর তারও পিছনে একটা কারখানার পাঁচিল। হারুন ডান দিকে খোলা জায়গাটার মধ্যে যেখানটায় জংলাটা কম, সেখানে বসে পড়ল আসন বিছিয়ে। ছেলেমেয়েদের দল তার সামনে আর দু'পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হারুন থলি থেকে বার করল একটা হলদের উপর কালো বুটি দেওয়া সিল্কের রুমাল। সেটা পাশেই দাঁড়ানো ফটিকের হাতে দিয়ে বলল, 'বাঁধ তো দেখি বেশ করে।'

ফটিক রুমালটা দিয়ে হারুনের চোখ বেঁধে, পিছিয়ে ভিড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সেই চোখ-বাঁধা অবস্থায় হারুন তার গুরুকে তিনবার সেলাম জানিয়ে প্রথমে দুটো আর তারপর তিনটে পিতলের বল নিয়ে এমন আশ্চর্য খেলা দেখাল যে, ফটিকের মনে হল, তার মন থেকে যদি আবার সব মুছে গিয়ে শুধু আজকের খেলাটাই থেকে যায়, তা হলে তাই নিয়েই সে বাকি জীবনটা

কাটিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু বলেই শেষ না। বল রেখে এবার বাঁধন না খুলেই হারুন থলি থেকে বার করল তিনটে ছুরি, যার আয়নার মতো ঝকঝকে ফলাগুলোতে বাড়ি-ঘর-গাছ-আকাশ সবকিছু দেখা যাচ্ছে। ওই ফলাগুলো এবার নাচতে শুরু করল হারুনের হাতে। হারুনের সামনের আকাশ বাতাস চিরে ফালাফালা হয়ে গেল, কিন্তু একটিবারও ছুরিগুলো পরস্পরের গায়ে ঠেকল না, একটি বারও হারুনের হাতে একটি আঁচড়ও লাগল না।

বস্তির আকাশ যখন হাততালি আর চিৎকারে ফেটে পড়ছে, তখন ফটিক এগিয়ে গিয়েও হারুনের বাঁধন খুলতে গিয়ে পারল না, কারণ তার হাত কাঁপছে। হারুন বুঝতে পেরে হেসে নিজেই বাঁধন খুলে নিল। তারপর তার সরঞ্জাম থলিতে পুরে বাচ্চাদের দিকে ফিরে বলল, 'আজকের মতো খেল খতম। তোরা যে যার ঘরে ফিরে যা!'

ফটিকের কেন যেন মনে হচ্ছিল, এমন একটা খেলা দেখিয়ে হারুনের মুখে যতটা হাসি-ফুর্তি থাকা উচিত ছিল, ততটা যেন নেই। হয়তো ওস্তাদের কথা মনে পড়ে তার মনটা ভারী হয়ে গেছে।

কিন্তু আসলে তা নয়। ঘরে ফিরে এসে হারুন কারণটা বলল ফটিককে।

'দুটো লোক—বুঝলি ফটিক—বে-পাড়ার লোক—দেখিনি কখনও—দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল তোর দিকে। বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়াতেই চোখ গেছে আমার। লোক দুটোর ভাবগতিক ভাল লাগল না।'

কথাটা বলতেই ফটিকের ধক্ করে সেই দুটো লোকের কথা মনে পড়ে গেল। ও বলল, 'একজন ষণ্ডা আর একজন রোগা কি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তুইও দেখলি?'

'এখন দেখিনি, দুপুরে।'

ফটিক বলল দুপুরের ব্যাপারটা। শুনে হারুনের মুখটা থমথমে হয়ে গেল। 'কানে লোমটা একটু বেশি কী?' হারুন জিজ্ঞেস করল। ফটিকের তক্ষুনি মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, সত্যিই তো! সবচেয়ে আগে কানের দিকেই চোখ গিয়েছিল ফটিকের—এখন হারুনদা বলাতে মনে পড়েছে।

'শ্যামলাল', চোয়াল শক্ত করে বলল হারুন। 'ওপরদিকটা ষণ্ডা হলে কী হবে, পা দু'খানা ধনুকের মতো বাঁকা। দূর থেকে পা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। দাড়ি ছিল, কামিয়ে ফেলেছে। কানের দাড়িটা আর কামানোর কথা খেয়াল করেনি। বছর কয়েক আগে চিৎপুরের একটা চায়ের দোকানে যেতুম মাঝে মাঝে। সেখানে দেখিছি। চার বন্ধু ছিল। একের নম্বরের—'

হারুন হঠাৎ থেমে গিয়ে ভুরু কুঁচকে আবার বলল, 'দু'জন লোক মরে পড়েছিল গাড়িতে—তাই না?'

ফটিক মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। হারুনের মুখ কালো হয়ে গেল। বলল, 'যা আঁচ করেছিলাম তাই রে ফটিক। তোর বাপের অনেক পয়সা।'

বাবা-টাবার কথা বললে ফটিকের মনে কোনও ভাবই জাগে না, তাই ও চুপ করে রইল। হারুন তক্তপোশ ছেড়ে উঠে গিয়ে পশ্চিমের জানলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দেখে বলল, 'এখনও আছে। সিগারেট ধরাল।'

বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ফটিকের মনে পড়ল, ওকে বাড়ি ফিরতে হবে। সেই বেনটিং স্ট্রিটে। হারুনদা ওকে পৌঁছে দেবে বলেছে, কিন্তু লোক দুটোর যদি মতলব খারাপ হয়ে থাকে, তা হলে ওদের দু'জনেরই মুশকিল হতে পারে।

হারুনদা আবার তক্তপোশে বসে পড়েছে। ওকে এত গম্ভীর কখনও দেখেনি ফটিক। 'আমার বাড়ি ফেরার কথা ভাবছ?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

হারুন বলল, 'বাড়ি ফেরার অন্য রাস্তা আছে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে লখা মিস্তিরির ঘরের ভেতর দিয়ে ওদিকের গলিটা ধরব। শ্যামলাল টের পাবে না। যদ্দূর মনে হয়, তল্লাটটা ভাল চেনে না। তোকে ধাওয়া করে এসে পড়েছে। না, ওটা চিন্তা না। চিন্তা হচ্ছে ভবিষ্যৎ নিয়ে।' হারুন একটু থামল। তারপর ফটিকের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'তোর এখনও কিচ্ছু মনে পড়েনি?'

ফটিক মাথা নাড়ল। —'কিচ্ছু না হারুনদা। মনে-পড়া কাকে বলে, তাই জানি না।'

হারুন হাঁটুতে একটা চাঁটি মেরে উঠে পড়ল। তার পর ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে রেখে দরজায় একটা তালা এঁটে ফটিককে নিয়ে সামনের দরজার দিকে না গিয়ে উলটো দিকে ঘুরল।

॥ ৯ ॥

পরের রবিবারে সকাল।

ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যালের বাড়িতে আজ মিটিং বসেছে বৈঠকখানায়। প্রায় ষাট বছরের পুরনো অভিজাত বাড়ির প্রকাণ্ড ড্রইংরুম। ঘরের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে যাঁর বাঁধানো ছবি রয়েছে, তাঁরই কীর্তি এই বাড়ি। ইনি শরদিন্দু সান্যালের পরলোকগত পিতৃদেব দ্বারকানাথ সান্যাল। ছেলে বাপেরই পেশা নিয়েছেন, তবে বাপের মতো অত অঢেল রোজগারের ভাগ্য তাঁর কখনও হয়নি। শোনা যায়, দ্বারিক সান্যালের এক সময় আয় ছিল গড়ে দিনে হাজার টাকা।

আগের দিনের চেয়ে আজ যেন মিস্টার সান্যালের দাপটটা একটু কম। আসলে এতদিনেও গুণ্ডাদের কাছ থেকে কোনও হুমকি, চিঠি না পেয়ে তিনি একটু ধাঁধায় পড়েছেন। সেইসঙ্গে ছেলের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাটাও আরও বেড়ে গেছে। আজ শুধু মিস্টার সান্যাল ও দারোগা সাহেব নন—ঘরে আরও দু'জন লোক রয়েছেন, মিস্টার সান্যালের দুই ছেলে—মেজো আর সেজো। বড়টিও এসেছিল, তবে দু' দিনের বেশি থাকতে পারেনি, দিল্লিতে তার একটা জরুরি মিটিং আছে।

মেজো ছেলে সুধীন্দ্রই এখন কথা বলছে। বছর ছাব্বিশেক বয়স, রঙ ফরসা, আজকের ফ্যাশানে ঝুলপিটা বড়, আর চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। সুধীন্দ্র বলছে, 'মেমরি লসের অনেক ইয়ে তো বিলিতি ম্যাগাজিনে পড়া যায় বাবা। এটা তো হতেই পারে। তুমি যে কেন বিশ্বাস করছ না, সেটা আমি বুঝতেই পারছি না। অ্যামনিসিয়ার কথা পড়োনি?'

সেজো ছেলে প্রীতীন কিছুই বলছে না। হারানো ভাইয়ের সঙ্গে নিজের বয়সের তফাতটা সবচেয়ে কম বলেই বোধহয় প্রীতীনের মনটা অন্যদের চেয়ে বেশি ভারী। ও বাবলুকে ক্রিকেট খেলা শিখিয়েছে, মোনোপলি শিখিয়েছে, দরকার হলে অঙ্ক বুঝিয়ে দিয়েছে, এই সেদিনও সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেছে। প্রীতীন খড়্গপুর চলে যাবার পর থেকে অবিশ্যি দু'-ভাইয়ের দেখা কমে গেছে। এখন যে প্রীতীন মাঝে মাঝে দু'-হাতের তেলো দিয়ে কপালে আঘাত করছে, তার কারণ ওর বিশ্বাস, ও কলকাতায় থাকলে বাবলুকে এইভাবে কিডন্যাপ করা সম্ভব হত না। ওর কেন যে এরকম ধারণা হল, সেটা বলা মুশকিল। কারণ ও সেই সময় কলকাতায় থাকলেও ভাইয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকত না। বাবলু ফিরছিল ইস্কুল থেকে। বাড়ি কাছে হওয়ায় বৃষ্টি না থাকলে ও হেঁটেই ফেরে। সঙ্গে থাকে ওর বন্ধু পরাগ—যার বাড়ি ওর তিনটে বাড়ি পরেই। সেদিন ইস্কুল ছুটি ছিল, কিন্তু ইস্কুলেরই খেলার মাঠে শিশুমেলা হবে কয়েক দিনের মধ্যেই, তাই কিছু ছেলেকে বাছাই করা হয়েছিল, তার তোড়জোড়ে সাহায্য করার জন্য। বাবলু ছিল তাদের মধ্যে একজন। পরাগ ছিল না। তাই বাবলু সেদিন একাই বাড়ি ফিরছিল বিকেল সাড়ে-পাঁচটার সময়। সেই সময় তাকে ধরে নিয়ে যায় গুণ্ডার দল, একটা নীল রঙের অ্যামবাসাডার গাড়িতে। ঘটনাটার একজন সাক্ষীও ছিল, পোদ্দারদের বাড়ির বুড়ো দারোয়ান মহাদেও পাঁড়ে।

'তাই যদি হয়,' মিস্টার সান্যাল একটু ভেবে বললেন, 'তা হলে তো সে ছেলে বাড়ি ফিরে এলে কাউকে চিনতেই পারবে না।'

'সেটারও ট্রিটমেন্ট হয়,' সুধীন্দ্র বলল। 'লস্ট মেমরি ফিরিয়ে আনা যায়। তুমি এ বিষয়ে ডক্টর বোসকে কনসাল্ট করে দেখতে পারো। আর এখানে যদি সেরকম স্পেশালিস্ট না থাকে, বিদেশে নিশ্চয়ই আছে।'

'তা হলে—' মিস্টার সান্যাল সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তিনি তাঁর কথা শেষ করার আগেই দারোগা মিস্টার চন্দ বললেন, 'আমি যেটা বলছি, সেটাই করুন স্যার। অ্যাদ্দিনেও যখন তারা কোনও উচ্চবাচ্য করল না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আপনার ছেলে অন্য কোথাও

আছে। আর সে যদি সবকিছু ভুলে গিয়েই থাকে, তা হলে তো সে আর নিজে থেকে বাড়ি ফিরবে না। তাই বলছি, আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। রিওয়ার্ড অফার করুন। তার পর দেখুন কী হয়। এতে তো আর কোনও ক্ষতি হচ্ছে না আপনার।'

'ওই লোক দুটোর কোনও হদিস পেলেন ?' মিস্টার সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন।

'মনে হয়, তারা কলকাতাতেই আছে,' বললেন দারোগাসাহেব, 'তবে খোঁজ যাকে বলে সেটা এখনও ঠিক...'

শরদিন্দু সান্যাল ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাতটা চালিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা হলে তাই করা যাক্। বলু, তুই কালকের দিনটা থেকে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাটা করে দে। পিটু ছেলেমানুষ, পারবে না।'

সুধীন্দ্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। অপমানবোধে একটু নড়েচড়ে বসল প্রীতীন্দ্র।

'ক'টা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলছেন আপনি ?'

প্রশ্নটা দারোগাসাহেবকে করলেন মিস্টার সান্যাল। চন্দ্র বললেন, 'পাঁচটা তো বটেই—মিনিমাম। ইংরিজি বাংলা হিন্দি তিনটে ভাষাতেই দেওয়া উচিত। আমি হলে উর্দু আর গুরুমুখীটাও বাদ দিতাম না। কোন্ দলে গিয়ে পড়েছে আপনার ছেলে, সে তো জানার উপায় নেই।'

'ওর একটা ছবিও দিতে হবে তো ?'

এবার প্রীতীন্দ্র কথা বলল।

'আমার কাছে ছবি আছে বাবলুর। লাস্ট ইয়ার দার্জিলিঙে তোলা।'

'দেওয়াই যখন হচ্ছে', বললেন মিস্টার সান্যাল, 'তখন ভাল করে চোখে পড়ার মতো বিজ্ঞাপন হয় যেন। খরচটা কোনও কথা নয়।'

॥ ১০ ॥

আজ সকাল থেকেই ফটিকের মনটা চনমনে। আজ হারুনদা প্রথম ময়দানে চোখ বেঁধে জাগ্‌লিং দেখাবে। সেদিন থেকে হারুন রোজই নিয়মমতো উপেনবাবুর দোকানে এসেছে। আগে একবার করে আসত, এ ক'দিন দু'বেলা এসেছে। সেদিন ওর বাড়ি থেকে ফিরতে ফটিকদের কোনও অসুবিধা হয়নি। শ্যামলাল আর সেই লোকটা ওদের পিছু নেয়নি।

হারুন যে কলকাতার অলিগলি কীরকম ভালভাবে জানে, সেটা ফটিক সে দিন বুঝতে পেরেছে। লোকগুলো পিছু নিলেও হারুনের চরকিবাজির চোটে হিমশিম খেয়ে যেত।

হারুন প্রতিবার এসেই ফটিককে জিজ্ঞেস করেছে, সেই দুটো লোক আর এসেছিল কিনা। কিন্তু তারা আর আসেনি। দোকানের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে কিনা সেটা ফটিক জানে না, কারণ রোজই তাকে সকাল থেকে রাত অবধি ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। বাইরে গিয়ে দু-দণ্ড দাঁড়াবারও সময় পায়নি। এ ক'দিনে তার কাজ আরও অনেকটা সড়গড় হয়ে এসেছে। গোড়ায় রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে বুঝতে পারত হাত দুটোতে একটা অবশ ভাব, কিন্তু গত ক'দিন সেটাও হয়নি। এমনকী বিষ্যুদবার থেকেই ও কাজের পর খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় বসে দুটো কাঠের বল নিয়ে লোফালুফি অভ্যাস করেছে। বল দুটো হারুনদাই এনে দিয়েছে, একটা হলদে, একটা লাল। কী করে লুফতে হয়, সেটাও হারুনদা শিখিয়ে দিয়ে বলেছে, 'তুই যে আর্টটা শিখছিস, সেটা পাঁচ হাজার বছর আগেও মিশরদেশে ছিল। পাঁচ হাজার কী বলছি—সৃষ্টির আদি থেকে ছিল। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর আগে।' ফটিক অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভাবল, হারুনদা বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু হারুন বুঝিয়ে দিল :

'এই যে পৃথিবী—এটাও তো একটা বল। আরও যত গ্রহ আছে—মঙ্গল বুধ বিষ্যুদ শুক্কুর শনি—সব এক-একটা বল। আর সব ব্যাটা ঘুরছে সূর্যকে ঘিরে। আবার চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চার দিকে। অথচ কেউ কারুর গায়ে লাগছে না। ভাবতে পারিস ? এর চেয়ে বড় জাগ্‌লিং হয় ?

রাত্তিরে আকাশের দিকে চাইলেই বুঝবি কী বলছি। ...বল দুটো যখন হাতে নিবি, তখন এই কথাটা মনে রাখিস।'

কিন্তু লোক দুটো না এলেও ফটিক বুঝতে পারছে যে হারুনদার মনে একটা ভয় ঢুকে গেছে, যেটা সহজে যাবার নয়। এক এক সময়ে মনে হয়, শুধু ভয় না, আরও কিছু ; কিন্তু সেটা যে কী, সেটা ফটিক বুঝতে পারে না। ও খালি লক্ষ করে যে, হারুনদার চোখের জ্বলজ্বলে ভাবটা মাঝে মাঝে চলে গিয়ে চোখ দুটো কিছুক্ষণের জন্য কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে।

এসব কথা অবিশ্যি ময়দানে গিয়ে আর ফটিকের মনে হয়নি। হারুন গত রবিবারে যেখানে খেলা দেখিয়েছিল, সেখানে আজ আগে থেকেই ছেলের দল ভিড় করে রয়েছে। ফটিক তাদের কয়েকজনকে দেখেই চিনল। ওই যে সেই মুখে বসন্তের দাগওয়ালা কানা ছেলেটা ; ওই যে সেই বেঁটে বামনটা—যাকে দূর থেকে দেখলে বাচ্চা মনে হয়, আর কাছে এসেই গোঁফদাড়ি দেখে চমকে যেতে হয় ; আর ওই যে সেই লুঙ্গি-পরা ঢ্যাঙা ছেলেটা, যার দাঁত সবসময়ে বেরিয়ে থাকে। হারুনকে দেখেই ছেলের দল হাততালি দিয়ে হইহই করে উঠল।

হারুন তার জায়গায় বসে একবার আকাশের দিকে চেয়ে নিল। ফটিক জানে কেন। পশ্চিমের আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি এলে খেলা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। হে ভগবান—যেন বৃষ্টি না হয়, যেন হারুনদা আজ চোখ বেঁধে খেলা দেখিয়ে এদের চোখ টেরিয়ে দিতে পারে, যেন সে আজ আঠারো টাকা বত্রিশ পয়সার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করতে পারে। ইস্, কয়েকটা সাহেব-মেম ভিড়ের মধ্যে থাকলে বেশ হত ! এখানে কে ফেলবে দশ টাকা, পাঁচ টাকার নোট !

দূর থেকে আসা একটা মেঘের ডাকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হারুন তার খেলা শুরু করে দিল। আজ থুতনির উপর লাট্টুর খেলাটা শেষ করে হারুন ভিড়ের মধ্যে থেকে ইশারা করে ফটিককে কাছে ডাকল। লাট্টুটা তখনও হারুনের তেলোতে ঘুরছে। ফটিক আসতেই হারুন তাকে হাত পাততে বলে নিজের হাত থেকে লাট্টুটা ফটিকের হাতে চালান দিয়ে বলল, 'ধর এটা।'

তেলোতে সুড়সুড়ি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ফটিকের সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে আজ হারুনদার অ্যাসিস্ট্যান্ট, হারুনদার শিষ্য !

হারুন এবার আর একটা ঘুরন্ত লাট্টু ডান হাতে নিয়ে অন্যটা ফটিকের হাত থেকে নিজের বাঁ হাতে নিয়ে নিল। তারপর যতক্ষণ দুটো লাট্টুতে দম থাকে, ততক্ষণ চলল চোখ-ধাঁধানো ঘুরন্ত লাট্টুর জাগ্‌লিং।

তারপর এমনই বলের খেলা শেষ হলে ফটিকের আবার ডাক পড়ল। হারুনদা থলি থেকে বুটিদার সিল্কের রুমালটা বার করে ফটিকের হাতে দিল। ফটিক রুমাল দিয়ে হারুনের চোখ ঢাকতেই ভিড়ের মধ্য থেকে একটা হইহই রব উঠল। অন্ধকার হয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু ফটিক জানে, তাতে কিছু এসে যাবে না ; হারুনদার চোখেও এখন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। এ খেল্ দেখাতে হারুনদার আলোর দরকার হয় না।

দু' বলের খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফটিক বুঝেছে যে, আজকে আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশি পয়সা পড়বে। অনেক নতুন লোক এসে জমা হয়েছে এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

হারুন থলে হাতড়ে তিন নম্বর পিতলের বল বার করল। বেশ জোরে একটা মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ-বাঁধা হারুন ওস্তাদের উদ্দেশে সেলাম জানিয়ে বল আকাশে ছুড়ল। বল চার পাক ঘোরার পর পাঁচ পাকের বেলা ফটিকের চোখের সামনে যেটা ঘটল, তার চেয়ে যদি আকাশ ভেঙে ওর মাথায় পড়ত, তাতে ওর কষ্ট অনেক কম হত।

ঠিক হারুনদার মাথার উপরে একটা বল আর-একটা বলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একটা সাত-চড়া কান-ফাটানো শব্দ করে ছিটকে গিয়ে পড়ল দু' দিকে ঘাসের উপর।

আরও অবাক এই যে, যে-লোকগুলো এতক্ষণ হারুনকে তারিফ করছিল, তালি দিচ্ছিল, শাবাশ দিচ্ছিল, তারাই হঠাৎ রাক্ষস হয়ে গিয়ে বিকট সুরে হেসে উঠে সেই একই হারুনকে দুয়ো দিতে লাগল।

তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিড় উধাও হয়ে গিয়ে জায়গাটা খালি হয়ে

গেল। এদিকে হারুন নিজেই চোখের বাঁধন খুলে থলির মধ্যে তার খেলার সরঞ্জাম তুলে ফেলেছে। ফটিক পয়সাগুলো তুলতে যাচ্ছিল, হারুন তার দিকে একটা ধমক ছুড়ে সেটা বন্ধ করে দিল। তারপর ঘাসের উপর বসেই একটা বিড়ি ধরাল। ফটিক তারপাশে গিয়ে বসল। নিজে থেকে কিছু বলার সাহস নেই তার ; সে ইচ্ছেও নেই। চৌরঙ্গি থেকে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, যা এর আগের দিন, বা একটুক্ষণ আগে পর্যন্ত ফটিকের কানেই যায়নি। দুটো টান দিয়ে বিড়িটাকে ঘাসের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে হারুন বলল, 'মনের সঙ্গে হাতের এমন যোগ না রে ফটিক—একটা গুম্‌সে গেলে অন্যটাও খেলতে চায় না। ...যদ্দিন না তোর একটা হিল্লে হচ্ছে, তদ্দিন ব্লাইন্ড জাগ্‌লিং এস্টপ্‌।'

এসব আবোল-তাবোল কী বলছে হারুনদা ? বেশ তো আছে ফটিক। আবার কী হিল্লের দরকার ? হারুন বলে চলল, 'সেদিন শ্যামলালকে দেখার পর থেকেই তোর ঘটনাটা একটা ছকে এসে গেছে। লোকগুলো তোকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। তোকে কোনও একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখে তোর বাবার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে তবে তোকে ছাড়ত। ওদের প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যায় গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে। শ্যামলাল আর-আর এক ব্যাটা বেঁচে যায়, অন্য দুটো মরে। তোকে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে দেখে শ্যামলালের হয়তো ধারণা হয়েছিল তুইও মরে গেছিস, তাই তোকে ফেলেই পালায়। তার পর সেদিন উপেনদার দোকানে গিয়ে দেখে, ফস্‌কে-যাওয়া শিকার আবার হাতের কাছে এসে গেছে।

'সেদিন তোকে পৌঁছে বাড়ি ফিরে এসে দেখি, দু' ব্যাটা তখনও ঘুরঘুর করছে। এগারোটা পর্যন্ত ছিল, তারপর চলে যায়। আমি পিছনে ধাওয়া করে ওদের ডেরাটা জেনে নিই। পুলিশে বললে ওরা ধরা পড়ে যায় ; কিন্তু ওদের ধরিয়ে দিলেই তো আর খেলা ফুরিয়ে যাচ্ছে না। ...আমার উচিত তোকেও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া।'

'না না, হারুনদা।'

'জানি। তোর মন আমি জানি। তাই তো কিছু করতে পারছি না। আর সত্যি বলতে কী, তোর পরিচয়টা জানা হয়ে গেলে অন্য কথা ছিল। এখন তোকে পুলিশে দেওয়া আর একটা রাস্তার কুকুরকে পুলিশে দেওয়া একই ব্যাপার।'

কথাটা শুনে ফটিকের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ও বলল, 'রাস্তার কুকুর কাঠের বল নিয়ে জাগ্‌লিং করতে পারে ?'

'তুই অভ্যেস করছিস ?' হারুন জিজ্ঞেস করল, এই প্রথম ফটিকের দিকে সোজা তাকিয়ে, এই প্রথম একটু হেসে।

'করছি না ?'—ফটিকের অভিমান এখনও যায়নি।—'সারাদিন কাজের পর রাত্তিরে ঘুমোনোর আগে এক ঘন্টা রোজ।' ফটিক পকেট থেকে বল দুটো বার করে হারুনকে দেখিয়ে দিল।

'গুড,' বলল হারুন। 'দেখি, আর দুটো দিন দেখি। কেউ যদি তোর খোঁজখবর না করে তো তোকে সঙ্গে নিয়েই যাব।'

'কোথায় ?'—ফটিক অবাক। হারুনদা যে আবার কোথাও যাবার কথা ভাবছে, সেটা ও এই প্রথম শুনল।

'এখনও ঠিক করিনি। কাল সেই ভেঙ্কটেশের একটা চিঠি পেয়েছি। আসতে লিখেছে। এইভাবে মাটি থেকে পয়সা কুড়িয়ে নিতে আর ভাল লাগছে না রে। অনেকদিন তো—'

'তোমার এই খুদে শাগরেদটি কে হে ?'

কথাটা এমন আচমকা এল যে, ফটিকের মনে হল, তার কলজেটা এক লাফে গলার কাছে চলে এসেছে।

সেই দুটো লোক অন্ধকারে পিছন থেকে এসে দাঁড়িয়েছে। ফটিকের ডান কাঁধের পাশে এখন শ্যামলালের ধনুকের মতো বাঁকা প্যান্ট-পরা বাঁ পা।

এবার ফটিক দেখল তার কানের পাশ দিয়ে একটা ছুরির ফলা এগিয়ে গিয়ে তার আর হারুনের মাঝখানে এসে থেমে গেল।

হারুনদাও আড়চোখে দেখছে শ্যামলালের দিকে।

‘রোঘো—চাকতিগুলো তুলে নে। নন্দর দোকানের দেনাটা শোধ হয়ে যাবে।’

অন্য লোকটা পয়সাগুলো তুলতে আরম্ভ করে দিল।

‘কী হে, আমার কথার—’

শ্যামলালের কথা শেষ হল না। ফটিক দেখল চারটে পিতলের বল, চারটে ছোরা আর দুটো বোমা লাট্টু সমেত হারুনদার থলিটা মাটি থেকে হাউইয়ের মতো শূন্যে উঠে গিয়ে, শ্যামলালের থুতনিতে লেগে তাকে পাঁচ হাত পিছনে ছিটকে ফেলে দিল।

'ফট্‌কে !'

হারুনদার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ফটিক দেখল, সে-ও থলিটার মতো শূন্যে উঠে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে হারুনের বগলদাবা হয়ে। এদিকে ধুলোর ঝড় উঠেছে শহিদ মিনারের চারদিকে, আর ময়দানের যত লোক—সব ছুটে চলেছে চৌরঙ্গির দিকে বৃষ্টির প্রথম ঝাপটা থেকে রেহাই পাবার জন্য।

'ছুটতে পারবি ?'

'পারব।'

ফটিক বুঝল তার পায়ের তলায় আবার মাটি, আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই তার পা-ও চলতে লাগল হারুনের সঙ্গে পা মিলিয়ে গাড়িগুলোর দিকে।

'ট্যাক্সি !'

একটা ব্রেক কষার শব্দ। ফটিকের সামনে একটা কালো গাড়ির দরজা খুলে গেল।

'সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ !'

সামনে অন্য গাড়ি, ট্যাক্সি, বাস, স্কুটার। হারুন-ফটিক দু'জনেই পাশ ফিরে দেখছে, শ্যামলাল আর রঘুনাথ দৌড়ে এগিয়ে আসছে ঝড়ের মধ্যে। এখনও দিনের আলো আছে, তবে রাস্তায় আর দোকানে বাতি জ্বলে গেছে।

ট্যাক্সি সামনে ফাঁক পেয়ে রওনা দিল। হারুন ড্রাইভারকে বলল, 'বাড়তি পয়সা দেব ভাই—একটু তেজ লাগান।'

বাঁয়ে ঘুরে চৌরঙ্গি ধরে ট্যাক্সি এগিয়ে চলল ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সামনে চৌমাথা। ধরমতলার মোড়। বাতি লাল ছিল ; ফটিকদের ট্যাক্সি পৌঁছতে না পৌঁছতে সবুজ হয়ে গেল। গাড়ি মোড় পেরিয়ে বিজলি-আপিস বাঁয়ে ফেলে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর চওড়া রাস্তা ধরল। রবিবার, তাই ভিড় কম। ফটিক বুঝল, তার কানের পাশ দিয়ে শনশন করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

'আরও জোরে ভাই—পিছনে গণ্ডগোল।'

হারুনের কথায় ফটিক মাথা ঘুরিয়ে পিছনের কাচ দিয়ে দেখল, আর একটা ট্যাক্সির জোড়া আলো ক্রমে বড় হয়ে তাদের দিকে ধাওয়া করে আসছে।

'হারুনদা—ওরা ধরে ফেলবে আমাদের !'

'না, ফেলবে না।' ফটিকের কান বাতাসে বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। জোড়া আলো আবার ছোট হচ্ছে। এবার ঝাপসা হয়ে গেল, কারণ কাচে বৃষ্টি পড়ছে। ফটিক সামনের দিকে ফিরল। সামনের কাচেও বৃষ্টি। সামনেও জোড়া জোড়া গোল আলো একটার পর একটা হুশ্‌ হুশ্‌ করে ট্যাক্সির পাশ দিয়ে বেরিয়ে উলটো দিকে চলে যাচ্ছে।

এবার একটা জোড়া আলো যেন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। গাড়ি নয়, বাস। ধুমসো বাস। দৈত্যের মতো বাস। রাক্ষসের মতো বাস। ওই দুটো ওর চোখ। ক্রমে বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে। হতে হতে বাসটা হঠাৎ লরি হয়ে গেল। দু'পাশের বাড়িগুলো আর নেই...আলোগুলো আর নেই। তার বদলে অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার, জঙ্গল, জঙ্গল, জঙ্গল...

'কী হল ফট্‌কে ? এলিয়ে পড়লি কেন ? কী হল ?'

হারুনের প্রশ্নটা একরাশ ফিরে আসা শব্দের মধ্যে হারিয়ে গেল। প্রথমেই সেই গাড়িতে-গাড়িতে লাগার কান-ফাটা শব্দ—যার পরেই ওর মনে হয়েছিল, ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় উড়ছে। সেটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কানে তালা লেগে যাওয়ার ভাব হল, আর তারপরেই তার বারো বছর তিন মাসের জীবনে যা-কিছু ঘটেছিল, সব যেন হুড়মুড় করে এসে তাকে ঘিরে ধরে বলল—আমরা এসেছি, যখন চাও, যাকে চাও, বেছে নাও। তারাই বলল, তোমার ভাল নাম নিখিল, ডাকনাম বাবলু, তোমার বাবার নাম শরদিন্দু সান্যাল ; তোমার তিন দাদা, এক দিদি ; দিদির নাম ছায়া। দিদি বিয়ে করে চলে গেছে বরের সঙ্গে সুইজারল্যান্ড। তারাই বলল, তোমার ঠাম্মা তোমাদের বাড়ির দোতলায় বারান্দার শেষের বাঁ দিকের ঘরটাতে—রাত-দিন পুজোর ঘরে খুটুং খাটুং—নাকের উপর সোনার চশমা এঁটে ইয়া মোটা কাশীরামের ছেঁড়া পাতার উপর ঝুঁকে পড়ে সুর করে দুলে দুলে পড়া ঠাম্মা...ছোড়দা বলল,

'এই দ্যাখ, ড্রাইভ মারার সময় রিস্ট কী ঘোরে,' আর অঙ্কের স্যার মিস্টার শুক্‌লা বলছে, 'স্টপ ইট মনমোহন !'—মনমোহনের গোল মুখ গোল মাথায় এত সরু বুদ্ধি—যতবার বিক্রমটা পেনসিল কেটে ডেস্কের উপর রাখছে, ও পিছন থেকে কাগজের নল পাকিয়ে ফুঁ দিয়ে সেটাকে গড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। সবচেয়ে হাসি পায় মনে করলে, দিদির বিয়েতে গ্রামোফোনে বিসমিল্লার সানাই, আর পুরনো রেকর্ড ফাটা জায়গায় এসে প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও একই জিনিস বার বার, আর তাই শুনে শামিয়ানার তলায় যত লোক সব খাওয়াটাওয়া ফেলে হো হো হো— আর হ্যাঁ, দার্জিলিং তো মনে পড়েই, আর তার আগের বছর পুরী, তার আগে মুসুরি, তার আগে আবার দার্জিলিং, আর তারও অনেক অনেক আগে ছোটবেলায় ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে পায়ের তলায় বালি সরে সরে যাচ্ছে আর সুড়সুড়ি লাগছে আর মনে হচ্ছে ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে সরসর সরসর করে সরে যাচ্ছে, আর মা যেই বললেন, পড়ে যাবে বাবলু সোনা, অমনি ধপাস্ ঝপাং !—মা'র কথা অবিশ্যি বেশি মনে নেই। এখন খালি একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। এখন বাড়িতে লোক আর নেই। এতবড় বাড়ি আর তিনজন মাত্র লোক। ছোটকাকার তো মাথাই খারাপ। আগে ছিল বাড়িতেই, যখন মাথা ঠিক ছিল। এখন লুম্বিনীতে।...

ও আবার শুনতে পেল ট্যাক্সির শব্দ। বাইরের রাস্তার আলো দেখতে পেল। হারুনদা—হ্যাঁ, ওই তো হারুনদা—ওর পাশের জানলার কাচটা তুলে দিল।

'ভয় পেলি নাকি—অ্যাই ফটকে,' হারুনদা বলছে। 'আর ভয় নেই। ওরা আর নেই পেছনে।'

ও শুনতে পেল, পাশের বাড়ির রাইট সাহেবদের অ্যালসেশিয়ানটা ভারী গলায় ঘেউ-ঘেউ করছে। কুকুরের নাম ডিউক। ও ডিউককে ভয় পায় না। ওর ভীষণ সাহস। ও রাত্রে একা শোয়। একবার দার্জিলিঙে ও বার্চ হিলের রাস্তা দিয়ে অনেকদূর গিয়ে—হঠাৎ কুয়াশা এসে সব ঢেকে দিল। ও তখন একা। ওর মনে আছে, ও ভয় পায়নি।

'শরীর খারাপ লাগছে ? না মনখারাপ ?' হারুনদা জিজ্ঞেস করছে।

ও মাথা নাড়ল।

'তবে কী ?'

ও হারুনদার দিকে চাইল। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ট্যাক্সি চলছে এখনও। কাচ তোলা, তাই আস্তে বললেও কথা শোনা যায়। ও আস্তেই বলল—

'সব মনে পড়ে গেছে হারুনদা।'

॥ ১১ ॥

ওরা দু'জন এখন চিৎপুরের একটা দোকানে বসে রুটি-মাংস খাচ্ছে। ও জানে, এরকম জায়গায় এসে ও কোনওদিন খায়নি, হারুনদার সঙ্গে না এলে হয়তো কোনওদিন আসত না। হারুনদা এতক্ষণ ওকে জিজ্ঞেস করে করে সব জেনে নিয়েছে। ইস্কুল থেকে ফেরার সময় লোকগুলো কী করে ওকে রাস্তা থেকে ছিনিয়ে তুলে নিল, তাও বলেছে।

'লাউডন স্ট্রিটে তোর বাড়িতে পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবি ?' হারুন জিজ্ঞেস করল। 'ও তল্লাট আমার চেনা নেই।'

ও হেসে উঠল।—'আরেব্বাস, খুব সহজ।'

'হুঁ...'

হারুন একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আজ রাত করে যাবার দরকার নেই। আর তোর চেহারাটাকেও একটু ফিরিয়ে নিতে হবে। চুলটা আর একটু বড় হলে ভাল হত, কিন্তু উপায় নেই। কাল পরিষ্কার প্যান্ট-শার্ট পরে রেডি থাকবি। আমি সক্কাল সক্কাল এসে পড়ব। উপেনদাকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। আমি পরে ম্যানেজ করব।'

ও এখনও কিছুই ভাল করে ভাবতে পারছে না। বাড়ি তো যেতেই হবে। বাবা আছে, ঠামা আছে, হরিনাথ বুড়ো চাকর আছে। হরিনাথ ওর সব কাজ করে দেয়। ও চায় না, তাও করে

দেয়। ওর রাগ হয়, কিন্তু হরিনাথ বুড়ো বলে কিছু বলে না। তারপর ইস্কুল আছে, রাম খেলাওন দারোয়ান, মিস্টার শুকুল হেডমাস্টার, পি-টি মাস্টার মিঃ দত্ত, ওর ক্লাসের বন্ধুরা—অঞ্জন, প্রীতম, রুসি, প্রদ্যোত, মনমোহন। একবার সেই চাঁদপাল ঘাট থেকে স্টিমার করে বোটানিক্স-এ পিকনিক...

ওর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, আর তক্ষুনি সেটা হারুনদাকে না বলে পারল না।

'আমাদের বাড়ির একতলায় একটা ঘর আছে, কেউ থাকে না হারুনদা! খালি একটা পুরনো আলমারি আর একট পুরনো ভাঙা টেবিল রয়েছে। ওগুলো সরিয়ে দিলেই তুমি থাকতে পারবে।'

হারুন একবার আড়চোখে ওর দিকে দেখে নিল। তারপর রুটির আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে বলল, 'আমার বস্তির ঘরের মতো করে সাজিয়ে নিতে দেবে তোর বাবা?'

বাবার চেহারাটা মনে করে ও যে খুব ভরসা পেল, তা নয়; কিন্তু তা হলে কী হয়? মানুষ তো বদলাতে পারে! তাই ও বলল, 'কেন দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে।'

'ভেরি গুড,' বলল হারুন, 'তা হলে বলব, তোর বাবা খাঁটি আর্টিস্ট। খালিফ হারুনের খেয়ালগুলো আর্টিস্ট ছাড়া কেউ বুঝবে না।'

॥ ১২ ॥

খবরের কাগজের সবকিছুই যে সবাই পড়ে বা দেখে, তা নয়। বিশেষ করে সাঁতরাগাছির কাছে একটা বিশ্রী রেল-দুর্ঘটনার খবর কাগজের সামনের পাতার অনেকখানি জুড়ে থাকায় অনেকেরই আর পিছনের পাতায় বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়েনি। যাদের পড়েছে, তারা সকলেই স্বীকার করল যে, ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যাল তাঁর হারানো ছেলেকে ফিরে পাবার আশায় যে পুরস্কারটা ঘোষণা করেছেন, সেটা তাঁর মতো ধনী লোকের পক্ষে বেশ মানানসই হয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা মুখের কথা নয়!

উপেনবাবু বিজ্ঞাপনটা দেখেননি। হারুন নিয়মিত কাগজ না পড়লেও একবার অন্তত উলটেপালটে দেখে সকালে সিংহিমশাইয়ের চায়ের কেবিনে বসে। আজ সেটা হয়ে ওঠেনি, কারণ তার সে মেজাজ ছিল না। ভোর সাড়ে-পাঁচটায় উঠে কোনও-মতে এক কাপ চা খেয়ে সে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেছে ফটিকের কাছে। এখন বোধহয় আর ফটিক বলাটা ঠিক নয়; কিন্তু হারুনের কাছে ওই নামটাই ওর নাম। নিখিল নয়, বাবলু নয়, এমনকী সান্যালও নয়। ওর নাম ফটিকচন্দ্র পাল।

উপেনবাবু অবিশ্যি একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, ফটিককে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে হারুন। তাতে হারুন বলল, 'একটু সাহেবপাড়ায় যাচ্ছি উপেনদা; ফিরে এসে সব বলব।' উপেনবাবু জানেন, হারুনের মাথায় মাঝে মাঝে ছিট দেখা দেয়। তবে লোকটা ভাল, তাই ওকে আর কিছু না বলে কেষ্টর ছেলে সতুর দিকে ফিরে বললেন, 'আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে হবে না। কাজ আছে, হাতমুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নে।'

॥ ১৩ ॥

শরদিন্দু সান্যাল তাঁর ক্লার্ক রজনীবাবুকে বললেন, 'আজকাল কাগজ আর ছাপা যা হয়েছে—এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। ...বাবলুর এমন সুন্দর ছবিটাকে এইভাবে ছেপেছে?'

'আপনি এইটে দেখেছেন স্যার?'—বলে রজনীবাবু একটা ইংরিজি কাগজ মিস্টার সান্যালের দিকে এগিয়ে দিলেন। 'ওতে কিন্তু বাবলু বলে চিনতে অসুবিধে হয় না।'

শরদিন্দু সান্যালের সামনে ডাঁই করা খবরের কাগজ। রজনীবাবুকে বলাই ছিল উনি যেন আসার সময় কিনে আনেন। এমনিতে রজনীবাবু সাড়ে-আটটায় আসেন। আজ তাড়াতাড়ি আসার কারণ, সান্যাল সাহেবের বিশ্বাস, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই যতসব আজেবাজে লোক টাকার লোভে যেখান-সেখান থেকে ছেলে ধরে এনে তাঁর সামনে হাজির করবে। তখন ব্যাপারটা যাতে বেসামাল

না হয়ে পড়ে, তার জন্য সেজো ছেলে প্রীতীন আর বেয়ারা কিশোরীলাল ছাড়াও তিনি রজনীবাবু ও জুনিয়র ব্যারিস্টার তপন সরকারকে সকাল সকাল আসতে বলেছেন। সরকার এখনও আসেননি, আর প্রীতীনের এখনও ঘুম ভাঙেনি। সে রাত জেগে পরীক্ষার পড়া করেছে। আজই দুপুরে সে খড়্গপুর ফিরে যাবে।

বাইরে একটা ট্যাক্সি থামার আওয়াজ পেয়ে মিস্টার সান্যাল হাত থেকে কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই শুরু হল।' শুরুতেই যে শেষ, সেটা শরদিন্দু সান্যাল ভাবতে পারেননি।

'বাবা!'

এ কী, এ যে বাবলুর গলা!

শরদিন্দু সান্যালের দৃষ্টি পরদাওয়ালা বাইরের দরজাটার দিকে চলে গেল। তার ঠিক পরেই পরদা ফাঁক করে বাবলু এসে ঢুকল ঘরে।

'কী ব্যাপার? কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন? কে আনল তোকে? এ কী, তোর চুলের এ কী দশা?'

প্রশ্নগুলো এক নিশ্বাসে করে গেলেন শরদিন্দু সান্যাল; এবং করেই একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁর চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন—যেন উত্তরগুলো জানাটা বড় কথা নয়, ছেলে ফিরে এসেছে সেটাই বড়।

তারপরেই তাঁর চোখ গেল বাবলুর পাশে পরদার ফাঁক দিয়ে বাইরে বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে। 'আপনি ভেতরে আসুন,' বললেন মিস্টার সান্যাল। যেই হোক না কেন, ভিতরে ডাকতেই হবে; একটা পুরস্কারের ব্যাপার আছে তো।

লোকটা দরজার দিকে এগিয়ে এল। মিস্টার সান্যাল রজনীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'দারোয়ানকে বলে দিন, বাচ্চা ছেলে সঙ্গে করে কেউ এলে যেন ঢুকতে না দেয়। বলুন, যেন বলে দেয় যে, ছেলে ফিরে এসেছে।'

রজনীবাবু হুকুম তামিল করতে চলে গেলেন। পরদা ফাঁক হতেই মিস্টার সান্যাল দেখলেন যে, লোকটা দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

একে ভদ্রলোক বলা যায় কি? মিস্টার সান্যাল ভেবে স্থির করলেন—না, যায় না। শার্টটা সস্তা এবং ময়লা, পায়ের চটিটা ক্ষয়ে গেছে, সাদা সুতির প্যান্টটায় অজস্র ভাঁজ। আর ওরকম চুল আর ঝুলপি—অবশ্য না, ওগুলোকে অভদ্র বলা মুশকিল, কারণ তার নিজের সেজো ছেলে প্রীতীন্দ্রর চুল আর ঝুলপিও তো কতকটা ওইরকমই।

'ভেতরে এসো।'

হারুন চৌকাঠ পেরিয়ে এল।

'কী নাম তোমার?'

'ও হারুনদা, বাবা। আর্টিস্ট। দারুণ খেলা দেখায়।'

শরদিন্দু সান্যাল তাঁর সদ্য-ফিরে-পাওয়া ছেলের দিকে একটু বিরক্তভাবেই চেয়ে বললেন, 'তুমি থামো বাবলু। ওকে বলতে দাও। তুমি বরং ওপরে যাও। ঠামাকে গিয়ে বলো, তুমি ফিরে এসেছ—বড় কষ্ট পেয়েছেন এ ক'টা দিন। আর ছোড়দাও আছে। ঘুমোচ্ছে। ওকে তুলে দাও গিয়ে।'

বাবলুর কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই। হারুনদাকে ফেলে সে যাবে কী করে? ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বাবার চোখের আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাবলু। ও হারুনদাকে দেখতে পাচ্ছে। ওর পিছন দিকটা।

শরদিন্দু সান্যাল আবার লোকটার দিকে চাইলেন।

'শুনি তোমার ব্যাপার।'

'ও খড়্গপুর থেকে আমার সঙ্গে এসেছে। চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছিল। আমি টেনে তুলি। তারপর থেকে এখানেই ছিল।'

'এখানে মানে?'

'কলকাতায় বেনটিং ইস্ট্রিটে। একটা চায়ের দোকানে।'

'চায়ের দোকানে ?' মিস্টার সান্যালের চোখ কপালে উঠে গেছে। 'কী করছিল চায়ের দাকানে ?'

'কাজ করছিল স্যার ?'

'কাজ ? কী কাজ ?' মিস্টার সান্যাল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করছেন না।

হারুন বলল। মিস্টার সান্যালের মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে, থাকলে বোধহয় বেশ কয়েক গাছা ছিঁড়ে ফেলতেন।

'হোয়াট ইজ অল্ দিস !' চেয়ার ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার সান্যাল—'এ কি মগের মুল্লুক নাকি ? ওকে দিয়ে চায়ের দোকানের বয়ের কাজ করিয়েছ ? তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই ? দেখে বুঝলে না, ও ভদ্রলোকের ছেলে ?'

বাবলু আর থাকতে পারল না। ও বারান্দা থেকে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'আমার খুব ভাল লাগছিল কাজ করতে বাবা !'

'চুপ করো !'—গর্জন করে উঠলেন মিস্টার সান্যাল। 'তোমাকে বললাম না ওপরে যেতে ?'

বাবলু আবার দরজার বাইরে চলে গেল। অ্যাদ্দিন পরে বাড়িতে ফিরে এসে যে এরকম একটা ব্যাপার হবে, সেটা ও ভাবতেই পারেনি।

হারুন এখনও শান্তভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, আর শান্তভাবেই সে বলল, 'আমি যদি জানতুম ও কোন্ বাড়ির—তা হলে কি আর আমার কাছে রাখতুম স্যার। ও যে বলতে পারলে না। ওর কিছু মনে ছিল না।'

'আর আজ কাগজে বেরোনোমাত্র সব মনে পড়ে গেল ?'

মিস্টার সান্যাল যে হারুনের কথা মোটেই বিশ্বাস করছেন না, সেটা তাঁর প্রশ্নের সুর থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল। হারুন কথাটা শুনে একটু অবাক হল।

'কাগজের কথা কী বলছেন জানি না স্যার। ওর মনে পড়েছে কাল রাত্তিরে। কাল বাদলা ছিল তাই আর আনিনি। আজ নিয়ে এলুম, আপনার হাতে তুলে দিলুম—ব্যস্, আমার ডিউটি ফিনিশ। তবে, ইয়ে, ওর মাথার একটা জায়গায় দেখবেন একটু ফোলা আছে। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। যদি ডাক্তার-ফাক্তার দেখান, তাই জানিয়ে দিলুম।...চলি রে ফট্‌কে।'

হারুনদা চলে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবলু ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার আগেই ওকে বাবা ডাকলেন। 'বাবলু, একবার এদিকে এসো।'

ও এল। টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। শরদিন্দু সান্যাল ছেলের মাথার দিকে হাত বাড়ালেন। 'কোথায় ফোলা রে ?'

বাবলু দেখাল। সত্যিই ফোলাটা এখনও পুরোপুরি যায়নি। পাছে ব্যথা লাগে, তাই মিস্টার সান্যাল আর সেখানে হাত দিলেন না।

'খুব কষ্ট হয়েছে এ-ক'দিন ?'

ও মাথা নাড়ল। না, হয়নি !

'ওপরে যাও। হরিনাথকে বলো, গরম জলে বেশ করে চান করিয়ে দেবে। আজ তোমার ছুটি। আজ ডাক্তারবাবু এসে তোমাকে দেখবেন। যদি বলেন যে ঠিক আছে, তা হলে কাল থেকে তুমি আবার ইস্কুলে যাবে। এবার থেকে রোজ গাড়িতে।...যাও।'

ও চলে গেল।

মিস্টার সান্যাল সামনে টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজের স্তূপটা হাতের একটা বিরক্ত ঝাঁটে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'চায়ের দোকান ! ফুঃ !' তারপর রজনীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'চায়ের দোকান ! ভাবতে পারো ?'

রজনীবাবু কেবল একটা কথাই ভাবছিলেন—যদিও সেটা তাঁর মনিবকে বলা যায় না, কারণ কথাটা তাঁর সম্পর্কেই। তিনি ভাবছিলেন যে, যে-লোকটা বাবলুকে ফেরত দিয়ে গেল, তার খবরের কাগজ না-দেখার সুযোগটা নিয়ে মিস্টার সান্যাল তাকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করে কাজটা বোধহয় ভাল করলেন না।

ঘণ্টাখানেক পরে মিস্টার সান্যাল দারোগা মিস্টার চন্দর কাছ থেকে একটা ফোন পেলেন।

‘আপনার বিজ্ঞাপনের কোনও ফল পেলেন ?’ জিজ্ঞেস করলেন দারোগা সাহেব।

উত্তরে মিস্টার সান্যাল যা বললেন তাতে তিনি খুশি তো হলেনই, সঙ্গে সঙ্গে অবাকও হলেন রীতিমতো। বললেন, ‘আশ্চর্য ব্যাপার স্যার !—এক-একটা সময় আসে যখন মনে হয়, এগোবার বুঝি আর রাস্তা নেই। আবার তারপরেই হঠাৎ দেখবেন, ম্যাজিকের মতো সব রাস্তা খুলে গেছে। আপনার ছেলেও ফিরল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্যাং-এর দুটি লোকও অ্যারেস্ট হয়ে গেল।’

‘সে কী !’ বললেন মিস্টার সান্যাল। ‘কী করে হল ?’

‘একটা লোক ফোন করে তাদের ডেরার হদিস দিয়ে দেয়। আধঘন্টাও হয়নি, ওদের ঘুম থেকে তুলে ধরে আনা হয়েছে। থানায় এসে ঘুম ছুটে গেছে। পুরো ব্যাপারটা স্বীকার করেছে।’

এই টেলিফোনের দশ মিনিটের মধ্যে বাবলু-চুরির পুরো ব্যাপারটা শরদিন্দু সান্যালের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেল।

বাবলুর ঠাকুরমা তাঁর নাতিকে ফিরে পেয়ে কিছুক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে ‘ধন আমার মানিক আমার’

বলে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, ওর ব্যথার জায়গাগুলোতে নতুন করে ব্যথা লাগিয়ে দিয়ে, আবার চলে গেলেন তাঁর পুজোর ঘরে। গোপালই তাঁর নাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। গোপালের উপর তাঁর ভক্তি তিনগুণ বেড়ে গেছে। বাবলু নতুন করে বুঝেছে যে, ঠামার পুজোর ঘণ্টা ওর নিজের ঘর থেকে শোনা গেলেও, আসলে ঠামা থাকেন অনেক দূরে।

ছোড়দা আড়াইটের সময় খড়্গপুর চলে গেল। সে বলল, 'ভাবতে পারিস, তুই রয়েছিস খড়্গপুরে, নিজের নাম বাপের নাম সব ভুলে রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছিস, আর আমিও রয়েছি সেই একই শহরে মাইলখানেকের মধ্যে, অথচ কিছুই জানতে পারলাম না। স্কাউন্ড্রেল দুটোকে হাতের কাছে পেলে স্রেফ একটি করে কারাটে চপ—ব্যস্, ওদেরও বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়া যেত।...যাক্, তোকে হোম টাস্ক দিচ্ছি—যা ঘটল তা বেশ গুছিয়ে লিখে ফ্যাল্ তো ইংরিজিতে। তুই তো "এসে-টেসে" বেশ ভাল লিখতিস। লিখে ফ্যাল্। নেক্সট টাইম এসে দেখব।'

এ বাড়িতে বাবলুর নতুন করে দেখার কিছুই নেই। সবই ওর জানা, ওর দেখা। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি বারান্দা, প্রতিটি সিঁড়ির ধাপ। ওর নিজের ঘরে দেওয়ালের উপর দিকে একটা জায়গায় ড্যাম্প লেগে নকশা ফুটে উঠেছিল, যেটা দেখতে ঠিক যেন আফ্রিকার ম্যাপ। বাবলুর সেটা সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ছিল। এবার ফিরে এসে ঘরে গিয়েই দাগটার দিকে চেয়ে দেখল সেটা বেড়ে ছড়িয়ে অনেকটা উত্তর আমেরিকার মতো হয়ে গেছে।

সাড়ে-তিনটের সময় গোলগাল নাদুস-নুদুস ডক্টর বোস এলেন। বাবলু দেখেছে, তার যখন একশো চার জ্বর হয়েছে, তখনও ডাক্তারবাবুর মুখে হাসি। ছোড়দা একবার বলেছিল, ওঁর মুখের মাস্‌লগুলোই নাকি ওই রকম, তাই হাসতে না চাইলেও মুখ হাসি-হাসি দেখায়। হরিনাথ ডাক্তারবাবুর ব্যাগ বয়ে নিয়ে এল। সঙ্গে রজনীকাকুও ছিলেন, আর চৌকাঠের বাইরে পরদা ফাঁক করে পুরু চশমার ভিতর দিয়ে দেখছিল ঠামা। বাবা তখনও কোর্ট থেকে ফেরেনি। ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, 'তোমার দাম কত জানো তো বাবলুবাবু ? পাঁচটা তুমি হলেই একটা অ্যামবাসাডর হয়ে যায়—হ্যাঁ-হ্যাঁ !'

বাবলু তখন কথাটার মানে বুঝতে পারেনি। বুঝল, যখন ডাক্তারবাবু পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ করে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে রজনীকাকুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাগ্যবান পুরুষটি কে মশাই ? পাঁচ হাজার ইজ নো জোক !' —আর রজনীকাকু গলা খাক্‌রিয়ে 'ওটা, ইয়ে—লোকটির নামটা...মানে...' বলে থেমে গেলেন। ডাক্তার বোস আর ব্যাপারটা না ঘাঁটিয়ে 'ওয়েল বাবলুবাবু—একদিন এসে তোমার গপ্‌পো শোনা যাবে, কেমন ?'—বলে চলে গেলেন, আর হরিনাথ আর রজনীকাকুও ওঁর পিছন পিছন বেরিয়ে গেল।

বাবলু বুঝতে পারল, বাবা হারুনদাকে ফাঁকি দিয়েছেন। ও আজকাল মাঝে মাঝে খবরের কাগজ দেখে—খেলার খবর দেখে, কোথায় কী সিনেমা হচ্ছে দেখে। ও জানে, কাগজে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশের খবর বেরোয়। তাতে যে হারিয়েছে তার ছবি থাকে, আর পুরস্কারের কথা থাকে। বাবাও কি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন নাকি ?

বাবলু নীচে গেল। বাবার আপিস ঘরে থাকে খবরের কাগজ। গিয়ে দেখল, দশটা খবরের কাগজে পাঁচরকম ভাষায় ওর সেই সিঞ্চল লেকের ধারে ছোড়দার তোলা ছবিটা দিয়ে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। 'হারানো ছেলে নিখিল (ডাকনাম বাবলু) সান্যালের সন্ধান দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।'

হারুনদা কাগজ পড়েনি, তাই হারুনদা টাকা চায়নি। এই টাকা হারুনদার পাওনা। না চাইলেও পাওয়া উচিত ছিল। বাবার দেওয়া উচিত ছিল। বাবা দেননি।

বাবলুর মনটা এত ভারী হয়ে গেল যে, সে কিছুক্ষণের জন্য বাগানে গিয়ে পেয়ারাগাছটার তলায় চুপ করে বসে রইল। বাবা হারুনদাকে ফাঁকি দিয়েছেন। টাকাটা পেলে হারুনদা নতুন খেলার জন্য নতুন জিনিস কিনতে পারত, ছোট ঘর ছেড়ে আর-একটু বড় ঘরে গিয়ে থাকতে পারত। হয়তো অনেকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারত। দিব্যি খেয়ে-পরে হেসে-খেলে গান গেয়ে কাটাতে পারত।

হয়তো ও এতক্ষণে কাগজ পড়ে বিজ্ঞাপনটা দেখে ফেলেছে, আর দেখে না জানি কী ভাবছে !

বাবলু বাগান থেকে বেরিয়ে এল। ওই যে বৈঠকখানা। প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। চারদিকে ছড়ানো সোফা, টেবিল, বইয়ের আলমারি, মূর্তি, ছবি, ফুলদানি। কোনওটাতেই এমন রং নেই, যাতে মনটা খুশি হয়। সোফার ঢাকনাগুলো ময়লা হয়ে গেছে, নক্‌শাগুলো প্রায় বোঝাই যায় না। কেউ বদলায়নি, তাই এই দশা। দিদি থাকলে খেয়াল করে বদলে দিত। এখন কেউ করে না।

বাবলু বেশ কিছুক্ষণ একা একটা সোফায় পা তুলে বসে রইল। দেওয়ালের ঘড়িটায় ঢং ঢং করে চারটে বাজল। পাশের বাড়ি থেকে ডিউক কুকুরটা একবার ঘেউ করে উঠল। বোধহয় বারান্দা থেকে কোনও রাস্তার কুকুরকে দেখেছে। হারুনদা সেদিন ওকে বলেছিল রাস্তার কুকুর। বাবলুর মনে হল, সেটা হলে তাও ভাল ছিল।

॥ ১৪ ॥

সাড়ে-চারটের সময় হরিনাথ চায়ের জন্য বাবলুর খোঁজ করে বুঝতে পারল, খোকাবাবু বাড়ি নেই। তাতে হরিনাথের খুব বেশি ভাবনা হল না, কারণ তিনটে বাড়ি পরেই বাবলুর বন্ধু থাকে। অ্যাদ্দিন পরে বাড়ি ফিরে খোকাবাবু নিশ্চয়ই তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে ; একটু পরেই ফিরে আসবে।

বাবলু তার বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু হরিনাথ যার কথা ভাবছে সে-বন্ধু নয়। দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে বাগানের পিছনের পাঁচিল টপকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাবলু লাউডন স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট দিয়ে, লোয়ার সার্কুলার রোড পেরিয়ে শেষটায় সি আই টি রোডে পৌঁছে একে-ওকে জিজ্ঞেস করে ঠিক হাজির হয়েছিল সেই ব্রিজটাতে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে ডান দিক বাঁ দিক হিসেব রেখে টিউব কলের ধারে মেয়েদের ভিড় পেরিয়ে একটু যেতেই, কয়েকটি ছেলে তাকে দেখে বলল, ‘হারুনদা নেই, হারুনদা চলে গেছে।’

বাবলু চোখে অন্ধকার দেখল।

‘কোথায় চলে গেছে ?’ সে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল।

এবার একজন লুঙ্গিপরা বুড়ো একটা ঝুরঝুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ‘হারুনকে খুঁজছ খোকা ? সে আজ মাদ্রাজ যাবে বলে ট্রেন ধরতে গেছে। সার্কাস কোম্পানি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।’

হাওড়া যাবার জন্য দশ নম্বর বাস ধরতে হবে সেটা বস্তির কয়েকজন ছেলেই বাবলুকে বলে, ওকে ট্রেন লাইন পেরিয়ে একেবারে বাসস্টপে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। উপেনবাবুর দেওয়া আগাম টাকাটা বাবলু সব সময়ই তার প্যান্টের পকেটে রাখত। তার থেকেই বাসভাড়া আর হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম টিকিট হয়ে গেল।

হারুনদার গাড়ি ছেড়ে দেয়নি তো ?

‘মাদ্রাজের গাড়ি কোন্ প্ল্যাটফর্মে—মাদ্রাজের গাড়ি ?’

‘সাত নম্বর, খোকা, ওই যে ওইদিকে। ওই দ্যাখো নম্বর।’

লম্বা ট্রেনটা দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে লম্বা পাড়ি দেবে বলে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাবলু এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে চলল। থার্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস,...ফার্স্ট ক্লাস...লোকজন মাল কুলি বাক্স-প্যাঁটরা হোল্ডল পুঁটলি সব ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে, একটা জায়গায় এসে বাবলু থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

একটা চায়ের দোকানের পাশে লোকে ভিড় করেছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তিনটে চায়ের কাপ শূন্যে লাফ মারছে, আর লোকগুলো হো-হো করে উঠছে, হাততালি দিচ্ছে।

গাড়ি ছাড়তে কিছু দেরি, তাই হারুনদা খেলা দেখাচ্ছে।

বাবলু ভিড় ঠেলে হারুনদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

‘এ কী, তুই এখানে ?’

হাততালির জন্য হারুনদাকে বেশ চেঁচিয়ে বলতে হল কথাটা। তারপর কাপ তিনটে দোকানদারের হাতে তুলে দিয়ে হারুন আবার বাবলুর দিকে ফিরল।

'আমার ওখানে গেসলি বুঝি ? ওরা বলে দিল "আমি নেই" ?'

ও কিছু বলছে না দেখে হারুনই বলে চলল, 'সেদিন তোকে মাদ্রাজের সেই ভেঙ্কটেশের চিঠিটার কথা বলছিলাম না ?—ভেবে দেখলাম, মওকাটা ছাড়া উচিত হবে না। ওখানে চোখ বেঁধে এক চাকার সাইকেল চালাতে চালাতে জাগ্‌লিং দেখাতে হবে। কম-সে-কম মাসখানেক প্র্যাকটিস লাগবে। তাই একটু আগে যাওয়া ভাল।'

ও টাকাটার কথা বলতে গিয়েও পারল না। হারুনদা একটা নতুন সুযোগ পেয়েছে—হয়তো অনেক বেশি রোজগার করবে। আর ওকে দেখেও মনে হচ্ছে ও ফুর্তিতে আছে। যদি টাকাটার কথা বললে ওর মনখারাপ হয়ে যায় !

ওর নিজের মনখারাপের কথাটাও বলতে হল না, কারণ হারুনদা বুঝে ফেলেছে।

'বাড়িতে ভাল্লাগছে না তো ?'

'না হারুনদা।'

'ফটকেটা জ্বালাছে, তাই তো ? বলছে, উপেনদার দোকানে ইস্কুল করতে হত না, কতরকম লোক দেখা যেত—হারুনদা কতরকম খেলা দেখাত, কলকাতার রাস্তা দিয়ে কেমন হেঁটে বেড়াতাম দু'জনে—তাই তো ?'

সব ঠিক বলেছে হারুনদা। ও মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল। হারুন বলল, 'ফটকেটাকে একটু ধমক না দিলে ও তোকে লেখাপড়া করতে দেবে না। সেটা কোনও কাজের কথা নয়। কত আফসোস হয় আমার জানিস—আরও পড়িনি বলে ?'

'তাও তো তুমি এত ভাল খেলা দেখাও। তুমি তো আর্টিস্ট।'

'আর্টিস্ট কি শুধু একরকম হয় ? তোদের বাড়ির মতো বাড়িতে থেকে কি আর্টিস্ট হওয়া যায় না ? লেখাপড়া করে আর্টিস্ট হয় না ? শুধু বলের খেলাতেই কি আর্টিস্ট ? বলের খেলা, রঙের খেলা, কথার খেলা, সুরের খেলা—কতরকম খেলা আর কতরকম আর্টিস্ট হয় জানিস ? যখন বড় হবি, তখন জানতে পারবি, কোন্ খেলাটা কী স্টাইলে খেলতে হবে তোকে। তখন তুই—'

ও আর পারল না। গার্ড হুইস্‌ল দিয়ে দিয়েছে। ওকে বলতেই হবে কথাটা। ও হারুনদার কথার উপরেই চিৎকার করে বলল, 'বাবা তোমায় টাকা দেয়নি হারুনদা। পাঁচ হাজার টাকা ! তুমি না নিয়েই চলে যাবে ?'

হারুন ওর কামরার পা-দানিতে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকে হেসে বলল, 'তোর ছবিটা ওরকম হয়েছে কেন ? মনে হচ্ছে খোক্কসের ছা।'

হারুনদা জানে ! ও কাগজ দেখেছে !

ট্রেনের ভোঁ বেজে উঠল। ও হারুনদার কামরার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। হারুন বলল, 'তোর বাবাকে বলিস, হারুনদা বলেছে ওঁর ছেলেকে ফেরত দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা নিতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাইকে বিক্রি করে কেউ টাকা নেয় ?'

গাড়ি ছেড়ে দিল। ও কিছু ভাবতে পারছে না। ও শুনছে হারুনদা চেঁচিয়ে বলছে, 'গ্রেট ডায়মন্ড সার্কাস—এলে দেখতে যাস—এক চাকার সাইকেলে চোখ বেঁধে বলের খেলা !'

'এখানে আসবে হারুনদা ?'

ও ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। বেশিক্ষণ পারবে না।

'আসতেই হবে ! সার্কাসের কদর কলকাতায় সবচেয়ে বেশি। দেশের সব শহরের মধ্যে !'

হারুনদা হাত নাড়ছে।

হারুনদা দূরে চলে যাচ্ছে।

হারুনদা মিলিয়ে গেল।

ট্রেন চলে গেল।

ওই যে সবুজ গোল আলো। ওটাকে বলে 'সিগন্যাল'। বাবলু এখন জানে। ওর মানে লাইন

ক্লিয়ার।

হাতের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছে বাবলু বাড়ির দিকে পা বাড়াল। দুটো কাঠের বল ওর পকেটে। আর, একটা মানুষ—যাকে ও খুব ভাল করে চেনে—যাকে দিয়ে ওর অনেক কাজ হবে—তাকে ও মনের এক কোনায় পুরে রেখে দেবে।

তার নাম শ্রীফটিকচন্দ্র পাল।

আনন্দমেলা, পূজাবার্ষিকী ১৩৮২

বিষফুল

'ওদিকে যাবেন না বাবু!'

জগন্ময়বাবু চমকে উঠলেন। কাছাকাছির মধ্যে যে আর কোনও লোক আছে সেটা উনি টের পাননি ; তার ফলেই এই চমকানি। এবার দেখলেন তাঁর ডাইনে হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটি তেরো-চোদ্দো বছরের ছেলে, তার পরনে একটা ডোরা কাটা নীল হাফপ্যান্ট, আর গায়ে জড়ানো একটা সবুজ রঙের দোলাই। ছেলেটির রং কালো, মাথার চুল গ্রাম্য কায়দায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো, চোখ দুটিতে শান্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। গ্রাম্য হলেও নির্ঘাত ইস্কুলে পড়ে। অকাট মূর্খ হলে অমন চাহনি হয় না।

'কোনদিকে যাব না?' জগন্ময়বাবু প্রশ্ন করলেন।

'ওই দিকে।'

অর্থাৎ জগন্ময়বাবু তাঁর হাঁটার পথে একবারটি থেমে যেদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, সেইদিকে।

'কেন, যাব না কেন? কী হবে গেলে?'

'বিষ আছে।'

'বিষ? কীসে?'

'ওই গাছে।'

সত্যি বলতে কী গাছটা দেখেই জগন্ময়বাবু থেমেছিলেন। ফুলগাছ। বুনো ফুল সম্ভবত। রাস্তা থেকে হাত বিশেক দূরে একটা ঢিপি, তার উপরে ওই একটি মাত্র গাছ। কাছাকাছির মধ্যেও যাকে গাছ বলে তা আর নেই। এ গাছটা কোমর অবধি উঁচু। তেকোনা ছোট ছোট পাতা, আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভারী সুন্দর হলদে কমলা আর বেগুনি রঙের ফুল। জগন্ময়বাবুর অবাক লাগছিল এই কারণেই যে গত তিন দিন ঠিক এই রাস্তা দিয়েই হাঁটা সত্ত্বেও ওই ঢিবি আর ওই গাছ ওঁর চোখে পড়েনি। অবিশ্যি হাঁটার সময় অর্ধেক দৃষ্টি পথে রেখেই চলতে হয়, বিশেষ করে সে-পথ যদি কাঁচা আর অজানা হয়। কাজেই না-দেখাটা আশ্চর্য নয়।

ছেলেটি এখনও সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে দেখছে।

'কী নাম তোর?' জগন্ময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'ভগওয়ান।'

'ওরেব্বাবা!—বাংলা শিখলি কোথায়?'

'ইস্কুলে।'

'আমার পিছন পিছন আসছিলি কেন?'

'আমার বাড়ি ওই তো।'

জগন্ময়বাবু দেখলেন যেদিকে ঢিবি সেইদিকেই আরও সিকি মাইলটাক দূরে বাঁশবনের লাগোয়া খাপ্‌রার ছাউনি দেওয়া কুটির।

জগন্ময়বাবু আবার চাইলেন ছেলেটির দিকে। আরও দু-একটা প্রশ্ন করতে হয়। সে ফস্ করে যেচে তাঁকে এভাবে নিষেধ করবে কেন ?

‘গাছের কী নাম ?’

‘জানি না।’

‘বিষ আছে জানলি কী করে ?’

‘মরে যায় যে।’

‘কী মরে যায় ?’

‘সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর...পাখি...’

‘কী করে মরে যায় ? গাছে বসলে ? না ফুল খেলে ?’

‘কাছে গেলে।’

‘কাছে মানে ? কত কাছে ?’

‘চার হাত। পাঁচ হাত।’

‘তুই তো খুব গোপ্পে দেখছি ! নাকি গাঁজা ধরেছিস এই বয়সেই ? তোর মাস্টারকে জিজ্ঞেস করিস ইস্কুলে। ফুলগাছে এরকম বিষ হয় না কখনও।’

ছেলেটি চুপ করে চেয়ে আছে।

‘আমি এখানে নতুন লোক। চেঞ্জের জন্য এসেছি। আমার শরীর খারাপ, বুঝেচিস ? ওরকম

গুল-টুল মারিসনি। এদেশে ওরকম ফুলের কথা কেউ শোনেনি। ওরকম হয় না।'

'এদেশের না। সাহেব এনেছিল।'

ছেলেটা দেখছি নাছোড়বান্দা। বিশ্বাস করাবার জন্য বদ্ধপরিকর।

'কোন্ সাহেব ?'

'আপনি যে বাড়িতে আছেন, সেই বাড়িতে ছিল।'

'কবে এসেছিল ?'

'যেবার খরা হল তার আগের বার।'

'কী নাম ?'

'নাম জানি না। লাল মুখ, কটা চুল।'

'সে এসে এই টিপির উপর পুঁতে দিয়ে গেছে গাছ ?'

'জানি না।'

'তবে ?'

'সাহেব যাবার পরেই গাছ হল, হোই যে বন, ওইখানে ঘুরত হাতে কাচ নিয়ে।'

বটানিস্ট-টটানিস্ট হবে, জগন্ময়বাবু ভাবলেন। ভারী তাজ্জব কথাবার্তা বলছে ছেলেটি।

'ওই দেখুন না।'—ছেলেটি আবার আঙুল দেখাল। 'ওই টিবিটার পাশে। ওই যে পাথরটা, তার ঠিক ডান পাশে।'

জগন্ময়বাবু দেখলেন। একটা সাদা সাদা কী যেন দেখা যাচ্ছে।

'কী ওটা ?'

'সাপ।'

'সাপ ?'

'সাপ ছিল। এখন হাড়। মরে গেছে। চিতি সাপ। বিষের দম ছাড়ে ওই ফুল।'

জগন্ময়বাবু বাইনোকুলারটা চোখে লাগালেন। হ্যাঁ, সাপই বটে। সাপের কঙ্কাল। ফুলটাও দেখলেন দূরবীনের ভিতর দিয়ে। যত সরল মনে হয়েছিল তত নয়। কোনও রংটাই সরল নয়। হলদের মধ্যে বেগুনির ছিটে, বেগুনির মধ্যে হলুদ, অরেঞ্জের মধ্যে সাদা আর কালো।

যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে আরও একটা মরা জিনিস দেখতে পেলেন জগন্ময়বাবু। এটাও সরীসৃপ, তবে এটার পা আছে চারটে। গিরগিটি বা বহুরূপী জাতীয় কিছু। এটা গত দু'একদিনের মধ্যে মরেছে।

'তা এরা সব অ্যাদ্দিনে সেয়ানা হয়ে যায়নি ? এখনও আসে আর মরে ?'

'রোজ মরে, একটা দুটো।'

'কই অত তো দেখছি না। মাত্র দুটো তো।'

'টিবির পিছনে আছে। বেশি মরলে পরে বাঁশ দিয়ে টেনে এনে সাফ করে দেয়।'

'কে ?'

'আমার বাবা। আমিও।'

'তা বাঁশ দিয়ে গাছে ঘা মেরে ওটাকেও সাবাড় করে দিস না কেন ? তা হলেই তো আপদ চুকে যায়।'

'আবার গজায়।'

'বলিস কী !'

'পুড়িয়ে দিলেও আবার গজায়।'

জগন্ময়বাবু ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন না। কারণ পাঁচ আনার বেশি বিশ্বাস হয়নি এখনও তাঁর মনে। যেটুকু হয়েছে তার কারণ একবার কোন্ বইয়ে যেন মাংসাশী গাছের কথা পড়েছিলেন। বিশ্ব-চরাচরে অনেক আশ্চর্য জিনিস আছে যার অনেকই এখনও হয়তো মানুষের অগোচরে রয়েছে।

'আরও আছে এই গাছ ?'

'আছে।'
'কোথায় ?'
'ওই বনে আছে।'
'কাছাকাছির মধ্যে এই একটাই ?'
'আর দেখিনি বাবু।'

ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তা হলে বলতে হবে এখানে এসে সুদৃশ্য স্বাস্থ্যময় নিরিবিলি পরিবেশ আর টাট্‌কা সস্তা সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও একটা উপরি লাভ হয়েছে জগন্ময়বাবুর। এটার আশাই করেননি। ফিরে গিয়ে আপিসে বলার মতো গল্প হল একটা। বিষফুল ! গাছের নিশ্বাসে বিষ ! ওই দুটি মৃত প্রাণী না দেখলে ছেলেটির কথা তিনি আদৌ বিশ্বাস করতেন না। তবে সে এইভাবে বানিয়ে কথা বলবে কেন সেটাও একটা প্রশ্ন। এ ধরনের প্র্যাকটিক্যাল জোক একমাত্র শহরেই সম্ভব—আর তাও সে পয়লা এপ্রিলে। গাঁয়ে দেশে যে এমন জিনিস হয় না সেটা চিরকাল শহরে বাস করেও বেশ বুঝতে পারলেন জগন্ময়বাবু। আর এটাও বুঝলেন যে তাঁর বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে আজ একটি স্মরণীয় দিন। বিষফুলের কথা আজ তিনি প্রথম শুনলেন।

অথচ মজা এই যে কাঠঝুমরিতে আসার কথাই ছিল না তাঁর। গিয়েছিলেন ডালটনগঞ্জ, তাঁর বোনের বাড়িতে দিন পনেরো ছুটি কাটিয়ে আসবেন বলে। গত বছর থেকেই একটা হাঁপের কষ্ট অনুভব করতে শুরু করেছেন জগন্ময়বাবু। ডাক্তার—শুধু ডাক্তার কেন, চেনাশোনা সকলেই—বলেছেন ড্রাই ক্লাইমেটে ক'টা দিন কাটিয়ে আসার কথা।—'বিয়ে তো করোনি ; এত টাকা কার জন্য পুষে রাখছ ? একটু খরচ-টরচ করো। আমাদের পেছনে না করবে তো অন্তত নিজের পিছনেই করো !'—এই 'এত টাকা'র ব্যাপারটা জগন্ময়বাবুর মোটামুটি নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসামুদ্রিক ঢেউ-এর মতো। তিনদিন রেসের মাঠে যাবার পর চতুর্থ দিনই জ্যাকপট পেয়ে যান ভদ্রলোক। এক ধাক্কায় চৌষট্টি হাজার টাকা। অথচ ঘোড়া নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামাননি, রেসের বই-এর পাতা খুলে দেখেননি ; যাওয়া কেবল এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। এবং কিছুটা কৌতূহলবশত। ডাক্তার নন্দী বলেন হাঁপানির টানটা ওই টাকা পাওয়ার পর থেকেই ! তা হতে পারে। জগন্ময়বাবু নিজে লক্ষ করেছেন যে এই আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনের ফলে তাঁর মধ্যে কিছু চারিত্রিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ! যেমন, তিনি সাধারণ অবস্থায় অনেক বেশি হাতখোলা ছিলেন, এখন হিসেবি হয়ে পড়েছেন। গাড়ি কেনার সামর্থ্য হয়েছিল, কিনে-কিনেও কেনেননি। বন্ধুদের ভোজ দেবেন বলে শেষ পর্যন্ত সন্দেশের উপর সেরেছেন। আদরের ভাইপো তিলুর জন্মদিনের জন্য চুয়াল্লিশ টাকা দামের রেলগাড়িটা দর করে পয়সা বার করার সময় মত বদলে সাতাশ টাকারটা কিনেছেন। শুকনো ক্লাইমেটে দিন পনেরো কাটিয়ে আসার পরিকল্পনাটা যখন মাথায় এল, তখন বন্ধুরা অনেকেই অমুক জায়গায় অমুক হোটেল অমুক ট্যুরিস্ট লজের কথা বলেছিল, সে সবই জগন্ময়বাবুর সামর্থ্যের মধ্যেই ছিল ; কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি খরচ বাঁচিয়ে ডালটনগঞ্জে বোনের কাছে যাওয়াই স্থির করেন। সেখানেই থাকতেন পুরো ছুটিটা। কিন্তু দুই ভাগনের এক সঙ্গে চিকেন পক্স হয়ে যাওয়ায় ভগ্নীপতি নিজেই বললেন, 'একবার কাঠঝুমরিতে মূর সাহেবের বাংলোটার খোঁজ করে দেখুন না। বিলিতি টাইপের বাংলো, খাওয়া-দাওয়া সস্তা আর ভাল, চেঞ্জও হবে, বিশ্রামও হবে। অবিশ্যি সাহেব আর নেই—মাস চারেক হল মারা গেছেন। তবে গিন্নী আছেন। এখানেই থাকেন। ওঁরা ভাড়া দেন ওদের বাংলো এটা আমি জানি।'

বুড়ি মিসেস মূর কোনও আপত্তি তোলেননি। তবু বলেছিলেন, 'এ দিকটা তো আমার স্বামীই দেখতেন।—ওঁর কয়েকজন বাঁধা খদ্দের ছিল।—তবে তাদের তো কোনও চিঠি বা টেলিগ্রাম দেখছি না ; তোমায় দিতে আপত্তি নেই, তবে পনেরো দিনের বেশি তোমাকে থাকতে দিতে পারব না, ভেরি সরি।'

'তার প্রয়োজনও হবে না।'

তিন দিন ডালটনগঞ্জে থেকে এই সবে তিনদিন হল গত শুক্রবার জগন্ময়বাবু মূর সাহেবের বাংলোতে এসে উঠেছেন। আর এসেই বুঝেছেন যে তাঁর মতো মানুষের পক্ষে ছুটি কাটানোর আর

এর চেয়ে ভাল জায়গা হয় না। প্রথমত, ক্লাইমেট। এসে অবধি একদিনও নিশ্বাসের কষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়ত, কলকাতার মানুষ জগন্ময় বারিক কল্পনাই করতে পারেননি যে ট্রাম বাস লরি ট্যাক্সি রেডিও টেলিফোন টেলিভিশন সিনেমা মানুষের কোলাহল ইত্যাদি বাদ হয়ে গেলে কী আশ্চর্য টনিকের কাজ হয়। এখন বুঝতে পারছেন যে কলকাতার মানুষ সব সময়ই কোণঠাসা ; সত্যি করে হাত পা ছড়ানো যে কাকে বলে সেটা তিনি বুঝেছেন কাঠঝুমরিতে এসে।

মূর সাহেবের বাংলো প্রথম দর্শনেই জগন্ময়বাবুর মনটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। দূরে পিছনে পাহাড়ের লাইন, তারপর এগিয়ে এলে প্রথমে বন, বনের পর অসমতল প্রান্তর—তার এখানে ওখানে ছড়ানো ছোট বড় টিলা, আর আরও এগিয়ে এলে লম্বা লম্বা গাছ পিছনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিমনি আর টালির ছাতওয়ালা বিলিতি পোস্টকার্ডের ছবির মতো মূর সাহেবের বাংলো। সেই বাংলোর বারান্দা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে ঘরগুলোর ছিমছাম চেহারা, আসবাবের পারিপাট্য, জানলা ও দরজার পর্দার নকশা ইত্যাদি দেখে জগন্ময়বাবুর বিশ্বাস হল যে রেসের মাঠে জ্যাকপট পাওয়ার চেয়ে ছুটি-ভোগের জন্য এমন বাংলো পাওয়া কিছু কম ভাগ্যের কথা না।

এখানে এসেই জগন্ময়বাবু তাঁর দিনের রুটিন ঠিক করে নিয়েছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে হাঁটতে বেরোন, ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট। তারপর বাংলোর বারান্দায় বা সামনের কম্পাউন্ডে বসে ম্যাগাজিন পাঠ—খান পঁচিশেক রিডারস ডাইজেস্ট নিয়ে এসেছেন তিনি বোনের বাড়ি থেকে,—তারপর স্নান-খাওয়া সেরে দিবানিদ্রা। বিকেলে চায়ের পর আবার পদব্রজে ভ্রমণ। রাত্রে সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে ঘুম।

আজ সকালে বেড়িয়ে ফিরে এসেই চৌকিদার বনোয়ারিকে জিজ্ঞেস করলেন বিষফুলের কথা। অবিশ্যি প্রথমেই ফুলের কথাটা না-জিজ্ঞেস করে সেদিকে অগ্রসর হবার একটা রাস্তা তৈরি করে নিলেন।

'ভগওয়ান বলে কোনও ছেলেকে চেনো ?'

'হাঁ বাবু। ভিখুয়াকা লড়কা।'

'ভিখুয়া কে ?'

চৌকিদার বলল ভিখুয়া কাঠের মজুরি করে। চৌধুরীবাবুদের কাঠের গোলা আছে এই কাঠঝুমরিতেই, সেখানে কাজ করে।

'ভগওয়ানের বাড়ির দিকে রাস্তার ধারে একরকম ফুলের গাছ আছে। সে-গাছ নাকি বাতাসে বিষ ছড়ায়।—জানো ?'

'হাঁ বাবু।'

'কথাটা সত্যি ?'

'মর জাতা হ্যায়...সাঁপ, চুহা, বিচ্ছু-উচ্ছু...'

বনোয়ারি রুটি আর ডিমের অমলেট রেখে টি-পট আনতে গেল।

'এখানে এক সাহেব এসেছিল বছর তিনেক আগে ?' বনোয়ারি ফিরে এলে পর জিজ্ঞেস করলেন জগন্ময়বাবু। বনোয়ারি বলল সাহেব এসে থেকেছে এখানে। এককালে মূর সাহেব গিন্নীকে নিয়ে নিজেই আসতেন প্রতি শীতকালে। তিন বছর আগে কোনও সাহেব এসেছিল কি না তা বনোয়ারির মনে নেই।

জগন্ময়বাবু ঠিক করলেন বিকেলে একবার বাজারের দিকে যাবেন। বাজার পান্নাহাটে—এখান থেকে মাইল দুয়েক। রেলস্টেশনও সেখানেই। এখানে আসতে হলে স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশা নিতে হয়। পান্নাহাট থেকে ট্রেন ধরে সোজা ডালটনগঞ্জ যাওয়া যায়। প্রথম দিন এসেই জগন্ময়বাবু একবার বাজারের দিকে গিয়েছিলেন। দুজন বাঙালির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। পোস্টমাস্টার নুটবিহারী মজুমদার, আর পবিত্রবাবু বলে এক ভদ্রলোক, যিনি রয়েল হোটেলে উঠেছেন। মিঠে পানের খোঁজ করতে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। বললেন আগেও এসেছেন কাঠঝুমরি। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের কাজ করেন। রয়েল হোটেল নাকি নামেই হোটেল—'বলতে পারেন থ্রি-স্টার সরাইখানা।' মনে হল বেশ রসিক লোক। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের

বেশি না। 'আপনি উঠেছেন কোথায় ? কাঠঝুমরিতে তো থাকবার জায়গাই নেই। চৌধুরী কম্পানির কারুর সঙ্গে চেনা আছে বুঝি ?'

'আজ্ঞে না, আমি উঠেছি মুর সাহেবের বাংলোতে।'

'ও—ওই শিশু গাছে ঘেরা কটেজ বাড়িটা ?'

জগন্ময়বাবু বললেন যে গাছে ঘেরা ঠিকই, তবে শিশু কি না বলতে পারবেন না, দেখে তো বুড়ো বলেই মনে হয়—হে হে।—'আমি মশাই সেন্ট পার্সেন্ট শহুরে। বড় জোর আম জাম কলা নারকেল আর বট-অশ্বত্থটা চিনতে পারি—তার বাইরে জিজ্ঞেস করলেই মুশকিল।'

এই পবিত্রবাবু আর নুটবিহারীকে আজ একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে। চৌকিদারের কনফারমেশন যথেষ্ট নয়। আসলে জগন্ময়বাবু কলকাতায় গিয়ে এই বিষফুলের বিষয় কিছু লিখতে চান। এখনও পর্যন্ত কেউ লেখেনি। এই একটা ব্যাপারে পায়োনিয়ার হবেন তিনি।

নুটবিহারীবাবুকে জিজ্ঞেস করে বিশেষ ফল হল না। বললেন, 'আমি মশাই সবে লাস্ট ইয়ারে বদলি হয়ে এখানে এসিচি। স্থানীয় সংবাদ বিশেষ আমার কাছে পাবেন না। আপনি বরং আর কাউকে জিজ্ঞেস করুন।'

পোস্টাপিস থেকে জগন্ময়বাবু গেলেন বাজারের দিকে। পান কেনা আছে, আর যদি একটা এক্সারসাইজ বুক পাওয়া যায় তো কাজের কাজ হবে। লেখার জন্য তৈরি হতে হবে তো। কলম আছে সঙ্গে, খাতা আনেননি।

পবিত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একটা চায়ের দোকানের সামনে। বেঞ্চিতে বসে বাংলা খবরের কাগজ পড়ছেন। বললেন, 'আসুন, চা খান। ওহে ভরদ্বাজ—দু কাপ—একের জায়গায় দুই।'

জগন্ময়বাবু সোজা আসল প্রশ্নে চলে গেলেন।

'আপনি বিষফুলের নাম শুনেছেন ?'

পবিত্রবাবু কাগজটা ভাঁজ করে জগন্ময়বাবুর দিকে চোখ তুললেন। 'হলদে কমলা বেগনি ? তালহার যাবার পথে ডানদিকে রয়েছে তো ? একটা টিবির ওপরে ?'

'আপনি তো সব জানেন দেখছি !'

'বললুম তো—চারবার ঘুরে গেছি এখানে। বছর দুই থেকে দেখছি ওটা। প্রথম যেদিন দেখি সেদিন টিবির পাশে একটা আস্ত শুয়োরছানা মরে পড়েছিল।'

'বলেন কী ! তা এই নিয়ে আপনি কাউকে বলেননি কিছু ? আপনি তো কলকাতার লোক—কাগজে-টাগজে— ?'

পবিত্রবাবু উড়িয়ে দিলেন। 'বলবার কী আছে মশাই ? প্রকৃতির খামখেয়াল কত রকম হয় সব নিয়ে কি আর কাগজে লেখে ? আরও কত হাজার রকম বিষফুল বিষফল বিষপোকা বিষপাখি রয়েছে পৃথিবীতে কে জানে। আরে মশাই, কলকাতাতে বাস, সেখানে হাওয়াটাই বিষাক্ত। প্রতি নিশ্বাসে পাঁচ সেকেন্ড করে আয়ু কমে যাচ্ছে—সেদিন দেখলুম কোথায় জানি লিখেছে। সেখানে ফুলের বিষ নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে মশাই ?'

'কিন্তু এখানকার লোক...এদের পক্ষে তো এটা একটা ডেঞ্জার মশাই ?'

'কাছে না ঘেঁষলেই হল। পাঁচ-সাত হাত দূরে থাকলেই তো সেফ। সেকথা এখানে সবাই জানে।'...

জগন্ময়বাবু চা খেয়েই উঠে পড়লেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি ; সূয্যি ডুবলেই ঝপ্‌ করে ঠাণ্ডা পড়ে। সর্দিগর্মির রিস্কটা না নেওয়াই ভাল।

চায়ের দোকানের পাশেই একটা মনিহারি দোকান থেকে খাতা কিনে ভদ্রলোক যখন বাড়ি ফিরলেন তখন সোয়া ছটা। মনে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছেন তিনি। পাকা কনফারমেশন পাওয়া গেছে, এবার উনি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন। লেখাটা কোনও উদ্ভিদবিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে একটা বড় কাজ হবে। কাঠঝুমরির নামটাও লোকের জানা উচিত। ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট জানে কি নামটা ? মনে তো হয় না।

লেখার অভ্যেস নেই তাই খাতা খুলে হাতের কলমটার উপর থুতনিটা ভর করে আধঘণ্টা বসে

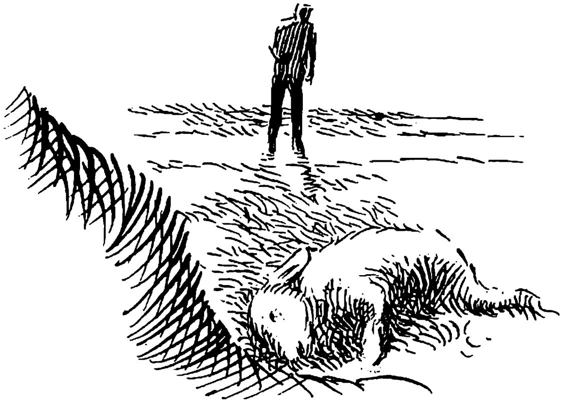

থেকেও কোনও ফল হল না। এত চট্ করে হবে না। হাতে আরও দশ দিন সময় আছে। ধীরে সুস্থে ভেবেচিন্তে লিখতে হবে। বিষফুল...। নামটা দুবার আপন মনে উচ্চারণ করলেন জগন্ময়বাবু। বিষফুল... ! এই নামের লেখা লোকে না পড়ে পারবে না।

॥ ২ ॥

আজ আর বাইনোকুলারের দরকার হল না। সকাল সাতটার সময় টিবিটার কাছে পৌঁছে রাস্তা থেকে খালি চোখেই জগন্ময়বাবু যে মৃত প্রাণীটা দেখতে পেলেন সেটা হল একটা খরগোশ। মরা সাপের কঙ্কাল আর মরা গিরিগিটিও এখনও রয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়লে হয়তো জায়গাটা পরিষ্কার করবে এসে ভগওয়ান বা ভগওয়ানের বাপ।

জগন্ময়বাবু হিসেব করতে চেষ্টা করলেন গাছটা কত দূর হবে রাস্তা থেকে। বিশ হাত ? পঁচিশ হাত ? তাঁর একটা অদম্য ইচ্ছে একটু এগিয়ে গিয়ে গাছটাকে আরেকটু ভাল করে দেখার। পাঁচ হাতের বেশি কাছে না গেলেই তো হল।

কিন্তু ওই ছোকরার অনুমান যদি ভুল হয় ?

যদি সাত হাত, আট হাত দূর পর্যন্ত ফুলের প্রভাব পৌঁছায়।

জগন্ময়বাবু ঘাসের উপর দিয়ে তিন পা এগিয়ে আবার পেছিয়ে এলেন। সাপ, খরগোশ, গিরগিটি। শুয়োর। পোকামাকড়ের কথা ছেলেটি বলেনি। ফড়িং পিঁপড়ে মশামাছি—এ সবই কি এই গাছের বিষে মরে ? না ছোট জিনিস রেহাই পায় ? আর বড় জিনিস ? তাঁর লেখার জন্য এগুলো জানা দরকার। আজ ছেলেটিকে দেখছেন না। একবার তার বাড়ি যাবেন নাকি ? একটা ইন্টারভিউ করবেন তাকে—যেমন অনেককে খবরের কাগজে করে ?

প্রশ্নটা মাথায় আসতেই মনে হল—তাড়া নেই, সব হবে। ধীরে সুস্থে, ধীরে সুস্থে। হাতে আরও সাতদিন সময়।

এখানে জলটা ভাল, তাই খিদে হয় প্রচুর। ব্রেকফাস্টের কথা চিন্তা করতে করতে জগন্ময়বাবু বাড়ি ফিরলেন। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বিশাল কম্পাউন্ড। দুটো কাঠের গেট, একটা পশ্চিমে, একটা উত্তরে।

উত্তরের গেটে—যেটা দিয়ে জগন্ময়বাবু এখন ঢুকলেন—এখনও একটা কাঠের ফলকে মূর সাহেবের নাম রয়েছে। গেট থেকে সোজা রাস্তা দিয়ে কটেজের সামনের বারান্দায় শেষ হয়েছে। বড় বড় গাছগুলো, যেগুলোকে পবিত্রবাবু শিশু বললেন, সেগুলো কটেজের পিছনদিকে। এদিকে

দক্ষিণে যে দুটো বড় গাছ রয়েছে সেগুলো শিশু নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সেগুলোর নামও জগন্ময়বাবু জানেন না। এর মধ্যে যেটা দূরের গাছ, সেটার ডালপালাগুলো প্রায় সাদা আর বেশ ছড়ানো। গুঁড়িটা কালো হলে হয়তো আরও সহজে চোখে পড়ত, কিন্তু সাদা হওয়া সত্ত্বেও, খুব বেশি দূরে নয় বলে গুঁড়ির পাশের চেনা গাছটা জগন্ময়বাবুর দৃষ্টি এড়াল না।

সেই একই গাছ, একই বিচিত্র ফুল।

বিষফুল!

জগন্ময়বাবুর পেট থেকে খিদেটা ম্যাজিকের মতো উবে গেল।

এ গাছ কাল ওখানে ছিল না। জগন্ময়বাবু ওই সাদা গুঁড়িটা থেকে হাত দশেক দূরে বনোয়ারিকে দিয়ে ডেক চেয়ারটা আনিয়ে তাতে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন। তখন তাঁর কোনও কাজ ছিল না, কেবল শরৎকালের মিঠে রোদটা উপভোগ করা। তাঁর চোখ তখন চতুর্দিকে ঘুরছে, এমন কী সাদা গুঁড়িটার দিকেও। এটা মনে আছে, কারণ জগন্ময়বাবুর তখন মনে হয়েছিল গুঁড়িটার রঙের সঙ্গে ইউক্যালিপটাসের গায়ের রঙের মিল আছে। ওই আরেকটা গাছ ওঁর চেনা। ইউক্যালিপ—

ওটা কী?

একটা পাখি।

খয়েরি রং—মাথা থেকে ল্যাজের ডগা অবধি। শালিকের চেয়ে ছোট। পাখিটা মাটিতে খুঁটে খুঁটে কী জানি খাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে খাওয়া থামিয়ে মাথা তুলে চিড়িক চিড়িক ডাকছে। ওই ফুলগাছটার হাত দশেকের মধ্যে। এবার দুটো ছোট্ট লাফ মেরে পাখিটা ফুলগাছটার দিকে আরও এগিয়ে গেল। জগন্ময়বাবু আর অপেক্ষা না করে সজোরে দুটো তালি মারলেন। পাখিটা তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে উড়ে পালিয়ে গেল। জগন্ময়বাবু হাঁফ ছাড়লেন। কিন্তু গাছটা তো রয়ে গেল।

ওটার একটা ব্যবস্থা করা যায় না? সামনে রাস্তায় অনেক ঢেলা পড়ে আছে।

একটা ঢেলা হাতে তুলে নিয়ে জগন্ময়বাবু গাছটাকে তাক করে নিক্ষেপ করলেন। গাছটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। লেগেছে! কিন্তু কোনও ফল হবে কি একটা ঢিলে?

জগন্ময়বাবু অনুভব করলেন যে তাঁর মাথায় খুন চেপেছে। পর পর ত্রিশটা ঢেলা মারলেন গাছটার দিকে। কোনওদিন ক্রিকেট খেলেননি, তাই বোধহয় অর্ধেক ঢেলা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল; কিন্তু বাকিগুলো লাগল। গাছটা নুয়ে পড়েছে।

'উয়ো ফির খাড়া হো যায়গা বাবু।'

ভগওয়ান। গেটের বাইরে বই হাতে দাঁড়িয়ে দেখছে, মুখে মৃদু হাসি!

'হোক্ গে খাড়া', বললেন জগন্ময়বাবু। 'কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত।'

ভগওয়ান চলে গেল।

ঘটনাটা যে চৌকিদার আর মালিও দেখেছে সেটা বাংলোর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বুঝলেন জগন্ময়বাবু। বোঝাই যাচ্ছে দুটোই অকর্মার ঢেঁকি। তাঁকে একটু হেল্প করতে পারল না এগিয়ে এসে?

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে মনে হল যে চৌকিদার আর মালির এই যে নিস্পৃহ ভাব, তার জন্য হয়তো উনি নিজেই কিছুটা দায়ী। এখানে এসেই বোধহয় ওদের দুজনের হাতে কিছু আগাম বকশিশ গুঁজে দেওয়া উচিত ছিল। মালি তো স্টেশনে গিয়েছিল ওকে আনতে। মিসেস মূর টেলিগ্রামে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কুলির বদলে উনি মালির পিঠেই মাল চাপিয়েছিলেন। একটা সুটকেস, একটা বেডিং, একটা বড় কল-লাগানো ফ্লাস্ক। নিজের হাতে নিয়েছিলেন কেবল ছাতা আর বোনের দেওয়া এক হাঁড়ি মিষ্টি। বাংলোয় পৌঁছে উনি মালির জন্য দুটো টাকা বার করেও আবার পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন—'যাবার দিন পুষিয়ে দেব; আগে দেখি না ব্যাটারা কীরকম কাজ করে।'

কাজ অবিশ্যি ভালই করেছে দুজনে। কিন্তু কাজের বাইরে আগ বাড়িয়ে এসে দুটো কথা বলা, কী চাই না-চাই, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, এসব জিজ্ঞেস করা—এটা দুজনের একজনও করেনি। কাঠঝুমরির এই একটি ব্যাপারই জগন্ময়বাবুর কাছে 'লেস দ্যান পারফেক্ট' বলে মনে হয়েছিল। এখন

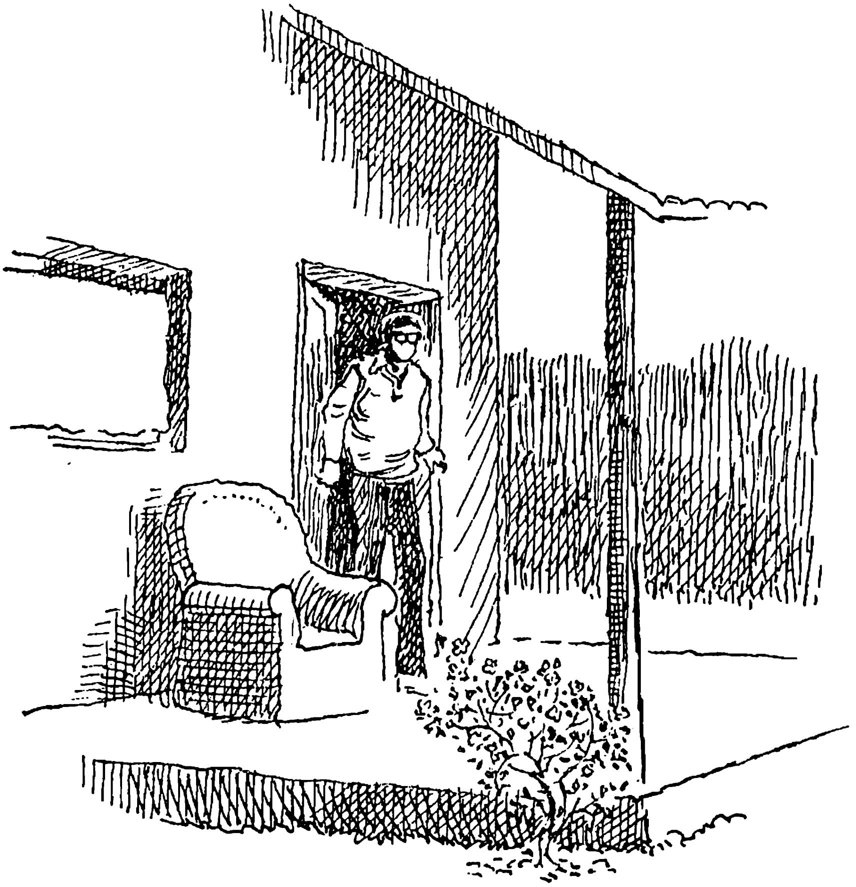

বুঝছেন দোষটা খানিকটা ওঁর নিজেরই।

'এই বাড়ির আশেপাশে ওই গাছ আরও আছে নাকি ?'—চায়ে চিনি নাড়তে নাড়তে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলেন জগন্ময়বাবু। চৌকিদার বলল বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে ওই গাছ ও আজ এই প্রথম দেখল।

'একি রাতারাতি গজিয়ে যায় নাকি ?'

'ওইসাই তো মালুম হোতা বাবু।'

'একটু খেয়াল রেখো তো। দেখলে আমায় বলবে।'

বনোয়ারি বলার আগেই জগন্ময়বাবুর চোখে পড়ল। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বারান্দার বেরিয়ে এসেই।

বারান্দার পুব কোনার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে এক গোছা চেনা ফুল। ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে ফুলগুলো। হাত পনেরোর বেশি দূরে নয়।

জগন্ময়বাবু বুঝতে পারলেন তাঁর পা দুটো কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। কোনও মতে এক পা পাশে সরে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লেন বেতের চেয়ারের উপর। একবার মালি বলে ডাকতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। গলা শুকিয়ে গেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। হাত-পা ঠাণ্ডা।

হাওয়াটা পুব দিক থেকেই আসছে। গাছের দিকে থেকেই। তার মানে ওই ফুলের বিষাক্ত

প্রশ্বাস—

জগন্ময়বাবু আর ভাবতে পারলেন না। এখানে বসা চলবে না। এর মধ্যেই তিনি অনুভব করছেন তাঁর নিশ্বাসের কষ্ট।

শরীর ও মনের অবশিষ্ট সব বলটুকু প্রয়োগ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে টলতে টলতে বৈঠকখানা পেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে শয্যা নিলেন জগন্ময়বাবু।

চৌকিদার রাত্রে কী রান্না হবে জিজ্ঞেস করতে এলে পর বললেন, 'কিচ্ছু না—খিদে নেই।'

তা সত্ত্বেও বনোয়ারি নিজ থেকেই এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে এল বাবুকে খাওয়ানোর জন্য। অনেক অনুরোধের পর জগন্ময়বাবু কোনও রকমে অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

দূরে মাদল বাজছে। বাজারে শুনেছিলেন কোথায় জানি মেলা বসবে। সাঁওতালের নাচ হবে সেখানে। ক'টা বাজল কে জানে। কম্বলের তলায় শুয়ে জগন্ময়বাবু অনুভব করলেন যে তাঁর এখনও শীত লাগছে। আলনা থেকে আলোয়ানটা নিয়ে কম্বলের উপর চাপিয়ে দিতে খানিকটা কাজ হল। তার ফলেই বোধহয় একটা সময় জগন্ময়বাবু বুঝলেন তাঁর চোখের পাতা দুটো এক হয়ে আসছে।

এর আগের ক'দিন এক ঘুমে রাত কাবার হয়েছে। আজ হল না। চোখ খুলতে ঘরে আলো দেখে প্রথমে খট্‌কা লেগেছিল, তারপর মনে পড়ল নিজেই বনোয়ারিকে বলেছিলেন আজ ঘরে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে রাখতে। এখনও শীত। হাওয়াটা ওই বাইরের দিকের জানালাটা দিয়েই আসছে বোধহয়। কিন্তু ওটা তো বন্ধ করেছিলেন উনি শোবার আগে। কেউ খুলল নাকি?

জগন্ময়বাবু ঘাড় তুললেন দেখবার জন্য।

জানালার পাশেই ড্রেসিং টেবিল। তার উপরেই রাখা লণ্ঠনের আলো পড়েছে তার পাল্লায়।

শুধু পাল্লায় না; বাইরে থেকে যে জিনিসটা উঁকি মারছে, তার উপরেও। সেই আলোতেই চেনা যাচ্ছে জিনিসটাকে।

এ সেই একই গাছ। একই গাছ, একই ফুল। হল্‌দে বেগুনি কমলা।

বিষফুল!

জগন্ময়বাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর তলপেট থেকে যে আর্তনাদটা কণ্ঠনালী বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে, সেটা মুখ দিয়ে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংজ্ঞা হারাবেন।

আর হলও তাই।

কামরাটা খালি পেয়ে জগন্ময় বারিক একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কারণ লোকের সান্নিধ্য এখন তাঁর ভাল লাগছে না। কাঠঝুমরিতে এমন স্বপ্নের মতো সুন্দর প্রথম তিনটি দিন গত দু-দিনে কী করে এমন বিভীষিকায় পরিণত হতে পারে, সেই নিয়ে তিনি এই সাত ঘণ্টার জার্নির মধ্যে একটু চুপচাপ একা বসে ভাবতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গার্ডের হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে একটি চেনা লোক তাঁর কামরায় এসে উঠলেন। পান্নাহাটের পোস্টমাস্টার নুটবিহারী মজুমদার। ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিনের পর আর দেখা হয়নি।

'সে কী মশাই! এর মধ্যেই ফিরে চললেন নাকি? নাকি আপনিও বেতোল যাচ্ছেন?'

'বেতোল?'

'এর পরের স্টেশন। মেলা বসেছে সেখানে। গিন্নীর হুকুমে সওদা করতে যাচ্ছি।'

'ও।'

'আপনি কোথায় চললেন?'

'ডালটনগঞ্জ।'

'শরীর খারাপ হল নাকি? এই দু'দিনেই এত পুল্‌ড ডাউন... ?'

'হ্যাঁ...একটু ইয়ে...'

নুটবিহারীবাবু মাথা নেড়ে একটু ফিক্ করে হেসে বললেন, 'যাক, ভদ্রলোকের লাক্‌টা ভাল।'

'লাক?'

'পবিত্রবাবুর কথা বলছি।'

'কেন?'

'আরে, উনি তো আজ দশ বছর হল বছরে দুবার করে মুর সাহেবের বাংলোতে এসে থাকেন। ওটা এক রকম ওঁর মনোপলি। অক্টোবর আর মার্চ। লিখতে আসেন। বড় রাইটার তো। পবিত্র ভট্টাচার্য—নাম শোনেন নি? লেখেন, আর ভগবান বলে একটা কাঠুরের ছেলেকে বাংলা শেখান। শখের মাস্টারি! একটু আদর্শবাদী প্যাটার্নের লোক আর কী। আপনি গেচেন শুনে নেচে উঠবেন। ভারী আক্ষেপ করছিলেন নিজের ডেরা ছেড়ে হোটেলে থাকতে হচ্ছে বলে। বললেন বুড়ো মুর বেঁচে থাকলে এ গোলমাল হত না, বুড়িই গণ্ডগোলটা করেছে।'

বেতোল স্টেশনে নুটবিহারী নেমে যাবার পর গাড়িটা ছাড়বার ঠিক মুখে জগন্ময়বাবু দেখলেন প্ল্যাটফর্মের ধারে লোহার রেলিং-এর পিছনে ফুলের ঝাড়টা। একটা-আধটা নয়, এক মাঠ জুড়ে কমপক্ষে একশোটা।

আর তারই মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে খেলা করছে তিনটি ছাগলছানা।

সন্দেশ,শারদীয়া ১৩৮৪

অসমঞ্জবাবুর কুকুর

হাসিমারায় বন্ধুর বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসে অসমঞ্জবাবুর একটা অনেকদিনের শখ মিটল।

ভবানীপুরের মোহিনীমোহন রোডে দেড়খানা ঘর নিয়ে থাকেন অসমঞ্জবাবু। লাজপত রায় পোস্টঅফিসের রেজিস্ট্রি বিভাগে কাজ করেন তিনি ; কাজের জায়গা তাঁর বাড়ি থেকে সাত মিনিটের হাঁটা পথ, তাই ট্রাম-বাসের ঝক্কি পোয়াতে হয় না। এমনিতে দিব্যি চলে যায়, কারণ যেসব মানুষ জীবনে কী হল না কী পেল না এই ভেবেই মুখ বেজার করে বসে থাকে, অসমঞ্জবাবু তাদের দলে পড়েন না। তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট। মাসে দুটো হিন্দি ছবি, একটা বাঙলা যাত্রা বা থিয়েটার, হপ্তায় দুদিন মাছ আর চার প্যাকেট উইলস সিগারেট হলেই তাঁর চলে যায়। তবে তিনি একা মানুষ, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনও বিশেষ নেই, তাই অনেক সময় মনে হয়েছে একটা কুকুর থাকলে বেশ হত। তাঁর বাড়ির দুটো বাড়ি পশ্চিমে তালুকদারদের যে বিশাল অ্যালসেশিয়ানটা আছে, সে রকম কুকুর না হলেও চলে ; এমনি একটা সাধারণ কুকুর, যেটা তাঁকে সকাল সন্ধে সঙ্গ দেবে, তাঁর তক্তপোষের পাশে মেঝেতে গা এলিয়ে পড়ে থাকবে, তিনি আপিস থেকে ফিরলে পরে লেজ নেড়ে আহ্লাদ প্রকাশ করবে, তাঁর আদেশ মেনে তার বুদ্ধি আর আনুগত্যের পরিচয় দেবে। কুকুরকে তিনি ইংরিজিতে আদেশ করবেন এটাও অসমঞ্জবাবুর একটা শখ। 'স্ট্যান্ড-আপ' 'সিট ডাউন' 'শেক হ্যান্ড', এসব বললে যদি কুকুর মানে তা হলে বেশ হবে। কুকুর জাতটাকে সাহেবের জাত বলে ভাবতে অসমঞ্জবাবুর বেশ ভাল লাগে, আর উনি হবেন সেই সাহেবের মালিক—মানে হিজ মাস্টার আর কী।

মেঘলা দিন, সকাল থেকে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, অসমঞ্জবাবু ছাতা ছাড়াই হাসিমারার বাজারে গিয়েছিলেন কমলালেবু কিনতে। বাজারের এক প্রান্তে একটা বেঁটে কুলগাছের পাশে বেতের টোকা মাথায় ভুটানি লোকটাকে দেখতে পেলেন তিনি। তিন আঙুলে একটা জ্বলন্ত চুটা ধরে পা ছাড়িয়ে মাটিতে বসে তাঁরই দিকে চেয়ে কেন যে মিটিমিটি হাসছে লোকটা সেটা বুঝতে না পারলেও, কৌতূহলবশে তিনি লোকটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভিখিরি কি ? পোশাক দেখে সেটা মনে হওয়া আশ্চর্য নয় ; প্যান্ট আর গায়ের জামাটার অন্তত পাঁচ জায়গায় তাপ্পি লক্ষ করলেন অসমঞ্জবাবু। কিন্তু ভিক্ষের পাত্র বা ঝুলি বলে কিছু নেই ; তার বদলে আছে একটা জুতোর বাক্স, সেই বাক্স থেকে উঁকি মারছে একটা বাদামি রঙের কুকুরছানা।

'গুড মর্নিং !'—চোখ বন্ধ করা হাসি হেসে বলল ভুটানি। উত্তরে অসমঞ্জবাবুও 'গুড মর্নিং' না বলে পারলেন না।

'বাই ডগ ? ডগ বাই ? ভেরি গুড ডগ।'

কুকুরছানাটাকে বাক্স থেকে বার করে মাটিতে রেখেছে ভুটানি। 'ভেরি চীপ্। ভেরি গুড। হ্যাপি ডগ।'

কুকুরছানাটা গা ঝাড়া দিল, বোধ হয় পিঠে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার দরুন। তারপর অসমঞ্জবাবুর দিকে চেয়ে তার দেড় ইঞ্চি লম্বা ল্যাজটা বার কয়েক নেড়ে দিল। বেশ কুকুর তো !

অসমঞ্জবাবু এগিয়ে গিয়ে কুকুরটার সামনে বসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। কুকুরটা দু' পা এগিয়ে এসে তার ছোট্ট জিভটা বার করে, অসমঞ্জবাবুর বুড়ো আঙুলের ডগাটায় একটা মৃদু চাটা দিয়ে দিল। বেশ কুকুর। যাকে বলে ফ্রেন্ডলি।

'কেতনা দাম ? হাউ মাচ ?'

'টেন রুপিজ।'

সাড়ে সাতে রফা হল। অসমঞ্জবাবু জুতোর বাক্স সমেত কুকুরছানাটাকে নিয়ে বগলদাবা করে বাড়িমুখো হলেন। কমলালেবুর কথাটা তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন।

হাসিমারা স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারী বিজয় রাহা তাঁর বন্ধুর এই শখটার কথা জানতেন না। তাই তাঁর হাতে জুতোর বাক্স এবং বাক্সের মধ্যে কুকুরছানা দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন বইকী ; কিন্তু দামটা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে মৃদু ভৎসনার সুরে বললেন, 'নেড়ি কুত্তাই যদি কেনার ছিল তা সে এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কী ভাই ? এ জিনিস তোমার ভবানীপুরে পেতে না ?'

না, ভবানীপুরে পেতেন না। অসমঞ্জবাবু সেটা জানেন। তাঁর বাড়ির সামনে রাস্তায় অনেক সময় অনেক কুকুরছানা দেখেছেন তিনি। তারা কখনও তাঁকে দেখে লেজ নাড়েনি বা প্রথম আলাপেই তাঁর বুড়ো আঙুল চেটে দেয়নি। বিজয় যাই বলুক—এ কুকুরের একটা বিশেষত্ব আছে। তবে নেড়ি কুত্তা জেনে অসমঞ্জবাবু খানিকটা আক্ষেপ প্রকাশ করাতে বিজয়বাবু তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে জাত কুকুরের ঝক্কি পোয়ানো অসমঞ্জবাবুর পক্ষে সম্ভব হত না।—'তোর কোনও আইডিয়া আছে একটা জাত কুকুরের কত ঝামেলা ? মাসে মাসে ডাক্তারের খরচায় তোর অর্ধেক মাইনে বেরিয়ে যেত। এ কুকুরকে নিয়ে তোর কোনও চিন্তা নেই। আর এর জন্য কোনও স্পেশাল ডায়েটেরও দরকার নেই। তুই যা খাস তাই খাবে। তবে মাছটা দিসনি, ওটা বেড়ালের খাদ্য। কুকুর মাছের কাঁটা ম্যানেজ করতে পারে না।'

কলকাতায় ফিরে এসে অসমঞ্জবাবুর খেয়াল হল যে কুকুরটার একটা নাম দেওয়া হয়নি। সাহেবি নাম ভাবতে গিয়ে প্রথমে টম ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছিল না, তারপর ছানাটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মাথায় এল যে রঙটা যখন ব্রাউন, তখন ব্রাউনি নামটা হয়তো বেমানান হবে না। ব্রাউনি নামে একটা বিলিতি ক্যামেরা তাঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের ছিল। কাজেই নামটা সাহেবি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আশ্চর্য নামটা মনে পড়া মাত্র ব্রাউনি বলে ডাকতেই ছানাটা ঘরের কোণে রাখা বেঁটে মোড়াটার উপর থেকে একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে মেঝেতে নেমে তাঁর দিকে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। অসমঞ্জবাবু বললেন, 'সিট ডাউন', আর অমনি ব্রাউনি তার পিছনের পা দুটো ভাঁজ করে থপ্ করে বসে পড়ে তাঁর দিকে চেয়ে একটা ছোট্ট হাই তুলল। অসমঞ্জবাবু এক মুহূর্তের জন্য যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন যে ব্রাউনি ডগ-শোতে বুদ্ধিমান কুকুর হিসেবে প্রথম পুরস্কার পাচ্ছে।

সুবিধে এই যে চাকর বিপিনেরও কুকুরটাকে পছন্দ হয়ে গেছে, ফলে দিনের বেলায় যে সময়টুকু তিনি বাইরে থাকেন, সে সময়ে ব্রাউনির দিকে নজর রাখার কাজটা বিপিন খুশি হয়েই করে। অসমঞ্জবাবু তাকে সাবধান করে দিয়েছেন যেন ব্রাউনিকে আজেবাজে কিছু খেতে না দেয়।—'আর দেখিস রাস্তায়-টাস্তায় না বেরোয়। আজকালকার ড্রাইভারগুলো চোখে ঠুলি দিয়ে গাড়ি চালায়।' অবিশ্যি বিপিনকে ফরমাশ দিয়েও অসমঞ্জবাবুর সোয়াস্তি নেই ; রোজ সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে এসে ব্রাউনির লাঙ্গুলসঞ্চালন না দেখা পর্যন্ত তাঁর উৎকণ্ঠা যায় না।

ঘটনাটা ঘটল হাসিমারা থেকে ফেরার তিনমাস পরে। বারটা ছিল শনি, তারিখ বাইশে নভেম্বর। অসমঞ্জবাবু আপিস থেকে ফিরে তাঁর ঘরে ঢুকে সার্টটা খুলে আলনায় টাঙিয়ে তক্তপোষ ছাড়া তাঁর একমাত্র আসবাব একটা পুরনো কাঠের চেয়ারে বসতেই সেটার একটা পঙ্গু পায়া তাঁর সামান্য ভারও সইতে না পেরে কাজে ইস্তফা দিল, আর তার ফলে চোখের পলকে অসমঞ্জবাবু চেয়ার সমেত সশব্দে মেঝের সংস্পর্শে এসে গেলেন। এতে তাঁর চোট লাগল ঠিকই, এমনকী চেয়ারের পায়ার মতো তাঁর ডানহাতের কনুইটাও বাতিল হয়ে যাবে কি না সে চিন্তাটাও তাঁর মনে উদয় হয়েছিল, কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ তাঁকে তাঁর যন্ত্রণার কথা ভুলিয়ে দিল।

শব্দটা এসেছে তক্তপোষের উপর থেকে। হাসির শব্দ, বোধহয় যাকে বলে খিলখিল হাসি, আর সেটার উৎস হচ্ছে নিঃসন্দেহে তাঁর কুকুর ব্রাউনি, কারণ ব্রাউনিই বসে আছে তক্তপোষের উপর, আর

ব্রাউনিরই ঠোঁটের কোণে এখনও লেগে আছে হাসির রেশ।

অসমঞ্জবাবুর সাধারণ জ্ঞানের মাত্রাটা যদি আর সামান্যও বেশি হত তা হলে তিনি জানতেন যে কুকুর কখনও হাসে না। আর এই জ্ঞানের সঙ্গে যদি তাঁর কল্পনাশক্তিও খানিকটা বেশি হত, তা হলে আজকের এই ঘটনা তাঁর নাওয়া-খাওয়া, রাতের ঘুম সব বন্ধ করে দিত। এই দুটোরই অভাবে অসমঞ্জবাবু যেটা করলেন সেটা হল, তিন দিন আগে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা পুরনো বইয়ের দোকান থেকে আড়াই টাকা দিয়ে কেনা 'অল অ্যাবাউট ডগ্‌স্' বইটা হাতে নিয়ে বসলেন। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সেটা উলটেপালটে দেখলেন যে তাতে কুকুরের হাসির কোনও উল্লেখ নেই।

অথচ ব্রাউনি যে হেসেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু হাসেনি, হাসির কারণে হেসেছে। অসমঞ্জবাবুর স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর যখন বছর পাঁচেক বয়স তখন নরেন ডাক্তার একবার তাঁদের চন্দননগরের বাড়িতে রুগি দেখতে এসে চেয়ার ভেঙে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছিলেন, আর তাই দেখে অসমঞ্জবাবু হাসিতে ফেটে পড়ায় বাবার কাছে কানমলা খেয়েছিলেন।

অসমঞ্জবাবু হাতের বইটা বন্ধ করে ব্রাউনির দিকে চাইলেন। চোখাচোখি হতেই বালিশের উপর সামনের পা দুটো ভর করে দাঁড়িয়ে ব্রাউনি তার তিন মাসে দেড় ইঞ্চি বেড়ে যাওয়া লেজটা নেড়ে দিল। তার মুখে এখন হাসির কোনও চিহ্ন নেই। অকারণে হাসাটা পাগলের লক্ষণ ; অসমঞ্জবাবু ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে ব্রাউনি ম্যাড ডগ নয়।

* * *

এর পর সাতদিনের মধ্যে ব্রাউনি আরও দুবার হাসার কারণে হাসল। প্রথমবারের ব্যাপারটা ঘটল রাত্রে। তখন রাত সাড়ে নটা। ব্রাউনির শোবার জন্য অসমঞ্জবাবু সবে তার তক্তপোষের পাশে মেঝেতে একটা চাদর পেতে দিয়েছেন, এমন সময় ফর ফর শব্দ করে দেওয়ালে একটা আরশোলা উড়ে এসে বসল। অসমঞ্জবাবু তাঁর এক পাটি চটি নিয়ে সেটাকে তাগ করে মারতে গিয়ে বেমক্কা এক চাপড় মেরে বসলেন দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটায়, আর তার ফলে সেটা পেরেক থেকে খসে মাটিতে পড়ে ভেঙে চৌচির। এবারে ব্রাউনির খিলখিলে হাসি তাঁকে ভাঙা আয়নার জন্য আপসোস করতে দিল না।

দ্বিতীয়বারের হাসিটা অবশ্য খিলখিল নয় ; সেটা যাকে বলে ফিক্ করে হাসা। অসমঞ্জবাবু এবারে বেশ ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন, কারণ ঘটনা বলতে কিছুই ঘটেনি। তবু ব্রাউনি হাসল কেন ? উত্তর জোগাল বিপিন। চা এনে ঘরে ঢুকে মনিবের দিকে চেয়ে সেও ফিক্ করে হেসে বলল, 'আপনার কানের পাশে সাবান লেগে রয়েছে বাবু।' আসলে আয়নার অভাবে জানলার আর্শিতে দাড়ি কামিয়েছেন অসমঞ্জবাবু ; চাকরের কথায় দু'দিকের জুলফিতেই হাত বুলিয়ে দেখলেন বেশ খানিকটা করে শেভিং সোপ লেগে রয়েছে।

এই সামান্য কারণেও যে ব্রাউনি হেসেছে তাতে অসমঞ্জবাবুর বেশ অবাক লাগল। তিনি দেখলেন যে পোস্টাপিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বার বার ব্রাউনির কৌতুকভরা দৃষ্টি আর হাসির ফিক্ শব্দটা মনে পড়েছে। অল অ্যাবাউট ডগ্‌স্-এ কুকুরের হাসির কথা না থাকলেও, কুকুরের এনসাইক্লোপিডিয়া গোছের একটা বই জোগাড় করতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয় কিছু জানতে পারতেন।

ভবানীপুরের চারটে বইয়ের দোকান, আর তারপর নিউ মার্কেটের সবক'টা বইয়ের দোকান খুঁজেও যখন তিনি ওই জাতীয় কোনও এনসাইক্লোপিডিয়া পেলেন না, তখন মনে হল—রজনী চাটুজ্যের কাছে গেলে কেমন হয় ? তাঁর পাড়াতেই থাকেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রজনী চাটুজ্যে। কী বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন ভদ্রলোক সেটা অসমঞ্জবাবু জানেন না, কিন্তু তাঁর বৈঠকখানাটি যে ভারী ভারী বইয়ে ঠাসা সেটা তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই দেখা যায়।

এক রবিবার সকালে দুগ্‌গা বলে রজনী চাটুজ্যের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন অসমঞ্জবাবু। দূর থেকে ভদ্রলোককে দেখেছেন অনেকবার, কিন্তু তাঁর গলার স্বর যে এত ভারী, আর ভুরু যে এত ঘন

সেটা জানা ছিল না। রাগি মানুষ হলেও দরজা থেকে ফিরিয়ে দেননি, তাই খানিকটা ভরসা পেয়ে অসমঞ্জবাবু অধ্যাপকের মুখোমুখি সোফাটায় বসে একবার ছোট্ট করে কেশে গলাটা ঝেড়ে নিলেন। রজনীবাবু হাতের ইংরিজি পত্রিকাটি চোখের সামনে থেকে সরিয়ে তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলেন।

'আপনাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ?'

'আজ্ঞে আমি এ পাড়াতেই থাকি।'

'অ।... কী ব্যাপার ?'

'আপনার বাড়িতে একটা কুকুর দেখেছি, তাই...'

'তাই কী ? আছে তো কুকুর। একটা কেন, দুটো আছে।'

'ও। আমারও আছে।'

'আপনারও আছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা।'

'বুঝলাম।—তা আপনি কি কুকুর-পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে আসছেন ?'

অসমঞ্জবাবু সরল মানুষ, তাই শ্লেষটা ধরতে পারলেন না। বললেন, 'আজ্ঞে না। একটা জিনিসের খোঁজ করতে আপনার কাছে এসেছি।'

'কী জিনিস ?'

'আপনার কাছে কি কুকুরের এনসাইক্লোপিডিয়া আছে ?'

'না, নেই।...ও জিনিসটার দরকার হচ্ছে কেন ?'

'না, মানে—আমার কুকুর হাসে। তাই জানতে চাইছিলাম কুকুরের হাসিটা স্বাভাবিক কিনা। আপনার কুকুরও হাসে কি ?'

রজনীবাবুর দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজতে যতটা সময় লাগল, ততক্ষণ একটানা তিনি অসমঞ্জবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'কখন হাসে আপনার কুকুর ? রাত্তিরে কি ?'

'হ্যাঁ, তা রাত্তিরেও...'

'রাত্তিরে আপনি ক'রকম নেশা করেন ? শুধু গাঁজায় তো হয় না এ জিনিস। তার সঙ্গে ভাঙ, চরস, আফিং—এসবও চলে কি ?'

অসমঞ্জবাবু বিনীতভাবে জানালেন যে একমাত্র ধূমপান ছাড়া তাঁর আর কোনও নেশা নেই, আর সেটাও তিনি কুকুর আসার পর থেকে হপ্তায় চার প্যাকেট থেকে তিন প্যাকেটে নামিয়েছেন, কারণ খরচে কুলোয় না।

'তাও বলছেন আপনার কুকুর হাসে ?'

'আমি দেখেছি হাসতে। শুনেওছি। আওয়াজ করে হাসে।'

'শুনুন—।'

রজনী চাটুজ্যে হাতের পত্রিকাটা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসে অসমঞ্জবাবুর দিকে তাকিয়ে একেবারে ষোলো আনা অধ্যাপকের মেজাজে বলেন, 'আপনার একটি তথ্য বোধহয় জানা নেই ; সেটা জেনে রাখুন। ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে জগতে, তার মধ্যে মানুষ ছাড়া আর কেউ হাসে না, হাসতে জানে না, হাসতে পারে না। এটাই হচ্ছে মানুষ আর অন্য প্রাণীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য। কেন এমন হল সেটা জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ সেটা জানি না। শুনেছি ডলফিন নামে শুশুক জাতীয় একরকম প্রাণীর নাকি রসবোধ আছে, তারা হাসলেও হাসতে পারে, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও প্রাণী হাসে না। মানুষ যে কেন হাসে সেটার কোনও স্পষ্ট কারণ জানা নেই। বাঘা বাঘা দার্শনিকরা অনেক ভেবে এর কারণ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁদের মতের মিল হয়নি।—বুঝেছেন ?'

অসমঞ্জবাবু বুঝলেন, আর এও বুঝলেন যে এবার তাঁকে উঠতে হবে, কারণ রজনী চাটুজ্যের দৃষ্টি কথা শেষ করেই চলে গেছে তাঁর হাতের পত্রিকার দিকে।

ডাঃ সুখময় ভৌমিক—যাঁকে কেউ কেউ ভৌ-ডাক্তার বলেন—কলকাতার একজন নামকরা

কুকুরের ডাক্তার। সাধারণ লোকে তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও একজন কুকুরের ডাক্তার সেটা করবে না এই বিশ্বাসে অসমঞ্জবাবু খোঁজ খবর নিয়ে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গোখেল রোডে ভৌমিকের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। গত চার মাসে সতেরো বার হেসেছে ব্রাউনি। এটা অসমঞ্জবাবু লক্ষ করেছেন যে মজার কথা শুনলে ব্রাউনি হাসে না, কেবল মজার ঘটনা দেখলেই হাসে। যেমন বোম্বাগড়ের রাজা শুনে ব্রাউনির মুখে কোনও পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু আধসেদ্ধ আলুর দমের আলু যখন অসমঞ্জবাবুর আঙুলের চাপে পিছলে ছিটকে দইয়ের মধ্যে পড়ল, আর সেই দইয়ের ছিটে যখন অসমঞ্জবাবুর নাকের ডগায় লাগল, তখন ব্রাউনির প্রায় বিষম লাগার জোগাড়। রজনী চাটুজ্যে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণী-টানি বলে তো তাঁকে বিস্তর জ্ঞান দিলেন, কিন্তু অসমঞ্জবাবুর চোখের সামনে যে অধ্যাপকের কথা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে?

এই সব ভেবে-টেবে বিশ টাকা ফি জেনেও অসমঞ্জবাবু গেলেন ভৌ-ডাক্তারের কাছে। কুকুরের হাসির কথা শোনার আগেই তার চেহারা দেখে ডাক্তারের চোখ কপালে উঠল।

'অনেক মংগ্রেল দেখিচি মশাই, কিন্তু এমনটি তো দেখিনি।'

ডাক্তার দুহাতে ব্রাউনিকে তুলে তাঁর টেবিলের উপর দাঁড় করালেন। ব্রাউনি তার পায়ের সামনে পিতলের পেপারওয়েটটাকে একবার শুঁকে নিল।

'কী খাওয়াচ্ছেন একে?'

'আজ্ঞে আমি যা খাই তাই খায়। জাত কুকুর তো নয়, কাজেই অতটা...'

ভৌমিক ভুরু কুঁচকোলেন। ভারী মনোযোগ আর কৌতূহলের সঙ্গে দেখছেন তিনি ব্রাউনিকে।

'জাত কুকুর দেখলে অবিশ্যি আমরা বুঝি', বললেন ভৌমিক, 'তবে সারা বিশ্বের সব জাত কুকুর যে আমাদের চেনা সেকথা জোর দিয়ে বলি কী করে বলুন। এটার চেহারা দেখে ফস করে দোআঁশলা বলতে আমার দ্বিধা হচ্ছে। আপনি একে ডাল ভাত খাওয়াবেন না, আমি একটা খাবারের তালিকা করে দিচ্ছি।'

অসমঞ্জবাবু এবার আসল কথায় যাবার একটা চেষ্টা দিলেন।

'ইয়ে, আমার কুকুরের একটা বিশেষত্ব আছে, যার জন্য আপনার কাছে আসা।'

'কী বলুন তো?'

'কুকুরটা হাসে।'

'হাসে?'

'হ্যাঁ—মানে, মানুষের মতো করে হাসে।'

'বলেন কী! কই দেখি হাসান তো দেখি।'

এইখানেই মুশকিলে পড়ে গেলেন অসমঞ্জবাবু। এমনিতেই তিনি বেশ লাজুক মানুষ, কাজেই সার্কাসের ক্লাউনের মতো হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করে তিনি ব্রাউনিকে হাসাবেন এমন ক্ষমতা তাঁর নেই। আর ঠিক এই মুহূর্তে এই ডাক্তারের ঘরে কোনও হাস্যকর ঘটনা ঘটবে এটাও আশা করা যায় না। তাঁকে তাই বাধ্য হয়ে বলতে হল অত সহজে ফরমাইশি হাসি হাসে না তাঁর কুকুর, কেবল কোনও হাসির ঘটনা দেখলেই হাসে।

এর পরে ডাঃ ভৌমিক আর বেশি সময় দিলেন না অসমঞ্জবাবুকে। বললেন, 'আপনার কুকুরের চেহারাতেই যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে; তার সঙ্গে আবার হাসিটাসি জুড়ে দিয়ে আরও বেশি অসাধারণ করে তুলবেন না। তেইশ বছর কুকুরের ডাক্তারির অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আপনাকে—কুকুর কাঁদে, কুকুর ভয় পায়, কুকুর রাগ ঘৃণা বিরক্তি হিংসে এ সবই প্রকাশ করে, এমন কী কুকুর স্বপ্নও দেখে; কিন্তু কুকুর হাসে না।'

এই ঘটনার পর অসমঞ্জবাবু ঠিক করলেন যে আর কোনওদিন কাউকে কুকুরের হাসির কথা বলবেন না। প্রমাণ দেবার উপায় যখন নেই, তখন বলে কেবল নিজেই অপ্রস্তুত হওয়া। কেউ নাই বা জানুক, তিনি তো জানেন। ব্রাউনি তাঁরই কুকুর, তাঁরই সম্পত্তি। তাঁদের দুজনের এই জগতে বাইরের লোককে টেনে আনার কী দরকার?

কিন্তু মানুষে যা ভাবে সব সময় তো তা হয় না। ব্রাউনির হাসিও একদিন বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন থেকেই অসমঞ্জবাবু অভ্যাস করে নিয়েছিলেন কাজ থেকে ফিরে এসে ব্রাউনিকে নিয়ে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকটায় একটা চক্কর মেরে আসা। একদিন এপ্রিল মাসের একটা বিকেলে বেড়ানোর সময় হঠাৎ আচমকা এল তুমুল ঝড়। আকাশের দিকে চেয়ে অসমঞ্জবাবু বুঝলেন এখন বাড়ি ফেরা মুশকিল, কারণ বৃষ্টিরও আর বেশি দেরি নেই। তিনি ব্রাউনিকে নিয়ে মেমোরিয়ালের দক্ষিণ দিকে কালো ঘোড়সওয়ার মাথায় করা শ্বেতপাথরের তোরণটার নীচে আশ্রয় নিলেন।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে, চারদিকে লোকজন পরিত্রাহি ছুটছে ছাউনি লক্ষ্য করে, এমন সময় সাদা প্যান্ট আর বুশ শার্ট পরা একটি মাঝবয়সী ফরসা মোটা বেঁটে ভদ্রলোক তাঁদের হাত

থেকে হাত পনেরো দূরে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে তার হাতের ছাতাটা খুলে মাথায় দিতেই ঝড়ের দাপটে সেটা হড়াৎ শব্দ করে উলটে গিয়ে অকেজো হয়ে গেল। সত্যি বলতে কী, এই দৃশ্য দেখে অসমঞ্জবাবুরই হাসি পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি হাসবার আগেই ব্রাউনির অট্টহাস্য ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে পৌঁছে গেল সেই অপ্রস্তুত ভদ্রলোকের কানে। ভদ্রলোক ছাতাটা আবার সোজা করার ব্যর্থ চেষ্টা বন্ধ করে অবাক বিস্ময়ে ব্রাউনির দিকে চাইলেন। এদিকে ব্রাউনির এখন কুটিপাটি অবস্থা, অসমঞ্জবাবু তার মুখের উপর হাত চেপে হাসি থামানোর চেষ্টায় বিফল হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

হতভম্ব ভদ্রলোক ভূত দেখার ভাব করে এগিয়ে এলেন অসমঞ্জবাবুর দিকে। ব্রাউনির হাসির তেজ খানিকটা কমেছে, কিন্তু তাও একজন লোকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

'লাফিং ডগ।'

ভদ্রলোকের মুখে রা নেই দেখে অসমঞ্জবাবুই বললেন কথাটা।

'লা-ফিং ড-গ !' বহুদূরের পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনির মতো ফিরে এল কথাটা ভদ্রলোকের মুখ থেকে। 'হাউ এক্সট্রর্ডিনারি !'

অসমঞ্জবাবু দেখেই বুঝেছিলেন যে ভদ্রলোক বাঙালি নন ; হয়তো গুজরাটি বা পারসি হবে। কোনও প্রশ্ন যদি করেন ভদ্রলোক তা হলে ইংরিজিতে করবেন, আর অসমঞ্জবাবুকেও জবাব দিতে হবে ইংরিজিতেই।

বৃষ্টিটা বেড়েছে। ভদ্রলোক অসমঞ্জবাবুর পাশেই আশ্রয় নিলেন ঘোড়সওয়ারের নীচে, এবং যে দশ মিনিট ধরে বৃষ্টিটা চলল তার মধ্যে ব্রাউনি সম্বন্ধে যা কিছু সব তথ্য জেনে নিলেন। সেই সঙ্গে অসমঞ্জবাবুর নিজের ঠিকানাটাও দিতে হল। ভদ্রলোক বললেন তাঁর নাম পিলু পোচকানওয়ালা। তিনি কুকুর সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, তাঁর এক ড্যালমেশিয়ান নাকি দুবার ডগ-শোতে প্রাইজ পেয়েছে, এমন কী তিনি কুকুর সম্বন্ধে কাগজে লিখেটিখেও থাকেন। বলা বাহুল্য, তাঁর জীবনে আজকের মতো তাক-লাগানো ঘটনা আর ঘটেনি, ভবিষ্যতে আর ঘটবে না। তিনি মনে করেন এ বিষয়ে একটা কিছু করা দরকার, কারণ অসমঞ্জবাবু নিজে নাকি বুঝতে পারছেন না তিনি কী আশ্চর্য সম্পদের অধিকারী।

বৃষ্টি থামার পরে চৌরঙ্গির এডওয়ার্ড কোর্টে তাঁর বাসস্থানে ফেরার পথে পোচকানওয়ালা যে মিনিবাসের ধাক্কা খেয়ে কোমর ভাঙলেন, তার জন্য ব্রাউনিকে খানিকটা দায়ী করা চলে, কারণ লাফিং ডগের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকার ফলে ভদ্রলোক রাস্তা পেরোবার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেননি। আড়াই মাস হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে পোচকানওয়ালা হাওয়া বদলের জন্য যান নৈনিতাল। সেখানে একমাস থেকে কলকাতায় ফিরে এসে সেইদিনই সন্ধ্যায় বেঙ্গল ক্লাবে গিয়ে তিনি তাঁর বন্ধু মিঃ বালাপুরিয়া ও মিঃ বিসোয়াসকে লাফিং ডগের ঘটনাটা বললেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাটা পৌঁছে গেল ক্লাবের সাতাশজন সদস্য ও তিনটি বেয়ারার কানে, এবং পরদিন দুপুরের মধ্যে এই ত্রিশজন মারফত ঘটনাটা জেনে গেল কমপক্ষে হাজার কলকাতাবাসী।

এই সাড়ে তিন মাসে ব্রাউনি আর হাসেনি। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, হাসির ঘটনা কোনও ঘটেনি। তাতে অবিশ্যি অসমঞ্জবাবু কোনও উদ্বেগ বোধ করেননি। কুকুরের হাসি ভাঙিয়ে খাবার কোনও অভিপ্রায় তাঁর কোনওদিন ছিল না। এই সাড়ে তিন মাসে তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝেছেন যে ব্রাউনি এসে তাঁর নিঃসঙ্গতা সম্পূর্ণ দূর করে দিয়েছে। সত্যি বলতে কী, কোনও মানুষের প্রতি অসমঞ্জবাবু কোনওদিন এতটা মমতা বোধ করেননি।

পোচকানওয়ালার দৌলতে যারা লাফিং ডগের খবরটা পেলেন তাদের মধ্যে ছিলেন স্টেটসম্যান পত্রিকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি সেই কাগজের এক সাংবাদিক রজত চৌধুরীকে ডেকে অসমঞ্জবাবুর সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব করলেন। অসমঞ্জবাবু যে লাজপত রায় পোস্টাপিসের কেরানি সে খবরটা পোচকানওয়ালার জবানিতেই রটে গিয়েছিল।

অসমঞ্জবাবু অবিশ্যি তাঁর বাড়িতে সাংবাদিকদের আগমনের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর বিস্ময় খানিকটা কাটল যখন রজত চৌধুরী পোচকানওয়ালার উল্লেখ করলেন। অসমঞ্জবাবু ভদ্রলোককে ঘরে এনে নতুন পায়া-লাগানো চেয়ারটায় বসিয়ে নিজে খাটে বসলেন। সেই সাতান্ন সালে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ-এর পর এই তাঁর প্রথম ইন্টারভিউ। ব্রাউনি ঘরের এক কোণে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে একটা পিঁপড়ের সারির গতিবিধি লক্ষ করছিল, তার মনিবকে খাটে বসতে দেখে সে এক লাফে তাঁর পাশে গিয়ে হাজির হল।

রজত চৌধুরীকে টেপ রেকর্ডারের চাবি টিপতে দেখে অসমঞ্জবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল সাংবাদিককে একটা কথা জানানো দরকার। তিনি বললেন, 'ইয়ে আমার কুকুর আগে হাসত ঠিকই, কিন্তু ইদানীং বেশ কয়েকমাস আর হাসেনি ; কাজেই আপনি ওর হাসি চাক্ষুষ দেখতে চাইলে

আপনাকে হতাশ হতে হবে।'

আজকালকার অনেক সাংবাদিকদের মতোই রজত চৌধুরী একটা বেশ চনমনে দাঁওমারা ভাব বোধ করেছিলেন এই সাক্ষাৎকারের শুরুতে। কথাটা শুনে তিনি খানিকটা হতাশ হলেও মনের ভাবটা যথাসম্ভব আড়াল করে বললেন, 'ঠিক, আছে। তবু কতকগুলো ডিটেলস্ আমি জেনে নিই। যেমন প্রথম হচ্ছে, আপনার কুকুরের নাম কী ?'

এগোনো মাইকটার দিকে গলা বাড়িয়ে অসমঞ্জবাবু বললেন, 'ব্রাউনি।'

'ব্রাউনি...'। এটা রজত চৌধুরীর দৃষ্টি এড়াল না যে নামটা উচ্চারণ হতেই কুকুরের লেজটা দুলে উঠেছে।

'ওর বয়স কত ?' দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন রজত চৌধুরী।

'এক বছর এক মাস।'

'আচ্ছা—আপনি এটাকে পে-প্পে-প্পেলেন কোথায় ?'

এটা আগেও হয়েছে। অনেক হোমরা-চোমরার সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েও রজত চৌধুরীর জিভের এই দোষটি তাকে আচমকা অপ্রস্তুত করে ফেলেছে। এখানেও তাই হতে পারত, কিন্তু ফল হল উলটো। এই তোতলামো ব্রাউনির বৈশিষ্ট্যপ্রকাশে আশ্চর্যভাবে সাহায্য করল। পোচকানওয়ালার পরে রজত চৌধুরী হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি নিজের কানে শুনলেন কুকুরের মুখে মানুষের হাসি।

পরের রবিবার সকালে গ্র্যান্ড হোটেলের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত দু'শো সাতষট্টি নম্বর কামরায় বসে আমেরিকায় সিনসিনাটি শহরের অধিবাসী উইলিয়াম পি. মুডি কফি খেতে খেতে স্টেটসম্যান পত্রিকায় লাফিং ডগ-এর বিবরণ পড়ে হোটেলের অপারেটরকে ফোন করে বললেন ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের মিস্টার ন্যানডির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। এই ন্যানডি ছোকরাটি যে কলকাতার রাস্তাঘাট ভালই চেনে তার প্রমাণ মুডি সাহেব গত দু'দিনে পেয়েছেন। স্টেটসম্যানে লাফিং ডগ-এর মালিকের নাম ঠিকানা বেরিয়েছে। মুডি সাহেবের তাঁর সঙ্গে দেখা করা একান্ত দরকার।

অসমঞ্জবাবু স্টেটসম্যান পড়েন না। তা ছাড়া তাঁর সাক্ষাৎকারটি যে কবে বেরোবে সেটা রজত চৌধুরী বলে যাননি ; দিনটা জানা থাকলে হয়তো তিনি কাগজের খোঁজ করতেন। তাঁকে খবরটা বলল জগুবাবুর বাজারে তাঁর পাড়ার জয়দেব দত্ত।

'আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক,' বললেন জয়দেববাবু, 'এমন একটা তাজ্জব জিনিস ঘরে নিয়ে বসে আছেন এক বচ্ছর যাবৎ, আর কথাটা ঘুণাক্ষরেও জানাননি। আজ বেলা করে যাব একবারটি আপনার ওখানে। দেখে আসব আপনার কুকুর।'

অসমঞ্জবাবু প্রমাদ গুনলেন। উৎপাতের সমূহ সম্ভাবনা। সত্যি বলতে কী, আপিসের বাইরে মানুষের সঙ্গ তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। কোনওদিনই লাগত না—ব্রাউনি আসার পরে তো নয়ই। অথচ কলকাতার লোকেরা যা হুজুগে ; এমন একটা খবর পড়ে কি আর তারা এই আশ্চর্য কুকুরটি দেখার লোভ সামলাতে পারবে ?

অসমঞ্জবাবু দ্বিধা না করে বাড়ি ফিরে দশ মিনিটের মধ্যে ব্রাউনিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর জীবনে প্রথম একটি ট্যাক্সি ডেকে তাতে চেপে সোজা চলে গেলেন বালিগঞ্জ রেলের স্টেশনে। সেখান থেকে চাপলেন ক্যানিং-এর ট্রেনে। পথে তালিত বলে একটা স্টেশনে গাড়ি থামলে পর জায়গাটাকে বেশ নিরিবিলি মনে হওয়ায় ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। সারা দুপুর বাঁশবন আমবনের ছায়া-শীতল পরিবেশে ঘুরে ভারী আরাম বোধ হল। ব্রাউনিকে দেখে মনে হল তারও ভাল লাগছে। তার ঠোঁটের কোণে যে হাসিটা আজ দেখলেন অসমঞ্জবাবু, সেটা একেবারে নতুন হাসি। এটা হল প্রসন্নতার হাসি, আরামের হাসি, মেজাজখুশ হাসি। অল অ্যাবাউট ডগস্ বইতে অসমঞ্জবাবু পড়েছিলেন যে কুকুরের এক বছর নাকি মানুষের সাত বছরের সামিল। কিন্তু এক বছরের ব্রাউনির হাবভাব দেখে তাঁর মনে হচ্ছে এই কুকুরটির মনের বয়স সাতের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

বাড়ি ফিরতে হল প্রায় সাতটা। বিপিন দরজা খুলতে অসমঞ্জবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, কেউ এসেছিল ?' বিপিন জানাল সারাদিনে অন্তত চল্লিশবার তাকে কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলতে

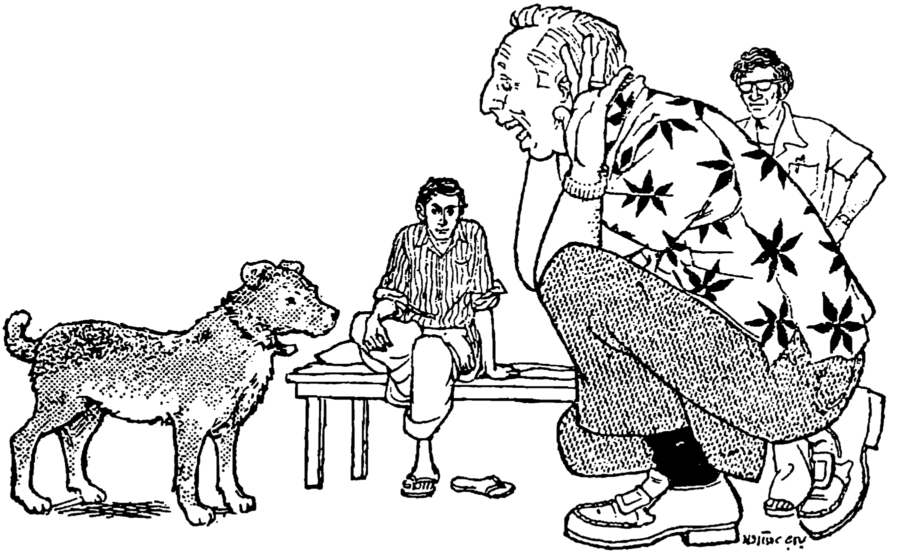

হয়েছে। অসমঞ্জবাবু মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করলেন।

বিপিনকে চা করতে বলে গায়ের জামাটা খুলে আলনায় রাখতেই কড়া নাড়ার শব্দ হল। 'ধুত্তেরি' বলে দরজা খুলে সামনে সাহেব দেখেই অসমঞ্জবাবু বলে ফেললেন, 'রং নাম্বার।' তারপর সাহেবের পাশে চশমা পরা এক বাঙালি যুবককে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'কাকে চাই ?'

'বোধহয় আপনাকে', বললেন ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের শ্যামল নন্দী। 'আপনার পিছনে যে কুকুরটাকে দেখছি সেটার সঙ্গে আজকের কাগজের বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। ভেতরে আসতে পারি ?'

অসমঞ্জবাবু অগত্যা দুজনকে তাঁর ঘরে এনে বসালেন। সাহেব বসলেন চেয়ারে, নন্দী মোড়াতে আর অসমঞ্জবাবু নিজে বসলেন খাটে। ব্রাউনির যেন কেমন একটা ইতস্তত ভাব ; সে ঘরে না ঢুকে চৌকাঠের ঠিক বাইরে রয়ে গেল। তার কারণ বোধহয় এই যে, এর আগে সে এই ঘরে কখনও একসঙ্গে তিনজন পুরুষকে দেখেনি।

'ব্রাউনি ! ব্রাউনি ! ব্রাউনি !'

ঘাড় নিচু, চোখ সঙ্কুচিত এবং ঠোঁট ছুঁচলো করে সাহেব হাসি হাসি মুখে ব্রাউনির দিকে চেয়ে মিহি গলায় তার নাম ধরে ডাকছে। ব্রাউনিও একদৃষ্টে সাহেবকে পর্যবেক্ষণ করছে।

স্বভাবতই অসমঞ্জবাবুর মনে প্রশ্ন জেগেছিল—এঁরা কারা ? সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন শ্যামল নন্দী। সাহেব মার্কিন মুলুকের একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি, ভারতবর্ষে এসেছেন পুরনো রোলস রয়েস গাড়ির সন্ধানে। সকালে ব্রাউনির বিষয়ে খবরের কাগজে পড়ে তাকে একবার দেখার লোভ সামলাতে পারেননি। সাহেব ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারবেন না বলে শ্যামল নন্দী তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

অসমঞ্জবাবু লক্ষ করলেন সাহেব এবার নাম ধরে ডাকা ছেড়ে চেয়ার থেকে নেমে এসে নানারকম মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি করতে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ কুকুরকে হাসানোর চেষ্টা চলেছে।

মিনিট তিনেক এইভাবে সংবাজি চালাবার পর সাহেব হাল ছেড়ে অসমঞ্জবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'ইজ হি সিক্ ?'

অসমঞ্জবাবু জানালেন তাঁর কুকুরের কোনও ব্যারাম হয়েছে বলে তিনি জানেন না।

'ডাঁজ হি রিঁয়েলি ল্যাঁফ ?'

মার্কিনি ইংরিজি পাছে অসমঞ্জবাবু না বোঝেন তাই শ্যামল নন্দী অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলেন সাহেব জানতে চাইছেন কুকুরটা সত্যিই হাসে কি না।

অসমঞ্জবাবুর অন্তরের ভিতর থেকে একটা বিরক্তির ভাব বাইরে ঠেলে বেরোতে চেষ্টা করছিল। সেটাকে মনের জোরে দাবিয়ে রেখে বললেন, 'সব সময় হাসে না। যেমন সব মানুষও হাসতে বললেই হাসে না।'

এবার দোভাষীর অনুবাদ শুনে সাহেবের মুখে লালের ছোপ পড়ল। তারপর তিনি জানালেন যে প্রমাণ না পেলে তিনি কুকুরের পিছনে খরচ করতে রাজি নন, কারণ দেশে ফিরে অপ্রস্তুতে পড়তে চান না তিনি। তিনি আরও জানালেন তাঁর বাড়িতে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে চীন থেকে পেরু পর্যন্ত পৃথিবীর এমন কোনও দেশ নেই যেখানকার কোনও না কোনও আশ্চর্য জিনিস নেই। একটি প্যারট আছে তাঁর কাছে, যেটা ল্যাটিন ভাষা ছাড়া কথা বলে না। —'এই লাফিং ডগটি কেনার জন্য আমি সঙ্গে চেক বই নিয়ে এসেছিলাম।'

কথাটা বলে সাহেব তাঁর বুক পকেট থেকে সড়াৎ করে একটি নীল বই করে দেখালেন। অসমঞ্জবাবু আড় চোখে দেখলেন, তার মলাটে লেখা সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ ইয়র্ক।

'আপনার ভোল পালটে যেত মশাই', বললেন শ্যামল নন্দী, 'আপনার কুকুরকে হাসাবার যদি কোনও উপায় জানা থাকে তা হলে সেইটি এবার ছাড়ুন। ইনি বিশ হাজার ডলার পর্যন্ত দিতে রাজি আছেন ওই কুকুরের জন্য। মানে টাকার হিসেবে দেড় লাখ।'

বাইবেলে লিখেছে ঈশ্বর সাতদিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষ কিন্তু কল্পনার সাহায্যে সাত সেকেন্ডেই এ কাজটা করতে পারে। শ্যামল নন্দীর কথা শোনামাত্র অসমঞ্জবাবু যে জগৎটা চোখের সামনে দেখতে পেলেন, সেখানে তিনি একটি পেল্লায় ছিমছাম ঘরে বার্ড কোম্পানির বড় সাহেবের মতো পায়ের উপর পা তুলে আরাম কেদারায় বসে আছেন, আর বাইরের বাগান থেকে ভেসে আসছে হাসনাহানা ফুলের গন্ধ। দুঃখের বিষয় তাঁর এই ছবি বুদ্বুদের মতো ফুড়ুৎ হয়ে গেল একটা শব্দে।

ব্রাউনি হাসছে।

এ হাসি আগের কোনও হাসির মতো নয়; এ একেবারে নতুন হাসি।

'বাঁট হি ইঁজ ল্যাফিং!'

মুডি সাহেব কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়েছেন, আর দুই চোখ দিয়ে গিলছেন এই দৃশ্য। জানোয়ার হলে তাঁর কানটাও যে খাড়া হয়ে উঠত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই অসমঞ্জবাবুর।

এবার কম্পিত হস্তে মুডি সাহেব তাঁর পকেট থেকে আবার বার করলেন তাঁর চেক বই। আর সেই সঙ্গে একটি সোনার পার্কার কলম।

ব্রাউনি কিন্তু হেসে চলেছে। অসমঞ্জবাবুর মনে খট্কা, কারণ তিনি এ হাসির মানে বুঝতে পারছেন না। কেউ তোতলায়নি, কেউ হোঁচট খায়নি, কারুর ছাতা উলটে যায়নি, চটির আঘাতে কোনও আয়না দেয়াল থেকে খসে পড়েনি—তা হলে কেন হাসছে ব্রাউনি?

'আপনার কপাল ভাল', বললেন শ্যামল নন্দী। 'তবে আমার কিন্তু একটা কমিশন পাওয়া উচিত, কী বলেন—হেঃ হেঃ।'

মুডি সাহেব মেঝে থেকে উঠে চেয়ারে বসে চেক বই খুললেন। 'অ্যাঁস্ক হিম হাঁউ হি স্পেঁল্স্ হিজ নেম।'

'সাহেব আপনার নামের বানান জিজ্ঞেস করছেন', বললেন দোভাষী শ্যামল নন্দী।

অসমঞ্জবাবু কথাটার উত্তর দিলেন না, কারণ তিনি হঠাৎ আলো দেখতে পেয়েছেন। আর সেই আলো তাঁর মনে গভীর বিস্ময় জাগিয়েছে। নামের বানানের বদলে তিনি বললেন, 'সাহেবকে বলুন কুকুর কেন হাসছে সেটা জানলে তিনি আর টাকার কথা তুলতেন না।'

'আপনি আমাকেই বলুন না,' শুকনো গলায় কড়া সুরে বললেন শ্যামল নন্দী। ঘটনার গতি তাঁর মোটেই মনঃপূত হচ্ছে না। মিশন ফেল করলে সাহেবের ধাতানি আছে তাঁর কপালে এটা তিনি জানেন।

ব্রাউনির হাসি থেমেছে। অসমঞ্জবাবু তাকে কোলে তুলে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বললেন, 'সাহেব ভাবছেন টাকা দিলে দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায়, তাই শুনে কুকুর হাসছে।'

'বটে? আপনার কুকুর বুঝি দার্শনিক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
'তার মানে আপনি কুকুর বেচবেন না?'
'আজ্ঞে না।'
শ্যামল নন্দী অবিশ্যি তাঁর অনুবাদে কুকুরের মনের ভাবের কথা কিছুই বললেন না, শুধু জানিয়ে দিলেন যে কুকুরের মালিক কুকুর বেচবেন না। কথাটা শুনে কলম, চেক-বই পকেটে পুরে প্যান্টের হাঁটু থেকে অসমঞ্জবাবুর মেঝের ধুলো হাত দিয়ে ঝেড়ে ঘর থেকে বেরোনোর সময় সাহেব শুধু মাথা নেড়ে বলে গেলেন, 'হি মাস্ট বি ক্রেজি!'
বাইরে মার্কিন গাড়িটার আওয়াজ যখন মিলিয়ে এল তখন অসমঞ্জবাবু ব্রাউনিকে তাঁর কোল থেকে নামিয়ে খাটের উপর রেখে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর হাসির কারণটা ঠিক বলিনি রে, ব্রাউনি?'
ব্রাউনি ছোট্ট করে হেসে দিল—ফিক্।
অর্থাৎ ঠিক।

সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৮৫

লোড শেডিং

ফণীবাবু তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগে থেকেই আঁচ করলেন যে তাঁর পাড়ায় লোড শেডিং হয়ে গেছে। আজ আপিসে ওভারটাইম করে বেরুতে বেরুতে হয়ে গেছে সোয়া আটটা। ডালহৌসি থেকে বাসে তাঁর পাড়ায় পৌঁছাতে লাগে পঁয়ত্রিশ মিনিট। কতক্ষণ হল বিজলি গেছে জানার উপায় নেই, তবে একবার গেলে ঘণ্টা চারেকের আগে আসে না।
ফণীবাবু বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে তাঁর বাড়ির গলি ধরলেন। এ সি, ডি সি, দুটোই গেছে। অথচ এই সেদিনও মনে হয়েছে যে অবস্থাটা যেন একটু ভালর দিকে যাচ্ছে। নবীন চাকর কালই যখন বলল 'আরও এক ডজন মোমবাতি কিনে রাখব বাবু?' তখন ফণীবাবু বলেছিলেন, 'মোমবাতি কিনলেই দেখবি আবার লোড শেডিং শুরু হয়েছে; এখন থাক।' তার মানে বাড়িতে মোমবাতি নেই। রাস্তার আলো থাকলে তার খানিকটা তাঁর তিনতলার ঘরে ঢুকে চলাফেরার একটু সুবিধে হয়; আজ তাও হবে না। ফণীবাবু বিড়ি সিগারেট খান না, তাই সঙ্গে দেশলাইও থাকে না। অনেকদিন মনে হয়েছে একটা টর্চ রাখলে মন্দ হয় না, কিন্তু সেও করছি করব করে হয়ে ওঠেনি।
বড় রাস্তা থেকে গলি ধরে মিনিট তিনেক গেলে পরে ফণীবাবুর বাসস্থান। সতেরোর দুই। ফুটপাথের উপর শোয়া গোটা তিনেক নেড়িকুত্তার বাচ্চাকে বাঁচিয়ে ফণীবাবু তাঁর বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।
মাসখানেক হল কারবালা ট্যাঙ্ক রোডের বাসা ছেড়ে এইখানে এসেছেন ফণীবাবু। তিনি আর চাকর নবীন। বাড়ির প্রত্যেক তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে ফণীবাবু লক্ষ করলেন একতলায় ইস্কুল মাস্টার জ্ঞান দত্তর ঘর থেকে একটা কম্পমান হলদে আলো পড়ছে বারান্দা আর উঠানে। মোমবাতির আলো। অন্য ফ্ল্যাটটা অন্ধকার। কোনও সাড়াশব্দও নেই। আজ পঞ্চমী। রমানাথবাবু যেন বলছিলেন পুজোয় ঘাটশিলা না মধুপুর কোথায় যাবেন। আজই চলে গেলেন নাকি?
সিঁড়ির তলায় এসে 'নবীন' বলে ডাক দিলেন ফণীবাবু। কোনও উত্তর নেই। বেরিয়েছে। ঠিক লোড শেডিং-এর সময় বেরোনো চাই। এটা আগেও কয়েকবার লক্ষ করেছেন ফণীবাবু।
চাকরের আশা ছেড়ে দিয়ে সিঁড়ি উঠতে আরম্ভ করলেন ফণীবাবু। মোমবাতির আলোতে প্রথম

কয়েকটা ধাপ দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু তার পরেই অন্ধকার। তার জন্য চিন্তার কোনও কারণ নেই ; তিন চব্বিশং বাহাত্তর ধাপ তাঁকে উঠতে হবে এটা তাঁর জানা আছে। লোড শেডিং-এর আশঙ্কা করেই ফণীবাবু একদিন সিঁড়ির সংখ্যা গুনে রেখেছিলেন। তাতে অন্ধকারে ওঠার অনেকটা সুবিধা হয়।

আশ্চর্য ! আলো থাকলে সিঁড়ি ওঠাটা সুস্থ লোকের পক্ষে কোনও সমস্যাই নয় ; কিন্তু অন্ধকারে পনেরো ধাপ উঠে ষোলোর মাথায় রেলিং-এ কাঠের বদলে হঠাৎ কী একটা হাতে ঠেকতেই ফণীবাবু শিউরে উঠে হাতটা সরিয়ে নিলেন। তারপর মনে সাহস এনে হাতটা রাখতেই বুঝলেন সেটা একটা গামছা।

দোতলায় কোনও আলো নেই। কোনও শব্দও নেই। তার মানে কোনও লোক নেই। পশ্চিমের দুটো ঘর নিয়ে থাকেন গেস্‌টেটনার অফিসের বিজনবাবু। সঙ্গে থাকেন তাঁর স্ত্রী আর দুই ছেলে। ছোট ছেলেটি মহা দুরন্ত। এক মুহূর্ত মুখ বন্ধ থাকে না তার। অন্য দিকে দুটি ঘর নিয়ে থাকেন কলেজ স্ট্রিটের এক জুতোর দোকানের মালিক মহাদেব মণ্ডল। ইনি সন্ধ্যায় প্রায়ই এক বন্ধুর বাড়িতে তাস খেলতে যান। বিজনবাবুরা মাঝে মাঝে সপরিবারে হিন্দি ছবি দেখতে যান ; আজও হয়তো গেছেন।

ফণীবাবু এ সব নিয়ে আর চিন্তা না করে উঠে চললেন। ষাট ধাপ উঠে ডাইনে মোড় নিতেই একটা টিনের পাত্রের সঙ্গে ঠোক্করের ফলে একটা কানফাটা শব্দ তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বেটাল করে দিয়ে তাঁর হৃৎস্পন্দনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। বাকি বারোটা ধাপ তাঁকে তাই অতি সাবধানে পা ফেলে উঠতে হল।

এবার বাঁয়ে ঘুরতে হবে। সামনে দড়িতে ঝোলানো একটা খালি পাখির খাঁচা পড়বে। তাঁর পড়শি নরেশ বিশ্বাসকে তিনি অনেকদিন থেকে বলছেন যে ময়নাটা যখন মরেই গেছে তখন আর খালি খাঁচাটাকে পথের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখা কেন। ভদ্রলোক এখনও পর্যন্ত কথাটা কানেই তোলেননি।

ফণীবাবু শরীরটাকে হাঞ্চব্যাকের মতো বেঁকিয়ে খাঁচা বাঁচিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয়ালে ভর করে তাঁর ঘরের দিকে এগোলেন। এই ভাবে দেয়াল হাতড়ে তিন চার পা এগোলেই ডাইনে তাঁর ঘরের দরজা।

একটা গানের শব্দ আসছে। রবীন্দ্রসংগীত। বোধ হয় পাশের বাড়ি থেকে। ট্র্যানজিস্টারই হবে। লোড শেডিং-এর আদিম ভুতুড়ে পরিবেশে এই জাতীয় শব্দ মনে অনেকটা সাহসের সঞ্চার করে। অবিশ্যি এটাও বলা দরকার যে ফণীবাবুর ভূতের ভয় নেই মোটেই।

দরজার চৌকাঠ হাতে ঠেকতে ফণীবাবু হাঁটা থামিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করলেন। দুটো চাবির একটা থাকে ফণীবাবুর কাছে ; আরেকটা রাখে নবীন। তালার জায়গা আন্দাজ করা সহজ ব্যাপার, কিন্তু কড়া হাতড়ে ফণীবাবু তালা পেলেন না। অথচ তাঁর স্পষ্ট মনে আছে যে আপিসে যাবার সময় তিনি তালা লাগিয়ে পকেটে চাবি পুরেছেন। এটাও কি তা হলে নবীনের কীর্তি ? সে কি তা হলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে ?

ফণীবাবু দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে বোকা বনে গেলেন ; কারণ দরজা দিব্যি খুলে গেল।

'নবীন !'

কোনও উত্তর নেই। নবীন ঘুমকাতুরে নয় সেটা ফণীবাবু জানেন।

ফণীবাবু চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অবিশ্যি 'ঘরে ঢুকলেন' কথাটা বোধহয় ঠিক হল না। কারণ দরজার পিছনে কী আছে তা বুঝতে হলে বেড়ালের চোখ দরকার। ফণীবাবু একবার চোখ বন্ধ করে আবার খুলে দেখলেন দুটো অবস্থার মধ্যে কোনও তফাত নেই। বাকি কাজ তিনি ইচ্ছে করলে চোখ বন্ধ করেই করতে পারেন। একেই বলে নিরেট অন্ধকার, যাকে দুহাত দিয়ে ঠেলে সামনে এগোতে হয়।

দরজার বাঁ পাশে এক ফালি দেয়াল, তাতে সুইচবোর্ড। তারপর দেয়াল ঘুরে গিয়ে পাশের ঘরের দরজা, আর দরজা পেরিয়ে ব্র্যাকেট আলনা। ফণীবাবুর হাতে ছাতা, সেটাকে আলনায় টাঙানো

দরকার। গরম লাগছে, গায়ের জামাটা খুলে সেটাও আলনায় যাবে। তবে জামা খোলার আগে বুক পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে আলনার পরেই বাঁ দিকে টেবিলের দেরাজে রাখতে হবে।

ফণীবাবু হাত বাড়ালেন সুইচ আন্দাজ করে। এখন বাতি জ্বলবে না ঠিকই, তবে বিজলি এলেই নিঃশব্দে আলো জ্বলে ওঠার মজাটা থেকে ফণীবাবু বঞ্চিত হতে চান না।

দুটো সুইচের একটার মাথা খোলা। নবীন একদিন লোড শেডিং-এর মধ্যেই হাতড়াতে গিয়ে শক্ খেয়েছিল। ফণীবাবু মোক্ষম আন্দাজে সেটাকে এড়িয়ে দ্বিতীয়টা বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মৃদু চাপে নীচে নামিয়ে দিলেন। খুট্ শব্দটা শুনতে ভালই লাগল।

সুইচ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় দরজার ফাঁকটা পেরোতেই আবার দেয়াল ঠেকল হাতে। এর পরেই তাঁর মাথার সমান হাইটে—

কিন্তু না।

আলনার বদলে একটা অন্য জিনিস হাতে ঠেকল। শুধু ঠেকল না। আঙুলের একটা বেআন্দাজি খোঁচা লাগায় সেটা স্থানচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

একটা ছবি। না হয় আয়না। ফণীবাবু বুঝলেন তাঁর পায়ের উপর কাচের টুকরো এসে পড়েছে। পায়ে চটি, তাই কাচ ফোটার ভয় নেই, কিন্তু আলনাটা গেল কোথায় সে ভাবনা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য অনড় করে দিল। তাঁর ঘরে একটা ছবি আছে বটে, পরমহংসদেবের, কিন্তু সেটা থাকবার কথা উলটোদিকের দেয়ালে। আয়নাটা থাকে টেবিলের উপর। এটা নির্ঘাত নবীনের কীর্তি। ঘরের জিনিস এখান-ওখান করার বাতিক তার আছে বটে! তাঁর চটিজোড়া তিনি রাখেন টেবিলের নীচে, আর বারণ সত্ত্বেও নবীন প্রতিদিন সেটাকে চালান দেয় খাটের তলায়।

ফণীবাবু হাতের জীর্ণ ছাতাটা মাটিতে নামিয়ে হাতলটা দেয়ালে ঠেকিয়ে সেটাকে সাবধানে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তারপর পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে এগিয়ে গেলেন অদৃশ্য টেবিল লক্ষ্য করে। এগোবার পথে পায়ের চাপে কাচ ভাঙল—চিড়্ চিড়্ চিড়্।

এবার বাঁ হাতটা টেবিলের কোণে ঠেকলেই দেরাজের হাতল খুঁজে পাওয়া সহজ ব্যাপার।

কিন্তু বাঁ হাত টেবিলে ঠেকল না। আন্দাজে ভুল হয়েছে। আরও এক পা এগিয়ে গেলেন ফণীবাবু। অন্ধকার এখনও নিরেট। রাস্তার দিকের জানলাটা খুললে হয়তো খানিকটা সুবিধে হত।

এবার বাঁ হাতটা বাধা পেল।

একটা আসবাব। কাঠের আসবাব। কিন্তু টেবিল নয়। আলমারি কি?

হ্যাঁ, এই তো হাতল। খাড়াখাড়ি হাতল। কাচের হাতল। পলকাটা। কাট-গ্লাস। যেমন অনেক পুরনো আলমারিতে থাকে। ফণীবাবুর একটা পুরনো আলমারি আছে বটে, কিন্তু তার হাতল কাচের কিনা সেটা মনে পড়ল না।

কিন্তু একী—আলমারি যে খোলা!

ফণীবাবু হাতলটা ছেড়ে দিলেন। অল্প টান দিতেই দরজা খুলে এসেছে।

সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তাঁর আলমারি স্বভাবতই তিনি কখনও খোলা রেখে যান না। যদিও ধনদৌলত বলতে তাঁর কিছুই নেই, কিন্তু জামাকাপড় আছে, কিছু পুরনো দলিল আছে, টাকা পয়সা যা কিছু থাকে আলমারির দেরাজে।

আজ সকালে কি তা হলে চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন ফণীবাবু?

কিন্তু টেবিলটা গেল কোথায়? তা হলে কি—?

ঠিক। তাই হবে। কারণটা খুঁজে পেয়েছেন ফণীবাবু।

গতকাল ছিল রবিবার। দুপুরে এল তুমুল বৃষ্টি। আর তখনই ফণীবাবু দেখলেন যে তাঁর ঘরের সিলিং থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে ঘরের ভিতর। টেবিলের উপরেও জল পড়ছিল, তাই নবীন খবরের কাগজ চাপা দিয়েছিল। আসলে বাড়িটা বেশ পুরনো। বাড়িওয়ালাকে ছাত সারানোর কথা বলতে হবে এ কথাটা তখনই মনে হয়েছিল ফণীবাবুর। আজও যে এ পাড়ায় দুপুরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে সেটা ফণীবাবু রাস্তা ভিজে দেখেই বুঝেছিলেন। নবীন যদি টেবিলটাকে জানলার দিকে সরিয়ে থাকে এবং কাপড় সমেত আলনাটা উলটো দিকের দেয়ালে টাঙিয়ে থাকে, তা হলে বলতে

হবে সে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে।

ফণীবাবু মানিব্যাগটা পকেটে পুরে জানলার দিকে এগোলেন।

তিন পা এগোতেই বাধা পড়ল।

এটা চেয়ার। নবীন তা হলে চেয়ারটাকে সরিয়েছে।

নাঃ, এভাবে অন্ধকারে হাতড়ানোর কোনও মানে হয় না। তার চেয়ে বাকি সময়টা আলোর অপেক্ষায় চেয়ারটাতেই বসে কাটিয়ে দেওয়া ভাল।

ফণীবাবু বসলেন। হাতলওয়ালা চেয়ার, বসার জায়গাটা বেতের। একবার যেন মনে হল তাঁর নিজের ঘরের চেয়ারে হাতল নেই, কিন্তু পরমুহূর্তেই খটকাটা মন থেকে দূর করে দিলেন। মানুষ নিজের ঘরের আসবাবের খুঁটিনাটি সব সময় মনে রাখে না, এই অভিজ্ঞতা তাঁর আজকে হয়েছে।

এখন ফণীবাবুর মুখ দরজার দিকে। বাইরে ছোট ছাতটার ওদিকে একটা ফিকে চতুষ্কোণ আভা। ফণীবাবু বুঝলেন সেটা আকাশ। শহরের যে অংশে লোড শেডিং নেই সেখানকার আলো প্রতিফলিত হয়ে আকাশে পড়েছে। যদিও মেঘ থাকায় তারা দেখা যাচ্ছে না। যাক্, তবুও তো একটা দেখার জিনিস রয়েছে চোখের সামনে।

একটা টিক্ টিক্ শব্দ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যে মুহূর্তে ফণীবাবুর খেয়াল হল যে তাঁর ঘরে কোনও টেবিল ঘড়ি নেই, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কান-ফাটা শব্দ তাঁকে চমকিয়ে প্রায় চেয়ার থেকে ফেলে দিল।

টেলিফোন।

তাঁর মাথার ঠিক পিছনে টেবিলের উপর টেলিফোন বেজে উঠেছে।

নিঃশব্দ অন্ধকারে প্রায় এক মিনিট ধরে একটা তুমুল আলোড়ন তুলে অবশেষে টেলিফোনটা থামল।

এইবার ফণীবাবু বুঝলেন যে তিনি তাঁর নিজের ঘরে আসেননি, কারণ তাঁর টেলিফোন নেই। আর এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাছে আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

সতেরোর দুই আর সতেরোর তিন হল পাশাপাশি বাড়ি। একই ধাঁচের দুটো বাড়ি। দুটো বাড়িই তিন তলা, দুটো বাড়িরই একই বাড়িওয়ালা। সতেরোর তিনে ফণীবাবু কোনওদিন ঢোকেননি, কিন্তু আজ বোঝাই যাচ্ছে যে দুটো বাড়ির প্ল্যানই প্রায় হুবহু এক। তিনি এখন বসে আছেন সতেরোর তিনের তিন তলার পশ্চিমের ঘরে। সেই ঘরের আলো এখন নেই, কিন্তু ঘরের দরজা খোলা, আলমারি খোলা।

তার মানে যাই হোক না কেন, ফণীবাবু নিজের ভুল বুঝতে পেরে আর সময় নষ্ট না করে উঠে পড়ার উপক্রম করেই আবার তৎক্ষণাৎ বসে পড়লেন।

আরেকটা শব্দ। এটা এসেছে তাঁর খুব কাছেই বাঁ দিক থেকে।

মেঝের উপর একটা টিনের বাক্স জাতীয় কিছু ঘষটানোর শব্দ।

ফণীবাবু বুঝলেন যে তাঁর গলা শুকিয়ে আসছে আর তাঁর বুকের ভিতরে দুরমুশ পেটা শুরু হয়েছে।

চোর।

তাঁর পাশেই বোধহয় খাট, আর খাটের নীচে চোর। বেরোবার চেষ্টায় খাটের নীচে রাখা টিনের বাক্সে ধাক্কা খেয়েছে।

ঘরের দরজা আর আলমারি কেন খোলা সেটা এখন খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

চোরের কাছে যদি হাতিয়ার থাকে তা হলে ফণীবাবুর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তাঁর নিজের একমাত্র হাতিয়ার ছাতাটি এখন নাগালের বাইরে। তা ছাড়া ছাতার যা দৈন্যদশা, তাতে চোরের চেয়ে ছাতাটি জখম হবে বেশি।

চোর অবিশ্যি আবার চুপ মেরে গেছে, কারণ টিনের বাক্সের শব্দ তুলে নিজের উপস্থিতিটা জানান দেবার অভিপ্রায় তার নিশ্চয়ই ছিল না, ফলে সে হয়তো কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট।

'*ঠিক ঠিক ঠিক !*'—একটা টিকটিকি ডেকে উঠল।

ভুল ভুল ভুল !—ফণীবাবুর মন বলল। একটা বিশ্রী ভুল করে একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছেন তিনি। ছিঁচকে চোরের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকার সম্ভাবনা কম, তবে ছোরা ছুরি থাকা অসম্ভব নয়। অবিশ্যি অনেক চোর নিরস্ত্র অবস্থাতেই বেরোয়। হাতাহাতির প্রশ্ন হলে ফণীবাবু হয়তো লড়ে যাবেন, কারণ এককালে তিনি ফুটবল খেলেছেন পাড়ার টিমে। কিন্তু মুশকিল করেছে এই অন্ধকার। দৃষ্টির অভাবে অতি শক্তিশালী মানুষও অসহায় বোধ করে।

কিন্তু তা হলে কী করা যায় ? যা থাকে কপালে বলে উঠে পড়বেন কি ?

কিন্তু যদি সিঁড়ি নামার মুখে বিজলি এসে যায় ? আর ঠিক সেই সময় যদি একদিক দিয়ে চোর পালায়, আর অন্য দিক দিয়ে ঘরের মালিক এসে পড়েন ? আর মালিক যদি এসে দেখেন তাঁর ঘরে চুরি হয়েছে, তা হলে তো—

ফণীবাবুর চিন্তায় ছেদ পড়ল।

নীচ থেকে একটা পায়ের শব্দ আসছে।

এই সিঁড়ি ওঠা শুরু হল। ধীরে ধীরে উঠছেন ভদ্রলোক। ওঠার মেজাজ আর পায়ের শব্দ থেকে পুরুষ বলে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আটচল্লিশ ধাপ অবধি গুনে উনপঞ্চাশের মাথায় ফণীবাবুর ধারণা বদ্ধমূল হল যে, এই ঘরের মালিকই আসছেন সিঁড়ি উঠে, আর সেই সঙ্গে হঠাৎ ভেল্কির মতো মনে পড়ে গেল—

এই ঘরের মালিককে তো ফণীবাবু চেনেন !

এতক্ষণ খেয়াল হয়নি কেন ? শেয়ারের ট্যাক্সিতে একবার ডালহৌসি অবধি গিয়েছিলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে। কোনও কারণে বাস বন্ধ ছিল সেদিন। ভদ্রলোক নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। নাম আদিনাথ সান্যাল। বছর পঞ্চাশেক বয়স, জাঁদরেল চেহারা, টকটকে রঙ, গায়ে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ সবজেটে চোখ।

বাষট্টি-তেষট্টি-চৌষট্টি...পায়ের শব্দ এখন জোরালো।

ঘরের ভিতরেও শব্দ। খচ্‌মচ্ ধুপ্‌ধাপ্—আর তারপরেই একটা যন্ত্রণাসূচক 'উফ্'। পায় কাচ বিঁধেছে। চোরের শাস্তি। বাইরে আকাশের ফিকে আলোটা এক মুহূর্তের জন্য ঢেকে গিয়ে আবার দেখা গেল। চোর ঘুরেছে ডান দিকে। পাইপটা বেয়ে নামা ছাড়া আর গতি নেই তার।

সিঁড়ির পায়ের শব্দ এবার মেঝেতে। বাইরের বারান্দায়। ফণীবাবুও উঠে পড়লেন। সাবধানে কাচ বাঁচিয়ে ছাতাটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

দরজার মুখ অবধি এসে পায়ের শব্দ থামল চৌকাঠের বাইরে। কয়েক মুহূর্তের নিঃশব্দতা। তারপর—

'একী ! দরজাটা—?'

আদিনাথ সান্যালের বাজখাঁই কণ্ঠস্বর। অনেক গল্প করেছিলেন সেদিন ট্যাক্সিতে, তাই ফণীবাবু গলাটা ভোলেননি।

আরও মনে পড়ছে ফণীবাবুর। তাঁর পাশের ঘরের নরেন বিশ্বাস বলেছিলেন একটা কথা। সান্যাল মশাই নাকি অগাধ টাকার মালিক। কলকাতায় তিনখানা বাড়ি। সব ভাড়া দিয়ে নিজে এইখানে থাকেন। উপার্জনের রাস্তাগুলো নাকি সিধে নয়। আলমারিতে নাকি অনেক কালো টাকা।

সান্যাল মশাই এখন ঘরের ভিতর। কাচ ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলেছেন হাতে হাতে চোর ধরার আশায়। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে ভদ্রলোকের।

ফণীবাবুর আর ভয় নেই। আদিনাথ সান্যালের পিছন দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে বাহাত্তরটা সিঁড়ি নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে সতেরোর দুইয়ের দিকে রওনা দিলেন।

নিজের বাড়ির তিন তলায় এসে খালি পাখির খাঁচাটা বাঁচিয়ে একবার এগোতেই যখন বিজলি ফিরে এল, তখন ফণীবাবু লক্ষ করলেন যে তাঁর হাতে একটি ঝক্‌ঝকে নতুন হাল ফ্যাশানের জাপানি ছাতা এসে গেছে।

ক্লাস ফ্রেন্ড

সকাল সোয়া নটা।

মোহিত সরকার সবেমাত্র টাইয়ে ফাঁসটা পরিয়েছেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী অরুণা ঘরে ঢুকে বললেন, 'তোমার ফোন।'

'এই সময় আবার কে ?'

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় অফিসে পৌঁছানোর অভ্যাস মোহিত সরকারের ; ঠিক বেরোনোর মুখে ফোন এসেছে শুনে স্বভাবতই তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল।

অরুণাদেবী বললেন, 'বলছে তোমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত।'

'ইস্কুলে ? বোঝ !—নাম বলেছে ?'

'বলল জয় বললেই বুঝবে !'

ত্রিশ বছর আগে ইস্কুল ছেড়েছেন মোহিত সরকার। ক্লাসে ছিল জনা চল্লিশেক ছেলে। খুব মন দিয়ে ভাবলে হয়তো তাদের মধ্যে জনা বিশেকের নাম মনে পড়বে, আর সেই সঙ্গে চেহারাও। জয় বা জয়দেবের নাম ও চেহারা দুটোই ভাগ্যক্রমে মনে আছে, কারণ সে ছিল ক্লাসে সেরা ছেলেদের মধ্যে একজন। পরিষ্কার ফুটফুটে চেহারা, পড়াশুনায় ভাল, ভাল হাইজাম্প দিত, ভাল তাসের ম্যাজিক দেখাত, ক্যাসাবিয়াঙ্কা আবৃত্তি করে একবার সোনার মেডেল পেয়েছিল। স্কুল ছাড়ার পরে তার আর কোনও খবর রাখেননি মোহিত সরকার। তিনি এখন বুঝতে পারলেন যে এককালে বন্ধুত্ব থাকলেও এত কাল ছাড়াছাড়ির পর তিনি আর কোনও টান অনুভব করছেন না তাঁর ইস্কুলের সহপাঠীর প্রতি।

মোহিত অগত্যা টেলিফোনটা ধরলেন।

'হ্যালো !'

'কে, মোহিত ? চিনতে পারছ ভাই ? আমি সেই জয়—জয়দেব বোস। বালিগঞ্জ স্কুল।'

'গলা চেনা যায় না, তবে চেহারাটা মনে পড়ছে। কী ব্যাপার ?'

'তুমি তো এখন বড় অফিসার ভাই ; নামটা যে মনে রেখেছ এটাই খুব !'

'ওসব থাক—এখন কী ব্যাপার বলো।'

'ইয়ে, একটু দরকার ছিল। একবার দেখা হয় ?'

'কবে ?'

'তুমি যখন বলবে। তবে যদি তাড়াতাড়ি হয় তা হলে...'

'তা হলে আজই করো। আমার ফিরতে ফিরতে ছ'টা হয়। সাতটা নাগাদ আসতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই পারব। থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। তখন কথা হবে।'

হালে কেনা হালকা নীল স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে আপিস যাবার পথে মোহিত সরকার ইস্কুলের ঘটনা কিছু মনে আনার চেষ্টা করলেন। হেডমাস্টার গিরীন সুরের ঘোলাটে চাহনি আর গুরুগম্ভীর মেজাজ সত্ত্বেও স্কুলের দিনগুলি ভারী আনন্দের ছিল। মোহিত নিজেও ভাল ছাত্র ছিলেন। শঙ্কর, মোহিত আর জয়দেব—এই তিনজনের মধ্যেই বেশি রেষারেষি ছিল। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনজনে যেন পালা করে হত। ক্লাস সিক্স থেকে মোহিত সরকার আর জয়দেব বোস একসঙ্গে পড়েছেন। অনেক সময় এক বেঞ্চিতেই পাশাপাশি বসতেন দুজন। ফুটবলেও পাশাপাশি স্থান ছিল দুজনের ; মোহিত খেলতেন রাইট-ইন, জয়দেব রাইট-আউট ; তখন মোহিতের মনে হত এই বন্ধুত্ব বুঝি চিরকালের।

কিন্তু স্কুল ছাড়ার পরেই দুজনের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল। মোহিতের বাবা ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক, কলকাতার নাম করা ব্যারিস্টার। স্কুল শেষ করে মোহিত ভাল কলেজে ঢুকে ভাল পাশ করে দু'বছরের মধ্যে ভাল সদাগরি আপিসে চাকরি পেয়ে যায়। জয়দেব চলে যায় অন্য শহরের অন্য কলেজে, কারণ তার বাবার ছিল বদলির চাকরি। তারপর, আশ্চর্য ব্যাপার, মোহিত দেখেন যে তিনি আর জয়দেবের অভাব বোধ করছেন না ; তার জায়গায় নতুন বন্ধু জুটেছে কলেজে। তারপর সেই বন্ধু বদলে গেল যখন ছাত্রজীবন শেষ করে মোহিত চাকরির জীবনে প্রবেশ করলেন। এখন তিনি তাঁর আপিসের চারজন মাথার মধ্যে একজন ; এবং তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হল তাঁরই একজন সহকর্মী। স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে একমাত্র প্রজ্ঞান সেনগুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে ক্লাবে দেখা হয় ; সেও ভাল আপিসে বড় কাজ করে। আশ্চর্য, স্কুলের স্মৃতির মধ্যে কিন্তু প্রজ্ঞানের কোনও স্থান নেই। অথচ জয়দেব—যার সঙ্গে ত্রিশ বছর দেখাই হয়নি—স্মৃতির অনেকটা জায়গা দখল করে আছে। এই সত্যটা মোহিত পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে বেশ ভাল করে বুঝতে পারলেন।

মোহিতের অফিসটা সেন্ট্রাল এভিনিউতে। চৌরঙ্গি আর সুরেন ব্যানার্জির সংযোগস্থলের কাছাকাছি আসতেই গাড়ির ভিড়, মোটরের হর্ন আর বাসের ধোঁয়া মোহিত সরকারকে স্মৃতির জগৎ থেকে হুড়মুড়িয়ে বাস্তব জগতে এনে ফেলল। হাতের ঘড়িটার দিকে চোখ পড়াতে মোহিত বুঝলেন যে তিনি আজ মিনিট তিনেক লেট হবেন।

অফিসের কাজ সেরে সন্ধ্যায় তাঁর লী রোডের বাড়িতে ফিরলেন মোহিত, তখন তাঁর মনে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের স্মৃতির কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। সত্যি বলতে কী, তিনি সকালের টেলিফোনের কথাটাও বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন ; সেটা মনে পড়ল যখন বেয়ারা বিপিন বৈঠকখানায় এসে তাঁর হাতে রুলটানা খাতার পাতা ভাঁজ করে ছেঁড়া একটা চিরকুট দিল। তাতে ইংরিজিতে লেখা—'জয়দেব বোস, অ্যাজ পার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

রেডিওতে বি বি সি-র খবরটা বন্ধ করে মোহিত বিপিনকে বললেন, 'ভেতরে আসতে বল'—আর বলেই মনে হল, জয় এতকাল পরে আসছে, তার জন্য কিছু খাবার আনিয়ে রাখা উচিত ছিল। আপিস-ফেরতা পার্ক স্ট্রিট থেকে কেক-পেস্ট্রি জাতীয় কিছু কিনে আনা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ছিল, কিন্তু খেয়াল হয়নি। তাঁর স্ত্রী কি আর নিজে খেয়াল করে এ কাজটা করেছেন ?

'চিনতে পারছ ?'

গলার স্বর শুনে, আর সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরের অধিকারীর দিকে চেয়ে মোহিত সরকারের যে প্রতিক্রিয়াটা হল সেটা সিঁড়ি উঠতে গিয়ে শেষ ধাপ পেরোনোর পরেই আরেক ধাপ আছে মনে করে পা ফেললে হয়।

চৌকাঠ পেরিয়ে যিনি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর পরনে ছেয়ে রঙের বেখাপ্পা ঢলঢলে সুতির প্যান্টের উপর হাতকাটা সস্তা ছিটের সার্ট দুটির কোনটিও কস্মিনকালে ইস্তিরির সংস্পর্শে এসেছে বলে মনে হয় না। সার্টের কলারের ভিতর দিয়ে যে মুখটি বেরিয়ে আছে তার সঙ্গে অনেক চেষ্টা করেও মোহিত তাঁর স্মৃতির জয়দেবের সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন না। আগন্তুকের চোখ কোটরে বসা, গায়ের রঙ রোদে পুড়ে ঝামা, গাল তোবড়ানো, থুতনিতে অন্তত তিন দিনের কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথার উপরাংশ মসৃণ, কানের পাশে কয়েক গাছা অবিন্যস্ত পাকা চুল। প্রশ্নটা হাসিমুখে করায় ভদ্রলোকের দাঁতের পাটিও দেখতে পেয়েছেন মোহিত সরকার, এবং মনে হয়েছে পান-খাওয়া ক্ষয়ে-যাওয়া অমন দাঁত নিয়ে হাসতে হলে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাসা উচিত।

'অনেক বদলে গেছি, না ?'

'বোসো।'

মোহিত এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সামনের সোফায় আগন্তুক বসার পর মোহিতও তাঁর নিজের জায়গায় বসলেন। মোহিতের নিজের ছাত্রজীবনের কয়েকটা ছবি তাঁর অ্যালবামে আছে ; সেই ছবিতে চোদ্দো বছর বয়সের মোহিতের সঙ্গে আজকের মোহিতের আদল বার করতে অসুবিধা হয় না। তা হলে এঁকে চেনা এত কঠিন হচ্ছে কেন ? ত্রিশ বছরে একজনের চেহারায় এত পরিবর্তন হয় কি ?

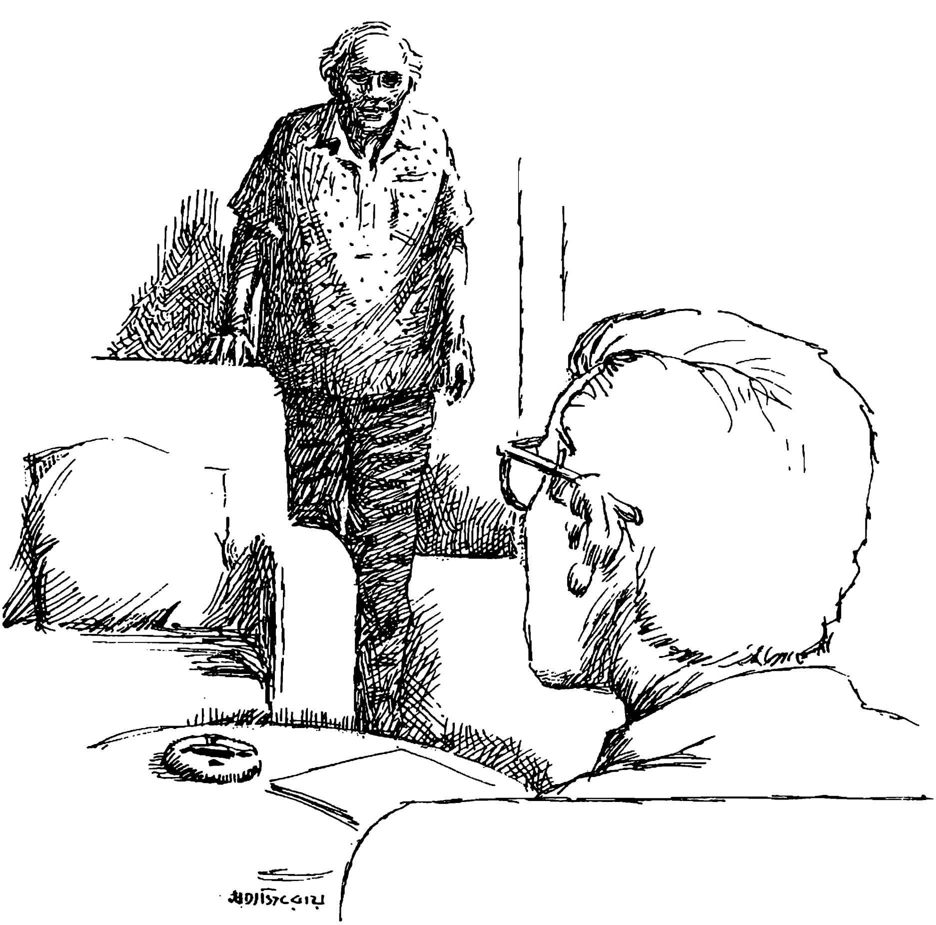

'তোমাকে কিন্তু বেশ চেনা যায়। রাস্তায় দেখলেও চিনতে পারতাম'—ভদ্রলোক কথা বলে চলেছেন—'আসলে আমার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। কলেজে পড়তে পড়তে বাবা মারা গেলেন, আমি পড়া ছেড়ে চাকরির ধান্দায় ঘুরতে শুরু করি। তারপর, ব্যাপার তো বোঝোই। কপাল আর ব্যাকিং এ দুটোই যদি না থাকে তা হলে আজকের দিনে একজন ইয়ের পক্ষে...'

'চা খাবে ?'

'চা ? হ্যাঁ, তা...'

মোহিত বিপিনকে ডেকে চা আনতে বললেন, আর সেই সঙ্গে এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে কেক মিষ্টি যদি নাও থাকে তা হলেও ক্ষতি নেই ; এনার পক্ষে বিস্কুটই যথেষ্ট।

'ওঃ।'—ভদ্রলোক বলে চলেছেন, 'আজ সারাদিন ধরে কত পুরনো কথাই না ভেবেছি, জানো মোহিত !'

মোহিত নিজেও যে কিছুটা সময় তাই করেছেন সেটা আর বললেন না।

'এল সি এম, জি সি এম-কে মনে আছে ?'

মোহিতের মনে ছিল না, কিন্তু বলতেই মনে পড়ল। এল সি এম হলেন পি-টির মাস্টার লালচাঁদ মুখুজ্যে। আর জি সি এম হলেন অঙ্কের স্যার গোপেন মিত্তির।

'আমাদের খাবার জলের ট্যাঙ্কের পেছনটায় দুজনকে জোর করে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে কে বক্স

ক্যামেরায় ছবি তুলেছিল মনে আছে ?'

ঠোঁটের কোণে একটা হাল্‌কা হাসি এনে মোহিত বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর মনে আছে। আশ্চর্য, এগুলো তো সবই সত্যি কথা। ইনি যদি জয়দেব না হন তা হলে এত কথা জানলেন কী করে ?

'স্কুল লাইফের পাঁচটা বছরই আমার জীবনের বেস্ট টাইম, জানো ভাই,' বললেন আগন্তুক, 'তেমন দিন আর আসবে না।'

মোহিত একটা কথা না বলে পারলেন না।

'তোমার তো মোটামুটি আমারই বয়স ছিল বলে মনে পড়ে—'

'তোমার চেয়ে তিন মাসের ছোট।'

'—তা হলে এমন বুড়োলে কী করে ? চুলের দশা এমন হল কী করে ?'

'স্ট্রাগ্‌ল, ভাই স্ট্রাগ্‌ল', বললেন আগন্তুক। 'অবিশ্যি টাকটা আমাদের ফ্যামেলির অনেকেরই আছে। বাপ-ঠাকুর্দা দুজনেরই টাক পড়ে যায় পঁয়ত্রিশের মধ্যে ! গাল ভেঙেছে হাড়ভাঙা খাটুনির জন্য, আর প্রপার ডায়েটের অভাবে। তোমাদের মতো তো টেবিল চেয়ারে বসে কাজ নয় ভাই। কারখানায় কাজ করেছি সাত বছর, তারপর মেডিক্যাল সেলসম্যান, ইনশিওরেন্সের দালালি, এ দালালি, সে দালালি ! এক কাজে টিকে থাকব সে তো আর কপালে লেখা নেই। তাঁতের মাকুর মতো একবার এদিক একবার ওদিক। কথায় বলে—শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়—অথচ তাতে শেষ অবধি শরীরটা গিয়ে কী দাঁড়ায় তা তো আর বলে না। সেটা আমায় দেখে বুঝতে হবে।'

বিপিন চা এনে দিল। সঙ্গে প্লেটে সন্দেশ আর সিঙ্গাড়া। গিন্নীর খেয়াল আছে বলতে হবে। ক্লাস ফ্রেন্ডের এই ছিরি দেখলে কী ভাবতেন সেটা মোহিত আন্দাজ করতে পারলেন না।

'তুমি খাবে না ?' আগন্তুক প্রশ্ন করলেন। মোহিত মাথা নাড়লেন।—'আমি এইমাত্র খেয়েছি।'

'একটা সন্দেশ ?'

'নাঃ, আপ—তুমিই খাও।'

ভদ্রলোক সিঙ্গাড়ায় কামড় দিয়ে চিবোতে চিবোতে বললেন, 'ছেলেটার পরীক্ষা সামনে। অথচ এমন দশা, জানো মোহিত ভাই, ফি-এর টাকাটা যে কোত্থেকে আসবে তা তো বুঝতে পারছি না।'

আর বলতে হবে না। মোহিত বুঝে নিয়েছেন। আগেই বোঝা উচিত ছিল এঁর আসার কারণটা। সাহায্য প্রার্থনা। আর্থিক সাহায্য। কত চাইবেন ? বিশ-পঁচিশ হলে দিয়ে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ না দিলেই যে উৎপাতের শেষ হবে এমন কোনও ভরসা নেই।

'আমার ছেলেটা খুব ব্রাইট, জানো ভাই। পয়সার অভাবে তার পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এ কথাটা ভেবে আমার রাতে ঘুম হয় না।'

দ্বিতীয় সিঙ্গাড়াটাও উঠে গেল প্লেট থেকে। মোহিত সুযোগ পেলেই জয়দেবের সেই ছেলে বয়সের চেহারাটার সঙ্গে আগন্তুকের চেহারা মিলিয়ে দেখছেন, আর ক্রমেই তাঁর বিশ্বাস বদ্ধমূল হচ্ছে যে সেই বালকের সঙ্গে এই প্রৌঢ়ের কোনও সাদৃশ্য নেই।

'তাই বলছিলাম, ভাই,' চায়ে সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন আগন্তুক, 'অন্তত শ'খানেক কি শ'দেড়েক যদি এই পুরনো বন্ধুর হাতে তুলে দিতে পার, তা হলে—'

'ভেরি সরি।'

'অ্যাঁ ?'

টাকার কথাটা উঠলেই সরাসরি না করে দেবেন এটা মোহিত মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলেন। কিন্তু এখন মনে হল ব্যাপারটা এতটা রূঢ়ভাবে না করলেও চলত। তাই নিজেকে খানিকটা শুধরে নিয়ে গলাটাকে আরেকটু নরম করে বললেন, 'সরি ভাই। আমার কাছে জাস্ট নাউ ক্যাশের একটু অভাব।'

'আমি কাল আসতে পারি। এনি টাইম। তুমি যখনই বলবে।'

'কাল আমি একটু কলকাতার বাইরে যাব। ফিরব দিন তিনেক পরে। তুমি রোববার এসো।'

'রবিবার...'

আগন্তুক যেন খানিকটা চুপসে গেলেন। মোহিত মনস্থির করে ফেলেছেন। ইনিই যে জয়, চেহারায় তার কোনও প্রমাণ নেই। কলকাতার মানুষ ধাপ্পা দিয়ে টাকা রোজগারের হাজার ফিকির জানে। ইনি যদি জালিয়াত হন ? হয়তো আসল জয়দেবকে চেনেন। তার কাছ থেকে ত্রিশ বছর আগের বালিগঞ্জ স্কুলের কয়েকটা ঘটনা জেনে নেওয়া আর এমন কী কঠিন কাজ ?

'রবিবার কখন আসব ?' আগন্তুক প্রশ্ন করলেন।

'সকালের দিকেই ভাল। এই নটা সাড়ে নটা।'

শুক্রবার ঈদের ছুটি। মোহিতের আগে থেকেই ঠিক আছে বারুইপুরে এক বন্ধুর বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক গিয়ে উইক-এন্ড কাটিয়ে আসবেন। দুদিন থেকে রবিবার রাত্রে ফেরা ; সুতরাং ভদ্রলোক সকালে এলে তাঁকে পাবেন না। এই প্রতারণাটুকুরও প্রয়োজন হত না যদি মোহিত সোজাসুজি মুখের উপর না করে দিতেন। কিন্তু কিছু লোক আছে যাদের দ্বারা এ জিনিসটা হয় না। মোহিত এই দলেই পড়েন। রবিবার তাঁকে না পেয়ে যদি আবার আসেন ভদ্রলোক, তা হলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করার কোনও অজুহাত বার করবেন মোহিত সরকার। তারপর হয়তো আর বিরক্ত হতে হবে না।

আগন্তুক চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রাখতেই ঘরে আরেকজন পুরুষ এসে ঢুকলেন। ইনি মোহিতের অন্তরঙ্গ বন্ধু বাণীকান্ত সেন। আরও দু'জন আসার কথা আছে, তারপর তাসের আড্ডা বসবে। এটা রোজকার ঘটনা। বাণীকান্ত ঘরে ঢুকেই যে আগন্তুকের দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিলেন সেটা মোহিতের দৃষ্টি এড়াল না। আগন্তুকের সঙ্গে বন্ধুর পরিচয়ের ব্যাপারটা মোহিত অম্লান বদনে এড়িয়ে গেলেন।

'আচ্ছা, তা হলে আসি...' আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়েছেন। 'তুই এই উপকারটা করলে সত্যিই গ্রেটফুল থাকব ভাই, সত্যিই।'

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্তেই বাণীকান্ত বন্ধুর দিকে ফিরে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'এই লোক তোমাকে তুই করে বলছে—ব্যাপারটা কী ?'

'এতক্ষণ তুমি বলছিল, শেষে তোমাকে শুনিয়ে হঠাৎ তুই বলল।'

'লোকটা কে ?'

মোহিত উত্তর না দিয়ে বুক শেল্‌ফ থেকে একটা পুরনো ফোটো অ্যালবাম বার করে তার একটা পাতা খুলে বাণীকান্তর দিকে এগিয়ে দিল।

'একি তোমার ইস্কুলের গ্রুপ নাকি ?'

'বোট্যানিক্‌সে পিকনিকে গিয়েছিলাম', বললেন মোহিত সরকার।

'কারা এই পাঁচজন ?'

'আমাকে চিনতে পারছ না ?'

'দাঁড়াও দেখি।'

অ্যালবামের পাতাটাকে চোখের কাছে নিয়ে বাণীকান্ত সহজেই তাঁর বন্ধুকে চিনে ফেললেন।

'এবার আমার ডানপাশের ছেলেটিকে দেখো তো ভাল করে !'

ছবিটাকে আরও চোখের কাছে এনে বাণীকান্ত বললেন, 'দেখলাম।'

মোহিত বললেন, 'ইনি হচ্ছেন যিনি এইমাত্র উঠে গেলেন।'

'ইস্কুল থেকেই কি জুয়া ধরেছিলেন নাকি ?'—অ্যালবামটা সশব্দে বন্ধ করে পাশের সোফায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রশ্ন করলেন বাণীকান্ত।—'ভদ্রলোককে অন্তত বত্রিশবার দেখেছি রেসের মাঠে।'

'সেটাই স্বাভাবিক', বললেন মোহিত সরকার। তারপর আগন্তুকের সঙ্গে কী কথা হল সেটা সংক্ষেপে বললেন।

'পুলিশে খবর দে', বললেন বাণীকান্ত, 'চোর জোচ্চোর জালিয়াতের ডিপো হয়েছে কলকাতা শহর। এই ছবির ছেলে আর ওই জুয়াড়ি এক লোক হওয়া ইম্‌পসিব্‌ল।'

মোহিত হালকা হাসি হেসে বললেন, 'রোববার এসে আমাকে না পেলেই ব্যাপারটা বুঝবে। তারপর আর উৎপাত করবে বলে মনে হয় না।'

বারুইপুরে বন্ধুর পুকুরের মাছ, পোলট্রির মুরগির ডিম, আর গাছের আম জাম ডাব পেয়ারা খেয়ে, বকুল গাছের ছায়ায় সতরঞ্চি পেতে বুকে বালিশ নিয়ে তাস খেলে শরীর ও মনের অবসাদ দূর করে রবিবার রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরে মোহিত সরকার বিপিন বেয়ারার কাছে শুনলেন যে সেদিন যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তিনি আজ সকালে আবার এসেছিলেন। —'যাবার সময় কিছু বলে গেছেন কি ?'

'আজ্ঞে না,' বলল বিপিন।

যাক্, নিশ্চিন্ত ! একটা সামান্য কৌশল, কিন্তু তাতে কাজ দিয়েছে অনেক। আর আসবে না। আপদ গেছে।

কিন্তু না। আপদ সেদিনের জন্য গেলেও, পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ মোহিত যখন বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, তখন বিপিন আবার একটি ভাঁজ করা চিরকুট এনে দিল তাকে। মোহিত খুলে দেখলেন তিন লাইনের একটি চিঠি।

ভাই মোহিত

আমার ডান পা-টা মচকেছে, তাই ছেলেকে পাঠাচ্ছি। সাহায্য স্বরূপ সামান্য কিছুও এর হাতে দিলে অশেষ উপকার হবে। আশা করি হতাশ করবে না। —

ইতি জয়

মোহিত বুঝলেন এবার আর রেহাই নেই। তবে সামান্য মানে সামান্যই, এই স্থির করে তিনি বেয়ারাকে বললেন, 'ডাক ছেলেটিকে।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই একটি তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের ছেলে দরজা দিয়ে ঢুকে মোহিতের দিকে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করে আবার কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মোহিত তার দিকে মিনিট খানেক চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'বোসো।'

ছেলেটি একটু ইতস্তত ভাব করে একটি সোফার এক কোণে হাত দুটোকে কোলের উপর জড়ো করে বসল।

'আমি আসছি এক্ষুনি।'

মোহিত দোতলায় গিয়ে স্ত্রীর আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে নিয়ে আলমারি খুলে দেরাজ থেকে চারটে পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে একটা খামে পুরে আলমারি বন্ধ করে আবার নীচের বৈঠকখানায় ফিরে এলেন।

'কী নাম তোমার ?'

'শ্রীসঞ্জয়কুমার বোস।'

'এতে টাকা আছে। সাবধানে নিতে পারবে ?'

ছেলেটি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'কোথায় নেবে ?'

'বুক পকেটে।'

'ট্রামে ফিরবে, না বাসে ?'

'হেঁটে।'

'হেঁটে ? কোথায় বাড়ি তোমার ?'

'মির্জাপুর স্ট্রিট।'

'এত দূর হাঁটবে ?'

'বাবা বলেছেন হেঁটে ফিরতে।'

'তার চেয়ে এক কাজ করো। ঘণ্টা খানেক বোসো, চা-মিষ্টি খাও, অনেক বই-টই আছে, দেখো—আমি ন'টায় অফিসে যাব, আমায় নামিয়ে দিয়ে আমার গাড়ি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে। তুমি বাড়ি চিনিয়ে দিতে পারবে তো ?'

ছেলেটি আবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

মোহিত বিপিনকে ডেকে ছেলেটির জন্য চা দিতে বলে আপিসে যাবার জন্য তৈরি হতে দোতলায়

রওনা হলেন।

ভারী হালকা বোধ করছেন তিনি, ভারী প্রসন্ন।

জয়কে দেখে না চিনলেও, তিনি তার ছেলে সঞ্জয়ের মধ্যে তাঁর ত্রিশ বছর আগের ক্লাস ফ্রেন্ডটিকে ফিরে পেয়েছেন।

সন্দেশ, ফাল্গুন ১৩৮৫

সহদেববাবুর পোর্ট্রেট

যেটার আগে নাম ছিল ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, সেই মিরজা গালিব স্ট্রিটে ল্যাজারাসের নিলামের দোকানে প্রতি রবিবার সকালে সহদেববাবুকে দেখা যেতে শুরু করেছে মাস তিনেক হল।

প্রথম অবস্থায় ল্যোকাল ট্রেনে হেঁয়ালির বই, গোপাল ভাঁড়ের বই, খনার বচনের বই, পাঁচালির বই, এইসব বিক্রি করে, তারপর সাত বছর ধরে নানারকম দালালির কাজ করে কমিশনের টাকা জমিয়ে সেই টাকায় ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করে আজ বছর পাঁচেক হল ইলেকট্রিক কেব্‌লের ব্যবসা করে সহদেব ঘোষ আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে সদানন্দ রোডে তাঁর একটি ছিমছাম ফ্ল্যাট, একটা ফিয়াট গাড়ি, টেলিফোন, টেলিভিশন, দুটো চাকর, একটা ঠাকুর আর একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর। আগে যারা তাঁর খুব কাছের লোক ছিল, তারা এখন তাঁকে দেখলে চট্‌ করে চিনতে পারে না, বা চিনলেও সাহস করে এগিয়ে এসে কথা বলে না। সহদেববাবুরও খুব ইচ্ছে নেই যে তারা তাঁকে চেনে; তাই তিনি গোঁফ রেখেছেন, ঝুলপিটা এক ইঞ্চি বাড়িয়েছেন, আর চোখ খারাপ না হওয়া সত্ত্বেও একটা পাওয়ারবিহীন সোনার চশমা নিয়েছেন। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নতুন বন্ধু জুটেছে, যাঁরা তাঁর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় এসে ভাল চা ভাল সিগারেট খান, প্লাস্টিকের তাসে তিন-তাস খেলেন, আর শনি-রবিবার টেলিভিশনে হিন্দি-বাংলা ছবি দেখেন।

ল্যাজারাসের দোকানে যাওয়ার কারণটা সহদেববাবুর বৈঠকখানায় গেলেই বোঝা যায়। প্রতি রবিবারই তিনি ঘরের শোভা বাড়ানোর জন্য নিলাম থেকে কিছু-না-কিছু শৌখিন জিনিস কিনে আনেন। ঘড়ি, ল্যাম্প, পিতল আর চীনে মাটির মূর্তি, রুপোর মোমবাতিদান, বিলিতি ল্যান্ডস্কেপ ছবি—ঘরের এ সব কিছুই ল্যাজারাসের দোকান থেকে আনা। এ ছাড়া টেবিল, চেয়ার, সোফা, কার্পেট ইত্যাদি তো আছেই।

আজ ল্যাজারাস কোম্পানির মিহিরবাবু কথা দিয়েছেন যে বিলিতি ঔপন্যাসিকদের ভাল এক সেট বই তিনি সহদেববাবুর জন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। মিহিরবাবু অভিজ্ঞ লোক, বিশ বছর আছেন ল্যাজারাস কোম্পানিতে। বাঁধাধরা খদ্দেরদের চাহিদাগুলো তিনি আগে থেকে আন্দাজ করতে পারেন। সহদেববাবুর পছন্দও তাঁর ভালভাবেই জানা। এর আগেও অনেক হঠাৎ-বড়লোকের চাহিদা তিনি মিটিয়েছেন। এঁরা অনেকেই যে লেখাপড়া বিশেষ না জানলেও ঝলমলে বিলিতি বই দিয়ে আলমারি সাজাতে ভালবাসেন সেটা মিহিরবাবু বিলক্ষণ জানেন।

ষোলোখানা বইয়ের সুদৃশ্য সেট, গাঢ় লাল চামড়ায় বাঁধানো, সহদেববাবুর দেখেই মনটা নেচে উঠেছিল। কিন্তু সেটা দেখার পরমুহূর্তেই, বইগুলো যে-টেবিলের উপর রাখা ছিল, তার পিছনেই দেয়ালে টাঙানো গিলটি করা ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি দেখে তিনি কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়ে বইয়ের কথাটা সাময়িকভাবে ভুলেই গেলেন।

ছবিটা একটা অয়েল পেন্টিং। একজন বাঙালি ভদ্রলোকের পোর্ট্রেট। সাইজে আন্দাজ তিন ফুট বাই চার ফুট। সেটা যে বেশ পুরনো, সেটা তার ধূলিমলিন অবস্থা থেকে যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় ছবিতে দেখানো অনেক খুঁটিনাটি জিনিস থেকে। গড়গড়া, কেরোসিনের ল্যাম্প, রুপোর

পানের ডিবে, হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা ছড়ি—এ সবই চলে-যাওয়া দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। তা ছাড়া বাবুর পরনে গিলে করা একপেশে বোতামওয়ালা পাঞ্জাবি, ঘন কাজ করা কাশ্মীরি শাল, চুনট করা চওড়া পেড়ে ধুতি, এ সবই বা আজকের দিনে কে পরে ? যে কালের ছবি, সেকালে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালিই আর্টিস্টদের দিয়ে নিজেদের ছবি আঁকিয়ে বাড়িতে টাঙিয়ে রাখতেন ; কাজেই তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যেটা সহদেববাবুকে অবাক করল, সেটা হল ভদ্রলোকের মুখ—'কেমন দেখছেন ?' সহদেববাবুর দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন মিহিরবাবু—'একেবারে আপনার মুখ বসানো—তাই নয় কি ?'

সেটা সহদেববাবুরও মনে হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাসটাকে পাকা করার জন্য হাতের কাছে বিক্রির জন্য রাখা একটা বাহারের আয়নায় নিজের মুখটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'সত্যিই তো। এ কার ছবি মশাই ?'

মিহিরবাবু জানেন না। বললেন, 'একটা লট এসেছে চিৎপুরের এক পুরনো বাড়ির গুদাম থেকে। এখন সে বাড়িতে গেঞ্জির কারখানা বসেছে। অনেক জিনিসের মধ্যে এটাও ছিল।'

'কার ছবি জানেন না ?' আবার জিজ্ঞেস করলেন সহদেববাবু।

'উহুঁ। দেখামাত্র আপনার কথা মনে হয়েছে। কোনও জমিদার-টমিদার হবে। তবে আর্টিস্ট নাকি নাম-করা। শৈলেশ চাটুজ্যে, এলগিন রোডে থাকেন, আর্ট নিয়ে লেখেন-টেখেন, তিনি এই কিছুক্ষণ আগে এসে দেখে বললেন, পরেশ গুঁই-এর নাকি এককালে সুনাম ছিল।'

ছবির ডান দিকের কোণে লাল রঙে লেখা শিল্পীর নামটা সহদেববাবুর দৃষ্টি এড়ায়নি। 'এটাও অকশন হবে নাকি ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কেন, চাই আপনার ?'

আশ্চর্য, সহদেব ঘোষের অনেক শখের মধ্যে একটা বড় শখ ছিল নিজের একটা পোর্ট্রেট আঁকানো। ল্যাজারাসেই একদিন একটা তেল-রঙে আঁকা পুরনো পোর্ট্রেট দেখে শখটা মাথায় চাপে। কথাটা মিহিরবাবুকে বলাতে তিনিও উৎসাহ দিয়েছিলেন। —'এ একটা নতুন জিনিস হবে মশাই। আজকাল আর এটার রেওয়াজই নেই ; অথচ পাকা হাতে আঁকা একখানা বেশ বড় সাইজের পোর্ট্রেট আঁকিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখলে সে-ঘরের চেহারাই পালটে যায়। আর এ সব ছবির আয়ু কতদিন ভাবতে পারেন ? আর্ট গ্যালারিতে এখনও চারশো পাঁচশো বছরের পুরনো অয়েল পেন্টিং-এর জেল্লা দেখলে মনে হবে কালকের আঁকা।'

কোনও আর্টিস্টের সঙ্গে পরিচয় নেই, এমন কী শিল্প জগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই বলে সহদেববাবু শেষটায় আনন্দবাজার আর যুগান্তরে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। প্রতিবেশী সাংবাদিক সুজয় বোস বাতলে দিয়েছিলেন বিজ্ঞাপনের ভাষা—'তৈলচিত্রে প্রতিকৃতি-অঙ্কনে পারদর্শী শিল্পীর প্রয়োজন। প্রশংসাপত্রসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায়' ইত্যাদি।

একজন শিল্পীর দরখাস্ত দেখে তাকে বাড়িতে ডেকে পাঠান সহদেববাবু। বছর পঁচিশেক বয়স, নাম কল্লোল, কল্লোল দাশগুপ্ত। গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্টস থেকে পাশ করে রোজগারের চেষ্টা করছে। ছাত্র ভাল ছিল তার প্রমাণ রয়েছে সার্টিফিকেটে। কিন্তু ছেলেটির চুল দাড়ি গোঁফের বহর, ঢলঢলে প্যান্ট আর উগ্র বেগুনি রঙের সার্ট দেখে সহদেববাবু ভরসা পাননি। অতিরিক্ত অভাবী বলেই বোধহয় বারণ সত্ত্বেও ছেলেটি আরও দুবার এসেছিল, কিন্তু সহদেববাবুর মন ভেজেনি। যার চেহারা এত অপরিষ্কার তার ছবির হাত পরিষ্কার হবে কী করে ?

শেষ পর্যন্ত এক ব্যবসায়ী বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করে এক ভদ্র চেহারাসম্পন্ন আর্টিস্টকে ডেকে দু'দিন সিটিংও দিয়েছিলেন সহদেববাবু। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে যখন দেখলেন যে তাঁর চেহারাটা ছবিতে তাঁর নিজের মতো না হয়ে নিউ মার্কেটের প্যারাডাইজ স্টোর্স-এর ব্রজেন দত্তর মতো হয়ে যাচ্ছে, তখন বাধ্য হয়ে আর্টিস্টের হাতে পাঁচটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে তাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

মিহিরবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সহদেববাবু বললেন, 'কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও তো ভাল আর্টিস্ট পেলাম না, অথচ এ যেন আমারই জন্য তৈরি !—তাই ভাবছিলাম, মানে...'

'তা হলে আপনার জন্য রেখে দিই ছবিটা ?'

'কী রকম ইয়ে হবে ?'

'দাম ? দেখি কত কমে পারি। তবে ওই যে বলছিলাম—আর্টিস্টের নাম ছিল এককালে।'

শেষ পর্যন্ত সাড়ে সাতশো টাকায় এই অজ্ঞাতপরিচয় বাঙালি বাবুর ছবিটি কিনে এনে সহদেব ঘোষ তাঁর বৈঠকখানায় সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে এমন একটা জায়গায় দেয়ালে স্থান দিলেন। ঘরের চেহারা সত্যিই ফিরে গেল। জবরদস্ত শিল্পী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কাশ্মীরি শালের প্রত্যেকটি কলকা কত ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে আঁকা ; ডান হাতের অনামিকায় আংটির হিরেটি যেন জ্বলজ্বল করছে ; গড়গড়ার রুপোর কলকেটি যেন এইমাত্র পালিশ করা।

বলা বাহুল্য সহদেববাবুর বন্ধুরাও ছবিটি দেখে থ' মেরে গেলেন। প্রথমে সবাই ভেবেছিলেন যে সহদেব বুঝি কোনও ফাঁকে কোনও শিল্পীর স্টুডিওতে গিয়ে ছবিটা আঁকিয়ে এনেছেন। তারপর আসল ঘটনাটা শুনে তাদের সকলের চোখ ছানাবড়া। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের প্রত্যেকেরই নাক চোখ কান ঠোঁট মুখের মোটামুটি একই জায়গায় থাকা সত্ত্বেও এক যমজ ভাই-বোন ছাড়া দু'জনের চেহারায় এতটা সাদৃশ্য কোথায় চোখে পড়ে ? সত্যনাথ বকশী তো সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল 'ইনি তোমার কোনও পূর্বপুরুষ নন তো ?' সেটা অবিশ্যি সম্ভব না, কারণ সহদেবের পূর্বপুরুষদের মধ্যে গত একশো বছরে কেউই পয়সা করেননি। ঠাকুরদাদা ছিলেন রেল স্টেশনের টিকিটবাবু, আর প্রপিতামহ ছিলেন জমিদারি সেরেস্তায় সামান্য কেরানি।

নন্দ বাঁড়ুজ্যের রহস্য উপন্যাস পড়ার বাতিক, সে নিজেকে একটি ছোটখাটো গোয়েন্দা হিসেবে কল্পনা করতে ভালবাসে। সে বলল, 'এই বাবুটির পরিচয় খুঁজে না বার করা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। ওই হিরের আংটিটার মধ্যে আমি একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। নিতাইদা'র কাছে চার ভল্যুম বংশ-পরিচয় আছে। বাংলার জমিদারদের নাড়ী-নক্ষত্র তাতে জানা যায় ; ছবিও আছে অনেকগুলো।'

সেদিন আর তাসের আড্ডা জমল না। এই ধরনের কাকতালীয় ঘটনা আর কার কী জানা আছে সেই সব গল্প করে সন্ধেটা কেটে গেল।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে সহদেব অনুভব করলেন যে ছবিটা দিনের বেলায় বৈঠকখানায় থাকলেও, রাত্রে শোবার ঘরে রাখলে ভাল হয়। আর সেই সঙ্গে যদি ছবিটির মাথার উপর একটা ব্লু-লাইটের ব্যবস্থা করা যায়—যেমন ট্রেনের কামরায় থাকে—আর সেটা যদি সারারাত জ্বালিয়ে রাখা যায়, তা হলে ঘুমেরও ব্যাঘাত হবে না, অথচ মাঝ রাত্রে ঘুম ভাঙলেই ছবিটা চোখে পড়বে।

এই কাজটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকিয়ে পরের দিনই করিয়ে ফেললেন সহদেববাবু।

ছবিটা পাবার তিন দিনের মধ্যেই সহদেববাবু তাঁর ঝুলপিটা ইঞ্চিখানেক কমিয়ে নিলেন, কারণ ঝুলপিতেই ছবির চেহারার সঙ্গে বেমিল ছিল। হাতের নখ নিয়মিত না-কাটার ফলে বেয়াড়া রকম বেড়ে যেত সহদেববাবুর ; ছবির বাবুর হাতের নখ গোড়া অবধি পরিষ্কার করে কাটা, তাই সহদেববাবু নিজের নখের যত্ন নিতে আরম্ভ করলেন। পানের অভ্যাস ছিল না ; ছবির মতো পানের ডিবে কিনে চাকরকে দিয়ে খিলি পান সাজিয়ে ডিবেয় পুরে পকেটে নিয়ে কাজে বেরোতে শুরু করলেন। গেঁয়ো মানুষ ছোট অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন বলেই আদব-কায়দার দিকটা সহদেববাবুর একেবারেই জানা ছিল না। এই সম্ভ্রান্ত ঘরের বাবুর ছবির প্রভাব ক্রমে তাঁর হাবেভাবে একটা পালিশ এনে দিতে শুরু করল। লালবাজারের আপিসে বসে যতক্ষণ কাজ করেন ততক্ষণ কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। টেরিলিনের সার্ট আর টেরিকটের প্যান্ট পরে আপিসে যান, গোল্ড ফ্লেক সিগারেট খান, দিনে তিনবার চা আর দুপুরে সীতানাথের দোকান থেকে আনা পুরি-তরকারি আর জিলিপি খান। এ সব অভ্যেস অনেক দিনের। কিন্তু কাজের শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে তিনি আর ঠিক আগের মানুষ থাকেন না। হাঁটাচলার ভঙ্গি, কথা বলার ঢং, তাকিয়া কোলে নিয়ে বাবু হয়ে বসার কায়দা, চাকরকে হাঁক দিয়ে ডাকার মেজাজ, এ সবই নতুন। এ সব অবিশ্যি বন্ধুদের দৃষ্টি এড়ায় না। তারা বলে, 'ছবির বাবুর প্রভাব তোমার উপর যেভাবে পড়ছে, তোমাকে তো ফ্ল্যাটবাড়ি ছেড়ে চক-মিলানো বাড়ি দেখতে হচ্ছে !' সহদেববাবু মৃদু হাসেন, কোনও মন্তব্য করেন না।

ছবির বাবুর সবচেয়ে বেশি কাছে মনে হয় নিজেকে যখন সহদেববাবু রাত্রে ঘরে ঢুকে অন্য সব বাতি নিভিয়ে কেবল নীল আলোটা জ্বালিয়ে খাটে শোন। তখন সত্যি মনে হয় ওই বাবু আর তিনি একই ব্যক্তি।

আর তখনই মনে হয় ওই রকম একপেশে সোনার বোতামওয়ালা পাঞ্জাবি, ওই বাহারের চওড়া লালপেড়ে ধুতি ওই রকম কাজ করা কাশ্মীরি শাল, ওই চেয়ার, ওই গড়গড়া, ওই হিরের আংটি, ওই হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা ছড়ি, এ সবই তাঁর চাই।

আর সবই একে একে জোগাড়ও হল।

ছড়ি আর চেয়ার দিলেন মিহিরবাবুই। চিৎপুর থেকে লোক ডাকিয়ে স্পেশাল গড়গড়া তৈরি হল ছবির সঙ্গে মিলিয়ে। সেই সঙ্গে ভাল অম্বুরি তামাক আনিয়ে সেটা খাবার অভ্যেসও তৈরি হল। ছবির মতো পাঞ্জাবি তৈরি করার কোনও অসুবিধা নেই, আর তার জন্য সোনার বোতামও কেনা হল।

শালটা জোগাড় হল এক বৃদ্ধ কাশ্মীরি শালওয়ালার কাছ থেকে।

নাদির শা শালওয়ালা গত শীতে সহদেববাবুর বাড়িতে এসেছিলেন হরেক রকম শাল সঙ্গে নিয়ে। সহদেববাবু কিছু কেনেননি। এবার শীত পড়তেই এক রবিবার সকালে শালওয়ালা আবার এসে হাজির। সহদেববাবু তাকে ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'ঠিক এমনি একখানা শাল জোগাড় করে দিতে পারেন ?'

নাদির শা তৈরি চোখে ছবির দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'এমন জামেওয়ার তো চট করে পাওয়া যায় না আজকের দিনে। তবে টাইম দিলে খোঁজ করে দেখতে পারি।'

সেই জামেওয়ারও চলে এল তিন সপ্তাহের মধ্যে। রঙে সামান্য বেমিল ; তবে আসল শালের রঙ কেমন ছিল কে বলবে ? একে তো পুরনো ছবি, রঙ বদলে যেতে পারে, তা ছাড়া আর্টিস্টের তেল রঙ আর আসল শালের রঙে কোনও তফাত নেই একথা জোর দিয়ে কে বলতে পারে ?

'কত দাম ?' জিজ্ঞেস করলেন সহদেববাবু।

'আপনার জন্য স্পেশাল রেট। সাড়ে চার।'

'সাড়ে চারশো ?'—আজকের দিনে ভাল কাশ্মীরি শালের দাম সম্পর্কে সহদেববাবুর কোনও ধারণাই নেই।

'নো স্যার', চোখের কোণে খাঁজ ফেলে মৃদু হেসে বললেন নাদির শা—'ফোর থাউজ্যান্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড।'

স্পেশাল রেট আর কমল না। নাদির শাকে সাড়ে চার হাজার টাকার একটা চেক লিখে দিলেন সহদেব ঘোষ।

ছবির সঙ্গে মেলানো চেয়ার, শ্বেত পাথরের তেপায়া টেবিল, ঘষা কাচের ডোমওয়ালা কেরোসিন ল্যাম্প আর শেক্সপিয়রের বই কেনার পরেও একটা জিনিস বাকি রইল।

সেটা হল বাবুর ডান হাতের অনামিকার হিরের আংটিটা।

সহদেব ঘোষ একবার নৈহাটি গিয়ে বিখ্যাত জ্যোতিষী দুর্গাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে তাঁর ভাগ্য গণনা করিয়ে এনেছিলেন। তখন তিনি সবে ব্যবসায় নেমেছেন, কপালে কী আছে জানা নেই। জ্যোতিষী সহদেবের অভাবনীয় আর্থিক সাফল্যের কথা গণনা করে একটা কাগজ লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু আট বছরের মধ্যেই যে ব্যবসায় এমন দুর্যোগ দেখা দেবে তার কোনও উল্লেখ সে কাগজে ছিল না। আজ সেই কাগজটিকে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে জানালার বাইরে ছুড়ে ফেলে দিলেন সহদেববাবু।

কারণ আর কিছুই নয়, গত এক মাসের মধ্যে দুটো বড় অর্ডার বাতিল হয়ে যাওয়ায় সহদেবের বেশ কয়েক লাখ টাকা লোকসান করিয়ে দিয়েছে।

অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে শুরু করলেও, সহদেবকে কোনওদিন পড়তির গ্লানি ভোগ করতে হয়নি। নীচ থেকে ধীরে ধীরে সমানে তিনি ওপরের দিকেই উঠেছেন। অর্থাৎ সবটাই চড়াই, উৎরাই নেই। কিন্তু আজ হঠাৎ উৎরাইয়ের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা তাঁকে দিশেহারা করে দিল।

আর এই অবস্থাটা যে সাময়িক, তেমন কোনও ভরসাও তিনি পেলেন না।

এই অবস্থায় একজন জ্যোতিষীর উপর আস্থা হারালেও অন্য আরেকজনের কাছে যাবার লোভ সামলাতে পারলেন না সহদেব ঘোষ। ভবানীপুরে গিরীশ মুখার্জি রোডের নারায়ণ জ্যোতিষীকে গিয়ে ধরে পড়লেন তিনি।

নারায়ণ জ্যোতিষীর গণনা করতে লাগল সাড়ে চার মিনিট। সহদেবের চরম দুর্দিন দেখা দিয়েছে। অপগ্রহের প্রভাব চলবে গোটা বছরটাই। এবং কোনও এক ব্যক্তি, যার উপর সহদেব

বিশ্বাস রেখেছিলেন, তিনি প্রতারকের কাজ করছেন। এই ব্যক্তি যে কে, সেটা ভেবে বার করার কোনও প্রয়োজন বোধ করলেন না সহদেববাবু। এমন কেউ করতে পারে সেটা আগে জানলে বরঙ সাবধান হতে পারতেন। ব্যবসায় নেমে অনেকের উপরই বিশ্বাস রাখতে হয়েছে তাঁকে, তাদের মধ্যে কে ল্যাঙ মেরেছে সেটা এখন জেনে কী লাভ ? আসল কথা, তাঁর সর্বনাশ হয়েছে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে।

প্রথমেই গেল ফিয়াট গাড়িটা। চার বছর আগে চৌত্রিশ হাজার টাকায় কেনা গাড়িটা বারো হাজারে বিক্রি করতে হল সহদেববাবুকে।

দুর্দিনের বন্ধুই খাঁটি বন্ধু, এমন একটা প্রবাদ ইংরিজিতে আছে। সহদেববাবুর তিনজন বন্ধুর মধ্যে একজনই দেখা গেল সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। নন্দ বাঁড়ুজ্যে সেই যে বলেছিলেন ছবির বাবুর পরিচয় খুঁজে বার করবেন, সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত সুবিধা করে উঠতে পারেননি। বংশ পরিচয়ের চার খণ্ডের এক খণ্ডে সেলিমগঞ্জের জমিদার ভূতনাথ চৌধুরীর ছবির সঙ্গে আর সব কিছু মোটামুটি মিলে গেলেও, মুখ একেবারেই মেলেনি। নন্দ পাশে থাকাতে এই সংকটের অবস্থাতেও সহদেববাবু তবু সামলে আছেন ; না হলে কী হত বলা যায় না।

এই নন্দ বাঁড়ুজ্যেই একদিন সহদেবকে বললেন কথাটা।

'ছবিটা বিদায় করো ভাই। আমার বিশ্বাস ওটাই নষ্টের গোড়া। আর সত্যি বলতে কী, এখন তোমার যা চেহারা হয়েছে, তার সঙ্গে ওটার মিল সামান্যই।'

হাতে আয়না নিয়ে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের সঙ্গে মিলিয়ে সহদেববাবুরও যে কথাটা মনে হয়নি তা নয়। গত দু'মাসেই কানের দু'পাশে পাকা চুল দেখা দিয়েছে, চোখের তলায় কালি পড়েছে, গাল বসেছে, চামড়ার মসৃণতা চলে গিয়েছে। অথচ ছবির বাবুর কোনও বিকার নেই।

'ওই ল্যাজারাসেই আবার গিয়ে ফেরত দাও ছবিটা,' বললেন নন্দ বাঁড়ুজ্যে। 'তোমাকে তো বলেছিল আর্টিস্টের বেশ নামডাক আছে। খদ্দের মিলে যাবে। আপদ বিদেয় হবে, পয়সাও কিছু আসবে ঘরে।'

সেই রাত্রে ঘরের বাতি নিভিয়ে নীল বাতি জ্বেলে ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সহদেববাবুর মনে যে ভাবটা এল, সেটা আগে কখনও আসেনি। সেটা আতঙ্কের ভাব। বাবুর ঠোঁটের কোণে হাসিটাকে এতদিন প্রসন্ন বলে মনে হয়েছে, এখন মনে হচ্ছে পৈশাচিক। দৃষ্টিটাও সোজা তাঁরই দিকে হওয়াতে মনে হয় হাসিটা বুঝি তাঁকেই উদ্দেশ করে হাসা। কী আশ্চর্য—কবেকার কোথাকার এক বাবু, সেই বাবুর ছবি আঁকলেন আদ্যিকালের শিল্পী পরেশ গুঁই, আর সেই ছবিই কিনা তাঁর বাড়িতে এসে তাঁর জীবনটাকে এমনভাবে তছনছ করে দিল ? ছবির দামের বাইরে কত টাকা তাঁর খরচ হয়েছে এটা কেনার দরুন সেটা ভাবতে সহদেববাবু শিউরে উঠলেন। তাও তো সামর্থ্য ছিল না বলে হিরের আংটিটা কেনা হয়নি ; সেটার পিছনে আবার...

আর ভাবতে পারলেন না সহদেববাবু। নীল বাতি নিভিয়ে দিয়ে খাটে শুয়ে স্থির করে ফেললেন কালই সকালে ট্যাক্সি করে ল্যাজারাসে গিয়ে ছবিটা ফেরত দিয়ে আসবেন।

* * *

'গুড মর্নিং স্যার ! ওটা কী বয়ে আনলেন ?'

প্রায় এক বছর পরে মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা হল। আজ অবিশ্যি রবিবার না, তাই নিলামের কোনও তোড়জোড় নেই। সহদেববাবু তিনটে বাংলা খবরের কাগজ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে মোড়া ছবিটাকে মেঝেতে নামিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছে মিহিরবাবুকে ব্যাপারটা বললেন। অবিশ্যি আসল কারণটা তো আর বলা যায় না, তাই বললেন, 'ছবিটা দেখে সবাই ঠাট্টা করে মশাই। বলে, "জমিদারি প্রথা কোনকালে উঠে গেল, আর তোমার কিনা হঠাৎ জমিদার সেজে ছবি আঁকার শখ হল ?"—শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তাই ফেরত দেওয়া স্থির করলাম। দেখবেন যদি কেউ কেনে-টেনে। অবিশ্যি পড়ে থাকলেও ক্ষতি নেই।'

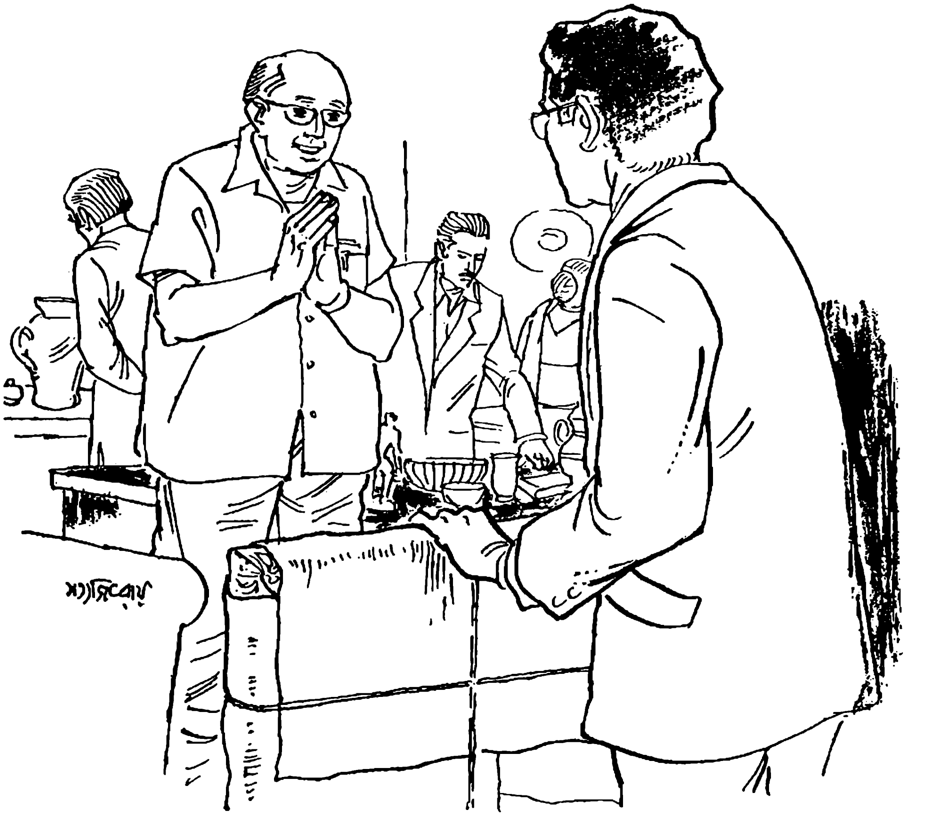

'ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখলুম ? গাড়ি কী হল ?'

'কারখানায়। আসি...'

সহদেববাবু চলে যাবার পর টেলিফোনের বই দেখে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নম্বর বার করে ভাইপোকে একটা ফোন করলেন মিহিরবাবু। ভাইপোর ছবির এগজিবিশন হচ্ছে সেখানে। বড় পেয়ারের ভাইপো এটি।

'কে, কল্লোল ? আমি মিহিরকাকা। শোন্, তোর প্রথম রোজগার করিয়ে দিয়েছিলুম কী ভাবে মনে আছে ?...মনে নেই ? সেই যে সদানন্দ রোডের এক ভদ্রলোক পোর্ট্রেট আর্টিস্টের জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন, তুই গেলে তোকে খেদিয়ে দিলেন, আর তুই মন থেকে পোর্ট্রেট করলি জমিদারের পোশাক পরিয়ে ?...হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ছবি আবার ফেরত এসেছে, বুঝেছিস ? তুই এক সময় এসে নিয়ে যাস। দোকানে অনেক মাল, রাখার জায়গা নেই।'

টেলিফোনটা রেখে মিহিরবাবু খদ্দেরের দিকে মন দিলেন। অ্যারন সাহেব এসেছেন সেই দাবার সেটটার খোঁজে। সেটাকে আবার দেড়শো বছর আগে বর্মায় তৈরি বলে চালাতে হবে।

সন্দেশ, চৈত্র ১৩৮৫

মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি

মিঃ শাসমল আরাম কেদারাটায় গা এলিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মোক্ষম জায়গা বেছেছেন তিনি—উত্তর বিহারের এই ফরেস্ট বাংলো। এর চেয়ে নিরিবিলি নিরাপদ নিরুপদ্রব জায়গা আর হয় না। ঘরটিও দিব্যি। সাহেবি আমলের মজবুত, সুদৃশ্য টেবিল চেয়ার সাজানো, প্রশস্ত খাটে বালিশ বিছানা তক্‌তকে পরিষ্কার, ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমটিও বেশ বড়। পশ্চিমের জানালাটা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে, আর সেই সঙ্গে আসছে ঝিঁঝির একটানা শব্দ। বিজলি না থাকলেও কোনও ক্ষতি নেই ; কলকাতার লোড শেডিং-এ কেরোসিনের আলোয় পড়ার অভ্যাস হয়ে গেছে। বাংলোর আলোতে সাদা কাচের শেড থাকার ফলে তাঁর কলকাতার আলোর চেয়ে বেশি বলেই মনে হচ্ছে। সঙ্গে বই আছে—গোয়েন্দা উপন্যাস ; মিঃ শাসমলের প্রিয় পাঠ্য।

এক চৌকিদার ছাড়া বাংলোয় অন্য কোনও বাসিন্দা নেই। অর্থাৎ আর কারুর মুখ দেখতে হবে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতে হবে না। চমৎকার। কলকাতার ট্যুরিস্ট আপিসে গিয়ে দশদিন আগে থেকে বলে এসেছিলেন এই বাংলোর কথা ; দিন চারেক আগে মিঃ শাসমল তাদের কাছ থেকে চিঠিতে জানেন যে ঘর বুক করা হয়ে গেছে। অন্তত তিনটে দিন এখানে থেকে তারপর অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবা যাবে। সঙ্গে টাকা আছে যথেষ্ট ; মাসখানেক চালিয়ে নেওয়া যাবে অক্লেশে। নিজের গাড়ি আছে সঙ্গে ; স্বভাবতই তিনি নিজেই চালিয়ে এসেছেন এই সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার পথ।

চৌকিদার তার কথামতো সাড়ে নটায় ডিনার দিয়ে দিল। হাতের রুটি অড়হরের ডাল, একটা তরকারি আর মুরগির কারি। ডাইনিং রুমেও সাহেবি আমলের চিহ্ন রয়েছে। টেবিল, চেয়ার, চীনেমাটির পাত্র, বাহারের সাইনবোর্ড—সবই সেই কালের।

'এখানে মশা আছে কি ?' খেতে খেতে প্রশ্ন করলেন মিঃ শাসমল। কলকাতায় যে অঞ্চলে তাঁর ফ্ল্যাট, সেখানে মশা নেই। আজ বছর দশেক হল মশারির অভ্যেসটা চলে গেছে। ওটা ব্যবহার না করতে পারলে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

চৌকিদার জানাল যে শীতকালে মশা হয়, তবে এসময়টা অর্থাৎ এপ্রিলে, মশারির দরকার না হওয়ারই কথা। অবিশ্যি স্টকে আছে মশারি, সাহেবের দরকার হলে খাটিয়ে দেবে। চৌকিদার আরও বলল যে রাত্রে দরজা বন্ধ করে শোয়াই ভাল। চারিদিকে জঙ্গল ; আর কিছু না হোক, শেয়াল-টেয়াল ঢুকে পড়তে পারে ঘরে ! মিঃ শাসমল অবিশ্যি নিজেই ঠিক করেছিলেন যে দরজা বন্ধ রাখবেন।

খাওয়ার পর ডাইনিং রুম থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে জঙ্গলের দিকে ফেললেন মিঃ শাসমল। শাল গাছের গুঁড়ির উপর পড়ল আলো। তারপর আলোটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখলেন কোনও জানোয়ার-জাতীয় কিছু দেখা যায় কি না। চোখে পড়ল না কিছুই। নিস্তব্ধ বন, ঝিঁঝি ডেকে চলেছে অবিরাম।

'বাংলোয় ভূত-টুত আছে নাকি হে !' হালকা ভাবে প্রশ্ন করলেন মিঃ শাসমল। চৌকিদার খাবার সরঞ্জাম তুলে নিয়ে তার ঘরের দিকে যাচ্ছিল, সে খালি একটু হেসে জানিয়ে দিল যে সে এখানে পঁয়ত্রিশ বছর আছে, বহু লোক এই বাংলোয় থেকে গেছে, কেউ কোনওদিন ভূত দেখেনি। কথাটা শুনে মিঃ শাসমল আরও খানিকটা হালকা বোধ করলেন।

ডাইনিং রুমের পর একটা ঘর ছেড়েই তাঁর নিজের ঘর। তাই আর খেতে যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করেননি ; ঘরে ঢুকে বুঝলেন বন্ধ রাখলেই ভাল ছিল। এই ফাঁকে কখন জানি একটা কুকুর ঢুকে পড়েছে। নেড়ি কুকুর। সাদার উপর বাদামি ছোপ, রুগ্‌ণ, হাড় বার করা চেহারা।

'অ্যাই—ভাগ্‌, ভাগ্‌—নিকালো হিঁয়াসে !'

কুকুর ঘরের এক কোণে বসে আছে ; ধমকে কোনও কাজ হল না। যেন এই ঘরেই রাত কাটাবে এমন একটা ভাব নিয়ে বসে রইল।

'অ্যাই কুত্তা—ভাগ্‌, ভাগ্‌ !'

এবারে কুকুরটা মিঃ শাসমলের দিকে দাঁত খিঁচিয়ে দিল।

মিঃ শাসমল দু'পা পিছিয়ে এলেন। ছেলেবেলায় যখন বেকবাগানে থাকতেন তখন একজন প্রতিবেশীর ছেলেকে পাগলা কুকুরে কামড়ায় ; ফলে ছেলেটির হয় জলাতঙ্ক। মিঃ শাসমলের স্মৃতিতে সেটা একটা বিভীষিকার আকার ধারণ করে আছে। দাঁত খিঁচোনো কুকুরের দিকে এগোনোর হিম্মৎ তাঁর নেই।

আড় দৃষ্টি কুকুরের দিকে রেখে মিঃ শাসমল ঘর থেকে বারান্দায় বেরোলেন।

'চৌকিদার।'

'বাবু !'

'একবার এদিকে এসো তো।'

চৌকিদার গামছা দিয়ে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল।

'আমার ঘরে একটা কুকুর ঢুকেছে ; ওটাকে তাড়াও তো।'

'কুত্তা ?'—চৌকিদার যেন ভারী অবাক হয়েছে বলে মনে হল।

'কেন, কুকুর নেই নাকি এ তল্লাটে ? তুমি আকাশ থেকে পড়লে যে। ঘরে এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

চৌকিদার মিঃ শাসমলের দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকল।

'কাঁহা হ্যায় কুত্তা, বাবু ?'

মিঃ শাসমলও ঢুকলেন তার পিছন পিছন। সত্যিই তো, এই দু'মিনিটের মধ্যেই কুকুর ভেগেছে। তাও নিশ্চিন্ত হবার জন্য চৌকিদার খাটের তলা এবং পাশের বাথরুমটা দেখে নিল।

'নেহি বাবু, কুত্তা নেহি হ্যায়।'

'ছিল, চলে গেছে।'

মিঃ শাসমলের নিজেকে একটু বোকা বোকা লাগছিল। চৌকিদারকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে তিনি আবার আরাম কেদারাটায় বসলেন। প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা ক্যারমের ঘুঁটি মারার মতো করে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে দু'হাত মাথার উপর তুলে আড় ভাঙতে গিয়ে দেখেন—কুকুর যায়নি, অথবা এরই মধ্যে কুকুর আবার ফিরে এসেছে, এবং সেই ভাবেই ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্বালাতনের একশেষ। রাত্তিরে তাঁর নতুন চটিটার দফারফা করবে। ফেলে রাখা চটির ওপর কুকুরের লোভের কথা মিঃ শাসমল জানেন। মেঝে থেকে বাটার চটিটা তুলে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিলেন তিনি।

ঘরের একজন বাসিন্দা বাড়ল। এখন থাকুক, ঘুমোনোর আগে আরেকটা চেষ্টা দেবেন ব্যাটাকে বিদেয় করার।

মিঃ শাসমল হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা এয়ার-লাইনস ব্যাগটা থেকে গোয়েন্দা উপন্যাসটা বার করলেন। ভাঁজ করা পাতায় আঙুল ঢুকিয়ে যেই খুলতে যাবেন, অমনি তাঁর চোখ গেল কুকুরের কোণের বিপরীত কোণে। সেখানে কখন যে আরেকটি প্রাণী এসে আস্তানা গেড়েছে সেটা শাসমল আদৌ টের পান নি।

একটা বেড়াল। বাঘের মতো ডোরাকাটা বেড়াল। ঘোলাটে চোখ তাঁরই দিকে রেখে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে।

এরকম বেড়াল কোথায় দেখেছেন মিঃ শাসমল ?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাঁর বাড়ির পাশেই মুখুজ্যেদের সাতটা বেড়ালের একটা ছিল ঠিক ওইরকম দেখতে। একদিন রাত্রে—

ঘটনাটা মনে পড়ে গেল মিঃ শাসমলের।

মাস ছয়েক আগে একদিন রাত্রে বেড়ালের কান্নায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মিঃ শাসমলের। তখন মেজাজটা ভাল যাচ্ছিল না তাঁর। তাঁর অংশীদার অধীরের সঙ্গে তার আগের দিনই প্রচণ্ড বচসা হয়েছে—প্রায় হাতাহাতি। অধীর শাসিয়েছে পুলিশের কাছে তাঁর কারচুপি ফাঁস করে দেবে। সেই অবস্থায় ঘুম এমনিতেই ভাল হচ্ছিল না, তার উপর এই বেড়ালের কাঁদুনি। আরও আধ ঘন্টা এই কান্না শুনে আর থাকতে না পেরে একটা ভারী কাচের পেপারওয়েট তুলে নিয়ে কান্নার উৎস লক্ষ্য করে মিঃ শাসমল সজোরে নিক্ষেপ করেন। তৎক্ষণাৎ কান্না থেমে যায়। পরদিন সকালে মুখুজ্যেদের বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড। তাদের সাধের হুলোকে মাঝরাত্তিরে কে যেন নৃশংসভাবে খুন করেছে। মিঃ শাসমলের খুব মজা লেগেছিল কথাটা শুনে। বেড়াল খুন! সেরকম দেখতে গেলে তো মানুষ হামেশাই খুন করছে। মনে পড়ল একবার—বহুদিন আগের ঘটনা, মিঃ শাসমল তখন কলেজে পড়েন, হস্টেলে থাকেন—ঘরের দেয়ালে পিঁপড়ের লম্বা লাইন দেখে, একটা খবরের কাগজের টুকরোয় দেশলাই ধরিয়ে সেই লাইনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা জ্বলন্ত কাগজটা একবার বুলিয়ে দিতেই সব ক'টা পিঁপড়ে এক সঙ্গে মরে কুঁকড়ে দেয়াল থেকে ঝরে পড়েছিল মেঝেতে। পিঁপড়ে খুন!...

মিঃ শাসমল রিস্টওয়াচের দিকে চেয়ে দেখলেন দশটা বেজে দশ। মাস খানেক থেকে মাথায় একটা দপদপানি অনুভব করছিলেন তিনি; সেটা এখন আর নেই। আর মাথা গরম ভাবটা, যেটার জন্য তাঁকে দিনে তিনবার স্নান করতে হত, সেটাও আর বোধ করছেন না তিনি।

মিঃ শাসমল বইটা খুলে মুখের সামনে ধরলেন। দু' লাইন পড়ে আবার চোখ চলে গেল বেড়ালটার দিকে। সেটা এরকম ভাবে চেয়ে রয়েছে কেন তাঁর দিকে?

নাঃ, একা থাকার বাসনা তাঁকে ত্যাগ করতে হল। অবিশ্যি মানুষ তো তিনি একাই; সেটাই ভরসা। রাত্রে এই দুই প্রাণী যদি উৎপাত না করে তা হলে ঘুম না হবার কোনও কারণ নেই। ঘুমটা খুবই দরকার। গত কয়েকটা দিন স্বাভাবিক কারণেই তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। ঘুমের বড়ি খাওয়ার আধুনিক বাতিকটা তাঁর নেই।

মিঃ শাসমল টেবিল থেকে ল্যাম্পটা তুলে বিছানার পাশে ছোট টেবিলটায় রাখলেন। তারপর গায়ের জামা খুলে আলনায় টাঙিয়ে, ফ্লাস্ক থেকে এক গেলাস জল ঢেলে খেয়ে হাতে বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

পায়ের দিকে কুকুর। সেটা বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, দৃষ্টি মিঃ শাসমলের দিকে।

কুকুর খুন?

মিঃ শাসমলের বুকের ভিতরে ধড়াস করে উঠল।

হ্যাঁ, তা এক রকম খুন বইকী। ঘটনাটা মনে পড়ে গেছে। বোধহয় তিয়াত্তর সাল। গাড়িটা তখন সবে কিনেছেন মিঃ শাসমল। চালক হিসাবে তিনি কিঞ্চিৎ 'র‍্যাশ'। কলকাতার ভিড়ে স্পিড তোলা সম্ভব নয়, তাই বোধহয় শহর থেকে বেরোলেই মিঃ শাসমলের স্পিডোমিটারের কাঁটা তরতরিয়ে উঠে যায় উপর দিকে। ৭০ মাইল স্পিড না ওঠা পর্যন্ত তাঁর মন অতৃপ্ত থেকে যায়। সেই অবস্থায় একবার ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে কোলাঘাট যাবার পথে একটা নেড়ি কুকুর তাঁর গাড়ির তলায় পড়ে। সাদার উপর বাদামি ছোপ। মিঃ শাসমল তা সত্ত্বেও গাড়ির স্পিড কমাননি। যে কুকুর খেতে পায় না, যার পাঁজরার হাড় গোনা যায়, তার বেঁচে থেকে লাভ কী—এমন একটা ধারণা মনে এনে অপরাধবোধ লাঘব করতে চেষ্টা করেছিলেন এটাও মনে আছে।

কিন্তু এই স্মৃতিই তাঁর মনের নিরুদ্বেগ ভাবটাকে একেবারে তছনছ করে দিল।

জীবনে যত প্রাণী হত্যা করেছেন তিনি তার সবগুলোই কি আজ এই ঘরে এসে হাজির হবে নাকি? সেই যে সেই প্রথম পাওয়া এয়ার গান দিয়ে মারা কুচ-কুচে কালো নাম-না-জানা পাখি আর সেবার সেই ঝাড়গ্রামে মামাবাড়িতে থান ইঁট দিয়ে—

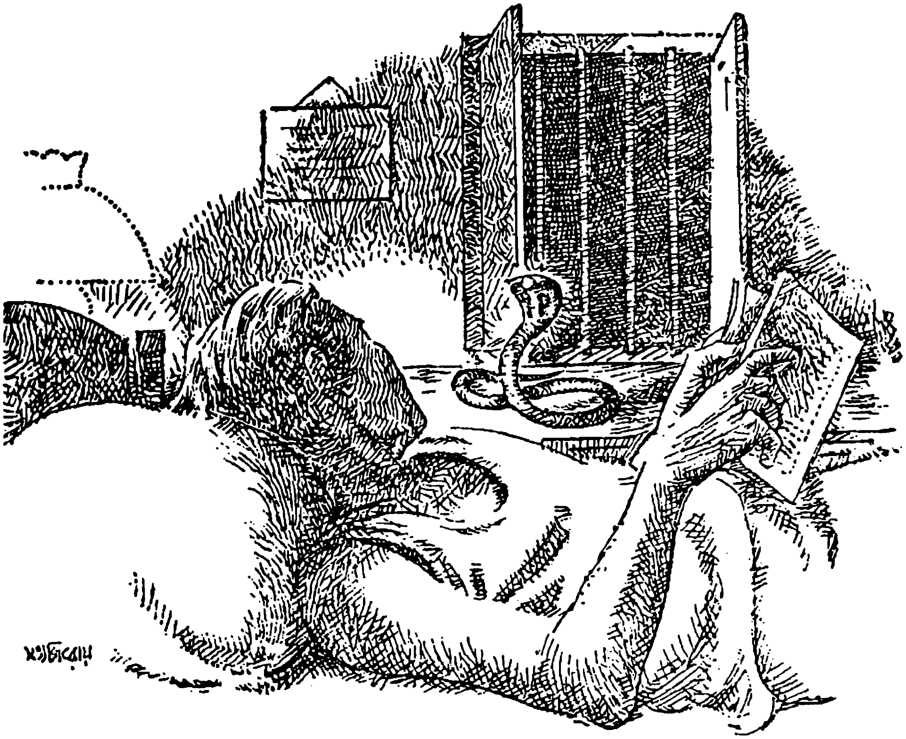

হ্যাঁ, সেটাও এসেছে।

জানালার দিকে চোখ যেতেই মিঃ শাসমল সাপটাকে দেখতে পেলেন। হাত চারেক লম্বা একটি গোখরো। তার মসৃণ দেহটা জানালা দিয়ে ঢুকে দেয়ালের সংলগ্ন টেবিলটার উপর উঠেছে। এপ্রিল মাসে সাপ বেরোয় না ; কিন্তু সাপ বেরিয়েছে।

সাপের তিন ভাগের দুই ভাগ রয়ে গেল টেবিলের উপর। বাকি এক ভাগ টেবিল ছেড়ে উঁচিয়ে উঠল ফণা তোলার ভঙ্গিতে। ল্যাম্পের আলোয় জ্বলজ্বল করছে তার নির্মম, নিষ্পলক দুটি চোখ।

ঝাড়গ্রামে তাঁর মামাবাড়িতে ঠিক এমনই একটা গোখরোর মাথা থেঁতলে দিয়েছিলেন মিঃ শাসমল থান ইঁট মেরে। সেটা ছিল নাকি বাস্তুসাপ, কারুর কোনও অনিষ্ট করেনি কোনওদিন।

মিঃ শাসমল অনুভব করলেন তাঁর গলা একদম শুকিয়ে গেছে। চেঁচিয়ে যে চৌকিদারকে ডাকবেন তার কোনও উপায় নেই।

বাইরে ঝিঁঝির ডাক থেমে গিয়ে চারিদিকে এক অপার্থিব নিস্তব্ধতা। হাতঘড়ির কোনও শব্দ নেই, না হলে সেটা শোনা যেত। একবার মিঃ শাসমলের মনে হল তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখেছেন। সম্প্রতি দু-একবার এরকম হয়েছে। নিজের ঘরে নিজের খাটে শুয়ে হঠাৎ মনে হয়েছে তিনি যেন অন্য কোথাও রয়েছেন, ঘরে অচেনা লোকজন চলাফেরা করছে, অস্ফুট স্বরে কথা বলছে। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বোধহয় এরকম হয়। এও একরকম স্বপ্ন, যদিও পুরোপুরি স্বপ্ন নয়।

আজ অবিশ্যি স্বপ্ন দেখছেন না তিনি। নিজের গায়ে চিমটি কেটে বুঝেছেন তিনি জেগেই আছেন। যা ঘটেছে তা সত্যিই তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে, এবং তাঁকে দেখানোর জন্যই ঘটছে।

আরও ঘণ্টা খানেক এই ভাবে শুয়ে রইলেন মিঃ শাসমল। ইতিমধ্যে মশা ঢুকেছে ঘরে। কামড়

তিনি অনুভব করেননি এখনও, কিন্তু তারা যে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে সেটা চোখে দেখে এবং কানে শুনে বুঝছেন। কত মশা মেরেছেন তিনি জীবনে তার কি হিসেব আছে ?

শেষ পর্যন্ত প্রাণীদের দিক থেকে উৎপাতের কোনও ইঙ্গিত না পেয়ে মিঃ শাসমল খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন ! এবার ঘুমোনোর চেষ্টা দিলে কেমন হয় ?

ল্যাম্পটা কমানোর জন্য হাত বাড়াতেই বাইরে থেকে একটা শব্দ এল। বাংলোর গেট থেকে বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত পথটা নুড়ি দিয়ে ঢাকা। সেই পথ দিয়ে কেউ হেঁটে আসছে।

চতুষ্পদ নয়, দ্বিপদ।

এবারে মিঃ শাসমল বুঝলেন তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে আসছে, আর তাঁর হৃৎস্পন্দনের শব্দ তিনি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছেন।

বেড়াল কুকুরের দৃষ্টি এখনও তাঁর দিকে। মশা গান গেয়ে চলেছে তাঁর কানের পাশে। গোখরোর ফণা এখনও তোলা ; কোনও অদৃশ্য সাপুড়ের অশ্রুত বাঁশির তালে তালে যেন সেই ফণা দুলছে।

পায়ের শব্দ এবার বারান্দায়। এগিয়ে আসছে।

ফুরুৎ করে একটা কুচকুচে কালো পাখি জানালা দিয়ে ঢুকে টেবিলে বসল। এই সেই পাখি—তাঁর এয়ার গানের গুলি খেয়ে যেটা পাঁচিল থেকে টুপ্ করে পড়েছিল পাশের বাড়ির বাগানে।

পায়ের শব্দ তাঁর ঘরের দরজার বাইরে থামল।

মিঃ শাসমল জানেন কে এসেছে। অধীর। অধীর চক্রবর্তী। তাঁর পার্টনার। এককালে বন্ধু ছিল, কিন্তু সম্প্রতি পরস্পরে প্রায় কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মিঃ শাসমলের ব্যবসায়িক কারচুপি অধীরের পছন্দ হয়নি। তাঁকে শাসিয়েছিল পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে। মিঃ শাসমল উলটে বলেছিলেন—ব্যবসার ক্ষেত্রে সিধে রাস্তাটা হল মূর্খের রাস্তা। অধীর সেটা মানেনি। এটা আগে জানা থাকলে কখনই তাকে অংশীদার করতেন না মিঃ শাসমল। তিনি বুঝেছিলেন অধীর তাঁর পরম শত্রু। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। শেষ রাখেননি মিঃ শাসমল। গতকাল রাত্রে অধীরেরই বৈঠকখানায় দুজনে মুখোমুখি বসেছিলেন। মিঃ শাসমলের পকেটে রিভলভার। খুনের অভিপ্রায় নিয়েই এসেছেন তিনি। মাত্র চার হাত দূরে বসে অধীর। অধীরের গলা যখন ভর্ৎসনার সপ্তমে চড়েছে, তখন রিভলভার বার করে গুলি চালান মিঃ শাসমল। তাঁর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখে এককালের বন্ধু অধীর চক্রবর্তীর মুখের অবস্থা কী হয়েছিল সেটা ভাবতে হাসি এল মিঃ শাসমলের। খুনটা করার দশ মিনিটের মধ্যেই তিনি গাড়িতে বেরিয়ে পড়েন। রাতটা বর্ধমান স্টেশনের ওয়েটিং রুমে কাটিয়ে আজ সকালে এই দশ দিন আগে রিজার্ভ করা বাংলোর উদ্দেশে রওনা দেন।

দরজায় আঘাত পড়ল। একবার, দু'বার, তিনবার।

মিঃ শাসমল চেয়ে আছেন দরজার দিকে। তাঁর সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'দরজা খোল, জয়ন্ত। আমি অধীর। দরজা খোল।'

যাকে তিনি গতকাল রাত্রে খুন করে এসেছেন, এই সেই অধীর। একটা কারণে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল খুনটা ঠিক হয়েছে কি না, কিন্তু এখন আর সন্দেহ নেই। ওই কুকুর, ওই বেড়াল, ওই সাপ, ওই পাখি—আর এখন দরজার বাইরে অধীর। সবাই যখন এসেছে মৃত্যুর পরে, তখন অধীরও আসবে এটাই সঙ্গত।

আবার দরজায় ঘন ঘন করাঘাত।

মিঃ শাসমলের দৃষ্টি ঝাপসা, কিন্তু তিনি দেখতে পাচ্ছেন কুকুরটা তাঁর দিকে এগোচ্ছে, বেড়ালের চোখ তাঁর নিজের চোখের এক হাতের মধ্যে, সাপটা টেবিলের পায়া বেয়ে মেঝেতে নামছে তাঁরই দিকে এগোবে বলে, পাখিটা এসে তাঁর খাটের উপর বসল, তাঁর বুকে গেঞ্জির ওপর অজস্র পিঁপড়ে এসে হাজির হয়েছে...

শেষ পর্যন্ত দুই কনস্টেবলের ঠেলায় দরজা ভাঙল।

অধীরবাবুই পুলিশ নিয়ে এসেছেন কলকাতা থেকে। মিঃ শাসমলের কাগজপত্র থেকে ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা চিঠি বেরোয় ; এই বাংলো রিজার্ভ করার খবর ছিল তাতে।

ঘরে ঢুকে মিঃ শাসমলকে মৃত অবস্থায় দেখে ইনস্পেক্টর সামন্ত অধীরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর পার্টনারের হার্টের ব্যারাম ছিল কি না। অধীরবাবু বললেন, 'হার্টের কথা জানি না, তবে ইদানীং ওর মাথাটা গোলমাল করছিল। যে ভাবে টাকা এদিক-ওদিক করেছে, আমাকে যে ভাবে ঠকিয়েছে, সেটা সুস্থ-মস্তিষ্ক লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। অবিশ্যি ওর হাতে রিভলভার দেখে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। সত্যি বলতে কী, ও যখন ওটা বার করল পকেট থেকে, তখন আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। ও গুলি মেরে পালানোর পর দশ মিনিট লেগেছিল আমার সংবিৎ ফিরে পেতে। তখনই ঠিক করি এই উন্মাদকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে। আমি যে খুন হইনি, সেটা নেহাতই দৈবক্রমে।'

মিঃ সামন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'কিন্তু এত কাছ থেকে আপনাকে মিস্ করলেন কী করে ?'

অধীরবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'কপালে মৃত্যু না থাকলে আর মানুষ কী করে মরে বলুন ! গুলি তো আমার গায়ে লাগেনি। লেগেছিল আমার সোফার গায়ে। অন্ধকারে লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা আর ক'জনের থাকে ? রিভলভার বার করার সঙ্গে সঙ্গে যে আমার পাড়ায় লোড শেডিং হয়ে যায় !'

সন্দেশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬

পিন্টুর দাদু

পিন্টুর আপসোস এইখানেই। তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই দাদু আছে, কিন্তু কই, তাদের কেউই তো তার নিজের দাদুর মতো নয়। রাজুর দাদুকে সে দেখেছে নিজে হাতে লাল আর বেগুনি কাগজের ফিতে পর পর জুড়ে রাজুর ঘুড়ির জন্য লম্বা ল্যাজ তৈরি করে দিতে। স্বপন আর সুদীপের দাদু—যাঁর টকটকে রং, গালভরা হাসি আর ধপ্‌ধপে সাদা দাড়িগোঁফ দেখলেই পিন্টুর ফাদার ক্রিসমাসের কথা মনে পড়ে যায়—তিনি কী দারুণ মজার মজার ছড়া লেখেন। একটা ছড়া স্বপনের কাছ থেকে শুনে শুনে পিন্টুর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল ; এখনও বেশ কয়েক লাইন মনে আছে—

লন্ডন ম্যাড্রিড সানফ্রানসিস্কো
আকবর হুমায়ূন হর্ষ কণিষ্ক
অ্যান্ডিজ কিলিমাঞ্জারো ফুজিয়ামা
তেনজিং ন্যানসেন ভাস্কো-ডা-গামা
রিগা লিমা পেরু চিলি চুংকিং কঙ্গো
হ্যানিবল তুঘলক তৈমুরলঙ্গ...

কী মজার ছড়া !—এক লাইন ভূগোল, এক লাইন ইতিহাস। আর ছড়া যে শুধু লেখেন তা নয় ; তাতে সুর দিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে পাড়ার ছেলেদের ডেকে শোনান।

এ ছাড়া সন্তুর দাদু—যাঁকে দেখতে ঠিক হ-য-ব-র-ল-র উদোর মতো—তিনি মোমবাতির আলোয় দেয়ালে নিজের হাতে ছায়া ফেলে দারুণ শ্যাডোগ্রাফি দেখান ; অতীনের দাদু ফাটাফাটি রকম ভাল শিকারের গল্প করেন ; সুবুর দাদু সাবানজলে কী জানি একটা মিশিয়ে আশ্চর্য রকম মজবুত বুদবুদ তৈরি করেন। একবার তাঁর তৈরি একটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের সাইজের বুদবুদকে পিন্টু সাতবার মাটিতে পড়ে লাফিয়ে তারপর ফাটতে দেখেছিল।

পিন্টু অনেকবার এইসব ভেবেছে, আর নিজের দাদুর সঙ্গে এদের দাদুর তুলনা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

একটা গালভরা নাম আছে অবিশ্যি পিন্টুর দাদুর—ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ গুহ মজুমদার। নামের পর আবার অনেকগুলো ইংরিজি অক্ষর আর কমা-ফুলস্টপ। সেগুলো সব নাকি দাদুর পাওয়া ডিগ্রি। মা-বাবার কাছে পিন্টু শুনেছে যে দাদুর মতো বিদ্বান লোক শুধু বাংলাদেশে কেন, ভারতবর্ষেই কম আছে। দাদু নাকি বারো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। তাঁর পড়াশুনার জন্য বাড়ি থেকে প্রায় খরচই দিতে হয়নি, কারণ তাঁর মতো এত বৃত্তি নাকি খুব কম ছাত্রই পেয়েছে। তা ছাড়া সোনা রুপোর মেডেল যে কত আছে তার তো হিসেবই নেই। আর আছে নানান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া মানপত্র, যেগুলো দাদুর ঘরের দেয়ালের সব ফাঁক ভরিয়ে দিয়েছে। যদিও দাদু সব বিষয়েই পণ্ডিত, যে বিষয়টা তাঁর সবচেয়ে ভাল করে জানা, সেটাকে বলে দর্শন। এই দর্শন নিয়ে দাদুর লেখা একটি ইংরেজি বই বেরিয়েছে দু'বছর আগে। পিন্টু দেখেছে সেটায় ৭৭২ পৃষ্ঠা, আর তার দাম পঁয়ষট্টি টাকা।

কিন্তু এত জ্ঞান, এত বিদ্যা হলেই কি মানুষকে এত গোমড়া আর এত থমথমে হতে হবে? পিন্টুর বন্ধুদের মধ্যে তো এটা একটা ঠাট্টারই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।—'হ্যাঁরে, আজ তোর দাদু হেসেছেন?'—এ প্রশ্নটা যে পিন্টুকে কতবার শুনতে হয়েছে! উত্তরে সে যদি হ্যাঁ বলে, তা হলে সেটা হবে মিথ্যে কথা; কারণ পিন্টুর এই আট বছরে এমন একটা দিনও মনে পড়ে না যেদিন সে দাদুকে হাসতে দেখেছে। তবে এও ঠিক, যে ধমক-ধামক করা বা গলা তুলে কথা বলা, এগুলোও দাদু বিশেষ করেন না। সেটার সুযোগও বাড়ির লোকে দেয় না, কারণ সবাই জানে যে দাদুর পান থেকে চুনটি খসলে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। পিন্টু মার কাছে শুনেছে যে সে যখন জন্মায়নি তখন জগন্নাথ ধোপা একবার নাকি দাদুর পাঞ্জাবিতে ভুল করে বেশি মাড় দিয়ে ফেলেছিল। তাতে দাদু তাঁর কাঁঠাল কাঠের লাঠি দিয়ে প্রথম জগন্নাথকে পেটান, তারপর তার গাধাটাকে পেটান। গাধাটা কী দোষ করল সেটা আর কারুর জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি।

পিন্টু নিজে গত বছর বাড়ির বাইরের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলতে গিয়ে দাদুর ঘরের জানলার একটা কাচ ভেঙে দেয়। দাদু তখন সারাদিনের লেখাপড়ার কাজের পর বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে শবাসনে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় গুলিটা কাচ ভেঙে ঘরের ভিতরে এসে পড়ে। দাদু গুলি হাতে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। পিন্টুর হাতেই ডাণ্ডা, তাই দাদুর বুঝতে বাকি থাকে না কার কীর্তি এই কাচ ভাঙা। দাদু চোখ রাঙাননি, ধমক দেননি, এমন কী একটি কথাও বলেননি পিন্টুকে।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরলে পর মা পিন্টুকে ডেকে বললেন, 'ডান্ডাটা দে। ওটা থাকবে দাদুর ঘরে। আর সাতদিন তোর সব খেলা বন্ধ।'

পিন্টুর চোখে জল এসে গিয়েছিল। সাতদিন খেলা বন্ধের চেয়েও বেশি আপসোস হয়েছিল ডান্ডা-গুলিটার জন্য। বিশেষ করে গুলিটা। শ্রীনিবাস কী সুন্দর করে দা দিয়ে ছুঁচোলো করে কেটে দিয়েছিল দুটো দিক। এত ভাল গুলি এ তল্লাটে আর কারুর নেই।

অথচ পিন্টু জানে যে দাদু ছেলেবেলায় এরকম ছিলেন না। বাড়িতে একটা অনেক দিনের পুরনো বিলিতি ফোটো অ্যালবাম আছে, যার মোটা মোটা পাতার পাশগুলোতে সোনার জল লাগানো। সেই অ্যালবামে দাদুর একটা ছবি আছে বাষট্টি বছর আগে তোলা। তখন দাদুর পিন্টুরই বয়স। তাতে দাদুর পরনে হাফ প্যান্ট, মুখে হাসি, আর হাতে একটি হকি স্টিক। তাঁর তখনকার চেহারার সঙ্গে পিন্টুর নিজের চেহারার আশ্চর্য মিল সেটা পিন্টু বেশ বুঝতে পারে। সেই হাসিখুশি খেলুড়ে খোকা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এমন হয়ে গেল কী করে?

দাদু যে সবসময় পিন্টুদের বাড়িতেই থাকেন তা নয়। পিন্টুর জ্যাঠামশাই আসামে জঙ্গল বিভাগে বড় চাকরি করেন; তাঁর একটা চমৎকার বাংলো আছে জঙ্গলের ভিতরে। দাদু মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থেকে আসেন মাস খানেক করে। যাবার সময় সুটকেস বোঝাই বই আর খাতা নেন সঙ্গে, আর যখন ফেরেন তখন খাতাগুলো লেখায় ভরে যায়।

যে সময়টা তিনি থাকেন না, সে সময়টা বাড়ির চেহারাই পালটে যায়। পিন্টুর দিদি রেডিওতে সিনেমার গান শোনে, দাদা হপ্তায় দুটো করে ফাইটিং-এর ছবি দেখে, বাবার চুরুট খাওয়া বেড়ে যায়,

আর মা দুপুর হলেই পাড়ার সদু মাসি-লক্ষ্মীমাসিদের ডেকে এনে দিব্যি খোশ মেজাজে তাস খেলেন আর আড্ডা দেন।

দাদু ফিরে এলেই অবিশ্যি আবার যেই কে সেই।

কিন্তু এবার হল একটু অন্যরকম।

এক মাসের জন্য দাদু গিয়েছিলেন আসামে তাঁর বড় ছেলের কাছে। পিন্টু মা-বাবার সঙ্গে এক ঘরে শোয় ; দাদু ফেরার দু'দিন আগে মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গিয়ে পিন্টু শোনে মা-বাবা দাদুকে নিয়ে কথা বলছেন। পিন্টু মটকা মেরে পড়ে থেকে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে কথা শুনল, কিন্তু বাবা অনেক শক্ত শক্ত ইংরিজি কথা ব্যবহার করাতে অনেক কিছুই বুঝতে পারল না। তবে এইটুকু বুঝল যে দাদুর কী একটা অসুখ করেছে।

দু'দিন বাদে অসুখ নিয়েই ফিরলেন দাদু। বাবার সঙ্গে ডাঃ রুদ্র স্টেশনে গেলেন দাদুকে আনতে। বাবার অ্যাম্বাসাডর গাড়িতেই দাদু ফিরলেন, আর তাঁকে গাড়ি থেকে ধরে নামালেন বাবা আর ডাঃ রুদ্র। তারপর ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায়, বারান্দা থেকে বৈঠকখানায়, বৈঠকখানা থেকে দোতলার সিঁড়ি, আর সিঁড়ি উঠে দাদুর ঘরে নিয়ে তাঁর বিছানায় তাঁকে শুইয়ে দিলেন। পিন্টু ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল, এমন সময় মা এসে তার মাথায় হাত দিয়ে নরম গলায় বললেন, 'এখানে না, নীচে যাও।'

'দাদুর কী হয়েছে মা ?' পিন্টু না জিজ্ঞেস করে পারল না।

'অসুখ', বললেন মা।

অথচ পিন্টুর দেখে মনে হয়নি দাদুর কোনও অসুখ হয়েছে। অবিশ্যি এটা ঠিকই যে দাদুকে এইভাবে পরের কাঁধে ভর করতে কোনওদিন দেখেনি পিন্টু। তা হলে কি পায়ে কোনও চোট পেয়েছেন ? জেঠুর বাংলোর বাইরে যদি একা হাঁটতে বেরিয়ে থাকেন দাদু, তা হলে জঙ্গলের মধ্যে খানাখন্দে পড়ে চোট পাওয়া কিছুই আশ্চর্য না। কিংবা যদি সাপ-টাপ বা বিছে-টিছে কামড়ে থাকে, তা হলেও অবিশ্যি অসুখ হতে পারে।

তিন দিন এইভাবে কেটে গেল। পিন্টুর শোবার ঘর এক তলায়, দাদুর ঘরের ঠিক নীচে। পিন্টুকে উপরে যেতে দেওয়া হয় না, কাজেই দাদুর অসুখ কেমন যাচ্ছে সেটা জানার উপায় নেই। দিদি বা দাদা থাকলে হয়তো জানা যেত, কিন্তু দিদি কলকাতার হস্টেলে, আর দাদা তার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে রানিখেত। গতকাল রাত্রে পিন্টু দাদুর ঘরে একটা কাঁসার গেলাস কিম্বা বাটি মেঝেতে পড়ার শব্দ পেয়েছে, আর আজ সকালে ধুপধাপ শব্দ শুনে মনে হয়েছে দাদু হাঁটছেন। তা হলে আর দাদুর এমন কী অসুখ ?

দুপুরে পিন্টু আর থাকতে পারল না। মা দাদুকে ওষুধ খাইয়ে নীচে নেমে এসেছেন কিছুক্ষণ হল, আর বাবা চলে গেছেন কোর্টে। আজ বিকেল থেকে একজন নার্স আসবে সে কথা পিন্টু জানে, কিন্তু এখন দাদুর ঘরে আর কেউ নেই।

বুকের মধ্যে একটা ধুকপুকুনির সঙ্গে সঙ্গে পিন্টু বুঝতে পারল যে তাকে একবার দোতলায় গিয়ে দাদুর ঘরে উঁকি দিতেই হবে। শুধু তাই না ; দাদু যদি ঘুমোন, তা হলে তাকে ঢুকতে হবে, আর ঢুকে তার ডাণ্ডা আর গুলিটা খুঁজে বার করে আনতে হবে। দাদু যখন থাকেন না তখন তাঁর ঘর তালা-চাবি দিয়ে বন্ধ থাকে, তাই ওঘর থেকে কিছু বার করে আনার উপায় থাকে না।

দোতলায় উঠতে পিন্টুর যে একটু ভয়-ভয় করছিল না তা নয় ; তবে অসুস্থ দাদু আর তেমন কী করতে পারেন এই ভেবে মনে খানিকটা সাহস পেয়ে উনিশ ধাপ সিঁড়ি উঠে পা টিপে টিপে সে দাদুর ঘরের দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। প্যাসেজের বাঁয়ে ঘরের দরজা, আর সামনে আট-দশ পা এগিয়ে ছাতের দরজা।

কোনও শব্দ নেই ঘরে। যে গন্ধটা পাচ্ছে পিন্টু সেটা ওর খুব চেনা আর প্রিয় গন্ধ। পুরনো বইয়ের গন্ধ। দু'হাজার পুরনো বই আছে দাদুর ঘরে।

পিন্টু নিশ্বাস বন্ধ করে গলাটা বাড়িয়ে দিল।

দাদুর খাট খালি।

তবে কি দাদু পিছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ?

পিন্টু তার ডান পা-টা বাড়িয়ে দিল চৌকাঠ-পেরিয়ে ঘরে ঢোকার জন্য। পা-টা চৌকাঠের ওদিকের মেঝেতে পৌঁছবার আগেই একটা শব্দ এল তার কানে।

খটাং, খটাং, খটাং !

পিন্টু চমকে পেছিয়ে আসতেই আরেকটা শব্দ—

'কু-ই ই ই !'

পিন্টুর চোখ চলে গেল ছাতের দরজার দিকে। দরজার পাশ দিয়ে একটা মুখ উঁকি মারছে।

দাদুর মুখ। এ মুখ পিন্টু এর আগে কখনও দেখেনি। সারা মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, চোখের চাহনি দুষ্টুমিতে ভরা।

পিন্টু অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে মুখের দিকে।

তারপর দাদুর ডান হাতটা বেরিয়ে এল দরজার পাশ দিয়ে।

পিন্টু দেখল সে হাতে ধরা তার ডাংগুলির ডান্ডা।

এবার দাদু পিন্টুকে আসবার জন্য ইশারা করে দরজা থেকে সরে গেলেন। পিন্টু ছাতের দিকে এগিয়ে গেল।

বেশ বড় খোলা ছাত, ছাতের মাঝখানে রাখা শ্রীনিবাসের তৈরি কাঠের গুলি।

দাদু পিন্টুর দিকে চেয়ে একবার হেসে হাতের ডান্ডাটা গুলির দিকে তাগ করে মারলেন—খটাং!

গুলিতে লাগল না ডাণ্ডা। তারপর আবার মারতেই গুলির ঠিক মোক্ষম জায়গায় বাড়ি লেগে সেটা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে ছাতের চার হাত উপরে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দাদু চালালেন ডাণ্ডা।

ডাণ্ডার বাড়ি লেগে গুলিটা ছাতের পঞ্চাশ হাত পশ্চিমে সুপুরি গাছটার মাথার উপর দিয়ে সন্তুদের বাড়ির দিকে সাঁ করে চলে গেল উড়ন তুবড়ির মতো। তারপরেই শুরু হল দাদুর খিলখিলে হাসির সঙ্গে হাততালি আর লাফানি।

পিন্টু ছাত থেকে নীচে নেমে এল।

মা-কে ঘটনাটা বলতে মা বললেন ওটাই নাকি দাদুর অসুখ। এরকম অসুখ নাকি মাঝে মাঝে বুড়োদের হয়; তারা আর বুড়ো থাকে না, খোকা হয়ে যায়।

যাই হোক, পিন্টু আজ প্রথম তার বন্ধুদের বলতে পারবে যে সে তার দাদুকে প্রাণখুলে হাসতে দেখেছে।

সন্দেশ, আষাঢ় ১৩৮৬

বৃহচ্চঞ্চু

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে তাঁর আপিসের যেখানে বসে তুলসীবাবু কাজ করেন, তার পাশেই জানালা দিয়ে পশ্চিম আকাশে অনেকখানি দেখা যায়। সেই আকাশে এক বর্ষাকালের সকালে যখন জোড়া রামধনু দেখা দিল, ঠিক তখনই তুলসীবাবুর পাশের টেবিলে বসা জগন্ময় দত্ত পানের পিক ফেলতে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আকাশে চোখ পড়াতে ভদ্রলোক 'বাঃ' বলে তুলসীবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখে যান মশাই, এ জিনিস ডেইলি দেখবেন না।'

তুলসীবাবু উঠে গিয়ে আকাশপানে চেয়ে বললেন, 'কীসের কথা বলছেন।'

'কেন, ডবল রেনবো!' অবাক হয়ে বললেন জগন্ময়বাবু। 'আপনি কি কালার ব্লাইন্ড নাকি মশাই?'

তুলসীবাবু জায়গায় ফিরে এলেন।—'এ জিনিসও কাজ ফেলে উঠে গিয়ে দেখতে হবে? একটার জায়গায় দুটো কেন, পঁচিশটা রামধনু উঠলেও তাতে আশ্চর্যের কী আছে জানি না মশাই। লোয়ার সারকুলার রোডে জোড়া গির্জা আছে তো; তা হলে তো তার সামনে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়।'

অবাক হবার ক্ষমতাটা সকলের সমান থাকে না ঠিকই, কিন্তু তুলসীবাবুর মধ্যে আদৌ আছে কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। 'আশ্চর্য' বিশেষণটা তিনি কেবল একটি ব্যাপারেই প্রয়োগ করেন; সেটা হল মনসুরের দোকানের মোগলাই পরোটা আর কাবাব। অবিশ্যি সে খবরটা তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু প্রদ্যোতবাবু ছাড়া আর কেউ জানেন না।

এমনিধারা লোক বলেই হয়তো দণ্ডকারণ্যের জঙ্গলে কবিরাজি গাছগাছড়া খুঁজতে গিয়ে একটা অতিকায় ডিমের সন্ধান পেয়েও তুলসীবাবু অবাক হলেন না।

কবিরাজিটা তুলসীবাবু ধরেছেন বছর পনেরো হল। বাবা ত্রৈলোক্য সেন ছিলেন নাম-করা কবিরাজ। তুলসীবাবুর আসল রোজগার আরবাথনট কোম্পানির মধ্যপদস্থ কর্মচারী হিসেবে। কিন্তু

পৈতৃক পেশাটাকে তিনি সম্পূর্ণ এড়াতে পারেননি। সম্প্রতি ঝোঁকটা একটু বেড়েছে, কারণ কলকাতার দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর ওষুধে আরাম পাওয়ার ফলে তিনি কিঞ্চিৎ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এবারে দণ্ডকারণ্যে আসার পিছনেও ছিল কবিরাজি। জগদলপুরের মাইল ত্রিশেক উত্তরে এক পাহাড়ের গুহায় এক সাধু বাস করেন। তাঁর সন্ধানে নাকি আশ্চর্য ভাল কবিরাজি ওষুধ আছে এ খবর তুলসীবাবু কাগজে পড়েছেন। বিশেষত রক্তের চাপ কমানোর জন্য একটা ওষুধ আছে যেটা নাকি সর্পগন্ধার চেয়েও ভাল। তুলসীবাবু মাঝে মাঝে ব্লাডপ্রেসারে ভোগেন। সর্পগন্ধায় বিশেষ কাজ দেয়নি, আর অ্যালোপ্যাথি-হোমিওপ্যাথি তিনি মানেন না।

এই অভিযানে তুলসীবাবুর সঙ্গে আছেন প্রদ্যোতবাবু। তুলসীবাবুর বিস্ময়বোধের অভাবে প্রদ্যোতবাবুর যে ধৈর্যচ্যুতি হয় না তা নয়। একদিন তো তিনি বলেই বসলেন, 'মশাই, কল্পনাশক্তি থাকলে মানুষ কোনও কোনও ব্যাপারে অবাক না হয়ে পারে না। আপনি চোখের সামনে ভূত দেখলেও বলবেন—এতে আর আশ্চর্যের কী আছে।' তুলসীবাবু শান্তভাবে জবাব দিয়েছিলেন, 'অবাক না হলে অবাক হবার ভান করাটা আমার কাছে আদিখ্যেতা বলে মনে হয়। ওটা আমি পছন্দ করি না।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'জনের পরস্পরের প্রতি একটা টান ছিল।

জগদলপুরের একটা হোটেলে আগে থেকে ঘর ঠিক করে নবমীর দিন গিয়ে হাজির হলেন দুই বন্ধু। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ মেলে বিজয়নগরম, সেখান থেকে আবার ট্রেন বদলে জগদলপুর। মাদ্রাজ মেলের থ্রি-টায়ার কামরায় দুটি বিদেশি ছোকরা উঠেছিল, তারা নাকি সুইডেনের অধিবাসী। তাদের মধ্যে একজন এত ঢ্যাঙা যে তার মাথা কামরার সিলিং-এ ঠেকে যায়। প্রদ্যোতবাবু হাইট জিজ্ঞেস করাতে ছোকরাটি বলল, 'টু মিটারস অ্যান্ড সিক্স সেন্টিমিটারস।' অর্থাৎ প্রায় সাত ফুট। প্রদ্যোতবাবু বাকি পথ এই তরুণ দানবটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারেননি। তুলসীবাবু কিন্তু অবাক হননি। তাঁর মতে ওদের ডায়েটে এমন হওয়াটা নাকি কিছুই আশ্চর্যের না।

প্রায় মাইল খানেক পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে শ' পাঁচেক ফুট পাহাড় উঠে তবে ধুমাইবাবার গুহায় পৌঁছতে হয়। বিশাল গুহা, দশ পা ভিতরে গেলেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সেটা যে শুধু ধুমাইবাবার ধুনুচির ধোঁয়ার জন্য তা নয় ; এমনিতেই গুহায় আলো প্রবেশ করে না বললেই চলে। প্রদ্যোতবাবু অপার বিস্ময়ে দেখছিলেন গুহার সর্বত্র স্ট্যালাকটাইট-স্ট্যালাগমাইটের ছড়াছড়ি। তুলসীবাবুর দৃষ্টি সেদিকে নেই, কারণ তাঁর লক্ষ্য কবিরাজি ওষুধ। ধুমাইবাবা যে গাছের কথা বললেন তার নাম চক্রপর্ণ। এ নাম তুলসীবাবু কোনওদিন শোনেননি বা পড়েননি। গাছ নয়, গাছড়া—আর সে গাছড়া নাকি কেবল দণ্ডকারণ্যের একটি বিশেষ জায়গায় ছাড়া আর কোথাও নেই, আর সেই জায়গাটারও একটা বিশেষত্ব আছে সেটা তুলসীবাবু নাকি গেলেই বুঝতে পারবেন। কী বিশেষত্ব সেটা আর বাবাজি ভাঙলেন না। তবে কোন পথে কী ভাবে সেখানে পৌঁছানো যায় সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

গুহা থেকে বেরিয়েই গাছের সন্ধানে রওনা দিলেন তুলসীবাবু। প্রদ্যোতবাবুর সঙ্গ দিতে কোনও আপত্তি নেই ; তিনি নিজে এককালে শিকারের ধান্দায় অনেক পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেছেন। বন্যপশু সংরক্ষণের হিড়িকের পর থেকে বাধ্য হয়ে শিকার ছাড়লেও জঙ্গলের মোহ কাটাতে পারেননি।

সাধুবাবার নির্দেশ অব্যর্থ। আধঘণ্টা অনুসন্ধানের পরেই একটা নালা পড়ল আর নালা পেরিয়ে মিনিট তিনেকের মধ্যেই যেমন বর্ণনা ঠিক তেমনি একটা বাজ পড়ে ঝলসে যাওয়া নিম গাছের গুঁড়ি থেকে সাত পা দক্ষিণে চক্রপর্ণের সন্ধান মিলল। কোমর অবধি উঁচু গাছ, আধুলির সাইজের গোল পাতাগুলির মাঝখানে একটি করে গোলাপি চাকতি।

'এ কোথায় এলাম মশাই ?' প্রদ্যোতবাবু মন্তব্য করলেন।

'কেন, কী হল ?'

'এখানের অধিকাংশ গাছই দেখছি অচেনা', বললেন প্রদ্যোতবাবু।—'আর জায়গাটা কীরকম স্যাঁতসেঁতে দেখেছেন ? বনের বাকি অংশের সঙ্গে যেন কোনও মিলই নেই।'

পায়ের তলায় ভিজে ভিজে ঠেকছিল বটে তুলসীবাবুর, কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে কেন ? কলকাতা শহরের মধ্যেই এ পাড়া ও পাড়ায় তাপমাত্রার ফারাক হয়—যেমন ভবানীপুরের চেয়ে টালিগঞ্জে শীত বেশি। তা হলে বনের এক অংশ থেকে আরেক অংশে তফাত হবে না কেন ? এ তো প্রকৃতির খেয়াল।

তুলসীবাবু কাঁধ থেকে ঝোলা নামিয়ে গাছের দিকে উপুড় হয়েছেন, এমন সময় প্রদ্যোতবাবুর বিস্ময়সূচক প্রশ্ন তাঁকে বাধা দিল।

'ওটা আবার কী ?'

তুলসীবাবু দেখেছেন জিনিসটা, কিন্তু গ্রাহ্য করেননি। বললেন, 'কিছুর ডিমটিম হবে আর কি !'

প্রদ্যোতবাবুর প্রথমে পাথর বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই বুঝলেন ডিম ছাড়া আর কিছুই না। হলুদের উপর চকোলেটের ডোরা। তারই ফাঁকে ফাঁকে নীলের ছিটেফোঁটা। এত বড় ডিম কীসের হতে পারে ? ময়াল সাপ-টাপ নয় তো ?

ইতিমধ্যে তুলসীবাবু গাছের খানিকটা তাঁর ঝোলায় পুরে নিয়েছেন। ডাল সমেত আরও কিছু পাতা নেবার ইচ্ছে ছিল ; কিন্তু সেটা হল না। ডিম বাবাজি ঠিক এই সময়ই ফুটবেন বলে মনস্থ করলেন।

খোলা চৌচির হবার শব্দটা শুনে প্রদ্যোতবাবু চমকে পিছিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, ডিম ফুটেছে, এবং শাবকের মাথা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সাপ নয়, কুমির নয়, কচ্ছপ নয়—পাখি।

এবার ছানার সমস্ত শরীরটা বেরিয়ে এসে দুটি শীর্ণ ঠ্যাঙে ভর করে এদিক ওদিকে চেয়ে দেখছে। আয়তন ডিমেরই অনুযায়ী ; শাবক অবস্থাতেও দিব্যি একটা মুরগির সমান বড়। প্রদ্যোতবাবুর এককালে নিউ মার্কেটে পাখির সন্ধানে যাতায়াত ছিল। বাড়িতে পোষা বুলবুলি আছে, ময়না আছে। কিন্তু এত বড় ঠোঁট, এত লম্বা পা, গায়ের এমন বেগুনি রঙ আর জন্মানো মাত্র এমন সপ্রতিভ ভাব তিনি কোনও পাখির মধ্যে দেখেননি।

তুলসীবাবুর কিন্তু ছানা সম্বন্ধে মনে কোনও কৌতূহল নেই। তিনি ইতিমধ্যে গাছের আরও বেশ খানিকটা অংশ ঝোলায় পুরে ফেলেছেন।

প্রদ্যোতবাবু এদিক ওদিক চেয়ে পাখিটা সম্বন্ধে একটা মন্তব্য না করে পারলেন না।

'আশ্চর্য ! ছানা আছে অথচ মা নেই, বাপ নেই। অন্তত কাছাকাছির মধ্যে দেখছি না।'

'ঢের আশ্চর্য হয়েছেন' ঝোলা কাঁধে নিয়ে বললেন তুলসীবাবু।—'তিনটে বাজে, এর পর ঝপ করে সন্ধে হয়ে যাবে।'

প্রদ্যোতবাবু কিছুটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পাখি থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে তুলসীবাবুর সঙ্গে হাঁটা শুরু করলেন। তাঁদের গাড়ি অপেক্ষা করছে যেখানে, সেখানে পৌঁছাতে লাগবে প্রায় আধ ঘণ্টা।

পিছন থেকে শুকনো পাতার খসখসানি শুনে প্রদ্যোতবাবুই থেমে ঘাড় ঘোরালেন।

ছানাটা পিছু নিয়েছে।

'ও মশাই !'

এবার তুলসীবাবুও থেমে পিছন ফিরলেন। শাবকের দৃষ্টি সটান তুলসীবাবুর দিকেই।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসে ছানাটা তুলসীবাবুর সামনেই থামল। তারপর গলা বাড়িয়ে তার বেমানান রকম বড় ঠোঁট দিয়ে তুলসীবাবুর ধুতির কোঁচার একটা অংশে কামড়ে দিয়ে সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

প্রদ্যোতবাবু কাণ্ড দেখে এতই অবাক যে তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। শেষটায় যখন দেখলেন যে তুলসীবাবু ছানাটাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে ঝোলায় পুরলেন, তখন আর চুপ থাকা যায় না।

'কী করছেন মশাই ! একটা নামগোত্রহীন ধেড়ে পাখির ছানাকে থলেতে পুরে ফেললেন ?'

'একটা কিছু পোষার শখ ছিল অনেকদিন থেকে,' আবার হাঁটতে শুরু করে বললেন

তুলসীবাবু। —'নেড়িকুত্তা পোষে লোকে দেখেননি ? তাদের গোত্রটা কি খুব একটা জাহির করার ব্যাপার ?'

প্রদ্যোতবাবু দেখলেন পাখির ছানাটা তুলসীবাবুর দোলায়মান ঝোলাটা থেকে গলা বার করে মিটিমিটি এদিক ওদিক চাইছে।

তুলসীবাবু থাকেন মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে দোতলার একটি ফ্ল্যাটে। একা মানুষ, একটি চাকর আছে, নাম নটবর, আর জয়কেষ্ট বলে একটি রান্নার লোক। দোতলায় আরও একটি ফ্ল্যাট আছে। তাতে থাকেন নবরত্ন প্রেসের মালিক তড়িৎ সান্ন্যাল। স্যান্ন্যাল মশাইয়ের মেজাজ এমনিতেই খিট্‌খিটে, তার উপর লোড শেডিং-এ ছাপাখানাতে বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে বলে সব সময়ই যেন মারমুখো ভাব।

দু'মাস হল তুলসীবাবু দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে পাখির ছানাটিও এসেছে, আর আসার পর দিনই একটি তারের খাঁচা কিনে পাখিটিকে তার মধ্যে পুরে বারান্দার এক কোণে রেখে দেওয়া হয়েছে। পাখির নামকরণও হয়েছে। তুলসীবাবু ম্যাট্রিকে সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিলেন, তাই সংস্কৃত নামের উপর তাঁর একটা দুর্বলতা আছে। নাম রেখেছিলেন বৃহচ্চঞ্চু ; শেষ পর্যন্ত সেটা চঞ্চুতে এসে দাঁড়িয়েছে।

জগদলপুরে থাকতে পাখিকে ছোলা ছাতু পাঁউরুটি খাওয়াবার চেষ্টা করে তুলসীবাবু শেষে বুঝেছিলেন যে পাখিটি মাংসাশী। তার পর থেকে রোজ উচ্চিংড়ে আরশোলা ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে তাকে। সম্প্রতি যেন তাতে পাখির খিদে মিটছিল না। খাঁচার জালের উপর দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট চালিয়ে খড়াং খড়াং শব্দ তুলে তার ক্ষোভ জানাতে শুরু করেছিল। শেষটায় বাজার থেকে মাংস কিনে এনে খাওয়াতে শুরু করে তুলসীবাবু তার খিদে মিটিয়েছেন। এখন নিয়মিত মাংস কিনে আনে নটবর, আর সেই মাংস খেয়েই বোধহয় পাখির আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তুলসীবাবু গোড়াতেই বুদ্ধি করে পাখির অনুপাতে খাঁচাটা বড়ই কিনেছিলেন। তাঁর মন বলছিল এ পাখির জাত বেশ জাঁদরেল। খাঁচাটা মাথায় ছিল আড়াই ফুট। কালই ভদ্রলোক লক্ষ করেছেন যে চঞ্চু সোজা হয়ে দাঁড়ালে তার মাথা তারে ঠেকে যাচ্ছে। অথচ বয়স মাত্র দু'মাস। এইবেলা চটপট একটা বড় খাঁচার ব্যবস্থা দেখতে হবে।

ভাল কথা—পাখির ডাক সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। এই ডাক শুনেই একদিন সকালে সান্ন্যাল মশাই বারান্দার ওপারে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলেন। এমনিতে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বাক্যালাপ নেই বললেই চলে ; আজ কোনওমতে কাশির ধাক্কা সামলে নিয়ে তড়িৎ সান্ন্যাল তুলসীবাবুর উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন,—'খাঁচায় কী জানোয়ার রেখেছেন মশাই যে, ডাক ছাড়লে পিলে চমকে যায় ?' পাখির ডাক শুনে জানোয়ারের কথাই মনে হয় তাতে ভুল নেই।

তুলসীবাবু সবে কলঘর থেকে বেরিয়ে অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন ; হাঁক শুনে দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে তড়িৎবাবুকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'জানোয়ার নয়, পাখি। আর ডাক যেমনই হোক না কেন, আপনার হুলোর মতো রাত্তিরে ঘুমের ব্যাঘাত করে না।'

হুলোর কান্না আগে শোনা যেত না, সম্প্রতি শুরু হয়েছে।

তুলসীবাবুর পালটা জবাবে বাক্‌যুদ্ধ আর এগোতে পারল না বটে, কিন্তু তড়িৎবাবুর গজগজানি থামল না। ভাগ্যিস খাঁচাটা থাকে তড়িৎবাবুর গণ্ডির বাইরে ; পাখির চেহারা দেখলে ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া কী হত বলা শক্ত।

এই চেহারা তুলসীবাবুকে বিস্মিত না করলেও, তাঁর বন্ধু প্রদ্যোতবাবুকে করে বই কী। আগে অফিসের বাইরে দুজনের মধ্যে দেখা কমই হত। মনসুরের দোকানে গিয়ে কাবাব পরোটা খাওয়াটা ছিল সপ্তাহে একদিনের ব্যাপার। প্রদ্যোতবাবুর স্ত্রী আছে, দুটি ছেলেমেয়ে বাপ মা ভাই বোন আছে, সংসারের অনেক দায়দায়িত্ব আছে। কিন্তু দণ্ডকারণ্য থেকে ফেরার পর থেকেই তাঁর মনটা বার বার চলে যায় তুলসীবাবুর পাখির দিকে। ফলে তিনি আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যায় চলে আসেন মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের এই ফ্ল্যাটে।

পাখির দ্রুত আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে তার চেহারার পরিবর্তনও প্রদ্যোতবাবুকে বিস্মিত করে। এটা

তুলসীবাবুর দৃষ্টি এড়ায় কী করে, বা না এড়ালেও তিনি এই নিয়ে কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করেন না কেন, সেটা তিনি বুঝতে পারেন না। কোনও পাখির চোখের চাহনি যে এত নির্মম হতে পারে সেটা প্রদ্যোতবাবু ভাবতে পারেননি। চোখ দুটো হলদে, আর সেই চোখে এক ভাবে একই দিকে মিনিটের পর মিনিট চেয়ে থাকাটা তাঁর ভারী অস্বস্তিকর বলে মনে হয়। পাখির দেহের সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটটিও স্বভাবতই বেড়ে চলেছে। কুচকুচে কালো মসৃণ ঠোঁট, ঈগলের ঠোঁটের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, তবে আয়তনে প্রায় তিন গুণ বড়। এ পাখি যে ওড়ে না সেটা যেমন ডানার সাইজ থেকে বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় বাঘের মতো নখ সমেত শক্ত, সবল পা দুটো থেকে। অনেক পরিচিত লোকের কাছে পাখির বর্ণনা দিয়েছেন প্রদ্যোতবাবু, কিন্তু কেউই চিনতে পারেনি।

আজ রবিবার, এক ভাইপোর একটি ক্যামেরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন প্রদ্যোতবাবু। খাঁচার ভিতর আলো কম, তাই ফ্ল্যাশের প্রয়োজন। ছবি তোলার অভ্যাস ছিল এককালে। তারই উপর ভরসা করে খাঁচার দিকে তাগ করে ক্যামেরার শাটারটা টিপে দিলেন প্রদ্যোতবাবু। ফ্ল্যাশের চমকের সঙ্গে সঙ্গে পাখির আপত্তিসূচক চিৎকারে তাঁকে তিন হাত পিছিয়ে যেতে হল, আর সেই মুহূর্তেই মনে হল যে এর গলার স্বরটা রেকর্ড করে রাখা উচিত। উদ্দেশ্য আর কিছু না—ছবি দেখিয়ে এবং ডাক শুনিয়ে যদি পাখিটাকে চেনাতে সুবিধে হয়। তা ছাড়া প্রদ্যোতবাবুর মনে একটা খচখচানি রয়ে গেছে যেটা তুলসীবাবুর কাছে এখনও প্রকাশ করেননি ; কবে বা কোথায় মনে পড়ছে না, কিন্তু কোনও বই বা পত্রিকায় প্রদ্যোতবাবু একটি পাখির ছবি দেখেছেন যেটার সঙ্গে তুলসীবাবুর পাখির আশ্চর্য সাদৃশ্য। যদি কখনও সেই ছাপা ছবি আবার হাতে পড়ে তা হলে মিলিয়ে দেখতে সুবিধা হবে।

ছবি তোলার পরে চা খেতে খেতে তুলসীবাবু একটা কথা বললেন যেটা আগে বলেননি। চঞ্চু আসার কিছুদিন পর থেকেই নাকি এ বাড়িতে আর কাক চড়ুই বসে না। 'খুব লাভ হয়েছে মশাই', বললেন তুলসীবাবু, 'চড়ুইগুলো যেখানে-সেখানে বাসা করে উৎপাত করত। কাকে রান্নাঘর থেকে এটা-সেটা সরিয়ে নিত। আজকাল ওসব বন্ধ।'

'সত্যি বলছেন ?'—প্রদ্যোতবাবু যথারীতি অবাক।

'এই যে রইলেন এতক্ষণ, দেখলেন একটাও অন্য কোনও পাখি ?'

প্রদ্যোতবাবুর খেয়াল হল যে সত্যিই দেখেননি। 'কিন্তু আপনার চাকর-বাকর টিকে আছে ? চঞ্চুবাবাজিকে বরদাস্ত করতে পারে তো ?'

'জয়কেষ্ট খাঁচার দিকে এগোয়-টেগোয় না,' বললেন তুলসীবাবু, 'তবে নটবর চিমটে করে মাংসের টুকরো ঢুকিয়ে দেয়। তার আপত্তি থাকলেও সে মুখে প্রকাশ করেনি। আর পাখি যদি দুষ্টুমি করেও, আমি একবারটি গিয়ে দাঁড়ালেই সে বশ মেনে যায়। —ইয়ে, আপনি ছবি তুললেন কী কারণে !'

প্রদ্যোতবাবু আসল কারণটা চেপে গেলেন। বললেন, 'কোন্‌দিন মরে-টরে যাবে, একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকা ভাল নয় কি ?'

প্রদ্যোতবাবুর ছবি প্রিন্ট হয়ে এল পরদিনই। তার মধ্যে থেকে ভালটা নিয়ে দুটো এনলার্জমেন্ট করিয়ে একটা আপিসে তুলসীবাবুকে দিলেন, অন্যটা নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন মালেন স্ট্রিটে পক্ষিবিদ্ রণজয় সোমের বাড়ি। সম্প্রতি দেশ পত্রিকায় সিকিমের পাখি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন সোম সাহেব।

কিন্তু তিনি পাখির ছবি দেখে চিনতে পারলেন না। কোথায় পাখিটা দেখা যায় জিজ্ঞেস করাতে প্রদ্যোতবাবু অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বললেন।—'ছবিটা ওসাকা থেকে আমার এক বন্ধু পাঠিয়েছে। সেও নাকি পাখির নাম জানে না।'

তারিখটা ডাইরিতে নোট করে রাখলেন তুলসীবাবু। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮০। গত মাসেই কেনা সাড়ে চার ফুট উঁচু নতুন খাঁচায় রাখা সাড়ে তিন ফুট উঁচু পোষা পাখি বৃহচ্চঞ্চু গতকাল মাঝরাত্রে একটা কাণ্ড করে বসেছে।

একটা সন্দেহজনক শব্দে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল তুলসীবাবুর। কট্‌কট্ কটাং কটাং কট্‌কট্...। ঘুম ভাঙার মিনিট খানেকের মধ্যেই শব্দটা থেমে গেল। তারপর সব নিস্তব্ধ।

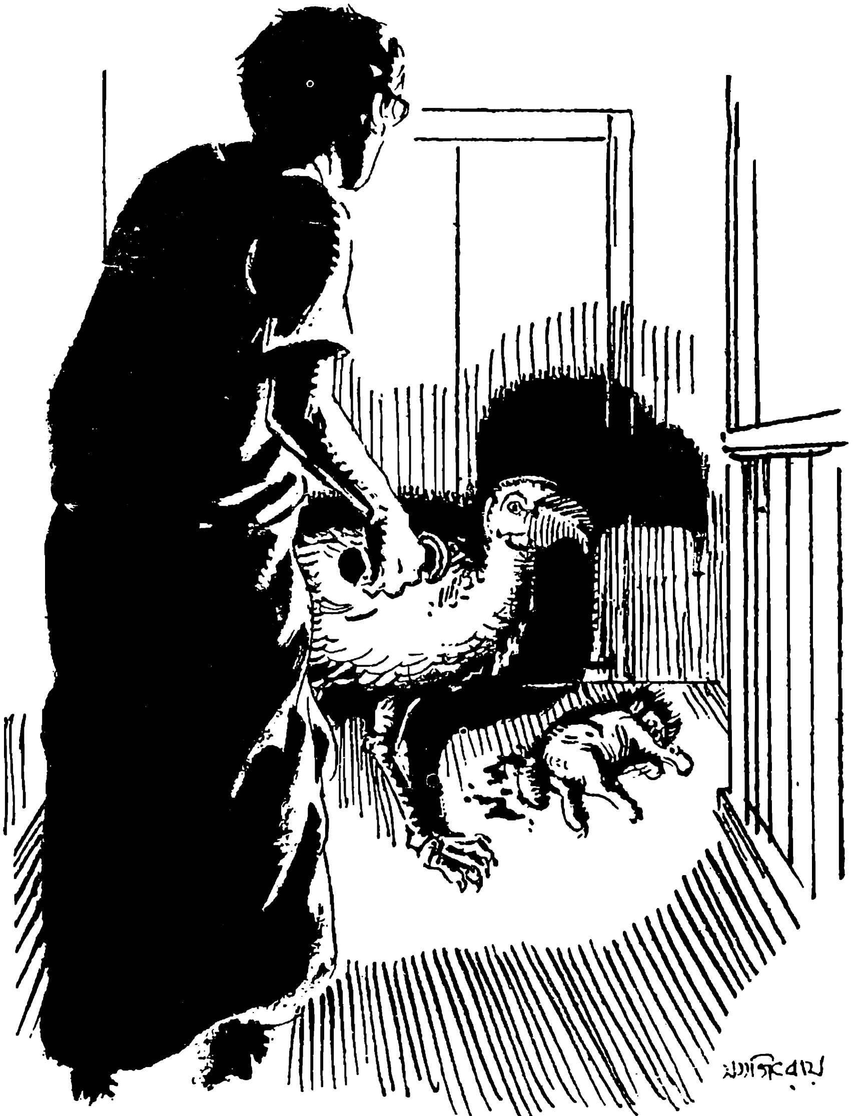

মন থেকে সন্দেহটা গেল না। তুলসীবাবু মশারিটা তুলে খাট থেকে নেমে পড়লেন। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। তারই আলোতে চটিজোড়ায় পা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

টর্চের আলো খাঁচাটার উপর পড়তেই দেখলেন নতুন খাঁচার মজবুত তার ছিঁড়ে দিব্যি একটা বেরোনোর পথ তৈরি হয়ে গেছে।

খাঁচা অবিশ্যি খালি।

টর্চের আলো ঘুরে গেল বারান্দার উলটো দিকে। চঞ্চু নেই।

সামনে সিঁড়ির মুখটাতে বারান্দা ডাইনে ঘুরে চলে গেছে তড়িৎবাবুর ঘরের দিকে। একটা শব্দ—

তুলসীবাবু রুদ্ধশ্বাসে বারান্দার মোড়ে গিয়ে আলো ফেললেন বিপরীত দিকে।

যা ভেবেছিলেন তাই। তড়িৎবাবুর হুলো চঞ্চুর ডাকসাইটে ঠোঁটের মধ্যে অসহায় বন্দি। মেঝেতে টর্চের আলোয় যেটা চিক্চিক করছে সেটা রক্ত ছাড়া আর কিছুই না। তবে হুলোটা এখনও জ্যান্ত সেটা তার চার পায়ের ছটফটানি থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

আশ্চর্য এই যে আলো চোখে পড়া এবং তুলসীবাবু ধমকের সুরে 'চঞ্চু' বলার সঙ্গে সঙ্গে পাখি ঠোঁট ফাঁক করে হুলোটাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বড় বড় পা ফেলে ও-মাথা থেকে এ-মাথা এসে মোড় ঘুরে সটান গিয়ে ঢুকল নিজের খাঁচার ভিতর।

এই বিভীষিকার মধ্যেও তুলসীবাবু হাঁফ না ছেড়ে পারলেন না।

তড়িৎবাবুর ঘরের দরজায় তালা। সারা ডিসেম্বর ও জানুয়ারি স্কুলপাঠ্য বই ছাপানোর ঝামেলা মিটিয়ে ভদ্রলোক দিন তিনেক হল চলে গেছেন কলকাতার বাইরে বিশ্রামের জন্য।

হুলোটাকে ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেই নিশ্চিন্ত। কত গাড়ি যায় রাতবিরেতে রাস্তা দিয়ে—কলকাতা শহরে দিনে রাতে কত কুকুর বেড়াল গাড়ি চাপা পড়ে মরে তার কি কোনও হিসেব আছে?

বাকি রাতটা ঘুম হল না তুলসীবাবুর।

পরদিন আপিস থেকে ঘণ্টা খানেকের ছুটি নিয়ে রেলওয়ে বুকিং আপিসে গেলেন। একজন চেনা লোক ছিল কেরানিদের মধ্যে, তাই কাজ হাসিল হতে বেশি সময় লাগল না। প্রদ্যোতবাবু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার চঞ্চুর খবর কী মশাই?' তাতে তুলসীবাবু ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছিলেন—'ভালই।' তারপর এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলেছিলেন, 'আপনার দেওয়া ছবিটা ভাবছি বাঁধিয়ে রাখব।'

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি তুলসীবাবু দ্বিতীয়বার বিজয়নগরম হয়ে জগদলপুর হাজির হলেন। সঙ্গে ব্রেকভ্যানে এল একটা প্যাকিং কেস, যার গায়ে ফুটো থাকায় তার ভিতরের খাঁচার পাখির নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কোনও অসুবিধা হয়নি।

জগদলপুর থেকে একটি টেম্পো ভাড়া করে সঙ্গে দু'জন কুলি নিয়ে তুলসীবাবু রওনা দিলেন দণ্ডকারণ্যের সেই জঙ্গলের সেই বিশেষ জায়গাটির উদ্দেশে, যেখানে চঞ্চুকে শাবক অবস্থায় পেয়েছিলেন তিনি।

চেনা জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে কুলির মাথায় বাক্স চাপিয়ে আধঘণ্টার পথ হেঁটে সেই ঝলসানো নিম গাছের ধারে গিয়ে তুলসীবাবু থামলেন। কুলিরাও মাথা থেকে বাক্স নামাল। তাদের আগে থেকেই ভাল বকশিশ দেওয়া ছিল, আর বলা ছিল যে প্যাকিং কেসটা তাদের খুলতে হবে।

পেরেক খুলে কাঠ চিরে ফেলে খাঁচা বাইরে বার করার পর তুলসীবাবু দেখে নিশ্চিন্ত হলেন যে পাখি দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে। এ হেন জীবের দর্শন পেয়ে কুলি দুটো স্বভাবতই পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে পালাল। কিন্তু তাতে তুলসীবাবুর কোনও উদ্বেগ নেই। তাঁর কাজ হয়ে গেছে। খাঁচার ভিতর চঞ্চু একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। তার মাথা এখন সাড়ে চার ফুট উঁচু, খাঁচার ছাত ছুঁই ছুঁই করছে।

'আসি রে চঞ্চু!'

আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। তুলসীবাবু একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে টেম্পোর উদ্দেশে রওনা দিলেন।

তুলসীবাবু কোথায় যাচ্ছেন সেটা আপিসে কাউকে বলে যাননি। এমন কী প্রদ্যোতবাবুকেও না। পাওনা থেকে পাঁচদিন ছুটি নিয়ে মাঝ সপ্তাহে বেরিয়ে পড়ে সোমবার আবার আপিসে হাজিরা দেবার পর প্রদ্যোতবাবু স্বভাবতই জিজ্ঞেস করলেন এই অকস্মাৎ অন্তর্ধানের কারণ। তুলসীবাবু সংক্ষেপে জানালেন নৈহাটিতে তাঁর এক ভাগনির বিয়ে ছিল।

এর দিন পনেরো পরে প্রদ্যোতবাবু একদিন তাঁর বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে খাঁচা সমেত পাখি উধাও দেখে ভারী অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করে উত্তর পেলেন, 'পাখি আর নেই।'

প্রদ্যোতবাবুর মনটা খচ্খচ্ করে উঠল। তিনি নেহাতই হাল্কা ভাবে বলেছিলেন পাখি মরে

যাবার কথা ; এভাবে এত অল্প দিনের মধ্যেই কথাটা ফলে যাবে সেটা ভাবতে পারেননি। দেয়ালে তাঁরই তোলা চঞ্চুর ছবি টাঙানো রয়েছে ; তুলসীবাবুরও কেমন জানি নিঝুম ভাব—সব মিলিয়ে প্রদ্যোতবাবুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। যদি বন্ধুর মনে কিছুটা ফুর্তি আনা যায় তাই বললেন, 'অনেকদিন মনসুরে যাওয়া হয় নি মশাই। চলুন কাবাব খেয়ে আসি।'

'ওসবে আর রুচি নেই', বললেন তুলসীবাবু।

প্রদ্যোতবাবু আকাশ থেকে পড়লেন।—'সে কী মশাই, কাবাবে অরুচি ? আপনার কি শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি ? আপনার তো এতরকম ওষুধ জানা আছে—একটা কিছু খান !—সেই সাধু যে পাতার সন্ধান দিল, তাতে ফল হয় কি না দেখেছেন ?'

তুলসীবাবু জানালেন সেই পাতার রস খাবার পর থেকে তাঁর রক্তের চাপ একদম স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এটা আর বললেন না যে যদ্দিন পাখি ছিল তদ্দিন চক্রপর্ণের গুণ পরীক্ষা করার কথা তাঁর মনেই আসেনি। এই সবে দিন দশেক হল তিনি আবার কবিরাজিতে মন দিয়েছেন।

'ভাল কথা', বললেন প্রদ্যোতবাবু, 'চক্রপর্ণ বলতে মনে পড়ল—আজ কাগজে দণ্ডকারণ্যের খবরটা পড়েছেন ?'

'কী খবর ?'

তুলসীবাবু কাগজ রাখেন, কিন্তু সামনের পাতার বেশি আর এগোনো হয় না। কাগজটা হাতের কাছেই টেবিলের উপর ছিল। প্রদ্যোতবাবু খবরটা বার করে দিলেন। বেশ বড় হরফেই শিরোনাম রয়েছে—'দণ্ডকারণ্যের বিভীষিকা'।

খবরে বলছে গত দশ দিন ধরে দণ্ডকারণ্যের আশেপাশে অবস্থিত গ্রাম থেকে নানারকম গৃহপালিত পশু, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি কোনও এক জানোয়ারের খাদ্যে পরিণত হতে শুরু করেছে। দণ্ডকারণ্যে বাঘের সংখ্যা কমই, আর এ যে বাঘের কীর্তি নয় তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাঘ খাদ্য টেনে নিয়ে যায় ; এ জানোয়ার তা করে না। তা ছাড়া আধ-খাওয়া গোরু-বাছুর ইত্যাদি দেখে বাঘের কামড়ের সঙ্গে এ জানোয়ারের কামড়ের পার্থক্য ধরা পড়ে। মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত দু'জন বাঘা শিকারি এক সপ্তাহ অনুসন্ধান করেও এমন কোনও জানোয়ারের সন্ধান পাননি যার পক্ষে এমন হিংস্র আচরণ সম্ভব। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। একজন গ্রামবাসী দাবি করে সে নাকি একরাত্রে তার গোয়াল থেকে একটি দ্বিপদবিশিষ্ট জীবকে ঝড়ের বেগে পালাতে দেখেছে। তারপরই সে তার গোয়ালে গিয়ে তার মহিষকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। মহিষের তলপেটের বেশ খানিকটা অংশ নাকি খুবলে নেওয়া হয়েছিল।

তুলসীবাবু খবর পড়ে কাগজটা ভাঁজ করে আবার টেবিলের উপর রেখে দিলেন।

'এটাও কি আপনার কাছে অবাক কাণ্ড বলে মনে হচ্ছে না ?' প্রদ্যোতবাবু প্রশ্ন করলেন।

তুলসীবাবু মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ তিনি বিস্মিত হননি।

এর তিনদিন পর প্রদ্যোতবাবুর জীবনে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

সকালে চায়ের কাপ এনে সামনে রাখলেন গিন্নী, সঙ্গে প্লেটে নতুন প্যাকেট থেকে বার করা তিনখানা ডাইজেসটিভ বিস্কুট। সেদিকে চোখ পড়তেই প্রদ্যোতবাবু হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

আর তার পরেই তাঁর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল।

মিনিবাসে করে একডালিয়া রোডে তাঁর কলেজের বন্ধু অনিমেষের কাছে যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর নাড়ী চঞ্চল।

বন্ধুর হাত থেকে খবরের কাগজটা ছিনিয়ে পাশে ফেলে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'তোর রিডার্স ডাইজেস্টগুলো কোথায় চট্ করে বল—বিশেষ দরকার।'

অন্য অনেকের মতোই অনিমেষ সরকারের প্রিয় পাঠ্য পুস্তক হল রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকা। বন্ধুর আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করারও সময় পেলেন না তিনি। উঠে গিয়ে বুকশেলফের তলার তাক থেকে এক গোছা পত্রিকা বার করলেন টেনে।

'কোন মাসেরটা চাচ্ছিস ?'

ঝড়ের বেগে এ সংখ্যা ও সংখ্যা উলটে দেখে অবশেষে যা খুঁজছিলেন তা পেলেন প্রদ্যোতবাবু।

'এই চেহারা—এগজ্যাক্টলি !'

একটি পাখির ছবির উপর আঙুল রেখেছেন প্রদ্যোতবাবু। জ্যান্ত পাখি নয়। শিকাগো ন্যাচরেল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে রাখা একটি পাখির আনুমানিক মূর্তি। হাতে বুরুশ নিয়ে মূর্তিটিকে পরিষ্কার করছে মিউজিয়ামের এক কর্মচারী।

'অ্যান্ডালগ্যালর্নিস,' নামটা পড়ে বললেন প্রদ্যোতবাবু। 'অর্থাৎ টেরর বার্ড—ভয়াল পাখি। আয়তন বিশাল, মাংসাশী, ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী, আর অসম্ভব হিংস্র।'

প্রদ্যোতবাবুর মনে যে সন্দেহটা উঁকি দিয়েছিল সেটা সত্যি বলে প্রমাণ হল যখন পরদিন তুলসীবাবু আপিসে এসে বললেন যে তাঁকে আরেকবারটি দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে, এবং তিনি খুব খুশি হবেন যদি প্রদ্যোতবাবু তাঁর সঙ্গে যান। হাতিয়ার সমেত। ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া মুশকিল হতে পারে, কিন্তু তাতে পেছপা হলে চলবে না, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি।

প্রদ্যোতবাবু রাজি হয়ে গেলেন।

অ্যাডভেঞ্চারের উৎসাহে দুই বন্ধু ট্রেনযাত্রার গ্লানি অনুভব করলেন না। প্রদ্যোতবাবু যে রিডার্স ডাইজেস্টে পাখিটার কথা পড়েছেন সেটা আর বললেন না ; সেটা বলার সময় ঢের আছে। তুলসীবাবু সবই বলে দিয়েছেন তাঁকে, আর সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ রহস্য করেছেন এটাও বলে যে, পাখিকে মারার প্রয়োজন হবে বলে তিনি মনে করেন না, বন্দুক নিতে বলেছেন শুধু সাবধান হবার জন্য। প্রদ্যোতবাবু বন্ধুর কথায় কান দেননি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে তাঁকে এটা তিনি স্থির করে নিয়েছেন। গত রবিবারের কাগজে খবর বেরিয়েছে যে এই নৃশংস প্রাণীকে যে হত্যা করতে পারবে, মধ্য প্রদেশ সরকার তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। এই প্রাণী এখন নরখাদকের পর্যায়ে এসে পড়েছে ; একটি কাঠুরের ছেলে সম্প্রতি তার শিকারে পরিণত হয়েছে।

জগদলপুরে পৌঁছে বনবিভাগের কর্তা মিঃ তিরুমালাইয়ের সঙ্গে কথা বলে শিকারের অনুমতি পেতে অসুবিধা হল না। তবে তিরুমালাই সতর্ক করে দিলেন যে স্থানীয় কোনও লোককে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যাবে না। কোনও লোকই ওই বনের ত্রিসীমানায় যেতে রাজি হচ্ছে না।

প্রদ্যোতবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আর যে-সব শিকারি আগে গেছে তাদের কাছ থেকে কিছু জানা গেছে কি ?'

তিরুমালাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'এ পর্যন্ত চারজন শিকারি প্রাণীটির সন্ধানে গিয়েছিল। প্রথম তিনজন বিফল হয়ে ফিরে এসেছেন। চতুর্থজন ফেরেননি।'

'ফেরেননি ?'

'না। তারপর থেকে আর কেউ যেতে চাচ্ছে না। আপনারাও যাবেন কি না সেটা ভাল করে ভেবে দেখুন।'

প্রদ্যোতবাবুর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তুলসীবাবুর শান্ত ভাব দেখে তিনি জোর করে মনে সাহস ফিরিয়ে আনলেন। বললেন, 'আমরা তাও যাব।'

এবারে হাঁটতে হল আরও বেশি, কারণ ট্যাক্সিওয়ালা মেন রোড ছেড়ে বনের ভেতরের রাস্তা দিয়ে যেতে রাজি হল না। তুলসীবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে ; পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দেওয়া হবে শুনে ট্যাক্সি সেই সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা করতে রাজি হল। দুই বন্ধু গাড়ি থেকে নেমে বনের সেই বিশেষ অংশটির উদ্দেশে রওনা দিলেন।

বসন্তকাল, তাই বনের চেহারা বদলে গেছে, গাছপালা সবই ঋতুর নিয়ম মেনে চলছে। কচি সবুজে চারদিক ছেয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে পাখির ডাক একেবারেই নেই। কোয়েল দোয়েল পাপিয়া কবিদের একচেটিয়া বসন্তের পাখি সব গেল কোথায় ?

তুলসীবাবুর কাঁধে এবারও তাঁর ঝোলা। তাতে একটি খবরের কাগজের মোড়ক রয়েছে সেটা প্রদ্যোতবাবু জানেন, যদিও তাতে কী আছে জানেন না। তুলসীবাবু ভোরে উঠে বেরিয়েছিলেন,

কিন্তু কোথায় গিয়েছিলেন সেটা জিজ্ঞেস করা হয়নি। প্রদ্যোতবাবুর নিজের সঙ্গে রয়েছে তাঁর বন্দুক ও টোটা।

গতবারের তুলনায় আগাছা কম থাকাতে বনের মধ্যে দৃষ্টি অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে। তাই একটা দেবদারু গাছের পিছনে উপুড় হওয়া পা ছড়ানো মানুষের দেহটাকে বেশ দূর থেকেই দেখতে পেলেন প্রদ্যোতবাবু। তুলসীবাবু দেখেননি। প্রদ্যোতবাবু থেমে ইশারা করায় তাঁকে থামতে হল।

প্রদ্যোতবাবু বন্দুকটাকে শক্ত করে বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেলেন দেহটার দিকে। তুলসীবাবুর ভাব দেখে মনে হল এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কৌতূহল নেই।

অর্ধেক পথ গিয়ে প্রদ্যোতবাবু ফিরে এলেন।

'আপনি ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন যে মশাই,' বললেন তুলসীবাবু, 'এ তো সেই চতুর্থ শিকারি ?'

'তাই হবে,' ধরা গলায় বললেন প্রদ্যোতবাবু, 'তবে লাশ শনাক্ত করা মুশকিল হবে। মুণ্ডুটাই নেই।'

বাকি পথটা দুজনে কেউই কথা বললেন না।

সেই নিম গাছটার কাছে পৌঁছতে লাগল এক ঘণ্টা, অর্থাৎ মাইল তিনেক হাঁটতে হয়েছে। প্রদ্যোতবাবু দেখলেন চক্রপর্ণের গাছটা ডালপাতা গজিয়ে আবার আগের চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে।

'চঞ্চু ! চঞ্চু !'

প্রদ্যোতবাবুর এই সংকট মুহূর্তেও হাসি পেল। কিন্তু তার পরেই মনে হল তুলসীবাবুর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। এই রাক্ষুসে পাখি যে তাঁর পোষ মেনেছিল সেটা তো তিনি নিজেই দেখেছেন।

বনের পুবদিকে পাহাড় থেকে বার বার তুলসীবাবুর ডাক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

'চঞ্চু ! চঞ্চু ! চঞ্চু !'

মিনিট পাঁচেক ডাকার পর প্রদ্যোতবাবু দেখলেন যে বেশ দূরে, গাছপালা ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে একটা কী যেন তাঁদেরই দিকে এগিয়ে আসছে, এবং এতই দ্রুত গতিতে যে তার আয়তন প্রতি মুহূর্তেই বেড়ে চলেছে।

এবার আর সন্দেহের কোনও কারণ নেই। ইনিই সেই ভয়াল পাখি।

প্রদ্যোতবাবু অনুভব করলেন তাঁর হাতের বন্দুকটা হঠাৎ যেন ভারী বলে মনে হচ্ছে। প্রয়োজনে ওটা ব্যবহার করতে পারবেন কি ?

চঞ্চু গতি কমিয়ে একটা ঝোপ ভেদ করে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল।

অ্যান্ড্যালগ্যালর্নিস। নামটা মনে থাকবে প্রদ্যোতবাবুর। মানুষের সমান উঁচু পাখি। উটপাখিও লম্বা হয়, তবে সেটা প্রধানত তার গলার জন্য। এ পাখির পিঠই তুলসীবাবুর মাথা ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ একমাসে পাখি উচ্চতায় বেড়েছে প্রায় দেড় ফুট। গায়ের রঙও বদলেছে। বেগুনির উপর কালোর ছোপ ধরেছে। আর জ্বলন্ত হলুদ চোখের ওই দৃষ্টি পাখির খাঁচাবন্দি অবস্থায় প্রদ্যোতবাবুর সহ্য করতে অসুবিধা হয়নি, কিন্তু এখন সে-চোখের দিকে চাওয়া যায় না। পাখির দৃষ্টি সটান তার প্রাক্তন মালিকের দিকে।

পাখি কী করবে জানা নেই। তার স্থির নিশ্চল ভাব আক্রমণের আগের অবস্থা হতে পারে মনে করেই বোধ হয় প্রদ্যোতবাবুর কাঁপা হাতে ধরা বন্দুকটা খানিকটা উঁচিয়ে উঠেছিল। ওঠামাত্র পাখির দৃষ্টি বন্দুকের দিকে ঘুরল আর তার পরমুহূর্তেই প্রদ্যোতবাবু শিউরে উঠলেন দেখে যে পাখির গায়ের প্রত্যেকটি পালক উঁচিয়ে উঠে তার আকৃতি আরও শতগুণে ভয়াবহ করে তুলেছে।

'ওটা নামিয়ে ফেলুন', চাপা ধমকের সুরে বললেন তুলসীবাবু।

প্রদ্যোতবাবুর হাত নেমে এল, আর সেই সঙ্গে পাখির পালকও নেমে এল। তার দৃষ্টিও আবার ঘুরে গেল তুলসীবাবুর দিকে।

'তোর পেটে জায়গা আছে কি না জানি না, তবে আমি দিচ্ছি বলে যদি খাস।'

তুলসীবাবু ঝোলা থেকে ঠোঙাটা আগেই বার করেছিলেন, এবার তাতে একটা ঝাঁকুনি দেওয়াতে একটি বেশ বড় মাংসের খণ্ড ছিট্‌কে বেরিয়ে পাখিটার সামনে গিয়ে পড়ল।

'অনেক লজ্জা দিয়েছিস আমাকে, আর দিসনি।'

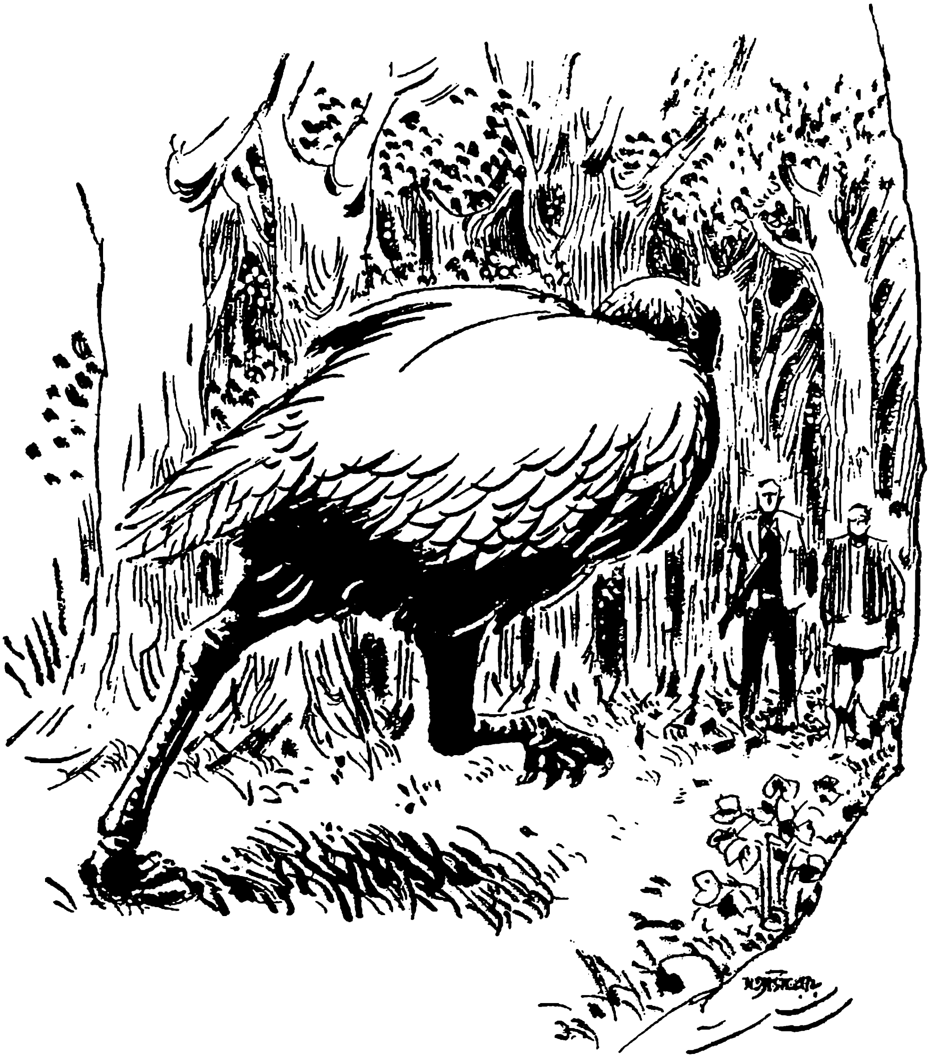

প্রদ্যোতবাবু অবাক হয়ে দেখলেন যে পাখিটা ঘাড় নিচু করে ঠোঁট দিয়ে মাটি থেকে মাংসখণ্ড তুলে নিয়ে তার মুখে পুরল।

'এবার সত্যিই গুডবাই।'

তুলসীবাবু ঘুরলেন। প্রদ্যোতবাবু চট্ করে পাখির দিকে পিঠ করার সাহস না পেয়ে কিছুক্ষণ পিছু হাঁটলেন। তারপর পাখি এগোচ্ছে না বা আক্রমণ করার কোনও লক্ষণ দেখাচ্ছে না দেখে ঘুরে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা শুরু করলেন।

দণ্ডকারণ্যের রাক্ষুসে প্রাণীর অত্যাচার রহস্যজনকভাবে থেমে যাবার খবর কাগজে বেরোল দিন সাতেক পরে। পাছে বিস্ময় প্রকাশ না করে রসভঙ্গ করেন, তাই প্রদ্যোতবাবু অ্যান্ডালগ্যালর্নিসের কথা, বা সে পাখি যে আজ ত্রিশ লক্ষ বছর হল পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সে কথা কিছুই

বলেননি তুলসীবাবুকে। আজ খবরটা পড়ে আপিসে এসে তাঁকে আসতেই হল বন্ধুর কাছে। বললেন, 'আমার মন বলছে আপনি এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেন। আমি তো মশাই অথৈ জলে।'

'ব্যাপারটা কিছুই না,' কাজ বন্ধ না করেই বললেন তুলসীবাবু, 'মাংসের সঙ্গে ওষুধ মেশানো ছিল।'

'ওষুধ ?'

'চক্রপর্ণের রস,' বললেন তুলসীবাবু, 'আমিষ ছাড়ায়। যেমন আমাকে ছাড়িয়েছে।'

সন্দেশ, ফাল্গুন ১৩৮৬

চিলেকোঠা

ন্যাশনাল হাইওয়ে নাম্বার ফর্টি থেকে ডাইনে রাস্তা ধরে দশ কিলোমিটার গেলেই ব্রহ্মপুর। মোড়টা আসার কিছু আগেই আদিত্যকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে, তোর জন্মস্থানটা একবার ঢুঁ মেরে যাবি নাকি ? সেই যে ছেড়েছিস, তারপর তো আর আসিসনি।'

'তা আসিনি,' বলল আদিত্য, 'উনত্রিশ বছর। অবিশ্যি আমাদের বাড়িটা নির্ঘাত এখন ধ্বংসস্তূপ। যখন ছাড়ি তখনই বয়স ছিল প্রায় দুশো বছর। ইস্কুলটারও কী দশা জানি না। বেশি সংস্কার হয়ে থাকলে তো চেনাই যাবে না। ছেলেবেলার স্মৃতি ফিরে পাব এমন আশা করে গেলে ঠকতে হবে। তবে হ্যাঁ, নগাখুড়োর চায়ের দোকানটা এখনও থাকলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে মন্দ হয় না।'

ধরলাম ব্রহ্মপুরের রাস্তা। আদিত্যদের জমিদারি ছিল ওখানে। স্বাধীনতার বছর খানেকের মধ্যেই আদিত্যর বাবা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মপুরের পাট উঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় এসে ব্যবসা শুরু করেন। আদিত্য ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিল ব্রহ্মপুর থেকেই, কলেজের পড়াশুনা হয় কলকাতায়। তখন আমি ছিলাম ওর সহপাঠী। ছিয়াত্তরে আদিত্যর বাবা মারা যান। তারপর থেকে ছেলেই ব্যবসা দেখে। আমি ওর অংশীদার এবং বন্ধু। আমাদের নতুন ফ্যাক্টরি হচ্ছে দেওদারগঞ্জে, সেইটে দেখে ফিরছি আমরা। গাড়িটা আদিত্যরই। যাবার পথে ও চালিয়েছে, ফেরবার পথে আমি। এখন বাজে সাড়ে তিনটে। মাসটা মাঘ, রোদটা মিঠে, রাস্তার দু'ধারে দিগন্তবিস্তৃত খেতের ধান কাটা হয়ে গেছে কিছুদিন হল। ফসল এবার ভালই হয়েছে।

পাকা রাস্তা ধরে মিনিট দশেক চলার পরেই গাছপালা দালানকোঠা দেখা গেল। ব্রহ্মপুর হল যাকে বলে শহর বাজার জায়গা। লোকালয় আসার অল্পক্ষণের মধ্যেই আদিত্য বলল, 'দাঁড়া।'

বাঁয়ে ইস্কুল। গেটের উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি লোহার ফ্রেমের ভিতর লোহার অক্ষরে লেখা 'ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল, প্রতিষ্ঠা ১৮৭২'। গেট পেরিয়ে রাস্তার বাঁ পাশে খেলার মাঠ, রাস্তার শেষে দোতলা স্কুল বাড়ি। আমরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

'স্মৃতির সঙ্গে মিলছে ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আদপেই না,' বলল আদিত্য, 'আমাদের ইস্কুল ছিল একতলা, আর ডাইনে ও বিল্ডিংটা ছিল না। ওটা আমাদের হাডুডু খেলার জায়গা ছিল।'

'তুই তো ভাল ছাত্র ছিলি, তাই না ?'

'তা ছিলুম, তবে আমার বাঁধা পোজিশন ছিল সেকেন্ড।'

'ভেতরে যাবি ?'

'পাগল !'

মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে গাড়িতে ফিরে এলাম দুজনে।

'তোর সেই চায়ের দোকানটা কোথায় ?'

'এখান থেকে তিন ফার্লং। সোজা রাস্তা। একটা চৌমাথার মোড়ে। পাশেই একটা মুদির দোকান ছিল, আর উলটোদিকে শিবমন্দির। পোড়া ইটের কাজ দেখতে আসত কলকাতা থেকে লোকেরা।'

আমরা আবার রওনা দিলাম।

'তোদের বাড়িটা কোথায় ?'

'শহরের শেষ মাথায়। ও বাড়ি দেখে মন খারাপ করার কোনও বাসনা নেই আমার।'

'তবু একবার যাবি না ?'

'সেটা পরে ভাবা যাবে। আগে চা।'

চৌমাথা এসে গেল দেখতে দেখতে। মন্দিরের চুড়োটা একটু আগে থেকেই দেখা যাচ্ছিল, কাছে যেতে আদিত্যর মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল একটা দোকানের উপর সাইনবোর্ডে—'নগেন'স টি ক্যাবিন'। পাশে মুদির দোকানটাও রয়েছে এখনও। আসলে উনত্রিশ বছরে মানুষের চেহারার অনেকটা পরিবর্তন হলেও, এইসব শহরের রাস্তাঘাট দোকানপাটের চেহারা খুব একটা বদলায় না।

শুধু দোকান নয়, দোকানের মালিকও বর্তমান। ষাটের উপর বয়স, রোগা পট্‌কা চাষাড়ে চেহারা, হিসেব করে আঁচড়ানো ধবধবে সাদা চুল, দাড়ি গোঁফ কামানো, পরনে খাটো ধুতির উপর নীল ডোরা কাটা সার্টের তলার অংশটা দেখা যাচ্ছে সবুজ চাদরের নীচ দিয়ে।

'কোত্থেকে এলেন আপনারা ?' একবার গাড়ির দিকে, একবার দুই আগন্তুকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন নগেনবাবু। স্বভাবতই আদিত্যকে চিনতে পারার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

'দেওদারগঞ্জ', বলল আদিত্য,'যাব কলকাতা।'

'এখানে— ?'

'আপনার দোকানে চা খেতে আসা।'

'তা খাবেন বইকী। শুধু চা কেন, ভাল বিস্কুট আছে, চানাচুর আছে।'

'বরং নানখাটাই দিন দুটো করে।'

আমরা দুটো টিনের চেয়ারে বসলাম। দোকানে আর লোক বলতে কোণের টেবিলে একজন মাত্র, যদিও তার সামনে খাদ্য বা পানীয় কিছুই নেই। মাথা হেঁট, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

'ও সান্ডেল মশাই', কোণের ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে বেশ খানিকটা গলা তুলে বললেন নগেনবাবু—'চারটে বাজতে চলল। বাড়িমুখো হন এবার। অন্য খদ্দের আসার সময় হল।'—তারপর আমাদের দিকে ফিরে চোখ টিপে বললেন, 'কানে খাটো। চোখেও চালশে। তবে চশমা করাবেন সে সংগতি নেই।'

বুঝলাম এই ভদ্রলোকটি একটি মশকরার পাত্র। শুধু তাই না। নগেনবাবুর কথার যে প্রতিক্রিয়া হল, তাতে ভদ্রলোকের মাথার ঠিক আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। আমাদের দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য চেয়ে থেকে শরীরটাকে একবার ঝেড়ে নিয়ে সান্যাল মশাই তাঁর শীর্ণ ডান হাতটা বাড়িয়ে চাল্‌শে-পড়া চোখ দুটো পাকিয়ে শুরু করলেন আবৃত্তি—

'মারাঠা দস্যু আসিছে রে ওই, করো করো সবে সাজ,
আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া দুর্গেশ দুমরাজ—'

এই থেকে শুরু করে ভদ্রলোক বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দোকানের বাইরে এসে রবীন্দ্রনাথের পণরক্ষা কবিতাটা পুরো আবৃত্তি করে, কোনও বিশেষ কাউকে লক্ষ্য না করেই একটা নমস্কার ঠুকে একটু যেন বেসামাল ভাবেই চৌরাস্তার একটা রাস্তা ধরে চলে গেলেন সোজা হয়তো তাঁর নিজের বাড়ির দিকেই। চৌরাস্তায় লোকের অভাব নেই, বিশেষত মন্দিরের সামনে আট-দশ জন লোক শুয়ে বসে রোদ পোহাচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে তাদের কারুরই এই আবৃত্তি শুনে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। ব্যাপারটা যেন কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। আসলে পাগলের প্রলাপের বেশির ভাগটাই বাতাসে হারিয়ে যায়। তাতে কেউ কান দেয় না।

পাগল আরও ঢের দেখেছি, তাই ঘটনাটাকে আমার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে কোনও অসুবিধা হল না। কিন্তু আদিত্যর দিকে চেয়ে বেশ একটু হকচকিয়ে গেলাম। তার চোখেমুখের ভাব পালটে গেছে। কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে কোনও জবাব না দিয়ে নগেনবাবুকে প্রশ্ন করল, 'ভদ্রলোক কে বলুন তো ? করেন কী ?'

নগেনবাবু নিজের হাতেই দু' গেলাস চা আর একটা প্লেটে চারটে নানখাটাই আমাদের সামনে এনে রেখে বললেন, 'শশাঙ্ক সান্যাল ? কী আর করবে। অভিশপ্ত জীবন মশাই, অভিশপ্ত জীবন ! চোখ-কানের কথা তো বললুম ; মাথাটাও গেছে বোধ হয়। তবে পুরনো কথা একটিও ভোলেনি। ইস্কুলে শেখা আবৃত্তি শুনিয়ে শুনিয়ে ব্রহ্মপুরের সকলের কান পচিয়ে দিয়েছে। ইস্কুল মাস্টারের ছেলে, বাপ মরেছে অনেক কাল। সামান্য জমিজমা ছিল। একটিমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে তার বেশির ভাগটাই গেছে। বউও মরেছে বছর পাঁচেক হল। একটি ছেলে ছিল, বি কম পাশ করে চাকরি পেয়েছিল কলকাতায়—মিনিবাস থেকে পড়ে মারা গেছে গত বছর। সেই থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে।'

'কোথায় থাকেন ?

'যোগেশ কোবরেজ ছিলেন ওর বাপের বন্ধু ; তাঁরই বাড়িতে একটা ঘরে থাকেন, ওঁরা দুবেলা দুটি খেতে দেন। আমার এখানে এসে চা বিস্কুট খান ওই কোণে বসে। পেমেন্টটিও করা চাই, কারণ আত্মসম্মানবোধটি আছে পুরোমাত্রায়। যদিও এ ভাবে ক'দিন চলবে জানি না। সব মানুষের সময় তো সমান যায় না। আপনারা কলকাতার লোক। ঢের বেশি দেখেছেন আমাদের চেয়ে। আপনাদের আর কী বলব।'

'যোগেশ কবিরাজের বাড়ি চড়কের মাঠটার পশ্চিম দিকে না ?'

'আপনি তো জানেন দেখছি ! ব্রহ্মপুরে কি— ?'

'এককালে যোগাযোগ ছিল একটু।'

নগেনবাবুর কাছে অন্য খদ্দের এসে পড়ায় কথা আর এগোল না।

দাম চুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম। গাড়ির চারপাশে ছেলেছোকরাদের একটু জটলা হয়েছে এরই মধ্যে, তাদের সরিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠলাম। এবার আদিত্যই স্টিয়ারিং ধরল।

বলল, 'আমাদের বাড়িটা একটু ঘুরপ্যাঁচের রাস্তা। আমিই চালাই।'

'তা হলে বাড়িটা দেখার ইচ্ছে জেগেছে বল।'

'ওটা এসেনশিয়্যাল হয়ে পড়েছে।'

তাকে দেখে মনে হল আদিত্যকে জিজ্ঞেস করেও ওর মত পরিবর্তনের কারণটা এখন জানা যাবে না। ওর স্নায়ুগুলো যেন সব টান টান হয়ে আছে।

আমরা রওনা দিলাম।

চৌমাথার পুবের রাস্তা ধরে কিছুদূর গিয়ে ডাইনে বাঁয়ে খান কয়েক মোড় ঘুরে অবশেষে একটা উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়ির পাশে এসে পড়লাম। নহবতখানা সমেত জীর্ণ ফটকটায় এসে পৌঁছতে আরেকটা মোড় নিতে হল।

চারমহলা বাড়িটা যে এককালে খুবই জাঁদরেল ছিল সেটা আর বলে দিতে হয় না, যদিও এখন অবস্থাটা কঙ্কালসার। হানাবাড়ি হলেও আশ্চর্য হব না। বাড়ির গায়ে লটকানো একটা ভাঙা সাইনবোর্ড থেকে জানা যায় একটা সময় কোনও এক উন্নয়ন সমিতির অফিস ছিল এখানে। এখন একেবারে পরিত্যক্ত।

ফটক দিয়ে ঢুকে আগাছায় ঢাকা পথ দিয়ে আদিত্য গাড়িটাকে নিয়ে গিয়ে একেবারে সদর দরজার সামনে দাঁড় করাল। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। দেখে মনে হয় বছর দশেকের মধ্যে এ তল্লাটে কেউ আসেনি। বাড়ির সামনেটায় বাগান ছিল বোঝা যায়। এখন সেখানে জঙ্গল।

'তুই কি ভিতরে ঢোকার মতলব করছিস নাকি?'

আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম, কারণ আদিত্য গাড়ি থেকে নেমে দরজার দিকে এগোচ্ছে।

'ভেতরে না ঢুকলে ছাদে ওঠা যাবে না।'

'ছাদে?'

'চিলেকোঠায়', রহস্য আরও ঘন করে বলল আদিত্য।

অগত্যা আমিও গেলাম পিছন পিছন, কারণ তাকে নিরস্ত করা যাবে বলে মনে হল না।

বাড়ির ভিতরের অবস্থা আরও শোচনীয়। কড়ি-বরগাগুলো দেখে মনে হয় তাদের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, ছাদ ধসে পড়তে আর বেশিদিন নেই। সামনের ঘরটা বাইরের মহলের বৈঠকখানা। তাতে খান তিনেক ভাঙা আসবাব কোণে ডাঁই করা রয়েছে, মেঝেতে সাতপুরু ধুলো।

বৈঠকখানার পর বারান্দা পেরিয়ে ঠাকুরদালানের ভগ্নাবশেষ। এখানে কত পুজো, কত যাত্রা, কত কবিগান, পাঁচালি আর কবির লড়াই হয়েছে তার গল্প আদিত্যর কাছে শুনেছি। এখন এখানে পায়রা ইঁদুর বাদুড় আর আরশোলার রাজত্ব। ইটের ফাটলের মধ্যে বেশ কিছু বাস্তু সাপ থেকে থাকলেও আশ্চর্য হব না।

ডাইনে ঘুরে কিছুদূর গিয়েই সিঁড়ি। দৃশ্য এবং অদৃশ্য মাকড়সার জাল দু'হাত দিয়ে সরাতে সরাতে আমরা উপরে উঠলাম। দোতলায় আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই, তাই ডাইনে ঘুরে আরও খান পনেরো সিঁড়ি উঠে ছাদে পৌঁছলাম।

এই হল চিলেকোঠা।

'এটা আমার প্রিয় ঘর ছিল', বলল আদিত্য। ছেলেবেলায় চিলেকোঠার প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে জানি। আমারও ছিল। বাড়ির সব ঘরের মধ্যে এই ঘরটাতেই একাধিপত্যের সবচেয়ে বেশি সুযোগ।

এই বিশেষ চিলেকোঠাটির এক দিকে দেয়ালের খানিকটা অংশ ধসে পড়াতে একটা কৃত্রিম জানালার সৃষ্টি হয়েছে, যার ভিতর দিয়ে বাইরের আকাশ, মাঠ, ধানকলের খানিকটা অংশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর পোড়া ইটের মন্দিরের চুড়ো, সবই দেখা যাচ্ছে। সারা বাড়ির মধ্যে এই ঘরটার অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়, কারণ ঝড়ঝঞ্ঝা বয়েছে বাড়ির মাথার উপর দিয়েই সবচেয়ে বেশি। মেঝেয়

চতুর্দিকে খড়কুটো আর পায়রার বিষ্ঠা। এ ছাড়া এক কোণে আছে একটা ভাঙা আরামকেদারা, একটা ভাঙা ক্রিকেট ব্যাট, একটা দুমড়ানো বেতের ওয়েস্টপেপার বাস্কেট, আর একটা কাঠের প্যাকিং বাক্স।

আদিত্য প্যাকিং কেসটা ঘরের এক দিকে টেনে এনে বলল, 'যদি কাঠ ভেঙে পড়ি তা হলে তোর উপর ভরসা। দুর্গা দুর্গা।'

উঁচুতে ওঠার কারণ আর কিছুই না, ঘুলঘুলিতে হাত পাওয়া। সেখানে হাতড়ানোর ফলে একটি চড়ুই দম্পতির ক্ষতি হল, কারণ তাদের সদ্য তৈরি বাসাটি স্থানচ্যুত হয়ে মেঝের আরও বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে খড়কুটোয় ভরে দিল।

'যাক্, বাব্বাঃ!'

বুঝলাম আদিত্য যা খুঁজছিল সেটা পেয়েছে। জিনিসটা এক ঝলক দেখে সেটাকে একটা ক্যারমের স্ট্রাইকার বলে মনে হল। কিন্তু সেটা এখানে লুকোনো কেন, আর উনত্রিশ বছর পর সেটা উদ্ধার করার প্রয়োজন হল কেন, সেটা বুঝতে পারলাম না।

আদিত্য জিনিসটাকে রুমালে ঘষে পকেটে পুরল। ওটা কী জিজ্ঞেস করতে বলল, 'একটু পরেই বুঝবি।'

নীচে নেমে এসে গাড়িতে উঠে আবার ফিরতি পথ ধরলাম। চৌমাথার কাছাকাছি এসে আদিত্য একটা দোকানের সামনে গাড়িটাকে দাঁড় করাল। নামলাম দু'জনে।

ক্রাউন জুয়েলার্স।

দু'জনে গিয়ে ঢুকলাম স্যাকরার দোকানে।

'এই জিনিসটা একবার দেখবেন?' পকেট থেকে বার করে পুরু চশমা পরা বৃদ্ধ মালিকের হাতে জিনিসটা তুলে দিল আদিত্য।

ভদ্রলোক চাকতিটা চোখের সামনে ধরলেন। এবার আমি বুঝতে পেরেছি জিনিসটা কী।

'এ তো অনেক পুরনো জিনিস দেখছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এ জিনিস তো আজকাল আর এত বড় দেখা যায় না।'

'এটা যদি একবারটি ওজন করে দেখে দেন।'

বৃদ্ধ নিক্তিটা কাছে টেনে এনে তাতে কালসিটে পড়া চাকতিটা চাপালেন।

নেকস্ট্ স্টপ যোগেশ কবিরাজের বাড়ি। আমার মনের কোণে একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু আদিত্যর মুখের ভাব দেখে তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

কবিরাজ মশাইয়ের বাড়ির বাইরে দুটি বছর দশেকের ছেলে বসে মার্বেল খেলছিল। গাড়ি আসতে দেখে তারা গভীর কৌতূহলের সঙ্গে খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাদের জিজ্ঞেস করতে বলল সান্যাল মশাই থাকেন সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকের ঘরে।

সামনের দরজা খোলাই ছিল। বাঁয়ের ঘর থেকে আওয়াজ পাচ্ছিলাম। আরও এগোতে বুঝলাম সান্যাল মশাই আপন মনে আবৃত্তি করে চলেছেন। দেবতার গ্রাস। আমরা ঘরের দরজার মুখটায় গিয়ে দাঁড়াতেও সে আবৃত্তি চলল যতক্ষণ না কবিতা শেষ পংক্তিতে পৌঁছায়। আমরা যে এসে দাঁড়িয়েছি সেটা যেন তাঁর খেয়ালই নেই।

'একটু আসতে পারি?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল আবৃত্তি শেষ হবার পর।

ভদ্রলোক ঘুরে দেখলেন আমাদের দিকে।

'আমার এখানে তো কেউ আসে না।'

ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বর। আদিত্য বলল, 'আমরা এলে আপত্তি আছে কি?'

'আসুন।'

আমরা ঢুকলাম গিয়ে ঘরের ভিতর। তক্তপোষ ছাড়া বসবার কিছু নেই। দু'জনে দাঁড়িয়েই রইলাম। সান্যাল মশাই চেয়ে আছেন আমাদের দিকে।

'আদিত্যনারায়ণ চৌধুরীকে আপনার মনে আছে ?' আদিত্য প্রশ্ন করল।

'বিলক্ষণ,' বললেন ভদ্রলোক। 'আলালের ঘরের দুলাল। ছাত্র ভালই ছিল, তবে আমাকে কোনওদিন টেক্কা দিতে পারেনি। হিংসে করত। প্রচণ্ড হিংসে। আর মিথ্যে কথা বলত।'

'জানি,' বলল আদিত্য। তারপর পকেট থেকে একটা মোড়ক বার করে সান্যালের হাতে দিয়ে বলল, 'এইটে আদিত্য আপনাকে দিয়েছে।'

'ওটা কী ?'

'টাকা।'

'টাকা ? কত টাকা ?'

'দেড়শো। বলেছে এটা আপনি নিলে সে খুশি হবে।'

'হাসব না কাঁদব ? আদিত্য টাকা দিয়েছে আমায় ? হঠাৎ এ মতি হল কেন ?'

'সময়ের প্রভাবে তো মানুষ বদলায়। আদিত্য এখন হয়তো আর সে আদিত্য নেই।'

'আদিত্য বদলাবে ? প্রাইজ পেলুম আমি। উকিল রামশরণ বাঁড়ুজ্যের নিজের হাতে দেওয়া মেডেল। সেটা তার সহ্য হল না। সে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেল তার বাপকে দেখাবে বলে। তারপর আর ফেরতই দিলে না। বললে পকেটে ফুঁটো ছিল, গলে পড়ে গেছে।'

'এটা সেই মেডেলেরই দাম। আপনার পাওনা।'

সান্যালের চোখ কপালে উঠে গেল। ফ্যালফ্যাল করে আদিত্যর দিকে চেয়ে বলল, 'মেডেলের দাম কী রকম ? সে তো বড় জোর পাঁচ টাকা। রুপোর মেডেল তো !'

'রুপোর দাম ত্রিশগুণ বেড়ে গেছে।'

"বটে ? আশ্চর্য ! এ খবর তো জানতুম না। তবে...'

সান্যাল মশাই হাতের পনেরোটা দশ টাকার নোটের দিকে দেখলেন। তারপর মুখ তুলে চাইলেন আদিত্যর দিকে। এবার তাঁর চোখেমুখে এক অদ্ভুত নতুন ভাব। বললেন, 'এতে যে বড্ড চ্যারিটির গন্ধ এসে পড়ছে, আদিত্য !'

আমরা চুপ। সান্যাল মিটিমিটি চোখে চেয়ে আছেন আদিত্যর দিকে। তারপর মাথা নেড়ে হেসে বললেন, 'তোমার ডান গালের ওই আঁচিল দেখে নগাখুড়োর চায়ের দোকানেই আমি চিনে ফেলেছি তোমায়। আমি বুঝেছি তুমি আমায় চেনোনি, তাই সেই প্রাইজের দিনের কবিতাটাই আবৃত্তি করলুম, যদি তোমার মনে পড়ে। তারপর যখন দেখলুম তুমি আমার বাড়িতেই এলে, তখন কিছু পুরনো ঝাল না ঝেড়ে পারলুম না।'

'ঠিকই করেছ,' বলল আদিত্য, 'তোমার প্রত্যেকটা অভিযোগ সত্যি। কিন্তু এ টাকা তুমি নিলে আমি খুশি হব।'

'উঁহু', মাথা নাড়লেন শশাঙ্ক সান্যাল। 'টাকা তো ফুরিয়ে যাবে, আদিত্য। বরং মেডেলটা যদি থাকত তা হলে নিতুম। আমার ছেলেবেলার ওই একটি অপ্রিয় ঘটনা আমি ভুলে যেতুম মেডেলটা পেলে। আমার মনে আর কোনও খেদ থাকত না।'

চিলেকোঠাতে উনত্রিশ বছর লুকিয়ে রাখা মেডেল যার জিনিস তার কাছেই আবার চলে এল। এতদিনেও তার গায়ে খোদাই করে লেখাটা ম্লান হয়নি—'শ্রীমান শশাঙ্ক সান্যাল—আবৃত্তির জন্য বিশেষ পুরস্কার—১৯৪৮'।

সন্দেশ, চৈত্র ১৩৮৭

ভূতো

নবীনকে দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। অক্রূরবাবুর মন ভেজানো গেল না। উত্তরপাড়ার একটা ফাংশনে নবীন পেয়েছিল অক্রূর চৌধুরীর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়। ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম। খেলার নামটা নবীনের জানা ছিল না। সেটা বলে দেয় দ্বিজপদ। দ্বিজুর বাবা অধ্যাপক, তাঁর লাইব্রেরিতে নানান বিষয়ের বই। দ্বিজু নামটা বলে বানানটাও শিখিয়ে দিল। ভি-ই-এন-টি-আর-আই-এল-ও-কিউ-ইউ-আই-এস-এম। ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম। অক্রূর চৌধুরী মঞ্চে একা মানুষ, কিন্তু তিনি কথা চালিয়ে যাচ্ছেন আর-একজন অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে। সেই মানুষ যেন হলের সিলিং-এর কাছাকাছি কোথাও শূন্যে অবস্থান করছে। অক্রূরবাবু তাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, তারপর উত্তর আসে উপর থেকে।

'হরনাথ, কেমন আছ ?'

'আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি।'

'শুনলাম তুমি নাকি আজকাল সংগীতচর্চা করছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।'

'রাগ সংগীত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাগ সংগীত।'

'গান করো ?'

'আজ্ঞে না।'

'যন্ত্র সংগীত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী যন্ত্র ? সেতার ?'

'আজ্ঞে না।'
'সরোদ ?'
'আজ্ঞে না।'
'তবে কী বাজাও ?'
'আজ্ঞে গ্রামোফোন।'

হাসি আর হাততালিতে হল মুখর হয়ে ওঠে। প্রশ্নটা উপর দিকে চেয়ে করে উত্তরটা শোনার ভঙ্গিতে মাথাটা একটু হেঁট করে নেন অক্রূরবাবু, কিন্তু তিনি নিজেই যে উত্তরটা দিচ্ছেন সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। ঠোঁট একদম নড়ে না।

নবীন তাজ্জব বনে গিয়েছিল। এ জিনিস শিখতে না পারলে জীবনই বৃথা। অক্রূর চৌধুরী কি ছাত্র নেবেন না ? নবীনের পড়াশুনোয় আগ্রহ নেই। হাইয়ার সেকেন্ডারি পাশ করে বসে আছে বছর তিনেক। আর পড়ার ইচ্ছে হয়নি। বাপ নেই, কাকার বাড়িতেই মানুষ সে। কাকার একটা প্লাইউডের কারখানা আছে ; তাঁর ইচ্ছে নবীনকে সেখানেই ঢুকিয়ে দেন, কিন্তু নবীনের শখ হল ম্যাজিকের দিকে। হাত সাফাই, রুমালের ম্যাজিক, আংটির ম্যাজিক, বলের ম্যাজিক—এসব সে বাড়িতেই অভ্যাস করে বেশ খানিকটা আয়ত্ত করেছে। কিন্তু অক্রূর চৌধুরীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম দেখার পরে সেগুলোকে নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে।

ফাংশনের উদ্যোক্তাদের কাছেই নবীন জানল যে অক্রূরবাবু থাকেন কলকাতায় অ্যামহার্স্ট লেনে। পরদিনই ট্রেনে চেপে কলকাতায় এসে সে সোজা চলে গেল যাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে তাঁর বাড়িতে। গুরু কিন্তু বাদ সাধলেন।

'কী করা হয় এখন ?' প্রথম প্রশ্ন করলেন ভেন্‌ট্রিলোকুইস্ট। কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখে হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল নবীনের। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়, চাড়া দেওয়া ঘন কালো গোঁফ, মাথার কালো চুলের ঠিক মধ্যিখানে টেরি, তার দু'দিক দিয়ে ঢেউ খেলে চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, যদিও স্টেজে এই চোখই স্পটলাইটের আলোতে ঝিলিক মারে।

নবীন বলল সে কী করে।

'এই সব শখ হয়েছে কেন ?'

নবীন সত্যি কথাটাই বলল।—'একটু-আধটু ম্যাজিকের অভ্যাস আছে, কিন্তু এটার শখ হয়েছে আপনার সেদিনের পারফরম্যান্স দেখে।'

অক্রূরবাবু মাথা নাড়লেন।

'এ জিনিস সকলের হয় না। অনেক সাধনা লাগে। আমাকেও কেউ শেখায়নি। যদি পার তো নিজে চেষ্টা করে দেখো।'

নবীন সেদিনের মতো উঠে পড়ল, কিন্তু সাতদিন বাদেই আবার অ্যামহার্স্ট লেনে গিয়ে হাজির হল। ইতিমধ্যে সে খালি ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মের স্বপ্ন দেখেছে। এবার দরকার হলে সে অক্রূরবাবুর হাতে পায়ে ধরবে।

কিন্তু এবার আরও বিপর্যয়। এবার অক্রূরবাবু তাকে একরকম বাড়ি থেকে বারই করে দিলেন। বললেন, 'আমি যে শেখাব না সেটা প্রথমবারেই তোমার বোঝা উচিত ছিল। সেটা বোঝোনি মানে তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি না থাকলে কোনওরকম ম্যাজিক চলে না—এ ম্যাজিক তো নয়ই।'

প্রথমবারে নবীন মুষড়ে পড়েছিল, এবারে তার মাথা গরম হয়ে গেল। চুলোয় যাক অক্রূর চৌধুরী। সে যদি না শেখায় তবে নবীন নিজেই শিখবে, কুছ পরোয়া নেহি।

নবীনের মধ্যে যে এতটা ধৈর্য আর অধ্যবসায় ছিল সেটা সে নিজেই জানত না। কলেজ স্ট্রিটে একটা বইয়ের দোকান থেকে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম সম্বন্ধে একটা বই কিনে নিয়ে সে শুরু করে দিল তার সাধনা।

মোটামুটি নিয়মটা সহজ। প বর্গের অর্থাৎ প ফ ব ভ ম, কেবল এই ক'টা অক্ষর উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকে, ফলে ঠোঁট নাড়াটা ধরা পড়ে বেশি। এই ক'টা অক্ষর না থাকলে যে কোনও কথাই ঠোঁট ফাঁক করে অথচ না নাড়িয়ে বলা যায়। কোনও কথায় প বর্গের অক্ষর থাকলে

সেখানেও উপায় আছে। যেমন, 'তুমি কেমন আছ' কথাটা যদি 'তুঙি কেঙন আছ' করে বলা যায়, তা হলে আর ঠোঁট নাড়াবার দরকারই হয় না, কেবল জিভ নাড়ালেই চলে। প ফ ব ভ ম-য়ের জায়গায় ক খ গ ঘ ঙ—এই হল নিয়ম। কথোপকথন যদি হয় এই রকম—'তুমি কেমন আছ ?' 'ভাল আছি', 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না ?' 'তা পড়েছে, দিব্যি ঠাণ্ডা।'—তা হলে সেটা বলতে হবে এই ভাবে—'তুমি কেমন আছ ?' 'ঘালো আছি' 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না ?' 'তা কড়েছে, দিগ্যি ঠাণ্ডা'।

আরও আছে। উত্তরদাতার গলার আওয়াজটাকে চেপে নিজের আওয়াজের চেয়ে একটু তফাত করে নিতে হবে। এটাও সাধনার ব্যাপার, এবং এটাতেও অনেকটা সময় দিল নবীন। কাকা এবং কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে শুনিয়ে যখন সে তারিফ পেল, তখনই বুঝল যে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম ব্যাপারটা তার মোটামুটি রপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

সেই অদৃশ্য উত্তরদাতার যুগ আর আজকাল নেই। আজকাল ভেন্‌ট্রিলোকুইস্টের কোলে থাকে পুতুল। সেই পুতুলের পিছন দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাথা ঘোরায় এবং ঠোঁট নাড়ায় জাদুকর। মনে হয় জাদুকরের প্রশ্নের উত্তর বেরোচ্ছে এই পুতুলের মুখ দিয়েই।

তার আশ্চর্য প্রোগ্রেসে খুশি হয়ে কাকাই এই পুতুল বানাবার খরচ দিয়ে দিলেন নবীনকে। পুতুলের চেহারা কেমন হবে এই নিয়ে দিন পনেরো ধরে গভীর চিন্তা করে হঠাৎ এক সময় নবীনের মাথায় এল এক আশ্চর্য প্ল্যান।

পুতুল দেখতে হবে অবিকল অক্রূর চৌধুরীর মতো। অর্থাৎ অক্রূর চৌধুরীকে হাতের পুতুল বানিয়ে সে তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

একটা হ্যান্ডবিলে অক্রূর চৌধুরীর একটা ছবি ছিল সেটা নবীন সযত্নে রেখে দিয়েছিল। সেটা সে আদিনাথ কারিগরকে দেখাল।—'এইরকম গোঁফ, এই টেরি, এইরকম ঢুলুঢুলু চোখ, ফোলা ফোলা গাল।' সেই পুতুল যখন মুখ নাড়বে আর ঘাড় ঘোরাবে নবীনের কোলে বসে, তখন কী রগড়টাই না হবে ! আশা করি তার শো দেখতে আসবেন অক্রূর চৌধুরী !

সাতদিনের মধ্যে পুতুল তৈরি হয়ে গেল। পোশাকটাও অক্রূর চৌধুরীর মতো ; কালো গলাবন্ধ কোটের তলায় কোঁচা কোমরে গোঁজা ধুতি।

নেতাজী ক্লাবের শশধর বোসের সঙ্গে নবীনের আলাপ ছিল ; তাদের একটা ফাংশনে শশধরকে ধরে তার ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মের একটা আইটেম ঢুকিয়ে নিল নবীন। আর প্রথম অ্যাপিয়েরেন্সেই যাকে বলে হিট। পুতুলের একটি নামও দেওয়া হয়েছে অবশ্য—ভূতনাথ, সংক্ষেপে ভূতো। ভূতোর সঙ্গে নবীনের সংলাপ লোকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ভূতো হল ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, আর নবীন মোহনবাগানের। বাগ্‌বিতণ্ডা এতই জমেছিল যে ভূতো যে ক্রমাগত ইস্টগেংগল আর ঙোহনবাগান বলে চলেছে সেটা কেউ লক্ষই করেনি।

এর পর থেকেই বিভিন্ন ফাংশনে, টেলিভিশনে ডাক পড়তে লাগল নবীনের। নবীনও বুঝল যে ভবিষ্যৎ নিয়ে তার আর কোনও চিন্তা নেই, রুজি-রোজগারের পথ সে পেয়ে গেছে।

অবশেষে একদিন অক্রূর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল নবীনের।

মাস তিনেক হল নবীন উত্তরপাড়া ছেড়ে কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রিটে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রয়েছে। বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দি বেশ লোক, নবীনের খ্যাতির কথা জেনে তাকে সমীহ করে চলেন। সম্প্রতি মহাজাতি সদনে একটা বড় ফাংশনে নবীন এবং ভূতো প্রচুর বাহবা পেয়েছে। ফাংশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আজকাল নবীনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। নবীনের নিজের ব্যক্তিত্বেও সাফল্যের ছাপ পড়েছে, তার চেহারা ও কথাবার্তায় একটা নতুন জৌলুস লক্ষ করা যায়।

হয়তো মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানেই অক্রূরবাবু উপস্থিত ছিলেন, এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নবীনের ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন। সেদিনের আইটেমে নবীন আর ভূতোর মধ্যে কথাবার্তা ছিল পাতাল রেল নিয়ে। যেমন—

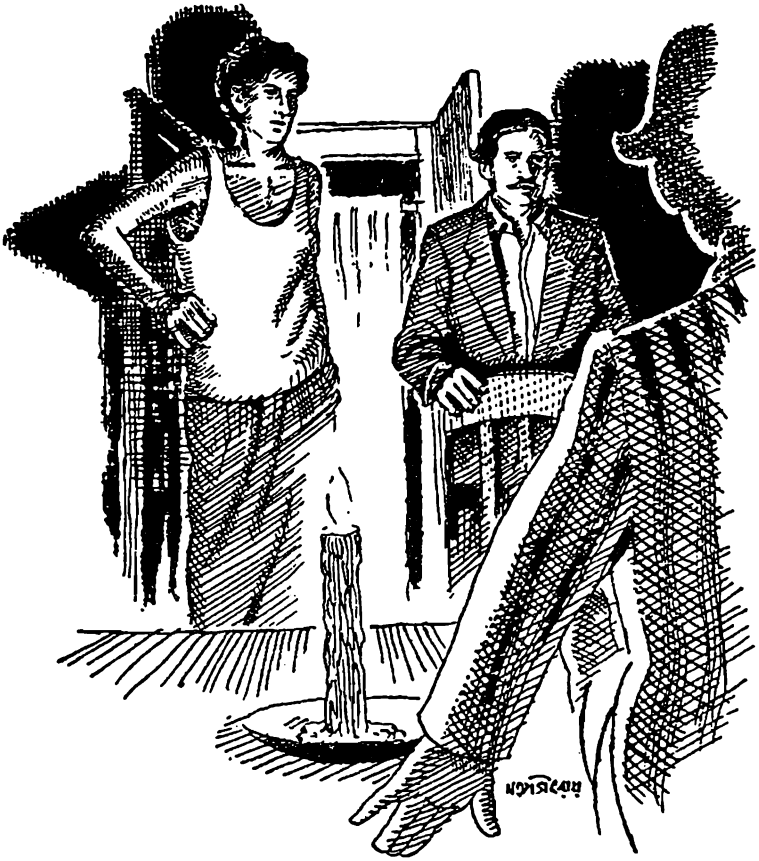

'কলকাতায় পাতাল রেল হচ্ছে জানো তো ভূতো ?'

'কই, না তো।'

'সে কী, তুমি কলকাতার মানুষ হয়ে পাতাল রেলের কথা জানো না ?'

ভূতো মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, তবে হাসপাতাল রেলের কথা শুনেছি বটে।'

'হাসপাতাল রেল ?'

'তাই তো শুনি। একটা বিরাট অপারেশন, সারা শহরের গায়ে ছুরি চলছে, শহরের এখন-তখন অবস্থা। হাসপাতাল ছাড়া আর কী ?'

আজ নবীন তার ঘরে বসে নতুন সংলাপ লিখছিল লোড শেডিংকে কেন্দ্র করে। লোড শেডিং, জিনিসের দাম বাড়া, বাসট্রামে ভিড় ইত্যাদি যে সব জিনিস নিয়ে শহরের লোক সবচেয়ে বেশি মেতে ওঠে, ভূতোর সঙ্গে সেইসব নিয়ে আলোচনা করলে দর্শক সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এটা নবীন বুঝে নিয়েছে। আজকের নকশাটাও বেশ জমে উঠেছিল, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। নবীন দরজা খুলে বেশ খানিকটা হকচকিয়ে দেখল অক্রূরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

'আসতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

নবীন ভদ্রলোককে ঘরে এনে নিজের চেয়ারটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

অক্রূরবাবু তৎক্ষণাৎ বসলেন না। তাঁর দৃষ্টি ভূতোর দিকে। সে অনড় ভাবে বসে আছে নবীনের টেবিলের এক কোণে।

অক্রূরবাবু এগিয়ে গিয়ে ভূতোকে তুলে নিয়ে তার মুখটা বেশ মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। নবীনের কিছু করার নেই। সে যে খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করছে না সেটা বললে ভুল হবে, তবে অক্রূরবাবুর হাতে অপমান হবার কথাটা সে মোটেই ভোলেনি।

'তোমার হাতের পুতুল বানিয়ে দিলে আমাকে?'

অক্রূরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

'হঠাৎ এ মতি হল কেন?'

নবীন বলল, 'কেন বানিয়েছি সেটা বোধহয় বুঝতে পারছেন। আমি অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাছে। সবটুকু ভেঙে দিয়েছিলেন আপনি। তবে এটুকু বলতে পারি—আপনার এই প্রতিমূর্তিই কিন্তু আজ আমাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। আমি খেয়ে-পরে আছি এর জন্যেই।'

অক্রূরবাবু এখনও ভূতোর দিক থেকে চোখ সরাননি। বললেন, 'তুমি জানো কি না জানি না—বারাসাতে সেদিন আমার একটা শো ছিল। স্টেজে নেমেই যদি চতুর্দিক থেকে 'ভূতো' 'ভূতো' বলে টিটকিরি শুনতে হয়, সেটা কি খুব সুখকর হয় বলে তুমি মনে করো? তোমার ভাত-কাপড় আমি জোগাতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য যে আমার ভাত-কাপড়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে? তুমি কি ভেবেছ আমি এটা এত সহজে মেনে নেব?'

সময়টা সন্ধ্যা। লোড শেডিং। টিমটিম করে দুটি মোমবাতি জ্বলছে নবীনের ঘরে। সেই আলোয় নবীন দেখল অক্রূরবাবুর চোখ দুটো স্টেজে যেমন জ্বলজ্বল করে সেই ভাবে জ্বলছে। ছোট্ট মানুষটার বিশাল একটা দোলায়মান ছায়া পড়েছে ঘরের দেয়ালে। টেবিলের উপর ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে বসে আছে ভূতনাথ—অনড়, নির্বাক্।

'তুমি জানো কি না জানি না', বললেন অক্রূরবাবু, 'ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মেই কিন্তু আমার জাদুর দৌড় শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছর বয়স থেকে আটত্রিশ বছর পর্যন্ত আমাদের দেশের একজন অজ্ঞাতনামা অথচ অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জাদুকরের শিষ্যত্ব করেছি। কলকাতা শহরে নয়; হিমালয়ের পাদদেশে এক অত্যন্ত দুর্গম স্থানে।'

'সে জাদু আপনি মঞ্চে দেখিয়েছেন কখনও?'

'না। তা দেখাইনি কারণ সে সব স্টেজে দেখানোর জিনিস নয়। রোজগারের পন্থা হিসেবে আমি সে জাদু ব্যবহার করব না এ প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম আমার গুরুকে। সে কথা আমি রেখেছি।'

'আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমি শুধু সতর্ক করে দিতে এসেছি। তোমার মধ্যে সাধনার পরিচয় পেয়ে আমি খুশিই হয়েছি। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম যেমন তোমাকে আমি শেখাইনি, তেমনি আমাকেও কেউ শেখায়নি। পেশাদারি জাদুকররা তাদের আসল বিদ্যা কাউকে শেখায় না, কোনওদিনই শেখায়নি। ম্যাজিকের রাস্তা জাদুকরদের নিজেদেরই করে নিতে হয়—যেমন তুমি করে নিয়েছ। কিন্তু তোমার পুতুলের আকৃতি নির্বাচনে তুমি যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। শুধু এইটুকু বলতে এসেছি তোমাকে।'

অক্রূরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার চুল আর গোঁফ এতদিন কাঁচা ছিল, এই সবে পাকতে শুরু করেছে। তুমি দেখছি সেটা অনুমান করে আগে থেকেই কিছু পাকা চুল লাগিয়ে রেখেছ।... যাক, আমি তা হলে আসি।'

অক্রূরবাবু চলে গেলেন।

নবীন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভূতনাথের সামনে এসে দাঁড়াল। পাকা চুল। ঠিকই। দু-একটা পাকা চুল ভূতনাথের মাথায় এবং গোঁফে রয়েছে বটে। এটা নবীন এতদিন লক্ষ করেনি। সেটাও আশ্চর্য, কারণ ভূতোকে কোলে নিলে সে নবীনের খুবই কাছে এসে পড়ে, আর সব সময় তার দিকে তাকিয়েই কথাবার্তা চলে। সাদা চুলগুলো আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

যাই হোক, নবীন আর এই নিয়ে ভাববে না। দেখার ভুল সব মানুষেরই হয়। মুখ চোখের

দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছে নবীন, চুলটা তেমন ভাল করে দেখেনি।

কিন্তু মন থেকে খটকা গেল না।

ভূতোকে বইবার জন্য নবীন একটা চামড়ার কেস করে নিয়েছিল, সেই কেসে ভরে সে পরদিন হাজির হল চিৎপুরে আদিনাথ পালের কাছে। তার সামনে কেস থেকে ভূতোকে বার করে মেঝেতে রেখে নবীন বললে, 'দেখুন তো, এই পুতুলের মাথায় আর গোঁফে যে সাদা চুল রয়েছে, সে কি আপনারই দেওয়া ?'

আদিনাথ পাল ভারী অবাক হয়ে বলল, 'এ আবার কী বলছেন স্যার। পাকা চুলের কথা তো আপনি বলেননি। বললে কাঁচা পাকা মিশিয়ে দিতে তো কোনও অসুবিধে ছিল না। দু' রকম চুলই তো আছে স্টকে ; যে যেমনটি চায়।'

'ভুল করে দু-একটা সাদা চুল মিশে যেতে পারে না কি ?'

'ভুল তো মানুষের হয় বটেই। তবে তেমন হলে আপনি পুতুল নেবার সময়ই বলতেন না কি ? আমার কী মনে হয় জানেন স্যার, অন্য কেউ এসে এ চুল লাগিয়ে দিয়েছে ; আপনি টের পাননি।'

তাই হবে নিশ্চয়ই। নবীনের অজান্তেই ঘটনাটা ঘটেছে।

চেতলায় ফ্রেন্ডস ক্লাবের ফাংশনে একটা মজার ব্যাপার হল।

ভূতোর জনপ্রিয়তার এইটেই প্রমাণ যে ফাংশনের উদ্যোক্তারা তার আইটেমটি রেখেছিলেন সবার শেষে। লোড শেডিং নিয়ে রসালো কথোপকথন চলেছে ভূতো আর নবীনে। নবীন দেখল যে ভূতোর উত্তরে সে যে সব সময় তৈরি কথা ব্যবহার করছে তা নয়। তার কথায় অনেক সময় এমন সব ইংরিজি শব্দ ঢুকে পড়ছে যেগুলো নবীন কখনও ব্যবহার করে না—বড় জোর তার মানেটা জানে। নবীনের পক্ষে এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। অবিশ্যি তার জন্য শো-এর কোনও ক্ষতি হয়নি, কারণ কথাগুলো খুব লাগসই ভাবেই ব্যবহার হচ্ছিল, আর লোকেও তারিফ করছিল খুবই। ভাগ্যে তারা জানে না যে নবীনের বিদ্যে হাইয়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত।

কিন্তু এই ইংরিজি কথার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারটা নবীনের খুব ভাল লাগেনি। তার সব সময়ই মনে হচ্ছিল অন্য একজন কেউ যেন অলক্ষ্যে তার উপর কর্তৃত্ব করছে। শো-এর পর বাড়ি ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নবীন টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ভূতোকে রাখল বাতির সামনে।

কপালের তিলটা কি ছিল আগে ? না। এখন রয়েছে। সেদিন তার ঘরে বসেই নবীন প্রথম লক্ষ করেছে অক্রূরবাবুর কপালের তিলটা। খুবই ছোট্ট তিল, প্রায় চোখেই পড়ার মতো নয়। ভূতোর কপালেও এখন দেখা যাচ্ছে তিলটা।

আর সেই সঙ্গে আরও কিছু।

আরও খান দশেক পাকা চুল।

আর চোখের তলায় কালি।

এই কালি আগে ছিল না।

নবীন চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিল। তার ভারী অস্থির লাগছে। ম্যাজিকের পূজারি সে, কিন্তু এ ম্যাজিক বড়ই অস্বস্তিকর। যে ম্যাজিকে সে বিশ্বাস করে তার সবটাই মানুষের কারসাজি। যেটা অলৌকিক, সেটা নবীনের কাছে ম্যাজিক নয়। সেটা অন্য কিছু। সেটা অশুভ। ভূতোর এই পরিবর্তনের মধ্যে সেই অশুভের ইঙ্গিত রয়েছে।

অথচ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও ভূতোকে পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। চোখে সেই ঢুলুঢুলু চাহনি, ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি, আর খেলার সময় তার নিজের হাতের কারসাজি ছাড়া যে কোনও পুতুলের মতোই অসাড়, নির্জীব।

অথচ তার চেহারায় অল্প অল্প পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

আর নবীন কেন জানি বিশ্বাস করে এই পরিবর্তনগুলো অক্রূর চৌধুরীর মধ্যেও ঘটছে। তারও চুলে পাক ধরেছে, তারও চোখের তলায় কালি পড়েছে।

ভূতোর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলে টেকনিকটা ঝালিয়ে নেওয়ার অভ্যাস নবীনের প্রথম

থেকেই। যেমন—

'আজ দিনটা বেজায় গুমোট করছে, না রে ভূতো ?'

'হুঁ, গেজায় গুঙোট।'

'তবে তোর সুবিধে আছে, ঘাম হয় না।'

'কুতুলের আগার ঘাঙ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !'

আজও প্রায় আপনা থেকেই নবীনের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল।—

'এসব কী ঘটছে বল তো ভূতো ?'

উত্তরটা এল নবীনকে চমকে দিয়ে—

'কর্ঙখল, কর্ঙখল !'

কর্মফল।

নবীনের ঠোঁট দিয়েই উচ্চারণটা হয়েছে, যেমন হয় স্টেজে, কিন্তু উত্তরটা তার জানা ছিল না। এটা তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। কে বলিয়েছে সে সম্বন্ধে নবীনের একটা ধারণা আছে।

সে রাত্রে চাকর শিবুর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নবীন কিচ্ছু খেল না। এমনিতে রাত্রে ওর ঘুম ভালই হয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই, তাই আজ একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিল। একটা নাগাদ বুঝতে পারল বড়িতে কাজ দেবে। হাত থেকে পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিতেই চোখের পাতা বুজে এল।

ঘুমটা ভেঙে গেল মাঝরাত্তিরে।

ঘরে কে কাশল ?

সে নিজে কি ? কিন্তু তার তো কাশি হয়নি। অথচ কিছুক্ষণ থেকেই যেন খুক্ খুক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

ল্যাম্পটা জ্বালাল নবীন।

ভূতনাথ বসে আছে সেই জায়গাতেই, অনড়। তবে তার দেহটা যেন একটু সামনের দিকে ঝোঁকা, আর ডান হাতটা ভাঁজ হয়ে বুকের কাছে চলে এসেছে।

নবীন ঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। বাইরে পাহারাওয়ালার লাঠির ঠক্ ঠক্। দূরে কুকুর ডাকছে। একটা প্যাঁচা কর্কশস্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল তার বাড়ির উপর দিয়ে। পাশের বাড়িতে কারুর কাশি হয়েছে নিশ্চয়ই। আর জানালা দিয়ে হাওয়া এসে ভূতোর শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের জনবহুল মির্জাপুর স্ট্রিটে তার এহেন অহেতুক ভয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

নবীন ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল, এবং আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ফিন্‌লে রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক ফাংশনে নবীন প্রথম ব্যর্থতার আস্বাদ পেল।

প্রকাণ্ড হলে প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান। যথারীতি তার আইটেম হল শেষ আইটেম। আধুনিক গান, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, কথক নাচ ও তার পর নবীন মুনসীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে নিজের গলার যত্ন নেবার জন্য যা করার সবই করেছে নবীন। গলাটাকে পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার, কারণ সূক্ষ্মতম কন্ট্রোল না থাকলে ভেন্‌ট্রিলোকুজ্‌ম হয় না। স্টেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত সে দেখেছে তার গলা ঠিক আছে। এমন কী ভূতোকে প্রথম প্রশ্ন করার সময়ও সে দেখেছে গলা দিয়ে পরিষ্কার স্বর বেরোচ্ছে। কিন্তু সর্বনাশ হল ভূতোর উত্তরে।

এ উত্তর দর্শকের কানে পৌঁছাবে না, কারণ সর্দি-কাশিতে বসে গেছে সে গলা। আর এটা শুধু ভূতোর গলা। নিজের গলা সাফ এবং স্পষ্ট।

'লাউডার প্লিজ' বলে আওয়াজ দিল পিছনের দর্শক। সামনের দর্শক অপেক্ষাকৃত ভদ্র, তাই তাঁরা আওয়াজ দিলেন না, কিন্তু নবীন জানে যে তাঁরা ভূতোর একটা কথাও বুঝতে পারছেন না।

আরও পাঁচ মিনিট চেষ্টা করে নবীনকে মাপ চেয়ে স্টেজ থেকে বিদায় নিতে হল। এমন লজ্জাকর অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম।

সেদিনের পারিশ্রমিকটা নবীন নিজেই প্রত্যাহার করল। এ অবস্থায় টাকা নেওয়া যায় না। এই

বিভীষিকাময় পরিস্থিতি নিশ্চয়ই চিরকাল চলতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এ বিশ্বাস নবীনের আছে।

ভাদ্র মাস। গরম প্রচণ্ড। তার উপরে এই অভিজ্ঞতা। নবীন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। সে রীতিমত অসুস্থ বোধ করছে। এই প্রথম ভূতোর উপর একটু রাগ অনুভব করছে সে, যদিও সে জানে ভূতো তারই হাতের পুতুল। ভূতোর দোষ মানে তারই দোষ।

টেবিলের উপর ভূতোকে রেখে নবীন দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিল। হাওয়া বিশেষ নেই, তবে যেটুকু আসে, কারণ আজ শনিবার, রাত বারোটার আগে পাখা চলবে না।

নবীন মোমবাতিটা জ্বেলে টেবিলে রাখতেই একটা জিনিস দেখে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ভূতোর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শুধু তাই না। ভূতোর গালে চকচকে ভাবটা আর নেই। ভূতো শুকিয়ে গেছে। আর ভূতোর চোখ লাল।

এই অবস্থাতেও নবীন তার পুতুলের দিকে আরও দু'পা এগিয়ে না গিয়ে পারল না। কত বিস্ময়, কত বিভীষিকা তার কপালে আছে সেটা দেখবার জন্য যেন তার জেদ চেপে গেছে।

দু' পা-র বেশি এগোনো সম্ভব হল না নবীনের। একটি জিনিস চোখে পড়ায় তার চলা আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।'

ভূতোর গলাবন্ধ কোটের বুকের কাছটায় একটা মৃদু উত্থান-পতন।

ভূতো শ্বাস নিচ্ছে।

শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি ?

হ্যাঁ, যাচ্ছে বইকী। ট্র্যাফিক-বিহীন নিস্তব্ধ রাত্রে নবীনের ঘরে এখন একটির বদলে দু'টি মানুষের শ্বাসের শব্দ।

হয়তো চরম আতঙ্ক আর প্রচণ্ড বিস্ময় থেকেই নবীনের গলা দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে পড়ল—

'ভূতো !'

আর সেই সঙ্গে এক অশরীরী চিৎকার নবীনকে ছিটকে পিছিয়ে দিল তার তক্তপোষের দিকে—

'ভূতো নয় ! আমি অক্রূর চৌধুরী !'

নবীন জানে যে সে নিজে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেনি। কণ্ঠস্বর ওই পুতুলের। অক্রূর চৌধুরী কোনও এক আশ্চর্য জাদুবলে ওই পুতুলকে সরব করে তুলেছেন। নবীন চেয়েছিল অক্রূর চৌধুরীকে তার হাতের পুতুল বানাতে। এ জিনিস নবীন চায়নি। এই জ্যান্ত পুতুলের সঙ্গে এক ঘরে থাকা নবীনের পক্ষে অসম্ভব। সে এখনই—

কী যেন একটা হল।

একটা শ্বাসের শব্দ কমে গেল কি ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ভূতো আর নিশ্বাস নিচ্ছে না। তার কপালে আর ঘাম নেই। তার চোখের লাল ভাবটা আর নেই, চোখের তলায় আর কালি নেই।

নবীন খাট থেকে উঠে গিয়ে ভূতোকে হাতে নিল।

একটা তফাত হয়ে গেছে কেমন করে জানি এই অল্প সময়ের মধ্যেই।

ভূতোর মাথা আর ঘোরানো যাচ্ছে না, ঠোঁট আর নাড়ানো যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতিতে জাম ধরে গেছে। আর একটু চাপ দিলে ঘুরবে কি মাথা ?

চাপ বাড়াতে গিয়ে ভূতোর মাথাটা আলগা হয়ে টেবিলে খুলে পড়ল।

* * *

পরদিন সকালে সিঁড়িতে নবীনের দেখা হল বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে। ভদ্রলোক

সত্যজিৎ রায়

অভিযোগের সুরে বললেন, 'কই মশাই, আপনি তো আপনার পুতুলের খেলা দেখালেন না একদিনও আমাকে। সেই যে ভেন্টিকলোজিয়াম না কী!'

'পুতুল নয়', বলল নবীন, 'এবার অন্য ম্যাজিক ধরব। আপনার যখন শখ আছে তখন নিশ্চয়ই দেখাব। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?'

'আপনার এক জাতভাই যে মারা গেছে দেখলুম কাগজে। অক্রূর চৌধুরী।'

'তাই বুঝি?'—নবীন এখনও কাগজ দেখে নি।—'কীসে গেলেন?'

'হৃদ্‌রোগে', বললেন সুরেশবাবু, 'আজকাল তো শতকরা সত্তর জনই যায় ওই রোগেই।'

নবীন জানে যে খোঁজ নিলে নির্ঘাত জানা যাবে মৃত্যুর টাইম হল গত কাল রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট।

সন্দেশ, আষাঢ় ১৩৮৮

অতিথি

মন্টু ক'দিন থেকেই শুনেছে তার মা-বাবার মধ্যে কথা হচ্ছে দাদুকে নিয়ে। মন্টুর ছোটদাদু, মা-র ছোটমামা।

দাদুর চিঠিটা যখন আসে তখন মন্টু বাড়ি ছিল। মা চিঠি পড়ে প্রথমে আপন মনে বললেন, 'বোঝো ব্যাপার।' তারপর বাবাকে ডেকে বললেন, 'ওগো শুনছ?'

বাবা বারান্দায় বসে মুচির জুতো মেরামত করা দেখছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, 'বলো।'

মা চিঠি হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'মামা আসছেন।'

'মামা?'

'আমার ছোটমামা গো।'

বাবার ঘাড় ঘুরে ভুরু কপালে উঠে গেল।

'বলো কী! তিনি বেঁচে আছেন?'

'এই তো চিঠি। মামার যে চিঠি লেখার মতো বিদ্যে আছে সেটাই তো জানতাম না।'

বাবা আরাম কেদারার হাতল থেকে চশমাটা তুলে পরে নিয়ে মা-র দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'কই, দেখি।'

এক পাতার চিঠিটা পড়ে বাবাও বললেন, 'বোঝো।'

মা ততক্ষণে মোড়ায় বসে পড়েছেন।

একটা খটকা লেগেছে দুজনেরই সেটা বেশ বুঝতে পারছে মন্টু। বাবাই প্রশ্নটা করলেন।

'আমাদের ঠিকানা পেলেন কোথায় বলো তো? আর ওঁর ভাগনির সঙ্গে যে সুরেশ বোস বলে একজনের বিয়ে হয়েছে, আর তারা যে এই মামুদপুরে থাকে সেটাই বা জানলেন কী করে?'

মা একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে বললেন, 'শেতলমামা আছেন তো। তাঁর কাছেই জেনেছেন হয়তো।'

'শেতলমামা?'

'আঃ, তোমার আবার কিছু মনে থাকে না। মামাদের পড়শি ছিলেন নীলকণ্ঠপুরে। কত যাতায়াত ছিল আমাদের বাড়িতে। তুমিও তো দেখেছ। বাজি ফেলে ছাপান্নটা রাজভোগ খেলেন আমাদের বিয়েতে, সেই নিয়ে কত হাসাহাসি।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'ছোটমামার সঙ্গে তো খুব মিতালি ছিল। গোড়ার দিকে মামা যে চিঠি দিতেন সে তো শুনেছি

শেতলমামাকেই।'

'এ বাড়িতেও তো এসেছেন না শীতলবাবু ?'

'বাঃ, আসেননি ? রাণুর বিয়েতেই তো এলেন।'

'ঠিক ঠিক। কিন্তু তোমার ছোটমামা তো শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন।'

'তাই তো জানতাম। তিনি আবার হঠাৎ আমার এখানে আসছেন কেন সেটা তো বুঝলাম না।'

বাবা একটু ভেবে বললেন, 'অবিশ্যি আসতেই যদি হয়তো তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে আসবেন বলো। তোমার বাপ মা বড় মামা বড় মামী সব পরলোকে। বড় মামার ছেলে ক্যানাডা, মেয়ে সিঙ্গাপুর। তুমি ছাড়া তার আর আছে কে ?'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু যে লোকটাকে প্রায় চোখেই দেখিনি তাকে মামা বলে চিনব কী করে ? মামা যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যান তখন আমার বয়স দু' বছর, আর ওনার ষোলো কি সতেরো।'

'ওঁর ছবি একখানা আছে না তোমার সেই পুরনো অ্যালবামে ?'

'তোমার যা কথা ! সে চেহারা আর এখনকার চেহারা ! তখন মামার বয়স পনেরো আর এখন ষাট।'

'সত্যি, খুব মুশকিলে পড়া গেল।'

'ঘর তো একখানা বাড়তি আছেই, বিনুর ঘর। কিন্তু কী খায় না খায় কিচ্ছু জানা নেই...'

'খাবে আবার কী ? আমরা যা খাব তাই খাবে !'

'আমরা যা খাব মানে কী ? যদি সাধু হয়ে থাকে তা হলে তো নিরামিষ খাবে। সে তো আরও ঝক্কি। পাঁচ রকম পদের কমে হবে না তার।'

'চিঠির ভাষা দেখে তো সাধু বলে মনে হয় না। দিব্যি আমাদেরই মতো লেখা। ইংরিজিতে তারিখ লিখেছে, ইংরিজি কথা ব্যবহার করেছে। এই তো—আন্নেসেসারি।'

'নিজের ঠিকানা তো দেয়নি।'

'তা দেয়নি।'

'আর সোমবারই আসছেন বলে লিখেছেন।'

মা-বাবা দুজনেই খুব ভাবনায় পড়েছেন বলে মনে হল মন্টুর। সত্যি, যে মামাকে কেউ কোনওদিন চোখেই দেখেনি তাকে তো মামা বলে মনে করাই মুশকিল।

মন্টু এই দাদুর কথা বড় জোর একবার কি দু'বার শুনেছে। ইস্কুলে পড়া শেষ হবার আগেই দাদু বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপর এই পঁয়তাল্লিশ বছরের গোড়ার কয়েকটা বছরের পর তার আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। মা বলতেন তিনি নিশ্চয়ই মরে গেছেন। মন্টুর দু-একবার মনে হয়েছে দাদু যদি হঠাৎ একদিন ফিরে আসেন তা হলে বেশ হয়। কিন্তু তারপরই মনে হয়েছে—সেরকম কেবল গল্পেই শোনা যায়। তাও গল্পে ঘর-পালানো লোক অনেকদিন পরে ফিরে এলে তাকে চেনবার লোক থাকে। এখানে তাও নেই। দাদু এল কি দাদু সেজে অন্য লোক এল তাও বলার জো নেই।

দাদু অবিশ্যি লিখেছেন বেশিদিন থাকবেন না—দিন দশেক। বাংলাদেশের ছোট মফঃস্বল শহরেই দাদুর ছেলেবেলা কেটেছে। সেই বাংলাদেশ দেখার ইচ্ছে হয়েছে দাদুর। নিজের দেশ নীলকণ্ঠপুরে তো যাওয়া যায় না, কারণ এখন আর সেখানে কেউ নেই। তাই মামুদপুরেই আসতে চান। তাও এখানে একজন ভাগনি আছে তো। মন্টুর বাবা এখানে ওকালতি করেন। মন্টুর দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকে রিশড়ায়। দাদা কানপুরে হস্টেলে থেকে পড়ে আই আই টিতে।

রবিবারের মধ্যে মা সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। দোতলার পশ্চিমের ঘরের খাটে নতুন বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, দাদুর জন্য সাবান তোয়ালে গামছা, সবই এসে গেল। ট্রেন আসবে সকালে, দাদু নিজেই সুরেশ বোসের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করে সাইকেল রিকশা নিয়ে চলে আসবেন। তারপর যা থাকে কপালে। বাবা আজই সকালে বলেছেন, 'মামা হোক আর না হোক, লোকটা যদি সভ্যভব্য মিশুকে হয় তা হলে একরকম চলে যাবে। না হলে এই দশটা দিন হুজ্জতের একশেষ।'

'ভাল্লাগেনা বাপু,' বললেন মা, 'সাপ না ব্যাঙ না বিচ্ছু—কিচ্ছু জানা নেই, এখন সামলাও ঝক্কি।

ঠিকানাও দিল না লোকটা ; তা হলে না হয় কোনও একটা ছুতোয় না করে দেওয়া যেত। এ যেন একেবারে পণ করে ঘাড়ে এসে চাপা।'

মন্টুর মনের ভাব কিন্তু অন্যরকম। তাদের বাড়িতে অনেকদিন কেউ এসে থাকেনি। এখন তার গ্রীষ্মের ছুটি ; সারাটা দিন সে বাড়িতেই থাকে। খেলার সাথীর অভাব নেই—সিধু, অনীশ, রথীন, ছোট্কা—কিন্তু বাড়িতে একজন বাড়তি লোকের মজাটা আলাদা। সারাক্ষণ শুধু মা আর বাবাকে দেখতে কি ভাল লাগে ? আর দাদু-কি-দাদু-নয় মজাটাও কি কম ? এ যেন একটা রহস্য অ্যাডভেঞ্চার। যদি দাদু না হয়, যদি কোনও বদ মতলবে দুষ্টু লোক আসে, আর সেটা যদি মন্টু ধরে দিতে পারে, তা হলে দারুণ ব্যাপার হবে।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে সদর দরজার বাইরে ঘোরাঘুরি করার পর সোয়া এগারোটার সময় মন্টু দেখল একটা সাইকেল রিকশা আসছে তাদের বাড়ির দিকে। গাড়িতে একজন লোক, তার হাতে একটা মিষ্টির হাঁড়ি, আর পায়ের কাছে একটা চামড়ার সুটকেস। লোকটা সুটকেসের উপর একটা পা তুলে দিয়েছে।

ইনি সাধু নন। অন্তত সাধুর মতো পোশাক পরেন না। ধুতি-পাঞ্জাবিও নয়, প্যান্ট-সার্ট। মা বলেছিলেন বয়স ষাটের উপর, কিন্তু বেশি বুড়িয়ে যাননি। মাথার চুলও বেশি পাকেনি। চোখে চশমা আছে, তবে পাওয়ার খুব বেশি নয়।

রিকশাকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাক্স মাটিতে নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক মন্টুর দিকে ফিরে দেখে বললেন, 'তুমি কে ?'

দাড়িগোঁফ নেই, নাকটা চোখা, চোখ দুটো ছোট হলেও উজ্জ্বল।

মন্টু সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'আমার নাম সাত্যকি বোস।'

'অর্জুনের সারথি, না সুরেশ বোসের পুত্র ? এই ভারী সুটকেস বইতে পারবে তুমি ? ওতে বই আছে কিন্তু।'

'পারব।'

'তবে চলো।'

ভিতরের বারান্দায় উঠতে মা এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক মিষ্টির হাঁড়িটা মা-র হাতে দিয়ে বললেন—

'তোমার নাম সুহাসিনী তো ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী তো উকিল। সে বোধহয় কাজে বেরিয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'এইভাবে এসে পড়লাম...খুব কিন্তু-কিন্তু বোধ করছিলাম, জানো, কিন্তু শেষে মনে হল দিন দশেক হয়তো এই বুড়োকে বরদাস্ত করতে তোমাদের খুব অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া শীতলদা তোমাদের এত প্রশংসা করলেন। কিন্তু বুঝতে তো পারি, আমি যে সত্যি তোমার মামা তার তো কোনও প্রমাণ নেই। কাজেই সেদিক দিয়ে আমি কিছু দাবিও করব না। একজন বুড়ো মানুষকে আশ্রয় দিলে ক'টা দিনের জন্য—এইটেই ভেবে নিতে হবে তোমাদের।'

মন্টু লক্ষ করছিল যে মা মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছেন ভদ্রলোকের দিকে। এবার বললেন, 'আপনি চানটান করবেন তো ?'

'খুব বেশি যদি অসুবিধে না হয়—'

'না না, অসুবিধে কেন ? মন্টু, এঁকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দাও চানের ঘরটা। আর, ইয়ে, আপনি কী খানটান সে তো জানা নেই, তাই...'

'আমি সর্বভুক্। যা দেবে তাই খুশি মনে খাব। কথাটা বাড়িয়ে বলছি না।'

'তুমি ইস্কুলে পড় ?' দোতলায় উঠতে উঠতে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন মন্টুকে।

'হ্যাঁ। সত্যভামা হাই স্কুল। ক্লাস সেভেন।'

মন্টু একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারল না।

'আপনি বুঝি সাধু নন ?'

'সাধু ?'

'মা বলছিলেন আপনি সাধু হয়ে গেছেন।'

'ও হো হো ! সাধু-টাধু তো অনেককালের কথা ভাই। যখন প্রথম বাড়ি থেকে বেরোই তখন গেলাম হরিদ্বার। বাড়িতে ভাল লাগত না, তাই বেরিয়ে পড়লাম। একজন সাধুর কাছে গিয়ে ছিলাম বটে কিছুদিন। হৃষীকেশে। তারপর সেখানেও আর ভাল লাগল না, তাই বেরিয়ে পড়লাম। তারপর সাধু-টাধুর কাছে আর যাইনি।'

দুপুরে খাবার যা ছিল সেটা ভদ্রলোক সত্যিই বেশ খুশি মনে চেঁছেপুঁছে খেলেন। আমিষে কোনও আপত্তি নেই ; মাছ ডিম দুই-ই খেলেন। মন্টুর মনে হল মা একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন। মন্টুর যদিও ভদ্রলোককে দাদু বলতে ইচ্ছে করছিল, সে লক্ষ করল মা একবারও মামা বললেন না।

যখন দই-এর প্লেটটা পাতে তুলছেন ভদ্রলোক, তখন যেন কতকটা কথা বলার জন্যই মা বললেন, 'বাংলা রান্না অনেকদিন খাওয়া হয়নি বোধহয় ?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'গত দু'দিনে কলকাতায় খেয়েছি ; তার আগে কতদিন খাইনি বললে বিশ্বাস করবে না।'

মা আর কিছু বললেন না। মন্টুর ইচ্ছে হচ্ছিল যে জিজ্ঞেস করে—'বাংলা রান্না খাননি কেন ? কোথায় ছিলেন আপনি এতদিন ?' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর জিজ্ঞেস করল না। ভদ্রলোক যদি ধাপ্পাবাজ হয়ে থাকেন তা হলে তাকে গুল মারার সুযোগ দেওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। উনি নিজে যদি বলতে চান তো বলুন।

কিন্তু উনি নিজেও কিছু বললেন না। চল্লিশ বছরের উপর যে লোক নিরুদ্দেশ ছিল তার তো অনেক কিছুই বলার থাকা উচিত, তা হলে এ লোক এত চুপচাপ কেন ?

বাবার গাড়ির আওয়াজ যখন পেল মন্টু তখন সে দোতলায়। সে দেখেছে ভদ্রলোক তখন হাতে একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছেন। তার আগে মন্টু আধ ঘণ্টা কাটিয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। সে ঘরের বাইরে ঘুরঘুর করছে দেখে ভদ্রলোক নিজেই তাকে ডাকেন।

'ওহে অর্জুনের সারথি।'

মন্টু গিয়ে ঢোকে ভদ্রলোকের ঘরে।

'এসো আমার কাছে' বললেন ভদ্রলোক, 'তোমাকে কিছু জিনিস দেখাই।'

মন্টু খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'এটা কী ?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'একটা তামার পয়সা।'

'কোথাকার ?'

মন্টু পয়সার গায়ে লেখাটা পড়তে চেষ্টা করে পারল না।

'এটাকে বলে লেপ্‌টা। গ্রিস দেশের পয়সা। আর এটা ?'

এটাও মন্টু বলতে পারল না।

'এটা তুর্কির পয়সা। এক কুরু। আর এটা রুমানিয়ার পয়সা। একে বলে বনি। এটা ইরাকের—ফিল।'

এ ছাড়া আরও দশ দেশের দশ রকম পয়সা মন্টুকে দেখালেন ভদ্রলোক। তার একটাও মন্টু আগে কখনও দেখেওনি, তার নামও শোনেনি।

'এগুলো সব তোমার জন্য।'

মন্টু অবাক। ভদ্রলোক বলেন কী ! অনীশের কাকাও পয়সা জমান। উনি মন্টুকে বুঝিয়েছেন যারা এ কাজটা করে তাদের বলে নিউমিস্‌ম্যাটিস্টস। কিন্তু অনীশের কাকার মোটেই এতরকম পয়সা নেই সেটা মন্টু জানে।

'আমি তো জানতাম যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমার একজন নাতি আছে ; তার জন্য এনেছি এসব পয়সা।'

মন্টু মহা ফুর্তিতে পয়সাগুলো নিয়ে নীচে নেমে এল মা-কে দেখাতে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাবার গলা পেয়ে সে থেমে গেল। এই লোকটার বিষয় কথা বলছেন বাবা।

'...দশ দিনটা বাড়াবাড়ি। ওকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমাদের মনে সন্দেহ আছে। অতিরিক্ত খাতির না করলে ভদ্রলোক আপনিই মানে মানে বিদায় নেবেন। আর কোনওরকম রিস্ক নেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। আজ সুধীরের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেও অ্যাডভাইস দিল। আলমারি-টালমারি সব ভাল করে বন্ধ করে রাখবে। মন্টু তো সব সময় পাহারা দেবে না। তার বন্ধু-বান্ধব আছে, খেলাধুলো আছে। আমি কাজে বেরিয়ে যাব। বাড়িতে তুমি আর সদাশিব। সদাশিব কাজ না থাকলেই ঘুমোয়। তুমিও যে দুপুরে ঘুমোও না তা তো নয়।'

'একটা কথা তোমায় বলি,' বললেন মন্টুর মা।

'কী ?'

'এনার সঙ্গে কিন্তু মায়ের আদল আছে।'

'তোমার তাই মনে হল ?'

'সেই রকম টিকোলো নাক, চোখের চাহনিও যেন সেইরকম।'

'আহা, আমি তো বলছি না ইনি তোমার মামা নন। কিন্তু মামা লোকটি কেমন তা তো কিছুই জানি না আমরা। লেখাপড়া করেননি, কোনও ডিসিপ্লিন নেই, ছন্নছাড়া জীবন...। আমার মোটেই ভাল লাগছে না ব্যাপারটা।'

বাবার কথা থামলে পর মন্টু ঘরে ঢুকল। এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই মন্টুর ভদ্রলোককে বেশ ভাল লেগে গেছে। বাবার কথাগুলো সে পছন্দ করেনি। হয়তো পয়সাগুলো দেখলে বাবার মনটা ভদ্রলোকের প্রতি একটু নরম হবে।

'এই কয়েন উনি দিলেন ?'

মন্টু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'উনি কি এসব জায়গায় গেছেন বলে বললেন নাকি ?'

'না, তা বলেননি।'

'তাও ভাল। এ জিনিস কলকাতায় কিনতে পাওয়া যায়। চৌরঙ্গিতে দোকান আছে।'

সাড়ে চারটে নাগাদ দোতলা থেকে নেমে এলেন ভদ্রলোক। তারপরেই বাবার সঙ্গে আলাপ হল।

'আপনার ছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে,' বললেন ভদ্রলোক।

'হ্যাঁ, ও তাই বলছিল।'

মায়ের মতো বাবাও ঘন ঘন দৃষ্টি দিচ্ছেন ভদ্রলোকের দিকে।

'আমি দেখেছি কম বয়সী ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব চট করে ভাব হয়ে যায়। ভবঘুরেদের বোধহয় ওরাই সবচেয়ে ভাল বোঝে।'

'আপনি বুঝি সারাজীবনই ঘুরেছেন ?'

'তা ঘুরেছি। এক জায়গায় বসে থাকা ধাতে ছিল না আমার।'

'আমরা আবার গুছোনো জীবনটাই বুঝি। উদ্দেশ্যহারা ভাবে ঘোরাঘুরি আমাদের পোষায় না। রোজগার আছে, সংসারের দায়িত্ব আছে, সন্তানপালন আছে। আপনি তো বিয়ে করেননি ?'

'না।'

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সুহাসিনীর বোধহয় মনে নেই; ওর এক প্রমাতামহ—আমার এক দাদু—তাঁরও ঠিক এই প্রবৃত্তি ছিল। উনি তেরো বছর বয়সে ঘরছাড়া হন। আমি তো অল্পদিনের জন্য হলেও ফিরেছি। উনি আর একেবারেই ফেরেননি।'

মন্টু দেখল বাবা মা-র দিকে ফিরলেন।

'এটা জানতে তুমি ?'

'জানলেও এখন আর মনে নেই,' বললেন মা।

বিকেলে চা খাবার পর এক ব্যাপার হল। মন্টুর বন্ধুরা ক'দিন থেকেই শুনছে যে সোমবার তার এক দাদু আসবে যাকে দাদু বলে চেনার কোনও উপায় নেই। তারা ভারী কৌতূহলী হয়ে এল সেই দাদুকে দেখতে। চার-পাঁচটি দশ-বারো বছরের ছেলেকে একসঙ্গে দেখে দাদুও খুব খুশি। সবাইকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন লাঠি হাতে নিয়ে। মিত্তিরদের বাড়ি পেরিয়ে মাঠটার একধারে কদম গাছটার তলায় বসে দাদু বললেন, 'তুয়ারেগ কাদের বলে জানো ?' সকলেই মাথা নেড়ে না বলল। দাদু বললেন, 'সাহারা মরুভূমি জানো তো ?—সেই সাহারায় তুয়ারেগ বলে একরকম যাযাবর জাতি বাস করে। দরকার হলে তারা দস্যুবৃত্তি করে। সেই তুয়ারেগের কবলে পড়ে একজন লোক কী ভাবে রক্ষা পেয়েছিল বুদ্ধির জোরে সে গল্প বলি তোমাদের।'

দাদুর গল্প ছেলের দল মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলে। মন্টু পরে মা-কে বলেছিল, 'এমন গল্প, ঠিক মনে হয় সব কিছু চোখের সামনে দেখছি।'

বাবা কাছেই ছিলেন, বললেন, 'গল্পের বই পড়ার বাতিক আছে বুঝি ভদ্রলোকের ? কোনও এক ইংরিজি পত্রিকায় এ ধরনের একটা গল্প পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।'

মন্টু বলেছিল ভদ্রলোকের সুটকেসে বই আছে সেটা সে জানে, তবে গল্পের বই কি না জানে না।

তিনদিন তিন রাত চলে এই ভাবে। বাড়ির কোনও কিছু চুরি হল না, ভদ্রলোক কোনও উৎপাত করলেন না, যা দেওয়া হল তাই তৃপ্তি করে খেলেন, কোনও বাড়তি আবদার করলেন না, কোনও বিষয়ে অভিযোগ করলেন না। এ ক'দিনে বাবার বেশ কয়েকজন উকিল বন্ধু এসেছে মন্টুদের বাড়িতে। এমনিতে বেশি আসে-টাসে না ; মন্টু জানে তারা এই দাদু-কি-দাদু-নয় বুড়োকেই দেখতে এসেছে। মা-বাবাকে দেখে মনে হয় তারা মোটামুটি বুড়োকে মেনেই নিয়েছেন। বাবাকে তো একদিন বলতেই শুনেছে মন্টু—'লোকটা সাদাসিধে এটা বলতেই হবে। বেশি গায়ে পড়ার চেয়ে এই ভাল , তবে এরকম মানুষের বেঁচে থেকে কী লাভ জানি না। আসলে বাড়ি ছেড়ে পালানোর মানে বোঝো তো ?—দায়িত্ব এড়ানো। এঁরা পরাশ্রয়ী জীব। সারা জীবনটাই হয়তো এর-ওর ঘাড়ে ভর করে কাটিয়েছে।'

মন্টু একবার ছোটদাদু বলে ডেকে ফেলেছিল ভদ্রলোককে, তাতে তিনি শুধু মৃদু হেসে তার দিকে চেয়েছিলেন, কিছু বলেননি। মা কিন্তু মামা বলে ডাকেননি একবারও। মন্টু সে কথা বলাতে মা বলেছেন, 'তাতে ভদ্রলোক খুব একটা দুঃখ পাচ্ছেন বলে তো মনে হয় না। আর মামা যে ডাকব, তারপর যদি বেরোয় মামা নন, তা হলে কী অপ্রস্তুতের ব্যাপার বল তো।'

চারদিনের দিন ভদ্রলোক বললেন আজ একটু বেরোবেন।—'নীলকণ্ঠপুর বাস যায় না ?'

বাবা বললেন তা যায়। বাজার থেকে এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর বাস ছাড়ে।

'তা হলে ভাবছি জন্মস্থানটা একবার দেখে আসব। ফিরতে অবিশ্যি বিকেল হয়ে যাবে।'

'খেয়ে যাবেন তো ?' প্রশ্ন করলেন মন্টুর মা।

'নাঃ। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়াই ভাল। ওখানেই হোটেলে কোথাও খেয়ে নেব। ওর জন্য চিন্তা কোরো না।'

ন'টার মধ্যেই ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়লেন।

দুপুরে মন্টু আর লোভ সামলাতে পারল না। ভদ্রলোকের ঘর খালি। ওঁর সুটকেসটায় কী বই আছে সেটা দেখার শখ অনেকদিন থেকেই। বাবা নেই, মা একতলায় বিশ্রাম করছেন ; মন্টু গিয়ে ঢুকল ভদ্রলোকের ঘরে।

সুটকেসে তালা নেই। চুরির ভয়টা নেই ভদ্রলোকের সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

মন্টু সুটকেসের ডালাটা তুলল।

কিন্তু কোথায় বই ? বই তো নেই, খাতা। খান ত্রিশেক নানারকমের খাতা, তার মধ্যে দশবারোটা বাঁধিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু খাতা খুলল মন্টু। পরিষ্কার ঝকঝকে বাংলা হাতের লেখা, পড়তে কোনও অসুবিধে নেই।

মন্টু খাটের উপর উঠল খাতাটা নিয়ে।

আর পরমুহূর্তেই নেমে আসতে হল।

তার অজান্তে মা উপরে উঠে এসেছেন।

'ও ঘরে কী হচ্ছে মন্টু ? ওনার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছ বুঝি ?'

মন্টু সুবোধ বালকের মতো খাট থেকে নেমে এসে সুটকেসে খাতাটা রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'যাও, নিজের ঘরে যাও। পরের জিনিস ঘাঁটতে নেই। নিজের বই পড়ো গিয়ে যাও।'

ছ'টার একটু পরেই ফিরে এলেন ভদ্রলোক।

রাত্তিরে খাবার সময় মন্টুর মা-বাবাকে বেশ খানিকটা অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন তিনি কালই ফিরে যাচ্ছেন।

'তোমাদের আতিথেয়তার তুলনা নেই, কিন্তু আমার পক্ষে এক জায়গায় বেশিদিন থাকা পোষায় না।'

বাবা-মা যে খবরটা শুনে অখুশি নন এটা মন্টু জানে, যদিও তার নিজের মনটা খারাপ হয়ে গেছে। বাবা বললেন, 'আপনি কি কলকাতায় যাবেন এখান থেকে ?'

'হ্যাঁ, তবে সেও বেশিদিনের জন্য নয়। সেখান থেকে অন্য কোথাও পাড়ি দেব। কারুর গলগ্রহ

হয়ে থেকে অভ্যেস নেই। আমি সেই বাড়ি ছাড়ার পর থেকেই স্বাধীন।'

মা বললেন, 'গলগ্রহ বলছেন কেন, আমাদের তো কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না।'

খানিকটা যে হচ্ছিল সেটা মন্টু জানে, কারণ সে এর মধ্যে একদিন বাবাকে বলতে শুনেছে যে এই মাগ্যির বাজারে একজন বাড়তি লোকের পিছনে খরচ অনেক।

এবার মন্টু আর বাবা দুজনেই গেল ভদ্রলোককে স্টেশনে পৌঁছাতে, বাড়ির গাড়িতে করে। মন্টু জানে যে ট্রেন যখন ছাড়ল, তখন অবধি বাবার মনে সন্দেহ আছে যিনি এসে রইলেন এতদিন, তিনি সত্যি করেই মন্টুর দাদু কি না।

সাতদিন পর আরেক বৃদ্ধ এসে হাজির হলেন মন্টুদের বাড়িতে। ইনি মন্টুর মায়ের শেতলমামা। এঁকে এর আগে একবারই দেখেছে মন্টু, দিদির বিয়েতে।

'সে কী, শেতলমামা, হঠাৎ কী মনে করে?'

'একটা কর্তব্য সারতে এসেছি রে। একটা নয়, দুটো। নইলে এই বুড়ো বয়সে আজকের দিনে এমনি এমনি কেউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পাড়ি দেয়? দুপুরে খাব কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই খাবেন। কী খেতে মন চায় বলুন। এখানে সব পাওয়া যায়, কলকাতার মতো নয়।'

'দাঁড়া দাঁড়া, আগে কাজগুলো সারি।'

কাঁধে ঝোলানো থলি থেকে ভদ্রলোক একটা বই বার করলেন।

'এ বইয়ের নাম শুনিসনি তো?'

মা বইটা হাতে নিয়ে বললেন, 'কই, না তো।'

'পুলিন তোদের বলেনি সেটা জানি।'

'পুলিন?'

'তোর ছোটমামা! যে লোক কাটিয়ে গেল এখানে পাঁচটা দিন তার নামটাও জানিস নি? এ তারই লেখা বই।'

'তাঁর বই?'

'তোরা কোন্ রাজ্যে থাকিস? সেদিন কাগজেও তো নাম বেরিয়েছে। এমন আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যে ক'টা আছে?'

'কিন্তু এই নাম তো—'

'নাম তো ছদ্মনাম। সারা পৃথিবী ঘুরেছে চল্লিশ বছর ধরে, অথচ এতটুকু দম্ভ নেই।'

'সারা পৃথিবী— ?'

'পুলিন রায়ের মতো অত বড় ভূপর্যটক ভারতবর্ষে আর হয়নি। আর সব নিজের রোজগারে ঘোরা। খালাসিগিরি থেকে শুরু করে কুলিগিরি, কাঠের মজুরি, খবরের কাগজ বিক্রি, দোকানদারি, লরির ড্রাইভারি—কোনও কাজ সে বাদ দেয়নি। তার অভিজ্ঞতার কাছে গল্প হার মেনে যায়। সে বাঘের কবলে পড়েছে, সাপের ছোবল খেয়েছে, সাহারায় দস্যুদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এসেছে, জাহাজডুবি থেকে সাঁতরে উঠেছে ম্যাডাগাস্কারের ডাঙায়। থার্টি নাইনে সে ভারতবর্ষ ছেড়ে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সে বলে বাপের বাড়ির মায়া একবার কাটাতে পারলে সারা পৃথিবীটাই হয়ে যায় নিজের ঘর। সাদা কালো ছোট বড় জংলি সভ্য সব এক হয়ে যায়।'

'কিন্তু—এসব আমাদের বললেন না কেন?'

'তোদের মতো ঘরকুনো কূপমণ্ডূক কি এসব কথা বিশ্বাস করত? সে আসল কি নকল তাই তোরা ঠিক করতে পারিসনি, তাকে মামা বলে ডাকতে পারিসনি, আর এত কথা সে বলতে যাবে তোদের?'

'ইস্—আবার ডেকে আনা যায় না মামাকে?'

'উঁহু। পাখি উড়ে গেছে। বললে বলিদ্বীপটা দেখা হয়নি, সেখানে যাবার চেষ্টা করবে। এই বইটা তোদের দিয়ে গেছে। তোদের ঠিক দেয়নি, দিয়েছে দাদুকে। বললে ওর মনটা এখনও কাঁচা, ওতেই ছাপটা পড়বে ভাল। তবে ওর আসল পাগলামোর কথাটা বলিনি এখনও। ওকে পই পই করে বললাম যে আর ক'টা দিন থেকে যাও, এ বই নির্ঘাত পুরস্কার পাবে, অ্যাকাডেমি দশ হাজার

টাকা দিচ্ছে আজকাল। সে কিছুতেই শুনলে না। বললে টাকা যদি আসে তো মামুদপুরে আমার ভাগনিকে দিয়ে দিয়ো, সে খুব যত্ন নিয়েছে আমার। শুধু মুখে বলা না, কাগজে লিখে দিলে।—এই নে সেই টাকা।'

মা শেতলমামার হাত থেকে কামটা নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ধরা গলায় বললেন, 'বোঝো ব্যাপার।'

রচনাকাল আষাঢ় ১৩৮৮ (১৯,২০/৭/৮১) সরাসরি 'আরো বারো' বইতে। প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১

ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট

॥ ১ ॥

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে আশ্চর্য গাছটা আবিষ্কার করলেন নিশিকান্তবাবু। সাহেব যে গাছপালা ভালবাসতেন সেটা করিমগঞ্জে এসেই শুনেছিলেন নিশিকান্তবাবু। ভারত স্বাধীন হবার বছর সাতেকের মধ্যেই সাহেব অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর দেশে ফিরে যান। তারপর থেকে এই বাংলোবাড়িটা খালিই পড়ে আছে। লোকে বলে সাহেবের গিন্নি নাকি এই বাড়িতে বজ্রাঘাতে মারা যান। সাদা গাউন পরা তাঁর ভূতকে নাকি বাগানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় পূর্ণিমার রাতে। তাই এ বাড়ির দিকে আর বিশেষ কেউ ঘেঁষে না।

নিশিকান্তবাবু বহরমপুরের সরকারি ইস্কুলে মাস্টারি থেকে রিটায়ার করে করিমগঞ্জে আসেন মাধব কবিরাজকে দিয়ে তাঁর বাতের চিকিৎসা করানোর জন্য। মাধব ডাক্তারের খ্যাতি দেশজোড়া না হলেও, প্রদেশজোড়া তো বটেই। বন্ধু তারক বাগচীর বাড়িতে এ ক'দিন থেকে চিকিৎসা করিয়ে ফিরে যাবেন এই ছিল কথা। কিন্তু সে আর হল না। প্রথমত, এসে শুনলেন মাধব কবিরাজ মারা গেছেন দেড় মাস হল। তারপর তারক বাগচী বললেন, 'তুমি একা মানুষ, বিয়ে থা করোনি, কার জন্য ফিরবে বহরমপুরে? এখানেই থেকে যাও, কবিরাজ অর নো কবিরাজ। করিমগঞ্জের জলহাওয়াতেই তোমার বাত ভাল হয়ে যাবে।'

অনুরোধ এড়াতে পারেননি নিশিকান্তবাবু। একবার যেতে হয়েছিল বহরমপুর, তল্পিতল্পা গুটিয়ে আনার জন্য। সেই থেকে পেইং গেস্ট হয়ে আছেন বন্ধুর বাড়িতে। বেশ ছিমছাম বাড়ি, মুনসেফির আয় থেকে তারক বাগচী তৈরি করেছেন সিক্সটি ফোরে।

বউ মারা গেছেন বছর তিনেক হল, একটি মেয়ের বিয়ের হয়ে গেছে, একমাত্র ছেলে চাকরি করে দেরাদুনে।

জায়গাটা যে মনোরম তাতে সন্দেহ নেই। এককালে রেশমের কুঠি ছিল করিমগঞ্জে। সেই সূত্রেই ম্যাকেঞ্জি সাহেবের পূর্বপুরুষ এখানে বাসা বেঁধেছিল। কুঠি উঠে গেছে একশো বছর আগে। কিন্তু ম্যাকেঞ্জিরা করিমগঞ্জের মায়া কাটাতে পারেননি। শেষ সাহেব জন ম্যাকেঞ্জিও হয়তো থেকেই যেতেন, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল। ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় পশমের ব্যবসা করে, সে-ই বাপকে চিঠি লিখে দেশে আনিয়ে নেয়।

বন্ধুর সঙ্গে নিশিকান্তবাবুর একটা ব্যাপারে বেমিল। তারক বাগচী ঘরকুনো মানুষ, কাজের পর বাড়িতে এসে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দেন, আর নিশিকান্তবাবুর হেঁটে বেড়ানোর অভ্যাস, বাত

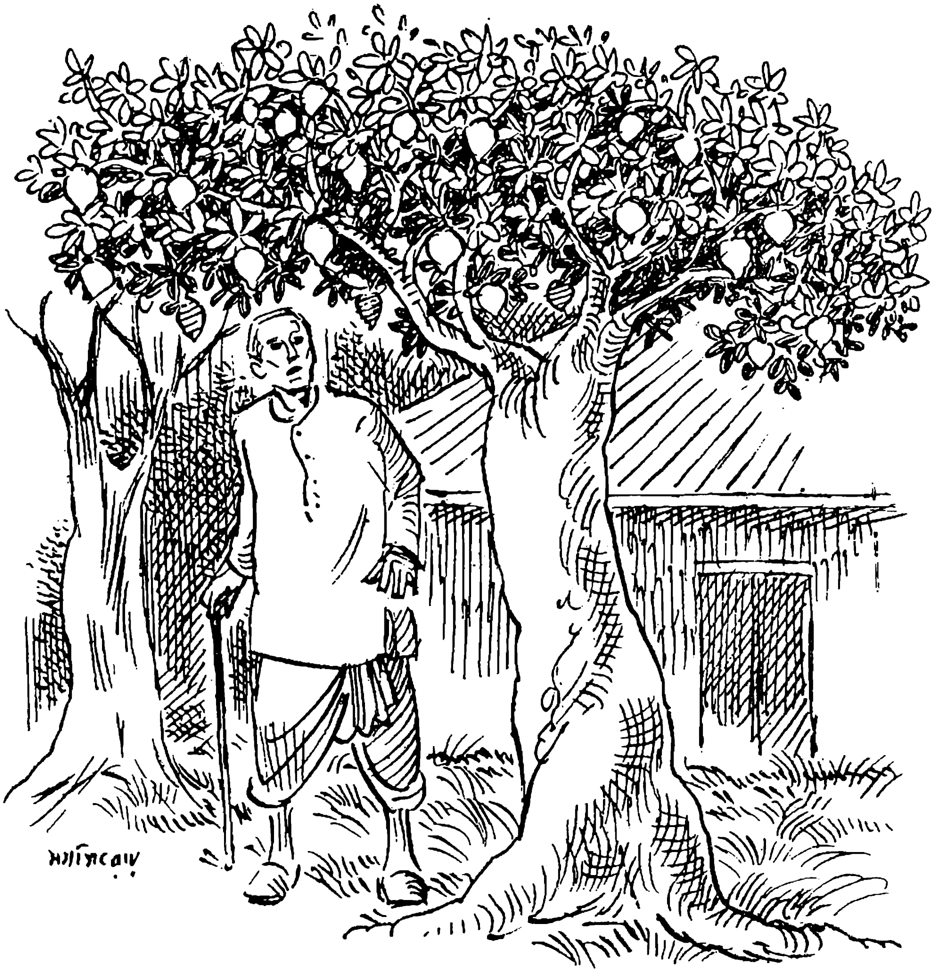

সত্ত্বেও সকালে সন্ধেয় মাইল দু-এক না হাঁটলে তাঁর ভাত হজম হয় না। করিমগঞ্জে আসার দিন তিনেকের মধ্যেই বেড়ানোর পথে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের পরিত্যক্ত বাংলোটা চোখে পড়ল তাঁর। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আড়াই বিঘে জমির মাঝখানে ছবির মতো একতলা বাংলো, খাপরা দেওয়া ঢালু ছাত, সামনে-পিছনে বারান্দা, চারদিক ঘিরে গাছপালা। নিশিকান্তবাবু গাছপালা ভালবাসেন, বটানি তাঁর প্রিয় সাবজেক্ট ছিল কলেজে, বহরমপুরের বাড়িতে তাঁর নিজেরও একটি ছোট্ট বাগান ছিল। তার উপর অনুসন্ধিৎসা তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ অঙ্গ। এত বিচিত্র রকমের গাছ দেখে তিনি আর লোভ সামলাতে পারেননি। ১০ই কার্তিক ১৩৮৭—তারিখটা জরুরি—তিনি বন্ধুর নিষেধ অমান্য করে কাপড় হাঁটুর উপর তুলে পাঁচিলের একটি ভাঙা অংশ টপকে ঢুকে পড়লেন ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে।

আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারকেল ইত্যাদি যাবতীয় দেশি গাছ ছাড়াও, ছবিতে এবং শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে দেখা কিছু বিদেশি গাছও চোখে পড়ল নিশিকান্তবাবুর। ফুলগাছ যা ছিল তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আগাছায় ভরে আছে চতুর্দিক। তারই মধ্যে দিয়ে এক অদম্য কৌতূহলে গাছপালা দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন নিশিকান্তবাবু।

বাগানের মধ্যে দিয়ে পাথরে বাঁধানো পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আশেপাশে ছড়ানো রয়েছে

শ্বেতপাথরের স্ট্যাচু, লোহার বেঞ্চি, জল শুকিয়ে যাওয়া ফোয়ারা। শৌখিন লোক ছিলেন ম্যাকেঞ্জিরা, তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলোর পিছন দিকটায় পৌঁছে গন্ধটা পেলেন নিশিকান্তবাবু। কোনও ফুল কিংবা ফলের গন্ধ। তবে চেনা নয়। স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধ।

নিশিকান্তবাবু এগিয়ে গেলেন অনুসন্ধান করতে। শরৎকালের দিন ছোট হয়ে এসেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নেমে পড়বে। গন্ধের কারণটা কী সেটা তার আগেই জানা দরকার।

একটা সিংহের মূর্তি পেরিয়ে তিন পা যেতেই নিশিকান্তবাবুকে থেমে যেতে হল। সামনে বাঁয়ে একটা করবী গাছ, তার ঠিক পিছনে একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় একটা অচেনা গাছের গায়ে পশ্চিম দিক থেকে ঢলে পড়া সূর্যের রশ্মি এসে পড়ে তার একটা দিককে যেন সোনার পাতে মুড়ে দিয়েছে

নিশিকান্তবাবু এগিয়ে গেলেন গাছটার দিকে। গন্ধ যে এই গাছটা থেকেই আসছে তাতে সন্দেহ নেই। গাছের ফল থেকে। সাদা রঙের ফল। ওপর দিকটা গোল। তলাটা ঈষৎ ছুঁচোলো। গোল অংশটার ব্যাস একটা মাঝারি সাইজের কমলালেবুর মতো। গাছের পাতাগুলো লক্ষ করলেন নিশিকান্তবাবু। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে শেখা বটানির কিছু নামও মনে পড়ে গেল। পাতার রঙ গাঢ় সবুজ, কম্পাউন্ড লিফ, অবলং, সেরেট। গাছটা দেড় মানুষ উঁচু। ফলের সংখ্যা কম করে পঞ্চাশ। তাদের গা থেকে সোনালি রোদ ক্রমে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ফলের রঙটার যেন একটা নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য আছে, যাতে মনে হয় অন্ধকার হবার পরও সেগুলো চোখ টানবে।

প্রায় মিনিট দশেক ধরে গাছটার এদিক ওদিক ঘুরে অবশেষে নিশিকান্তবাবুর মায়া কাটাতে হল। পোকামাকড় সরীসৃপের অভাব নেই এই পরিত্যক্ত বাগানে। এইবেলা বেরিয়ে পড়া দরকার। খালি হাতে ফিরবেন কি না? না। এই অভিনব গাছের একটি ফল সঙ্গে নেওয়া দরকার।

নিশিকান্তবাবু হাত বাড়িয়ে একটি ফল ছিঁড়ে নিয়ে বাড়িমুখো হলেন।

তারকবাবু ফলটা দেখে নিশিকান্তবাবুর মতো না হলেও, খানিকটা বিস্মিত হলেন বইকী!

'এ আবার কী আনলে সঙ্গে করে?'

নিশিকান্তবাবু বললেন। তারকবাবু ফলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'এ জিনিস তো কস্মিনকালে দেখিনি হে! অস্ট্রেলিয়ার ফলই হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু সেটা সঠিক জানা যায় কী করে বলো তো?'

ফলের নাম না জানা অবধি নিশিকান্তবাবুর শান্তি নেই।

'তুমি জ্ঞানবাবুকে দেখাও গিয়ে,' বললেন তারক বাগচী। 'ওঁর দেশ-বিদেশ অনেক ঘোরা আছে। দেখো উনি যদি চিনতে পারেন।'

জ্ঞানবাবু অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ চৌধুরী। চৌধুরীরা করিমগঞ্জের জমিদার ছিলেন। জ্ঞানপ্রকাশের ছিল ভ্রমণের নেশা। এখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি। তবে যুবা বয়সে যখন জমিদারি উচ্ছেদ হয়নি তখন বাপের পয়সায় অনেক ঘুরেছেন। অনেক দেশের অনেক কিছু জিনিস সংগ্রহ করে এনে বাড়ি ভরিয়ে ফেলেছেন।

নিশিকান্তবাবু তাঁর বন্ধুর কথামতো ফলটি থলিতে ভরে নিয়ে গেলেন জ্ঞান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোক তখন তাঁর বৈঠকখানায় বসে কলের গান শুনছেন। আজকাল ভদ্রলোকের নেশা পুরনো বাংলা গানের রেকর্ড আর ডাকটিকিটে এসে দাঁড়িয়েছে। চৌধুরীমশাই হালফ্যাশানের রেকর্ডপ্লেয়ারে বিশ্বাস করেন না। তাঁর গ্রামোফোনের চোঙা আছে, এবং সেটি হাতে ঘুরিয়ে দম দিয়ে চালাতে হয়। কাজেই কলের গান বলাটাই ঠিক।

তিন মিনিটের রেকর্ড—জোহরা বাঈ-এর গান শেষ হতে চাবি টিপে মেশিন বন্ধ করে ভদ্রলোক নিশিকান্তবাবুকে বসতে বললেন। হাতের ফলটা থলি থেকে বার করে শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর রেখে পাশের সোফায় আসন গ্রহণ করলেন নিশিকান্তবাবু।

'ওটা আবার কী?'

জ্ঞানবাবুর দৃষ্টি ফলের দিকে।

নিশিকান্তবাবু নম্রভাবে বললেন, 'আজ্ঞে ওটার জন্যই আপনার কাছে আসা। এই ফলটা পেয়েছি

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে, কিন্তু কী ফল সেটা বুঝতে পারছি না। আপনি তো অনেক ঘুরেছেন-টুরেছেন, তাই...'

'দেখি।'

নিশিকান্তবাবু ফলটা দিলেন চৌধুরীমশাইয়ের হাতে। সেটাকে নেড়েচেড়ে শুঁকেটুকে দেখে মাথা নাড়লেন জ্ঞান চৌধুরী।

'উঁহুঁ। এ ফল তো দেখছি আমার অজানা। আপনি বরং কোনও বটানিস্টকে জিজ্ঞেস করুন। প্রেসিডেন্সির বটানির অধ্যাপক এখন বোধ করি বিনয় সোম। সেদিন কাগজে যেন দেখলাম নামটা। সে যদি বলতে পারে।'

নিশিকান্তবাবু চিন্তায় পড়লেন। তাঁকে কি তা হলে কলকাতায় যেতে হবে এই ফল নিয়ে?

'আপনি এক কাজ করুন',—তাঁর চিন্তাটা আঁচ করেই যেন বললেন জ্ঞান চৌধুরী—'আমার মেজো ছেলের পোলারয়েড ক্যামেরা আছে। সে আপনাকে ফলসমেত গাছের রঙিন ছবি তুলে দেবে। তারই এক কপি আপনি সোমকে পাঠিয়ে দিন। তারপর দেখুন কী বলে?'

মেজো ছেলে জ্যোতিপ্রকাশ চৌধুরী কানাডায় প্রোফেসারি করেন, সম্প্রতি বিয়ে করতে এসেছেন করিমগঞ্জে। তিনি খুশি হয়েই তাঁর ক্যামেরার শাটার টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাদা কাগজ সড়াৎ করে ক্যামেরার গায়ে একটি খাঁজের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর চোখের সামনে এক মিনিটের মধ্যে ভেলকির মতো সেই কাগজে গাছের রঙিন ছবি ফুটে বেরোলো। জ্যোতিপ্রকাশ ছবিটা ছিঁড়ে নিশিকান্তবাবুকে দিয়ে দিলেন।

ছবিটা হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করে নিশিকান্তবাবু বললেন, 'একটা ছবি, যদি হারিয়ে টারিয়ে যায়...'

জ্যোতিপ্রকাশ বিনা বাক্যব্যয়ে আরও দু'খানা ছবি তুলে দিলেন নিশিকান্তবাবুকে।

ছবির সঙ্গে তাঁর কলেজলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে নিশিকান্তবাবু গাছের একটি বর্ণনা দিয়ে প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক বিনয় সোমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সাতদিনের মধ্যে উত্তর এসে গেল।

বিনয় সোম জানালেন, এমন গাছ তিনি কখনও দেখেননি।

কিন্তু নিশিকান্তবাবু সহজে ছাড়বার পাত্র নন। বর্ণনা সমেত আরেকটি ছবি তিনি পাঠালেন ইংল্যান্ডের রয়েল বোটানিক্যাল সোসাইটিতে। জ্ঞানবাবুর বাড়িতেই 'হুইটেকারস অ্যালম্যানাক' ছিল, তাতেই পাওয়া গেল সোসাইটির ঠিকানা। উত্তর আসতে লাগল তিন সপ্তাহ।

সোসাইটির পক্ষ থেকে মর্টিমার সাহেব জানিয়েছেন যে, ফল সমেত গাছের যে ছবি পাঠানো হয়েছে তাতে যদি কোনও কারচুপি না থাকে তা হলে বলতেই হবে যে, গাছটির জাত অজ্ঞাত।

এরপর যেটা ঘটল তাতে নিশিকান্তবাবুর চরিত্রের আরেকটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সেটা হল তাঁর ভাবুক দিক। একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিশিকান্তবাবু ভাবলেন—এই যে মানুষ এতরকম শাকসব্জি ফলমূল শস্যকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করছে, এর শুরু হল কবে? আম জাম কলা কমলা পেঁপে পেয়ারা এসব কে বা কারা প্রথম খেল, এ-কথা তো ইতিহাসে লেখে না। অমুক ফল সুস্বাদু, অমুক খাদ্য পুষ্টিকর—এসব কে কবে আবিষ্কার করল? এর মধ্যে এমনও তো অনেক কিছু আছে, যা মানুষের খাদ্য নয়, যা খেলে মানুষের অনিষ্ট হতে পারে। কয়েক শ্রেণীর ব্যাঙের ছাতা আছে। যা মানুষের পক্ষে মারাত্মক সেটা যে খাওয়া চলে না সেটাও তো একদিন মানুষকে খেয়েই বুঝতে হয়েছিল!

শাস্ত্রে যাবতীয় খাদ্যের গুণাগুণ লেখা আছে, কিন্তু শাস্ত্র লেখা হয়েছে এই তো সেদিন—মানুষ সভ্য হবার অনেক পরে। তার লক্ষ লক্ষ বছর আগেই তো সেসব খাদ্য মানুষ খেতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিহাসে এমন একটিও নজির আছে কি যেখানে বলা হয়েছে অমুক ফল অমুক শস্য আজ প্রথম অমুক ব্যক্তি খেয়ে সেটাকে খাদ্য বলে প্রমাণ করল?

এইসব চিন্তা থেকেই নিশিকান্তবাবু একদিন স্থির করলেন যে, এই নতুন ফল—যার নাম তিনি দিয়েছেন ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট—তাঁকে খেয়ে দেখতে হবে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি বন্ধুকে কিছু বললেন না। কারণ বললে তিনি হয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করবেন, না হয় হাঁ হাঁ করে উঠবেন। দুটোর কোনওটাই

নিশিকান্তবাবু চান না।

এই সিদ্ধান্ত নেবার পরদিনই নিশিকান্তবাবু প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে সোজা চলে গেলেন ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে।

মনে একটা সংশয় ছিল যে দেখবেন গাছে ফল নেই, সব ঝরে পড়েছে, কিন্তু গিয়ে দেখলেন ফলের সংখ্যা আগের দিনের চেয়ে বেশি। নিশিকান্তবাবু ঝোলা নিয়ে গিয়েছিলেন, টসটসে দেখে তিনটি ফল পেড়ে তাতে পুরে বাড়িমুখো হলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন তাঁর হৃৎস্পন্দনের মাত্রা সাধারণ অবস্থার চেয়ে বেশ খানিকটা দ্রুত। আজ তিনি যা করতে চলেছেন সেটা পৃথিবীতে আর কেউ কোনওদিন করেনি।

কিন্তু তাই কি?

গাছটা তো ছিল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে। তিনি নিজে কি এ ফল কোনওদিন খেয়ে দেখেননি?

এই নতুন প্রশ্নটা সাময়িকভাবে নিশিকান্তবাবুর সমস্ত উৎসাহকে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিল। কে দিতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর? ম্যাকেঞ্জি সাহেবের সঙ্গে করিমগঞ্জের কারুর ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা সেটা আগে জানা দরকার, তারপর ফল ভক্ষণ!

উত্তর মিলল তারকবাবুর কাছে।

'ম্যাকেঞ্জি বিশেষ মিশতেন টিশতেন না কারুর সঙ্গে', বললেন তারকবাবু। 'তবে শিবশরণ উকিলের সঙ্গে সাহেবকে ঘুরতে দেখেছি বারকয়েক। বোধহয় সাহেবের কোনও মামলার সূত্রে দু'জনের আলাপ হয়।'

শিবশরণ মিত্র ব্যাপারটাকে অনেক সহজ করে দিলেন। বললেন, 'মামলা নয়। তাঁরও বাগানের শখ, আমরাও বাগানের শখ, আর এই সূত্রে আমাদের আলাপ। তেতাল্লিশ রকম গোলাপ ছিল আমার বাগানে। সাহেব দেখে খুব তারিফ করেছিলেন।'

নিশিকান্তবাবু ভরসা পেয়ে ঝোলা থেকে ফল বার করলেন।

'এই ফল কি ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে দেখেছেন কখনও?'

শিবশরণবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল।

'সাহেবের বাগানে ছিল এই ফল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোনখানটায়?'

নিশিকান্তবাবু বর্ণনা দিলেন।

'কাছাকাছি একটা বাজে-ঝলসানো আমলকী গাছ আছে কী?' প্রশ্ন করলেন শিবশরণবাবু।

তা আছে। মনে পড়েছে নিশিকান্তবাবুর। এই অজানা গাছটার পুবদিকে হাত দশেক দূরে।

'তার মানে মেমসাহেব যেখানে মারা গিয়েছিলেন ঠিক সেইখানেই এই গাছ,' বললেন শিবশরণ উকিল। 'তবে সাহেব থাকাকালীন এ গাছ ছিল না। থাকলে আমার চোখে পড়ত। ও বাগানে সাহেবের সঙ্গে অনেক ঘুরিছি আমি।'

হাঁফ ছাড়লেন নিশিকান্তবাবু। পায়োনিয়ার হবার পথে তাঁর আর কোনও বাধা নেই। তিনিই হবেন ম্যাকেঞ্জি ফ্রুটের প্রথম ভক্ষক।

সেই রাত্তিরে নিতাই ঠাকুরের রান্না চচ্চড়ি, মুসুরির ডাল, লাউঘণ্ট আর ট্যাংরা মাছের ঝোল খেয়ে বন্ধুর সঙ্গে উত্তরের বারান্দায় বসে আধঘণ্টাখানেক গল্প করে নিশিকান্তবাবু চলে এলেন নিজের ঘরে। বিকেল থেকেই মেঘ করেছিল, দশটা নাগাদ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বেশ জাঁকিয়ে বৃষ্টি নামল। নিশিকান্তবাবু ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কুঁজো থেকে এক গেলাস জল ঢেলে নিয়ে খাটের পাশে টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর একটি ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট হাতে নিয়ে দেয়ালে টাঙানো পরমহংসদেবের ছবিটা উদ্দেশ করে একটা নমস্কার ঠুকে শরীরটাকে টান করে হাতের ফলে কামড় দিলেন।

বারতিনেক চিবোবার পর ফলের রস খাদ্যনালীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝলেন এ একেবারে দেবভোগ্য ফল। এর সঙ্গে অন্য কোনও ফলের সাদৃশ্য নেই। তুলনাও নেই।

একটি আস্ত ফল শেষ করতে পাঁচ মিনিট লাগল নিশিকান্তবাবুর। তখন রাত পৌনে এগারোটা।

ঘুমোনোর কোনও প্রশ্ন ওঠে না। একে তো আবিষ্কারের উত্তেজনা, তার উপর একটা সংশয় আছে—ফলে যদি কোনও অনিষ্ট হয় সেটা হয়তো রাতারাতিই জানা যাবে।

নিশিকান্তবাবু ঘন ঘন নিজের নাড়ি টিপে দেখতে লাগলেন। চেহারায় কোনও অনিষ্টের ছাপ পড়ছে কিনা জানার জন্য আধঘণ্টা অন্তর অন্তর দেয়ালে টাঙানো আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। শেষটায় মাঝরাতেই ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পায়চারি করে শরীরে মাংসপেশিগুলো সব ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করে দেখলেন।

পাঁচটার ঠিক পরে যখন ভোরের প্রথম পাখি ডাকতে শুরু করেছে, তখন নিশিকান্তবাবু উপলব্ধি করলেন যে তাঁর কোমরের বাত সম্পূর্ণ সেরে গেছে, এবং এমন সুস্থ তিনি গত ত্রিশ বছরের মধ্যে কখনও বোধ করেননি।

॥ ২ ॥

ম্যাকেঞ্জি ফলের এই আশ্চর্য স্বাদ তিনি একাই ভোগ করবেন এটা নিশিকান্তবাবুর কাছে ন্যায্য বলে মনে হল না। সেইসঙ্গে তিনিই যে ফলের সন্ধান পেয়েছেন এবং তিনিই যে প্রথম এই ফল খেয়ে দেখেছেন সেটা তো জানানো দরকার। বন্ধুর এ-ব্যাপারে কোনও উৎসাহ নেই সেটা নিশিকান্তবাবু ভালভাবেই জানেন। ব্যাপারটা কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তির গোচরে আনা উচিত এটা মনে করে জ্ঞান চৌধুরীর নামটাই সবচেয়ে আগে মনে পড়ল। মানুষে মানুষে রুচিভেদ হয় এটা নিশিকান্তবাবু জানেন, কিন্তু এমন সুস্বাদু ফল কারুর খারাপ লাগতে পারে এটা যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই একটি ফল সঙ্গে নিয়ে তিনি গেলেন চৌধুরী নিবাসে।

বৈঠকখানায় জ্ঞানবাবুর সঙ্গে একটি অবাঙালি ভদ্রলোককে দেখে কিছুটা দমে গেলেও, নিশিকান্তবাবু ভণিতা না করে তাঁর আসার কারণটা জানিয়ে দিয়ে থলি থেকে ফলটা বার করে চৌধুরী মশাইয়ের সামনে টেবিলে উপর রাখলেন।

'নাম জানলেন এ ফলের?' জ্ঞান চৌধুরী প্রশ্ন করলেন। নিশিকান্তবাবু জানালেন রয়্যাল বোটানিক্যাল সোসাইটি পর্যন্ত ছবি দেখে ফলটাকে চিনতে পারেনি।—'আপনি খেয়ে দেখুন, অতি সুস্বাদু ফল।'

জ্ঞানবাবু আপত্তি করলেন না, তবে কামড় দিয়ে না খেয়ে চাকরকে ডেকে ছুরি আর দুটো প্লেট আনিয়ে নিজে এক টুকরো নিয়ে এক টুকরো দিলেন অন্য ভদ্রলোকটিকে। খাওয়ার পর দু'জনের মুখের ভাব দেখে নিশিকান্তবাবুর মন খুশিতে ভরে গেল।

'এ যে অতি সুস্বাদু মশাই!' বললেন জ্ঞানবাবু।

'ওয়ান্ডারফুল!' বললেন অন্য ভদ্রলোকটি। 'ডিলিশাস! ইয়ে ফল কোথায় মিলল?'

নিশিকান্তবাবু সরল মনে সবকিছুই বলে দিলেন। এমনকী তাঁর বাত সেরে যাওয়ার ব্যাপারটা পর্যন্ত।

'ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট? এ কি আপনি দিলেন নাম?' অবাঙালি ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করলেন।

'নাম তো একটা দেওয়া দরকার,' বললেন নিশিকান্তবাবু। 'এ ছাড়া আর কিছু মনে পড়ল না।'

নামটা যে বেশ জবরদস্ত হয়েছে সেটা দুই ভদ্রলোকই স্বীকার করলেন। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে দু'জনকেই নমস্কার জানিয়ে নিশিকান্তবাবু বিদায় নিলেন।

চৌধুরী নিবাস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে নিশিকান্তবাবু ভারী প্রসন্ন বোধ করলেন। একটা কীর্তি রেখে যেতে চলেছেন তিনি। এমন যে হবে সেটা তাঁর এই বাষট্টি বছরের জীবনের ঘটনা থেকে কারুর বোঝার সাধ্যি ছিল কি? না, ছিল না। মাঝারি মানুষের মাঝারি জীবন তাঁর। আর লক্ষ লক্ষ মাঝারি জীবনের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু আজ তিনি অনন্য, শুধু বাঙালিদের মধ্যে নয়, নিজ-দেশবাসীদের মধ্যে নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে।

কিন্তু কীর্তির শেষ তো এখানেই না। এই ফল যদি দশজনের হাতে তুলে দেওয়া যায় তবেই না কীর্তি! ফলের ব্যাপক চাষ হলে দেশের লোকের যে কত উপকার হবে সেটা ভাবতেই নিশিকান্তবাবুর বুক দশহাত হয়ে গেল। ফলের বীজ তো আছে তাঁর কাছে! হালকা বেগুনি শাঁসের ভিতর কালো রঙের বীজ। সেটা পুঁতলে গাছ হবে না কী? তাঁর বাড়ির পিছনদিকে লাউ মাচার পাশে তো খানিকটা জমি রয়েছে। সেখানে পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কী?

কিন্তু সে-গুড়ে বালি। বিচি পুঁতে জলটল দিয়ে কোনও ফল হল না। সাতদিন অপেক্ষা করেও অঙ্কুরের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলেন না নিশিকান্তবাবু।

ইতিমধ্যে ফলের আশ্চর্য গুণের আরও পরিচয় পেয়েছেন তিনি। পড়শি অবনী ঘোষের আট বছরের ছেলে ভুতো তাঁর কাছে মাঝে মাঝে অঙ্ক দেখাতে আসে। তার ফ্যারিন জাইটিস সেরে গেছে ফল খেয়ে। পাড়ার একটা ঘেয়ো কুকুর তারকবাবুর বাড়ির রাস্তার দিকের বারান্দার সামনে এসে রোজ ঘুরঘুর করে। নিশিকান্তবাবু তাকে ফলের একটা টুকরো খেতে দেওয়ায় দু'দিন পরে দেখলেন তার ঘা শুকিয়ে গেছে। এমনকী বন্ধুকে না বলে তার চায়ে এক চামচ ম্যাকেঞ্জির রস মিশিয়ে দেওয়ার ফলে ভদ্রলোকের দশদিনের বসা সর্দি একদিনে হাওয়া।

কিন্তু শুধু করিমগঞ্জের লোকেরাই ফলের কথা জানবে, বাইরের আর কেউ জানবে না, এটা কি হয়? জ্যোতিপ্রকাশবাবুর তোলা একটা ছবি এখনও আছে নিশিকান্তবাবুর কাছে। ইংরিজিতে ফুলস্ক্যাপের চার পাতা একটি প্রবন্ধ লিখে ছবি সমেত স্টেটসম্যান পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন তিনি। প্রবন্ধের নাম 'এ ওয়ান্ডারফুল নিউ ফ্রুট'। বলা বাহুল্য, তিনি নিজেই ফলের আবিষ্কর্তা সেটা বেশ পরিষ্কার ভাবে লিখে দিলেন নিশিকান্তবাবু। এ অবস্থায় আত্মপ্রচারের লোভটা সামলানো কি সহজ কথা?

সাতদিন বাদে একটি বছর পঁচিশেকের যুবক তাঁর বাড়িতে এল দেখা করতে। ইনি অঞ্জন সেনগুপ্ত, স্টেটসম্যানের রিপোর্টার। স্মার্ট চেহারা, চোখে পুরু চশমা, সঙ্গে ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার। নিশিকান্তবাবু যে ফলটার কথা লিখেছেন সেটা সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়েছে তাঁকে।

নিশিকান্তবাবু খুশি হলেন। এই তো চাই। এটাই তো আশা করছিলেন তিনি।

'আমার লেখাটা যাচ্ছে তো?' নিশিকান্তবাবু প্রশ্ন করলেন।

'লেখার চেয়ে, মানে, সাক্ষাৎকারটা আজকাল লোকে পছন্দ করে বেশি', বললেন অঞ্জন সেনগুপ্ত। 'ইয়ে, আমি কি গাছটা একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন', বললেন নিশিকান্তবাবু, 'তবে মাইলখানেক হাঁটতে হবে।'

দু'জনে মিলে বেরিয়ে পড়লেন ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানের উদ্দেশে। দিনদশেক যাওয়া হয়নি বাগানে। শেষ যেদিন গেছেন সেদিনও নিশিকান্তবাবু দেখেছেন গাছ ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। এ ফলের কি তা হলে 'সিজন' নেই? সারা বছরই কি গাছে ফল ফলে? যাবার পথে এইসব প্রশ্ন নিশিকান্তবাবুর মনে ঘুরছিল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! যে বাগানে তিনি ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করেনি গত কয়েক মাস—এক ক্যামেরা নিয়ে জ্যোতিপ্রকাশ চৌধুরী ছাড়া—সেখানে আজ এত লোক কেন?

দুজন লোককে চিনতে পারলেন নিশিকান্তবাবু—জ্ঞানপ্রকাশ চৌধুরী ও তাঁর ঘরে সেদিন যে অবাঙালি ভদ্রলোকটি ছিলেন, তিনি। আজ তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন জ্ঞানবাবু।

'এঁকে সেদিন দেখেছেন আপনি। ইনি হচ্ছেন চুনিলাল মানসুখানি। আপনার দেওয়া সেই ফলটি খেয়ে অবধি এঁর মাথায় নানান ফন্দি খেলছে।'

'তাই বুঝি?'

নিশিকান্তবাবুর বুকের মধ্যে কেন জানি দুরু দুরু আরম্ভ হয়ে গেছে। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে সেটা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন।

'ওই ফলের চাষ করার ইচ্ছে মিঃ মানসুখানির। ব্যবসাদার মানুষ তো, নতুন ব্যবসার সুযোগ পেলে ওঁকে সামলানো দায়!'

নিশিকান্তবাবু কথাটা না বলে পারলেন না।

'কিন্তু আমি বীজ পুঁতে দেখেছি। চারার কোনও লক্ষণ দেখিনি।'

মানসুখানি হেসে উঠলেন। 'গাছ শুধু এই বাগানের মাটিতেই জন্মায়। ওই দেখুন—সাতদিন আগে পোঁতা বীজে কেমন চারা গজিয়েছে।'

নিশিকান্তবাবু অবাক হয়ে দেখলেন আগের গাছটা থেকে হাতদশেক ডাইনে একটি সতেজ গাছের চারা, পাতা দেখে তাকে চিনতে কোনও অসুবিধা হয় না।

সাংবাদিক অঞ্জন সেনগুপ্ত জোর খবরের গন্ধ পেয়ে নিশিকান্তবাবুকে ছেড়ে মানসুখানিকে ধরেই ইন্টারভিউ করে নিয়ে গেলেন। নিশিকান্তবাবুর প্রবন্ধের বদলে সেই ইন্টারভিউটাই বেরোলো কাগজে।

ছ'মাসের মধ্যে ম্যাকেঞ্জি ফলের গাছে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগান ভরে গেল। এক মাসের মধ্যে জ্ঞান চৌধুরীর সঙ্গে পার্টনারশিপে মানসুখানির ব্যবসা চালু হয়ে গেল। মাত্র একশো বাষট্টিটা গাছ। কিন্তু তা থেকে ফল পাওয়া যায় সারা বছর ধরে। ইতিমধ্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে জানা গেছে ফলে সাতরকম ভিটামিন আছে, এবং সেইসঙ্গে আরও এমন কিছু আছে, যার সঙ্গে রাসায়নিকদের এখনও পরিচয় হয়নি।

স্বাদ গন্ধ উপকারিতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য ফলের দাম হল আকাশ-ছোঁয়া। এক-একটি টিনে দু'টুকরো করে কাটা সংরক্ষক-রসে ভাসমান চারটি করে খোসা ছাড়ানো বীজবিহীন ফল। প্রতি টিনের দাম ভারতীয় টাকার হিসেবে সাড়ে তিনশো। দেশের লোক সে ফলের শুধু নামই শুনেছে, তাদের ঘরে সে ফল পৌঁছয় না, কারণ সব ফল চলে যায় জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায়। ফলের খ্যাতি সারা বিশ্বে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানের বাইরে সে ফল গজানো সম্ভব হয়নি।

যেমন বাগানে, তেমনই করিমগঞ্জের লাগোয়া বীরসিংহপুরে, ফল যেখানে টিনে ভরা হয় সেই কারখানায় পুলিশের কড়া বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বাগানের চারপাশ ঘিরে নতুন পাঁচিল উঠেছে, দেখে মনে হয় জেলখানার পাঁচিল। বাংলো ভেঙে মানসুখানির ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট কোম্পানির আধুনিক অফিস তৈরি হয়েছে। রোজ সকাল ন'টায় জার্মান মার্সিডিজ গাড়িতে ভদ্রলোককে সেই অফিসে আসতে দেখা যায়। তাঁর কয়েকজন খুব কাছের লোকও মাঝে মাঝে সেখানে আসেন, আর যাবার সময় সঙ্গে একটি

করে ফলের টিন নিয়ে যান কনসেশন রেটে। এ ছাড়া অফিসের কর্মীর বাইরে আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই।

আজ দেড় বছর হল এই ব্যবসা চালু হয়েছে। কিন্তু নিশিকান্তবাবুর হতভম্ব ভাবটা এখনও কাটেনি। অফিস খোলার দু'দিন বাদে তিনি গিয়েছিলেন ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগান দেখতে। কিন্তু পুলিশ তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। তিনি ভারী অবাক হয়ে বলেন, 'হাম নিশিকান্ত বোস হ্যায়—ইয়ে ফল হমারি আবিষ্কার হ্যায়—তুমহারা বাবুকো যাকে বোলো।' কিন্তু সশস্ত্র দ্বাররক্ষক তাঁর কথায় কান দেয়নি। জ্ঞান চৌধুরীর বাড়িতে গিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তিনি এখন আর যার-তার সঙ্গে দেখা করেন না।

তারক বাগচী অবশ্য এতদিনে সবই জেনেছেন। তিনি ভর্ৎসনার সুরে বন্ধুকে বলেন, 'তোমার বন্ধু উকিল, তুমি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে ফস করে কতগুলো ব্যাপার করে বসলে—ধুরন্ধর লোকের মতিগতি তুমি বুঝবে কী করে? তোমাকে বোকা পেয়ে তারা যে লেঙ্গি মারবে এতে করে আশ্চর্য কী?'

তবে একটি ফল নিশিকান্তবাবুর কাছে রয়ে গিয়েছিল। বীরসিংহপুরে গিয়ে একটি খালি টিন তিনি সংগ্রহ করে এনেছিলেন অনেক কষ্টে। সেই ফল তার মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন। তাঁরই আবিষ্কার এই ফল, তিনিই প্রথম খেয়েছিলেন, তিনিই নামকরণ করেছিলেন ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট।

সেই আশ্চর্য ফল এই দেড় বছর পরে আজও টাটকা রয়েছে।

সন্দেশ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৮

ফার্স্ট ক্লাস কামরা

আগের আমলের ফার্স্ট ক্লাস কামরা—বাথরুম সমেত ফোর বার্থ বা সিক্স বার্থ কম্পার্টমেন্ট—আজকাল উঠেই গেছে। এটা যে সময়ের গল্প, অর্থাৎ নাইনটিন সেভেনটি—তখনও মাঝে মাঝে এক-আধটা এই ধরনের কামরা কী করে জানি ট্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়ত। যাদের পুরনো অভিজ্ঞতা আছে, সেইসব ভাগ্যবান যাত্রী এমন একটি কামরা পেলে মনে করত হাতে চাঁদ পেয়েছে।

রঞ্জনবাবুও ঠিক তেমনই বোধ করলেন গাড়িতে উঠে। প্রথমে তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। এই ধরনের কামরায় শেষ কবে তিনি চড়েছেন তা আর মনে নেই। পয়সাওয়ালা বাপের ছেলে, তাই ফার্স্ট ক্লাসে চড়ার অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই। একক কামরা উঠে গিয়ে যখন ছয় কামরা বিশিষ্ট করিডর ট্রেন চালু হল, তখন রঞ্জনবাবু বুঝলেন আর একটা আরামের জিনিস দেশ থেকে উঠে গেল। গত কয়েক বছর থেকেই এ জিনিসটা লক্ষ করে আসছেন তিনি। বাপের ছিল ব্যুইক্ গাড়ি। পিছনের সিটে চিত হয়ে পা ছড়িয়ে বসে কত বেড়িয়েছেন সে গাড়িতে। তারপর এল ফিয়াট-অ্যামবাসাডরের যুগ। আরামের শেষ। ব্রিটিশ আমলে টেলিফোন তুললে মহিলা অপারেটর বলতেন 'নাম্বার প্লিজ'; তারপর নম্বর চাইলেই লাইন পাওয়া যেত নিমেষের মধ্যে। আর এখন ডায়াল করতে করতে তর্জনীর ডগায় কড়া পড়ে যায়। সমস্ত কলকাতা শহর থেকেই যেন আরাম জিনিসটা ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ট্রামে বাসে তাঁকে চড়তে হয়নি কোনও দিন, কিন্তু মোটর গাড়িতেই বা কী সুখ আছে? ট্র্যাফিক জ্যামের ঠেলায় প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে, গাড্ডায় গাড়ি পড়লে শরীরের হাড়গোড় আলগা হয়ে আসে।

রঞ্জনবাবুর মতে এ সবই আসলে দেশ স্বাধীন হওয়ার ফল। সাহেবদের আমলে এমন মোটেই ছিল না। কলকাতাকে তখন সত্যিই একটা সভ্য দেশের সভ্য শহর বলে মনে হত।

রঞ্জনবাবু বছর তিনেক আগে ছ'মাস কাটিয়ে এসেছেন লন্ডন শহরে। সাহেবরা বাঁচতে জানে,

সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের মূল্য জানে, সিভিক সেন্স কাকে বলে জানে। ঘড়ির কাঁটার মতো লন্ডন টিউবের গতিবিধি দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। আর যেমন মাটির নীচে, তেমনই মাটির উপরে। ওখানেও তো জনসংখ্যা নেহাত কম নয়, কিন্তু কই, বাসস্টপে তো ধাক্কাধাক্কি নেই, গলাবাজি নেই, কন্ডাক্টরের হুঙ্কার আর বাসের গায়ে চাপড় মারা নেই। ওদের বাস তো একদিকে কাত হয়ে চলে না যে, মনে হবে এই বুঝি উলটে পড়ল!

বন্ধুমহলে রঞ্জনবাবুর উগ্র সাহেবপ্রীতি একটা প্রধান আলোচনার বিষয়। ঠাট্টারও বটে, আর সেই কারণেই হয়তো রঞ্জনবাবুর বন্ধুসংখ্যা ক্রমে কমে এসেছে। শহরে যেখানে সাহেব প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে, সেখানে অনবরত সাহেব আর সাহেবি আমলের গুণকীর্তন ক'টা লোক বরদাস্ত করতে পারে? পুলকেশ সরকার ছেলেবেলার বন্ধু তাই তিনি এখনও টিকে আছেন, কিন্তু তিনিও সুযোগ পেলে বিদ্রূপ করতে ছাড়েন না। বলেন, 'তোমার এ দেশে জন্মানো ভুল হয়েছে। তোমার জাতীয় সংগীত হল গড সেভ দ্য কুইন, জনগণমন নয়। এই স্বাধীন নেটিভ দেশে তুমি আর বেশিদিন টিকতে পারবে না।'

রঞ্জনবাবু উত্তর দিতে ছাড়েন না।—'যাদের যেটা গুণ, সেটা অ্যাডমায়ার না করাটা অত্যন্ত সংকীর্ণ মনের পরিচয়। বাঙালিরা কলকাতা নিয়ে বড়াই করে—আরে বাবা, কলকাতা শহরের যেটা আসল বিউটি, সেই ময়দানও তো সাহেবদেরই তৈরি। শহরের যা কিছু ভাল সে তো তারাই করে দিয়ে গেছে। শ্যামবাজার বাগবাজার ভবানীপুরকে তো তুমি সুন্দর বলতে পারো না। তবে এটাও ঠিক যে ভালগুলো আর ভাল থাকবে না বেশি দিন। আর তার জন্য দায়ী হবে এই নেটিভ বাঙালিরাই।'

মধ্যপ্রদেশের রায়পুর শহরে দুই বন্ধুতে গিয়েছিল ছুটি কাটাতে। রঞ্জন কুণ্ডু একটা সাহেবি নামওয়ালা সওদাগরি অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পুলকেশ সরকার একটি বড় বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। এবার পুজো ঈদ মিলিয়ে দু'জনেরই দশদিনের ছুটে পড়ে গেল। রায়পুরে দুজনের কমন ফ্রেন্ড মোহিত বোসের সঙ্গে এক হপ্তা কাটিয়ে গাড়িতে করে বস্তারের অরণ্য অঞ্চল ঘুরে দেখে দুজনের একসঙ্গে কলকাতা ফেরার কথা ছিল। পুলকেশবাবু একবার বলেছিলেন ভিলাইতে তাঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে দু'দিন কাটিয়ে ফিরবেন, কিন্তু রঞ্জনবাবু রাজি হলেন না। বললেন, 'এসেছি একসঙ্গে, ফিরবও একসঙ্গে। একা ট্র্যাভেল করতে ভাল লাগে না ভাই।'

শেষ পর্যন্ত স্টেশনে গিয়েও পুলকেশবাবুকে থেকেই যেতে হল। ভিলাই রায়পুর থেকে মাত্র মাইল দশেক। পুলকেশবাবু আসতে পারবেন না জেনে খুড়তুতো ভাই সশরীরে এসে হাজির হলেন দাদাকে বগলদাবা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভিলাইয়ের বাঙালিরা বিসর্জন নাটক মঞ্চস্থ করবে পুজোয়, পুলকেশবাবুর থিয়েটারের নেশা, ভাইয়ের অনুরোধ, তিনি যদি গিয়ে নির্দেশনার ব্যাপারে একটু সাহায্য করেন! পুলকেশবাবু আর না করতে পারলেন না।

রঞ্জনবাবু হয়তো খুবই মুষড়ে পড়তেন, কিন্তু পুরনো ফার্স্ট ক্লাস কামরাটি দেখে তিনি এতই বিস্মিত ও পুলকিত হলেন যে, বন্ধুর অভাবটা আর অত তীব্রভাবে অনুভব করলেন না। আশ্চর্য এই যে, সেকালের হলেও কামরার অবস্থা দিব্যি ছিমছাম। সবক'টি আলোরই বাল্‌ব রয়েছে, পাখাগুলো চলে। সিটের চামড়া কোথাও ছেঁড়া নেই, বাথরুমটিও পরিপাটি।

আরও বড় কথা হচ্ছে ফোর বার্থ কামরায় রঞ্জন কুণ্ডু আর পুলকেশ সরকার ছাড়া আপাতত আর কেউ যাত্রী নেই। পুলকেশবাবু খোঁজ নিয়ে জানালেন, 'তুমি রাউরকেল্লা পর্যন্ত একা যেতে পারবে। সেখানে একটি যাত্রী উঠবেন, তারপর আর কেউ নেই। দুটো আপার বার্থ সারা পথই খালি যাবে।'

রঞ্জনবাবু বললেন, 'তোমাকে এই পুরনো কামরার আরামের কথা অনেকবার বলেছি, আফসোস এই যে, এতে ট্র্যাভেল করার সুযোগ পেয়েও নিতে পারলে না।'

বন্ধু হেসে বললেন, 'হয়তো দেখবে কেল্‌নারের লোক এসে তোমার ডিনারের অর্ডার নিয়ে গেল।'

'ওটা বলে আবার মন খারাপ করে দিও না,' বললেন রঞ্জনবাবু। 'ট্রেনে খাওয়ার কথা ভাবতে গেলে এখন কান্না আসে। আমাদের ছেলেবেলায় কেল্‌নারের লাঞ্চ আর ডিনারের জন্য আমরা মুখিয়ে থাকতাম।'

রঞ্জনবাবু অবিশ্যি বন্ধুর বাড়ি থেকে লুচি তরকারি নিয়ে এসেছেন টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে। রেলের

থালিতে তাঁর আদৌ রুচি নেই।

যথাসময়ে বোম্বে মেল ছেড়ে দিল। 'কলকাতায় দেখা হবে ভাই', বললেন পুলকেশ সরকার। 'তোমার জার্নি আরামদায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই।'

গাড়ি ছাড়ার পরে রঞ্জনবাবু মিনিটখানেক শুধু কামরার মধ্যে পায়চারি করলেন। এ সুখ বহুকাল পাননি তিনি। আজকালকার কামরায় ট্রেন ছাড়লে পরে সিটে বসে পড়া ছাড়া আর গতি নেই। বাইরে করিডর আছে বটে, কিন্তু তা এতই সংকীর্ণ সেখানে হাঁটা চলে না। এক স্টেশন এলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করা যায়, তা ছাড়া সারা রাস্তা অনড় অবস্থা।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর কোন সিটটা দখল করবেন এই নিয়ে একটু চিন্তা করে শেষে রায়পুরের প্ল্যাটফর্মের দিকের সিটটায় বসে সুটকেস থেকে একটা বালিশ ও একটা ডিটেকটিভ বই বার করে শুয়ে পড়লেন রঞ্জনবাবু। এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। অন্ধকার হয়ে যাবে একটুক্ষণের মধ্যেই। তবে বই পড়া বন্ধ করার প্রয়োজন নেই, কারণ মাথার পিছনে রিডিং লাইট আছে, এবং সেটা জ্বলে।

ন'টায় রায়গড় পেরোনোর পর থেকেই একটা ঘুমের আমেজ অনুভব করলেন রঞ্জনবাবু। বিলাসপুরে লোক এসেছিল ডিনারের অর্ডার নিতে। রঞ্জনবাবু স্বভাবতই তাকে না করে দিয়েছেন। এবারে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাওয়াটা সেরে নীল লাইট ছাড়া আর সবক'টা আলো নিভিয়ে দিয়ে রঞ্জনবাবু বেঞ্চিতে গা এলিয়ে দিলেন। দেওয়ামাত্র মনে পড়ল রাউরকেল্লায় যাত্রী ঢুকবে ঘরে। আজকাল করিডর ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে কোনও যাত্রী উঠলে কন্ডাক্টর গার্ডই তার ব্যবস্থা করে দেয়। এই পুরনো গাড়িতে তাঁকেই উঠে দরজা খুলতে হবে। তা হলে কি দরজাটা লক্ করবেন না? যদি ঘুম না ভাঙে? ক্ষতি কী লক্ না করলে? যিনি আসবেন তিনিই না হয় লক্ লাগিয়ে নেবেন। আর এমন কিছু মাঝরাত্তির নয় তো, রাউরকেল্লা আসে বোধহয় সাড়ে দশটা নাগাদ। চিন্তার কোনও কারণ নেই।

বেদম বেগে ছুটে চলেছে বোম্বাই মেল। কামরার দোলানিতে কারুর কারুর ভাল ঘুম হয় না, কিন্তু রঞ্জনবাবুর হয়। কোথায় যেন পড়েছিলেন যে, মা শিশুকে কোলে দোল দিয়ে ঘুম পাড়ানোর স্মৃতি শিশু বড় হলেও তার মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তাই ট্রেনের দোলানিতে ঘুম পাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ছেলেবেলায় ফার্স্ট ক্লাসে কেল্‌নারের চিকেন কারি অ্যান্ড রাইস আর কাস্টার্ড পুডিং-এর মধুর স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে রঞ্জনবাবু নিদ্রাসাগরে তলিয়ে গেলেন।

'গরম চায়?' চায় গরম?'

ঘুমটা ভাঙল খোলা জানলার বাইরে থেকে ফেরিওয়ালার ডাক শুনে। স্টেশন। প্ল্যাটফর্মের ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলোর রশ্মি টেরচা ভাবে কামরায় ঢুকে তাঁর নিজের শরীর ও মেঝের খানিকটা অংশে পড়েছে।

'হিন্দু চায়! হিন্দু চায়!!'

কী আশ্চর্য অপরিবর্তশীল এই স্টেশনের ফেরিওয়ালার ডাক। মনে হয় একই লোক ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্টেশনে ঠিক একই ভাবে ডেকে চলেছে আবহমানকাল থেকে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্টেশনের নাম দেখতে পেলেন না রঞ্জনবাবু। রাউরকেল্লা নয় তো?

নামটা মনে পড়তেই রঞ্জনবাবুর চোখ গেল বেঞ্চির বিপরীত দিকে। একটা টুং টুং আওয়াজ কানে এসেছিল ঘুমটা ভাঙামাত্র। এবার আবছা নীল আলোয় দেখলেন একটি লোক বসে আছে বেঞ্চিতে। তার সামনে দুটো বোতল ও একটি গেলাস। গেলাসে পানীয় ঢাললেন ভদ্রলোক এইমাত্র। এবার সেই পানীয় চলে গেল তার মুখের দিকে।

মদ খাচ্ছেন নাকি সহযাত্রী? উনিই কি রাউরকেল্লায় উঠেছেন? এটা কি তা হলে চক্রধরপুর? বড় স্টেশন বলেই তো মনে হচ্ছে।

রঞ্জনবাবু আগন্তুকের দিকে চেয়ে দেখলেন। মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবে একটা বেশ তাগড়াই গোঁফ রয়েছে ভদ্রলোকের, সেটা বোঝা যায়। পরনে শার্ট ও প্যান্ট, তবে নীল আলোতে তাদের রঙ বোঝা মুশকিল।

রঞ্জনবাবুকে নড়াচড়া করতে দেখেই বোধহয় আগন্তুক তাঁর সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন। মদের গন্ধ পাচ্ছেন রঞ্জনবাবু, তাঁর নিজের ওসব বদ অভ্যাস নেই, কিন্তু চেনাশোনার মধ্যে অনেকেই

ড্রিংক করে। পার্টি-টার্টিতেও যেতে হয় তাঁকে। কাজেই কোন্ পানীয়ের কী গন্ধ, সেটা মোটামুটি জানা আছে। ইনি খাচ্ছেন হুইস্কি।

'ইউ দেয়ার।'

সোজা রঞ্জনবাবুর দিকে মুখ করে ঘড়ঘড়ে গলায় হাঁক দিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

গলা এবং উচ্চারণ শুনে রঞ্জনবাবুর বুঝতে বাকি রইল না যে যিনি উঠেছেন তিনি হচ্ছেন সাহেব। এ গলার দানাই আলাদা।

'ইউ দেয়ার!' আবার হাঁক দিয়ে উঠলেন অন্ধকারে বসা সাহেবটি। নেশা হয়ে গেছে এর মধ্যেই, নইলে আর এত মেজাজের কী কারণ থাকতে পারে?

'আপনি কিছু বলতে চাইছেন কী?' ইংরিজিতে প্রশ্ন করলেন রঞ্জনবাবু। মনে মনে বললেন পুরনো ফার্স্ট ক্লাসের সঙ্গে মানানসই বটে এই সাহেব সহযাত্রী!

'ইয়েস' বললেন সাহেব। 'গেট আউট অ্যান্ড লিভ মি অ্যালোন।'

অর্থাৎ ভাগো হিঁয়াসে। আমি একা থাকতে চাই।

এবার রঞ্জনবাবু বুঝলেন যে, সাহেবের নেশাটা বেশ ভালমতোই হয়েছে। কিন্তু কথাটার তো একটা উত্তর দিতে হয়। যথাসাধ্য শান্তভাবে বললেন, 'আমারও রিজার্ভেশন রয়েছে এই কামরায়। আমরা দু'জনেই থাকব এখানে—তাতে ক্ষতিটা কী?'

গার্ডের হুইস্‌লের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের ভোঁ শোনা গেল, আর পরমুহূর্তেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বোম্বে মেল আবার রওনা দিল। রঞ্জনবাবু আড়চোখে স্টেশনের নামটা দেখে নিলেন। চক্রধরপুরই বটে!

এখন ঘরে নীল নাইট লাইট ছাড়া আর কোনও আলো নেই। রঞ্জনবাবু সাহেবটিকে একটু ভাল করে দেখার জন্য এবং মনে আর একটু সোয়াস্তি আনার জন্য অন্য বাতি জ্বালানোর উদ্দেশ্যে সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু সাহেবের 'ডোন্ট!' হুঙ্কার তাঁকে নিরস্ত করল। যাই হোক এতক্ষণে রঞ্জনবাবুর চোখ অন্ধকারে সয়ে গেছে। এখন সাহেবের মুখ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। গোঁফজোড়াটাই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। চোখ দুটো কোটরে বসা। নীল আলোতে গায়ের রঙ ভারী ফ্যাকাসে মনে হচ্ছে। মাথার চুল সোনালি না সাদা সেটা বোঝার উপায় নেই।

'আমি নিগারের সঙ্গে এক কামরায় থাকতে রাজি নই। তোমায় বলছি তুমি নেমে পড়ো।'

নিগার! উনিশশো সত্তর সালে ভারতবর্ষে বসে কোনও ভারতীয়কে নিগার বলার সাহস কোনও সাহেবের হতে পারে এটা রঞ্জনবাবু ভাবতে পারেননি। ব্রিটিশ আমলে এ জিনিস ঘটেছে, এ গল্প রঞ্জনবাবু শুনেছেন। সবসময় যে বিশ্বাস হয়েছে তা নয়। সাহেবদের সম্বন্ধে অনেক মিথ্যে অপবাদ রটিয়েছে বাঙালিরা। আর যদি সত্যি হয়ে থাকে, সেসব সাহেব নিশ্চয়ই খুব নিম্নস্তরের। ভদ্র সাহেব, সভ্য সাহেব যারা, তারা ভারতীয়দের সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার কখনওই করতে পারে না।

রঞ্জনবাবুর বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গেছে। তবে এখনও ধৈর্যচ্যুতি হয়নি। মাতালের ব্যাপারে ধৈর্যহারা হলে চলে না। সুস্থ অবস্থায় এ সাহেব কখনওই এ ধরনের কথাবার্তা বলতে পারত না।

রঞ্জনবাবু সংযতভাবে বললেন, 'তুমি যেভাবে কথা বলছে, সেরকম কিন্তু আজকাল আর কোনও সাহেব বলে না। ভারতবর্ষ আজ বছর পঁচিশেক হল স্বাধীন হয়েছে সেটা বোধহয় তুমি জানো।'

'হোয়াট?'

কথাটা বলেই সাহেব রঞ্জনবাবুকে চমকে দিয়ে ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

'কী বললে তুমি? ভারত স্বাধীন হয়েছে? কবে?'

'নাইনটিন ফর্টি সেভন। অগাস্ট দ্য ফিফটিন্থ।'

কথাটা বলতে গিয়ে রঞ্জনবাবুর হাসি পাচ্ছিল। স্বাধীনতার এতদিন পরে নিজের দেশে বসে কাউকে তারিখ সমেত খবরটা দিতে হচ্ছে, এটা একটা কমিক ব্যাপার বইকী!

'ইউ মাস্ট বি ম্যাড!'

'আমি ম্যাড নই সাহেব', বললেন রঞ্জনবাবু। 'আমার মনে হয় তোমার নেশাটা একটু বেশি হয়েছে?'

'বটে?'

সাহেব হঠাৎ তাঁর ডান দিকে বেঞ্চির উপর থেকে একটা জিনিস তুলে নিলেন।

রঞ্জনবাবু সভয়ে দেখলেন সেটা একটা রিভলভার, আর সেটা সটান তাঁরই দিকে তাগ করা।

'সি দিস?' বললেন সাহেব। 'আমি আর্মির লোক। আমার নাম মেজর ড্যাভেনপোর্ট। সেকেন্ড পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। আমার মতো অব্যর্থ নিশানা আর কারুর নেই আমার রেজিমেন্টে। আমার হাত কাঁপছে কি? তোমার শার্টের তৃতীয় বোতামের ডান দিকে আমার লক্ষ্য। ঘোড়া টিপলে সেইখান দিয়ে গুলি ঢুকে সোজা জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তোমার আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। ভাল চাও তো বেরিয়ে পড়ো। একে তো নিগার। তার উপরে উন্মাদ, এটা কত সাল জানো? নাইনটিন থার্টিটু। আমাদের অনেক উত্ত্যক্ত করেছে তোমাদের ওই নেংটি পরা নেতা। স্বাধীনতার স্বপ্ন তোমরা দেখতে পারো, কিন্তু সেটা বাস্তবে পরিণত হবে না কখনওই।'

এবার সত্যিই প্রলাপ বকছেন সাহেব। উনিশশো সত্তর হয়ে গেল নাইনটিন থার্টিটু? নেংটি পরা নেতা গান্ধিজি মারা গেছেন তাও হয়ে গেছে তেইশ বছর।

'কাম অন নাউ, গেট আপ।'

সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। রঞ্জনবাবু লক্ষ করলেন তাঁর পা টলছে না। সবে শুরু করলেন কি তা হলে মদ খেতে? কিন্তু এত উলটোপালটা বকছেন কেন? উনিই কি তা হলে উন্মাদ?

'আপ! আপ!'

রঞ্জনবাবুর গলা শুকিয়ে গেছে। তিনি সিট ছেড়ে মেঝেতে নামতে বাধ্য হলেন। সেই সঙ্গে প্রায় তাঁর অজান্তেই তাঁর হাত দুটো উপরের দিকে উঠে গেল।

'নাউ টার্ন রাউন্ড অ্যান্ড গো টু দ্য ডোর।'

সাহেব বলে কী? কমপক্ষে ষাট মাইল বেগে চলেছে মেল ট্রেন। তিনি কি চলন্ত অবস্থায় তাঁকে গাড়ি থেমে নামিয়ে দিতে চান?

এই অবস্থাতেও কোনওমতে একটি কথা উচ্চারণ করতে সমর্থ হলেন রঞ্জনবাবু।

'শুনুন মেজর ড্যাভেনপোর্ট—এর পরেই টাটানগর, গাড়ি থামলে আমি যাব অন্য কামরায়—কথা দিচ্ছি। চলন্ত গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাকে মেরে ফেলে আপনার কী লাভ?'

'টাটানগর? ও নামে কোনও স্টেশন নেই। তুমি আবার আবোল তাবোল বকছ।'

রঞ্জনবাবু বুঝলেন যে, এটা উনিশশো বত্রিশ সাল সেটা যদি সাহেব বিশ্বাস করে বসে থাকেন তা হলে অবিশ্যি টাটানগর বলে কোনও স্টেশন থাকার কথা নয়। এখানে প্রতিবাদ করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে বললেন, 'ঠিক আছে, মেজর ড্যাভেনপোর্ট, আমারই ভুল। তবে এর পর অন্য যে কোনও স্টেশনে গাড়ি থামুক, আমি নেমে যাব। ঘণ্টাখানেকের বেশি তোমার নিগারের সঙ্গ বরদাস্ত করতে হবে না, কথা দিচ্ছি।'

সাহেব যেন একটু নরম হয়ে বললেন, 'মনে থাকে যেন, কথার নড়চড় হলে তোমার লাশ পড়ে থাকবে লাইনের ধারে, এটা বলে দিলাম।'

সাহেব গিয়ে তাঁর জায়গায় বসে হাত থেকে রিভলভার নামিয়ে রাখলেন বেঞ্চির এক পাশে। রঞ্জনবাবু এ যাত্রা প্রাণে মরেননি এটা ভেবে খানিকটা ভরসা পেয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। সাহেব যাই বলুন, এর পরের স্টেশন যে টাটানগর সেটা রঞ্জনবাবু জানেন। আসতে আরও এক ঘণ্টা দেরি। এই সময়টুকু তিনি এই কামরাতেই আছেন। তারপর কপালে কী আছে জানা নেই। অন্য ফার্স্ট ক্লাস কামরায় জায়গা পাবেন কী? সেটা জানা নেই। জানার উপায়ও নেই।

ড্যাভেনপোর্ট সাহেব আবার মদ্যপান শুরু করেছেন। সাময়িকভাবে তাঁর সামনের বেঞ্চের যাত্রীর কথাটা তিনি যেন ভুলেই গেছেন। রঞ্জনবাবু আধ বোজা চোখে চেয়ে রয়েছেন তাঁর দিকে। এমন এক বিভীষিকাময় ঘটনার মধ্যে তাঁকে পড়তে হবে কে জানত? পুলকেশ থাকলে এ জিনিস ঘটত কী? না, তা ঘটত না। তবে এর চেয়েও সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারত। পুলকেশ রগচটা মানুষ। তা ছাড়া শারীরিক শক্তি রাখে যথেষ্ট। তার দেশাত্মবোধ প্রবল। কোনও সাদা চামড়ার কাছ থেকে অপমান হজম করার লোক সে নয়। হয়তো ধাঁ করে একটা ঘুষিই লাগিয়ে

দিত। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় এক গোরাকে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেওয়ার গল্প সে এখনও করে।

ট্রেন চলেছে রাতের অন্ধকার ভেদ করে। মিনিটদশেক পরে রঞ্জনবাবু অনুভব করলেন যে, এই বিপদের মধ্যেও গাড়ির দোলানিতে তাঁর মাঝে মাঝে একটা তন্দ্রার ভাব আসছে।

এই অবস্থাতেই একটা নতুন চিন্তা তাঁকে হঠাৎ সম্পূর্ণ সজাগ করে দিল।

সাহেবের কোনও মালপত্র নেই। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় কী? একটা সামান্য হাত-বাক্সও কি থাকবে না? শুধু মদ, সোডার বোতল, গেলাস আর রিভলভার নিয়ে কি কেউ ট্রেনে ওঠে?

আর উনিশশো বত্রিশ সাল, নেংটি পরা নেতা, টাটানগর নেই—এসবেরই বা মানে কী?

মানে কি তা হলে একটাই যে, সাহেব আসলে জ্যান্ত সাহেব নন, তিনি ভূত?

মেজর ড্যাভেনপোর্ট নামটা কি চেনা চেনা লাগছে?

হঠাৎ ধাঁ করে রঞ্জনবাবুর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বছর পাঁচেক আগে ব্যারিস্টার বন্ধু নিখিল সেনের বাড়িতে আড্ডায় কথা হচ্ছিল। বিষয়টা সাহেব প্রীতি এবং সাহেব বিদ্বেষ। কে বলেছিল ঠিক মনে নেই, কিন্তু বোম্বে মেলেই একবার এক বাঙালিকে ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এক গোরা সৈনিক। নামটা মেজর ড্যাভেনপার্টই বটে! কাগজে বেরিয়েছিল খবরটা। সালটা জানা নেই, তবে থার্টিটু হওয়া আশ্চর্য না। সাহেবের হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। সেই বাঙালি ছিলেন অসীম সাহস ও দৈহিক শক্তির অধিকারী। অপমান হজম করতে না পেরে সাহেবকে মারেন এক বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুঁষি। সাহেব উলটে পড়েন এবং বেঞ্চির হাতলে মাথায় চোট লেগে তৎক্ষণাৎ মারা যান।

রঞ্জনবাবু অনুভব করলেন তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও সামনের লোকটার দিকে আর একবার না চেয়ে থাকতে পারলেন না তিনি।

মেজর ড্যাভেনপোর্ট হাতে গেলাস নিয়ে বসে আছেন। নাইট লাইটের আলো এমনিতেই উজ্জ্বল নয়; আলোর শেডও অপরিষ্কার, বাল্‌বের পাওয়ারও বেশি নয়। তার উপর গাড়ির ঝাঁকুনি। সব মিলিয়ে সাহেবের দেহটাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। হয়তো এই কামরাতেই সাহেবের মৃত্যু হয়েছিল—১৯৩২ সালে। আর তখন থেকেই এই পুরনো আমলের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় রোজ রাত্তিরে...

রঞ্জনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। সাহেব আর তাঁর দিকে দৃকপাত করছেন না; তিনি মদ নিয়ে মশগুল হয়ে বসে আছেন।

চেয়ে থাকতে থাকতে রঞ্জনবাবু অনুভব করলেন যে, তাঁর চোখের পাতা আবার ভারী হয়ে আসছে। ভূতের সামনে মানুষের ঘুম পেতে পারে এটা তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন। মেজর ড্যাভেনপোর্ট একবার নেই, একবার আছেন। অর্থাৎ চোখের পাতা বন্ধ হলে নেই, আবার খুললেই আছেন। একবার যেন সাহেব তাঁর দিকে চাইলেন। তারপর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা একটা কথা বারকয়েক এল তাঁর কানে—'ডার্টি নিগার...ডার্টি নিগার...'

তারপর রঞ্জনবাবুর আর কিছু মনে নেই।

রঞ্জনবাবুর যখন ঘুম ভাঙল তখন জানলার বাইরে ভোরের আলো। সামনের বেঞ্চে কেউ নেই। রাত্রের বিভীষিকার কথা ভেবে তিনি একবার শিউরে উঠলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ফাঁড়া কেটে গেছে বুঝতে পেরে হাঁফ ছাড়লেন। এ গল্প কাউকে বলা যাবে না। প্রথমত, কেউ বিশ্বাস করবে না; দ্বিতীয়ত, তিনি যে সাহেব ভূতের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন এটা খুব জাহির করে বলার ঘটনা নয়। ডার্টি নিগার। কথাটা তাঁর আঁতে লেগেছিল বিশেষ ভাবে, কারণ তাঁর নিজের রঙ রীতিমতো ফরসা। অনেক রোদে পোড়া সাহেবের চেয়ে বেশি ফরসা। এই রঙের জন্য লন্ডনে অনেকে তাঁকে ভারতীয় বলে বিশ্বাস করেনি। আর তাঁকেই কিনা বলে ডার্টি নিগার!

সঙ্কল্প অনুযায়ী তাঁর ট্রেনের অভিজ্ঞতাটা রঞ্জনবাবু কাউকেই বলেননি। তবে তাঁর মধ্যে উগ্র সাহেবপ্রীতির ভাবটা যে অনেকটা কমেছে সেটা তাঁর কাছের লোকেরা অনেকেই লক্ষ করেছিল।

ঘটনার দশ বছর পরে একদিন সন্ধ্যায় তাঁর নিজের বাড়িতে বন্ধু পুলকেশের সঙ্গে বসে কফি খেতে খেতে রঞ্জনবাবু ব্যাপারটা উল্লেখ না করে পারলেন না।

'সেভেনটিতে রায়পুর থেকে ফেরার সেই দিনটার কথা মনে পড়ে?'

'বিলক্ষণ।'

'তোমাকে বলি বলি করেও বলিনি, এক সাহেব ভূতের পাল্লায় পড়ে কী নাজেহাল হয়েছিলাম জানো না!'

'মেজর ড্যাভেনপোর্টের ভূত কী?'

রঞ্জনবাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'সে কী? তুমি জানলে কী করে?'

পুলকেশবাবু তাঁর ডান হাতটা বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'মিট দ্য গোস্ট অফ মেজর ড্যাভেনপোর্ট।'

রঞ্জনবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছে।

'তুমি! তা তুমি অ্যাদ্দিন—?'

'বলে ফেললে তো সমস্ত ব্যাপারটাই ব্যর্থ হত ভাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার মধ্যে থেকে সাহেবপ্রীতির ভূতটা তাড়ানো। ঘটনাটা যদি তুমি বিশ্বাস না করো, তা হলে কাজটা হবে কী করে? আমি নিগার বলছি, আর সাহেব নিগার বলছে—দুটোর মধ্যে তফাত নেই?'

'কিন্তু কীভাবে—?'

'ভেরি ইজি', বললেন পুলকেশ সরকার। 'তোমার কামরাটা দেখেই ফন্দিটা আমার মাথায় আসে। গাড়ি ছাড়ার পর তোমার পাশের ফার্স্ট ক্লাস বগিটাতে উঠে পড়ি। আমার ফার্স্ট এড বক্স থেকে তুলো নিয়ে গোঁফ করেছিলাম। তা ছাড়া নো মেক আপ। আমারই কামরায় একটি গুজরাটি বাচ্চার হাতে দেখলাম একটা খেলার রিভলভার। এক রাতের জন্য ধার চাইতে খুশি হয়ে দিয়ে দিল। তার বাপের সঙ্গে হুইস্কি ছিল। সেটাও চেয়ে নিলাম। অবিশ্যি কেন নিচ্ছি সেটাও বলতে হল। আমি নিজে খেয়েছি শুধু জল। হুইস্কির বোতলটা খোলা রেখেছিলাম যাতে তুমি গন্ধ পাও। ব্যস্। বাকি কাজ করেছিল তোমার কামরার নীল আলো, আর তোমার কল্পনা।... আশা করি কিছু মনে করোনি ভাই।'

রঞ্জনবাবু বন্ধুর হাতটা দু'হাতে চেপে ধরলেন বটে, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

তাঁর বিস্ময় ভাবটা কাটতে লাগবে আরও দশ বছর।

সন্দেশ, পৌষ ১৩৮৮

ডুমনিগড়ের মানুষখেকো

'আমি তখন ছিলাম ডুমনিগড় নেটিভ স্টেটের ম্যানেজার', বললেন তারিণীখুড়ো।

'ডুমনিগড় ম্যাপে আছে?' জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা। ন্যাপলার মুখে কিছু আটকায় না।

'তোর কি ধারণা ম্যাপে যা আছে তার বাইরে আর কিছু নেই?' চোখ-কান কুঁচকে বিস্ময় আর বিরক্তি দুটোই একসঙ্গে প্রকাশ করে বললেন তারিণীখুড়ো। 'ম্যাপ তৈরি করে কারা? মানুষে তো! ভগবানের সৃষ্টিতে ডিফেক্ট থাকে জানিস? জোড়া মানুষ সায়ামীজ টুইন্‌সের কথা শুনিসনি? হাতে ছটা করে আঙুল, বাছুরের দুটো মাথা—এসব শুনিসনি?—ম্যাপে নেই ডুমনিগড়। এই নিয়ে ফিলিপ্‌সের অ্যাটলাস কোম্পানিকে কড়া চিঠি দিয়েছিলাম সেই সময়। তারা লিখলে, ভেরি সরি, আগামী সংস্করণে শুধরে দেবে। দেয়নি যে, সেটা স্রেফ গাফিলতি। ডুমনিগড় হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের বাঘেলখণ্ডে। মাইহার অবধি ট্রেন, তারপর একশো বত্রিশ কিলোমিটার পুবে গাড়িতে। হল?'

ন্যাপলা চুপ মেরে গেল। আমরাও বাঁচলাম, কারণ তারিণীখুড়োর গল্প শোনার আগ্রহ আমাদের সকলের সমান, ন্যাপলারও। খুড়ো আসলে আমাদের কেউ হন না, তবে খুব ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি ইনি মাঝে-মধ্যে আসেন আমাদের বাড়িতে। আমার জন্মের আগে বাবারা যখন ঢাকায় ছিলেন, তখন তারিণীখুড়ো ছিলেন আমাদের পড়শি। তাই খুড়ো। বাবারও খুড়ো, আমাদেরও খুড়ো। খুড়ো ছাড়া আর ওঁকে কেউ কিছু বলে বলে জানি না। বাবার কাছেই শুনেছি যে, ভদ্রলোক নাকি চাকরির ধান্দায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন, আর অভিজ্ঞতাও হয়েছে বিচিত্ররকম। কাজেই গল্পের স্টক অঢেল। খুড়ো বলেন যে শুধু আর্টের খাতিরে যেটুকু কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় সেটুকু ছাড়া নাকি সবই সত্যি।

গল্পের প্রথম লাইন বলে থেমে গেছেন খুড়ো, কারণ তাঁর ফরমাশ-মতো দুধ-চিনি ছাড়া চা এসে গেছে। এ-জিনিসটি একটু বেশি রসিয়ে-রসিয়ে খাচ্ছেন দেখে ন্যাপলা অধৈর্য হয়ে বলল, 'ডুমনিগড়ে হলটা কী?'

'বলছি, বলছি,' বললেন তারিণীখুড়ো। 'এই র'টি খাওয়ার অভ্যাস আমার ডুমনিগড় থেকেই। রাজা ভূদেব সিং-এর হয়েছিল ডায়াবিটিস। এককালে সাত রঙের সাত রকম মিঠাই বরাদ্দ ছিল রোজ দুবেলা। তা ছাড়া নিয়মিত মদ্যপান করতেন। আমার ডাক পড়ত সন্ধ্যাবেলা যেদিনই খুলতেন শঁপাঞ-এর বোতল।'

'শঁপাঞ?'—নামটা আমাদের সকলের কাছেই নতুন।

'অশিক্ষিতরা যেটাকে বলে শ্যামপেন', বললেন খুড়ো। 'যাই হোক, রাজা একদিনে সব পরিত্যাগ করেন। আমার চোখের সামনে ষোলো স্টোন থেকে সাড়ে ন' স্টোনে নেমে গেল ওজন। আর সেই সময়ই খুনটা হয়।'

'খুন?'

আমাদের পাঁচজন শ্রোতার পাঁচ রকম গলায় একসঙ্গে উচ্চারিত হল প্রশ্নটা।

'হ্যাঁ, খুন। রাজার তিন ছেলে—শ্রীপত, ভূপত আর অনুপ। ছোটটা রায়পুরে রাজকুমার কলেজে পড়ে, বড় দুটো পড়াশুনা শেষ করে ডুমনিগড়েই থাকে। বড় শ্রীপতই হল খুন। শ্রীপতের ইয়ার ছিল নারায়ণ শ্রীমল। ধনী ব্যবসাদার ডুমনিগড়ের রাইস-কিং পুরুষোত্তম শ্রীমলের একমাত্র ছেলে। জুয়ার আড্ডা বসত নারায়ণের বাড়িতে। এক সন্ধ্যায় তুমুল বচসা হয় শ্রীপত আর নারায়ণে। প্রায় হাতাহাতি। শ্রীপত জিতছিল প্রায় বিশ হাজার টাকা। সেই সময় নারায়ণের হাতে

তার জোচ্চুরি ধরা পড়ে যায়। নারায়ণ শাসায় তাকে খতম করবে বলে।

'যাই হোক, খেলা শেষ করে বাড়ি ফিরছিল শ্রীপত। তখন রাত এগারোটা। হেঁটেই ফিরত। রাজবাড়ি থেকে শ্রীমলদের বাড়ি হাফ-এ-মাইল। পথে পড়ে রাম সরোবর। ভারী সুদৃশ্য লেক, ঠিক মধ্যিখানে একটি শ্বেতপাথরের মিনি-প্রাসাদ, নৌকো করে যাওয়া যায় সেখানে। সেই লেকের ধারে কে জানি রিভলভার দিয়ে গুলি করে শ্রীপতকে। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মেরেছে, এক গুলিতেই সাবাড়। পুলিশ নারায়ণকে সন্দেহ করে। সে যে শ্রীপতকে মারবে বলে শাসিয়েছে, সে-কথা জেরাতে আড্ডার সকলেই স্বীকার করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে নারায়ণ বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। আমি অবশ্য খুনের সময় কাছেই ছিলাম।'

'বলেন কী!' আবার পাঁচটা গলা একসঙ্গে।

'জোনাকি স্টাডি করছিলাম', বললেন তারিণীখুড়ো। 'সামনে দেওয়ালি—রাজাকে কথা দিয়েছিলাম পিদ্দিমের বদলে একটা নতুন ধরনের বাতির বন্দোবস্ত করব। ইলেকট্রিক নয়। কাচের টিউবের অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম। রাজবাড়ির যত ব্যালকনি আর যত বারান্দা সব কটার আলসে আর রেলিঙের উপর টিউব বসানো থাকবে, আর তার মধ্যে ছাড়া থাকবে জোনাকি। অবিশ্যি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ফুটো থাকবে টিউবে। নির্ঘাত চমকপ্রদ ব্যাপার হত, তবে বড়কুমারের মৃত্যুর জন্য সেবার আর কোনও ঘটা হয়নি দেওয়ালিতে।'

'আপনি খুনিকে দেখেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা।

'না, দেখিনি। গুলি করেই সে পালায়। তবে খুনের খবরটা আমিই দিই। আমি যদি অন্যমনস্ক না থাকতাম তা হলে হয়তো খুনিকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু সেটা হবার ছিল না। ফলে একটা জলজ্যান্ত অপরাধী চিরকালের মতো রেহাই পেয়ে গেল।'

তারিণীখুড়ো বিড়ি ধরাতে থেমেছেন, আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, গল্প শেষ কি না তাও বুঝতে পারছি না, এমন সময় খুড়ো আবার শুরু করলেন।

'এদিকে বড় ছেলের মৃত্যুতে রাজা আঘাত পেয়েছেন খুবই, আর তাতে অসুখও বেড়ে গেছে। এমন সময় একটা অন্য গণ্ডগোল দেখা দিল।

'খুনের মাসখানেক আগে দুই আমেরিকান এসেছিল রাজার অতিথি হয়ে। আসল উদ্দেশ্য শিকার। ডুমনিগড়ের পুবদিকে পাহাড়ের শ্রেণী; আর তার পাদদেশে গভীর জঙ্গল। যাকে বলে হান্টারস প্যারাডাইজ। বহু বিদেশি শিকারি ডুমনিগড়ে এসে শিকার করে গেছে, রাজা তাদের জন্য ঢালাও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। বীটাররা বন পিটিয়ে কাঁসি ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বাঘ এনে ফেলে দিয়েছে শিকারিদের সামনে, আর তারা হাতির পিঠ থেকে শার্দূলসংহার করে খুশি মনে দেশে ফিরে গেছে।

'এইবার ওই দুই আমেরিকানের একটি, নাম স্যাঙ্গার, চল্লিশ হাত দূর থেকে পর-পর দুটি গুলি মেরেও বাঘকে জখমের বেশি কিছু করতে পারল না। একটা গুলি লাগল ল্যাজে, একটা পিছনের পায়ের গোড়ালিতে। সেই বাঘ এখন হয়ে গেছে নরখাদক। এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, তোরা জানিস বোধহয়। পুলাম্বি, হাড়ভা আর থুয়ারা—পাহাড়ের নীচে এই তিনটি গ্রাম থেকে সতেরোজন মেয়ে-পুরুষকে ধরে নিয়ে গেছে সেই বাঘ। গাঁয়ের লোকে রাজার কাছে এসে হত্যা দিয়েছে, ওই বাঘের শেষ না দেখা পর্যন্ত তাদের সোয়াস্তি নেই। বাঘের ভয়ে তারা বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না, সেই সুযোগে তাদের খেতের ফসল খেয়ে নিচ্ছে হরিণ আর শুয়োরের দল।

'রাজা ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন "ট্যারি"—রাজা আমাকে ট্যারি বলেই ডাকতেন—"ট্যারি, এখন তুমিই ভরসা। এই ম্যানইটারের একটা বিহিত না করলেই নয়। তোমার কী লোকজন লাগবে বলো, আমি দিয়ে দিচ্ছি। তুমি দু-একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ো।"

'এখানে বলা দরকার যে, মেজোকুমার ভূপত সিং-ও শিকারে সিদ্ধহস্ত। তেইশ বছর বয়স, কিন্তু এর মধ্যেই বড় বাঘ ছোট বাঘ মিলে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিয়াত্তর। তবে এটা জানি যে, রাজা মেজোকুমারের খুব একটা ভক্ত নন, কারণ সে অতি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছেলে। তা ছাড়া মদ জিনিসটাকে একটু বেশিরকম পছন্দ করে। আমি মেজোকুমারের হয়ে একবার সুপারিশ করেও

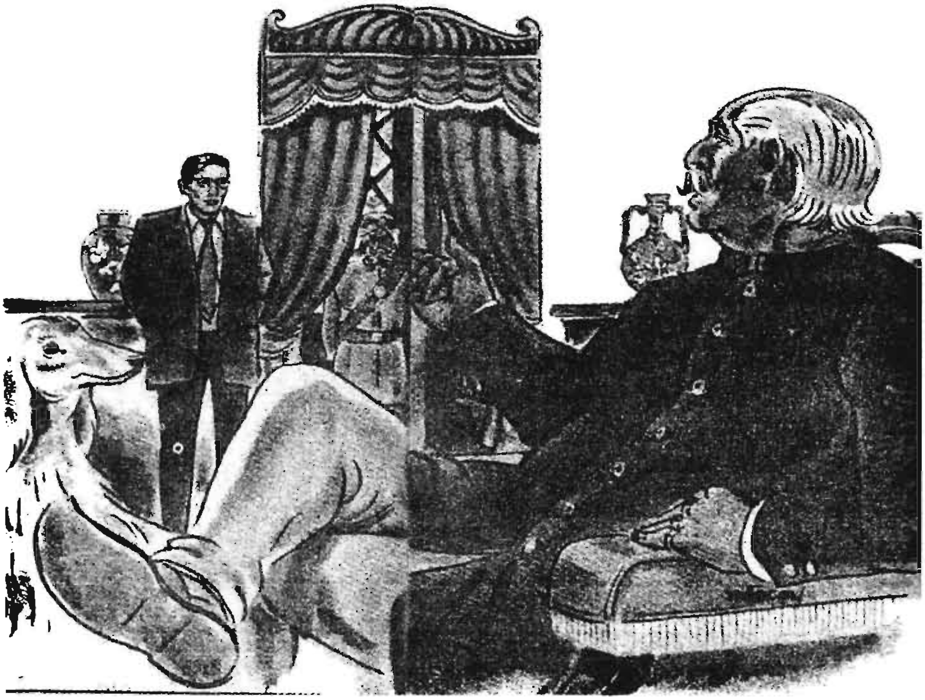

কোনও ফল হল না।

'কাজেই আমাকেই রাজি হতে হল। আমার তখন জোয়ান বয়স, সবে ত্রিশ পেরিয়েছে। চোখে মাইনাস পাওয়ারের পুরু চশমা সত্ত্বেও অব্যর্থ টিপ। কর্নেল হোয়াইটহেড নিজে হাতে ধরে বন্দুক চালানো শিখিয়েছেন আজমীরে থাকতে।

'যেখানে উৎপাতটা হচ্ছে, সেখানে পৌঁছতে হলে একটা ছোট নদী পেরোতে হয়। সে নদীর নাম লুঙ্গি কেন জিজ্ঞেস করিসনি ন্যাপলা, কারণ উত্তর আমি জানি না। এই লুঙ্গিরই পাশে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় মাস চারেক হল এক বাবাজি এসে আস্তানা গেড়েছেন, এ-খবর আমরা পেয়েছি। রাজার আবার হোলি ম্যানে খুব বিশ্বাস; বলে দিলেন যাবার সময় আমি যেন একবার দেখা করে যাই। রাজা শুনেছেন বাবাজির কাছে নাকি অনেকরকম ওষুধ আছে; যদি ডায়াবিটিসের কোনও ওষুধ বলতে পারেন আমি যেন সেটা জেনে নিই।

'জানুয়ারি মাস, প্রচণ্ড শীত পড়েছে সেবার, তারই মধ্যে দুটি বেয়ারা সমেত বেরোবার সব তোড়জোড় করে ফেললাম। রাজার কাছে বিদায় নিতে গিয়ে দেখি মেজোকুমার বসে রয়েছেন তাঁর ঘরে। বুঝলাম একটা কথা-কাটাকাটির মাঝখানে গিয়ে পড়েছি। রাজা তখনও হাঁপাচ্ছেন, এবং আমার সামনেই মেজোকুমারকে কড়া কথা শুনিয়ে তাঁকে ঘর থেকে বিদায় করে দিলেন। বেরোবার মুখে কুমার আমার প্রতি যে দৃষ্টি হানলেন, সেটা মোটেই প্রসন্ন নয়। বুঝলাম তাঁকে বাদ দিয়ে আমাকে বাঘ মারতে পাঠানো হচ্ছে সেটা আদৌ ওঁর মনঃপূত নয়। তবে সিদ্ধান্তটা তো আমার নয়, সেটার জন্য দায়ী স্বয়ং রাজা ভূদেব সিং। কাজেই আমার উপর চোখ রাঙানোর কারণটা বোধগম্য হল না।

'লুঙ্গি নদী ডুমনিগড় থেকে ৩২ মাইল, অর্থাৎ আজকের হিসেবে পঞ্চাশ কিলোমিটার। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে, তবে ডুমনিগড়ে জিপ আসেনি। রাজার একটা পুরনো ফোর্ড ছিল, সেটা খুব মজবুত। তাতে করেই পৌঁছে গেলাম এক ঘণ্টার ভেতর। শিকারের জন্য যাবতীয় যা কিছু দরকার,

সবই সঙ্গে এসেছে। নদী পেরিয়ে আরও যেতে হবে সতেরো মাইল, তার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়ি থাকবে ওপারে। রেঞ্জার নিজেও থাকবেন, আমরা গিয়ে উঠব ফরেস্ট রেস্ট হাউসে।

'অবিশ্যি ওপারে যাবার আগে একটা কর্তব্য সারতে হল। উদাস বাবার আশ্রমে একবার ঢুঁ দিতে হল। গেরুয়াধারী বাবাজি শিষ্য-শিষ্যা-পরিবেষ্টিত হয়ে পর্ণকুটিরের সামনে বাঘছালের উপর বসেছেন, সামনে ধুনি জ্বলছে। চেহারাটি বেশ ভক্তি-উদ্রেককারী, দাড়ি-গোঁফ-জটা সত্ত্বেও অনেক সাধুর চেয়ে বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, জংলিভাব একেবারেই নেই।

'সাধু আমাকে দেখেই স্মিতহাস্য করে "আইয়ে" বলে তাঁর সামনে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। আমি গিয়ে বসলাম। সাধু চেয়ে রইলেন আমার দিকে। ঠোঁটের কোণে সেই স্মিত হাসির রেশ। মনে মনে ভাবছি এত দেখার কী আছে, এমন সময় বাবাজি হঠাৎ বলে উঠলেন, "বাঙালি ?" এবং যেভাবে যে-উচ্চারণে বললেন তাতে বুঝলাম ইনি নিজেও বাঙালি। এতে অবাক হলাম বই কী, কারণ যেদিন থেকে বাবাজি আস্তানা গেড়েছেন সেদিন থেকে শুনছি এনার কথা, কিন্তু কেউ বলেনি ইনি বঙ্গসন্তান।

"কী চাস তুই ?"

'এখানে বলি রাখি, বাবাজিদের এই হোলসেল তুইতোকারির ব্যাপারটা আমি মোটে বরদাস্ত করতে পারি না। তাই এনার প্রশ্ন শুনে ধাঁ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল। বললাম, "রাজার অনুরোধে তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

'বাবা কিন্তু আমার মুখে তুই শুনে মোটেই বিরক্ত বা বিচলিত হলেন না। বরং এবার যে-কথাটা বললেন, তাতে আমি হকচকিয়ে গেলাম তো বটেই, সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা নম্রও হয়ে গেলাম।

"রাজার জন্য ওষুধ আমি দিয়ে দিচ্ছি। বলিস চিন্তা করার কিছু নেই। অসুখ সেরে যাবে, তবে পুত্রশোক থেকে রেহাই নেই। বড়টা গেছে, পরেরটাও যাবে। ছোটটি ভাল ছেলে, সেই বাপের মুখ রাখবে। তবে রাজত্ব নেই কপালে, কারণ রাজা আর থাকবে না দেশে। দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।"

'আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছি না, এমন সময় বাবাজি বললেন, "তোর জন্যেও ওষুধ আছে।"

'আমার ওষুধ ? সে আবার কী ? জিজ্ঞেস করলাম, "কীসের ওষুধ ?"

"তুই বাঘের পেটে যেতে চাস ?"

"সেটা আর কে চায় বলুন।"

"তা হলে আরও কাছে আয়।"

'আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম সাধুবাবার দিকে। বাবাজি তাঁর ঝোলা থেকে একটা কৌটো বার করে তার থেকে খানিকটা সবুজ মলম নিয়ে আমার কপালে ঘষে দিলেন। হিঙ আর কস্তুরী মেশানো একটা গন্ধ এল নাকে। —"ব্যস্, আর ভয় নেই তোর।"

'রাজার জন্য ওষুধ নিয়ে বিদায় নিলাম। মনে-মনে বললাম, বাবাজির ক্ষমতা অসীম, কারণ আমার কাছ থেকে "তুই" থেকে "আপনি" সম্বোধন আদায় করে নিতে লেগেছে ঠিক দু মিনিট।

'রেস্ট হাউসে পৌঁছে গেলাম আধ ঘণ্টার মধ্যেই। গিয়ে দেখি সব ব্যবস্থা হয়ে আছে। আমি আসছি সে-খবর আগেই পৌঁছে গেছে, তিন গাঁয়ের তিন মোড়ল এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললাম আমার যতদূর সাধ্যি আমি করব।

'শীতকালের দিন ছোট, তাই সাড়ে চারটের মধ্যে বনমোরগের রোস্ট খেয়ে বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। স্থানীয় শিকারি শুকদেও তেওয়ারি আমাকে সাহায্য করছে ; সে মাচা বাঁধার জন্য গাছ বেছে রেখেছে সমতল জমি যেখানে শেষ হয়ে পাহাড় শুরু হয়েছে সেইরকম একটা জায়গায়। কাছাকাছির মধ্যে বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ পাওয়া গেছে। একটি মোষও কেনা হয়েছে টোপ হিসেবে, সব মিলিয়ে ব্যবস্থা ভালই। আমি একাই থাকব পাহারায়, সকালে শিকারি ও কুলির দল এসে আমায় মিট করবে। তার মধ্যে যদি কাজ সারা হয়ে যায় তো ভালই, নইলে কাল সন্ধে থেকে আবার বসতে হবে। এ-ভাবে কতদিন চলবে জানা নেই।

'রেস্ট হাউস ছাড়বার মুখে আরেকটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। এ-আওয়াজ আমার চেনা। এ

হল মেজোকুমারের পন্টিয়াক টুরার। ব্যাপার কী ?

'মেজোকুমার গাড়ি থেকে নেমেই কারণটা জানিয়ে দিলেন। বললেন বাবাকে বলে রাজি করিয়েছেন, তিনিও আমার সঙ্গে নরখাদকের সন্ধানে যাবেন। এমন একটা গুরু দায়িত্ব শুধু একজনের উপর দেওয়ার কোনও মানে হয় না।—"দাদার মৃত্যুতে বাবার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।"

'কথাটা শুনে আমার মোটেই ভাল লাগল না। রাজা সত্যিই অনুমতি দিয়েছেন কি না জানার কোনও উপায় নেই। আমার ধারণা তিনি বারণই করেছেন, কিন্তু ঈর্ষাবিশত ইনি নিজেই চলে এসেছেন।

'কী আর করি। মনিবের সন্তান, তার সঙ্গে তো আর ঝগড়া চলে না। তখনই তেওয়ারিকে বলে একটা দ্বিতীয় মাচার বন্দোবস্ত করা হল। তবু ভাল যে, মেজোকুমার তাঁর নিজের জন্য শিকারের সব সরঞ্জাম সঙ্গেই এনেছিলেন।

'দুজনে গিয়ে উঠলাম মাচাতে। আমারটা শিমুল গাছ, ওনারটা বাদাম। আমাদের রেখে দল ফিরে গেল। আমরা রাত্রি জাগরণের জন্য তৈরি হলাম। নীচে থেকে যাতে বাঘ বুঝতে না পারে তার জন্য দুটো মাচার নীচেই লতাপাতা দিয়ে ক্যামুফ্লাজ করা হয়েছে। ব্যবস্থা পাকাপোক্ত।

'কুমার দেখি মাচায় উঠে ব্র্যান্ডির বোতল খুলেছেন। আমি ইশারায় তাঁকে বারণ করার চেষ্টা করলাম, তিনি আমার দিকে চেয়েও চাইলেন না।

'অন্ধকারটা যেন একটু আগে হল মনে করে আকাশের দিকে চেয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখি, কালো মেঘে দিগন্ত ছেয়ে গেছে।

'ছ'টা নাগাত বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। বাঘ বৃষ্টির তোয়াক্কা করে না, শিকারিরও করা উচিত নয়, কিন্তু শীতকালের বৃষ্টি বলেই বোধহয় অনুভব করলাম ওভারকোট ভেদ করে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল আমায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। এমনিতে আমার অসুখ-বিসুখ হয় না বললেই চলে, কিন্তু সর্দি জিনিসটাকে আমি বড় ভয় পাই। এটা চিরকালের ব্যাপার। যখন একটা হাঁচি হল, তখন প্রমাদ গুনলাম। মাচায় বসা শিকারির পক্ষে হাঁসি-কাশি যে কী সর্বনেশে ব্যাপার, তা বোধহয় তোদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। তা ছাড়া হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় এক

জ্যোতিষী বলেছিল আমার অপঘাতে মৃত্যু হতে পারে। একে বাজ পড়ছে, তায় গাছের উপর বসা। পরিস্থিতিটা মোটেই ভাল লাগল না।

'এবার কুমারকে ইশারা করে জানালাম আমি মাচা থেকে নেমে পড়ছি। আজ আর ম্যানইটারের সঙ্গে মোকাবিলা হবে না, কারণ এই হাঁচি শুনে তিনি আর এ-তল্লাটে আসবেন না।

'নীচে মোষটা জলে ছটফট করছে, আর গলায় বাঁধা ঘণ্টা অনবরত টিংটিং করছে। মাচা থেকে নামতে-নামতে মনে হল মেজোকুমারের ভাগ্য ভাল ; নরখাদক সংহারের ক্রেডিটটা হয়তো তিনি একাই পাবেন। আমার এখন আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই ; এই বৃষ্টিতে আর ভিজলে নিউমোনিয়া অবধারিত।

'জঙ্গলের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝলকানি মাঝে-মাঝে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। আমি টর্চের সাহায্য না নিয়েই এগিয়ে চললাম যেদিকে পাহাড় সেই দিকে। হাতে বন্দুকটা নিয়েছি, কারণ সেটার যে প্রয়োজন হবে না, এমন কোনও গ্যারান্টি নেই।

'পাহাড়ের গায়েও গাছপালা ঝোপঝাড়ের অভাব নেই, তারই মধ্যে দিয়ে হ্যাঁচড়-প্যাঁচড় করে উঠে গিয়ে হঠাৎ সামনে একটা ঘোর অন্ধকার কী যেন এসে পড়ল। বিদ্যুতের আলোতেও যখন সে-অন্ধকার দূর হল না, তখন বুঝলাম সেটা একটা গুহার মুখ। গিয়ে ঢুকলাম ভিতরে। মাথার উপর বারিবর্ষণ দূর হল। বাঁচা গেল। শেলটার পেয়ে গেছি। পকেট থেকে টর্চ বার করে সামনে ফেলে বুঝলাম, গুহার অপর দিকের দেয়াল টর্চের আলোর নাগালের বাইরে। কমপক্ষে পাঁচশো লোক এ-গুহায় আশ্রয় নিতে পারে।

'আলোতেই দেখলাম সামনেই একটা মাঝারি আকারের পাথরের চাঁই। সেটাতে পিঠ দিয়ে বসলাম গুহার মেঝেতে। বাইরে সমানে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বিদ্যুতের আলোতে বুঝতে পারছি পাহাড়ের গা দিয়ে জলের ধারা নেমে এসে গুহার মুখের সামনে একটা ছোটখাটো জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। পকেটে সিগারেট দেশলাই ছিল। সেটা এই অবস্থায় ব্যবহারযোগ্য হবে কি না ভাবছি, এমন সময় তড়িৎ-ঝলকানিতে একটা ব্যাপার দেখে চমকে উঠলাম।

'একটি লোক এসে গুহার ভিতর ঢুকল।

'লোকটির সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটা থেকে বুঝতে পারলাম ইনি মেজোকুমার। তাঁর সাত বছর বয়সে পায়ের পাতার উপর দিয়ে চলে যায় বাপের রোলস রয়েস গাড়ি। সাহেব ডাক্তার মেজর স্টেবিংস-এর অস্ত্রোপচারের ফলে পা সেরে যায় ঠিকই, কিন্তু ডান পায়ের তুলনায় আধ ইঞ্চি ছোট হয়ে যায়। তার ফলেই এই খোঁড়ানো।

'মেজোকুমারের অন্ধকার দেহ আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার পাশেই বসল। একটা বোটকা গন্ধ কিছুক্ষণ থেকে পাচ্ছিলাম, তার সঙ্গে এবার হেনেসি ব্র্যান্ডির গন্ধ যোগ হল। তারপর অনুভব করলাম গরম নিশ্বাস পড়ছে আমার মুখের উপর। তারপর মেজোকুমারের কণ্ঠস্বর প্রবেশ করল আমার কানে।

"শত্রুর শেষ রাখতে নেই জানো ?"

'বলে কী লোকটা ? আমি ওর শত্রু হতে যাব কেন ?

"'তোমাকে যখন আমি দেখে চিনেছি সেই রাতে, তখন তোমারও আমাকে দেখা এবং চিনে ফেলাটা আশ্চর্য নয়।"

"'কোন্ রাতে ?"

"'সেটা কি বলে দিতে হবে ? ইমলিগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি। দাদা ফিরছিল শ্রীমলের বাড়ি থেকে।"

'আমার গরম লাগতে শুরু করেছে। ওভারকোটটা খুলে ফেলতে পারলে ভাল হয়। এই মেজোকুমারই তা হলে হত্যাকারী, নারায়ণ শ্রীমল নয়। দাদাকে হটিয়ে নিজে গদিতে বসার লোভ। যেমন আরও অনেক রাজপরিবারেই হয়ে থাকে। কিন্তু আমায় সে চিনল কী করে সে-রাতে ?

'উত্তর এল মেজোকুমারের মুখ থেকেই।

"'ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছিল তখন। তোমার চশমার কাচ চকচক করছিল সেই আলোয়। এত

পুরু কাচ ও তল্লাটে আর কারুর নেই।"

'আমি চুপ করে আছি। আমার চোখের পাওয়ার মাইনাস নয়। এই চশমাই আমাকে বিট্রে করল।

'একটা খুট্ করে শব্দ পেলাম। মেজোকুমারের টোটা-ভরা রাইফেল উঁচিয়ে উঠেছে। ওর ও আমার মধ্যে ব্যবধান দুহাতের। ওই বাঘ-মারা বারো বোরের আগ্নেয়াস্ত্র এই দূরত্ব থেকে আমার উপর প্রয়োগ করলে আমার দেহ শত টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে গুহার চারিদিকে।

'কিন্তু ওটা কী ?

'এক জোড়া জ্বলন্ত মার্বেল এগিয়ে আসছে আমার দিকে মেজোকুমারের পিছন থেকে। আর তার সঙ্গে সেই বোটকা গন্ধ।

'"সে ইয়োর প্রেয়ারস, মিস্টার ব্যানার্জি !"

'বিদ্যুতের আলোতে বন্দুকের ইস্পাতের নল ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'আর পরমুহূর্তেই একটা ভারী ধাতব শব্দে বুঝতে পারলাম বন্দুক গুহার মেঝেতে আছড়ে পড়েছে।

'একটা গোঙানির শব্দ ক্রমে দূরে সরে গেল। আর সেই সঙ্গে জ্বলন্ত মার্বেল দুটোও।

'আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

'ক্রমে বজ্রবিদ্যুতের তেজ কমে এল, বৃষ্টির শব্দ থেমে এল।

'বোধহয় নার্ভাস স্ট্রেনের দরুন, কিংবা হয়তো জ্বর ছিল শরীরে, এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ি। যখন ঘুম ভাঙল তখন ভোর হয়ে গেছে। গুহাটা যে কত বড় সেটা এখন বুঝতে পারলাম। আমি যেদিকে বসা, তার বিপরীত দিকে দেয়ালের সামনে পড়ে আছে মেজোকুমারের আধখাওয়া মৃতদেহ। কিন্তু নরখাদকের কোনও চিহ্ন নেই।

'গুহার বাইরে একটা পাথর-খণ্ডের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম হাতে বন্দুক নিয়ে। একটু খুঁতখুঁত ভাব ছিল মনে, কারণ এটা জানি যে, বাঘ সুযোগ পেয়েও আমাকে খায়নি—সেটা বাবাজির

মলমের জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক। শুধু তাই নয়, আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সে রক্ষা করেছে। তবে গ্রামের লোকেরা যে লাঞ্ছিত, সে-কথা তো মিথ্যে নয় ; তাই মন থেকে মমতা দূর করে দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলাম।

'আটটা পর্যন্ত বসে থেকেও যখন বাঘের দেখা পেলাম না, তখন অগত্যা ফিরতি পথ ধরলাম। মাচার কী অবস্থা দেখতে হবে গিয়ে। সেখানে চায়ের ফ্লাস্ক, জলের বোতল, বালিশ কম্বল ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়েছে।

'জায়গাটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। কিন্তু যা দেখলাম তাতে চক্ষু ছানাবড়া।

'মাচা সমেত শিমুল গাছ বজ্রপাতে ঝলসে গেছে, আর তার পাশেই পড়ে আছে মৃত মোষ, আর তার কাঁধে দাঁত-বসানো মৃত নরখাদক। সে এক বিচিত্র ছবি। মানুষের হাতের বন্দুকের চেয়ে হাজার গুণে বেশি শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রের শিকার হয়েছে এরা, সেটা আর বলে দিতে হয় না।

'ফেরার পথে বাবাজিকে ধন্যবাদ দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। তাঁর পর্ণকুটির ভাসিয়ে নিয়ে গেছে লুঙ্গি নদী গতরাত্রের বৃষ্টিতে। তিনি নিজে নাকি একটি সেগুন গাছে চড়ে রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু আপাতত সর্দিজ্বরে কাবু হয়ে এক শিষ্যের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।'

আনন্দমেলা, পৌষ ১৩৮৮ (১৩ জানুয়ারি ১৯৮২)

ধাপ্পা

'চার্লস ওয়েকম্যানের 'হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক' আপনার ক' ভল্যুম ছিল?'

সমরেশ ব্রহ্ম ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক সার্কেলের চিঠির উত্তরে সইটা করে মুখ তুলে চাইল মহিমের দিকে। তার বন্ধু অধ্যাপক রণেন সেনগুপ্তর ছেলে মহিম। সবে লাইব্রেরিয়ানশিপ পাশ করেছে। সে নিজেই আগ্রহ করে তার সমরেশকাকার আড়াই হাজার অগোছালো বইগুলোকে বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে গুছিয়ে শেল্‌ফে রেখে তাদের একটা তালিকা করে দেবার ভার নিয়েছে।

'কেন, দু' ভল্যুম!' বলল সমরেশ।

'মাত্র একটাই পাচ্ছি। সেকেন্ডটা?'

'সে কী! ভাল করে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! সেটটা কানা হয়ে গেল? ও বই যে আর পয়সা দিলেও পাওয়া যায় না।'

সমরেশ ব্রহ্মের বইয়ের নেশা সেই কলেজ থেকেই। পঁচিশ বছর আগের কথা। ইতিহাসের ছাত্র ছিল সে, তবে তার বাইরেও অনেক বিষয়ের বইয়ের প্রতি তার আকর্ষণ। যেমন ভ্রমণ কাহিনী, শিকার কাহিনী, প্রত্নতত্ত্ব, অ্যানাটমি। আর ম্যাজিক। ম্যাজিক ছিল প্রথমে সমরেশের হবি। তারপর ক্রমে সেটা নেশায় দাঁড়ায়। বাপ ছিলেন কলকাতার নামকরা ব্যারিস্টর আদিনাথ ব্রহ্ম। ছেলেও বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টরি পাশ করে আসে, এমন একটা ইচ্ছে বাপের ছিল, এবং সে ইচ্ছে অনুযায়ী সমরেশ গিয়েওছিল বিলেত। কিন্তু কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তিন মাস পড়ার পর জাদুকর মার্কা সিলভারস্টোনের সঙ্গে আলাপ হয়ে পড়াশুনা শিকেয় উঠল। সমরেশ তার বাপকে জানাল সে ব্যারিস্টরি পড়বে না; তার শখ চেপেছে ম্যাজিসিয়ান হবার। অনুরোধটা যাতে আরও জোরদার হয় সেই উদ্দেশ্যে নিজের চিঠির সঙ্গে সিলভারস্টোনেরও একটা চিঠি সে পুরে দিল খামের মধ্যে। সিলভারস্টোন লিখেছে আদিনাথ

ব্রহ্মকে—'তোমার ছেলের বন্ধু হিসেবেই তোমাকে লিখছি—সমরেশ ইজ ওয়ান্ডারফুলি ক্লেভার উইথ হিজ হ্যান্ডস। ঐন্দ্রজালিক হিসেবে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে বলে আমি মনে করি।'

এক্ষেত্রে যে কোনও সাধারণ বাপই হয় মর্মাহত হতেন, না হয় মারমুখো হতেন। কিন্তু আদিনাথ ছিলেন সাধারণের বাইরে। তিনি ছেলেকে লিখলেন, 'তোর স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তোর মধ্যে যদি কোনও বিশেষ ক্ষমতা থেকে থাকে, তা হলে সেটার স্ফুরণ হোক সেটাই আমার কাম্য। লন্ডনে যদি ম্যাজিক শেখার সুযোগ থাকে তা হলে তার জন্য কী খরচ পড়বে সেটা আমাকে জানাতে দ্বিধা করিস না। আমি টাকা পাঠিয়ে দেব।'

সমরেশ কিন্তু আর লন্ডনে থাকেনি। সে দু'মাসের মধ্যে দেশে ফিরে আসে এবং বাড়িতেই ম্যাজিক অভ্যাস শুরু করে। তখন তার বয়স বাইশ। পঁচিশ বছর বয়সে সে প্রথম মঞ্চে ম্যাজিক দেখায়। সেটা অবিশ্যি একক প্রদর্শনী; শুধু হাত সাফাইয়ের খেলা। তা সত্ত্বেও তরুণ জাদুকরের আশ্চর্য দক্ষতার প্রচুর তারিফ করে দৈনিক কাগজের সমালোচকেরা।

বত্রিশ বছর বয়সে সাতজন সহকর্মী ও স্টেজ ইল্যুশনের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন ব্রামা দ্য গ্রেট। শো-এর শেষে দর্শকের তুমুল করধ্বনিতে হলে প্রথম সারিতে বসা আদিনাথ ব্রহ্মের বুক গর্বে দশ হাত হয়।

উনিশশো চুয়াত্তরে আদিনাথের মৃত্যু হয়। বাপের একমাত্র সন্তান হিসেবে সমরেশ তাঁর সম্পত্তির মালিকানা পায়। কিন্তু ততদিনে তার নিজের রোজগারও কিছু কম নয়। ভারতের বিভিন্ন শহরে থেকে ডাক তো আসেই, সেইসঙ্গে বিদেশ থেকে আহ্বান আসা শুরু হয়েছে। আইটেমগুলোর উৎকর্ষ ছাড়াও, সমরেশের শো-এর দুটো বিশেষত্ব দেশ-বিদেশের দর্শককে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। জাদুকরের বুকনিটা তার ম্যাজিকের একটা অঙ্গ বলেই এতদিন লোকে মেনে নিয়েছে। সমরেশই প্রথম দেখাল যে কথা না বলেও জাদু হয়। আড়াই ঘণ্টা শো-এর মধ্যে একটিবারের জন্যও মুখ খোলে না সে। তার বদলে কানে শোনার জন্য যেটা থাকে সেটা হল সমরেশের দ্বিতীয় বিশেষত্ব। সেতার সরোদ বাঁশি ও তবলার একটি চমৎকার অর্কেস্ট্রার খাঁটি রাগসংগীত সমরেশ ব্যবহার করে তার জাদুর সঙ্গে। সব দেশেরই দর্শকের কাছে এটা একেবারে নতুন জিনিস। বিশেষ করে জাদুর সঙ্গে বিশেষ বিশেষ রাগ যেভাবে খাপ খেয়ে যায় সেটা দর্শকের চিত্ত জয় না করে পারে না।

আজ একচল্লিশ বছর বয়সে সমরেশের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তার ম্যাজিকের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে তার জনপ্রিয়তাও বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। কলকাতায় তার ম্যাজিকের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাতদিনের সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। শো-এর শেষে আনন্দে ও বিস্ময়ে বিভোর অবস্থায় ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষের দল বেরিয়ে আসে হল থেকে। সমরেশও জানে যে, একসঙ্গে হাজার দু' হাজার লোককে সুকৌশলে ধাপ্পা দেওয়ার আর্ট আজ তার হাতের মুঠোয়। আমেরিকানরা তার তুলনা করে থার্স্টন ও হুডিনির সঙ্গে, ব্রিটিশরা করে ম্যাসকেলাইন ও ডেভিড ডেভান্টের সঙ্গে, ফরাসিরা রোবেয়র-উদ্যাঁ আর হংকং-এর চিনেরা চিং-লিং ফু-এর সঙ্গে।

তবে সমরেশের আকাঙ্ক্ষার শেষ এখানেই নয়; তার দৃষ্টি এখনও সামনের দিকে। আরও নতুন-নতুন জাদুর উদ্ভব করবে সে, দর্শকদের আরও চমক দেবে, মুগ্ধ করবে, বিস্মিত করবে।

আর তাই তার বই কেনা আর বই পড়াও শেষ হয়নি। ম্যাজিকের বই তো বটেই, সেই সঙ্গে আছে উইচক্রাট, ভুডুইজম ইত্যাদি আদিম ম্যাজিক, আর হিপনটিজম, ক্লেয়ারভয়েন্স, ভেনট্রিলোকুইজম ইত্যাদি সংক্রান্ত বই। শুধু এইসব বইয়েতেই তার তিনখানা বড় বুককেস ভরে গেছে। বাইরে থেকে অর্ডার আছে আরও খান-পনেরো সদ্য প্রকাশিত বইয়ের। অনেকটা সময় বাইরে থাকতে হয় বলে বইগুলো অগোছালো ভাবে ছড়িয়ে ছিল, তাই বন্ধুপুত্রের প্রস্তাবে সমরেশ আপত্তি করেনি। মহিমের কাজ শেষ হতে লাগবে আরও দিন চারেক।

এককালে বন্ধুবান্ধবদের বই ধার দিয়েছে সমরেশ, যদিও খুশিমনে দেয়নি কখনও। কেউ কিছু চাইলে না বলাটা ছিল সমরেশের ধাতের বাইরে। এটা যে চরিত্রের একটা দুর্বলতা সেটা সে নিজেও বুঝত, কিন্তু বুঝেও কারুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি কখনও। ধার দেওয়া বইয়ের হিসেব রাখার জন্য একটি খাতা করেছিল সমরেশ; যে বই নিচ্ছে সে নিজেই তার নাম বইয়ের নাম এবং ধার

নেবার তারিখ সে খাতায় লিখে রাখত। বই ফেরত এলে সমরেশ এই নাম-তারিখের উপর দিয়ে কলম চালিয়ে পাশে একটা সই করে রাখত।

কাজে সফলতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চরিত্র আরও দৃঢ় হয়, আত্মপ্রত্যয় বাড়ে। সেই কারণেই বোধ হয় বছর দশেক হল সমরেশ বই ধার দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে—'মাফ করো ভাই, ওই একটি অনুরোধ রাখতে পারব না'—এই কথাটা বলা হঠাৎ তার পক্ষে সহজ হয়ে গিয়েছিল। আজকাল ব্যাপারটা সকলেই জানে, তাই আর অনুরোধটা কেউ করেও না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই একটা বই বেপাত্তা হয় কী করে?

ওই খাতাটা একবার দেখলে হত না কি? কিন্তু ম্যাজিকের বই নেবার মতো লোক—?

ঠিক তো! তেমন লোকও ছিল। সমরেশের মনে পড়েছে। মহিম পাশেই দাঁড়িয়ে; সমরেশ তার দিকে ফিরল।

'শোনো মহিম, আমার ইতিহাসের বইয়ের শেলফের ডান দিকে একটা ছোট রাইটিং টেবল আছে, দেখেছ তো? তার দেরাজে দেখবে একটা নীল রঙের নোটবুক আছে। এককালে বই ধার দিয়েছি লোককে; যে নিত সে ওই নোটবুকে লিখে রাখত। একবার ওটাতে দেখো তো হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক কেউ ধার নিয়েছিল কিনা?'

মহিম এক মিনিটের মধ্যেই খাতাটা নিয়ে এল, তার মুখে হাসি।

'পাওয়া গেছে', বলল মহিম, 'লাস্ট এনট্রি। নামটা কাটা হয়নি।'
'সুশীল তালুকদার কি?'
'হ্যাঁ।'
'ঠিক ধরেছি। দেখি খাতাটা।'
যাক, অন্তত হদিস পাওয়া গেছে। চার্লস ওয়েকম্যানের হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক ভল্যুম ওয়ান ধার নিয়েছিল সুশীল তালুকদার ১০-১০-৭২ তারিখে। অর্থাৎ আজ থেকে দশ বছর আগে। ফেরত দেয়নি। হস্তাক্ষর সুশীলের তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
কিন্তু সুশীল তো এসেছিল দিন পাঁচেক আগে। বিকেলের দিকে। তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জানিয়ে স্লিপ পাঠিয়েছিল মহিমের হাতেই। অসুস্থতার অজুহাতে সমরেশ দেখা করেনি। সাক্ষাতের কারণ তো জানাই আছে। হয় শো-এর টিকিটের জন্য হাতে-পায়ে ধরা, না হয় কোনও ফাংশনে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি। এককালে প্যান্ডেলে ম্যাজিক দেখিয়েছে বইকী সমরেশ। কিন্তু এখন যে সমরেশ আর সে-সমরেশ নেই সে কথাটা অনেকেই ভুলে যায়। আর টিকিটের জন্য আবদার জিনিসটা তো বাঙালিদের মজ্জাগত। ফুটবলের টিকিট, ক্রিকেটের টিকিট, থিয়েটারের টিকিট, গানবাজনার টিকিট, ম্যাজিকের টিকিট—এর আর শেষ নেই। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনতে হবে ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে। যদি আসল লোকের কাছে চাইলে পাওয়া যায় তা হলে মিথ্যে হ্যাঙ্গাম কেন? যতসব কুঁড়ের দল। অথচ না-দিলে বলবে ব্রামা দ্য গ্রেটের ভারী দেমাক হয়েছে; নইলে পুরনো আলাপীদের এইভাবে নিরাশ করে?
'এ ভদ্রলোক তো এসেছিলেন সেদিন', বলল মহিম।
'হ্যাঁ। নির্ঘাত কোনও ফেভার চাইতে। সঙ্গে করে বইটা নিয়ে এলেই হত, কিন্তু তা করবে না। তখনকার দিনে আড়াইশো টাকা দাম ছিল সেটটার। বহুদিন আউট অফ প্রিন্ট। আজকের দিনে নতুন করে ছাপলে দাম হবে হাজার টাকা।'
সমরেশ কথা থামিয়ে ভুরু কুঞ্চিত করল। তারপর বলল, 'কীরকম দেখলে ভদ্রলোককে? আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। বহুকাল দেখা নেই।'
'রোগা, আধপাকা চুল, ঘন ভুরু, চোখদুটো তীক্ষ্ণ। আমি বললাম আপনি এ সময় দেখা করেন না; তাও জোর করে আমাকে দিয়ে স্লিপ পাঠালেন। বললেন ওঁর নাম শুনলে নাকি আপনি দেখা করতে পারেন।'
'হুঁ...'
সুশীল তালুকদারকে ম্যাজিকের বইটা ধার দেবার স্মৃতি সমরেশের মন থেকে একেবারে মুছে গেছে। কী মূর্খই ছিল সে নিজে দশ বছর আগে। নইলে এমন বই কেউ ধার দেয়? তখনও পর্যন্ত সুশীলের ম্যাজিক সম্বন্ধে বেশ আগ্রহ ছিল সেটা সমরেশের মনে আছে। হাত সাফাইটা বেশ ভালই পারত। তবে ধৈর্য বা অধ্যবসায় কোনওটাই ছিল না।
তা ছাড়া অবিশ্যি সমরেশের মতো ধনী বাপও ছিল না। তাই ম্যাজিকটাকে পেশা হিসেবে নেবার প্রশ্ন সুশীলের ক্ষেত্রে ওঠেনি। সেই লোকের কাছে আজ দশ বছর থেকে পড়ে আছে সমরেশের সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান দুটি বইয়ের একটি।
ভরসা এই যে, জানা যখন গেছে তখন ফেরত পাবার একটা উপায় হবে নিশ্চয়ই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কলামন্দিরে শো ছিল। রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে এসে সমরেশের আবার মনে পড়ল বইয়ের কথাটা। বছর বারো আগে প্রথম কিনে বইদুটো সুশীলকে দেখিয়েছিল সেটাও মনে পড়ল। সুশীলের মন্তব্যটাও মনে পড়ল—'জাদুবিদ্যার ইতিহাসে একদিন তোমারও নাম লেখা হবে সমরেশ!' সুশীলের অবস্থা তেমন সচ্ছল নয় সেটা সমরেশ জানে। সে বিয়ে করেছিল বেশ অল্প বয়সে। দুটি মেয়েও হয়েছিল। একটির অন্নপ্রাশনে সমরেশ নেমন্তন্ন খেয়েছিল। ইতিমধ্যে আরও সন্তান হয়ে থাকতে পারে। এমন মানুষের টাকার টানাটানি আশ্চর্য ঘটনা নয়। সে যদি বইটা বিক্রি করে দিয়ে থাকে? মহামূল্য সেটটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে মনে করে সমরেশের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে

উঠল।

পন্থা একটাই। সে নিজে যখন বইটা ফেরত নিয়ে আসেনি, তখন তাকে চিঠি লিখে সেটার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে।

সমরেশ লিখল, 'প্রিয় সুশীল, সেদিন তুমি এলে, অথচ অসুস্থতার জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। আশা করি কিছু মনে করোনি। আমার একটা বই—ওয়েকম্যানের হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক প্রথম খণ্ড—১০-১২-৭২ তারিখে আমার কাছ থেকে তুমি পড়তে নিয়েছিলে—এ-কথা আমার নোটবুকে তোমার নিজের হস্তাক্ষর বলছে। ওটা আমার সংগ্রহের একটা সেরা বই, এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য। পত্রপাঠ যদি সেটা ফেরত দিতে পারো তো আশ্বস্ত হই। সকালের দিকে এলে চা-যোগে কিঞ্চিৎ আড্ডাও হতে পারে। শুভেচ্ছা নিয়ো। সমরেশ।'

চিঠিটা লিখে বার দুয়েক পড়ে দেখল সমরেশ। ফেরত দেবার ব্যাপারটা বেশ জোর দিয়েই বলা হয়েছে, তবে রূঢ়ভাবে নয়। এটাই দরকার।

খামের উপর ঠিকানা লিখে টিকিট লাগিয়ে সমরেশ ড্রাইভার রঘুনাথের হাতে চিঠিটা দিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ ডাকে ফেলে আসার জন্য।

কলকাতার ডাকবিভাগ যে সবসময়ে খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে তা নয়। তবে তাদের গাফিলতির জন্য চারদিন সময় দিয়েও যখন সুশীল তালুকদার দেখা দিল না, তখন সমরেশ রীতিমতো বিরক্ত বোধ করল। এখন করা কী? নিজে গিয়ে সরাসরি বইটা ডিমান্ড করাটা কি একটু বিসদৃশ মনে হবে? তা হলেও, যদি ধরে নেওয়া যায় যে চিঠি সুশীলের হাতে পৌঁছয়নি, ডাকে খোয়া গেছে, তা হলে এ ছাড়া গতি কী? বুক শেলফ-এর দিকে চোখ পড়লেই দ্বিতীয় খণ্ডের পাশে প্রথম খণ্ডের অভাবে সমরেশের মনটা হু হু করে ওঠে। বইয়ের নেশা এমনই জিনিস। ওটা উদ্ধার না করা অবধি শান্তি নেই।

সাতের তিন মাধব লেনে থাকে সুশীল তালুকদার। রবিবার সকালে গেলে তাকে বাড়িতে পাবার সম্ভাবনাটা বেশি, তাই সেটাই করল সমরেশ। ন'টার সময় সুশীলের কলিং বেলে তার হাত পড়ল। মাধব লেনে এ-সময় লোক চলাচল যথেষ্ট। সমরেশ কোনও জনপ্রিয় ফিল্ম স্টার হলে আর রক্ষা ছিল না, কিন্তু এমনি দেখে তাকে ব্রামা দ্য গ্রেট বলে চেনার কোনও উপায় নেই। স্টেজে সে গোঁফ ও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ব্যবহার করে এবং নিজের আসল চেহারা কাগজে ছাপতে দেওয়ায় তার নিষেধ আছে।

'কাকে চাই?'

দরজা খুলেছে একটি চাকর।

'সুশীলবাবু আছেন কী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কী নাম বলব?'

'বলো যে সমরেশবাবু দেখা করতে এসেছেন।'

চাকর তাঁকে বসতে বলে ভিতরে চলে গেল বাবুকে ডাকতে।

দরজার পিছনে বৈঠকখানায় ছড়ানো রয়েছে গোটা চারেক সাধারণ সোফা ও চেয়ার, মাঝখানে একটা গোল কাশ্মীরি কাঠের টেবিল, একপাশে একটা ছোট বইয়ের আলমারির মাথায় একটা ওয়াড় পরানো রেডিও, দেয়ালে গোটা তিনেক ছবি ও দু'রকম ক্যালেন্ডার।

সমরেশকে বসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার উঠতে হল। চোখ কপালে তুলে পর্দা ফাঁক করে হাসিমুখে ঘরে ঢুকেছে তার কলেজের সহপাঠী সুশীল তালুকদার।

'কী সর্বনাশ! এ কী সৌভাগ্য আমার! কোনদিকে সূর্য উঠল ভাই?'

'আমার চিঠিটা পাওনি বোধহয়?'

'পেয়েছি বইকী!'

'তা হলে—?'

সমরেশ হতভম্ব। সুশীল বসেছে তার মুখোমুখি সোফায়।

'ব্যাপার কী জানো? বইয়ের প্রতি তোমার যে কী দুর্বার আকর্ষণ সে তো জানি! আর সেদিন তো গিয়ে দেখলুম আরও কত বেড়েছে তোমার সংগ্রহ। তাই ভাবলুম, যদি জবাব না দিই তা হলে তোমার সশরীরে এসে পড়াটা খুব আশ্চর্য নয়। তা অনুমান ঠিকই করেছি, কী বলো?'

সশরীরে এসে পড়ে সমরেশের যে খুব ভাল লাগছিল তা নয়। দু'জনের জগৎটা যে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে সেটা সে বেশ বুঝতে পারছিল। পৃথিবীর চল্লিশটা বড় শহরের কত লক্ষ লোককে সে তার জাদুবলে বশ করেছে, আরও কত লক্ষকে করবে। আর সুশীল? কত সংকীর্ণ তার জগৎটা! ভাবলে অনুকম্পাই হয়। বইটা পেলেই সমরেশ উঠবে। এর সঙ্গে বসে গালগল্প করার সময় তার নেই।

'তুমি চালটা ঠিকই চেলেছ', বলল সমরেশ। 'এমনিতে হয়তো সত্যিই আসা হত না। শো চলছে তো শহরে, তাই বেজায় ব্যস্ত। এবার বইটা যদি ফেরত দাও তো উঠে পড়ি।'

'বই?'

'আছে তো? না কি—'

সুশীল তালুকদার হো হো করে হেসে উঠল।

'তোমার কোনও বই আমার কাছে নেই ভাই।'

'সে কী!'—যা আশঙ্কা করেছিল তাই। সে বই পাচার হয়ে গেছে।

'বই আছে তোমার বাড়িতেই', বলল সুশীল তালুকদার।

'মানে? খাতায় যে তোমার হাতে লেখা দেখলাম—'

'তা থাকবে না কেন? খাতাটা কোথায় থাকত সেটা তো আমার জানা। ওই ছোকরাটির কথা শুনেই যখন বুঝলুম তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তখন মাথায় একটা মতলব এল। দেখিই না একটু রগড় করে! ওকে স্লিপ দিয়ে হটিয়ে দিলুম। তারপর দেরাজ খুলে দেখলুম নোটবুক সেখানেই আছে। ম্যাজিকের বইটা শেলফে দেখতে পাচ্ছিলুম, লিখে দিলুম খাতায় সেটার নাম, আমার নাম আর দশ বছর আগের একটা তারিখ। তারপর দু'ভল্যুম বইয়ের এক ভল্যুম বার করে নিয়ে লুকিয়ে রেখে দিলুম তোমারই ঘরে।'

'কোথায়?'

'তোমার যে বাক্স প্যাটার্নের পুরনো গ্রামোফোনটা আছে, সেটার ঢাকনা খুললেই পাবে।'

'কিন্তু—কিন্তু...' কিঞ্চিৎ আশ্বস্তভাবের সঙ্গে একটা হতভম্ব ভাব সমরেশের মনটাকে দু'ভাগে চিরে ফেলেছে। এরকম পাগলামির কারণটা কী?

'কারণটা আর কিছুই না, ভাই', বলল সুশীল তালুকদার, 'সেদিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার দুই মেয়ের অটোগ্রাফের খাতা। ব্রামা দ্য গ্রেট আমার কলেজের সহপাঠী ছিল সেটা তাদের বলেছি। তার উপরে তোমার ম্যাজিক দেখে তারা অভিভূত। আবদার করল তোমার সই নিয়ে আসতে হবে। তুমি তো দেখা করলে না। তারা শুনে প্রচণ্ড খাপ্পা, তোমার উপর থেকে ভক্তি চলে যায় আর কি! এটা হবে আমি জানি, যদিও হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বললুম, বেচারা অসুখের জন্য আসতে পারেনি, এবার দেখিস একেবারে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হবে। আর হলও তো তাই!—ওরে রুনু ঝুনু! তোরা আয় রে!—দেখে যা তোদের বাপের কথা ঠিক হল কিনা!'

পরক্ষণেই পর্দা ফাঁক করে বারো থেকে ষোলো বছর বয়সের দুটি ছিপছিপে মেয়ে মুখে সলজ্জ হাসি ও চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকে সমরেশকে প্রণাম করে তার সামনে খাতা-কলম ধরল।

সই দিতে দিতে সমরেশ ব্রহ্ম ভাবল, তাকে ধাপ্পা দিতে পারে এমন লোকও এই কলকাতা শহরেই আছে, এটা তার জানা ছিল না!

সন্দেশ, চৈত্র ১৩৮৮

কনওয়ে কাস্‌লের প্রেতাত্মা

তারিণীখুড়ো তাঁর এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বিড়িতে দুটো টান দিয়ে বললেন, 'ভূতের গল্প অনেকে বলতে পারে, তবে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলা গল্পের জাতই আলাদা। সেটা আর কজন পারে বলো।'

'আপনি পারেন ?' প্রশ্ন করল ন্যাপলা।

'হুঁঃ,' বলে খুড়ো অন্য দিকে চাইলেন।

তারিণীখুড়োর এক্সপিরিয়েন্সের স্টক যে অফুরন্ত সেটা আমরা জানি। এই সেদিন অবধি সারা দেশময় টোটো করে বেড়িয়েছেন। ভারতবর্ষের তেত্রিশটা শহরে ছাপান্ন রকম কাজ করেছেন উপার্জনের জন্য। তবে এক বছরের বেশি কোনও কাজে টিকে থাকেননি—সে ব্যবসাই হোক আর চাকরিই হোক। এখন চৌষট্টি বছর বয়সে চরকিবাজি থামিয়ে কলকাতায় এসে রয়েছেন বেনেটোলা লেনে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে। এখানে বলে রাখি, তারিণীখুড়ো সকলেরই খুড়ো। বাবাও খুড়ো বলেন, আমিও বলি। ন্যাপলা একবার ওঁকে দাদু বলেছিল, তাতে খুড়ো মহা ক্ষেপে বললেন, 'এখনও বাস না পেলে অক্লেশে হেঁটে আসি বেনেটোলা টু বালিগঞ্জ—দাদু আবার কী ? খুড়ো বলবি।'

আমি আর পাড়ার পাঁচটা ছেলে মিলে আমাদের দল। আমাদের বাড়িতেই আসেন তারিণীখুড়ো ; এলেই খবর চলে যায়, আর পাঁচজন তুরন্ত চলে আসে খুড়োর গল্পের লোভে। একটা গল্পে পুরো একটা সন্ধে কেটে যায়। খুড়ো বলেন আর্টের খাতিরে খানিকটা রং চড়ানো ছাড়া গল্পগুলো ষোলো আনা সত্যি।

'আমি তখন থাকি পুনায়,' বললেন তারিণীখুড়ো।

'পুনে' বলল ন্যাপলা।

একটা গল্পের গন্ধ পাচ্ছি, ন্যাপলা যাতে বারবার ইনটারাপ্ট না করে তাই তার কোমরে একটা চিমটি কেটে দিলাম।

'ওই হল,' বললেন তারিণীখুড়ো, 'পুনে-পুনা, মুম্বাই-বোম্বাই, তিরুচিরপল্লী-ত্রিচিনপলি—যে-কোনও একটা বললেই হল। আর আমি যখনকার কথা বলছি তখন সবে স্বাধীনতা এসেছে ; পুনার পুনে হতে অনেক দেরি। পল্টু একটা চা বলো।'

আমি লক্ষ্মণকে ডেকে চা অর্ডার দিলাম—দুধ-চিনি ছাড়া চা—আর খুড়ো তাঁর গল্প শুরু করলেন।

আমি রয়েছি আমার এক বন্ধু রাধানাথ চ্যাটুজ্যের বাড়ি। সে ফার্গুসন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। কোডার্মায় মাইকা মাইনসের কাজে ইস্তফা দিয়ে শিবাজীর দেশে এসেছি একটা হোটেলের ম্যানেজারি নিয়ে। আমার বয়স তখন চৌত্রিশ।

পৌঁছাবার দুদিনের মধ্যেই রাধানাথ নিয়ে গেল উকিল ঘনশ্যাম আপ্‌টের বাড়ি। সেখানে সন্ধ্যায় আড্ডা বসে, পাঁচ মেশালি আড্ডা, যাকে বলে মিক্সড ক্রাউড। আমরা তিনজন ছাড়া আসে মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কের এজেন্ট মিঃ যোশী, ম্যাকডারমট কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী মিঃ হরিহরণ, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ আগাশে আর তরুণ সাংবাদিক আনওয়র কুরেশি।

কুরেশির বয়স আমাদের মধ্যে সব চেয়ে কম, ত্রিশ পৌঁছায়নি। তুখোড় ছেলে, হ্যান্ডসাম চেহারা, চোখে জ্বলজ্বলে দৃষ্টি। সে আসে হরিহরণের সঙ্গে দাবা খেলতে। তাঁরা ঘুটি এঘর ওঘর করেন, আর

আমরা বাকি পাঁচজনে মারি আড্ডা। সবচেয়ে বেশি কথা বলেন বাড়ির কর্তা আপ্‌টে সাহেব নিজে। আমার বিশ্বাস তাঁর কথা বলার প্রয়োজনেই এই আড্ডার সৃষ্টি। কিছু লোক আছে যারা সাঙ্গোপাঙ্গ ছাড়া বাঁচতে পারে না। এই সাঙ্গোপাঙ্গ যদি তোষামুদে হয় তা হলে তো কথাই নেই। অবিশ্যি আড্ডার সকলে আপ্‌টেকে তোষামোদ করে বললে ভুল হবে, তবে ওঁর মতামতের প্রতিবাদ কেউ করে না।

আগাশের মতো খোশ মেজাজের দারোগা আমি আর দুটি দেখিনি। অবিশ্যি যখন প্রথম আলাপ তখন তিনি একটা ব্যাপারে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সম্প্রতি কিছু টাটকা জালনোট পাওয়া গেছে পুনাতে। জালিয়াত কারা এবং তাদের আস্তানাটা কোথায় তাই নিয়ে পুলিশ দপ্তরে বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। আগাশেকে তাই মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে দেখা যায়।

দলের মধ্যে স্বল্পভাষী হলেন মিঃ যোশী ; তবে শ্রোতা হিসেবে তিনি চমৎকার। সব কথাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনেন। হাসির কথায় ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাস্য করেন, দুঃখের কথায় তাঁর জিভ দিয়ে চুক্ চুক্ শব্দ শুনে আপ্‌টের পোষা ড্যালমেশিয়ন বারান্দা থেকে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে যোশীর কাছে চলে এসেছে, এ ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

আমার স্টকে হাজার গল্প, বাংলার বাইরে বছরের পর বছর কাটিয়ে ইংরিজিটাও বেশ রপ্ত, তাই আমার একটা বেশ ভাল পোজিশন হয়ে গেল আপ্‌টের আড্ডায়।

কী প্রসঙ্গে মনে নেই, একদিন কথা উঠল অশরীরী আত্মার। দেখা গেল আপ্‌টে ছাড়া আর সকলেই ভূতে বিশ্বাস করে। আমি আপ্‌টেকে বোঝালুম যে পুরাণ, শেক্‌সপিয়র, ডিকেন্‌স, রবীন্দ্রনাথ, দেশবিদেশের উপকথা, সবেতেই ভূতের উল্লেখ আছে, কাজেই ভূতে বিশ্বাস না করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। আপ্‌টে তবু মাথা নাড়ে। সে বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, যুক্তিবাদী মন তার, খালি বলে ভূত জিনিসটা ভুয়ো।

হঠাৎ কেন জানি রোখ চেপে গেল, ধাঁ করে হাজার টাকা বাজি ধরে ফেললুম। বললুম দুমাসের মধ্যে ভূত দেখিয়ে দেব তোমায়। আপ্‌টে হেসে উড়িয়ে দিলে। বললে—'সাবধান। হাজার টাকা খোয়া যেতে চলেছে তোমার এটা তোমায় বলে দিলাম।'

অবিশ্যি আমার দিক থেকে ব্যাপারটা অতিমাত্রায় রিস্কি হয়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। রাধানাথের কাছে ভর্ৎসনাও শুনতে হয়েছিল ; কিন্তু বাজির ব্যাপারে দাবার মতোই চাল ফেরত নেওয়া যায় না। কাজেই ব্যাক-আউট করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

এরই দিন সাতেক বাদে আমাদের আড্ডায় এলেন প্রোফেসর অটো হেলমার। জার্মানির স্টুটগার্ট শহরের বাসিন্দা। ভদ্রলোক পক্ষিবিদ্, ভারতবর্ষে এসেছেন ভারতীয় পাখির ডাক রেকর্ড করতে। টেপ রেকর্ডার জিনিসটা তখন সবে আবিষ্কার হয়েছে, সাহেবের কাছেই প্রথম দেখলুম সেই আশ্চর্য যন্ত্র। আমাদের নানারকম পাখির ডাক শুনিয়ে সাহেব বললেন পুনায় এক জায়গায় তিনি নাকি হুতোম প্যাঁচার ডাক শুনেছেন। সেইটে রেকর্ড করতে পারলেই নাকি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। প্যাঁচার ডাকের ভাল রেকর্ডিং তিনি এখনও পাননি।

'কোথায় শুনলে ডাক ?' প্রশ্ন করলেন আপ্‌টে।

তাতে হেলমার সাহেব একটা বাড়ির বর্ণনা দিলেন—দুর্গ প্যাটার্নের প্রাচীন পরিত্যক্ত সাহেব বাড়ি। সেন্ট মেরি গির্জার পুব পাশে। তারই কম্পাউন্ডে নাকি দু'রাত আগে প্যাঁচাটা ডাকছিল। সাহেব ছিলেন গাড়িতে। সঙ্গে টেপরেকর্ডার। চলন্ত অবস্থাতেই ডাকটা শুনে গাড়ি থামিয়ে নেমে কম্পাউন্ডের পাঁচিলের ধারে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও ফল হয়নি। প্যাঁচা আর ডাকেনি।

বাড়ির বর্ণনা এবং অবস্থান শুনে আমাদের অনেকেই বললেন যে সেটা কনওয়ে কাস্‌ল। এখানে বলা দরকার যে ব্রিটিশ আমলে পুনা ছিল সাহেবদের একটা বড় ঘাঁটি। মিলিটারি তো বটেই, সিভিলিয়ানও অনেক থাকতেন পুনা শহরে। তাঁরা অনেকেই রিটায়ার করার পর পুনাতে বাড়ি করে সারাজীবন সেখানেই কাটিয়ে দিতেন। ব্রিগেডিয়ার কনওয়ে ছিলেন এই রকম একজন সাহেব। তাঁরই তৈরি বাড়ি এই কনওয়ে কাস্‌ল। কুরেশি বাড়িটা সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানে, সেই বললে। বাড়িটা তৈরি হয় কুইন ভিক্টোরিয়া যে বছর ভারত-সম্রাজ্ঞী হন সেই বছর। অর্থাৎ ১৮৭৬

খ্রিস্টাব্দে। কনওয়ে এই বাড়িতে প্রবেশ করার ছ'মাসের মধ্যে নাকি তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলে মারা যায়। ছেলেরা অবিশ্যি বাড়িতে মরেনি ; তারা দুজনেই ছিল আর্মিতে, মরেছিল দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে। স্ত্রী মারা যায় যক্ষ্মারোগে। আর তার তিনমাসের মধ্যে কনওয়ে নিজেও মরে। কীভাবে মরে জানা যায়নি। তবে অনেকের ধারণা সে আত্মহত্যা করে।

মোট কথা সেই থেকে এই বাড়ি অভিশপ্ত বাড়ি বলে পরিচিত। কেউ আর সে বাড়িতে থাকেনি। সকলের পক্ষে সম্ভবও হত না, কারণ এত পেল্লায় বাড়ি মেনটেন করা মুখের কথা নয়। আসবাবপত্র যা ছিল সবই নাকি কনওয়ের এক আত্মীয় বিলেত থেকে এসে নিলামে বিক্রি করে দেয়।

রাধানাথ সব শুনে-টুনে বলল, 'কনওয়ে কাস্‌ল সম্বন্ধে একটা ঘটনা শুনেছি সেটা স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।'

'কোন্ স্বদেশি আন্দোলন ?' প্রশ্ন করলেন আপ্‌টে।

'বালগঙ্গাধর তিলকের সময়কার', বললে রাধানাথ। 'উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে। মেজর লেথব্রিজ বলে এক সাহেবকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল এক সন্ত্রাসবাদী দল। তারা নাকি ওই কাস্‌লে তাদের গুপ্ত ডেরা করেছিল। পরে আত্মসমর্পণ করে। তবে তাদের লিডার আচরেকারকে নাকি ধরা যায়নি। সে বেপাত্তা হয়ে যায়।'

'কনওয়ে কাস্‌লে খোঁজ করা হয়েছিল কি ?' আপ্‌টে প্রশ্ন করলেন। আগাশে হো হো করে হেসে উঠলেন।

'মিঃ আপ্‌টে—পুলিশও মানুষ। তাদেরও ভূতের ভয় আছে। ওই অভিশপ্ত বাড়ি রেড করতে গেলে রীতিমতো হিম্মৎ লাগে।'

এদিকে আমার কৌতূহল চাগিয়ে উঠেছে। ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটেমোর শখ। সেটা চৌত্রিশ বছরেও পুরোপুরি বজায় আছে। পর পর অতগুলো মৃত্যু যেখানে ঘটেছে, সেই বাড়ির ভেতরে দু-একটা প্রেতাত্মা বসবাস করবে না কি ? বাজি জেতার পক্ষে এ যে একটা বড় সুযোগ !

এর কিছুদিন পরেই হেলমার সাহেব আবার এলেন আড্ডায় তাঁর টেলিফুংকেন টেপ রেকর্ডার নিয়ে। ভদ্রলোকের বাঁ কব্জিতে ব্যান্ডেজ। বললেন কাঁটা ঝোপে হাত কেটে গেছে। মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে না সুখবর না দুঃসংবাদ। তাঁকে বসতে দিয়ে সকলেই তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলুম। হুতোমের ডাক শোনা যাবে কি ?

হেলমার কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'ডাক তুলতে পেরেছি, তবে পারফেক্ট হল না। রাত বারোটার পর প্যাঁচাটা ডাকল, সঙ্গে সঙ্গে মেশিন চালু করলাম। তখন শহরের অন্য শব্দ প্রায় নেই বললেই চলে। নিয়মমতো নিখুঁত রেকর্ডিং হবার কথা, কিন্তু দেখ কী হয়েছে।'

শুনলাম প্যাঁচার ডাক। ছেলেবেলা আমাদের বাদুড়বাগানের বাড়ির পাঁচিলের ওপারে পুকুরের ধারে শ্যাওড়া গাছে একটা হুতোম প্যাঁচা থাকত, তাই তার ডাক চেনা ছিল। ইনিও যে হুতোম তাতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা শব্দ তাকে সত্যিই বড্ড ডিস্টার্ব করছে। সাহেবের এত মেহনত ষোলো আনা সার্থক হল না জেনে তাঁর প্রতি মমতা হল।

'বাট হোয়াট ইজ দ্যাট আদার সাউন্ড ?' প্রশ্ন করল কুরেশি। সে দাবা ছেড়ে এগিয়ে এসেছে।

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না,' বললেন হেলমার। 'মেশিনেই গণ্ডগোল বলে মনে হচ্ছে। এর আগে তো এ রকম হয়নি কখনও।'

শুনলে মনে হয় একটা যান্ত্রিক শব্দ। ঘটাং ঘটাং ঘটাং ঘটাং এই রকম। খুবই ক্ষীণ, কিন্তু জার্মান পক্ষিবিদ্-এর মন যে তাতে খুঁত খুঁত করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

'প্লে দ্যাট এগেন প্লিজ !' হঠাৎ বলে উঠলেন ইন্‌স্পেক্টর আগাশে। তাঁর শরীরটা টান, আর চোখে এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—শিকারের গন্ধ পেলে যেমন হয় হিংস্র জানোয়ারের।

হেলমার টেপটা ব্যাক করে আবার চালালেন। আগাশে কোমর থেকে শরীরটা ভাঁজ করে কানটা নিয়ে গেছেন একেবারে স্পিকারের সামনে।

ততক্ষণে অবিশ্যি আমিও বুঝে গেছি আগাশে কী ভাবছেন।

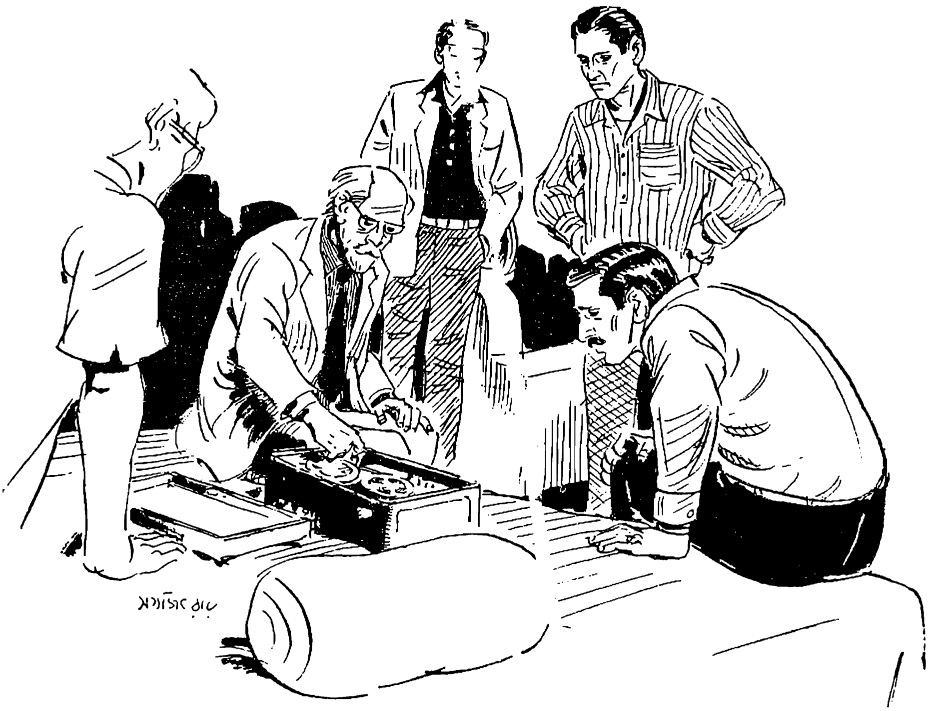

শব্দটা শুনে প্রিন্টিং মেশিনের কথা মনে হয়। ছোট, পায়ে-চালানোর কল। যাকে বলে ট্রেড্‌ল মেশিন।

এইরকম যন্ত্রই সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে নোট জাল করার কাজে।

শব্দটা কাস্‌লের ভিতর থেকেই আসছে না অন্য কোথাও থেকে আসছে সেটা অবিশ্যি বোঝার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু আগাশে স্থির করলেন যে কনওয়ে কাস্‌লে পুলিশের রেড হবে। আগাশের হুম্‌কিতে নাকি কিছু কন্‌স্টেবল রাজি হয়েছে অভিশপ্ত দুর্গে প্রবেশ করতে। এমনি খোশমেজাজ হলে কী হবে, অফিসার হিসেবে নাকি ভদ্রলোক অত্যন্ত কড়া।

আমি কিঞ্চিৎ নিরাশ বোধ করছি। জালিয়াতরা যেখানে আস্তানা গেড়েছে সেখানে ভূত থাকার কোনও সম্ভাবনা আছে কি ? মনে তো হয় না।

পরদিনই রাত্তিরে রেড, আড্ডার সকলে ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব, এমন সময় ইন্‌স্পেক্টর সাহেব এসে হাজির।

'সেকী, তোমাদের তো আজই রেড হবার কথা।'

আমাদের হয়ে আপ্‌টেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আগাশে একটা বোকা হাসি হেসে মাথা নেড়ে সোফায় বসে পড়লেন।

'ভাবতে পার ? আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সে গ্যাং ধরা পড়েছে।

'কোথায় ?' আমরা সমস্বরে জিজ্ঞেস করে উঠলাম।

'নাসিক', বললেন আগাশে।

'তা হলে ওই শব্দটা... ?'

'টেপরেকর্ডারেই কোনও গণ্ডগোল হবে। ওটা বাইরের কোনও শব্দ না। কাল মাঝ রাত্তিরে আমি কাস্‌লের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে কোনও শব্দ পাইনি।'

আর কিছু বলবার নেই। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা বেলুন চুপসানো ভাব, অথচ তার কোনও কারণ নেই। জালিয়াতের দল ধরা পড়েছে এ তো ভাল কথা ; শুধু পুনার কনওয়ে কাস্‌লে ধরা না পড়ে পড়েছে অন্য শহরের অন্য জায়গায়। কিন্তু তাও বলতে হবে যা ঘটেছে তার মধ্যে যেন নাটকের অভাব।

অবিশ্যি পরমুহূর্তেই মনে হল—জালিয়াত যখন নেই, তখন ভূত থাকতে বাধা কী ? কনওয়ে কাস্‌লে একবার হানা দিলে দোষ কী ?

চা-টা শেষ করে আমিই কথাটা পেড়ে বসলাম, 'কে কে যেতে রাজি আছ বলো।'

যোশী গোড়াতেই বললে তার ধুলোয় অ্যালার্জি, তাই ওই পোড়ো বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। হরিহরণ বললেন, 'আমি যাব, কিন্তু আপ্‌টে সাহেবেরও যাওয়া চাই। ভূত যদি থাকে তো সেটা ওঁর চাক্ষুষ দেখা উচিত। আমাদের কথা উনি মানতে নাও পারেন।'

আপ্‌টে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি যাব। এবং আমি সঙ্গে ক্যাশ হাজার টাকা নিয়ে যাব। আমার কন্ডিশন হল যে মিঃ ব্যানার্জিও যেন সঙ্গে টাকা রাখেন। বাজির টাকা ফেলে রাখা নিয়মবিরুদ্ধ।'

আমি বললুম, 'তথাস্তু। তা হলে কালই হোক এক্সপিডিশন।'

এইখেনে কুরেশি বললে তাকে নাকি দুদিনের জন্য কোলাপুর যেতে হবে একটা রিপোর্টিং-এর ব্যাপারে ; ফিরে এসে সে যেতে প্রস্তুত আছে। আমরাও তাতে রাজি হয়ে গেলুম।

আগাশে এতক্ষণ চুপ করে আমাদের কথা শুনছিলেন ; এবার তিনি মুখ খুললেন।

'জেন্‌টলমেন, তোমাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই। কাস্‌লের সদর দরজা যদি তালা দিয়ে বন্ধ থাকে, তা হলে সেটা খোলার যন্ত্র, বা জানালা ভেঙে খোলার সরঞ্জাম—এসব তোমাদের আছে কি ? কাজটি কিন্তু সহজ নয়।'

এ প্রশ্নের জবাব অবিশ্যি হ্যাঁ হতে পারে না। আমাদের যেটা আছে সেটা হল উৎসাহ আর উদ্যম। যন্ত্রপাতি থাকবে কোত্থেকে ?

আমরা এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি দেখে আগাশে একটু হেসে বললেন, কাজেই বুঝতে পারছ, আমি ছাড়া তোমাদের গতি নেই।'

ভালই হল। শুধু জানালা দরজা ভেঙে খোলার সরঞ্জাম নয়, একটি আগ্নেয়াস্ত্রও থাকবে সঙ্গে এটাও কম ভরসা নয়।

জুন মাস, দিনে বেজায় গরম, রাত্তিরের দিকটা তবু একটু ঝিরঝির হাওয়া দেয়। বন্দোবস্ত অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া সেরে ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় আমরা ছ'জন সেন্ট মেরি গির্জার সামনে জমায়েত হলাম। পাড়াটা নির্জন, গাড়ি চলাচল নেই বললেই চলে। আমরা দল বেঁধে এগোলাম কনওয়ে কাস্‌লের দিকে।

ফটক থেকে কাস্‌লের দরজা অবধি লম্বা রাস্তা। এককালে বাহার ছিল রাস্তাটার সেটা আঁচ করা যায়, এখন পথ বলতে প্রায় কিছুই নেই, টর্চের আলোয় কোনওরকমে আগাছা বাঁচিয়ে পা ফেলতে হয়। বাড়িটা আমাদের সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এক বিশাল প্রেতপুরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে, কেউ যে কস্মিনকালেও সেখানে ছিল সেটা এখন আর বিশ্বাস হয় না। দলে আছি বলে রক্ষে, না হলে যতই ডানপিটে হই না কেন, আশি বছরের মধ্যে মানুষের পা পড়েনি এমন একটা থম্‌থমে অন্ধকার অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে বুকের মধ্যে যে একটা ট্রেড্‌ল মেশিন চলতে শুরু করেছে, সেটা তো অস্বীকার করা যায় না।

আগাশে সদর দরজায় ঠেলা দিতেই সেটা একটা জান্তব আর্তনাদ করে ধীরে ধীরে খুলে গেল, আর সেই সঙ্গে ইঁদুর বাদুড় পায়রা চামচিকে গিরগিটি ছুঁচো মেশানো একটা গন্ধর ধাক্কায় আমরা সকলেই বেশ কয়েক হাত পিছিয়ে গেলুম।

তারপর দুরু দুরু বক্ষে সবাই মিলে ঢুকলুম ভেতরে। এটা ল্যান্ডিং, বাঁ দিকে চওড়া কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। আগে একতলা সেরে তারপর দোতলায় যাব এটাই আমার ইচ্ছে ছিল,

দেখলাম সকলেই তাতে সায় দিলে। আমরা সার বেঁধে গিয়ে ঢুকলুম একটা বিশাল ঘরে। সম্ভবত ডাইনিং রুম ছিল এটা। সারা ঘরে একটিও আসবাব নেই ঠিকই, কিন্তু দেয়ালে ধূলিমলিন ওয়াল পেপারের উপর বড় বড় ছবির ফ্রেমের দাগ রয়েছে, খান তিনেক দেয়ালবাতির মর্চে ধরা ব্র্যাকেট রয়েছে, আর সিলিং থেকে ঝুলে আছে ঝাড়-লণ্ঠন আর টানাপাখার হুক। এটার কড়িকাঠেই বাদুড় ঝোলার কথা, তবে তারা বোধহয় রাত্তিরে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়েছে। এত বড় বাড়ির এতগুলো জানালার মধ্যে কয়েকটা কি আর খোলা নেই ? বাদুড় না থাকলেও, ছোটখাটো চতুষ্পদ প্রাণী যে কিছু রয়েছে সেটা মেঝের এদিক ওদিক থেকে সড়াৎ সড়াৎ শব্দেই বুঝতে পারছি।

এতক্ষণ সবাই একটা জমাট দল বেঁধে চলাফেরা করছিলুম, বড় ঘর পেয়ে সেটা কিছুটা আলগা হল। কুরেশি দেখলুম একাই একটা টর্চ নিয়ে হল ঘরের পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আপ্‌টেও খানিকটা এগিয়ে গেছে আমাদের ছেড়ে, তারও নিজস্ব একটি টর্চ আছে। ভূত এখনও চোখে পড়েনি ঠিকই, কিন্তু এর চেয়ে ভাল ভৌতিক পরিবেশ আর কী হতে পারে আমি জানি না।

হলঘরের একটা দরজা দিয়ে ডাইনে ঘুরে একটা প্যাসেজ পড়ল। সেটার ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই ঘরের সারি। আগাশে তার পাঁচ-সেলের টর্চ জ্বেলে এগিয়ে চলল প্যাসেজ ধরে। আমরা তার পিছনে। ঘর পড়লে দরজা দিয়ে আলো ফেলে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি।

এইভাবে পাঁচখানা ঘর দেখার পর একটা ঘটনা ঘটল যেটা ভাবতে এখনও গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

একটা গোঙানির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্যাসেজের শেষ প্রান্তে বাঁয়ের একটা দরজা থেকে পিছন ফিরে টলতে টলতে বেরিয়ে এল কুরেশি। তার মুখ দেখতে না পেলেও, আতঙ্কের ছাপ রয়েছে সর্বাঙ্গে সেটা বুঝতে পারছি। ঘাড় কুঁজো, হাত দুটো পিছনে এবং কনুই-এর কাছে ভাঙা, হাতের আঙুলগুলো ফাঁক।

আগাশের সঙ্গে আমরাও দৌড়ে গেলাম কুরেশির দিকে। আপ্‌টেও এখন আমাদেরই সঙ্গে রয়েছে।

'কী হল ? কী ব্যাপার ?' আগাশে ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলে।

কুরেশি কাঁপা হাত দিয়ে খোলা দরজার দিকে দেখিয়ে দিলে।

ঘরের ভিতর আলকাত্‌রা অন্ধকার। আগাশে তার টর্চটা ফেলতে প্রথমে বিপরীত দিকের দেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। তারপর টর্চটা একটু তুলতেই যা দেখলুম তাতে শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল।

সিলিং থেকে ঝুলছে দড়ি, আর সেই দড়ি ফাঁস দিয়ে বাঁধা একটি আস্ত নরকঙ্কালের গলায়।

ধন্যি ইন্‌সপেক্টর আগাশে। এই চরম আতঙ্কের মুহূর্তেও সে দিব্যি ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'ইনিই সেই স্বদেশে গ্যাঙের লিডার আচরেকর বলে মনে হচ্ছে। এই কারণেই বেপাত্তা হয়ে গেছিলেন ভদ্রলোক।'

'বাট এ স্কেলিটন ইজ নট এ গোস্ট।'

ঠিকই বলেছেন মিঃ আপ্‌টে। এবং তিনিও যেমন দিব্যি স্বাভাবিক ভাবে বললেন কথাটা, তাতে তাঁর নার্ভের তারিফ না করে পারা যায় না।

'সরি' বললে কুরেশি, 'হঠাৎ সামনে কঙ্কালটা দেখে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম।'

'কিন্তু ওটা কী ?'

প্রশ্নটা করলেন আগাশে। তাঁর টর্চের আলো এখন সিলিং থেকে নীচের দিকে নেমেছে।

ঘরের কোণে ধুলো আর মাকড়সার জালে মুড়ি দেওয়া কীসের জানি একটা স্তূপ।

আলোটা ভাল করে ধরতে বুঝতে পারলুম জিনিসটা কী, আর পেরে একেবারে তাজ্জব বনে গেলুম।

এ যে দেখছি ট্রেডল মেশিন ! এখানে ছাপার যন্ত্র কী করছে ?

আগাশে ব্যাপারটার একটা খুব সহজ এক্সপ্ল্যানেশন দিয়ে দিলেন। বললেন, 'এটা যদি সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি হয়ে থাকে তা হলে ছাপার কল থাকা অস্বাভাবিক নয়। এক নম্বর—তাদের

সত্যজিৎ রায়

মুখপত্র লুকিয়ে ছাপবার জন্যে কলের দরকার হত ; দুই—সন্ত্রাসবাদীরা টাকার প্রয়োজনে নোট জাল করেছে এও অনেক শোনা গেছে।'

রাধানাথ এ কথায় সায় দিল।

মাথার উপর ঝুলন্ত কঙ্কাল আর তার নীচে নির্জীব যন্ত্রটা অদ্ভুত ভাবে যেন এক অতীত যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

'আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে কি ?' প্রশ্ন করলেন মিঃ আপ্‌টে।

আমরা সকলেই বললাম যে যখন এসেছি তখন সারা বাড়িটা না দেখে ফিরব না। আমিই অবিশ্যি কথাটায় সবচেয়ে বেশি জোর দিলাম। কঙ্কাল হল মৃতব্যক্তির দেহের পরিণাম। তার আত্মা কী অবস্থায় আছে তা কে বলতে পারে ?

প্যাসেজ দিয়ে যখন উলটোমুখে অর্ধেক পথ এসেছি তখন শুনতে পেলাম সেন্ট মেরি চার্চের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। ঘণ্টার রেশ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা শব্দ শুরু হল যেটা আমাদের হাঁটা বন্ধ করে দিল।

যে ঘর থেকে এলাম, সে ঘর থেকেই আসছে শব্দটা।

ট্রেড্‌ল মেশিন চলতে শুরু করেছে, আর তার শব্দে সারা কনওয়ে কাস্‌ল গম্ গম্ করছে। সেই সঙ্গে মাথার উপর ডানার ঝটপটানি শুরু হয়েছে, কারণ ঘুলঘুলির বাসিন্দা পায়রাগুলোর ঘুম ভেঙে গেছে প্রেসের শব্দে।

আমরা ছ'জনে রুদ্ধশ্বাসে শব্দটা শুনছি। দ্বিতীয়বার ওই ঘরের দিকে যাবার কোনও মানে নেই, কারণ জানি সে ঘরে যন্ত্র চালানোর মতো কোনও লোক নেই। হয়তো ওই আচরেকারই এককালে যন্ত্রটা চালিয়েছে। তারপর এক সময়ে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা এড়াবার জন্য গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। আর সেই থেকে প্রতিদিন মাঝরাত্তিরে তার প্রেতাত্মা ওই ট্রেড্‌ল মেশিন চালিয়ে এসেছে। তার মানে হেলমারের রেকর্ডারে যে শব্দটা উঠেছিল সেটা এটারই শব্দ।

কনওয়ে কাস্‌লের বাইরে বেরোবার পর বেশ কিছুক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই। হরিহরণ অসুস্থ বোধ করছে, সে গিয়ে তার গাড়িতে উঠে পড়ল। কথা ছিল আপ্‌টে তার গাড়িতে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবে। তার ডজ সিডানে ওঠার আগে সে আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'টেন হানড্রেড-রুপি নোট্‌স—গুনে নাও।'

আমার তখন রীতিমতো অসোয়াস্তি লাগছে। তবে এ তো আর এলেবেলে খেলা নয়—এ বেট ইজ এ বেট।

খাম থেকে নোটের গোছাটা বার করে রাস্তার আলোতে একবার দেখে নিলুম। দশখানাই আছে।

তিনদিন পরে এক শনিবারের সন্ধ্যায় নেপিয়ার হোটেলে ডিনার হল। আমিই খাওয়ালুম। তখনকার সস্তাগণ্ডার দিনে সাত জনের বিল হল একশো নব্বই টাকা। আজ হলে বড় হোটেলে সাত জনের ফাইভ-কোর্স ডিনার হাজার টাকায় হত কি না সন্দেহ।'

গল্প শুনে ন্যাপলা বলল, 'তা হলে খুব দাঁও মারলেন বলুন।'

খুড়ো উত্তর দিতে একটু সময় নিলেন, কারণ সদ্য আনা তৃতীয় কাপ চা-য়ে গলা ভেজানো আছে, তারপর বিড়ি ধরানো আছে।

'তা বটে,' অবশেষে বললেন খুড়ো, 'তবে ঘটনার শেষ এখানেই নয়।'

'আরও আছে ?' আমরা সকলেই প্রশ্ন করলাম। এর পরে আর কী থাকতে পারে সেটা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

তারিণীখুড়ো বলে চললেন—

ঘটনার কদিন পরে এক সকালে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হল আমাদের আড্ডার সাংবাদিক আনওয়র কুরেশি। বললে, 'আমার গাড়ি আছে, তোমাদের একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাই। বিশ মিনিট স্পেয়ার করতে পারবে ?'

কৌতূহল হল। রাধানাথ আর আমি গিয়ে উঠলুম তার গাড়িতে। কুরেশি নিজেই ড্রাইভ করে। কিছুদুর যেতেই বুঝলাম গাড়ি চলেছে আবার সেই কনওয়ে কাস্‌লের দিকে। কেন যাচ্ছে সে কথা বললে না ছোক্‌রা, খালি বললে এ কদিনে সে নাকি আরও তথ্য আবিষ্কার করেছে কনওয়ে সাহেব সম্বন্ধে।

একটি খবর নাকি বিলিতি কাগজে ছাপেনি, দিশি কাগজে পেয়েছে সেটা কুরেশি। ব্রিগেডিয়ার কনওয়ে তাঁর এক পাংখাবরদারকে বুট দিয়ে লাথিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। তাতে রাধানাথ বললে সেটা নাকি সে-যুগের একটা স্বাভাবিক ঘটনা। গরমকালে মাঝরাত্তিরে পাংখাবরদার পাখা টানতে টানতে ঘুমিয়ে পড়ত। মশার কামড়ে ঘুম ভেঙে যেত সাহেবের। আর তখন রাগে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান হারিয়ে এমন প্রহার করত ভৃত্যকে যে সে বেচারা অনেক সময় মরেই যেত।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গাড়ি গিয়ে থামল কনওয়ে কাস্‌লের গেটের সামনে।

কুরেশির পিছন পিছন আমরা গিয়ে ঢুকলাম কাস্‌লের ভেতর। দিনের বেলাও রীতিমতো অন্ধকার, ঢুকলে গা ছম্‌ছম্‌ করে।

'আমরা কি আবার সেই ঘরেই যাচ্ছি ?'

রাধানাথের এ প্রশ্নের কোনও জবাব দিলে না কুরেশি। তবে তার লক্ষ্য যে ওই একই ঘরের দিকে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কী দেখব কে জানে। শিরার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য অনুভব করছিলুম। কুরেশি ছোক্‌রা নির্বিকার।

আর তা হবে নাই বা কেন। সে ঘর যে খালি ! দড়ি কঙ্কাল, ছাপার যন্ত্র, সব হাওয়া !

আমাদের হতভম্ব ভাব দেখে কুরেশি হো হো করে হেসে উঠলে। তারপর এক অদ্ভুত প্রশ্ন করলে।

'আপ্‌টের বাড়িতে চা ছাড়া কিছু খেয়েছ কখনও ?'

প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত হলেও বললুম, 'কই, না তো !'

'ওই তো !' বললে কুরেশি। 'লোকটা হাড় কঞ্জুস। তা ছাড়া ওর আত্মম্ভরি ভাবটাও মাঝে মাঝে ইরিটেট করে আমাকে। তুমি বাজিটা ফেলে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ করনি। তোমার নির্ঘাৎ হাজার টাকা খসত। তাই ভাবলাম কনওয়ে কাস্‌লে যদি ভূতের ব্যবস্থা করতে পারি তা হলে তোমারও লাভ, উনিও জব্দ। তাই দুদিন সময় চেয়ে নিয়েছিলাম। কঙ্কালটা আমার বন্ধু আর্টিস্ট কুলকার্নির বাড়ি থেকে আনা। ট্রেড্‌ল মেশিনটা শিবাজী জব প্রেসের। প্রোপ্রাইটার মধুকর ঢোন্‌ডির ছেলে আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। ওটার জন্যে কিছু দক্ষিণা লাগবে ; আর ওদেরই আপিসের এক ছোকরা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে ছিল ; সে-ই কলটা চালায়। বেচারা অনেক মশার কামড় খেয়েছে। তাকে কিছু বকশিস দিয়েছি—'

আমি আর কথা বলতে দিলুম না কুরেশিকে। এক হিসেবে পুরো টাকাটাই ওর প্রাপ্য, কিন্তু পাঁচশোর বেশি কিছুতেই নিতে রাজি হল না।

প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে যখন ল্যান্ডিং-এ এসেছি, তখন কুরেশি বললে, 'একবার দোতলায় যাবে নাকি ? দেখবার জিনিস আছে কিন্তু। এলেই যখন...'

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যুদ্ধের দামামার মতো শব্দ তুলে তিনজনে ওপরে হাজির হলুম। ল্যান্ডিং পেরিয়ে বৈঠকখানা। একটা শন্‌ শন্‌ মচ্‌ মচ্‌ শব্দ পাচ্ছিলুম, কিন্তু সেটা যে কী সেটা বুঝতে পারছিলুম না।

বৈঠকখানায় ঢুকে প্রচণ্ড চমক।

এ ঘর যে একেবারে আসবাবে ঠাসা ! ভিক্টোরীয় যুগের সোফা, টেবিল, আয়না, মার্বেলের মূর্তি, দেয়ালের বাতি, কার্পেট, ঝাড়লণ্ঠন—কোনওটাই বাদ নেই। মনে হয় ঠিক যেমন ছিল তেমনিই আছে, তবে সব কিছুরই উপর আশি বছরের ধুলো জমে সেগুলোর আসল চেহারা বেমালুম ঢেকে দিয়েছে।

কিন্তু মোক্ষম চমকটা ঘরের মেঝে বা দেয়ালে নয়, সেটা হল সিলিং-এ।

সিলিং-এ দুলছে একটি বিশাল শতচ্ছিন্ন টানা পাখা, যার হাওয়া এই জুন মাসের ঘাম ছুটোনো

গরমে আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু এই পাখা টানছে কে ? আর টানছে কী ভাবে ? কারণ পাখার কোনও দড়ি নেই।

অর্থাৎ সেটাকে টানার কোনও উপায় নেই।

'ভূতের উৎপাত বলে এ ঘরে কেউ প্রবেশ করেনি,' বলল কুরেশি। 'তাই জিনিসগুলোও নিলাম হয়নি। আমি ঘরটা আবিষ্কার করি ভূতের সব ব্যবস্থা করার পর। তারপর ভেবে মনে হল কঙ্কাল আর ট্রেড্‌ল মেশিনে ব্যাপারটা আরও জমবে।'

অবাক বিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলুম অশরীরী পাংখাবরদারের অদৃশ্য হাতে টানা পাখার দিকে। ভূত বলেই তার ক্লান্তি নেই ঘুম নেই, সাহেবের লাথিতে মৃত্যু নেই।

আমরা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছি তখনও বেশ কিছুক্ষণ ধরে শুনতে পেলুম ওই টানাপাখার শব্দ।

কঙ্কাল আর ছাপার কলের ব্যাপারটা কুরেশির কারসাজি জেনে মনে একটা খচখচে গিল্টি ভাব জেগে উঠেছিল ; এখন বুঝতে পারলুম দিব্যি নিশ্চিন্ত লাগছে।

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৮৯

অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু

টিপু ভূগোলের বইটা বন্ধ করে ঘড়ির দিকে দেখল। সাতচল্লিশ মিনিট পড়া হয়ে গেছে একটানা। এখন তিনটে বেজে তেরো মিনিট। এবার যদি ও একটু ঘুরে আসে তা হলে ক্ষতি কী? ঠিক এমনি সময় তো সেদিন লোকটা এসেছিল। সে তো বলেছিল টিপুর দুঃখের কারণ হলে তবে আবার আসবে। তা হলে? কারণ তো হয়েছে। বেশ ভাল রকমই হয়েছে। যাবে নাকি একবার বাইরে?

নাঃ। মা বারান্দায় বেরিয়েছেন কীসের জন্য জানি। হুস করে একটা কাগ তাড়ালেন এক্ষুনি। তারপর ক্যাঁচ শব্দটায় মনে হল বেতের চেয়ারটায় বসলেন। বোধহয় রোদ পোয়াচ্ছেন। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

লোকটার কথা মনে পড়ছে টিপুর। এমন লোক টিপু কোনওদিন দেখেনি। ভীষণ বেঁটে, গোঁফদাড়ি নেই, কিন্তু বাচ্চা নয়। বাচ্চাদের এমন গম্ভীর গলা হয় না। তা হলে লোকটা বুড়ো কী? সেটাও টিপু বুঝতে পারেনি। চামড়া কুঁচকোয়নি কোথাও। গায়ের রঙ চন্দনের সঙ্গে গোলাপি মেশালে যেমন হয় তেমনই। টিপু মনে মনে ওকে গোলাপীবাবু বলেই ডাকে। লোকটার আসল নাম টিপু জানে না। জানতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা বলল, 'কী হবে জেনে? আমার নাম উচ্চারণ করতে তোমার জিভ জড়িয়ে যাবে।'

টিপু বেশ রেগে গিয়েছিল। 'কেন, জড়িয়ে যাবে কেন? আমি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলতে পারি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলতে পারি, এমনকী ফ্লক্সিনসিনিহিলিপিলিফিকেশন বলতে পারি, আর তোমার নাম বলতে পারব না?' তাতে লোকটা বলল, 'একটা জিভে আমার নাম উচ্চারণ হবে না।'

'তোমার বুঝি একটার বেশি জিভ আছে?' জিজ্ঞেস করেছিল টিপু।

'বাংলা বলতে একটার বেশি দরকার হয় না।'

বাড়ির পিছনে যে নেড়া শিরীষ গাছটা আছে, তারই নীচে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। এদিকটা বড় একটা কেউ আসে না। শিরীষ গাছটার পিছনে খোলা মাঠ, তারও পিছনে ধান খেত, আর তারও অনেক, অনেক পিছনে পাহাড়ের সারি। ক'দিন আগেই টিপু এদিকটায় এসে একটা ঝোপের ধারে একটা বেজিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিল। আজ হাতে কিছু পাঁউরুটির টুকরো নিয়ে এসেছিল ঝোপটার

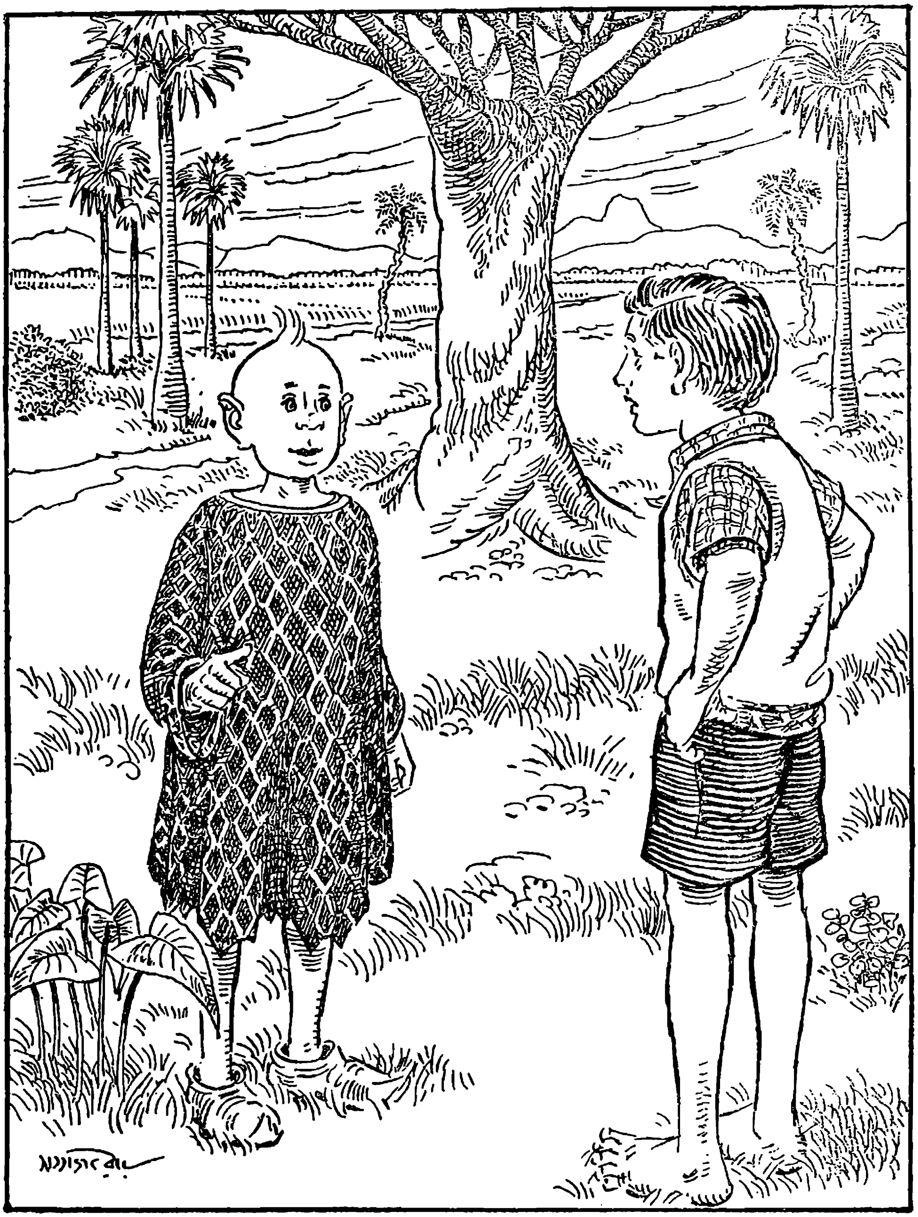

ধারে ছড়িয়ে দেবার জন্য, যদি তার লোভে বেজিটা আবার দেখা দেয়। এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়ল গাছতলায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে। চোখাচুখি হতেই লোকটা ফিক করে হেসে বলল, 'হ্যালো।'

সাহেব নাকি? সাহেব হলে কথা বলে বেশিদূর এগোনো যাবে না, তাই টিপু কিছুক্ষণ কিছু না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার লোকটাই ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার কোনও দুঃখ আছে?'

'দুঃখ?'

'দুঃখ।'

টিপু তো অবাক! এমন প্রশ্ন তাকে কেউ কোনওদিন করেনি। সে বলল, 'কই না তো। দুঃখ তো নেই।'

'ঠিক বলছ?'

'বা রে, ঠিক বলব না কেন?'

'তোমার তো দুঃখ থাকার কথা। হিসেব করে তো তাই বেরোলো।'

'কীরকম দুঃখ? ভেবেছিলাম বেজিটাকে দেখতে পাব, কিন্তু পাচ্ছি না। সেরকম দুঃখ?'

'উঁহুঁ উঁহুঁ। যে-দুঃখে কানের পিছনটা নীল হয়ে যায়, হাতের তেলো শুকিয়ে যায়, সেরকম দুঃখ।'

'মানে ভীষণ দুঃখ?'

'হ্যাঁ।'

'না, সেরকম দুঃখ নেই।'

লোকটা এবার নিজে দুঃখ ভাব করে মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, তা হলে এখনও মুক্তি নেই।'

'মুক্তি?'

'মুক্তি। ফ্রিডম।'

'ফ্রিডম মানে মুক্তি সেটা আমি জানি,' বলল টিপু। 'আমার দুঃখ হলে বুঝি তোমার মুক্তি হবে?'

লোকটা টিপুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলল, 'তোমার বয়স সাড়ে দশ?'

'হ্যাঁ,' বলল টিপু।

'আর নাম শ্রীমান তর্পণ চৌধুরী?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে কোনও ভুল নেই।'

লোকটা যে ওর বিষয়ে এত খবর পেল কোত্থেকে, সেটা টিপু বুঝতে পারল না। টিপু বলল, 'শুধু আমার দুঃখ হলেই তোমার মুক্তি? আর কারুর দুঃখে নয়?'

'দুঃখে মুক্তি নয়, দুঃখ দূর করলে তবে মুক্তি।'

'কিন্তু দুঃখ তো অনেকের আছে। আমাদের বাড়িতে নিকুঞ্জ ভিখিরি এসে একতারা বাজিয়ে গান গায়। সে বলে তার তিন কুলে কেউ নেই। তার তো খুব দুঃখ।'

'তাতে হবে না,' লোকটা মাথা নেড়ে বলল। 'তর্পণ চৌধুরী, বয়স সাড়ে দশ— এখানে তুমি ছাড়া আর কেউ আছে?'

'বোধহয় না।'

'তবে তোমাকেই চাই।'

এবার টিপু একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারল না।

'তুমি কীসের থেকে মুক্তির কথা বলছ? তুমি তো দিব্যি চলেফিরে বেড়াচ্ছ।'

'এটা আমার দেশ নয়। এখানে তো আমায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।'

'কেন?'

'অত জানার কী দরকার তোমার?'

'বা রে, একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হল, আর তার বিষয় জানতে ইচ্ছা করবে না? তুমি কোথায় থাকো, কী করো, কী নাম তোমার, আর কে কে চেনে তোমাকে—সব জানতে ইচ্ছা করছে আমার।'

'অত জানলে জিঞ্জিরিয়া হবে।'

লোকটা আসলে জিঞ্জিরিয়া বলেনি; বলেছিল একটা ভীষণ কঠিন কথা যেটা টিপু চেষ্টা করলেও উচ্চারণ করতে পারবে না। তবে খুব সহজ করে বললে সেটা জিঞ্জিরিয়াই হয়। না জানি কী ব্যারামের কথা বলছে, তাই টিপু আর ঘাঁটাল না। কার কথা মনে হচ্ছে লোকটাকে দেখে? রামখেল তিলক সিং? না কি ঘ্যাঁঘাসুরের সেই একহাত লম্বা লোকটা, যার সঙ্গে মানিকের দেখা হয়েছিল? নাকি স্নো হোয়াইটের সেই সাতটা বামুনের একটা বামুন? টিপু রূপকথার পোকা। তার দাদু প্রতিবারই পুজোয় কলকাতা থেকে আসার সময় তার জন্য তিন-চারখানা করে রূপকথার বই এনে দেন। টিপুর মনটা সে সব পড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী ছত্রিশ পাহাড় পেরিয়ে কোথায় যেন উড়ে

চলে যায়। সে নিজেই হয়ে যায় রাজপুত্তুর—তার মাথায় মুক্তো বসানো পাগড়ি, আর কোমরে হিরে বসানো তলোয়ার। কোনওদিন চলেছে গজমোতির হার আনতে, কোনওদিন ড্র্যাগনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

'গুড বাই।'

সে কী, লোকটা যে চলল!

'কোথায় থাকো তুমি, বললে না?'

লোকটা তার প্রশ্নে কান না দিয়ে শুধু বলল, 'তোমার দুঃখ হলে তখন আবার দেখা হবে।'

'কিন্তু তোমায় খবর দেব কী করে?'

ততক্ষণে লোকটা এক লাফে একটা দেড় মানুষ উঁচু কুলগাছ টপকে হাইজাম্পে ওয়র্লড রেকর্ড করে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এটা প্রায় দেড়মাস আগের ঘটনা। তারপর থেকে লোকটা আর আসেনি। কিন্তু এখন তো আসা দরকার, কারণ টিপুর সত্যিই দুঃখের কারণ হয়েছে। আর সেই কারণ হল তাদের ইস্কুলের নতুন অঙ্কের মাস্টার নরহরিবাবু।

নতুন মাস্টারমশাইকে টিপুর এমনিতেই ভাল লাগেনি। প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকে কিছু বলার আগে প্রায় দু'মিনিট খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সারা ক্লাসের ছাত্রদের উপর যেভাবে চোখ বোলালেন তাতে মনে হয় যেন আগে সকলকে ভস্ম করে তারপর পড়াতে শুরু করবেন। তালগাছের হুসুর মুসুরের মতো এমন ঝাঁটা গোঁফ যে সত্যি-মানুষের হয় সেটা টিপু জানতই না। তার ওপর ওরকম মুখে-হাঁড়িধরা গলার আওয়াজ। ক্লাসের কেউই তো কালা নয়, তা হলে অত হুমকিয়ে কথা বলার দরকার কী?

আসল গোলমালটা হল দু'দিন পরে, বিষ্যুদবারে। দিনটা ছিল মেঘলা, তার উপর পৌষ মাসের শীত। টিফিনের সময় টিপু ক্লাস থেকে না বেরিয়ে নিজের ডেস্কে বসে পড়ছিল ডালিমকুমারের গল্প। কে জানত ঠিক সেই সময়ই অঙ্কের স্যার ক্লাসের পাশ দিয়ে যাবেন, আর তাকে দেখতে পেয়েই ক্লাসে ঢুকে আসবেন?

'ওটা কী বই, তর্পণ?'

স্যারের স্মরণশক্তি যে সাংঘাতিক সেটা বলতেই হবে, কারণ দু'দিনেই সব ছাত্রদের নাম মুখস্থ হয়ে গেছে।

টিপুর বুকটা দুরদুর করলেও, টিফিনে গল্পের বই পড়াটা দোষের নয় মনে করে সে বলল, 'ঠাকুরমার ঝুলি, স্যার।'

'কই দেখি।'

টিপু বইটা দিয়ে দিল স্যারের হাতে। স্যার মিনিট খানেক ধরে সেটা উলটেপালটে দেখে বললেন, 'হাঁউ মাউ কাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ, হিরের গাছে মোতির পাখি, শামুকের পেটে রাজপুত্তুর—এসব কী পড়া হচ্ছে শুনি? যত আজগুবি ধাপ্পাবাজি! এসব পড়লে অঙ্ক মাথায় ঢুকবে কেমন করে, অ্যাঁ?'

'এ গল্প, স্যার,' টিপু কোনওরকমে গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে বলল।

'গল্প? গল্পর তো একটা মাথামুণ্ডু থাকবে, না কি যেমন-তেমন একটা লিখলেই হল?'

টিপু অত সহজে হার মানতে চাইছিল না। বলল, 'রামায়ণেও তো আছে হনুমান জাম্বুমান, আর মহাভারতে বক রাক্ষস আর হিড়িম্বা রাক্ষসী আর আরও কত কী।'

'জ্যাঠামো কোরো না', দাঁত খিঁচিয়ে বললেন নরহরি স্যার। 'ওসব হল মুনিঋষিদের লেখা, দু'হাজার বছর আগে। সে তো গণেশ ঠাকুরেরও—মানুষের গায়ে হাতির মাথা, আর মা দুর্গার দশটা হাত। ও জিনিস আর তোমার এ মনগড়া গাঁজাখুরি গল্প এক জিনিস নয়। তোমরা এখন পড়বে মনীষীদের জীবনী, ভাল ভাল ভ্রমণ কাহিনী, আবিষ্কারের কথা, মানুষ কী করে ছোট থেকে বড় হয়েছে সেইসব কথা। তোমাদের বয়সে বাস্তব কথার দাম হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তোমরা হলে বিংশ শতাব্দীর ছেলে। আদ্যিকালে পল্লীগ্রামে যে জিনিস চলত সে জিনিস আজ শহরে চলবে কী করে? এসব পড়তে হলে পাততাড়ি নিয়ে পাঠশালায় গিয়ে বসতে হবে, আর দুলে দুলে কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া মুখস্থ করতে হবে। সে সব পারবে তুমি?'

টিপু চুপ করে রইল। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত কথা শুনতে হবে, সেটা ও ভাবতে পারেনি।

'ক্লাসে আর কে কে এসব বই পড়ে?' অঙ্ক স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

সত্যি বলতে কি, আর কেউই প্রায় পড়ে না। শীতল একবার টিপুর কাছ থেকে হিন্দুস্থানী উপকথা ধার নিয়ে গিয়েছিল, পরদিনই ফেরত দিয়ে বলল, 'ধুস, এর চেয়ে অরণ্যদেব ঢের ভাল।'

'আর কেউ পড়ে না স্যার', বলল টিপু।

'হুঁ।...তোমার বাবার নাম কী?'

'তারানাথ চৌধুরী।'

'কোথায় থাকো তোমরা?'

'স্টেশন রোড। পাঁচ নম্বর।'

'হুঁ।'

বইটা ঠক করে ডেস্কের উপর ফেলে দিয়ে অঙ্ক স্যার চলে গেলেন।

ইস্কুলের পর টিপু সোজা বাড়ি ফিরল না। স্কুলের পুব দিকে ঘোষদের আমবাগানটা ছাড়িয়ে বিষ্ণুরাম দাসের বাড়ির বাইরে বাঁধা সাদা ঘোড়াটার দিকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইল জামরুল গাছটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। বিষ্ণুরামবাবুর বিড়ির কারখানা আছে। ঘোড়ায় চড়ে কারখানায় যান। বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু এখনও মজবুত শরীর।

টিপু প্রায়ই এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে দেখে, কিন্তু আজ আর কিছু ভাল লাগছিল না। তার মন বলছে অঙ্ক স্যার তার গল্পের বই পড়া বন্ধ করার মতলব করছেন। গল্পের বই না পড়ে সে থাকবে কী করে? সারা বছরের একটা দিনও তার গল্পের বই পড়া বন্ধ থাকে না, আর সবচেয়ে ভাল লাগে ওইসব বইগুলো, যেগুলোকে অঙ্ক স্যার বললেন আজগুবি আর গাঁজাখুরি। কই, ও তো এসব বই পড়েও অঙ্কেতে কোনওদিন খারাপ করেনি! গত পরীক্ষায় পঞ্চাশে চুয়াল্লিশ পেয়েছিল। আর আগের অঙ্কের স্যার ভূদেববাবুর কাছে তো অঙ্কের জন্য কোনওদিন ধমক খেতে হয়নি!

শীতকালের দিন ছোট বলে এমনিতেই টিপু এবার বাড়ি ফিরবে ভাবছিল, এমন সময় একটা ব্যাপার দেখে ঝট করে গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিতে হল।

অঙ্ক স্যার নরহরিবাবু বই ছাতা বগলে এদিকেই আসছেন।

তা হলে কি ওঁর বাড়ি এইদিকেই? বিষ্ণুরামবাবুর বাড়ির পরে আরও গোটা পাঁচেক বাড়ি আছে অবিশ্যি এ রাস্তায়। তারপরেই হামলাটুনির মাঠ। ওই মাঠের পুব দিকে এককালে রেশমের কুঠি ছিল। হ্যামিলটন সাহেব ছিলেন তার ম্যানেজার। ভয়ংকর কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন তিনি। বত্রিশ বছর ম্যানেজারি করে কুঠির পাশেই তাঁর বাংলোতে মারা যান। তাঁর নামেই ওই মাঠের নাম হয়ে গেছে হামলাটুনির মাঠ।

আলো পড়ে আসা পৌষ মাসের বিকেলে জামরুল গাছের আড়াল থেকে ও দেখছে নরহরি স্যারকে। ভারী অবাক লাগছে তাঁর হাবভাব দেখে। স্যার এখন বিষ্ণুরামবাবুর ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ঠোঁট ছুঁচোলো করে চুক চুক করে ঘোড়ার কাঁধে হাত বুলোচ্ছেন।

এমন সময় খুট করে বাড়ির সদর দরজা খোলার শব্দ হল, আর বিষ্ণুরামবাবু নিজেই চুরুট হাতে বেরিয়ে এলেন।

'নমস্কার।'

ঘোড়ার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে অঙ্ক স্যার বিষ্ণুরামবাবুর দিকে ফিরলেন। বিষ্ণুরামবাবুও নমস্কার করে বললেন, 'এক হাত হবে নাকি?'

'সেইজন্যেই তো আসা', বললেন অঙ্ক স্যার। তার মানে অঙ্ক স্যার দাবা খেলেন। বিষ্ণুরামবাবু যে খেলেন সেটা টিপু জানে। অঙ্ক স্যার এবার বললেন, 'দিব্যি ঘোড়াটি আপনার। পেলেন কোত্থেকে?'

'কলকাতা। শোভাবাজারের দ্বারিক মিত্তিরের ছিল ঘোড়াটা। ওঁর কাছ থেকেই কেনা। রেসের মাঠে ছুটেছে এককালে। নাম ছিল পেগ্যাসাস।'

পেগ্যাসাস? নামটা যেন চেনা চেনা মনে হল টিপুর, কিন্তু কোথায় শুনেছে মনে করতে পারল না।

'পেগ্যাসাস' বললেন অঙ্ক স্যার। 'কিম্ভূত নাম তো মশাই!'

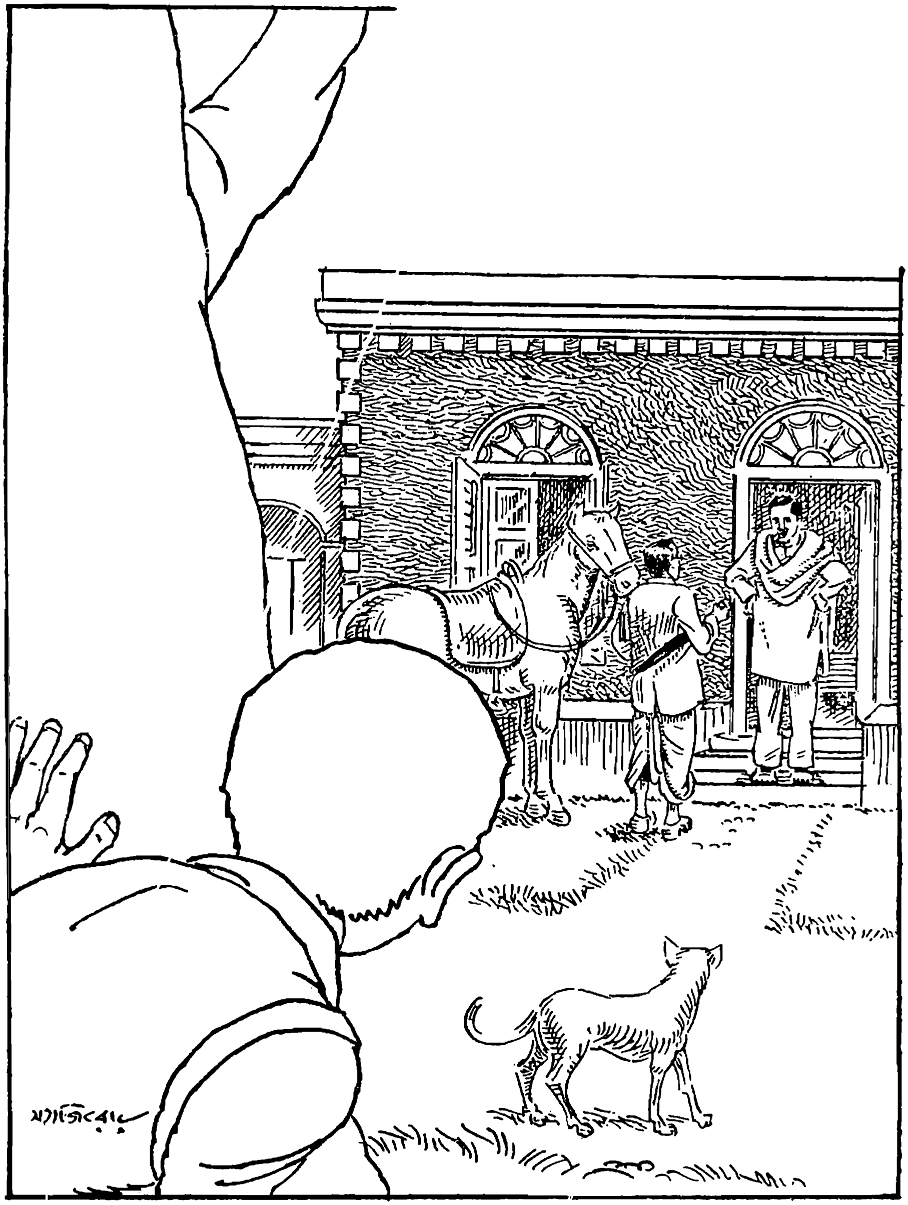

'ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার ওইরকমই নাম হয়। হ্যাপি বার্থডে, শোভান আল্লা, ফরগেট-মি-নট...'
'আপনি চড়েন এ ঘোড়া?'
'চড়ি বইকী। তালেবর ঘোড়া। একটি দিনের জন্যও বিগড়োয়নি।'
অঙ্ক স্যার চেয়ে আছেন ঘোড়াটার দিকে। বললেন, 'আমি এককালে খুব চড়িছি ঘোড়া।'
'বটে?'
'তখন আমরা শেরপুরে। বাবা ছিলেন ডাক্তার। ঘোড়ায় চেপে রুগি দেখতে যেতেন। আমি তখন ইস্কুলে পড়ি। সুযোগ পেলেই চড়তুম। ওঃ, সে কি আজকের কথা!'

'চড়ে দেখবেন এটা?'
'চড়ব?'
'চড়ুন না!'
টিপু অবাক হয়ে দেখল অঙ্ক স্যার হাত থেকে বই ছাতা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে ঘোড়ার দড়িটা খুলে এক ঝটকায় সেটার পিঠে চড়ে বসলেন। তারপর বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পাশে দু'বার চাপ দিতেই সেটা খট খট করে চলতে আরম্ভ করল।
'দেখবেন, বেশিদূর যাবেন না', বললেন বিষ্ণুরামবাবু।
'আপনি ঘুঁটি সাজান গিয়ে', বললেন অঙ্ক স্যার, 'আমি খানিকদূর গিয়েই ঘুরে আসছি।'
টিপু আর থামল না। আজ একটা দিন গেল বটে!
কিন্তু ঘটনার শেষ এখানেই নয়।
তখন সন্ধ্যা সাতটা। টিপু পরের দিনের পড়া শেষ করে সবে ভাবছে এবার গল্পের বইটা খুলবে কিনা, এমন সময় বাবা ডাক দিলেন নীচে থেকে।
টিপু নীচে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখে নরহরি স্যার বসে আছেন বাবার সঙ্গে। টিপুর রক্ত হিম হয়ে গেল। বাবা বললেন, 'তোমার দাদুর দেওয়া যে বইগুলো রয়েছে সেগুলো ইনি একবার দেখতে চাইছেন। যাও তো, নিয়ে এসো গিয়ে।'
টিপু নিয়ে এল। সাতাশখানা বই। তিন খেপে আনতে হল।
অঙ্ক স্যার ঝাড়া দশ মিনিট ধরে বইগুলো দেখলেন। মাঝে মাঝে মাথা নাড়েন আর হুঁ করে একটা শব্দ করেন। তারপর বইগুলো রেখে দিয়ে বললেন—'দেখুন মিস্টার চৌধুরী, আমি যেটা বলছি সেটা আমার অনেকদিনের চিন্তা-গবেষণার ফল। ফেয়ারি টেইল বলুন আর রূপকথাই বলুন আর উপকথাই বলুন, এর ফল হচ্ছে একই—ছেলেমেয়েদের মনে কুসংস্কারের বীজ বপন করা। শিশুমনকে যা বোঝাবেন তাই তারা বুঝবে। সেখানে আমাদের বড়দের দায়িত্বটা কতখানি সেটা একবার ভেবে দেখুন! আমরা কি তাদের বোঝাব, বোয়াল মাছের পেটে থাকে মানুষের প্রাণ?—যেখানে আসল কথাটা হচ্ছে যে প্রাণ থাকে মানুষের হৃৎপিণ্ডে—তার বাইরে কোথাও থাকতে পারে না, থাকা সম্ভব নয়।'
বাবা পুরোপুরি কথাটা মানছেন কিনা সেটা টিপু বুঝতে না পারলেও, এটা সে জানে যে, ইস্কুলের মাস্টারদের কথা যে মেনে চলতে হয়, এটা তিনি বিশ্বাস করেন। 'ছেলেবয়সটা মেনে চলারই বয়স, টিপু', একথা বাবা অনেকবার বলেছেন। 'বিশেষ করে গুরুজনদের কথা মানতেই হবে। নিজের ইচ্ছেমতো সবকিছু করার বয়সও আছে একটা, কিন্তু সেটা পড়াশুনো শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর। তখন তোমাকে কেউ বলবে না এটা করো, ওটা করো। বা বললেও, সেখানে তোমার নিজের মতটা দেবার অধিকার আছে। কিন্তু সেটা এখন নয়।'
'আপনার বাড়িতে অন্য ধরনের শিশুপাঠ্য বই নেই?' জিজ্ঞেস করলেন নরহরি স্যার।
'আছে বইকী,' বললেন বাবা। 'আমার বুক শেলফেই আছে। আমার ইস্কুলে প্রাইজ পাওয়া বই। টিপু তুই দেখিসনি?'
'সব পড়া হয়ে গেছে বাবা', বলল টিপু।
'সবগুলো?'
'সবগুলো। বিদ্যাসাগরের জীবনী, সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী, ক্যাপ্টেন স্কটের দক্ষিণ মেরু অভিযান, মাঙ্গো পার্কের আফ্রিকা ভ্রমণ, ইস্পাতের কথা, আকাশযানের কথা...। প্রাইজ আর কটাই বা পেয়েছ বাবা?'
'তা বেশ তো', বললেন বাবা। 'নতুন বই এনে দেওয়া যাবেখন।'
'আপনি এখানে তীর্থঙ্কর বুক স্টলে বললে ওরা কলকাতা থেকে আনিয়ে দেবে বই', বললেন অঙ্ক স্যার, 'সেইসবই তুমি পড়বে এবার থেকে, তর্পণ। এগুলো বন্ধ।'
এগুলো বন্ধ। ওই দুটো কথায় যেন এক মুহূর্তে পৃথিবীটা টিপুর চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল। এগুলো বন্ধ!
আর বন্ধ যাতে হয় তার জন্য বাবাও অঙ্ক স্যারের থেকে নিয়ে বইগুলো তাঁর আলমারির তাকে ভরে

ফেলে চাবিবন্ধ করে দিলেন।

মা অবিশ্যি ব্যাপারটা শুনে বেশ খানিকক্ষণ গজর গজর করেছিলেন। খাবার সময় একবার তো বলে ফেললেন, 'যে লোক এমন কথা বলতে পারে তাকে মাস্টার করে রাখা কেন বাপু?'

বাবা পরপর তিনবার উঁহুঁ বলে মা-কে থামিয়ে দিলেন।—'তুমি বুঝছ না। উনি যা বলছেন টিপুর ভালর জন্যই বলছেন।'

'ছাই বলছেন।' তারপর টিপুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুই ভাবিসনে রে। আমি বলব তোকে গল্প। তোর দিদিমার কাছ থেকে অনেক গল্প শুনেছি ছেলেবেলায়। সব তো আর ভুলিনি।'

টিপু কিছু বলল না। মুশকিল হচ্ছে কি, মা-র কাছে টিপু এককালে অনেক গল্পই শুনেছে। তার বাইরে মা আর কিছু জানেন বলে মনে হয় না। আর জানলেও, বই পড়ার মজা মুখে শোনা গল্পে নেই। বইয়ে ডুবে যাওয়া একটা আলাদা ব্যাপার। সেখানে শুধু গল্প আর তুমি—মাঝখানে কেউ নেই। সেটা মা-কে বোঝাবে কী করে?

আরও দু'দিন গেল টিপুর বুঝতে যে, এবার সত্যি-সত্যিই সে দুঃখ পাচ্ছে। গোলাপীবাবু যে দুঃখের কথা বলেছিলেন, এটা সেই দুঃখ। এবার এক উনিই যদি কিছু করতে পারেন।

আজ রবিবার। বাবা ঘুমোচ্ছেন। মা বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকে সেলাই-এর কল চালাচ্ছেন। এখন বেজেছে সাড়ে তিনটে। এখন একবার পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া যেতে পারে। লোকটা যে কেন বলে গেল না সে কোথায় থাকে! সে না এলে টিপু সটান তার বাড়িতে চলে যেতে পারত।

টিপু পা টিপে টিপে একতলায় নেমে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

চারদিকে রোদ ঝলমল করছে, কিন্তু তাও বেশ শীত শীত ভাব। দূরে ধানখেতে সোনালি রঙ ধরে আছে পাহাড়ের লাইন অবধি। একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে একটানা, আর চিড়িক চিড়িক শব্দটা নিশ্চয়ই ওই শিরীষ গাছের বাসিন্দা কোনও একটা কাঠবেড়ালি করছে।

'হ্যালো।'

আরে! কী আশ্চর্য! কখন যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে গাছতলায়, সেটা টিপু দেখতেই পায়নি!

'তোমার কানের পিছনে নীল রঙ, হাতের তেলো খসখসে, বুঝতেই পারছি তোমার দুঃখের কারণ ঘটেছে।'

'তা ঘটেছে বইকী!'

লোকটা এগিয়ে আসছে টিপুর দিকে। আবার সেই পোশাক। আবার মাথার চুলগুলো ফৎফৎ করে ঝুঁটির মতো উড়ছে বাতাসে।

'কী ঘটেছে সেটা বলতে হবে তো, নইলে আমি কিংকর্তব্যমতিত্ব।'

টিপুর হাসি পেলেও, লোকটাকে শুধরোবার চেষ্টা না করে অঙ্ক স্যারের পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে ফেলল। বলতে বলতে চোখে জল এসে গেলেও মনের জোরে নিজেকে সামলে নিল টিপু।

'হুঁ', বলে লোকটা ষোলোবার ধীরে ধীরে মাথা উপর-নীচ করল। টিপু ভেবেছিল আর থামবেই না; আর সেইসঙ্গে এও মনে হয়েছিল যে, লোকটা হয়তো কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। যদি না পায় তা হলে যে কী দশা হবে সেটা ভেবে টিপুর আবার চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটা মাথা নাড়া থামিয়ে আবার 'হুঁ' বলাতে টিপুর ধড়ে প্রাণ এল।

'তুমি কিছু করতে পারবে কী?' টিপু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ভেবে দেখতে হবে। পাকস্থলীটা খাটাতে হবে।'

'পাকস্থলী? কেন, তোমরা মাথা খাটাও না বুঝি?'

লোকটা কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোমার এই নরহরি স্যারকে কাল দেখলাম না মাঠে ঘোড়া চড়তে?'

'কোন মাঠে? হামলাটুনির মাঠে?'

'যে মাঠে ভাঙা বাড়িটা আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি কি সেইখানেই থাকো?'

'ওই ভাঙা বাড়িটার পিছনেই আমার ট্রিডিঙ্গিপিডিটা রয়েছে।'

টিপু কথাটা ঠিক করে শোনেনি নিশ্চয়ই। তবে শুনলেও সেটা যে তার জিভ দিয়ে কিছুতেই বেরোত না সেটা সে জানে।

লোকটা এখনও আছে, আর আবার মাথাটা উপর-নীচ করতে আরম্ভ করেছে।

এবার একত্রিশবার নাড়াবার পর মাথা থামিয়ে লোকটা বলল, 'আজ ফুল মুন। তুমি যদি ব্যাপারটা দেখতে চাও, তা হলে চাঁদ যখন মাঠের মাঝখানের খেজুর গাছটার ঠিক মাথায় আসবে তখন মাঠে এসে যেও। আড়ালে থেকো; কেউ যেন দেখে না ফেলে। তারপর দেখা যাক কী করা যায়।'

টিপুর হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় ঢুকে তাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিল।

'তুমি অঙ্ক স্যারকে মেরে-টেরে ফেলবে না তো?'

এই প্রথম লোকটাকে হো হো করে হাসতে দেখল টিপু, আর সেইসঙ্গে দেখল লোকটার মুখের ভিতর একটার উপর আরেকটা জিভ। আর দেখল যে, লোকটার দাঁত বলে কিছু নেই।

'মেরে ফেলব?'—লোকটা কোনওরকমে হাসি থামাল।—'উঁহু। আমরা কাউকে মারি-টারি না। একজনকে চিমটি কাটার কথা ভেবেছিলাম বলেই তো আমার নির্বাসন। প্রথম ছক কেটে বেরোলো পৃথিবীর নাম, সেখানে হবে নির্বাসন; তারপর ছক কেটে বেরোলো এই শহরের নাম; তারপর তোমার নাম। তোমার দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েই মুক্তি।'

'ঠিক আছে, তা হলে—'

লোকটা সেদিনের মতোই টিপুর কথা শেষ হবার আগেই কুলগাছের উপর দিয়ে হাই জাম্প করে হাওয়া।

টিপুর শরীরের ভিতরে সেই যে মিহি কাঁপুনি শুরু হল সেটা রইল রাত অবধি। আশ্চর্য কপাল,—আজ মা বাবা দু'জনেই রাত্রে নেমন্তন্ন খেতে যাবেন সুশীলবাবুদের বাড়ি। সুশীলবাবুর নাতির মুখে ভাত। টিপুরও নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু সামনে পরীক্ষা, তাই মা নিজেই বললেন, 'তোর আর গিয়ে কাজ নেই। বাড়িতে বসে পড়াশুনা কর।'

সাড়ে সাতটায় মা-বাবা বেরিয়ে গেলেন। টিপু পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে পুব দিকটা হলদে হতে শুরু করেছে দেখে বেরিয়ে পড়ল।

ইস্কুলের পিছনের শর্টকাটটা দিয়ে বিষ্ণুরামবাবুদের বাড়ি পৌঁছতে লাগল মিনিট দশেক। ঘোড়াটা নেই। টিপুর ধারণা, ওটা বাড়ির পিছন দিকে আস্তাবলে থাকে। সামনের বৈঠকখানার জানলা দিয়ে আলো রাস্তায় এসে পড়েছে, ঘরের ভিতর চুরুটের ধোঁয়া।

'কিস্তি।'

অঙ্ক স্যারের গলা। দাবা খেলছেন বিষ্ণুরামবাবুর সঙ্গে। তা হলে কি আজ ঘোড়া চড়বেন না? সেটা জানার কোনও উপায় নেই। লোকটা কিন্তু বলেছে হামলাটুনির মাঠে যেতে। টিপু যা থাকে কপালে করে সেইদিকেই রওনা দিল।

ওই যে পূর্ণিমার চাঁদ। এখনও সোনালি, রুপোলি হবে আরও পরে। নেড়া খেজুর গাছটার মাথায় পৌঁছতে এখনও মিনিট দশেক দেরি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না যাকে বলে সেটা হতে আরও সময় লাগবে, তবে একটা ফিকে আলো চারদিক ছেয়ে আছে। তাতে গাছপালা ঝোপঝাড় সবই বোঝা যাচ্ছে। ওই যে দূরে ভাঙা কুঠিবাড়ি। ওর পিছনে কোথায় থাকে লোকটা?

টিপু একটা ঝোপের পিছনে গিয়ে অপেক্ষা করার জন্য তৈরি হল। তার প্যান্টের পকেটে খবরের কাগজে মোড়া একটুকরো পাটালি গুড়। টিপু তার খানিকটা মুখে পুরে চিবোতে লাগল। শেয়াল ডাকছে দূরের বন থেকে। আকাশ দিয়ে যে কালো জিনিসটা উড়ে গেল সেটা নিশ্চয়ই পেঁচা। গরম কোটের উপর একটা খয়েরি চাদর জড়িয়ে নিয়েছে টিপু। তাতে গা ঢাকা দেওয়ার সুবিধে হবে, শীতটাও বাগে আসবে।

আটটা বাজার যে শব্দটা এল দূর থেকে, সেটা নিশ্চয়ই বিষ্ণুরামবাবুদের ঘড়ির শব্দ।

আর তারপরেই টিপু শুনতে পেল—খটমট-খটমট-খটমট-খটমট...

ঘোড়া আসছে।

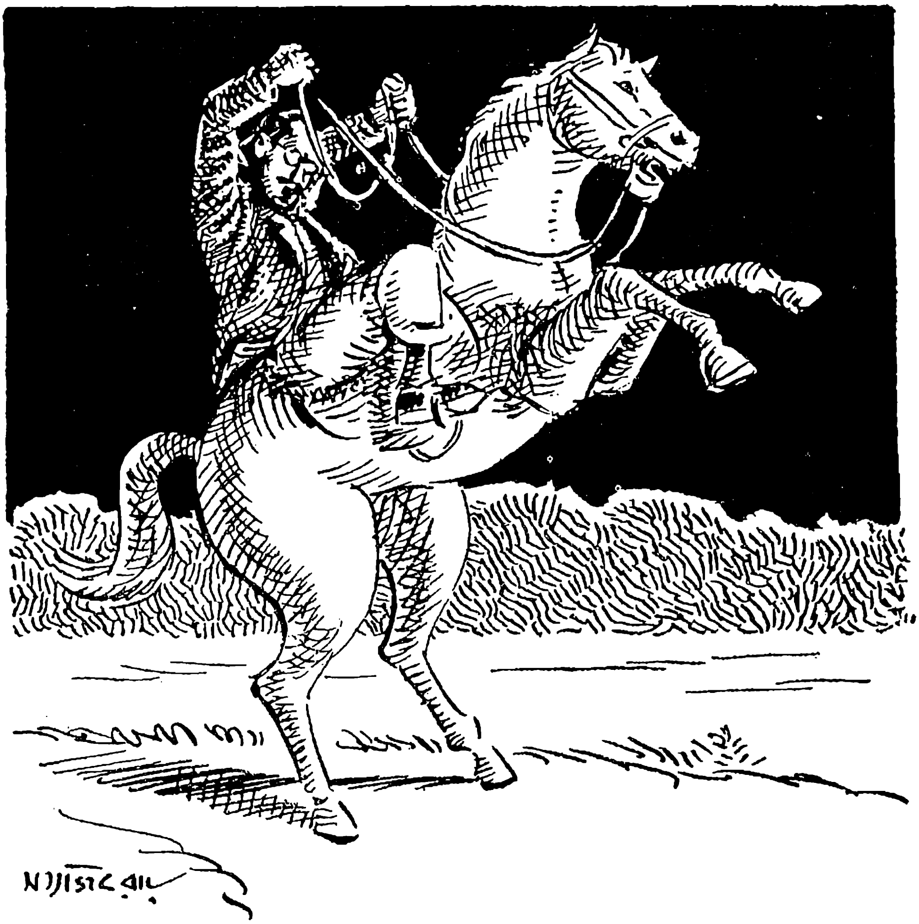

টিপু ঝোপের পাশ দিয়ে মাথাটা বার করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মোড়ের দিকে।

হ্যাঁ, ঘোড়া তো বটেই, আর তার পিঠে নরহরি স্যার।

কিন্তু ঠিক এই সময় ঘটে গেল একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। একটা মশা কিছুক্ষণ থেকেই টিপুর কানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল, টিপু হাত চালিয়ে চালিয়ে সেটাকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু হঠাৎ সেটা সুড়ুৎ করে ঢুকল গিয়ে তার নাকের ভিতর।

দু' আঙুল দিয়ে নাক টিপে যে হাঁচি চাপা যায় সেটা টিপু আগে পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু এখন নাক টিপলে মশাটা আর বেরোবে না মনে করে সে হাঁচিটা আসতে দিল, আর তার শব্দটা খোলা মাঠের শীতের রাতের থমথমে ভাবটাকে একেবারে খানখান করে দিল।

ঘোড়া থেমে গেছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল টিপুর উপর।

'তর্পণ!'

টিপুর হাত পা অবশ হয়ে গেছে। সে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ছি ছি ছি! এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটা ভেস্তে দেওয়াতে লোকটা না জানি কী মনে করছে!

ঘোড়াটা এগিয়ে আসছিল তারই দিকে, পিঠে অঙ্ক স্যার, কিন্তু এমন সময় স্যারকে প্রায় পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ঘোড়াটা সামনের পা দুটো তুলে একটা আকাশচেরা চিঁহিহি ডাক ছেড়ে এক লাফে রাস্তা থেকে মাঠে গিয়ে পড়ল।

আর তারপরেই টিপুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, দেখে যে ঘোড়া আর মাটিতে নেই।

ঘোড়ার দু'দিকে দুটো ডানা। সেই ডানায় ঢেউ তুলে ঘোড়া আকাশে উড়তে লেগেছে, অঙ্ক স্যার উপুড় হয়ে ঘোড়ার পিঠ জাপটে ধরে আছেন, তাঁর জ্বলন্ত টর্চ হাত থেকে পড়ে গেছে রাস্তায়। চাঁদ এখন খেজুরগাছের মাথায়, জ্যোৎস্না এখন ফুটফুটে, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে অঙ্ক স্যারকে পিঠে নিয়ে বিষ্ণুরাম দাসের ঘোড়া আকাশভরা তারার দিকে উড়তে উড়তে ক্রমশই ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে।

পেগ্যাসাস!

ধাঁ করে টিপুর মনে পড়ে গেল।

গ্রিসের উপকথা। রাক্ষসী মেডুসা—তার মাথায় চুলের বদলে হাজার বিষাক্ত সাপ, তাকে দেখলে মানুষ পাথর হয়ে যায়—তরোয়াল দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলল বীর পারসিয়ুস, আর মেডুসার রক্ত থেকে জন্ম নিল পক্ষিরাজ পেগাসাস।

'তুমি বাড়ি যাও, তর্পণ।'

পাশে দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত লোকটা, চাঁদের আলো তার মাথার সোনালি ঝুঁটিতে।—'এভরিথিং ইজ অল রাইট।'

তিনদিন হাসপাতালে ছিলেন অঙ্ক স্যার। শরীরে কোনও জখম নেই, খালি মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন, জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেন না।

চারদিনের দিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অঙ্ক স্যার টিপুদের বাড়িতে এলেন। বাবার সঙ্গে কী কথা হল সেটা টিপু জানে না। অঙ্ক স্যার চলে যাবার পরেই বাবা টিপুকে ডাকলেন।

'ইয়ে, তোর বইগুলো নিয়ে যা আমার আলমারি থেকে। উনি বললেন ওসব গল্পে ওঁর আপত্তি নেই।'

সেই লোকটাকে আর দেখেনি টিপু। তার খোঁজে একদিন গিয়েছিল কুঠিবাড়ির পিছনটায়। পথে যেতে দেখেছে বিষ্ণুরামবাবুর ঘোড়া যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু কুঠিবাড়ির পিছনে কিচ্ছু নেই।

শুধু একটা গিরগিটি দেখতে পেয়েছিল টিপু, যেটার রঙ একদম গোলাপী।

সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৮৯

শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত

'আমার এখন যে চেহারা দেখছিস,' বললেন তারিণীখুড়ো, 'তা থেকে আমার ইয়াং বয়সের চেহারা তোরা কল্পনাই করতে পারবি না।'

'কীরকম চেহারা ছিল আপনার, খুড়ো?' জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা, 'ধর্মেন্দরের মতো?'

'য্যা য্যাঃ!' বললেন খুড়ো, 'ওরকম নাসপাতিমার্কা চেহারা নয়। টক্‌টকে রং, ব্যায়াম করা পাকানো শরীর, জামা খুললে প্রত্যেকটি মাস্‌ল আঙুল দিয়ে দেখানো যায়—অ্যানাটমির চার্টের দরকার হয় না।—আর ফিল্ম স্টারের কথা কী বলছিস? কত অফার পেয়েছে জানিস খুড়ো হিরো হবার জন্যে?'

'ইস্—আর আপনি নিলেন না?' বলল ন্যাপলা। 'আবিশ্যি তখন তো বোধহয় সাইলেন্ট ছবি, তাই না?'

'কে বললে সাইলেন্ট? আমি বলছি স্বাধীনতার কয়েক বছর আগের কথা। সাইলেন্ট ছবি তো ফুরিয়ে গেছে ত্রিশ সনের কিছু পরেই।'

'আপনি রিফিউজ করলেন?'

'আলবাৎ! একবার একটা ছবিতে করতে হয়েছিল, তবে সেটা অন্য গল্প, আরেকদিন বলব। আসলে ফিল্মের হিরো হবার শখ আমার ছিল না। আমি চেয়েছিলাম আমার গোটা জীবনটাই হবে একটা সিনেমার গপ্‌পো। একটা খাঁটি নির্ভেজাল অ্যাডভেঞ্চার। অথবা বলতে পারিস একটা সিরিজ অফ অ্যাডভেঞ্চার্স। রঙ মেখে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াব, ডিরেক্টরমশাই ডুগডুগি বাজাবেন, আর আমি নাচব—এ-শর্মা সে-শর্মা নয়।'

'আজ কোন অ্যাডভেঞ্চারের বিষয় বলবেন, মিস্টার শর্মা?' জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা। খুড়োকে এ ধরনের কথা বলার সাহস একমাত্র ন্যাপলারই আছে, তবে সেটা খুড়ো বিশেষ মাইন্ড করেন বলে মনে হয় না। বাইরে একটা খিটখিটে ভাব দেখালেও আসলে ওঁর মনটা নরম এটা জানতাম। বেনেটোলা থেকে টালিগঞ্জে আসেন যে শুধু আমাদের গল্প শোনাবার জন্যই এটা তো মিথ্যে নয়।

দুধ-চিনি ছাড়া চায়ে পর পর দুটো চুমুক দিয়ে খুড়ো বললেন, 'নাইনটিন ফর্টি-ফোরে আজমীর, তখন আমার বয়স আটাশ।'

আমরা পাঁচজন—আমি, ভুলু, চটপটি, সুনন্দ আর ন্যাপলা—গল্পের জন্য রেডি হয়ে বসলাম। চা শেষ করে একটা একসপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ি ধরিয়ে খুড়ো আরম্ভ করলেন।

আগ্রায় একটা ব্যাঙ্কের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল ধরণীকাকার কথা। আমার বাবার মাসতুতো ভাই। তিনি জয়পুরে হোমিওপ্যাথি করে বেশ পসার জমিয়ে বসেছেন। রাজস্থানটা দেখা হয়নি, অথচ ছেলেবেলা থেকেই ও-দেশটার উপর একটা আকর্ষণ রয়েছে। মনে হয় ভারতবর্ষে ওটাই হস সত্যিকারের রোম্যান্স ও অ্যাডভেঞ্চারের ঘাঁটি। চলে গেলুম কাকার কাছে।

আমি বেকার জেনে কাকার ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'তোর মতো একজন জোয়ান ছেলে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আজমীর যাবি?' বললুম, 'কী আছে সেখানে?' কাকা বললেন, 'শেঠ গঙ্গারাম আমার পেশেন্ট। পেটের আলসারে ভুগত, আমার ওষুধে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। তার একজন ইংরিজি জানা সেক্রেটারি দরকার। তোর তো ইংরিজিতে অনার্স ছিল। যদি চাস তো তোকে রেকমেন্ড করে দিতে পারি।'

কখন কী কাজে দরকার পড়ে, তাই টাইপিংটা আগেই শেখা ছিল। কাজেই সেক্রেটারির চাকরির পক্ষে আমি অনুপযুক্ত নই। তবু লোকটার সম্বন্ধে একটু ডিটেল জানা দরকার বলে প্রশ্ন করলুম, 'কী করেন গঙ্গারাম?' গঙ্গারাম বললেই উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে—মনে পড়ে যায়।

কাকা বললেন, 'গঙ্গারাম মস্ত ধনী। হিরে জহরতের কারবার। বিদেশে করেসপন্ডেন্স চালাতে হয়। যে সেক্রেটারি ছিল সে নাকি বিয়ে করার নাম করে সেই যে গেছে আর আসেনি।'

'বস হিসেবে গঙ্গারাম কি—?'

'কোনও গোলমাল নেই। তবে ওর একটা ছেলে আছে বছর বারো বয়স, সে নাকি একটি মূর্তিমান বিচ্ছু। সে যদি কিছু করে থাকে।'

আমি বললাম, 'কুছ পরোয়া নেহি। যে ছেলের এখনও গোঁফ গজাবার বয়স হয়নি তাকে আবার ভয় কীসের? ও আমি সামলে নেব।'

'তা হলে আর কী, লেগে পড়। আমি গঙ্গারামকে লিখে দিচ্ছি। আমার রিকোয়েস্ট ও ঠেলতে পারবে না।'

কাকার এক চিঠিতেই গঙ্গারাম রাজি, লিখলেন 'সেন্ড ইওর নেফিউ ইমিডিয়েটলি।' একবার অম্বর প্যালেসটায় ঢুঁ মেরে জয়পুর থেকে চলে গেলাম মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান আজমীরে। আকবর একটা প্রাসাদ বানিয়েছিলেন এই শহরে। আজমীর থেকে সাত মাইল পশ্চিমে হিন্দুদের তীর্থস্থান পুষ্কর। সব মিলিয়ে যাকে বলে ঐতিহ্যে মহীয়ান।

প্রথম রাতটায় থাকলাম সার্কিট হাউসে। কাকাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আনাসাগর নামে বিরাট

লেকের ধারে এমন সার্কিট হাউস ভারতবর্ষে আর দুটি আছে কি না সন্দেহ। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে যে দৃশ্য দেখলুম তা জীবনে ভুলব না। হাজার হাঁস চরে বেড়াচ্ছে লেকে, পশ্চিমে তারাগড় পাহাড়, তার পিছনে টেকনিকালার ছবির মতো সানসেট হচ্ছে।

শেঠ গঙ্গারাম গদি এবং বাসস্থান শহরের মধ্যিখানে হলেও, বাড়ির ভেতরে একবার ঢুকে পড়লে সেটা আর বোঝার জো থাকে না। সাতাশ বিঘে জমির ওপর বাড়ি। আর সেটাকে ঘিরে দুর্গের মতো পাঁচিল। আড়াই শো বছরের সোনাদানার ব্যবসা। ঘরে কত যে মহামূল্য রত্ন আর গয়নাগাটি আছে তার হিসেব নেই। সেই জন্যেই এই পাঁচিলের ব্যবস্থা—যদিও তাতেও যে ষোলো আনা সেফ্‌টি হয় না সেটা পরে বুঝেছিলাম, তবে সে কথা যথাস্থানে প্রকাশ্য।

গঙ্গারামের সঙ্গে সকালে গদিতে দেখা করলুম। ভদ্রলোকের বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি, ঘি খাওয়া নধর পরিপুষ্ট চেহারা, একবার বসে পড়লে উঠতে গেলে পাশের লোককে হাত ধরে হেল্‌প করতে হয়। আমায় দেখে প্রথম প্রশ্ন হল 'আর ইউ এ বেঙ্গলি?'

এ প্রশ্নের অবশ্যি একটা কারণ আছে। সেটা এখানে বলি।

আগ্রায় থাকতে একদিন ব্যাঙ্কে এক খদ্দের আসে। ভদ্রলোকের চেহারা এমনিতেই ভাল, তার উপর এক জোড়া তাগড়াই গোঁফ তাতে এমন এক পার্সোন্যালিটি এনে দিয়েছে যে দেখেই ডিসাইড করলুম ও জিনিস আমারও চাই।

আড়াই মাস লেগেছিল গোঁফের ওই শেপ নিতে। মাঝখানটা ভরাট আর পুরু। আর দুটো পাশ যেন দুটো হাতির শুঁড় সেলাম ঠুকছে। কলকাতার বাঙালিদের মধ্যে থেকে গোঁফ জিনিসটা তখন প্রায় উঠে গেছে, কিন্তু পশ্চিমে অনেকেই ওটার খুব তোয়াজ করে। আর রাজস্থানে তো কথাই নেই।

শেঠজিকে বললুম যে আমি বঙ্গসন্তানই বটে—গোঁফটা নেহাত শখের ব্যাপার।

ইংরিজিটা তো মোটামুটি বলতেই পারতুম, দু-বছর আগ্রায় থেকে হিন্দিটাও সড়গড় হয়ে গেস্‌ল। তার উপর আদব কায়দাগুলো রপ্ত, স্বাস্থ্য ভাল, সব মিলিয়ে গঙ্গারাম খুশিই হলেন। বললেন, 'আমার বাড়িতেই তুমি থাকবে। সকালে বিকেলে আমার কাজ করবে, দুপুরটা আমি ঘুমোই, আর সন্ধ্যেটা তুমি আমার ছেলের টিউশনি করবে। ছেলে চালাক, তবে পড়াশুনোয় মন নেই, ভারী দুরন্ত, সঙ্গদোষে নষ্ট না হয় সেটা তোমাকে দেখতে হবে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি তোমাকে দেব। তবে একটা কথা—আমরা নিরামিষ খাই। মাছ, মাংস খেতে চাইলে তোমাকে বাইরে গিয়ে খেতে হবে। অবিশ্যি শাক-সবজি ফলমূল দুধ-মিষ্টিতে যদি তোমার অরুচি না হয় তা হলে বাইরে যাবার কোনও দরকার হবে বলে মনে করি না।'

নিরামিষ শুনে গোড়ায় মনটা দমে গেস্‌ল, কিন্তু শেঠজির বাড়ির নিরামিষ রান্না এমনই সুস্বাদু, আর বাড়ির গোরুর খাঁটি দুধের মালাই-বালাইয়ের এমনই কোয়ালিটি যে মাছ-মাংসের অভাব মিটিয়ে দিয়েছিল।

গঙ্গারামের সবসুদ্ধ সাত ছেলে। তার মধ্যে দুটি অল্প বয়সেই মারা গেছে, দুটি আর্মিতে, দুটি বাপের ব্যবসায় যোগ দিয়েছে আর ছোটটি হলেন শ্রীমান মহাবীর বিচ্ছু। আমার সঙ্গে কথা বলে গঙ্গারাম ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে পর 'ইনি তোমার নতুন মাস্টর' বলে আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'যাও, এঁকে এঁর ঘর দেখিয়ে দিয়ে এসো।'

এমন অস্থির চোখের দৃষ্টি আমি কোনও ছেলের মধ্যে দেখিনি, আর সেই সঙ্গে এমন তীক্ষ্ণ ঝিলিক। সে যে বিচ্ছু তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বুদ্ধিও যে বেশ ধারালো সেটা বোঝা যায়।

গদি থেকে বাড়ির ভিতর ঢুকে একটা প্রকাণ্ড উঠোন পেরিয়ে একটা প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে আরেকটা উঠোনে পৌঁছলাম। তারই পাশে বারান্দার ধারে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে হাজির করল মহাবীর। বোঝাই যাচ্ছে এটা শিস-মহল জাতীয় একটা কিছু ছিল, কারণ ঘরের সারা দেয়াল আয়নার টুকরো দিয়ে মোড়া।

আমাকে পৌঁছে দিয়েই মহাবীর যে কেন চম্পট দিল সেটা মিনিট খানেকের মধ্যেই বুঝতে পারলুম।

ঘরের মেঝেতে দুটি এবং খাটের উপর একটি জ্যান্ত বিছে অবস্থান করছে। মেঝের দুটি তেঁতুলে, আর খাটের ওপরেরটি একেবারে খোদ কাঁকড়া বিছে। শেষেরটি আপাতত খাটের মধ্যিখান থেকে

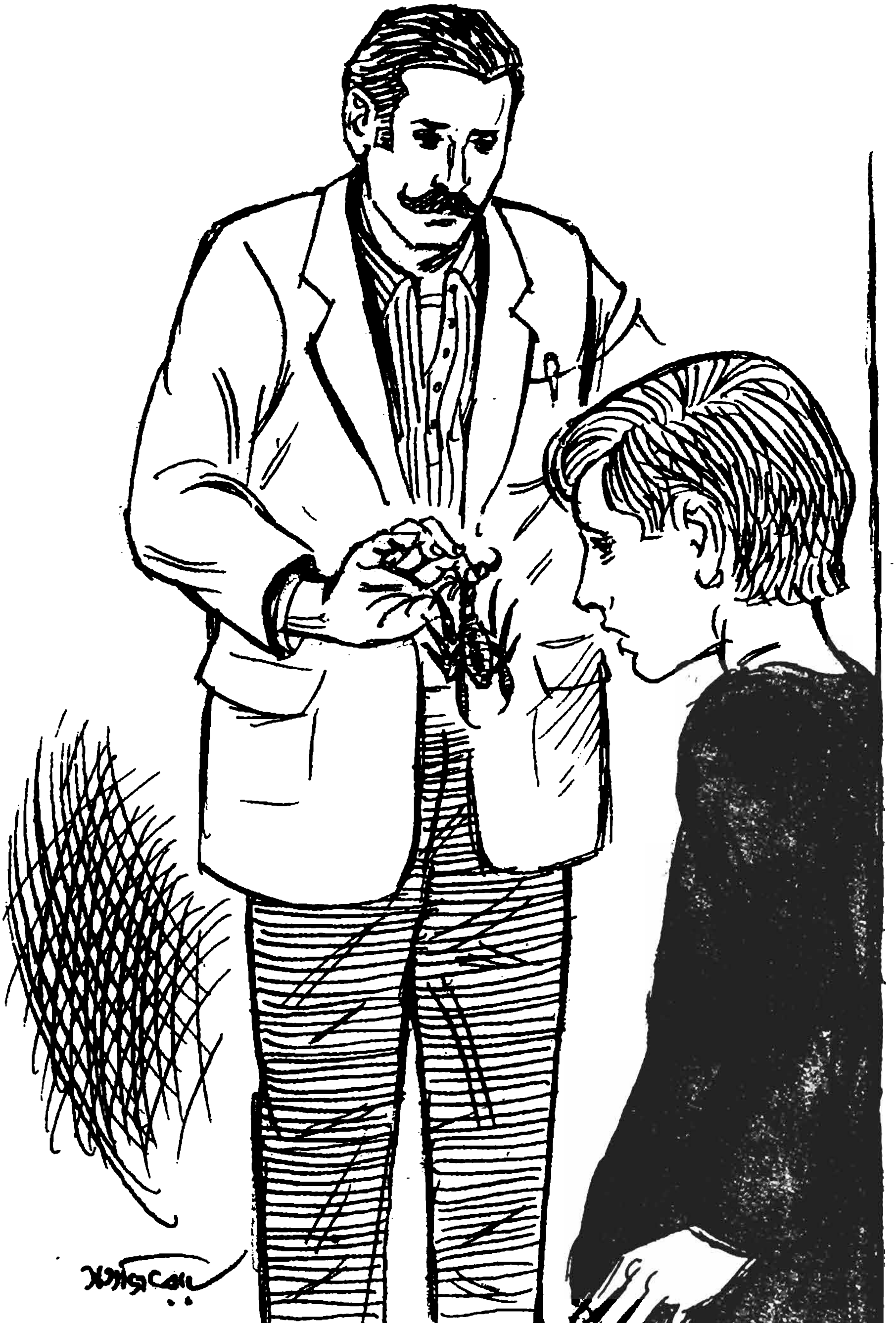

বালিশ লক্ষ্য করে এগুচ্ছে। আমি জানি মেঝের দুটি চেহারাতেই যা ভয়ের উদ্রেক করে, কামড়ে বিষ নেই। তবে বিছানার উপরে যেটি, তার ল্যাজের ডগায় বাঁকানো হুলটির ছোবল একেবারে মারাত্মক।

'বিচ্ছু' বিশেষণের তাৎপর্য যে এই ভাবে প্রথম দিনই বোঝা যাবে সেটা ভাবিনি।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে 'মহাবীর' বলে একটা হাঁক দিলুম। তাতে উত্তর না পেলেও, ডাকের ফলে উলটো দিকের বারান্দায় স্বয়ং শ্রীমানের আবির্ভাব হল। হেলতে দুলতে সে এসে দাঁড়াল একটা থামের পাশে। আমি তাকে ডাকলুম।

'ইধার আও।'

বিচ্ছু এগিয়ে উঠোনের মাঝ বরাবর এসে আবার থামলেন।

'হাত দিয়ে বিচ্ছু তুলতে পার?' জিজ্ঞেস করলুম আমি।

শ্রীমান নিরুত্তর।

'এসো। দেখে যাও কী করে তোলে।'

এবার শ্রীমানের কৌতূহল হল। এখানে বলে রাখি আমি নিজেও কোনওদিন হাত দিয়ে কাঁকড়া বিছে তুলিনি। তবে সেটা যে সম্ভব তা জানি, কারণ ছেলেবেলায় গণশা বলে আমাদের একটা চাকর ছিল তাকে এ জিনিস করতে দেখেছি। খপ্ করে ঠিক হুলের তলাটা ধরে তুলে ফেললে হুল ফোটাবার আর মওকা পায় না বিছে।

মহাবীর আমার ঘরের দরজার মুখটাকে এসে দাঁড়াল।

আমি দম টেনে এক বুক সাহস নিয়ে দুগ্গা বলে এক ছোবলে খাটের উপর থেকে বিছেটাকে ল্যাজ ধরে তুললুম। তারপর সেটা দু আঙুলে ঝুলিয়ে মহাবীরের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বললুম, 'বিছেগুলোকে বাইরে ফেলে আসার জন্য একটা পাত্র নিয়ে এসো। আর দেখছই তো—আমার যখন ভয় নেই, তখন আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনও মজা নেই।'

মহাবীর এক মিনিটের মধ্যেই একটা কাচের বৈয়াম নিয়ে এল। তার ভেতরের দেয়ালে লাড্ডুর গুঁড়োও লেগে রয়েছে। তারই মধ্যে প্রথমে কাঁকড়া বিছেটাকে, তারপর তেঁতুলে বিছে দুটো ফেলে বললুম, 'এগুলোকে বাড়ির পাঁচিলের বাইরে ফেলে এসো।'

মহাবীর গেল, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে রিপোর্ট করে গেল যে সে আমার আজ্ঞা পালন করেছে।

তারপর থেকে মনে হত যে প্রাইভেট টিউটরের প্রতি তার যে স্বাভাবিক বিরাগ সেটা মহাবীর কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। কতটা কাটিয়েছে সেটা জানা মুশকিল, কারণ এমনিতে সে অত্যন্ত চাপা। পেটে বোমা মারলেও মনের আসল ভাব সে প্রকাশ করবে না। কিন্তু ছেলেটি অত্যন্ত চৌকস, কাজেই লেখাপড়ায় যাতে তার মন বসে সে চেষ্টা আমাকে করতেই হবে, তাতে সফল হই বা না হই। দুষ্টুমি বন্ধ করার চেষ্টা আমি করিনি, কারণ জানি সেটা মাঠে মারা যাবে। ত্যাঁদড়ামোর দৌড় যে কতখানি সেটা এক দিনের ঘটনা বললেই বুঝতে পারবে।

গঙ্গারামের বাড়িতে চারটে ঘোড়া, ছটা উট। একদিন সকালে মনিবের চিঠি টাইপ করছি গদিতে বসে, এমন সময় হঠাৎ সমস্বরে অনেকগুলো উটের আর্তনাদ শুনে আঁতকে উঠলুম। উটের ডাকের মতো অমন বীভৎস ঘড়ঘড়ে ডাক আর কোনও জানোয়ারের নেই।

কৌতূহল হওয়াতে বাইরে বেরিয়ে দেখি—জোড়া জোড়া উট বোধহয় পরস্পরের দিকে পিঠ করে বসেছিল, কোন এক ফাঁকে গিয়ে শ্রীমান এর-ওর ল্যাজ গাঁটছড়ার মতো করে বেঁধে দিয়ে এসেছে। বসা উট দাঁড়িয়ে উঠতে ল্যাজে টান পড়ার ফলেই এই বিকট চিৎকার।

গঙ্গারাম এ ব্যাপারে ভয়ংকর আপসেট হয়ে পড়াতে তাকে বুঝিয়ে বললুম যে এ ধরনের দুষ্টুমির বয়সটা মানুষের খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না; তোমার ছেলের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে; সে পড়াশুনোয় ভাল হবে এ গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি, তুমি চিন্তা কোরো না।

এত বলার পর বাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মহাবীরকে পড়ানোর টাইম ছিল সন্ধ্যা সাতটা থেকে নটা। একতলার পিছন দিকে আমার ঘরের উলটোদিকে একটা ঘরে বসে পড়াশুনা হত। আমি গিয়ে বসলেই বেয়ারা এক গেলাস সরবত দিয়ে

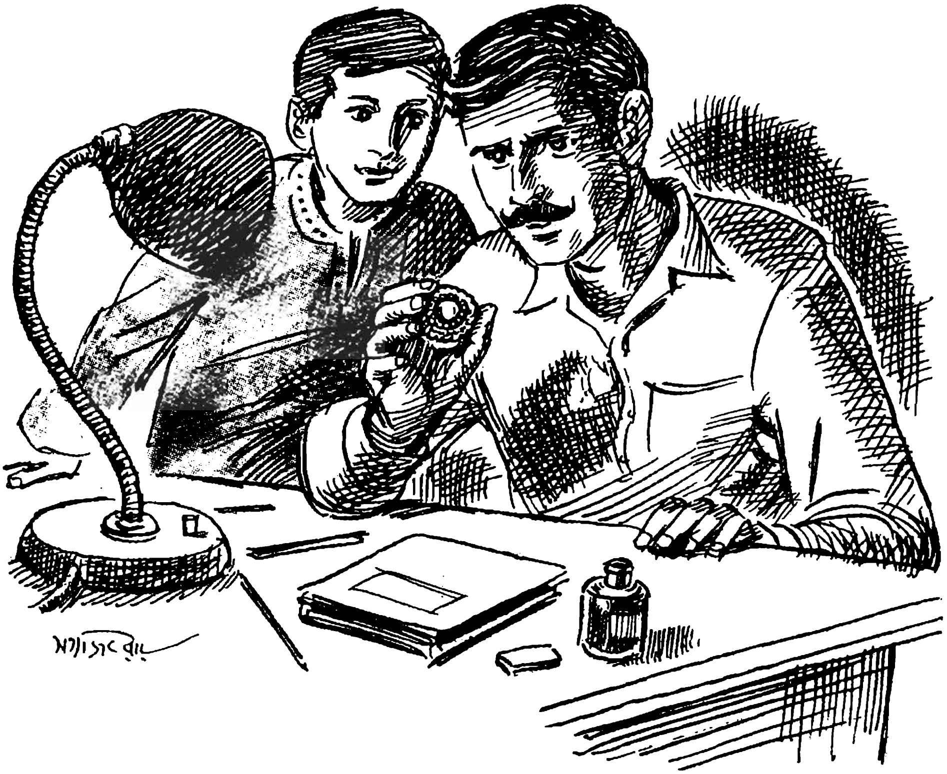

যেত। সেটা যে কীসের সরবত তা কোনও দিন ঠাহর করতে পারিনি, তবে বলতে পারি এমন সুস্বাদু সুগন্ধী সরবত আর কোনওদিন খাইনি। সরবত শেষ হতে না হতেই ছাত্র এসে পড়তেন।

একদিন দেখি ছেলে আর আসে না। আমি ঘড়ি দেখছি থেকে থেকে; বিশ মিনিট হয়ে গেল, পঁচিশ মিনিট, এক ঘণ্টা, তবু সে আসে না। দেরির কী কারণ হতে পারে বুঝতে পারছি না, এমন সময় হঠাৎ শ্রীমান এসে হাজির।

'কী ব্যাপার বলো তো?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে। 'এত দেরি কেন?'

'তোমায় একটা জিনিস, দেখাব তাই', বললেন শ্রীমান। 'বাবার নেশা পুরোপুরি না হলে ট্যাঁক থেকে চাবি বার করতে পারছিলাম না।'

সর্বনাশ! বাবার ট্যাঁক থেকে চাবি? শেঠজি যে গাঁজা জাতীয় একটা কিছু সেবন করেন সন্ধ্যাবেলা সেটা জানতাম।

'কীসের চাবি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সিন্দুকের', বললেন শ্রীমান বিচ্ছু।

তারপর পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে টেবিলের উপর রাখল। ল্যাম্পের আলোয় সেটার চোখ ধাঁধানো ঝলসানি আমায় থমকে দিল।

জিনিসটা একটা সোনার লকেট। সাইজে ক্যারামের স্ট্রাইকারের মতো। মাঝখানে একটা আধুলি-প্রমাণ সবুজ মণি, নির্ঘাৎ মরকত বা পান্না,—তাকে ঘিরে আছে হিরের বলয়, আর তাকে আবার ঘিরে আছে সোনার সূক্ষ্ম কারুকার্যের মধ্যে বসানো চুনি আর পান্না।

'জাহাঙ্গীর বাদশার জিনিস ছিল এটা' চাপা গলায় বলল মহাবীর। 'বিশ লাখ টাকা দাম। বাবা কাউকে

দেখান না, কাউকে বিক্রি করবেন না।'

'আর তুমি এটা সিন্দুক থেকে বার করে নিয়ে এলে?'

'বাঃ, এটা তোমাকে দেখাব না? তোমার দেখা হলে আবার রেখে দিয়ে আসব।'

আমি অবাক হয়ে একবার লকেটের দিকে, একবার মহাবীরের দিকে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলেন শ্রীমান।

'টোটা সিং-এর নাম শুনেছ?'

'কে টোটা সিং?'

'আসল নাম কেউ জানে না। ডাকু টোটা সিং। পুলিশ ধরে জেলে পুরেছিল, ও জানলার গরাদ হাত দিয়ে বেঁকিয়ে পালিয়ে যায়।'

এবার মনে পড়ল। কোনও একটা কাগজে পড়েছিলাম বটে। রাজপুত ডাকাত, রাজপুত্রেরই মতো চেহারা। ফরসা রঙ, কিন্তু ডাকাতি করে মিশকালো ভীলদের সঙ্গে। ভারী রহস্যময় চরিত্র। পুলিশ জেরা করেও কিছু জানতে পারেনি। দুর্ধর্ষ সাহসী, আর বন্দুকের অব্যর্থ নিশানা। গায়েও নাকি প্রচণ্ড শক্তি।

'হঠাৎ টোটা সিং-এর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'আমাদের বাড়িতে ডাকাত এলে মজা হবে।'

আমি তো থ! বললাম, 'এসব কী বলছ তুমি?'

'গোলাগুলি চলবে, আর মজা হবে না?'

'এসব কথা বোলো না মহাবীর। যদি লোক খুন হয় সেটা কি খুব ভাল হবে?'

মহাবীর আর কিছু বলল না। তার উৎসাহের সঙ্গে আমার উৎসাহ মেলাতে পারলাম না বলে বোধহয় সে কিছুটা হতাশ হল। তাকে লকেটটা দিয়ে বললাম, 'যাও, এটা রেখে এসো বাবার সিন্দুকে।'

মহাবীর বাধ্য ছেলের মতো লকেটটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। সেদিন আর তেমন জমিয়ে পড়াশুনা হল না।

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে লকেটটার কথা আর সেই সঙ্গে কী বিপুল ধনদৌলতের মধ্যে রয়েছি আমি সেই কথাটা ভাবছিলাম। আমার ঘরের উপরেই শেঠ গঙ্গারামের ঘর। শেঠজির ইনসমনিয়া, রাত আড়াইটা তিনটার আগে ঘুম আসে না। নেশার ফলে সন্ধ্যা সাতটা নাগাত একটা তন্দ্রার ভাব আসে। তারপর দশটা থেকে একেবারে সজাগ। এই ব্যারাম হোমিওপ্যাথিতে সারেনি। তাই শেঠজি আলোপ্যাথির ঘুমের বড়ি খান। কিন্তু যতক্ষণ না ঘুমের আমেজ আসে ততক্ষণ ঘরে পায়চারি করেন। তাঁর পদধ্বনি আজ শুনতে পাচ্ছি আমার মাথার উপরে।

ক্রমে সেই পায়ের শব্দও থেমে গেল, কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ঢং ঢং করে গদির ঘরের জাপানি দেয়ালঘড়িতে দুটো বাজল, আর তারই কিছুক্ষণ পরেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

একে টেলিপ্যাথি বলব না কী বলব জানি না; আজই সন্ধ্যায় ডাকাতের কথা হল, আর আজই ডাকাত পড়ল শেঠ গঙ্গারামের বাড়ি!

প্রথমে সন্দেহ হল কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে। তারপর ঘোড়ার চিঁহিহি আর উটের পরিত্রাহি আর্তনাদ। তারপর হই হল্লা আর পর পর তিনটে বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে আমি খাটের উপর সটান উঠে বসলাম। ঘর থেকে বারান্দায় বেরোব কি না ভাবছি, এমন সময় বেশ কিছু লোকের এক সঙ্গে দ্রুত পায়ের শব্দে সমস্ত বাড়িটা গমগম করে উঠল। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদিকের বারান্দায় প্যাসেজের ভিতর দিয়ে বাইরের উঠোনের যে অংশটা দেখা যায়, তাতে আলোকরশ্মির ছটফটানি দেখে বুঝলাম কে বা কারা যেন টর্চ ফেলছে।

মাথায় রোখ চেপে গেল। শেঠজিই আমাকে একটা রিভলভার দিয়েছিলেন। সেটা নিয়ে প্যাসেজের দিকে এগিয়ে গেলুম। বাড়িতে ডাকাত যদি পড়েই থাকে তো এভাবে কেঁচো হয়ে ঘরে বসে থাকলে বাঙালির মুখে যে কালি পড়বে!

কিন্তু প্যাসেজ দিয়ে বেরোনোমাত্র একটা বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম আমার কানের পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে পিছনের একটা কাচের জানালাকে চৌচির করে দিল। আমি বেগতিক

দেখে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। গোলাগুলি চললে এটাই যে প্রশস্ত পন্থা এটা আমার জানা ছিল। তাও উপুড় অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে রিভলভারের ঘোড়া টিপে একজন বন্দুকধারীর দিকে একটা গুলি চালিয়ে দিলুম। লোকটা আর্তনাদ করে কোমরে হাত চাপা দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল । আজ অমাবস্যা, কিন্তু উঠোনের উপরে ছাত নেই বলে তারার আলোতে তবু কিছুটা দেখা যাচ্ছিল।

এই ভাবে কুরুক্ষেত্র চলল মিনিট কুড়ি। শেঠজির বাড়ি পাহারা দেবার জন্য সশস্ত্র দারোয়ান ছিল গোটা আষ্টেক। কাজেই যুদ্ধ যে শুধু এক তরফাই ঘটেছে তা নয়।

ক্রমে হল্লা, আর্তনাদ, গুলির শব্দ, পায়ের শব্দ ইত্যাদি সব কিছু থামার পর আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম। তখন এদিকে ওদিকে বাতি জ্বলতে শুরু করেছে। ওপর থেকে মেয়েদের গলায় ঘোর বিলাপধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যতদূর মনে হয়, রেড সাক্সেসফুল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই মহাবীর দৌড়ে নেমে এল দোতলা থেকে। সে আমার ঘরেই যাচ্ছিল,

মাঝপথে আমাকে দেখে থেমে গিয়ে পাকা খবর দিয়ে দিল।

টোটা সিং ডাকাতের দল বিস্তর ধনরত্ন লুট করে নিয়ে চলে গেছে, ইনক্লুডিং শেঠজির সিন্দুক খুলে জাহাঙ্গীরের লকেট। শেঠজি নিজে নাকি বিপদ বুঝে গিন্নি ও মহাবীরকে নিয়ে ছাতে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তাঁর দুই ছেলে প্রতাপ ও রঘুবীর বন্দুক নিয়ে ডাকাতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল—দুজনেই জখম। এ ছাড়া দুটি প্রহরী মরেছে, আরকটির পায়ে গুলি লেগেছে।

কিন্তু এখানেই গল্পের শেষ নয়।

পুলিশে ডায়রি ইত্যাদি যা করবার সে তো হলই। এখানে বলে রাখি যে শেষ পর্যন্ত ইনস্পেক্টর যশোবন্ত সিং এবং তাঁর দলের লোকেরা জাহাঙ্গীরের লকেট সমেত চোরাই মালের অধিকাংশই উদ্ধার করেছিলেন, ডাকাতদলের সাতজন ধরা পড়েছিল, তবে টোটা সিং উধাও। কিন্তু এ সবের আগে আমাকে জড়িয়ে যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

ডাকাতির দুদিন পরের সন্ধেবেলা।

ছাত্র পড়ানোর ঘরে গেছি যথারীতি সাতটার সময়, সরবতও খাওয়া হয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলাম মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। ছাত্র তখনও আসেনি, এদিকে ক্রমেই বুঝতে পারছি যে চোখের সামনের জিনিসগুলো দেখতে যেন রীতিমতো কষ্ট করে দৃষ্টি ফোকাস করতে হচ্ছে।

কী যে হল কিছুই বুঝতে পারছি না, শুধু এটুকু বুঝছি যে এ অবস্থায় পড়ানো অসম্ভব।

এমন সময় শ্রীমান মহাবীর সিং-এর প্রবেশ। তার হাতে একটা হলদে কাগজ—হ্যান্ডবিলের মতো।

অবাক হয়ে দেখলাম তাতে আমারই ছবি।

'টোটা সিং', বলল মহাবীর, তার চোখ জ্বল জ্বল করছে।

টোটা সিং? কী বলছে ছেলেটা পাগলের মতো। স্পষ্ট দেখছি যে আমার ছবি—সেই গোঁফ, সেই জুলফি, নেই নাক, সেই চোখ!

'টোটা সিং,' আবার বলল মহাবীর। 'ঠিক তোমার মতন দেখতে। রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে ছবি আটকে দিয়েছে আজই দুপুরে। ধরে দিতে পারলে দু হাজার টাকা পুরস্কার।'

আমি সেই অবস্থাতেই কাগজটা ওর হাত থেকে নিয়ে চোখের একেবারে সামনে এনে নীচের লেখাটা পড়ার চেষ্টা করলুম। বড় করে লেখা টোটা সিং-এর নামটা পড়তে কোনও অসুবিধা হল না। আর সেই সঙ্গে ছবির মাথার উপরে লেখা 'রিওয়ার্ড রুপিজ ২০০০।'

'পুলিশ তোমায় ধরতে আসবে,' বলল মহাবীর সিং। 'কিষণলাল বলল ও পুলিশে বলে দেবে তুমি এখানে থাক। ও দেখেছে দেয়ালের ছবি।'

কিষণলাল শেঠজির দোকানের একজন কর্মচারী। লোকটা খুব সুবিধের নয় সেটা আমারও কয়েকবার মনে হয়েছে।

'তোমার জেল হবে,' বলে চলেছে মহাবীর সিং। আমার জেল হলে সে যেন রেহাই পায় এমনই তার ভাব। এই অদ্ভুত প্রায়-বেহুঁশ অবস্থাতে বুঝতে পারলাম যে এ ছেলেকে আমি বশ করতে পারিনি। সে আমার প্রতি যেমনি বিরূপ ছিল তেমনিই রয়ে গেছে।

আমি আর চোখ খুলে রাখতে পারছিলাম না। জিভও জড়িয়ে আসছিল। তার মধ্যেই বুঝতে পারছি যে একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়ে গেছি। চেহারায় যখন এতই মিল তখন গঙ্গারামও আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। শেষটায় হাতে হাতকড়া।

ঘর থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে উঠোন পেরিয়ে কোনও মতে আমার শিস-মহলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, আর শোয়ামাত্র অঘোরে ঘুম!

পরদিন ঘুম ভাঙল পুরুষ মানুষের গলার শব্দে। ভারী গলায় কে যেন ইংরিজি-হিন্দি মিশিয়ে কথা বলছেন আমার ঘরের কাছেই।

'আমাদের ডেফিনিট ইনফরমেশন আছে এ বাড়িতে সে লোককে দেখা গেছে। আমরা সার্চ করে দেখতে চাই। ছাব্বিশটা ঘর এই হাভেলিতে। লুকোবার জায়গার কি অভাব আছে?'

আমি প্রমাদ গুনলাম। কথার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে আমারই ঘরের দিকে।

এবার গঙ্গারামের কাতর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'এ বাড়িতে টোটা সিং লুকিয়ে থাকবে আমার অজানতে। এটা কী করে সম্ভব হয় ইনস্পেক্টর সাহেব?'

দরজার বাইরে লোক। আমি বিছানায় কনুইয়ে ভর করে আধশোয়া। আমার গলা শুকিয়ে গেছে, বুকের ভিতর ধড়ফড়ানি। এখনও মাথা ভার; কাল যে কী হল এখনও বুঝতে পারছি না।

চৌকাঠ পেরিয়ে এক পা ঢুকে এলেন উর্দি পরা দারোগা। আমার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে 'সরি' বলে বেরিয়ে গেলেন। পায়ের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর বারান্দার ডান দিক দিয়ে মিলিয়ে এল।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। তা হলে কি কালকের ছবিটাও মহাবীরের আরেকটা বিচ্ছুমি? শুধু আমার মনে একটা প্যানিক সৃষ্টি করার জন্য?

আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

দেয়ালের দিকে চোখ গেল।

দেয়ালের সর্বাঙ্গে আয়নার টুকরো। তাতে আমার মুখের ছায়া পড়েছে। একটা নয়, অগুনতি।

কিন্তু এ মুখ যে বদলে গেছে।

আপনা থেকেই আমার হাতটা মুখের উপর চলে এল।

কোথায় আমার টোটা-মার্কা তাগড়াই গোঁফ? আমি যে ক্লিন-শেভন!

আর আমার মাথার চুলের এ কী দশা? এ যে প্রায় কদমছাঁট!

দোর গোড়ায় এখন দাঁড়িয়ে মহাবীর সিং—তার চোখে মুখে শয়তানি হাসি।

'কাল সরবতে কী ছিল? সে জিজ্ঞেস করল।

'কী ছিল?'

'বাবার চারটে ঘুমের বড়ি। তুমি ঘুমোলে পর দাদার খুর দিয়ে আমি তোমার গোঁফ কামিয়ে দিই, কাঁচি দিয়ে চুল ছেঁটে দিই। নাহলে তোমায় ধরে নিয়ে যেত। এখন ওরা বুদ্ধু বনে যাবে।'

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম মহাবীরের দিকে। এমন ফন্দির কি তারিফ না করে পারা যায়? আর সে যে সত্যি আমার বন্ধু, তার এর চেয়ে বড় প্রমাণ কি আর আছে?

'সাবাস, মহাবীর,' আমি এগিয়ে গিয়ে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললাম, 'জিতে রহো।'

সন্দেশ, কার্তিক ১৩৮৯

স্পটলাইট

ছোটনাগপুরের এই ছোট্ট শহরটায় পুজোর ছুটি কাটাতে আমরা আগেও অনেকবার এসেছি। আরও বাঙালিরা আসে; কেউ কেউ নিজেদের বাড়িতে থাকে, কেউ কেউ বাড়ি-বাংলো-হোটেল ভাড়া করে থাকে, দিন দশেকে অন্তত মাস ছয়েক আয়ু বাড়িয়ে নিয়ে আবার যে যার জায়গায় ফিরে যায়। বাবা বলেন, 'আজকাল আর খাবার-দাবার আগের মতো সস্তা নেই ঠিকই, কিন্তু জলবায়ুটা তো ফ্রি, আরে সেটার কোয়ালিটি যে পড়ে গেছে সে-কথা তো কেউ বলতে পারবে না।'

দলে ভারী হয়ে আসি, তাই গাড়ি-ঘোড়া সিনেমা-থিয়েটার দোকান-পাট না থাকলেও দশটা দিন দারুণ ফুর্তিতে কেটে যায়। একটা বছরের ছুটির সঙ্গে আরেকটা বছরের ছুটির তফাত কী জিজ্ঞেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে, কারণ চারবেলা খাওয়া এক—সেই মুরগি মাংস ডিম অড়হর ডাল, বাড়িতে দোওয়া গোরুর দুধ, বাড়ির গাছের জামরুল পেয়ারা; দিনের রুটিন এক—রাত দশটায় ঘুম,

ভোর ছ'টায় ওঠা, দুপুরে তাস মোনপলি, বিকেলে চায়ের পর রাজা পাহাড় অবধি ইভনিং ওয়ক্; অন্তত একদিন কালীঝোরার ধারে পিকনিক; দিনে ঝলমলে রোদ আর তুলো পেঁজা মেঘ; রাত্তিরের আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ছড়ানো ছায়াপথ, কাক শালিক কাঠবেড়াল গুবরে ভোমরা গিরগিটি কাচপোকা কুঁচফল—সব এক।

কিন্তু এবার নয়।

এবার একটা তফাত হল।

অংশুমান চ্যাটার্জিকে আমার তেমন ভাল না লাগলে কী হল—সে হচ্ছে পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জনপ্রিয় ফিল্মস্টার। আমার ছোট বোন শর্মি—বারো বছর বয়স—তার একটা পুরো বড় বঙ্গলিপি খাতা ভরিয়ে ফেলেছে ফিল্ম পত্রিকা থেকে কাটা অংশুমান চ্যাটার্জির ছবি দিয়ে। আমার ক্লাসের ছেলেদের মধ্যেও তার 'ফ্যান'-এর অভাব নেই। এর মধ্যেই তারা অংশুমানের চুলের স্টাইল নকল করছে, ওর মতো ভারী গলায় ভুরু তুলে কথা বলার চেষ্টা করে, শার্টের নীচে গেঞ্জি পরে না, ওপরের তিনটে বোতাম খোলা রাখে।

সেই অংশুমান চ্যাটার্জি সঙ্গে তিনজন চামচা নিয়ে কুণ্ডুদের বাড়ি ভাড়া করে ছুটি কাটাতে এসেছে এই শহরে, সঙ্গে পোলারাইজড কাচের জানলাওয়ালা এয়ারকন্ডিশনড হলদে মার্সেডিজ গাড়ি। সেবার আন্দামান যাবার সময় দেখেছিলাম আমাদের জাহাজ ঢেউ তুলে চলেছে আর আশেপাশের ছোট নৌকোগুলো সেই ঢেউয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে। অংশুমান-জাহাজ বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোলে এখানকার পানসে-নৌকো বাঙালি চেঞ্জারদের সেইরকম অবস্থা হয়—ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ কেউ বাদ যায় না। মোটকথা এই একরত্তি শহরে এরকম ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি। ছোটমামা ছবি-টবি দেখেন না। শখ হল পামিস্ট্রির, তিনি বললেন, 'ছেলেটার যশের রেখাটা একবার দেখে আসতে হচ্ছে। এ সুযোগ কলকাতায় আসবে না।' মা-র অবিশ্যি ইচ্ছে অংশুমানকে একদিন ডেকে খাওয়ানোর। শর্মিকে বললেন, 'হ্যাঁ রে, তোরা তো ফিলিমের ম্যাগাজিনে ওর বিষয় এতসব পড়িস-টড়িস—ও কী খেতে ভালবাসে জানিস?' শর্মি মুখস্থ আউড়ে গেল—'কৈ মাছ, সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ, কচি পাঁঠার ঝোল, তন্দুরি চিকেন, মুসুরির ডাল, আমের মোরব্বা, ভাপা দই—তবে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে চাইনিজ।' মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাবা বললেন, 'খেতে বলতে তো আপত্তি নেই। হয়তো বললে আসবেও, তবে সঙ্গের ওই মোসাহেবগুলো...'

ছেনিদা আমার খুড়তুতো ভাই। সে সাংবাদিক, খবরের কাগজের আপিসে কাজ করে, ছুটি প্রায় পায় না বললেই চলে। এবার এসেছে ঝিকুড়িতে সাঁওতালদের একটা পরব হয় এই সময়, সেই নিয়ে একটা ফিচার লিখতে। সে বলল, এই ফাঁকে অংশুমানের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের সুযোগ তাকে নিতেই হবে। 'লোকটা বছরে তিনশো সাতষট্টি দিন শুটিং করে; ছুটির মওকা কী করে পেল সেটাই তো একটা স্টোরি।'

একমাত্র ছোটদারই কোনও তাপ নেই। ও প্রেসিডেন্সিতে পড়া ভয়ংকর সিরিয়াস ছেলে। ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার, জার্মান সুইডিশ ফরাসি কিউবান ব্রেজিলিয়ান ছবি দেখে, বাংলা ছবি নিয়ে একটা কড়া থিসিস লিখবে বলে ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা করছে। অংশুমানের 'বিনিদ্র রজনী' ছবি টেলিভিশনে তিন মিনিট দেখে 'ডিসগাসটিং' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে মনে হয় এবারের ছুটিটাই মাটি; ফিল্মস্টার এসে এমন সুন্দর চেঞ্জের জায়গার আবহাওয়াটা নষ্টই করে দিয়েছে।

যারা চেঞ্জে আসে তারা ছাড়াও বাঙালি এখানে দু'-চারজন আছেন যাঁরা এখানেই থাকেন। তার মধ্যে গোপেনবাবু একজন। একটা ছোট্ট বাড়ি করে আছেন এখানে বাইশ বছর, চাষের জমিও নাকি আছে কিছু। বয়স বোধ হয় বাবার চেয়ে বছর পাঁচেকের বেশি, রসিক মানুষ, উনি এলেই মনটা খুশি-খুশি হয়ে যায়।

আমরা পৌঁছানোর দু'দিন পরেই ভদ্রলোক সকালে এসে হাজির, খদ্দরের পাঞ্জাবির সঙ্গে মালকোঁচা-মারা ধুতি, হাতে বাঁকানো লাঠি আর পায়ে ব্রাউন কেডস জুতো। বাংলোর বাইরে থেকেই হাঁক দিলেন ভদ্রলোক—'চৌধুরী সাহেব আছেন নাকি?'

আমরা চা খাচ্ছিলাম, বাবা ভদ্রলোককে ডেকে এনে বসালেন আমাদের সঙ্গে।

'ওরে বাবা, এ যে দেখছি এলাহি কারবার!' বললেন ভদ্রলোক। 'আমি কিন্তু শুধু এক কাপ চা।'

গতবারে ভদ্রলোকের চোখে ছানি ছিল, বললেন মার্চ মাসে কলকাতায় গিয়ে কাটিয়ে এসেছেন।—'দিব্যি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

'এবার তো এখানে রমরমা ব্যাপার মশাই', বললেন বাবা।

'কেন?' ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেছে।

বাবা বললেন, 'সে কী মশাই, তারার হাট বসে গেছে এখানে, আর আপনি জানেন না?'

'তার মানে আপনার দৃষ্টি এখনও ফরসা হয়নি,' বললেন ছোটমামা, 'এতবড় ফিল্ম স্টার এসে রয়েছে এখানে, শহরে হইহই পড়ে গেছে, আর আপনি সে খবর রাখেন না?'

'ফিল্ম স্টার?' গোপেনবাবুর ভুরু এখনও কুঁচকোনো। 'ফিল্ম স্টার নিয়ে এত মাতামাতি করার কী আছে মশাই? ফিল্মস্টার মানে তো শুটিং স্টার। তারা তো শুটিং করে শুনেছি। শুটিং স্টার জানো তো, সুমোহন?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন গোপেনবাবু—'আজকে আছে, কালকে নেই। ফস করে খসে পড়বে আকাশ থেকে আর বায়ুমণ্ডলে যেই প্রবেশ করল অমনই পুড়ে ছাই। তখন পাত্তাই পাওয়া যাবে না তার।'

ছোটদার একটা ছোট্ট চাপা কাশিতে বুঝলাম গোপেনবাবুর কথাটা তার মনে ধরেছে।

'আসল স্টারের খবরটা তা হলে পৌঁছয়নি আপনাদের কাছে?' গরম চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করললেন গোপেনবাবু।

'আসল স্টার?'

প্রশ্নটা করলেন বাবা, কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি গোপেনবাবুর দিকে, সকলেরই মনে এক প্রশ্ন।

'গির্জার পিছনদিকে কলুটোলার চাটুজ্যেদের একটা বাগানওয়ালা একতলা বাড়ি আছে দেখেছেন তো? সেইখেনে এসে রয়েছেন ভদ্রলোক। নাম বোধ হয় কালিদাস বা কালীপ্রসাদ বা ওইরকম একটা কিছু। পদবি ঘোষাল।'

'স্টার বলছেন কেন?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

'বলব না? একেবারে পোল স্টার। স্টেডি। ইটারন্যাল। একশোর ওপর বয়স, কিন্তু দেখে বোঝার জো নেই।'

'বলেন কী! সেঞ্চুরিয়ন?' মামার হাঁয়ের মধ্যে চিবোনো টোস্টের অনেকটা এখনও গেলা হয়নি।

'সেঞ্চুরি প্লাস টোয়েনটি-সিক্স। একশো ছাব্বিশ বছর বয়স ভদ্রলোকের। জন্ম এইটিন-ফিফটিসিক্স। সিপাহি বিদ্রোহের ঠিক এক বছর আগে। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন এইটিন সিক্সটি-ওয়ান।'

আমাদের কথা বন্ধ, খাওয়া বন্ধ। গোপেনবাবু আবার চুমুক দিলেন চায়ে।

প্রায় এক মিনিট কথা বন্ধের পর ছোটদা প্রশ্ন করল, 'বয়সটা আপনি জানলেন কী করে? উনি নিজেই বলেছেন?'

'নিজে কি আর যেচে বলেছেন? অতি অমায়িক ভদ্রলোক। নিজে বলার লোকই নন। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল। দেখে মনে হবে আশি-বিরাশি। ওঁরই বাড়ির বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। একবার পর্দার ফাঁক দিয়ে এক মহিলাকে দেখলুম, পাকা চুল, চোখে সোনার চশমা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। কথাচ্ছলে শুধোলুম—"আপনার গিন্নির এখানকার ক্লাইমেট সুট করছে তো?" ভদ্রলোক স্মিতহাস্য করে বললেন, "গিন্নি নয়, নাতবউ।" আমি তো থ। বললুম, "কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনার বয়সটা—?" "কত মনে হয়?" জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। বললুম, "দেখে তো মনে হয় আশি-টাশি।" আবার সেই মোলায়েম হাসি হেসে বললেন, "অ্যাড অ্যানাদার ফর্টি-সিক্স।" বুঝুন তা হলে। সোজা হিসেব।'

এর পর ব্রেকফাস্টটা ঠিকমতো খাওয়া হল না। এমন খবরে খিদে মরে যায়। ভারতবর্ষের—না, শুধু ভারতবর্ষ কেন—খুব সম্ভবত সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘায়ু লোক এখানে এসে রয়েছেন, আমরা যখন রয়েছি তখনই রয়েছেন, এটা ভাবতে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

'দেখে আসুন গিয়ে', বললেন গোপেনবাবু। 'এমন খবর তো চেপে রাখা যায় না, তাই বললুম দু-চারজনকে—সুধীরবাবুদের, সেন সাহেবকে, বালিগঞ্জ পার্কের মিঃ নেওটিয়াকে। সবাই গিয়ে দর্শন

করে এসেছেন। আর দুটো দিন যাক না, দেখুন কী হয়! আসল স্টারের অ্যাট্রাকশনটা কোথায় সেটা বুঝতে পারবেন।'

'লোকটির স্বাস্থ্য কেমন?' মামা জিজ্ঞেস করলেন।

'সকাল বিকেল ডেইলি দু'মাইল।'

'হাঁটেন!'

'হাঁটেন। লাঠি একটা নেন হাতে। তবে সে তো আমিও নিই। ভেবে দেখুন, আমার দ্বিগুণ বয়স!'

'ভদ্রলোকের আয়ুরেখাটা...'

মামা ওয়ান-ট্রাক মাইন্ড।

'দেখবেন হাত', বললেন গোপেনবাবু, 'বললেই দেখাবেন।'

ছেনিদা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, হঠাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল।—'স্টোরি। এর চেয়ে ভাল স্টোরি হয় না। এ একেবারে স্কুপ।'

'তুই কি এখনই যাবি নাকি?' প্রশ্ন করলেন বাবা।

'একশো-ছাব্বিশ বয়স,' বলল ছেনিদা। 'এরা কীভাবে মরে জানো তো? এই আছে, এই নেই। ব্যারাম-ট্যারামের দরকার হয় না। সুতরাং সাক্ষাৎকার যদি নিতে হয় তো এই বেলা। পরে দর্শনের হিড়িক পড়ে গেল আর চান্স পাব?'

'বোস!' বাবা একটু ধমকের সুরেই বললেন। 'সবাই একসঙ্গে যাব। তোর তো একার প্রশ্ন নেই, আমাদের সকলেরই আছে। খাতা নিয়ে যাস, নোট করে নিবি।'

'বোগাস।'

কথাটা বলল ছোটদা। আর বলেই আবার দ্বিতীয়বার জোরের সঙ্গে বলল, 'বোগাস! ধাপ্পা। গুল।'

'মানে?' গোপেনবাবুর মোটেই পছন্দ হয়নি কথাগুলো। 'দ্যাখো সুরঞ্জন শেক্সপিয়র পড়েছ তো? দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভ্ন অ্যান্ড আর্থ জানা আছে তো? সব ব্যাপার বোগাস বলে উড়িয়ে দিলে চলে না।'

ছোটদা গলা খাঁকরে নিল।

'আপনাকে একটা কথা বলছি গোপেনবাবু—আজকাল প্রমাণ হয়ে গেছে যে, যারা একশো বছরের বেশি বয়স বলে ক্লেম করে তারা হয় মিথ্যেবাদী না হয় জংলি ভূত। রাশিয়ার হাই অলটিচিউডে একটা গ্রামে শোনা গিয়েছিল মেজরিটি নাকি একশোর বেশি বয়স, আর তারা এখনও ঘোড়া-টোড়া চড়ে। এই নিয়ে ইনভেসটিগেশন হয়। দেখা যায় এরা সব একেবারে প্রিমিটিভ। তাদের জন্মের কোনও রেকর্ডই নেই। পুরনো কথা জিজ্ঞেস করলে সব উলটোপালটা জবাব দেয়। নব্বুই-এর গাঁট পেরোনো চাট্টিখানি কথা নয়। লঞ্জিভিটির একটা লিমিট আছে। নেচার মানুষকে সেইভাবেই তৈরি করেছে। বার্নার্ড শ', বার্ট্রান্ড রাসেল, পি জি উডহাউস—কেউ পৌঁছতে পারেননি একশো। যদুনাথ সরকার পারেননি। সেঞ্চুরি কি মুখের কথা? আর ইনি বলছেন একশো-ছাব্বিশ। হুঁ!'

'জোরো আগার নাম শুনেছিস?' খেঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন মামা।

'না। কে জোরো আগা?'

'তুর্কির লোক। কিংবা ইরানের। ঠিক মনে নেই। থার্টি ফোর-থার্টি ফাইভের কথা। একশো চৌষট্টি বছরে মারা যায়। সারা বিশ্বের কাগজে বেরিয়েছিল মৃত্যুসংবাদ।'

'বোগাস।'

ছোটদা মুখে যাই বলুক, কালী ঘোষালের বাড়ি যখন গেলাম আমরা, সে বোধহয় অবিশ্বাসটাকে আরও পাকা করার জন্যই আমাদের সঙ্গে গেল। গোপেনবাবুই নিয়ে গেলেন। বাবা বললেন, 'আপনি আলাপটা করিয়ে দিলে অনেক সহজ হবে। চেনা নেই শোনা নেই, কেবল একশো ছাব্বিশ বয়স বলে দেখা করতে যাচ্ছি, এটা যেন কেমন কেমন লাগে।' ছেনিদা অবিশ্যি সঙ্গে নোটবুক আর দুটো ডট পেন নিয়েছে। মা বললেন, 'আজ তোমরা আলাপটা সেরে এসো। আমি এর পরদিন যাব।'

কালী ঘোষালের বাড়ির সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ার, কাঠের চেয়ার, মোড়া আর টুলের বহর

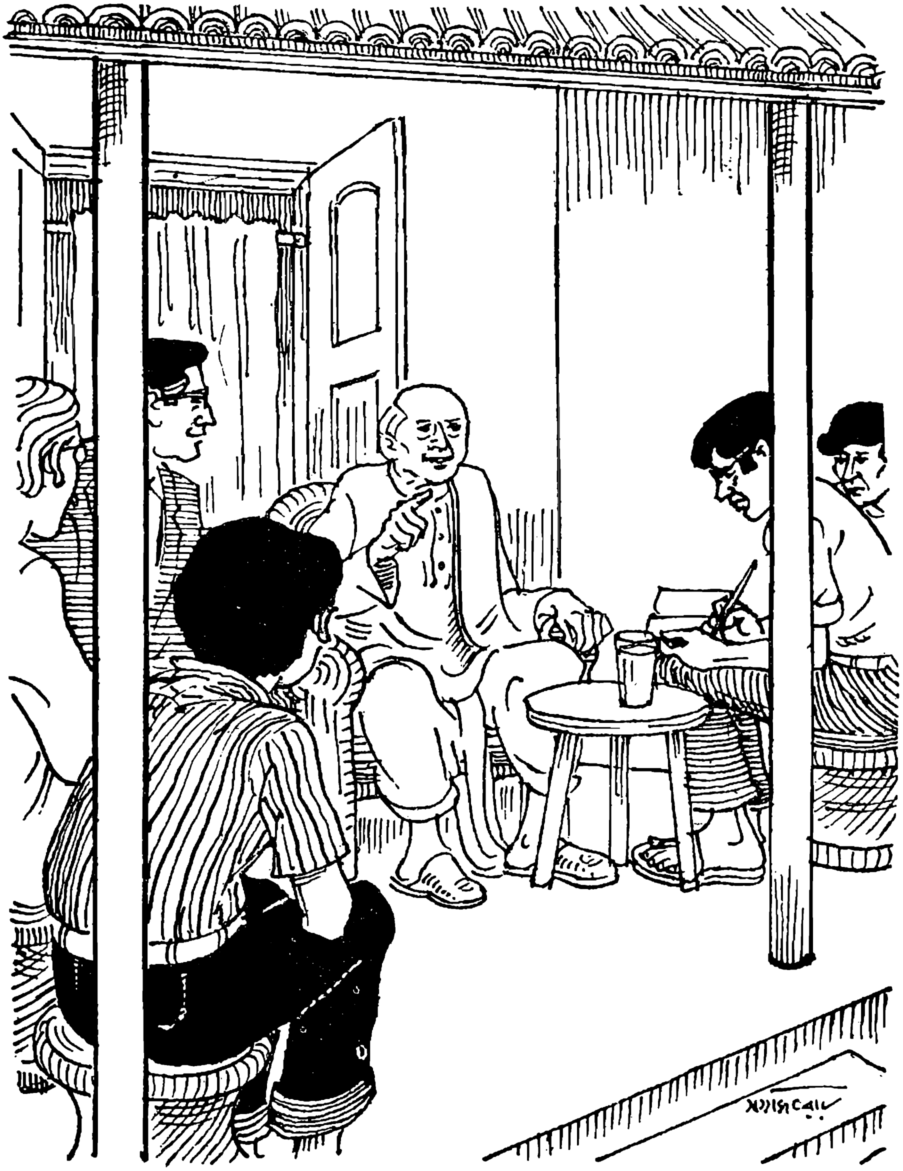

দেখে বুঝলাম সেখানে রেগুলার লোকজন আসতে শুরু করেছে। ব্রেকফাস্টের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা, কারণ গোপেনবাবু বললেন ওটাই বেস্ট টাইম। গোপেনবাবুর 'ঘোষাল সাহেব বাড়ি আছেন?' হাঁকের মিনিট খানেকের মধ্যেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। মন খালি বলছে একশো ছাব্বিশ—একশো ছাব্বিশ—অথচ চেহারা দেখলে সত্যিই আশির বেশি মনে হয় না। ফরসা রং, বাঁ গালে একটা বেশ বড় আঁচিল, টিকোলো নাক, চোখে পরিষ্কার চাহনি, কানের দু'পাশে দু'গোছা পাকা চুল ছাড়া বাকি মাথায় চকচকে টাক। এককালে দেখতে বোধহয় ভালই ছিলেন, যদিও হাইট পাঁচ ফুট ছয়-সাতের বেশি নয়। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পাজামা, কটকি চাদর, পায়ে সাদা কটকি চটি। চামড়া

যদি কুঁচকে থাকে তো চোখের দু'পাশে আর থুতনির নীচে।

আলাপের ব্যাপারটা সারা হলে ভদ্রলোক আমাদের বসতে বললেন। ছোটদা থামের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার মতলব করেছিল বোধহয়, বাবা 'রঞ্জু, বোস না' বলতে একটা টুলে বসে পড়ল। সে এখনও গম্ভীর।

'এভাবে আপনার বাড়ি চড়াও করাতে ভারী লজ্জিত বোধ করছি আমরা', বললেন বাবা, 'তবে বুঝতেই পারছেন, আপনার মতো এমন দীর্ঘজীবী মানুষ তো দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তাই...'

ভদ্রলোক হেসে হাত তুলে বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'অ্যাপোলোজাইজ করার কোনও প্রয়োজন নেই। একবার যখন বয়সটা বেরিয়ে পড়েছে, তখন লোকে আসবে সেটা তো স্বাভাবিক। বয়সটাই যে আমার বিশেষত্ব, ওটাই একমাত্র ডিস্টিংশন—সেটা কি আর বুঝি না? আর আপনারা এলেন কষ্ট করে, আপনাদের সাথে আলাপ হল, এ তো আনন্দের কথা।'

'তা হলে একটা কথা বলেই ফেলি', বললেন বাবা। 'একটা অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন। আমার এই ভাইপোটি, নাম শ্রীকান্ত চৌধুরী, হল সাংবাদিক। এর খুব শখ আপনার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় সেটা ওর কাগজে ছাপায়। অবিশ্যি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

'আপত্তি কীসের?' ভদ্রলোক অমায়িক হেসে বললেন। 'শেষ জীবনে যদি খানিকটা খ্যাতি আসে, সে তো আমারই ভাগ্য। গণ্ডগ্রামে কেটেছে সারাটা জীবন। তুলসীয়ার নাম শুনেছেন? শোনেননি। মুর্শিদাবাদে। রেলের কানেকশন নেই। বেলডাঙা জানেন তো? বেলডাঙায় নেমে সতেরো কিলোমিটার দক্ষিণে। তুলসীয়ায় জমিদারি ছিল আমাদের। সে সব তো আর নেই, তবে বাড়িটা আছে। তারই এক কোনায় পড়ে আছি। সেখানকার লোকে বলে যমের অরুচি। বলবে নাই বা কেন! গৃহিণী গত হয়েছেন বাহান্ন বছর আগে। ভাই বোন ছেলে মেয়ে কেউ নেই। নাতি আছে একটি, ডাক্তারি করে, তারও আসার কথা ছিল; এক রুগির এখন-তখন অবস্থা, তাই শেষ মুহূর্তে আসতে পারলে না। একাই আসতে পারতুম, চাকর সঙ্গে ছিল, নাতবউ দিলে না। সে এসেছে সঙ্গে। এই তিনদিনেই পুরো সংসার পেতে বসেছে। ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে সব।'

ডট পেনে আওয়াজ নেই। তবে আড়চোখে দেখছি ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে ঝড়ের বেগে লিখে চলেছে। টেপরেকর্ডারটার ব্যাটারি খতম, সেটা টের পেয়েছে আসার দিন, রোববারে। তাই কলম ছাড়া গতি নেই। সঙ্গে একটা ধার করা পেনট্যাক্স ক্যামেরা আছে। কোনও একটা সময়ে সেটার সদ্ব্যবহার হবে নিশ্চয়ই। ছবি ছাড়া এ লেখা ছাপা হবে কী করে?

'কিছু মনে করবেন না', ফাঁক পেয়ে বললেন মামা, 'আমি আবার একটু পামিস্ট্রির চর্চা-টর্চা করি। বিলিতি মতে অবশ্য। তা, আপনার হাতখানা যদি একবার দেখতে দেন। শুধু একবারটি চোখ বুলব।'

'দেখুন না।'

কালী ঘোষাল ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, মামা হাতটা ধরে তার উপর ঝুঁকে পড়ে মিনিট খানেক দেখে মাথা নেড়ে বললেন, 'ন্যাচারেলি। ন্যাচারেলি। আপনার বয়সের সঙ্গে তাল রেখে আয়ুরেখাকে বাড়তে গেলে সেটা হাত ছেড়ে কবজিতে এসে নামবে। আসলে শতায়ু বা শতাধিক আয়ুর জন্য মানুষের হাতে কোনও প্রভিশন নেই। থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

এবার বাবা বললেন, 'আপনার স্মরণশক্তি কি এখনও, মানে—?'

'মোটামুটি ভালই আছে', বললেন কালী ঘোষাল।

'কলকাতায় কি আপনি একেবারেই আসেননি?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'এসেছি বইকী! পড়াশুনা তো হেয়ার স্কুল আর সংস্কৃত কলেজে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে হস্টেলে থাকতুম।'

'ঘোড়ার ট্রাম—?'

'ঢের চড়িছি। দু' পয়সা ভাড়া ছিল লালদিঘি টু ভবানীপুর। রিকশা ছিল না তখন। পালকির একটা বড় স্ট্যান্ড ছিল শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে। পালকি বেহারাদের স্ট্রাইক হয় একটা, সে-কথাও মনে আছে। আজকাল যেমন রাস্তাঘাটে কাক-চড়ুই, তখন হাড়গিলে চরে বেড়াত কলকাতার রাস্তায়। বলত স্ক্যাভেঞ্জার বার্ড। আবর্জনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খেত। প্রায় আমার কাঁধের হাইট, তবে একদম নিরীহ।'

'তখনকার কোনও বিখ্যাত পার্সোনালিটিকে মনে পড়ে?' ছেনিদাই চালিয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন।

'বিখ্যাত মানে, রবীন্দ্রনাথকে পরে দেখিছি অনেক। আলাপ অবশ্যই ছিল না; আমি আর এমন একটা কে যে-আলাপ থাকবে। তবে একবার তরুণ বয়সের রবীন্দ্রনাথকে দূর থেকে দেখেছিলাম। কবিতা আবৃত্তি করলেন। হিন্দু মেলায়।'

'সে তো বিখ্যাত ঘটনা!' বললেন বাবা।

'বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিনি কখনও। একটানা কলকাতায় থাকলে হয়তো দেখা পেতুম। কিন্তু আমি কলেজের পাঠ শেষ করেই দেশে ফিরে যাই। তবে হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর। সে এক ব্যাপার বটে! হেদোর পাশ দিয়ে হাঁটছি আমরা তিন বন্ধুতে, বিদ্যাসাগর আসছেন উলটো দিক থেকে। মাথায় ছাতা, পায়ে চটি, কাঁধে চাদর। আমার চেয়েও মাথায় খাটো। ফুটপাথে কে জানি কলা খেয়ে ছোবড়া ফেলেছে, বিদ্যাসাগরের পা পড়তেই পপাত চ। আমরা তিনজন দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে ধরাধরি করে তুললুম। হাতের ছাতা ছিটকে পড়েছে রাস্তায়, সেটাও তুলে এনে দিলুম। ভদ্রলোক উঠে কী করলেন জানেন? এ জিনিস ওঁর পক্ষেই সম্ভব। যে ছোবড়ায় আছাড় খেলেন সেটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে কাছে ডাস্টবিন ছিল, তার মধ্যে ফেলে দিলেন।'

আমরা আরও আধ ঘণ্টা ছিলাম। তার মধ্যে চা এল আর তার সঙ্গে নির্ঘাত নাতবউয়ের তৈরি ক্ষীরের ছাঁচ। শেষকালে যখন বিদায় নিতে উঠলাম, ততক্ষণে ছেনিদা একটা টাটকা নতুন নোটবুকের প্রায় অর্ধেক ভরিয়ে ফেলেছে। সেইসঙ্গে অবিশ্যি ছবিও থুলেছে খান দশেক। সেই ফিল্ম পার্সেল করে চলে গেল কলকাতায় ছেনিদার খবরের কাগজের আপিসে। সেইখানেই ছবি ডেভেলপিং প্রিন্টিং হয়ে ভাল ছবি বাছাই করে কাগজে বেরোবে।

পাঁচদিনের মধ্যে ছেনিদার লেখা ছবিসমেত কাগজে বেরিয়ে সে কাগজ আমাদের হাতে চলে এল। লেখার মাথায় বড় বড় হরফে হেডলাইন—'বিদ্যাসাগরের হাত ধরে তুলেছিলাম আমি।'

ছেনিদা 'স্কুপ' করল ঠিকই, আর তার ফলে আপিসে তার যে কদর বেড়ে যাবে তাতেও সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর পরে আমরা থাকতে থাকতেই কলকাতার আরও সাতখানা দিশি-বিলিতি কাগজের সাংবাদিক এসে কালী ঘোষালের ইন্টারভিউ নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা বলা হয়নি। ফিল্ম স্টার অংশুমান চ্যাটার্জি তার চেলাচামুণ্ডাদের নিয়ে মার্সেডিজ গাড়ি করে দশদিনের ছুটি পাঁচদিনে খতম করে কলকাতায় ফিরে গেছে। তার নাকি হঠাৎ শুটিং পড়ে যাওয়াতে এই ব্যবস্থা। শর্মি খুব একটা আফসোস করল না, কারণ এই ফাঁকে তার অটোগ্রাফ নেওয়ার কাজটা সে সেরে নিয়েছে। সত্যি বলতে কি, খাতা নিয়ে যখন অংশুমানের সঙ্গে দেখা করে, তখন 'তোমার নাম কী খুকি?' জিজ্ঞেস করাতে হিরোর উপর থেকে অন্তত সিকিভাগ ভক্তি তার এমনিতেই চলে গিয়েছিল। তারপর বিশ্বের অন্যতম প্রাচীনতম মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে তার মন ভরে গেছে। বাবা বললেন, 'সে থাকতে একটা বুড়ো-হাবড়াকে নিয়ে এত মাতামাতি হচ্ছে এটা বোধ হয় স্টার বরদাস্ত করতে পারলেন না।'

আমরা ফিরে আসার আগের দিন রাত্রে কালী ঘোষাল আর তার নাতবউ আমাদের বাড়িতে খেলেন। অল্পই খান ভদ্রলোক, তবে যেটুকু খান তৃপ্তি করে খান। 'জীবনে কখনও ধূমপান করিনি, তা ছাড়া পরিমিত আহার, দু'বেলা হাঁটা, এইসব কারণেই বোধহয় যমরাজ আমার দিকে এগোতে সাহস পাননি!'

'আপনার ফ্যামিলিতে আর কেউ খুব বেশিদিন বেঁচেছিলেন কি?' জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

'তা বেঁচেছিলেন বইকী! শতাধিক আয়ুর সৌভাগ্য আমার পিতামহ প্রপিতামহ দু'জনেরই হয়েছিল। প্রপিতামহ তন্ত্রসাধনা করতেন। একশো তেরো বছর বয়সে হঠাৎ একদিন ঠাকুরদাকে ডেকে বললেন, "গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর। আমার সময় এসেছে।" অথচ বাইরে থেকে ব্যাধির কোনও লক্ষণ নেই। চামড়া টান, দাঁত পড়েনি একটাও, চুলে যৎসামান্য পাক ধরেছে। যাই হোক, অন্তর্জলির ব্যবস্থা হল। হরনাথ ঘোষাল শিবের নাম করতে করতে কোমর অবধি গঙ্গাজলে শোয়া অবস্থায় চক্ষু মুদলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। আমার বয়স তখন বেয়াল্লিশ। সে দৃশ্য ভুলব না কখনও।'

'রিমার্কেবল!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মামা।

কলকাতায় ফেরার সাতদিন পরে ছোটদা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল হাতে একটা বাঁধানো মোটা বই নিয়ে। বই নয়, পত্রিকা। নাম 'বায়স্কোপ'। বলল, নবরঙ্গ পত্রিকার এডিটর সীতেশ বাগচীর কাছে পঞ্চাশ টাকা জমা রেখে বইটা একদিনের জন্য বাড়িতে আনতে পেরেছে। দুটো পাতার মাঝখানে একটা বাসের টিকিট গোঁজা ছিল। সেই পাতায় খুলে বইটা আমার সামনে ফেলে দিল।

ডানদিকের পাতায় একটা বেশ বড় ছবি যাকে বলে ফিল্মের 'স্টিল', চকচকে আর্ট পেপারে ছাপা। পৌরাণিক ছবির স্টিল। ফিল্মের নাম 'শবরী'। ছবির তলায় লেখা—'প্রতিমা মুভিটোনের নির্মীয়মাণ ছায়াচিত্র শবরী-তে শ্রীরামচন্দ্র ও শবরীর ভূমিকায় যথাক্রমে নবাগত কালীকিঙ্কর ঘোষাল ও কিরণশশী'।

'চেহারাটা মিলিয়ে দ্যাখ, স্টুপিড', বলল ছোড়দা।

দেখলাম মিলিয়ে। কিরণশশীর চেয়ে ইঞ্চি তিনেক লম্বা—অর্থাৎ মাঝারি হাইট, খালি গা বলে বোঝা যায় গায়ের রঙ ফরসা, টিকোলো নাক, আর ডান গালে বেশ একটা বড় আঁচিল। বয়স দেখে পঁচিশের বেশি বলে মনে হয় না।

আমার কেমন যেন বুকটা খালি-খালি লাগছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কবেকার ছবি, ছোড়দা?'

'সেপাই মিউটিনির আটষট্টি বছর পরে। নাইনটিন টোয়েন্টি-ফোর। সাইলেন্ট ছবি। তার হিরো হচ্ছেন কালীকিঙ্কর ঘোষাল। এই প্রথম, আর এই শেষ ছবি। তিন মাস পরের সংখ্যায় ছবির সমালোচনা আছে। বলছে নবাগত নায়ক আগমন না করিলে কোনও ক্ষতি ছিল না। চিত্রাভিনেতা হিসাবে এঁর কোনও ভবিষ্যৎ নাই।'

'মানে, তা হলে ওঁর বয়স—'

'যা মনে হয় তাই। আশি-বিরাশি। চব্বিশ সালের এ ছবিতে যদি বছর পঁচিশ বয়স হয়, তা হলে হিসেব করে দ্যাখ ওর সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি আসলে ওর বউ। গোপেনবাবু প্রথমে যা ভেবেছিলেন তাই।'

'লোকটা তা হলে একেবারে—'

'বোগাস। ফোর-টোয়েন্টি। ভাবছিলাম কাগজে লিখে সব ফাঁস করে দিই, কিন্তু করব না। কারণ লোকটার ব্রেনটা শার্প আছে। সেটার তারিফ করতেই হয়। যখন বয়স ছিল তখন রাম-হড়কান হড়কেছে, কিন্তু শেষ বয়সে দেখিয়ে তো দিল—একটি মিথ্যে কথা বলে কী করে স্পটলাইটটা টপ স্টারের উপর থেকে টেনে এনে নিজের উপর ফেলতে হয়!'

সন্দেশ, পৌষ ১৩৮৯

তারিণীখুড়ো ও বেতাল

শ্রাবণ মাস, দিনটা ঘোলাটে, সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে সন্ধের দিকে তারিণীখুড়ো এসে হাজির। হাতের ভিজে জাপানি ছাতাটা সড়াত করে বন্ধ করে দরজার পাশটায় দাঁড় করিয়ে রেখে তক্তপোশে তাঁর জায়গাটায় বসে তাকিয়াটা টেনে নিয়ে খুড়ো বললেন, 'কই, আর সবাইকে ডাক, আর নিকুঞ্জকে বল নতুন করে জল ফুটিয়ে এক কাপ চা করতে।'

লোড শেডিং, তাই বসবার ঘরে দুটো মোমবাতি জ্বলছে, তাতে থমথমে ভাবটা তো কমেইনি, বরং বেড়েছে।

নিকুঞ্জই জল চাপিয়ে পাড়ার এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে ন্যাপলা, ভুলু, চটপটি আর সুনন্দকে ডেকে আনল। ন্যাপলা এসেই বলল, 'এই বাদলা দিনে মোমবাতির আলোয় কিন্তু—'

'ভূতের গল্প তো?'

'মানে, যদি আপনার স্টকে আর থাকে। দুটো গল্প তো অলরেডি বলা হয়ে গেছে।'

'আমার স্টক? আমার যা স্টক তাতে দুটো আরব্যোপন্যাস হয়ে যায়।'

'তার মানে টু থাউজ্যান্ড অ্যান্ড টু নাইটস?'

আমাদের মধ্যে ন্যাপলাই খুড়োর সঙ্গে তাল রেখে কথা বলতে পারে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললেন খুড়ো। 'তবে সব যে ভূতের গল্প তা নয় অবশ্যই।'

এখানে বলে রাখি যে তারিণীখুড়োর গল্পগুলো এত জমাটি হয় যে সেগুলো গুল না সত্যি সে কথাটা আর কোনওদিন জিজ্ঞেস করি না। তবে এটা জানি যে পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘোরার ফলে খুড়োর অভিজ্ঞতার স্টক অফুরন্ত।

'আজকে কীসের গল্প বলবেন?' জিজ্ঞেস করল ভুলু।

'আজকেরটা ভূতেরও বলতে পারিস, কঙ্কালেরও বলতে পারিস।'

'কঙ্কাল আর ভূত যে এক জিনিস সেটা তো জানতাম না,' বলল ন্যাপলা।

'তুই আর কী জানিস রে ছোকরা? এক জিনিস না হলেও এককে সময় এক হয়ে যায়। অন্তত আমি যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি তাতে তাই হয়েছিল। শোনার যদি সাহস থাকে তোদের তো বলতে পারি।'

আমরা পাঁচজনে একসঙ্গে পর পর তিনবার 'আছে!' বলার পর খুড়ো শুরু করলেন।

আমি তখন মালাবারে এলাচের ব্যবসা করে বেশ দু' পয়সা কামিয়ে আবার ভবঘুরে। কোচিন থেকে গেলুম কোয়েম্বাটোর, সেখান থেকে ব্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর টু কুর্নুল, কুর্নুল টু হায়দ্রাবাদ। ফার্স্ট ক্লাশ ছাড়া ট্রেনে চড়ি না, ভাল হোটেলে থাকি, শহরে ঘোরার ইচ্ছে হলে ট্যাক্সি ডাকি। হায়দ্রাবাদে যাবার ইচ্ছে ছিল সালার জাং মিউজিয়ামটা দেখার জন্য। স্রেফ একজন লোকের সংগ্রহ থেকে একটা পুরো মিউজিয়ম হয়ে যায় সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মিউজিয়ম দেখে গোলকোণ্ডায় একটা ট্রিপ মেরে আবার বেরিয়ে পড়ব ভাবছি, এমন সময় লোকাল কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে মনটা চনমন করে উঠল। হায়দ্রাবাদেরই আর্টিস্ট ধনরাজ মার্তণ্ড একজন মডেল চাইছেন পৌরাণিক ছবি আঁকার জন্য। তোরা রবিবর্মার নাম শুনেছিস কি না জানি না। রাজা রবিবর্মা। ট্র্যাভাঙ্কোরের এক রাজবংশের ছেলে ছিলেন। পৌরাণিক ছবি এঁকে খুব নাম করেছিলেন গত শতাব্দীর শেষ দিকটায়। ভারতবর্ষের বহু রাজারাজড়ার বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর আঁকা সব অয়েল পেন্টিং। কতকটা রবিবর্মার স্টাইলের ছবি আঁকে এই ধনরাজ মার্তণ্ড, আর আমি যখনকার কথা বলছি, বছর পঁয়ত্রিশ আগে, তখন লোকটার খুব নাম, খুব পসার। তার এই বিজ্ঞাপনটা দেখে বেশ একটা জোরালো প্রতিক্রিয়া হল। পুরুষ মডেল চেয়েছে, চেহারা ভাল হওয়া চাই, রোজ সিটিং দিতে হবে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবে। তোদের তো বলেইছি, সে বয়েসে আমার চেহারা ছিল লাইক এ প্রিন্স। তার উপর ডন-বৈঠক দেওয়া শরীর। গায়ে জোব্বা, মাথায় মুকুট আর কোমরে তলোয়ার দিয়ে যে-কোনও নেটিভ স্টেটের সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া যায়। যাই হোক, অ্যাপ্লাই করে দিলুম, আর ডাকও এসে গেল সাতদিনের মধ্যে।

নতুন খুরে দাড়ি কামিয়ে ভাল পোশাক পরে দুর্গা বলে হাজির হলুম মার্তণ্ডের অ্যাড্রেসে। বাড়িটা দেখেই মনে হল এককালে কোনও নবাবের হাভেলি-টাভেলি ছিল। চারিদিকে মার্বেল মোজেইক নকশার ছড়াছড়ি। পৌরাণিক ছবিতে যে ভাল রোজগার হয় সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

উর্দিপরা বেয়ারা এসে আমাকে নিয়ে গিয়ে বসাল একটা সারি সারি চেয়ার পাতা ঘরে। সেখানে জনাপাঁচেক ক্যানডিডেট অপেক্ষা করছে, যেন ডাক্তারের ওয়েটিং রুম। এদের মধ্যে একজনের চেহারাটা চেনা চেনা লাগলেও সে যে কে তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমি বসার মিনিট খানেকের মধ্যেই সে লোকের ডাক এল। বেয়ারা ঘরে ঢুকে 'বিশ্বনাথ সোলাঙ্কি' বলতেই চিনে ফেললুম লোকটাকে। ফিল্ম পত্রিকায় এঁর ছবি দেখেছি। কিন্তু তা হলে আবার চাকরির জন্য দরখাস্ত করা যেন?

কৌতূহল হওয়াতে আমার পাশে বসা ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আচ্ছা, যিনি এক্ষুনি উঠে গেলেন তিনি বোধহয় একজন ফিল্মস্টার, তাই না?'

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'স্টার হলে কি আর এখানে দেখতে পেতে? হতে চেয়েছিল স্টার,

কিন্তু তিনটি ছবি পর পর মার খাওয়াতে এখন অন্য রাস্তা দেখছে।'

ভদ্রলোক আরও বললেন যে সোলাঙ্কি নাকি হায়দ্রাবাদেরই ছেলে। ধনী বাপের পয়সা উড়িয়েছে জুয়া খেলে আর ফুর্তি করে। তারপর বোম্বাই গিয়ে ফিল্মের হিরো হবার চেষ্টায় বিফল হয়ে আবার এখানে ফিরে এসেছে।

যিনি এসব খবর দিলেন তিনি নিজেও অবিশ্যি একজন ক্যানডিডেট। পাঁচজনের সকলেই মডেল হবার আশায় এসেছেন, তবে তার মধ্যে সোলাঙ্কির চেহারাটাই মোটের উপর ভাল, যদিও যাকে পৌরুষ বলে সে জিনিসটার একটু অভাব।

আমার ডাক পড়ল সবার শেষে। যে ঘরে ইন্টারভিউ হচ্ছে সেটাই দেখলাম স্টুডিয়ো, কারণ এদিকে রয়েছে বেশ বড় একটা কাচের জানালা, ঘরের একপাশে একটা ইজেল আর তার পাশে একটা টেবিলের উপর আঁকার সরঞ্জাম। এইসবের মধ্যেই একটা ডেসক পাতা হয়েছে, আর তার দুদিকে দুটো চেয়ার। একটায় বসেছেন মার্তণ্ড সাহেব। সাহেব কথাটা ভুল হল না, কারণ ভদ্রলোকের ইংরেজিটি বেশ চোস্ত। শকুনিমার্কা নাক, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, মাথার লম্বা ঢেউ-খেলানো চুল নেমে এসেছে কাঁধ অবধি। পোশাক সম্ভবত নিজেরই ডিজাইন করা, কারণ জাপানি, সাহেবি আর মুসলমানি পোশাকের এমন খিচুড়ি আর দেখিনি। পাঁচ মিনিট কথা বলে আর জামা খুলিয়ে আমার বাইসেপ ট্রাইসেপ আর ছাতি দেখে ভদ্রলোক আমাকেই সিলেক্ট করে নিলেন। ডেইলি সিটিং-এ একশো টাকা। অর্থাৎ মাসে ত্রিশ দিন কাজ হলে তিন হাজার—আজকের দিনে প্রায় দশ-পনেরো হাজারের সামিল।

পরের দিন থেকেই কাজ শুরু হয়ে গেল। যে কোনও পৌরাণিক ঘটনাই হোক না কেন, তাতে প্রধান পুরুষ চরিত্র হব আমি। নারী চরিত্রের জন্য আছেন মিসেস মার্তণ্ড, আর ওদেরই উনিশ বছরের মেয়ে শকুন্তলা। খুচরো পুরুষের জন্য মডেলের অভাব নেই। মার্তণ্ডের পৌরাণিক পোশাকের স্টক বিরাট—পাগড়ি মুকুট ধুতি চাদর কোমরবন্ধ তাগা তাবিজ নেকলেস সবই আছে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ দিয়ে আঁকা শুরু হল, তার জন্য একটি জবরদস্ত ধনুকও তৈরি করিয়ে রেখেছেন আর্টিস্ট মশাই।

হুসেন সাগর লেক থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে দেড়শো টাকা ভাড়ার দুটি ঘর নিয়ে নিলাম আমি। বাড়িওয়ালা মোতালেফ হোসেন অতি সজ্জন ব্যক্তি, বাঙালিদের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা। রোজ সকালে আন্ডা-টোস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ি, নটা থেকে একটা পর্যন্ত সিটিং, তার মধ্যে চা পানের জন্য দশ মিনিটের বিরতি থাকে এগারোটায়। কাজের পর বাকি দিনটা ফ্রি থাকে, হায়দ্রাবাদ শহর ঘুরে দেখি, সন্ধ্যাবেলা লেকের ধারে একটু বেড়িয়ে দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি। এ ছাড়া আরেকটা কাজ আছে, সেটা হল পুরাণের গল্প পড়ে মার্তণ্ডর জন্য সুটেবল সাবজেক্ট খুঁজে রাখা। মার্তণ্ড নিজে শুধু রামায়ণ-মহাভারতটা পড়েছে, তাও তেমন খুঁটিয়ে নয়, তাই তার বিষয়গুলো একটু মামুলি হয়ে পড়ে।

আমিই মার্তণ্ডকে বলেছিলাম রাজা বিক্রমাদিত্যের কিছু ঘটনা, যেগুলো ওর মনে ধরেছিল। আমি জানতুম বিক্রমাদিত্যের পক্ষে আমার চেহারা খুব জুতসই। কিন্তু কাজের বেলা গণ্ডগোলটা কোথায় হল আর কী ভাবে হল সেটাই বলি।

চারমাস এক টানা সিটিং দিয়ে আটটা ছবি হয়ে গেছে, এমন সময় একদিন সন্ধেবেলা লেকের ধারে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছি, একটা পুরনো মসজিদের পাশ দিয়ে রাস্তা, জায়গাটা নিরিবিলি। মসজিদের উলটো দিকে একটা তেঁতুল গাছের নীচে পৌঁছেছি, এমন সময় পিছন দিক থেকে মাথায় একটা বাড়ি খেয়ে চোখে ফুলঝুরি দেখলুম।

জ্ঞান হলে পর দেখি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি, মাথায় আর বাঁ হাতে বেদম পেন। রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে এক সহৃদয় ভদ্রলোক তাঁর গাড়িতে তুলে সোজা হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। হাতের ব্যথাটা আর কিছুই না—যখন পড়েছি তখন রাস্তায় একখণ্ড পাথরে লেগে কনুইটা ফ্র্যাকচার হয়েছে। এখানে বলে রাখি যে অজ্ঞান অবস্থায় আমার বেশ কিছু লোকসান হয়ে গেছে: আমার ওয়ালেটে ছিল দেড়শো টাকা, সেটি গেছে, আর আমার সাতশো টাকা দামের সাধের ওমেগা ঘড়িটা। পুলিশে খবর দিয়ে কোনও ফল হয়নি, কারণ এ ধরনের অঘটন রাস্তাঘাটে নাকি প্রায়ই ঘটে।

হাত প্লাস্টার করে বিছানায় পড়ে থাকতে হল তিন হপ্তা। জখম হবার চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমি মার্তণ্ডকে একটা পোস্টকার্ড ছেড়ে দিয়েছিলুম আমার অবস্থা জানিয়ে। তিন দিনের মধ্যেই তার উত্তর

এসে যায়। দুঃসংবাদ। মার্তণ্ড লিখেছে বিক্রমাদিত্য সিরিজের জন্য অর্ডার পেয়ে গেছে, অমুক তারিখের মধ্যে ছখানা ছবি দিতে হবে, তাই সে অন্য মডেল নিতে বাধ্য হয়েছে। আমার মতো কোয়ালিফিকেশন নাকি তার নেই, কিন্তু নিরুপায়। এ সিরিজ শেষ হলে পরে প্রয়োজন হলে আমায় আবার জানাবে, ইত্যাদি।

এ নিয়ে তো আর করার কিছু নেই, তাই অগত্যা সময় কাটানো এবং যা হোক কিছু রোজগারের জন্য অন্ধ্র হেরাল্ড পত্রিকায় একটু আধটু লিখতে শুরু করলুম। ছ খানা ছবি আঁকতে মার্তণ্ডের লাগবে অন্তত তিনমাস। অর্থাৎ আমার প্রায় ন হাজার টাকা লোকসান করে দিয়েছে হায়দ্রাবাদের গুণ্ডা।

কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই আমার বাড়িওয়ালার কাছে টেলিফোন এল মার্তণ্ড সাহেবের। আমায় নাকি তাঁর প্রয়োজন।

বেশ কৌতূহল নিয়ে হাজির হলুম মার্তণ্ডের স্টুডিয়োতে। ব্যাপারটা কী?

'আমার একটা ভাল স্কেলিটন জোগাড় করে দিতে পার?' বললেন মার্তণ্ড সাহেব। 'দু-একজনকে বলে ফল হয়নি তাই তোমার কথা মনে হল। যদি পার তো ভাল কমিশন দেব। আমার বিশেষ দরকার।'

জিজ্ঞেস করলুম স্কেলিটনের প্রয়োজন হচ্ছে কেন। মার্তণ্ড বললেন বেতাল পঞ্চবিংশতির ছবি আঁকবেন। বিক্রমাদিত্যের কাঁধে বেতাল হবে ছবির সাবজেক্ট। বেতালের গল্প আজকালকার ছেলেমেয়েরা পড়ে কি না জানি না; আমরা এককালে খুব উপভোগ করতুম। এক সন্ন্যাসী বিক্রমাদিত্যকে আদেশ করেছে—দু ক্রোশ দূরে শ্মশানে শিরীষ গাছে একটা মড়া ঝুলছে, সেইটে তুমি আমার কাছে এনে দাও। বিক্রমাদিত্য শ্মশানে গিয়ে ঝুলন্ত মড়ার গলার দড়ি তলোয়ারের এক কোপে কেটে ফেলতেই মড়া মাটিতে পড়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। ছেলেবেলায় জিন্দা লাশ বলে একটা হিন্দি ফিল্ম দেখেছিলুম; এও হল জিন্দা লাশ। এমন লাশ যার মধ্যে ভূত বাসা বেঁধেছে। এই ভূতে পাওয়া মড়াকেই বলে বেতাল। বিক্রমাদিত্য বেতালকে কাঁধে নিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে চলেছেন, আর বেতাল তাঁকে হেঁয়ালি গল্প বলছে। রাজা যদি হেঁয়ালির ঠিক উত্তর দেন তা হলে মড়া আবার তাঁর কাঁধ থেকে শিরীষ গাছে ফিরে যাবে, আর যদি ভুল উত্তর দেন তা হলে রাজা বুক ফেটে মরে যাবেন।

যাই হোক, আমি মার্তণ্ডকে বললুম, 'কিন্তু সাহেব, বেতাল তো কঙ্কাল নয়, সে তো শবদেহ।'

মার্তণ্ড বললেন, 'স্কেলিটন পেলে আমি ছবিতে তার গায়ে চামড়া বসিয়ে নিতে পারব, কিন্তু স্কেলিটন আমার চাই-ই।'

আমি বললুম, 'তোমার মডেল কঙ্কালকে কাঁধে নিতে রাজি হবে তো?'

'হবে বইকী,' বললে মার্তণ্ড। 'আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে বলে তার কোনও ভয়ডর নেই। এখন তুমি বলো তুমি জোগাড় করে দিতে পারবে কি না।'

বললুম, 'আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট। তবে এ কিন্তু অল্প খরচে হবে না। আর কাজ হয়ে গেলে সে কঙ্কাল ফেরত দিতে হতে পারে।'

মার্তণ্ড আমার হাতে দু হাজার টাকা দিয়ে বললে, 'এই হল কঙ্কালের সাতদিনের ভাড়া, এটা দাম নয়। আর তোমায় আমি দেব টু হান্ড্রেড।'

॥ ২ ॥

স্কেলিটন পাওয়া আজকের দিনে খুবই কঠিন সেটা সকলেই জানে। যা পাওয়া যায় সবই প্রায় বিদেশে এক্সপোর্ট হয়ে যায়। কিন্তু তখনও যে সহজ ছিল তা নয়। বিশেষত হায়দ্রাবাদের মতো জায়গায়। আমি অনর্থক খোঁজাখুঁজি না করে সোজা আমার বাড়িওয়ালাকে ব্যাপারটা খুলে বললাম। মোতালেফ সাহেব হায়দ্রাবাদে রয়েছেন বেয়াল্লিশ বছর। এখানকার নাড়িনক্ষত্র জানেন। আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে বললেন, 'একটা স্কেলিটনের কথা মনে পড়ছে বটে, তবে সেটা আসল কঙ্কাল না যন্ত্রপাতি লাগানো আর্টিফিশিয়াল কঙ্কাল সেটা বলতে পারব না। আর সেটা এখনও সে লোকের কাছে আছে কি না তাও জানি না।'

'কে লোক সে?'

'এক ম্যাজিশিয়ান,' বললেন হোসেন সাহেব। 'আসল নাম কী জানি না, তবে ভোজরাজ নামে খেলা দেখাত। তার মধ্যে একটা ছিল কঙ্কালের খেলা। কঙ্কাল তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা খেত, তাস খেলত, দুজনে পাশাপাশি হাঁটাচলা করত। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। খুব নাম করেছিল লোকটা। তবে বছর পনেরো তার কোনও হদিস পাইনি। ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছে এটাই শুনেছিলাম।'

'সে কি হায়দ্রাবাদেরই লোক?'

'হ্যাঁ, তবে তার ঠিকানা জানি না। অন্ধ্র অ্যাসোসিয়েশনে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। তারা ফিরে বছর ভোজরাজের খেলার ব্যবস্থা করত।'

অন্ধ্র অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে ভোজরাজের এককালের ঠিকানা পাওয়া গেল। আশ্চর্য! গিয়ে দেখি লোকটা এখনও সেইখানেই আছে। চক বাজারের মধ্যে একটা দোতলা বাড়িতে দুটি ঘর নিয়ে তিনি থাকেন। বয়স আশি-টাশি হবে, মুখ ভর্তি একরাশ খয়েরি রঙের দাড়ি, মাথায় চকচকে টাক, গায়ের রঙ আবলুশ। আমায় দেখে হিন্দিতে প্রথম কথাই বললেন, 'বাঙালিবাবুর নসীব খারাপ যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?'

লোকটা তা হলে বোধহয় গুনতে জানে। এবারে আর ভণিতা না করে আসল ব্যাপারটা তাঁর কাছে পেশ করলুম। বললুম, 'যদি সে-কঙ্কাল এখনও আপনার কাছে থেকে থাকে আর যদি সেটাকে হপ্তা খানেকের জন্য ভাড়া দিতে পারেন তা হলে আমার নসীব কিছুটা ইমপ্রুভ করতে পারে। যিনি ভাড়া নেবেন তিনি দু হাজার টাকা দিতে রাজি আছেন। সে কঙ্কাল এখনও আছে কি?'

'একটা কেন—দুটো আছে—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।'

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলুম।

'আরে কঙ্কাল তো তোমারও আছে!' বললেন ভোজরাজ। 'নেই কি? কঙ্কাল আছে বলেই তো চলে ফিরে বেড়াচ্ছ! তোমার কঙ্কাল আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কনুইয়ের কাছে হাড়ে চিড় ধরল, ডাক্তার আবার সেটাকে জুড়ে দিল। তুমি জোয়ান বলেই জোড়া লাগল! আমি যদি মাথায় বাড়ি খেয়ে পড়ে হাড় ভাঙতুম, আমাকে কি আর কোনওদিন উঠতে হত?'

এই সুযোগে একটা প্রশ্ন না করে পারলুম না।

'আমায় কে জখম করল সেটা বলতে পারেন?'

'এ ভেরি অর্ডিনারি গুণ্ডা,' বললেন ভোজরাজ। 'তবে তার পিছনে অন্য কেউ আছে কি না জানি না। থাকতে পারে। সেটা জানতে পারে আমার কঙ্কাল। সেটা আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী। তুমি চাইছ সে কঙ্কাল, আমি দিতেও প্রস্তুত আছি—অনেককাল রোজগার নেই, দেনা জমে গেছে বিস্তর, দু হাজার পেলে সব শোধ হয়ে যাবে, আমিও নিশ্চিন্তে মরতে পারি—কিন্তু একটা কথা বলি তোমায়। এ কঙ্কাল যে-সে কঙ্কাল নয়। যাঁর কঙ্কাল তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। মাটি থেকে পাঁচ হাত শূন্যে উঠে যোগ সাধনা করতেন। বায়ু থেকে আহার্য আহরণ করতেন, ফলমূলের দরকার হত না। তাঁর তেজ ছিল অসামান্য। একবার তাঁর সাধনার সময় এক চোর তাঁর কুটিরে ঢুকে ঘটিবাটি সরাতে গিয়েছিল। হাত বাড়ানো মাত্র আঙুলগুলো বেঁকে যায়। কুষ্ঠ। কেউটে ছোবল মারতে এলে সাপ ভস্ম হয়ে যেত, বাবাজির কিছু হত না!'

আমি একটা কথা না বলে পারলুম না।

'কিন্তু এই বাবাজির কঙ্কালকেও তো আপনি বশে এনেছিলেন। একে দিয়ে ভেলকি দেখাতেন স্টেজে।'

'তা হলে বলি শোনো', বললেন ভোজরাজ। 'কঙ্কালকে আমি কোনওদিন বশে আনিনি। এ সবই তাঁর খেলা। অন্য যা ম্যাজিক দেখাতুম সেগুলো কিছুই না—সব যন্ত্রপাতির কারসাজি। লোকে ভাবত কঙ্কালের যা কিছু ক্ষমতা সবই গুরুজীর কৃপায়। মনে মনে তাঁর শিষ্য হয়ে আমি একটানা দশ বছর তাঁর পদসেবা করি। তখন আমার তরুণ বয়স—ম্যাজিক সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ছিল, এই পর্যন্ত। গুরুজী একবারও আমার কোনও নোটিস নেননি। তারপর একদিন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'বেটা, তোর ওপর আমি খুশি হয়েছি। তবে তুই এখন সংসার ত্যাগ করতে যাসনি। তোর অনেক কাজ আছে। তুই হবি ভোজবাজির রাজা। তোর নাম হবে। যে কাজে নাম করবি সেই কাজেই আমি তোকে সাহায্য

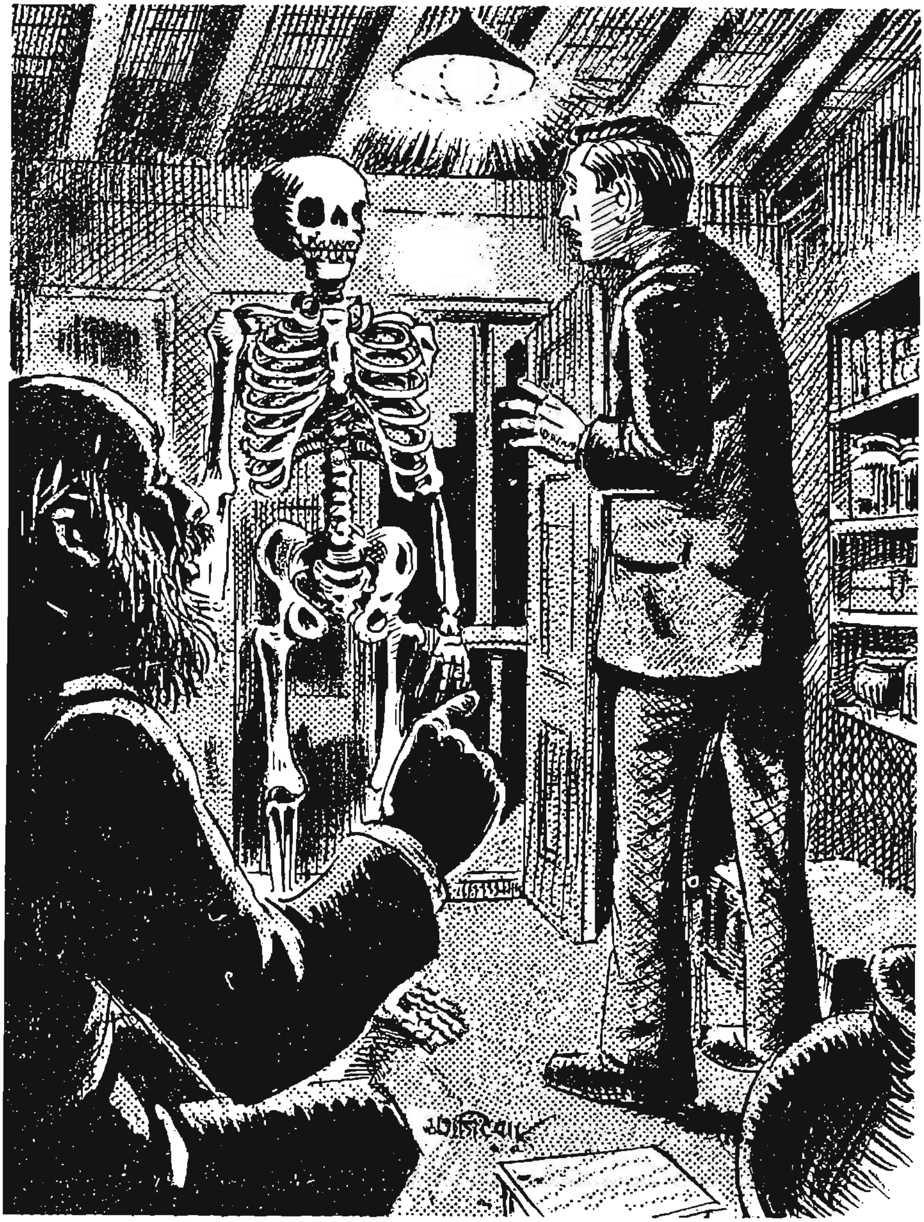

করব, তোর সেবার প্রতিদান দেব। তবে সেটা এখন নয়। আমি মরবার পর।'

আমি বললাম, 'সেটা কীরকম করে হবে যদি বুঝিয়ে দেন।'

গুরুজী আমাকে সন তারিখ বলে দিয়ে বললেন, 'এই দিনে যাবি তুই নর্মদার তীরে মান্ধাতা শহরে। সেখানে শ্মশানে গিয়ে দেখবি একটা বেল গাছ। সেই গাছ থেকে নদীর ধার ধরে পশ্চিমে চলে যাবি নশো নিরানব্বই পা। সেখানে দেখবি বনের মধ্যে একটা তেঁতুল গাছ আর বাবুল গাছের মধ্যে আকন্দ ঝোপের পাশে একটা কঙ্কাল । সেটাই আমি। সেটাকে তুই নিয়ে যাস। সেটাই সাহায্য করবে তোর কাজে, তোর আদেশ মানবে, লোকে দেখে তোকে বাহবা দেবে। তারপর কাজ ফুরিয়ে গেলে সেটাকে

নদীর জলে ফেলে দিবি। যদি তখনও কাজ বাকি থাকে তা হলে সেটা জলে ডুববে না। তখন আবার তুলে এনে তোর কাছে রেখে দিবি।'

সব শুনেটুনে ভোজরাজকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা জলে ফেলে দেবার সময় কি এখনও আসেনি?'

ভোজরাজ বললেন, 'না, আসেনি। একবার মুসির জলে ফেলে দেখেছিলাম, ডোবেনি। এখন বুঝতে পারছি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম। তোমার কর্কট রাশিতে জন্ম তো?'

'হ্যাঁ।'

'পঞ্চমী তিথি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে তুমিই সেই লোক। অবিশ্যি রাশি আর তিথি না মিললেও, তোমাকে দেখেই মনে হয়েছিল তুমি সিধে লোক। বাবার কঙ্কালের হিল্লেটা তোমার হাত দিয়ে হলে ভালই হবে। আমার বিশ্বাস বাবারও তোমাকে ভাল লাগত। তিনি সাচ্চা লোক পছন্দ করতেন।'

'তা হলে এখন কী করতে হবে?'

'আগে ওই বাক্সটা খোলো।'

ঘরের এক পাশে একটা বড় কাঠের সিন্দুকের দিকে দেখিয়েছেন ভোজরাজ। আমি গিয়ে ডালাটা তুললুম। ভেতরে কিংখাবের কাজ করা একটা গাঢ় লাল মখমলের ওপর হাঁটু ভাঁজ করে কঙ্কালটা শোয়ানো রয়েছে। ভোজরাজ বললেন, 'ওটাকে তুলে বাইরে আনো।'

দেখলাম মিহি তামার তার দিয়ে সুন্দর করে কঙ্কালের হাড়গুলো পরস্পরের সঙ্গে প্যাঁচানো রয়েছে। পাঁজরটা দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে কঙ্কালটা বাইরে আনলুম। ভোজরাজ বললেন, 'ওটাকে দাঁড় করাও।'

করালুম।

'এবার হাত দুটো ছেড়ে দাও।'

হাত সরিয়ে আনলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ টেরিয়ে গেল।

কঙ্কাল নিজে থেকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনও সাপোর্টি নেই।

'এবারে ওটাকে গড় করো। এই শেষ কাজের জন্য ওটা তোমারই সম্পত্তি।'

কাজটা যে কী জানি না, তবু রিস্ক না নিয়ে গড় না করে একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়লুম স্কেলিটনের সামনে।

'যা করছ তা বিশ্বাস করে করছ তো?' জিজ্ঞেস করলেন ভোজরাজ। বললুম, 'আমার মনের সব কপাট খোলা, ভোজরাজজী। আমি হাঁচি টিকটিকি ভূত-প্রেত দত্যি-দানা বেদ-বেদান্ত আইনস্টাইন-ফাইনস্টাইন সব মানি।'

'ভেরি গুড। এবার তুমি ওটাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। দেখো যেন গুরুজীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কাজ হয়ে গেলে ওটাকে মুসি নদীর জলে ফেলে দিয়ো।'

কঙ্কাল পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে মার্তণ্ড আমাকে দুশোর জায়গায় পাঁচশো টাকা বকশিস দিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় কী করছ?'

'কেন বলুন তো?'

'আজ বিক্রমাদিত্যের ছবিটা আঁকা শুরু করব। তুমি এলে ভাল হয়।'

'আমি তো জানতুম আপনি সকালে ছাড়া ছবি আঁকেন না।'

'এটার জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা', বললেন মার্তন্ড। এ ছবির জন্য যে মুডটা চাই সেটা রাত্রেই ভাল আসবে। আর দৃশ্যটার জন্য আমি নিজে প্ল্যান করে একটা লাইটিং-এর ব্যবস্থা করেছি। আমি সেটা তোমাকে দেখাতে চাই।'

'কিন্তু মডেল যদি আপত্তি করে?'

'তুমি যে ঘরে আছ সেটা সে জানবেই না। তুমি ঠিক সাতটার সময় এসে স্টুডিয়োর এই কোণটাতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আলোগুলো সব মডেলের উপর ফেলা থাকবে। তার পিছনে কী আছে সেটা সে দেখতেই পাবে না।'

এককালে অ্যামেচার থিয়েটার করেছি। জানতুম ফুটলাইটের পিছনে দর্শকদের প্রায় দেখাই যায় না। এও সেই ব্যাপার আর কী।

আমি রাজি হয়ে গেলাম।

একটা ধুকপুকুনির ভাব নিয়ে সাতটার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে হাজির হলুম মার্তণ্ডের বাড়ি। ওঁর মাদ্রাজি চাকর শিবশরণ আমাকে দরজা ফাঁক করে ঢুকিয়ে দিলে স্টুডিয়োতে।

মডেলের জায়গা এখনও খালি। তবে লাইটিং হয়ে গেছে এবং সত্যিই তারিফ করার মতো ব্যাপার সেটা। যে শ্মশানে ভূত পিশাচের নৃত্য হচ্ছে সেখানে এইরকম আলোরই দরকার।

মার্তণ্ড বসে আছে ক্যানভাসের সামনে, তার পাশে একটা জোরালো ল্যাম্প। সে আমাকে আড়চোখে দেখে একটা বিশেষ দিকে নির্দেশ করল। সেটা হল স্টুডিয়োর সঙ্গে লাগা একটা ঘরের দরজা। বুঝলাম সে ঘরে মডেল তৈরি হচ্ছেন।

এবারে আরেকটা জিনিসের দিকে দৃষ্টি গেল। সেটা হল কঙ্কাল। একটা হ্যাটস্ট্যান্ডের ডাঁটি থেকে সেটা ঝুলছে। তার গায়ে ভৌতিক আলো পড়ে সেটা আরও ভৌতিক দেখাচ্ছে। আর তার সঙ্গে ভৌতিক হাসি। তোরা লক্ষ করেছিস কি না জানি না—বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে থাকে বলে যে-কোনও খুলির দিকে চাইলেই মনে হয় সেটা হাসছে।

একটা খুট শব্দ শুনে অন্য ঘরের দরজাটার দিকে চোখ গেল। তলোয়ার হাতে রাজপোশাক পরিহিত বিক্রমাদিত্য বেরিয়ে এলেন দরজা খুলে। পাকানো গোঁফ, গালপাট্টা, লম্বা ঢেউ খেলানো চুল—কোনও ভুল নেই। মনটা হু হু করে উঠল, কারণ এই পার্টটা আমারই পাবার কথা, দৈব দুর্বিপাকে ফসকে গেল।

রাজা এসে স্টেজে আলো নিয়ে দাঁড়ালেন। মার্তণ্ড উঠে গিয়ে তার পোজ আর পোজিশনটা ঠিক করে দিয়ে চলে গেলেন হ্যাটস্ট্যান্ডের দিকে। কঙ্কালটাকে নামিয়ে নিয়ে সেটাকে মডেলের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটার হাত দুটোকে তোমার কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দাও,

আর পা দুটো কোমরের দুপাশ দিয়ে নিয়ে এক করে তোমার বাঁ হাত দিয়ে চেপে থাকো।'

দেখলুম মডেল দিব্যি মার্তণ্ডের ইনস্ট্রাকশন পালন করলে। লোকটার সাহসের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

মার্তন্ড ছবি আঁকা শুরু করে দিলেন। প্রথমে চারকোল দিয়ে স্কেচটা করে তারপর রং চাপানো হবে। এর আগে তো আমিই মডেল হতুম, তাই আঁকাটা কেমন হচ্ছে সেটা দেখার সুযোগ ছিল না। আজ দেখতে পেলুম মার্তণ্ডের নিপুণ হাতের কাজ।

মিনিট পাঁচেকও হয়নি, হঠাৎ মনে হল স্টেজের দিক থেকে একটা গোঙানির শব্দ পাচ্ছি। আর্টিস্ট এত মশগুল যে তার কানে শব্দটা যায়নি। সে খালি বললে, 'স্টেডি, স্টেডি', কারণ রাজা অল্প অল্প হেলতে দুলতে শুরু করেছেন।

আর্টিস্টের আদেশ সত্ত্বেও দেখলাম মডেল স্টেডি থাকতে পারছে না; সে এপাশ ওপাশ করছে। আর তার মুখ দিয়ে যে শব্দটা বেরোচ্ছে সেটাকে গোঙানি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

'হোয়াটস দ্য ম্যাটার?' বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন মার্তন্ড।

এদিকে আমি ম্যাটারটা বুঝে ফেলেছি। কারণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কী ঘটছে।

কঙ্কালের হাত দুটো আর ঝোলানো নেই। সেটা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে মডেলের থুতনির নীচে এসে ক্রমে একটা ভয়ঙ্কর আলিঙ্গনে পরিণত হচ্ছে। সেই সঙ্গে পা দুটোও যেভাবে জড়িয়ে ফেলেছে কোমরটাকে, সেটা আর কোনওদিন খোলা যাবে বলে মনে হয় না।

মডেলের অবস্থা এখন শোচনীয়। তার গোঙানি ক্রমে পরিত্রাহি আর্তনাদে পরিণত হয়েছে, আর সে তলোয়ার মাটিতে ফেলে দিয়ে সমস্ত দেহটাকে ঝাঁকিয়ে দু'হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে কঙ্কালের হাত দুটো আলগা করার চেষ্টা করছে।

মার্তণ্ড একটা চিৎকার দিয়ে দৌড়ে গেছে মডেলের দিকে, কিন্তু দু'জনের কম্বাইন্ড চেষ্টা এবং শক্তিপ্রয়োগেও কোনওই ফল হল না। মার্তণ্ড হাল ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে এসে ইজেলটাকে উলটে ফেলে দিয়ে আমারই পাশে দেওয়ালের গায়ে এলিয়ে পড়ল।

আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটা যদিও বেশিক্ষণ থাকেনি, কিন্তু তার মধ্যেই মডেল কাঁধে কঙ্কাল সমেত মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। এদিকে ঘড়ঘড়ে গলায় মার্তণ্ড বলছে, 'ডু সামথিং!'

আমি এবার এগিয়ে গেলুম মঞ্চের দিকে। আমার কিন্তু ভয় কেটে গেছে এর মধ্যেই, কারণ মন বলছে কঙ্কাল আমার কোনও ক্ষতি করবে না, আমার চেষ্টায় কোনও বাধা দেবে না।

কাছে যেতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে মাথাটা ভোঁ করে উঠল। রাজার চুল গোঁফ গালপাট্টা পাগড়ি সবই আলগা হয়ে খসে পড়েছে, আর তার ফলে যে মুখটা বেরিয়ে পড়েছে সেটা আমার চেনা।

ইনি হলেন মার-খাওয়া ফিল্মের হিরো বিশ্বনাথ সোলাঙ্কি।

মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গিয়ে জাজ্জ্বল্যমান সত্যিটা বেরিয়ে পড়ল, আর সেই সঙ্গে মাথায় খেলে গেল এক পৈশাচিক বুদ্ধি।

আমি সোলাঙ্কির উপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'এবার বলো তো দেখি, আমার জায়গাটা দখল করার জন্য আমার মাথায় বাড়ি তুমিই মারিয়েছিলে কি না। না বললে কিন্তু কঙ্কালের হাত থেকে তোমার মুক্তি নেই।'

সোলাঙ্কির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে; সে সেই অবস্থাতেই দম বেরিয়ে আসা গলায় বলে উঠল, 'ইয়েস ইয়েস ইয়েস—প্লিজ সেভ মি, প্লিজ!'

আমি মার্তণ্ডের দিকে ফিরে বললুম, 'তুমি সাক্ষী। শুনলে তো?—কারণ এঁকে আমি পুলিশে দেব।'

মার্তণ্ড মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে দিলেন।

এবার কঙ্কালের কাঁধ ধরে মৃদু টান দিতেই সেটা রাজার কাঁধ ছেড়ে উঠে এল, সঙ্গে সঙ্গে কোমর ছেড়ে পা দুটোও।

এর পরে অবিশ্যি সোলাঙ্কি মশাইয়ের আর মডেল হওয়া হয়নি, কারণ তাঁকে বেশ কিছুদিন পুলিশের জিম্মায় থাকতে হয়েছিল। তার জায়গায় বিক্রমাদিত্য সিরিজের হিরো হলেন তারিণীচরণ

বাঁড়ুজ্জে। ঘটনাটা মার্তণ্ডকেও কাবু করে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দিন সাতেকের মধ্যেই রিকভার করে তিনি আবার পুরোদমে কাজে লেগে গেলেন।

বেতালের ছবি শেষ হবার পর দিনই মুসি নদীর জলে কঙ্কালটাকে ফেলে দিলাম। চোখের নিমেষে সেটা তলিয়ে গেল জলের তলায়।

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৯০

বহুরূপী

নিউ মহামায়া কেবিনের একটি চেয়ার দখল করে হাফ কাপ চা আর আলুর চপ অর্ডার দিয়ে নিকুঞ্জ সাহা একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। তার চেনা-পরিচিতের কেউ এসেছে কি? হ্যাঁ, এসেছে বইকী! ওই তো রসিকবাবু, আর ওই যে শ্রীধর। পঞ্চানন এখনও আসেনি, তবে মিনিট দশেকের মধ্যে এসে যাবে নিশ্চয়ই। যত বেশি চেনা লোক আসে ততই ভাল। চেনা লোক চিনতে না পারলে তবেই না ছদ্মবেশের সার্থকতা!

অবিশ্যি এখনও পর্যন্ত তার সবক'টা ছদ্মবেশই আশ্চর্যরকম সফল হয়েছে। আজকে তো তাও দাড়ির আবরণ রয়েছে—মুখের অর্ধেকটা অংশই ঢাকা। বয়সও বাড়িয়ে নিয়েছে নিকুঞ্জ অন্তত বছর পঁচিশ। গতকালের মেক-আপ ছিল একটি ছোট্ট প্রজাপতিমার্কা গোঁফ, আর সেইসঙ্গে প্লাস্টিসিনের সাহায্যে নাকের শেপটা বদলানো। কিন্তু হাবভাব হাঁটাচলা গলার স্বর এমনই চতুর ভাবে পালটে নিয়েছিল নিকুঞ্জ যে, তার দশ বছরের আলাপী পঞ্চানন গুঁই তার কাছ থেকে দেশলাই ধার নেওয়ার সময়ও তাকে চিনতে পারেনি। নিকুঞ্জ অসম সাহসের সঙ্গে কয়েকটা কথাও বলে ফেলেছিল—'আপনি ওটা রাখতে পারেন। আমার কাছে আরেকটা দেশলাই আছে।' পঞ্চানন গলার স্বর শুনেও চেনেনি। একেই বলে আর্ট।

নিকুঞ্জ সাহার আর সব শখ চলে গিয়ে এটাই পোক্তভাবে রয়ে গেছে। শুধু রয়ে গেছে না, উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়ে শখটা নেশায় পরিণত হয়েছে। তার হাতে এখন সময়ও অঢেল। আগে একটা চাকরি ছিল। কলেজ স্ট্রিটে ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানিতে সে ছিল সেলসম্যান। সম্প্রতি তার এক জ্যাঠামশাই শেয়ার মার্কেটে অনেক টাকা করে গত হয়েছেন; তাঁর নিজের সন্তান ছিল না; স্ত্রীও মারা গেছেন সেভেনটি টুতে। নিকুঞ্জকে তিনি উইল করে যে টাকা দিয়ে গেছেন তার ব্যাঙ্কের সুদ হয় মাসে সাড়ে সাতশো। কাজেই সেলসম্যানের চাকরিটা সে অক্লেশে ছাড়তে পেরেছে। এই জ্যাঠাই বলতেন, 'বই পড়ো নিকুঞ্জ, বই পড়ো। বই পড়ে না শেখা যায় এমন জিনিস নেই। ইস্কুলের দরকার হবে না, মাস্টারের দরকার হবে না—স্রেফ বই। লোকে এরোপ্লেন চালাতে শিখেছে বই পড়ে, এ-কথাও শুনেছি!' জ্যাঠা নিজে বই পড়ে দুটি জিনিস শিখেছিলেন—হাত দেখা আর হোমিওপ্যাথি। দুটোই তিনি বেশ ভাল ভাবেই রপ্ত করেছিলেন বলে জানা যায়। নিকুঞ্জ তাঁর কথা মেনে নিয়েই বই পড়ে শিখেছিল চামড়ার কাজ আর ফোটোগ্রাফি। মাস ছয়েক আগে কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে মেক-আপ সম্বন্ধে একটা মোটা আমেরিকান বই দেখে সে কেনার লোভ সামলাতে পারেনি। সেইটে পড়ে এই নতুন শখটা তাকে পেয়ে বসে।

অথচ মেক-আপের যেটা আসল জায়গা—থিয়েটার—সে সম্বন্ধে নিকুঞ্জর কোনও উৎসাহই নেই। একবার মনে হয়েছিল—এ তো বেশ নতুন জিনিস শেখা হল, এর থেকে একটা উপরি রোজগারের রাস্তা ধরলে কেমন হয়?

নব নট্ট কোম্পানির ভুলু ঘোষের সঙ্গে নিকুঞ্জর কিছুটা আলাপও ছিল। দু'জনেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মেম্বার, সেই সূত্রেই আলাপ। আমহার্স্ট স্ট্রিটে ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে কথাটা পাড়তে ভুলু ঘোষ বললে,

'বেশ তো আছ নিকুঞ্জ, আবার থিয়েটার লাইনে আসার ইচ্ছে হল কেন? আর, আমাদের কোম্পানির কথা যদি বলো, সেখানে অপরেশ দত্তকে সরিয়ে তুমি তার জায়গায় বসবে কী করে? সে লোক আজ ছত্রিশ বছর ধরে মেক-আপ করছে; পুরো আর্টটি তার নখের ডগায়। তোমার ছ'মাসের বিদ্যে শুনলে তো সে তোমার দিকে চাইবেই না—কথা বলা দূরের কথা। না হে—ওসব ভুলে যাও। সুখে যখন আছ, তখন ভূতের কিল ভোগ করবে কেন সাধ করে?'

নিকুঞ্জ সেইদিনই পেশাদার মেক-আপের চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে দেয়।

তা হলে মেক-আপ শিখে করবে কী সে? কার মেক-আপ করবে? চুল ছাঁটার সেলুনের মতো তো মেক-আপের সেলুন খোলা যায় না, যেখানে লোক পয়সা দিয়ে নিজের চেহারা পালটে নিতে আসবে!

তখনই নিকুঞ্জর মনে হয়—কেন, আমার নিজের চেহারা কী দোষ করল? সত্যি বলতে কি, তার নিজের চেহারায় কয়েকটা সুবিধে আছে—যাকে বলে ন্যাচারেল অ্যাডভানটেজেস। নিকুঞ্জর সবই মাঝারি। সে না-লম্বা না-বেঁটে, না-কালো, না-ফরসা, না-চোখা, না-ভোঁতা। যে নাক খাড়া তাকে ভোঁতা করা যায় না। যে বেশি লম্বা, তাকে বেঁটে করা যায় না, যে বেশি কালো, তাকে ফরসা বানাতে হলে যে-পরিমাণ রঙের প্রলেপ লাগে তাতে মেক-আপ ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।

দুদিন ধরে আয়নায় নিজের চেহারাটা স্টাডি করে নিকুঞ্জ তাই স্থির করল যে মেক-আপ সে নিজেকেই করবে, নিজের চেহারার উপরেই চলবে তার যত এক্সপেরিমেন্ট।

কিন্তু তারপর? এই মেক-আপের উদ্দেশ্যটা হবে কী?

উদ্দেশ্য হবে দুটি—এক, নিজের শিল্পচাতুরিকে পারফেকশনের সবচেয়ে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়া; এবং দুই, লোকের চোখে ধুলো দেয়ার আনন্দ উপভোগ করা।

বই কেনার দিন-সাতেকের মধ্যেই নিকুঞ্জ মেক-আপের সরঞ্জাম কিনতে শুরু করে। বইয়েতেই সে জেনেছে ম্যাক্স ফ্যাক্টর কোম্পানির প্যান-কেক, মেক-আপের মাহাত্ম্যের কথা। সে জিনিস আমেরিকায় তৈরি হয়, কলকাতায় আসে না। অথচ দিশি রঙে নিখুঁত মেক-আপ সম্ভব নয়। নিকুঞ্জকে তাই যেতে হল প্রতিবেশী ডাক্তার বিরাজ চৌধুরীর কাছে। এই ডাক্তার চৌধুরীই একবার নিকুঞ্জর জনডিস সারিয়ে দিয়েছিলেন। এঁর ছেলে আমেরিকায় পড়াশুনা করে, নিকুঞ্জ খবর পেয়েছে সে বোনের বিয়েতে শিগগিরই দেশে আসছে।

ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে নিকুঞ্জ ভণিতা না করে সোজাসুজি বলল, 'আপনার ছেলে যদি একটি জিনিস আমার জন্য আনতে পারে; ও এলেই আমি দামটা দিয়ে দেব।'

'কী জিনিস?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার চৌধুরী।

'কিছু রঙ। মেক-আপের রঙ। আমি নাম লিখে এনেছি। এখানে পাওয়া যায় না।'

'বেশ তো। আপনি ডিটেলটা দিয়ে দিন, আমি ওকে পাঠিয়ে দেব।'

ম্যাক্স ফ্যাক্টরের রঙ এসে যায় তিন সপ্তাহের মধ্যেই। তার আগেই অবশ্য বাকি সব জিনিস কেনা হয়ে গেছে—তুলি, স্পিরিট গাম, ভুরু আঁকার কালো পেনসিল, ফোকলা দাঁত করার জন্য কালো এনামেল পেন্ট, পাকা চুল করার জন্য সাদা রঙ, পরচুলা লাগানোর জন্য সূক্ষ্ম নাইলনের নেট। এ ছাড়া কিনতে হয়েছে বেশ কিছু আলগা চুল, যা ওই সূক্ষ্ম নেটের উপর একটা করে বসিয়ে নিকুঞ্জ নিজে হাতে তৈরি করে নিয়েছে বিশ রকমের গোঁফ, বিশ রকমের দাড়ি আর বিশ রকমের পরচুলা। রুক্ষ, মসৃণ, সোজা, ঢেউ খেলানো, কাফ্রিদের মতো পাকানো—কোনওরকম চুল বাদ নেই।

কিন্তু শুধু মুখ পালটালেই তো হল না, সেইসঙ্গে পোশাক না বদলালে চলবে কী করে? নিকুঞ্জর সাতদিন লেগেছে নিউ মার্কেট, বড়বাজার আর গ্রান্ট স্ট্রিট ঘুরে নিজের মাপ অনুযায়ী পোশাক জোগাড় করতে। রেডিমেড আর ক'টা জিনিস পাওয়া যায়? তাই দরজিকে দিয়েও বেশ কিছু পোশাক করিয়ে নিতে হয়েছে। আর শুধু জামাকাপড় তো নয়, পরিধেয় সবকিছুই। সাত রকমের চশমা, বারো রকম চটিজুতো স্যান্ডেল, দশ রকম টুপি—তার মধ্যে দারোগার টুপিও বাদ যায় না—পাগড়ির জন্য পাঁচ রকম কাপড়, পাঁচ রকম হাতঘড়ি। শিখদের হাতের লোহা, তাগা, তাবিজ, মাদুলি, পৈতে, বোষ্টমের মালা, শাক্তের রুদ্রাক্ষ, ওস্তাদের কানে পরার নকল হিরে—কিছুই বাদ যায়নি।

আর কিনতে হয়েছে একটা বড় আয়না, আর তার ফ্রেমে বসানোর জন্য জোরালো বালব।

লোডশেডিং-এ যাতে কাজ বন্ধ না হয়ে যায় তার জন্য একটা ছোট জাপানি জেনারেটরও কিনতে হয়েছে নিকুঞ্জকে। চাকর নিতাইকে সে শিখিয়ে দিয়েছে সেটা কী করে চালাতে হয়।

কাজ শুরু হয় ষোলোই অগ্রহায়ণ। তারিখটা নিকুঞ্জ ডায়রিতে লিখে রেখেছে। সকাল আটটা থেকে শুরু করে বিকেল সাড়ে চারটেয় মেক-আপ শেষ হয়। মোটামুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরই মেক-আপ নিতে হবে, সেটা নিকুঞ্জ আগেই ঠিক করে রেখেছিল। রাস্তার ভিখিরি বা কুলি-মজুর সেজে তো লাভ নেই, কারণ মেক-আপ উতরেছে কি না সেটা পরীক্ষা হবে নিউ মহামায়া কেবিনে। সেখানে বসে চা খেতে পারে এমন লোক তো হওয়া চাই।

প্রথম দিনেই বাজিমাৎ। ঘন কালো ভুরু, আর তার সঙ্গে মানানসই ঘন কালো ঝুপো-গোঁফ-বিশিষ্ট মোক্তার সেজেছিল নিকুঞ্জ। সাদা প্যান্ট ও বহুব্যবহৃত কালো মোক্তারি কোট; হাতে একটা পুরনো ব্রিফ কেস, পায়ে সুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া কালো শু আর ইলাসটিক-বিহীন সাদা মোজা। তারই টেবিলে এসে বসল পঞ্চানন। নিকুঞ্জ যতক্ষণ চা খেয়েছে, তার বুকের ধুকপুকুনি চলেছে সমানে। কিন্তু সামনে বসা অচেনা সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে একজন লোক যে কত কম কৌতূহলী হয়—বিশেষত সে লোকের যদি অন্যদিকে মন থাকে—সেটা নিকুঞ্জ সেদিন বুঝেছে। পঞ্চানন তার দিকে দেখেও দেখেনি। বাঁ হাতে রেস বুকের পাতা উলটে দেখেছে আর ডান হাতে চামচ দিয়ে অমলেট ছিঁড়ে খেয়েছে। নিকুঞ্জ যখন বয়ের কাছে বিল চাইল, তখনও পঞ্চাননের দৃষ্টি ঘুরল না তার দিকে। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, অদ্ভুত আনন্দ। নিকুঞ্জ সেদিনই বুঝেছিল যে, আজ থেকে এটাই হবে তার জীবনের একমাত্র অকুপেশন।

সেদিন বাড়ি ফিরে একটা মজা হল। এটা যে হবে সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু নিকুঞ্জর খেয়াল হয়নি। শশীবাবু থাকেন একতলার সদর দরজার পাশের ফ্ল্যাটে। তাঁর বসার ঘর থেকে কে ঢুকছে না-ঢুকছে দেখা যায়। নিকুঞ্জ ফিরেছে সোয়া সাতটায়। লোডশেডিং হয়নি বলে দরজার সামনের প্যাসেজে আলো ছিল। মোক্তার-নিকুঞ্জ ঢুকতেই শশীবাবুর হাঁক এল, 'কাকে চাই?'

নিকুঞ্জ থামল। তারপর শশীবাবুর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এবার তারা মুখোমুখি। শশীবাবু আবার বললেন, 'কাকে খুঁজছেন মশাই?'

'নিকুঞ্জ সাহা কি এই বাড়িতে থাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দোতলার সিঁড়ি উঠে ডান দিকের ঘর।'

উত্তরটা দিয়ে শশীবাবু ঘুরে গেলেন, আর সেই ফাঁকে একটানে গোঁফ-ভুরু খুলে ফেলে নিকুঞ্জ বলল, 'একটা কথা ছিল।'

'বলুন,' বলেই নিকুঞ্জর দিকে ফিরে শশীবাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'সে কী—এ যে নিকুঞ্জ!'

নিকুঞ্জ শশীবাবুর ঘরে ঢুকে গেল। এঁকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। বাড়ির অন্তত একজন জানলে ক্ষতি নেই, বরং সুবিধেই হবে।

'শুনুন শশীদা, আমি এবার থেকে মাঝে মাঝে এইরকম মেক-আপ নিয়ে ফিরব। কোনওদিন ডাক্তার, কোনওদিন মোক্তার, কোনওদিন শিখ, কোনওদিন মারোয়াড়ি—বুঝছেন? বেরোব বিকেলে, ফিরব সন্ধেয়। আপনার ঘরে এসে মেক-আপটা খুলে ফেলব। ব্যাপারটা আমার-আপনার মধ্যেই থাক, কেমন?'

'কিন্তু হঠাৎ এ উদ্ভট শখ কেন? থিয়েটার-টিয়েটার—?'

'না না। থিয়েটার নয়। এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট। আপনাকে কনফিডেন্সে নিচ্ছি কারণ আপনি বুঝবেন। মোটকথা, আপনি আর ছড়াবেন না ব্যাপারটা, এইটে আমার রিকোয়েস্ট।'

শশীবাবু সজ্জন ব্যক্তি, পাড়ার বঙ্কিম পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান, নিজেও বইয়ের পোকা। নিকুঞ্জর কথায় রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'কোনও বদ মতলব নেই যখন বলছ, তখন আর কি? কত লোকের তো কতরকম শখই থাকে।'

কাজটা মেহনতের ও সময়সাপেক্ষ, তাই সপ্তাহে দু'দিনের বেশি মেক-আপ নেওয়া চলবে না এটা নিকুঞ্জ আগেই বুঝেছিল। তবে বাকি সময়টা সদ্ব্যবহার করতে বাধা নেই; নিকুঞ্জ সেই সময়টা শহরে ঘুরে বেড়িয়ে লোকজন স্টাডি করে। নিউ মার্কেট যে এ ব্যাপারে একটা স্বর্ণখনি সেটা একদিন গিয়েই বুঝেছে। তা ছাড়া খেলার মাঠ, হিন্দি সিনেমার কিউ—এসব তো আছেই। ইন্টারেস্টিং টাইপের লোক দেখলেই নিকুঞ্জ খাতায় নোট করে নেয়, এমনকী কোনও ছুতো করে সে-লোকের সঙ্গে দুটো কথাও বলে রাখে। 'কটা বাজল দাদা, আমার ঘড়িটা আবার...।' অথবা 'এখান থেকে গড়িয়াহাট যেতে কত নম্বর বাস ধরব বলতে পরেন?'—এ ধরনের প্রশ্নেও যথেষ্ট কাজ হয়। যেদিন মেক-আপ থাকে না সেদিন বিকেলে সে স্বাভাবিক বেশেই চলে যায় মহামায়া কেবিনে। যে তিন-চারজন আলাপী আসে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে রাজা উজির মেরে যথা সময়ে ফিরে আসে তার বৃন্দাবন বসাক লেনের ফ্ল্যাটে। ছোকরা চাকর নিতাই অবশ্য বাবুর ব্যাপারটা জানে, বাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে এবং রীতিমতো উপভোগ করে। তবে চাকরটি যে খুব বুদ্ধিমান তা বলা চলে না।

'চিনতে পারছিস?'

'হ্যাঁ—!'

'মারব এক থাপ্পড়! তোর বাবু বলে চিনতে পারছিস?'

'আপনি তো বাবু বটেই। সে তো জানি।'

'তোর বাবুর এরকম গোঁফ, এরকম টাক? এরকম পোশাক পরে তোর বাবু? এরকম চশমা পরে? কাঁধে এরকম চাদর নেয়?'

নিতাই হাসিমুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে দরজায় হেলান দিয়ে। নিকুঞ্জ বুঝতে পারে মাথামোটা লোকেদের জন্য তার এই ছদ্মবেশ নয়। তারা এর আর্ট কোথায় তা ধরতে পারবে না।

কিন্তু শুধুমাত্র তিনজন কি চারজন বন্ধুকে ঠকিয়েই কি তার কাজ শেষ?

এ প্রশ্নটা ক'দিন থেকেই নিকুঞ্জকে ভাবিয়ে তুলেছে। সে বুঝেছে যে, তার আকাঙ্ক্ষা ঊর্ধ্বগামী পথ নিতে চাইছে। তার আর্টের দৌড় কতটা, সেটা জানার একটা গোপন বাসনা মাথা উঁচিয়ে উঠছে।

সেই বাসনা চরিতার্থ করার একটা সুযোগ এসে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই।

শশীবাবুর ঘরেই কথা হচ্ছিল এই ফ্ল্যাটবাড়ির কয়েকজন বাসিন্দার মধ্যে। নিকুঞ্জ সেখানে উপস্থিত। ভুজঙ্গবাবু একটু-আধটু ধর্মচর্চা করেন, তার মধ্যে প্রাণায়াম, কুম্ভক, রেচক, নাক দিয়ে জল টানা, এসব

আছে। গুজব শোনা যায়, তিনি নাকি সন্নাসী হতে হতে সংসারী হয়ে পড়েন। তবে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ আছে তাঁর, কেদার-বদ্রী কাশী-কামাখ্যা সব ঘোরা আছে কুণ্ডু স্পেশ্যালে। তিনিই বললেন তারাপীঠে এক তান্ত্রিক সাধু এসে আস্তানা গেড়েছেন, যাঁর ক্ষমতা নাকি পৌরাণিক সাধুদের হার মানায়।

'নামটা কী বললেন?' জিজ্ঞেস করল ব্যাঙ্কের চাকুরে হরবিলাস।

'নাম বলিনি,' বিরক্তভাবে বললেন ভুজঙ্গবাবু। রাগলে এঁর ভুরু উপরে ওঠে, ফলে চশমা নাক দিয়ে হড়কে নীচে নেমে যায়।

'হেঁচকি বাবা কী?' প্রশ্ন করল হরবিলাস।

হেঁচকি বাবা নামে একজন সাধুর কথা কাগজে বেরিয়েছিল বটে! ইনি নাকি ভক্তদের সামনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ হঠাৎ এমন হেঁচকি তোলেন যে মনে হয় অন্তিমকাল উপস্থিত, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে এমন ভাব করেন, যেন কিছুই হয়নি। অথচ উপস্থিত ডাক্তারেরাও বলেছেন এ-হেঁচকি মরণ-হেঁচকি ছাড়া কিছুই না।

ভুজঙ্গবাবু ডান হাতের তর্জনী দিয়ে চশমা নাকের উপর ঠেলে তুলে জানালেন সাধুর নাম কালিকানন্দ স্বামী।

'যাবেন নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন ইনসিওরেন্সের দালাল তনয়বাবু। 'আপনি যান তো আমিও ঝুলে পড়ি আপনার সঙ্গে। সাধুদর্শনে বেশ একটা ইয়ে হয়। কলকাতার এই হোলসেল নোংরামি আর ভাল্লাগে না।'

ভুজঙ্গবাবু বললেন তিনি যাবেন বলেই স্থির করেছেন।

নিকুঞ্জ আর কিছু না বলে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল। তার ধমনীতে রক্ত যে বেশ দ্রুত চলাচল শুরু করেছে সেটা সে বেশ বুঝতে পারছে। তান্ত্রিক সাজতে হলে কী কী জিনিস লাগে, কী কী তার কাছে আছে, এবং কী কী জোগাড় করতে হবে সেটা জানা চাই।

তাক থেকে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী নিয়ে কপালকুণ্ডলার তান্ত্রিকের বর্ণনাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল নিকুঞ্জ। আজও এ বর্ণনার কোনও পরিবর্তন হয়নি। সাধু সন্ন্যাসীদের চেহারা পৌরাণিক যুগে যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। নিকুঞ্জ একবার বেনারস গিয়েছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে মনে হয়েছিল যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের চেহারাটা এই একটা জায়গায় ধরা রয়েছে।

নিকুঞ্জর প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল।

তারাপীঠ হল বীরভূম। রামপুরহাটে নিকুঞ্জর এক খুড়তুতো ভাই থাকে। সেইখানে সে চলে যাবে তান্ত্রিক মেক-আপের সরঞ্জাম নিয়ে। তারপর সেখান থেকে তৈরি হয়ে নিয়ে হাজির হবে তারাপীঠে। তারপর হবে পরীক্ষা। সাধুবাবাজিদের মধ্যে সে বেমালুম মিশে যেতে পারে কিনা সেইটে তাকে দেখতে হবে। ভুজঙ্গবাবুরাও সেখানে থাকবেন; তাঁরাও তার ছদ্মবেশ ধরতে পারেন কিনা দেখা যাবে।

মেক-আপের অধিকাংশ জিনিসই নিকুঞ্জর ছিল, কেবল হাতে নেওয়ার যষ্টি, চিমটে আর কমণ্ডলু ছড়া। ঝাঁকড়া চুল আছে একটা, সেটাকে জটায় পরিণত করতে হবে। ও হয়ে যাবে; চিন্তার কোনও কারণ নেই।

ভুজঙ্গবাবু সপরিবারে বুধবার রওনা দিচ্ছেন খবর পেয়ে নিকুঞ্জ মঙ্গলবার বেরিয়ে পড়ল। ভাই সন্তোষকে আগেই খবর দেওয়া ছিল, যদিও কেন যাচ্ছে সেটা নিকুঞ্জ জানায়নি। ভাইয়ের বয়স বাইশ, বাবা মারা গেছেন গত বছর। তিনি ছিলেন রামপুরহাটে পূর্ণিমা টকিজের মালিক। এখন সন্তোষই মালিকানা ভোগ করছে, এবং হিন্দি ছবি দেখিয়ে পয়সাও কামিয়েছে মন্দ না। হয়তো হিন্দি ছবি দেখার জন্যই সে নিকুঞ্জর প্ল্যানের মধ্যে একটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেল। বলল, 'তোমার কোনও চিন্তা নেই নিকুঞ্জদা। আমার গাড়িতে করে সোজা নিয়ে গিয়ে তোমাকে একেবারে শ্মশানের মুখে নামিয়ে দেব।'

নিকুঞ্জের খেয়াল ছিল না যে, তারাপীঠের শ্মশানেই হচ্ছে মন্দির, আর শ্মশানেই যত সাধুদের আস্তানা। সন্তোষ বলাতে মনে পড়ল তারাপীঠের বিখ্যাত সাধু বামাক্ষ্যাপা তো শ্মশানেই সাধনা করতেন; ঠিক কথা।

বিষ্যুদবার দিন ভোর থেকে মেক-আপ শুরু করে দিল নিকুঞ্জ। দাড়ি গোঁফ জটা লাগানোর সঙ্গে

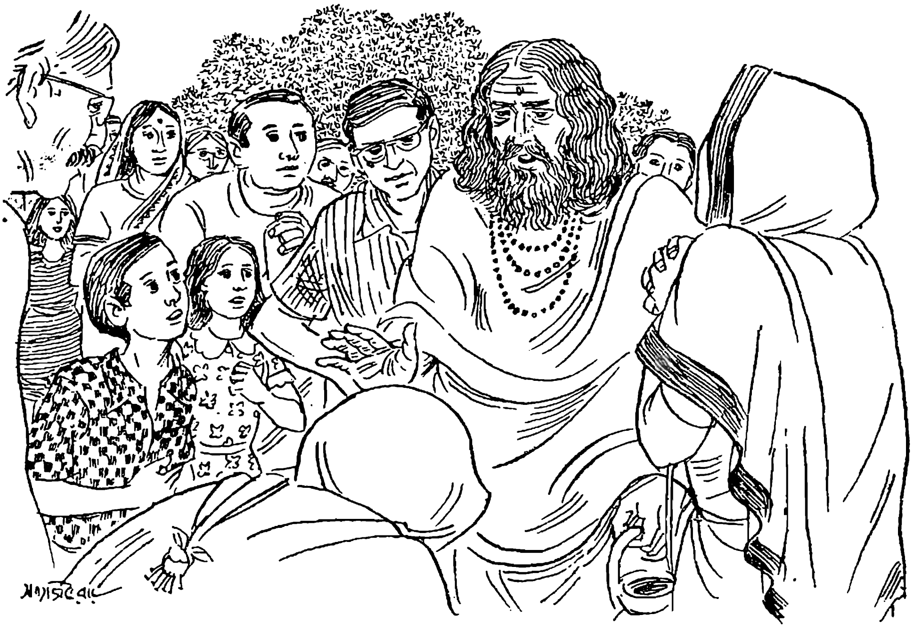

সঙ্গে তার পরিচয় লোপ পেল। তারপর কপালে চন্দনের প্রলেপ আর লাল ফোঁটা দিয়ে গলায় তিন গাছি বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা পরে গায়ে গেরুয়া বস্ত্র চাপানোর সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঢিপ করে এক প্রণাম করল নিকুঞ্জকে।

'ওফ্‌ফ্‌—নিকুঞ্জদা—এ যা হয়েছে না! কার বাপের সাধ্যি তোমাকে চেনে। নেহাত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি বলে, নইলে আমিও ব্যোমকে যেতুম।'

এই ক' মাসে হাত পেকেছে, তাই দুপুর আড়াইটার মধ্যে মেক-আপ হয়ে গেল। চিমটে-কমণ্ডলু নতুন কেনা, তাই তাদেরও একটু মেক-আপ করে পুরনো করে নেওয়া হল। চারটের মধ্যে সম্পূর্ণ তৈরি নিকুঞ্জ সাহা ওরফে ঘনানন্দ মহারাজ। একটা নাম না দিলে চলে না, যদিও নিকুঞ্জ মাঝে মাঝে বম বম ছাড়া কথা বলবে না বলেই স্থির করেছে। সাধুরা অন্য জগতের মানুষ; সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কথা বলতে হবে এমন কোনও কথা নেই। নামটা দরকার হচ্ছে সন্তোষের জন্য। সেই বলেছে, 'নিকুঞ্জদা, তুমি যখন গাড়ি থেকে নামবে, লোকে তো ঘিরে ধরবেই। তখন যদি জিজ্ঞেস করে কে, তার জন্য একটা নামের দরকার।' ঘনানন্দ দিব্যি গম্ভীর নাম। সন্তোষ এখন নিশ্চিন্ত।

সন্তোষ সচরাচর নিজেই গাড়ি চালায়। কিন্তু এবার সে একটা ড্রাইভার সঙ্গে নিল। বলল, 'আমাকে সাধুবাবার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে হবে, গাড়িটা কিন্তু আপনার জিম্মায় থাকবে।'

একটা কথা নিকুঞ্জ সন্তোষকে না বলে পারল না। 'ওখানে পৌঁছনোর পর আমি কিন্তু একা হয়ে যেতে চাই। আমার লক্ষ্য হবে কালিকানন্দ। তাঁর আশেপাশে আরও পাঁচজন সাধুবাবা কি থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। আমি সেই দলে গিয়ে ভিড়ব। তুই বরং আলগা থেকে ভক্তদের দলে গিয়ে বসে পড়িস।'

'তোমার কোনও চিন্তা নেই, নিকুঞ্জদা।'

সন্তোষের গাড়ি যখন তারাপীঠ শ্মশানে পৌঁছল, তখন সূর্য ডুবতে আরও আধ ঘণ্টা বাকি। আর পাঁচটা পীঠস্থানের মতো এখানেও লোকের ভিড়, পাণ্ডার ভিড়, পথের দু'ধারে লাইন করা দোকানে গাঁদাফুল আবির কুমকুম বই ক্যালেন্ডার চা বিস্কুট তেলেভাজা মাছিবসা-জিলিপি ইত্যাদি সবই রয়েছে।

নিউ মহামায়া কেবিনের পর নিকুঞ্জর এখানে এসে এক আশ্চর্য নতুন অভিজ্ঞতা হল। গেরুয়া পরা লোক দেখলেই লোকের মনে যে কী করে ভক্তিভাব জেগে ওঠে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। গাড়ি থেকে নামামাত্র নিকুঞ্জ দেখল যে, গড় করা শুরু হয়ে গেছে। ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ কেউ বাদ নেই। আপনা থেকেই আশীর্বাদের ভঙ্গিতে নিকুঞ্জর হাতটা উঠে সামনের দিকে এগোতে শুরু করল। শেষে এমন হল যে, হাত টেনে নেওয়ারও অবসর নেই। পাশে সন্তোষ না থাকলে তাকে বোধহয় এক জায়গাতেই আটকে পড়তে হত। 'দাদা সরুন, মা পথ দিন, পথ দিন'—এই করে সন্তোষ কোনওমতে একটা অপেক্ষাকৃত জনবিরল জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলল নিকুঞ্জকে। এখানে চারদিকে সাধুর অভাব নেই, ফলে আলাদা করে নিকুঞ্জর দিকে লোকের দৃষ্টি পড়ার কোনও কারণ নেই।

এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে নিকুঞ্জ দেখল যে, কিছুদূরে একটা বটগাছের নীচে একটা ভিড় দেখা যাচ্ছে। গেরুয়া ছাড়াও অন্য রঙ রয়েছে সেখানে। সন্তোষ বলল, 'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি দেখে আসছি ওইখেনেই কালিকানন্দ বসেছেন কিনা। ওঁর সামনে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে তবে আমার কাজ শেষ। আমি আপনাকে চোখে চোখে রাখব, তারপর যখন যাওয়ার ইচ্ছে হবে তখন আমাকে ইশারা করলেই আমি বুঝতে পারব।'

সন্তোষ দেখে এসে ফিসফিস করে জানাল ওই ভিড়টা কালিকানন্দের জন্যই বটে! 'আপনি সোজা এগিয়ে যান নিকুঞ্জদা। কুছ পরোয়া নেই।'

পরোয়া নিকুঞ্জর এমনিতেও নেই। সে এখানে এসে অবধি অত্যন্ত সহজ বোধ করছে। সেইসঙ্গে একটা পরম তৃপ্তির ভাব। মেক-আপে তার জুড়ি কেউ নেই সে বিশ্বাসটা তার মনে আজ পাকা হয়েছে।

নিকুঞ্জ এগিয়ে গেল ভিড়ের দিকে। পথে দু-একজন গড় করল। নিকুঞ্জ যথারীতি হাত বাড়িয়ে আশীর্বাদ করল।

উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত বাণী কিছুক্ষণ থেকেই শোনা যাচ্ছে; নিকুঞ্জ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ক্রমশ জোর হয়ে আসছে। আরেকটু এগিয়ে যেতেই সে দেখতে পেল কালিকানন্দকে। বাঘের মতো চেহারা বটে, এবং বাঘছালের উপরেই বসেছেন তিনি। তিনিই বাণী শোনাচ্ছেন ভক্তদের। সবই ছেঁদো কথা, কিন্তু বলার ঢঙে বিশেষত্ব আছে। আর সেইসঙ্গে চোখের দৃষ্টিতেও। মণিকে ঘিরে যে সাদা অংশ সেটা সাদা নয়, গোলাপি। গাঁজা খাওয়ায় ফল কি? হতেও পারে।

ভক্তের সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাটের বেশি নয়, তবে একজন দু'জন করে ক্রমেই বাড়ছে। ওই তো ভুজঙ্গবাবু আর তাঁর স্ত্রী! তনয়বাবুও নিশ্চয়ই আছেন ভিড়ের মধ্যে। ভুজঙ্গবাবুরা মনে হয় বেশ সকাল সকাল এসেছেন, কারণ তাঁদের স্থান ভক্তদের একেবারে প্রথম সারিতে।

কালিকানন্দের দু'পাশে এবং পিছনে দশ-বারোজন গেরুয়াধারী বসেছেন, তাঁদের সকলেরই গোঁফদাড়ি জটা, রুদ্রাক্ষের মালা, সর্বাঙ্গে ভস্ম। অর্থাৎ নিকুঞ্জর সঙ্গে তাঁদের চেহারার তফাত করা প্রায় অসম্ভব।

নিকুঞ্জ ভিড়ের পিছন দিয়ে এগিয়ে গেল সাধুদের দলের দিকে। কোত্থেকে যেন একটা গান ভেসে আসছে—

কে হরি বোল হরি বোল বলিতে যায়
যা রে মাধাই জেনে আয়
বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায়
যাদের সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়—

হঠাৎ গানটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেন? কারণ আর কিছুই না—কালিকানন্দের কথা থেমে গেছে।

নিকুঞ্জের দৃষ্টি গেল সাধুবাবার দিকে।

কালিকানন্দ তার দিকেই চেয়ে আছে। একদৃষ্টে। রাঙা চোখে।

নিকুঞ্জের হাঁটা থেমে গেছে।

অন্যান্য সাধু আর ভক্তদের দৃষ্টিও তার দিকে।

এবার কালিকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন এল, 'বাবাজির ভেক ধরা হয়েছে, অ্যাঁ? গেরুয়া পরলেই সাধু হয়? গলায় মালা পরলেই সাধু? গায়ে ছাই মাখলেই সাধু? অ্যাঁ? তোর আস্পর্ধা তো কম না? তোর জটা ধরে যদি টান দিই, তখন কী হবে? কোথায় যাবে তোর সাধুগিরি?'

চোখের পলকে সন্তোষ হাজির নিকুঞ্জের পাশে।

'আর নয় দাদা। সোজা গাড়িতে।'

নিকুঞ্জের সমস্ত দেহ অবশ, কিন্তু তাও পালানো ছাড়া পথ নেই। সন্তোষের কাঁধে ভর করে প্রায় চোখ বন্ধ করে সে রওনা দিল শ্মশানের গেটের উদ্দেশে। কান তো খোলা, তাই কালিকানন্দের শেষ কথাগুলো না শুনে পারল না—'এই ভণ্ডামির ফল কী তা জানো তুমি, নিকুঞ্জ সাহা?'

কলকাতায় পৌঁছে বাসা বদল করতে হল। আর এ তল্লাটেই নয়। ভুজঙ্গবাবুর সামনে ঘটেছে ঘটনাটা; তিনি এসেই হাটে হাঁড়ি ভাঙবেন। তখন আর টিটকিরিতে কান পাতা যাবে না। ভবানীপুরে কাঁসারিপাড়া লেনে একটা ফ্ল্যাট পাওয়া গেল ভাগ্যক্রমে। ফ্ল্যাট মানে দেড়খানা ঘর। ভাড়া আড়াইশো টাকা। বাপরে বাপ—তান্ত্রিকের কী তেজ, কী অন্তর্দৃষ্টি। পাদ্রি, পুরুত, মোল্লা, দরবেশ—এইসব মেক-আপের যা সরঞ্জাম ছিল নিকুঞ্জর কাছে, সব বাক্স থেকে বার করে নিয়ে কাছেই আদিগঙ্গার জলে ফেলে দিল সে।

তিন হপ্তা গেল আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে। ইতিমধ্যে নতুন পাড়ার আলাপী হয়েছে দু-একজন। এখানেও রয়েছে বাড়ি থেকে আধমাইলের মধ্যে বড় রাস্তায় একটি রেস্টোরান্ট, নাম পরাশর কেবিন। এখানে কেউই জানে না নিকুঞ্জের কলঙ্কময় ইতিহাস—তারকবাবু, নগেন মাস্টার, শিবু পোদ্দার। শিবু আবার থিয়েটারে পার্ট করে। নিকুঞ্জকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল একদিন তপন থিয়েটারে 'আগুনের ফুলকি' দেখাতে। 'দেখবেন কেমন ফার্স্ট ক্লাস মেক-আপ নিই', যাওয়ার আগে বলেছিল শিবু। নিকুঞ্জ দেখে হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারেনি। এ-ই মেক-আপ! এরা কি ভাল মেক-আপ দেখেছে কোনওদিন? আমার মেক-আপ দেখলে তো এদের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

পরক্ষণেই অবিশ্যি মনে পড়ল তারাপীঠের অভিজ্ঞতার কথা। তবু, তান্ত্রিকদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা তো শোনাই যায়। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নিকুঞ্জর চালে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল, এই যা!

কিন্তু তাই বলে কি তার এত সাধের অকুপেশনটি একেবারে বরবাদ করে দিতে হবে? সে হয় না, হতে পারে না। আরও কত কী সাজতে বাকি আছে! যেমন, একটা সত্যি করে ষণ্ডা চরিত্র এখনও সাজা হয়নি। এক তান্ত্রিক ছাড়া যা সেজেছে সবই নিরীহ অমায়িক চরিত্র—যাদের দিকে এমনিতেই লোকের দৃষ্টি যায় না। চোখ যাবে অথচ চেনা যাবে না—তেমন একটা চরিত্রের মেক-আপ না করলে আর সত্যি করে সাফল্যের পরীক্ষা হবে কী করে?

কেমন হবে এই ষণ্ড চরিত্র? মাথায় কদমছাঁট চুল, মুখে চারদিনের দাড়ি, চোখের নীচে একটা ক্ষতচিহ্ন—যাকে বলে 'স্কার'—নাকটা একটু ভাঙা—মুষ্টিযোদ্ধার মতো—হাতে উলকি, গলায় চেন, পরনে বোতাম ছাড়া চেক শার্ট আর বর্মার লুঙ্গি।

তারাপীঠের অভিজ্ঞতার পর নিকুঞ্জর আর ছদ্মবেশের ত্রিসীমানায় যাওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু শখটা বোধহয় এমনই মজ্জাগত যে, কাজের বেলা দেখা গেল সে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বসে গেছে আবার আয়নার সামনে।

সকালবেলা চা খেয়েই কাজে লেগে যাওয়ার ফলে সেদিন আর নিকুঞ্জর খবরের কাগজটা দেখা হয়নি। ফলে খিদিরপুরে জোড়া খুনের খবরটা, এবং পলাতক আততায়ী ডাকসাইটে গুণ্ডা বাঘা মণ্ডলের ছবিটাও দেখা হয়নি। যদি হত তা হলে অবিশ্যি নিকুঞ্জ মেক-আপটা অন্যরকম ভাবে করত। বাঘা মণ্ডলের ছবি মাস ছয়েক আগেও একবার বেরিয়েছিল কাগজে। সেটা একটা দুঃসাহসিক ডাকাতির পরে। সেবারও বাঘা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিল। কাগজে ছবি ছাপার উদ্দেশ্য ছিল

জনসাধারণকে সতর্ক করা। সেই প্রথমবারের ছবি কি নিকুঞ্জ দেখেছিল, আর সেই চেহারা তার মনের অবচেতনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল? না হলে আজ সে হুবহু বাঘা মণ্ডলের ছদ্মবেশ নেবে কেন?

ছবি দেখে থাকলেও, বাঘা সংক্রান্ত ঘটনাবলী নিশ্চয়ই নিকুঞ্জর জানা ছিল না। যদি থাকত তা হলে তাকে এসে টেবিলে বসতে দেখে যেভাবে পরাশর কেবিন খালি হয়ে গেল, সেটা তার মনে কোনও বিস্ময়ের সৃষ্টি করত না।

ব্যাপারটা কী? এরা এরকম করছে কেন? ম্যানেজার উঠে কোথায় গেলেন? বয়টা ওই কোণে ওরকম ফ্যাকাসে মুখ করে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে কেন?

ম্যানেজার যে পাশের ডাক্তারখানায় গিয়েছেন পুলিশে ফোন করতে এবং সেই ফোন যে পুলিশ ভ্যানকে চুম্বকের মতো টেনে আনবে নিকুঞ্জের পাড়ায়, সেটা আর নিকুঞ্জ জানবে কী করে? তবে এমনও দেখা যায় যে, একজন লোকের চরম সংকটের মুহূর্তে তার উদ্ধারকল্পে ভাগ্যদেবতা পুরো হাতটা না হলেও, অন্তত একটা আঙুল তার দিকে বাড়িয়ে দেন। সেই আঙুলই হল নিকুঞ্জর পাশের চেয়ারে পড়ে থাকা একটি দৈনিক কাগজ। কাগজটা পুরো দেখারও দরকার নেই। যে পাতায় সেটা খোলা রয়েছে, তাতেই রয়েছে খুনি বাঘা মণ্ডলের ছবি, আর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত গরম খবর।

এই মুখই আজ নিকুঞ্জের আয়নায় তারই চোখের সামনে ক্রমে ফুটে উঠেছে।

নিকুঞ্জর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও কাগজটা কাছে টেনে এনে খবরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়ার লোভ সে সামলাতে পারল না। আর নেওয়ামাত্র সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে দ্রুতপদে (দৌড়লে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে) কাঁসারিপাড়া লেনে নিজের বাসায় গিয়ে ঢুকতে সময় লাগল দশ মিনিট। একটা গাড়ির শব্দ সে পিছন থেকে পেয়েছে, এবং ঠিকই সন্দেহ করেছে সেটা পুলিশ ভ্যান—কিন্তু সেদিকে দৃকপাত করেনি। আসুক পুলিশ। পুলিশই বোকা বনবে। তারা সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় পৌঁছনোর আগেই নিকুঞ্জর ছদ্মবেশ উধাও হয়ে যাবে। নিকুঞ্জ সাহা তো কোনও অপরাধ করেনি, করেছে বাঘা মণ্ডল।

ঘরে ঢুকে চাকরকে চায়ের জল চাপাতে বলে নিকুঞ্জ দরজাটা খিল দিয়ে বন্ধ করে দিল। ওই যাঃ!— লোড শেডিং। এখন জাপানি জেনারেটর চালাতে গেলে সময় লাগবে।

কুছ পরোয়া নেই। মোমবাতি আছে। কিন্তু আগে জামাটা ছেড়ে ফেলা উচিত। সে কাজটা অন্ধকারেই হবে।

নিকুঞ্জ এক নিমেষে লুঙ্গি শার্ট কালো কোট ছেড়ে খাটের উপর ছুড়ে ফেলে এক ঝটকায় আলনা থেকে পায়জামাটা নামিয়ে নিয়ে সেটাকে পরে ফেলল। তারপর দেশলাইয়ের আলোয় মোমবাতিটা দেরাজ থেকে বার করে সেটাকে জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখল।

এখনও পুলিশ ভ্যানের কোনও শব্দ নেই। পুলিশ হয়তো পাড়ায় নেমে খোঁজ নিচ্ছে কোন বাড়িতে ঢুকেছে বাঘা মণ্ডল। এ বাড়ির লোক অন্তত তাকে ঢুকতে দেখেনি। সামনের বা আশেপাশের বাড়ির কথা নিকুঞ্জ জানে না।

এইসব চিন্তার মধ্যেই নিকুঞ্জ হাত চালাতে শুরু করল। প্রথমে নকল গোঁফ।

নকল গোঁফ?

নকল যদি হবে তো টানলে খোলে না কেন? স্পিরিট গাম দিয়ে আটকানো গোঁফ তো এক টানেই খুলে যায়—তবে?

মোমবাতিটা মুখের কাছে এনে আয়নার দিকে ঝুঁকতে নিকুঞ্জর রক্ত জল হয়ে গেল।

এ গোঁফ তো নকল বলে মনে হয় না! এ যে তার চামড়া থেকেই গজিয়েছে! আঠার কোনও চিহ্ন তো এ গোঁফে নেই!

এ পরচুলাও তো পরচুলা নয়—এ যে তার নিজেরই চুল? এমনকী চারদিনের যে গজানো দাড়ি, যে দাড়ি সে একটি একটি করে গালে লাগিয়েছিল—তাতেও তো কৃত্রিমতার কোনও চিহ্ন নেই।

আর চোখের তলার ওই ক্ষতচিহ্ন? কোন ক্ষণজন্মা মেক-আপ শিল্পীর ক্ষমতা এমন ক্ষতচিহ্ন তৈরি করে রঙ তুলি আঠা আর প্লাস্টিসিনের সাহায্যে? এ তো সেই উনিশ বছর আগে এন্টালির গাঁজা পার্কে

বজ্রু শেখের সঙ্গে হাতাহাতির সময় ছুরির আঘাতের ফল! বাঘা তখন বাঘা হয়নি, তখন সে রাধু মণ্ডল, বয়স একুশ, সবে গুণ্ডামিতে তালিম নিচ্ছে মেঘনাদ রক্ষিতের কাছে।...

দরজা ভেঙে ঢুকতে হল পুলিশকে। মাটিতে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা বাঘা মণ্ডলের দিকে টর্চ ফেলে দারোগা চাকর নিতাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই লোক কি এ বাড়িতেই থাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি তো আমার মনিব।'

'কী নামে জানো ওঁকে?'

'নিকুঞ্জবাবু। সাহাবাবু।'

'হুঁঃ!—ভদ্রলোক সাজা হয়েছে!' বাঁকা হাসি হেসে বললেন দারোগাবাবু। তারপর কনস্টেবলের দিকে ফিরে বললেন, 'ওকে ধরে বেশ করে ঝাঁকাও তো দেখি। হুঁশ ফিরুক, তারপর বাকি কাজ।'

রিভলভার বার করে তাগ করে রইলেন দারোগা বেহুঁশ আততায়ীর দিকে।

ঝাঁকানি দিতেই প্রথমে বাঘা মণ্ডলের পরচুলাটা খসে মাটিতে পড়ল। তারপর গোঁফটা। তার প্লাস্টিসিন দিয়ে সযত্নে তৈরি ক্ষতচিহ্ন ও নাকের বাড়তি অংশটা উঠে এল নেট সমেত।

ততক্ষণে অবিশ্যি নিকুঞ্জ সাহার জ্ঞান ফিরেছে।

কাপালিকের ধমকানিতে যে কাজ হয়নি, আজ পুলিশের শাসানিতে তা হল।

নিকুঞ্জ এখন বই পড়ে মৃৎশিল্প বা ক্লে মডেলিং শিখছে। গঙ্গা কাছেই; নিতাই সেখান থেকে মাটি এনে দেয়। নিকুঞ্জর ইচ্ছা, নিতাই হবে তার প্রথম মডেল।

সন্দেশ, আষাঢ় ১৩৯০

মানপত্র

শতদল সংস্থার সেক্রেটারি প্রণবেশ দত্ত বিস্ফোরক সংবাদটি ঘোষণা করবার পর উপস্থিত সদস্যদের মুখ দিয়ে প্রায় এক মিনিট কোনও কথা বেরোল না। ক্লাবঘরে জরুরি মিটিং বসেছে নববর্ষের পাঁচদিন আগে। মিটিং-এর উদ্দেশ্য প্রণবেশ জানায়নি কাউকে, কেবল বলেছে 'আজ সকলের আসা চাই-ই, কারণ সংকটময় মুহূর্ত সমুপস্থিত।'

প্রথম মুখ খুলল জয়ন্ত সরকার।

'আর ইউ অ্যাবসোলিউটলি শিওর?'

জয়ন্ত লাগসই ইংরিজির হদিস পেলে বাংলা বলে না।

'বিশ্বাস না হয় চিঠি দেখো', বলল প্রণবেশ। 'এই তো। সমরকুমারের নিজের সই। আরও শিওরিটির দরকার আছে কি?'

সমরকুমারের চিঠিটা হাত ঘুরে আবার প্রণবেশের কাছেই ফিরে এল। হ্যাঁ, সমরকুমারেরই সই বটে ফিল্ম পত্রিকার দৌলতে এই সই কারুর চিনতে বাকি নেই—বিশেষ করে হ্রস্ব উ-এর ওই ডবল প্যাঁচ।

'কারণটা কী বলছে?' প্রশ্ন করল নরেন গুঁই।

'শুটিং,' বলল প্রণবেশ, 'হঠাৎ আউটডোর পড়ে গেছে কালিম্পঙে। অতএব ভেরি সরি।'

'আশ্চর্য,' বলল শান্তনু রক্ষিত। 'লোকটা ইয়েস বলে স্রেফ নো করে দিল?'

নরেন গুঁই বলল, 'আমি তো গোড়াতেই বলেছিলাম—ওসব চিত্রতারকা-ফারকা বাদ দে। ওদের কথার কোনও ভ্যালু নেই।'

'হোয়াট এ ক্যাটাসট্রফি!' কপালের ঘাম মুছে বলল জয়ন্ত সরকার।

'এর কোনও বিকল্প ব্যবস্থা হয় না?' প্রশ্ন করল চুনিলাল সান্যাল। চুনিলাল স্থানীয় বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউটে বাংলার শিক্ষক।

'এই লাস্ট মোমেন্টে আর কী বিকল্প ব্যবস্থা আশা করছ চুনিদা', বলল সেক্রেটারি প্রণবেশ। 'আর আমি তো চুপচাপ বসে নেই। এর মধ্যে দুবার ট্রাঙ্ককল করেছি কলকাতায়। নিমুর সঙ্গে কথা হয়েছে। বললাম গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে খেলুড়ে যা একটা ধর। সংবর্ধনা অ্যানাউন্স করা হয়ে গেছে, মানপত্র লেখা হয়ে গেছে। সম্বর্ধনা আমাদের দশ বছরের ট্র্যাডিশন, ওটা ছাড়া ফাংশন হবে না। নিমু বললে, নো চান্স। এক কলকাতাতেই সাত-সাতটা সংস্থা সংবর্ধনার আয়োজন করেছে। ক্যানডিডেটের চয়েস তো বেশি নেই। নামকরা যে কজন আছে সবাই এংগেজড। পল্টু ব্যানার্জিকে তো একদিন দু-জায়গায় সংবর্ধনা নিতে হচ্ছে; তাও একই শহরে বলে পারছে। শ্যামল সোম, রজত মান্না, হরবিলাস গুপ্ত, দেবরাজ সাহা—সব বেটাকে একধার থেকে কোনও-না-কোনও ক্লাব বুক করে রেখেছে।'

'তুমি যে মানপত্রের কথা বললে', বললেন ইন্দ্রনাথ রায়—যিনি এখানে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ—

'সমরকুমারের জন্য যে মানপত্র লেখা হয়েছে সেটা তুমি অন্যের ঘাড়ে চাপাবে কী করে?'

'আপনি বোধহয় মানপত্রটা দেখেননি, ইন্দ্রদা', বলল প্রণবেশ।

'না, দেখিনি।'

'তাই। ওর কোথাও ফিল্মস্টার বা ফিল্মের কোনও কথা নেই। অ্যাড্রেস করা হয়েছে "হে সুধী" বলে। সুধী তো এনিওয়ান হতে পারে।'

'দেখি মানপত্রটা।'

দেরাজ থেকে একটা পুরু পাকানো কাগজ বার করে সেটা ইন্দ্রনাথ রায়ের হাতে দিয়ে দিল প্রণবেশ।—'এটা লিখতে মনোতোষের ঝাড়া সাতদিন লেগেছে। ভাষাটা অবিশ্যি চুনিদার।'

চুনিলাল খুক করে একটা কাশি দিয়ে তার অস্তিত্বটা জানান দিল।

' "তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই"—এ কী, এ কী—এ যে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!'

পাকানো কাগজটা খুলে ধরেছেন ইন্দ্রনাথ। তাঁর কপালে খাঁজ, দৃষ্টি চুনিলালের দিকে।

'তা তো হবেই', বলল চুনিলাল, 'রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে স্যার জগদীশ বোস কবিগুরুকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ভাষাটা শরৎচন্দ্রের। এটা তার প্রথম লাইন।'

'সে লাইন তুমি বেমালুম লাগিয়ে দিলে?'

'কোটেশনে আপত্তি কীসের ইন্দ্রদা? এ তো বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি, শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেই চিনবে। এর চেয়ে ভাল ধরতাই হয় না।'

'আর ক'টা কোটেশন আছে এতে?'

'আর নেই ইন্দ্রদা', বলল চুনিলাল। 'বাকিটা সম্পূর্ণ মৌলিক।'

মানপত্র টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে একটা হাই তুলে ইন্দ্রনাথ বললেন, 'তা হলে বোঝো এখন তোমরা কী করবে।'

অক্ষয় বাগচীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, মেজাজও বেশ ভারিক্কি। তিনি একটা উইলস ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'নামের মোহটা যদি ত্যাগ করতে পারো তো আমি একজনের নাম সাজেস্ট করতে পারি। সংবর্ধনা ছাড়া যখন ফাংশন হবে না, তখন তার কথাটা তোমরা ভেবে দেখতে পারো।'

'নামের কথাটা যে এখন ভুলে যেতে হবে সে তো বুঝতেই পারছি', বলল প্রণবেশ। 'তবে তাই বলে তো আর রাস্তা থেকে লোক ডেকে রিসেপশন দেওয়া যায় না। কোনও একটা কনট্রিবিউশন তো থাকতে হবে লোকটার!'

'আছে', বললেন অক্ষয় বাগচী, 'এঁর আছে।'

'কার কথা বলছেন আপনি?' ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল প্রণবেশ।

'হরলাল চক্রবর্তী।'

নামটা উচ্চারণ করার পরে ক্লাবঘরে বেশ কয়েক মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য। উপস্থিত সভ্যদের অনেকেই যে এ নামটা শোনেনি সেটা বোঝা যাচ্ছে। কেবল ইন্দ্রনাথ রায় কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে থেকে অক্ষয় বাগচীর দিকে চেয়ে বললেন, 'হরলাল চক্রবর্তী মানে আর্টিস্ট হরলাল চক্রবর্তী?'

'হ্যাঁ, আর্টিস্ট', মাথা নেড়ে বললেন অক্ষয় বাগচী। 'আমরা ছেলেবেলা থেকে তাঁর আঁকা ছবি দেখে এসেছি গল্পের বইয়ে। বেশিরভাগ পৌরাণিক ছবি। এককালে খুব পপুলার ছিলেন। ছেলেদের পত্রিকাতেও ছবি আঁকতেন রেগুলারলি। আমার মনে হয় তেলা মাথায় তেল দেওয়ার চেয়ে এইটে অনেক ভাল হবে।'

'কথাটা মন্দ বলোনি অক্ষয়', সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন ইন্দ্রনাথ। 'আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি। আমারও এখন পষ্ট মনে পড়ছে তাঁর আঁকা ছবি। আমাদের বাড়িতে কাশীদাসের একটা এডিশন ছিল, তাতে তাঁরই আঁকা ছবি ছিল।'

'ভাল ছবি?' প্রশ্ন করল জয়ন্ত সরকার। 'মানে, যাকে দেওয়া হবে সংবর্ধনা—ডাজ হি ডিজার্ভ ইট?'

এবার নরেন গুঁই নড়েচড়ে বসল।—'মনে পড়েছে। আমার বাড়িতে একটা হাতেমতাই ছিল। তার ছবিতে এইচ চক্রবর্তী সই ছিল। মনে পড়েছে।'

‘এনি গুড?’ জিজ্ঞেস করল জয়ন্ত সরকার।
‘বটতলার বাবা।’
কথাটা বলে নরেন গুঁই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বয়োজ্যেষ্ঠদের দৃষ্টির আড়ালে সিগারেটে দুটো টান মেরে আসতে হবে।
‘ছবি ভাল কি মন্দ সেটা বড় কথা নয়,’ বললেন ইন্দ্রনাথ রায়। ‘লোকটা একটানা বহুকাল ধরে কাজ করে গেছে। অক্লান্ত কর্মী। চাহিদা যখন ছিল তখন নিশ্চয়ই পপুলারিটি ছিল। অথচ বাগচী যেটা বলল, যাকে বলে রেকগনিশন, সে জিনিস সে নিশ্চয়ই পায়নি! সেটা শতদল সংস্থা তাকে দেবে।’
‘আর সবচেয়ে বড় কথা,’ বললেন অক্ষয় বাগচী, ‘আর সুবিধের কথা—সে এই শহরেরই লোক। তার জন্য কলকাতা ছুটোছুটি করতে হবে না।’
‘আরেব্বাস,’ বলল প্রণবেশ, ‘এটা তো জানা ছিল না!’
তথ্যটা উপস্থিত সকলের কাছেই নতুন বলে ক্লাবঘরে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে।
‘কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন...?’ প্রণবেশ অক্ষয় বাগচীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিল।
‘আমি জানি,’ বললেন বাগচী। ‘কুমোরপাড়ার শেষ মাথায় যেখানে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে, সেটা ধরে বাঁয়ে কিছুদূর গেলেই মন্মথ ডাক্তারের বাড়ি। তিনি একবার বলেছিলেন হরলাল চক্রবর্তী তাঁর প্রতিবেশী।’
‘আপনি তাঁকে চেনেন? হরলালকে?’
‘চিনি মানে, বছর পাঁচেক আগে একবার মুখুজ্যেদের বাড়িতে দেখেছিলাম। এক ঝলকের দেখা আর কি। বোধহয় ওদের বাড়ির জন্য কিছু ছবি আঁকছিলেন।’
‘কিন্তু’—প্রণবেশের মনে এখনও খটকা।
‘কিন্তু কী?’ জিজ্ঞেস করলেন ইন্দ্রনাথ রায়।
‘না, মানে, নামটা তো অ্যানাউন্স করতে হবে যদি উনি রাজি হন সংবর্ধনা নিতে।’
‘তাতে কী হল?’
‘লোকে যদি সে নাম না শুনে থাকে, তা হলে...’
‘তা হলে ভাববে এ আবার কাকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে—তাই তো?’
‘হ্যাঁ, মানে—’
‘কিছু না। নামের আগে জুড়ে দেবে “প্রখ্যাত প্রবীণ চিত্রশিল্পী”—ব্যস। যারা তাঁর নাম জানে না তারা জানুক। এটাও তো শতদল সংস্থার একটা দায়িত্ব, নয় কি?’
‘রেসকিউইং ফ্রম ওবলিভিয়ন,’ বললে জয়ন্ত সরকার। ‘ভেরি গুড আইডিয়া।’
আইডিয়াটা যে ভেরি গুড সেটা মোটামুটি সকলেই মেনে নিল। উৎসাহের নিভু-নিভু আগুন ইন্ধন পেয়ে আবার হলকে উঠল। সকলেই স্বীকার করল যে, এতে শতদল সংস্থার প্রেস্টিজ বাড়বে বই কমবে না। তারা যেটা করতে চলেছে সেটা মামুলি সংবর্ধনা নয়, সেটা একটা সামাজিক কর্তব্যও বটে! হয়তো এটাই হবে ভবিষ্যতের রেওয়াজ। বাংলার যেসব কৃতী সন্তান অন্ধকারে পড়ে আছেন তাঁদের আলোতে তুলে ধরা।
ঠিক হল অক্ষয় বাগচী নিজে যাবেন প্রণবেশ ও ক্লাবের আরেকটি সভ্যকে নিয়ে হরলাল চক্রবর্তীর বাড়ি। কাল সকালেই যাওয়া দরকার, কারণ আর সময় নেই। চক্রবর্তী মশাই রাজি হলে, ক্লাবের প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে পোস্টারে সমরকুমারের জায়গায় নতুন নাম বসিয়ে দিতে হবে। নামের আগে অবিশ্যি ‘প্রখ্যাত প্রবীণ চিত্রশিল্পী’ কথাটা বাদ দিলে চলবে না।

গোলাপি রঙের একতলা বাড়ির ফটকে ‘হরলাল চক্রবর্তী, আর্টিস্ট’ ফলক থাকায় কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল। অক্ষয় বাগচী ভুল বলেননি; এই বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই মন্মথ ডাক্তারের বাসস্থান। প্রণবেশ ও বাগচীমশাই ছাড়া সঙ্গে এসেছেন বাংলার শিক্ষক চুনিলাল সান্যাল।
তিনজনে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।
বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা ফুলের বাগান, তাতে একটা আমড়া গাছ। পরিবেশ ছিমছাম হলেও

সচ্ছলতার কোনও পরিচয় নেই। বোঝাই যাচ্ছে হরলাল চক্রবর্তীর ভাগ্যে যে শুধু খ্যাতিই জোটেনি তা নয়, অর্থোপার্জনের ব্যাপারেও তিনি তেমন সুবিধে করতে পারেননি।

দরজায় টোকা দেবার আর দরকার হল না, কারণ পক্ব গুম্ফবিশিষ্ট চশমাপরিহিত এক ভদ্রলোক, হয়তো জানলা দিয়ে আগন্তুকদের দেখেই, দরজা খুলে এলেন। পরনে লুঙ্গি করে পরা ধুতির উপর লম্বাহাতা জালিদার গেঞ্জি।

অক্ষয় বাগচী নমস্কার করে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার বোধহয় মনে নেই, বছর পাঁচ-সাত আগে ধরণী মুখুজ্যের বাড়িতে একবার আপনার সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছিল।'

'ও—'

'একটা ইয়ে, মানে, কথা ছিল আপনার সঙ্গে', বলল প্রণবেশ। 'একটু বসা যায় কি?'

'আসুন না।'

দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁয়ে বৈঠকখানা। কিছু বাঁধানো পেন্টিং, তাতে ইংরিজিতে এইচ চক্রবর্তী সই সুস্পষ্ট। এ ছাড়া অনাড়ম্বর পরিবেশ। তক্তপোশ ও কাঠের চেয়ার মিলিয়ে সকলেরই বসার জায়গা হয়ে গেল।

'আমরা আসছি শতদল সংস্থার পক্ষ থেকে,' বলল প্রণবেশ।

'শতদল সংস্থা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা ক্লাব। এখানের খুব নামকরা ক্লাব। বরদাবাবু—বরদা মজুমদার এম, এল, এ—আমাদের প্রেসিডেন্ট।'

'ও।'

'আমরা প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ একটা ফাংশন করি। একটু গান-বাজনা হয়, একটা একাঙ্ক নাটিকা, আর তার সঙ্গে, বাংলার সংস্কৃতির ব্যাপারে যাঁর কিছু অবদান আছে এমন একজনকে আমরা সংবর্ধনা দিই। এবার আপনার কথাটাই মনে পড়ল। আপনি আমাদের শহরের লোক, অথচ, মানে, তেমন করে তো কেউ আপনাকে চেনে না...'

'হুঁ—। পয়লা বৈশাখ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে তো আর মাত্র চারদিন।'

'হ্যাঁ। মানে, একটু লেট হয়ে গেল। কতকগুলো—' প্রণবেশ গলা খাঁকরে নিল—'অসুবিধা ছিল।'

'বুঝলাম। তা, সম্বর্ধনা মানে...?'

'কিছুই না। ছ'টা নাগাদ আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব গাড়িতে করে। সন্ধ্যা ছ'টা। আপনার আইটেমটা একদম শেষে। আপনাকে একটা মানপত্র দেওয়া হবে, ইনি—মিস্টার বাগচী—আপনার সম্বন্ধে দুটো কথা বলবেন, আর শেষে আপনিও যদি দুকথা বলেন তা হলে তো কথাই নেই। ন'টার মধ্যে ফাংশন শেষ।

'হুঁ—।'

'আপনার বাড়ির লোক, মানে, আপনার স্ত্রী...'

'উনি তো বাতের রুগি।'

'ও। তা আপনি যদি আর কাউকে নিয়ে যেতে চান...'

'সেটা দেখা যাবে'খন।'

এবার অক্ষয় বাগচী একটা কাজের কথা পাড়লেন।

'আপনার সম্বন্ধে একটা ইনট্রোডাকশন দিতে পারলে ভাল হত।'

'ঠিক আছে। আমি কিছু তথ্য লিখে রাখব একটা কাগজে। আপনারা কাল যদি কাউকে পাঠিয়ে দেন—'

'আমি নিজেই এসে নিয়ে যাব,' বলল প্রণবেশ।

শতদল সংস্থার তিন সদস্য উঠে পড়লেন। হরলাল চক্রবর্তী যেন এতক্ষণে ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর চোখের কোণ চিকচিক করছে বলে মনে হল প্রাণবেশের।

অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যে সুনাম আছে শতদল সংস্থার, এই পয়লা বৈশাখেও সেটা অক্ষুণ্ণ রইল। হরলাল চক্রবর্তীর নাম শুনে 'ইনি আবার কিনি' বলে যে প্রশ্ন উঠেছিল, সংবর্ধনার পরে সে প্রশ্ন আর কেউ করেনি। সরকারি আর্ট স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবন, পেশাদারি শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর অক্লান্ত স্ট্রাগল, পৌরাণিকী সিরিজের ছাপ্পান্নখানা বই ও অজস্র শিশু পত্রিকার পাতায় তাঁর ছবি, রায়বাহাদুর এল. কে. গুপ্তর প্রশংসাপত্র, বর্ধমান মহারাজাধিরাজ কর্তৃক প্রদত্ত রৌপ্য পদক এবং সবশেষে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে আরথ্রাইটিস রোগের আক্রমণ হেতু বাষট্টি বছর বয়সে চিত্রাঙ্কন থেকে অবসর গ্রহণ—এ সবই তথ্য আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই অবগত হলেন। হরলাল নিজে শতদল সংস্থার উদ্যমের প্রশংসা করে শুধু একটি কথাই বললেন—'এই প্রশংসাপত্র আমার প্রাপ্য নয়।' তাঁর বিনয়সূচক এই উক্তি অবিশ্যি সকলের মনেই গভীরভাবে রেখাপাত করল।

পুষ্পমাল্য ও ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্র নিয়ে হরলাল যখন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট নীহার চৌধুরীর গাড়িতে উঠছেন তখন তিনি বেশি খুশি না শতদল সংস্থার সভ্যরা বেশি খুশি তা বলা শক্ত। শেষ কথা বললেন ইন্দ্রনাথ রায়, 'আগামী বছরের সম্বর্ধনা তোমরা বাগচীকেই দিও, প্রণবেশ ভায়া। সেই তো ক্লাবের মানটা বাঁচালো।'

পরদিন সকালে সংস্থার আপিসে একটি লোক এসে সেক্রেটারির নামে একটি মোড়ক দিয়ে গেল। প্রণবেশ মোড়কটা খুলে ভারী অবাক হয়ে দেখলে তাতে রয়েছে হরলাল চক্রবর্তীর মানপত্র। সঙ্গের চিঠি রহস্য উদঘাটন করবে মনে করে সেটি খুলে প্রণবেশ যা পড়ল তা হল এই—

শতদল সংস্থার সেক্রেটারি মহাশয় সমীপে সবিনয় নিবেদন—

সেদিন আপনাদের কথায় মনে হয়েছিল আপনারা নেহাত বিপাকে পড়ে হরলাল চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনাদের ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করতে পেরে আমি পুলক বোধ করছি। তবে মানপত্রটি ফেরত দিতে বাধ্য হলাম। তার কারণ, প্রথমত, পড়ে দেখলাম যে নাম ও তারিখ বদল করে এটি আপনারা স্বচ্ছন্দে আগামী বছর কাজে লাগাতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, এই মানপত্র সত্যিই আমার প্রাপ্য নয়। চিত্রশিল্পী হরলাল চক্রবর্তী আজ তিন বছর হল এই শহরেই দেহরক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন আমার দাদা। আমি কাঁথিতে পোস্টাপিসের সামান্য কর্মচারী। এখানে এসেছিলাম সাতদিনের ছুটিতে।

ইতি ভবদীয়
রসিকলাল চক্রবর্তী

সন্দেশ, শ্রাবণ ১৩৯০

অপদার্থ

অপদার্থ কথাটা অনেক লোক সম্বন্ধে অনেক সময়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন আমাদের চাকর নবকেষ্ট। 'নব, তুই একটা অপদার্থ'—এই কথাটা ছেলেবেলায় মার মুখে অনেকবার শুনেছি। নব কিন্তু কাজ ভালই করত; দোষের মধ্যে সে ছিল বেজায় ঘুমকাতুরে। দিনের বেলা প্রায়ই একটু টেনে ঘুম দেওয়ার ফলে বিকেলে চায়ের জলটা চড়াতে চারটের জায়গায় হয়ে যেত সাড়ে চারটে। কাজেই মা যে তাকে অপবাদটা দিতেন সেটা ছিল রাগের কথা।

কিন্তু সেজোকাকার বেলায় অপদার্থ কথাটা যেরকম লাগসই ছিল সেরকম আর কারুর বেলায় হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সেজোকাকা মানে যাঁর ভালনাম ক্ষেত্রমোহন সেন, ডাকনাম ক্ষেতু। বাবারা ছিলেন পাঁচ ভাই। বাবাই বড়, তারপর মেজো সেজো সোনা আর ছোট। পাঁচের মধ্যে সেজো বাদে আর সকলেই জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। বাবা ছিলেন নামকরা উকিল। মেজো সম্মানিত অধ্যাপক, সংস্কৃত আর ইতিহাসে ডবল এম. এ। সোনা ব্যবসা করে কলকাতায় তিনখানা বাড়ি তুলেছিলেন, আর ছোট কালোয়াতি গানে বড়বড় মুসলমান ওস্তাদের বাহবা আর ছত্রিশটা সোনা-রুপোর মেডেল পেয়েছিলেন ধনী সমঝদারদের কাছ থেকে।

আর সেজোকাকা?

তাঁকে নিয়েই এই গল্প, তাই তাঁর কথাটা এককথায় বলা যাবে না।

সেজোকাকার জন্মের মুহূর্তে নাকি ভূমিকম্প হয়েছিল। অনেকের মতে সেই কারণে নাকি তাঁর ঘিলুতে জট পাকিয়ে যায়, আর তাই তাঁর এই দশা। হাম আর চিকেন পক্স একবার না একবার প্রায় সব শিশুদেরই হয়। সেজোকাকার এই দুটো তো হয়েই ছিল, সেইসঙ্গে কোনও-না-কোনও সময় হয়েছিল হুপিং কাশি, ডিপথিরিয়া, ডেঙ্গু, একজিমা, আসল বসন্ত। শিশু বয়সে সাতবার কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠে নীল হয়ে সেজোকাকা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সাত বছরে সেজোকাকার তোতলামো দেখা দেয়; সাড়ে ন'য়ে পেয়ারা গাছ থেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তোতলামো সেরে যায়। এই পতনের ফলে সেজোকাকার গোড়ালি ভেঙে যায়। ডাক্তার বিশ্বাস সেটাকে ঠিকমতো জোড়া দিতে না পারায় সেজোকাকাকে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটতে হত। এই খোঁড়ানোর জন্য তাঁর আর খেলাধুলা করা সম্ভব হয়নি। হাতের টিপের অভাবে ক্যারম, আর মাথা খেলে না বলে তাসপাশাও হয়নি।

সেজোকাকা ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু পর পর তিনবার এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল হবার পর ওঁর বাবা, মানে আমার ঠাকুরদাদা, নিজেই ওঁর পড়াশুনো বন্ধ করে দেন। বলেন, 'ক্ষেতু, তুই যখন একেবারেই অপদার্থ, তখন তোর এডুকেশনের পেছনে খরচ করা মানে টাক জলে দেওয়া। তবে গলগ্রহ হয়ে থাকতে দেওয়াও তো চলে না! তুই আজ থেকে ভোম্বলের সঙ্গে বাজারে যাবি। শাকসব্জি মাছ মাংস চিনে নিবি। তারপর থেকে সংসারের বাজারটা তুই-ই করবি।' ভোম্বল-কাকা হলেন বাবার এক দূরসম্পর্কের ভাই; আমাদের বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করেছেন, মানুষ হয়েছেন।

সেজোকাকা বেশ কিছুদিন বাজারে গেলেন ভোম্বলকাকার সঙ্গে। তারপর একদিন—সেদিন বাড়িতে লোক খাবে—ঠাকুরদা সেজোকাকার পকেটে দুটো দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, 'দেখি তুই কেমন জিনিসপত্তর চিনেছিস। আজ বাজারের ভার তোর ওপর।'

সেজোকাকাকে দিয়ে বাজার আর হল না, কারণ কাকার পাঞ্জাবির পকেটে ফুটো, নোট দু'খানা বাজারে পৌঁছনোর আগেই পথে কোথায় গলে পড়েছে। এর পর থেকে কে আর কাকাকে ট্রাস্ট করবে?

আমার প্রথম স্মৃতিতে সেজোকাকার বয়স তেত্রিশ আর আমার তিন। কালীপুজোর দিন সন্ধ্যাবেলা। ঘটনাটা মনে আছে কেন, সেটা আরেকটু বললেই বোঝা যাবে। সেজোকাকা বারান্দার মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছেন, আর আমি তাঁর পিঠে চড়ে ঘোড়া-ঘোড়া খেলছি। পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ একটা জ্বলন্ত উড়নতুবড়ি এসে বারান্দার তক্তপোশের উপর পড়তেই 'সর্বনাশ' বলে সেজোকাকা সটান উঠে দাঁড়ালেন। তার ফলে আমি পিঠ থেকে ছিট্‌কে পড়লাম শান বাঁধানো মেঝেতে, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। সেদিন অবিশ্যি সেজোকাকাকে ভয়ংকর সব কথা শুনতে হয়েছিল বাড়ির প্রায় সকলের কাছ থেকেই। আমার কিন্তু একটু দুঃখ হয়েছিল কাকার জন্য। কেউ তাঁকে গ্রাহ্য করে না, এমনকী মানুষের মধ্যেই ধরে না, তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার কাকার উপর একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। মাঝারি হাইট, মাঝারি রঙ, মুখে সবসময়ই একটা খুশি আর দুঃখ মেশানো ভাব—মনে হত সব মানুষেরই বুদ্ধি হবে, সব মানুষই করিৎকর্মা হবে, তার কী মানে? শহরভর্তি এত লোকের মধ্যে একটা লোক যদি সেজোকাকার মতো হয় তাতে দোষ কী?

আমি তাই ফাঁক পেলেই তাঁর একতলার কোণের ঘরটায় গিয়ে সেজোকাকার সঙ্গে বসে গল্প করতাম। ক'দিন গিয়েই এটা বুঝেছিলাম যে সেজোকাকাকে গল্প বলতে বলে কোনও লাভ নেই, কারণ তাঁর কোনও গল্পই শেষ পর্যন্ত মনে থাকে না।

'তারপর কী হল সেজোকাকা?'

'তারপর? হুঁ...তারপর... দাঁড়া, তারপর...তারপর...তারপর...'

গলার স্বর 'তারপর' 'তারপর' বলতে বলতে ক্রমে দম ফুরানো হারমোনিয়ামের মতো ক্ষীণ হয়ে আসে। সেজোকাকা গল্প থেকে গুনগুন বেসুরো গানে চলে যান, শেষটায় গানও ফুরিয়ে গিয়ে কাকার মাথাটা ঘুমে ঢুলতে থাকে। বুঝতে পারি গল্পের বাকি অংশ মনে করার মেহনত কাকার পোষাচ্ছে না। তাঁকে সেই অবস্থায় রেখেই আমি পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, সেজোকাকা আর ডাকেনও না।

আমার যখন বছর বারো বয়স তখন একদিন তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি একটা মোটা বই খুলে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। জিজ্ঞেস করাতে বললেন আয়ুর্বেদের বই।

বললাম, 'ও বই পড়ে কী হবে সেজোকাকা?'

কাকা একটু ভেবে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'এটাও তো একটা ব্যারাম, তাই না?'

'কোনটা?'

'এই যে আমার দ্বারা কিচ্ছু হচ্ছে না, কিচ্ছু মনে থাকে না, কিচ্ছু মাথায় ঢোকে না—এটা নিশ্চয়ই একটা রোগ?'

কী আর বলব? বললাম, 'তা তো হতেই পারে, সেজোকাকা।'

'তা হলে এর চিকিৎসা হবে না কেন?'

বললাম, 'তুমি নিজেই চিকিৎসা করবে নাকি?'

আমি জানতাম যে সেজোকাকার এই অপদার্থতার জন্য তাঁকে ডাক্তার দেখানোর কথা কেউ

কোনওদিন ভাবেনি। সত্যি বলতে কি, ওঁর ছেলেবেলার সেই একগাদা ব্যারামের পর ওঁর আর বিশেষ কোনও অসুখটসুখ করেনি। স্বাস্থ্যটা ওঁর মোটামুটি ভালই ছিল।

সেজোকাকা বলে চললেন, 'চকবাজারে ফুটপাথে বইটা পড়ে ছিল, দশ আনা দিয়ে কিনে এনেছি। বোধহয় কাজে দেবে। মনে হচ্ছে আমার ব্যারামের জন্যও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা আছে।'

দু'দিন বাদে—তখন বর্ষাকাল—বিকেলে সেজোকাকার ঘরে গিয়ে দেখি উনি বেরোবার তোড়জোড় করছেন। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, মালকোঁচা মেরে পরা ধুতি, গলায় জড়ানো সুতির চাদর আর হাতে ছাতা। বললেন, 'ভটচাযপাড়ায় ভাঙা শিবমন্দিরটার পিছনে একটা গাছ আছে খবর পেয়েছি। তার শিকড় আমার চাই। ওইটে পেলেই—ব্যস্ নিশ্চিন্তি।'

সেজোকাকা বেরিয়ে পড়লেন। আকাশ ঘোলাটে হয়ে আসছে, তেমন তেমন বৃষ্টি নামলে কাকার প্ল্যান ভেস্তে যাবে।

আমি ঘণ্টাখানেক নীচে ঘুরঘুর করে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেলাম। দক্ষিণের জানলা দিয়ে সামনের রাস্তা দেখা যায়। বৃষ্টি নামল না। সন্ধে যখন হব হব, তখন দেখি সেজোকাকা ফিরছেন। দুড়দাড় করে নীচে নেমে সদর দরজার মুখে কাকার সঙ্গে দেখা।

'পেলে শিকড়?'

'না রে! ভুল হয়ে গেল। একটা টর্চ নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। জায়গাটা জংলা আর বেজায় অন্ধকার।'

'কিন্তু ওটা কী?'

কাকার কথার মধ্যেই চোখ পড়েছে আমার। খদ্দরের পাঞ্জাবির বুকে লাল রঙের ছোপ।

'তাই তো, এটা তো খেয়াল করিনি এতক্ষণ!'

পাঞ্জাবি খুলতেই বেরোল একটা জোঁক। ভীম যেমন দুর্যোধনের বুকের রক্ত খেয়েছিল, তেমনই ইনি সেজোকাকার বুকের রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল, টোকা দিতেই টপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

কিন্তু একটা জোঁকে আর সেজোকাকার কী হবে? কাঁধ, কনুই, কোমর, পায়ের গুল। হাঁটু, গোড়ালি—সব জায়গা মিলিয়ে চোদ্দটা জোঁক বেরোল কাকার গা থেকে। পাঁচ-ছ' আউন্স রক্ত যে তাঁর আজ খোয়া গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, তার আয়ুর্বেদ চর্চাও এই একটি ঘটনাই দিল বন্ধ করে।

পড়াশুনায় আমি ছিলাম রীতিমতো ভাল। আমাদের এফ. এ, এনট্রান্সের যুগ শেষ হয়ে ম্যাট্রিক চলছে। পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্ড হয়ে বিজ্ঞান পড়ব বলে চলে এলাম কলকাতায়। হোস্টেলে থেকেই এম. এসসি পর্যন্ত পড়ে পদার্থবিজ্ঞানে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে চলে যাই আমেরিকায়। শেষ পর্যন্ত গবেষক হিসেবে আমার বেশ খ্যাতি হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও গবেষণার কাজ আমি একসঙ্গে চালাতে থাকি।

বাইরে থাকার ফলে সেজোকাকার সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। একবার—তখন আমি সবে অধ্যাপনা শুরু করেছি—মা-র চিঠিতে এক অদ্ভুত খবর পেলাম। সেজোকাকা নাকি ফিল্মে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন। এখানে বলি যে সেজোকাকার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের চেহারার একটা সাদৃশ্য ছিল। দেহের গঠন মোটেই এক নয়—সেজোকাকা ছিলেন পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি—তবে নাক চোখ মুখের সাদৃশ্য সকলের চোখেই ধড়া পড়ত। পরমহংসদেব সম্বন্ধে একটা ফিল্ম তোলা হবে এবং তাতে বিবেকানন্দের ভূমিকা আছে খবর পেয়ে সেজোকাকা নাকি সরাসরি প্রযোজকের সঙ্গে দেখা করে অভিনয় করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। চেহারায় মিলের জন্য পার্টটা পেতে নাকি তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু হপ্তাখানেক বাদেই আর একটা চিঠিতে জানলাম কাকা নাকি ছবি থেকে বাদ হয়ে গেছেন। হবেন নাই-বা কেন? ঘর বন্ধ করে প্রাণপণে পার্ট মুখস্থ করা সত্ত্বেও, এক নম্বর দৃশ্যে রামকৃষ্ণের কথার উত্তরে বিবেকানন্দের মুখ থেকে যদি তিন নম্বর দৃশ্যের উত্তর বেরিয়ে পড়ে, তা হলে আর তাঁকে দিয়ে কীভাবে কাজ চলে? অর্থাৎ ফিল্ম অভিনেতা হিসেবেও তিনি যে অপদার্থ, সেটা সেজোকাকা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

আমার যখন আটচল্লিশ বছর বয়স তখন শিকাগোতেই আমার ছোট ভাইয়ের একটা চিঠিতে জানি যে, সেজোকাকা এক সাধুবাবার শিষ্য হয়ে কোয়েম্বেটুর চলে গেছেন।

গত বছর ডিসেম্বরের গোড়ায় আমার ছোটকাকার মেয়ে কাকলির বিয়েতে আমাকে কলকাতায় আসতে হয়। সঙ্গে আমার স্ত্রী আর আমার দুই মেয়ে—তারা দু'জনেই পুরোপুরি আমেরিকায় মানুষ। ইতিমধ্যে

সেজোকাকার কোনও খবর পাইনি। তাই কলকাতায় এসে যখন শুনলাম উনি শহরেই আছেন এবং বহাল তবিয়তে আছেন, তখন স্বভাবতই তাঁকে একবার দেখার জন্য মনটা উৎসুক হয়ে উঠল। আমার বয়স তখন ষাট। তাই সোজা হিসেবে সেজোকাকার নব্বুই। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, ইতিমধ্যেই প্রবাসেই কাকার দেহান্ত ঘটেছে।

শুনলাম ফার্ন রোডে তাঁর ভাগ্নে, অর্থাৎ আমার ছোট পিসিমার ছেলে ডাক্তার রণেশ গুপ্তর বাড়িতে এসে তিনি উঠেছেন মাস তিনেক হল। আরও শুনলাম যে, ধর্মকর্ম ব্যাপারটা মোটেই তাঁর ধাতে সয়নি। দশ বছরেও ইডলিদোসায় অভ্যাস হয়নি। রোজ আধপেটা খেয়ে ওজন নাকি প্রায় ত্রিশ কিলো কমে গেছে। আমি এসেছি শুনে তিনি তাঁর ডাক্তার ভাগ্নেকে বলেছেন, 'ঝন্টুকে বলিস একবার যেন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।'

এক রবিবার সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হলাম ফার্ন রোডে। লোডশেডিং চলছে, দোতলার একটি ঘরে টিমটিমে মোমবাতি জ্বালিয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে খাটের উপর বসে আছেন সেজোকাকা। একটা মটকার চাদরের উপর গলায় প্যাঁচ দিয়ে জড়ানো সবুজ মাফলার।

কাকাকে দেখলে চেনা যায় বটেই, এবং বলতেই হবে বয়সের পক্ষে রীতিমতো মজবুত চেহারা। মাথার চুল সব পাকা ঠিকই, কিন্তু এখনও যে চুল আছে সেটাই বড় কথা। আমায় দেখে হাসিতে মুখ ফাঁক হওয়াতে অরিজিন্যাল দাঁতও চোখে পড়ল ডজনখানেক, আর যখন কথা বেরোল তখন দেখলাম গলার স্বর ক্ষীণ হলেও কথায় বেশ তেজ আছে। এ তেজ কাকার মধ্যে আগে দেখিনি কখনও। তিনি যে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁকে আর কারুর কাছে মাথা নোয়াতে হয় না, এই বোধ হয়তো তাঁর মেজাজে একটা ভারিক্কি ভাব এনে দিয়েছে।

'কী রে ঝন্টু,' বললেন সেজোকাকা, 'মার্কিন মুলুকে গিয়ে কী করা হচ্ছে শুনি?'

আমার কাজের কথাটা যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে বললাম।

'পদার্থবিজ্ঞান? গবেষণা?' বললেন সেজোকাকা। 'লোকে মান্যি করে?'

আমার সাতাত্তর বছরের পিসিমা গলা সপ্তমে চড়িয়ে আমার বিনয়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলেন আমার খ্যাতির কথা।

'বটে?' বললেন সেজোকাকা। 'নোবেল প্রাইজ পেয়েছিস কিনা সেটা বল আগে।'

হালকা হেসে মাথা নাড়লাম।

'তবে আর কীসের বড়াই? ছ্যা ছ্যা ছ্যা—একেবারে অপদার্থ!'

আমি এই গুঁতোর ঠেলা সামলাতে না সামলাতে সেজোকাকার বাক্যস্রোত আমাকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিল।

'তুই তো যাহোক ভিন মুলুকে পালিয়ে বাঁচলি, আমি ভাবলুম কলকাতায় গিয়ে একটু সোয়াস্তি মিলবে। জীবনের শেষ ক'টা দিন তবু আপনজনের সান্নিধ্যে কাটবে—তা এসব কী হচ্ছে বল তো? শকুনির ঠোকরে তো হাড় পাঁজরা বার করে দিয়েছে শহরটার। দিনে দশ ঘণ্টা বিজলি নেই। শ্বাস টানলে ধোঁয়া-ধুলোয় প্রাণ অতিষ্ঠ। জিনিসপত্তরের যা দর, উদরের সাধ মিটিয়ে ভালমন্দ যে একটু খাব তারও জো নেই।—দূর দূর দূর—অপদার্থ, অপদার্থ।'

সেদিন বুঝলাম যে, সেজোকাকার উপর থেকে আমার পুরনো টানটা এখনও যায়নি, কারণ তাঁর কথাগুলো শুনে আমার মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। মনে হল, আমরা বোধহয় অ্যাদ্দিন ভুল করে এসেছি, উলটো ভেবে এসেছি; আসলে কাকা দিব্যি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, আমরা সুদ্ধ দুনিয়াটাই অপদার্থ।

কিন্তু কথাটা যে ঠিক নয় সেটা সেজোকাকাই প্রমাণ করে দিলেন কয়েক দিনের মধ্যে।

এক সকালে ছোট পিসিমার বাড়ি থেকে ফোন এল যে, সেজোকাকা ভোর রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন। আর যাওয়ার দিনটাও মোক্ষম বেছেছেন কাকা, কারণ সেদিনই সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে আমার ভাগ্নির বিয়ে।

চকমকি, ১৩৯০

সাধনবাবুর সন্দেহ

সাধনবাবু একদিন সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফিরে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলেন মেঝেতে একটা বিঘতখানেক লম্বা সরু গাছের ডাল পড়ে আছে। সাধনবাবু পিটপিটে স্বভাবের মানুষ। ঘরে যা সামান্য আসবাব আছে—খাট, আলমারি, আলনা, জলের কুঁজো রাখার টুল—তার কোনওটাতে এক কণা ধুলো তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, ফুলকারি করা টেবিল ক্লথ—সবই তকতকে হওয়া চাই। এতে ধোপার খরচটা বাড়ে, কিন্তু সেটা সাধনবাবু গা করেন না। আজ ঘরে ঢুকেই গাছের ডাল দেখে তাঁর নাক কুঁচকে গেল।

'পচা!'

চাকর পচা মনিবের ডাকে এসে হাজির।

'বাবু, ডাকছিলেন?'

'কেন, তোর কি সন্দেহ হচ্ছে?'

'না বাবু, তা হবে কেন?'

'মেঝেতে গাছের ডাল পড়ে কেন?'

'তা তো জানি না বাবু। কাক-চড়ুইয়ে এনে ফেলেছে বোধহয়।'

'কেন, ফেলবে কেন? কাক-চড়ুই তো ডাল আনবে বাসা বাঁধার জন্য। সে ডাল মাটিতে ফেলবে কেন? ঝাড়ু দেবার সময় লক্ষ করিসনি এটা? না কি ঝাড়ুই দিসনি?'

'ঝাড়ু আমি রোজ দিই বাবু। যখন দিই তখন এ-ডাল ছিল না।'

'ঠিক বলছিস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।'

'তাজ্জব ব্যাপার তো!'

পরদিন সকালে আপিস যাবার আগে একটা চড়ুইকে তাঁর জানলায় বসতে দেখে সাধনবাবুর সন্দেহ হল ইনিই বাসা বাঁধার ফিকির খুঁজছেন। কিন্তু কোথায়? ঘরের মধ্যে জায়গা কোথায়? ঘুলঘুলিতে কি? তাই হবে।

তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সাতখানা ঘরের মধ্যে তাঁর ঘরের দিকেই চড়ুই-এর দৃষ্টি কেন, এই নিয়েও সাধনবাবুর মনে খটকা লাগল। এমন কিছু আছে কি তাঁর ঘরে, যা পাখিদের অ্যাট্রাক্ট করতে পারে?

অনেক ভেবে সাধনবাবুর সন্দেহ হল—ওই যে নতুন কবরেজি তেলটা তিনি ব্যবহার করছেন—যেটা দোতলার শখের কবিরাজ নীলমণিবাবুর মতে খুসকির মহৌষধ—সেটার উগ্র গন্ধই হয়তো পাখিদের টেনে আনছে। সেইসঙ্গে এমনও সন্দেহ হল যে, এটা হয়তো নীলমণিবাবুর ফিচলেমি, সাধনবাবুর ঘরটাকে একটা পক্ষিনিবাসে পরিণত করার মতলবে তিনি এই তেলের গুণগান করছেন।...

আসলে সতেরোর দুই মির্জাপুর স্ট্রিটের এই ফ্ল্যাটবাড়ির সকলেই সাধনবাবুর সন্দেহ বাতিকের কথা জানেন, এবং আড়ালে এই নিয়ে হাসিঠাট্টা করেন। 'আজ কী কী সন্দেহের উদয় হল আপনার মনে?'—এ জাতীয় প্রশ্ন দিনের শেষে সাধনবাবুকে প্রায়ই শুনতে হয়।

শুধু প্রশ্ন নয়, অন্যভাবেও তাঁকে নিয়ে লেগ-পুলিং চলে। একতলার নবেন্দু চাটুজ্যের ঘরে সন্ধ্যায় তিন-তাসের আড্ডা বসে। সাধনবাবু তাতে নিয়মিত যোগদান করেন। সেদিন যেতে নবেন্দুবাবু তাঁকে একটা দলা পাকানো কাগজ দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন তো মশাই, এ থেকে কিছু সন্দেহ হয় কি না। এটা জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে।'

আসলে কাগজটা নবেন্দুবাবুরই মেয়ে মিনির অঙ্কের খাতার একটা ছেঁড়া পাতা। সাধনবাবু কাগজটাকে খুলে সেটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, 'এটা তো সংখ্যা দিয়ে লেখা কোনও সাংকেতিক ভাষা বলে মনে হচ্ছে।'

নবেন্দুবাবু কিছু না বলে চুপটি করে চেয়ে রইলেন সাধনবাবুর দিকে।

'কিন্তু এটার তো মানে করা দরকার,' বললেন সাধনবাবু। 'ধরুন এটা যদি কোনও হুমকি হয়, তা হলে...'

সংকেতের পাঠোদ্ধার হয়নি অবশ্য। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়; কথা হল, এই কাগজের দলা থেকে সাধনবাবুর সন্দেহ কোন কোন দিকে যেতে পারে সেইটে দেখা। সাধনবাবু বিশ্বাস করেন যে, গোটা কলকাতা শহরটাই হল ঠক জুয়াচোর ফন্দিবাজ মিথ্যেবাদীর ডিপো। কারুর উপর ভরসা নেই, কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। এই অবস্থায় একমাত্র সন্দেহই মানুষকে সামলে চলতে সাহায্য করতে পারে।

এই সাধনবাবুই একদিন আপিস থেকে এসে ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলের উপর একটা বেশ বড় চার-চৌকো কাগজের মোড়ক দেখতে পেলেন। তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হল সেটা ভুল করে তাঁর ঘরে চলে এসেছে। এহেন মোড়ক তাঁকে কে পাঠাবে? তিনি তো এমন কোনও পার্সেল প্রত্যাশা করেননি!

কাছে গিয়ে যখন দেখলেন যে মোড়কের উপর তাঁর নাম নেই, তখন সন্দেহটা আরও পাকা হল।

'এটা কে এনে রাখল রে?' চাকর পচাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন সাধনবাবু।

'আজ্ঞে, একজন লোক ধনঞ্জয়ের হাতে দিয়ে গেছে দুপুরে এসে। আপনার নাম করে বলেছে আপনারই জিনিস।'

ধনঞ্জয় একতলার ষোড়শীবাবুর চাকর।

'কী আছে এতে, কে পাঠিয়েছে, সেসব কিছু বলেছে?'

'আজ্ঞে, তা তো বলেনি।'

'বোঝো!'

সাধনবাবু কাঁধের চাদরটা আলনায় রেখে খাটে বসলেন। রীতিমতো বড় মোড়ক। প্রায় একটা পাঁচ নম্বর ফুটবল ঢুকে যায় ভিতরে। অথচ কে পাঠিয়েছে জানার কোনও উপায় নেই।

সাধনবাবু খাট থেকে উঠে এগিয়ে গিয়ে মোড়কটা হাতে তুললেন। বেশ ভারী। কমপক্ষে পাঁচ কিলো।

সাধনবাবু মনে করতে চেষ্টা করলেন শেষ কবে তিনি এই জাতীয় মোড়ক পেয়েছেন। হ্যাঁ, বছর তিনেক আগে খড়দায় তাঁর এক মাসিমা থাকতেন, তিনি পাঠিয়েছিলেন আমসত্ত্ব। তার মাস ছয়েকের মধ্যেই সেই মাসিমার মৃত্যু হয়। আজ সাধনবাবুর নিকট আত্মীয় বলতে আর কেউই অবশিষ্ট নেই। পার্সেল কেন, চিঠিও তিনি মাসে দু-একটার বেশি পান না। এই মোড়কের সঙ্গে একটা চিঠি থাকা অস্বাভাবিক হত না, কিন্তু তাও নেই।

কিংবা হয়তো ছিল। সাধনবাবুর সন্দেহ হল ধনঞ্জয়ের অসাবধানতা হেতু সেটি খোয়া গেছে।

একবার ধনঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

তাকে ডেকে পাঠানো অনুচিত হবে মনে করে সাধনবাবু নিজেই নীচে গেলেন। ধনঞ্জয় উঠোনে বসে হামানদিস্তায় কী যেন ছেঁচছিল, সাধনবাবুর ডাকে উঠে এল।

'ইয়ে, আজ তোমার হাতে কেউ একটা পার্সেল দিয়ে গেসল আমার নাম করে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সঙ্গে চিঠি ছিল?'

'কই না তো।'

'কোত্থেকে আসছে সেটা বলেছিল?'

'মদন না কী জানি একটা নাম বললেন।'

'মদন?'

'তাই তো বললেন।'

মদন নামে কাউকে চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না সাধনবাবু। কী বলতে কী বলছে লোকটা কে জানে! ধনঞ্জয় যে একটি গবেট সে সন্দেহ অনেকদিনই করেছেন সাধনবাবু।

'চিঠিপত্তর কাগজটাগজ কিছু ছিল না সঙ্গে?'

'একটা কাগজ ছিল, তাতে বাবু সই করে দিলেন।'

'কে, ষোড়শীবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কিন্তু ষোড়শীবাবুকে জিজ্ঞেস করে কোনও ফল হল না। একটা চিরকুটে তিনি সাধনবাবুর হয়ে সই করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা কোথা থেকে এসেছিল খেয়াল করেননি।

সাধনবাবু আবার নিজের ঘরে ফিরে এলেন। কার্তিক মাসের সন্ধ্যা, শীতটা এর মধ্যে বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। সামনে কালীপুজো, তার তোড়জোড় যে চলছে সেটা মাঝে মাঝে বোমা-পটকার—

'দুম!'

পাড়াতেই একটা বোমা ফেটেছে। আর সেই মুহূর্তে খাটে বসা সাধনবাবুর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল।

টাইম-বোমা!

ওই মোড়কের মধ্যে টাইম-বোমা নেই তো, যেটা নির্দিষ্ট সময়ে ফেটে তাঁর ইহজগতের লীলা সাঙ্গ করে দেবে?

এই টাইম-বোমার কথা ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে। সারা বিশ্বের সন্ত্রাসবাদীদের এটা একটা প্রধান অস্ত্র।

কিন্তু তাঁকে বোমা পাঠাবে কে, কেন?

প্রশ্নটা মনে আসতেই সাধনবাবু উপলব্ধি করলেন যে ব্যবসায়ী হওয়ার ফলে তাঁর শত্রুর অভাব নেই। কনট্র্যাক্ট পাবার জন্য তোষামোদ ধরাধরি তাঁকেও করতে হয়, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদেরও করতে হয়। যদি তিনি পেয়ে যান সে কনট্র্যাক্ট, তা হলে অন্যেরা হয়ে যায় তাঁর শত্রু। এ তো হামেশাই হচ্ছে।

'পচা!'

ডাকটা দিয়েই বুঝতে পারলেন যে, তাঁর গলা দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোচ্ছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কিন্তু তাও পচা হাজির।

'বাবু, ডাকলেন?'

'ইয়ে—'

কিন্তু কাজটা কি ভাল হবে? সাধনবাবু ভেবেছিলেন পচাকে বলবেন পার্সেলে কান লাগিয়ে দেখতে টিকটিক শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা। টাইম-বোমার সঙ্গে কলকব্জা লাগানো থাকে, সেটা টিকটিক শব্দে চলে। সেই টিকটিক-ই একটা পূর্বনির্ধারিত বিশেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পরিণত হয়।

পচা যখন কান লাগাবে, তখনই যদি বোমাটা—

সাধনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। এদিকে পচা বাবুর আদেশের জন্য দাঁড়িয়েই আছে; সাধনবাবুকে বলতেই হল যে তিনি ভুল করে ডেকেছিলেন, তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই।

এই রাতটা সাধনবাবু ভুলবেন না কোনওদিন। অসুখ বিসুখে রাত্রে ঘুম হয় না এটা স্বাভাবিক নয়, কিন্তু চরম আতঙ্কে এই শীতকালে ঘর্মাক্ত অবস্থায় সারারাত ঠায় বিছানায় বসে কাটানোর অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম।

কিন্তু সকাল পর্যন্ত যখন বোমা ফাটল না, তখন কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে সাধনবাবু স্থির করলেন যে আজই সন্ধ্যায় মোড়কটা খুলে দেখতে হবে তার মধ্যে কী আছে। তাঁর নিজেরও মনে হয়েছে যে তাঁর সন্দেহটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, সাধনবাবুর আর মোড়ক খোলা হল না।

অনেক লোক আছে যারা খবরের কাগজের আদ্যোপান্ত না পড়ে পারে না। সাধনবাবু এই দলে পড়েন না। প্রথম এবং মাঝের পাতার খবরগুলোর শিরোনামায় চোখ বুলিয়েই তাঁর কাগজ পড়া হয়ে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই উত্তর কলকাতায় খুনের খবরটা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। আপিস থেকে ফিরে একতলায় নবেন্দু চাটুজ্যের ঘরে একটা বড়রকম দাপাদাপি চলছে শুনে কারণ জিজ্ঞেস করে তিনি ঘটনাটা জানতে পারলেন।

পটুয়াটোলা লেনে খুন, হত ব্যক্তির নাম শিবদাস মৌলিক। কথাটা শুনেই সাধনবাবুর একটা সুপ্ত স্মৃতি খোঁচা খেয়ে জেগে উঠল।

এক মৌলিককে তিনি চিনতেন খুব ভাল করে। তার প্রথম নাম শিবদাস কী? হতেও পারে। সাধনবাবু তখন থাকতেন ওই পটুয়াটোলা লেনেই। মৌলিক ছিল তাঁর প্রতিবেশী। তিন-তাসের আড্ডা বসত মৌলিকের ঘরে রোজ সন্ধ্যায়। মৌলিককে কেন জানি মৌলিক বলেই ডাকত সবাই। আরও দু'জন ছিলেন আড্ডায়। সুখেন দত্ত আর মধুসূদন মাইতি। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটির মতো সাংঘাতিক চরিত্র সাধনবাবু আর দেখেননি। তাসের খেলায় সে যে জুয়াচুরির রাজা, সে সন্দেহ সাধনবাবুর গোড়া থেকেই হয়েছিল। শেষে বাধ্য হয়ে একদিন সন্দেহটা প্রকাশ করতে হল। এতে মধু মাইতির প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভয়াবহ। তার পকেটে সবসময়ই যে একটি চাকু অবস্থান করে সেটা সেদিনই জানতে পেরেছিলেন সাধনবাবু। তিনি প্রাণে বেঁচেছিলেন মৌলিক আর সুখেন দত্তর জন্য। ব্যবসায় উন্নতির পর সাধনবাবু পটুয়াটোলা লেনের খোলার ঘর ছেড়ে চলে আসেন মির্জাপুর স্ট্রিটের এই ফ্ল্যাটে। আর সেই থেকেই

মৌলিক অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে তাঁর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাসের নেশাটা তিনি ছাড়াতে পারেননি, আর সেইসঙ্গে তাঁর সন্দেহ বাতিকটাও। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে পরিবর্তন হয়েছিল বিস্তর। পোশাকে পারিপাট্য, বিড়ি ছেড়ে উইলস সিগারেট ধরা, নিলামের দোকান থেকে মাঝে মাঝে শখের জিনিস কিনে এনে ঘর সাজানো—পেন্টিং, ফুলদানি, বাহারের অ্যাশট্রে—এ সবই গত পাঁচ-সাত বছরের ঘটনা।

এই খুনের ঘটনার শিবদাস মৌলিক যদি সেই মৌলিক হয়, তা হলে খুনি যে মধু মাইতি সে বিষয়ে সাধনবাবুর কোনও সন্দেহ নেই।

'খুনটা কীভাবে হল?' সাধনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'নৃশংস,' বললেন নবেন্দু চাটুজ্যে। 'লাশ শনাক্ত করার কোনও উপায় ছিল না। পকেটে একটা ডায়রি থেকে নাম জেনেছে।'

'কেন, কেন? শনাক্ত করার উপায় ছিল না কেন?'

'ধড় আছে, মুড়ো নেই। শনাক্ত করবে কী করে?'

'মুড়ো নেই মানে?'

'মুণ্ডু ঘ্যাচাং!' জোড়া হাত মাথার উপর তুলে আবার ঝটিতি নামিয়ে এনে খাঁড়ার কোপের অভিনয় করে বুঝিয়ে দিলেন নবেন্দু চাটুজ্যে। 'খুনি যে কোথায় সরিয়ে রেখেছে মুণ্ডু সেটা এখনও জানা যায়নি।'

'খুনি কে সেটা জানা গেছে?'

'তিন-তাসের বৈঠক বসত এই মৌলিকের ঘরে। তাদেরই একজন বলে সন্দেহ করছে পুলিশ।'

সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে উঠতে সাধনবাবু অনুভব করলেন যে তাঁর মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সেদিনের ঘটনা চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছেন তিনি—যেদিন তিনি মধু মাইতিকে জোচ্চুরির অপবাদ দিয়েছিলেন। চাকুর আক্রমণ থেকে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার বেশ কিছুক্ষণ পর অবধি মধু মাইতির দৃষ্টি তাঁর উপর অগ্নিবর্ষণ করেছিল সেটা মনে আছে। আর মনে আছে মধুর একটি উক্তি—'আমায় চেনো না তুমি, সাধন মজুমদার!—আজ পার পেলে, কিন্তু এর বদলা আমি নেব, সে আজই হোক, আর দশ বছর পরেই হোক।'

রক্ত-জল-করা শাসানি। সাধনবাবু ভেবেছিলেন পটুয়াটোলা লেন থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন, কিন্তু—

কিন্তু ওই মোড়ক যদি মধু মাইতি দিয়ে গিয়ে থাকে? মদন!—ধনঞ্জয় বলেছিল মদন। ধনঞ্জয় যে কানে খাটো সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মধু আর মদনে খুব বেশি পার্থক্য আছে কি? মোটেই না। মধু অথবা মধুর লোকই রেখে গেছে ওই পার্সেল, আর সেটা যাতে সত্যিই তাঁর হাতে পৌঁছয় তাই চিরকুটে সই করিয়ে নিয়েছে।

ওই মোড়কের ভিতরে রয়েছে শিবদাস মৌলিকের মাথা!

এই সন্দেহ সিঁড়ির মাথা থেকে তাঁর ঘরের দরজার দূরত্বটুকু পেরোবার মধ্যে দৃঢ়ভাবে সাধনবাবুর মনে গেঁথে গেল। দরজা থেকেই দেখা যায় টেবিলের উপর ফুলদানিটার পাশে রাখা মোড়কটাকে। মোড়কের ওজন এবং আয়তন দুইই এখন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে তার ভিতরে কী আছে।

বাবু দোরগোড়ায় এসে থেমে গেছেন দেখে পচা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল; সাধনবাবু প্রচণ্ড মনের জোর প্রয়োগ করে বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে চাকরকে চা আনতে বললেন।

'আর, ইয়ে, আজ কেউ এসেছিল? আমার খোঁজ করতে?'

'কই না তো।'

'হুঁ।'

সাধনবাবু অবশ্য সন্দেহ করেছিলেন পুলিশ হয়তো এরই মধ্যে হানা দিয়ে গেছে। তাঁর ঘরে খুন হওয়া ব্যক্তির মুণ্ডু পেলে তাঁর যে কী দশা হবে সেটা ভাবতে তাঁর আরেক দফা ঘাম ছুটে গেল।

গরম চা পেটে পড়তে সামান্য বল যেন ফিরে এল মনে। যাক—অন্তত টাইম বোমা তো নয়।

কিন্তু এও ঠিক যে, এই মুণ্ডুসমেত মোড়কটিকে সামনে রেখে যদি তাঁকে সারারাত জেগে বসে থাকতে হয় তা হলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

ঘুমের বড়িতে ঘুম হল ঠিকই, কিন্তু দুঃস্বপ্ন থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। একবার দেখলেন মুণ্ডুহীন মৌলিকের সঙ্গে বসে তিন-তাস খেলছেন তিনি, আরেকবার দেখলেন মৌলিকের ধড়বিহীন মুণ্ডু তাঁকে এসে বলছে, 'দাদা,—ওই বাক্সে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। দয়া করে মুক্তি দিন আমায়।'

বড়ি খাওয়া সত্ত্বেও চিরকালের অভ্যাসমতো সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল সাধনবাবুর। হয়তো ব্রাহ্ম মুহূর্তের গুণেই সংকট মোচনের একটা উপায় সাধনবাবুর মনে উদিত হল।

মুণ্ডু যখন তাঁর কাছে পাচার করা হয়েছে, তখন সে-মুণ্ডু অন্যত্র চালান দিতে বাধাটা কোথায়? তাঁর ঘর থেকে জিনিসটাকে বিদায় করতে পারলেই তো নিশ্চিন্ত।

ভোর থাকতেই অন্য কাজ সারার আগে বাজারের থলিতে মোড়কটা ভরে নিয়ে সাধনবাবু বেরিয়ে পড়লেন। প্যাকিংটা ভালই হয়েছে বলতে হবে, কারণ ভিতরে রক্ত চুঁইয়ে থাকলেও তার বিন্দুমাত্র বাক্স ভেদ করে বাইরের কাগজে ছোপ ফেলেনি।

বাসে উঠে কালীঘাট পৌঁছতে লাগল পঁচিশ মিনিট। তারপর পায়ে হেঁটে আদিগঙ্গায় পৌঁছে একটি অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে হাতের মোড়কটাকে সবেগে ছুড়ে ফেললেন নদীর মাঝখানে।

ঝপাৎ—ডুবুস!

মোড়ক নিশ্চিহ্ন, সাধনবাবু নিশ্চিন্ত।

বাড়ি ফিরতে লাগল পঁয়ত্রিশ মিনিট। সদর দরজা দিয়ে যখন ঢুকছেন তিনি, তখন ষোড়শীবাবুর দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজছে।

আর সেই ঘড়ির শব্দ শুনেই সাধনবাবু মুহূর্তে চোখে অন্ধকার দেখলেন।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তাঁর। ক'দিন থেকেই বারবার সন্দেহ হয়েছে তিনি যেন কী একটা ভুলে যাচ্ছেন। পঞ্চাশের পর এ জিনিসটা হয়। এ-কথা নীলমণিবাবুকে বলতে তিনি নিয়মিত ব্রাহ্মীশাক খেতে বলেছিলেন।

আজ আধ ঘণ্টা আগেই বেরিয়ে পড়তে হল সাধনবাবুকে, কারণ যাবার পথে একটা কাজ সেরে যেতে হবে।

রাসেল স্ট্রিটে নিলামের দোকান মডার্ন এক্সচেঞ্জে ঢুকতেই একগাল হেসে এগিয়ে এলেন মালিক

তুলসীবাবু।

'টেবিল ক্লকটা চলছে তো?'

'ওটা পাঠিয়েছিলেন আপনি?'

'বা রে, আমি তো বলেইছিলাম পাঠিয়ে দেব। সেটা পৌঁছয়নি আপনার হাতে?'

'হ্যাঁ, মানে, ইয়ে—'

'আপনি পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে গেলেন, এত পছন্দ আপনার, আপনি পুরনো খদ্দের—কথা দিয়ে কথা রাখব না?'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই—'

'দেখবেন ফার্স্ট ক্লাস টাইম রাখবে ও ঘড়ি। নামকরা ফরাসি কোম্পানি তো! জিনিসটা জলের দরে পেয়ে গেছেন। ভেরি লাকি!'

তুলসীবাবু অন্য খদ্দেরের দিকে এগিয়ে যেতে সাধনবাবু দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। জলের দরের ঘড়ি জলেই গেল!

ভাল বদলা নিয়েছে মধু মাইতি, তাতে সন্দেহ নেই। আর 'মডার্ন'কেই যে 'মদন' শুনেছে ধনঞ্জয়, তাতেও কোনও সন্দেহ আছে কি?

সন্দেশ, কার্তিক ১৩৯০

গগন চৌধুরীর স্টুডিও

একটা ফ্ল্যাট দিনের বেলা দেখে পছন্দ হলেও, সেখানে গিয়ে থাকা না অবধি তার সুবিধে-অসুবিধেগুলো ঠিক বোঝা যায় না। সুধীন সরকার এইটেই উপলব্ধি করল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাটে বসবাস আরম্ভ করে। এই একটা ব্যাপারেই ভাগ্যলক্ষ্মী একটু শুকনো হাসলেন; না হলে তিনি যে সুধীনের প্রতি সবিশেষ প্রসন্না তার নজিরের অভাব নেই।

যেমন তার পদোন্নতির ব্যাপারটাই ধরা যাক। সে এখন আপিসের একটি ডিপার্টমেন্টের হেড। ঠিক এত তাড়াতাড়ি মাথায় পৌঁছনোর কথা নয়; হাজার হোক তার বয়সটা তো বেশি নয়—এই আষাঢ়ে একত্রিশে পড়েছে সে। ডিপার্টমেন্টের কাঁধ অবধি এমনিতেই উঠেছিল সুধীন। মাথায় ছিল নগেন্দ্র কাপুর, যাঁর বয়শ চল্লিশ, যিনি দীর্ঘাঙ্গ, সুপুরুষ, কর্মক্ষম; যিনি ছাই রঙের সাফারি সুট পরে আপিসে ঢুকলে সকলের দৃষ্টি চলে যায় তাঁর দিকে। সেই নগেন্দ্র কাপুর যে অকস্মাৎ টালিগঞ্জের গল্‌ফের মাঠে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাবেন সে কি কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল? এই মৃত্যুর পরেই সুধীন দেখল প্রায় প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সে কাপুরের জায়গা অধিকার করে বসেছে। এটা অবিশ্যি শুধু কপালজোরে নয়; সুধীন এই পদের উপযুক্ত নয় এ অপবাদ তাকে কেউ দেবে না।

তারপর এই ফ্ল্যাট। সুধীনের বাপ-মা তাকে সংসারী করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন, সময়টাও ভাল, কাজেই সুধীনকে বাধ্য হয়েই সে অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে। আগে পার্ক সার্কাসে যে ফ্ল্যাটটা ছিল, তার পায়রার খোপের মতো দু'খানা ঘরে সংসার করা চলে না। তা ছাড়া কাছেই ছিল একটা বিয়ে-শাদিতে ভাড়া দেওয়ার বাড়ি। অষ্টপ্রহর গ্রামোফোন রেকর্ডে সানাইয়ের বিকৃত বাঁশফাটা সুরে সুধীনের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। দালালের কাছ থেকে খবর পেয়ে সুধীন প্রথম যে ফ্ল্যাটটা দেখতে গেল সেটাই হল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাট। দোতলার ফ্ল্যাট, তিনখানা বেশ বড় বড় ঘর, দুটো বাথরুম, দক্ষিণে বারান্দা, মেঝের মোজেইক, জানলার গ্রিল, ফ্ল্যাটের প্ল্যান—সবকিছুতেই সুপরিকল্পনা ও

সুরুচির ছাপ। ভাড়া আটশো। সর্বোপরি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে মোটামুটি সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে মনে হয়। সুধীনের আর দ্বিতীয় কোনও ফ্ল্যাট দেখতে হয়নি।

দু' সপ্তাহ হল সে এসেছে এই ফ্ল্যাটে। প্রথম ক'দিন অত খেয়াল করেনি, তারপর একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখল তার চোখে বাইরে থেকে বিজলি আলো এসে পড়েছে। বেশ উজ্জ্বল আলো। এত রাত্রে আলো আসে কোত্থেকে?

সুধীন বিছানা ছেড়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সারা পাড়া অন্ধকার, কেবল একটি আলো জ্বলছে রাস্তার উলটো দিকের প্রাচীন অট্টালিকার তিনতলার একটি ঘরে। খোলা জানলার পর্দার উপর দিয়ে সটান এসে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকেছে সুধীনের ঘরে। শুধু ঘরে নয়, একেবারে সুধীনের বিছানায়। বালিশ উলটো দিকে ঘুরিয়ে শুলেও সে আলো পড়বে সুধীনের মুখে।

এ তো বড় জ্বালাতেন! ঘর অন্ধকার না হলে মানুষ ঘুমোয় কী করে? অন্তত সুধীন সেটা পারে না। এটা কি রোজই হবে নাকি?

আরও এক সপ্তাহ দেখার পর সুধীন বুঝল এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই। বারোটার কিছু আগে থেকেই আলোটা জ্বলে, এবং জ্বলে থাকে ভোর অবধি। অথচ নিজের ঘরের দক্ষিণের জানলা বন্ধ করে শোয়ায় সুধীনের ঘোর আপত্তি। কার না হয়? কলকাতায় ওই একটি জিনিসের অনেক দাম। দক্ষিণের জানলা। বিশেষ করে তার সামনে যদি অন্য কোনও বাড়ি না থাকে। সেটাও এ ফ্ল্যাটের একটা লোভনীয় দিক। জানলার সামনে রাস্তার ওপরে হল ওই পুরনো বনেদি বাড়িটার সংলগ্ন বাগান, যেখানে অদূর ভবিষ্যতে নতুন দালান ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। বাড়িটা কোনও এককালীন জমিদারের সেটা বোঝাই যায়। সংস্কার হয়নি বহুদিন, লোকজনও বিশেষ থাকে বলে মনে হয় না।

এক ওই তিনতলার ঘরে ছাড়া।

কোনও অজ্ঞাত কারণে ওই ঘরের বাসিন্দা সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখেন। একতলার ফ্ল্যাটে ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন সোমেশ্বর নাগ। সুধীনের মাস চারেক আগে ইনি এসেছেন এই ফ্লাটে। বছর পঞ্চান্ন বয়স, বেঙ্গল ক্লাবের মেম্বার, সন্ধ্যাটা তিনি ক্লাবেই কাটান। এক শনিবার বিকেলে বাড়ির গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সুধীন তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ বাক্যালাপের লোভ সামলাতে পারল না।

'আমাদের উলটোদিকের বাড়িটা কাদের বলুন তো?'

'চৌধুরী। কেন, কী ব্যাপার?'

'না, মানে, বাড়িতে তো বিশেষ কেউ থাকে-টাকে বলে মনে হয় না, অথচ তিনতলার একটা ঘরে সারারাত বাতি জ্বলে। সেটা লক্ষ করেছেন?'

'না, তা তো করিনি।'

'আপনাদের ঘরে আসে না আলো?'

'সেট তো সম্ভব নয়। ওদের ছাতের পাঁচিলটা সামনে পড়ে তো। আমরা তো ঘরটাই দেখতে পাই না।'

'খুব বেঁচে গেছেন। আমার তো রাত্রে ঘুমই হয় না ওই আলোর জন্য।'

'ভেরি স্ট্রেঞ্জ! শুনেছি তো ওই এতবড় বাড়িতে একটি কি দুটি মাত্র প্রাণী থাকে। মালিক হলেন গগন চৌধুরী। তাঁকে বড় একটা দেখা-টেখা যায় না। আমি তো এসে অবধি দেখিনি। তবে আছেন বলে জানি। বয়স হয়েছে বোধহয়। শুনেছি এককালে ছবি-টবি আঁকতেন। আপনি এক কাজ করুন না! ভদ্রলোককে গিয়ে সোজাসুজি বলুন। অন্তত ওঁর নিজের ঘরের জানলাটা তো বন্ধ করে দিতে পারেন। এতটুকু কনসিডারেশন হবে না প্রতিবেশীর জন্য?'

এ কাজটা অবিশ্যি করা যায়, যদিও সহজ নয়। অনুরোধ করলেও সেটা যে গ্রাহ্য হবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। রাত্রে কী ঘটনা ঘটে ওই গগন চৌধুরীর ঘরে?

সুধীন বুঝতে পারল, আলোর জন্য ব্যাঘাতের প্রশ্নটা বড় ঠিকই, কিন্তু ওই প্রাচীন অট্টালিকার ওই ঘরে কী ঘটছে সেটা জানার আগ্রহ্য কম নয়! তার বন্ধু মহিম রেসের মাঠে যাতয়াত করে; তার একটি বড় বাইনোকুলার আছে। সেটা দিয়ে দেখলে কিছু জানা যাবে কি? বাইনোকুলারের দরকার এইজন্যই যে, ঘরটা নেহাত কাছে নয়, চৌধুরীদের বাড়িটা ঠিক রাস্তার উপরে নয়; পাঁচিল পেরিয়ে সামনে বেশ

খানিকটা জায়গা আছে যেটা বাগানেরই অংশ। এই দূরত্বের পরেও আরও দূরত্ব আছে, কারণ তিনতলার ঘরটা ছাতের খানিকটা অংশ পেরিয়ে।

মহিমের বাইনোকুলারে জানলাটা চলে এল অনেকখানি কাছে, কিন্তু পর্দার উপর দিয়ে দেয়ালের খানিকটা অংশ ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা গেল না। দেয়ালে টাঙানো তেলরঙে আঁকা দুটি আবক্ষ প্রতিকৃতির খানিকটা করে অংশ দেখা যাচ্ছে সিলিং-এর ওই আলোতে। তা হলে কি শিল্পীর ঘর? এটাই কি ছিল ভদ্রলোকের স্টুডিও? কিন্তু সেখানে কি কোনও মানুষ নেই?

হ্যাঁ, আছে। এইমাত্র জানলার পর্দায় ছায়া ফেলে একটা মূর্তি ডান থেকে বাঁ দিকে চলে গেল। কিন্তু ছায়া থেকে মানুষ চেনা গেল না। পর্দার আলোটা পড়তে তার স্বচ্ছতাও অনেকটা কমে গেছে।

প্রায় পনেরো মিনিট দেখার পর সুধীনের ক্লান্তি এল। যেটুকু ঘুমের সম্ভাবনা তাও কি সে নষ্ট করবে এই ছেলেমানুষি করে?

বাইনোকুলারটা টেবিলের উপর রেখে সুধীন শুয়ে পড়ল। সে মনে মনে স্থির করে নিয়েছে কী করা দরকার।

সোজা গিয়ে গগন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাঁকে বলবে তাঁর ঘরের উত্তরের দিকের জানলাটা বন্ধ রাখতে। এতে কাজ হলে হবে, না হলে সুধীনকে এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। গগন চৌধুরী লোকটা কীরকম, সেটা জানা থাকলে ভাল হত—প্রতিবেশীর কাছ থেকে অভদ্র অপমানসূচক ব্যবহার হজম করা খুব কঠিন, তা তিনি যতই প্রবীণ হন না কেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া গতি নেই।

গেটটা খোলা এবং দারোয়ান নেই দেখে সুধীনের একটু অবাক লাগল; কিন্তু প্রথম বাধা এত সহজে অতিক্রম করতে পারায় সেইসঙ্গে একটু নিশ্চিন্তও লাগল। সে রাত্রেই যাওয়া স্থির করেছে, কারণ ভদ্রলোক দেখতে চাইলে তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারবে আলোটা কীভাবে তার ঘরে পড়ে।

ভবানীপুরের ভদ্রপাড়া শীতকালের রাত এগারোটার মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। গতকাল পূর্ণিমা ছিল; চৌধুরীবাড়ির আগাছায় পরিপূর্ণ বাগানের সবকিছুই জ্যোৎস্নার আলোতে স্পষ্ট দেখা যচ্ছে। শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি ডাইনে ফেলে সুধীন এগিয়ে গেল নোনা ধরা গাড়ি বারান্দার দিকে। এখনও তিনতলার ঘরে আলো জ্বলেনি। কপাল ভাল হলে গগন চৌধুরীকে হয়তো নীচেই পাওয়া যেতে পারে।

সদর দরজার কড়া নাড়তে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটি ভৃত্যস্থানীয় প্রৌঢ় দরজা খুলে প্রশ্ন করল—'কাকে চাই?'

'চৌধুরীমশাই—গগন চৌধুরী—তিনি কি শুয়ে পড়েছেন?'

'ন।'

'তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যায় কি? আমার নম সুধীন সরকার। আমি থাকি ওই সামনের বাড়িতে। একটা বিশেষ কাজে এসেছি।'

চাকর ভিতরে গিয়ে আবার মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এল।

'আপনি আসুন।'

সব ব্যাপারটই যে সহজে হয়ে যাচ্ছে—এ তো ভারী আশ্চর্য!

ভিতরে ঢুকে ল্যান্ডিং পেরিয়ে একটা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকল সুধীন।

'বসুন।'

জানলা দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে সোফার উপর, তাই সুধীন সেটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে বসল। চাকর বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল না কেন? এখন তো পাড়ায় লোডশেডিং নেই।

এবারে ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরাতে সুধীনের হৃৎস্পন্দন হঠাৎ দেখতে দেখতে দ্বিগুণ হয়ে গেল। সে কি ঘরভর্তি লোকের মধ্যে এসে পড়ল নাকি? তাকে ঘিরে কারা চেয়ে রয়েছে তার দিকে?

ঘরের প্রায়ান্ধকারে দৃষ্টি আরেকটু অভ্যস্ত হতে সুধীন বুঝতে পারল যারা চেয়ে রয়েছে তারা মানুষ নয়, মুখোশ। প্রত্যেকটি চোখের চাহনি যেন তারই দিকে ঘোরানো। এসব মুখোশ যে এ দেশের নয়, সেটাও বুঝেছে সুধীন। দেখে মনে হয়, অধিকাংশই আফ্রিকার, কিছু দক্ষিণ আমেরিকার হতে পারে।

সুধীন এককালে ভাল ছবি আঁকত, বাপের আপত্তি না থাকলে হয়তো সেটাকেই সে পেশা করত। হাতের নানারকম কাজ সম্বন্ধে তার এখনও যথেষ্ট কৌতূহল আছে।

সুধীন মনে মনে নিজের সাহসের তারিফ না করে পারল না। অন্ধকার ঘরে মুখোশ পরিবৃত এই ভৌতিক পরিবেশে অনেকেরই দাঁতকপাটি লেগে যেত।

ঘরে যে কখন লোক প্রবেশ করেছে তা সুধীন টের পায়নি। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন শুনে চমকে পাশ ফিরে সোফায় বসা মানুষটাকে দেখতে পেল।

'এত রাত্রে?'

সুধীন হাত দুটোকে প্রায় যন্ত্রের মতো সামনে তুলে নমস্কার করে কথা বলতে গিয়েও পারল না।

ইনি যে অভিজাত পরিবারের সন্তান তাতে কোনও সন্দেহ নেই—পরনে দোরোখা শালই তার পরিচয় দিচ্ছে—কিন্তু গায়ের রঙে এমন পাংশুটে রক্তহীন ভাব, আর চোখের চাহনিতে এমন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা সুধীন কখনও দেখেনি। এমন ব্যক্তিকে প্রথম দর্শনে কারুরই মুখ দিয়ে চট করে কথা বেরোবে না।

ভদ্রলোক নিষ্পলক দৃষ্টিতে সুধীনের দিকে চেয়ে আছেন। প্রায় এক মিনিট লাগল সুধীনের নিজেকে সামলে নিতে। তারপর সে মুখ খুলল।

'আমি একটা, মানে, অভিযোগ জানাতে এসেছি—কিছু মনে করবেন না। আপনিই গগন চৌধুরী তো?'

ভদ্রলোক একবার শুধু মাথাটা নাড়িয়ে জানিয়ে দিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি। প্রশস্ত ললাটের তিনদিক দিয়ে সিংহের কেশরের মতো আধপাকা চুল থেকে মনে হয় বয়স পঁয়ষট্টির কম না।

সুধীন বলে চলল, 'আমার নাম সুধীন্দ্রনাথ সরকার। আমি সামনের বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে থাকি। আসলে হয়েছে কি, আপনার তিনতলার ঘরের বাতিটা সারারাত জ্বলে বলে বড্ড অসুবিধা হয়। আলোটা সোজা আমার মুখের উপর এসে পড়ে। যদি আপনার জানলাটা বন্ধ করে রাখতে পারতেন!—নইলে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়। সারাদিন আপিস করে রাত্তিরে ঘুমোতে না পারলে...'

ভদ্রলোক এখনও একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সুধীনের দিকে। এই ঘরের কি কোনও আলোই জ্বলে না নাকি?

অগত্যা সুধীনই আবার মুখ খুলল। ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার।

'আমি যদি জানলা বন্ধ করি তা হলেও আলো আসবে না ঠিকই, কিন্তু দক্ষিণের জানলা তো, তাই...'

'আপনার জানলা বন্ধ করতে হবে না।'

'আজ্ঞে?'

'আমিই করব।'

হঠাৎ যেন একট বিরাট ভার নেমে গেল সুধীনের বুক থেকে।

'ওঃ, তা হলে তো কথাই নেই! অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি উঠছেন?'

সুধীন ওঠার উদ্যোগ করছিল ঠিকই, কিন্তু এই প্রশ্নে একটু অবাক হয়েই আবার বসে পড়ল—'রাত হল তো! আর আপনিও নিশ্চয়ই শুতে যাবেন।'

'আমি রাত্রে ঘুমোই না।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি সুধীনের দিক থেকে একচুল নড়েনি।

'লেখাপড়া করেন বুঝি?' সুধীন ধরা গলায় প্রশ্ন করল। এই পরিবেশে গগন চৌধুরীর সান্নিধ্য যে খুব স্বস্তিকর নয়, সেটা স্বীকার করতেই হবে।

'না।'

'তবে?'

'ছবি আঁকি।'

সুধীনের মনে পড়ে গেল বাইনোকুলার দিয়ে ঘরের দেওয়ালে পেন্টিং দেখে মনে হয়েছিল সেটা চিত্রকরের স্টুডিও হতে পারে। নাগমশাইও বলেছিলেন ইনি এককালে ছবি আঁকতেন।

'তার মানে ওই ঘরটা আপনার স্টুডিও?'
'ঠিকই ধরেছেন।'
'কিন্তু সে-কথা বোধহয় পাড়ার বিশেষ কেউ জানে না?'
গগন চৌধুরী একটা শুকনো হাসি হাসলেন।
'আপনার সময় আছে?'
'সময়, মানে...'
'তা হলে কতগুলো কথা বলি। অনেকদিনের জমে থাকা কথা। কাউকে বলার সুযোগ হয়নি কখনও।'
সুধীন অনুভব করল, ভদ্রলোকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।
'বলুন।'
'পাড়ার লোকে জানে না, কারণ জানার আগ্রহ নেই। একটা লোক সারাটা জীবন শিল্পচর্চা করে গেল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কারুরও কোনও কৌতূহল নেই। এককালে যখন এগজিবিশন করেছি, তখন কেউ কেউ এসে দেখেছে, অল্পবিস্তর সুখ্যাতিও করেছে। কিন্তু যখন হাওয়া বদলাতে শুরু করল, মানুষের যে ছবি রক্তমাংসের মানুষ বলে চেনা যায় তার কদর আর যখন রইল না, তখন থেকে আমি গুটিয়ে নিয়েছি নিজেকে। নতুনের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলতে আমি শিখিনি। মনে মনে দা ভিঞ্চিকে গুরু বলে মেনেছিলাম; এখনও তিনিই আমার গুরু।'
'কিন্তু...আপনি কীসের ছবি আঁকেন?'
'মানুষের।'
'মানুষের?'
'পোর্ট্রেট।'
'মন থেকে?'
'না। সেটা আমি পারি না। শিখিনি। আমার সামনে কেউ এসে না বসলে আমি ছবি আঁকতে পারি না।'
'এই মাঝরাত্তিরে—?'
'আসে। মডেল আসে। সিটিং দেয়। রোজই আসে।'
সুধীন কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে বসে রইল। এ কেমনতরো কথাবার্তা বলছেন ভদ্রলোক? এ যে পাগলের প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে!
'বিশ্বাস হচ্ছে না!' গগন চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে এই প্রথম একটা পরিষ্কার হাসির আভাস দেখা গেল। সুধীন কী বলবে বুঝতে পারল না।
'আসুন আমার সঙ্গে।'
সুধীন এ আদেশও অমান্য করতে পারল না। ভদ্রলোকের চোখে এবং কথায় একটা সম্মোহনী শক্তি আছে, সেটা মানতেই হবে। তার নিজেরও যে কৌতূহল হচ্ছে না তা নয়। কেমন ছবি আঁকেন ভদ্রলোক? কারা আসে সিটিং দিতে মাঝরাত্তিরে? কীভাবে তাদের জোগাড় করা হয়?
'এক আমার স্টুডিওতে ছাড়া বাড়ির আর কোথাও ইলেকট্রিসিটি নেই,' কেরোসিন ল্যাম্পের আবছা হলদে আলোয় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বললেন ভদ্রলোক।—'বাকি সব কানেকশন কেটে দিয়েছি।'
আশ্চর্য এই যে, ল্যান্ডিং-এ, সিঁড়ির দেওয়ালে, বৈঠকখানায়—কোথাও একটিও পেন্টিং নেই। সবই কি তা হলে স্টুডিওতে জড়ো করে রেখেছেন ভদ্রলোক?
তিনতলায় উঠে বাঁয়ে ঘুরেই সামনে একটা দরজা। সেই ঘরে সুধীনকে নিয়ে ঢুকে দরজা আবার বন্ধ করে দিয়ে বাঁয়ে দেওয়ালে একট সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোতে ঘরটা ভরে গেল।
এটাই যে স্টুডিও সেটা আর বলে দিতে হয় না। আঁকার সব সরঞ্জামই রয়েছে এখানে। ঘরের এক পাশে আলোর ঠিক নীচে ইজেলে একটা সাদা ক্যানভাস খাটানো রয়েছে। তাতে নতুন ছবি শুরু হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

সরঞ্জামের বাইরে যেটা আছে সেটা হল দেওয়ালে টাঙানো এবং মেঝেতে ডাঁই করে রাখা পোর্ট্রেট। কমপক্ষে একশো তো হবেই। মেঝেরগুলো এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে না ধরলে বোঝা যাবে না। যেগুলো চোখের সামনে জলজ্যান্ত সে হল দেওয়ালে টাঙানো পোর্ট্রেটগুলো। অধিকাংশই পুরুষের ছবি। সুধীন তার তৈরি চোখে বুঝে নিল সাবেকি ঢঙে আঁকা পেন্টিংগুলোতে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় আছে। এখানেও সুধীনের মনে হল যে, সে যেন অনেক জ্যান্ত মানুষের ভিড়ে এসে পড়েছে—এবং সবাই চেয়ে আছে তারই দিকে—কমপক্ষে পঞ্চাশ জোড়া চোখ!

কিন্তু এরা সব কারা? দু-একটা মুখ চেনা-চেনা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু—

'কেমন লাগছে?' প্রশ্ন করলেন গগন চৌধুরী।

'উঁচুদরের কাজ,' স্বীকার করতে বাধ্য হল সুধীন।

'অথচ অয়েল পেন্টিং-এ পোর্ট্রেট আঁকার রেওয়াজটাই লোপ পেয়ে গেছে। সেখানে আমাদের মতো শিল্পীদের কী দশা হয় ভেবে দেখেছেন?'

'কিন্তু এ ঘরে এসে তো মনে হচ্ছে না যে, আপনার কাজের অভাব আছে।'

'কী বলছেন! সে তো এখন! এককালে পনেরো বছর ধরে সমানে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছি—একটি লোকও সাড়া দেয়নি। শেষটায় বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিই।'

'তারপর? আবার আঁকা শুরু হল কী করে?'

'অবস্থার পরিবর্তনের ফলে।'

সুধীন আর কিছু বলল না, কারণ তার সমস্ত মন এখন ছবির দিকে। ইতিমধ্যে সে তিনজনকে চিনতে পেরেছে। একজন মাস চারেক হল মারা গেছেন। বিখ্যাত গায়ক অনন্তলাল নিয়োগী। সুধীন আসরে বসে তাঁর গান শুনেছে বছর আষ্টেক আগে।

দ্বিতীয়জন হলেন অসীমানন্দ স্বামী—এককালে স্বদেশি করে পরে সন্ন্যাসী হয়ে যান। ইনিও মারা গেছেন বছরখানেক হল। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল, সুধীনের মনে আছে।

তৃতীয় ব্যক্তি হলেন এয়ার ইন্ডিয়ার বাঙালি পাইলট ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী। লন্ডন যাওয়ার পথে বোয়িং দুর্ঘটনায় আড়াইশো যাত্রী সমেত এঁরও মৃত্যু হয় বছর তিনেক আগে। সুধীন যে শুধু ছবি থেকেই চিনল এঁকে তা নয়; একবার আপিসের কাজে রোম যাওয়ার পথে প্লেনের ককপিটে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

সুধীন একটা প্রশ্ন না করে পারল না।

'এঁরা কি শুধুই পোর্ট্রেট করানোর উদ্দেশ্যে এসেছিলেন? সে ছবি নিজেরা নেননি কখনও?'

গগন চৌধুরীকে এই প্রথম গলা ছেড়ে হাসতে শুনল সুধীন।

'না, মিস্টার সরকার, পোর্ট্রেট এঁদের কোনও প্রয়োজন ছিল না। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য আঁকা।'

'আপনি কি বলতে চান রোজই কেউ না কেউ এসে আপনাকে সিটিং দেন?'

'সেটা আর একটুক্ষণ থাকলেই দেখতে পাবেন। আজও লোক আসবে।'

সুধীনের মাথা ক্রমেই গুলিয়ে যাচ্ছে।

'কিন্তু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগটা কীভাবে—?'

'দাঁড়ান, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার সিস্টেমটা একটু আলাদা।'

তাক থেকে একটা বেশ বড় খাতা নামিয়ে সুধীনের দিকে নিয়ে এলেন গগন চৌধুরী।

'এটা খুলে দেখুন এতে কী আছে।'

আলোর তলায় নিয়ে গিয়ে খাতাটা খুলল সুধীন।

খাতার পাতার পর পাতায় আঠা দিয়ে সাঁটা রয়েছে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে কাটা মৃত্যুসংবাদ। অনেকগুলো খবরের সঙ্গে ছবিও রয়েছে। সুধীন দেখল যে, কিছু কিছু কাটিং-এর পাশে পেনসিল দিয়ে টিকে দেওয়া রয়েছে।

'পেনসিলের দাগ হলে বুঝতে হবে তাদের ছবি আঁকা হয়ে গেছে,' বললেন গগন চৌধুরী।

'কিন্তু যোগাযোগটা করেন কী করে সেটা তো—'

গগন চৌধুরী সুধীনের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে আবার সেটা তাকে রেখে দিলেন। তারপর ঘুরে

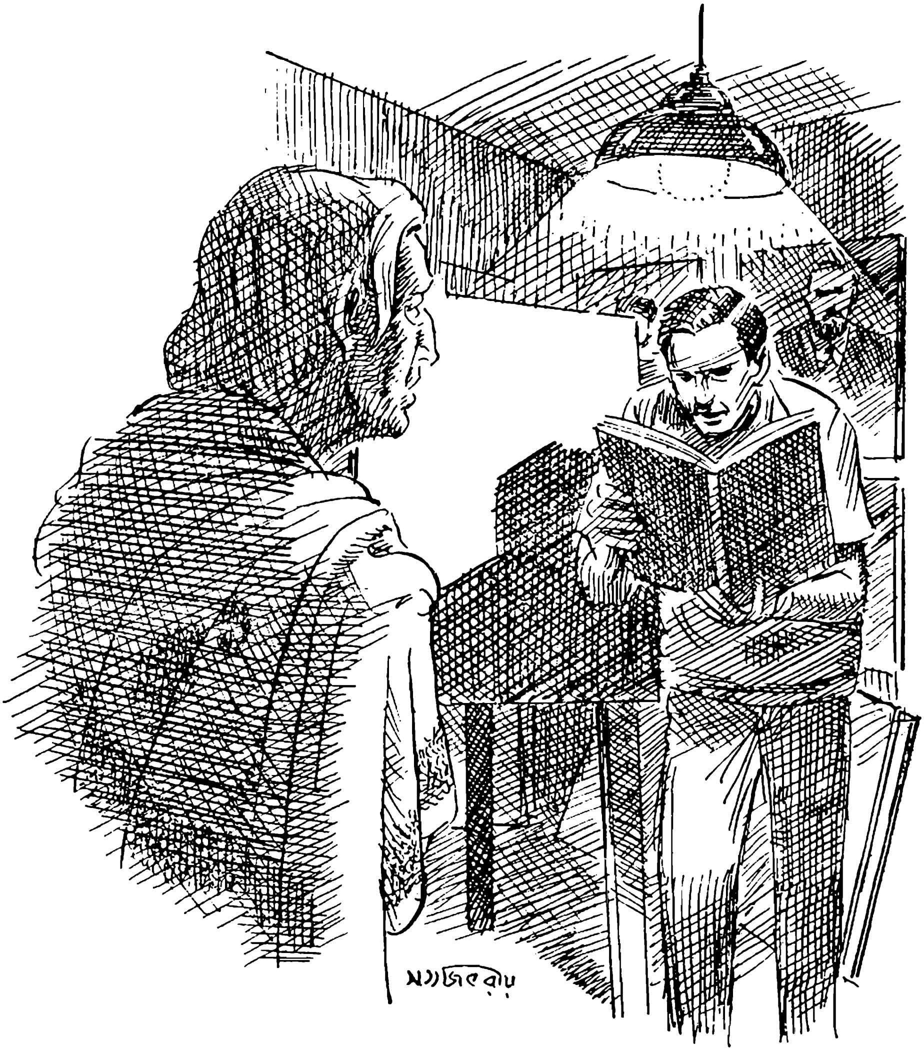

এগিয়ে এসে বললেন, 'ওটা সকলে পারে না, আমি পারি। এটা চিঠি বা টেলিফোনের কম্ম নয়। এঁরা যেখানে আছেন সেখানে তো আর টেলিফোন নেই বা ডাক বিলির ব্যবস্থাও নেই। এঁদের জন্য অন্য উপায়ের প্রয়োজন হয়।'

সুধীনের হাত পা ঠাণ্ডা, গলা শুকিয়ে কাঠ। তাও একটা প্রশ্ন না করলেই নয়!

'আপনি কি বলতে চান এইসব লোকের পোর্ট্রেট করা হয়েছে এঁদের মৃত্যুর পর?'

'মৃত্যুর আগে এঁদের খবর পাব কী করে সুধীনবাবু? আমি আর কলকাতার ক'টা লোককে চিনি? মৃত্যু না হলে তো তাঁরা আর তাঁদের গণ্ডির বাইরে বেরোতে পারেন না। একমাত্র মৃত ব্যক্তিই তো সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁদের সময়েরও অভাব নেই, ধৈর্যেরও অভাব নেই। ছবি যতক্ষণ না নিখুঁত হচ্ছে ততক্ষণে ঠায় বসে থাকবেন ওই চেয়ারে।'

ঢং-ঢং-ঢং—

রাত্রের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা ঘড়ি বেজে উঠল। সিঁড়ির পাশে যে ঘড়িটা দেখেছিল সুধীন

সেটাই বোধহয়।

'বারোটা,' বললেন গগন চৌধুরী। 'এইবার আসবেন।'

'কে?'—সুধীনের গলার স্বর অস্বাভাবিক রকম চাপা ও রুক্ষ। তার মাথা ঝিমঝিম করছে।

'আজকে যিনি বসবেন তিনি। ওই তাঁর পায়ের শব্দ।'

সুধীন শ্রবণশক্তিটা এখনও হারায়নি, তাই সে স্পষ্ট শুনতে পেল বাইরে নীচ থেকে জুতোর শব্দ।

'এসে দেখুন।'—গগন চৌধুরী এগিয়ে গেছেন পাশের একটা জানলার দিকে। 'আমার কথা বিশ্বাস না হয় এসে দেখুন।'

এও কি সেই সম্মোহনী শক্তি? যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গিয়ে সুধীন গগন চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে দৃষ্টি দিল। তারপর তার অজান্তেই একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে—

'একে যে চিনি!'

সেই দৃপ্ত মিলিটারি ভঙ্গি, সেই দীর্ঘ গড়ন, সেই ছেয়ে রঙের সাফারি সুট।

ইনিই ছিলেন সুধীনের বস—নগেন্দ্র কাপুর।

সুধীনের মাথা ঘুরছে। টাল সামলানোর জন্য সে ইজেলটাকে জাপটে ধরে ফেলল।

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের আওয়াজ উপরে উঠে আসছে। কাঠের সিঁড়িতে জুতোর ক্রমবর্ধমান শব্দে সমস্ত বাড়ি গমগম করছে।

এবার আওয়াজ থামল।

নৈঃশব্দ্যের মধ্যে গগন চৌধুরী মুখ খুললেন আবার।

'যোগস্থাপনের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না, সুধীনবাবু? ভেরি সিম্পল—এইভাবে হাতছানি দিলেই চলে আসে!'

সুধীন বিস্ফারিত চোখে দেখল দোরোখা শালের ভিতর থেকে গগন চৌধুরীর ডান হাতটা বেরিয়ে সামনে প্রসারিত। সে হাতে মাংস, চামড়া কিছুই নেই—খালি হাড়।

'যে হাতে ডাকা, সে হাতেই আঁকা!'

সংজ্ঞা হারাবার আগের মুহূর্তে সুধীন শুনল স্টুডিওর বন্ধ দরজার বাইরে থেকে টোকা পড়ছে—

খট খট খট—খট খট খট—

খট খট খট—খট খট খট—

'দাদাবাবু! দাদাবাবু।'

এক ঝটকায় ঘুমটা ভেঙে গিয়ে দিনের আলোয় সুধীনকে আবার তখনই চোখটা কুঁচকে বন্ধ করে নিতে হল। বাপরে—কী ভয়ংকর স্বপ্ন!

'দরজা খুলুন! দাদাবাবু!'

চাকর অধীরের গলা।

'দাঁড়া, এক মিনিট।'

সুধীন বিছানা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিল। অধীরের মুখে গভীর উদ্বেগ।

'আপনি এত বেলা অবধি—'

'জানি। ঘুমটা একটু বেশি হয়ে গেছে।'

'এত হইহল্লা বাড়ির সামনে, কিছুই টের পেলেন না?'

'হইহল্লা?'

'চৌধুরীবাড়ির বড়বাবু যে মারা গেলেন কাল রাত্তিরে। গগনবাবু। চৌরাশি বছর বয়স হয়েছেল। ভুগছিলেন তো অনেকদিন। ঘরে বাতি জ্বালা থাকত রাত্তিরে দেখেননি?'

'তুই জানতিস ওঁর অসুখ?'

'জানব না? ওনার চাকর ভগীরথ—তার সঙ্গে তো দেখা হয় রোজ বাজারে।'

'বোঝো!'

সন্দেশ, পৌষ ১৩৯০

লখ্‌নৌর ডুয়েল

‘ডুয়েল মানে জানিস ?’ জিজ্ঞেস করলেন তারিণীখুড়ো।

‘বাঃ, ডুয়েল মানে জানব না ?’ বলল ন্যাপলা। ‘ডুয়েল রোল, মানে দ্বৈত ভূমিকা। সন্তোষ দত্ত গুপী গাইনে ডুয়েল রোল করেছিলেন—হাল্লার রাজা, শুণ্ডীর রাজা।’

‘সে ডুয়েলের কথা বলছি না,’ হেসে বললেন তারিণীখুড়ো। ‘ডি-ইউ-এ-এল নয়, ডি-ইউ-ই-এল ডুয়েল। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে লড়াই।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি জানি !’ আমরা সকলে একসঙ্গে বলে উঠলাম।

‘এই ডুয়েল নিয়ে এককালে কিছু পড়াশুনা করেছিলুম নিজের শখে,’ বললেন তারিণীখুড়ো। ‘ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইটালি থেকে ডুয়েলিং-এর রেয়াজ ক্রমে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তরোয়াল জিনিসটা ছিল ভদ্রলোকদের পোশাকের একটা অঙ্গ, আর অসি-চালনা বা ফেনসিং শেখাটা পড়ত সাধারণ শিক্ষার মধ্যে। একজন হয়তো আরেকজনকে অপমান করল, অমনি অপমানিত ব্যক্তি ইজ্জত বাঁচাবার খাতিরে অন্যজনকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করল ; এই চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করাটা রেয়াজের মধ্যে পড়ত না, ফলে সোর্ড ফাইট শুরু হয়ে যেত। মান যে বাঁচবেই এমন কোনও কথা নেই, কারণ যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি অসি চালনায় তেমন নিপুণ নাও হতে পারেন। কিন্তু তাও চ্যালেঞ্জ করা চাই, কারণ অপমান হজম করাটা সেকালে অত্যন্ত হেয় বলে গণ্য হত।

‘বন্দুক-পিস্তলের যুগে অবিশ্যি পিস্তলই হয়ে গেল ডুয়েলিং-এর অস্ত্র। সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা। এই ডুয়েলিং-এ তখন এত লোক মরত আর জখম হত, যে এটাকে বেআইনি করার চেষ্টা ইতিহাসে অনেকবার হয়েছে। কিন্তু এক রাজা আইন করে বন্ধ করলেন তো পরের রাজা ঢিলে দেওয়াতে আবার চালু হয়ে গেল ডুয়েলিং। আর কতরকম তার আইনকানুন !—দুজনকেই হুবহু একরকম অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে, দুজনেরই একটি করে “সেকেন্ড” বা আম্পায়ার থাকবে যাতে কারচুপির রাস্তা বন্ধ হয় ; দুজনকেই দাঁড়াতে হবে এমন জায়গায় যাতে পরস্পরের মধ্যে আন্দাজ বিশ গজের ব্যবধান থাকে, আর চ্যালেঞ্জারের সেকেন্ড “ফায়ার” বলা মাত্র দুজনের একসঙ্গে গুলি চালাতে হবে। তোরা জানিস কিনা জানি না, এই ভারতবর্ষেই—না, ভারতবর্ষ কেন—এই কলকাতাতেই, আজ থেকে দুশো বছর আগে এক বিখ্যাত ডুয়েল লড়াই হয়েছিল ?’

ন্যাপলাও দেখলাম জানে না ; সেও আমাদের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

‘যে দুজন লড়েছিলেন,’ বললেন তারিণীখুড়ো, ‘তাঁদের একজন তো জগদ্বিখ্যাত। তিনি হলেন ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। প্রতিপক্ষের নাম ফিলিপ ফ্রানসিস। ইনি ছিলেন বড়লাটের কাউনসিলের সদস্য। হেস্টিংস কোনও কারণে ফ্রানসিসকে একটি অপমানসূচক চিঠি লেখেন। ফ্রানসিস তখন তাকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করে। আলিপুরে এখন যেখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, তারই কাছে একটা খোলা জায়গায় এই ডুয়েল হয়। ফ্রানসিস চ্যালেঞ্জ করেছেন, ফলে তারই এক বন্ধুকে জোড়া-পিস্তল জোগাড় করতে হল, এবং তিনিই “ফায়ার” বলে চেঁচালেন। পিস্তলও চলেছিল একই সঙ্গে, কিন্তু মাটিতে পড়ে জখম হয়ে পড়ল মাত্র একজনই—ফিলিপ ফ্রানসিস। তবে সুখের বিষয় সে-জখম মারাত্মক হয়নি।’

‘ইতিহাস তো হল,’ বলল ন্যাপলা, ‘এবার গল্প হোক্। ডুয়েলিং যখন আপনার মাথায় ঘুরছে, তখন মনে হচ্ছে ডুয়েল নিয়ে নির্ঘাত আপনার কোনও এক্সপিরিয়েন্স আছে।’

খুড়ো বলল, ‘তোরা যা ভাবছিস সেরকম অভিজ্ঞতা না থাকলেও, যা আছে শুনলে তাক্ লেগে

যাবে।'

দুধ-চিনি ছাড়া চায়ে চুমুক দিয়ে, পকেট থেকে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ির প্যাকেট আর দেশলাইটা বার করে পাশে তক্তপোষের ওপর রেখে তারিণীখুড়ো তাঁর গল্প শুরু করলেন—

আমি থাকি লখ্‌নৌতে। রেগুলার চাকরি বলে কিছু নেই, এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই, কারণ তার বছর দেড়েক আগে রেঞ্জার্সের লটারিতে লাখ দেড়েক টাকা পেয়ে, তার সুদেই দিব্যি চলে যাচ্ছে। আমি বলছি ফিফ্‌টি ওয়ানের কথা। তখনও আর এমন মাগ্যির বাজার ছিল না, আমি একা মানুষ, মাসে পাঁচ-সাতশো টাকা হলে দিব্যি আরামে চলে যেত। লাটুশ রোডে একটা ছোট্ট বাংলো বাড়ি নিয়ে থাকি, 'পায়োনিয়ার' কাগজে মাঝে মাঝে ইংরিজিতে চুট্‌কি গোছের লেখা লিখি, আর হজরতগঞ্জের একটা নিলামের দোকানে যাতায়াত করি। নবাবদের আমলের কিছু কিছু জিনিস তখনও পাওয়া যেত। সুবিধের দামে পেলে ধনী আমেরিকান টুরিস্টদের কাছে বেচে বেশ টুপাইস লাভ করা যেত। অবিশ্যি আমার নিজেরও যে শখ ছিল না তা নয়। আমার বৈঠকখানা ছোট হলেও তার অনেক জিনিসই ছিল এই নিলামের দোকানে কেনা।

এক রবিবার সকালে দোকানে গিয়ে দেখি জিনিসপত্তরের মধ্যে রয়েছে একটা খয়েরি রঙের মেহগনি কাঠের বাক্স, এক হাত লম্বা, এক বিঘত চওড়া, ইঞ্চি তিনেক পুরু। ভেতরে কী থাকতে পারে আন্দাজ করতে পারলাম না, তাই জিনিসটা সম্বন্ধে কৌতূহল গেল বেড়ে। নিলামে অনেক জিনিসই উঠেছে, কিন্তু আমার মনটা পড়ে রয়েছে ওই বাক্সের দিকে।

অবশেষে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দেখলুম নিলামদার বাক্সটাকে হাতে তুলে নিয়েছেন। আমি টান হয়ে বসলুম। যথারীতি গুণকীর্তন শুরু হল।—'এবারে একটি অতি লোভনীয় জিনিস আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। এর জুড়ি পাওয়া ভার। দেখুন, এই যে ঢাকনা খুলছি আমি। দুশো বছরের পুরনো জিনিস, অথচ এখনও এর জেল্লা অম্লান রয়েছে। জগদ্বিখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুতকারক জোসেফ ম্যানটনের ছাপমারা এক জোড়া ডুয়েলিং পিস্তল ! এই জোড়ার আর জুড়ি নেই !...'

আমার তো দূর থেকে দেখেই হয়ে গেছে। ও জিনিসটা আমার চাই। আমার কল্পনা তখনই খেলতে শুরু করে দিয়েছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের বিশ হাত দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'ফায়ার !' শোনামাত্র গুলি চালাচ্ছে, আর তার পরেই রক্তাক্ত ব্যাপার !

এই সব চিন্তা মাথায় ঘুরছে, নিলামও হয়ে চলেছে, চারবাগের এক গুজরাটি ভদ্রলোক সাড়ে সাত শো বলার পর আমি ধাঁ করে হাজার বলাতে দেখলাম ডাকাডাকি বন্ধ হয়ে গেল, ফলে বাক্স সমেত পিস্তল দুটি আমারই হয়ে গেল।

জিনিসটা দোকানে দেখে যতটা ভাল লেগেছিল, বাড়িতে এসে হাতে নিয়ে তার চেয়ে যেন শতগুণে বেশি ভাল লাগল। পিস্তলের মতো পিস্তল বটে। যেমন তার বাঁট, তেমনি তার নল। পুরো পিস্তল প্রায় সতেরো ইঞ্চি লম্বা। তার গায়ে পরিষ্কার খোদাই করা রয়েছে মেকারের নাম—জোসেফ ম্যান্টন। বন্দুক সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা আগেই করা ছিল ; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলন্ডে বন্দুক বানিয়ে হিসেবে যাদের সবচেয়ে বেশি নামডাক ছিল, তার মধ্যে জোসেফ ম্যান্টন হলেন একজন।

লখ্‌নৌ গিয়েছি সবে মাস তিনেক হল। ওখানে বাঙালির সংখ্যা বিশেষ কম নয়, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাদের কারুর সঙ্গে তেমন পরিচয় হয়নি। সন্ধ্যাবেলাটা মোটামুটি বাড়িতেই থাকি ; আমি ছাড়া থাকে একজন রান্নার লোক আর একটি চাকর। পিস্তল দুটো কেনা অবধি মাথায় ডুয়েলিং সংক্রান্ত একটা প্লট ঘুরছে, তাই খাতা-কলম নিয়ে আরাম কেদারায় বসেছি, এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। কোনও বিদেশি খদ্দের নাকি ? পুরনো জিনিসের সাপ্লায়ার হিসেবে আমার কিছুটা পরিচিতি এর মধ্যেই হয়ে গেছে।

গিয়ে দরজা খুললুম। একজন সাহেবই বটে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, বোঝাই যায় এদেশে অনেকদিনের বাসিন্দা, এমন কী জন্মও হয়তো এখানেই। অর্থাৎ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।

'গুড ইভিনিং।'

আমিও প্রত্যাভিবাদন জানালুম। সাহেব বলল, 'একটু দরকার ছিল। ভেতরে বসতে পারি কি ?'

'নিশ্চয়ই।'

সাহেবের উচ্চারণে কিন্তু দোআঁশলা ভাব নেই একদম।

ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় এনে বসালাম। এইবার আলোয় চেহারাটা আরও স্পষ্ট বোঝা গেল। সুপুরুষই বলা চলে। চুল কটা। একজোড়া বেশ তাগড়াই গোঁফ তাও কটা, চোখের মণি নীল, পরনে ছেয়ে রঙের সুট। আমি বললুম, 'সাহেব, আমি তো মদ খাই না, তবে যদি বলো তো এক পেয়ালা চা বা কফি করে দিতে পারি।' সাহেব বললে যে তার কিছুরই দরকার নেই, সে এইমাত্র বাড়ি থেকে ডিনার খেয়ে আসছে। তারপর তার আসার কারণটা বললে।

'তোমায় আজ সকালে দেখলাম হজরতগঞ্জের অকশন হাউসে।'

'তুমিও ছিলে বুঝি সেখানে ?'

'হ্যাঁ—কিন্তু তুমি এত তন্ময় ছিলে তাই বোধহয় খেয়াল করনি।'

'আসলে একটা জিনিসের ওপর খুব লোভ ছিল—'

'সেটা তো তোমারই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ডুয়েলিং পিস্তল—জোসেফ ম্যান্টনের তৈরি ! ইউ আর ভেরি লাকি !'

আমি একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

'ওটা কি তোমার কোনও চেনা লোকের সম্পত্তি ছিল ?'

'হ্যাঁ, তবে সে বহুদিন হল মারা গেছে। তারপর কোথায় চলে গিয়েছিল জিনিসটা জানতাম না। ওটা কি আমি একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি ? কারণ ওটার সঙ্গে একটা কাহিনী জড়িত রয়েছে, তাই...'

আমি সাহেবের হাতে পিস্তলের বাক্সটা দিলুম। সাহেব সেটা খুলে পিস্তলটা বার করে উদ্ভাসিত

চোখে সেটা ল্যাম্পের কাছে নিয়ে গিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে, 'এই পিস্তল দিয়ে এক ডুয়েল লড়া হয়েছিল এই লখ্নৌ শহরে সেটা বোধহয় তুমি জান না ?'

'লখ্নৌতে ডুয়েল !'

'হ্যাঁ। আজ থেকে দেড়শো বছর আগের ঘটনা। একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে। সত্যি বলতে কী, আর তিন দিন পরেই ঠিক দেড়শো বছর পূর্ণ হবে। ষোলোই অক্টোবর।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'খুব আশ্চর্য তো ! কিন্তু ডুয়েলটা কাদের মধ্যে হয়েছিল— ?'

সাহেব পিস্তলটা ফেরত দিয়ে আবার সোফায় বসে বললে, 'সমস্ত ঘটনাটা আমার এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শোনা যে আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই।...ডাঃ জেরিমায়া হাডসনের মেয়ে অ্যানাবেলা হাডসন তখন ছিল লখ্নৌ-এর নামকরা সুন্দরী। ডাকসাইটে তরুণী ; ঘোড়া চালায়, বন্দুক চালায়—দুটোই পুরুষের মতো। এদিকে আবার ভাল নাচতে পারে, গাইতে পারে। সেই সময় লখ্নৌতে এক তরুণ ইংরেজ আর্টিস্ট এসে রয়েছেন, নাম জন ইলিংওয়ার্থ। তার আসল মতলব নবাবের ছবি এঁকে ভাল ইনাম পাওয়া, কিন্তু অ্যানাবেলার সৌন্দর্যের কথা শুনে আগে তার একটা পোর্ট্রেট করার প্রস্তাব নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। ছবিও হল বটে, কিন্তু তার আগেই ইলিংওয়ার্থ অ্যানাবেলাকে গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলেছে।

'এদিকে তারই কিছুদিন আগে একটা পার্টিতে অ্যানাবেলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে চার্লস ব্রুসের। লখ্নৌ ক্যান্টনমেন্টে তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা বড় অংশ ছিল, তারই ক্যাপ্টেন ছিলেন চার্লস ব্রুস। ব্রুসও প্রথম দর্শনেই অ্যানাবেলার প্রেমে পড়ে গেলেন।

'পার্টির দুদিন বাদে আর থাকতে না পেরে অ্যানাবেলার বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন ক্যাপ্টেন ব্রুস। গিয়ে দেখেন একটি অচেনা তরুণ অ্যানাবেলার ছবি আঁকছে। ইলিংওয়ার্থ তেমন জোয়ান পুরুষ না হলেও চেহারাটা তার মন্দ ছিল না। তার হাবেভাবে সেও যে অ্যানাবেলার প্রতি অনুরক্ত এটা বুঝতে ব্রুসের দেরি লাগল না। শিল্পী জাতটাকে ব্রুস এমনিতেই অবজ্ঞা করে, বর্তমান ক্ষেত্রে সে অ্যানাবেলার সামনেই ইলিংওয়ার্থকে একটা অপমানসূচক কথা বলে বসল।

'ইলিংওয়ার্থের মধ্যে যা গুণ ছিল তা সবই শিল্পীসুলভ গুণ, আর তার প্রবৃত্তিগুলি ছিল কোমল। কিন্তু আজ অ্যানাবেলার সামনে এই অপমান সে হজম করতে পারল না। সে ব্রুসকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করে বসল। ব্রুসও খুশি মনে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। ডুয়েলের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল—ষোলোই অক্টোবর, ভোর ছটা।'

'তুমি জান বোধহয় যে যারা ডুয়েল লড়বে তাদের একজন করে সেকেন্ডের দরকার হয় ?'

আমি বললাম, 'জানি। এরা আম্পায়ারের কাজ করে, অর্থাৎ লক্ষ রাখে যে ডুয়েলের নিয়মগুলো ঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে কি না।'

'হ্যাঁ। সচরাচর এই সেকেন্ডটি হয় যে ডুয়েল লড়বে তার বন্ধুস্থানীয় কেউ। লখ্নৌ শহরে ইলিংওয়ার্থের পরিচিতের সংখ্যা বেশি না হলেও, সরকারি দপ্তরের এক কর্মচারীর সঙ্গে তার বেশ আলাপ হয়েছিল। এঁর নাম হিউ ড্রামন্ড। ইলিংওয়ার্থ ড্রামন্ডকে অনুরোধ করল এক জোড়া ভাল পিস্তল জোগাড় করে দিতে, কারণ ডুয়েলের নিয়ম অনুযায়ী দুটো পিস্তল ঠিক একরকম হওয়া চাই। এ ছাড়া ইলিংওয়ার্থের দ্বিতীয় অনুরোধ হল ড্রামন্ড যেন তার সেকেন্ডের কাজ করে। ড্রামন্ড রাজি হল। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন ব্রুসও তার বন্ধু ফিলিপ মক্সনকে তাঁর সেকেন্ড করলেন।

'ডুয়েলের দিন এগিয়ে এল। এর ফলাফল যে কী হবে সে সম্বন্ধে কারুর মনে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ পিস্তলে ক্যাপ্টেন ব্রুসের লক্ষ্য অব্যর্থ, আর ইলিংওয়ার্থ তুলি চালনায় নিপুণ হলেও পিস্তল চালনায় একেবারেই অপটু।'

এই পর্যন্ত বলে সাহেব থামলেন। আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলুম, 'শেষ পর্যন্ত কী হল ?'

সাহেব মৃদু হেসে বললেন, 'প্রতি বছর ষোলোই অক্টোবর ভোর ছটায় কিন্তু এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।'

'কোথায় ?'

'ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল সেখানে। দিলখুশার পশ্চিমে গুমতী নদীর কাছে একটা মাঠে তেঁতুল গাছের নীচে।'

'পুনরাবৃত্তি মানে ?'

'যা বলছি তাই। ওখানে তরশু ভোর ছটায় গেলে পুরো ঘটনাই চোখের সামনে ঘটতে দেখবে।'

'বলছ কী ! এ তো ভৌতিক ব্যাপার !'

'আমার কথা মানার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তুমি নিজেই গিয়ে যাচাই করে এসো তিনদিন পরে।'

'কিন্তু আমি কি জায়গাটা ঠিক চিনে যেতে পারব ? আমি তো বেশিদিন হল এখানে আসিনি। লখ্‌নৌ-এর ভূগোলটা এখনও—'

'তুমি দিলখুশা চেনো তো ?'

'তা চিনি।'

'দিলখুশার বাইরে আমি পৌনে ছটায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

'বেশ। তাই কথা রইল।'

সাহেব বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তারপরই খেয়াল হল যে ভদ্রলোকের নামটাই জানা হয়নি। অবিশ্যি উনিও আমার নাম জিজ্ঞেস করেননি। যাই হোক, নামটা বড় কথা নয় ; যে কথাগুলো উনি বলে গেলেন সেগুলোই হল আসল। বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এই শহরেই এককালে এরকম রোমান্টিক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, এবং আমারই হাতে রয়েছে এক জোড়া পিস্তল যেগুলো এই ঘটনায় একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্যে জুটল অ্যানবেলা হাডসন ? এবং আরও একটা প্রশ্ন—এই দুজনের মধ্যে কাকে ভালবেসেছিল অ্যানাবেলা ?

আশা করি ষোলো তারিখের অভিযানেই এইসব প্রশ্নের জবাব মিলবে।

ক্রমে এগিয়ে এল ষোলোই অক্টোবর। পনেরোই রাত্তিরে একটা গানের জলসা থেকে বাড়ি ফিরছি। রাস্তায় দেখা সেই সাহেবের সঙ্গে। বলল, 'তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম তোমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য।' আমি বললাম, 'আমি যে শুধু ভুলিনি তা নয়, অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে আগামীকাল সকালের জন্য অপেক্ষা করে আছি।' সাহেব চলে গেল।

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ভোর পাঁচটায় উঠে এক কাপ চা খেয়ে গলায় একটা মাফলার চাপিয়ে নিয়ে একটা টাঙ্গা করে বেরিয়ে পড়লাম দিলখুশার উদ্দেশে। শহরের একটু বাইরে দিলখুশা এককালে ছিল নবাব সাদাত আলির বাগান বাড়ি। চারিদিকে ঘেরা প্রকাণ্ড পার্কে হরিণ চরে বেড়াত। কখনও-সখনও জঙ্গল থেকে এক-আধটা চিতাবাঘও নাকি এসে পড়ত বাড়ির ত্রিসীমানায়। এখন সে বাড়ির শুধু খোলটাই রয়েছে। তবে তার পাশে একটা ফুলবাগিচা এখনও মেনটেন করা হয়, লোকে সেখানে বেড়াতে যায়।

ছটা বাজতে কুড়ি মিনিটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম, 'তুমি যদি আধ ঘণ্টা অপেক্ষা কর, তা হলে আমি আবার এই গাড়িতেই বাড়ি ফিরে যেতে.পারি।' উর্দুটা ভাল জানা ছিল আগেই, তাই বোধহয় খানদানি আদমি ভেবে টাঙ্গাওয়ালা রাজি হয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই একটা অর্জুন গাছের পাশে দেখি সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। বললে সেও নাকি মিনিট পাঁচেক হল এসেছে।

'লেট্‌স গো দেন।'

বললুম, 'চলো সাহেব—তুমিই তো পথ জান, তোমার পিছু নেব আমি।'

মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই একটা খোলা মাঠে এসে পড়লুম। দূরে বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ চারিদিক একটা আবছা কুয়াশায় ঢাকা। হয়তো ডুয়েলের দিনেও ঠিক এমনি কুয়াশা ছিল।

আগাছা আর কাঁটা ঝোপে ঘেরা একটা পোড়ো বাড়ির কাছে এসে সাহেব থামল। দেখেই বোঝা

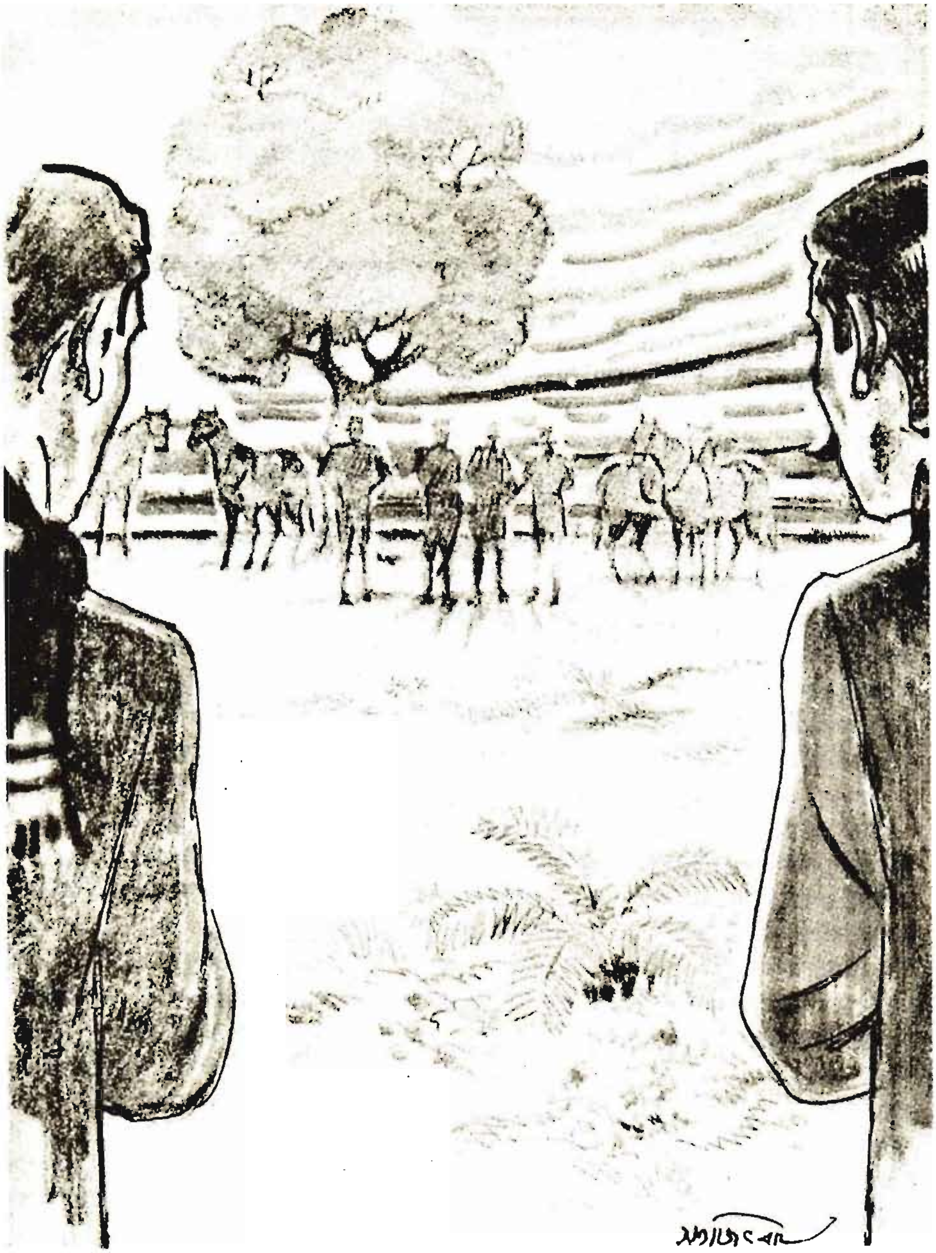

যায় সেটা প্রাচীনকালে কোনও সাহেবের বাড়ি ছিল। অবিশ্যি আমাদের কারবার এই বাড়িটাকে নিয়ে নয়। সেটাকে পেছনে ফেলে আমরা দাঁড়ালাম পুব দিকে মুখ করে। কুয়াশা হলেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সামনে কিছু দূরে রয়েছে একটা তেঁতুল গাছ, আর তার ডাইনে আমাদের থেকে হাত চল্লিশেক দূরে রয়েছে একটা বেশ বড় ঝোপ। আর সব কিছুর পিছন দিয়ে বয়ে চলেছে গুমতী নদী। নদীর পিছনে কুয়াশা হলেও, আন্দাজ করা যায় ওদিকটায় বসতি নেই। সব মিলিয়ে অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশ।

'শুনতে পাচ্ছ ?' সাহেব হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

কান পাততেই শুনতে পেলুম। ঘোড়ার খুরের শব্দ। গাটা যে ছমছম করছিল না তা বলতে পারি না। তবে তার সঙ্গে একটা অভিনব অভিজ্ঞতার চরম প্রত্যাশা।

এইবার দেখলুম দুই অশ্বারোহীকে। আমাদের বাঁ দিকে বেশ দূর দিয়ে এসে তেঁতুল গাছটার নীচে দাঁড়াল।

'এরা দুজনেই কি লড়বেন ?' আমি ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

সাহেব বলল, 'দুজন নয়, একজন। দুজনের মধ্যে লম্বাটি হলেন জন ইলিংওয়ার্থ, অর্থাৎ যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন। অন্যজন ইলিংওয়ার্থের সেকেন্ড ও বন্ধু, হিউ ড্রামন্ড। ওই দেখ ড্রামন্ডের হাতে সেই মেহগ্যানি বাক্স।'

সত্যিই তো ! এবার বুঝলুম আমার রক্ত চলাচল দ্রুত হতে শুরু করেছে। আমি যে দেড়শো বছর আগের একটি ঘটনা আজ ১৯৫০ সালে লখ্‌নৌ শহরে দাঁড়িয়ে দেখতে চলেছি, সেই চিন্তা আমার হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দুটো ঘোড়ায় ক্যাপ্টেন ব্রুস ও তাঁর সেকেন্ড ফিলিপ মক্সন এসে পড়লেন। তারপর ড্রামন্ড বাক্স থেকে পিস্তল দুটো বার করে তাতে গুলি ভরে ব্রুস ইলিংওয়ার্থের হাতে দিয়ে তাদের যেন কী সব বুঝিয়ে দিলেন।

পিছনের আকাশ গোলাপি হতে শুরু করেছে, গুমতীর জলে সেই রঙ প্রতিফলিত।

ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থ এবার পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দুজনেই গুনে গুনে চোদ্দো পা হেঁটে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে মুখোমুখি হলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত কোনও শব্দ শুনতে পাইনি, কিন্তু এবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পিস্তল উঁচিয়ে পরস্পরের দিকে তাক করার পর স্পষ্ট কানে এল ড্রামন্ডের আদেশ—

'ফায়ার !'

পরমুহূর্তেই শুনলাম এক সঙ্গে দুই পিস্তলের গর্জন।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থ দুজনের দেহই একসঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সেই সঙ্গে আরেকটি দৃশ্য আমাকে আরও অবাক করে দিল। যেই ঝোপটার কথা বলছিলাম, সেটার পিছন থেকে এক মহিলা ছুটে বেরিয়ে কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'ফলাফল তো দেখলে', বলল সাহেব। 'এই ডুয়েলে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছিল।'

বললাম, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু ঝোপের পিছন থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে চলে গেলেন, তিনি কে ?'

'দ্যাট ওয়াজ অ্যানাবেলা।'

'অ্যানাবেলা !'

'ইলিংওয়ার্থের গুলিতে ক্যাপ্টেন ব্রুস মরবে না এটা অ্যানাবেলা বুঝেছিল—অথচ ওর দরকার ছিল যাতে দুজনেই মরে। তাই সে আর ঝুঁকি না নিয়ে "ফায়ার" বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই পিস্তল দিয়ে ব্রুসকে মারে। ইলিংওয়ার্থের গুলি ব্রুসের গায়ে লাগেইনি।'

'কিন্তু অ্যানাবেলার এই আচরণের কারণ কী ?'

'কারণ সে ওই দুজনের একজনকেও ভালবাসেনি। ও বুঝেছিল ইলিংওয়ার্থ মরবে, এবং ব্রুস বেঁচে থেকে ওকে বিরক্ত করবে। সেটা ও চায়নি, কারণ সে আসলে ভালবাসত আরেকজনকে—যাকে সে পরে বিয়ে করে এবং যার সঙ্গে সে সুখে ঘর করে।'

আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, যে দেড়শো বছরের পুরনো ডুয়েলের দৃশ্য দ্রুত মিলিয়ে আসছে। কুয়াশাও যেন আরও ঘন হচ্ছে। আমি আশ্চর্য মহিলা অ্যানাবেলার কথা ভাবছি, এমন সময় একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম।

'হিউ ! হিউই !'

'অ্যানাবেলা ডাকছে,' বললেন সাহেব।

আমার দৃষ্টি এবার সাহেবের দিকে ঘুরতেই শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরন

খেলে গেল। এ কাকে দেখছি চোখের সামনে? এর পোশাক বদলে গেল কী করে?—এ যে সেই দেড়শো বছর আগের পোশাক।

'তোমাকে আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি,' বলল সাহেব; তার গলার স্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে।—'আমার নাম হিউ ড্রামন্ড। ইলিংওয়ার্থের বন্ধুকেই ভালবাসত অ্যানাবেলা। গুড বাই...'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখলাম সাহেব ওই পোড়ো বাড়িটার দিকে অগ্রসর হয়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

টাঙ্গা করে বাড়ি ফিরে মেহগ্যানির বাক্সটা খুলে পিস্তলদুটো আরেকবার বার করলাম। নলে হাত পড়তে গরম লাগল। এবার নলের মুখটা নাকের কাছে আনলাম। টাটকা বারুদের গন্ধ।

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৯১

ধুমলগড়ের হান্টিং লজ

'মাথায় অনেকরকম উদ্ভট শখ চাপে মানুষের', বললেন তারিণীখুড়ো, 'কিন্তু আমার যেমন চেপেছে, তেমন কজনের চাপে জানি না।'

আমরা পাঁচজন ঘিরে বসেছি খুড়োকে। বাইরে এক পশলা বেশ ভাল বৃষ্টি হয়ে গিয়ে এখন সেটা অবিরাম ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়েছে। আষাঢ় মাস, তার উপর লোডশেডিং, টিম টিম করে দুটো মোমবাতি জ্বলছে, দেয়ালে আমাদের সকলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে—সব মিলিয়ে তারিণীখুড়োর গল্প শোনার পক্ষে আইডিয়াল পরিবেশ। খুড়োর মতে তাঁর গল্পগুলো সবই সত্যি। এ ব্যাপারে গ্যারান্টি দেবার সাধ্যি আমার নেই, তবে গল্পগুলো যে রঙদার তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আর তারিণীখুড়োর যে গত চল্লিশ বছর ধরে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে সে কথা বাবা আমাদের বলেছেন, কাজেই সেটা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।

ন্যাপলা বলেই বসল, 'আজ কিন্তু ভূতের মতো আর কোনও গল্প জমবে না।'

তারিণীখুড়ো ইস্কুল মাস্টারি ঢং-এ বললেন, "ভূত সচরাচর চার প্রকার হয়। এক অশরীরী আত্মা, যাকে চোখে দেখা যায় না; দুই ছায়ামূর্তি; তিন, নিরেট ভূত—দেখলে মনে হবে জ্যান্ত মানুষ, কিন্তু চোখের সামনে ভ্যানিশ করে যাবে; আর চার, নরকঙ্কাল—যদিও সে কঙ্কাল চলে ফিরে বেড়ায় এবং কথা বলে। আমার চাররকম ভূতেরই অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

'আজ কোন প্রকার ভূতের গল্প বলছেন আপনি?' ন্যাপলা প্রশ্ন করল।

সে কথায় কান না দিয়ে, দুধ-চিনি ছাড়া গরম চায়ে একটা চুমুক দিয়ে খুড়ো তাঁর গল্প শুরু করলেন।

তোরা তো পত্রিকা-টত্রিকা পড়িস, নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিস যে আজকাল এই সময় ডেকান হেরাল্ডের ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে বছর সাতেকের পুরনো একটা লেখা চোখে পড়ল। লেখক এক সাহেব— নাম রবার্ট ম্যাকার্ডি। লেখার বিষয় হল ধুমলগড়ের হান্টিং লজ। ধুমলগড় মধ্যপ্রদেশের একটা ছোট্ট শহর, চাঁদা থেকে সত্তর কিলোমিটার পশ্চিমে। চারিদিকে জঙ্গল, আর সেই জঙ্গলেরই একটা অংশে একটা টিলার উপর রাজার হান্টিং লজ বা শিকারাবাস—দিব্যি আরামে রাত্রিবাস করা যায় এমন একটা বাড়ি, আবার তার খোলা ছাতে বসে জন্তুজানোয়ারও মারা যায়। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে বহু মৃগয়াপ্রিয় রাজাদের এইরকম হান্টিং লজ আছে; ম্যাকার্ডি সাহেব এইগুলো স্টাডি করতেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

ধুমলগড়ের হান্টিং লজে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন যে লজটি 'হন্টেড'। অর্থাৎ সেখানে একটি প্রেতাত্মা বাস করে। ম্যাকার্ডি খবর নিয়ে জানেন যে ওই হান্টিং লজেই ধুমলগড়ের বড়কুমার আদিত্যনারায়ণের মৃত্যু হয়। ছোটকুমার প্রতাপনারায়ণ সেটা ভেরিফাই করে।

লেখাটা পড়ার পর থেকেই আমার মাথায় একটা অদ্ভুত ফন্দি ঘুরতে লাগল। এটা আমার বিশ্বাস— এবং অনেকেরই বিশ্বাস যে মানুষ মরে গেলে ভূত হয় তখনই যখন মৃত্যুটা স্বাভাবিক না হয়ে হয় অপঘাত জাতীয় কিছু। খুন, আত্মহত্যা, বাজ পড়ে মরা, মোটর ক্র্যাশে মরা, জলে ডুবে মরা, হিংস্র জানোয়ারের হাতে মরা— এ সব ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তির আত্মার টেনডেন্সি হয় যে তল্লাটে মৃত্যু হয়েছে তারই আশেপাশে ঘোরাফেরা করা— যেন সে অকালে প্রাণ হারিয়ে পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারছে না।

ডেকান হেরাল্ডের পুরনো ফাইলেই জানতে পারলাম যে দশ বছর আগে ধুমলগড়ের বড় কুমার আদিত্যনারায়ণ হান্টিং লজে বন্দুক সাফ করার সময়ে অকস্মাৎ গুলি ছুটে গিয়ে মারা যান। অবিশ্যি মৃত্যুটা আত্মহত্যাও হতে পারে, কিন্তু সঠিক জানার কোনও উপায় ছিল না, অপঘাত ঠিকই, আর তাই প্রেতাত্মার উপস্থিতিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমার মনে হল, এই প্রেতাত্মার দেখা পেলে তার একটি সাক্ষাৎকার নিলে কেমন হয়? কী কারণে সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে উঠতে পারছে না সেটা জানা যাবে কি? কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল তার সঠিক বর্ণনা পাওয়া যাবে কি? তার অতৃপ্ত বাসনা কিছু আছে কি এবং সে বাসনা পূর্ণ হলেই কি সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরলোকে প্রস্থান করতে পারবে?

আমার কাগজের সম্পাদক জগন্নাথ কৃষ্ণানকে বলে সাতদিনের ছুটি নিয়ে ধুমলগড় পাড়ি দিলাম। যারা অন্ধকার ঘরে টেবিলের চারপাশে ঘিরে বসে প্ল্যানচেট করে, তারাও প্রেতাত্মার সঙ্গে কথোপকথন চালায়, কিন্তু সেটা হয় একটি তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে, যাকে বলে মিডিয়াম। এখানে ভূতকে দেখা যায় না, ফলে মিডিয়াম যদি খাঁটি না হয় তা হলে বুজরুকির অনেক সুযোগ থাকে। প্ল্যানচেটে তাই আমার বিশ্বাস নেই। তবে ভূতে বিশ্বাস আছে কারণ তোরা তো জানিস, ভূতের অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই অনেকবার হয়েছে।

ধুমলগড়ের ছোটকুমার প্রতাপনারায়ণ এখন গদিতে বসেছে, কারণ বাপ শঙ্করনারায়ণ মারা গেছেন বছর পাঁচেক হল। বড় ছেলে আদিত্য হান্টিং লজে মারা যাওয়ায় বাপের সম্পত্তি ও সিংহাসন ছোটকুমারই পেয়েছে।

এস্টেটের ম্যানেজারকে আগেই চিঠি লিখে আমার আসার কথা জানিয়ে দিয়েছিলাম। ধুমলগড় পৌঁছে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আমার অভিপ্রায় জানালাম। ম্যানেজার ঈশ্বরীপ্রসাদ বললেন যে একবার রাজার সঙ্গে কথা বলে নেওয়া দরকার। সকলকে হান্টিং লজে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

ঈশ্বরীপ্রসাদই রাজার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিল। রাজার সুসজ্জিত আপিসঘরে সকালে প্রতাপনারায়ণের সঙ্গে দেখা করলাম। বয়স চল্লিশের বেশি না, চাড়া দেওয়া গোঁফ, শরীরে চর্বি যেন একটু বেশি। পোশাক একেবারে সাহেবি ধরনের, তার সঙ্গে দুহাতের আঙুলের আংটির বহর কেমন যেন বেমানান।

রাজাসাহেব আমাকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করাতে অকপটে তাকে সব বলে দিলুম। রাজা শুনে বললেন, এ তোমার খুবই উদ্ভট শখ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমায় জিজ্ঞেস করলে আমি বলব যে আমার দাদা লজে ভূত হয়ে অবস্থান করছেন এটা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। ভূত জিনিসটাতেই আমি বিশ্বাস করি না। আর সে ভূত থাকলেও সে তোমার সঙ্গে কথা বলবে, তোমার প্রশ্নের জবাব দেবে, এমন আশা করাটাই বোধ হয় ঠিক না।'

আমি তখন ম্যাকার্ডি সাহেবের কথা বললাম। প্রতাপনারায়ণ বলল, 'ম্যাকার্ডির ধারণা ভারতবর্ষ হচ্ছে ভূত-প্রেতের ডিপো। তাকে বলে বোঝাতে পারিনি যে এ ধারণা ভুল। পোড়োবাড়ি দেখলেই সাহেব সেটাকে ভূতের বাড়ি বলে ধরে নিত। সাহেবের পুরো ব্যাপারটাই কল্পনাভিত্তিক।'

আমি বললাম, 'তাও একবার যাচাই করতে ক্ষতি কী? এতদূর যখন এসেছি, তখন, কোনওরকম অনুসন্ধান না করেই ফিরে যাব?'

আমার গোঁ দেখে প্রতাপনারায়ণ শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। রাজবাড়ি থেকে হান্টিংলজের দূরত্ব দেড় মাইল। পাতলা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সাপের মতো অ্যাঁকাব্যাঁকা রাস্তা দিয়ে নাকি সেখানে পৌঁছাতে হয়। ঈশ্বরীপ্রসাদকে বলে রাজা আমার জন্য একটা জিপের বন্দোবস্ত করে দিলেন। সেটা আমাকে রাত দশটা নাগাত পৌঁছে দিয়ে আবার ভোরবেলা গিয়ে নিয়ে আসবে।

বিকেলে ঈশ্বরীপ্রসাদের সঙ্গে বসে একটু আলাপ আলোচনা করলাম। লোকটা অনেকদিন ম্যানেজারি করেছে, বয়স সত্তরের কাছাকাছি। দুই কুমারকেই সে ছেলেবেলা থেকে বড় হতে দেখেছে। বলল দুই ভাইয়ের স্বভাবচরিত্রে অনেক বেমিল থাকলেও দুজনের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা ছিল। দাদার মৃত্যুতে প্রতাপনারায়ণ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। আত্মহত্যার কোনও কারণ ছিল না। ঈশ্বরীপ্রসাদ নিজেও খুবই আঘাত পেয়েছিল। বড়কুমার এভাবে অকস্মাৎ মরবে সেটা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। শিকারি হিসাবে সে ছিল খুব পাকা। হাত ফসকে গুলি ছুটে গিয়ে নিজের গায় লাগবে সেটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বড়কুমারের মৃত্যুর ব্যাপারে কোনও তদন্ত হয়েছিল কি ?'

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললেন, 'পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মহাদেব দেওয়ান তদন্ত করেছিলেন। তাঁর ধারণা—এটা অপঘাত মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই না। কারণ আদিত্যনারায়ণের হাতে বন্দুক ছিল, এবং তার ডান হাতের তর্জনী বন্দুকের ট্রিগারের সঙ্গে লাগানো ছিল। কাজেই আত্মহত্যা বা অ্যাক্সিডেন্ট্ দুটোই সম্ভব। আসলে কী হয়েছিল তা বলা মুশকিল।'

'বর্তমান রাজা প্রতাপনারায়ণ কি শিকার করেন ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না', বললেন ঈশ্বরীপ্রসাদ। 'ছোটকুমার চিরকালই একটু আয়েশী প্রকৃতির। খেলাধুলা বা শিকার-টিকারে তাঁর ঝোঁক নেই। সে গান-বাজনা নিয়ে থাকে। তাকে হান্টিং লজে যেতে হয় না কখনও।'

রাত্রে লক্ষ্মীবিলাস হোটেলে চাপাটি আর মুরগির মাংস খেয়ে, খাতা পেনসিল নিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ দ্রুত ভেসে যাবার পথে মাঝে মাঝে চাঁদটাকে আড়াল করছে। পৌনে দশটায় জিপ এসে গেল, আমি হান্টিং লজের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

মিনিট খানেকের মধ্যেই শহর পিছনে ফেলে জিপ জঙ্গলের পথ ধরল, আর তার দশমিনিট পরেই একটা দোতলা বাড়ির গাড়ি বারান্দার তলায় এসে জিপটা থামল। অর্থাৎ হান্টিং লজে এসে গেছি। বুঝতে পারলাম বাড়ির পিছন দিকের জমিটা ঢালু হয়ে জঙ্গলের দিকে নেমে গেছে।

জিপের ড্রাইভার গুরমীত সিং বলল যে দরকার হলে সে সারারাত থাকতে পারে। প্রস্তাবটা আমার ভাল লাগল না। পরিবেশ যত নিরিবিলি হয়, ভূতের আবির্ভাবের সম্ভাবনা তত বেড়ে যায়। বললুম, 'তুমি এখন যাও, কাল ভোরে ছটায় এসে আমাকে নিয়ে যেয়ো।' জিপ চলে গেল।

আমি চারপাশটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলুম। একটা টিলার মাথাটা চেঁছে সমতল করে তার উপর তৈরি হয়েছে হান্টিং লজটা। পাথরের তৈরি মোগলাই প্যাটার্নের বাড়ি, বয়স নাকি দেড়শো বছর।

পাঁচ ধাপ সিঁড়ি উঠে সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে জানালা দিয়ে আসা ফিকে চাঁদের আলোয় দেখলাম কার্পেট বিছানো এক সুদৃশ্য বৈঠকখানায় এসে পড়েছি। চারিদিকে আসবাবের ছড়াছড়ি, দেয়ালে টাঙানো স্টাফ্ করা বাইসন হরিণ বাঘ-ভাল্লুকের মাথা। বৈঠকখানার পরে একটা চওড়া বারান্দা, তার ডানদিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। আন্দাজ করলুম সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই খোলা ছাতে পৌঁছনো যাবে। সেখান থেকে বাড়ির পিছনের জঙ্গল দেখা যায়, আর সেখানেই বড় কুমারের মৃত্যু হয়েছিল।

মূর্খের মতো টর্চটা সঙ্গে আনিনি। চাঁদের আলো আছে ঠিকই, কিন্তু সে আর সব জায়গায় প্রবেশ করবে কী করে ? তখন আমার চুরুট খাওয়া অভ্যেস। দেশলাই-এর আলোতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় পৌঁছলুম।

যা ভেবেছিলুম তাই। একপাশে পশ্চিমদিকে খোলা ছাত, তার নিচু পাঁচিলের ধারে গিয়ে

দাঁড়ালেই সামনে ঢালু জমির ওপারে গভীর জঙ্গল শুরু হয়েছে। একবার মনে হল যেন বাঘের ডাকও শুনতে পেলুম জঙ্গলের দিক থেকে।

ছাত ছাড়াও একটা বড় ঘর রয়েছে নীচের বৈঠকখানার ঠিক ওপরে। এখানে একটা ফরাস পাতা দেখে বুঝলুম যে শিকারির যদি ঘুম পায় তাই এই ব্যবস্থা। ঘরের দেয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং, তার বেশির ভাগই মনে হল এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের ছবি। ফরাসের পাশে একটা আরাম কেদারা ছাড়া আরও কয়েকটা ছোট ছোট সোফা রয়েছে।

আমি আরাম কেদারায় বসে একটা চুরুট ধরালুম। পকেট থেকে নোট বই বার করে চেয়ারের হাতলে রাখলুম। শর্টহ্যান্ড লেখার অভ্যাস আছে, দরকার হলে অন্ধকারে লিখতেও কোনও অসুবিধে হবে না। আরেকটা জিনিস আমার কাছে ছিল সেটা হল এক ফ্লাস্ক ভর্তি গরম চা। নভেম্বর মাস, বেশ শীত, ফ্লাস্কের ঢাকনায় চা ঢেলে খেয়ে শরীরটাকে একটু গরম করে নিলুম।

চির-প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আমারও বিশ্বাস ছিল যে ভূতের আবির্ভাব যদি হয়ই, তবে সেটা মাঝরাতে, অর্থাৎ বারোটায়। বাইরে ক্রমে নিস্তব্ধ হয়ে আসছে, তার মধ্যে মাঝেমাঝে শেয়াল গোষ্ঠী কেয়া হুয়া হুয়া করে সরব হয়ে উঠছে। খবরের কাগজের আপিসে কাজ করে রাত জাগার অভ্যেস হয়ে গেছে, তবে এ পরিবেশ কেমন যেন ঝিম-ধরা। তার উপরে দরজা-জানলা দিয়ে আসা আবছা চাঁদের আলো ঘরটাকে কেমন যেন একটা স্বপ্নরাজ্যের চেহারা এনে দিয়েছে। তাই বোধহয় ঘাড়টা একবার একটু নুয়ে পড়েছিল, এমন সময় একটা ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠলুম।

আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে ঘরে একটি নতুন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে।

আমি ছাতের দরজার দিকে দৃষ্টি ঘোরালাম।

সমস্ত দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি ছায়ামূর্তি।

মূর্তি নিঃশব্দে প্রবেশ করে ধীরপদে এগিয়ে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। মুখ বোঝার উপায় নেই, আন্দাজে বোঝা যায় পরনে শিকারির পোশাক।

'তোমার কী প্রয়োজন ?' ইংরাজিতে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন এল।

'আমি কি ধুমলগড়ের বড়কুমারের সঙ্গে কথা বলছি ?'

'হ্যাঁ', আবার সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

বললাম, 'আমি আপনার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে এসেছি।'

'কী প্রয়োজনে ?'

'আমি একজন সাংবাদিক। আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'কী প্রশ্ন ?'

'প্রথম হল— আপনি কেমন আছেন ?'

উত্তর এল, 'মৃত ব্যক্তির আত্মা কেমন আছে সেটা কোনও প্রশ্ন নয়।'

'তা হলে দ্বিতীয় প্রশ্ন করছি।'

'করুন।'

'আপনার কি কোনও অতৃপ্ত বাসনা আছে, যে কারণে আপনি এই হান্টিং লজ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না ?'

'মোটেই না। আমার আয়ু আমার জন্মের মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। আমি জানতাম আমার মৃত্যু হবে সাতই অগ্রহায়ণ, আমার বত্রিশ বছর বয়সে। আমি এই মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম, এবং মৃত্যুর আগে আমার সব সাধ মিটিয়ে নিয়েছিলাম। অবিশ্যি কী ভাবে যে মরব সেটা আগে থেকে জানা ছিল না।'

বলা বাহুল্য, আমি সব কিছুই শর্টহ্যান্ডে লিখে নিচ্ছি।

এবার প্রশ্ন করলাম, 'আপনি তা হলে আত্মহত্যা করেননি ?'

উত্তর এল, 'না। আমার মৃত্যু হয় অকস্মাৎ আমার নিজের অসাবধানতা হেতু। আমি বন্দুক সাফ করছিলাম, কিন্তু সে বন্দুকে যে টোটা ছিল সেটা আমি—'

প্রেতাত্মার কথা হঠাৎ থেমে গেছে, কারণ তার কথা ছাপিয়ে আরেকটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা

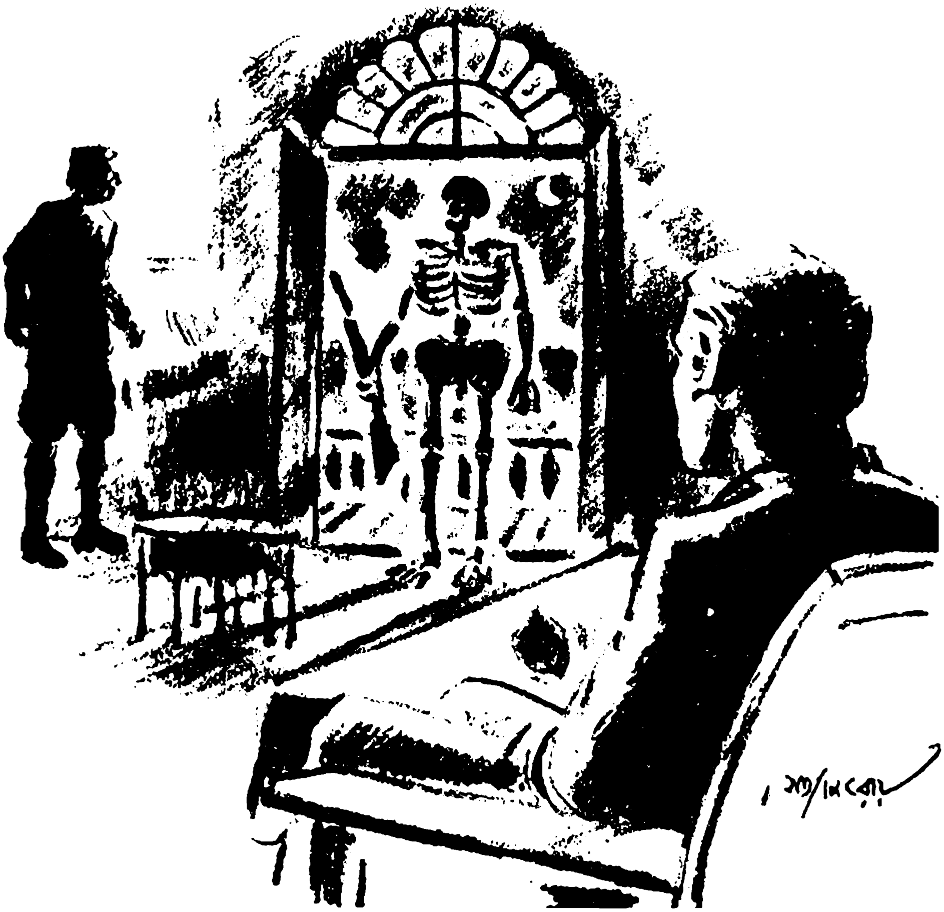

গেছে।

'মিথ্যা কথা!'

আমি তো থ! এ আবার কার কণ্ঠস্বর? কোন তৃতীয় ব্যক্তি এসে ঢুকল ঘরে?

আমার দৃষ্টি আবার দরজার দিকে ঘুরে গেছে। হ্যাঁ, দরজার মুখে দণ্ডায়মান আরেকটি মূর্তি। যদিও আমি নিজের সাহসের বড়াই করি, কিন্তু যখন দেখলাম এই দ্বিতীয় মূর্তিটি নিরেট নয়, এর পাঁজরের হাড়ের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে পিছনের আকাশ দেখা যাচ্ছে, তখন গলাটা যে একটু শুকিয়ে যায়নি, তা বলব না। আসলে আগন্তুক একটি নরকঙ্কাল এবং আরও আশ্চর্য এই যে এই কঙ্কালের হাতে একটি বন্দুক।

এবার কঙ্কাল ধীরে ধীরে এগিয়ে এল প্রথম মূর্তির দিকে। এদিকে প্রথম মূর্তি যেন সভয়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে দেয়ালের দিকে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছি এই ছায়াছবি। 'মিথ্যে কথা!' আবার সজোরে বলে উঠল কঙ্কাল। 'আমার মৃত্যু আকস্মিক নয়, আমার অন্যমনস্কতার জন্য নয়। বন্দুক চালাতাম আমি তেরো বছর বয়স থেকে; আমি অতটা অসাবধান হতে পারি না।'

আমার মন বলছে এই কঙ্কালই আসলে বড়কুমারের প্রেতাত্মা। আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'তা হলে আপনার মৃত্যু হয় কী ভাবে?'

'আমাকে খুন করা হয়েছিল!' গর্জিয়ে উঠল কঙ্কাল। 'সম্পত্তির লোভে, সিংহাসনের লোভে!

এই অন্যায়ের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি এই বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি পাচ্ছিলাম না। আজ সেই মুক্তির সুযোগ এসেছে। আজ আমার হত্যার প্রতিশোধ আমি নিজেই নিচ্ছি। পুলিশ সন্দেহ করেছিল আমাকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু টাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা হয়েছিল, এই সব পাপের শাস্তি দেবার সুযোগ আজ এসেছে। ইষ্টনাম জপ করো প্রতাপ, তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত !'

প্রথম ছায়া মূর্তির ঘর থেকে বাইরে পালাবার চেষ্টা বিফল করে দিল বন্দুকের গর্জন। ফরাসের উপর লুটিয়ে পড়ল প্রথম ছায়ামূর্তির নিস্পন্দ দেহ। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কাল আমাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'সত্য ঘটনা প্রকাশ হলে আমি শান্তি পাব। আমার এই উপকার করার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

এই কথাটা বলে বন্দুকধারী কঙ্কাল অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি একটা দেশলাই জ্বালিয়ে ফরাসের কাছে গিয়ে ধরতেই প্রথম ছায়ামূর্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। ইনি ছায়ামূর্তি নন ; ইনি রক্তমাংসের দেহসম্পন্ন সদ্যোমৃত ধুমলগড়ের রাজা প্রতাপনারায়ণ, যিনি আজ থেকে দশ বছর আগে সম্পত্তি আর গদির লোভে নিজের দাদা আদিত্যনারায়ণকে খুন করে সেটাকে অপঘাত মৃত্যু বলে চালিয়েছিলেন।

এই খুনের অবিশ্যি তদন্ত হয়েছিল, এবং স্বভাবতই তাতে আমাকেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। কারণ আমি ছাড়া আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না প্রতাপনারায়ণের সঙ্গে। অথচ যে অস্ত্র দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে তার কোনও চিহ্ন নেই ত্রিসীমানায়, তাই শেষ পর্যন্ত বেকসুর খালাস পেয়ে গেলাম।

সন্দেশ, শ্রাবণ ১৩৯১

লাখপতি

ত্রিদিব চৌধুরী আর থাকতে না পেরে বিরক্তভাবে বেয়ারাকে ডাকার বোতামটা টিপলেন। কিছুক্ষণ থেকেই তিনি অনুভব করছেন যে, কামরাটা যত ঠাণ্ডা থাকার কথা মোটেই তত ঠাণ্ডা নয়। অথচ তাঁর তিন সহযাত্রীই দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। এটা যে কী করে সম্ভব হয় তা ত্রিদিববাবু মোটেই বুঝতে পারেন না। আসলে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে-করেই হয়েছে এই হাল। সাত চড়ে রা নেই বলেই তো জাতটার কোনওদিন উন্নতি হল না।

দরজায় টোকা পড়ল।

'অন্দর আও।'

দরজাটা একপাশে সরে গিয়ে বাইরে বেয়ারাকে দেখা গেল।

'কামরার টেমপারেচার কত রাখা হয়েছে?' ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন ত্রিদিববাবু।

'উয়ো তো মালুম নহী হ্যায় বাবু।'

'কেন? মালুম নেই কেন? এসি-তে ট্র্যাভেল করে গরম ভোগ করতে হবে এ আবার কীরকম কথা? এ ব্যাপারে তোমাদের কোনও দায়িত্ব নেই?'

বেয়ারা আর কী বলবে?—সে বোকার মতো দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে আপার বার্থের মাদ্রাজি ভদ্রলোকটির ঘুম ভেঙে গেছে, তাই ত্রিদিব চৌধুরীকে বাধ্য হয়ে তাঁর রাগ হজম করে নিতে হল।

‘ঠিক হ্যায়। তুম যাও।—আর শোনো, কাল সকালে ঠিক সাড়ে ছ’টার সময় চা দেবে।’

‘বহুত আচ্ছা, হুজুর।’

বেয়ারা চলে গেল। ত্রিদিববাবু দরজা বন্ধ করে তাঁর জায়গায় শুয়ে পড়লেন। এসব ল্যাঠা ভোগ করতে হত না যদি তিনি প্লেনে আসতেন। তাঁর মতো অবস্থার লোকেরা কলকাতা থেকে রাঁচি সাধারণত প্লেনেই যায়। মুশকিল হচ্ছে কি, প্লেনে যাত্রা সম্পর্কে ত্রিদিববাবু একটা আতঙ্ক বোধ করেন সেটা কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বছর বারো আগে তিনি একবার প্লেনে করে বোম্বাই গিয়েছিলেন। সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। সেদিন আবহাওয়া ছিল প্রতিকূল, ফলে প্লেন আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে ঝাঁকুনি শুরু হয় সেটা চলে একেবারে শেষ পর্যন্ত। সেদিনই ত্রিদিববাবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি আর কখনও প্লেনে চড়বেন না। তাই এবার যখন রাঁচি যাওয়ার দরকার হল তখন তিনি সরাসরি রাঁচি এক্সপ্রেসে বুকিং করলেন। এসি-তে আরামের প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু এখন সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে অন্ধকার কামরায় শুয়ে নানান চিন্তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন।

বিশেষ করে মনে পড়ছে তাঁর ছেলেবেলার কথা। রাঁচিতেই তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা আদিনাথ চৌধুরী ছিলেন রাঁচির নামকরা ডাক্তার। ত্রিদিববাবু ইস্কুলের পড়াশুনা রাঁচিতে শেষ করে কলকাতায় চলে যান কলেজে পড়তে। মামাবাড়িতে থেকে বি.এ. পর্যন্ত পড়ে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর এক মাড়োয়ারি বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসার দিকে ঝোঁকেন। লোহালক্কড়ের ব্যবসা দিয়ে শুরু করে অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাঙ্কে তাঁর অনেকগুলো টাকা জমে যায়। তিনি বুঝতে পারেন যে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর প্রতি সবিশেষ প্রসন্ন। সেই থেকে তিনি কলকাতাতেই থেকে যান, যদিও বাপ-মা রাঁচি ছাড়েননি। প্রথমে সর্দার শঙ্কর রোডে একটা ফ্ল্যাটে। তারপর রোজগার বাড়লে পর হ্যারিংটন স্ট্রিটে একটা দোতলা বাড়ির একতলাটা ভাড়া নেন ত্রিদিববাবু। বাপ-মায়ের সঙ্গে যে একেবারে যোগাযোগ ছিল না তা নয়। প্রতি বছর অন্তত একবার সাতদিনের জন্য এসে পৈতৃক বাড়িতে কাটিয়ে যেতেন ত্রিদিববাবু। বাপ-মায়ের অনুরোধেই তিনি ছাব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে করেন। দু’বছর পরে তাঁর একটি ছেলে হয়। সেই ছেলে এখন আমেরিকায় পড়াশুনা করছে। আর কোনও সন্তান হয়নি ত্রিদিববাবুর। স্ত্রী মারা গেছেন তিন বছর হল। মা দেহ রেখেছেন সেভেন্টিটুতে, আর বাপ সেভেন্টিফোরে। রাঁচির সেই বাড়ি এখনও রয়েছে একটি চাকর ও একটি মালির জিম্মায়। ত্রিদিববাবু নিয়মিত তাদের মাইনে দিয়ে এসেছেন গত দশ বছর ধরে। বাড়িটা রাখার উদ্দেশ্য হল মাঝে মাঝে দু-চারদিন বিশ্রাম করে যাওয়া। কিন্তু রোজগারের ধান্দায় সেটা আর হয়ে ওঠেনি। তিনদিন বিশ্রাম মানেই তো হাজার পাঁচেক টাকা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। যে মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল অর্থোপার্জন, তার আর বিশ্রামের ফুরসত কোথায়? ত্রিদিববাবু আজ লাখপতি। বাঙালিরা ব্যবসায়ে রোজগার করতে পারে না—এই অপবাদের মুখে তিনি ঝাড়ু মেরেছেন।

এবার যে দশ বছর বাদে ত্রিদিববাবু রাঁচি যাচ্ছেন, এটা বিশ্রামের জন্য নয়। রাঁচিতে লাক্ষার ব্যবসা একটা বড় ব্যবসা। এই ব্যবসায়ে কোনও সুবিধা হতে পারে কিনা সেইটে যাচাই করে দেখার জন্যই রাঁচি যাওয়া। পৈতৃক বাড়িতেই থাকবেন ত্রিদিববাবু, এবং দু’দিনের মধ্যেই কাজ হয়ে যাবার কথা। প্রশান্ত সরকারকে তিনি চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন আসছেন বলে। সে-ই তাঁর বাড়িতে গিয়ে চাকরদের বলে সব ব্যবস্থা করে রাখবে। প্রশান্ত তাঁর বাল্যবন্ধু। রাঁচির এক মিশনারি স্কুলে মাস্টারি করে। ত্রিদিববাবুর সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই বললেই চলে, যদিও পুরনো বন্ধুর জন্য তিনি এতটুকু করতে রাজি হবেন এটা ত্রিদিববাবু বিশ্বাস করেন।

আশ্চর্য! এসব ভাবতে ভাবতেই কখন যে ত্রিদিববাবুর ঘুম এসে গেল এটা তিনি নিজেই জানেন না। তাঁরও যে অন্য তিনজন যাত্রীর মতো নাক ডাকে সেটাও কি তিনি জানেন?

রাঁচি এক্সপ্রেস আসার টাইম সকাল সোয়া সাতটা। প্রশান্ত সরকার তাঁর ছেলেবেলার বন্ধুকে স্বাগত জানাতে দশ মিনিট আগেই হাজির হয়েছেন স্টেশনে। ইস্কুলে থাকতে ত্রিদিব চৌধুরী ওরফে মণ্টির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল ঘনিষ্ঠ। ত্রিদিব যখন কলকাতায় কলেজে পড়ত তখনও দু’জনের মধ্যে নিয়মিত চিঠি লেখালেখি চলত। কলেজ ছাড়ার পরে এখন দু’জনের মধ্যে ব্যবধান এসে পড়ে। এর জন্য দায়ী অবশ্য ত্রিদিববাবুই। বাপ-মা বেঁচে থাকতে তিনি মাঝে মাঝে রাঁচিতে এসেছেন, কিন্তু প্রশান্তকে না জানিয়ে।

ফলে অনেকবার এমন হয়েছে দু'জনের মধ্যে দেখাই হয়নি। কেন যে এরকম হচ্ছে সেটা প্রশান্ত সরকার বুঝতেই পারেননি। তারপর খবরের কাগজ থেকে জেনেছেন যে, ত্রিদিব চৌধুরী এখন একজন ডাকসাইটে ব্যবসায়ী, অর্থাৎ তিনি এখন প্রশান্তর নাগালের বাইরে। সেটা আরও স্পষ্ট হয় এই সেদিনের পাওয়া চিঠিটা থেকে। চার লাইনের সংক্ষিপ্ত শুকনো চিঠিতে দু'জনের মধ্যে দূরত্বটাই ফুটে ওঠে।

বন্ধুর এই পরিবর্তনে প্রশান্তবাবু খুশি হতে পারেননি। ইস্কুলের সেই সরল হাসিখুশি মণ্টুর সঙ্গে এই লাখপতি ত্রিদিব চৌধুরীর যেন কোনও মিল নেই। মানুষ কি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এতই বদলে যায়? ত্রিদিব চৌধুরীর যে অভাবনীয় আর্থিক উন্নতি হয়েছে সেটা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু টাকার গরমটাকে কোনওদিনই বিশেষ আমল দেন না প্রশান্ত সরকার। তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটা তাঁর বাবার কাছ থেকে পাওয়া। প্রমথ সরকার ছিলেন গান্ধীভক্ত আদর্শবাদী পুরুষ। প্রশান্তর নিজের জীবনে তেমন কোনও উত্থান পতন ঘটেনি। একজন ইস্কুল মাস্টারের জীবনে কতই বা রকমফের হবে? তাই আজ তাঁকে দেখলে ছেলেবেলার প্রশান্ত ওরফে পানুকে চিনতে কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু ত্রিদিব চৌধুরী সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে কি? সেটা জানার জন্যই প্রশান্ত সরকার উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। ছেলেবেলার বন্ধু আজ লক্ষপতি হয়ে যদি দেমাক দেখাতে আসে তা হলে সেটা বরদাস্ত করা মুশকিল হবে।

ট্রেন এল দশ মিনিট লেটে। মাত্র তিনদিনের জন্য আসা, তাই ত্রিদিববাবু সঙ্গে একটা ছোট সুটকেস আর একটা ফ্লাস্ক ছাড়া আর কিছুই আনেননি। সুটকেসটা প্রশান্তবাবু একরকম জোর করেই নিজের হাতে তুলে নিলেন। তারপর দু'জনে রওনা দিলেন স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সির উদ্দেশে।

'অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হল নাকি?' ত্রিদিব চৌধুরী প্রশ্ন করলেন হাঁটতে হাঁটতে।

'এই মিনিট কুড়ি।'

'তুমি যে আবার স্টেশনে আসবে সেটা ভাবতেই পারিনি। কোনও দরকার ছিল না। আমি তো আর এই প্রথম আসছি না রাঁচিতে।'

প্রশান্তবাবু মৃদু হাসলেন, কোনও মন্তব্য করলেন না। চিরকালের অভ্যাস মতো তিনি বন্ধুকে 'তুই' বলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বন্ধু 'তুমি' বলাতে সেটা আর হল না।

'এখানে সব খবর ভাল তো?' জিজ্ঞেস করলেন ত্রিদিববাবু।

'হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অ্যাদ্দিন বাদে বাবু আসছেন জেনে তোমার মালি আর চিন্তামণি খুব একসাইটেড।'

চিন্তামণি হল একাধারে রসুয়ে আর চৌকিদার। 'বাড়িটা বাসযোগ্য আছে তো এখনও? না কি ভূতের বাসায় পরিণত হয়েছে?'

প্রশান্তবাবু আবার মৃদু হেসে একটু চুপ থেকে বললেন, 'ভূতের বাসার কথা জানি না, কিন্তু একটা কথা তোমাকে জানানো দরকার। আমি সেদিন রাত্রে তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় বাগানে একটি বছর দশেকের ছেলেকে খেলতে দেখেছি।'

'রাত্রে মানে?'

'বেশ বেশি রাত। সাড়ে এগারোটা। দেখে চমকে গিয়েছিলাম। মনে হল যেন দশ বছরের মণ্টু আবার ফিরে এসেছে।'

'এনিওয়ে—ভূত যে নয় সে তো বোঝাই যাচ্ছে। বাড়ি তো আমার বাবার তৈরি—ওতে কে মরেছে না মরেছে সে তো আমার জানা আছে। কথা হল—বাড়িটাকে ঝেড়ে পুঁছে রেখেছে তো?'

'একেবারে তকতকে। আমি কাল গিয়ে দেখে এসেছি। ভাল কথা—তোমার কাজটা কখন, কোথায়?'

'আমার নামকাম যেতে হবে আজই দুপুরে, আফটার লাঞ্চ। মহেশ্বর জৈন বলে এক লাক্ষা ব্যবসায়ী থাকেন ওখানে। আড়াইটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'বেশ তো, আমরা যে ট্যাক্সিটা এখন নিচ্ছি সেটাই তোমার জন্য ঠিক করা আছে। এখন তোমাকে পৌঁছিয়ে দুপুরে খেয়ে আবার দুটোর মধ্যে তোমার কাছে চলে আসবে। নামকাম যেতে মিনিট দশেকের বেশি লাগবে না।'

ট্যাক্সিতে উঠে রওনা হবার পরে প্রশান্ত সরকার জরুরি কথাটা পাড়লেন—তাও সরাসরি নয়, একটু ভণিতা করে।

'ইয়ে-- তুমি আছ কদ্দিন?'

'আজ কথা শেষ না হলে কাল আরেকবার যেতে হবে। আমি ফিরছি পরশু।'

'যা ভারভার্তিক চেহারা হয়েছে তোমার, খোলাখুলি কথা বলতেও সঙ্কোচ হয়।'

'কী বলতে চাও বলে ফেলো না। ওরকম ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বললেই সন্দেহ হয়।'

'কিছুই না, সামান্য একটা অনুরোধ। তুমি রাজি হলে তোমার এই বাল্যবন্ধু খুব গ্রেটফুল বোধ করবে।'

'কী অনুরোধ?'

'ফাদার উইলিয়ামসকে মনে আছে?'

'উইলিয়ামস—উইলি, ও সেই লাল দাড়ি?'

'লাল দাড়ি। সেই উইলিয়ামস বছর পাঁচেক হল একটা ইস্কুল করেছেন গরিব ছেলেদের জন্য। তাতে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, কোল সবরকম ছেলেই পড়ে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ব্যাপারটাকে দাঁড় করিয়েছেন ভদ্রলোক। তাঁর খুব ইচ্ছে যে তুমি একবার ইস্কুলটাকে দেখে যাও। কিছুই না, আধঘণ্টার ব্যাপার। ভদ্রলোক খুব উৎসাহিত বোধ করবেন।'

'গেলেই তো হাত পাতবে।'

'মানে?'

'এইসব আমন্ত্রণের পিছনে আসল কথাটা কী সেটা তুমি জানো না? নতুন ইনস্টিটিউশন, টানাটানির ব্যাপার, একজন পয়সাওয়ালা মক্কেলকে ডেকে খানিকটা আপ্যায়ন করে মাথায় হাত বুলিয়ে শেষে ভিক্ষের ঝুলিটা তার সামনে খুলে ধরো। দ্যাখো হে, এ জিনিস আমার কাছে নতুন নয়। এককালে বহুবার এই প্যাঁচে পড়তে হয়েছে। আমি ভুক্তভোগী। চ্যারিটি যদি করতেই হয় তো সে যখন পরকালের চিন্তা করব, তখন। এখন নয়। এখন সঞ্চয়ের সময়। পরোপকারী হিসেবে একবারটি নাম হয়ে গেলে আর নিস্তার নেই। কাজেই আমাকে এ ধরনের রিকোয়েস্ট করতে এসো না, আমি শুনব না। বুঝিয়ে বললে ফাদার নিশ্চয়ই বুঝবেন; আর সে ভার তোমার উপর। এখানে এসে কাজের বাইরে আমি যেটা চাই সেটা হল রেস্ট। কলকাতায় একটা মিনিট ফাঁক নেই।'

'ঠিক আছে।'

এমন একটা প্রস্তাবের যে এই প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেটা প্রশান্তবাবু ভাবতে পারেননি। এখন মনে হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক। এ মণ্টু সেকালের সে মণ্টু নয়। এই মানুষটাকে প্রশান্তবাবু চেনেন না।

জন্মস্থানে এসে ত্রিদিববাবুর ভারিক্কি ভাবটা খানিকটা দূর হয়ে তার জায়গায় একটা প্রসন্নতার আমেজ দেখা দিল। এই সুযোগে প্রশান্তবাবু তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবটা করলেন।

'আমার একটা অনুরোধ তো নাকচ হয়ে গেল, কিন্তু দ্বিতীয়টি ভাই রাখতে হবে। আমার গিন্নি বারবার করে বলে দিয়েছেন তোমায় বলতে যে, আজ রাত্তিরে যেন এই গরিবের বাড়িতে তোমার পায়ের ধুলো পড়ে। খাওয়াটাও ওখানেই সারতে হবে, বলা বাহুল্য। অভাবের সংসার হলেও এটা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, সেখানে ত্রিদিব চৌধুরীর সামনে কেউ ভিক্ষের ঝুলি খুলে ধরবে না।'

ত্রিদিববাবু এ ব্যাপারে আপত্তি করলেন না। করুণাবশত কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামালেন না প্রশান্ত সরকার। তাঁর তাড়া আছে, বাজার সেরে, নাওয়া-খাওয়া সেরে, তারপর ইস্কুল যেতে হবে। বিদায় নেবার সময় তিনি বলে গেলেন যে, আটটা নাগাদ নিজে এসে তিনি ত্রিদিববাবুকে নিয়ে যাবেন।—'আর দশটার মধ্যে খাইয়ে-দাইয়ে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব, এ গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

ত্রিদিব চৌধুরীর ব্যক্তিত্ব আর তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা—এই দুটোই যে তাঁর সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ সেটা আজ আরেকবার প্রমাণ হয়ে গেল। রাঁচিতে আসা বৃথা হয়নি। তাঁর নানান ব্যবসার সঙ্গে লাক্ষা যুক্ত হয়ে তাঁর জীবনটাকে আরেকটু জটিল করে তুলল সেটা ঠিক, কিন্তু সেইসঙ্গে অতিরিক্ত আয়ের কথাটা ভাবলে আর আক্ষেপ করার কোনও কারণ থাকে না।

পাঁচটা নাগাত বাড়ি ফিরে চা খেয়ে ত্রিদিববাবু একবার তাঁর জন্মস্থানটা ঘুরে দেখলেন। দোতলা বাড়ি; একতলায় বৈঠকখানা, খাবার ঘর, গেস্টরুম আর রান্নাঘর, দোতলায় দুটো বেডরুম, বাথরুম, আর একটা বেশ বড় পশ্চিমমুখী ঢাকা বারান্দা। দুটোর মধ্যে ছোট বেডরুমটা ছিল ত্রিদিববাবুর ঘর।

ছেলেবেলার তুলনায় এখন সেটাকে অনেক ছোট বলে মনে হয়, কারণ তিনি নিজেই শুধু বড় হয়েছেন, ঘর যেমন ছিল তেমনই আছে। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে খাটটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ত্রিদিববাবু স্থির করলেন আজ রাত্রে সেখানেই শোবেন। চিন্তামণি সকালেই জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু তিনি তখনও মনস্থির করে উঠতে পারেননি। রাত্রে বেরোবার মুখে চাকরকে ডেকে ছোট ঘরে বিছানা করার কথা বলে দিলেন।

প্রশান্ত সরকারের স্ত্রী বেলা সুগৃহিণী এবং রন্ধনে সুনিপুণা, তাই খাওয়াটা হল পরিপাটি। ভোজের ব্যাপারে প্রশান্তবাবু কোনও কার্পণ্য করেননি। বন্ধুকে মাংস, দু'রকম মাছ, পোলাও, লিচু, তিনরকম মিষ্টি ও মালাই খাইয়েছেন। ত্রিদিববাবু তৃপ্তির সঙ্গেই খেয়েছেন। কিন্তু খাবার পরে দশ মিনিটের বেশি বসেননি। তাঁর বর্তমান অবস্থা, এবং তিনি কীভাবে সেই অবস্থায় পৌঁছলেন, সে সম্পর্কে প্রশান্তবাবুর কৌতূহল আর মিটল না। পৌনে দশটার মধ্যে ত্রিদিবাবু নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

বাড়িটা শহরের একটা অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি অংশে। পাড়া এর মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ত্রিদিববাবু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময় তাঁর নিজের পায়ের আওয়াজ নিজের কাছেই দুরমুশের মতো মনে হল।

দোতলায় এসে ত্রিদিববাবু দেখলেন যে, তাঁর ছেলেবেলার খাটে তাঁর জন্য বিছানা পাতা হয়ে গেছে। সবেমাত্র খাওয়া হয়েছে, তাই তিনি স্থির করলেন যে কিছুক্ষণ বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে বিশ্রাম করে তারপর শুতে যাবেন।

হেলানো চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি অনুভব করলেন যে, সারাদিনের সমস্ত অবসাদ চলে গিয়ে তিনি আশ্চর্য হালকা ও শান্ত বোধ করছেন। বাইরে ফিরে চাঁদের আলো, বাগানের একটা নেড়া শিরীষ গাছের ছড়ানো কালো ডালগুলোর দিকে তাঁর দৃষ্টি। ত্রিদিববাবু বুঝতে পারলেন যে তিনি নিজের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। সমস্ত বিশ্বচরাচরে যেন সেটাই একমাত্র শব্দ।

তাই কি?

না, তার সঙ্গে আরেকটা শব্দ যোগ হল। একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। সেটা কোত্থেকে আসছে বলা কঠিন।

মনোযোগ দিয়ে শুনে ত্রিদিববাবু বুঝলেন যে, সেটা কোনও অল্পবয়স্ক ছেলের গলায় আবৃত্তির শব্দ। কবিতাটা তাঁর ভীষণ চেনা।

ক্ষীণ হলেও কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার।

—'রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়
একলা যাব, করব না ত ভয়—
মামা যদি বলেন ছুটে এসে
'হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়ো'
বলব আমি, দেখছ না কি মামা
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো—
আমায় দেখে মামা বলবে, 'তাই-তো,
খোকা আমার সে খোকা আর নাই তো।'—

এতদিন যেন ত্রিদিব চৌধুরীর স্মৃতির কোণে লুকিয়ে ছিল কবিতাটা; আজ শুনে আবার নতুন করে মনে পড়ছে।

আবৃত্তি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। ত্রিদিববাবু উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। মনটাকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া কোনও কাজের কথা নয়। আসল হল ভবিষ্যৎ; অতীত নয়। তিনি জানেন ভবিষ্যতে তাঁকে আরও অনেক উপরে উঠতে হবে, লাখপতি থেকে কোটিপতি হতে হবে। অতীত মানে তো যা

ফুরিয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। অতীতের চিন্তা মানুষকে দুর্বল করে, আর ভবিষ্যতের আশা তাকে সবল করে, সক্রিয় করে।

নিজের শোয়ার ঘরে গিয়ে ত্রিদিববাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। শহরে এখন লোডশেডিং, খাটের পাশে টেবিলের উপর একটা মোমবাতি টিমটিম করে জ্বলছে, তার মৃদু আলোতেই তিনি স্পষ্ট দেখলেন যে, বিছানাটা ভাল করে পাতা হয়নি, চাদর বালিশ দুটোই কুঁচকে আছে। হাত দিয়ে চাপড় মেরে সেগুলোকে টান করে দিয়ে, পাঞ্জাবি খুলে আলনায় রেখে ত্রিদিববাবু খাটে শুয়ে পড়লেন। মোমবাতিটা জ্বলবে কি? কোনও দরকার নেই। এক ফুঁয়ে সেটাকে নিভিয়ে দিলেন ত্রিদিববাবু। পোড়া মোমের উগ্র

গন্ধ কিছুক্ষণ বাতাসে ঘোরাফেরা করে মিলিয়ে গেল। পশ্চিমের জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। রাতের আকাশ চাঁদের আলোয় ফিকে। পায়ের দিকে ঘরের দরজা। দরজা দিয়ে বাইরে বারান্দা ও বাঁয়ে সিঁড়ির মুখটা দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির দিকে দৃষ্টি যাবার কথা নয়, কিন্তু ত্রিদিববাবুর মনে হল তিনি যেন একটা পায়ের আওয়াজ পাচ্ছেন। খালি পায়ে থপথপ করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার শব্দ।

কিন্তু কেউ এল না। শব্দটা যেন মাঝসিঁড়িতে থেমে গেল।

হঠাৎ ত্রিদিববাবুর মনে হল তিনি অনর্থক ছেলেমানুষি কল্পনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। সব ভৌতিক চিন্তা এক ঝটকায় মন থেকে দূর করে দিয়ে তিনি শক্ত করে চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন। একতলায় খাবার ঘরের জাপানি ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল। ঘড়িটা এতদিন বন্ধ ছিল। আজই সকালে ত্রিদিববাবু আবার সেটাকে চালু করে দিয়েছেন।

ঘড়ির শেষ ঢং মিলিয়ে যাওয়ায় নৈঃশব্দ্য যেন আরও বেড়ে গেল।

ত্রিদিববাবুর চোখ বন্ধ, এবং সেই বন্ধ চোখেই যেন তিনি টুকরো টুকরো ঝাপসা ছবি দেখতে শুরু করেছেন। তিনি জানেন যে এটা ঘুমের পূর্বাভাস। ওই টুকরো ছবিগুলো আসলে স্বপ্নের টুকরো। মানুষ গান করার আগে যেমন গুনগুন করে সুর ঠিক করে নেয়, এই টুকরো ছবিগুলো হল আসলে স্বপ্ন শুরু হবার আগে স্বপ্নের গুনগুনানি।

কিন্তু স্বপ্নের সময় এখনও আসেনি। চোখ বন্ধ অথচ সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থাতেই ত্রিদিববাবু তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করলেন যে ঘরে যেন কে ঢুকেছে। না, শুধু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ও বটে। ত্রিদিববাবু নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছেন। কেউ যেন দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ে দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে।

লোক দেখতে পাবেন এই দৃঢ় বিশ্বাসে চোখ খুলে ত্রিদিববাবু বুঝলেন যে, তিনি ভুল করেননি।

দরজার মুখে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, বছর দশেক বয়স, আর ডান হাতটা আলতো করে দরজার উপর রাখা, বাঁ পা-টা একটু সামনের দিকে এগোনো। ছেলেটি যেন ঘরে ঢুকতে গিয়ে লোক দেখে থেমে গেছে।

ত্রিদিববাবু অনুভব করলেন একটা ঠাণ্ডা ভাব তাঁর পা থেকে শুরু করে মাথার দিকে উঠে আসছে শিরদাঁড়া বেয়ে। প্রশান্ত বলেছিল একটি ছেলেকে দেখেছে, বাগানে...খেলছিল...ছেলেবেলার মণ্টু...

ছেলেটি নিঃশব্দে আরও তিন পা এগিয়ে এল। এখন সে খাট থেকে চার হাত দূরে। ছেলেবেলার মণ্টু...

ত্রিদিববাবুর হাত পা বরফ, মাথা ঝিমঝিম করছে। তিনি বুঝতে পারছেন এবার তিনি চোখে অন্ধকার দেখবেন, তাঁর আতঙ্ক চরমে পৌঁছেছে।

ছেলেটি আরেক পা এগোল। বেগুনি শার্ট...এই শার্ট তো...

সংজ্ঞা হারাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ত্রিদিববাবু রিনরিনে গলায় প্রশ্ন শুনলেন।

'আমার বিছানায় কে শুয়ে?'

তাঁর কখন জ্ঞান হয়েছিল, বা আদৌ হয়েছিল কিনা, আর তারপর কখন তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন, এসব কিছুই জানেন না ত্রিদিববাবু। সকালে যথারীতি সাড়ে ছ'টায় ঘুম ভেঙে গেল। প্রশান্ত বলেছে সাড়ে সাতটায় এসে তাঁর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করবে। রাত্রে যা ঘটল, তারপর তিনি মামুলি দৈনন্দিন কাজের কথা ভাবতেই পারছেন না। জীবনে তিনি প্রথম এমন ধাক্কা খেলেন। কাল চাঁদনি রাতে যে আবৃত্তি শুনেছিলেন সেই আবৃত্তি করে তিনি ইস্কুলে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। আর দ্বিতীয়? দ্বিতীয় হয়েছিল প্রশান্ত সরকার। তাতে মণ্টু খুশি হয়নি। 'দু'জনেই ফার্স্ট প্রাইজ পেলে দারুণ হত, না রে?' মণ্টু বলেছিল তার প্রাণের বন্ধু পানুকে।

আর ঘরে যে ছেলেটি এল তার মুখ বোঝা যায়নি, কিন্তু শার্টের রঙ যে বেগুনি সেটা দেখেছিলেন ত্রিদিববাবু। এই বেগুনি শার্ট—তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শার্ট—যেটা তাঁকেই জন্মদিনে দিয়েছিলেন তাঁর ছোটমাসি, সেটা কি তিনি ভুলতে পারেন? ওই শার্ট পরে যেদিন প্রথম স্কুলে গেলেন সেদিন পানু বলেছিল, 'তোকে ঠিক সাহেবের মতো দেখাচ্ছে রে মণ্টু!'

এই অদ্ভুত ভৌতিক অভিজ্ঞতার মানেও তাঁর কাছে স্পষ্ট। আজকের ত্রিদিবের সঙ্গে ছেলেবেলার ত্রিদিবের কোনও মিল নেই। ছেলেবেলার সেই মণ্টু ছেলেবেলাতেই মরে গেছে। আর তার ভূত এসে কাল জানিয়ে গেছে যে, লাখপতি ত্রিদিব চৌধুরীকে সে মোটেই বরদাস্ত করতে পারছে না।

প্রশান্তবাবুকে রাত্রের ঘটনা কিছুই বললেন না ত্রিদিববাবু। তবে এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, শত চেষ্টা করেও তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে পারছেন না। তাই বোধহয় প্রশান্তবাবু এক সময় প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো? রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি নাকি?'

ত্রিদিববাবু গলা খাকরিয়ে বললেন, 'না,—ইয়ে, আমি ভাবছিলাম, মানে, দু'দিনের কাজ যখন একদিনেই হয়ে গেল, তখন আজ একবার ফাদার উইলিয়ামসের স্কুলটা দেখে এলে হত না?'

'উত্তম প্রস্তাব।' উৎফুল্ল হয়ে বললেন প্রশান্ত সরকার।

মুখের হাসি ছাড়া অন্তরের একটা গোপন হাসিও হাসলেন তিনি, কারণ তাঁর ফন্দি আশ্চর্য ভাবে কাজ দিয়েছে। ফেরার পথে তাঁর প্রতিবেশী নন্দ চক্রবর্তীর ছেলে বাবলুকে বলে যেতে হবে যে, তার কাল রাত্তিরের আবৃত্তি আর অভিনয় চমৎকার হয়েছে। আর সেইসঙ্গে অবিশ্যি চিন্তামণিকে একটা ভালরকম বকশিশ দিতে হবে।

সন্দেশ, মাঘ ১৩৯১

খেলোয়াড় তারিণীখুড়ো

ডিসেম্বরের উনত্রিশে, শীতটা পড়েছে বেশ জাঁকিয়ে। সন্ধেবেলা তারিণীখুড়ো এলেন গলায় আর মাথায় মাফলার জড়িয়ে। 'তোরা মাঠে যাচ্ছিস না খেলা দেখতে?' তক্তপোষে বসেই প্রশ্ন করলেন খুড়ো, 'নাকি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার তাল করছিস?'

'তার মানে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওই টেলিভিশন আর কী,' বললেন খুড়ো। 'লোককে ঘরকুনো করার জন্যে অমন জিনিস আর দ্বিতীয় নেই। আমাদের সময়ে খেলা দেখতে হলে টিকিট কেটে মাঠে যেতে হত, আর তার মজাটাই ছিল আলাদা। শীতকালের মিঠে রোদে সবুজ রঙের খোলা বেঞ্চেতে বসে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে সাদা পোশাক পরা লোকগুলোর কাণ্ড দেখে দিব্যি সময় কেটে যেত। তার মধ্যে দুটো একটা বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি হলে তো কথাই নেই। মনে আছে দিলওয়ার হোসেনের খেলা জার্ডিনের এম সি সি টিমের এগেনস্টে। মাথায় পট্টি— বল লেগে মাথা ফেটে গেছে— তাই নিয়ে খেলছে দিলাওয়ার। স্টাইল-ফাইলের বালাই নেই, ব্যাট ধরেছে যেন কোলা ব্যাঙ ওত পেতেছে, কিন্তু কী খেলা খেললে লোকটা! চৌষট্টি না পঁয়ষট্টি রান্, কিন্তু প্রত্যেকটি রানের দাম লাখ টাকা।'

'সে তো হল, কিন্তু খেলা যদি না জমে?' বলল সুনন্দ।

'তাতে কী হল? চার পাশে লোক রয়েছে, তাদের সঙ্গে খোশ গল্প করো; লাঞ্চ টাইমে মুরগির কাটলেট আর হ্যাপি বয় আইসক্রিম। বিকেল যত বাড়ছে সূর্যি তত হেলছে পশ্চিমে, আর গাছের ছায়া লম্বা হয়ে মাঠটাকে ছেয়ে ফেলছে, উত্তরে হাইকোর্ট। ব্যাটে বলে খুটখুটের ফাঁকে ফাঁকে গঙ্গা থেকে স্টীমারের ভোঁ...আর কত বলব? সাহেবরা বলে গেছে ইডেনের মতো ক্রিকেটের মাঠ দুনিয়ায় দুটি নেই।'

'আপনার যে ক্রিকেটে এত শখ সে তো অ্যাদ্দিন বলেননি,' বলল ন্যাপলা।

'বলিস কী ! আমার হিরো ছিল রণজি। জামসাহেব অফ নওয়ানগর মহারাজা রণজিৎ সিংজী। নওয়ানগরের রাজা, ক্রিকেটেরও রাজা। সাহেবদের চোখ টেরিয়ে যেত কালা আদমির খেলা দেখে। যে সব ভারতীয় বিদেশে গিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে তার মধ্যে রণজিই বোধহয় প্রথম।... তবে, শুধু ক্রিকেট কেন ? এই পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে কোনও খেলাই বাদ দেয়নি এ শর্মা— ডাংগুলি হাডুডু থেকে শুরু করে ব্রিজ-পোকার-দাবা-বিলিয়ার্ড পর্যন্ত। ইস্কুল কলেজে হকি ক্রিকেট ফুটবল রেগুলার খেলতুম। ত্রিশ বছর বয়সে একবার এক সাহেব টিমের এগেনস্টে ক্রিকেট খেলতে হয়েছিল।'

'এম সি সি ?' ন্যাপলা জিজ্ঞেস করল।

'ঠিকই বলেছিস্' বললেন তারিণী খুড়ো, 'তবে এম সি সি-র বিরুদ্ধে নয়, এম সি সি-র পক্ষে। মেরিলিবোন নয়, মার্তণ্ডপুর ক্রিকেট ক্লাব, আর বিপক্ষদলের সাহেবরা প্লান্টার্স ক্লাব।'

'কত রান করেছিলেন আপনি ?'

'সে বললে তো পুরো গল্পটাই বলতে হয়।'

'তাই বলুন না' বলল ন্যাপলা। 'ভূতের গল্প তো অনেক হল ; আজ খেলার গল্পই হোক।'

'ভূত যে এ গল্পে একেবারেই নেই সেটা অবিশ্যি বললে ভুল হবে।'

'আরেব্বাস !' চোখ গোল গোল করে বলল ন্যাপলা, 'ভূত আর ক্রিকেট— দারুণ কম্বিনেশন !'

চিনি-দুধ ছাড়া চায়ে একটা সশব্দ চুমুক দিয়ে গলার মাফলারটা আরেকটু ভাল করে পেঁচিয়ে নিয়ে তারিণীখুড়ো আরম্ভ করলেন তাঁর গল্প।

উত্তর প্রদেশের উত্তরে হিমালয়ের গায়ে সাড়ে তিন হাজার ফুট এলিভেশনে হল মার্তণ্ডপুর শহর। নেটিভ স্টেট্, রাজার বয়স বাহান্ন, নাম বীরেন্দ্রপ্রতাপ সিং। এই রাজার সেক্রেটারির চাকরি আমি পেলুম ভগবানগড়ের রাজার রেকমেন্ডেশনে। রাজাদের সম্বন্ধে যে যাই বলুক না কেন, আমি তাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি তাতে আমি অন্তত তাদের বদনাম করতে পারব না। হতে পারে যে আমার কপাল ছিল ভাল, তেমন বিচ্ছু রাজার সংস্পর্শে আমি আসিনি। সে যাই হোক, মার্তণ্ডপুরের রাজা আমাকে যে ভাবে খাতির করলেন তাতে খুশি না হয়ে উপায় নেই। সেক্রেটারির যাবতীয় কাজ ছাড়াও একটা জরুরি কাজ আমার ছিল সেটা হল এই—বীরেন্দ্রপ্রতাপ তাঁর বাপ রাজেন্দ্রপ্রতাপের জীবনী লিখবেন, সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করা। রাজেন্দ্রপ্রতাপ ছাত্র-জীবন থেকেই ডায়রি লিখতেন। সেই সব ডায়রি পড়ে তাঁর জীবনের নানান তথ্য বার করে একটা খাতায় নোট করে রাখতে হবে আমাকে। ঘটনাবহুল জীবন, তাই কাজটা করতে ভালই লাগছিল। এই ডায়রি থেকেই আমি জানতে পারি যে রাজেন্দ্রপ্রতাপের জীবনে ক্রিকেট একটা খুব বড় স্থান অধিকার করেছিল। রাজবাড়ির বিশাল কম্পাউন্ডে একটা ক্রিকেট মাঠ রয়েছে সেটা এসেই দেখেছিলাম। কম্পাউন্ডের অধিকাংশটাই পাহাড় চেঁছে সমতল করে ফেলা হয়েছে। তাতে ফুলের বাগান, ফলের বাগান, তিরতির করে বয়ে যাওয়া সরু নদী, চিড়িয়াখানা, মন্দির, সবই রয়েছে। আর আছে ক্লাব বিল্ডিং সমেত ক্রিকেট গ্রাউন্ড। রাজাকে জিজ্ঞেস করাতে উনি বলেছিলেন সে মাঠে খেলা হয় শরৎকালে। বড় খেলা একটাই হয়, সেটা হল মার্তণ্ডপুর ক্রিকেট ক্লাব ভারসাস প্লান্টার্স ক্লাব। সে খেলা দেখতে নাকি সমতলভূমি থেকেও লোক উঠে আসে। আমি যখন গেছি— নাইনটিন ফর্টি নাইনে— তখনও অনেক সাহেব প্লান্টার থাকে ওই অঞ্চলে। তারা সব স্থানীয় চা বাগানের মালিক। তার মধ্যে নাকি জনাচারেক ডাকসাইটে প্লেয়ার আছে যারা তরুণ বয়সে দেশে থাকতে কাউন্টি ক্রিকেট খেলেছে, তারপর ভারতবর্ষে চলে এসেছে ব্যবসা করতে। রাজার টিম নাকি রাজেন্দ্রপ্রতাপের আমলে খুবই ভাল ছিল, কিন্তু এখন আর তেমন নেই। তাই গত দশ বছরে একবারও মার্তণ্ডপুর জিততে পারেনি। চারদিন ধরে খেলা চলে, মার্তণ্ডপুরের পক্ষে রান ওঠে না বলে প্রতিবারই নাকি ইনিংস ডিফিট হয়, তাই সাহেবদের এক ইনিংসের বেশি ব্যাটই করতে হয় না।

আমি আসার হপ্তা তিনেকের মধ্যেই রাজা একদিন আমাকে এই বাৎসরিক ম্যাচের কথা বলে বললেন, 'তোমার তো বেশ জোয়ান ছিমছাম সুপুরুষ চেহারা, খেলাধুলোর শখ আছে নাকি ?'

আমি বললাম, 'আউটডোর গেমস এককালে খেলেছি ; আজকাল তাস, দাবা, বিলিয়ার্ড, এই সব খেলি সুযোগ পেলে।'

তারপরেই রাজা এম সি সি আর প্লান্টার্স ক্লাবের কথাটা বললেন। 'এখানে ভাল ক্রিকেটারের খুব অভাব', বললেন রাজা। 'এককালে এমন ছিল না। আমি নিজে অবশ্য কোনওদিন ক্রিকেট খেলিনি, বাবাই খেলতেন, কিন্তু তখন আমাদের দলকে সাহেবরা রীতিমতো ভয় পেত। এখন ব্যাপারটা উলটে গেছে। অথচ এমনই ট্র্যাডিশনের জোর যে বাৎসরিক ম্যাচটা না খেললেই নয়। আর তো একমাস আছে ; এবার তুমিও লেগে পড়ো।'

আমি বাধ্য হয়ে বললাম যে আমার প্র্যাকটিস নেই ; কিন্তু রাজা কথাটা কানেই নিলেন না। বললেন, 'এই একমাসে প্র্যাকটিসের ঢের সুযোগ পাবে। তোমাকে গান্ অ্যান্ড মুর কোম্পানির একটা ভাল বিলিতি ব্যাট দিচ্ছি, বাবা এনেছিলেন বিলেত থেকে, তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া। কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু হাত চালিয়ে নাও। তোমার কি বোলিং আসে নাকি ?'

বাধ্য হয়ে বললুম যে ওদিকে আমার কোনওদিনও ঝোঁক ছিল না। ফাইভ ডাউন, সিক্স ডাউন নামতুম আর ব্যাটিং-ই করতুম। তবে ইয়াং বয়সের সে ফর্ম ফিরে পাবার আশা বৃথা। সেটাও জানিয়ে দিলুম। রাজা অবিশ্যি এ কথাতেও কান দিলেন না। বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো, তোমাকে ব্যাটটা দিয়ে দিই।'

প্রাসাদের দক্ষিণভাগে একটা বিশেষ ঘরে গেলুম রাজার সঙ্গে। এই ঘরটা হল যাকে বলে ট্রোফি রুম। বীরেন্দ্রপ্রতাপ ভাল শিকারি, তাঁর মারা বাঘ ভাল্লুক বাইসন হরিণের স্টাফ করা দেহ আর মাথা রয়েছে এই ঘরে। এ ছাড়া রয়েছে এক আলমারি বোঝাই কাপ আর মেডেল, তার মধ্যে বেশির ভাগই রাজেন্দ্রপ্রতাপের পাওয়া, আর বাকি পেয়েছেন বর্তমান রাজা তাঁর স্কোয়াশ খেলায় কৃতিত্বের জন্য।

এরই পাশে একটা আলমারিতে রয়েছে কিছু টেনিস র‍্যাকেট, স্কোয়াশ র‍্যাকেট, মাছ ধরার ছিপ, আর বিভিন্ন খেলার সময় পরার জন্য রকমারি ক্যাপ। কিন্তু ক্রিকেট ব্যাট তো কোথাও দেখছি না। রাজাকে জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'ওটা ছিল রাজার খুব সাধের সম্পত্তি, তাই যেমন-তেমন ভাবে রাখা নেই।'

এই বলে একটা আলমারির তলার দিকের দেরাজ খুলে তার থেকে টেনে বার করলেন খবরের কাগজে মোড়া ব্যাটটা। সেটা দিয়ে অনেক খেলা হলেও এখনও বেশ ব্যবহার্য অবস্থায় রয়েছে।

'হাতে নিয়ে দেখো।'

নিলুম, আর নিতেই কেমন যেন ম্যাজিকের মতো বয়সটা দশ বছর কমে গেল। মনে পড়ল যত খেলা আমি খেলেছি তার মধ্যে নিঃসন্দেহে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল ক্রিকেট। বার চারেক হাঁকড়াবার ভঙ্গিতে হাত চালিয়ে ফস করে বলে দিলুম আমি রাজার দলের হয়ে সাহেবদের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি আছি। রাজা হ্যান্ডশেকের জন্য তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

*   *   *   *

দিন তিনেকের মধ্যে এম সি সি টিমের সব খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ক্যাপটেন হচ্ছেন সুন্দরলাল গুপ্তে, দিল্লির লোক, বয়স আমারই মতো। অন্য খেলোয়াড়দের কাউকেই দেখে বিশেষ ভরসা হয় না। এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমার চেহারা এবং স্বাস্থ্য এদের সকলের চাইতে ভাল।

দুদিন মাঠে নেমে ঠুকঠাক করলুম, দেখলুম দিব্যি হাত চলছে, দৃষ্টি পরিষ্কার, মাথা ঠাণ্ডা। সুন্দরলাল খুব খুশি হলেন।

কিন্তু তিনদিনের দিন বিধি বাদ সাধলেন। সকালে উঠে দু-চারটে হাঁচি হল, আর দুপুর হতে না হতে তেড়ে জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জা। তখন মিক্সচারের যুগ, ডাক্তার পান্ডে এসে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দিলেন, তাও সাতদিনের আগে জ্বর ছাড়ল না। আট দিনের দিন বিছানা ছেড়ে উঠে বুঝতে পারলুম

দেহের শক্তি অর্ধেক হয়ে গেছে। আগেও ফ্লু হয়েছে, জানি দুর্বল করে দেয়, কিন্তু কথা হচ্ছে—পনেরো দিন বাদে ম্যাচ, খেলব কী করে ? রাজা কিন্তু নির্বিকার। বললেন, 'পনেরো দিন ঢের সময় ; খেলার আগে ঠিক চাঙা হয়ে উঠবে, দেখে নিও। ম্যাচের আগের দিন একটু ব্যাট চালিয়ে নিতে পারলে আর কোনও ভাবনা নেই।'

কী আর করি ; খেলার চিন্তা আপাতত স্থগিত রেখে কাজে মন দিলাম।

এখানে রাজেন্দ্রপ্রতাপের ডায়রির কথাটা বলা দরকার। চামড়া দিয়ে বাঁধানো তেত্রিশটা ভল্যুম। ষোল বছর বয়স থেকে লেখা শুরু, আগাগোড়াই ইংরিজিতে। গোড়ার দিকে ভাষায় গণ্ডগোল, ব্যাকরণে ভুল ইত্যাদি রয়েছে, কিন্তু একুশ বছর বয়সে বিলেত যাবার ছ মাসের মধ্যে ভাষা হয়ে গেছে চোস্ত। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নোট করে যেতে হচ্ছে বলে এই দেড়মাসে বেশি এগোতে পারিনি, কিন্তু এর মধ্যেই রাজার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। বীরেন্দ্রপ্রতাপ অবিশ্যি তেত্রিশ খণ্ডের সবকটাই পড়েছেন। তাঁর মতে রাজেন্দ্রপ্রতাপের ডায়রি হল একমেবাদ্বিতীয়ম্। ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যের কোনও রাজাই এরকম ডায়রি লিখেছেন বলে জানা যায়নি। একটা কথা অবিশ্যি এর মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছি ; সেটা হল এই যে রাজেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন ক্রিকেটের পোকা। তিনি বিলেত পৌঁছেছিলেন ১৯০১ সালে। যেদিন পৌঁছালেন সেদিনই ডায়রিতে লিখছেন, 'অ্যাট লাস্ট আই ক্যান ওয়চ রণ্‌জি প্লে !'

বিলেত থেকে ফিরে এসেই রাজেন্দ্রপ্রতাপ মার্তগুপুর ক্রিকেট ক্লাবের পত্তন করেন। প্লান্টার্স ক্লাব অবিশ্যি তার আগে থেকেই ছিল। দুই ক্লাবের মধ্যে বাৎসরিক ম্যাচের পরিকল্পনাও রাজেন্দ্রপ্রতাপের। তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স অবধি তিনি ছিলেন এম সি সি-র ক্যাপ্টেন। তাঁর আমলে সাহেবরা নাকি মোটেই জুত করতে পারেননি। তার প্রধান কারণ— অধিনায়ক নিজে ছিলেন ডাকসাইটে ব্যাট্‌স্‌ম্যান। বীরেন্দ্রপ্রতাপের মতে তাঁর বাবার উচিত ছিল কোমর বেঁধে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে নেমে যাওয়া— যেমন নেমেছিলেন রণ্‌জি, দিলীপ সিংজী, পাতৌদির নবাব, পাতিয়ালার মহারাজা। কিন্তু ক্রিকেটের চেয়েও বেশি টান ছিল তাঁর সাহিত্যের প্রতি। আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তিপ্পান্ন বছর বয়সে হঠাৎ হার্টফেল করে চলে গেলেন। বীরেন্দ্রপ্রতাপের বয়স তখন বাইশ। যে কাজ বাপ করে যেতে পারেননি, সে কাজ এখন তিনি করবেন বলে মনস্থ করেছেন।

দেখতে দেখতে ম্যাচের দিন এল। তার আগে দুদিন মাত্র প্র্যাকটিস করেছি। দুর্বলতা যে পুরোপুরি গেছে তাও বলতে পারব না। তা সত্ত্বেও যে একটা উদ্দীপনা অনুভব করছিলুম এটা বলতেই হবে। মন বলছিল যে এ-খেলা আমাকে খেলতে হবে।

ইতিমধ্যে প্লান্টার্সের টিম সম্বন্ধেও জেনেছি। তিনজন ভাল ব্যাট্‌সম্যান আছে তাদের মধ্যে— বোল্টন, ম্যানারস আর উইলকক্স। এ ছাড়া ভাল বোলার আছে দুজন— মার্টিন আর ফুলারটন। তার মধ্যে প্রথমটির বলে নাকি বেশ তেজ।

খেলার দিন দেখি সকাল থেকে মাঠে দর্শক জমায়েত হচ্ছে। বুকের ভেতর ধুকপুক করছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে খেলার আগ্রহটাও বাড়ছে। ক্যাপ্টেনকে বললাম যে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব যেহেতু সম্পূর্ণ কাটেনি, ফিল্ডিং-এ যেন আমাকে এমন জায়গায় রাখা হয় যাতে বেশি দৌড়াতে না হয়। গুপ্তে বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই, তোমাকে স্লিপে দেব।'

দশটায় ম্যাচ শুরু, মাঠের চতুর্দিকে লোক গিজগিজ করছে, নীল আকাশে শরতের তুলো-প্যাঁজা মেঘ, দুই ক্যাপ্টেন আম্পায়ারের সঙ্গে মাঠে নামলেন, আর আমিও চোখ বুজে বার চারেক দুর্গা নাম জপে নিলুম। ওদিকের অধিনায়ক জন উইলকক্স, সেই টস্ জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলে, আর আমি টাটকা নতুন সাদা প্যান্ট, শার্ট জুতো আর নীল ক্যাপ পরে দলের সঙ্গে মাঠে নেমে সেকেন্ড স্লিপে গিয়ে দাঁড়ালুম। যাবার আগে অবিশ্যি রাজার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলুম। রাজা আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'কোনও ভাবনা নেই, তোমার ব্যাটে জাদু আছে।' কথাটার আসল মানে অবশ্য পরে বুঝেছিলুম।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা, তাই খুব ডিটেলে মনে নেই, তবে এটা মনে আছে যে সাহেবরা তিনশো বাইশ রান তুলে দ্বিতীয় দিন টি-এর আগে সবাই আউট হয়ে গেলেন। আমি একটা ক্যাচ লুফে কিছুটা মান রক্ষা করলুম, কিন্তু মন বলতে লাগল যে এবারও সাহেবদের হারানো গেল না, সাড়ে তিনশো রান তোলার মতো ব্যাটসম্যান আমাদের দলে নেই। পর পর দশবার হেরেছে মার্তগুপুর ক্লাব, এবার নিয়ে হবে এগারোবার।

এম্ সি সি চায়ের পর ব্যাট করতে নামল ; ওপনিং ব্যাট ক্যাপ্টেন গুপ্তে আর সুন্দরম বলে একটি মাদ্রাজি। আমি পাঁচ উইকেট গেলে নামব এটা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে।

গুপ্তে টুক্‌টুক্ করে তেইশ রান তুলে কট আউট হয়ে গেল, তার জায়গায় এল সলামৎ হোসেন। বললে বিশ্বাস করবি না, পৌনে পাঁচটার মধ্যে পাঁচটা উইকেট ধড়াধ্‌ধড় কচুকাটা— তখন রান উঠেছে মাত্র বিরানব্বুই ! চারটে যখন পড়েছে তখনই আমি প্যাড পরে রেডি। পাঁচ নম্বর যখন শূন্যি করে মুখ কালি করে ফিরছে, আমি নেমে পড়লুম মাঠে। কেউ তালি দিলে না। আমাকে কেউ চেনে না, শুনেছে ইনি বাঙালিবাবু, কাজেই আমার উপর কেউই বিশেষ ভরসা করছে না।

তখনও ওভারের তিন বল বাকি, বোলিং করছে ওদের ফাস্ট বোলার ক্লিফ মার্টিন। আমি গিয়ে জায়গায় দাঁড়ালুম। তখনকার মনের অবস্থা বলে বোঝানো খুব মুশকিল। সকাল অবধি মনে হচ্ছিল যে অসুখের দরুন যে এনার্জিটা হারিয়েছিলাম, তার সবটুকুই এ কদিনে আবার ফিরে পেয়েছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা আবার লোপ পেয়েছে। ব্যাটটা হাতে ভারী লাগছে, পায়ের প্যাড যেন একটা

দুর্বিষহ বোঝা, তাই নিয়ে ছুটে রান করা যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার।

ওদিকে মার্টিন হেঁটে গিয়ে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে বলটা প্যান্টের পাশে ঘষে নিচ্ছে, মন বলছে প্রথম বলেই আমার স্টাম্প হবে চিচিং ফাঁক। তাও কোনওরকমে মনটাকে শক্ত করে মাথা ঘুরিয়ে ফিল্ডটা দেখে নিয়ে ব্যাট পাতলুম ঘাসের ওপর। তারপর ভুরু কুঁচকে চাইলুম মার্টিনের দিকে। সব তৈরি বুঝে সে দিলে স্টার্ট। চোদ্দো পা দৌড়ে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে যে বলটা সে দাগলে আমার দিকে সেটা শর্ট পিচ। কোত্থেকে মুহূর্তের মধ্যে যে মনে সাহসটা এল জানি না। শুধু সাহস না— সেই সঙ্গে চোখের দৃষ্টি, নার্ভের উপর দখল, কবজির জোর আর হাঁকড়াবার গোঁ। সব মিলে ব্যাট চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বলবাবাজি উলটো মুখে আকাশে উঠে চোখের পলকে ক্লাব ঘরের পেছনে শিরীষ গাছের পাতা ভেদ করে একটা কান ফাটানো খটাং শব্দ করে পড়ল একটা অদৃশ্য টিনের চালের উপর। খেলায় এই প্রথম ছক্কা, আর তাই না দেখে হাজার পায়রা এক সঙ্গে টেক অফ্ করলে যেমন শব্দ হয়, দর্শকদের মধ্যে থেকে উঠল তেমনি একটা শব্দ। এমন হাততালি ক্রিকেটের মাঠে বড় একটা শোনা যায় না। আর এই হাততালিতেই যেন নদীতে বান ডাকার মতো হুড়মুড় করে

আমার সমস্ত উৎসাহ আর কনফিডেন্স ফিরে এল। এটা ঠিক যে সেদিন নিজের খেলায় আমি নিজেই হকচকিয়ে যাচ্ছিলুম। এ যেন আমি নয় ; আমার ভেতর ঢুকে আমার হয়ে অন্য কোনও ক্ষণজন্মা ক্রিকেটর যেন খেলাটা খেলে দিচ্ছে, সব কৃতিত্ব তারই, আমি নিমিত্ত মাত্র।

আমার স্কোর হয়েছিল দুশো তেতাল্লিশ নট আউট, তার মধ্যে এগারোটা ছক্কা আর একত্রিশটা বাউন্ডারি। অন্য ব্যাটসম্যানের উপর ভরসা নেই বলে ওভারে শেষ বলে শর্ট রান নিয়ে ব্যাটিং-এর পুরো দায়িত্বটা নিজের ঘাড়েই নিয়ে নিয়েছিলুম। ড্রাইভ, হুক, গ্লান্স, কাট, ওভার দি বোলার— কোনও স্ট্রোকই আমার খেলা থেকে বাদ পড়েনি। আশ্চর্য এই যে, এককালে যখন ক্রিকেট খেলেছি তখন এর অনেক স্ট্রোকই আমার হাত দিয়ে বেরোয়নি। একশো করার সঙ্গে সঙ্গে সাহেবরা এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল, কিন্তু দুশোর বেলায় দেখলুম তাদের সকলের মুখ ফ্যাকাশে মেরে গেছে, পিঠ চাপড়ানোর সামর্থ্যও যেন আর নেই।

আমার এমন খেলার পরে সাহেবরা এমন মুষড়ে পড়েছিল যে দ্বিতীয় ইনিংসে সাতাত্তরের মাথায় তাদের শেষ উইকেট পড়ে গেল। ইনিংস ডিফিট, কারণ আমাদের টোট্যাল হয়েছিল চারশো ছত্রিশ।

চারদিনের দিন আড়াইটেয় খেলা শেষ হয়ে গেল।

সেদিনই সন্ধ্যায় আমার ঘরে খাটে শুয়ে ভরদ্বাজ বেয়ারাকে দিয়ে একটু দলাই মলাই করিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় রাজার খাস বেয়ারা এসে জানালে যে আমার তলব পড়েছে।

গেলুম বেয়ারার সঙ্গে। তাঁর ঘরে ঢুকতেই রাজা আমার দিকে চেয়ে একগাল হেসে বললেন, 'ওয়েল ব্যানার্জি, হাউ ডু ইউ ফিল ?'

আমি অকপটে বললুম, 'দেখো রাজা, আমি একেবারে বোকা বনে গেছি। সত্যি বলছি আমি এমন খেলা কখনও খেলিনি, কারণ এমন খেলা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। এর রহস্য ভেদ করার শক্তি আমার নেই।' রাজার মুখে এখনও মোলায়েম হাসি। সামনের চেয়ারের দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'বোসো !'

আমি বসলুম। রাজা তাঁর সামনে টেবিলের উপর থেকে একটা বই তুলে নিলেন। দেখে চিনতে পারলুম ; এটা রাজেন্দ্রপ্রতাপের ডায়রির একটা খণ্ড।

একটা বিশেষ জায়গায় ডায়রিটা খুলে সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বীরেন্দ্রপ্রতাপ বললেন, 'এইখানটা পড়ে দেখো।'

পড়ার আগে ওপরে সন তারিখ দেখে নিলুম। তেসরা নভেম্বর ১৯০৩। অর্থাৎ বিলেত যাবার আড়াই বছর পর।

এবার লেখাটায় চোখ গেল। যা পড়লুম তার বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায়— 'আজ রণ্‌জি তার বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তার নিজের একটা ব্যাট আমাকে দিল। এই ব্যাট নিয়েই সে সাসেক্সের হয়ে মিড্‌লসেক্সের বিরুদ্ধে ২০২ রান করেছিল। আমার মতো ভাগ্যবান পৃথিবীতে আর কেউ আছে কি ?'

এতদিন রণ্‌জির শুধু নামই শুনেছিলুম। আজ তাঁর মৃত্যুর ষোলো বছর পরে, নিজের খেলা থেকে আঁচ করলুম তিনি কেমন খেলতেন।

সন্দেশ, ফাল্গুন ১৩৯১

টলিউডে তারিণীখুড়ো

তাকিয়াটাকে কোলের উপর টেনে নিয়ে আরও জমিয়ে বসে ঝুঁকে পড়ে তারিণীখুড়ো তাঁর গল্প আরম্ভ করলেন।—

আমার তখন তেইশ বছর বয়স, তবে একটা তেকোনা ফ্রেঞ্চকাট গোছের দাড়ি রেখেছিলাম বলে মনে হত তেত্রিশ। বেয়াল্লিশ সালের কথা বলছি। তখন যুদ্ধ চলেছে পুরোদমে, কলকাতার রাস্তাঘাটে খাকি পরা জি. আই. সেনা ঘোরাফেরা করছে, শহরের চেহারাটাই পালটে গেছে। জোড়া জোড়া মার্কিন মিলিটারি পুলিশ চৌরঙ্গিতে টহল দিয়ে ফেরে, তাদের জামার আস্তিনে কনুই-এর ওপর লেখা এম. পি.। সিনেমা হাউসগুলো খালি পড়ে থাকে না কখনও ; ম্যাটিনি-ইভনিং-নাইট তিনটেই হাউস ফুল, সব ছবিই হিট, তা সে দিশিই হোক আর বিলিতিই হোক। আমাদের টলিউডের স্টুডিওগুলো গমগম করছে, কুইক মানির লোভে রোজই টাকাওয়ালা নতুন নতুন প্রোডিউসার আসছে। তারা জানে ছবি একবার লেগে গেলে কোনও ব্যবসাতে চটজলদি এত লাভ হয় না। আমার মেজোমামার এক সহপাঠী, নাম পরেশ মুস্তোফি, তিনি ভারত মাতা স্টুডিওর মালিক। আমাকে ডেকে পাঠিয়ে যেচে একটা চাকরি দিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজারের। কাজটা নেহাত ফেলনা নয় ; একটা ছবি হলে পরে সবাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, খরচের হিসেব রাখা, আর্টিস্ট আর কর্মীদের পেমেন্ট করা, এমন কী ছুঁচ থেকে হাতি পর্যন্ত যা কিছু একটা ছবিতে লাগবে সব কিছু জোগাড় করার ভার আমার উপর। তখন বয়স কম, তা ছাড়া টুপাইস রোজগার হচ্ছে, খাটনি হলেও কাজটা ভালই লাগছিল।

সেই সঙ্গে এটাও বলা দরকার যে ভেতরে ভেতরে আমার অভিনয়ের একটা শখ ছিল। আমার চেহারাটা যে এককালে ভাল ছিল, সেটা তো তোমাদের বলেইছি। তা ছাড়া আমি ছিলাম হলিউডের ছবির পোকা। বাংলা ছবিতে তো আর অভিনয় হত না, হত রঙ তামাশা। আমি দেখি পৃথিবীর সব সেরা স্টারের অভিনয়, যাকে দেখে অভিনয় বলেই মনেই হয় না। অবিশ্যি সেই সঙ্গে ভাল বাংলা পেশাদারি থিয়েটারও বাদ দিই না, কারণ শিশির ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী মনোরঞ্জন ভট্টাচায্যি—এঁরা সব ছিলেন বাঘা বাঘা অভিনেতা। কিন্তু যেচে গিয়ে বলব আমায় একটা পার্ট দিন, তেমন সাহস তখনও হয়নি। তবে স্টুডিও পাড়ায় থাকলে কোনও প্রযোজক বা পরিচালকের চোখে পড়ে গিয়ে সুযোগ যে আসবে না, এমনই বা কে বলতে পারে ?

একদিন জানতে পারলাম যে আলমগীর ছবি হচ্ছে আমাদের এই ভারত মাতা স্টুডিওতেই, আর স্টুডিওই টাকা ঢালছে সে ছবিতে। বস মুস্তোফি সাহেব আমাকে ডেকে সব ডিটেল বললেন। তখনকার নামকরা পরিচালক জগদীশ নস্কর পরিচালনা করবেন, সেরা অভিনেতারা সব অভিনয় করছেন। তবে নাম ভূমিকায়—অর্থাৎ আলমগীরের চরিত্রে—একটি নতুন লোককে নেওয়া হচ্ছে। এর নাম রমণীমোহন চ্যাটার্জি, সুন্দর চেহারা, উচ্চবংশের ছেলে, অনেক পয়সা। মুস্তোফিমশাই নিজেই নাকি ছেলেটিকে এক বিয়ে বাড়িতে দেখে সোজাসুজি অফারটা দেন, এবং ছেলে নাকি এককথায় রাজি হয়ে যায়।

রমণীমোহন চ্যাটার্জি নামটা চেনা চেনা লাগছিল কেন বুঝতে পারছিলাম না, শেষটায় হঠাৎ মনে পড়ল যে শ্যামবাজারের একটা ক্লাবে আমারই স্কুলের সহপাঠী ব্রতীন থিয়েটার করে, তার কাছে শুনেছি এই রমণীমোহনের কথা। চেহারা ভাল—'অনেকটা তোর মতো দেখতে'—বলেছিল ব্রতীন,

আর অ্যাকটিংটাও নাকি ভালই করে। তবু মনে একটা খটকা ছিল তাই ব্রতীনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করলাম, আর করে জানলাম যে এ সেই একই রমণীমোহন। বললাম, 'পারবে তো এত বড় দায়িত্ব কাঁধে নিতে ?' ব্রতীন বললে, 'আদা নুন খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছে তো ছোকরা। শখ প্রচণ্ড। আর, ও একটা আংটি পরে সেটা নাকি মুঘল আমলের ; ওর ঠাকুরদাদার ছিল ; খুব পয়া। আলমগীর সাজলে ওটা আঙুলে পরবে, আর তা হলে নাকি আর দেখতে হবে না। আসলে, রমণী আবার তুকতাকে বিশ্বাস করে, পুজো আচ্চা করে। বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে, বুঝতেই তো পারিস, পয়সার জন্য যে করছে তা তো নয়, শখ হয়েছে চিত্রতারকা হবার।'

পয়লা বৈশাখ মহরতের দিন স্থির হয়েছে, এখন মার্চের মাঝামাঝি, তাই হাতে কিছুটা সময় আছে। ইতিমধ্যে পরিচালক জগদীশ নস্কর একদিন বলে বসলেন যে নতুন ছেলেটিকে একবার বাজিয়ে দেখবেন। শুধু চেহারাতে তো হবে না, তাকে ডায়ালগ বলতে হবে, তাই অভিনয় ছাড়াও কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ ইত্যাদি ভাল হওয়া চাই। আর একমাত্র সেই যখন নতুন, তখন তাকে একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এই পরীক্ষায় উতরোলে তারপর একটা ক্যামেরা টেস্ট নিলেই চলবে।

আমারই উপর ভার পড়ল রমণীমোহনকে টেলিফোন করে তারই বাড়িতে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা। রবিবার সকাল দশটায় টাইম ঠিক হল। আমি আর পরিচালকমশাই যাব। টেস্টে পাশ করলে পর মুস্তোফির সঙ্গে বাকি কথা হবে।

রবিবার এসে পড়ল। জগদীশ নস্কর সময়ানুবর্তিতায় বিশ্বাসী, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় দশটায় গিয়ে রমণীমোহনের বাড়ি সদর দরজার বেল টিপলেন। বেয়ারা আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রমণীমোহনের আবির্ভাব হল। চেহারা ভাল তাতে সন্দেহ নেই, আর এতেও সন্দেহ নেই যে আমার সঙ্গে একটা মিল আছে। দুজনেরই হাইট ছ ফুট, দোহারা চেহারা, ফরসা রং, চোখা নাক, পাতলা ঠোঁট। আমার তেকোনা দাড়ির জন্য মিলটা হয়তো অতটা ধরা পড়ে না, কিন্তু আমি জানি, দাড়ি বাদ গেলেই পড়বে।

পরিচালকমশাই সঙ্গে আলমগীরের ডায়ালগ এনেছিলেন। তারই একটা অংশ পড়তে দিলেন রমণীমোহনকে। ছোকরা বেশ ভালই পড়ল। বলল ও নাকি ভাদুড়ীমশাইকে গুরু বলে মানে, আর হলিউডের তারকাদের মধ্যে রোনাল্ড কলম্যান। নস্কর মশাই বেশ খুশি, আমাকে বললেন অবিলম্বে দরজি এনে রমণীমোহনের পোশাকের মাপ নিতে। এই ফাঁকে রমণীমোহনও তাঁর আংটিটা দেখিয়ে দিলেন। দেখলাম সত্যি খাসা জিনিস ; সোনার আংটির মাঝখানে হিরেকে ঘিরে গোল করে পান্না বসানো। নস্করমশাই বললেন আলমগীর গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে আংটিটা ক্লোজ-আপের সৌন্দর্য অনেক গুণে বাড়িয়ে দেবে।

তিনদিন বাদে ক্যামেরা টেস্টেও রমণীমোহন দিব্যি উতরে গেলেন।

এরপর একটা দিন ঠিক করে বস মুস্তোফি মশাইকে সঙ্গে নিয়ে রমণীমোহনের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে চুক্তি সই হয়ে গেল। পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে রমণীমোহন, আর পাঁচ হাজার অ্যাডভান্স। তখনকার দিনে একজন নতুন অভিনেতার পক্ষে এটা অঢেল টাকা, আজকের দশলাখের সমান। পয়লা বৈশাখ মহরত ; তাতে কোনও অভিনয়ের ব্যাপার নেই, কিন্তু রমণীমোহনকে মেক-আপ নিয়ে, কস্টিউম পরে আসতে হবে। এইখানে রমণীমোহন একটি বায়না করলে। সে বললে যে স্টুডিওর মেক-আপ রুম তার জানা আছে, সে অতি রদ্দি, তাতে সে মেক-আপ করবে না। মেক-আপ-ম্যান যেন সকাল সকাল তার বাড়িতে চলে আসে, সে বাড়িতেই মেক-আপ নিয়ে কস্টিউম পরে স্টুডিওতে হাজির হবে। মুস্তোফিমশাই দেখলাম এতে রাজি হয়ে গেলেন, যদিও একজন নবাগতের পক্ষে আবদারটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের। বুঝলাম নতুন হিরোকে খুবই পছন্দ হয়েছে কর্তামশাইয়ের।

পয়লা বৈশাখ ভারত মাতা স্টুডিওতে আলমগীরের মহরত হয়ে গেল। লোকে লোকারণ্য, ফিল্ম লাইনের কেউ বাদ যায়নি, খানাপিনার বন্দোবস্ত ছিল, নতুন তারকাকে মোগল বাদশার মেক-আপে দেখে সকলেই খুব তারিফ করে গেলেন। ইতিমধ্যে রমণীমোহন নাকি আলমগীরের ডায়ালগ পেয়ে গেছেন, এবং সবই তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছে। আচকান জোব্বা পরচুলা দাড়ি গোঁফ তলোয়ার নাগরা সব রেডি, প্রথম শুটিং-এর তারিখ স্থির হয়েছে পনেরোই বৈশাখ।

এদিকে আমি তখন পুরোদস্তুর প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাজ করছি। উদয়াস্ত খাটছি, দম ফেলার ফাঁক নেই। কিন্তু এতেও যে আপত্তি নেই তার কারণ হল যে স্টুডিওর পরিবেশে একটা জাদু আছে। এটা স্বীকার করতেই হবে। বিশেষ করে ঐতিহাসিক ছবিতে যারা কাজ করবে—সে অভিনেতা-অভিনেত্রীই হোক আর সাধারণ কর্মীই হোক—তাদের সকলেরই মেজাজে যেন একটা আমীরী ভাব চলে আসে। স্টুডিওর ভিতরে সেট তৈরি হচ্ছে প্রাসাদের—তার খিলেন, থাম, ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, গালিচা, মসনদ, ফরাস, তাকিয়া—সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন গেছে পালটে। মাঝে মাঝে কথা বলতে যে উর্দু-ফারসিও বেরিয়ে পড়ছে না তা নয়।

দেখতে দেখতে ১৫ই বৈশাখ এসে গেল। আলমগীরকে দিয়েই কাজ শুরু ; বাপ শাজাহানের সঙ্গে দৃশ্য। ঠিক সাড়ে দশটার সময় তাঁর নিজের লাল শেভ্রোলে গাড়িতে আলমগীরের বেশে এসে হাজির হলে রমণীমোহন।

ক্যামেরাম্যানের আলো করা প্রায় শেষ, দু-একটা খুচরো রিহার্সেলও হয়ে গেল, এবং তাতে শাজাহান-বেশি পেশাদারি অভিনেতা জয়নারায়ণ বাগচির বিপরীতে নিউকামার রমণীমোহন বেশ ভালই অভিনয় করলেন। কেবল, পাখা সত্ত্বেও তিনি যে এত ঘামছেন, সেটা বোধহয় প্রথম দিনের উত্তেজনা ও কিঞ্চিৎ নার্ভাসনেসের জন্য। শট্-এর সময়ে এটা না হলেই আর কোনও চিন্তার কারণ থাকবে না।

এবার ডিরেকটার সাহেব 'লাইটস !' বলে চেঁচাতেই সেটের প্রয়োজনীয় সব আলোগুলো জ্বলে উঠল; অভিনেতা দুজন তাঁদের নিজেদের নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে হেঁটে চলে দেখে নিলেন যে আলো ঠিক আছে। ঠিক আছে বলছি অবিশ্যি বাংলা ছবির কথা ভেবে। প্রাসাদের দেয়াল যে চটের তৈরি

সেটা বিশ হাত দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মেক-আপ আর পোশাক একেবার যাত্রামার্কা। তবে এ-টুকু জানি যে রমণীমোহন যদি উতরে যায় তা হলে এ ছবি হিট হবার সমূহ সম্ভাবনা।

'সব রেডি ?' হাঁক দিয়ে প্রশ্ন করলেন পরিচালক জগদীশ নস্কর। নস্কর সাহেব হচ্ছেন সেই জাতের পরিচালক যিনি যার যার কাজ তাকে তাকে দিয়ে নিজে পরম নিশ্চিন্ত বোধ করেন। কেবল পরিচালনার সময়টুকুতেও তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা পরিবর্তন আসে। তাও সেটা বেশি না। আর এঁর আরেকটি অভ্যাস হচ্ছে যে ইনি কাজের মধ্যে সামান্যতম ফাঁক পেলেই একটু বসে নেন, এবং আরামকেদারা পেলে কক্ষনও মোড়া বা কাঠের চেয়ারে বসেন না।

সব্বাই রেডি ছিল, কাজেই শট নেওয়ায় কোনও বাধা নেই, কিন্তু রমণীমোহন দেখছি ঘেমেই চলেছেন। মেক-আপ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রতি তিন মিনিট অন্তর তোয়ালে দিয়ে তাঁর মুখ 'প্যাড' করে দিচ্ছে, কিন্তু তাও ঘামের অন্ত নেই। স্টুডিওতে বৈশাখ মাসে গরম ঠিকই, কিন্তু এখন তো চতুর্দিকে বিরাট বিরাট পাখা চলছে ; শট-এর সময়ে সেগুলো বন্ধ হয়ে গেলে কী অবস্থা হবে ?

শুটিং-এ একটা রেওয়াজ আছে যে প্রথম দিনের প্রথম শটটা একবার উতরে গেলে সবাই হাততালি দেয়। বিশেষ করে নতুন অভিনেতা হলে তো কথাই নেই।

কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপ ও বিস্ময়ের ব্যাপার যে পর পর সাতবার চেষ্টার পরেও হাততালির সুযোগ এল না, এবং তার জন্য দায়ী স্বয়ং আলমগীর বাদশা। তাঁর ডায়ালগ ছিল অতি সহজ। বাপকে তিনি বলবেন, 'আমি তো আগেই বলেছি, আমার পথে কোনও বাধা আমি সহ্য করব না।' এই কয়েকটি কথা পর পর 'আমার পথে কোনও বাধা আমি সহ্য করব না'—এটা একবার হল 'আমার বাধা আমি কোনও পথে সহ্য করব না,' তারপর হল, 'আমার সহ্যের পথে আমি কোনও বাধা দেব না,' তারপর হল, 'আমি কোনও পথেই আমার সহ্যে বাধা দেব না,' আর চতুর্থবার পরিচালক হুঙ্কার দিয়ে 'অ্যাকশন' বলার পরে আওরঙ্গজেবের মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না। আমি দেখি তার পা ঠকঠক করে কাঁপছে। সে তার কাছেই একটা সিংহাসন গোছের গদির চেয়ার ছিল, তাতে বসে মাথার পাগড়িটা খুলে ফেলল। তারপর বলল যে তার ব্লাড প্রেশার নাকি মাঝে মাঝে অত্যন্ত বেশি নেমে যায়, সম্ভবত এখনও তাই হয়েছে, তাই একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়।

রিহার্সালি মোটামুটি ঠিক হয়েছিল বলে সকলে আরও অবাক, কিন্তু আমি তো জানি যে শট নেবার ঠিক আগে যে মুখের সামনে খটাস করে ক্ল্যাপস্টিক মারা হয়, তাতে অনেক পাকা অভিনেতাও টসকে যায়। এখানেও তাই হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ডাক্তার এসে বললেন প্রেশার নামলেও তেমন কিছু নয়, কিন্তু অভিনেতাকে দিয়ে আজকে আর কাজ না করানোই ভাল।

রমণীমোহন বাড়ি চলে গেলেন। পরিচালক একা শাজাহানকে নিয়ে গোটা পাঁচেক শট নিয়ে তিনটের মধ্যে কাজ শেষ করে দিলেন।

কিন্তু বাকি কাজ কবে হবে ?

আর এই রমণীমোহনকে দিয়ে আদৌ কাজ চলবে কি ? নাকি, শেষ মুহূর্তে অন্য অভিনেতা দেখতে হবে ?

আমার বস মিঃ মুস্তোফি আমায় ডেকে বললেন, 'তুমি একবারটি ওই ছোকরার বাড়িতে গিয়ে সঠিক খবরটা নিয়ে এসো তো। সে নিজে কী মনে করে সেটা জানা দরকার। সে ফ্র্যাঙ্কলি বলুক সে পারবে কি না। যদি কদিন সময় চায় তাও দিতে রাজি আছি, কারণ চেহারার দিক দিয়ে ওকে মানিয়েছিল চমৎকার। হয়তো জড়তাটা টেম্পোরারি। অবিশ্যি দ্বিতীয় দিনেও এই একই ব্যাপার ঘটলে অন্য লোক নিতেই হবে।'

মুস্তোফি সাহেব যেন একবার ভুরু কুঁচকে আমার দিকে চাইলেন, ভাবটা যেন—একে দিয়েও তো কাজটা চলতে পারত। কিন্তু তারপর আর কিছু বললেন না, আর আমিও চেপে গেলুম।

দুদিন পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রমণীমোহনের ট্যাগোর কাসল রোডের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। বেয়ারা আমায় বৈঠকখানায় বসানোর এক মিনিটের মধ্যে বাবু এসে ঢুকলেন। দেখলুম এই কদিনে ওর বয়স যেন বেড়ে গেছে দশ বছর। বললুম, 'কী ব্যাপার বলুন তো ? এরকম হল কেন ?

ভদ্রলোক গভীর আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'কী আর বলব বলুন, শুটিং-এর তিনদিন আগে আমার এক বন্ধু এক জ্যোতিষী এনে হাজির করে বলল—"নতুন কাজে হাত দিতে যাচ্ছ, এঁকে দিয়ে একবার ভাগ্যটা যাচাই করে নাও।' আমিও আপত্তি করলুম না, কারণ ওসবে আমার বেশ আস্থা আছে। আর এঁর নাকি জ্যোতিষার্ণব-টার্ণব উপাধি আছে, চেহারাও বেশ ইমপ্রেসিভ। কিন্তু মশাই, হাত দেখার আগেই আমার মাথার দুদিকের রগ বুড়ো আর কড়ে আঙুলে টিপে লোকটা কী বললে জানেন ? বললে, "এ লাইন তোমার নয়। অভিনয়ের দিকে যেও না; গেলেই হোঁচট খেতে হবে।"—ভেবে দেখুন তো কী কথা ! তিনদিন বাদে শুটিং, পার্ট মুখস্থ হয়ে গেছে, আর লোকটা বলে কি না আমায় দিয়ে অ্যাকটিং হবে না ? সাধে কি ডায়ালগ গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল ? যেই মুখ খুলতে যাব অমনি জ্যোতিষীর মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছে, আর কে যেন গলার ভেতর পাথর গুঁজে দিচ্ছে। ওফ্ ! সে যে কী অবস্থা, সে আর আপনাকে কী করে বোঝাব ? রাজ্যি সুদ্ধু লোক জেনে গেছে আমি আলমগীর করছি আর সেই সময় অকেজো বলে বাদ হয়ে যাওয়া—এর চেয়ে বেশি অপমান আর কী হতে পারে বলুন ?'

আমি আর কী করি ? যথাসাধ্য সহানুভূতি দেখালুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'কী করলে পরে এই বিভীষিকা আপনার মন থেকে দূর হতে পারে ? কারণ আপনার মধ্যে যে অ্যাকটিং আছে সে তা আমরা রিহার্সেলেই দেখেছি।'

রমণীমোহন মাথা নাড়ল। ঘাড় হেঁট ছিল, এবার মুখ তোলাতে দেখলুম চোখে জল। আমার হাত দুটো ধরে অত্যন্ত করুণ সুরে বললে, 'কতদিনের যে স্বপ্ন সিনেমায় অভিনয় করে নাম করব ! আর সেই সুযোগ এসেও গ্রহের ফেরে বানচাল হয়ে গেল ! এখন আপনি যদি কোনও রাস্তা বাতলাতে পারেন। আমার নিজের মাথায় একটা রাস্তা এসেছে কিন্তু সেটা সভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব বুঝতে পারছি না।'

আমি বললুম, 'নির্ভয়ে বলুন।'

রমণীমোহন কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আপনার অভিনয় আসে ?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?'

'কারণ আমার সঙ্গে আপন্যার চেহারার মিল আছে। সে কথা আমার বেয়ারা প্রসন্নও বলছিল। ভাবছিলুম, আমার বদলে আপনি যদি আমার বাড়ি থেকে মেক-আপটা করে নিয়ে পোশাকটা পরে আমার হয়ে অভিনয়টা করে দিয়ে আসতেন। অবিশ্যি, কিছু লোককে ব্যাপারটা বলতেই হবে। যেমন মেক-আপ-ম্যান যতীন, তার সহকারী হাবুল, আর ড্রেসার তারাপদ। তাদের হাতে কিছু গুঁজে দিলে তারা কখনওই ব্যাপারটা ফাঁস করবে না।'

আমি বললাম, 'তার মানে অভিনয় করবেন তারিণী বাঁড়ুজ্জে আর নাম হবে রমণী চ্যাটুজ্যের ?'

'এ-ছাড়া আর রাস্তা আছে কি ?'

'আর প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাজটা কে করবে ?'

'সেটার একটা অন্য ব্যবস্থা করবে ওরা। আপনি বলে দেবেন বোম্বাই থেকে একটা ভাল অফার পেয়েছেন, তাই চলে যাচ্ছেন।'

'কথাটা মন্দ বলেননি। কিন্তু যদি অভিনয় আমার ভাল হয়, আর তার জন্য যদি কোনও সংস্থা পুরস্কার ঘোষণা করে, তা হলে সেটাও তো আপনিই নেবেন ?'

'তা তো নিতেই হবে। তবে আপনাকে পারিশ্রমিক ছাড়াও আমি একটা জিনিস দিতে রাজি আছি।'

'কী জিনিস ?'

'আমার এই মোগলাই আংটি। আজকের বাজারে এর দাম কত জানেন তো ?'

পুরনো ভাল জিনিসের উপর আমার মোহ আছে সেটা তো তোরা জানিস। সেটা তখনও ছিল। বলে দিলুম 'ঠিক হ্যায়। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি। কিন্তু সবচেয়ে আগে আপনার চিত্রনাট্যটি চাই। ডায়ালগ মুখস্থ করতে হবে তো।'

রমণীমোহন তৎক্ষণাৎ তাঁর ফাইলটা এনে আমায় দিলেন।

সেইদিনই বিকেলে মিঃ মুস্তোফির কাছে গিয়ে বললুম যে রমণীমোহন আরেকটা চান্স চাইছে। বলছে, এবার না হলে যেন তাকে বাদ দেওয়া হয়। মুস্তোফি মশাই রাজি হয়ে গেলেন, ওদিকে পরিচালক মশাইকেও খবরটা দিয়ে দেওয়া হল।

রমণীমোহনকে সুস্থ হবার সময় দিয়ে পনেরো দিন পরে শুটিং রাখা হল। অন্যদের কাজের তারিখ আর স্টুডিওর বুকিংও সেভাবে বদলে দেওয়া হল। যাদের দলে টেনে নেবার কথা তাদের সকলকেই তালিম দেওয়া হয়ে গেছে। আমার জায়গায় নতুন প্রোডাকশন ম্যানেজার এসে গেছে। তাঁকেও দলে টেনে নিয়েছি, কারণ প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাছে কোনও কিছু লুকোনো বড় কঠিন ব্যাপার। আমি মুস্তোফি মশাইকে অবিশ্যি জানিয়ে দিয়েছি যে একটা ভাল চান্স পেয়ে বোম্বে চলে যাচ্ছি, এ ছবিতে আর আমার কাজ করা সম্ভব হবে না।

যথারীতি শুটিং-এর দিন এসে পড়ল। সকাল দশটায় রমণীমোহনের লাল শেভ্রোলে এসে ঢুকল ভারত মাতা স্টুডিওতে। তার থেকে আলমগীরের বেশে নামলেন তারিণী বাঁড়ুজ্জে—কার বাপের সাধ্যি ধরে যে অ্যাকটর চেঞ্জ হয়ে গেছে !'

সেই একই দৃশ্য তোলা হবে, সব তৈরি, সবাই তৈরি, 'স্টার্ট সাউন্ড' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন পরিচালক। সাউন্ডম্যানের কাছ থেকে উত্তর এল 'রানিং'।

'অ্যাকশন।'

আলমগীর তাঁর বাবার সামনে এসে অত্যন্ত সাবলীলভাবে তাঁর কথা বলে গেলেন ; শট-এর শেষে পরিচালক 'কাট' বলতেই হাততালিতে স্টুডিও গমগম করে উঠল।

সারাদিনের তেরোটি শট-এর একটিতেও রমণী-তারিণী ঠেকলেন না।

ছবি শেষ হতে লাগল পাঁচমাস। তোরা তখন জন্মাসনি তাই তোদের খবরটা দিতে হচ্ছে যে আলমগীর হয়েছিল সুপারহিট, আর রমণীমোহন বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে তিনটে সংস্থা থেকে পুরস্কার পেয়েছিলেন। অবিশ্যি তাঁর কেরিয়ারের শুরু এবং শেষ এই একটি ছবিতে, কারণ তাঁর গুরু তাঁকে ফিল্মে অভিনয় করতে বারণ করায় সে প্লাস্টিকের ব্যবসায় চলে যায়। আর আমি হয়তো

নিজের নামে ছবিতে একটা চান্স নিতে পারতুম, কিন্তু তখনই উদয়পুরে একটা ভাল চাকরি জুটে গেল। আমার কাছে তখন থেকেই নতুন দেশ দেখার চেয়ে বড় আর কিছু নেই, তাই আর দ্বিধা না করে পাড়ি দিলুম রাজস্থানে। অবিশ্যি সেটা আরেক গল্প।

'তা হলে সেটাও হোক।' বলল ন্যাপলা।

'তা কী করে হবে,' বললেন তারিণীখুড়ো, 'আগে যেটা বলছি সেটা শেষ হোক।'

আমরা তো অবাক। এ গল্পে আর কী থাকতে পারে?

'আমি যে দ্বৈত ভূমিকা বা ডবল পার্ট করেছিলুম সেটাই তো তোদের বলা হয় নি।' বললেন তারিণীখুড়ো, তাঁর ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি।

'কীরকম, কীরকম?' আমরা সকলে একসঙ্গে বলে উঠলাম।

'আমার বন্ধু ব্রতীনকে দিয়ে রমণীমোহনকে আমিই বলালুম যে নতুন কাজে নামার আগে একবার ভাগ্য গণনা করিয়ে নাও। তখন ব্রতীনই তো জ্যোতিষার্ণবকে নিয়ে যায় রমণীমোহনের কাছে। কে সেই জ্যোতিষার্ণব? হুঁ হুঁ—স্বয়ং তারিণীচরণ বাঁড়ুজ্জে। নিজের হাতে তৈরি মেক-আপ, নিজের হাতে লেখা সংলাপ। বাজিমাত না হয়ে যায় কোথায়?'

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৯২

আমি ভূত

আমি ভূত। আজ থেকে ঠিক সাড়ে তিন বছর আগে আমি জ্যান্ত ছিলাম। সেই সময় এই দেওঘরের এই বাড়িতেই আগুনে পুড়ে আমার জ্যান্ত অবস্থার শেষ হয়। এই বাড়ির নাম লিলি ভিলা। আমি এখানে এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ছুটি কাটাতে। একদিন স্টোভে চা করতে গিয়ে স্টোভ ফেটে আমার কাপড়ে আগুন ধরে যায়! আমার মুখেও আগুন লেগেছিল এইটুকু আমার মনে আছে। তারপর আর কিছু মনে নেই। তারপর থেকে আমি এই বাড়িরই বাসিন্দা হয়ে গেছি। আমার চেহারা এখন কীরকম তা আমি নিজে জানি না, কারণ আয়নায় ভূতের ছায়া পড়ে না। জলেও যে পড়ে না সেটা বাঁড়ুজ্যেদের পুকুরে পরখ করে দেখেছি। খুব যে আহামরি চেহারা নয় সেটা বুঝেছি একটা ঘটনা থেকে। লিলি ভিলায় দু' বছর আগে একটা পরিবার ছুটি কাটাতে এসেছিল। সেই পরিবারের কর্তা একদিন আমার মুখোমুখি পড়ে গিয়ে চোখ কপালে তুলে ভিরমি গিয়েছিলেন। দোষটা আমারই; ভূত দেখা দেবে কি অদৃশ্য থাকবে সেটা ভূতের মর্জির উপরই নির্ভর করে। আমি অদৃশ্য থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অন্যমনস্কতার ফলে ভুল করে দেখা দিয়ে ফেলেছিলাম। এই ঘটনার পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আগুনে পুড়ে শরীর আর মুখের যে অবস্থা হয়েছিল, ভূত হয়েও সেই অবস্থাটাই রয়ে গেছে।

এই ভিরমি দেবার ঘটনার পর থেকেই এ বাড়িতে আর কেউ আসে না, কারণ হানাবাড়ি বলে এটার একটা বদনাম রটে গেছে। আমার পক্ষে এটা লোকসান, কারণ বাড়িতে জ্যান্ত লোকজন থাকলে আমার বেশ ভালই লাগে। না হলে তো সেই একা একা দিন কাটানো। ভূত এ তল্লাটে আরও অনেক আছে, কিন্তু এ বাড়িতে তো নেই, কারণ এখানে আর কেউ কখনও অপঘাতে মরেনি। শহরের অন্য জায়গায় যে ভূত আছে তাদের সকলকে আমার পছন্দ নয়। কয়েকজন তো রীতিমতো মন্দ। যেমন নস্করদা, বা ভীম নস্করের ভূত। ওর মতো কুচক্রী ফন্দিবাজ ভূত দুনিয়ায় দুটো হয় না। এই দেওঘরে কিছুদিন আগে লক্ষ্মণ ত্রিপাঠী বলে এক পোস্টমাস্টার ছিলেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্পর্ক ছিল স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারী কান্তিভাই দুবের। এক সন্ধ্যায় লক্ষ্মণ ত্রিপাঠী পোস্টাপিস থেকে বাড়ি ফিরছেন; শা-বাবুদের

বাড়ি পেরিয়ে মাঠটার কাছে আসতেই ভীম নস্করের ভূত করল কি, ঝপ করে একটা তেঁতুল গাছ থেকে নেমে ত্রিপাঠী মশাইয়ের ঘাড়টা মটকে দিল। তারপর সে কী হই-হুল্লোড়!—থানা দারোগা কোর্ট কাচারি মামলা মকদ্দমা, সব শেষে ফাঁসি পর্যন্ত। কার ফাঁসি? লক্ষ্মণ ত্রিপাঠীর দুশমন কান্তিভাই দুবের। যে-খুনটা করল ভীম নস্করের ভূত, ঘটনাচক্রে সেই খুনের জন্য দায়ী হল কান্তিভাই দুবে। এই উদোর বোঝা যে বুধোর ঘাড়ে চাপবে সেটা জেনেশুনেই নস্করের ভূত করেছিল কাণ্ডটা। আমি বাধা দিয়ে নস্করদাকে বললাম যে তুমি কাজটা ভাল করোনি। ভূত হয়েছ বলেই যে জ্যান্ত মানুষের অপকার করতে হবে এমন তো কোনও কথা নেই। তুমি তোমার রাজ্যে তোমার ধান্দা নিয়ে থাকো, আর জ্যান্তরা থাকুক তাদের ধান্দা নিয়ে। দুই জগতে ঠোকাঠুকি হলেই যত অনাসৃষ্টি।

আমি নিজে সজ্ঞানে কোনও জ্যান্ত মানুষের অনিষ্ট করতে যাইনি। বিশেষ করে যেদিন থেকে বুঝেছি যে আমার চেহারাটা মানুষের মনে আতঙ্ক জাগায়, সেদিন থেকে আমি একদম সাবধান। লিলি ভিলার পিছনে আম-কাঁঠাল বনের একপাশে একটা পুরনো ভাঙা মালির ঘর আছে, সেইখানেই আমি পড়ে থাকি বেশির ভাগটা সময়। অবিশ্যি লিলি ভিলা এখন অনেকদিন থেকেই খালি; কিন্তু কাছেই চৌধুরী বাড়ি থেকে ছেলেরা এখানে লুকোচুরি খেলতে আসে। আশ্চর্য, এই ছেলেগুলোর একদম ভূতের ভয় নেই। কিংবা হয়তো ভূত আছে জেনেই তারা এখানে আসে। যাই হোক, সেই সময়টা আমাকে একদম অদৃশ্য থাকতে হয়। বড়রাই যদি আমাকে দেখে ভিরমি যায়, তা হলে ছোটদের কী অবস্থা হবে ভাবো তো! না; ওসবের মধ্যে আমি নেই।

তবে এটাও ঠিক যে, ভূতদেরও একা-একা লাগে। আমারই একটা গলতির জন্য লিলি ভিলা এখন হানাবাড়ি। তাই এখানে কেউ এসে থাকতে চায় না; আর আমিও জ্যান্ত মানুষের গলার আওয়াজ, তাদের চলাফেরা কাজকর্ম হাসি-তামাশার শব্দ কিছুই পাই না। তাই মনটা এক-একসময় হু হু করে ওঠে। জ্যান্তরা যদি জানত যে ভূতরা তাদের সান্নিধ্য কত পছন্দ করে, তা হলে কি তারা ভূতকে এত ভয় পেত? কখনওই না।

কিন্তু লিলি ভিলাতেও শেষ পর্যন্ত লোক এসে হাজির হল। একদিন সকালে একটা সাইকেল রিকশার হর্ন শুনে ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে দেখি রিকশা থেকে মাল নামছে। ক'জন লোক? দু'জন। একজন বাবু, আর একটি চাকর। তাই সই। বেশি লোকের দরকার নেই আমার। নাই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

ভূতরা দূর থেকেই খুব স্পষ্ট দেখতে পায়, তাই বলছি—বাবুটির বয়স বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি, বেঁটে, মাথায় টাক, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, ঘন ভুরু, আর ভ্রূকুটি করা চোখ। বাড়িতে ঢুকেই চাকরটিকে বাবু বললেন, 'সব দেখেশুনে বুঝে নাও। আধঘণ্টার মধ্যে আমার চা চাই। তারপর আমি কাজে বসব।'

এই কথাগুলো অবিশ্যি আমি মালির ঘর থেকেই শুনতে পেলাম। আমরা যেমন দেখি বেশি, তেমনই শুনিও বেশি। আমাদের চোখ কান দুটোই যেন দূরবিনের মতো কাজ করে।

চাকর আধঘণ্টার মধ্যেই বাবুকে চা বিস্কুট এনে দিল। বাবু তখন বাগানের দিকের ঘরটায় তাঁর বাক্স খুলে জিনিসপত্র বার করে গুছিয়ে রাখছেন। জানালার সামনে একটা টেবিল-চেয়ার। তার উপর দোয়াত কলম কাগজ সব রাখা হয়েছে।

ইনি তা হলে লেখক। খুব নামকরা লেখক কি?

হ্যাঁ, তাই।

ভদ্রলোক আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেওঘরের জনা আষ্টেক বাঙালি এসে হাজির হল লিলি ভিলাতে। তখনই জানলাম ভদ্রলোকের নাম নারায়ণ শর্মা। আসল নাম না ছদ্ম তা জানি না, তবে এই নামেই সকলে তাঁকে ডাকে। বাঙালির দল নারায়ণবাবুকে দেওঘরে পেয়ে কৃতার্থ। এতবড় একজন কাউকে তো সবসময় পাওয়া যায় না। তাই, যদি ভদ্রলোকের আপত্তি না থাকে, তা হলে এখানকার সকলে তাঁকে একদিন সংবর্ধনা জানাতে ইচ্ছুক।

নারায়ণ শর্মা লোকটি দেখলাম বেশ কড়া। বললেন, 'এখানে নিরিবিলিতে কাজ করতে পারব বলে কলকাতা ছেড়ে এলাম, আর আসামাত্র আপনারা এসে সংবর্ধনার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন?'

এ-কথায় অবিশ্যি সকলেই একটা কাঁচুমাচু ভাব করলেন। তাতে আবার নারায়ণ শর্মা নিজেই নরম হয়ে বললেন, 'বেশ, আমাকে দিন পাঁচেক একটু নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করতে দিন, তারপর হবেখ'ন সংবর্ধনা। বেশি বিব্রত করলে কিন্তু আমি আবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে কলকাতা ফিরে যাব।'

এই সময় ঘোষ বাড়ির কর্তা নিতাইবাবু হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলেন যেটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। তিনি বললেন, 'এখানে এত বাড়ি থাকতে আপনি লিলি ভিলায় এসে উঠলেন কেন?'

নারায়ণবাবুর মুখে এই প্রথম হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'হানাবাড়ি বলে বলছেন তো? তা, ভূত যদি আসে তা হলে তো ভালই, একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে।'

'আপনি বোধহয় আমাদের কথাটা সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না,' বললেন হারু তালুকদার। 'কলকাতার এক ডাক্তার এখানে সপরিবারে এসেছিলেন। ভদ্রলোক নিজের চোখে দেখেছিলেন ভূত। আর সে

নাকি বীভৎস ব্যাপার। প্রায় পনেরো মিনিট পরে জ্ঞান ফেরে ভদ্রলোকের। এখানে ভাল ডাকবাংলো আছে; ম্যানেজার আপনার খুব ভক্ত। বললে উনি নিজে সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনি লিলি ভিলা ছাড়ুন।'

এইবার নারায়ণ শর্মা একটা অদ্ভুত কথা বললেন।

'আপনারা বোধহয় জানেন না যে, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যতটা জানি ততটা খুব কম লোকেই জানে। আমার এখানকার লেখার বিষয়ও হচ্ছে ওই প্রেততত্ত্ব। সেই ডাক্তারের অবস্থায় আমাকে কোনওদিন পড়তে হবে না এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। তিনি ভূতের বিরুদ্ধে কোনও প্রি-কশন নেননি, কোনও ব্যবস্থা করেননি; আমি সেটা নেব এবং করব। ভূত আমার কিছু করতে পারবে না। আপনারা সদুদ্দেশ্য নিয়েই উপদেশ দিতে এসেছেন তা জানি, কিন্তু আমি এই লিলি ভিলাতে থেকেই কাজ করতে চাই। এ বাড়িতে আমি ছেলে বয়সে এসেছি। তখনকার অনেক স্মৃতি আমার এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।'

ভূতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার কথাটা আমি এই প্রথম শুনলাম। কথাটা ভাল লাগল না। আর প্রেততত্ত্ব? ভূত নিয়েও তত্ত্ব হয় নাকি? এসব কী বলছেন নারায়ণ শর্মা?

অবিশ্যি এখন এসব ভেবে কোনও লাভ নেই। রাতটা আসুক; আপনা থেকেই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে বলে আমার বিশ্বাস।

তবে এই ব্যবস্থার কথাটা শুনে অবধি আমার মন বলছিল যে খবরটা একবার—অন্তত মজা দেখার জন্যও—ভীম নস্করকে জানানো উচিত। সে জ্যান্ত মানুষের ঘাড় মটকাবার কায়দা রপ্ত করেছে; না জানি সে এ খবর শুনে কী বলবে!

বেলা যতই বাড়তে লাগল ততই আমার ছটফটানিও বেড়ে চলল। শেষটায় আর না পেরে অদৃশ্য অবস্থায় মল্লিকদের দুশো বছরের পুরনো পোড়ো বাড়িটায় গিয়ে নস্করদার নাম ধরে ডাক দিলাম। সে দোতলার পুবদিকের ছাত ভাঙা ঘরটা থেকে হাওয়ায় ভেসে নীচে এসে বেশ কড়া সুরেই বলল, 'এই অসময়ে কেন?'

আমি তাকে নারায়ণ শর্মার কথাটা বললাম। শুনে নস্করদা প্রচণ্ড ভ্রূকুটি করে বলল, 'বটে? বলি, ব্যবস্থা কি সে একাই করতে পারে? আমরা পারি না?'

'কী ব্যবস্থা করবে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। আমি বুঝেছিলাম যে নস্করদার মাথায় ফন্দি খেলছে।

নস্করদা বলল, 'কেন? বেঁচে থাকতে বত্রিশ বছর ধরে ব্যায়াম করেছিলুম—ডন বৈঠক মুগুর ডামবেল চেস্ট-এক্সপান্ডার কিছুই বাদ দিইনি। নারায়ণ ছোকরার ঘাড় মটকাবার শক্তি কি আমার নেই?'

ব্যায়াম যে সে করত সেটা ভীম নস্করকে দেখলেই বোঝা যায়। সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল; তাতে তার দেহের কোনও বিকার ঘটেনি; তাই এখনও হাত পা নাড়লে শরীরে মাংসপেশি ঢেউ খেলে যায়। আমি বললাম, 'তা হলে?'

আমি জানি যে আমার হৃৎপিণ্ড থাকলে তা এখন ধুকপুক করত।

'তা হলে আর কিছুই না,' বলল নস্করদা। 'আজ রাত বারোটায় নারায়ণ শর্মার আয়ু শেষ। ভূতের সঙ্গে চালাকি করলে আর যেই করুক, ভূত কখনও ক্ষমা করবে না।'

বাকি দিনটা যে কীভাবে কাটল তা আমিই জানি। এদিকে নারায়ণ শর্মা সারাদিন তাঁর ঘরে বসে লিখেছেন। বিকেলে সূর্য ডোবার বেশ কিছু আগে ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে উত্তরের রাস্তাটা ধরে বেশ খানিক হেঁটে আকাশে সন্ধেতারাটা বেরোবার কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি ফিরলেন। আজ অমাবস্যা, তাই চাঁদ নেই।

আমি আমার ডেরা থেকে সবই লক্ষ করে যাচ্ছি। এবার নারায়ণ শর্মাকে দেখলাম একটা অদ্ভুত জিনিস করতে। সুটকেস খুলে একটা থলে বার করে তার থেকে একটা গুঁড়ো জিনিসের এক মুঠো নিয়ে একটা ধুনুচির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাতে আগুন দিয়ে ধুনুচিটা ঘরের দরজার চৌকাঠের বাইরে রেখে দিলেন। সেই ধুনুচি থেকে গলগল করে ধোঁয়া উঠতে লাগল, আর দক্ষিণের হাওয়া সেই ধোঁয়াকে সোজা এনে ফেলল আমার ডেরায়।

বাপ্ রে—এ কী ব্যবস্থা! ভূতেরা কোনও গন্ধ পায় না, কিন্তু এ গন্ধ দেখছি নাকের মধ্যে দিয়ে একেবারে ব্রহ্মতালুতে পৌঁছে গেছে। এ কী সর্বনাশ! এ অবস্থায় নস্করদাও এই বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না।

আর সত্যিই তাই হল। মাঝরাত্তির নাগাদ আমার ঘরের পিছনের পাঁচিলের ওদিক থেকে চাপা গোঙানি শুনলাম—'সুধন্য! ও সুধন্য!'

সুধন্য আমার নাম।

বাইরে বেরিয়ে দেখি রাস্তার ধারে ঘাসের উপর নাক টিপে বসে আছে ভীম নস্কর। নাকিসুরেই কথা বলল সে—

'একুশ বছর হল গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে আমার, আর এই প্রথম জ্যান্ত লোকের কাছে হার মানতে হল। মানুষ যে এত কল করতে পারে সে তো আমার জানা ছিল না।'

'ও লোকটা পড়াশুনা করে, নস্করদা। ও অনেক কিছু জানে।'

'ও হো হো!—এমন একটা লোকের ঘাড় মটকাতে পারলে কী সুখ হত বল দিকিনি।'

'সে যে আর হবার নয় সে তো বুঝতেই পারছ।'

'তা পারছি। আজ আসি। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা হল বটে!'

নস্করদা চলে গেল, আর আমিও নিজের ঘরে ফিরে এলাম। আর তার পরেই বুঝতে পারলাম যে আমার ঘুম পাচ্ছে। ভূতের চোখে ঘুম—এ যে অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কিন্তু তা হলে কী হবে—ওই ধোঁয়াতে এমন জিনিস আছে যে, ভূতকেও ঘুম পাড়ায়। অথচ রাতই হল ভূতের চরে বেড়াবার সময়!

আমি আর থাকতে পারলাম না। একটা ঝিমধরা অবস্থায় ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল একটা গলার শব্দে। সময়টা সকাল।

আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম। বসেই সামনে তাকিয়ে চক্ষুস্থির। ইনি যে নারায়ণ শর্মা সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু এঁর এমন দশা হল কী করে?

নারায়ণ শর্মাই আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন।

'চাকরটা ঘুম থেকে ওঠেনি দেখে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে গেসলুম। স্টোভটা বার্স্ট করে। ওরা বোধ হয় ওদিকে আমার মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করছে। আমি একটা ডেরা খুঁজছিলুম, তখন এ ঘরটা দেখতে পাই। এখানে আরেকজনের ঠাঁই হবে কি?'

আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই হবে।'

যাক—দুই মুখ-পোড়ায় জমবে ভাল!

সন্দেশ, আষাঢ় ১৩৯২

রামধনের বাঁশি

রামধনের লোকটাকে চেনা চেনা লাগায় আরেকটু কাছে গিয়ে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখে তার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল। দশ বছর পেরিয়ে গেলেও চিনতে কোনও অসুবিধা নেই। এই সেই খগেশবাবু। খগেশ খাস্তগির, পুরনো ইটপাথর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন।

খগেশবাবুর সঙ্গে ছিলেন বকুলতলার সত্যপ্রকাশবাবু। তিনি বলছিলেন: 'কই, তেমন বদনাম তো কেউ দেয়নি এ বাড়ির। ভূতটুত এ তল্লাটে নেই। আপনি দুটো রাত এখানে অনায়াসে থাকতে পারেন। আর সঙ্গে যখন চাকর এনেছেন তখন ভাবনা কী? আপনি তো এদিকে এসেছেন আগে, দেখেছেন তো

কী চমৎকার সব মন্দির। সব দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো। আমাদের গাঁয়ে তো বড় একটা কেউ আসে না; আপনি অ্যাদ্দিন বাদে এলেন, এ আমাদের পরম ভাগ্য।'

এতদিন পর মানে দশ বছর। রামধনের মেজকাকার বন্ধু হলেন খগেশ খাস্তগির। ভদ্রলোক কলকাতায় থাকেন, প্রত্নতত্ত্ব না কী জানি চর্চা করেন, তার জন্যই বার কয়েক এই জামহাটি গাঁয়ের দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো পোড়া ইটের মন্দির দেখে গেছেন কয়েকবার। সেই নিয়ে তাঁর কিছু লেখাও কাগজে বেরিয়েছে মাঝে মাঝে।

খগেশবাবুর এই কাজ নিয়ে রামধনের মনে কৌতূহল জাগলেও সেই নিয়ে কোনওদিন কিছু বলার সাহস পায়নি। বাপরে বাপ—একটা ঘটনা সে কোনওদিন ভুলতে পারবে না। একবার খগেশবাবুর একটা পাথরের মূর্তি রামধন তুলে দেখতে গিয়ে সেটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল। এমনিতেই রগচটা লোক, তার উপর এত বড় একটা ক্ষতি। খগেশবাবু শাস্তি হিসেবে এক হাতে রামধনের চুলের মুঠি আর এক হাতে তার পাতলা কোমরটা ধরে মাথার উপর তুলে একটা আছাড় মেরেছিলেন। দশ দিন ছিল গায়ে ব্যথা।

রামধন ছিল অত্যন্ত নিরীহ মেজাজের ছেলে। খগেশবাবু যখন প্রথমবার তাদের বাড়িতে এসেছিলেন তখন রামধনের বয়স মাত্র সতেরো। তখন সকলে তাকে দিয়ে ফাইফরমাশ খাটিয়ে নেয় আর কথায় কথায় ধমক লাগায়। পোস্টাপিসে চিঠি ফেলে এসো—তাও রামধন; বিশু জ্যাঠাকে ইস্টিশনে পৌঁছে দিয়ে এসো—তাও রামধন; বাদলা হয়েছে, কেষ্টর দোকান থেকে পেঁয়াজি নিয়ে এসো—তাও রামধন। ফলে রামধনকে সর্বদাই তটস্থ হয়ে থাকতে হত। পান থেকে চুনটি খসলে আর রক্ষে নেই; বাড়ির বড় কর্তা থেকে শুরু করে তেরো বছরের ছোট ভাই বিষ্টুও তার দিকে চোখ রাঙিয়ে ছাড়া কথা বলে না।

খগেশবাবু অ্যাদ্দিন বাদে গাঁয়ে এসেছেন আর গাঙ্গুলীদের বাড়িতে একটা ঘর নিয়ে থাকছেন শুনে সত্যপ্রকাশবাবু সত্যিই গদ্গদ্ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আপনার কাজের দিক দিয়ে দোতলার দক্ষিণের ঘরটা সবচেয়ে সুবিধে হবে। আলোবাতাস দুইই আছে। জানলা দিয়ে গণ্ডকী পাহাড় দেখা যাবে। আপনি দিব্যি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবেন।'

এইরে—কেলেঙ্কারি! ওই দক্ষিণের ঘরে রামধনের বাঁশিটা রয়ে গেছে। বড় সাধের বাঁশি—রথের মেলা থেকে চার আনায় কেনা। সে কী আজকের কথা? সেই বাঁশি রামধন গাঁয়ের উত্তরের মাঠে গিয়ে একটা নোনা বাদাম গাছের তলায় বসে বাজায়! এইভাবে তার কত সময় কেটে গেছে। বাড়িতে থাকে সে খুব কম সময়টুকু; বেশির ভাগই একা একা মাঠে ঘাটে টোটো করে বেড়ায়। এই নিয়ে কেউ আর আপত্তিও করে না। সেই ভাল। সারা জীবন অনেকের অনেক ফরমাশ সে খেটেছে; এখন তার ছুটি।

কিন্তু বাঁশিটা কী হবে? ওই বাঁশির জাতই যে আলাদা। এত বছর ফুঁয়ে ফুঁয়ে ওর এমন গলা খুলেছে যেমন আর কোনও নতুন বাঁশিতে খুলবে না। এখন উপায় হচ্ছে তক্কে তক্কে থাকা। খগেশবাবু একবার বাড়ি থেকে বেরোলে পর টুক করে গিয়ে বাঁশিটা নিয়ে আসা যাবে। ওর সামনে পড়া কোনওমতেই চলবে না। কে জানে, হয়তো দশ বছর আগের রাগ ভদ্রলোক এখনও পুষে রেখেছেন। চেহারায় যে দশ বছরে খগেশবাবুর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি সেটা রামধন প্রথমেই লক্ষ করেছে।

খগেশবাবু এসেছিলেন সকালে। সারা দুপুর তিনি ঘর থেকে বেরোলেন না। সূর্যি যখন প্রায় ডুবুডুবু তখন কাঁঠাল গাছের আড়াল থেকে রামধন দেখল যে খগেশবাবু আড় ভাঙতে সামনের দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এবার বেরোবেন কি ভদ্রলোক? রামধন নিজেকে আরেকটু ভাল করে আড়াল করল গাছটার পিছনে।

খগেশবাবু আবার ভিতরে চলে গেলেন। তারপর একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনের রাস্তাটা ধরে পুবে রওনা দিলেন। হাঁটার মেজাজ দেখেই বোঝা যায় তিনি সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন।

রামধন দু' মিনিট অপেক্ষা করে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। চাকরটাকেও এড়াতে হবে, না হলে আবার চোর ভেবে হল্লা শুরু করবে।

চাকরটাও ছিল একতলায় রান্নাঘরে। রামধন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সোজা দক্ষিণের ঘরের দিকে গেল!

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। ঘুরে গিয়ে বারান্দার দিকের জানালা দিয়ে ঢুকতে হবে। অবিশ্যি সে জানলা যদি খোলা থাকে।

হ্যাঁ—জানালা খোলা।

রামধন ঢুকল ঘরে। চারিদিকে টেবিলের উপর নানারকম পাথরের মূর্তি ছড়ানো। তাছাড়া রয়েছে কাগজপত্র কলম পেনসিল দোয়াত ছবি।

কিন্তু বাঁশিটা নেই। অন্তত সেটা যে কুলুঙ্গিটার মধ্যে রাখা ছিল তার মধ্যে এখন রয়েছে একটা লণ্ঠন।

বাইরে মেঘের গর্জন। রামধন এখানে আসবার আগেই দেখেছিল নৈঋত কোণে কালো মেঘ জমেছে। এখন মনে হচ্ছে সে মেঘ একেবারে মাথার উপর। ঝড়ও বইতে শুরু করেছে। বারান্দার জানলা দিয়ে কয়েকটা শিরীষ গাছের পাতা এসে ঢুকল।

রামধন এসে হন্যে হয়ে বাঁশিটা খুঁজছে। খাটের নীচে, বালিশের নীচে, টেবিলের দেরাজে, ঘুলঘুলিতে।

এমন সময় হঠাৎ সিঁড়িতে একটা পায়ের শব্দ।

রামধনের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে খগেশবাবু এখন ফিরে আসছেন বৃষ্টির উপক্রম দেখে।

তার সেই দশ বছর আগের কথা মনে পড়ে রামধনের বুকের রক্ত আবার হিম হয়ে গেল।

পায়ের শব্দ বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে এল।

রামধন একবার মনে করল যে বারান্দার দিকের জানলা দিয়ে পালাবে। কিন্তু কেন যেন তার শরীরে একটা অবশ ভাব এসে গেছে। তা ছাড়া তার বাঁশিটা তো এখনও পাওয়া যায়নি।

একটা মচ শব্দ করে দরজার তালাটা খুলল, আর তারপরেই দরজাটা খুলে গেল। রামধন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যা কপালে আছে হবে।

কিন্তু যা হবে ভেবেছিল তা তো হলই না, বরং হল তার উলটো।

দরজাটা খুলে রামধনকে সামনে দেখে খগেশবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল, আর তিনি ভিরমি দিয়ে সটান পড়লেন্ মেঝের উপর। আর ঠিক সেই সময় তার কোটের পকেট থেকে রামধনের বাঁশিটা বেরিয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। রামধন সেটাকে তুলে নিয়ে খগেশবাবুর দেহ টপকে বাইরে এসে সটান সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে গেল।

সকলের কাছে ধমক খেয়ে এসেছে বলেই রামধন এটা বোঝেনি যে তাকে এখন দেখে খগেশবাবুর এই দশাই হবে। কারণ আজ থেকে দশ বছর আগে আজকেরই মতো একটা ঝড়ের সন্ধ্যায় মাথায় একটা কৎ-বেল প্রমাণ শিল পড়ে রামধন মাথা ফেটে অক্কা পায়।

তাঁর মেজাজ যতই ভারিক্কি হোক, চোখের সামনে রামধনের ভূতকে দেখে যে খগেশবাবু ভিরমি যাবেন তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

রচনাকাল: ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

জুটি

'আজ আমি একজন ফিল্মস্টারের কথা বলতে যাচ্ছি,' চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন তারিণীখুড়ো।

'কে তিনি? তাঁর নাম কী?' আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'তাঁর নাম তোরা শুনিসনি,' বললেন তারিণীখুড়ো। 'তিনি যখন রিটায়ার করেন তখন তোরা সবে জন্মেছিস।'

'তবু আপনি নামটা বলুন না', বললে নাছোড়বান্দা ন্যাপলা। 'আজকাল টেলিভিশনে অনেক পুরনো ফিল্মস্টারের ছবি আমরা দেখি।'

'তাঁর নাম হল রতনলাল রক্ষিত।'

'তা হলে তো ভালই হল', বললেন তারিণীখুড়ো। 'তাঁকে ছবিতে দেখে থাকলে গল্পটা আরও জমবে।'

'এটাও কি ভূতের গল্প?' ন্যাপলা জিজ্ঞেস করল।

'না, ভূত নয়। তবে ভূত বলতে তো শুধু প্রেতাত্মা বোঝায় না, ভূতের আরও মানে আছে। একটা মানে হল অতীত, অর্থাৎ যা ঘটে গেছে। ভবিষ্যতের উলটো। সেই অর্থে এটা ভূতের গল্প বলতে পারিস।'

'বেশ, তা হলে শুরু হোক।'

তাকিয়াটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তারিণীখুড়ো শুরু করলেন তাঁর গল্প—

রতন রক্ষিত রিটায়ার করেন ১৯৭০-এ সত্তর বছর বয়সে। শরীরটা হঠাৎ ভেঙে পড়েছিল, তাই ডাক্তার বললেন কমপ্লিট রেস্ট। তার আগে পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে একটানা অভিনয় করে গেছেন রক্ষিতমশাই। তার মানে সেই সাইলেন্ট যুগ থেকে। অগাধ টাকা করেছিলেন ছবি করে, আর সেই টাকার সদ্ব্যবহার কী করে করতে হয় সেটাও জানতেন। তিনখানা বাড়ি ছিল কলকাতায়। নিজে থাকতেন আমহার্স্ট স্ট্রিটে, আর অন্য দু'খানা ভাড়া দিয়ে দিয়েছিলেন।

এই রতন রক্ষিত কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, তাঁর একজন সেক্রেটারি চাই। আমি তখন কলকাতাতেই ছিলাম, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সারাজীবন টো টো করে ঘুরে নানান রোজগারের পন্থা ট্রাই করে সবে ভাবছি এবার ঘরের ছেলে যখন ঘরে ফিরেছি তখন সেটল করা যায় কিনা, এমন সময় বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। দিলুম অ্যাপ্লাই করে। রতন রক্ষিতের নামের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল, ভদ্রলোকের ছবিও দেখেছি বিস্তর। তা ছাড়া আমার যে সিনেমার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে সেটা তো তোরা জানিস।

দরখাস্তের রিপ্লাই এসে গেল সাতদিনের মধ্যে। আমার ডাক পড়েছে ইন্টারভিউ-এর জন্য।

গিয়ে হাজির হলুম রক্ষিত মশাইয়ের বাড়িতে।

জানি ভদ্রলোকের শরীর খারাপ, কিন্তু চেহারা দেখে সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। বেশ টান-টান চামড়া, ঝকঝকে দাঁতগুলো ওরিজিন্যাল বলেই মনে হল। প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ছবি দেখেছি কিনা। বললুম, পরের দিকের ছবি তো দেখেইছি, গোড়ার দিকেরও কিছু সাইলেন্ট ছবি দেখা আছে, যখন রক্ষিত মশাই কমিক ছবি করতেন।

উত্তর শুনে দেখলুম ভদ্রলোক খুশিই হলেন। বললেন, 'আমি গত কয়েক বছর ধরে আমার সব সাইলেন্ট ছবি সংগ্রহ করছি। আমার এই বাড়িতে একটি আলাদা ঘর আছে যেখানে এইসব ছবি দেখার জন্য একটা প্রজেক্টর বসিয়েছি এবং সে প্রজেক্টর চালাবার জন্য একটি লোকও রেখেছি। সাইলেন্ট ছবি আজকাল প্রায় পাওয়াই যায় না। জানেন তো, ফিল্মের গুদামে দু'বার দুটি অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সব বাংলা সাইলেন্ট ছবি পুড়ে যায়, ফলে সে সব ছবি এখন দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিই। তার ফলে জানতে পারি যে আমার অনেকগুলো সাইলেন্ট ছবি মীরচান্দানি নামে আমার এক প্রোডিউসারের গুদোমে সযত্নে রাখা আছে। তার কারণ আর কিছুই না, মীরচান্দানি যে শুধু আমার প্রোডিউসার ছিলেন তা নয়; তিনি ছিলেন আমার "ফ্যান"। মীরচান্দানি মারা গেছেন বছর চারেক আগে; তার ছেলেকে বলে আমি ছবিগুলো কিনে নিই। এই ভাবে বার বার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমি আমার সংগ্রহ তৈরি করি। অসুস্থতার জন্য আমাকে রিটায়ার করতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফিল্মের জগৎ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। এইসব পুরনো ছবি দেখে আমার সন্ধ্যাগুলো দিব্যি কেটে যায়। আপনার কাজ হবে আমার এই ফিল্ম লাইব্রেরির তদারক করা, ছবিগুলোর একটা ক্যাটালগ তৈরি করা, আর আমার সংগ্রহে নেই এমন ছবি খুঁজে বার করা। পারবেন তো?'

আমি বললাম, চেষ্টার ত্রুটি হবে না। যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে ক্যাটালগ করে ঠিক করে রাখা কঠিন কাজ নয়; যে ছবি নেই, তার সন্ধানের কাজটা অবিশ্যি সহজ নয়। রক্ষিত বললেন, 'আমি যে শুধু সাইলেন্ট ছবির কথা বলছি তা নয়, গোড়ার দিকের কিছু টকি ছবিও আমার সংগ্রহে নেই। আমার মনে হয় ধরমতলা পাড়ায় প্রযোজক-পরিবেশকদের অফিসে খোঁজ করলে সেসব ছবি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মোটকথা, আমার সংগ্রহে যেন কোনও ফাঁক না থাকে। বুড়ো বয়সে আমার অবসর বিনোদনের

পন্থাই হবে আমার নিজের পুরনো ছবি দেখা।'

চাকরি হয়ে গেল। অদ্ভুত মানুষ। ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছেন বছর পনেরো হল। দুই ছেলে আছে, দু'জনেই থাকেন দক্ষিণ কলকাতায়। এক মেয়ে থাকে এলাহাবাদে, স্বামী সেখানকার ডাক্তার। নাতি-নাতনিরা মাঝে মাঝে আসে দাদুর সঙ্গে দেখা করতে; ছেলেরাও যে আসে না তা নয়, তবে ফ্যামিলির সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই বললেই চলে। বাড়িতে থাকে দুটি চাকর, একটি রান্নার লোক, আর একটি খাস বেয়ারা, নাম লক্ষ্মীকান্ত! লক্ষ্মীকান্ত বাঙালি, বয়স ষাটের উপর এবং অত্যন্ত অনুগত। এমন একজন বেয়ারা পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা।

এবং লক্ষ্মীকান্তের সাহায্যে কাজ করে আমি দিন দশেকের মধ্যে রক্ষিত মশাইয়ের সংগ্রহের একটা ক্যাটালগ করে দিলাম। তা ছাড়া ধরমতলায় ঘুরে উনি টকির আদি যুগে যে সব ছবি করেছিলেন তার অনেকগুলোর হদিস জোগাড় করে দিলাম। ভদ্রলোক সেগুলোর একটা করে প্রিন্ট কিনে নিজের লাইব্রেরিতে রেখে দিলেন।

আমার কাজ দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত; কিন্তু মাঝে মাঝে সন্ধ্যাটাও রক্ষিত মশাইয়ের সঙ্গে কাটিয়ে যাই। সাড়ে ছ'টায় ভদ্রলোক ছবি দেখতে শুরু করেন, থামেন সাড়ে আটটায়। প্রোজেকশনিস্টের নাম আশুবাবু, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, কাজে কোনও ক্লান্তি নেই। দর্শক মাত্র তিনজন—রক্ষিত মশাই, বেয়ারা লক্ষ্মীকান্ত, আর আমি। বেয়ারাকে থাকতে হয়, কারণ বাবু গড়গড়ায় তামাক খান; সেই তামাক মাঝে মাঝে ফিরিয়ে দিতে হয়। তবে লক্ষ্মীকান্ত যে ছবিগুলো উপভোগ করে সেটা অন্ধকারে তার মুখের দিকে চেয়ে আমি বুঝেছি।

সবচেয়ে মজা লাগে যখন সাইলেন্ট যুগের ছবিগুলো দেখানো হয়। আগেই বলেছি যে রতন রক্ষিত সেই সময় হাসির ছবি করতেন। এইসব ছবির মধ্যে অনেকগুলো ছিল যাকে বলে শর্ট ফিল্ম। দু' রিলের ছবি, কুড়ি মিনিট ছিল তাদের দৈর্ঘ্য। এই ছবিতে দেখানো হত লরেল-হার্ডির মতো এক জুটির কীর্তিকলাপ। ছবিতে তাদের নাম ছিল বিশু আর শিবু। বিশু সাজতেন রতন রক্ষিত, আর শিবুর পার্ট করতেন শরৎ কুণ্ডু নামে এক অভিনেতা। দুই কমিক অভিনেতার হইহুল্লোড়ে বিশ মিনিট দেখতে দেখতে বেরিয়ে যেত। কখনও তারা ব্যবসাদার, কখনও জুয়াড়ি, কখনও সার্কাসের ক্লাউন, কখনও জমিদার আর মোসাহেব—এইরকম আর কি? কুণ্ডু-রক্ষিতের এই জুটি তখন খুব পপুলার হয়েছিল এটা মনে আছে। বড় ছবির আগে এই কুড়ি মিনিটের শর্ট ফিল্ম দেখানো হত।

এই ছবি চলার সময় দেখবার জিনিস হত রক্ষিত মশাইয়ের হাবভাব। নিজের ভাঁড়ামো দেখে তিনি নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়তেন। কোনও কমিক অভিনেতা যে নিজের অভিনয় দেখে এত হাসতে পারে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁর দেখাদেখি অবিশ্যি আমাকেও হাসতে হত। রক্ষিত মশাই বলতেন, 'জানো তারিণী, এইসব ছবি যখন করেছি, তখন এগুলো দেখে মোটেই হাসি পায়নি। বরং নির্লজ্জ ভাঁড়ামো দেখে বিরক্তই লাগত। কিন্তু এতদিন পরে দেখছি এর মধ্যে একটা নির্মল হাস্যরস আছে, যেটা আজকের হাসির ছবির তুলনায় অনেক ভাল।'

একটা প্রশ্ন কিছুদিন থেকে আমার মাথায় ঘুরছিল, একদিন সেটা রক্ষিত মশাইকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম। বললাম, 'একটা ব্যাপারে আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে; আপনি তো বিশু সাজতেন, কিন্তু শিবু যিনি সাজতেন সেই শরৎ কুণ্ডুর কী হল? তাঁর সঙ্গে আপনার কোনও যোগাযোগ নেই?'

রক্ষিত মশাই মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি যতদূর জানি, শরৎ কুণ্ডু সাইলেন্ট যুগের পর আর ছবিতে অভিনয় করেনি। আমরা যখন একসঙ্গে কাজ করেছি তখন আমাদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। ভেবে ভেবে নানারকম ভাঁড়ামোর ফন্দি বার করতুম দুজনে। ডিরেক্টর যিনি ছিলেন তিনি নাম-কা-ওয়াস্তে। ছবির সঙ্গে মালমশলা সব আমরাই জোগাতুম। তারপর একদিন কাগজে দেখলুম হলিউডের ছবিতে শব্দ যোগ হচ্ছে, পাত্র-পাত্রীরা এবার থেকে কথা বলবে, আর সেই কথা দর্শকে শুনতে পাবে। সেটা ছিল ১৯২৮ কি '২৯ সাল। যাই হোক, হলিউডে সত্যিই টকি এসে গেল। আমাদের এখানে আসতে লাগল আরও তিন-চার বছর। সে এক হইহই ব্যাপার। সিনেমার খোল নলচে পালটে গেল। তার সঙ্গে অভিনয়ের রীতিও। আমার কিন্তু একটা থেকে আরেকটায় যেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। গলার স্বরটা ভাল ছিল, তাই টকি আমাকে হটাতে পারেনি। তখন আমার বয়স

ত্রিশ-বত্রিশ। বাংলা ছবিতে সুকণ্ঠ হিরোর দরকার। সেই হিরোর পার্টে আমি অনায়াসে খাপ খেয়ে গেলুম। বিশ মিনিটের ভাঁড়ামোর যুগ শেষ হয়ে গেল। আমি হয়ে গেলুম ছবির নায়ক। কিন্তু সেই সময় থেকেই শরৎ কুণ্ডু কেমন যেন হারিয়ে গেল। যদ্দূর মনে পড়ে, দু-একজনকে জিজ্ঞেসও করেছিলুম ওঁর কথা, কিন্তু কেউ সঠিক জবাব দিতে পারেনি। লোকটার অকালমৃত্যু হয়েছিল কিনা কে জানে।'

তাই যদি হয়, তা হলে অবিশ্যি অনুসন্ধান করার কোনও মানে হয় না। কিন্তু আমার মনে তাও একটা খটকা থেকে গেল। ঠিক করলুম যে শরৎ কুণ্ডু সম্বন্ধে খোঁজখবর চালিয়ে যেতে হবে। সত্যি বলতে কি, বিশ মিনিটের ছবিগুলো দেখে একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম যে, কমিক অভিনেতা হিসেবে রতন রক্ষিতের চেয়ে শরৎ কুণ্ডু কোনও অংশে কম ছিলেন না।

টালিগঞ্জ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে জানলুম যে নরেশ সান্যাল বলে এক ভদ্রলোক বাংলা ফিল্মের আদিযুগ নিয়ে রিসার্চ করছেন। ইচ্ছে, একটা প্রামাণ্য বই লেখার। ভদ্রলোকের ঠিকানাটাও জোগাড় হল। তারপর এক রবিবার সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। ভদ্রলোক বললেন যে, হ্যাঁ, শরৎ কুণ্ডু সম্পর্কে কিছু তথ্য তাঁর জানা আছে। বছর পাঁচেক আগে একবার অনেক খোঁজ করে তাঁর বাড়িতে গিয়ে শরৎ কুণ্ডুর একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন সান্যাল মশাই। 'সে বাড়ি কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করলুম। 'গোয়াবাগানের এক বস্তিতে', বললেন সান্যাল মশাই। 'ভদ্রলোকের তখন চরম দুরবস্থা।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কি সাইলেন্ট যুগের অভিনেতাদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন নাকি?'

'খুব বেশি তো বেঁচে নেই', বললেন সান্যাল মশাই। 'যে ক'জন রয়েছেন তাঁদের নিতে চেষ্টা করছি।'

আমি রতন রক্ষিতের কথা বলে দিলাম, আর বললাম যে, তাঁর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি। ভদ্রলোক তাতে বেশ উৎসাহ প্রকাশ করলেন।

এর পর আমি আসল প্রশ্নে চলে গেলুম।

'টকি আসার পর কি শরৎ কুণ্ডু আর ছবিতে অভিনয় করেননি?'

'আজ্ঞে না', বললেন নরেশ সান্যাল। 'ভয়েস টেস্টেই ভদ্রলোক বাতিল হয়ে যান। তারপর যে কী করেছেন সেটা ভদ্রলোক খোলাখুলি বললেন না। মনে হল খুবই স্ট্রাগল গেছে, তাই নিজের কথা বেশি বলতে চান না। তবে সাইলেন্ট যুগ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমি ভদ্রলোকের কাছে পেয়েছি।'

এর পর টালিগঞ্জ পাড়ার আরও কয়েকজন পুরনো কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানলুম যে, টকি আসার পরেও বেশ কয়েক বছর শরৎ কুণ্ডু সিনেমা পাড়ায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সে-সময় ওঁর অবস্থা নাকি খুব খারাপ। টালিগঞ্জেরই মায়াপুরী স্টুডিওর ম্যানেজার ধীরেশ চন্দর সঙ্গে কথা বলে জানলুম যে, শরৎ কুণ্ডু নাকি মাঝে মাঝে ছবিতে 'একস্ট্রা'র পার্ট করে পাঁচ-দশ টাকা করে রোজগার করতেন। এইসব পার্টে অভিনেতা সাধারণত ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকে; তার কথা বলার কোনও দরকার হয় না।

এই মায়াপুরী স্টুডিওতেই দ্বারিক চক্রবর্তী বলে এক বৃদ্ধ প্রোডাকশন ম্যানেজার আমাকে বললেন, 'বেনটিঙ্ক স্ট্রিটে নটরাজ কেবিনে গিয়ে খোঁজ করুন। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সেখানে আমি শরৎ কুণ্ডুকে দেখেছি।'

শরৎ কুণ্ডুকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে টেনে বার করার জন্য নটরাজ কেবিনে গিয়ে হাজির হলুম। এর মধ্যে—এ-কথাটা বলা হয়নি—গোয়াবাগান বস্তিতে গিয়ে খোঁজ করে জেনেছি যে শরৎ কুণ্ডু আর সেখানে থাকেন না। এটাও বলা দরকার যে, আমার উৎসাহের সঙ্গে তাল রেখে চলেছেন রক্ষিত মশাই। ছোঁয়াচে ব্যারামের মতো তাঁরও এখন ধ্যান জ্ঞান চিন্তা হল শরৎ কুণ্ডু। তাঁদের দু'জনের মধ্যে যে কত সৌহার্দ্য ছিল সেটা এখন মনে পড়েছে রক্ষিত মশাই-এর। যুবা বয়সের স্মৃতি, আর দু'জনে তখন ডাকসাইটে জুটি। লোকে আসল ছবির কথা চিন্তাই করে না; ছবির আগে বিশু-শিবুর দু রিলের কীর্তিকলাপই হল তাদের কাছে আসল। সেই জুটির একটি রয়েছে, একটি উধাও। এমন হলে কি চলে?

নটরাজ কেবিনের মালিক পুলিন দত্তকে জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক বললেন, 'শরৎদা বছর তিনেক আগে অবধি এখানে রেগুলারলি আসতেন। তারপর আর আসেননি।'

'তিনি কি কোনও কাজ-টাজ করতেন?'

'সে-কথা তাঁকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি,' বললেন পুলিন দত্ত, "কিন্তু কোনও সোজা উত্তর কখনও পাইনি। কেবল বলতেন, 'পেটের দায়ে এমন কোনও কাজ নেই যা আমি করিনি।" তবে অভিনয়

যে ছেড়ে দিয়েছিলেন সেটা আমি জানি, আর সেইসঙ্গে ছবি দেখাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। টকিই যে তাঁর কাল হয়েছিল সেটা বোধহয় উনি কোনওদিন ভুলতে পারেননি।'

এর পরে আরও মাসখানেক নানান জায়গায় খোঁজ করেও শরৎ কুণ্ডুর কোনও পাত্তা পেলাম না। লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কথাটা রক্ষিত মশাইকে বলতে উনি সত্যিই মর্মাহত হলেন। বললেন, 'এমন একটা গুণী অভিনেতা, টকি এসে তার পসার মাটি করল, আর ক্রমে সে মানুষের মন থেকে মুছেই গেল। এখন আর তাকে কে চেনে? সে তো বেঁচে থেকেও প্রায় মরারই শামিল।'

শরৎ কুণ্ডুর ব্যাপারে আর কিছু করার নেই বলে আমি কাজের কথায় চলে গেলুম। ভদ্রলোককে একটা প্রশ্ন করার ছিল। বললুম, 'আপনার একটি সাক্ষাৎকার দিতে কোনও আপত্তি আছে কি?'

'কে চাইছে সাক্ষাৎকার?'

আমি নরেশ সান্যালের কথা বললুম। ভদ্রলোক সেদিনই সকালে ফোন করেছিলেন, আগামীকাল আসতে চান।

'বেশ তো, সকালে দশটায় আসুক। তবে বেশি সময় যেন না নেয়।'

নরেশ সান্যাল ফোন নম্বর দিয়ে দিয়েছিলেন, আমি তাঁকে খবরটা জানিয়ে দিলুম।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রোজেকশন ঘরে রয়ে গেলুম। বিশু-শিবুর কীর্তিকলাপ দেখার জন্য। বিশু-শিবুর ছবি হয়েছিল সবসুদ্ধ বেয়াল্লিশটা। তার মধ্যে সাঁইত্রিশটা আগেই জোগাড় হয়েছিল, বাকি পাঁচখানা আমার চেষ্টায় জোগাড় হয়েছে। আজ এই নতুন পাঁচখানা দেখতে দেখতে আবার মনে হল যে, শরৎ কুণ্ডু সত্যিই বেশ জোরদার কমিক অভিনেতা ছিলেন। রক্ষিত মশাইকে দু-একবার চুক-চুক করতে শুনলুম, তাতে বুঝলুম যে তিনি শরৎ কুণ্ডুর অন্তর্ধানের জন্য আক্ষেপ করছেন।

পরদিন সকালে আমি আসার দশ মিনিটের মধ্যেই নরেশ সান্যাল এসে পড়লেন। রক্ষিত মশাই তৈরিই ছিলেন; বললেন, 'আগে চা হোক, তারপর ইন্টারভিউ হবে।' সান্যাল মশাই কোনও আপত্তি করলেন না।

সকালে দশটায় রোজই রক্ষিত মশাই চা খান এবং সেইসঙ্গে আমিও খাই। এই সময়টাতেই আমাদের যা কিছু আলোচনা করবার তা হয়ে যায়, তারপর আমি বসে পড়ি কাজে, উনি চলে যান বিশ্রাম করতে। ক্যাটালগিং হয়ে যাবার পর আমি যে কাজটা করছি সেটা হল বিশু-শিবুর প্রত্যেকটি ছবির গল্পের সারাংশ তৈরি করা এবং তাতে কে কে অভিনয় করেছে, পরিচালক কে, ক্যামেরাম্যান কে—এই সবের একটা তালিকা তৈরি করা। একে বলে ফিল্মোগ্রাফি।

যাই হোক, আজ অতিথি এসেছেন বলে দেখি চায়ের সঙ্গে কচুরি এসেছে। ট্রে সমেত চা টেবিলে রাখা হতেই সান্যাল মশাই হঠাৎ একটা কথার মাঝখানে খেই হারিয়ে চুপ করে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি ভৃত্যের দিকে। ভৃত্য স্বয়ং খাস বেয়ারা লক্ষ্মীকান্ত।

আমার দৃষ্টিও চলে গেছে লক্ষ্মীকান্তের দিকে, এবং সেই সঙ্গে রক্ষিত মশাইয়েরও। এই নাক, এই থুতনি, এই চওড়া কপাল, চোখের এই তীক্ষ্ণ চাহনি—এ কোথায় দেখেছি? অ্যাদ্দিন তো এর মুখের দিকে ভাল করে চাইনি। কেন চাইব? অকারণে বেয়ারার দিকে কে চেয়ে থাকে?

প্রায় তিনজনের মুখ দিয়েই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল একটা নাম—

'শরৎ কুণ্ডু!'

হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই, শরৎ কুণ্ডু এখন হলেন তাঁর এককালের ফিল্মের জুটি রতন রক্ষিতের খাস বেয়ারা।

'কী ব্যাপার হে শরৎ?' এতক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলেন রতন রক্ষিত। 'তুমি আমার বাড়িতে—?'

শরৎ কুণ্ডুরও মুখে কথা ফুটতে সময় লাগল।

'কী আর করি', অবশেষে কপালের ঘাম মুছে বললেন ভদ্রলোক, 'নেহাত ইনি চিনলেন বলেই তো তোমরা চিনলে; অ্যাদ্দিন তো বুঝতে পারোনি! আর চল্লিশ বছর বাদে দেখে বুঝবেই বা কী করে!—একদিন মীরচান্দানির ওখানে চাকরির আশায় গিয়ে শুনি তুমি নাকি এসে আমাদের সেই আদ্যিকালের ছবির অনেকগুলো কপি কিনে নিয়ে গেছ নিজের সংগ্রহের জন্য। ভাবলাম তোমার এখানে এসে নিশ্চয়ই সেসব ছবি আবার দেখতে পাব। এমনিতে তো দেখার কোনও সুযোগ নেই। সেসব ছবি যে

এখনও টিকে আছে তাই জানতাম না। তাই বেয়ারার চাকরির জন্য চলে এলাম তোমার কাছে। তুমি আমায় চিনলে না, চাকরিও হয়ে গেল। কুলিগিরিও করেছি, বেয়ারার কাজ তো তার কাছে স্বর্গ। আর ভালও লাগছিল। সে যুগের ছবিতে কথা না বলে অভিনয় করেছি, সে তো নেহাত নিন্দের নয়! অবিশ্যি সেসব দেখার সুযোগ বোধহয় এখন বন্ধই হয়ে গেল!'

'কেন, বন্ধ হবে কেন?' রক্ষিত মশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। 'তুমি এখন থেকে হবে আমার ম্যানেজার! তারিণীর সঙ্গে এক ঘরে বসবে তুমি; আমার এখানেই থাকবে, সন্ধেবেলা একসঙ্গে বসে ছবি দেখব আমরা। এককালের জুটি ভেঙে গিয়েছিল দৈব দুর্বিপাকে, আবার এখন থেকে জোড়া লেগে গেল। কী বলো তারিণী?'

আমি দেখছি নরেশ সান্যালের দিকে। তাঁর মতো এমন হতভম্ব ভাব আমি অনেকদিন কারুর মুখে দেখিনি। তবে তাঁর পক্ষে নির্বাক যুগের এই বিখ্যাত জুটির পুনর্মিলন যে একটা বড়রকম সাংবাদিক দাঁও হল, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কি?

আনন্দ বার্ষিকী, ১৩৯২

মাস্টার অংশুমান

সেই সকালটার কথা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। সেদিন ছিল রবিবার। তিনদিন ধরে সমানে বাদলা করে সেদিনই প্রথম ঝলমলে রোদ বেরিয়েছে। আমি একটা অঙ্ক কষে আমার খাতাটা বন্ধ করেছি এমন সময় বিশুদা এল। বিশুদা, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলি, আমার জ্যাঠতুতো দাদা। সে একটা সিনেমা কোম্পানিতে কাজ করে। বিশুদা এসেই বলল, 'হ্যাঁ রে, তোর পুজোর ছুটি কবে থেকে শুরু হচ্ছে?' আমি বললাম, 'সাতই অক্টোবর। কেন?'

'কারণ তোকে নিয়ে সট্‌কাবার তাল করছি।'

'তার মানে?'

'দাঁড়া, আগে কাকার সঙ্গে কথা বলি।'

বাবা পাশের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, বিশুদা সটান তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হল, আমি তার পিছনে। বাবা কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'কী রে বিশু—সকাল-সকাল—কী ব্যাপার?'

বিশুদার উত্তর শুনেই আমার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে শুরু করল। 'একটা জরুরি ব্যাপারে তোমার কাছে এসেছি ছোট্‌কা', বলল বিশুদা, 'আমাদের ডিরেক্টর সুশীল মিত্তির একটা ছবি করছেন। বেশিরভাগ শুটিং হবে বাইরে—আজমীরে। এতে একটা বছর বারোর ছেলের পার্ট আছে—খুব ভাল পার্ট, প্রায় বিশদিনের কাজ। আমার বিশ্বাস অংশুকে খুব ভাল মানাবে পার্টটাতে। এখন তুমি যদি...'

'শুধু আমি কেন', বললেন বাবা, 'আমার ছেলের একটা মতামত নেই?'

বাবা যে কথাটা ঠাট্টা করে বলেছেন সেটা জানি, কিন্তু এটা বুঝলাম যে তাঁর খুব একটা আপত্তি নেই। অ্যাক্টিং জিনিসটা বাবা খুব পছন্দ করেন সেটা আমি জানি। আমাকে গলা ছেড়ে আবৃত্তি করতে বাবাই শিখিয়েছেন, আর ইস্কুলে আবৃত্তি করে প্রাইজ পেলে বাবাই সবচেয়ে বেশি খুশি হন।'

'ইস্কুল কামাই হবে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

'হলেও বড়জোর দুচারদিন', বলল বিশুদা। 'পুজোর ছুটির মধ্যে চোদ্দ আনা কাজ হয়ে যাবে; তারপর হয়তো চার পাঁচদিনের কাজ থাকবে কলকাতার স্টুডিওতে। অংশু তো ভাল ছেলে—দুচারদিন

কামাইতে ওর কিছু ক্ষতি হবে না।'

'অংশুর কথা যে বলছিস, ও পারবে তো?'

'আলবত', বলল বিশুদা। 'তবে শুধু আমি বললে তো হবে না। কাল সকালে সুশীলবাবুকে একবার নিয়ে আসছি—সুশীল মিত্তির—আমাদের ডিরেক্টর। তবে ওঁর টেস্ট আমি জানি। আই অ্যাম সিওর অংশুকে ওঁর পছন্দ হবে। আর পার্টটাও খুব ভাল। ওই ছেলেকে নিয়েই যত কাণ্ডকারখানা। ওর পার্টটা ও আগেই পেয়ে যাবে, তুমি পড়িয়ে দিও। ওর কোনও অসুবিধা হবে না। তাছাড়া কাজের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেশ দেখা হবে সেটাও কি কম নাকি? কী রে অংশু, আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি নেই তো? বাবা-মা থাকবেন না কিন্তু।'

আমি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম আমার কোনও আপত্তি নেই। আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করছে।

বিশুদার দৌলতে আমার স্টুডিওতে গিয়ে শুটিং দেখা হয়ে গেছে। মোটামুটি কী ঘটনা ঘটে সেটা আমি জানি। দেখতে দেখতে আমার অনেকবার মনে হয়েছে—ওরকম আমিও পারি, ক্যামেরার সামনে আমার মোটেই ভয় করবে না। আমার ভুলের জন্য একই শট বার বার নিতে হবে না, কক্ষনও না। অবিশ্যি সেটা কতদূর সত্যি তা এখনও জানি না।

বিশুদা আবার বলল, 'তোর কোনও চিন্তা নেই। কাজটা করতে তোর কোনও অসুবিধা হবে না। আর ছবি শেষ হয়ে সিনেমায় দেখানো হলে তোর কী নাম হয় দেখিস। এমনকী শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেতা হিসেবে পুরস্কারটা হয়তো পেয়ে যেতে পারে মাস্টার অংশুমান গাঙ্গুলি।'

পরের দিন ডিরেক্টর সুশীলবাবু এলেন আমাকে দেখতে। ভদ্রলোক গম্ভীর হলেও, কড়া মেজাজের লোক বলে মনে হল না। উনি বলাতে আমি 'পুরাতন ভৃত্য'টা আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলাম। তাতে মনে হল ভদ্রলোক খুশিই হলেন।

'তবে তোমার একটা ক্যামেরা টেস্ট নিতে হবে দু-চারদিনের মধ্যে', বললেন সুশীলবাবু, 'সে ব্যাপারে বিশু তোমায় জানিয়ে দেবে। কয়েক লাইন কথা তোমার পাঠিয়ে দেব, সেটা তুমি মুখস্থ করে রেখো।'

সুশীলবাবু চলে যাবার পর বাবা বলেন, 'দেখো বাবা, এও একরকম পরীক্ষা কিন্তু। স্কুলের পরীক্ষায় ভাল করো তুমি তেমনই এতেও ভাল করতে হবে। স্কুলে যেমন মাস্টারমশাই তেমনই এখানে ডিরেক্টর হবেন তোমার মাস্টার। তাঁর কথা শুনবে। পড়া যেমন মুখস্থ করো, তেমনই এখানেও তোমার পার্ট ভাল করে মুখস্থ করবে।'

আমার ভয় ছিল যে মা হয়তো বেঁকে বসবেন, কিন্তু তিনিও এককথায় রাজি। ছেলে প্রায় এক মাসের জন্য দূরে চলে যাবে শুনে প্রথমে একটু খুঁতখুঁত করলেন, কিন্তু বিশুদাকে মা-বাবা দু'জনেই এত ভালবাসেন যে তাঁর উপর আমার ভার দিয়ে দুজনেই নিশ্চিন্ত।

আমি যে পার্টটা পেয়েই গেছি, ক্যামেরা টেস্টটা যে শুধু নাম-কা-ওয়াস্তে, সেটা বুঝলাম যখন দু'দিন পরে বিশুদা আবার এল দরজি নিয়ে আমার জামার মাপ নিতে। কুর্তা আর চাপা পায়জামা পরতে হবে আমাকে, রাজস্থানি পোশাক। কিন্তু শুধু একরকম পোশাকেই হবে না। আমাকে নাকি দুটো পার্ট করতে হবে: এক হল রাজা ভরত সিং-এর ছেলে অমৃৎ সিং, আর আরেক হল গরিব ইস্কুল মাস্টার গোপীনাথের ছেলে মোহন। দু'জনেরই এক বয়স, এক চেহারা। পুষ্করের মেলাতে দু'জনের আলাপ হবে। একসঙ্গে দুজন একরকম দেখতে ছেলেকে দেখাবার জন্য ক্যামেরার কারসাজি ব্যবহার করা হবে। দুই নতুন বন্ধুতে মেলা ছেড়ে যাবে একটা নিরিবিলি জায়গায় খেলা করতে। সেখানে দুজন পোশাক অদলবদল করবে মজা করার জন্য। আর তার ফলে তিনজন গুণ্ডা রাজপুত্র ভেবে মোহনকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে। তাদের মতলব হল রাজার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে তারপর ছেলেকে ফেরত দেওয়া। এদিকে অমৃৎ বাড়ি ফিরে আসে মোহনের পোশাক পরে, আর এসে বাবা-মাকে সব কথা বলে। ছেলে পার পেয়ে গেছে জেনে বাবা-মা হাঁফ ছাড়েন, কিন্তু অমৃৎ জোর গলায় বলে যে তার বন্ধুকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত সে কারুর সঙ্গে কথা বলবে না। শেষকালে গল্পের হিরো তরুণ পুলিশ ইনস্পেক্টর সূর্যকান্ত রাঠোর অসমসাহসের পরিচয় দিয়ে মোটর সাইকেলে করে দস্যুদের হাত থেকে মোহনকে

উদ্ধার করে আনবে।

গল্পটা জেনে আর পার্ট দুটো পড়ে আমার উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল, আর সেইসঙ্গে মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন জমা হতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে দুর্দান্ত সাহসী সূর্যকান্তর পার্টে কে অ্যাক্টিং করবে সেটা জানার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। বিশুদা বলল ওই পার্টে শঙ্কর মল্লিক বলে একজন নতুন ছেলেকে নেওয়া হচ্ছে, সে নাকি দারুণ স্মার্ট আর খুব ভাল দেখতে। আমি বললাম, 'কিন্তু ও কি মোটর সাইকেল চালাতে জানে?'

বিশুদা হেসে বলল, 'তা জানে ঠিকই, কিন্তু স্টান্টবাজির জন্য তো মাইনে-করা স্টান্টম্যান আসছে বম্বে থেকে।'

'স্টান্টম্যান? সে আবার কী?'

'সে পরে দেখতে পাবি', বলল বিশুদা।

পাঁচই অক্টোবর আমাদের শুটিং-এর দল রওনা দিল আজমীর। হাওড়া থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে বান্দিকুই, বান্দিকুই থেকে আজমীর। তার মানে দুবার চেঞ্জ। পাঁচই সন্ধ্যায় রওনা হয়ে সাতই রাত্রে পৌঁছানো। আগে থেকে বগি বুক করে রাখা ছিল। চাকরবাকর ছাড়া আর সকলেই ধরে গেছে একটা ফার্স্ট ক্লাস বগিতে। ট্রেনেই আমার সকলের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। অ্যাকটরদের মধ্যে এখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন সাতজন। এদের কাজ একেবারে প্রথম দিকেই। বাকি সবাই ক্রমে ক্রমে এসে পড়বেন। অমৃৎ সিং-এর বাবা-মা, মানে রাজা-রানীর পার্ট করছেন পুলকেশ ব্যানার্জি আর মমতা সেন। ইনস্পেক্টর সূর্যকান্তের পার্ট করছেন শঙ্কর মল্লিক, সে তো আগেই বলেছি। এ ছাড়া আছেন গুণ্ডাদের সর্দার ছগনলালের পার্টে জগন্নাথ দে। ইনি বাংলা ছবির নামকরা দুষ্টু লোক, বা যাকে বলে ভিলেন। এঁকে সবাই জগু ওস্তাদ বলে ডাকে। এইসব অ্যাকটর ছাড়া আছেন ডিরেক্টর সুশীলবাবু, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট উজ্জ্বল প্রামাণিক, ক্যামেরাম্যান ধীরেশ বোস, গল্পের লেখক সুকান্ত গুপ্ত, মেক-আপম্যান সজল সরকার। অ্যাসিস্ট্যান্টদের দলে আছেন সবসুদ্ধ আটজন, আর সবশেষে বিশুদা। এঁদের মধ্যে চোদ্দজন ট্রেন ছাড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো কামরায় ভাগ করে তাস খেলতে শুরু করেছেন। সাতজন খেলছেন রামি, আর সাতজন ফ্লাশ। আমি রামি জানি, তাই সেই কামরাতেই বেশিটা সময় কাটাচ্ছি। বিশুদাও রামির দলে ভিড়ে পড়েছে। যাঁরা খেলছেন না তাঁদের মধ্যে আছেন ডিরেক্টর সুশীলবাবু আর গল্প লিখিয়ে সুকান্ত গুপ্ত। এঁরা দুজন ছবি নিয়ে আলোচনা করছেন। এছাড়া পুলকেশ ব্যানার্জি আর মমতা সেন দু'জনেই হাতে ম্যাগাজিন নিয়ে বসে আছেন।

আমাকে আমার পার্ট দিয়ে দিয়েছে বিশুদা কলকাতায় থাকতেই। একটা ফাইলের মধ্যে প্রায় বিশপাতা ফুলস্ক্যাপ কাগজ। সেটা বাবা একবার পড়িয়ে শুনিয়ে দিয়েছেন আমাকে। তা থেকে আমি খানিকটা বুঝে গেছি কীভাবে আমাকে অ্যাক্টিং করতে হবে। খুব বেশি কথা নেই, তাই মুখস্থ করতে অসুবিধা হবে না। আসবার দুদিন আগে কলকাতার স্টুডিওতে আমার টেস্টটা নেওয়া হয়ে গেছে; তাতে শঙ্কর মল্লিকের সঙ্গে একটা ছোট দৃশ্যে আমাকে রাজস্থানি পোশাক পরে অ্যাক্টিং করতে হয়েছে ক্যামেরার সামনে। কাজটা নিশ্চয়ই ভাল হয়েছিল, তা না হলে সুশীলবাবু কেন আমার পিঠ চাপড়ে দু'বার 'একসেলেন্ট' বলবেন? আর সেই থেকেই লক্ষ করছি আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সুশীলবাবু হাসছেন।

বর্ধমানে থালিতে ডিনার খাবার পর আমি একটা আপার বার্থে উঠে নিজেই হোল্ডঅল খুলে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। মমতা সেন আমার কামরায় ছিলেন। তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে এবার থেকে মমতামাসি বলে ডাকবে, কেমন? আর কোনও কিছু দরকার-টরকার হলে আমাকে বলবে।'

আমি পাশ ফিরে চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম। না জানি কত কী ঘটনা ঘটবে সামনের একমাসে। বিশুদা আছে, তাই বাবা-মা যে নেই সে-কথা মনেই হচ্ছে না। একবার কালিম্পং গিয়েছিলাম আমার মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে। সেবারও বাবা-মা ছিলেন না। আমার কিন্তু কোনও অসুবিধাই হয়নি। আমি জানি এবারও হবে না। কাজের মধ্যে দেখতে দেখতে একমাস পেরিয়ে যাবে।

এই ভাবতে ভাবতেই কখন যে ঘুম এসে গেছে, টেরই পাইনি।

॥ ২ ॥

বাবা কলেজে ইতিহাস পড়ান, তিনিই আমাকে বলেছিলেন যে, আজমীর শহরটা ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর দখল করে নেন মারওয়াড় অধিপতি মালদেও-এর হাত থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আজমীর ব্রিটিশদের হাতে চলে আসে। আজমীর থেকে এগারো কিলোমিটার পশ্চিমে হল পুষ্কর। এটা হল হিন্দুদের একটা বড় তীর্থস্থান। এখানে একটা হ্রদ আছে যেটাকে ঘিরে প্রতি বছর কার্তিক মাসে একটা মেলা বসে, যাতে লাখের উপর লোক আসে। আমাদের ফিল্মের গল্পে অবিশ্যি আজমীর হয়ে যাচ্ছে কাল্পনিক শহর হিঙোলগড়। আমাদের ফিল্মের নামও হিঙোলগড়। পুষ্কর অবিশ্যি পুষ্করই থাকছে, আর এই পুষ্করের মেলাতেই ইস্কুল মাস্টারের ছেলে মোহনের সঙ্গে রাজকুমার অমৃৎ সিং-এর আলাপ হচ্ছে।

রাত করে আজমীর পৌঁছে আমরা সোজা চলে গেলাম সার্কিট হাউসে। এইখানেই তিন সপ্তাহের জন্য আমরা থাকব। বেশ বড় সার্কিট হাউস, দোতলায় উত্তর আর পশ্চিমে চওড়া বারান্দা, সেখানে দাঁড়ালেই উত্তরে প্রকাণ্ড আনা সাগর লেক, আর পশ্চিমে পাহাড় দেখা যায়। রাত্তিরে অবিশ্যি দেখার কিছুই নেই, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম যে আমরা একটা অদ্ভুত জায়গায় অদ্ভুত বাড়িতে এসে পড়েছি। আকাশে তিনভাগের একভাগ চাঁদের ফিকে আলো পাতলা কুয়াশায় ঢাকা লেকের জলে পড়ে দারুণ দেখাচ্ছে। দূরে শহরে কোথায় যেন ঢোলক বাজিয়ে গান হচ্ছে, এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

আমি বারান্দার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, বিশুদা এসে বলল, 'চ' তোর ঘর ঠিক হয়ে গেছে, মমতাদি শোবেন একই ঘরে; তোর কোনও ভয় নেই।'

ভয় আমার এমনিতেই ছিল না। এত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে থাকব, তাতে আবার ভয় কীসের? 'আমার কাজ কবে থেকে শুরু?' আমি জিজ্ঞেস করলাম বিশুদাকে।

ও বলল, 'কাল একবার পুষ্কর দেখতে যাওয়া হবে, আর যে বাড়িটা রাজবাড়ি হবে সেই বাড়িটা। কাজ শুরু পরশু থেকে।'

কথার মাঝখানে মমতামাসি এসে বললেন, 'কী অংশু, মা'র জন্য মন কেমন করছে?'

সত্যি বলতে কি, বাড়ির কথা একবারও মনে হয়নি, আর সেটাই বললাম মমতামাসিকে।

'এই তো চাই', বললেন মমতামাসি। 'আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন আমিই কিন্তু তোমার মা, বুঝেছ? কোনও অসুবিধা হলে আমাকে বলবে।'

রাত্তিরে ঘুমটা ভালই হল।

সকালে উঠে বারান্দায় বেরোতেই প্রথম সত্যি করে লেকটা দেখতে পেলাম। বিরাট লেক, ওপারের সবকিছু ছোট ছোট দেখাচ্ছে। জলে অসংখ্য হাঁস চরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়টা বেশ উঁচু, একেবারে লেকের জল থেকে উঠেছে বলে মনে হয়।

ডিম রুটি আর চমৎকার বড় বড় জিলিপি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে ন'টার সময় প্রথম দেখতে গেলাম হিরে জহরতের ব্যবসায়ী ধনী স্বরূপলাল লোহিয়ার বাড়ি। দলের বেশিরভাগ লোকই সার্কিট হাউসে রয়ে গেছে, বেরিয়েছি শুধু ছ'জন—আমি, বিশুদা, সুশীলবাবু, সুশীলবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট মুকুল চৌধুরী, ক্যামেরাম্যান ধীরেশ বোস আর গল্পের লেখক সুকান্ত গুপ্ত। একটা বড় বাস আর তিনটে ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছে তিন সপ্তাহের জন্য, তার মধ্যে দুটো ট্যাক্সি আজ খাটছে। মিঃ লোহিয়ার বাড়িটাকে বাড়ি বললে ভুল হবে; বরং দুর্গ বলা উচিত। চারদিকে পরিখা নেই বটে, কিন্তু গাছপালা পুকুর মন্দির সমেত জমি রয়েছে বিশাল। এই কেল্লাই হবে রাজবাড়ি, আর এই বাড়ির ছেলেই হবে অমৃৎ সিং।

সত্যি বলতে কি, এরকম বাড়ি আমি কখনও দেখিনি। হলদে পাথরের তৈরি। কতকালের যে পুরনো তা দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই। মোঘল আমলের হলেও অবাক হব না। শেষ পর্যন্ত সেটাই ঠিক বলে জানা গেল।

মিঃ লোহিয়ার বয়স ষাটের উপর। ধবধবে সাদা চুল আর চাড়া দেওয়া বিরাট সাদা গোঁফ। আমাদের সবাইকে খুব খাতির করে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন তিনি ফিল্ম বেশি দেখেন না। তবে বাংলা আর বাঙালিদের খুব ভালবাসেন। তাঁর এক মামাতো ভাইয়ের পরিবার নাকি দু'শ বছর

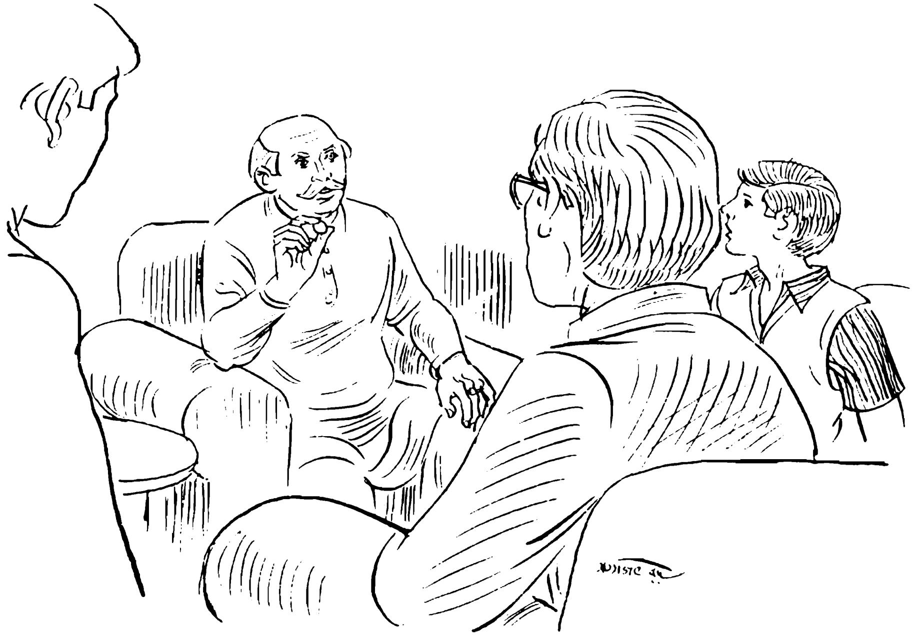

ধরে কলকাতায় থেকে ব্যবসা করছে। এই মামাতো ভাই মতিলাল চুনৌরিয়ার সঙ্গে আমাদের ছবির প্রোডিউসারের আলাপ ছিল। তিনিই মিঃ লোহিয়াকে চিঠি লিখে আমাদের শুটিং-এর বন্দোবস্তটা করে দিয়েছেন। একটা সুবিধা হচ্ছে যে, এ বাড়ির লোকের তুলনায় ঘরের সংখ্যাটা অনেক বেশি। তার মধ্যে কয়েকটা ঘরে শুটিং হলে বাড়ির লোকের কোনও অসুবিধা হবার কথা নয়।

মিঃ লোহিয়া আমাদের চা আর লাড্ডু খাওয়ালেন, আর তারপর তাঁর কিছু হিরে জহরত বার করে দেখালেন। দেখে আরেকবার চোখটা টেরিয়ে গেল। সবশেষে একটা নীল পাথর দেখালেন তার সাইজ একটা পায়রার ডিমের মতো, সেটার নাম নীলকান্তমণি। এরকম পাথর নাকি খুব কমই পাওয়া যায়। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল সেটার দাম জিজ্ঞেস করার; শেষ পর্যন্ত সুশীলবাবুই সেটা করলেন। তাতে মিঃ লোহিয়া একটু হেসে বললেন, 'ইট ইজ প্রাইসলেস।' তার মানে এর দামের কোনও হিসেব হয় না। মনে মনে ভাবলাম, বাড়ির গেটে কি সাধে বন্দুকধারী দরোয়ান রেখেছেন লোহিয়া সাহেব? এই এক বাড়িতে কোটি কোটি টাকার ধনরত্ন রয়েছে।

মিঃ লোহিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গেলাম পুষ্কর। পথে একটা গিরিবর্ত্ম পড়ে যেটা প্রায় এক মাইল লম্বা। দু'দিকে খাড়া পাহাড়, আর তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা। পুষ্কর পৌঁছতে লাগল কুড়ি মিনিট।

সুকান্তবাবুর খুব পড়ার বাতিক; তিনিই রাজস্থান সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়ে এসেছেন; তিনিই বললেন যে দেড় হাজার বছর আগেও নাকি পুষ্কর ছিল ভারতবর্ষের একটা প্রধান তীর্থস্থান। হ্রদের পাশের মন্দিরগুলো আওরঙ্গজেব ভেঙে ফেললেন, তার জায়গায় নতুন মন্দির তৈরি করেছে। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বিখ্যাত সেটা হল ব্রহ্মার মন্দির। ভারতবর্ষে এটাই নাকি একমাত্র মন্দির যেখানে ব্রহ্মাকে পুজো করা হয়। মন্দিরের বাইরে উপর দিকে ব্রহ্মার বাহন হাঁসের মূর্তি রয়েছে। আমাদের মধ্যে দুজন—সুশীলবাবু আর লেখক সুকান্তবাবু—মন্দিরে ঢুকে পুজো দিয়ে এলেন।

দু'দিন পরেই পুষ্করের মেলা আরম্ভ। লেকের দক্ষিণে প্রকাণ্ড খোলা মাঠে মেলার তোড়জোড় চলছে। উট, গোরু আর ঘোড়া আসতে শুরু করেছে। এই তিনটি জিনিসের এতবড় হাট নাকি আর

কোথাও বসে না। যেদিকে মেলা বসবে, তার উলটো দিকে খানিকটা অংশে গাছপালা আর একটা পুরনো ভাঙা হাভেলির জায়গাটা সুশীলবাবু আর ক্যামেরাম্যান ধীরেশ বোস বেছে নিলেন অমৃৎ আর মোহনের পোশাক বদল আর কিডন্যাপিং-এর দৃশ্যের জন্য। এইখানেই তিনজন দস্যু এসে অমৃৎবেশী মোহনকে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে পালাবে। অবিশ্যি এই দস্যুরা পুরনো আমলের দস্যু নয়। এরা মোহনকে নিয়ে পালাবে একটা মোটর গাড়িতে, উট বা ঘোড়ায় চড়ে নয়।

পুষ্কর থেকে ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল সাড়ে বারোটা। দুপুরে খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল সার্কিট হাউসের একতলার ডাইনিং রুমে। একসঙ্গে পনেরোজন খেতে বসেছে, হিরো ভিলেন সবাই আছে। বেশ একটা গমগমে পিকনিক-পিকনিক ভাব। এই ভাবটা চলবে যত দিন আজমীরে আছি ততদিন। অবিশ্যি কাজ শুরু হলে ক্রমে ক্রমে সার্কিট হাউসের সঙ্গে সম্পর্কটা কমে আসবে, কারণ সারাদিনই প্রায় বাইরে বাইরে থাকতে হবে।

খেতে খেতে সুশীলবাবু তুললেন মিঃ লোহিয়ার হিরে জহরতের কথা। আমরা নীলকান্তমণির মতো একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে এসেছি বলে যারা যায়নি তারা সকলেই আফসোস করল।

দুপুরে খাবার পর আগামীকাল যে দৃশ্যটা শুটিং হবে সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। এটা জানি যে ছবির শুটিং ঠিক পর পর গল্পের ঘটনা ধরে হয় না। অনেক সময় পরের দিকের দৃশ্য আগে আর গোড়ার দিকের দৃশ্য শেষে তোলা হয়। যেমন, কালকে যে দৃশ্যটা প্রথম তোলা হবে সেটা হল মেলা থেকে ফেরার পরের দৃশ্য। যদিও প্রথম দিনের কাজ, কিন্তু খুব সহজ নয়। আমি ফাইলটা খুলে কালকের পার্টটা একবার দেখে নিচ্ছি, এমন সময় বিশুদা এসে বলে গেল যে সন্ধেবেলা বারান্দায় রিহার্সাল হবে; আমি রাজা, রানি, রাজার দেওয়ান—সকলকেই থাকতে হবে। মনে মনে বললাম, এই শুরু হল কাজ।

এই কাজ করতে কত কী কাণ্ড হবে সেটা কি আগে থেকে জানতাম?

॥ ৩ ॥

পরদিন ভোর ছ'টায় উঠতে হল। শুধু আমাকে নয়, যাদের শুটিং-এ দরকার হবে তাদের সকলকেই ভোর ছ'টায় চা এনে দিয়ে উঠিয়ে দিল পঞ্চানন বেয়ারা। ব্রেকফাস্ট পরে হবে—এটা ছিল যাকে বলে বেড-টি। আমার এ জিনিসে অভ্যাস নেই, কিন্তু এখানে আর সকলের সঙ্গে চা খেতে মোটেই খারাপ লাগল না। আজমীরে অক্টোবর মাসে সকালে একটা শীত-শীত ভাব থাকে, তাই মমতামাসি আমাকে জোর করে একটা পুলোভার পরিয়ে দিলেন। রোদ বাড়লে সেটা খুলে ফেললেই হবে।

গতকাল রিহার্সাল ভালই হয়েছে। আমার যেটুকু ভয়-ভয় ভাব ছিল সেটা অন্যদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে একদম কেটে গেছে। রাজবাড়িতে কিছু ছোট পার্ট করার জন্য আজমীর থেকেই তিনজন বাঙালিকে নেওয়া হয়েছে; তারা এখানের বহুদিনের বাসিন্দা। বিশুদাই খোঁজ করে তাদের জোগাড় করে এনেছে। বিশুদাকে সারাক্ষণ চরকিবাজির মতো ঘুরতে হয়। ওর কাজটাকে বলে প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাজ। এই একজন লোক যার এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই।

আজ সকালে ন'টা থেকে কাজ আরম্ভ হবার কথা। একটার সময় লাঞ্চের জন্য একঘণ্টা ছুটি, তারপর আবার দুটো থেকে কাজ। আমার কাজটা বিকেলের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। সন্ধ্যার পরেও কাজ আছে, তাতে তিন গুণ্ডাকে দরকার হবে আর আমাকে লাগবে মাত্র একটা শটের জন্য। ছগনলাল গুণ্ডা তার দুই শাকরেদকে নিয়ে রাজবাড়ির পাঁচিলের বাইরে হানা দিতে এসেছে। তারা মতলব করছে রাজকুমার অমৃৎকে নিয়ে পালাবে, তারই সুযোগ খুঁজছে। রাজবাড়ির বাইরে থেকে দোতলার একটা ঘরে তারা অমৃৎকে দেখতে পায়। অমৃৎ এ-ঘর সে-ঘর খেলা করে বেড়াচ্ছে, আর ছগনলাল তাকে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছে। এই হল দৃশ্য।

আজ আমাদের সব গাড়িগুলোকেই দরকার হল। বাসের মাথায় প্রথমে চাপানো হল ক্যামেরা চলার জন্য রেলগাড়ির মতো লাইন। টুকরো-টুকরো আট দশ ফুটের লাইন পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে বড় লাইন হয়ে যায়। তার উপর দিয়ে চলে চাকাওয়ালা গাড়ি, যাকে বলে ট্রলি, আর সেই ট্রলির উপর বসে

ক্যামেরা। এই ট্রলিও উঠেছে বাসের মাথায়। আর উঠেছে স্টুডিওর বড় বড় আলো। দিনের বেলাও ঘরের ভিতর কাজ করতে বাইরে থেকে আসা আলোর সঙ্গে বাড়তি ইলেকট্রিক আলো যোগ করতে হয়।

আজ সকালে আমি ছাড়া অ্যাক্টিং-এর জন্য দরকার হবে রাজা, রানি, দেওয়ান আর আরও জনা তিনেক লোক, যাদের কোনও কথা বলতে হবে না। এদের বলা হয় একস্ট্রা, আর এদের সবাইকে আজমীরেই পাওয়া গেছে। এখানে একটা হিন্দি নাটকের দল আছে, তারা গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিল সার্কিট হাউসে। তারা বলে গেছে লোক দিয়ে সাহায্য করবে।

সাড়ে সাতটার সময় আমাদের গাড়ি আর বাস রওনা দিয়ে দিল। মিঃ লোহিয়ার বাড়ি যেতে দশ মিনিট লাগে, কাজেই সময় আছে অনেক। কিন্তু তোড়জোড়ে যে অনেক সময় বেরিয়ে যায় সেটা আমি একদিন স্টুডিওতে টেস্ট দিয়েই বুঝেছি। যিনি রাজা সাজবেন, সেই পুলকেশ ব্যানার্জি প্রায় পনেরো বছর হল ফিল্মে অ্যাকটিং করছেন। সেইসঙ্গে থিয়েটারও করেন। তিনি গাড়িতে আমার পাশেই বসেছিলেন, যাবার পথে বললেন, 'এসো মাস্টার অংশুমান, আমাদের পার্টগুলো একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক।' আমারও আপত্তি নেই, তাই গাড়ি চলতে চলতেই কয়েকটা রিহার্সাল দিয়ে দিলাম।

রাজবাড়িতে পৌঁছে আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেওয়া হল। মিঃ লোহিয়া পুরো একতলাটা ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের জন্য। তা ছাড়া শুটিং-এর জন্য দোতলার তিনটে ঘর ছাড়া আছে। সেসব ঘরে চেয়ার টেবিল কার্পেট ছবি ঝাড়-লণ্ঠন সবই রয়েছে, আর সেগুলোই ছবিতে ব্যবহার করা হবে। ঘরে রাখার জন্য কলকাতা থেকে প্রায় কিছুই আনতে হয়নি।

যতক্ষণ একতলায় খাওয়া হচ্ছে, ততক্ষণে কাজের জিনিসপত্র দোতলায় যে ঘরে শুটিং হবে সেখানে চলে গেল। পুলকেশবাবু আর মমতামাসি খাওয়া শেষ করেই একতলার বারান্দায় মেক-আপ করার জন্য বসে গেলেন। আমাকে রঙ মাখতে হবে না, শুধু চুলটাকে একটু অন্যরকমভাবে আঁচড়ে নিতে হবে। খানিকটা সময় আছে, তাই ভাবছি কী করব, এমন সময় একটা আওয়াজ শুনে আমার চোখ চলে গেল বাড়ির সামনের মাঠের দিকে। একটা মোটরসাইকেল মাঠের উপর ফটফটিয়ে বেড়াচ্ছে, আর তাতে চড়ে আছে বিশুদা।

দু'পাক ঘুরেই বিশুদা সাইকেলটাকে আমার সামনেই এনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'আয়, পেছনে বোস। দু' চক্কর ঘুরিয়ে আনি তোকে।'

আমি জানি যে গল্পে ইনস্পেক্টর সূর্যকান্তর সঙ্গে আমাকে মোটরবাইকের পিছনে চড়তে হবে, তাই ক্যারিয়ারে উঠে বসলাম, আর বিশুদা প্রচণ্ড শব্দ করে বাইক ছেড়ে দিল। আমার হাত দুটো বিশুদার কোমরে জড়ানো, কানের পাশ দিয়ে শনশন্ করে হাওয়া যাচ্ছে, এ এক দারুণ মজা। বিশুদা যে এত ভাল মোটরবাইক চালায় সেটা জানতামই না। সে মোটরগাড়ি চালায় অবিশ্যি অনেকদিন থেকেই।

তিন পাক ঘুরে বাইকটাকে আবার বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করাল বিশুদা। এও একটা রিহার্সাল বইকী! আমার মন বলছে স্টান্টম্যান যদি তেমন ওস্তাদ হয়, তা হলে তার পিছনে চড়তে আমার কোনও ভয় লাগবে না। গল্পে এক জায়গায় আছে ইনস্পেক্টর সূর্যকান্ত মোহনকে ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার করে মোটরসাইকেলে ছুটে চলেছে, আর ডাকাতরা তাদের তাড়া করেছে অ্যাম্বাসাডরে। তাদের এড়াবার জন্য সূর্যকান্ত রাস্তা ছেড়ে এবড়ো-খেবড়ো মাঠে নেমে পড়েছে। মোহন আঁকড়ে ধরে আছে সূর্যকান্তর কোমর আর বাইক বেদম স্পিডে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলেছে মাঠের উপর দিয়ে। আর তারপর? এটাই আসল, এখানেই হাততালি পড়বে সিনেমা হলে—মাঠ থেকে বাইক কাঁচা রাস্তায় নেমেছে, ডাকাতদের গাড়ি আবার তাদের পিছু নিয়েছে, এবার রাস্তা হঠাৎ চড়াই ওঠে। ওঠবার আগে মোটরসাইকেলের স্পিড ভীষণ বাড়িয়ে দেয় সূর্যকান্ত। তার কারণ আর কিছুই না—সামনে একটা দশ হাত চওড়া নালা, তাতে জল বইছে তোড়ে, সেই নালা এক লাফে পেরিয়ে উলটো দিকের উতরাইতে পড়তে হবে। গল্পে অবিশ্যি আছে সূর্যকান্ত স্বচ্ছন্দে নালা টপকে পেরিয়ে গেল, কিন্তু শুটিং-এ বম্বের স্টান্টম্যান সেটা পারবে কি? আর সেটা করার সময় কি আমাকেই থাকতে হবে মোটর সাইকেলের ক্যারিয়ারে স্টান্টম্যানের কোমর জড়িয়ে ধরে?

এ বিষয় এখন কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভাল। যা হবার সে তো পরে জানতেই পারব। কাজটা ভাল

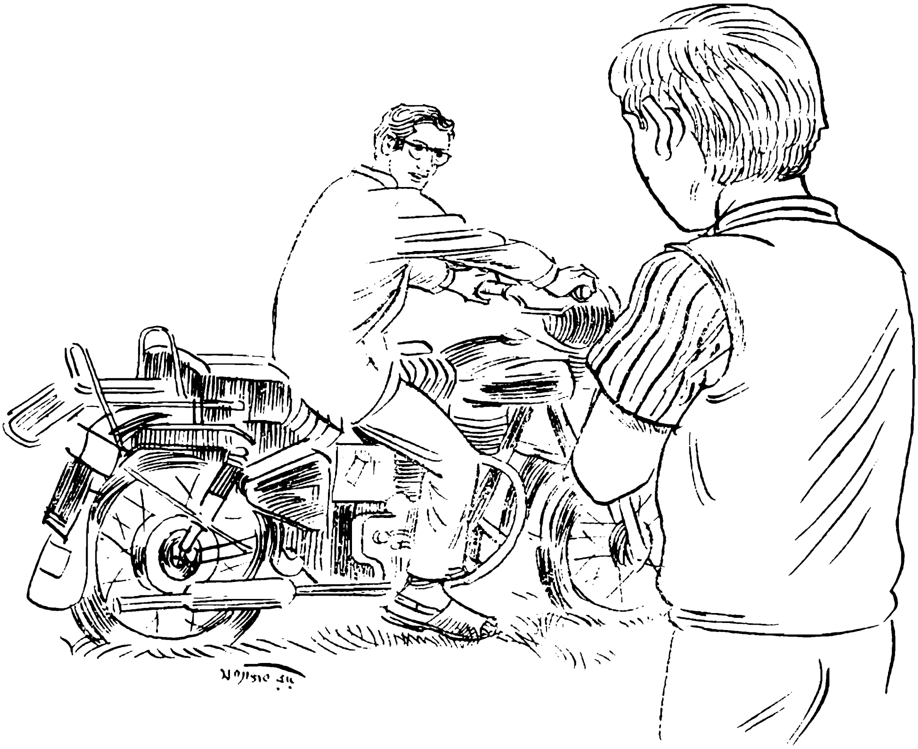

হবার জন্য যদি আমাকেই থাকতে হয় তা হলে তাই করব।

সাইকেল থেকে নেমে বিশুদা বলল, 'সূর্যকান্তর জন্য এই বাইকটা ভাড়া করা হল। আশা করি ক্যাপ্টেনের পছন্দ হবে।'

'ক্যাপ্টেন?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ক্যাপ্টেন আবার কে?'

'ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ', বলল বিশুদা, 'স্টান্টম্যান। আজ রাত্তিরে আসছে বম্বে থেকে।'

কৃষ্ণণ! বম্বে থেকে এলেও লোকটা যে মাদ্রাজি সেটা নাম শুনেই বুঝতে পারলাম।

॥ ৪ ॥

প্রথম দিনের কাজটা খুব ভাল ভাবেই উতরে গেল। প্রথম শটই ছিল আমার—মোহনের পোশাকে এসে ঘরে ঢুকছি দেওয়ানের সঙ্গে। সামনে বাবা, পোশাক বদল দেখে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা। প্রথমবারেই ঠিক হওয়ার জন এক চোট সকলের হাততালি পেলাম। এমনকী মিঃ লোহিয়া শুটিং দেখছিলেন তাঁর নাতিকে সঙ্গে নিয়ে, তিনিও হাততালিতে যোগ দিলেন। আজ বাবা-মার কথা মনে হয়ে মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমন সুন্দর শুটিং তাঁরা দেখলে না জানি কত খুশি হতেন! কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার দ্বিতীয় শটের জন্য তৈরি হতে হবে বলে দুঃখটা ঝেড়ে ফেলে দিতে হল। বিশুদা প্রথম শট-এর সময় ছিল। সে শট-এর পর আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে ফিসফিস করে বলে গেল, 'এইভাবে চালিয়ে যা। কুছ পরোয়া নেহি!'

রাজার পার্টে পুলকেশ ব্যানার্জিও বেশ ভালই করলেন, কিন্তু তিনি একটা কথা বললেন লাঞ্চের সময়, সেটা আমার খুব মজার লাগল।—'জানো মাস্টার অংশুমান, শিশু অভিনেতা পাশে থাকলে আর

বড়দের দিকে কেউ চায় না। আমরা মিথ্যেই খেটে মরছি।' এটাও লক্ষ করলাম যে প্রত্যেক শট-এর আগে পুলকেশবাবু চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন বলে নেন। বোধহয় ঠাকুরের নাম করে নেন।

মমতামাসির অ্যাক্টিং-ও আমার খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে চোখে জল আনার ব্যাপারটা। অনেক অ্যাক্টর নিজে থেকে চোখে জল আনতে পারে না। কান্নার দরকার হলে তারা শটের আগে চোখের কোনায় গ্লিসারিনের ফোঁটা দিয়ে নেয়। তার ফলে চোখ জ্বালা করে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ জলে ভরে যায়। মমতামাসি বললেন তাঁর গ্লিসারিনের দরকার হবে না। অবাক হয়ে দেখলাম যে, সত্যিই তাই। দস্যুরা তাঁর ছেলেকে না নিয়ে ভুল করে অন্য ছেলেকে নিয়ে গেছে জেনে তাঁর এত আনন্দ হয়েছে যে, কান্নায় ভেঙে পড়ে নিজের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বিকেল পাঁচটার মধ্যে পুরো দৃশ্যটা শেষ হয়ে গেল। এর পরের কাজটা অন্ধকার হলে পর হবে; তার মানে সাতটার আগে নয়। পুলকেশবাবু আর মমতামাসি সার্কিট হাউসে ফিরে গেলেন। বাকি কাজটা খুবই সোজা; আমাকে শুধু এ ঘর ওঘর ঘুরতে হবে, আর ক্যামেরা সেটা পাঁচিলের বাইরে থেকে এমনভাবে তুলবে যে, মনে হয় যেন দস্যুরাই ব্যাপারটা দেখছে।

দুটো ঘণ্টা দিব্যি বেরিয়ে গেল গ্রামোফোন শুনে। মিঃ লোহিয়ার একটা চোঙাওয়ালা পুরনো গ্রামোফোন আছে, আর আছে রাজ্যির পুরনো হিন্দি ওস্তাদি গানের রেকর্ড। সেই সব রেকর্ড তিনি বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন। দম দেওয়া গ্রামোফোন এর আগে আমি কখনও দেখিনি। অ্যাসিস্ট্যান্ট মুকুল চৌধুরী খুব ওস্তাদি গানের ভক্ত; সে বলল, এসব রেকর্ড নাকি আজকাল একেবারেই পাওয়া যায় না। অথচ মিঃ লোহিয়া সেগুলোকে এমন যত্নে রেখেছেন যে, এতদিনেও পুরনো হয়নি।

সাতটার কিছু আগেই গান শোনা বন্ধ করে শটের জন্য তৈরি হতে শুরু করলাম। এবার রাজপুত্রের পোশাক, ঠিক পনেরো মিনিট লাগল তৈরি হতে। কিন্তু তা হলে কী হবে, খবর এল যে কাজে একটু দেরি হবে; আসল দস্যু ছগনলাল যে সাজবে সেই জগন্নাথ দে বা জগু ওস্তাদকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশুদা হন্তদন্ত হয়ে সকলকে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছে কেউ জগন্নাথকে দেখেছে কিনা। বিকেলে আমি নিজে দেখেছি ভদ্রলোককে; এর মধ্যে হঠাৎ তিনি গেলেন কোথায়?

এখানে বলে রাখি যে, অ্যাকটর হিসেবে তিনি যতই ভাল হন, লোক হিসেবে আমার জগু ওস্তাদকে তেমন ভাল লাগছে না। তার দুটো কারণ আছে। এক হল, জগু ওস্তাদের হাসিটা পরিষ্কার নয়। সত্যি বলতে কি, পান-দোক্তা খাওয়া অমন দাঁতে পরিষ্কার হতেও পারে না। দ্বিতীয় কারণ হল, দলের দুই চাকর ভিখু আর পঞ্চাননের সঙ্গে ভদ্রলোকের ব্যবহার মোটেই ভাল না। এটা আমার ভীষণ খারাপ লাগে, বিশেষ করে এই কারণে যে, ওরা দুজনেই দারুণ পরিশ্রম করতে পারে।

বিশুদা জগু ওস্তাদকে খুঁজতে যাবার আগে সুশীলবাবুর সঙ্গে কথা বলে গেল যে, ইতিমধ্যে যেন আমার শটটা নেওয়া হয়ে থাকে। আমি তো তৈরি, এখন শুধু বাকি আলো বসানো। সাধারণ বিজলিবাতিতে শুটিং সম্ভব নয়, তাই স্টুডিওর বড় আলো ব্যবহার করতে হবে। ডিরেক্টর সুশীলবাবু এসে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে এ-ঘর থেকে ও-ঘর চলাফেরা করতে হবে। 'মনে মনে গুনগুন করে গান গাও', বললেন সুশীলবাবু, 'আর সেই গানের তালে তালে পা ফেলো। তা হলে চলাটা স্বাভাবিক আর মজাদার হবে। আসলে রাজপুত্রের কিছু করার নেই তাই সে আপনমনে এ-ঘর ও-ঘর করছে। এই ভাবটা ছবিতে ফুটে ওঠা চাই।'

আমি একটু একটু গাইতে পারি, কিন্তু কী গান গাইব সেটা চট করে ভেবে পেলাম না। সুশীলবাবুকে জিজ্ঞেস করাতে উনি একটু ভেবে বললেন, 'ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় জানো?'

আমি হ্যাঁ বলতে সুশীলবাবু বললেন, 'ভেরি গুড, তা হলে ওটাই গুনগুন কোরো।' আমি মনে মনে গানটা একবার গেয়ে নিলাম। পুরো গানের কথা মনে নেই, আর তার দরকারও নেই।

আধঘণ্টার মধ্যে শটটা খুব সুন্দরভাবেই হয়ে গেল। তারও আধঘণ্টা পরে বিশুদা এসে খবর দিল যে, জগু ওস্তাদকে পাওয়া গেছে। বিশুদা একেবারে ফায়ার হয়ে আছে দেখে আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, কিন্তু কথাবার্তাতে বুঝলাম যে জগু ওস্তাদের নেশা করার বাতিক আছে; সে চলে গিয়েছিল রাজবাড়ি থেকে কিছু দূরে বাজারের মধ্যে একটা মদের দোকানে। সন্ধ্যা হলেই সে নাকি নেশা না করে পারে না।

এদিকে অন্য দু'জন দস্যু তৈরি হয়ে বসে আছে, এবার জগু ওস্তাদকে মেক-আপ করে পোশাক পরে ছগনলাল সাজতে হবে। কাজেই আরও প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। বিশুদা এর মধ্যে একবার জিজ্ঞেস করে গেছে আমি বাড়ি যেতে চাই কিনা। আমার কিন্তু সব ব্যাপারটা ভীষণ ভাল লাগছে, তাই বলে দিলাম যে দস্যুদের শট না দেখে ফিরব না।

শট হতে হতে হয়ে গেল সাড়ে ন'টা। তিন গুণ্ডা রাজবাড়ির পাঁচিলের বাইরে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। পাঁচিলটা উঁচু হওয়াতে রাজবাড়ির শুধু চুড়োটা দেখা যাচ্ছে। তাই ছগনলাল তরতরিয়ে গাছে উঠে যায়। আর তার দেখাদেখি অন্য দু'জন গুণ্ডাও। এবার তারা অমৃৎকে দেখতে পায়। ঠিক এই সময় একজন টহলদার সেপাই এসে পড়ে। তার হাঁক শুনে তিন গুণ্ডা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে গিয়ে তাদের গাড়িতে উঠে পালায়।

শুটিং দেখে এটা বুঝতে পারলাম যে নেশাই করুক আর যাই করুক, জগু ওস্তাদ অ্যাকটিং-এ দারুণ পাকা। বিশুদা পরে বলেছিল, 'লোকটা মারাত্মক অভিনেতা। তাই ওর শত বদখেয়াল সত্ত্বেও ওকে না নিয়ে উপায় নেই।' আমি মনে মনে বললাম, 'আর যাই করো বাবা, আমার সঙ্গে অ্যাকটিং করার সময় নেশা করে এসো না। আমি শুনেছি মদের গন্ধ ভয়ানক খারাপ।'

॥ ৫ ॥

শুটিং থেকে রাত করে ফিরে বেশ ক্লান্ত লাগছিল, তাই খেয়ে নিয়েই শুতে চলে গেলাম। আগামীকাল অত ভোরে ওঠার দরকার নেই, কারণ সকালে শুধুই পুষ্করের মেলার ভিড়ের শট নেওয়া হবে, তাতে কোনও অভিনেতার দরকার হবে না। মেলা শুরু হবে কাল থেকেই, কাজেই খুব বেশি ভিড় হবার আগে কিছু শট নিয়ে রাখা দরকার। সন্ধেবেলা আবার কাজ আছে রাজবাড়িতে। এবারে হিরো শঙ্কর মল্লিককে লাগবে। দৃশ্যটা হচ্ছে—রাজা পুলিশে খবর দেবার পর ইনস্পেক্টর সূর্যকান্ত এসে অমৃৎকে জেরা করে সব ব্যাপারটা জেনে নিচ্ছে। কাজেই আমারও কাজ আছে, আর পুলকেশ ব্যানার্জিরও আছে।

ওঠার তাড়া না থাকলেও সাতটার বেশি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলাম না। এক হিসেবে ভালই হল। কারণ বারান্দায় বেরিয়েই বিশুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বিশুদা বলল, 'তুই আমাদের সঙ্গে আসবি?'

আমি বললাম, 'কোথায়?'

'জায়গাটার নাম দৌরাল। এখান থেকে ষোলো কিলোমিটার দূর। গল্পের মতো একটা নালা পাওয়া গেছে, সেটা কৃষ্ণণকে দেখিয়ে দেব। ও একবার পরখ করে দেখতে চায় মোটর সাইকেলে টপকে পেরোনো যায় কিনা।'

'স্টান্টম্যান এসে গেছে?'

'আর বলিস না!' বলল বিশুদা, 'ট্রেন প্রায় তিন ঘণ্টা লেট। কৃষ্ণণকে নিয়ে আমি ফিরেছি প্রায় রাত দেড়টায়।'

'তার মানে মোটর সাইকেলও থাকবে আমাদের সঙ্গে?'

'তা থাকবে বইকী! সেটা যাবে বাসের মাথায়। ওখানে গিয়ে চড়বে কৃষ্ণণ।'

'কৃষ্ণণ কোন দেশি লোক বিশুদা? ম্যাড্রাসি?'

'সেটা দেখলেই বুঝতে পারবি।'

আটটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল। আজ বাস ছাড়া কিছুই যাচ্ছে না, কারণ তিনটে গাড়িই পুষ্কর চলে গেছে শুটিং-এ। তবে আউটিং-এ অনেকেরই উৎসাহ। তাই যারা শুটিং-এ যায়নি তারা প্রায় সকলেই বাসে উঠে পড়ল। সবশেষে বিশুদার সঙ্গে এল একজন লোক যার বছর ত্রিশেক বয়স, গায়ের রঙ মোটামুটি পরিষ্কার, আর হাইট মাঝারির চেয়ে একটু বেশি। ভদ্রলোকের শরীর যে অত্যন্ত ফিট সেটা তার হাঁটাচলা দেখলেই বোঝা যায়।

'স্টান্টম্যান-স্টান্টম্যান করছিলি—ইনিই ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ', বলে বিশুদা ভদ্রলোককে আমার পাশের খালি সিটে বসিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ আমার দিকে চেয়ে ঝলমলে দাঁত বার করে হেসে পরিষ্কার

বাংলায় বললেন, 'নমস্কার।'

আমি তো অবাক! ভাবতেই পারিনি যে কৃষ্ণণ বাঙালির নাম হতে পারে।

বাসের মাথায় মোটর সাইকেল চড়ে গেছে, দু'বার হর্ন দিয়ে ডিলাক্স বাস রওনা দিয়ে দিল।

বাসের সবাই ঘুরে ঘুরে নতুন-আসা স্টান্টম্যানের দিকে দেখছে; আমার চোখটাও চলে গেল তাঁর দিকে। ভদ্রলোক এখনও মিটিমিটি হাসছেন। শেষে আর না থাকতে পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বাঙালি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনার নাম তো—?'

'আমার নাম কৃষ্ণপদ সান্যাল', হেসে বললেন ভদ্রলোক, 'বম্বেতে বাঙালি স্টান্টম্যানকে কেউ পাত্তা দেয় না, তাই একটা দক্ষিণী নাম নিয়েছি। ওখানে ভাঙাভাঙা হিন্দি আর ইংরেজি বলি। কথা তো বলতে হয় না বেশি—আমাদের কথায় কেউ কান দেয় না, শুধু দেখে কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা!'

আমার অদ্ভুত লাগছিল ভদ্রলোককে দেখে। ইনিই শঙ্কর মল্লিক হয়ে সব কঠিন প্যাঁচের কাজগুলো করবেন, আর লোকে ছবি দেখে ভাববে সব বুঝি শঙ্কর মল্লিকই করছেন। বিশুদা বলছিল, হিন্দি ছবির হিরোরা যত ফাইটিং করে, যত ঘোড়া থেকে পড়ে, যত এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি লাফ মেরে চলে যায়—সবই আসলে করে স্টান্টম্যানরা, কিন্তু বাইরের লোকে সেটা জানতেও পারে না।

আমি আরেকবার আড়চোখে চাইলাম ভদ্রলোকের দিকে। কৃষ্ণপদ সান্যাল। তার মানে ব্রাহ্মণ। তাদের বাড়ির ছেলে স্টান্টম্যান হল কী করে? এসব তো জানতে হবে ভদ্রলোকের কাছ থেকে। এটা বেশ বুঝছি যে, একে একটা গোঁফ লাগিয়ে দিলে একটু দূর থেকে শঙ্কর মল্লিকের সঙ্গে বেশি তফাত করা যাবে না। দু'জনের গায়ের রঙ আর গড়ন মোটামুটি একই রকম। বিশুদার বাছাইয়ের প্রশংসা করতে হয়। সে-ই যে এই স্টান্টম্যানকে জোগাড় করে এনেছে সেটা জানি।

'তোমার নাম কী?'

নাম বললাম। তারপর বললাম, 'আমাকে তো বোধহয় আপনার পিছনে বসতে হবে মোটরবাইকে।'

'তা বসবে', বললেন ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ, 'ভয়ের কোনও কারণ নেই। মোটর সাইকেলের স্টান্ট আমার মতো কেউ করতে পারে না। বাইশটা হিন্দি-তামিল ছবিতে আমি মোটর সাইকেল চালিয়েছি, একবারও গড়বড় হয়নি।'

'তাই বুঝি?'

'ইয়েস স্যার।'

ভদ্রলোককে দেখে কেন জানি বেশ ভাল লাগছিল। চেহারার মধ্যে এমন একটা নির্ভীক ভাব চট করে দেখা যায় না। আর এমন পরিষ্কার হাসি যে মানুষের, তার মধ্যে কোনও নিচুভাব থাকতে পারে কি? মনে তো হয় না।

ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ গুনগুন করে হিন্দি গানের সুর ভাঁজছেন দেখে আমি আর কোনও কথা বললাম না। ভাল করে আলাপ করার অনেক সময় আছে। নালা টপকানোর শুটিংটা হবে দু' সপ্তাহ পরে, সেটা আমি জেনে নিয়েছি।

দৌরাল একটা ছোট্ট শহর। সেটা ছাড়িয়ে বাস আরও কিছুদুর যাবার পর বিশুদা এক জায়গায় থামতে বলল। বাঁয়ে বনের মধ্যে দিয়ে একটা পায়ে হাঁটা পথ চলে গিয়েছে। বুঝতে পারলাম সেটা দিয়ে আর বাস যাবে না, আর সেটা দিয়েই আমাদের যেতে হবে। এইসব জায়গা বাছার জন্য সুশীলবাবু বিশুদা আর ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে নিয়ে গত মাসেই একবার আজমীর ঘুরে গেছেন। জায়গা বাছার কাজটা সবসময় আগেই সেরে নিতে হয়; শুটিং একবার আরম্ভ হয়ে গেলে তখন আর অন্য কিছুর সময় থাকে না। এই নালাটা ডিরেক্টর সাহেবের পছন্দ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যাকে মোটর সাইকেল করে এটা টপকে পেরোতে হবে তারও তো পছন্দ হওয়া চাই!

বিশুদা বলল, জায়গাটা বড় রাস্তা থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটাপথ। জিপে করে অনায়াসেই যাওয়া যায়, এমনি গাড়ি বা বাসে সম্ভব নয়।

আমরা বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। মোটর সাইকেলটাও নামানো হয়েছে; ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ তাতে চড়ে বিকট আওয়াজ তুলে স্টার্ট দিয়ে আমাদের পাশে-পাশেই চললেন।

পাতলা বন, গাছপালাগুলো সব অচেনা, এ দৃশ্যের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের কোনও মিল নেই। ক্রমে বড় রাস্তার গাড়ি চলাচলের শব্দ একেবারে মিলিয়ে এল। এখন শুধু মোটর সাইকেলের শব্দ আর পাখির ডাক।

মিনিটখানেক পরে একটা কুলকুল শব্দ পেলাম। বুঝলাম নালা এসে গেছে। এখানে পথটা একটু চওড়া আর একটু চড়াই। খানিকদূর চড়াই গিয়ে রাস্তাটা হঠাৎ ঢালু নেমে গিয়ে একেবারে নালায় পড়েছে। নালাটা হাত দশেক চওড়া হলেও মোটর সাইকেলকে লাফিয়ে পার হতে হবে প্রায় বিশ পঁচিশ হাত, তা হলে ঠিক এদিকে চড়াই-এর মুখ থেকে ওদিকে উতরাইয়ের মুখে গিয়ে পড়বে।

'কী কাপ্তেন, কী মনে হচ্ছে?'

বিশুদা ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল। কৃষ্ণণ ইতিমধ্যে বাইক থেকে নেমে সেটাকে দাঁড় করিয়ে নালা আর রাস্তাটাকে ঘুরে ঘুরে দেখছে।

'দাঁড়ান, একবার ওপারটা দেখে আসি।'

কৃষ্ণণ ঢাল দিয়ে নেমে জলের ধারে গিয়ে প্যান্টটাকে গুটিয়ে খানিকটা উপরে তুলে ছপ্ ছপ্ করে জল পেরিয়ে ওপারে চলে গেলেন। মিনিটখানেক ওদিকটা দেখার পর আবার এদিকে ফিরে এসে বললেন, 'আমি একবার ট্রাই করে দেখব। আপনারা একটু পাশে সরে দাঁড়ান।'

দলের সবাই হুড়মুড় করে নালার ধারে নেমে রাস্তার দু'পাশে ভাগ হয়ে দাঁড়াল। আমি বাঁ দিকের দলের সঙ্গে রয়েছি, আমার চোখ রাস্তার দিকে। কৃষ্ণণ ইতিমধ্যে আবার ওপরে ফিরে এসে মোটর সাইকেলের দিকে এগিয়ে গেছে। রাস্তার দু'পাশে ঝোপ থাকার জন্য কৃষ্ণণকে আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ফটফটানি শোনা যাচ্ছে। আওয়াজ যেভাবে কমে আসছে তাতে বুঝতে পারছি কৃষ্ণণ বাইকটাকে বেশ দূরে নিয়ে যাচ্ছেন স্পিড তোলার সুবিধার জন্য।

'রেডি হলে বলবেন!' হাঁক দিল বিশুদা।

কয়েক সেকেন্ড পরেই উত্তর এল—

'রেডি! আই অ্যাম কামিং।'

এবার বাইকের শব্দটা ক্রমে বেড়ে যাওয়াতে বুঝতে পারলাম সেটা রওনা দিয়েছে। রওনা দেওয়া, আর ঝোপের পিছন থেকে হঠাৎ ম্যাজিকের মতো বেরোনো—এই দুটো অবস্থার মধ্যে ব্যবধান বড়জোর তিন সেকেন্ডের। আর তার পরেই ঘটল তাক লাগানো ব্যাপারটা। একটা হিংস্র, ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অনায়াসে দশ হাত দূরে তার শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে, সেইভাবে,

আর ঠিক সেই রকম সহজে আর সতেজে ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণের মোটরবাইক শূন্য দিয়ে লাফিয়ে নালা টপকে উলটোদিকের উতরাইয়ের মুখটাতে পড়ে গড়গড়িয়ে নেমে ওদিকের ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর পরে একটাই জিনিস হবার ছিল, আর হলও তাই। দলের সব কটি লোক একসঙ্গে হাততালি দিয়ে কৃষ্ণণের এই আশ্চর্য স্টান্টের তারিফ করল।

কিন্তু এইখানেই খেলার শেষ নয়। এর পরে যেটা হল সেটা আমি সারাজীবন ভুলতে পারব না। ওপার থেকে হঠাৎ কৃষ্ণণের ডাক শোনা গেল।

'মাস্টার অংশুমান।'

আমি আমার নামটা শুনে হঠাৎ কেন জানি থতমত খেয়ে গেলাম। অংশুমান যেন আমি নই; নামটা যেন অন্য কারুর।

'কোথায়—মাস্টার অংশুমান!' আবার এল ডাক।

এদিকে বিশুদা আমার দিকে এগিয়ে এসেছে।

'তোকে ডাকছে—তুই যাবি?'

'যাব।'

হঠাৎ মনের সমস্ত ভয় যেন ম্যাজিকের মতো উবে গেল। আমার মন বলল, ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ যেখানে সারথি সেখানে ভয়ের কিছু থাকতে পারে না।

আমি চেঁচিয়ে বলে দিলাম, 'এক্ষুনি আসছি।' তারপর প্যান্ট তুলে নালা পেরিয়ে হাজির হলাম ওপারে। বিশ হাত দূরে ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ বসে আছেন বাইকে; আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

'রিহার্সালটা হয়ে যাক!'

আমি এগিয়ে গেলাম ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণের দিকে। ভদ্রলোক ক্যারিয়ারের উপর একটা চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিলেন আমায় কোথায় বসতে হবে। আমি বসলাম।

'কিচ্ছু ভয় নেই; শুধু আমার কোমরটাকে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরবে।'

আমি ধরলাম। ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ বাইকটাকে ঘুরিয়ে আরেকটু দূরে নিয়ে গেলেন। তারপর আবার নালার দিকে ঘুরিয়ে এঞ্জিনে একটা হুঙ্কার দিয়ে বাইকটা ছেড়ে দিলেন।

কোমর জড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি কিছুই দেখিনি, শুধু জানি যে যখন চোখ খুললাম তখন আমি উলটো পারে চলে এসেছি, আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে, আর সকলে নতুন করে হাততালি দিচ্ছে আর শাবাশ শাবাশ বলছে।

'কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ।

আমি বললাম, 'দারুণ মজা, দারুণ আরাম।'

'যাক, আর কোনও ভাবনা নেই। কাল স্টেশন থেকে আসার পথে বিশুবাবু বলেছিলেন সিনটার কথা। আমি বললাম, কোনও চিন্তা নেই। ছেলেটি যদি সাহস করে বাইকে চড়তে পারে তা হলে আমার দিক দিয়ে কোনও গড়বড় হবে না।'

এর মধ্যে আরও অনেকে আমাদের কাছে এসে পড়েছে। সুশীলবাবু পুষ্করে শুটিং করছেন, নাহলে উনিও নিশ্চয় খুবই খুশি আর নিশ্চিন্ত হতেন। শঙ্কর মল্লিক আমার পিঠ চাপড়ে 'ব্রেভ বয়' বলে তারিফ করলেন, তারপর কৃষ্ণণের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার এই স্টান্টের ব্যাপারে সত্যিই চিন্তা ছিল। জানি আমাকে এসব কিছুই করতে হবে না, কিন্তু যে করবে তাকে মানাবে কিনা সেইটেই ছিল ভাবনা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার মতো একটা গোঁফ লাগিয়ে দিলে একটু দূর থেকে বা পিছন থেকে কেউ আর তফাতই করতে পারবে না।'

যে কাজের জন্য আসা হয়েছিল সেটা হয়ে গেছে বলে সবাই আবার বাসে উঠল। বারোটার মধ্যে সার্কিট হাউসে দুপুরের খাওয়া সেরে যেতে হবে মিঃ লোহিয়ার বাড়ি।

নালা টপকানোর ব্যাপারে রিহার্সালটা এভাবে উতরে যাওয়াতে আমার যে কী নিশ্চিন্ত লাগছে তা বলতে পারি না। সমস্ত ছবিটাতে এটাই আমার সবচেয়ে কঠিন কাজ, আর এটা নিয়েই ছিল সবচেয়ে বেশি ভাবনা। ভাগ্যিস কৃষ্ণণকে পাওয়া গিয়েছিল! ভাল স্টান্টম্যান যে কী জিনিস সেটা আজ প্রথম বুঝলাম।

॥ ৬ ॥

বিকেল পাঁচটার মধ্যে মিঃ লোহিয়ার বাড়িতে দুপুরের কাজটা হয়ে গেল। আমার মন সবচেয়ে খুশি আছে এই কারণে যে, আমার ভুলের জন্য বারবার একই শট নিতে হচ্ছে না। আমি বুঝেছি যে ক্যামেরার ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। হিরো শঙ্কর মল্লিকও প্রথম দিনে ভালই অ্যাকটিং করেছেন। এই একজনের সম্বন্ধে কেউ কিছুই জানত না, কারণ ইনিও নতুন লোক। পরে শঙ্করবাবু নিজেই বলেছিলেন যে উনি নাকি ছবির পোকা; বহু ভাল বিদেশি ছবিতে বিদেশি অ্যাকটরদের অভিনয় দেখেছেন। তাতে নিশ্চয়ই অনেকটা সাহায্য হয়েছে, কারণ উনি যেটা করলেন সেটাকে প্রায় অ্যাকটিং বলে মনেই হয় না। আজ শুটিং দেখতে এখানকার একজন সত্যিকারের পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলেন। এঁর নাম মিঃ মাহেশ্বরী, মিঃ লোহিয়ার খুব চেনা। তিনি সব দেখে-টেখে খুব তারিফ করে গেলেন।

সন্ধ্যায় সার্কিট হাউসে ফিরে এসে আবার ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা হল। সারা দুপুরে আমার অনেকবার মনে হয়েছে ভদ্রলোকের কথা, আর সেইসঙ্গে সকালের তাক-লাগানো ঘটনাটা। এটা জানি যে, মা-বাবা এখানে থাকলে কখনওই এ জিনিস করতে দিতেন না। বিশুদা বলে দিয়েছে—'বাড়িতে যখন চিঠি লিখবি, খবরদার এই স্টান্টের কথাটা লিখবি না। ওটা কাকা-খুড়িমা একেবারে ছবি দেখতে গিয়ে জানতে পারবেন, তার আগে নয়। জানলে সব দোষ পড়বে আমার ঘাড়ে।'

'কীরকম কাজ হল?' ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ জিজ্ঞেস করলেন।

'খুব ভাল। তবে সকালের নালার কাজের চেয়ে ভাল নয়।'

'একটা কথা বলছি তোমায়', বললেন কৃষ্ণণ, 'আমাকে এবার থেকে কেষ্টদা বলে ডাকবে। ওটাই

আমার আসল নাম। তোমাদের কাছে তো নিজেকে মাদ্রাজি বলে পরিচয় দেবার কোনও কারণ নেই।'

এই ভাল। আমার নিজেরও ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণকে দাদা বলতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু কীভাবে শুরু করব সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

একটা কথা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, সেটা এই বেলা বলে ফেললাম।

'তুমি কী করে এই স্টান্টম্যানের কাজে ঢুকলে কেষ্টদা?'

'সে অনেক ব্যাপার', বলল কেষ্টদা, 'আমি পণ্ডিতের বাড়ির ছেলে। আমার বাড়ি কোন্নগর। বাপ ছিলেন ইস্কুলে সংস্কৃত আর অঙ্কের মাস্টার। বোধহয় এখনও আছেন। আমি ছিলুম ইস্কুল-পালানো ছেলে। ক্লাস কামাই করে হিন্দি ফাইটিং-এর ছবি দেখতে যেতুম, আর বাবার কাছে বেদম মার খেতুম। লাঠির বাড়ি। কিন্তু তখনই একটা কায়দা শিখেছিলুম; পিঠে লাঠি পড়লেও তেমন ব্যথা লাগত না। আমার বাবা যে খুব ষণ্ডা লোক ছিলেন তা না। সে ছিলেন আমার ঠাকুরদা। তিনিও সংস্কৃতের পণ্ডিত, কিন্তু ব্যায়াম করতেন রেগুলার। মুগুর ভাঁজা। একবার একটা মেড়া শিং বাগিয়ে তাড়া করেছিল ঠাকুরদাকে। উনি উলটে মেড়ার দিকে তেড়ে গিয়ে তার শিং দুটো ধরে মট করে ভেঙে দেন। বুঝে দেখো কেমন জোর। আমিও ব্যায়াম করেছি, তবে বেশি মাসল হলে স্টান্টের ব্যাপারে অসুবিধা হয়। বডিটা হবে স্প্রিং-এর মতো। মাটিতে পড়ার সময় হাড়গোড় সব আলগা দিতে হবে, তাতে হাড়ে চোটটা কম লাগবে। কম করে পাঁচশো বার পড়েছি ঘোড়ার পিঠ থেকে গত দশ বছরে। চোট যে একেবারেই লাগেনি তা নয়; সারা গায়ে ছড়ে যাওয়ার দাগ রয়েছে। কিন্তু শটের সময় কেউ কোনওদিন বুঝতে পারেনি চোট লাগল কিনা।'

কেষ্টদা একটু থেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার শুরু করল।

'তেরো বছর বয়সে ইস্কুল ছাড়ি। বাবা হাল ছেড়ে দেন। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় গিয়ে শেয়ালদার টাওয়ার হোটেলে বয়ের কাজ নিই। পাঁচ বছর সেই কাজ করে একশো ছাপ্পান্ন টাকা জমিয়ে একদিন ফস করে থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনে বম্বে মেলে উঠে পড়লুম। দু'দিন লাগল বম্বে পৌঁছতে। গমগমে শহর, কাউকে চিনি না, কেবল জানতুম বম্বে টকিজ। গিয়ে শুনলুম বম্বে টকিজ আর নেই। কোথায় যাব? ঘুরতে ঘুরতে একে-ওকে জিজ্ঞেস করে শেষটায় প্যারোলে রাজকমল স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলুম। শুনলুম বাঙালি ডিরেক্টর স্বদেশ মুখার্জি শুটিং করছেন। সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লুম স্টুডিওর ভেতর। চুপ করে একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

'লাকটা যে ভাল ছিল সেটা এই ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবে। হিরো আর ভিলেনে মারপিটের সিন হচ্ছিল। দু'জনের জায়গাতেই স্টান্টম্যান কাজ করছে। হিরোর স্টান্টম্যানকে পেটে লাথি খেয়ে ছিটকে মেঝেতে পড়তে হবে। যেমন-তেমন ভাবে ছিটকে পড়ে যাওয়ার প্র্যাকটিস কলকাতায় থাকতে হোটেলের ছাতে অনেক করেছি। এখানে সেটা কীভাবে হয় দেখবার জন্য লুকিয়ে আছি। যেটা হল সেটা এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার। হিসেবের সামান্য গণ্ডগোলে ছিটকে পড়ার সময় হিরোর স্টান্টম্যানের মাথাটা লাগল একটা টেবিলের কোণে। ব্যস, ব্ল্যাক আউট। তাকে চ্যাংদোলা করে সেট থেকে বার করে নিতে হল। এদিকে ডিরেক্টরের মাথায় হাত, প্রোডিউসারের মাথায় হাত। স্টান্টম্যান ছাড়া কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। একদিন বন্ধ হলে বিশ হাজার টাকা লোকসান। যা থাকে কপালে করে ডিরেক্টরের কাছে গিয়ে ধরে পড়লুম। ভাঙা ভাঙা হিন্দি-ইংরিজি মিশিয়ে বললুম, আমার নাম উন্নি কৃষ্ণণ, আমি মালাবারের লোক, স্টান্টম্যান। আমাকে দিয়ে পরীক্ষা করা হোক।

'এমনই সংকটের অবস্থা যে আমি যে কাউকে না বলে শুটিং দেখতে ঢুকেছি, তার জন্য কেউ কিছু বলল না। ডিরেক্টর সাহেব তক্ষুনি বললেন যে, একে নিয়ে একটা রিহার্সেল হোক, উতরে গেলে একে দিয়েই কাজ করানো হবে।

'দাঁত কামড়ে নেমে পড়লুম। রিহার্সেল পার্ফেক্ট, টেক পার্ফেক্ট। সেইদিন থেকে স্টান্টম্যান ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণের জন্ম। তবে এটা জেনেছি যে একাজে নাম হয় না। ফাইটিং-এর ছবি দেখে কেউ জিজ্ঞেসও করে না কে স্টান্টম্যান ছিল। তবে পেট চলে যায়, কারণ কাজের অভাব নেই। যত দিন যাচ্ছে, ছবিতে স্টান্ট ততই বেড়ে যাচ্ছে। একটা ছবিতে হেলিকপ্টারের তলায় দড়ি ধরে ঝুলতে হয়েছিল। ওয়ান স্টান্ট, টোয়েন্টি ফাইভ থাউজ্যান্ড রুপিজ। প্রাণ হাতে নিয়ে কাজ করা তো! প্রতি স্টান্টেই জান লড়িয়ে দিতে

হয়, কারণ একটু এদিক-ওদিক হলেই, মৃত্যু না হোক, মারাত্মক জখম হতেই পারে। দেখলেই তো সকালে, ব্যাপারটা কত রিস্কি। একটু গড়বড় হলে কী হত ভাবতে পারো?'

ভাবতে পারি, কিন্তু ভাবতে চাই না। আমি জানি যে আমার ভাগ্যটা এখন লটকে গেছে কেষ্টদার ভাগ্যর সঙ্গে। সেখান থেকে পিছোনোর কোনও উপায়ও নেই, ইচ্ছেও নেই।

পাহাড়ের পিছনে সন্ধ্যার আকাশ থেকে শেষ রঙটুকু মুছে গেল। লেকের জল কালচে নীল। হাঁসগুলিকে এখনও দেখা যাচ্ছে, একটু পরে আর যাবে না। ভিতরে সকলে তাস খেলতে বসে গেছে। সেটা মাঝে মাঝে হই-হুল্লোড় থেকে বোঝা যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি তাস খেলো না কেষ্টদা?'

'খেলি,' বলল কেষ্টদা, 'আজ দুপুরেই খেলছিলাম। ভাল কথা—তোমাদের দলের একজন—তাকে জগু ওস্তাদ বলে ডাকে—সে কে বলো তো?'

'সে তো দস্যু দলের নেতা সাজছে। ও বেশ নামকরা অ্যাক্টর। আসল নাম জগন্নাথ দে।'

'আমি আবার ছাই বাংলা ছবি প্রায় দেখিইনি গত দশ বছরে।'

'কিন্তু ওর কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে কেন?'

'কারণ তাসের দলে ও-ও ছিল। ওই আমাকে ডেকে নিল, আমি ঘরে বসে ছিলাম। লোকটা গোলমেলে। সাংঘাতিক জোচ্চোর। কিন্তু আমার চোখে তো ধুলো দিতে পারবে না, একবারের পর দ্বিতীয়বারেই ধরে ফেলেছি। তাতে লোকটা যেরকম ভাব করল সেটা মোটেই ভাল লাগল না। এরকম মুখ-খারাপ করতে আমি খুব কম লোককে শুনেছি। ও লোক সুবিধের নয়।'

সেটা যে আমার জানতে বাকি নেই সেটা গতকালের ঘটনা বর্ণনা করে আমি বুঝিয়ে দিলাম।

'হুঁ...' বলে কেষ্টদা কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে ভুরু কুঁচকে রইল। তারপর বলল, 'তোমার মা-বাবা নেই কলকাতায়?'

আমি বললাম, 'আছেন। আর আমার এক দিদি আছেন, তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'মা-বাবাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না?'

'উঁহুঁ। বিশেষ করে এখন তুমি আসাতে আর হচ্ছে না।'

'গুড। কাজটা যাতে ভাল হয় সেটাই দেখতে হবে। খুব মন দিয়ে কাজ করবে। আর করলে তুমি নাম করবে সেটা আমি পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'শুধু আমি কেন, তুমিও করবে!'

কেষ্টদা মাথা নাড়ল।

'উঁহুঁ। স্টান্টম্যানদের নামের মোহ কাটাতে হয়। নাম করলে করবে তোমাদের হিরো, আর তাতেই যা আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন।'

কেষ্টদা উঠে পড়ল।

'যাই দেখি কোনও তাসের দলে ঢুকতে পারি কিনা।'

॥ ৭ ॥

তিনদিন পরে আমার সবচেয়ে মজাদার শুটিং হল পুষ্করের মেলায়। আজ প্রথম আমাকে দুটো পার্টে অভিনয় করতে হল। মোহন আর অমৃতের কথা বলার দৃশ্য দু'বার করে তুলতে হল। প্রথমবার আমি মোহন সাজলাম, আর আমার সামনে অমৃতের জায়গায় দাঁড়াল শ্যামসুন্দর বলে আজমীর থেকেই নেওয়া একজন বারো বছরের ছেলে। দ্বিতীয়বার আমি সাজলাম অমৃৎ, আর সেই একই শ্যামসুন্দর দাঁড়াল মোহনের জায়গায়। দৃশ্যটা যখন লোকে পর্দায় দেখবে তখন কিন্তু শ্যামসুন্দরকে দেখাই যাবে না; তার বদলে দেখা যাবে মোহন আর অমৃৎ কথা বলছে।

কিডন্যাপিং-এর দৃশ্যটা যেখানে নেওয়া হল সেখানে মেলার কোনও ভিড় ছিল না; থাকলে খুব মুশকিল হত। জগু ওস্তাদ দিনের বেলা নেশা করেন না। তাই তিনি ছগনলালের পার্টে কাজটা ভালই করলেন। তবে যেখানে ছগনলাল অমৃৎবেশী মোহনকে কোলপাঁজা করে তুলে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে

ফেলছে সেটা জগু ওস্তাদ আরেকটু সাবধানে করতে পারতেন। শটটা নেওয়ার পরে আমার কোমরে যে ব্যথাটা আরম্ভ হল, সেটা ছিল প্রায় সন্ধ্যা অবধি।

সন্ধ্যাবেলা সার্কিট হাউসে ফিরে এসে কেষ্টদার সঙ্গে দেখা হল। গত দুদিন সকাল থেকে রাত অবধি সব শুটিংই রাজবাড়িতে হয়েছে। সেখানে কেষ্টদা ছিল, কিন্তু কাজের পরে আমার সঙ্গে আর কথাই হয়নি। রাত করে সার্কিট হাউসে ফিরে বেশ ক্লান্ত লাগায় দু'দিনই স্নান করে খেয়েই শুয়ে পড়েছি। আমার কৌতূহল ছিল জানবার জন্য এই দু'দিনে কোনও বলার মতো ঘটনা ঘটেছে কিনা। আজ সন্ধ্যায় সে-প্রশ্নের উত্তর পেলাম।

কেষ্টদা মুখে গুনগুন করে গান গাইলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম ওর মাথায় কী যেন একটা চিন্তা পাক খাচ্ছে, কারণ ওর ভুরুটা ছিল কুঁচকোনো।

'তোমাকেই খুঁজছিলাম', বলল কেষ্টদা।

'কী ব্যাপার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ব্যাপার গুরুতর।'

'কেন বলো তো?'

'তোমরা তো এ-দু'দিন শুটিং করছিলে রাজবাড়িতে; আমার তো সারাদিন কাজ নেই, তাই এদিক-ওদিক ঘুরছিলুম। আজমীরের কিছু দেখবার জিনিসও দেখে নিলুম। কাল রাত্তিরে আটটা নাগাদ একবার গিয়েছিলুম বাজারে। ভাবলুম ঠাণ্ডা পড়েছে, গরম চায়ে একটু গলাটা ভিজিয়ে নিই। চায়ের দোকানটা তার আগের দিনই দেখা ছিল। যাই হোক, দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় পাশের দোকান থেকে দেখলাম দু'জন লোক বেরোলো। দোকানটা মদের। দুটো লোকের মধ্যে একটা হল তোমাদের জগু ওস্তাদ, আর আরেকটাকে রাজবাড়িতে দেখেছি। চাকরের কাজ করে। নাম বোধহয় বিক্রম। চাকরটাকে ওস্তাদের সঙ্গে দেখেই মনের ভেতর একটা সন্দেহ ধক করে উঠেছে। ওরা দু'জন কিন্তু বাইরে এসে চলে গেল না; কথা বলতে বলতে গেল দোকানের পিছন দিকে অন্ধকারে।

'কী ঘটছে জানার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ হওয়াতে আমিও বেঞ্চি ছেড়ে উঠে খুব সাবধানে এগিয়ে গেলুম যেদিকে ওরা গেছে সেইদিকে। দুটো দোকানের মাঝখানে একটা গোরুর গাড়ি দাঁড়ানো ছিল। সেটার পাশে গা ঢাকা দিয়ে কয়েক পা এগোতেই জগু ওস্তাদের গলা পেলুম। বুঝলুম সে বিক্রম লোকটাকে কোনও একটা কাজে সাহায্য করার কথা বলছে। সেটা করে দিলে জগু তাকে মোটা টাকা বকশিশ দেবে। কত টাকা সেই নিয়েও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হল, শেষটায় এক হাজারে রফা হল। বুঝতেই পারছ, রাজবাড়ি থেকে কিছু চুরি করার তাল করছে ওরা। চাকরটাই চুরি করে জিনিসটা জগু ওস্তাদকে এনে দেবে, আর তার জন্য এক হাজার টাকা পাবে।'

আমার কাছে এক ধাক্কায় সব জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল। নীলকান্তমণি। জগু ওস্তাদের সামনে অনেকবার মণিটার কথা হয়েছে। সেটা যে কত দামি তা সে জানে। সেইটে সে বিক্রমের সাহায্যে হাতাবার তাল করছে। আর সেটা জেনে গেছে কেষ্টদা।

নীলকান্তমণির ব্যাপারটা কেষ্টদাকে বলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি যে ওদের কথা শুনেছ সেটা ওরা টের পায়নি তো?'

'মনে তো হয় না', বলল কেষ্টদা, 'আমি বেশিক্ষণ থাকিনি। গোলমালটা কোথায় বুঝেই আমি সটকে পড়েছি। এখন কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারে কী করা যায়?'

'তুমি কি মনে করো ব্যাপারটা বিশুদাকে বলা উচিত?' কেষ্টদা মাথা নাড়ল। 'তাতে সুবিধা হবে না। জগু ওস্তাদের কাজ এখনও বাকি আছে। ওর যদি একদিনও শুটিং না হত তা হলে ওকে বাদ দিয়ে অন্য লোক নেওয়া যেত। কিন্তু এখন ও কনটিনিউইটি হয়ে গেছে।'

'কী হয়ে গেছে?'

'কনটিনিউইটি। তার মানে ওকে নিয়ে তিনদিন কাজ হবার ফলে ও-ই ছগনলাল গুণ্ডা হয়ে গেছে। ওর বদলে অন্য লোক নিতে গেলে তাকে নিয়ে ওই তিনদিনের কাজ আবার নতুন করে করতে হবে। তাতে লাখ টাকা লোকসান। জগু লোকটা জোর পাচ্ছে শুধু এই কারণেই। ও জানে যে ওকে ছাড়া চলবে না। সেই সুযোগে লোকটা এই বদমাইশিটা করার তাল করছে।'

'তা হলে?'

'তা হলে মুখ বন্ধ করে বসে থাকা, আর প্রাণপণে আশা করা যাতে ওরা চুরিটা না করতে পারে। যে-মণিটার কথা বলছ সেটা কত বড়?'

'প্রায় একটা পায়রার ডিমের মতো।'

'কত দাম তা কিছু বলেছে?'

'বলেছে দামের কোনও হিসেব নেই। যাকে বলে অমূল্য।'

'বোঝো!'

কেষ্টদা গম্ভীর মুখ করে চলে গেল।

রাত্তিরে খাবার পর ঘুমোতে যাবার আগে একবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বাইরে ঝলমলে চাঁদনি রাত, লেকের জলটা চিকচিক করছে, এমন সময় একটা শব্দ শুনে পিছনে ফিরতে হল।

বারান্দায় লোক এসেছে।

জগু ওস্তাদ। আমি তো অবাক! লোকটা যে আমারই দিকে আসছে! আমার সঙ্গে ওর কী দরকার থাকতে পারে? আর এখন তো নেশা করেছে—সমস্ত বারান্দা দুর্গন্ধে ভরে যাবে।

না, গন্ধ তো নেই। আজ দিব্যি সুস্থ লাগছে ভদ্রলোককে।

'কেমন আছিস তুই?'

এ আবার কী প্রশ্ন!

আমি বললাম, 'কেন, ভালই তো আছি।'

'দুপুরে শট-এর পর দেখছিলাম কোমরে হাত বুলোচ্ছিস। বেশি চোট লাগেনি তো?'

'না, না। এখন আর ব্যথা নেই।'

'ভেরি গুড। ভাবনা হচ্ছিল তোর জন্য, তাই ভাবলাম একবার খোঁজ নিই।'

'আমি ভাল আছি।'

জগু ওস্তাদ চলে গেল।

আজ যে মানুষটাকে একদম অন্যরকম বলে মনে হল!

কেষ্টদা ঠিক শুনেছিল তো?

॥ ৮ ॥

আরও সাতদিন কেটে গেল।

এখন শুটিং-এর কাজটা বেশ মেশিন-মাফিক চলেছে। সবাইয়েরই সবকিছু সড়গড় হয়ে গেছে, তার ফলে কাজের স্পিডও বেড়ে গেছে। এর মধ্যে মা-বাবা দুজনেরই চিঠি পেয়েছি; আমার কাজ ভাল হচ্ছে জেনে দু'জনেই খুব খুশি।

বিশুদা ছাড়াও আরও কয়েকজন আছে যারা রোজই একবার এসে আমার খোঁজ নিয়ে যায়। তার মধ্যে অবিশ্যি মমতামাসি একজন। উনি বেশ বুঝতে পারেন মায়ের অভাব কী জিনিস। সত্যি বলতে কি, উনি থাকাতে সুবিধাই হয়েছে, না হলে সব জিনিস সবসময় খেয়াল করা মুশকিলই হত। এ ছাড়া আছেন সুশীলবাবু, যিনি এমনিতে একটু গম্ভীর মেজাজের লোক, কিন্তু তাও একবার অন্তত এসে 'কী, সব ঠিক তো?' কথাটা বলে যান। সুশীলবাবুর সহকারীদের মধ্যে মুকুল চৌধুরীকে আমার এমনিতেই ভাল লাগে, কারণ কাজের সময় আমার ব্যাপারে উনি খুব বেশিরকম দৃষ্টি রাখেন। একটা শট্-এ যদি আমার কুর্তার উপরের বোতামটা খোলা থাকে, তা হলে সেই দৃশ্যের অন্য সব শটেই সেটা খোলা থাকছে কিনা সেটা দেখার ভার মুকুল চৌধুরীর উপর।

কেষ্টদার ধারণা যে ভুল সেটা আমার মনে আরও দানা বাঁধল যখন দেখলাম পর পর এই সাতদিনেও জগু ওস্তাদের দিক থেকে কোনও গোলমাল দেখা গেল না। আমি এখনও সুযোগ পাইনি, কিন্তু পেলেই এ-কথাটা কেষ্টদাকে বলব বলে ঠিক করে রেখেছি।

সাতদিন অবিশ্যি ছবির কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। পুলকেশ ব্যানার্জি আর মমতামাসির কাজ আজ সকালেই হয়ে গেছে, ওঁরা আজ সন্ধ্যায় কলকাতা ফিরে যাবেন। ইতিমধ্যে মোহনের গরিব স্কুলমাস্টার বাবার পার্ট করার জন্য আজমীর থেকে একজন বছর চল্লিশেকের ভাল বাঙালি অ্যাকটর পাওয়া গেছে। এঁকে নিয়ে একদিনের কাজও হয়ে গেছে। কেষ্টদাকে কাজে লেগেছে এর মধ্যে তিনদিন, তার মধ্যে একদিন তাকে আরেকজন নতুন-আসা স্টান্টম্যানের সঙ্গে ফাইটিং করতে হয়েছে। আসলে ফাইটিংটা ছবিতে হবে ছগনলাল আর সূর্যকান্তের মধ্যে। তিনজনের মধ্যে একজন গুণ্ডা সূর্যকান্তের হাতে লাথি মেরে হাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে ফেলে দিয়েছে। সেটা আবার পাবার জন্যই সূর্যকান্তকে ঘুঁষোঘুঁষি করতে হচ্ছে। ছগনলাল-বেশী জগু ওস্তাদ আর সূর্যকান্ত-বেশী শঙ্কর মল্লিককে গায়ে না লাগিয়ে ঘুঁষি চালানোর অ্যাকটিং করতে হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু যেখানেই ঘুঁষি খেয়ে ছিটকে পড়ার ব্যাপার আছে, সেখানেই অ্যাকটরের বদলে স্টান্টম্যান ব্যবহার করতে হয়েছে।

গুণ্ডাদের আস্তানার জন্য শহরের একটু বাইরে একটা তিনশো বছরের পুরনো পোড়ো বাড়ি পাওয়া

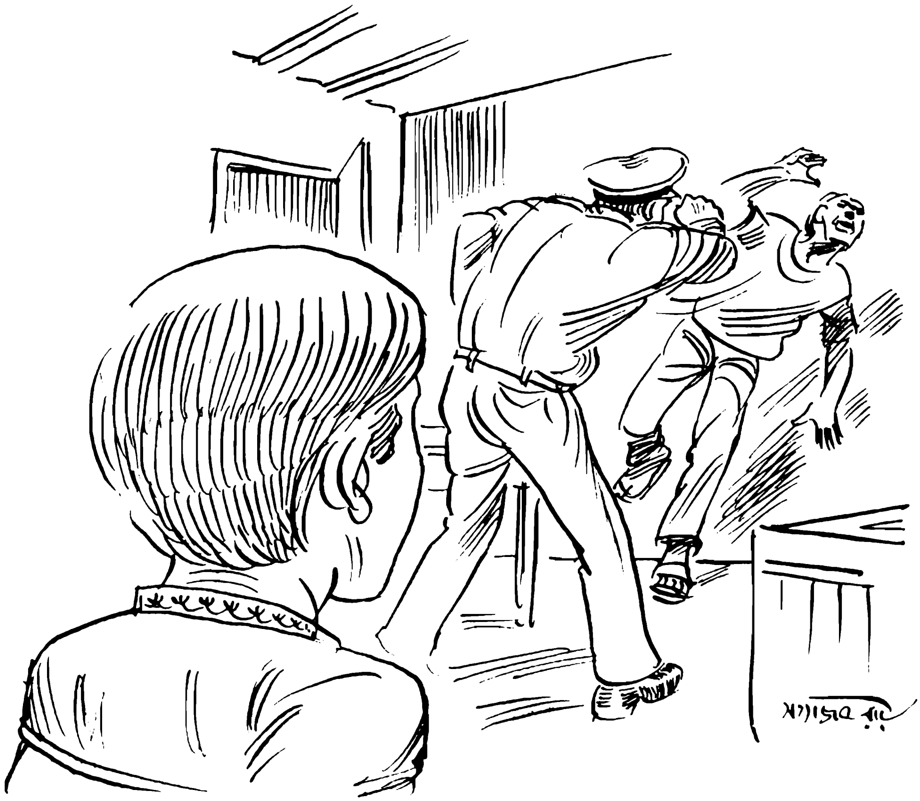

গিয়েছিল, তাতেই তোলা হয়েছে এইসব দৃশ্য। আমাকেও এ দৃশ্যে থাকতে হয়েছিল, কারণ মোহন তো গুণ্ডাদের হাতে বন্দি, আর তাকে উদ্ধার করতে এসেছেন ইনস্পেক্টর সূর্যকান্ত। হাত পা বাঁধা অবস্থায় ঘরের এক কোণে বসে আমাকে কষ্টের অ্যাকটিং করতে হয়েছে, যদিও স্টান্টম্যানদের কারসাজি দেখে আমার বুকটা বারবার কেঁপে উঠছিল। বিশেষ করে কেষ্টদার স্টান্টের তো কোনও তুলনাই নেই। এক-এক সময় মনে হচ্ছিল কেষ্টদার শরীরে বুঝি হাড় বলে কিছু নেই—নইলে এভাবে ছিটকে ছিটকে মাটিতে পড়ছে অথচ ব্যথা লাগছে না, এটা কীভাবে হয়?

আরও দু'দিন যে কাজ করেছে কেষ্টদা তার সবই হল মোটর বাইকে আমাকে নিয়ে। যদিও মোটরবাইককে মোটর গাড়ির তাড়া করার দৃশ্যটা ছবিতে থাকবে মাত্র দেড় মিনিট, তার জন্য শট নিতে হবে প্রায় ষাট-সত্তরটা। দৃশ্যটা শেষ হবে নালার উপর দিয়ে লাফের শট দিয়ে। সেটা নেওয়া হবে আরও সাতদিন পরে। সবচেয়ে কঠিন বলে কাজটা শেষের জন্য রাখা আছে। এই শটের পরে আমারও আর কোনও কাজ বাকি থাকবে না, কেষ্টদারও না।

এটা বলতেই হবে যে, অ্যাকটিং-এর ব্যাপারে জগু ওস্তাদের কোনও গাফিলতি নেই। তাই আমার সন্দেহ হচ্ছিল কেষ্টদা ঠিক শুনেছিল কিনা। পাঁচদিনের দিন সারাদিন মোটর সাইকেলে শুটিং করার পর সার্কিট হাউসে সন্ধ্যায় একটু ফাঁক পেয়ে কেষ্টদা নিজে থেকেই এল আমার কাছে। আমি তখন সবে স্নান করে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। আনা সাগর লেকটা রোজ দেখেও পুরনো হয়নি। আর পাহাড়ের পিছনে সূর্যোদয়টার এক-একদিন এক-একরকম বাহার।

'কী খবর?' বলল কেষ্টদা।

আমি বললাম, 'আমি তো তোমার কাছে খবর পাব বলে বসে আছি।'

'লোকটা বোধহয় হাল ছেড়ে দিয়েছে,' বলল কেষ্টদা, 'আমি ফাঁক পেলেই একবার সন্ধ্যার দিকে চায়ের দোকানটায় যাই। মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে বেঞ্চিতে ঘাপটি মেরে বসে থাকি। আমায় চেনা যায় না নিশ্চয়ই। সেই অবস্থায় তিনদিন জগু ওস্তাদকে ঢুকতে দেখেছি মদের দোকানে। ওর সঙ্গে অন্য দু'জন গুণ্ডার একজনকে দেখেছি একদিন, কিন্তু সেই চাকর বিক্রম আর আসেনি।'

'তা হলে বোধহয় তুমি ভুল শুনেছিলে।'

কেষ্টদা মাথা নাড়ল।

'উঁহুঁ। আমার শোনায় ভুল হয়নি। ওরা যে একটা কোনও মতলব করছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর মধ্যে একদিন রাজবাড়িতে শুটিং-এর সময় আমার কোনও কাজ ছিল না, আমি ওদের বাড়ির একজন চাকরের কাছে একটা দেশলাই চেয়ে তার সঙ্গে একটু গল্প জুড়ে দিয়েছিলাম। সে বলল মিঃ লোহিয়ার যে খাস বেয়ারা সে নাকি ছুটিতে গেছে তিন হপ্তা হল। বিক্রম চাকরটা তার জায়গায় বদলি এসেছে। কাজেই সেখানে একটা গোলমাল আছে। এর বেলায় প্রভুভক্তির কোনও প্রশ্ন আসে না। এই লোকটাকে হাত করা তাই অনেকটা সহজ। আমার সন্দেহটা ওইখানেই। দেখা যাক; আর ক'দিন না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'কিন্তু সত্যি যদি কিছু হয়?'

কেষ্টদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'জানি না। যতদিন জগু ওস্তাদের কাজ আছে ততদিন আমাদের মুখ বন্ধ। সেই পাথরটা যদি চুরি যায়, তা হলে পুলিশ আসবে নিশ্চয়ই। পুলিশ যদি জগু ওস্তাদকে সন্দেহ করে তা হলে করবে—সেখানে আর কারুর কিছু বলার থাকতে পারে না। কিন্তু এটাও ঠিক যে, তা হলে তোমাদের ছবির সাংঘাতিক ক্ষতি হবে। পুলিশ দরকার বুঝলে অপরাধীকে পাকড়াও করবেই, তাদের কেউ রুখতে পারবে না। ভাবনা হচ্ছে ছবিটার জন্য। যতদূর জানি তোমার সঙ্গে জগু ওস্তাদের বেশ কিছু কাজ বাকি আছে।'

'তা তো আছেই। আমাকে ধরে নিয়ে যাবার পর গুণ্ডাদের আস্তানায় আমার তিনটে দৃশ্য আছে। তারা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, ভাল করে খেতে দিচ্ছে না। আমাকে এক-পোশাকে দিনের পর দিন থাকতে হচ্ছে—এসব তো কিছুই তোলা হয়নি এখনও।'

'হুঁ...'

ছবিটা সম্বন্ধে কেষ্টদার এতটা দরদ আছে দেখে আমার আরও ভাল লাগল।

সত্যিই যে ভাবনার কারণ ছিল সেটা বোঝা গেল আটদিনের দিন সকালে।

সেদিন সকালে ন'টায় রাজবাড়িতে কাজ। আমি আর যিনি দেওয়ান সাজছেন, তাঁকে নিয়ে একটা দৃশ্য। পুলিশ গুণ্ডাদের খোঁজ করতে আরম্ভ করেছে, আর এদিকে রাজকুমার অমৃৎ তার নতুন বন্ধুর খবরের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। বড়দের বলে কোনও ফল না পেয়ে শেষটায় সে নিজেই ফোন করে ইনস্পেক্টরকে খবর জিজ্ঞেস করে। এই দৃশ্য তুলতে ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগা উচিত না। তারপর বাকি দিনটা কাজ হবে গুণ্ডাদের আস্তানায়।

সাড়ে সাতটার মধ্যে বাস বেরিয়ে পড়ল মালপত্র আর কিছু লোকজন নিয়ে। বিশুদাও চলে গেল সেই বাসে। বাকি সবাই গাড়িতে যাবে আটটার সময়। মিনিট কুড়ির মধ্যে দেখি একটা অটো-রিকশাতে করে বিশুদা ফিরে এসেছে। রাজবাড়িতে সাংঘাতিক কাণ্ড। গতরাত্রে ডাকাত পড়েছিল। মিঃ লোহিয়ার মাথায় বাড়ি মেরে তাঁকে অজ্ঞান করে তাঁর বালিশের নীচে থেকে চাবি বার করে সিন্দুক খুলে নীলকান্তমণিটা চুরি করে নিয়েছে। মিঃ লোহিয়ার স্ত্রী পাশের ঘরে দুই নাতিকে নিয়ে শুতেন, তিনি কিছুই টের পাননি। ভোরবেলা জ্ঞান হয়ে মিঃ লোহিয়া সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরে স্ত্রীকে ঘুম ভাঙিয়ে বলেন।

এটাও বিশুদা বলল যে, বাড়ির একজন চাকর বিক্রমকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। সে লোহিয়ার খাস বেয়ারা শত্রুঘ্নের বদলি হিসাবে এসেছিল একমাসের জন্য। পুলিশ এর মধ্যেই এসে সকলকে জেরা করতে শুরু করেছে। রাজবাড়িতে আরও তিনদিনের কাজ বাকি ছিল, সেটা করতে হবে একেবারে শেষদিকে—অন্য সব কাজ শেষ হয়ে যাবার পর।

আমি হন্তদন্ত হয়ে নীচে গিয়ে বিশুদার মুখ থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা শুনলাম। কেষ্টদাও ছিল সেই

ঘরে। সে খালি একবার আমার দিকে চাইল। আমি জানি যে এই ব্যাপারে আমাদের দু'জনেরই কিচ্ছু করার নেই, যদিও আমরা সবই জানি।

ফিল্মের দলের পঁচিশজন লোকের মধ্যে শুধু আমি আর কেষ্টদাই জানি আসল ব্যাপারটা, জানি নীলকান্তমণি কোথায় কার কাছে আছে।

॥ ৯ ॥

গুণ্ডাদের আস্তানার শুটিংটা বিকেল সাড়ে চারটায় শেষ করে ফেরার পথে বিশুদা বলল, 'চল অংশু, আমরা ক'জন একবার মিঃ লোহিয়াকে দেখে আসি। ভদ্রলোক কেমন আছেন জানা দরকার।'

একটা গাড়িতে বিশুদা, সুশীলবাবু, শঙ্কর মল্লিক, সুকান্তবাবু আর আমি গেলাম রাজবাড়িতে।

বাড়ির বাইরে পুলিশ, ভিতরে পুলিশ—সারা বাড়ির চেহারাই পালটে গেছে। বাড়ির লোকজন সকলেরই মুখ গম্ভীর, সবাই ধীরে ধীরে হাঁটছে, ফিসফিস করে কথা বলছে—দেখে মনে হয় যেন সারা বাড়িটার ওপর শোকের ছায়া পড়েছে। তার উপরে আবার আজ দিনটাও করেছে মেঘলা।

তবু ভাল যে মিঃ লোহিয়ার মাথার জখমটা তেমন গুরুতর হয়নি। ভদ্রলোক দোতলার সামনে বারান্দায় মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আরাম কেদারায় বসে ফলের রস খাচ্ছিলেন। আমাদের বসতে বলে পাশে দাঁড়ানো চাকরকে সকলের জন্য শরবত আনতে বললেন। সুশীলবাবু বললেন, 'আমরা কিন্তু আপনাকে মোটেই বিরক্ত করতে চাই না। আপনার এই দুর্ঘটনার কথা শুনে আপনি কেমন আছেন খালি সেইটুকু দেখতে এসেছি।'

'আই অ্যাম মাচ বেটার,' বললেন মিঃ লোহিয়া, 'কী করব বলুন, মানুষের জীবন তো আর সবসময় একরকম যায় না। কপালে দুর্ভোগ ছিল, সে কে পারে খণ্ডাতে? আফসোস হয় যে, আমার এত হিরে জহরত থাকতে সে লোক আমার সাধের মণিটাই নিল।'

'এটা কি আপনার ওই চাকরেরই কীর্তি?' প্রশ্ন করলেন সুশীলবাবু।

'সে যখন পালিয়েছে তখন তাই ধরে নিতে হবে। অথচ লোকটা যে এমন সেটা আগে বুঝতে পারিনি। বদলি হিসেবে এসেছিল, আর কাজ করছিল ভালই। হঠাৎ যে কী গোলমাল হয়ে গেল।'

'সে লোক কি সত্যি করেই পালিয়েছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। এমন একটা কু-কীর্তি করে সেকি আর শহরে থাকবে? আমার সবচেয়ে আফসোস হচ্ছে যে আজ আপনাদের কাজটা হল না। ওটা বন্ধ করেছে আমার বাড়ির কর্মচারীরা। আমি জানলে বন্ধ হতে দিতাম না। আপনারা যদি চান তো কাল সকালেই আবার আসতে পারেন। আমার কোনও অসুবিধা হবে না।'

'তার কোনও প্রয়োজন হবে না', বললেন সুশীলবাবু, 'আপনি সেরে উঠুন। ইতিমধ্যে আমাদের অন্য জায়গায় অন্য কাজ আছে।'

শরবত খেয়েই আমরা সকলে উঠে পড়লাম। সার্কিট হাউসে যখন ফিরলাম তখন ছ'টা বাজে। আমি ঘরে গিয়ে স্নানের জোগাড় করব কিনা ভাবছি এমন সময় কেষ্টদা এল। তার মুখ গম্ভীর।

'কী হল, কেষ্টদা?'

'আমার কাজ কদ্দিন আছে তুমি বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল কেষ্টদা।

আমি বললাম, 'চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'জগু ওস্তাদের কাজ কি চব্বিশের পরেও আছে?'

'না। ওর কাজ শেষ হচ্ছে চব্বিশে সকালে। ও সেইদিনই সন্ধ্যায় চলে যাবে।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'আমাদের কাজের চার্ট তো বসবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো আছে। সেটা দেখলেই সব জানা যায়। কিন্তু তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ বলো তো।'

'কারণ ওর কাজ শেষ হবার আগে আমি এখান থেকে চলে গেলে মুশকিল হবে। যদ্দিন ওর কাজ চলছে তদ্দিন আমি কিছু বলতে পারব না। চব্বিশ তারিখ ও চলে যাবার আগে আমার যা করার করতে

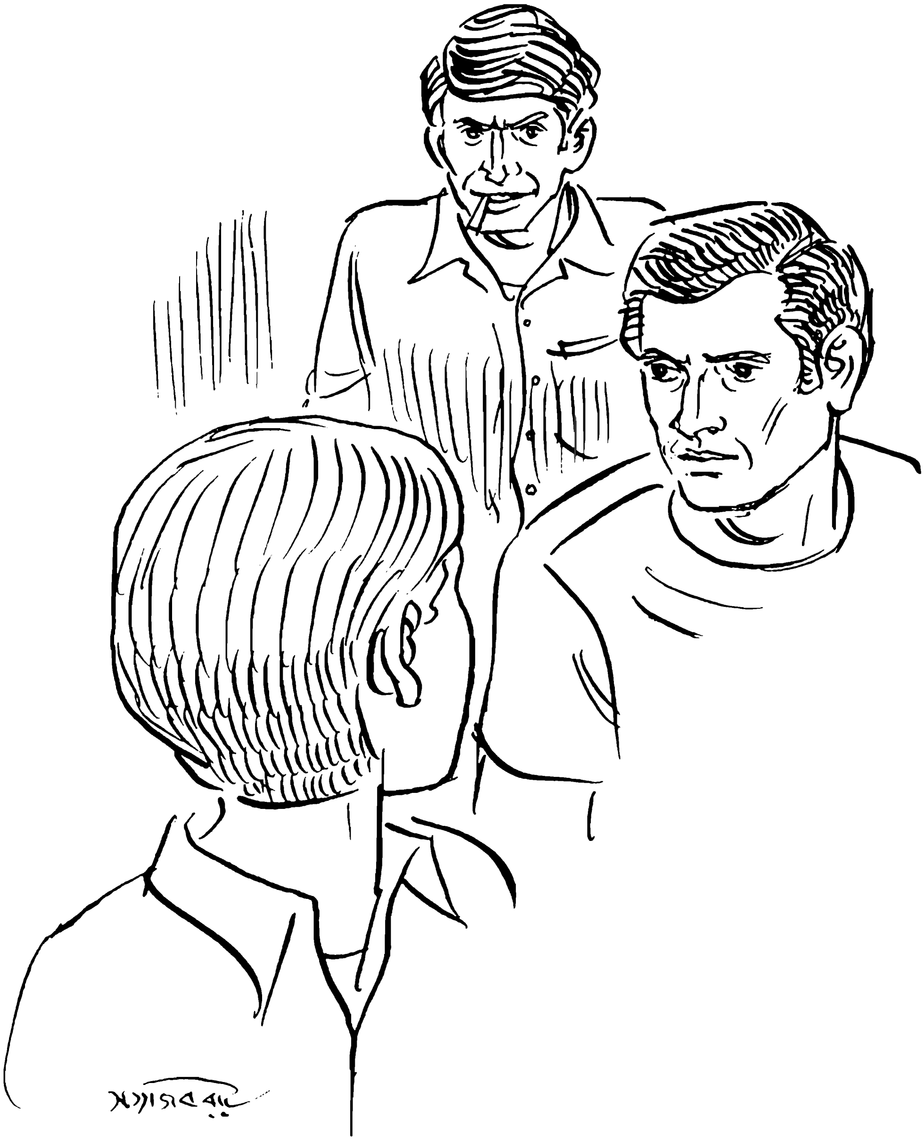

হবে। হাতে বোধহয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় থাকবে। খুব গোলমেলে ব্যাপার।'

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম কেষ্টদার ভাবনার কারণটা। ও আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'সবচেয়ে মুশকিল কোথায় জানো? আমি বললেই যে এরা আমার কথা বিশ্বাস করবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই।'

আমি কেষ্টদাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু পারলাম না। আরেকজন লোক এসে গেছে বারান্দায়। জগু ওস্তাদ।

'দুজনে খুব দোস্তি দেখছি।' বাঁকা হাসি হেসে বলল জগু ওস্তাদ। 'আরে ভাই, তোমরাই তো ক্ল্যাপ তুলবে হাউসে; আমাদের কপালে তো দুয়ো ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। তবে হ্যাঁ, এটা বলতে হবে যে

তোমাদের দুজনেরই কাজ হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস। মাস্টার অংশুর তো জবাবই নেই, আর স্টান্টম্যানও জবর।'

আমি বললাম, 'এসব আবার কী বলছ জগুদা, তুমি একটা ছবিতে থাকলে তোমার নামেই তো টিকিট বিক্রি হয় বলে শুনেছি।'

জগু ওস্তাদ হঠাৎ যেন দেমাকে ফুলে উঠল।

'তা ভিলেনের পার্ট করছি আজ এগারো বছর ধরে। অনেক এলেম লাগে ভিলেন করতে, বুঝলে কেষ্টভায়া—এটা তোমার ওই ডিগবাজি খাওয়া নয়। ভাল অ্যাকটিং আর জিমন্যাস্টিক এক জিনিস নয়।'

কেষ্টদা একটু হেসে নরম গলায় বলল, 'সে কি আমি অস্বীকার করছি ওস্তাদজি? আপনার নাম ছবির টাইটেলে বড় করে থাকবে। আমার তো নামই থাকবে না। আমাদের কাজ আর কুলিগিরিতে কোনও তফাতই নেই।'

কেষ্টদা যে এত বিনয়ী হতে পারে সেটা হয়তো জগু ওস্তাদ আশা করেনি, তাই সে একটু থতমত খেয়ে কথা পালটে বলল, 'আপসোস কী হচ্ছে জানো মাস্টার অংশু—এমন একটা পাথর লোপাট হয়ে গেল, আর আমি একবারটি দেখতেও পেলুম না। শুধু তোমাদের মুখে শুনে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হল। অবিশ্যি কে নিয়েছে পাথরটা সে তো জানাই আছে।'

'তার মানে?' আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

'ওই বিক্রম চাকরটা এক নম্বরের বজ্জাত।'

'তুমি কী করে জানলে?' জগু ওস্তাদের মতলবটা কী সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

'জানব না কেন?' বলল জগু ওস্তাদ, 'আমরা তো মদের দোকানে যাই নেশা করতে, তাই আমাদের সব রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। ও ব্যাটা একদিন এসেছিল দোকানে। আমাকে ভজাবার তাল করছিল। নেশা করে ব্যাটা বলে কি—আমার মনিবের একটা দামি পাথর আছে; তোমাকে এনে দিলে কত টাকা দেবে আমায়? ভেবেছে ফিল্ম অ্যাকটর তো, কোটিপতি না হলেও, লাখপতি তো হবে নির্ঘাত। আমি তখন সবে শুরু করেছি, মাথা একদম ক্লিয়ার। ব্যাটাকে দোকানের বাইরে নিয়ে এলুম, তারপর গলার মাদুলি ধরে টান দিয়ে মাথাটাকে মুখের কাছে এনে বললুম—'আর একটিবার অমন কথা বলেছ কি তোমাকে সোজা পুলিশের হাতে চালান দেব।'

'তাই করলেই তো পারতেন', বলল কেষ্টদা, 'তা হলে আর এই কেলেঙ্কারিটা হত না।'

'পাথর তো আর ওই ব্যাটার কাছে নেই', বলল জগু ওস্তাদ, 'ওটা অন্য জায়গায় পাচার করে মোটা বকশিশ নিয়ে ভেগেছে ব্যাটা বিক্রম। পুলিশের বুদ্ধি থাকলে এখানকার যত হিরে জহরতের কারবারি আছে তাদের বাড়ি রেড করা উচিত। জলের দরে অমন একটা পাথর পেলে এরা তো লুফে নেবে। যে পাথরের দাম হয়তো বিশ লাখ, তার জন্য হাজার দু' হাজার পেলেও ওই বিক্রম ব্যাটা বর্তে যাবে। একটা সামান্য চাকরের আর চাহিদা কত হতে পারে?'

জগু ওস্তাদ তার কথা শেষ করে গুড নাইট করে চলে গেল। আমি একটু অবাক হয়ে কেষ্টদার দিকে চাইলাম।

'কী মনে হচ্ছে কেষ্টদা?'

কেষ্টদা চুপ মেরে গেছে। দুবার এপাশ ওপাশ মাথা নাড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সব গুলিয়ে যাচ্ছে। এখন এক-একবার সত্যিই মনে হচ্ছে আমি ভুল শুনেছিলাম। অবিশ্যি সেটা হলেই ভাল হয়। যদি প্রমাণ হয় যে ওস্তাদ পাথরটা নিয়েছে বিক্রমের কাছ থেকে তা হলে ফিল্ম অ্যাকটরদের বদনাম হবে। সেটা মোটেই ভাল নয়।'

'না, তা নিশ্চয়ই নয়।'

॥ ১০ ॥

এই ঘটনার পরে অ্যাকটিং-এর সময় আমার বেশ কয়েকবার কথা গুলিয়ে গিয়ে 'এন. জি' হল। 'এন. জি.' মানে 'নো গুড'। তার মানে শটটা আবার নিতে হবে। শট যদি ঠিক থাকে তা হলে সেটা হয় 'ও. কে.'। একটা শট শেষ হওয়া মাত্র ডিরেক্টর বলে দেন সেটা ও. কে. না এন. জি.। সুশীলবাবু আমাকে

একবার জিজ্ঞেসও করলেন, 'অংশু, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?' কথাটা খুব নরম করে বললেও আমার ভীষণ লজ্জা লাগছিল। কারণ আর কিছুই না; নীলকান্তমণির ব্যাপারটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না বলেই যত গণ্ডগোল। বিশেষ করে জগু ওস্তাদের কথাগুলো বারবার মনে হচ্ছিল, আর মন বলছিল জগু ওস্তাদ নির্দোষ। ও যা বলেছে সেটাই আসলে ঠিক, কেষ্টদা নিশ্চয়ই উলটোপালটা শুনেছে।

দু'দিন লাগল মন থেকে নীলকান্তমণির চিন্তাটা তাড়িয়ে দিয়ে অ্যাকটিং করতে। তারপর অবিশ্যি আর এন. জি. হয়নি।

ইনস্পেক্টর মাহেশ্বরী কিন্তু তদন্তের ব্যাপারে বেশ নাজেহাল হচ্ছেন। সে-চাকর শহর ছেড়ে পালিয়েছে বটেই, কিন্তু সে যে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে সেটা পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও বার করতে পারছেন না।

তেইশ তারিখ সকালে আমার শুটিং ছিল মোহনের বাড়িতে। ইনস্পেক্টর সূর্যকান্ত গুণ্ডাদের হাত থেকে মোহনকে উদ্ধার করে তার বাবার কাছে এনে দিচ্ছে, বাবা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরছে।

এই শুটিং মিঃ মাহেশ্বরী তাঁর স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে দেখতে এলেন। বিশুদার প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন যে চোর এখনও ধরা পড়েনি। 'তবে বিক্রম যে লোক সুবিধের ছিল না তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বাজারে যাবার নাম করে মদের দোকানে গিয়ে মদ খেত। যেদিন চুরিটা হয় সেদিনও সে মদের দোকানে গিয়েছিল।'

পরদিন—চব্বিশ তারিখ—ভীষণ জরুরি দিন। আজকে মোটরবাইকে চড়ে কেষ্টদা আমাকে নিয়ে নালা টপকাবে। এই দৃশ্য তোলার জন্য দুটো বাড়তি ক্যামেরা লোকসমেত বম্বে থেকে এসেছে। সার্কিট হাউসে ঘর খালি করা হয়েছে, তাই তারা সেখানেই এসে উঠেছে, বাইকে নালা পেরনোর ব্যাপারটা একবারের বেশি করা রিস্কি বলে দৃশ্যটা তিনটে ক্যামেরা দিয়ে তিন জায়গা থেকে একই সঙ্গে তোলা হবে। একটা চড়াই দিয়ে এগোনোর সময়, একটা নালা টপকে পেরোনোর সময়, আর একটা উলটোদিকে উৎরাইয়ের মুখে ল্যান্ড করার সময়।

অবিশ্যি এই সিনের আগে সকালে অন্য কাজ আছে। তাতে তিন গুণ্ডা আর পুলিশের দল লাগবে। পুলিশ ছগনলালের দলকে গ্রেপ্তার করার দৃশ্য। ইনস্পেক্টর মাহেশ্বরী স্থানীয় পুলিশের লোক দিয়েছেন, তারাই শুটিং-এ পুলিশের কাজ করবে। আমার মনে আর এখন কোনও সন্দেহ নেই যে কেষ্টদা ভুল শুনেছিল। জগু ওস্তাদ আসলে নির্দোষ। তাকে ভজাতে চেষ্টা করেছিল বিক্রম, কিন্তু সে রাজি হয়নি। ভাগ্যিস! মিছামিছি জগু ওস্তাদের উপর দোষ চাপালে একটা বিশ্রী ব্যাপার হত!

একটা গোলমেলে ব্যাপার এই যে, আজ সকাল থেকে মেঘলা করেছে। অবিশ্যি হাওয়া আছে বলে মেঘ মাঝে মাঝে সরে গিয়ে রোদ বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিকেলে নালা টপকানোর শট্-এর জন্য রোদেরই দরকার, কারণ মোটরবাইক সংক্রান্ত আর সব শটে রোদ রয়েছে। আমি বুঝি গেছি যে এখানেও সেই কনটিনিউইটির ব্যাপার। একই দৃশ্যে দশটা রোদে তোলা শট-এর সঙ্গে একটা মেঘলায় তোলা শট জুড়লে ভীষণ চোখে লাগে। তাই সকাল থেকেই মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যেন বিকেলে মেঘ সরে গিয়ে রোদ বেরোয়।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে একটা গাড়িতে আমি, কেষ্টদা, আর মেক-আপের দুজন লোক, আর অন্য গাড়িতে নতুন দুটো ক্যামেরা, তাদের ক্যামেরাম্যান আর সহকারী নালার শুটিং-এর জন্য বেরিয়ে পড়লাম। অন্যেরা সকাল-সকাল বেরিয়ে গেছে গুণ্ডাদের দৃশ্য তুলতে। তারা সেখান থেকে সোজা চলে যাবে নালার জায়গায়।

পথে হঠাৎ দেখলাম আমাদের তিন নম্বর গাড়িতে জগু ওস্তাদ আর আরও দু তিন জন লোক শুটিং সেরে সার্কিট হাউসে ফিরছে। তার মানে ছগনলালের কাজ শেষ।

সেদিনেরই মতো কুড়ি মিনিট লাগল নালার জায়গাটায় পৌঁছতে। মোটরবাইক আগেই এসে গেছে বাসের মাথায়। কেষ্টদা আর দেরি না করে বাইকে চড়ে পড়ল। যারা আগে এসেছে তারা সবাই এখন পুরি-তরকারি লাঞ্চ করছে। কেষ্টদা বলল, 'আমি একবার নালাটা টপকে পেরিয়ে দেখে নিচ্ছি। স্পিডের আন্দাজটা ঠিক করে নিতে হবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে দরকার হবে?'

কেষ্টদা মাথা নাড়ল—'তুমি চড়বে একেবারে শট-এর সময়।'

পথের ডান পাশে কিছু দূরে একটা তেঁতুল গাছ, তারই নীচে দলের সকলে খেতে বসেছে। কেষ্টদা চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল যে, সে একটা রিহার্সাল করে নিচ্ছে। আজই ওর শেষ কাজ, সেটা হলেই ও বম্বে ফিরে যাবে, হয়তো আর কোনওদিনও দেখা হবে না। এটা মনে হলেই আমার খুব খারাপ লাগছিল।

কেষ্টদা বাইকটাকে দাঁড় করিয়েছে নালা ঘেঁষে বেশ কিছুটা দূরে রাস্তার উপর।

'নালার দিকে কেউ নেই তো?' হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কেষ্টদা।

বিশুদা পরিবেশন করছিল, চেঁচিয়ে বলল, 'না, সবাই এখানে।'

আমি রিহার্সালটা দেখব বলে দৌড়ে নালার ধারে চলে গেলাম। তারপর গলা ছেড়ে হাঁক দিলাম, 'এসো, কেষ্টদা!'

আবার সেই কানফাটা শব্দ, সেই আচমকা ঝোপের পিছন থেকে বেরোনো, সেই দম-বন্ধ-করা লাফ, আর সেই ম্যাজিকের মতো—

কিন্তু এ কী? ওপারে গিয়ে বাইকটা একী হল? সেটা যে মুখ থুবড়ে পড়েছে উতরাইটা পেরিয়েই, আর কেষ্টদা যে বাইক থেকে ছিটকে গিয়ে পড়েছে ঝোপের মধ্যে।

'বিশুদা!'

চিৎকার ছেড়ে জুতো মোজা পরেই নালা পেরিয়ে উলটো দিকে গিয়ে উঠলাম।

মোটরবাইকটা একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে, তার একটা চাকা এখনও বনবন করে ঘুরছে, আর কেষ্টদা রাস্তা থেকে উঠে গা থেকে ধুলো ঝাড়ছে।

'আমি স্টান্টম্যান বলেই আজ বেঁচে গেলাম, অংশুবাবু! অন্য কেউ হলে...'

‘ব্যথা পেয়েছ নিশ্চয়ই?’

আমার বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ করছিল।

‘ঝোপটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। নইলে মাথায় চোট পেতাম নির্ঘাত।’

‘কিন্তু কী করে—?’

‘ব্যাপারটা আর কিছুই না; রাস্তাটাকে খুঁড়ে গর্ত করে তারপর আলগা মাটি দিয়ে বুজিয়ে কিছু পাথর আর খোলামকুচি ওপরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। দেখেই বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। তাই বাইকটা এসে পড়তেই মাটির ভিতর ঢুকে গেছে।’

বিশুদার সঙ্গে প্রায় সকলেই আমার ডাকে ছুটে এসেছে। কাণ্ড দেখে সকলের চক্ষুস্থির।

‘কিন্তু এরকম করল কে?’ প্রশ্ন করলেন সুশীলবাবু, ‘আপনার উপর কারুর আক্রোশ আছে নাকি যে আপনাকে এভাবে টাইট দেবে?’

কেষ্টদার ঘাড় আর গাল ছড়ে গিয়েছিল; আমাদের সঙ্গে ফার্স্ট এড বক্স ছিল, তার থেকে ওষুধ নিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হল।

সুশীলবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার কোনও ধারণা আছে এ-কাজ কে করে থাকতে পারে?’

কেষ্টদা বলল, ‘তা আছে, তবে কেন সে ধারণা হয়েছে সেটা বললে অনেক কিছু বলতে হয়। আমি শুধু বলছি যে আপনাদের জগু ওস্তাদ বলে যে অভিনেতাটি আছেন, তাঁর কলকাতা যাওয়া আপনারা বন্ধ করুন।’

বিশুদা দেখলাম কথাটা ভালভাবে নিল না। বলল, ‘আপনি শুধু ওরকম বললে তো চলবে না। কেন এমন একটা ব্যাপার করতে বলছেন সেটা আমাদের জানতে হবে। আপনি কারণটা বলুন। কথা নেই বার্তা নেই আমাদের দলের একজনের ঘাড়ে দোষ চাপালে তো চলবে না। আপনার কি তার সঙ্গে কোনওরকম ঠোকাঠুকি লেগেছিল?’

কেষ্টদাকে অগত্যা সব কথাই বলতে হল। আমি এখন জানি যে, কেষ্টদার কথাই ঠিক, কিন্তু বিশুদা তার কথায় আমলই দিল না।

‘দেখুন, কাপ্তেন মশাই’, বলল বিশুদা, ‘জগু ওস্তাদ যে সন্ধেবেলা নেশা করে সেটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তার নামে চুরির অপবাদ কেউ কোনওদিন দেয়নি। অনেকদিন হল সে ফিল্মের লাইনে কাজ করছে, আর কাজটা সে ভালভাবেই করে এটা কেউ অস্বীকার করবে না। আপনি বোম্বাই থেকে এসে বাংলার একজন অভিনেতা সম্পর্কে এমন একটা গুরুতর অভিযোগ করবেন সেটা তো আমরা বরদাস্ত করতে পারব না। আপনি মদের দোকানে তার মুখ থেকে কী কথা শুনেছেন সেটা তো আমি মানতে রাজি নই। আপনি নিজে যে নেশা করেন না তার কী প্রমাণ?’

কেষ্টদা বলল, ‘আমি এককালে মাঝে মাঝে নেশা করতুম সেটা অস্বীকার করব না, কিন্তু একবার একটা স্টান্টে গড়বড় হয়ে যাবার পর থেকে গত পাঁচ বছরে আমি মদ ছুঁইনি। আমি যা শুনেছি তা ঠিকই শুনেছি, তাতে কোনও ভুল নেই। আজকের ঘটনাটাই প্রমাণ করছে যে আমি ভুল শুনিনি। সেটা আপনারা বিশ্বাস করেন কি না-করেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। আজকের এই অ্যাক্সিডেন্টের পর আমি একবারে শিওর যে জগু ওস্তাদের কাছেই রয়েছে ওই পাথর, আর আমি তার কথা শুনে ফেলেছিলাম বলেই সে রাস্তা খুঁড়ে রেখে আমাকে খতম করার চেষ্টা করেছিল।’

সুশীলবাবুকে ভীষণ চিন্তিত বলে মনে হচ্ছিল; এবার উনিই কথা বললেন—

‘যাই হোক, এখন আসল কথা হচ্ছে যে, এই রাস্তা দিয়ে আর বাইক চালানো যাবে কি না। শটটা তো আমাদের নিতে হবে। আর এখানেই নিতে হবে, কারণ আমরা জানি যে এ ছাড়া আর কোনও রাস্তা এইভাবে এই নালার উপর এসে পড়েনি।’

‘শট নিতে কোনও বাধা নেই’, বলল কেষ্টদা, ‘ওই গর্তটাকে শক্ত মাটি আর পাথর দিয়ে ভাল করে বুজিয়ে দিলেই শট নেওয়া যাবে। ওটা প্রায় ফাঁপা ছিল বলে বাইক ওর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল।’

আধঘণ্টার মধ্যে সবাই মিলে কাজ করে গর্তটাকে আবার বুজিয়ে দেওয়া হল। ঘড়িতে বলছে আড়াইটা। তা হলে এখন কি শট নেওয়া যায়?

না, যায় না, কারণ আকাশ মেঘে ভরে গেছে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। এমন কী বৃষ্টি নামলেও কিছু আশ্চর্য হবার নেই।

আমি জানি যে রোদ না উঠলে শট নেওয়া যাবে না। আমি কেষ্টদাকে একা পেয়ে তার পাশে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'জগু ওস্তাদ কিন্তু পৌনে ছ'টায় সার্কিট হাউস থেকে বেরোবে। সাড়ে ছটায় ওর ট্রেন।'

কেষ্টদা আমার কথার কোনও উত্তর দিল না। আমি ওর পিঠে হাত রাখলাম ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। বিশুদা ওর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে সত্যিই অন্যায় করেছে।

এবার কেষ্টদা কথা বলল, তার গলা ভারী আর গম্ভীর।

'আমাকে কিছু বলতে এসো না। আমি বুঝেছি মানুষের উপকার করতে যাওয়া হচ্ছে বোকামো। বম্বে হলে লোকে আমার কথা মানত।'

আমার ভয় হল যে কেষ্টদা হয়তো রেগে গিয়ে আর শটটাই দেবে না। আমি তাই বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেষ্টদা, তুমি বাকি কাজটা করবে তো?'

'দেখা যাক', বলে কেষ্টদা চুপ করে গেল।

বৃষ্টি এল না, কিন্তু মেঘ জমে রইল। হাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে, তাই মেঘ আর সরতেই চায় না। আমার চোখ বারবার আকাশের দিকে চলে যাচ্ছে। শুধু আমি কেন, দলের সকলেই ওই একটা শট-এর অপেক্ষায় খালি খালি উপর দিকে চাইছে। সূর্যটা যে কোথায় আছে সেটা অবিশ্যি বোঝা যায়; এমনকী এক-একসময় মেঘ পাতলা হয়ে চারিদিকের আলো বেড়ে ওঠে, কিন্তু রোদ ওঠার নাম নেই। ক্যামেরাম্যানরা তাদের কাজের জন্য একটা কালো কাচ ব্যবহার করে, সেটা একটা ফিতে দিয়ে গলায় ঝোলানো থাকে। ধীরেশ বোস বারবার সেই কাচের ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে দেখছেন।

সাড়ে চারটে।

হঠাৎ দেখি কেষ্টদা বাইকটা নিয়ে হাতে করে ধরেই সেটা নালার ওপারে করে নিল, কারণ শটে ওদিক থেকেই আসবে বাইকটা। আমি মনে খানিকটা ভরসা পেলাম। মনে হচ্ছে কেষ্টদার রাগ কিছুটা পড়েছে। রাগ করবার যে যথেষ্ট কারণ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই জানি যে শয়তানির গোড়ায় রয়েছেন জগু ওস্তাদ। নীলকান্তমণি চুরি করে বিক্রম জগু ওস্তাদকেই দিয়েছে। কেষ্টদা যে ফন্দিটা ধরে ফেলেছে সেটা জগু ওস্তাদ কোনওরকমে জেনে ফেলেছে, আর তাই বদলা নেবার জন্য গতকাল লোকজন নিয়ে এসে রাস্তাটা খুঁড়ে আলগা মাটি দিয়ে ভরিয়ে রেখে গেছে। অথচ বিশুদা কেষ্টদার কথাটা বিশ্বাস করল না। শুধু বিশুদা কেন, কেউই করল না। স্টান্টম্যান বলে কি তার কথাও বিশ্বাস করতে নেই?

ইতিমধ্যে আমি অমৃতের পোশাক পরে নিয়েছি, আর দেখে নিশ্চিন্ত হলাম যে কেষ্টদাও গোঁফ লাগিয়েই ইনস্পেক্টরের পোশাক পরে নিল। কেষ্টদা রেডি হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলের চার-পাঁচজন একসঙ্গে বলে উঠল—'রোদ বেরিয়েছে!'

আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, সত্যিই মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যসমেত অনেকখানি নীল আকাশ বেরিয়ে গেছে। অন্তত পাঁচ মিনিট থাকবে নিশ্চয়ই।

'ক্যামেরাজ রেডি?'

এই হুঙ্কারটা ছাড়লেন স্বয়ং ডিরেক্টর সুশীল মিত্তির।

তিনটে ক্যামেরা তিন জায়গায়—রাস্তার দু'পাশে আর নালার ধারে—বসিয়ে রাখা হয়েছে অনেক আগে থেকেই। এবারে তিনজন ক্যামেরাম্যান রেডি হয়ে গেলেন।

'চলো মাস্টার অংশু!' গম্ভীরভাবে বলল কেষ্টদা।

আমি আর কেষ্টদা মোটরবাইকে উঠে পড়লাম।

'ক্যামেরা স্টার্ট দিলে চেঁচিয়ে বোলো', হাঁক দিলেন সুশীলবাবু, 'তারপর বাইক স্টার্ট হবে।'

এবারে কেষ্টদা বাইকটাকে আরও বেশ অনেকখানি দূরে নিয়ে গেল। আগেরবার কিন্তু এতদূর থেকে রওনা হয়নি। এবার কি তা হলে আরও স্পিডে বাইক আসবে? আমার সেটা কেষ্টদাকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন আর ওসবের সময় নেই।

'সবাই রেডি?' সুশীলবাবু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তিন ক্যামেরাম্যান আর কেষ্টদা বলে উঠল—'রেডি!'

আমি ক্যারিয়ারে বসে আমার হাত দুটো কেষ্টদার কোমরের দু'দিক দিয়ে পেঁচিয়ে দিয়েছি।

'আজ স্পিড বাড়াব', দাঁতে দাঁত চেপে নিজেই বলল কেষ্টদা, 'শক্ত করে ধরে থাকবে। কোনও ভয় নেই।'

'স্টার্ট ক্যামেরা!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিন ক্যামেরাম্যান একসঙ্গে বলে উঠল—'রানিং!'

আর চার-পাঁচ সেকেন্ড পরেই শোনা গেল।

'স্টার্ট বাইক!'

গোঁ করে গর্জন করে একটা ধাক্কা দিয়ে বাইক ছুটতে শুরু করল। আজ আর আমি চোখ বুজলাম না। আজ চেয়ে থাকব, সব দেখব। আগের দিনের দেড়া স্পিডে তীরবেগে চড়াই দিয়ে উঠে গেল বাইক।

এবারে সমস্ত পৃথিবীটা হঠাৎ যেন নীচে নেমে গেল।

বাইক শূন্যে উঠেছে। প্রচণ্ড হাওয়া।

শূন্য দিয়ে এগিয়ে আবার নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

পৃথিবী আবার উপরে উঠে এল।

এবার বুঝলাম স্পিড বাড়ানোর কারণ। গর্তটা ছাড়িয়ে শক্ত জমিতে নামবে কেষ্টদা। আমাকে পিছনে নিয়ে কোনও রিস্কের মধ্যে সে যাবে না।

একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সঙ্গে বাইক আবার মাটিতে এসে নামল। আমি শুনলাম বহুদূর থেকে চিৎকার ভেসে এল—

'ও. কে.!'

আর তারপরে আরও দুটো 'ও. কে.!'

তার মানে তিনটে ক্যামেরাতেই শট ঠিকভাবে উঠেছে।

কিন্তু বাইক থামছে না কেন?

কেষ্টদা কোথায় চলেছে?

প্রশ্নটা মনের মধ্যে আসতেই আমি উত্তরটা পেয়ে গেলাম।

বিশুদা যাই বলুক, কেষ্টদা তার নিজের বিশ্বাসে কাজ করে চলেছে।

নালার জায়গাটা সার্কিট হাউস থেকে চোদ্দ কিলোমিটার। প্রচণ্ড স্পিডে দশ মিনিটে আজমীরে পৌঁছে একটা চৌমাথায় আসতেই একটা ট্র্যাফিক পুলিশের ঠিক পাশে এসে বাইকটা থামাল কেষ্টদা। তারপর পুলিশটিকে জিজ্ঞেস করল থানাটা কোথায়।

পুলিশ বুঝিয়ে দিতেই বাইক ছুটল আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে। কত স্পিডে যাচ্ছে বাইক? আশি? নব্বই? আমি জানি না। শুধু জানি এত স্পিডে আমি কোনওদিন কোনও গাড়ি চড়িনি। হাওয়ার শব্দে কান প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে, গায়ের লোম খাড়া।

এই যে পুলিশ স্টেশন।

তিন মিনিটের মধ্যে ইনস্পেক্টর মাহেশ্বরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক চিনলেন। কেষ্টদার গায়ে ইনস্পেক্টরের পোশাক দেখে ভদ্রলোক হেসেই ফেললেন।

'কী চাই আপনাদের?'

'লোহিয়াজির পাথর,' বলল কেষ্টদা, 'আমি জানি কোথায় আছে। একটা জিপে চলে আসুন আমার সঙ্গে। যদি দেখেন ভুল বলছি তা হলে আমাকে হাজতে পুরবেন।'

হয়তো কেষ্টদার কথা বলার ভঙ্গির জন্যই মাহেশ্বরী রাজি হয়ে গেলেন।

'ঠিক হ্যায়, আমি আসছি আপনার সঙ্গে।'

'সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে নেবেন।'

'ও. কে.।'

বাইকে উঠেই কেষ্টদার কব্জিটা ধরে ঘুরিয়ে একবার ঘড়িটা দেখে নিলাম। ছ'টা বাজতে দশ। জগু ওস্তাদ স্টেশনে রওনা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

বাইরে অন্ধকার। শহরের বাতি জ্বলে গেছে।

রাস্তার ট্র্যাফিককে আশ্চর্যভাবে বাঁচিয়ে কেষ্টদা বিদ্যুদ্বেগে ছুটে চলেছে স্টেশনের উদ্দেশে। পিছনে পুলিশের জিপ। বাইকের সঙ্গে তাল রেখে সেও চলেছে ছুটে। ঘন ঘন হর্ন দিয়ে লোক সরানো হচ্ছে রাস্তার মাঝখান থেকে।

স্টেশন এসে গেছে। কটা বাজল? থানা ছাড়বার পর পাঁচ মিনিটও হয়নি।

স্টেশনের বাইরে বাইক আর জিপ পর পর থামল।

'ওই যে জগু ওস্তাদ!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

ঠিক কথা। সেও সবেমাত্র স্টেশনে পৌঁছেছে। কুলির মাথায় মাল চাপাচ্ছে অটো-রিকশা থেকে নেমে।

'দ্যাট ইজ দ্য ম্যান!' জগু ওস্তাদের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে মাহেশ্বরীকে বলল কেষ্টদা।

মাহেশ্বরী জগু ওস্তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁর হাতে রিভলভার।

জগন্নাথ দে ওরফে জগু ওস্তাদ শেষ মুহূর্তে পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। দু'দিক থেকে দুই পুলিশ এসে তাকে ধরে ফেলেছিল। তার কাছেই যে মিঃ লোহিয়ার নীলকান্তমণিটা পাওয়া গেল সেটা বোধ হয় আর না বললেও চলবে। পাথর ফেরত পেয়ে মিঃ লোহিয়া এত খুশি হলেন যে, কেষ্টদাকে দু' হাজার টাকা পুরস্কার দিয়ে ফেললেন। এটা যে হবে সেটা আমি জানতাম। কেষ্টদা স্টান্টম্যান ঠিকই, কিন্তু এটাও ঠিক যে এই পাথর উদ্ধার করার মতো স্টান্ট সে কোনওদিন করেনি।

সবচেয়ে আফসোস হয়েছিল বিশুদার। 'আপনাকে সেদিন ভুল করে কত কথা বলে ফেলেছিলাম; আশা করি আপনি অপরাধ নেবেন না।'

'অপরাধ আমি নিশ্চয়ই নেব না,' বলল কেষ্টদা, 'কারণ এ ছবিতে কাজ করে, বিশেষ করে মাস্টার অংশুর সঙ্গে কাজ করে, আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি।'

'আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাকে', বলল বিশুদা।

'কী, বলুন!'

'আপনাদের তো টাইটেলে কখনও নাম যায় না—আমি কথা দিচ্ছি এবার আমাদের ছবিতে আপনার নাম বড় করে আলাদা করে যাবে।'

'তা হলে আমার অনেকদিনের একটা সাধ পূর্ণ হবে,' বলল কেষ্টদা।

এসব কথা হচ্ছিল স্টেশনে। আমরা কাল সকালে সামান্য কয়েকটা কাজ সেরে সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা দেব; আজ কেষ্টদা বম্বে চলে যাচ্ছে, আমরা তাকে বিদায় দিতে এসেছি। কেষ্টদা এবার আমার দিকে ফিরল। তারপর তার ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'আমি তো দশ বছর হল স্টান্ট করছি, কাজটা আমার কাছে নাওয়া-খাওয়ার মতোই সহজ হয়ে গেছে; কিন্তু তুমি বারো বছর বয়সে তোমার প্রথম ছবিতেই যে সাহস দেখালে, সে স্টান্টের কোনও জবাব নেই।'

'কিন্তু আবার কবে দেখা হবে কেষ্টদা?'

'যেদিন এই ছবি রিলিজ করবে সেইদিন। মিঃ লোহিয়ার দেওয়া টাকা দিয়ে আমি নিজে টিকিট কেটে চলে আসব। নইলে বাংলা ছবি তো আর এমনিতে বোম্বাই পৌঁছবে না।'

ট্রেনে হুইসল দিয়ে দিয়েছিল। একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে কেষ্টদা পাদানিতে উঠে পড়ল।

'আসি, মাস্টার অংশু। ঠিকানাটা রেখে দিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'চিঠি লিখো।'

ট্রেন ছেড়ে দিল।

'নিশ্চয়ই লিখব কেষ্টদা। নিশ্চয়ই লিখব।'

যতক্ষণ দেখা গেল কেষ্টদাকে ততক্ষণ সে পাদানিতে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে রড ধরে ঝুলে বাইরে বেরিয়ে অন্য হাত নাড়িয়ে আমাকে বিদায় জানাল।

দেশ শারদীয়, ১৩৯২

নিধিরামের ইচ্ছাপূরণ

কোনও মানুষই তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে ষোলো আনা সন্তুষ্ট বোধ করে না। কোনও-না-কোনও ব্যাপারে একটা খুঁতখুঁতেমির ভাব প্রায় সবার মধ্যেই থাকে। রাম ভাবে তার শরীরে আরও মাংস হল না কেন—হাড়গুলো বড্ড বেশি বেরিয়ে থাকে; শ্যাম ভাবে—আমার কেন গলায় সুর নেই, পাশের বাড়ির ছোকরা তো দিব্যি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গলা সাধে; যদু বলে—আহা, যদি খেলোয়াড় হতে পারতাম!—গাভাসকার ব্যাটা কত রেকর্ড করে কী নামটাই করে নিল! মধু বলে—যদি বোম্বাইয়ের ফিল্মের হিরো হতে পারতাম!—যশ আর অর্থ দুইয়েরই কোনও অভাব হত না।

তেমনই নিধিরাম মিত্তিরের মনেও অনেক অপূর্ণ বাসনা আছে। শুধু অপূর্ণ বাসনা নয়; ঈশ্বর তাঁকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তাতেও তাঁর আপত্তি। এই যেমন, বেশিরভাগ লোকই ফল খেতে ভালবেসে। আম জাম লিচু আঙুর আপেল এসব ফলের কত সুনাম; লোকে কত ভালবেসে এসব ফল খায়, আর তা থেকে পুষ্টি লাভ করে। নিধিরামের কিন্তু কোনও ফলেই রুচি নেই। বিধাতা তাকে এমন বেয়াড়া ভাবে সৃষ্টি করলেন কেন?

তারপর নিধিরাম নিজের চেহারা সম্পর্কেও সন্তুষ্ট নয়। দেখতে সে খারাপ নয়, কিন্তু মাথায় খাটো। ১৯৭৩-এ সে একবার নিজের হাইট মেপেছিল। পাঁচ ফুট সাড়ে ছ' ইঞ্চি। তার আপিসের লোকনাথ গুঁই ছ' ফুট লম্বা। নিধিরাম তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর তার মন ঈর্ষায় ভরে যায়। যদি আরেকটু লম্বা হওয়া যেত!

তার ক্ষমতা অনুযায়ী যতদূর সম্ভব ততদূর নিধিরাম করেছে। মুখার্জি বিল্ডার্স অ্যান্ড কনট্র্যাকটরস কোম্পানিতে আজ চোদ্দ বছরের চাকরি তার। তার কর্তা তার উপর খুশিই আছেন। মাইনেও সে যা পায় তাতে স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তার দিব্যি চলে যায়। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে কি, চাকরি ব্যাপারটাই নিধিরামের পছন্দ নয়। কত লোক আছে যারা স্রেফ লিখে পয়সা করে—গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক। তাতে তাদের খাটতে হয় ঠিকই, কিন্তু চাকুরেদের মতো দশটা-পাঁচটা ডেস্কের উপর ঘাড় গুঁজে বসে থাকতে হয় না। আর শিল্পী, সাহিত্যিক, গাইয়ে, বাজিয়ে হলে বাজারে যে নাম হয়, আপিসে চাকরি করে তো তা হয় না। পাবলিককে খুশি করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ নিধিরাম কোনওদিন পাবে না। এটা তার একটা বড় আফসোসের কারণ। তার এক বন্ধু আছে, মনোতোষ বাগচী, সে থাকে পাইকপাড়ায়। অভিনয়ে সে রীতিমতো দক্ষ। সে পেশাদারি থিয়েটারে যোগ দিয়ে খুব নাম করেছে। হিরোর পার্টই করে বেশিরভাগ। নিধিরাম মনোতোষকে অনেকবার বলেছে, 'ভাই, আমাকে অ্যাকটিং-এ একটু তালিম দিয়ে দে না। আমার বড় শখ। অন্তত ক্লাবে-টাবেও যদি দু-একটা পার্ট করতে পারি তা হলেও তো পাঁচজনে আমাকে চেনে।'

মনোতোষ বলেছে, 'সকলের মধ্যে সব গুণ থাকে না। অ্যাকটিং যে করবি তার গলা কোথায় তোর? লোকে পিছনের সারি থেকে তোর কথা শুনতে না পেলে এমন আওয়াজ দেবে যে অভিনয়ের বারোটা বেজে যাবে।'

এবার পুজোর ছুটিতে পুরীতে গিয়ে নিধিরাম এক সাধুবাবার সাক্ষাৎ পেল। ভদ্রলোক সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে ঘিরে জনা বিশেক মেয়ে-পুরুষ ভক্তের দল। সাধু-সন্ন্যাসীর দেখা পেলে নিধিরাম কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না, বিশেষ করে এঁর মতো তেজিয়ান চেহারার সাধু হলে তো কথাই নেই!

নিধিরাম ভিড় ঠেলে একটু কাছে যেতেই বাবাজির দৃষ্টি তার উপর পড়ল। 'কী বাবা নিধিরাম,' বলে উঠলেন বাবাজি, 'যা নয় তাই হবার শখ হয়েছে?'

নিধিরাম সাধুর মুখে নিজের নাম শুনেই তাজ্জব বনে গেছে; খাঁটি সিদ্ধপুরুষ না হলে এ ক্ষমতা হয় না। সে আমতা-আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে কই, না তো।'

'না আবার কী?' বলে উঠলেন বাবাজি, 'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোর দেহ দু'ভাগে ভাগ হয়ে রয়েছে; একটা তোর বাস, আর একটা বাসনা। বাসনাটাই যে প্রবল হয়ে উঠেছে তার কী হবে?'

'কী হবে তা আপনিই বলে দিন বাবাজি।' কাতর কণ্ঠে বলল নিধিরাম। 'আমি মুখ্যু মানুষ, আমি আর কী বলব?'

'হবে হবে', বললেন বাবাজি। 'মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তবে এখনই নয়, সময় লাগবে। একেবারে মূল উপড়ে ফেলতে হবে তো। তারপর আবার নতুন করে শেকড় গজাবে, আর সে শেকড় নতুন জমিতে ভুঁয়ের নীচে প্রবেশ করবে। চাট্টিখানি কথা নয়! তবে ওই যা বললাম—তোর হবে।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই কলকাতায় ফিরে এসে একদিন নিধিরামের কলা খেতে ইচ্ছে করল। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে কলা বিক্রি হচ্ছে; নিধিরাম একটা কিনে খেয়ে দেখল—দিব্যি স্বাদ। উনচল্লিশ বছর বয়সেও তা হলে মানুষের রুচি পালটায়! এটার সঙ্গে সাধুবাবার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা সেটা নিধিরামের খেয়াল হয়নি, তবে এই দিয়েই তার পরিবর্তনের সূত্রপাত।

সেদিন আপিসে নিধিরামের কাজে মন বসল না। ক'দিন থেকেই সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে, পুরীর বাবাজির কথা মনে পড়ছে, ফলে তার কাজে ব্যাঘাত হচ্ছে। তার পাশের টেবিলের ফণীবাবু টিফিন টাইম হয়েছে দেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'আজ মিত্তিরমশাইকে অন্যমনস্ক

দেখছি কেন? কীসের এত চিন্তা?'

কথাটা বলে সিগারেটে একটা টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন ভদ্রলোক, আর সেই ধোঁয়া নিধিরামের নাকে মুখে প্রবেশ করে হঠাৎ তাকে বিষম খাইয়ে দিল। অথচ নিধিরাম নিজেই বিড়ি-সিগারেট খায়, ধোঁয়ায় সে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত। আজ হঠাৎ তার এমন হল কেন? তার নিজের পকেটে এক প্যাকেট উইলস রয়েছে; খেয়াল হল যে এগারোটার সময় চায়ের পর সে সিগারেট ধরায়নি। এটা নিয়মের একটা বিরাট ব্যতিক্রম। এখানেও তার একটা পরিবর্তন সে লক্ষ করল। এই নিয়ে সে ফণীবাবুকে কিছু বলল না।

এর পর থেকে নিধিরামের নানারকম দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল। সে লুঙ্গি ছেড়ে ধুতি, আমিষ ছেড়ে নিরামিষ, অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি ধরল। মাথার টেরি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিয়ে এল। তার গোঁফ ছিল না, এখন একটু সরু গোঁফ গজালো, মাথার চুলটা বেড়ে গিয়ে ঘাড় অবধি ঝুলে এল।

এর মধ্যে এক শনিবার নিধিরাম গিন্নিকে নিয়ে 'মর্যাদা' নাটক দেখতে গেল রঙমহলে। হিরোর পার্টে ছিল বন্ধু মনোতোষ বাগচী। নিধিরাম বুঝল তার বন্ধুর অভিনয় ক্ষমতা। দর্শককে সে ধরে রাখে হাতের মুঠোর মধ্যে, দর্শকও বারবার করধ্বনি করে তাদের তারিফ জানিয়ে দেয় নায়ককে।

নিধিরামের আবার নতুন করে ইচ্ছা জাগল অভিনেতা হবার। নাটকের শেষে ব্যাকস্টেজে গিয়ে সে বন্ধুর অভিনয়ের প্রশংসা করে এল মুক্তকণ্ঠে। আর নিজের আফসোসটা জানিয়ে এল। মনোতোষ তাকে পিঠ চাপড়ে বলে দিল, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, তাই না? থিয়েটারে কী? আজ আছি, কাল নেই। তোদের চাকরিতে ঢের বেশি নিরাপত্তা।'

নিধিরাম ম্যাটিনিতে গিয়েছিল নাটক দেখতে; ফেরার পথে কলেজ স্ট্রিট থেকে কিছু নাটকের বই কিনে নিল। স্ত্রী মনোরমা জিজ্ঞেস করল, 'এসব কী হবে?' 'পড়ব', ছোট করে জবাব দিল নিধিরাম। স্ত্রী বলল, 'সাত জন্মেও তো নাটক পড়তে দেখিনি তোমায়।' 'এবার দেখবে', বলল নিধিরাম।

স্বামীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন ক'দিন থেকেই লক্ষ করেছে মনোরমা। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করেনি। আজ তাকে জিজ্ঞেস করতেই হল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো?' স্বামীর সঙ্গে পুরী যায়নি মনোরমা, কারণ সে সময়ে সে ছিল বাঁশবেড়ে; অসুস্থ বাপের পরিচর্যা করতে হচ্ছিল তাকে। তাই সাধুবাবার ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে সে কিছুই জানত না, নিধিরামও ঘটনাটা গিন্নির কাছে প্রকাশ করেনি।

তবে চেপে রাখলেই বা কী?—এত পরিবর্তন হয়েছে নিধিরামের এ ক' মাসে যে, সেটা স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। এখানে এটাও বলা দরকার যে, স্বামীর রূপান্তরে মনোরমা খুশিই আছে, কারণ পরিবর্তনগুলো সবই ভালর দিকে।

বড়দিনের ছুটিতে নিধিরাম নাটকের বইগুলো পড়ল। একটাতে হিরোর পার্টের বেশ খানিকটা মুখস্থ করে সে স্ত্রীকে অভিনয় করে দেখাল। মনোরমার চোখ কপালে উঠে গেল। স্বামীর মধ্যে যে এমন একটা ক্ষমতা লুকিয়ে ছিল সেটা সে কল্পনাই করতে পারেনি।

উনচল্লিশ বছর বয়সে মানুষ দৈর্ঘ্যে বাড়ে না; বছর পঁচিশ থেকেই বাড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শার্ট-পাঞ্জাবির হাতগুলো খাটো মনে হচ্ছে দেখে নিধিরাম নতুন করে হাইট মেপে দেখল এবার হল পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি। এই তাজ্জব ঘটনাও নিধিরাম কারুর কাছে প্রকাশ করল না, তবে গিন্নিকে বলতেই হল, আর নতুন মাপের কিছু জামা তৈরি করতে খরচও হয়ে গেল কিছু। ঘটনাটা এতই অস্বাভাবিক, আর নিধিরামের পক্ষে এতই আনন্দের যে, খরচটা সে গ্রাহ্যই করল না। তার শুধু যে হাইট বেড়েছে তা নয়; গায়ের রঙও বেশ কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে, আর শরীরে বল হয়েছে আগের চেয়ে অনেকটা বেশি।

একদিন নিধিরাম আপিস থেকে ফিরে শোয়ার ঘরের আলমারির বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিজের চেহারার দিকে দেখে মনে মনে একটা ব্যাপার স্থির করে ফেলল। শ্যামবাজারের থিয়েটার পাড়াতে একবার যাওয়া দরকার। সম্রাট অপেরা কোম্পানিতে যে হিরোর পার্ট করত, সেই মলয়কুমার সম্প্রতি থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে। সম্রাটের ম্যানেজারের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

যেমন কথা তেমন কাজ। ম্যানেজার প্রিয়নাথ সাহার সঙ্গে সোজা দেখা করল নিধিরাম।

'অভিজ্ঞতা কী?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যানেজার মশাই।

'একেবারে নেই', অকপটে স্বীকার করল নিধিরাম—'তবে অভিনয় করে দেখিয়ে দিতে পারি। আপনাদের "প্রতিধ্বনি" নাটকে মলয়কুমার যে পার্টটা করেছিল সেটা আমার মুখস্থ আছে।'

'বটে?'

প্রিয়নাথবাবু এবার 'অখিলবাবু!' বলে একটি হাঁক দিলেন। একটা টাকমাথা প্রৌঢ় ভদ্রলোক পর্দা ফাঁক করে ঘরে ঢুকলেন।

'আমায় ডাকছিলেন?'

'হ্যাঁ', বললেন প্রিয়নাথবাবু। 'এঁকে একবার বাজিয়ে দেখুন তো। ইনি বলছেন মলয়ের পার্টটা নাকি এঁর মুখস্থ। দেখুন তো এঁকে দিয়ে কাজ চলে কিনা।'

বেশিক্ষণ পরীক্ষা করতে হল না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই নিধিরাম বুঝিয়ে দিল যে, সে মলয়কুমারের চেয়ে কম তো নয়ই, বরং অনেক ব্যাপারে তার চেয়েও বেশি দক্ষ।

পয়লা জানুয়ারি নিধিরাম চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সম্রাট অপেরায় যোগ দিল। মাইনে শুরুতে আড়াই হাজার, তবে কাজ ভাল হলে, আর লোকে তাকে পছন্দ করলে, আরও বাড়বে।

মুখার্জি কোম্পানির চাকরি যে নিধিরাম কোনওদিন ছাড়বে এটা কেউ ভাবতে পারেনি। নিধিরাম দার্শনিকের ভাব করে তার সহকর্মীদের বলল, 'মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসবেই। চিরকাল জীবনটা যে একই পথে চলবে এটা ভাবাই ভুল।'

তবে নাটকে যোগ দিয়েও পুরনো আপিসের সঙ্গে সম্পর্কটা চট করে ছাড়তে পারল না নিধিরাম। এক সোমবার টিফিন টাইমে সেখানে গিয়ে শুনল যে, তার জায়গায় নতুন লোক এসেছে। খবরটা দিলেন ফণীবাবু। বললেন, 'যিনি এসেছেন তিনি আবার আপনার ঠিক উলটো। ইনি আগে থিয়েটার করতেন।'

নিধিরামের কৌতূহল হল।

'কী নাম বলুন তো।'

'মনোতোষ বাগচী। বললেন পুরীতে এক সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি নাকি বলেছিলেন তাঁর জীবনে অনেক চেঞ্জ আসবে। ভদ্রলোকের থিয়েটারে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। বললেন চাকরি পেয়ে তাঁর অনেক বেশি নিশ্চিন্ত লাগছে।'

সন্দেশ, পৌষ ১৩৯২

কানাইয়ের কথা

নসু কবরেজ প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে বলরামের নাড়ি ধরে বসে রইলেন। শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে বলরামের সতেরো বছরের ছেলে কানাই কবরেজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। আজ দশদিন হল তার বাপের অসুখ। কোনও কিছু খাবারে তার রুচি নেই ; একটানা দশদিন না খেয়ে সে শুকিয়ে গেছে, তার চোখ কোটরে বসে গেছে, তার সর্বাঙ্গ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিন ক্রোশ পায়ে হেঁটে কানাই নসু কবরেজের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে পায়ে ধরে তাঁকে নিয়ে এসেছে তার বাপের চিকিৎসার জন্য। এ রোগের নাম কী, তা কানাই জানে না। কবরেজ জানেন কি ? তাঁর চোখের ভ্রূকুটি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়। মোট কথা, এ যাত্রা তার বাপ না বাঁচলে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। আপন লোক বলতে তার আর কেউ নেই। নন্দীগ্রামে দু' বিঘে জমি আর একজোড়া হাল বলদ নিয়ে থাকে বাপ-ব্যাটায়। খেতে যা ফসল হয় তাতে মোটামুটি দু'বেলা দু' মুঠো খেয়ে চলে

যায় দু'জনের। কানাইয়ের মা বসন্ত রোগে মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে, আর এখন বাপের এই বিদ্‌ঘুটে ব্যারাম।

'চাঁদনি', নাড়ি ছেড়ে মাথা নেড়ে বললেন কবরেজমশাই। নসু কবরেজের খ্যাতি অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। তাঁর নাড়িজ্ঞান নাকি যেমন-তেমন নয়। তিনি জবাব দিয়ে গেলে রোগীকে বাঁচানো শিবের অসাধ্যি, আর তিনি ওষুধ বাতলে গেলে রোগী চাঙ্গা হয়ে উঠবেই। কিন্তু চাঁদনি আবার কী ? 'আজ্ঞে ?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কানাই।

'চাঁদনি পাতার রস খাওয়াতে হবে, তা হলেই রোগ সারবে। সংস্কৃত নাম চন্দ্রায়ণী। আর রোগের নাম হল শুখ্‌নাই।'

'চাঁদনি একটা গাছের নাম বুঝি ?' ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল কানাই।

নসু কবরেজ ওপর-নীচে মাথা নাড়লেন দু'বার। কিন্তু তাঁর চোখ থেকে ভ্রূকুটি গেল না।

'কিন্তু চাঁদনি তো যেখানে-সেখানে পাবে না বাপু', শেষটায় বললেন তিনি।

'তবে ?'

'বাদড়ার জঙ্গলে যেতে হবে। একটা পোড়ো মন্দির আছে মহাকালের। তার উত্তরদিকে পঁচিশ পা গেলেই দেখবে চাঁদনি গাছ। কিন্তু সে তো প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ ; পারবে যেতে ?'

'নিশ্চয়ই পারব', বলল কানাই। 'হাঁটতে আমার কোনও কষ্ট হয় না।'

কথাটা বলেই কানাইয়ের আরেকটা প্রশ্ন মাথায় এল।

'কিন্তু গাছ চিনব কী করে কবরেজমশাই ?'

'ছোট ছোট ছুঁচলো বেগনে পাতা, হলদে ফুল আর মন-মাতানো গন্ধ। বিশ হাত দূর থেকে সে গন্ধ পাওয়া যায়। স্বর্গের পারিজাতকে হার মানায় সে গন্ধ। তিন-চার হাতের বেশি উঁচু নয় গাছ। একটি পাতা বেটে রস খাওয়ালেই আর দেখতে হবে না। ব্যারাম বাপ-বাপ বলে পালাবে, আর শরীর দু'দিনেই তাজা হয়ে যাবে। তবে সময় আছে আর মাত্র দশদিন। দশদিনের মধ্যে না খাওয়ালে...'

নসু কবরেজ আর কথাটা শেষ করলেন না।

'আমি কাল সক্কাল-সক্কাল বেরিয়ে পড়ব, কবরেজমশাই', বলল কানাই। 'গণেশখুড়োকে বলব আমি যখন থাকব না তখন যেন বাবাকে এসে দেখে যায়। খাওয়ানো তো যাবে না বোধ হয় কিছুই ?'

নসু কবরেজ মাথা নাড়লেন। 'সে চেষ্টা বৃথা। এ ব্যারামের লক্ষণই এই। পেটে কিছুই সহ্য হয় না, আর দিনে দিনে শরীর শুকিয়ে যেতে থাকে। তবে চাঁদনির রস এর অব্যর্থ ওষুধ। আর, ইয়ে, ব্যারাম সারবার পর বাকি কথা হবে...'

পড়শি গণেশ সামন্তকে বাপের দিকে একটু নজর রাখার কথা বলে পরদিন ভোর থাকতে গুড়-চিঁড়ে গামছায় বেঁধে নিয়ে কানাই বেরিয়ে পড়ল বাদড়ার জঙ্গলের উদ্দেশে। পৌঁছতে পৌঁছতে সেই বিকেল হয়ে যাবে, কিন্তু কানাই পরোয়া করে না। বাপকে সে দেবতার মতো ভক্তি করে, আর বাপও ছেলেকে ভালবাসে প্রাণের চেয়েও বেশি। দিব্যি সুস্থ মানুষটার হঠাৎ যে কী হল !—দেখতে দেখতে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেল।

পথ জানা নেই, তাই একে তাকে জিজ্ঞেস করে করে চলতে হচ্ছে। বনের নাম শুনে সকলেই জিজ্ঞেস করে, 'কেন, সেখানে আবার কী ?' শুনে কানাই বুঝতে পারে বনটা খুব নিরাপদ নয়, কিন্তু তা হলে কী হবে ? বাপের জন্য চাঁদনি পাতা জোগাড় করতে সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সূর্যি যখন লম্বা ছায়া ফেলতে শুরু করছে তখন একটা ধানখেতের ওপারে কানাই দেখল একটা গভীর বন দেখা যাচ্ছে। খেত থেকে এক কৃষক কাঁধে লাঙল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। তাকে জিজ্ঞেস করে কানাই জানল ওটাই বাদড়ার বন। কানাই পা চালিয়ে এগিয়ে চলল।

শাল সেগুন শিমুলের সঙ্গে আর কত কী গাছ মেশানো ঘন বনে সূর্যের আলো ঢোকে না বললেই চলে। এই বিশাল বনে তিন-চার হাত উঁচু গাছ খুঁজে পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা ? তবে কাছে মন্দির আছে, সেই একটা সুবিধে !

বিশ-পঁচিশ হাত ভিতরে ঢুকতেই একটা হরিণের পাল দেখতে পেল কানাই। তাকে দেখেই

হরিণগুলো ছুটে পালালো। হরিণ তো ভাল, কিন্তু জাঁদরেল কোনও জানোয়ার যদি সামনে পড়ে ? যাই হোক, সে ভেবে কোনও লাভ নেই। তার লক্ষ্য হবে এখন একটাই ; প্রথমে মহাকালের মন্দির, তারপর চাঁদনি গাছ খুঁজে বার করা।

মন্দির দেখতে পাবার আগে কিন্তু গন্ধটা পেল কানাই। তত জোরালো নয় ; মিহি একটা গন্ধ, কিন্তু তাতেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

এবার একটা মহুয়া গাছ পেরিয়ে পোড়ো মন্দিরটা চোখে পড়ল। দিন ফুরিয়ে এসেছে, তবে মন্দিরের চারপাশটায় গাছ একটু পাতলা বলে পড়ন্ত রোদ এখানে-ওখানে ছিটিয়ে পড়েছে।

'তুই কে রে ব্যাটা ?'

প্রশ্নটা শুনে কানাই চমকে তিন হাত লাফিয়ে উঠেছিল। এখানে অন্য মানুষ থাকতে পারে এটা তার মাথাতেই আসেনি। এবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল একটা গোলপাতার ছাউনির সামনে তিন হাত লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা একটা লোক ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে তার দিকে।

'তুই যা খুঁজছিস তা এখানে পাবি না', এবার বলল বুড়ো কয়েক পা এগিয়ে এসে। সে কি মনের কথা বুঝতে পারে নাকি ?

'কী খুঁজছি তা তুমি জানো ?' জিজ্ঞেস করল কানাই।

'দাঁড়া দাঁড়া, একটু মনে করে দেখি। তোকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু এখন আবার মন থেকে হঠাৎ ফস্‌কে গেল। একশো ছাপ্পান্ন বছর বয়সে স্মরণশক্তি কি আর জোয়ান বয়সের মতো কাজ করে ?'

বুড়ো মাথা হেঁট করে ডান হাত দিয়ে গাল চুলকে হঠাৎ আবার মাথা সিধে করে বলল, 'মনে পড়েছে। চাঁদনি। তোর বাপের অসুখ, তার জন্য চাঁদনি পাতা নিতে এসেছিস তুই। ওই মন্দিরের উত্তর দিকটায় ছিল আজ দুপুর অবধি। কিন্তু সে তোর আর নেই ! গিয়ে দেখ—শেকড় অবধি তুলে নিয়ে গেছে।'

কানাইয়ের বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে। এতটা পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে ? সে মন্দির লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। উত্তর দিক। উত্তর দিক কোন্‌টা ? হ্যাঁ, এইটে। ওই যে গর্ত। ওইখানে ছিল গাছ—শেকড় অবধি তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু কে ?

কানাইয়ের চোখে জল। সে বুড়োর কাছে ফিরে এল।

'কে নিল সে গাছ ? কে নিল ?'

'রূপসার মন্ত্রী সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে এসে গাছ তুলে নিয়ে গেছে। রূপসার প্রজাদের ব্যারাম হয়েছে—শুখ্‌নাই ব্যারাম—বিশদিনে না খেয়ে হাত পা শুকিয়ে মরে যায় তাতে। একমাত্র ওষুধ হল চাঁদনি পাতার রস।'

কানাইয়ের আর কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। সে চোখে অন্ধকার দেখছিল। কিন্তু বুড়ো একটা অদ্ভুত কথা বলল।

'চাঁদনি এখানে নেই বটে, কিন্তু আমি যে দেখছি তোর বাপ ভাল হয়ে উঠবে।'

কানাই চমকে উঠল।

'তাই দেখছেন ? সত্যি তাই দেখেছেন ? কিন্তু ওষুধ না পেলে কী করে ভাল হবে ? এ গাছ আর কোথায় আছে সে আপনি জানেন ?'

বুড়ো মাথা নাড়ল। 'আর কোথাও নেই। এই একটিমাত্র জায়গায় ছিল, তাও এখন চলে গেছে রূপসার রাজ্যে।'

'সে কতদূর এখান থেকে ?'

'দাঁড়া, একটু ভেবে দেখি ?'

বুড়ো বোধহয় আবার ভুলে গেছে, তাই মনে করার চেষ্টায় মাথা হেঁট করে টাক চুলকোতে লাগল।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ত্রিশ ক্রোশ পথ। বিশাল রাজ্য।'

এবার কানাইয়েরও মনে পড়েছে। বলল, 'রূপসা মানে যেখানের তাঁতের কাপড়ের খুব

নামডাক ?'

'ঠিক বলেছিস। রূপসার শাড়ি ধুতি চাদর দেশ-বিদেশে যায়। এমন বাহারের কাপড় আর কোথাও বোনা হয় না।'

'আপনি এত জানলেন কী করে ? আপনি কে ?'

'আমি ত্রিকালজ্ঞ। আমার নাম একটা আছে। তবে এখন মনে পড়ছে না। ভাল কথা, তোকে তো একবার রূপসা যেতে হচ্ছে। চাঁদনির খোঁজ তোকে তো করতেই হবে।'

'কিন্তু কবরেজ বলেছে দশদিনের মধ্যে বাপকে ওষুধ খাওয়াতে না পারলে বাপ আর বাঁচবে না। তার মধ্যে একদিন তো চলেই গেল।'

'তাতে কী হল। যা করতে হবে ঝটপট করে ফেল।'

'কী করে করব ? ত্রিশ ক্রোশ পথ। সেখানে যাওয়া আছে, গাছ খুঁজে বার করা আছে, ফেরা আছে...।'

'দাঁড়া, মনে পড়েছে।'

বুড়ো এবার তার কুটিরের মধ্যে ঢুকে একটা থলি বার করে আনল। তারপর তার থেকে তিনটে গোল গোল জিনিস বার করল—একটা লাল, একটা নীল, একটা হলদে।

'এই দ্যাখ্', লালটা হাতে তুলে বলল বুড়ো। 'এটা একরকম ফল। এটা খেলে তুই হরিণের চেয়ে তিনগুণ জোরে ছুটতে পারবি। এক ক্রোশ পথ তোর যেতে লাগবে তিন মিনিট। তার মানে দেড় ঘণ্টায় তুই পৌঁছে যাবি রূপসা। এই তিনটেই ফল, আর তিনটেই তোকে দিলাম।'

'কিন্তু হলদে আর নীল ফল খেলে কী হয় ?'

'এই তো মুশকিলে ফেললি', বলে বুড়ো আবার মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়িয়ে বলল, 'উঁহু, মনে পড়ছে না। তবে কিছু একটা হয়, আর সেটা তোর উপকারেই লাগবে। যদি কখনও মনে পড়ে তবে তোকে জানাব।'

'কী করে জানাবে ? আমি তো চলে যাব।'

'উপায় আছে।'

বুড়ো আবার থলির ভিতর হাত ঢুকিয়ে এবার একটা ঝিনুক বার করল, সেটা প্রায় হাতের তেলোর সমান বড়। সত্যি বলতে কি, কানাই এতবড় ঝিনুক কখনও দেখেনি। ঝিনুকটা কানাইকে দিয়ে বুড়ো বলল, 'এটা সঙ্গে রাখবি। আমার কিছু বলার দরকার হলে আমি তোকে নাম ধরে ডাকব। তোর নাম কানাই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'সেই ডাক তুই এই ঝিনুকের মধ্যে শুনতে পাবি। ওটা তোর ট্যাঁকে থাকলেও শুনতে পাবি। তারপর ঝিনুকটাকে কানের উপর চেপে ধরলেই তুই পষ্ট আমার কথা শুনতে পাবি। আমার কথা যখন শেষ হবে তখন ঝিনুকে শোনা যাবে সমুদ্রের গর্জন। তখন আবার ঝিনুকটা ট্যাঁকে গুঁজে রাখবি।'

কানাই ঝিনুকটা নিয়ে তার ট্যাঁকেই রাখল। বুড়ো এবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'আজ তো সন্ধে হয়ে গেল। তুই এখন রূপসা গিয়ে কিছু করতে পারবি না। আমি বলি আজ রাতটা আমার কুটিরেই থাক, কাল ভোরে রওনা হবি। তা হলে ওখানে সারা দিনটা পাবি, অনেক কাজ হবে। আমার ঘরে ফলমূল আছে, তাই খাবি এখন।'

কানাই রাজি হয়ে গেল। তার ইচ্ছে করছিল তখনই লাল ফলটা খেয়ে রওনা দেয় ; বুড়োর কথা ঠিক কিনা সেটা পরখ করে দেখতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সেটাকে সে দমন করল। সকালে রওনা দেওয়াই সবদিক দিয়ে ভাল হবে।

'ভাল কথা', বলল বুড়ো, 'মনে পড়েছে। আমায় লোকে জগাইবাবা বলে ডাকে। তুইও বলিস।'

॥ ২ ॥

পরদিন সকালে লাল ফলটা খেয়ে জগাইবাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় পা দিতেই কানাই বুঝল তার গায়ের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। তারপর হাঁটতে গিয়ে দেখল হাঁটলে চলবে না—দৌড়তে হবে। সে দৌড় যে কী বেদম দৌড় সে আর কী বলব ! রাস্তার দু'পাশে গাছপালা ঘরবাড়ি মানুষজন গোরু ছাগল সব তীরবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে উলটোদিকে, পায়ের তলা দিয়ে মাটি সরে যাচ্ছে শন্ শন্ করে, দু'কানের পাশে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে কানে প্রায় তালা লাগে, দেখতে দেখতে দু'দিকের দৃশ্য বদলে যাচ্ছে—গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে মাঠ, মাঠ থেকে বন, বন থেকে আবার গ্রামে। পথে দুটো নদী পড়ল, মুহূর্তের মধ্যে সে নদী কানাইয়ের পায়ের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল, পায়ের গোড়ালিটুকুও ভিজবার সময় পেল না।

সূর্য মাথায় ওঠার আগেই কানাই বুঝতে পারল সামনে একটা বড় শহর দেখা যাচ্ছে। সে তখনই দৌড়নো বন্ধ করে হাঁটতে শুরু করল। বাকি পথটুকু এমনিভাবেই হেঁটে যাবে, নইলে অন্য পথচারীরা কী ভাববে ? তাকে নিয়ে একটা হইচই পড়ে এটা কানাই মোটেই চায় না।

শহরে ঢোকবার মুখে একটা তোরণ, তার দু'দিকে দু'জন সশস্ত্র সেপাই। এটা আগে থেকে জানা ছিল না, তাই কানাইকে একটু মুশকিলেই পড়তে হয়েছিল। সেপাইরা কানাইকে দেখেই তার পথরোধ করতে গিয়েছিল, তাই নিরুপায় হয়ে কানাইকে সামান্য একটু দৌড় দিতে হয়েছিল। ফলে কানাই এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল, যেখান থেকে তোরণটা এত দূরে যে, সেটাকে প্রায় দেখাই যায় না।

আর কোনও ভাবনা নেই। কানাই এখন একটা বাজারের মধ্যে দিয়ে চলেছে। দু'দিকে দোকানপাট, তাতে নানারকম জিনিসের মধ্যে কাপড়ই বেশি, আর সেই কাপড়ের বাহার দেখেই কানাই তো থ ! দেশ-বিদেশের লোকেরা সে কাপড় দেখছে, দর করছে, কিনছে। কিন্তু একটা জিনিস দেখে কানাইয়ের ভারী অদ্ভুত লাগল। যারা সে কাপড় বেচছে তাদের কারুর মুখে হাসি নেই। আর, আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার হল, হাটের এখানে-সেখানে হাতে বল্লমওয়ালা সেপাইরা ঘোরাফেরা করছে।

কানাইয়ের ভারী কৌতূহল হল। সে একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, 'এই শহরের নাম কি রূপসা ?' লোকটা মুখে কিছু না বলে কেবল মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানাল। এবার কানাই বলল, 'তা তোমরা সবাই এত গম্ভীর কেন বলো তো ? কেনা-বেচা তো বেশ ভালই হচ্ছে ; তবু তোমাদের মুখে হাসি নেই কেন ?'

লোকটা এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে বলল, 'তুমি বুঝি ভিন দেশের লোক ?'

কানাই বলল, 'হ্যাঁ ; আমি সবে এখানে এলাম।'

'তাই তুমি জানো না', বলল দোকানদার। 'এখানে মড়ক লেগেছে।'

'মড়ক ?'

'শুখ্নাইয়ের মড়ক। এখন তাঁতিপাড়ায় লেগেছে, কিন্তু ছড়িয়ে পড়তে আর কতদিন ? তাঁতিরা সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।'

'কিন্তু—'

কানাই ওষুধের কথাটা বলতে গিয়ে বলল না। আশ্চর্য ব্যাপার !—মন্ত্রী গিয়ে চাঁদনি গাছ নিয়ে এসেছে, তাও তাঁতিদের কেন অসুখ সারছে না ? এই গাছের পাতায় কি তা হলে কাজ দেয় না ? একটা আস্ত গাছে কত পাতা হয় ? চার-পাঁচশো তো বটেই। তার একটা খেলেই একটা লোকের অসুখ সারার কথা। কিন্তু সে গাছ তা হলে গেল কোথায় ?

কানাই উঠে পড়ল। তার মনে পড়ে গেছে যে এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হল চাঁদনির পাতা জোগাড় করা। কিন্তু সেই গাছ তার নাগালে আসবে কী করে ? মন্ত্রিমশাই সে গাছ কোথায় রেখেছেন সেটা সে জানবে কী করে ?

কানাই হাঁটতে আরম্ভ করল। বাজার ছাড়িয়ে সে দেখল একটা পাড়ার মধ্যে এসে পড়েছে।

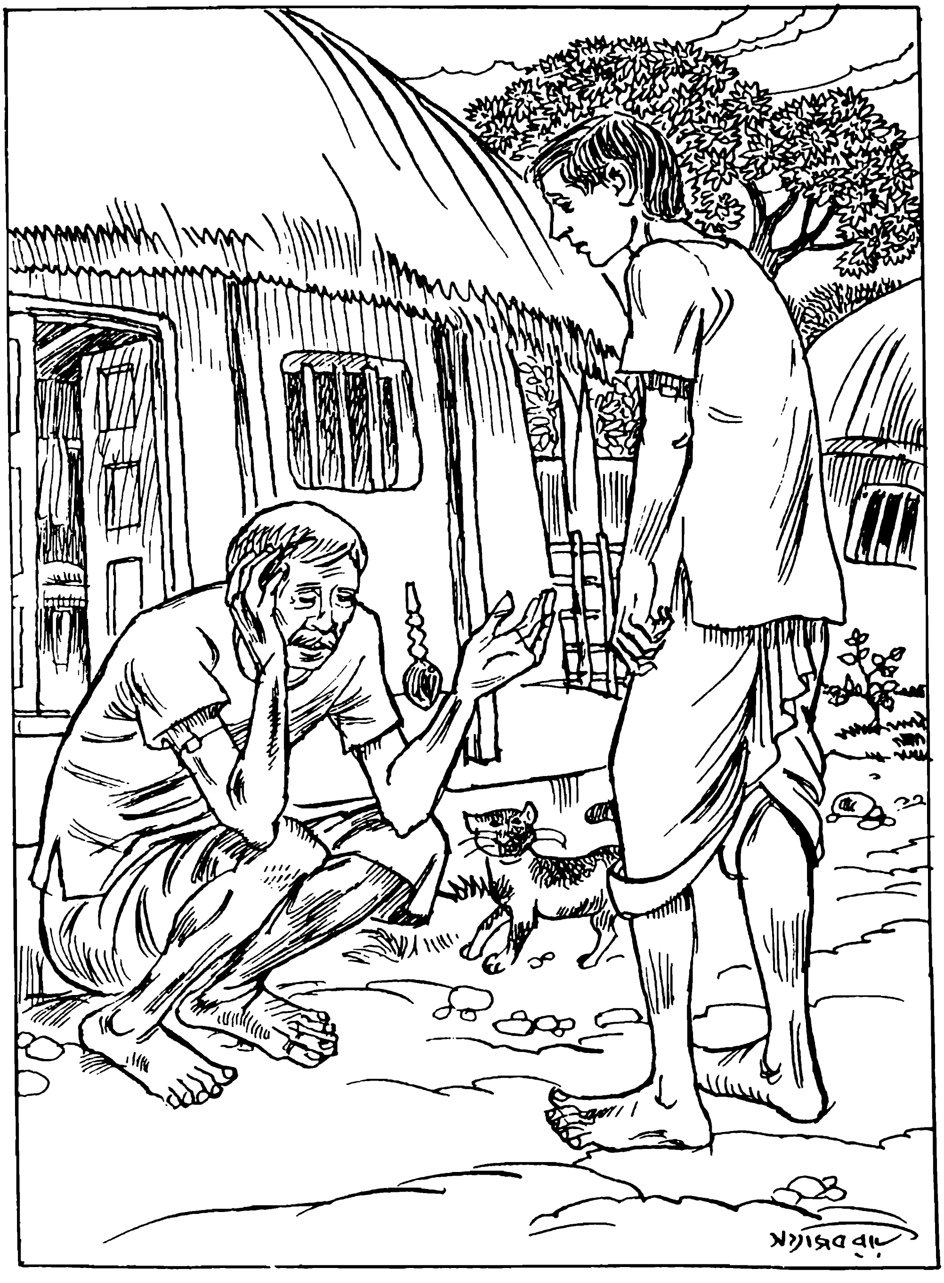

এখানে চারিদিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। এটাই কি তাঁতিপাড়া ?

রাস্তার ধারে একটা বুড়ো বসে আছে দেখে কানাই তার দিকে এগিয়ে গেল।

'হ্যাঁ গো, এটা কি তাঁতিপাড়া ?' কানাই জিজ্ঞেস করল।

বুড়ো মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এটাই তাঁতিপাড়া। তবে তাঁতি আর এখানে বেশিদিন নেই। চারটে করে তাঁতি রোজ মরছে ব্যারামে। শশী গেল, নীলমণি গেল, লক্ষ্মণ গেল, বেচারাম গেল—আর কি ! এ রোগের তো কোনও চিকিৎসা নেই। আমায় এখনও ধরেনি রোগে, তবে

ধরতে আর কত দিন ?'

'চিকিৎসা নেই বলছ কেন ? একটা গাছের পাতার রস খেলেই তো এ ব্যারাম সারে। সে গাছ তো তোমাদের মন্ত্রিমশাই বাদড়ার জঙ্গলে গিয়ে নিয়ে এসেছেন।'

'তাঁতিদের তাতে লাভটা কী ? সে গাছ তো মন্ত্রিমশাই আমাদের দেবেন না।'

'কেন, দেবে না কেন ?'

'আমাদের রাজা বড় সর্বনেশে।' বুড়ো এদিক-ওদিক সন্দেহের দৃষ্টি দিল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'এ রাজা পিশাচ। পেয়াদারা বল্লমের খোঁচা মেরে তাঁতিদের দিয়ে কাপড় বোনায়। যারা বোনে না তাদের শূলে চড়ায়। রূপসার কাপড় বিদেশ থেকে সদাগর এসে কিনে নিয়ে যায়। যা টাকা আসে তার চার ভাগের তিন ভাগ যায় রাজকোষে। তাঁতিরা সব একজোটে রাজাকে হটিয়ে তার ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে ঠিক করেছিল। সে-কথা কেউ গিয়ে তোলে রাজার কানে। আর সেই সময় লাগে এই মড়ক। রাজা চায় তাঁতিরা সব মরুক। তাই ওষুধ এনে সরিয়ে রেখেছে।'

কানাইয়ের মনটা শক্ত হয়ে উঠল। এমন শয়তান রাজা এই রূপসার রাজ্যে ? সে যে-করে হোক চাঁদনির পাতা এনে দেবে তাঁতিদের জন্য। যে-করে হোক !

বুড়ো বলে চলল, 'রাজা শয়তান, কিন্তু তার ছেলে রাজকুমার, সে সোনার চাঁদ ছেলে। তোমারই মতন বয়স তার। সে যদি রাজা হয় তা হলে দেশের সব দুঃখু দূর হবে।'

'এই রাজাকে সরাবার কোনও রাস্তা নেই বুঝি ?'

'সে কি আর আমরা জানি ? আমরা মুখ্য-সুখ্য মানুষ, আমরা শুধু দুঃখু পেতেই জানি।'

আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল বুড়োকে।

'রাজবাড়িটা কোনদিকে বলতে পারো ?'

'এই রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে রাজপথ পড়বে। বাঁয়ে ঘুরে দেখবে দূরে রাজার কেল্লার ফটক দেখা যাচ্ছে। তবে তোমায় সেখানে ঢুকতে দেবে না। পাহারা বড় কড়া।'

কানাই বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে কিছুদূর গিয়েই রাজপথে পড়ল। বাঁ দিকে ঘুরে সত্যিই দেখল দূরে কেল্লার ফটক দেখা যাচ্ছে।

কানাই ইতিমধ্যেই মতলব এঁটে নিয়েছে। সে এমনি ভাবে হেঁটে গিয়ে যখন ফটক থেকে বিশ হাত দূরে, প্রহরী তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে, তখন সে দিল ফটক লক্ষ্য করে বেদম ছুট।

চোখের পলকে কানাই প্রথম ফটক দ্বিতীয় ফটক পেরিয়ে পৌঁছে গেল একটা বাগানে। এখানে আশেপাশে কোনও লোক নেই দেখে কানাই থামল। বাঁ দিকে বাগান, তাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে আছে শ্বেতপাথরের দালান।

কানাই কী করবে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল। বাগানে ফুলের ছড়াছড়ি, চারিদিক রঙে রঙ, কে বলবে এই দেশে শুখ্‌নাইয়ের মড়ক লেগেছে !

এই ফুলের মধ্যেই কি চাঁদনি গাছ রয়েছে ? ছোট ছোট ছুঁচলো বেগুনি পাতা আর হলদে ফুল। যদি এর মধ্যেই থাকে তা হলে সে কাজ অনেক সহজে হয়ে যায়।

এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে কানাই এগোচ্ছিল, হঠাৎ তার পিঠে পড়ল একটা হাত, আর আরেকটা হাত তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে কোলপাঁজা করে তুলে নিল।

কানাই দেখলে সে এক অতিকায় প্রহরীর হাতে বন্দি।

॥৩॥

প্রহরী কানাইকে সোজা নিয়ে গেল রাজসভায়। কানাই দেখল রাজা সিংহাসনে বসে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে রয়েছে সভাসদরা। রাজা যে শয়তান সেটা তাঁর কুতকুতে চোখ, ঘন ভুরু আর গালপাট্টা দেখলেই বোঝা যায়।

'এটাকে কোত্থেকে পেলি ?' রাজা কানাইয়ের দিকে চোখ রেখে পেয়াদাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'মহারাজ, এ অন্দরমহলের বাগানে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছিল।'

'এ ব্যাটা ফটক দিয়ে ঢুকল কী করে ? দু-দুটো সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে সেখানে !'

'তা জানি না মহারাজ !'

'হুঁ। বলবন্ত আর যশোবন্তকে শূলে চড়াও। ফটকে নতুন প্রহরী মোতায়েন করো। এ রাজ্যে কাজে ফাঁকির শাস্তি মৃত্যু।'

মহারাজের পাশে দু-তিনজন কর্মচারী আদেশ পালন করার জন্য হাঁ হাঁ করে উঠল।

রাজা এবার কানাইয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেন।

'তোর ব্যাপার কী শুনি। তোর নাম কী ?'

'আজ্ঞে, আমার নাম কানাই।'

'কোত্থেকে আসছিস ?'

কানাই ঠিক করেছিল যে রাজার কাছে সে সব কথা সত্যি বলবে না। সে বলল, 'আজ্ঞে পাশের গাঁ থেকে।'

'কাগমারি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাগানে কী খুঁজছিলি ?'

'কই, কিছু খুঁজিনি তো। শুধু দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

রাজা যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, 'ঠিক আছে ; এখন একে হাজতে পোরো। পরে এর বিচার হবে।'

তিন মিনিটের মধ্যে কানাই দেখল যে সে কারাগারে বন্দি। গরাদওয়ালা দরজা খড়াং শব্দে বন্ধ হতেই সে হতাশ হয়ে কারাগারের এককোণে বসে পড়ল। আর আটদিন বাকি আছে। তার মধ্যে চাঁদনির পাতা নিয়ে দেশে ফিরতে না পারলে তার বাপকে সে চিরতরে হারাবে।

এমন হতাশ কানাইয়ের কোনওদিনও লাগেনি। জগাইবাবার কথা মনে পড়ল তার। নীল আর লাল ফল দুটো আর ঝিনুকটা এখনও তার ট্যাঁকে রয়েছে। কিন্তু কই, জগাইবাবা তো তাকে আর ডাকল না। ওগুলো দিয়ে কী কাজ হয় তাও জানা গেল না।

কয়েদখানার একটামাত্র খুপ্‌রি জানলা ; সেটা পশ্চিম দিকে হওয়াতে তার ভিতর দিয়ে বিকেলের রোদ এসে পড়েছে। কমলা রঙের রোদ দেখে কানাই বুঝল যে, সূর্য অস্ত যাবার মুখে।

ক্রমে সেই আলোটুকুও চলে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। ঘরের বাইরে একজন প্রহরী, সে সেখানে টহল ফিরছে। তার পায়ের একটানা খট্ খট্ শব্দে কানাইয়ের চোখে ঘুম এল, আর দশ মিনিটের মধ্যে কানাই ঘুমে ঢলে পড়ল।

এইভাবে জেগে ঘুমিয়ে, কয়েদখানার অখাদ্য খাওয়া খেয়ে, তিনদিন চলে গেল। সময় আর মাত্র পাঁচদিন। সন্ধ্যা হয়-হয়, কানাইয়ের চোখে ঘুমের আমেজ, মন থেকে আশা প্রায় মুছে এসেছে, এমন সময় সে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। বাইরে প্রহরী এখন টহল দিচ্ছে, কে যেন এর মধ্যে বাইরে একটা মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, তার আলোয় ফটকের গরাদের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে কারাগারের মেঝেতে।

কিন্তু কানাইয়ের ঘুমটা ভাঙল কেন ?

কান পাততেই কানাই কারণটা বুঝল।

তার ট্যাঁকের ঝিনুক থেকে একটা শব্দ আসছে।

'কানাই ! কানাই ! কানাই !'

কানাই তাড়াতাড়ি ঝিনুকটা বার করে কানের উপর চেপে ধরল। তারপরেই সে পরিষ্কার শুনতে পেল জগাইবাবার কথা।

'শোন্, কানাই, মন দিয়ে শোন্। আরও কিছু কথা মনে পড়েছে। তোর কাছে যে নীল ফলটা আছে সেটা খেলে তোর মধ্যে অদৃশ্য হবার শক্তি আসবে। কিন্তু অদৃশ্য হতে গেলে আগে একটা কথা বলে নিতে হবে। সেটা হল "ফক্কা"। সেটা বললেই তোকে আর কেউ দেখতে পাবে না। আবার যখন নিজের চেহারায় ফিরে আসতে চাইবি, তখন বলতে হবে "টক্কা"। বুঝলি ?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি', মনে মনে বলল কানাই।

'আচ্ছা, এবার আরেকটা কথা বলি—সেটাও হঠাৎ মনে পড়ল। রূপসার রাজা তার ছেলেকে বন্দি করে রেখেছে প্রাসাদের ছাতের কোণে একটা ঘরে। বাবাকে হটিয়ে ছেলে সিংহাসনে না বসা অবধি রূপসার কোনও গতি নেই ; শুখ্‌নাই অসুখে সারা দেশ ছারখার হয়ে যাবে। রাজাকে এক সদাগর এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে একটা পান্না বিক্রি করে আজ থেকে সাত বছর আগে। এই পান্না রাজার গলার হারে বসানো। এই পান্নায় জাদু আছে ; এটাই যত নষ্টের গোড়া। বুঝছিস ?'

কানাই বুঝেছে ঠিকই, কিন্তু চাঁদনির পাতা কী করে পাওয়া যাবে সেই নিয়ে তো জগাইবাবা কিছুই বললেন না !

ঝিনুকের ভিতর আবার কথা শোনা গেল।

'চাঁদনি উদ্ধার করায় বড় বিপদ। কিন্তু তারও রাস্তা আছে।'

'কী রাস্তা ?'

'সেটা মনে পড়ছে না', বলল জগাইবাবা। 'পড়লে বলব।'

ব্যস্‌, কথা শেষ। কানাই কানে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছে। সে ঝিনুকটাকে আবার ট্যাঁকে গুঁজে নিল।

প্রহরী এখনও টহল দিচ্ছে। লম্বা টহল, তার গোড়ায় আর শেষটায় প্রহরী কানাইয়ের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। বাঁ দিকে একবার প্রহরী অদৃশ্য হতেই ট্যাঁক থেকে নীল ফলটা বার করে কানাই টপ্‌ করে মুখে পুরে দিল। তারপর প্রহরী ডান দিকে অদৃশ্য হতেই কানাই ধাঁ করে বলে দিল 'ফক্কা !'

প্রহরী ফেরার পথে কয়েদখানার দিকে দেখেই চমকে উঠল। তার টহল থেমে গেল।

সে প্রথমে গরাদের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখল—এ-কোণ, ও-কোণ, সে-কোণ।

তারপর মশালটা গরাদের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে আবার দেখল।

তারপর মশাল রেখে চাবি দিয়ে ফটক খুলে অতি সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তার চোখে অবাক ভাবটা তখন দেখবার মতো !

কানাই এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিল। প্রহরীকে বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকতে দিয়ে টুক্‌ করে পাশ কাটিয়ে খোলা ফটক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

পা টিপে টিপে কোনও শব্দ না করে দু'জন প্রহরীর নাকের সামনে দিয়ে কানাই বেরিয়ে এসে পৌঁছল একটা ঘোরানো সিঁড়ির মুখে।

সেই সিঁড়ি দিয়ে সে উঠতে লাগল উপরে। নির্ঘাত এ সিঁড়ি ছাতে গিয়ে পৌঁছেছে।

হ্যাঁ, কানাইয়ের আন্দাজে ভুল নেই। সিঁড়ি উঠে গিয়ে একটা দরজার মুখে পৌঁছেছে, সেই দরজা পেরোতেই কানাই দেখল সে ছাতে এসে পড়েছে।

পেল্লায় ছাত, এককোণে একটা ঘর। তাতে একটা জানলা। সেই জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা টিমটিমে আলো। ঘরের দরজার বাইরে বসে আছে একটা প্রহরী, তার মাথা হেঁট।

অদৃশ্য কানাই এগিয়ে গেল প্রহরীর দিকে। যা আন্দাজ করেছিল তাই ; প্রহরী মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, তার নাক দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে।

ঘরের দরজায় একটা বড় তালা ঝুলছে। বোধহয় তারই চাবি রয়েছে প্রহরীর কোমরে গোঁজা।

কানাই খুব সাবধানে প্রহরীর ঘুম না ভাঙিয়ে চাবিটা বার করে নিল। তারপর সেটা তালায় ঢুকিয়ে একটা প্যাঁচ দিতেই খুট্‌ করে তালা খুলে গেল। কী ভাগ্যি এই শব্দেও প্রহরীর ঘুম ভাঙেনি।

এবার দরজা খুলে অদৃশ্য কানাই ঘরের ভিতর ঢুকল। ঘরে একটা টেমি জ্বলছে, আর একটা খাটিয়ায় চোখে অবাক দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে তারই বয়সি একটি ফুটফুটে ছেলে। ঘরের দরজা খুলল, অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তাতে রাজকুমারের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। এ কি ভেলকি নাকি ?

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কানাই এবার খাটের দিকে ঘুরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'টক্কা !'—আর অমনই তার চেহারা দেখা যাওয়াতে রাজকুমার আরও চমকে উঠে ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে ? কোনও জাদুকর নাকি ?'

ফিস্‌ফিসিয়েই কথা হল, যদিও প্রহরীর নাকডাকানি থেকে মনে হয় বাজ পড়লেও তার ঘুম ভাঙবে না।

কানাই রাজকুমারকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। রাজকুমার বলল, 'গাছের কথা তুমি বলছ বটে, কিন্তু সে গাছ তুমি পাবে কী করে ? সে তো সহজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'কী করে পাব তা জানি না', বলল কানাই, 'কিন্তু গাছের পাতা আমার চাই-ই। শুধু আমার বাবার জন্য নয় ; তোমাদের এখানে তাঁতিরা সব মরতে বসেছে। তাদের জন্য পাতা লাগবে। কম করে হাজার পাতা তো থাকবেই সে গাছে ; তাতে হাজার লোকের প্রাণ বাঁচবে।'

'আমিও তো তাদের বাঁচাতে চাই', বলল রাজকুমার। 'বাবাকে আমি সে-কথা বলেছিলাম। বাবা তাতেই আমাকে বন্দি করে রাখার হুকুম দিলেন। বাবা নিজের ছাড়া আর কারুর ভালও চান না। নিজের ভাল মানে যত বেশি টাকা আসে কোষাগারে ততই ভাল। ধর্মেকর্মে বাবার মতি নেই, প্রজাদের মঙ্গলের চিন্তা নেই, আমি যে তাঁর নিজের ছেলে, তার জন্যও মায়া-মমতা কিচ্ছু নেই।'

কানাই বলল, 'আচ্ছা, তোমার বাবার গলার হারে একটা জাদুপান্না আছে, তাই না?'

'তা তো বটেই। সাত বচ্ছর আগে এক সদাগর বাবাকে সেটা বেচে। সেই থেকে বাবার একটা দিনের জন্যও কোনও অসুখ হয়নি, আর বাবার অত্যাচারও বেড়ে গেছে তিনগুণ। এখানকার তাঁতিরা তাঁকে সিংহাসন থেকে সরাবার ফন্দি করেছিল। হয়তো তারা সে কাজে সফল হত, কিন্তু সেইসময়ই লাগে শুখ্‌নাইয়ের মড়ক।'

কানাই একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা বলো দেখি। রাজামশাইয়ের শোয়ার ঘরটা কোথায়? আমি তো ইচ্ছা করলে অদৃশ্য হতে পারি। আমি যদি তার গলা থেকে হারটা খুলে নিয়ে আসি?'

রাজকুমার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'বাবার শোয়ার ঘর রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে। কিন্তু তার দরজায় প্রহরী ছাড়াও একটা ভয়ানক হিংস্র কুকুর পাহারা দেয়। সে তোমাকে দেখতে না পেলেও তোমার গন্ধ পাবে, আর পেলেই চিৎকার শুরু করবে। না, ওভাবে হবে না। অন্য উপায় দেখতে হবে। যা করতে হবে দিনের বেলা।'

কানাই একটুক্ষণ চুপ করে ভেবে বলল, 'তোমাকে তো এবার পালাতে হবে। আমি যখন এসেই পড়েছি, তখন আর তুমি বন্দি থাকবে কেন? রাজবাড়ি ছাড়া তোমার কোনও ঠাঁই আছে?'

'তা আছে', বলল রাজকুমার। 'তাঁতিদের মধ্যে আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম গোপাল। তার এক বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। আমার নিজের মা-কে হারিয়েছি আমি তিন বছর বয়সে। গোপালের মা-কে আমি নিজের মায়ের মতো ভালবাসি। বাবা গোপালের সঙ্গে মিশতে দেন না আমাকে; কিন্তু আজ যদি তার কাছে যাই, সে আমাকে ফিরিয়ে দেবে না।'

'তার বাড়িতে কি দু'জনের জায়গা হবে?'

'হবে বইকী। তিনজনে এক ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে থাকব। আমার খুব অভ্যাস আছে।'

'তা হলে চলো, চাঁদের আলোয় বেরিয়ে পড়ি।'

'কিন্তু ফটকে প্রহরী আছে যে?'

'প্রহরী আমাদের কিছু করতে পারবে না। তোমাকে পিঠে করে নিয়ে আমি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাব। কেউ আমাদের নাগাল পাবে না।'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি।'

'কিন্তু যে আমার এমন বন্ধুর কাজ করল, তার নামটা তো এখনও জানলাম না!'

'আমার নাম কানাই।'

'আর আমার নাম কিশোর।'

'তবে চলো যাই এবার। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে যাব।'

'বেশ। নীচে সিঁড়ির মুখে দরজা পেরোলেই বাগান।'

'সেইখান থেকেই দেব ছুট!'

॥ ৪ ॥

গোপালদের বাড়ি তাঁতিপাড়ার এক প্রান্তে। সেখানে শুখ্‌নাই রোগ এখনও পৌঁছয়নি, কিন্তু কবে এসে পৌঁছবে তার ঠিক কি? গোপালের মা সেই কথা ভেবে কানাই আর কিশোরকে বলেছিলেন, 'আমার এখানে থাকার বিপদটা কী তা জানো। সেটা ভেবেও কি তোমরা তিনজনে একসঙ্গে

থাকতে চাও ?'

তিনজনেই মাথা নেড়ে বলেছিল—হ্যাঁ, তারা তাই চায়। সেই সঙ্গে কানাই বলেছিল, 'আপনি ভাববেন না। শুখ্নাই রোগের ওষুধ আছে রাজবাড়িতে। সে ওষুধ আমি জোগাড় করবই যে করে হোক। তা হলে আর কারুর ব্যারাম থাকবে না।'

কিন্তু মুখে বলা এক, আর কাজে আরেক।

তিনদিন কেটে গেল, তবু কাজ এগোলো না একটুও। আর মাত্র দু'দিন আছে কানাইয়ের বাপ, তারপরেই তার আয়ু শেষ। এদিকে ঝিনুকেও আর কোনও কথা শোনা যায়নি। জগাইবাবা এমন চুপ কেন ?

এর মধ্যে অবিশ্যি আরও অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। কানাই আর রাজকুমার দু'জনেই কয়েদি অবস্থা থেকে পালিয়েছে দেখে রাজবাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গেছে! এ জিনিস কেমন করে হয় ? যে প্রহরী দু'জন পাহারায় ছিল তাদের দু'জনকেই শূলে চড়ানো হয়েছে। কানাই আর কিশোরকে ধরার জন্য শয়ে শয়ে সেপাই সারা রাজ্যে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। গোপাল তাঁতির সঙ্গে যে রাজকুমারের ভাব ছিল সেটা রাজা জানতেন, তাই গোপালের বাড়িতেও পেয়াদা পাঠিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় কানাই বুদ্ধি করে 'ফক্কা' বলে অদৃশ্য হয়ে পেয়াদার হাত থেকে বল্লম টেনে নিয়ে তাকে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিয়েছে ; পেয়াদা এই ভেল্‌কিতে ভড়কে গিয়ে দিয়েছে চম্পট।

তারপর থেকে গোপালের বাড়িতে আর কেউ আসেনি।

আজ কানাই আর সবুর সইতে না পেরে কিশোরকে বলল, 'হ্যাঁ ভাই, সেই জাদুপান্না না সরাতে পারলে তো আর চলছে না। একবার একটু ভেবে বলো দেখি তোমার বাবা একা কখন থাকেন, তার কাছাকাছি যাবার সুযোগটা কখন পাওয়া যায় ?'

কিশোর বলল, 'জাদুপান্না নিলেই যে সব গোল মিটে যাবে তেমন ভেবো না। বরং উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হতে পারে, বাবার রাগ সপ্তমে চড়ে যেতে পারে।'

কানাই বলল, 'তাও চেষ্টা করতে ক্ষতি কী ? তুমি একবার একটু ভেবে বলো।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে ভেবে রাজকুমার বলল, 'একটা কথা মনে পড়েছে।'

'কী কথা ?'

'বাবা রোজ ভোরে সূর্যোদয়ের সময় রাজবাড়ির অন্দরমহলের দিঘিতে স্নান করতে যান। সেই সময় প্রহরী থাকে দূরে। বাবার কাছাকাছি কেউ থাকে না।'

'তবে আর কী!' বলল কানাই, 'এই তো সুযোগ। কাল ভোরে আমি রাজবাড়ি যাব অদৃশ্য হয়ে। দেখি তোমার বাবার সঙ্গে দিঘিতে গিয়ে কিছু করা যায় কিনা।'

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই কানাই 'ফক্কা' বলে অদৃশ্য হয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে রাজবাড়ি পৌঁছে দিঘির শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঘাটের কাছেই একটা বকুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল। পুব আকাশে পদ্মের রঙ ধরেছে কিন্তু সূর্য তখনও ওঠেনি।

কিছু পরে সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই কানাই খট্ খট্ শব্দ শুনে বুঝল রাজা খড়ম পায়ে ঘাটে আসছেন।

ওই যে রাজা! রাজার গা খালি। পরনে কেবল ধুতি আর কাঁধের উপর একটা রেশমের উত্তরীয়। উত্তরীয়টা ঘাটের পাশের বেদিতে রেখে রাজা খড়ম খুলে সিঁড়ির দিকে এগোলেন। গলার হারের পান্নাতে সূর্যের আলো পড়ে যেন তার থেকে আগুন বেরোচ্ছে।

এবার রাজা জলে নামলেন। কানাইও এগিয়ে গেল ঘাটের সিঁড়ির দিকে, তারপর ধীরে ধীরে সেও জলে নেমে রাজার সাত হাত দূরে গলা জলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাজা যেই ডুব দিলেন, অমনই কানাইও ডুব দিয়ে সাঁতরে এগিয়ে এসে পলকের মধ্যে রাজার গলা থেকে হার খুলে নিয়ে আবার ডুব সাঁতার দিয়ে দিঘির উলটো পারে গিয়ে জল থেকে উঠল।

ততক্ষণে রাজা দিশেহারা হয়ে জলে তাঁর হার খুঁজছেন আর 'প্রহরী, প্রহরী' বলে ডাকছেন।

প্রহরী ছুটে এল। 'কী হল মহারাজ ?'

'এই সেই শয়তান রাঘব বোয়ালের কাজ। আমার গলা থেকে হার খুলে নিয়ে গেল। খবর দিয়ে

দে। দরকার হলে দিঘির জল সেঁচতে হবে। হার আমার ফেরত চাই।'

ইতিমধ্যে অদৃশ্য কানাই হাতের মুঠোয় হার নিয়ে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এক ছুটে মুহূর্তের মধ্যে চলে এল একেবারে গোপালের বাড়ি। তারপর 'টক্কা' বলে আবার নিজের চেহারায় ফিরে এসে রাজকুমারকে দেখিয়ে দিল যে তার কাজ সে করে এসেছে।

কিন্তু এর ফলে রাজার মধ্যে কোনও পরিবর্তন এল কিনা সেটা কী করে বোঝা যাবে ?

কানাইয়ের সে বুদ্ধিও মাথায় এসে গেছে। সে বলল, 'আমি কাল অদৃশ্য হয়ে রাজসভায় যাব। রাজার হাবভাব কীরকম সেটা দেখে আসব।'

তাই ঠিক হল, আর কানাই পরদিন রাজসভায় গিয়ে হাজির হল।

সভাসদরা এসে গেছেন, কিন্তু রাজা তখনও আসেননি।

কানাই পিছনের দিকে এক কোনায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল।

সময় চলে যায়, কিন্তু রাজার দেখা নেই।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষার পর রাজামশাই এসে ঢুকলেন রাজসভায়।

কিন্তু কই, রাজার চেহারায় ভালর দিকে পরিবর্তনের তো কোনও লক্ষণ নেই। চোখে তো সেই একই শয়তানের দৃষ্টি, কেবল ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির বদলে আজ প্রচণ্ড রাগ।

রাজা সিংহাসনে বসে চারিদিকে একবার লাল চোখে দেখে নিয়ে বললেন, 'আমার রাজ্যে মহা শয়তান এক জাদুকরের আবির্ভাব হয়েছে। সে নিজে কয়েদখানা থেকে প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে, আমার ছেলেকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়েছে, আমার গলা থেকে আমার সাধের পান্নার হার খুলে নিয়েছে। গতকাল ভোরে দিঘিতে ডুব দেবার সময় এই ঘটনা ঘটে। আমি ভেবেছিলাম এ বোয়াল মাছের কাণ্ড, কিন্তু দিঘির জল সেঁচে সেই বোয়াল মাছকে ধরেও সে হার পাওয়া যায়নি। আজ থেকে শাসন হবে আরও দশগুণ কড়া। যতদিন সেই জাদুকর আর রাজকুমারকে খুঁজে না পাওয়া যায়, ততদিন হাটবাজার সব বন্ধ। লোকে না খেয়ে মরে মরুক !'

এই ভীষণ কয়েকটা কথা বলে রাজা সিংহাসন ছেড়ে চলে গেলেন। কানাই একেবারে মুষড়ে পড়ল। জাদুপান্না খুলে নিয়ে ফল আরও খারাপ হল। এখন কী উপায় ?

কানাই গোপালের বাড়ি ফিরে এল।

তার কাছে সব শুনে-টুনে কিশোর আর গোপালের মুখও শুকিয়ে গেল। একে দেশে মড়ক, তার উপর রাজার এই মূর্তি ! সারা দেশ তো ছারখার হয়ে যাবে।

কানাই তখন মনে মনে ভাবছে—আর একদিন মাত্র সময়। এই একদিনের মধ্যে চাঁদনির পাতা জোগাড় না হলে সে বাবাকে হারাবে।

দূর থেকে ঢ্যাঁড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর সেইসঙ্গে ঘোষণা। আজ থেকে বাজারে কেনাবেচা বন্ধ। সেইসঙ্গে এও ঘোষণা হচ্ছে যে, রাজকুমার আর জাদুকরকে যে ধরে দিতে পারবে তাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। ঢ্যাঁড়ার দুম্ দুম্ শব্দ ক্রমে এদিকে এগিয়ে আসছে। তাঁতিপাড়াতেও ঘোষণা হবে।

এই ডামাডোলের মধ্যে কানাই হঠাৎ চমকে উঠল।

তার নাম ধরে কে ডাকে ক্ষীণ স্বরে ?

সে তৎক্ষণাৎ ট্যাঁক থেকে ঝিনুক বার করে কানে দিল। পরিষ্কার শোনা গেল জগাইবাবার কথা।

'শোন্ কানাই, মন দিয়ে কাজের কথা শোন্। কাল সকালে এক প্রহরে তুই যাবি রাজবাড়ির অন্দরমহলের বাগানের ঈশান কোণে। সেই কোণে জলে ঘেরা একটা ছোট্ট দ্বীপে চাঁদনি গাছ পোঁতা আছে। সেই গাছ তোকে উদ্ধার করতে হবে।'

'কী করে জগাইবাবা ?'

'সেটা হবে তোর নিজের বুদ্ধি আর সাহসের জোরে। কাজটা সহজ নয়। বুঝলি ?'

'বুঝলাম, কিন্তু—'

'কিন্তু কী ?'

'হল্‌দে ফলের গুণ কী সেটা তো বললেন না।'

'এখন মনে পড়েনি। পড়লে বলব। আগে তোর বাপকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর। তার প্রায় শেষ অবস্থা। তবে পাতার রস খেলেই সে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আসি।'

ঝিনুকের মধ্যে আবার সমুদ্রের গর্জন।

কানাই সব ঘটনা বলল কিশোর আর গোপালকে। 'কাল এক প্রহর', সব শেষে বলল কানাই। 'কালই এসপার, নয় ওসপার।'

॥ ৫ ॥

জগাইবাবার নির্দেশমতো কানাই সকাল থেকেই অদৃশ্য হয়ে বাগানে হাজির হল। তারপর বাগানের ঈশান কোণে গিয়ে যা দেখল তাতে তার চক্ষুস্থির। একটা ছোট্ট দ্বীপে চাঁদনি গাছটা পোঁতা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই এক-মানুষ উঁচু গাছটার গোড়ায় পেঁচিয়ে আছে একটা শঙ্খচূড় সাপ, যার এক ছোবলেই একটা মানুষ পায় অক্কা। আর দ্বীপটাকে ঘিরে আছে একটা পাঁচ হাত চওড়া পরিখা, তাতে কিলবিল করছে পাঁচ-সাতটা কুমির। কানাই যখন পৌঁছল তখন সেই কুমিরগুলোর দিকে কোলা ব্যাঙ ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে একটা লোক আর সেগুলো কপ্‌ কপ্‌ করে গিলে খাচ্ছে কুমিরগুলো। একটা ব্যাঙ সাপটার দিকেও ছুড়ে দেওয়া হল, আর সেটা তক্ষুনি সে মুখে পুরে গিলতে আরম্ভ করল।

খাওয়া শেষ হলে কানাই দুগ্গা বলে কাজে লেগে গেল। আজই শেষ দিন, আজ তাকে যে করে হোক চাঁদনির পাতা জোগাড় করতেই হবে।

বাগানের একপাশে পাঁচিলের ধারে কিছু বাঁশ পড়ে আছে। অদৃশ্য কানাই তার থেকে দুটো বাঁশ নিয়ে সেগুলোকে পরিখার পাঁচিলে এমনভাবে শুইয়ে রাখল যে, বাঁশের অন্য দিক দ্বীপের উপর গিয়ে পড়ে। ফলে বেশ একটা সেতু তৈরি হয়ে গেল কুমির বাঁচিয়ে দ্বীপে যাবার জন্য।

কিন্তু সাপের কী হবে?

তার জন্য চাই অস্ত্র।

কানাই বাগানের ফটকে গিয়ে দেখল সেখানে হাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে একটা সেপাই দাঁড়িয়ে আছে। অদৃশ্য কানাই তার হাত থেকে একটানে তলোয়ারটা বার করে নিল। তারপর সেপাইকে হতভম্ব করে দিয়ে শূন্য দিয়ে সে তলোয়ার নিয়ে বাঁশের সেতুর উপর দিয়ে দ্বীপে পৌঁছে এক কোপে শঙ্খচূড়ের মাথা শরীর থেকে আলগা করে দিল। তারপর তলোয়ারটাকে পরিখার জলে ফেলে অদৃশ্য কানাই এক হ্যাঁচকায় শেকড়সুদ্ধ চাঁদনি গাছটাকে তুলে সেতু পেরিয়ে এসে ঝড়ের বেগে চলে এল গোপালের বাড়ি। তারপর 'টক্কা' বলে সে নিজের চেহারায় ফিরে এল।

গোপাল কানাইয়ের হাতে গাছ দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'চলো যাই ঘরে ঘরে পাতা বিলিয়ে আসি!'

'তাই যাও', বলল কানাই। 'তবে একটা পাতা আমি নিচ্ছি। আমি আবার ফিরে আসব বিকেল পড়তে না পড়তেই। আজই শেষ দিন; আজ আমার বাবাকে বাঁচাবার শেষ সুযোগ।'

তীরের বেগে দেখতে দেখতে নন্দীগ্রামে তার বাড়িতে পৌঁছে গেল কানাই। বাবা বিছানায় পড়ে আছে, তার শরীরের প্রত্যেকটি হাড় গোনা যায়।

'কানাই এলি?' ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করল বলরাম কৃষক।

কানাই তখন পাতার রস বার করতে শুরু করছে। বেগুনি পাতার বেগুনি রস।

'এই নাও বাবা, খেয়ে নাও।'

কোনওমতে ঘাড় উঁচু করে রস খেয়ে 'আঃ' বলে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে আবার বালিশে মাথা দিল বলরাম। আর তার পরমুহূর্তেই তার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। 'অনেক আরাম বোধ করছি রে কানাই! তুই আমাকে বাঁচালি এ-যাত্রা।'

কানাই বাবাকে বলল তার একবার রূপসা যেতে হবে, সেখানকার খবর নেওয়া দরকার। কাজ সেরেই সে আবার ফিরে আসবে।

'তা যা', বলল বলরাম, 'তবে যাবার আগে কিছু ফল আর এক বাটি দুধ রেখে যাস খাটের পাশে।

মনে হচ্ছে খিদে পাবে।'

কানাই বাবার ফরমাশ পালন করে রূপসা গিয়ে হাজির হল।

শহরের চেহারাই বদলে গেছে। তাঁতিপাড়ায় ঘরে ঘরে হাসিমুখ দেখতে দেখতে কানাই পৌঁছল গোপালের বাড়ি। কিশোরও রয়েছে সেখানে, কিন্তু তার মুখ গম্ভীর।

'কী ভাবছ কিশোর ?' জিজ্ঞেস করল কানাই।

'ভাবছি বাবার কথা', বলল কিশোর। 'বাবারও ব্যারাম হয়েছে।'

'অ্যাঁ, সে কী ? কী করে জানলে ?'

'ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে গেল। বলল রাজার অসুখ ; রাজা আমাকে দেখতে চায়। আমি যেখানেই থাকি যেন গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি।'

'ব্যারাম মানে কী ব্যারাম ?' জিজ্ঞেস করল কানাই।

'শুখ্‌নাই। তাঁতির যা অসুখ ; তোমার বাপের যা অসুখ, বাবারও সেই অসুখ। আর তার একমাত্র ওষুধ এখন আমাদের কাছে।'

'তা বেশ তো', বলল কানাই, 'সে ওষুধ তাকে দাও, কিন্তু একটা শর্তে।'

'কী শর্ত ?'

'তিনি যেন রোগ সারলেই রাজকার্য ছেড়ে তীর্থে যান। আর তাঁর জায়গায় তুমি বসো সিংহাসনে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম', বলল কিশোর।

'একটা কথা বলব ?' হঠাৎ বলে উঠল গোপাল তাঁতি।

'কী কথা ভাই ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তুমি রাজা হলে আমায় একটা নতুন তাঁত দেবে ? যেটা আছে সেটা আমার ঠাকুরদাদার। তাতে ভাল বোনা যায় না।'

'নিশ্চয়ই দেব', বলল কিশোর। 'তুমি হবে তাঁতির সেরা তাঁতি। তোমার বোনা কাপড় পরে আমি সিংহাসনে বসব।' তারপর কানাইয়ের দিকে ফিরে বলল, 'চলো যাই বাবার কাছে।'

কানাইয়ের পিঠে চড়ে এক মুহূর্তে প্রাসাদের অন্দরমহলে পৌঁছে গেল কিশোর। রাজবাড়িতে শোকের ছায়া পড়েছে। রাজার অসুখের একমাত্র ওষুধ চাঁদনি পাতা ভেলকির বশে রাজার উদ্যান থেকে উধাও হয়ে গেছে। আর বিশ দিন মাত্র আয়ু তাঁর।

রাজার শোয়ার ঘরের বাইরে প্রহরী কিশোর আর কানাইকে দেখে চমকে উঠল, কিন্তু তাদের কোনও বাধা দিল না। কিশোর আর কানাই সোজা গিয়ে ঢুকল রাজার ঘরে।

রাজা শয্যা নিয়েছেন, পাশে রাজ কবিরাজ মাথায় হাত দিয়ে বসে রাজার প্রশ্নের উত্তরে বলছেন আর কোনও জায়গায় চাঁদনি গাছ নেই, আর এ-রোগের আর কোনও চিকিৎসাও নেই।

ঠিক সেই সময় গিয়ে উপস্থিত হল কিশোর আর কানাই।

'তুই এলি !' ছেলেকে দেখে কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন রাজা। 'তবে তোর সঙ্গে এ কেন ? এ যে পিশাচসিদ্ধ জাদুকর !'

'না বাবা', বলল কিশোর। 'এ হল রূপসার ভবিষ্যৎ মন্ত্রী।'

'অ্যাঁ !'

'হ্যাঁ বাবা। আমি সঙ্গে করে তোমার ওষুধ এনেছি। এই ওষুধ তোমাকে দেব, যদি কথা দাও যে অসুখ সারলেই তীর্থে চলে যাবে চিরকালের মতো !'

'তা কেন দেব না কথা', বললেন রাজা, 'যত নষ্টের গোড়া ছিল ওই জাদুপান্না, যদিও রোগের হাত থেকে ওটাই আমাকে এতদিন রক্ষা করেছে। সেই পান্না যাবার পর থেকেই আমার দেহে আর মনে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। আমি বুঝেছি কত ভুল করেছি। আমি যাব তীর্থে, আর তুই বসবি আমার জায়গায় সিংহাসনে। রূপসার গৌরব ফিরিয়ে আনবি। লোকে ধন্য ধন্য করবে।'

রাজকুমার এবার তার হাতের মুঠো খুলে ধরল বাপের সামনে। সেই মুঠোয় চাঁদনির বেগুনি পাতা, তার সৌরভে রাজার শয়নকক্ষ ভরপুর হয়ে গেল।

রাজা সেরে উঠলেন একদিনেই।

তিনদিন পরে যুবরাজের অভিষেক হল। রাজা নিজে তার হাত ধরে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন ছেলেকে, তার পরনে গোপালের তৈরি পোশাক। তারপর কিশোর কানাইকে বসিয়ে দিল মন্ত্রীর আসনে। ইতিমধ্যে কানাই নন্দীগ্রামে গিয়ে তার বাবাকে নিয়ে এসেছে, কিশোর বলরামকে থাকবার ঘর দিয়েছে, তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

চারদিকে শাঁখ বাজছে, রোশনচৌকিতে সানাই বাজছে, তারই মধ্যে মন্ত্রীর আসনে বসে কানাই শুনতে পেল জগাইবাবার ডাক।

'কানাই ! কানাই ! কানাই !'

কানাই রাজসভার মধ্যেই ট্যাঁক থেকে ঝিনুক বার করে কানে দিল। খ্যান খ্যান করে শোনা গেল জগাইবাবার কথা।

'তোর তো আস্পর্ধা কম না—তোর বিদ্যেবুদ্ধি নেই, তুই রূপসার মন্ত্রীর আসনে বসেছিস ?'

'কী করব জগাইবাবা', মনে মনে বলল কানাই, 'আমি কি আর নিজে থেকে বসেছি ?—এরা আমায় বসিয়েছে।'

'তবে শোন বলি', এল জগাইবাবার কথা। 'অ্যাদ্দিনে মনে পড়েছে। সেই হলদে ফলটা আছে তো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে !'

'এইবার সেইটে খেয়ে নে। সেটা খেলে তোর বিদ্যেবুদ্ধি হাজার গুণ বেড়ে যাবে। মন্ত্রীগিরি কীভাবে করতে হয়, রাজাকে মন্ত্রণা কীভাবে দিতে হয়, দেশের মঙ্গল কীসে হয়, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন কাকে বলে—সব জানতে পারবি। তখন আর তোকে বেমানান লাগবে না, কেউ বলবে না তুই বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গেছিস। বুঝেছিস ?'

'বুঝেছি জগাইবাবা, বুঝেছি।'

'তা হলে আসি।'

ঝিনুকে আবার সমুদ্রের গর্জন।

কানাই ঝিনুকটা আবার ট্যাঁকে গুঁজে তার পাশ থেকে হলদে ফলটা বার করে মুখে পুরল।

সন্দেশ, ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৯২

রতন আর লক্ষ্মী

ঠিক কখন থেকে রতনের মনটা খুশিতে ভরে আছে সেটা রতন জানে। দশদিন আগে ছিল চৈত্র সংক্রান্তি। রতন থাকে শিমুলিতে। সেখান থেকে চার ক্রোশ দূরে উজলপুরে সংক্রান্তির খুব বড় মেলা হয়। রতন গিয়েছিল সেই মেলা দেখতে। শুধু দেখতে নয়, মেলা থেকে বাঁশের বাঁশি কেনার শখও ছিল তার, সেটাও একটা উদ্দেশ্য বটে। রতনের গানের কান খুব ভাল; যে কোনও গান দু'বার শুনলে নিজের গলায় তুলে নিতে পারে। সে বাঁশিও বাজায়, কিন্তু ভাল বাঁশি তার নেই। জমজমাট মেলার এক জায়গায় নানারকম বাজনা বিক্রি হচ্ছিল, তার মধ্যে বাঁশিও ছিল অনেক, রতন তারই কয়েকটা হাতে তুলে ফুঁ দিয়ে দেখছিল, এমন সময় চারদিকে একটা শোরগোল পড়ে গেল। উজলপুরের রাজকন্যা লক্ষ্মী এসেছেন ডুলিতে করে মেলা দেখতে। এমনিতে রাজকন্যারা রাজবাড়ির অন্তঃপুরেই বন্দি থাকে, তাকে বাইরের লোকে দেখতে পায় না। কিন্তু লক্ষ্মী তেমন মেয়ে নয়। সে অনেক আগে থেকেই বাপ-মাকে শাসিয়ে রেখেছে—'সংক্রান্তির মেলা আসছে, আমি কিন্তু তাতে যাব। ওসব পর্দাটর্দা মানতে পারব না। লোকে আমাকে দেখলে ক্ষতি কী? তারাও মানুষ, আমিও মানুষ; আর তারা তো আমায় খেয়ে ফেলবে না। আমি ডুলিতে করে যাব। আমার কেষ্টনগরের মাটির পুতুলের খুব শখ; সেই পুতুল আমি নিজে দেখে কিনতে চাই। তোমরা না করতে পারবে না।' লক্ষ্মী বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, তাই তার আবদার না রেখে উপায় নেই।

হবি তো হ, বাজনার দোকান মাটির পুতুলের দোকানের ঠিক পাশেই। রতন সবে একটা বাঁশিতে একটা মন-মাতানো সুর তুলেছে এমন সময় শোরগোল শুনে পাশ ফিরে দেখে রাজকন্যা। শুধু দেখা

নয়, একেবারে চোখে চোখে দেখা। রাজকন্যার বয়স ষোলো, রতনের উনিশ। রতনের চেহারাটাও ভাল। সে ব্রাহ্মণ পুরুতের একমাত্র ছেলে। পাঁচ ঘর যজমান্ নিয়ে পুরুত হরিনারায়ণের মোটামুটি চলে যায়, কিন্তু তার স্ত্রী অন্নপূর্ণা ছেলে রতনকে এই অবস্থার মধ্যেই মানুষ করেছে খুব যত্ন করে। তাই রতনের চেহারায় কোনও দারিদ্র্যের ছাপ পড়েনি।

রাজকন্যা লক্ষ্মীর চোখে চোখ পড়তেই রতনের মন খুশিতে ভরে উঠল। এমন সুন্দর মেয়ে সে দেখেনি কখনও। আহা, একে যদি গান শোনাতে পারত সে, তা হলে কেমন ভাল হত!

অবিশ্যি চোখ পড়তেই রাজকন্যা আবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তাতে কী হয়? তাকে দেখে রাজকন্যার খারাপ লাগেনি এটা রতন বুঝেছে। আর কী চাই? সে একটার জায়গায় তিনটে বাঁশি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরল। সে পুরুতগিরি করবে না, গান-বাজনা নিয়েই থাকবে, এটা সে বাপকে বলে দিয়েছে। তার বিয়ের কথাও বাপ দু-একবার তুলেছেন, তাতে রতন কিছু বলেনি। এবার যদি তোলেন তা হলে রতন বলবে উজলপুরের রাজকন্যার মতো সুন্দরী মেয়ে হলেই সে বিয়ে করবে, নইলে নয়।

আজ ছিল রবিবার। সময়টা দুপুর; রতন সকালে দু'ঘণ্টা বাঁশি বাজানো অভ্যাস করে একবার গিয়েছিল গোপীনাথ মুদির দোকানে। বাড়ি ফিরে এসে দেখে এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ন্যাসীর চোখ দুটো লাল, গলায় চারখানা বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে চিমটে আর কমণ্ডলু। রতনকে দেখেই বাবাজি হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, 'সেই চাঁদপুর থেকে আসছি, এখনও যেতে হবে তিন ক্রোশ পথ; তোরা তো ব্রাহ্মণ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

'আমাকে এক ঘটি খাবার জল এনে দে তো দেখি।'

'নিশ্চয়ই; আপনি বসুন।'

রতন তাড়াতাড়ি বাবাজির জন্য দাওয়ায় আসন পেতে দিল। তারপর বাড়ির ভিতরে গেল জল আনতে। মা শুনে বললেন, "শুধু জল কেন? অতিথি এসেছেন, পিঠে আছে, দু' খানা দিয়ে দে জলের সঙ্গে।'

আসলে বাবাজির চেহারাটা—বিশেষ করে জবাফুলের মতো চোখ দুটো—রতনের খুব ভাল লাগেনি। তাই মা-র কথা শুনে সে বলল, 'আবার পিঠে কেন? চেয়েছেন তো শুধু জল।'

অন্নপূর্ণা ধমকের সুরে বললেন, 'অতিথিসেবায় যত পুণ্যি তত আর কিছুতে হয় না, জানিস? যা বলছি তাই কর।'

রতন অনিচ্ছাসত্ত্বেও জলের সঙ্গে রেকাবিতে করে পিঠে নিয়ে গিয়ে বাবাজিকে দিল। বাবাজি দুই গ্রাসে দুটো পিঠে খেয়ে ঢকঢক করে পুরো ঘটি জলটা খেয়ে ফেলে বললেন, 'আঃ, বড় তৃপ্তি হল!'

কথাটা বলে আরও আরাম করে বসে পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তোর নাম তো রতন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

রতন বুঝল, বাবাজি যেমন-তেমন লোক নন; ইনি গুনতে জানেন। কিন্তু তাও তাঁকে রতনের ভাল লাগল না। এমনভাবে পা ছড়িয়ে দিলেন কেন? দুপুরটা এখানেই কাটাবেন নাকি?

'তা বাবা রতন', বললেন বাবাজি, 'একটু পা দুটো ডলে দে তো দেখি। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে।'

রতন এটা আশা করেনি। তার কাছে অনুরোধটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হল।

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বাবা আবার বললেন, 'কই, একটু পদসেবা কর! তোর পুণ্যি হবে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?'

রতনের মনটা হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। ইনি যত বড়ই সাধু হন, রতন পরোয়া করে না। এই লোকটার পা টিপে দেবে না। রাজ্যির ধুলোকাদা লেগে আছে পায়ে, এতখানি পথ হেঁটে।

সে মাথা নেড়ে বলল, 'না ঠাকুর, আমায় মাফ করবেন। আমি আমার বাবার পা টিপতে পারি, আর কারুর নয়।'

বাবাজি ছড়ানো পা দুটো টেনে নিলেন। রতন দেখল তাঁর চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটার মতো

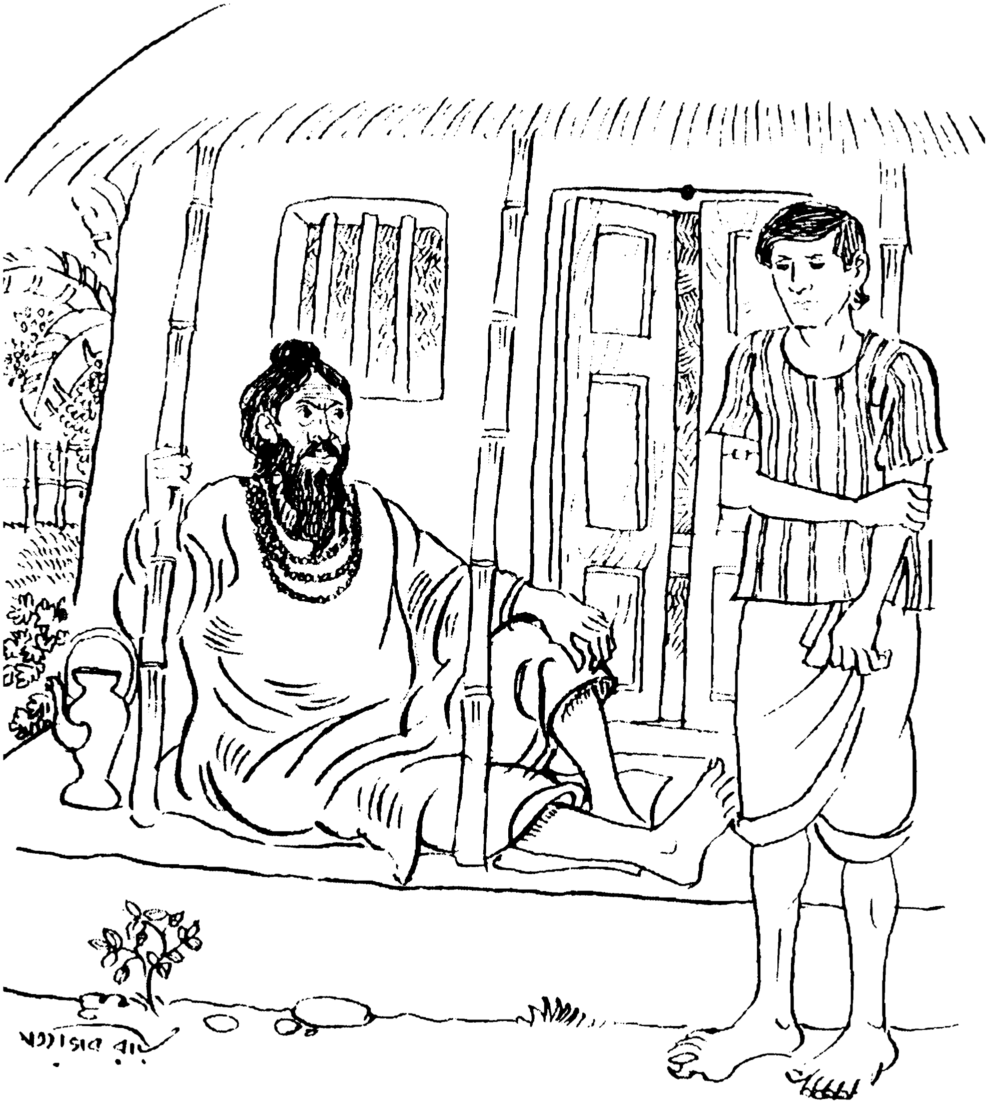

জ্বলে উঠল।

'কী বললি? আবার বল তো!'

রতন আবার বলল। এবার আরও স্পষ্ট করে। তার ভয় কেটে গেছে। যতবড় সাধুই হোক—কী আর করতে পারে? এ তো দুর্বাসা মুনি নয় যে অভিশাপ দেবে!

'আমি কে জানিস?' এবার বাবাজি জিজ্ঞেস করলেন।

রতন চুপ।

'আমি তোর কী করতে পারি জানিস?' বাবাজি আবার জিজ্ঞেস করলেন। 'তোর ভবিষ্যৎ আমার হাতের মুঠোয়। আমি বিপুলানন্দ তান্ত্রিক। আমি ত্রিকালজ্ঞ। আমার তেজে চরাচর ভস্ম হয়ে যায়। আমাকে অপমান করার সাহস হল তোর?'

রতন এখনও চুপ। সে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে বাবাজির দিকে। বুকে সামান্য দুরু দুরু ভাব। কী করবে তাকে বাবাজি? কী করতে পারে একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে?

কিন্তু বাবাজি যে মানুষের বাড়া সে কথা রতন জানবে কী করে?

'আজ অমাবস্যা', বলে চললেন বাবাজি। 'আজ সায়াহ্নে তুই আর মানুষ থাকবি না। তুই হয়ে যাবি রাক্ষস। আয়তনে তিনগুণ বেড়ে যাবি তুই। সভ্য সমাজে থাকা আর চলবে না তোর। তোর খাদ্য হবে বন্য পশু। আমার পদসেবা করলে তোর মঙ্গলই হত। তাতে যখন তোর এত আপত্তি তখন তোর একটু শিক্ষা হওয়াই দরকার। আমি আসি।'

বাবাজি চিমটে কমণ্ডলু নিয়ে উঠে পড়লেন। রতন পাথর। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। হ্যাঁ, একটা পন্থা আছে। নরহরি খুড়োর কাছে যাওয়া। সায়াহ্ন মানে কখন? সূর্যি ডোবার আগে তো নয়। তার মানে সময় আছে অন্তত তিন ঘণ্টা।

বাবাজি 'ব্যোম ভোলানাথ' বলে চলে গেলেন।

রতন তাঁকে বেশ কিছুদূর যেতে দিয়ে একছুটে গিয়ে পৌঁছল নরহরি জ্যোতিষীর বাড়ি।

'কী রে রত্না—এই অসময়ে? কী ব্যাপার?'

'খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি নরহরি খুড়ো!'

'কী বিপদ?'

'সেটা আর খুলে বলা যাবে না। আপনি একটু গুনে যদি বলেন আমার সামনের ক'টা দিন কেমন যাবে!'

রতনের গানের গলা আর মিষ্টি স্বভাবের জন্য গাঁয়ের সকলেই তাকে স্নেহ করে। নরহরি জ্যোতিষী এমনিতে একটু খিটখিটে মানুষ, কিন্তু রতনের দিশাহারা ভাব দেখে তার অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না।

'দাঁড়া দেখি। তোর করকোষ্ঠী আমিই করেছিলাম, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কর্কট রাশি, কৃষ্ণ পক্ষ...হুঁ...'

নরহরি জ্যোতিষী কাগজে কিছুক্ষণ হিজিবিজি কাটলেন, তারপর হঠাৎ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে রতনের দিকে চেয়ে বললেন, 'এ যে মহাসংকট! তোর উপর তো শনির দৃষ্টি পড়েছে দেখছি। সামনের ক'টা দিন তো ঘোর দুর্বিপাকের সময় রে রতন!'

'কিন্তু তার পরে?' ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল রতন।

নরহরি জ্যোতিষী আবার নকশার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করে রইলেন। তারপর তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। তিনি তিনবার পর পর 'বাঃ!' বলে বললেন, 'সব মেঘ কেটে যাবে। শনি সরে গিয়ে বৃহস্পতি উঠবে তুঙ্গে। তোর কষ্ট থাকবে না, অভাব থাকবে না, কিচ্ছু থাকবে না।'

'কিন্তু সেটা ক'দিন পরে নরহরি খুড়ো?'

'বেশি দিন নয়, বেশিদিন নয়। এক পক্ষকাল। আজ অমাবস্যা। পূর্ণিমায় দেখবি মেঘ কেটে গেছে। বুঝেছিস?'

রতন বুঝল।

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে, তাই রতন আর থাকতে পারল না। নরহরি খুড়োর কাছে ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার করে জেনে নিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু তার আর উপায় নেই। মোটামুটি যা জানবার তা রতন জেনে নিয়েছে। কিছুদিনের জন্য তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। অভিশাপের কথা মা-বাবাকে বলবে না। তারপর আবার কপাল ফিরলে সে বাড়ি ফিরবে।

বাড়ি ফিরে এসে রতন দেখল তার বাপও ফিরেছে। বাপ-মা দু'জনকেই একসঙ্গে পেয়ে রতন বলল, তাকে দু হপ্তার জন্য নারানপুর যেতে হচ্ছে। সেখানে এক নামকরা গাইয়ে এসেছেন, তাঁর কাছে থেকে যদি কিছু শেখা যায় তার চেষ্টা দেখবে রতন।

ছেলের যে গানের নেশা এটা তার বাপ-মা দুজনেই জানে। কাজেই তাকে এ ব্যাপারে নিরস্ত করার চেষ্টা বৃথা। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'জনকে মত দিতে হল। রতন লাঠির আগায় একটা পোঁটলা বেঁধে

নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গাঁয়ের পশ্চিমপ্রান্তে ঝলসির বন, সেটা পেরোলেই দিগ্‌নগর। ঝলসির বনে রতন গেছে একবারই, কারণ সেখানে অনেক জানোয়ারের বাস। প্রায় তিনশো বছর আগে ঝলসি ছিল এক সমৃদ্ধ শহর; তখন তার নাম ছিল আজিনগড়। এই আজিনগড়ের ভাঙা কেল্লা দেখতেই রতন গিয়েছিল তার দুই বন্ধু সুবল আর মুকুন্দর সঙ্গে। বিশাল কেল্লা, কিন্তু তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। সাপ-বিচ্ছুর বাস বলে আর ভিতরে কেউ যায় না, আর রতন সেখানেই থাকবে বলে মনস্থির করেছে। একটা ডেরা তার চাই; লোকের কাছ থেকে গা ঢাকা দিতে হবে তো!

রতন বনের ধারে গিয়ে একটা ছোট নদী থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে খেল। অনেকখানি পথ, বেশ জলপিপাসা পেয়েছিল। এখনও সূর্য ডুবতে এক ঘণ্টা দেরি। বাবাজির কথা যদি ফলেই যায়, তা হলেই সে কেল্লায় গিয়ে ঢুকবে। না হলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বাড়ি ফিরে যাবে; বলবে, ওস্তাদ ছাত্র নিতে নারাজ তাই সে বাড়ি ফিরে এল।

কিন্তু রতনের মন বলছে বাবাজির কথা ফলবে; কারণ এর মধ্যেই তার শরীরের ভিতরে কতকগুলো লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে। হাড়ে কেমন যেন টান টান ভাব। সঙ্গে পোঁটলায় চিড়ে বাঁধা ছিল, কিন্তু সেটা আর খেতে ইচ্ছা করছে না; অথচ একটা খিদের ভাব রয়েছে, কিন্তু তার জন্য যেন চাই অন্য খাদ্য।

বনের মধ্যে ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে। সূর্য এখন দূরের গাছপালার ঠিক মাথার উপর নেমে এসেছে। রতন তার নিজের হাত-পায়ের দিকে চেয়ে দেখল। এত লোম তো তার ছিল না!

আর নখও তো এত ধারালো ছিল না!

সামনে একটা শুয়োর। দাঁতাল বুনো শুয়োর। বন থেকে বেরিয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে তার দিকে চেয়ে দেখছে একদৃষ্টে।

রতন একটা আমলকী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। গাছের ডাল ছিল তার মাথার চেয়ে প্রায় দশ হাত উপরে। হঠাৎ রতন বুঝল ডালটা যেন ক্রমে কাছে এগিয়ে আসছে।

শুয়োরটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। রতনের দিকে চেয়ে একটা চাপা গর্জনের মতো শব্দ করল। তারপর উলটো দিকে ঘুরে ছুটে পালাল।

রতন দেখল যে, তার মাথা আমলকী গাছের ডাল ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে। তার মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু গালে হাত দিয়ে বুঝল সেখানেও লোম।

এবার রতন বড় বড় পা ফেলে জঙ্গল ভেদ করে রওনা দিল আজিনগড়ের কেল্লার উদ্দেশে।

॥ ২ ॥

আজিনগড়ের কেল্লায় যে একটা রাক্ষস এসে বাস করছে, সে খবর শিমুলির লোকে শুনেছে রামদাস কাঠুরের কাছ থেকে। রামদাস কাঠ কাটতে গিয়েছিল ঝলসির বনে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই গিয়েছিল যাতে বাঘের খপ্পরে না পড়তে হয়। কেল্লার কাছাকাছি এসে একটা বারো হাত উঁচু দু'-পেয়ে প্রাণী দেখতে পেয়ে সে চম্পট দেয়। প্রাণীটার সর্বাঙ্গে লোম, হাতপায়ের নখ বড় বড়, দু পাশের দাঁতগুলো জানোয়ারের মতো ছুঁচোলো আর বড়, চোখ দুটো লাল, আর মাথাভর্তি জটপাকানো চুল।

রামদাস এই বর্ণনা দেবার পর থেকে ঝলসির বনের ধারেকাছে আর কেউ যায় না। এই দানবের ভয়ে সারা শিমুলি গাঁ কাঁপতে শুরু করেছে, যদিও এটাও ঠিক যে, মানুষের কোনও অনিষ্ট এই রাক্ষস এখন অবধি করেনি।

রতনের মনটা এখনও আগের মতোই রয়েছে, এমনকী তার গলার আওয়াজেও কোনও পরিবর্তন হয়নি, কেবল তার চেহারা আর খিদেটা গেছে বদলে। বনে ফলমূলের অভাব নেই, কিন্তু রতনের খিদে মিটতে লাগে বন্য জানোয়ারের কাঁচা মাংস। তার দেহে শক্তিও হয়েছে অমানুষিক; সে দুই হাতে ধরে যে-কোনও জানোয়ারের ঘাড় মটকে দিতে পারে, তারপর তার ধারালো আর শক্ত দাঁত দিয়ে সেই জানোয়ারের মাংস চিবিয়ে খেতে পারে। তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি আর ঘ্রাণশক্তি—তিনটেই অসম্ভব বেড়ে গেছে। বাঘ বন দিয়ে হেঁটে চলে নিঃশব্দে, কিন্তু রতনের কানে তার পায়ের শব্দ ধরা পড়ে।

একশো হাত দূর থেকে জানোয়ারের গন্ধ সে পায়, আর পেয়ে নিঃশব্দে তাকে ধাওয়া করে। একবার একটা পুকুরের জলে রতন নিজের চেহারাটা দেখেছিল। দেখে তার নিজেরই ভয় লেগেছিল। জানোয়াররাও তাই দেখে পালায়, রতনকে ঝড়ের বেগে দৌড়ে গিয়ে তাদের ধরতে হয়।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর একা ভাঙা কেল্লায় বসে তার সবচেয়ে যার কথাটা বেশি মনে হয় সে হল উজলপুরের রাজকন্যা লক্ষ্মী। সংক্রান্তির মেলায় দেখা তার মুখের সেই হাসির কথা ভেবেই রতনের গলায় গান এসে পড়ে, আর সে আশ্চর্য হয়ে দেখে যে, রাক্ষস হয়েও তার গানের গলা নষ্ট হয়নি। কিন্তু তা হলে কী হবে; সে জানে যে, সে আর কোনওদিন রাজকন্যার কাছেও যেতে পারবে না, মানুষ হয়েও না। গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে রাজকন্যার কথা ভেবে কী লাভ? তার জন্য কত রাজপুত্র রয়েছে, তাদের একটার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাবে আর কিছুদিনের মধ্যেই।

তখনই আবার তার নরহরিখুড়োর কথাটা মনে পড়ে। তার কপাল যে ফিরবে সেটা কোনদিকে? হঠাৎ কি সে বড়লোক হয়ে উঠবে যাতে তার আর কোনও অভাব থাকে না? রাজারাজড়া তো সে আর হতে পারবে না, তা হলে নরহরিখুড়োর কথার মানেটা কী? খুড়োর তো বয়স হয়েছে অনেক; তার গণনায় ভুল হয়নি তো?

দশদিনে কাছাকাছির মধ্যে যা জানোয়ার ছিল সব শেষ করে রতন চলল দিগ্‌নগরের দিকে। দিগ্‌নগরের পশ্চিমে ঝলসির লাগোয়া বন শহরকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে রয়েছে। এই বনের নাম কী রতন জানে না, কিন্তু এখানে জানোয়ার আছে অনেক, রাজা মৃগয়ায় আসেন, এ খবর রতন রাখে। অনেকদূর পথ হেঁটে রতনের খিদে পেয়েছিল খুব, তাই বাঘের গন্ধ পেয়ে সে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়েছিল, আর গাছপালার ফাঁক দিয়ে সে বাঘকে দেখতেও পেল। কিন্তু সেটার দিকে এগোতে গিয়েই হঠাৎ দেখল একটা তীর এসে বাঘের গায়ে লাগাতে সেটা ছটফট করে মরে গেল। তারপরেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেয়ে রতন একটা সেগুন গাছের আড়ালে লুকোবার আগেই তাকে দেখে ফেলল ঘোড়সওয়ার। পোশাক দেখেই বোঝা যায় সে রাজপুত্র। মৃগয়ায় বেরিয়েছে। এদিকে রাজপুত্র এমন বিশাল এক রাক্ষসের সামনে পড়ে থতমত। যদিও রতন দেখে আশ্চর্য হল যে রাজপুত্র ডরায়নি।

'তুমিই বুঝি ঝলসির বনের রাক্ষস?' রাজকুমার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' বলল রতন। 'কিন্তু তুমি কে?'

'আমি চন্দ্রসেন। দিগ্‌নগরের রাজকুমার।' তারপর একটু অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি তো ঠিক মানুষের মতো কথা বলো দেখছি।'

'তার কারণ আমি আসলে মানুষ', বলল রতন। 'এক সন্ন্যাসীর অভিশাপে আমি রাক্ষস হয়েছি। তোমার আমাকে দেখে ভয় করছে না?'

'কই, না তো। তুমি তো আর মানুষ ধরে খাও না; ভয় করবে কেন?'

'কিন্তু আমি তো জানোয়ার খাই। এই বাঘটাকে আমি খাব বলে ঠিক করেছিলাম, সেটাকে তুমি মারলে।'

'আমি মারলাম তাতে কী হল? আমি আজ অনেক শিকার পেয়েছি। এখন সন্ধ্যা হতে চলল, এবার ফিরব। এই বাঘটা তুমিই খাও।'

'তুমি কি একাই শিকার করো?' রতন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। আগে লোকজন নিয়ে করতাম, এখন একাই করি। আমার ভয় করে না। ভাল কথা, তোমার একটা নাম আছে তো, না কি?'

'হ্যাঁ। আমার মানুষ নাম রতন। এখন আমি রাক্ষস, তাই সে নামের আর কোনও দাম নেই।'

'তুমি কি এখন এই বনেই থাকবে?'

'যদি খাবার পাই তা হলে থাকব।'

'তা হলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে। কাল আমি থাকব না। কাল যাব উজলপুর।'

উজলপুর শুনেই রতনের চমক লাগল।

'কেন? উজলপুরে কী?'

'সেখানে ডম্বরি পাহাড়ের গুহায় একটা দানব এসে রয়েছে। সে মানুষ খায়। তাকে মারবার জন্য

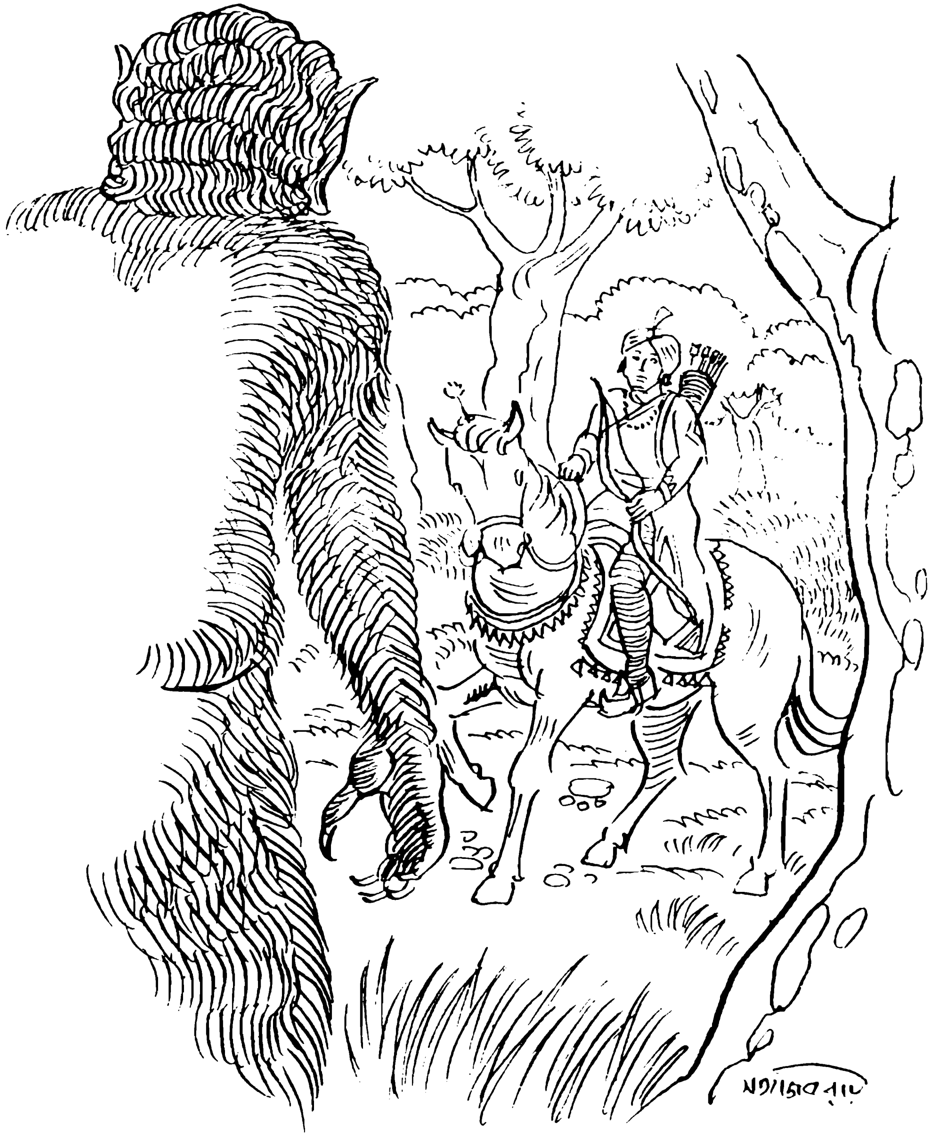

উজ্জলপুরের রাজা ঢ্যাঁড়া দিয়েছেন। আমি গিয়ে দেখব সেটাকে যদি মারতে পারি।'

চন্দ্রসেন বিদায় নিয়ে চলে গেল। রতনের খুব ভাল লাগল রাজকুমারকে। কিন্তু উজ্জলপুরে দানবের ব্যাপারটা শুনে রতন যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মানুষখেকো দানব। চন্দ্রসেন যাবে তাকে মারতে। পারবে তো?

পরদিন সকাল থেকে রতন দেখল তার মন বারবার চলে যাচ্ছে উজ্জলপুরের দিকে। একে তো সেখানেই থাকে লক্ষ্মী রাজকন্যা, তার উপর তার রাজ্যে বিপদ দেখা দিয়েছে, মানুষখেকো দানবের আবির্ভাব হয়েছে। উজ্জলপুরের কেউ নিশ্চয়ই সে দানবকে মারতে পারেনি, নইলে আর ঢ্যাঁড়া দেবে কেন? মারতে পারলে কোনও পুরস্কার দেবে কি রাজা? সে-কথা তো চন্দ্রসেন কিছুই বলল না।

রতন আর চিন্তা না করে বনের ভিতর দিয়ে উজ্জলপুর রওনা দিল। এখান থেকে দু ক্রোশের বেশি

দূর হবে না। সকালে সে একটা বুনো শুয়োর খেয়ে নিয়ে লম্বা পাড়ি দেবার জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছে। চন্দ্রসেনের জন্য তার মনে একটা চিন্তা দেখা দিয়েছে। জানোয়ার মারা আর দানব মারা এক জিনিস নয়।

আধঘণ্টার মধ্যেই রতন ডম্বরি পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেল। পাহাড়ের চারিদিকে ঘিরে আছে ঘন বন। সেই বন ধরে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড গুহা দেখতে পেল রতন। এটাই কি দানবের গুহা? হ্যাঁ, এটাই। কারণ তার প্রখর দৃষ্টিশক্তির জোরে সে দেখতে পেয়েছে যে, গুহাটার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে আছে অনেক মানুষের হাড়।

রতন একটা বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কান তাকে বলল যে, ঘোড়ার খুরের শব্দ এগিয়ে আসছে।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছে রতন। একটা ঘোড়া নয়, অনেক ঘোড়া। তবে একটা ছাড়া আর সবগুলোই একটা জায়গাতেই এসে থেমে গেল। তাদের পিঠে রয়েছে বল্লমধারী সৈন্য। আর, যে ঘোড়াটা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল তার পিঠে আছে রাজকুমার চন্দ্রসেন।

রাজকুমার নির্ভয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে উঠে গেল দানবের গুহা লক্ষ্য করে। গুহার মুখে এসে ঘোড়া থামাল সে। এবার সেনারা দামামা বাজিয়ে জানান দিল যে রাজকুমার উপস্থিত। এই শব্দেই দানবের বাইরে বেরোনো উচিত; এবার তার রাজকুমারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

রতনকে আর অপেক্ষা করতে হল না। দামামা বাজানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিকট হুঙ্কার দিয়ে দানব এক লাফে গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল—তার পায়ের চাপে কিছু বড় পাথর পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে এল সশব্দে।

দানবটা যে কত বড় সেটা ঘোড়ার পিঠে রাজকুমারের পাশে তাকে দেখে বোঝা গেল। রতন প্রমাদ গুণল। চন্দ্রসেন বিদ্যুদ্বেগে তীর ছুড়তে আরম্ভ করেছে দানবের দিকে, কিন্তু সে তীর দানবের পুরু চামড়া ভেদ করতে না পেরে চতুর্দিকে ছিটকে পড়ছে।

দানব যেন এটা উপভোগই করছে এমন ভাব করে কিছুক্ষণ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আরেকটা হুঙ্কার দিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে চন্দ্রসেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঠিক এই মুহূর্তেই রতন বুঝল যে, তার আর চুপ করে থাকা চলে না। সে বটগাছের পাশ থেকে বেরিয়ে কয়েকটা বিশাল লাফ দিয়ে পাহাড় বেয়ে পৌঁছে গেল দানবের পাশে। দানব তখন দু'হাত দিয়ে ঘোড়াসমেত চন্দ্রসেনকে জাপটে ধরেছে, চন্দ্রসেনও ছটফট করছে এই নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য। এমন সময় এই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পেয়ে দানব হঠাৎ হতভম্ব হয়ে ঘোড়াকে ছেড়ে দিল। তারপরেই সে ধেয়ে এল রতনের দিকে।

কিন্তু রতনের খাদ্য বন্য পশু আর দানবের খাদ্য মানুষ, দানব এই রাক্ষসের সঙ্গে পারবে কেন? দানবকে দুহাতে জাপটে নিয়ে তাকে মাথার উপর তুলে রতন প্রথম বুঝল তার নিজের শরীরে কত শক্তি হয়েছে। সেই অবস্থা থেকে সে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর দানবকে আছড়ে ফেলল। দানবের জানও কম কড়া নয়; সে সেই অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে আবার রতনের দিকে ধেয়ে এল। রতন আবার তাকে দুহাতে জড়িয়ে এবার আর ছুড়ে না ফেলে শুধু চাপের জোরে তাকে শেষ করার চেষ্টা করল।

সে চাপ যেন সহস্র অজগরের চাপ। দানব হাত পা ছুড়তে চেষ্টা করেও পারল না। তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তার মুখ হাঁ করে জিভ বেরিয়ে গেছে, আর সেই মুখের মধ্যে দিয়ে রতনের চাপের চোটে দানবের শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে এল। এবার রতন হাত আলগা দিতেই দানবের নিষ্প্রাণ দেহ পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে একেবারে নীচে গিয়ে পড়ল। এমন সময় কোলাহল শোনা গেল। সৈন্যদের কোলাহল। উজলপুরেও ঝলসির বনের রাক্ষসের খবর পৌঁছে গেছিল, এখন সেই রাক্ষস এখানে হাজির দেখে একশো সেনা তাদের বল্লম উঁচিয়ে ধেয়ে এল রতনের দিকে।

এইবারে দুটো ব্যাপার ঘটল: রতন কোনওরকম আক্রোশ দেখাল না। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল গুহার সামনে। আর চন্দ্রসেন সৈন্যদের দিকে হাত তুলে বলল, 'এ রাক্ষসই হোক আর যাই হোক, এ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, আর দানবের সংহার এ-ই করেছে; আমার দ্বারা এ কাজ হত না। কাজেই একে তোমরা রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাও; দেখো যেন এর অনিষ্ট না হয়।'

রতনকে নিয়ে সৈন্যদের কোনও বেগই পেতে হল না; তারা তাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে চলল, আর রতনও সে ব্যাপারে কোনও আপত্তি করল না।

রাজপ্রাসাদের কয়েদখানা রতনের পক্ষে যথেষ্ট বড় নয় বলে তাকে প্রাসাদের পিছনে একটা অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে চারগাছা দড়ি দিয়ে বেঁধে দশজন সশস্ত্র প্রহরী পাহারা রেখে দেওয়া হল।

এবার রাজা নিজে এলেন রাক্ষসকে দেখতে। বন্য পশু খেয়ে রাক্ষস যে এমন শান্তশিষ্ট হতে পারে এটা রাজা ভাবতেই পারেননি।

আর আরেকজন তাকে দেখল প্রাসাদের দোতলার একটা জানালা থেকে, সে হল রাজকন্যা লক্ষ্মী। এমন কদাকার বিশাল একটা প্রাণী এমন নিরীহ ভাবে বসে থাকতে পারে তাদের দেশের এত বড় একটা শত্রুর প্রাণ সংহার করে, এটা লক্ষ্মীর কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। এ কি সত্যিই রাক্ষস, না অন্য কিছু?

ক্রমে দিন ফুরিয়ে রাত এসে পড়ল। রতন এতই নির্জীব হয়ে পড়েছিল যে পেয়াদারা তাদের কাজে একটু একটু ঢিলে দিয়ে কেউ কেউ ঘুমিয়েই পড়েছিল। রতনের তাতে তাপ-উত্তাপ নেই; সে শুধু একজনের মন পাবার আশায় বসে আছে। এমন চেহারা নিয়ে যদিও সে আশা দুরাশা, কিন্তু রতন তবুও হাল ছাড়তে পারে না।

আকাশে চাঁদ দেখে, রাজবাড়ির বাগান থেকে ফুলের গন্ধ পেয়ে রতনের মনে একটা উদাস ভাব এল। চারিদিক নিঝুম হয়ে আছে। তার মধ্যেই রতনের মাথায় একটা গানেব কলি এল। তারপরেই সেই গান তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। প্রহরীদের মধ্যে যারা জেগে ছিল তারা অবাক হয়ে রাক্ষসের দিকে চাইল। এই রাক্ষস গান গায়? আর এত সুন্দর গলায়?

রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে সে গান ভেসে পৌঁছে গেল রাজবাড়ির দোতলার অন্তঃপুরে। আর সবাই ঘুমে অচেতন, কেবল একজন জেগে আছে তার রেশমের বালিশে মাথা দিয়ে। রাজকুমারী লক্ষ্মী।

গানের কলি তার কানে যেতেই লক্ষ্মী চমকে উঠে মোহিত হয়ে গেল। এই সুরই তো সেই ছেলেটি বাঁশিতে বাজিয়েছিল সংক্রান্তির মেলায়! এটা কী করে হয়?

তারপর রাজকন্যার মনে পড়ল ঘোষণার কথা। উজলপুরের রাজার ঘোষণা দেশে দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এ ক'দিনের মধ্যে। 'যে এই দানবকে মারতে পারবে সে পাবে অর্ধেক রাজত্ব, আর সেইসঙ্গে রাজকন্যাকে।' এই রাক্ষসই তো সেই দানবকে মেরেছে!

একি সত্যিই রাক্ষস?

এদিকে রতন গান গেয়েই চলেছে। রাজকন্যা লক্ষ্মীর চোখে ঘুম নেই। তার মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তা এসে জড়ো হয়েছে। কাল সকালে সে বাবার সঙ্গে দেখা করবে। তার মন বলছে—

না, এখনও কিছু বলছে না তার মন, কিন্তু তার মাথার মধ্যে সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। সে এই রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীর চোখে ঘুম এল, আর ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল সেই রাক্ষস তাকে বলছে, 'তুমি হ্যাঁ বললেই আমার এ দশার শেষ হবে। তা ছাড়া আমার মুক্তি নেই।'

পরদিন সকালে লক্ষ্মী তার বাবাকে ডেকে পাঠাল। রাজা তখন সবে নদীতে স্নান সেরে ফিরছেন। তিনি এসে বললেন, 'কী বলছ মা?'

লক্ষ্মী সোজা বাপের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি একবার রাক্ষসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কেন মা? এমন ইচ্ছা কেন হল তোমার?'

'তুমি বলেছিলে, যে দানবকে মারবে তাকেই তুমি তোমার মেয়েকে আর অর্ধেক রাজত্ব দেবে। তুমি তো বলোনি যে সে যদি রাক্ষস হয় তা হলে দেবে না।'

'একি পাগলের মতো কথা বলছ তুমি? রাক্ষসের হাতে তুলে দেব তোমাকে আর অর্ধেক রাজত্ব?'

'কেন দেবে না? সে তো কোনও দোষ করেনি। তার চেহারাটাই যা খারাপ। কাল রাত্রে তার গান শুনেছি আমি। এমন আশ্চর্য সুন্দর গলা খুব কম মানুষের হয়।'

'তুমি তো মহা সমস্যায় ফেললে দেখছি!'

'না বাবা। আমি ওকেই বিয়ে করব। একবার আমাকে ওর কাছে নিয়ে চলো।'

'যদি সে কিছু করে?'

'কিছু করবে না। আমার মন বলছে কিছু করবে না।'

অগত্যা রাজা লক্ষ্মীকে নিয়ে গেলেন রাক্ষসের কাছে। আর সেখানে গিয়ে দেখলেন এক আশ্চর্য দৃশ্য।

এই সবে এক পক্ষকাল শেষ হল; আজ পূর্ণিমা। তাই রাক্ষসের গা থেকে লোম মিলিয়ে যাচ্ছে। তার নখ ছোট হয়ে যাচ্ছে, আর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছোট হয়ে গিয়ে স্বাভাবিক মানুষের আকার নিচ্ছে, আর এ মানুষকে লক্ষ্মী চেনে।

সংক্রান্তির মেলায় একে দেখেছিল তার দিকে চেয়ে হাসতে।

আর এখন সেই হাসিই লেগে আছে রতনের ঠোঁটের কোণে।

রতন উঠে দাঁড়াল। তারপর মুখ খুলল। বলল, 'আমার নাম রতন।'

'আর আমার নাম লক্ষ্মী', বলল রাজকন্যা।

'শোনো রতন', বললেন রাজা, 'আমি কথা দিয়েছি যে, যে দানবকে মারবে তাকে আমার অর্ধেক রাজত্ব, আর আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।'

'সে তো ভাল কথা', বলল রতন।

'কিন্তু তোমার এমন দশা হল কী করে?' জিজ্ঞেস করল রাজকন্যা লক্ষ্মী।

রতন হাসল। তারপর বলল, 'সব বলব, আগে মণ্ডা মিঠাই আনো; বড় খিদে পেয়েছে।'

নীলকমল লালকমল, ফাল্গুন ১৩৯২ (মার্চ ১৯৮৬)

গঙ্গারামের কপাল

নদীর ধারে খোলামকুচি দিয়ে ব্যাঙবাজি খেলতে খেলতে হঠাৎ গঙ্গারামের চোখে পড়ল পাথরটা। এ নদীতে জল নেই বেশি; যেখানে সবচেয়ে গভীর সেখানেও হাঁটু ডোবে না। জলটা কাচের মতো স্বচ্ছ, তাই তার নীচে লাল নীল সবুজ হলদে খয়েরি অনেক রকম পাথর দেখা যায়। কিন্তু এমন পাথর গঙ্গারাম এর আগে কোনওদিন দেখেনি। যতরকম রঙ হয় রামধনুতে, সব রঙ আছে এই পাথরে। আকারে একটা পায়রার ডিমের মতো। গঙ্গারাম জল থেকে পাথরটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। 'বাঃ, কী সুন্দর!' আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ল তার মুখ থেকে। তারপর সেটাকে সে ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হল।

গঙ্গারাম থাকে বৈকুণ্ঠ গ্রামে। তার বাপ-মা মড়কে মারা গেছে যখন, তখন গঙ্গারামের বয়স সাড়ে চার। সে তার মামা গোপীনাথের ঘরে মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়স আঠারো। তাকে গ্রামের সকলেই ভালবাসে, কারণ কারও কোনও উপকারে আসতে পারলে গঙ্গারাম সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। তাই সকলেই বলে গঙ্গারামের মতো এমন সরল সদাশয় ছেলে আর দুটি হয় না। এ ছাড়া গঙ্গারামের চেহারাটিও ভাল, গ্রামে যাত্রা হলে সে তাতে রাজপুত্তুর সাজে আর অভিনয়ও করে দিব্যি। গঙ্গারামের অবস্থা যে ভাল তা নয় মোটেই। মামার চাষের জমি আছে কিছুটা, সেটা সে এখন নিজে চষতে পারে না বাতের জন্য, তাই খেতের কাজ গঙ্গারামকেই করতে হয়। যা ফসল হয় তাতে তাদের কোনওমতে চলে যায়। গঙ্গারামের একটা মামাতো ভাই আছে তার চেয়ে তিন বছরের বড়, নাম রঘুনাথ। রঘুনাথ কুসঙ্গে পড়ে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, তাতে তার শাস্তি হয় তিন বছরের হাজতবাস। সেই তিন বছর কাটতে আর তিন মাস বাকি। বাবা গোপীনাথ বলেছে ছেলেকে আর বাড়িতে ফিরিয়ে নেবে না।

নদীর ঘাটে খেলা সেরে বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গারাম একবার সুবলকাকার বাড়ি হয়ে গেল। সুবলকাকার ক'দিন থেকে সর্দিজ্বর। তার একটা পা খোঁড়া, তাই সে লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারে না। গঙ্গারাম তাকে এসে দেখার জন্য শশী কবিরাজকে খবর দেয়, শশী রুগি দেখে ঔষধ বলে দিয়ে যায় চাকুলে পাতার রস। সে পাতাও গঙ্গারাম বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বিছুটির কামড় খেয়ে জোগাড় করে এনে দেয়।

আজ গঙ্গারাম দেখল সুবলকাকা অনেকটা ভাল। একবার মোক্ষদা-বুড়ির বাড়িতেও যাবার ইচ্ছা ছিল, বুড়ি গ্রামের একপ্রান্তে একা থাকে সেইজন্য, কিন্তু সুবলকাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখল আকাশে মেঘের ঘনঘটা।

গঙ্গারাম পা চালিয়ে বাড়িমুখো চললেও বৃষ্টি এড়াতে পারল না। অবিশ্যি বৃষ্টিতে ভিজতে তার ভালই লাগে, কিন্তু ও মা—আজ যে জলের সঙ্গে শিল পড়তে শুরু করল! আর এমন শিল গঙ্গারাম তার বাপের জন্মে দেখেনি। একেকটা শিল যেন একেকটা তাল। ফটাস ফটাস করে রাস্তায় পড়ছে আর ফেটে চৌচির হয়ে বরফ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। যদি একটা মাথায় পড়ে?

মাথায় পড়ল ঠিকই, তবে সেটা গঙ্গারামের নয়। শ্রীনিবাস-ময়রার বুড়ো বাপ ভুজঙ্গ লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্ করে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, সোজা তার মাথায় একটা শিল পড়ে গঙ্গারামের চোখের সামনে বুড়ো মাথা ফেটে অক্কা পেল। আর তারপর গাঁয়ের কেলো কুকুরটাও মরল মাথায় ওই রাবুণে শিল পড়ে। গঙ্গারাম ভেবেছিল তেলিপাড়ার বুড়ো অশ্বত্থ গাছটার তলায় আশ্রয় নেবে, কিন্তু সেইসঙ্গে শিল কুড়িয়ে নিয়ে তাতে কামড় দেবার লোভটাও সামলাতে পারল না। অথচ গাঁয়ের সব লোক হয় গাছতলায় না হয় বাড়ির দাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। দু' একজন গঙ্গারামকে রাস্তায় দেখে চেঁচিয়ে তাকে সাবধান করে

দিল, কিন্তু গঙ্গারাম তাদের কথায় কান দিল না। আর এও ঠিক যে, তার চতুর্দিকে শিল পড়লেও তার গায়ে পড়েনি। গঙ্গারামের কপাল মন্দ বলেই সকলে জানত—যদিও গঙ্গারাম কোনওদিন নিজেকে দুঃখী বলে মনে করেনি—কিন্তু আজ যে ঘটনা ঘটল তাতে বলতেই হয় যে, তার কপাল খুলে গেছে।

এই ঘটনার তিনদিন পরে খেতে জমি চষতে গিয়ে গঙ্গারামের লাঙলে খটাং করে মাটির তলায় কী যেন একটা লাগল। গঙ্গারাম মাটি খুঁড়ে দেখল সেটা একটা পিতলের কলসি, তার মুখটা একটা পিতলের ঢাকনা দিয়ে বন্ধ, আর সেই ঢাকনা একটা লাল কাপড় জড়িয়ে তাকে গেরো দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে সহজে না খোলে।

খেতে কাজ সেরে গঙ্গারাম কলসিটা বাড়িতে নিয়ে এল। বেশ ভারী কলসি; গঙ্গারামের গায়ে জোর

আছে তাই সে বইতে পারল, না হলে দু'জন লোক লাগত।

বাড়িতে এসে কাপড়ের গেরো খুলে ঢাকনা তুলে গঙ্গারাম দেখল কলসিটার ভিতর অনেকগুলো গোল গোল হলদে চাকতি রয়েছে, যেগুলো দিনের আলোতে ঝলমল করছে। গঙ্গারাম চোখে কখনও মোহর দেখেনি, নইলে সে বুঝত যে, সেগুলো সবই মোহর। এই এক কলসির মধ্যে যত স্বর্ণমুদ্রা ছিল তাতে একটা প্রাসাদ বানানো যায়। কিন্তু গঙ্গারাম ভাবল—না জানি এগুলো কীসের চাকতি। যেইভাবে ছিল সেইভাবেই পড়ে থাক।

কলসির মুখে আবার ঢাকনা দিয়ে সেটাকে কাপড় দিয়ে বেঁধে গঙ্গারাম খাটের তলায় চালান দিল; মামাকেও বলল না সেটার বিষয়ে কিছু।

এর ক'দিন পরে আরেকটা ঘটনায় বোঝা গেল গঙ্গারামের কপাল ফিরেছে। মাঝরাত্তিরে গঙ্গারামের পাড়ায় অন্তা ঘোষের বাড়িতে আগুন ধরল। গঙ্গারামের সাতটা বাড়ি পরেই অন্তা ঘোষের বাড়ি। পাড়ার সকলের ঘুম ভেঙে গিয়ে চারিদিকে হইহই চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল, পুকুর থেকে বালতি বালতি জল এনে হাতে হাতে সে জল চালান হয়ে আগুনে ঢালা হল। কিন্তু সর্বগ্রাসী আগুন এক ঘরের চাল থেকে আরেক চালে ছড়াতে লাগল। সাড়ে চার ঘণ্টা লাগল আগুন নেভাতে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, চারপাশের বাড়ি পুড়ে গেলেও গঙ্গারামের বাড়ি সে আগুন ছোঁয়নি। গঙ্গারাম নিশ্চিন্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, বাঁচা গেল! আমাদের বাড়িতে আগুন ধরলে বাতের রুগি মামাটা হয়তো পুড়েই মরত।'

এই ঘটনার পর গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল গঙ্গারামের সৌভাগ্যের কথা। কেউ কেউ এসে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে গঙ্গা, তোর ব্যাপার কী বল তো? তোকে তো চিরদুঃখী বলেই জানি, কিন্তু তোর এমন ভাগ্য ফিরল কী করে?'

গঙ্গারাম একগাল হেসে বলে, 'কপালের কথা কেউ কি কিছু বলতে পারে? ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন বটে, কিন্তু কেন তা তো বলতে পারব না!'

গঙ্গারামের একবারও মনে হল না যে, তার ট্যাঁকে যে পাথরটা গোঁজা থাকে সেই পাথরই তার কপাল ফিরিয়ে দিয়েছে।

॥ ২ ॥

গঙ্গারামের মামাতো ভাই রঘুনাথ হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে তার বাড়িতে আসার পথেই হলধরের দোকান থেকে মুড়ি কিনে খেতে খেতে গঙ্গারামের আশ্চর্য কপালের কথা শুনল। শুনে তার মনে হল, এটা কেমন করে হয়? হঠাৎ একটা লোকের ভাগ্য ফিরে যায় কী করে? এ ব্যাপারে একটু খোঁজখবর করতে হবে তো!

খিদে মিটিয়ে বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই তার বাপের কাছে মুখ-ঝামটা খেতে হল রঘুনাথের। 'এ-বাড়িতে তোর ঠাঁই হবে না', সোজা বলে দিলেন বাপ, 'তুই অন্য ব্যবস্থা দ্যাখ।'

রঘুনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখল গঙ্গারাম মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে। 'কী দাদা, অ্যাদ্দিনে ছাড়া পেলে বুঝি?' গঙ্গারাম জিজ্ঞেস করল রঘুনাথকে। 'কিন্তু বাপ তোমার উপর খাপ্পা হয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ?'

'করেছি', বলল রঘুনাথ। 'আমি এ বাড়িতে থাকার জন্যে আসিনি। আমার অন্য ডেরা আছে কেষ্টপুরে। আমি এসেছি একবার তোর সঙ্গে দেখা করে যাব বলে।'

'সে তো ভাল কথা,' বলল গঙ্গারাম।

'তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

'কী কথা?'

'তোর কপাল ফিরেছে বলে শুনলাম। ব্যাপারটা কী?'

'আমি আর কী বলব দাদা। যিনি মাথার উপর আছেন, তাঁর কখন কী মর্জি হয় তা কি আমরা বলতে পারি?'

রঘুনাথ বুঝল যে গঙ্গারাম যা বলছে তা সরল মনেই বলছে। তার কাছ থেকে খুব বেশি কিছু জানা

যাবে না। সে পোঁটলা কাঁধে আবার বেরিয়ে পড়ল। কেষ্টপুরে সত্যিই তার একটা ডেরা আছে। তার দলের যে পাণ্ডা, যাকে পেয়াদায় ধরতে পারেনি, সেই মহেশ থাকে কেষ্টপুরে। জেল খেটে রঘুনাথের এবার সৎপথে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুষ্কর্ম তার মজ্জায় ঢুকে গেছে, তাই তার পুরনো দল সে ছাড়তে চায় না।

তবে কেষ্টপুর যাবার আগে সে গেল হরিতাল, অঘোর গনতকারের কাছে। অঘোর শুধু গুনতে জানে না, সে নানারকম মন্তর-তন্তর জানে। লম্বা, চিমড়ে মানুষটা, গায়ের রঙ একেবারে আলকাতরার মতো, বয়স কত তা কেউ জানে না।

অঘোর রঘুনাথকে দেখেই বলল, 'কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেলি? তবে তোর কিন্তু কপালে দুঃখু আছে, তোকে আবার হাজতে যেতে হবে। এই বেলা কুসঙ্গ পরিত্যাগ কর।'

'সে সব কথা থাক', বলল রঘুনাথ। 'আমি আমার পিসতুতো ভাইয়ের কথা জানতে এসেছি।'

'কে, গঙ্গারাম?'

'তার কপাল ফিরল কী করে বলতে পারেন?'

'দাঁড়া, একটু হিসেব করে দেখি।'

অঘোর গনতকার তার তক্তপোশে বসে একটা খেরোর খাতায় খাগের কলম দিয়ে কয়েকটা নকশা এঁকে প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'সে তো এখন বিস্তর ধনের মালিক।'

'ধন? কই, ধনদৌলত তো কিছু দেখতে পেলাম না।'

'কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'হঠাৎ তার কপাল ফিরল কেন? সে কি দেবতার বর পেল নাকি?'

'না। সে পেয়েছে একটা পাথর।'

'পাথর?'

'হ্যাঁ, পাথর। তার জোরেই তার কপাল ফিরেছে। এই পাথরের নাম সাতশিরা। তার বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। তবে সে নিজে তা বোঝে না। সে অতি সরল মানুষ।'

'তার ধন কোথায় আছে বলতে পারেন?'

'তার খাটের নীচে। তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।'

রঘুনাথ গনতকারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে সোজা গেল কেষ্টপুর। তার লক্ষ্য মহেশ চোরের বাড়ি।

মহেশের বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, পাকানো শরীর, নাকের নীচে পুরু গোঁফ আর গালে গালপাট্টা।

'দাদা!' বলল রঘুনাথ মহেশের হাত ধরে, 'তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা!'

'কী ব্যাপার?'

রঘুনাথ তাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল।

'এই কথা?' শুনে বলল মহেশ। 'খাটের তলায় আছে পেতলের ঘটি?'

'হ্যাঁ, দাদা! তুমি আনতে পারলে তিনের দুই ভাগ তোমার। এক ভাগ আমার।'

'তা বেশ,' বলল মহেশ। 'পরশু অমাবস্যা। পরশু যাব।'

মহেশের মতো চতুর চোর এ-তল্লাটে আর কেউ ছিল না। সে যে কতবার পেয়াদার চোখে ধুলো দিয়েছে তার হিসেব নেই। অমাবস্যার রাতে সিঁদকাঠি নিয়ে বৈকুণ্ঠগ্রামে গঙ্গারামের বাড়িতে এসে সে কাজ শুরু করে দিল। নিশুতি রাত, ফাল্গুন মাস, কিন্তু শীত এখনও পুরোপুরি যায়নি। মহেশ এসে পৌঁছেছে রাত তিনটেয়, যখন লোকের ঘুম হয় সবচেয়ে গভীর। এসেই প্রায় শব্দ না করে সে সিঁদ কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু তাকে বেশিদূর এগোতে হল না। দু'দিন হল বৃষ্টি হয়ে গেছে, শীতকালের লম্বা-ঘুম-ভাঙা এক কালসাপ ছিল কাছাকাছির মধ্যে, সেটা নিঃশব্দে এসে মহেশের গোড়ালিতে মারল একটা ছোবল। মহেশের হাত থেকে সিঁদকাঠি পড়ে গেল, আর দু'মিনিটের মধ্যে তার নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পরদিন সকালে গঙ্গারামই দেখল প্রথমে চোরের মৃতদেহ। সে বুঝল কী হয়েছে, কিন্তু তার বাড়িতে চোর সিঁদ কাটতে আসবে কেন সেটা সে বুঝল না।

এদিকে মহেশের কী দশা হয়েছে সেটা রঘুনাথ জানতে পেরেছে। সে বুঝল তার পিসতুতো ভাইয়ের কী আশ্চর্য কপাল। এইভাবে চুরি করে তো তার কাছ থেকে টাকা আদায় করা যাবে না। অন্য কী পন্থা নেওয়া যায় সেই নিয়ে সে ভাবতে বসল।

এদিকে গঙ্গারামের যে কপাল খুলেছে তার আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার মামার বাত আপনা থেকেই অনেকটা ভাল হয়ে গেছে; মামার মেজাজটা ছিল খিটখিটে, আজকাল সেটাও বদলে গিয়ে অনেক নরম হয়ে গেছে। মামা বলছে গঙ্গারামের জন্য এবার একটা পাত্রী খুঁজতে হবে। গঙ্গারাম এটাকেও কপাল ফেরার লক্ষণ বলে মনে করে, কারণ বিয়েতে তার আপত্তি নেই। বেশ একজন

সুখ-দুঃখের সাথী হবে, ঘরকন্নার কাজ করার লোক হবে, আর সে মেয়ে যদি ফুটফুটে হয় তা হলে তো কথাই নেই। ফুল যেমন সুন্দর, সকাল-সন্ধ্যার আকাশ যেমন সুন্দর, পাখির ডাক যেমন সুন্দর, তেমনই তার বউও সুন্দর হয় এটা গঙ্গারাম চায়।

এই সময় একদিন এক হাটবারে হাটে ঢ্যাঁড়া শোনা গেল। বৈকুণ্ঠগ্রাম থেকে সাত ক্রোশ দূরে কনকপুর শহর, সেই শহর থেকে ঢ্যাঁড়া দিতে এসেছে। ঘোষণাটা এই—

কনকপুরের রাজকন্যার একটা সাতশিরা পাথর ছিল, সেটা একটা বাঁদর রাজবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে নিয়ে যায়। সেই থেকে রাজবাড়িতে নানা দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাজকন্যার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। এই সাতশিরা পাথরে রামধনুর সাতটা রঙই শিরায় শিরায় ফুটে বেরোয়। সে পাথর যদি কারও কাছে থেকে থাকে তা হলে সেটা ফেরত দিলে রাজা সে-লোককে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবে।

গঙ্গারাম শুনল ঘোষণাটা, তারপর একটা গাছের আড়ালে গিয়ে ট্যাঁক থেকে পাথরটা বার করে দেখল সেটার দিকে মন দিয়ে। হ্যাঁ, এতেও তো শিরায় শিরায় সাতটা রঙই দেখা যায়। এই কি তা হলে সাতশিরা পাথর?

গঙ্গারাম মনে মনে ঠিক করল সে কনকপুর যাবে, আর গিয়ে রাজাকে জিজ্ঞেস করবে এই পাথরই সেই পাথর কিনা। যদি তাই হয় তা হলে সে পাথরটা ফেরত দিয়ে দেবে। সেটা তার সাধের জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজকুমারীর অবস্থা শুনে তার মনে আঘাত লেগেছে। কারও দুঃখ গঙ্গারাম সইতে পারে না। সে দুঃখ দূর করার ক্ষমতা যদি তার থাকে তা হলে সে নিশ্চয়ই তা করবে।

এদিকে কেষ্টপুরেও এই একই ঢ্যাঁড়া পড়েছে, একই ঘোষণা হয়েছে, আর সেটা শুনেছে রঘুনাথ। তার মন বলল তার পিসতুতো ভাইটা যা বোকা, সে নিশ্চয়ই পাথর ফেরত দিতে কনকপুর যাবে। সে নিজে কনকপুরের রাস্তায় ঝোপের পিছনে লুকিয়ে থাকবে, আর ভাই এলেই তাকে ঘায়েল করে তার কাছ থেকে পাথরটা নিয়ে নেবে। নিয়ে সেটা সে নিজের কাছেই রাখবে, রাজাকে ফেরত দেবে না।

গঙ্গারাম পরদিন সক্কাল সক্কাল চাদরের খুঁটে মুড়ি বাতাসা বেঁধে নিয়ে দুগ্গা বলে কনকপুর রওনা দিল।

তিন ক্রোশ পথ যাবার কিছু পরে একটা বনের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে রঘুনাথ হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে ধেয়ে এল গঙ্গারামের দিকে। গঙ্গারাম কিছুই টের পায়নি, কারণ তার পিছন দিক দিয়ে নিঃশব্দে এসেছিল রঘুনাথ। কিন্তু হলে কী হবে? গঙ্গারামের ট্যাঁকে সাতশিরা পাথর। সে লাঠি তার মাথায় পড়তেই সেটা শোলার মতো মট করে ভেঙে গেল। কাণ্ড দেখে রঘুনাথ দিল চম্পট, কারণ সে জানে গঙ্গারামের সঙ্গে খালি হাতে সে পেরে উঠবে না।

কনকপুর পৌঁছতে গঙ্গারামের দুপুর পেরিয়ে গেল। রাজবাড়িটা অনেক দূর থেকেই দেখা যায়। সে সটান চলে গেল ফটকের সামনে। সেখানে প্রহরী তাকে রুখতে সে বলল, 'আমি রাজকন্যার জন্য সাতশিরা পাথর এনেছি।'

প্রহরী পাথরটা দেখতে চাইলে গঙ্গারাম ট্যাঁক থেকে বার করে দেখাল। তাতে প্রহরী শুধু তার পথই ছেড়ে দিল না, আরেকজন প্রহরীকে বলে রাজার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে দিল।

রাজা রাজসভায় যাননি, মন্ত্রী রাজকার্য চালাচ্ছেন, রাজা মনের দুঃখে অন্দরমহলে শয্যা নিয়েছেন।

গঙ্গারাম রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে গড় করে বলল, 'মহারাজ, আমি একটা পাথর এনেছি, সেটা সাতশিরা কিনা যদি আপনি দেখে নেন।'

রাজা উঠে বসলেন, তাঁর চোখে আশার ঝিলিক।

'কই, দেখি তোমার পাথর।'

গঙ্গারাম দেখাল।

রাজার দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'এই তো সেই পাথর।' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

তারপর রাজা গঙ্গারামের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি দাঁড়াও। তোমার পাওনা পুরস্কারটা তোমাকে দিই; আর তোমার সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি, সে তোমাকে ঘোড়ায় করে তোমার গ্রামে পৌঁছে দেবে। এ-টাকা সঙ্গে নিয়ে হেঁটে যাওয়া নিরাপদ নয়।'

কোষাগার থেকে একজন কর্মচারী একটা মখমলের থলিতে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এনে গঙ্গারামকে দিল। গঙ্গারাম থলি খুলেই বলল, 'আরে, এ জিনিস তো আমার অনেক আছে—এর চেয়ে বেশি আছে। খেতে চাষ করতে গিয়ে মাটির তলা থেকে পেয়েছি। এ জিনিস আর আমার লাগবে না, যথেষ্ট আছে।'

রাজা তো অবাক। এমন কথা তিনি কখনও শোনেননি। তিনি বললেন, 'এটা তোমার পুরস্কার, তোমার পাওনা। তোমায় নিতেই হবে।'

'তবে দিন। আপনি যখন এত করে বলছেন তখন না বলব না। কিন্তু একটা কথা বলার ছিল, রাজামশাই।'

'কী কথা?'

'যাকে এনে দিলাম সাতশিরা পাথর, সেই রাজকন্যাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি কোনওদিন রাজকন্যা দেখিনি।'

রাজা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'এ কেমন কথা বললে তুমি! রাজকন্যাকে দেখা কি মুখের কথা? সে থাকে তার নিজের ঘরে; তার বিয়ের কথা হচ্ছে। সে তো আর খুকি নয়।'

'সে তো আমারও বিয়ের কথা হচ্ছে, রাজামশাই,' বলল গঙ্গারাম। 'আমি বলি দেখতে দোষটা কী? একবার দেখেই আমি চলে যাব।'

এমন সময় সকলকে অবাক করে দিয়ে রাজার ঘরে পর্দা সরিয়ে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

'এ কী, সুনয়না!' রাজা অবাক হয়ে বলে উঠলেন।

'যে আমার পাথর এনে দিয়েছে তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা হল,' বলল রাজকন্যা সুনয়না। 'এই পাথর যে হাতছাড়া করতে পারে সে তো যেমন তেমন লোক নয়। এমন পয়া পাথর তো আর হয় না। এতে মানুষের ভাগ্য ফিরে যায়।'

গঙ্গারাম অবাক হয়ে রাজকন্যার দিকে চেয়ে বলল, 'এ কথা বোধহয় ঠিকই, কারণ এটা পাবার পর থেকেই আমার মতো গরিবের কপালও খুলে গিয়েছিল। এখন যখন পাথরটা চলে গেল—'

'তখন আবার যে-কে-সেই হয়ে যাবে তুমি,' বলল রাজকন্যা। 'আমি এ পাথর ফেরত চাইনি, বাবাই জোর করে ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের সত্যি করে কোনও অভাব নেই, অভাব তো তোমারই।'

'অভাবের মধ্যেই তো মানুষ হয়েছি,' বলল গঙ্গারাম, 'তাই অভাবের অভাবটা যে কী তা জানিই না। তবে একটা কথা বলতে পারি—এই পাথর আমাকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা এনে দিয়েছে। অ্যাদ্দিন বুঝতে পারিনি, আজ বুঝলাম। আমার মনে হয় বাকি জীবনটা তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে আমার আর কোনও পাথরের দরকার নেই। ওটা তোমার জিনিস ছিল, তোমার কাছেই থাক।'

'কিন্তু একটা কথা বলি, এই পাথরের গুণে পাওয়া স্বর্ণমুদ্রা এই পাথর চলে গেলে আর নাও থাকতে পারে। তখন তুমি কী করবে?'

'পাথর পাওয়ার আগে যেমনভাবে চলছিল তেমন ভাবেই চলবে।'

'তা কেন? পাথর তো দুজনের কাছেই থাকতে পারে,' সকলকে অবাক করে দিয়ে বলল রাজকন্যা।

'এটা ঠিক বলেছ,' বলল গঙ্গারাম, 'যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তা হলেই তো দুজনের কাছেই থাকবে পাথর।'

রাজাকে এবার বাধ্য হয়ে কথা বলতে হল। তিনি গঙ্গারামের দিকে চেয়ে বললেন, 'সব তো বুঝলাম। কিন্তু আমি তো আর বেশিদিন নেই, আর আমার কোনও ছেলেও নেই। আমি না থাকলে তুমি রাজকার্য চালাতে পারবে?'

গঙ্গারাম বলল, 'অ্যাদ্দিন খেতে লাঙল চালালাম, এখন না হয় রাজ্য চালাব। ফসল ফলানোও তো সহজ কাজ নয়! তাতে অনেক বুদ্ধি লাগে, অনেক পরিশ্রম লাগে। আর রাজকার্যের অর্ধেক কাজ তো করে মন্ত্রী, আপনি আর একা কত করেন রাজামশাই?'

'সে-কথা ঠিকই,' বললেন রাজামশাই।

'তবে কোনও ভাবনা নেই,' বলল গঙ্গারাম। তারপর বলল, 'তা হলে এবার চলি। আপনি এদিকে তোড়জোড় করুন, দিনক্ষণ দেখুন। আমার মামাকে আবার খবরটা দিতে হবে।...চলি রাজকন্যা, আবার পরে দেখা হবে। ভাল কথা—আমার নাম গঙ্গারাম।'

দরজার পাশ থেকে রাজকন্যা একটা খুশির হাসি হেসে পর্দা ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বাড়ি ফিরে এসেই চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে গঙ্গারাম পাথরের অভাবটা হাড়ে হাড়ে টের পেল। মামার বাতটাও শুনল বেড়েছে। আর সবচেয়ে যেটা অবাক কাণ্ড—খাটের তলা থেকে কলসি বার করে দেখল তার ভিতর রয়েছে শুধু মাটি।

কিন্তু এর কোনওটাই সে গ্রাহ্য করল না, কারণ যা হতে চলেছে, তাতে তার কপাল মন্দ এটা আর বলা চলে না।

আনন্দমেলা, বৈশাখ ১৩৯৩ (১৪ মে ১৯৮৬)

সুজন হরবোলা

সুজনের বাড়ির পিছনেই ছিল একটা সজনে গাছ। তাতে থাকত একটা দোয়েল। সুজনের যখন আট বছর বয়স তখন একদিন দোয়েলের ডাক শুনে সে ভাবল—আহা, এ পাখির ডাক কেমন মিষ্টি। মানুষে কি কখনও এমন ডাক ডাকতে পারে? সুজন সেইদিন থেকে মুখ দিয়ে দোয়েলের ডাক ডাকার চেষ্টা করতে লাগল। একদিন হঠাৎ সে দেখল যে, সে ডাক দেবার পরেই দোয়েলটা যেন তার ডাকের উত্তরে ডেকে উঠল। তখন সে বুঝল যে, এই একটা পাখির ডাক তার শেখা হয়ে গেছে। তার মা দয়াময়ীও শুনে বললেন, 'বাঃ রে খোকা, মানুষের গলায় এমন পাখির ডাক তো শুনিনি কখনও!' সুজন তাতে যারপরনাই খুশি হল।

সুজন দিবাকর মুদির ছেলে। তার একটা বড় বোন ছিল, তার বিয়ে হয়ে গেছে, আর একটা বড় ভাই মারা গেছে তিন বছর বয়সে। সুজন তাকে দেখেইনি। সুজনের মা খুব সুন্দরী, সুজন তার মতো নাক-চোখ পেয়েছে, তার রঙটাও বেশ পরিষ্কার।

দিবাকরের ইচ্ছা ছেলে লেখাপড়া শেখে, তাই সে সুজনকে হারাণ পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দিল। কিন্তু পড়াশুনায় সুজনের একেবারেই মন নেই। পাততাড়ি নিয়ে পাঠশালায় বসে থাকে আর এ-গাছ সে-গাছ থেকে পাখির ডাক শুনে মনে মনে ভাবে এসব ডাক সে গলায় তুলবে। গুরুমশাই পাঁচের নামতা বলতে বললে সুজন বলে, 'পাঁচেক্কে পাঁচ, পাঁচ দুগুণে বারো, তিন পাঁচে আঠারো...।' গুরুমশাই তাকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেন, সেই অবস্থায় সুজন শালিক বুলবুলি চোখ-গেল পানকৌড়ির ডাক শোনে আর ভাবে কখন সে পাঠশালা থেকে ছুটি পেয়ে এইসব পাখির ডাক নকল করতে পারবে।

তিন বছর পাঠশালায় পড়েও যখন কিছু হল না তখন একদিন হারাণ পণ্ডিত দিবাকরের দোকানে গিয়ে তাকে বলল, 'তোমার ছেলের ঘটে বিদ্যা প্রবেশ করানো শিবের অসাধ্য। আমি বলি কি, তুমি ছেলেকে ছাড়িয়ে নাও। তোমার কপাল মন্দ, নইলে তোমার এমন ছেলে হবে কেন? অনেক ছেলেই তো দিব্যি লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে যাচ্ছে।'

দিবাকর আর কী করে, ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাদ্দিন পাঠশালায় গিয়ে কী শিখলি?'

'আমি বাইশ রকম পাখির ডাক শিখেছি, বাবা', বলল সুজন। 'আমাদের পাঠশালার পিছনে একটা বটগাছ আছে, তাতে অনেক রকম পাখি এসে বসে।'

'তা তুই কি হরবোলা হবি নাকি?' জিজ্ঞেস করল দিবাকর।

'হরবোলা? সে আবার কী?'

'হরবোলারা নানারকম পাখি আর জন্তু-জানোয়ারের ডাক মুখ দিয়ে করতে পারে। তারা এইসব ডাক ডেকে লোককে শুনিয়েই রোজগার করে। তোর যখন পড়াশুনা হল না, তখন দোকানে বসেও তুই কিছু করতে পারবি না। হিসেব যে করবি, সে বিদ্যেও তো তোর নেই। তাই তোকে আমার কোনও কাজে লাগবে না।'

সুজন সেই থেকে হরবোলা হবার চেষ্টায় লেগে গেল। তার কাজ মাঠে ঘাটে বনবাদাড়ে ঘোরা, আর পাখির ডাক শুনে, জানোয়ারের ডাক শুনে, সেই ডাক মুখ দিয়ে নকল করা। এই কাজে তার ক্লান্তি নেই, কারণ তার স্বাস্থ্য বেশ ভাল, অনেক হাঁটতে পারে, গাছে চড়তে পারে, সাঁতার কাটতে পারে। তার ডাকে যখন পাখি উত্তর দেয়, তখন তার মনটা নেচে ওঠে। মনে হয় সব পাখিই তার বন্ধু। খোলা মাঠে গিয়ে বসে গোরু বাছুর ছাগল ভেড়ার ডাক সে তুলেছে, তারা তার ডাকে জবাব দেয়। তার হাম্বা ডাক শুনে

নিস্তারিণী বুড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ধবলীর বাছুরটা হঠাৎ ফিরে এল ভেবে; তার গাধার ডাক শুনে মোতি ধোপার গাধা ঘাড় তুলে কানখাড়া করে ডাকতে শুরু করে, মোতি ভাবে আরেকটা গাধা এল কোত্থেকে! ঘোড়ার চিঁহিতেও সুজন ওস্তাদ, সেটা সে ডাকে জমিদার হালদারের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে। সে ডাক শুনে সহিস করিম মিঞা ভাবে, কই, আমার ঘোড়া তো ডাকছে না—এটা আবার কার ঘোড়া?

পাখির কথাই যদি বলো, তা হলে সুজন অন্তত একশো পাখির ডাক তুলেছে। কাক চিল চড়ুই, শালিক, কোয়েল, দোয়েল, পায়রা, ঘুঘু, তোতা, ময়না, বুলবুলি, টুনটুনি, চোখ-গেল, কাদাখোঁচা, কাঠঠোকরা, হুতোম প্যাঁচা—আর কত নাম করব? সুজন এইসব পাখির ডাক তুলে নিয়েছে এই গত কয়েক বছরে। সে ডাক শুনে পাখিরাই যদি ভুল করে তা হলে মানুষের আর কী দোষ?

বয়স কত হল সুজনের? তা হয়েছে মন্দ কী! তাকে আর খোকা বলা যায় না, সে এখন জোয়ান। সে গতরে বেড়েছে, সবল সুস্থ শরীর হয়েছে তার। বাবা বলে, 'তুই এবার কাজে লেগে পড়। রোজগারের বয়স হয়েছে তোর। কার্তিক হরবোলা থাকে এই পাশের গাঁয়ে। তাকে গিয়ে বল তোর একটা হিল্লে করে দিতে। না হয় তার সঙ্গে রইলি ক'টা দিন; তারপর আরেকটু বয়স হলে নিজের পথ দেখবি।'

বাপের কথা শুনে সুজন কার্তিক হরবোলার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। কার্তিকের বয়স হয়েছে দু'কুড়ির উপরে—সে বিশ বছর হরবোলার কাজ করছে। কিন্তু সুজন দেখল সে নিজে যতরকম ডাক জানে, কার্তিক তার অর্ধেকও জানে না। সুজন এই কিছুদিন হল নাকিসুরে মুখ দিয়ে সানাই বাজাতে শিখেছে, তার সঙ্গে ডুগি তবলা সে নিজেই বাজায়; শিঙে ফোঁকার আওয়াজও শিখেছে, নাচের সঙ্গে যে ঘুঙুর বাজে সেই ঘুঙুরের আওয়াজ করতে শিখেছে মুখ দিয়ে। কার্তিক এসব কিছুই জানে না। সে সুজনের কাণ্ড দেখে হাঁ! তবে মুখে কিছু বলল না, কারণ কার্তিকের হিংসে হচ্ছিল। সে শুধু বলল, 'আমি শাগরেদ নিই না। তোমার যা করার তা নিজেই করতে হবে।'

সুজন বলল, 'আজ্ঞে আপনি কী করে শুরু করলেন তা যদি বলেন তা হলে আমার একটু সুবিধে হয়।'

তাতে কার্তিকের আপত্তি নেই। সে বলল, 'আমি তেরো বছর বয়সে যন্তিপুরের রাজবাড়িতে গিয়ে হরবোলার খেলা দেখাই। রাজা খুশি হয়ে আমাকে ইনাম দেন। সেই থেকে আমার নাম হয়ে যায়। তুই কোনও রাজাকে খুশি করতে পারিস তো তোরও একটা গতি হয়ে যাবে। আমার দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়।'

সুজন আর কী করে? সে কাউকে চেনে না, কোথাকার কোন রাজবাড়িতে গিয়ে খেলা দেখাবে সে? মনের দুঃখে সে বাড়ি ফিরে এল।

সুজনের গ্রামের নাম হল ক্ষীরা। ক্ষীরার উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে একটা বড় মাঠ পেরিয়ে ছিল একটা গভীর বন। এই বনের নাম চাঁড়ালি। চাঁড়ালির বনে যত পাখি আর জানোয়ারের বাস তেমন আর কোনও বনে ছিল না। সুজন একদিন দিন থাকতে থাকতে সেই বনে গিয়ে হাজির হল । জানোয়ারে তার কোনও ভয় নেই, আর পাখিতে তো নে-ই-ই। এই বনে গিয়ে তিনটে নতুন নাম-না-জানা পাখির ডাক সে তুলল। সূর্যি যখন মাথার উপর থেকে পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে, এমন সময় সুজন শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের শব্দ, আর দেখল একপাল হরিণ ছুটে পালিয়ে গেল।

কিছু পরেই সুজন দেখল যে, বনের মধ্যে দিয়ে আসছেন ঘোড়ার পিঠে এক রাজা, আর আরও পাঁচ-সাতটা ঘোড়ায় তাঁর অনুচরের দল। দেখে সে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, কারণ বনে অন্য মানুষ দেখবে সেটা সে ভাবেনি। এটা সে ভালই বুঝল যে, রাজা মৃগয়ায় বেরিয়েছেন।

এদিকে রাজাও সুজনকে দেখে অবাক!

'তুই কে রে?' রাজা হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঘোড়া থামিয়ে।

সুজন হাতজোড় করে নিজের নাম বলল।

'তুই একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস, তোর বাঘের ভয় নেই?'

সুজন মাথা নেড়ে না বলল।

'তার মানে কি এ বনে বাঘ নেই?' রাজা জিজ্ঞেস করলেন। 'শুনেছিলাম যে, চাঁড়ালির বনে অনেক বাঘের বাস?'

'বাঘ আপনার চাই?'

'চাই বইকী! শিকারে এসেছি দেখতে পাচ্ছিস না? বাঘ ছাড়া কি শিকার হয়?'

'বাঘ খুঁজে পাননি আপনারা?'

'না, পাইনি। হরিণ ছাড়া আর কিছুই পাইনি।'

'ও।'

সুজন একটুক্ষণ ভাবল; তারপর বলল, 'বাঘ আছে, আর সে বাঘের ডাক আমি শুনিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আপনি কি সে বাঘ মারবেন, রাজামশাই?'

'মারব না? শিকার মানেই তো জানোয়ার মারা।'

'কিন্তু বাঘ আপনার কী ক্ষতি করল যে, তাকে মারবেন?'

রাজা আসলে খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, 'বেশ, আমি তোর কথা মানলাম। বাঘ আমি মারব না, কারণ সত্যিই সে আমার কোনও অনিষ্ট করেনি। কিন্তু সে যে আছে তার প্রমাণ কই?'

সুজন তখন দু'হাত চোঙার মতন করে মুখের ওপর দিয়ে সামনের দিকে শরীরটাকে নুইয়ে একটা বড় দম নিয়ে ছাড়ল একটা হুঙ্কার। অবিকল বাঘের ডাক। আর তার এক পলক পরেই বনের ভিতর থেকে উত্তর এল, 'ঘ্যাঁয়াঁওঁ!'

রাজা তো তাজ্জব!

'তোর তো আশ্চর্য ক্ষমতা,' বললেন রাজা। 'তুই থাকিস কোথায়?'

'আজ্ঞে, আমার গাঁয়ের নাম ক্ষীরা। এখান থেকে তিন ক্রোশ পথ।'

'তুই আমার সঙ্গে আমার রাজ্যে যাবি? তার নাম জবরনগর। এখান থেকে ত্রিশ ক্রোশ। আমার মেয়ের বিয়ে আছে সামনের মাসে আজবপুরের রাজকুমারের সঙ্গে। সেই বিয়েতে তুই হরবোলার ডাক শোনাবি। যাবি?'

'আজ্ঞে বাড়িতে যে বলতে হবে আগে।'

'তা সে তুই আজ বাড়ি চলে যা। আমরা বনে তাঁবু ফেলেছি। সেখানে রাত কাটিয়ে কাল সকালে ফিরব। তুই কাল সক্কাল সক্কাল চলে আসিস বাড়িতে বলে।'

'বেশ, তাই হবে।'

॥ ২ ॥

সুজন বাড়ি ফিরে এসে মা-বাবাকে সব কথা বলল। দিবাকর তো মহাখুশি। বলল, এইবার ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন। তোর বোধ হয় একটা হিল্লে হল।'

মা বলল, 'তুই যে যাবি, আর ফিরবি না নাকি?'

'পাগল!' বলল সুজন। 'কাজ হয়ে গেলেই ফিরব। আর নাম-ডাক হলে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাব, মাঝে মাঝে ফিরব।'

পরদিন ভোর থাকতে সুজন বেরিয়ে পড়ল। যখন চাঁড়ালির বনে পৌঁছল তখন সূর্য তালগাছের মাথা ছাড়িয়ে খানিকদূর উঠেছে। বনের ধারে একটু খুঁজতেই একটা খোলা জায়গায় জবরনগরের রাজার তাঁবু দেখতে পেল সুজন। রাজা দেশে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হয়েই বসে আছেন। বললেন, 'তোকে একটা ঘোড়ায় তুলে নেবে আমার লোক, তুই তার সঙ্গেই যাবি!'

সুজনকে আগে ভাল ভাল মিঠাই আর ফলমূল খেতে দিয়ে রাজা পাত্রমিত্র সঙ্গে করে রওনা দিলেন জবরনগর। ঘোড়ার পিঠে কোনওদিন চড়েনি সুজন, যদিও ঘোড়ার ডাক তার শেখা আছে। মহা আনন্দে রোদ থাকতে থাকতেই সুজন পৌঁছে গেল জবরনগর।

গাছপালা দালান-কোঠা পুকুর বাগান হাট-বাজারে ভরা এমন বাহারের শহর সুজন কখনও দেখেনি। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করে তার ভারী আশ্চর্য লাগল। সে রাজাকে জিজ্ঞেস করল, 'এত গাছপালা, এত বাগান, তবু একটাও পাখির ডাক নেই কেন?'

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে যে কতবড় দুঃখের কথা সে কী বলব তোকে! ওই যে দূরে পাহাড় দেখছিস, ওই পাহাড়ের নাম আকাশি। ওই পাহাড়ের গুহায় একটা রাক্ষস না খোক্কস না জানোয়ার কী জানি এসে রয়েছে আজ পাঁচ বছর হল। তার খাদ্যই হল পাখি। সে যে কী জাদু করে তা জানি না, পাখিরা সব আপনা থেকে দলে দলে উড়ে গিয়ে তার গুহায় ঢোকে, আর রাক্ষসটা তাদের ধরে ধরে খায়। এখন এই শহরে আর কোনও পাখি বাকি নেই। কেবল একটা হীরামন আছে আমার

মেয়ের খাঁচায়, রাজবাড়ির অন্দরমহলে।'

'কিন্তু তার খাবার ফুরিয়ে গেলে সে রাক্ষস বাঁচবে কী করে?'

'খাবার কি আর সে শুধু আমার শহর থেকে নেয়? পাহাড়ের উত্তরে আছে আজবপুর, পশ্চিমে আছে গোপালগড়—পাখির কি আর অভাব আছে?'

'এই জানোয়ারকে কেউ দেখেনি কখনও?'

'না। সে গুহা থেকে বেরোয় না। আমি নিজে তীর-ধনুক নিয়ে গুহার মুখে অপেক্ষা করেছি, আমার সঙ্গে সশস্ত্র সৈন্য ছিল পঞ্চাশজন। কিন্তু সে দেখা দেয়নি। গুহাটা অনেক গভীর; মশাল নিয়ে তার ভিতরে কিছুদূর গিয়েও তার দেখা পাইনি।'

সুজন এমন অদ্ভুত ঘটনা কখনও শোনেনি। শুধু পাখি খায় এমন রাক্ষসও থাকতে পারে? আর তাকে কোনওমতেই শায়েস্তা করা যায় না, এ তো বড় আজব কথা!

ততক্ষণে রাজার দল প্রাসাদে পৌঁছে গেছে। রাজা বলল, 'প্রাসাদের একতলায় একটা ঘরে তুই থাকবি। কাল সকালে আমার মেয়েকে একবার শোনাবি তোর পাখি আর জানোয়ারের ডাক। আমার মেয়ের নাম শ্রীমতী। তার মতো বিদুষী মেয়ে আর ভূভারতে নেই। সে শাস্ত্র পড়েছে, ব্যাকরণ পড়েছে, ইতিহাস পড়েছে, গণিত পড়েছে, দেশবিদেশের রূপকথা সে জানে, রামায়ণ মহাভারত জানে। সে ঘরেই থেকেছে চিরটা কাল। সূর্যের আলো তার গায়ে লাগতে দিইনি, তার মতো দুধে-আলতায় রঙ আর কোনও মেয়ের নেই।'

সুজন তো শুনে অবাক! মেয়েমানুষের এত বিদ্যেবুদ্ধি? আর সে নিজে যে অবিদ্যের জাহাজ! এই রাজকন্যার সঙ্গে তো কথাই বলা যাবে না।

'এই রাজকন্যারই কি বিয়ে হবে?' সে জিজ্ঞেস করল রাজাকে।

'হ্যাঁ, এরই বিয়ে। আজবপুরের যুবরাজের সঙ্গে। সেও পণ্ডিত ছেলে, অনেক পড়াশুনো করেছে। রূপেগুণে সবদিক দিয়েই ভাল।'

রাজপ্রাসাদে পৌঁছে সুজনকে তার ঘর দেখিয়ে দিল রাজার একজন পরিচারক। রাজামশাই বললেন, 'আজ বিশ্রাম কর, কাল সকালে তোকে এরা নিয়ে আসবে আমার কাছে। তারপর তোর গুণের পরীক্ষা হবে।'

'একটা কথা রাজামশাই।' সুজন ওই পাখিখোর রাক্ষসের কথা তুলতেই পারছিল না।

'কী কথা?'

'আকাশি পাহাড়টা এখান থেকে কতদূরে?'

'চার ক্রোশ পথ। কেন?'

'না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।'

রাজা যে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন সেটা সুজন তার ঘর দেখেই বুঝতে পারল। দিব্যি বড় ঘর, তাতে চমৎকার নকশা করা একটা পালঙ্ক, আর তা ছাড়াও আসবাব রয়েছে কাঠের আর শ্বেতপাথরের। পালঙ্কের বালিশের মতো বাহারের নরম বালিশ সুজন কখনও চোখেই দেখেনি, ব্যবহার করা তো দূরের কথা!

রাত্তিরে খাবারও এল এমন যা সুজন কোনওদিন খায়নি। কত পদ, আর তাদের কী স্বাদ, কী গন্ধ! সবশেষে মিষ্টান্নই এল পাঁচ রকম। এত খাবে সে কী করে?

যতটা পারে তৃপ্তি করে খেয়ে সুজন ভাবতে বসল। সেই রাক্ষসের কথাটাই বারবার মনে পড়ছে তার। পাখির মতো এত সুন্দর জিনিস, আর সেই পাখিই এই রাক্ষস টপ টপ করে গিলে খায়? এমনই তার খিদে যে, শহরের সব পাখি সে শেষ করে ফেলেছে। একবার তার আস্তানাটা দেখে এলে হয় না? সুজনের এখনও ঘুম পায়নি। বাইরে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। পাহাড় কোনদিকে সে তো দেখাই আছে, শুধু গুহাটা কোথায় সেটা খুঁজে বার করা।

সুজন খাট থেকে উঠে পড়ল। তারপর দুগ্গা বলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। তাকে সকলেই চিনে গেছে, কাজেই ফটকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না।

চারিদিকে ফুটফুটে চাঁদের আলো, সুজন তারই মধ্যে সটান চলল আকাশি পাহাড় লক্ষ্য করে। অল্প

কুয়াশায় পাহাড়টাকে মনে হয় ঝাপসা।

নিঝুম শহর দিয়ে দেড় ঘণ্টা হেঁটে সুজন গিয়ে পৌঁছল পাহাড়ের তলায়। চারিদিকে জনমানব নেই, রাতের প্যাঁচাও বোধহয় গেছে রাক্ষসের পেটে।

পাহাড়ের পাশ ধরে হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিকটা পৌঁছতেই সুজন দেখতে পেল মাটি থেকে ত্রিশ-চল্লিশ হাত উপরে একটা অন্ধকার গুহা।

এটাই নিশ্চয় সেই রাক্ষসের গুহা। মানুষও কি এই রাক্ষসের খাদ্য নাকি? আশা করি নয়।

সুজন সাহস করে পাহাড় বেয়ে উঠে গেল।

এই যে গুহার মুখ। পাহাড়ের উলটো দিকে চাঁদ, তাই গুহার ভিতরে মিশকালো অন্ধকার।

সুজনের মনে রাগ থেকে কেমন যেন একটা সাহস এসেছে। পাখিরা তার বন্ধু; আর সেই বন্ধুরা যাচ্ছে এই রাক্ষসের পেটে, তাই এ রাগ।

সুজন অন্ধকার গুহার ভিতরটায় গিয়ে ঢুকল।

দশ পা ভিতরে যেতেই তাকে সেই দশ পা-ই ছিটকে বেরিয়ে আসতে হল।

গুহার ভিতর থেকে একটা ভয়ংকর হুঙ্কার শোনা গেছে। এমন বীভৎস ডাক কোনও জানোয়ারের মুখ দিয়ে বেরোয় না।

এটা রাক্ষস, আর রাক্ষস সুজনকে দেখেছে, আর দেখে মোটেই পছন্দ করেনি।

॥ ৩ ॥

সুজন এই ঘটনার পর আর সময় নষ্ট না করে প্রাসাদে তার ঘরে ফিরে এসেছিল। পরদিন সকালে একজন কর্মচারী এসে তাকে রাজার সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেল। রাজা এখনও সভায় যাননি। আগে তাঁর মেয়েকে শোনাবেন সুজনের পাখি আর জানোয়ারের ডাক, তারপর রাজকার্য। সুজন বুঝল, মেয়ের উপর রাজার কত টান।

এদিকে রাজকন্যা শ্রীমতী কাল রাত্রেই শুনেছে সুজনের কথা—কীভাবে বাঘের ডাক ডেকে সে জঙ্গলে বাঘ আছে প্রমাণ করে দিয়েছিল। শ্রীমতী বেড়াল ছাড়া কোনওদিন কোনও জানোয়ারের ডাক শোনেনি। পাখি যখন ছিল শহরে—আজ থেকে পাঁচ বছর আগে—তখনও সে তার হীরামন ছাড়া কোনও পাখির ডাক শোনেনি। ঘর থেকে সে বাইরেই বেরোত না, শুনবে কী করে? সে যে অসূর্যম্পশ্যা। যে সূর্যকে দেখেনি, তার তো প্রকৃতির সঙ্গে চোখের দেখাই হয়নি। অবিশ্যি বই পড়ে সে অনেক কিছুই জেনেছে, কিন্তু বইয়ে আর কত জানা যায়? চোখে দেখা আর কানে শোনায় যা হয়, শুধু বই পড়ে কি তা হয়? বাংলার পাখির নাম শ্রীমতীর মুখস্থ, কিন্তু সেসব পাখি কেমন ডাক ডাকে, কেমন গান গায়, তা সে কানে শোনেনি কখনও।

সুজন যখন গিয়ে অন্দরমহলের আঙিনায় পৌঁছাল, তখন শ্রীমতী তার ঘর থেকে আরেকটা ঘরে এসে বসেছে। এ-ঘরে একটা খোলা জানলা আছে, তাই দিয়ে আঙিনায় কোনও গান বাজনা হলে তার আওয়াজ শোনা যায়। সেই আঙিনাতেই এই হরবোলা তার কারসাজি দেখাবে।

দেউড়িতে আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই রাজামশাই সুজনকে বললেন, 'কই, শুরু কর এবার তোর খেলা। আমার মেয়ে উপরে বসে আছে, সে শুনতে পাবে।'

কালটা বসন্ত, তাই সুজন পাপিয়া আর দোয়েলের ডাক দিয়ে শুরু করল। মানুষের গলায় এমন আশ্চর্য পাখির ডাক কেউ শোনেনি কখনও। পাঁচ বছর পরে এই প্রথম জবরনগরে পাখির ডাক শোনা গেল।

শুরুতেই রাজকন্যার চোখে জল এসে গেছে। চাপা স্বরে বলল শ্রীমতী, 'আহা কী সুন্দর! পাখি এমন করে ডাকে? আর এই পাখিরা সব গেছে সেই রাক্ষসের পেটে? কী অন্যায়! কী অন্যায়!'

সুজন একটার পর একটা ডাক শুনিয়ে চলল। রাজার বুক গর্বে ভরে উঠল, আর রাজকন্যার প্রাণ ছটফট করতে লাগল। এমন যার ক্ষমতা, তাকে একবার চোখে দেখা যায় না?

ঘরের বাইরে বারান্দা, সে বারান্দা বাহারের কাপড় দিয়ে ঢাকা। সেই কাপড়ের এক পাশ ফাঁক করলে

তবে নীচে দেখা যেতে পারে। রাজকন্যার পাশে তার সখী বসা, তাকে একবার ঘর থেকে সরানো দরকার। 'সুরধুনী, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে, একটু খাবার জল এনে দে', বলল রাজকন্যা।

জল আনতে সেই শোয়ার ঘরে যেতে হবে, তাতে কিছুটা সময় যাবে।

সুরধুনী চলে গেল।

শ্রীমতী এক ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এসে কাপড় ফাঁক করে দেখে নিল সেই ছেলেটিকে। সে এখন ফটিক-জলের ডাক ডাকছে। শ্রীমতীর দেখে বেশ ভাল লাগল ছেলেটিকে; তবে এটা সে বুঝল ছেলেটির পোশাকে যে, সে গরিব।

সুরধুনী জল নিয়ে আসার আগেই শ্রীমতী তার জায়গায় ফিরে এসেছে।

এক ঘণ্টা চলল সুজনের হরবোলার খেলা। এমন খেলা জবরনগরের রাজবাড়িতে কেউ কোনওদিন দেখেনি। আর রাজকন্যা তো এমন সব ডাক শোনেইনি; তার চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ খুলে গেছে—প্রকৃতির জগৎ, যার সঙ্গে এই ষোলো বছরে তার কোনওদিন পরিচয়ই হয়নি। এই গরিব ঘরের ছেলেটি তার জীবনে একটা নতুন প্রাণ এনে দিয়েছে।

এইসব ভাবতে ভাবতেই শ্রীমতীর মনে পড়ল যে, আসছে মাসে তার বিয়ে। যাকে সে বিয়ে করবে, সেই যুবরাজ রণবীর কথা দিয়েছে যে, শ্রীমতীর পড়াশুনার ব্যবস্থা তার বাড়িতেও হবে। আর তার জন্য অন্দরমহলের ভিতরে একটা ঘর রাখবে যাতে সূর্যের আলো কখনও প্রবেশ না করে। আলো লেগে রাজকন্যার রঙ যদি কালো হয়ে যায়!

সুজন কিন্তু রাজকন্যাকে দেখতে পায়নি। রাজা তাকে একটা হাতে আঁকা ছবি দেখিয়ে বলেছেন, 'এই দেখ আমার মেয়ের চেহারা।' ছবি দেখেই সুজনের মনে হয়েছে এ যেন স্বর্গের অপ্সরী। তারপর সুজন যখন শুনল যে, রাজকন্যা তার হরবোলার ডাক শুনে মোহিত হয়ে গেছে, তখন গর্বে তার বুকটা ভরে উঠল। আর তা ছাড়া রাজামশাই ইনামও দিয়েছেন ভাল; একটা হিরের আংটি আর একশত স্বর্ণমুদ্রা। সুজন জানে, এই টাকায় তাদের বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

কেবল একটা কথা ভেবে তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ওই রাক্ষসটাকে যদি শায়েস্তা করা যেত!

॥ ৪ ॥

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। এর মধ্যে সুজন বেশ কয়েকবার কাছাকাছির মধ্যে অন্য শহরে গিয়ে হরবোলার খেলা দেখিয়ে আরও কিছু রোজগার করে নিয়েছে, আর সে রোজগারের প্রায় সবটুকুই সে দেশে গিয়ে তার বাপের হাতে তুলে দিয়েছে। সে বেশ বুঝতে পারছে যে তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। যেটুকু সময় সে রাজবাড়িতে থাকে, তার অনেকটাই সে নতুন নতুন ডাক অভ্যাস করে কাটিয়ে দেয়। এ-কথা সে কখনওই ভুলতে পারে না যে, সামনে বিয়ের সভায় তাকে খেলা দেখাতে হবে, জবরনগরের রাজার সুনাম তাকে রাখতে হবে।

যদিও বিয়ের ধুমধাম শুরু হয়ে গেছে, রাজকন্যা শ্রীমতীর মনের অবস্থা কী তা কেউ জানে না। তার জীবনটা যেমন চাপা, তার মনটাও তেমনই চাপা। তবে এটা ঠিক যে, গত এক মাসে তাকে হাসতে দেখেনি কেউ। সুজন প্রাসাদের নীচের ঘরে পাখির ডাক অভ্যাস করে, তার সামান্য কিছুটা শব্দ ভেসে আসে দোতলায় অন্দরমহলের এই অংশে। সেই ক্ষীণ শব্দ শুনে শ্রীমতীর মনটা দুলে ওঠে। আশ্চর্য গুণ এই যুবকের! না জানি কথাবার্তায় সে কেমন!

এই কৌতূহল এক মাসে চরমে পৌঁছে গেছে। যে এমন সব ডাক ডাকতে পারে, যে এমন সুপুরুষ অথচ সরল, সে লোক কেমন সেটা শ্রীমতীকে জানতে হবেই। সে একদিন সুরধুনীকে কথাটা বলেই ফেলল।

সুরধুনী আজ পাঁচ বছর ধরে শ্রীমতীর সখী। শ্রীমতীকে যে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয় সেটা সুরধুনী পছন্দ করে না। সে শ্রীমতীর কাছে বর্ণনা দেয় সকালের ফুটফুটে রোদে গাছপালা নদনদী মাঠঘাটের।

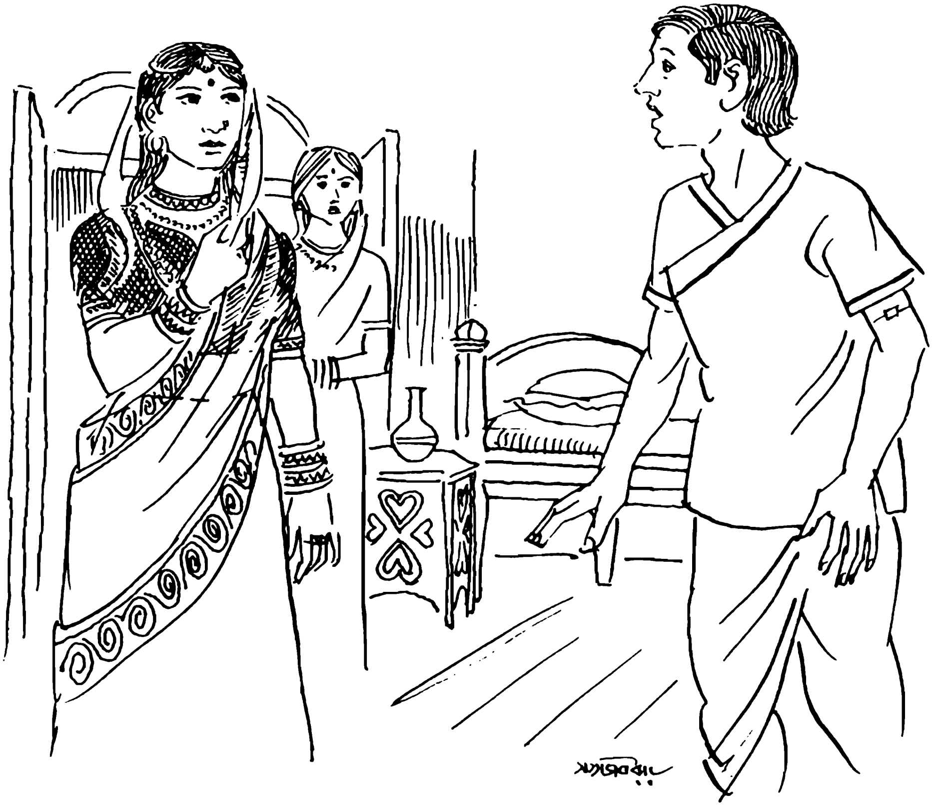

পাখি কেমন জিনিস সে এককালে দেখেছে, সে-কথাও সে বলল।

'তোকে ভাই একটা কাজ করতেই হবে', শ্রীমতী বলল।

'কী কাজ?'

'সেই হরবোলার ঘরে যাবার রাস্তাটা জেনে নিতে হবে।'

সুরধুনী কথা দিল সে জেনে দেবে। আর তারপর সত্যিই একদিন অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে প্রহরীকে শ্রীমতীর কাছ থেকে নেওয়া একটা মোহর ঘুষ দিয়ে সে নীচে এসে দেখে গেল সুজনের ঘর। সুজন তখন বসন্তবৌরীর ডাক অভ্যাস করছে।

সেই রাত্রে সুজন যখন খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় উঠতে যাবে তখন সুরধুনী এল তার ঘরে।

'এ কী!' বলে উঠল সুজন।

সুরধুনী ঠোঁটে আঙুল দিল। তারপর ইশারা করে ঘরে ডেকে নিল শ্রীমতীকে।

'তুমি!' অবাক হয়ে বলল সুজন। 'তোমার ছবি আমি দেখেছি!'

'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম', ধীর কণ্ঠে বলল শ্রীমতী। 'তুমি আমার সামনে নতুন জগৎ খুলে দিয়েছ।'

'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কী কথা বলব? আমার তো বিদ্যে বুদ্ধি নেই। আমি পাঁচের নামতাও বলতে পারি না, আর তুমি শুনেছি অনেক লেখাপড়া করেছ। তাই—'

'তুমি সূর্য দেখেছ?'

'হ্যাঁ। রোজ দেখি। সূর্য যখন ওঠে, তখন আকাশে সিঁদুর লেপে দেয়। আবার যখন ডোবে, তখনও। সূর্য ওঠার আগেই পাখিরা গান শুরু করে। সূর্য ডুবলেই তারা তাদের বাসায় চলে যায়।'

'বসন্তের ফুল দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ। এখনও দেখি। রোজই দেখি। লাল নীল হলদে সাদা বেগুনি—কত রঙ! মৌমাছি এসে মধু খায়, প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় ফুলের ধারে ধারে। কুঁড়ি থেকে ফুল হয়। সে ফুটে আবার ঝরে পড়ে। গাছের পাতায় বসন্তে কচি রঙ ধরে, শীতে সে পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে।'

'একটা কথা ভেবে বড় কষ্ট হয়।'

'কী কথা?'

'পাখিরা এত সুন্দর গান গায়, কিন্তু এখন সেসব পাখি চলে গেছে ওই রাক্ষসের পেটে। তাকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমার কিছুই ভাল লাগছে না।'

'কিন্তু তোমার যে সামনে বিয়ে। এখন ভাল না লাগলে চলবে কী করে? বিয়েতে কত আনন্দ!'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার মুখে পাখির গান শোনার পর থেকে আর আনন্দ নেই। আমি বাবাকে বলেছি।'

'কী বলেছ?'

'যার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে যদি ওই রাক্ষসকে মারতে পারে, তবেই আমি তাকে বিয়ে করব। আমাকে বিয়ে করার শর্তই হবে ওই।'

'সে না মেরে যদি আর কেউ মারে?'

'যে মারবে তাকেই আমি বিয়ে করব। যার শক্তি নেই সে মানুষই নয়।'

'তুমি খুব কঠিন শর্ত করেছ।'

'এ-কথা কেন বলছ?'

'আমি সেই রাক্ষসের গুহায় গিয়েছিলাম। তার এক ডাকে আমি পালিয়ে এসেছি। সে বড় ভয়ানক ডাক।'

'শুনে আমি খুব দুঃখ পেলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি এত বাঘ ভাল্লুকের ডাক ডাকলে, তোমার বুঝি সাহস আছে। যাই হোক, যে এই বিহঙ্গভুক্‌কে মারতে পারবে আমি তাকেই বিয়ে করব।'

'এর নাম বিহঙ্গভুক্ বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমি বইয়ে পড়েছি। বিহঙ্গ মানে পাখি।'

এইখানেই কথার শেষ হল। সুরধুনীর সঙ্গে শ্রীমতী আবার নিজের ঘরে চলে গেল।

॥ ৫ ॥

পরদিন সুজনকে যেতে হল মরকতপুর। সেখানের রাজা হরবোলার ডাকে খুশি হয়ে সুজনকে ভাল বকশিশ দিলেন। সুজন জবরনগরে ফিরে এল। শ্রীমতীর ফরমাশ মতো একবার রোজ তাকে পাখির ডাক শোনাতে হয়, আর রাজা রোজ তাকে বকশিশ দেন।

এদিকে রাজার মনে গভীর চিন্তা। তাঁর মেয়ে বেঁকে বসেছে, যে রাক্ষসকে মারতে পারবে তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। আজবপুরের যুবরাজ রণবীর তাই কালই সকালে আসছে জবরনগর। তাকে একা যেতে হবে আকাশির গুহায়। সে সফল হলে তবেই শ্রীমতীকে বিয়ে করতে পারবে। সাহসী যোদ্ধা হিসেবে রণবীরের নামডাক আছে, তাই জবরনগরের রাজার ভরসা আছে সে হয়তো এই পরীক্ষায় সফল হবে।

এদিকে সুজন মনে মনে ভাবছে—যা ডাক শুনেছি রাক্ষসের, সে তো কোনওদিন ভুলতে পারব না। এমন যার ডাক, তার চেহারা না জানি কেমন, আর শরীরের শক্তিই বা না জানি কেমন! আজবপুরের রাজকুমার কি পারবে মারতে এই রাক্ষসকে?

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার কিছু পরেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে আজবপুরের যুবরাজ জবরনগর এসে হাজির হল। তার গায়ে বর্ম, কোমরে তলোয়ার, পিঠে তূণ, হাতে ধনুক। তাছাড়া ঘোড়ার পাশে খাপের মধ্যে ঢোকানো রয়েছে একটা বল্লম।

এ ছাড়া রাজকুমারের সঙ্গে ছিল দুই জন অশ্বারোহী, যারা জালে করে শ্মশান থেকে ধরে এনেছিল তিনটে শকুনি। জাল সমেত এই শকুনিগুলোকে ফেলা হবে গুহার মুখে, তা হলেই রাক্ষস বেরোবে— এই ছিল তাদের মতলব।

জবরনগরের বেশ কিছু লোকও গুহার উলটোদিকে সমতল ভূমিতে জড়ো হয়েছিল এই যুদ্ধ দেখার জন্য। জবরনগরের রাজা নিজে না এলেও, দূত পাঠিয়েছিলেন সংগ্রামের ফলাফল জানার জন্য।

যুবরাজ রণবীর এখন তৈরি। এইবার তার দু'জন সহচর জালসমেত শকুনিগুলিকে গুহার সামনে

ফেলে শিঙায় ফুঁ দিয়ে জানিয়ে দিল যে, তারা উপস্থিত। তারপর তারা দু'জন সরে গেল, শুধু ঘোড়ার পিঠে রইল রণবীর।

দর্শকের ভিড়ের মধ্যে যারা ছিল তাদের একজনের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। সে হল সুজন হরবোলা। খবর পেয়ে সে সবার আগেই গিয়ে হাজির হয়েছে গুহার সামনে। কিন্তু কেন সে জানে না, তার মন বলছে যুবরাজ সফল না হলেই ভাল।

কিন্তু কই? রাক্ষস বার হয় না কেন? তার জন্য এমন টোপ ফেলা হয়েছে, তবুও কেন সে গুহার মধ্যে বসে?

এদিকে যুবরাজের ঘোড়া অস্থির হয়ে ছটফটানি শুরু করেছে। এবার যুবরাজ সাহস করে গুহার দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিঙাও বেজে উঠল তিনবার, আর তার পরেই সকলের রক্ত হিম করে দিয়ে শোনা গেল এক বিকট হুঙ্কার, যার ফলে যুবরাজের ঘোড়া সামনের পা দুটো আকাশে তুলে যুবরাজকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে উলটোমুখে দিল ছুট। তখন যুবরাজকেও ছুটতে হল ঘোড়ার পিছনে। বোঝাই গেল সে রাক্ষসের কাছে হার স্বীকার করেছে; যার এমন গর্জন তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস যুবরাজের নেই।

ভিড় করে যারা এসেছিল তারাও যে যেদিকে পারে চম্পট দিল। কেবল একজন—সুজন হরবোলা—মুখ গম্ভীর করে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর ধীরপদে ফিরতি পথ ধরল।

রণবীরের পর আরও সাতটি দেশের সাতটি যুবরাজ বিহঙ্গভুক্‌কে মারতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তার ডাক শুনে পালিয়ে বাঁচল, আর সেইসঙ্গে রাজকন্যার বিয়েও পিছিয়ে যেতে লাগল, রাজার কপালেও দুশ্চিন্তার রেখা দিনে দিনে বাড়তে লাগল।

এই আটজন যুবরাজের শোচনীয় অবস্থা সুজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে; দানবের হুঙ্কারে শুধু ঘোড়ার নয়, ঘোড়সওয়ারের মনেও যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে সেটা সুজন নিজের চোখে দেখেছে।

এই আটজন হার মানার ফলে আর কোনও দেশের কোনও রাজপুত্র সাহস করে জবরনগরের এই দানব সংহারে এগোতে পারল না।

ন' দিনের দিন সকালবেলা রাজা মন্দির থেকে পুজো সেরে যেই বেরিয়েছেন অমনই দেখলেন সুজন হরবোলা তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। রাজার মন খুব খারাপ, তাই গম্ভীর ভাবেই বললেন, 'কী সুজন, তোর আবার কী প্রয়োজন?'

সুজন বলল, 'মহারাজ, আমাকে একটা বল্লম দিতে পারেন?'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, কী হবে বল্লম দিয়ে?'

'আমি বিহঙ্গভুক্‌কে মারার একটা চেষ্টা দেখব।'

'তোর কি মতিভ্রম হল নাকি?'

'একবার দেখিই না চেষ্টা করে, মহারাজ! সে যখন প্রাণী, তখন তার প্রাণ আছে, আর প্রাণ যদি থাকে তা হলে তার কলিজা আছে। সেই কলিজায় যদি বল্লমটা গেঁথে দিতে পারি তো সে নির্ঘাত মরবে।'

'কিন্তু সে তো গুহা থেকে বারই হয় না!'

'ধরুন, যদি আজ বেরোয়! তার মতিগতি তো কেউ জানে না।'

রাজা একটু ভাবলেন সুজনের দিকে চেয়ে। তার স্বাস্থ্যটা যে ভাল, শরীরে যে শক্তি থাকার সম্ভাবনা, সেটা তাকে দেখলে বোঝা যায়।

অবশেষে রাজা বললেন, 'ঠিক আছে, বল্লমের অভাব নেই। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোর হাবভাবে মনে হয় তুই এ কাজটা না করে ছাড়বি না।'

বল্লম জোগাড় হল অল্পক্ষণের মধ্যেই। এবার সুজন ঘোড়াশাল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে বল্লম হাতে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আকাশির দিকে রওনা দিল।

এদিকে রাজার সুজনের উপর একটা মমতা পড়ে গেছে; ছেলেটার কী হয় দেখবার জন্য তিনিও ব্যস্ত হয়ে একটা ঘোড়ায় চড়ে চললেন পাহাড়ের দিকে।

সুজন গুহার সামনে পৌঁছনোর আগেই ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল। সে জানে সে যদি ঘোড়ার পিঠে

থাকে তা হলে ঘোড়া ভয় পেয়ে ছুট দিলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে পালাতে হবে।

গুহার ভিতরে দিনের বেলা রাতের মতো অন্ধকার, কারণ গুহাটা উত্তরমুখী।

ইতিমধ্যে রাজাও পৌঁছে গেছেন; তিনি একটু দূর থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপেই ঘটনাটা দেখবেন। আজ লোকের ভিড় নেই, কারণ শহরে ঢ্যাঁড়া পড়ে গেছে যে আর কোনও রাজপুত্র রাক্ষসকে মারতে আসবে না।

সুজন হাতে বল্লম নিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল গুহার দিকে। চারিদিক নিস্তব্ধ। পাখি নেই, তাই এই অবস্থা, না হলে সকালে পাখি না ডেকে পারে না।

এবার সুজন ঠাকুরের নাম জপ করে একবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিরাট একটা দম নিয়ে সেই দম ছাড়ার সময় তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই ন'দিনে শেখা একটা ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ল। এই ডাকে রাজার ঘোড়া ভড়কে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু রাজা কোনও মতে তাকে সামলালেন।

এইবার এল সেই হুঙ্কারের জবাব—আর সেইসঙ্গে গুহা থেকে এক লাফে বাইরে রোদে এসে পড়ল যে প্রাণীটা, সেটা মানুষ না রাক্ষস না জানোয়ার, তা কেউই সঠিক বলতে পারবে না। বরং বলা চলে তিনে মিশে এক কিম্ভূতকিমাকার প্রাণী, যাকে দেখলে মানুষের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়।

সুজন হরবোলা কিন্তু আর কিচ্ছু দেখল না, দেখল শুধু প্রাণীটার যেখানে কলিজাটা থাকার কথা সেই জায়গাটা। সেটার দিকে তাগ করে সে প্রাণপণে চালিয়ে দিল তার হাতের বল্লমটা। তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হয়ে চোখ খুলে সুজন প্রথমেই দেখতে পেল সেই মুখটা, যেটা আঁকা ছবিতে দেখে তার মনটা নেচে উঠেছিল।

শ্রীমতীর পাশেই রাজা দাঁড়িয়ে; বললেন: 'রাক্ষস মরেছে, তাই তোমার হাতেই দিলাম আমার মেয়েকে। আজ থেকে সাতদিন পরে বিয়ের লগ্ন। তোমার বাপ-মাকে খবর দিতে লোক যাবে ক্ষীরা গ্রামে। তারাও এখানেই থাকবে বিয়ের পর, আর তুমিও থাকবে।'

'আর আমার লেখাপড়া?'

শ্রীমতী হেসে বলল, 'আমি বলেছি সে ভার আমার। পাঁচের নামতা দিয়ে শুরু—বিয়ের পরদিন থেকেই। আর যদ্দিন না দেশে পাখি আসছে তদ্দিন তুমি আমাকে পাখির ডাক শোনাবে।'

'তা হলে একটা কথা বলি?'

'বলো।'

'তুমি আর ঘরের মধ্যে বন্দি থেকো না।'

'না, আর কোনওদিন না।'

'আর তোমার হীরামনটাকে ছেড়ে দাও। খাঁচায় পাখি রাখতে নেই। ওরা আকাশে উড়তে পারে না; ওদের বড় কষ্ট হয়।'

শ্রীমতী মাথা নেড়ে বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৯৩

নিতাই ও মহাপুরুষ

কোনও এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলে গেছেন যে মানুষের মধ্যে বেশিরভাগই মাঝারি দলে পড়ে। কথাটা হয়তো সত্যি, কিন্তু নিতাইকে মাঝারিও বলা চলে না। অনেক ব্যাপারেই সে অত্যন্ত খাটো। দেহের দিক দিয়ে যেমন, মনের দিক দিয়েও ছেলেবেলা থেকে সে খাটোই রয়ে গেছে। তার বয়স সবে আটত্রিশ পেরোল। সে ব্যাঙ্কে যে কেরানির চাকরিটা করে সেটাও অবশ্যই খাটো। মাসে যা আয় হয় তাতে বউ আর একটি তেরো বছরের ছেলে নিয়ে কোনওমতে টেনেটুনে সংসার চলে। তাও ভাগ্যি যে মেয়ে নেই; থাকলে তার বিয়ে দিতে নিতাই ফতুর হয়ে যেত। বউ-এর গঞ্জনা তাকে সইতে হয় সর্বক্ষণই সেটা বলাই বাহুল্য, কারণ সৌদামিনী বেশ দজ্জাল মহিলা। তাই বাড়িতে যেমন নিতাই সদা তটস্থ, আপিসেও বড়বাবু, মেজোবাবু সেজোবাবু সকলের চোখরাঙানি তাকে সহ্য করতে হয়। জীবনে এমন কোনও কাজ যদি সে করত যাতে তার গর্ব হয়, যাতে পাঁচজনে তার সুখ্যাতি করে, তা হলে কী ভালই না হত! কিন্তু তেমন কপাল করে নিতাই আসেনি। তার ধারণা, সে ঈশ্বরের দায়সারা সৃষ্টির মধ্যে একজন! তাকে গড়ার সময় বিধাতা ছিলেন অন্যমনস্ক, তাই সে জীবনে কিছু করতে পারল না।

যাদের উপর ঈশ্বরের সুনজর পড়ে তারা কেমন মানুষ হয়? তার একটা উদারণ নিতাই দিতে পারে এখনই! দু'দিন হল কলকাতায় একটি সাধুবাবা এসেছেন—জীবানন্দ মহারাজ—যাঁর শিষ্য-শিষ্যার নাকি ইয়ত্তা নেই, যিনি বাগ্মী, যিনি সুকণ্ঠ, যাঁর গীতার ব্যাখ্যা শুনে লোকে মোহিত হয়ে যায়, যাঁর চরণস্পর্শ করতে পারলে লোকে কৃতার্থ বোধ করে। ঈশ্বরের এক ধাপ নীচেই তাঁর স্থান। জীবানন্দ মহারাজ। হ্যারিংটন স্ট্রিটের এক ভক্তের বাড়িতে এসে উঠেছেন কেষ্টনগর থেকে, শহরে তাঁকে নিয়ে হইচই পড়ে গেছে, কাগজের প্রথম পাতায় তাঁর ছবি, এমন জাঁদরেল মহাপুরুষ নাকি বহুকাল দেখা যায়নি।

নিতাই আর তার স্ত্রী দু'জনেরই ইচ্ছা এঁর দর্শন পেতে, কিন্তু যা শোনা যাচ্ছে, ভিড়ের চোটে সাধারণ লোকের পক্ষে এঁর নাগাল পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। যে বাড়িতে এসে তিনি উঠেছেন, সে বাড়ির মাঠে শামিনায়া খাটানো হয়েছে! বাবাজি সকাল-সন্ধ্যা গিয়ে বেদিতে বসেন, ভক্তসমাগম হয়, বাবাজি নানারকম আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে জ্ঞানী জ্ঞানী কথা বলেন। ভক্তদের মধ্যে যাঁরা খুব ভাগ্যবান তাঁরা সামনের দিকে বসেন, বাবার মর্জি হলে তাঁদের আলাদা করে ডেকে এনে কথা বলেন, তাতে ভক্তদের ভক্তি বেড়ে যায় দ্বিগুণ।

নিতাই যে কোনওদিন এ আসরে প্রবেশ করতে পারবে, আর প্রথম সারিতে বসবার সুযোগ পাবে, সেটা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সে সুযোগ এসে গেল রসিকলালের কল্যাণে। রসিকলাল বোস নিতাইয়ের ভায়রা ভাই। সে বড় কোম্পানিতে বড় চাকরি করে, তবে তার জন্য তার কোনও দম্ভ নেই। সে নিতাইয়ের বাড়িতে মাসে অন্তত তিনবার করে আসে, এবং খোলা মনে নানারকম গালগল্প করে। সাধু সন্ন্যাসী সম্পর্কে তার একটা আগ্রহ আগে থেকেই ছিল, এবং সে প্রথম সুযোগেই জীবানন্দ বাবাজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর প্রথম শ্রেণীর চেলাদের মধ্যে একজন হয়ে গেছে। রসিকলালই এক শনিবার নিতাইয়ের বাড়িতে এসে বলল, 'একজন খাঁটি মহাপুরুষ দেখতে চাও তো চলে এসো আমার সঙ্গে।'

'কার কথা বলছ?' নিতাই প্রশ্ন করল।

'কার কথা আবার?—একজনই তো আছেন। হ্যারিংটন স্ট্রিটে ডেরা বেঁধেছেন। চোখের জ্যোতি দেখে বোঝা যায় পৌরাণিক যুগে সাধু সন্ন্যাসীরা কেমন ছিলেন। তাঁর দর্শন না পাওয়াটা জীবনে একটা খুব বড় লস্।'

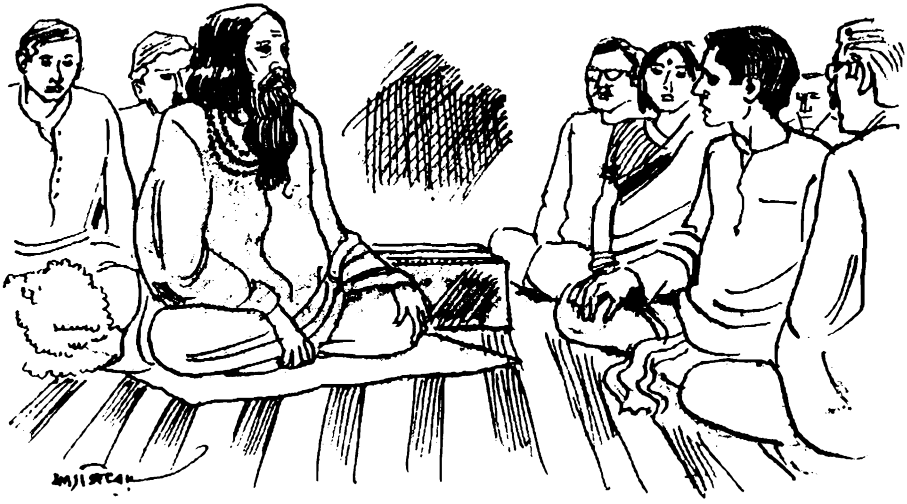

'কিন্তু তাঁর একশো হাতের মধ্যে তো যাওয়াই যায় না বলে শুনেছি।'

'সবাই পারে না যেতে, কিন্তু আমি কী কপাল করে এসেছি জানি না—আমার স্থান একেবারে প্রথম সারিতে। আমার উপর বাবার একটা টান পড়ে গেছে। কথা যখন বলেন তখন বেশিরভাগটাই আমার দিকে চেয়ে বলেন। শুনে গায়ে কাঁটা দেয় বারবার। যাবে তো বলো।'

'সে আর বলতে! এমন সুযোগ আসবে সে তো ভাবতেই পারিনি।'

'হিমালয়ে পঁচিশ বছর তপস্যা করেছেন গঙ্গোত্রীর ধারে। দেখলে আর বলে দিতে হয় না যে ইনি একজন খাঁটি সিদ্ধপুরুষ।'

দিন ঠিক হয়ে গেল। আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রসিকলাল আসবে নিতাই আর তার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে।

'সামনে বসতে পারব তো?'

রসিকলালের কথায় যেন পুরোপুরি ভরসা হচ্ছিল না নিতাইয়ের।

'না পারলে আমার নাম নেই', জোরের সঙ্গে বলল রসিকলাল। 'ভাল কথা, একটু আতর মেখে যেও! বাবাজি আতরের খুব ভক্ত।'

আশ্বিন মাস, তাই ছ'টা থেকেই অন্ধকার হয়ে গেছে। হ্যারিংটন স্ট্রিটে ব্যারিস্টার যতীশ সেনগুপ্তের বাড়ির মাঠে শামিয়ানার নীচে ফ্লুয়োরেসেন্ট লাইটের ব্যবস্থা, তাই বাবাকে দেখতে কারুর অসুবিধা হয় না। সুবেশী নারীপুরুষের ভিড় দেখে প্রথমে নিতাই হকচকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রসিকলাল তাদের সটান নিয়ে গেল একেবারে সামনের সারিতে। রসিকলাল পৌঁছিয়েই প্রথমে সাড়ম্বরে বাবাজির পদধূলি নিল, আর তার দেখাদেখি নিতাই আর তার স্ত্রীকেও নিতে হল। তারপর মাটিতে বসে নিতাই প্রথম বাবাজির দিকে ভাল করে চাইল।

সৌম্য চেহারা তাতে সন্দেহ নেই। আবক্ষ দাড়ি, মাথায় কাঁচা-পাকা মেশানো ঢেউ খেলানো চুল কাঁধ অবধি নেমে এসেছে, পরনে গেরুয়া সিল্কের আলখাল্লা, গলায় তিনটে বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা। বাবার দু'পাশে বেলফুলের মালা স্তূপ করে রাখা রয়েছে, বোঝাই যায় সুগন্ধের জন্য ভক্তরা সেগুলো বাবাকে দিয়েছেন। নিতাই নিজে কোনও গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করেনি, কারণ ও জিনিসটা তার বাড়িতেই নেই। কিন্তু আতর ও অন্যান্য সেন্টের গন্ধ সে চারদিক থেকেই পাচ্ছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ধূপের গন্ধ। সব মিলিয়ে বেশ একটা নেশা-ধরানো ভাব।

বাবা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার মুখ খুলে গীতার একটি শ্লোক আউড়িয়ে তার ব্যাখ্যা শুরু

করলেন।

নিতাইয়ের দৃষ্টি সম্পূর্ণ বাবার উপরে নিবদ্ধ। তার একটা কারণ আছে। একটা নয়, দুটো। এক হল বাবার চোখ। তিনি হলেন যাকে বলে লক্ষ্মীট্যারা। আর দুই হল—বাবার বাঁ গালে চোখের নীচে একটা বেশ বড় আঁচিল।

এই দুইয়ে মিলে নিতাইকে হঠাৎ যেন কেমন অন্যমনস্ক করে দিল। ওই আঁচিল আর ওই লক্ষ্মীট্যারা চোখ।

এবারে আরও ভাল করে খুঁটিয়ে বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখল নিতাই, আর একাগ্রভাবে শুনতে লাগল বাবার কথা। দিব্যি গড়গড় করে ব্যাখ্যা করে চলেছেন। সুললিত কণ্ঠস্বর, মনে হয় ইনি গানও ভাল করবেন। তার সাক্ষ্য দিচ্ছে বাবারই একপাশে রাখা হারমোনিয়াম আর খোল।

হঠাৎ একটা কথায় বাবা যেন একটু তোৎলে গেলেন। একবার মাত্র একটা সামান্য হোঁচট. কিন্তু তাতেই নিতাইয়ের মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আর সেই সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হল একটা নাম—

'ছেনো!'

নামটা বাবার গলার চেয়ে এক ধাপ উপরে হওয়াতে সভার মধ্যে দিয়ে একটা বিস্ময় আর বিরক্তি মেশানো চমকের স্রোত বয়ে গেল। এই বেয়াদব বেআক্কেল বেল্লিকটি কে, যে বাবার ব্যাখ্যার সময় এভাবে চেঁচিয়ে ওঠে?

রসিকলালও অবিশ্যি আর সকলের মতোই হতভম্ব। ভায়রা ভাইয়ের মাথাখারাপ হয়ে গেল নাকি? ছেনো? ছেনো আবার কী?

কথাটা বলেই অবিশ্যি নিতাই একদম চুপ মেরে গেছে। আর সেইসঙ্গে মুহূর্তের জন্য বাবাজির মুখ বন্ধ হয়ে তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে এই অর্বাচীন অপরাধীটির দিকে।

এর পরে যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্য নিতাই প্রস্তুত ছিল না, যদিও থাকা উচিত ছিল। বাবাজির দুই পাশে বসা তার দুই প্রধান চেলা উঠে এসে নিতাইকে বললেন, 'আপনাকে বাইরে যেতে হবে। বাবাজির হুকুম। উনি ব্যাঘাত বরদাস্ত করেন না।'

নিতাই সস্ত্রীক উঠে পড়ল, আর সেইসঙ্গে রসিকলালকেও উঠতে হল।

গেটের বাইরে এসে রসিকলাল নিতাইকে বলল, 'কী ব্যাপার বলো তো? তোমার কি ভীমরতি ধরল নাকি? এত সুযোগ দিলাম, তারপর এইরকম একটা কেলেঙ্কারি করে বসলে?'

নিতাই বলল, 'কিন্তু ও যে সত্যি ছেনো! ওর ভাল নাম শ্রীনাথ। ও কাটোয়াতে আমাদের ইস্কুলে আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত।'

সব কথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা গেল না। রসিকলাল নিতাইয়ের সঙ্গে নীলমণি আচার্য লেনে তাদের বাড়িতে আবার ফিরে এল। সেখানে তক্তপোশে বসে নিতাই পুরো ঘটনাটা বলল।

ওই শ্রীনাথ ওরফে ছেনো ইস্কুলের নামকরা শয়তান ছেলে। তিনবার পর পর প্রোমোশন না পেয়ে অবশেষে নিতাইয়ের সহপাঠী হয়। সে-ও লক্ষ্মীট্যারা, তারও ছিল বাঁ চোখের নীচে আঁচিল, সে-ও কথা বলার সময় হঠাৎ হঠাৎ তোৎলে যেত। তবে তার চেহারাটা ছিল ভাল, ভাল গান গাইত আর ভাল অ্যাকটিং করতে পারত। এই শেষের দুই গুণের জন্য সে ইস্কুলে টিকে ছিল, নইলে তাকে অনেকদিন আগেই রাস্টিকেট করা হত।

সেই ছেনোই আজ হয়ে গেছে জীবানন্দ বাবাজি, যাঁর শিষ্য সংখ্যাতীত, যাঁর তত্ত্বকথা শোনার জন্য লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, যাঁর দর্শন পেলে লোকের জন্ম সার্থক হয়ে যায়।

রসিকলাল সব শুনে বলল, 'তোমার ছেনো ইস্কুলে যাই করে থাকুক না কেন, সব মানুষের জীবনেই পরিবর্তন আসতে পারে। আজ যে সে সিদ্ধপুরুষ তাতে কোনও ডাউট নেই। কাজেই তুমি তোমার ছেলেবেলার কথা ভুলে যাও। কালই চলো বাবার কাছে ক্ষমা চাইবে। বাবার দয়া অশেষ; তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।'

নিতাইয়ের মন কিন্তু অন্য কথা বলছে। আজ এতদিন পরে তার মনে পড়ে গেছে ইস্কুলের কথা। ছেনো তাকে ভালমানুষ পেয়ে নানারকম ভাবে অপদস্থ করত। কতরকম ভাবে যে সে নাজেহাল হয়েছে ওই ছেনোর হাতে, সেটা কি সে ভুলতে পারে? ইস্কুলে কোনওদিন তার সঙ্গে পেরে ওঠেনি নিতাই,

কারণ ছেনো ছিল অত্যন্ত ধূর্ত। আর সেই ছেনো আজ...

নিতাই আর ভাবতে পারল না। আজকে আসরে 'ছেনো' বলে চেঁচিয়ে ওঠাটা অন্যায় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিতাইয়ের পক্ষে নিজেকে সামলানো সম্ভব ছিল না। সব অবস্থায় সামলে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আজকের অবস্থাটা ছিল সেইরকম একটা অবস্থা।

ছেনোর কাছে নিতাই ক্ষমা চাইবে কী করে? সেটা সম্ভব নয়।

পরদিন ছিল বুধবার। নিতাইয়ের আপিস দশটায়; সে বাড়ি থেকে বেরোয় সাড়ে ন'টায়। সকাল সাতটায় চা খেয়ে সবে সে কাগজটা খুলেছে এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। রাস্তার উপরেই ঘর, দরজা খুলে নিতাই দেখল একটি চশমা পরা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। বেশ স্মার্ট চেহারা, বয়স বেশি নয়।

'আপনি—?' প্রশ্ন করল নিতাই।

'আমি দৈনিক বার্তা কাগজ থেকে আসছি', বললেন ভদ্রলোক। 'আমার নাম দেবাশিস সান্যাল। আমি একজন সাংবাদিক। গতকাল সন্ধ্যায় জীবানন্দ বাবার আসরে আমি উপস্থিত ছিলাম। কালকের পুরো ঘটনাটা আমি দেখি। তারপর আপনাদের ধাওয়া করে এসে আমি আপনাদের বাড়িটা দেখে যাই।'

'কিন্তু আজ আসার কারণটা—?'

'আমি জানতে চাই আপনি ওভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন কেন, এবং তার ফলে আপনাকে ওখান থেকে সরানো হল কেন? আপনি যা বলবেন সেটা আমি রেকর্ড করে নেব। আমাদের ইচ্ছা, এই নিয়ে একটা খবর বার করা।'

নিতাই অনুভব করল যে, সে হঠাৎ সাংঘাতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েছে। তার মতো নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। সে এই সাংবাদিককে আসল ঘটনা সব খুলে বলে দিয়ে জীবানন্দ বাবাজির মুখোশ খুলে দিতে পারে। সেইসঙ্গে তাঁর ভক্তদের মধ্যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারে।

এটাই কি তার কর্তব্য? এই ভণ্ড সাধুর মুখোশ খুলে দেওয়া, সেই ইস্কুলের ছেলের বাঁদরামির কথা প্রকাশ করে?

কিন্তু পরক্ষণেই নিতাই বুঝতে পারল যে, যে করেই হোক, ছেনো আজ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলে তাকে হিংসে করেই নিতাই সব ব্যাপারটা ফাঁস করে দিতে চাইছে। শুধু তাই না; ছেনোর হাতে যে নিতাই বারবার নাজেহাল হয়েছিল সেটা নিতাই আজ অবধি ভুলতে পারেনি। তাই এখানে একটা প্রতিহিংসার প্রশ্নও আসছে।

নিতাই বুঝল যে, এ কাজটার মধ্যে খুব একটা বাহাদুরির ব্যাপার নেই। নিজে আধ-পেটা খাচ্ছে বলে পরের ভাত মারার ব্যাপারটা কীরকম প্রবৃত্তি? সে নিজে সৎ থেকেছে ঠিকই, কিন্তু বয়সের সঙ্গে যে ছেনোর মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আসেনি সেটা জোর দিয়ে কে বলবে? মানুষের মন কখন কোনদিকে কীভাবে চলে সেটা বোঝা বড় শক্ত। ছেনোর যদি সত্যিই সংস্কার হয়ে থাকে?

সাংবাদিক উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছেন নিতাইয়ের দিকে।

নিতাই বলল, 'কালকের ঘটনাটি সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। এটা কাগজে ছাপানোর উপযুক্ত খবর নয়।'

'আপনি কিছুই বলবেন না?' হতাশার সুরে প্রশ্ন করলেন সাংবাদিক।

'আজ্ঞে না, কিছুই না।'

বলাই বাহুল্য, পরের দিন দৈনিক বার্তা কাগজে এ বিষয়ে কিছুই বেরোলো না। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, জীবানন্দ বাবাজি কলকাতায় এসেছিলেন পনেরো দিনের জন্য, তিনি হঠাৎ এই ঘটনার পরদিনই—অর্থাৎ সাতদিনের মাথায়—তাঁর ভক্তদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, একটা জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে তাঁকে পাটনা চলে যেতে হচ্ছে।

এই ঘটনার পর দু' বছর কেটে গেছে। বাবাজি কিন্তু আর কলকাতামুখো হননি।

সন্দেশ, আষাঢ় ১৩৯৩

মহারাজা তারিণীখুড়ো

'আজ আপনার কপালে ভ্রূকুটি কেন খুড়ো?' জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা। এটা অবিশ্যি আমিও লক্ষ করেছিলাম। খুড়ো তক্তপোশের উপর বাবু হয়ে বসে ডান হাতটা পায়ের পাতায় রেখে অল্প অল্প দুলছেন, তাঁর কপালে ভাঁজ।

খুড়ো বললেন, 'এই বাদলার সন্ধ্যায় গরম চা যতক্ষণ না পেটে পড়ছে ততক্ষণ ভ্রূকুটি থাকতে বাধ্য।'

খুড়ো আসার সঙ্গে সঙ্গেই চা অর্ডার দেওয়া হয়েছে, বেশি দেরিও হয়নি, তাও আমি আর একবার চাকরের নাম ধরে হাঁক দিলাম।

'আপনার গল্প ফাঁদা হয়ে গেছে?' ন্যাপলা জিজ্ঞেস করল। সত্যি, ওর সাহসের অন্ত নেই!

'গল্প আমি ফাঁদি না', দাঁত খিঁচিয়ে বললেন খুড়ো। 'আমার অভিজ্ঞতার স্টক অঢেল। সে ফুরোতে-ফুরোতে তোদের গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে যাবে।'

চা এল। খুড়ো একটা সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন, 'এক দিন কা সুলতানের গল্প তোরা হয়তো শুনেছিস। সেটা ঘটেছিল হুমায়ুনের যুগে। সেরকম আমাকে পাঁচদিনের মহারাজা হতে হয়েছিল একটা নেটিভ স্টেটে, সে গল্প তোদের বলেছি কি?'

আমরা সকলে একসঙ্গে না বলে উঠলাম।

'আপনাকে সিংহাসনে বসতে হয়েছিল?' ন্যাপলা জিজ্ঞেস করল।

'আজ্ঞে না', বললেন খুড়ো। 'নাইনটিন সিক্সটি ফো'রের ঘটনা। তখন রাজারা আর সিংহাসনে বসে না; ভারত অনেকদিন হল স্বাধীন হয়ে গেছে। তবে রাজা গুলাব সিং-এর তখনও খুব খাতির। রাজ্যের সব লোকেরা তাঁকে মহারাজ বলে সম্বোধন করে। যাকগে—গল্পটা বলি শোন্।'

খুড়ো কাপে আর-একটা চুমুক দিয়ে তাঁর গল্প শুরু করলেন :

আমি তখন ব্যাঙ্গালোরে। মাদ্রাজে দু' বছর একটা হোটেলের ম্যানেজারি করে আবার ভবঘুরে। সেই সময় একদিন খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। অদ্ভুত বিজ্ঞাপন; ঠিক তেমনটি আর কখনও চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না। বিজ্ঞাপনের মাথায় একজন লোকের ছবি। তার নীচে বড় হরফে লেখা '১০,০০০ টাকা পুরস্কার!' তারপর ছোট হরফে লিখছে যে, ছবির চেহারার সঙ্গে আদল আছে এমন লোক যদি কেউ থাকে, সে যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় অ্যাপ্লাই করে তার নিজের ছবি সমেত। যাদের চেহারা মিলবে তাদের ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। ঠিকানা হল—ভার্গব রাও, দেওয়ান, মন্দোর স্টেট, মাইসোর। মন্দোর নামে যে একটা নেটিভ স্টেট আছে সেটা টক্ করে মনে পড়ে গেল। কিন্তু বিজ্ঞাপনে যাঁর ছবি রয়েছে তিনি যে কে সেটা বুঝতে পারলুম না। নাইবা বুঝি; এটুকু বুঝি যে, এই চেহারার সঙ্গে আমার নিজের চেহারার বিলক্ষণ মিল। আমি যদি আমার গোঁফটাকে একটু সরু করে ছাঁটি তা হলে দুই চেহারায় তফাত করা মুশকিল হবে।

গোঁফ ছেঁটে ভিক্টোরিয়া ফোটো স্টোর্সে গিয়ে একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি তুলিয়ে অ্যাপ্লাই করে দিলুম। দশ হাজার টাকার লোভ সামলানো কি সহজ কথা?

সাতদিনের মধ্যে উত্তর এসেছিল। ইন্টারভিউ-এর জন্য ডাক পড়েছে। যাতায়াতের খরচ বিজ্ঞাপনদাতারাই দেবেন, বোর্ড অ্যান্ড লজিংও তাঁদের দায়িত্ব, আমি যেন অবিলম্বে মন্দোর রওনা দিই। এও বলা ছিল চিঠিতে যে, আমি যেন সঙ্গে দিন দশেকের মতো জামাকাপড় নিয়ে নিই।

পরের দিনই একটা টেলিগ্রাম ছেড়ে দিয়ে রওনা দিয়ে দিলুম। হুবলি ছাড়িয়ে দুটো স্টেশন পরেই মন্দোর, আমার জন্য স্টেশনে লোক থাকার কথা। অনেকখানি রাস্তা, ভাবতে ভাবতে গেলুম এ

বিজ্ঞাপনের কী মানে হতে পারে। যে ভদ্রলোকের ছবিটা দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞাপনে তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশের লোক তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর জোড়া কেন দরকার হবে তা আমার মাথায় ঢুকল না।

মন্দোর স্টেশনে সুটকেস নিয়ে নেমে এদিক-ওদিক দেখছি, এমন সময় এক বছর ষাটেকের ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন্।

'ইউ আর মিস্টার ব্যানার্জি?' আমার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। তিনি যে রীতিমতো অবাক হয়েছেন সেটা আর বলে দিতে হয় না।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আমিই মিস্টার ব্যানার্জি।'

'আমার নাম ভার্গব রাও', বললেন ভদ্রলোক। 'আমি মন্দোরের দেওয়ান। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে আপনার মতো একজন ক্যানডিডেট পেয়েছি।'

'কীসের ক্যানডিডেট?'

'আগে গাড়িতে উঠুন। পথে যেতে যেতে সব কথা হবে। আমাদের এখন রাজবাড়ি যেতে হবে, এখান থেকে সাত কিলোমিটার। পথে আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব বলে বিশ্বাস করি।'

একটা পুরনো মডেলের সুপ্রশস্ত আর্মস্ট্রং সিডনি গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। দেওয়ান সাহেব পিছনে আমার পাশেই বসলেন। জানলা দিয়ে দেখছি দূরে পাহাড়ের লাইন—ভারী মনোরম দৃশ্য।

গাড়ি রওনা হবার পর দেওয়ান রহস্য উদ্ঘাটন করতে শুরু করলেন।

'মিস্টার ব্যানার্জি, আমাদের এখানে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটায় একটা জটিল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। আমাদের মহারাজা গুলাব সিং-এর হঠাৎ মস্তিষ্কের বিকার দেখা দিয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলেছে, মাইসোর থেকে বড় ডাক্তার এসেছেন, কিন্তু খুব শিগগির আরোগ্যের কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। অথচ আর তিনদিনের মধ্যে মহারাজার কাছে এক অতি সম্মানিত গেস্ট আসছেন আমেরিকা থেকে—ক্রোড়পতি মিস্টার অস্কার হোরেনস্টাইন। উনি প্রাচীন শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করেন এবং তার পিছনে লাখ লাখ ডলার খরচ করেছেন। আমাদের রাজারও সংগ্রহে অনেক পুরনো জিনিস আছে। তাঁর ইচ্ছা ছিল হোরেনস্টাইনকে কিছু জিনিস বিক্রি করা। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, আমাদের তহবিলে অর্থাভাব দেখা দিয়েছে বেশ কিছুদিন থেকেই। আমাদের কম্পাউন্ডে ছোট বড় মাঝারি প্রায় গোটা ছয়েক প্রাসাদ রয়েছে, রাজা তাদের মধ্যে একটিকে হোটেলে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মন্দোরে দেখবার জিনিসের অভাব নেই। লেক আছে, পাহাড় আছে, জঙ্গলে বাঘ হাতি হরিণ আছে; তা ছাড়া এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর। ঠিকমতো বিজ্ঞাপন দিলে হোটেলের ব্যবসা মার খাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তার আগে কিছু নগদ টাকা পাবার সম্ভাবনা ছিল এই হোরেনস্টাইনের কাছে। সেই জন্য তাঁকে আর আমরা আসতে বারণ করিনি, বা রাজার অসুখের কথা বলিনি। বুঝতেই পারছেন—'

বুঝতে আমি পেরেইছিলাম। বললাম, 'তার মানে খবরের কাগজের ছবিটা ছিল রাজার ছবি, আর আমাকে কিছুদিনের জন্য রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।'

'শুধু যে ক'দিন হোরেনস্টাইন থাকবেন, সেই কদিন।'

'হোরেনস্টাইনের সঙ্গে রাজার আলাপ হয় কোথায়?'

'আমেরিকায়, মিনিয়াপোলিস শহরে। সেখানে রাজা বেড়াতে গিয়েছিলেন মার্চ মাসে। রাজার একমাত্র ছেলে মহীপাল সেখানে ডাক্তারি করে। মিনিয়াপোলিসে থাকতে একটা পার্টিতে রাজার সঙ্গে হোরেনস্টাইনের আলাপ হয়। সেখানেই রাজা তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। হোরেনস্টাইনের শিকারের শখও আছে, কাজেই একদিন শিকারের বন্দোবস্তও করতে হবে। আপনি গুলি চালাতে পারেন?'

আমি বললাম, 'বিলক্ষণ, যদিও শিকার করিনি প্রায় দশ-বারো বছর।'

'এ শিকার হাতির পিঠ থেকে, কাজেই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।'

'আপনি যে রাজার সংগ্রহের কথা বলছিলেন, এগুলো কী ধরনের জিনিস?'

'বেশিরভাগই অস্ত্রশস্ত্র। ছোরা, ঢাল, তলোয়ার, পিস্তল—এসব প্রচুর আছে এবং দেখলেই

বুঝতে পারবেন সেগুলো কত মূল্যবান। এ ছাড়া প্রসাধনের জিনিসপত্র, আতরদান, আলবোলা, ছবি, ফুলদানি এসবও আছে। আমার মনে হয় না আপনাকে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হবে। সাহেবের কথা যা শুনলাম, তাতে তিনি নিজেই কিনতে আগ্রহী হবেন। ইনি আসবেন বলে রাজা একটা দামের তালিকাও করে রেখেছিলেন, সেটাও আপনাকে দিয়ে দেব।'

দেওয়ানের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমাকে সাজতে হবে পাঁচদিন কা সুলতান। তারপর আবার যে-কে-সেই। অবিশ্যি পারিশ্রমিকের কথাটা ভুললে চলবে না। তখনকার দিনে দশ হাজার টাকার ভ্যালু এখনকার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি।

রাজবাড়ির বিশাল ফটক দিয়ে যখন গাড়ি ঢুকছে, তখন বুকের ভিতরে বেশ একটা দুরু-দুরু অনুভব করছিলুম, কিন্তু সত্যি বলতে কি, নার্ভাস একটুও হইনি। গাড়িতে দেওয়ান বার তিনেক আমার দিকে চেয়ে দেখে বললেন, 'আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তরে আমরা রাজার এমন একজন জোড়া পেয়ে যাব। আমি ধরেই নিয়েছিলাম আমাদের অতিথিকে জানিয়ে দিতে হবে তিনি যেন না আসেন। এখন দেখছি সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।'

সাহেব আসবেন বুধবার, আজ রবিবার। এই তিনদিন আমার কাজ হচ্ছে রাজার ডায়রি পড়া। আর টেপ রেকর্ডারে রাজার কণ্ঠস্বর শোনা। গোটা তিনেক ইংরিজি বক্তৃতার টেপ করা আছে। দেওয়ান সেগুলো আমার জিম্মায় দিয়ে দিলেন আর সেইসঙ্গে চামড়ায় বাঁধানো গত দশ বছরের ডায়রি। ডায়রিগুলো উলটেপালটে দেখলুম। ইংরিজিতে লেখা, এবং বেশ চোস্ত ইংরিজি। নানান খুঁটিনাটির খবর রয়েছে তাতে। রাজা কখন ঘুম থেকে ওঠেন, কী ব্যায়াম করেন, কী খেতে ভালবাসেন, কী পরতে ভালবাসেন, সংগীতে রাজার রুচি নেই—এই সবই ডায়রি থেকে জানা যায়।

রাজার স্ত্রী মারা যান বছর তিনেক আগে। তাতে তিনি সাময়িক ভাবে কীরকম ভেঙে পড়েছিলেন—মৃত্যুর পর পনেরো দিন ডায়রির পাতা ফাঁকা—সেসব খবরও আমার খুব কাজে দিল।

তিনদিনের শেষে আমি দেওয়ানকে বললাম আমি একদম তৈরি। এ ছাড়া আর একটা কথা, আমি দু' দিন থেকে বলব বলব করছিলাম, সেটা আজ বলে দিলাম।

'দেওয়ানজি, ব্যবস্থা সবই ভাল, কিন্তু আমার দ্বারা ওই রাজশয্যায় শোওয়া চলবে না। অত নরম বিছানায় শোয়া আমার অভ্যেস নেই। ওতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়।'

'তা হলে আপনি থাকবেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন দেওয়ানজি।

আমি বললাম, 'কেন আপনার এখানে তো অনেক ছোট ছোট প্রাসাদ রয়েছে—লালকোঠি, পিলাকোঠি, সফেদকোঠি—এর একটাতে থাকা যায় না?'

'তা অবিশ্যি যায়', দেওয়ান চিন্তিত ভাবে বললেন, 'একদিক দিয়ে লালকোঠিতে থাকার খুব সুবিধে। একটা চমৎকার শোয়ার ঘর আছে, যেখানে মহারাজার বাপ মাঝে মাঝে থাকতেন। শত্রুঘ্ন সিং এক বাড়িতে বেশিদিন থাকা পছন্দ করতেন না। তাঁর জন্য নানারকম ছোট ছোট বাসস্থান বানানো হয়েছিল।'

'বেশ তো, সেই লালকোঠিতেই থাকব।'

'থাকবেন?'

'কেন, অসুবিধাটি কী?'

'একটা ব্যাপার আছে।'

'কী ব্যাপার?'

'বছর পঞ্চাশেক বয়সে শত্রুঘ্ন সিং-এর মাথাখারাপ হয়ে যায়; উনি নিজের মাথায় রিভলভার মেরে আত্মহত্যা করেন এবং সেটা করেন ওই লালকোঠির শোয়ার ঘরেই।'

'আপনার ধারণা তাঁর প্রেতাত্মা বাস করেন ওই ঘরে?'

'সে তো জানি না। তাঁর মৃত্যুর পর ও ঘরে আর কেউ থাকেনি।'

'তা হলে ওই ঘরে আমি থাকব। এই অভিজ্ঞতার সুযোগ ছাড়া যায় না। আমি অনেক ভূত দেখেছি তাই আমার ভূতের ভয় নেই। আর বিছানাটা যেন অত নরম না হয়।'

দেওয়ান রাজি হয়ে গেলেন। অবিশ্যি অবাকও কম হননি। একজন বাঙালির যে এত সাহস থাকতে পারে সেটা বোধহয় উনি ভাবতে পারেননি।

সেদিনই বিকেলে সাহেব এসে পড়লেন। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, আমার চেয়েও ইঞ্চি তিনেক লম্বা, মুখের সব মাংস যেন থুতনিতে গিয়ে জমা হয়েছে, নীল চোখে সোনালি চশমা, মাথায় কাঁচাপাকা মেশানো চুল মাঝখানে সিঁথি করে ব্যাকব্রাশ করা।

সাহেব আসামাত্র অবিশ্যি আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। দেওয়ানজি বললেন, 'লোকটা আগে সফেদকোঠিতে নিজের ঘরে গিয়ে উঠুক, তারপর কিছুটা সময় দিয়ে ওঁকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। নইলে প্রেস্টিজ থাকে না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি—সাহেব মনে হল একটু তিরিক্ষি মেজাজের লোক। স্টেশন থেকে আসার পথে গাড়ির টায়ার পাংচার হয়; তাতে বেশ খেপে আছে।'

আমি মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিলুম যে, সাহেব মেজাজ দেখালেও আমি দেখাব না। আমার সঙ্গে দেখা হতে রাগ আর রসিকতা মিলিয়ে সাহেব বললেন, 'ওয়েল, মহারাজ—হোয়াট কাইন্ড অফ এ ওয়েলকাম ইজ দিস? মাঝ-রাস্তায় আমাকে পনেরো মিনিট রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হল!'

আমি যথাসাধ্য অ্যাপলাইজ করলুম, বললুম যে আর কোনও গলতি হবে না সে গ্যারান্টি দিচ্ছি। সাহেব চেয়ারে বসলেন, তাঁর জন্য শরবত এল, সেটা খেয়ে যেন মাথাটা ঠাণ্ডা হল। আমি বললাম, 'তুমি এখানে কী কী করতে চাও সেটা আমাকে বলো। অবিশ্যি আমার মোটামুটি জানাই আছে, আর সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও করেছি, কিন্তু আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

সাহেব বললেন, 'আমার শিকারের শখ আছে, আমি বাঘ মারতে চাই—সে ব্যবস্থা করেছ?'

আমি মাথা নেড়ে জানালাম, করেছি।

'আর আমি তোমার সংগ্রহ থেকে কিছু জিনিস কিনতে চাই আমার সংগ্রহের জন্য। বিশেষ করে সামনের বছর আমাদের বিয়ের রজতজয়ন্তী। আমার স্ত্রীর জন্য একটা ভাল উপহার আমি নিয়ে যেতে চাই। আশা করি তেমন জিনিস আছে তোমার সংগ্রহে।'

'সেটা তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে। ভাল জিনিসের অভাব নেই আমার দেড়শো বছরের সংগ্রহে।'

দুপুরে খাবার পর সাহেবকে সংগ্রহশালায় নিয়ে যাওয়া হল। আমিও অবশ্য প্রথম দেখলুম জিনিসগুলো। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। এমন মহামূল্য জিনিস হাতছাড়া হয়ে যাবে ভাবতে আমার খারাপ লাগছিল। হোরেনস্টাইন দেখলাম সমঝদার লোক। সে চটপট কেনবার মতো জিনিস আলাদা করে রাখতে লাগল। সবসুদ্ধ প্রায় দশ লাখ টাকার জিনিস এইভাবে বাছল। কিন্তু তাও তার কপাল থেকে ভ্রূকুটি যায় না। ব্যাপার কী? শেষটায় সে বলল, 'সবই হল, কিন্তু ক্যাথলিনের উপযুক্ত কিছু পেলাম না এখনও। কোনও ভাল ডায়মন্ড ব্রোচ জাতীয় জিনিস তোমার নেই? আমার স্ত্রীর পাথরের উপর ভীষণ ফ্যান্সি। একখানা ভাল পাথরও যদি পেতাম তার জন্য!'

আমি মাথা নেড়ে আক্ষেপ জানালাম। 'ভেরি সরি, মিঃ হোরেনস্টাইন। পাথর থাকলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই দিতাম।'

দিনের বেলাটা সাহেবকে রাজার বড় গাড়ি লাগভাতে ঘুরিয়ে শহরের নানান দৃশ্য দেখানো হল। সন্ধ্যায় দু'জনে বসে কিছুক্ষণ দাবা খেললাম। বুঝতেই পারছিলাম সাহেব তাঁর গিন্নির জন্য লাগসই উপহার পেলেন না বলে তাঁর মনটা ভারী হয়ে রয়েছে, এবং তাই তাঁর চালে ভুল হচ্ছে। কিন্তু মেজাজের কথা মাথায় রেখে আমি আরও বেশি ভুল চাল দিয়ে তাঁকে জিতিয়ে দিলুম।

রাত্রি ন'টায় ষোড়শোপচারে ডিনার খেয়ে কফি আর ব্রান্ডিতে কিছুটা সময় দিয়ে সাহেব শুতে চলে গেলেন সফেদকোঠিতে। রাজা নিজে মদ্যপান করেন না, আমিও করি না—এখানে মিলেছে ভাল। আমি শুধু কফি আর একটা ভাল হাভানা চুরুট খেয়ে উঠে পড়লাম। দেওয়ান নিজে এলেন

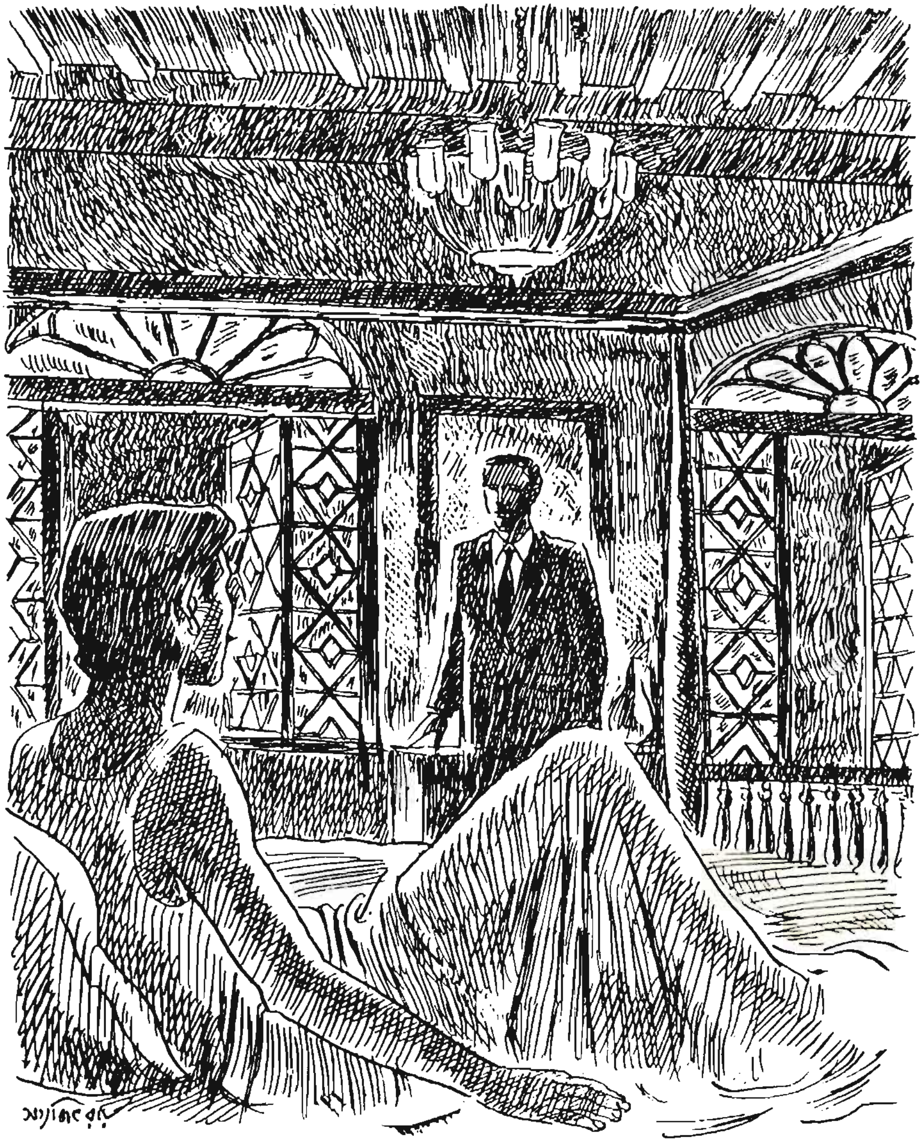

আমাকে লালকোঠিতে পৌঁছে দিতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রাজা আজ আছেন কেমন?' দেওয়ান মাথা নেড়ে আক্ষেপসূচক শব্দ করে বললেন, 'সেইরকমই। ভুল বকছেন, হাসপাতালের নার্সদের খুব জ্বালাচ্ছেন। ডাক্তাররাও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন।'

লালকোঠিতে গিয়ে দেখি এখানে খাট বিছানা তোশক বালিশ সবই অনেক ভদ্রস্থ, অর্থাৎ আমার উপযোগী। দেওয়ানজি যাবার সময় বলে গেলেন, 'আপনার সাহসের তুলনা নেই। এই ঘরে রাজা শত্রুঘ্ন সিং মারা যাবার পর এই প্রথম মানুষ বাস করছে।' আমি বললাম, 'কোনও চিন্তা করবেন না। আমি সব অবস্থাতেই নিজেকে সামাল দিতে পারি।'

খাটের পাশে একটা ল্যাম্প রয়েছে; সেটা জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ মন্দোরের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বই পড়ে সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাতি নিভিয়ে দিলাম। পশ্চিমে একটা বড় জানলা রয়েছে, সেটা

দিয়ে একসঙ্গে চাঁদের আলো আর ঝিরঝিরে বাতাস আসছে, চোখে ঘুম আসতে বেশি সময় লাগল না।

ঘুমটা ভাঙল যখন, তখন চাঁদ নেমে গিয়ে ঘরের ভিতরটা আবছা আলোয় ভরে গেছে। চোখ চেয়েই বুঝলাম যে, ঘরে আমি একা নই। দরজা যদিও বন্ধই আছে তবু জানলার পাশে একজন লোক সোজা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমারই মতন লম্বা আর আমারই ধাঁচের চেহারা, কেবল গোঁফটা আমার চেয়ে একটু বেশি পুরু। চাঁদের আলোয় খুব স্পষ্ট বোঝা না গেলেও লোকটা যে গাঢ় রঙের বিলিতি পোশাক পরে রয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম।

আমি কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঠে বসলাম। বুকের ভিতরে একটা মৃদু কাঁপুনি অনুভব করছিলাম, কিন্তু সেটাকে আমি ভয় বলতে রাজি নই। বেশ বুঝতে পারছি যে যিনি প্রবেশ করেছেন তিনি জ্যান্ত মানুষ নন; তিনি প্রেতাত্মা। এবং ইনি যে বর্তমান মহারাজার বাপ শত্রুঘ্ন সিং-এর প্রেতাত্মা তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। ইনিই এই ঘরে নিজের মাথায় রিভলভার মেরে আত্মহত্যা করেছিলেন।

'অ্যাই হ্যাভ কাম টু টেল ইউ সামথিং' গম্ভীর গলায় বললেন প্রেতাত্মা। বাকি কথাও ইংরিজিতে হল, আমি সেটা বাংলায় বলছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলতে এসেছেন আপনি?'

'আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে আমি একটা মহামূল্য পাথর কিনেছিলাম ভিয়েনাতে একটা নিলামে। সেটা একটা পান্না। তার নাম ছিল ডোরিয়ান এমারেল্ড। এমন পান্না সচরাচর দেখা যায় না।'

'সে পান্না কী হল?'

'এখনও আছে। আমার ছেলের আলমারির দেরাজে একটা মখমলের বাক্সতে। যদি পারো তো সেটা বিক্রি করে দাও। খরিদ্দার যখন পেয়েছ তখন এ সুযোগ ছেড়ো না।'

'কেন বলছেন এ-কথা?'

'ও পাথর শয়তান পাথর। যখন কিনি তখন আমি এটা জানতাম না। ওর প্রথম মালিক ছিল লুক্সেমবুর্গের কাউন্ট ডোরিয়ান। সে তার কেল্লার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। তার দেহের একটা হাড়ও আস্ত ছিল না। তারপর এই পান্না উনিশ জনের হাতে ঘোরে। উনিশ জনই আত্মঘাতী হয়। আমি এটা জেনেও পান্নাটি হাতছাড়া করিনি, কারণ এমন আশ্চর্য সুন্দর পাথরের সঙ্গে যে এত ট্র্যাজিডি জড়িয়ে থাকতে পারে সেটা আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আমার মৃত্যুর জন্য ওই পাথরই দায়ী। আজ যে আমার ছেলের মাথাখারাপ হয়েছে তার জন্যও ওই পাথর দায়ী। আমার নাতির এখনও কিছু হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে...'

প্রেতাত্মা কথা থামালেন। আমি বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি ওই পান্নাকে বিদায় করতে পারব।'

'তবে আমি আসি।'

চাঁদের আলোয় প্রেতাত্মা ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি বাকি রাত আর ঘুমোতে পারলাম না।

পরদিন সকালে দেওয়ানকে বললাম রাত্রের ঘটনা। দেওয়ান তো শুনে থ। বললেন, 'কিন্তু আমি এমন পাথরের কথা জানি না।' আমি বললাম, 'যাই হোক, আলমারির দেরাজটা একবার খুলে দেখতে হয়।'

আলমারির দেরাজ খুলে লাল মখমলের বাক্সে পান্নাটা পেতে কোনওই অসুবিধা হল না। পাথর দেখে আমার চক্ষুস্থির। এমন পান্না আমি জীবনে দেখিনি।

এবার সাহেবকে ডেকে বললাম, 'সাহেব তুমি পাথর চাইছিলে, একটা আশ্চর্য পাথর আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে বটে, কিন্তু সেটা আমার বাবার কেনা, তাই হাতছাড়া করতে দ্বিধা হচ্ছিল। পরে ভেবে দেখলাম, তুমি সম্মানিত অতিথি, এবং দূর-থেকে এসেছ, তোমাকে বিমুখ করার কোনও

মানে হয় না। দেখো তো এই পান্নাটা তোমার পছন্দ হয় কিনা।'

পান্না দেখে সাহেবের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। দু'বার অস্ফুট স্বরে বললেন, 'ইট্‌স এ বিউটি...ইট্‌স এ বিউটি!' তারপর বললেন, 'আমি আর কিছু নেব না।'

পান্না সাহেবের হাতে চলে গেল, আর আমাদের হাতে এল একটা চেক।

আশ্চর্য এই যে, বিকেলে হাসপাতাল থেকে খবর এল যে, রাজা অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন।

সাহেবের তরফ থেকে শিকার তেমন জমল না, কারণ জঙ্গল হাঁকোয়াদের কেনেস্তারা পেটানোর চোটে বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সাহেবের হাতির কাছে এসে পড়া সত্ত্বেও সাহেবের নিশানা অব্যর্থ হল না। শেষটায় আমার গুলিতেই বাঘ মরল।

পরের দিন সাহেব দিল্লি চলে গেলেন।

দু' দিন পরে কাগজে দেখলাম দিল্লির এয়ারপোর্ট থেকে একটি প্যান অ্যামেরিকান বিমান টেক-অফ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার এঞ্জিনে একটা শকুন ঢুকে পড়ে। প্লেন বিকল হয়ে গোঁৎ খেয়ে মাটিতে পড়ে। যদিও কেউ মারা যায়নি, যাত্রীদের মধ্যে জনা পঁচিশেককে নার্ভাস শকের জন্য হাসপাতাল যেতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন ধনকুবের অস্কার এম. হোরেনস্টাইন।

নীলকমল লালকমল শারদ সংখ্যা, ১৩৯৩

হাউই

জয়ন্ত নন্দী : ছোটদের পত্রিকা 'হাউই'-এর সম্পাদক
তরুণ সান্যাল : জয়ন্তর বন্ধু
তিনকড়ি ধাড়া : 'হাউই'-এর দপ্তরের কর্মচারী। কাজ—বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা
তন্ময় সেনগুপ্ত : লেখক
মুকুল : দপ্তরের কর্মচারী
ধনঞ্জয়/আলম্‌ : দপ্তরের বেয়ারা
অর্দ্ধেন্দু রায় : জনৈক গ্রাহকের বাবা

বালিগঞ্জে ছোটদের পত্রিকা 'হাউই'-এর দপ্তর। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল—তার পিছনে একটা চেয়ারে সম্পাদক জয়ন্ত নন্দী বসে আছে। জয়ন্তর বয়স বছর ৩৫। তার উলটোদিকে দুটো চেয়ারের মধ্যে একটায় তার বন্ধু তরুণ সান্যাল হাতে একটি সিগারেট নিয়ে বসে। ঘরের একপাশে দেখা যাচ্ছে বেয়ারা আলম নতুন 'হাউই' পত্রিকা ডাকে দেবার জন্য সেগুলো ব্রাউন কাগজের প্যাকেটে ভরছে। পিছন দিকে মঞ্চের মাঝখানে একটা বন্ধ দরজা, তার পিছনেও একটা ঘর আছে বোঝা যায়। বন্ধ দরজার পাশে একটা খালি চেয়ার। জয়ন্ত আর তরুণের সামনেই চায়ের পেয়ালা। তরুণ তার কাপে চুমুক দিয়ে সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

তরুণ ॥ তা হলে তোদের অবস্থা বেশ ভালই বলছিস?

জয়ন্ত ॥ তা ভাই তেরো হাজার সাব্‌স্ক্রিপশন, স্টল থেকে হাজার চারেক বিক্রি হয়—খারাপ আর কী করে বলি বল। আর বিজ্ঞাপন থেকেই খরচা উঠে আসে। এ মাসে তো চারখানা রঙিন বিজ্ঞাপন আছে, তার মধ্যে দুটো রেগুলার আর দুটো অকেশনাল। ছাপাও খারাপ হচ্ছে না। আগের প্রেসটা সুবিধের ছিল না। গত বৈশাখ থেকে প্রেস বদলেছি—এখন বেশ ঝরঝরে হয়েছে। এই যে দেখ না—

জয়ন্ত একটা পত্রিকা টেবিলের উপর থেকে তুলে তরুণকে দেয়। তরুণ সেটা উলটেপালটে দেখে।

জয়ন্ত ॥ তোর তো লেখার হাত বেশ ভাল ছিল। একটা লেখ না আমাদের কাগজের জন্য।

তরুণ ॥ পয়সা দিচ্ছিস লেখকদের?

জয়ন্ত ॥ তা দিচ্ছি বই কী। নেহাত খারাপ নয়। একটা গল্পের জন্য একশো টাকা। উপন্যাস হলে ফাইভ হান্ড্রেড। অবিশ্যি লেখক নতুন না নামী তার উপর রেট খানিকটা নির্ভর করছে।

তরুণ ॥ নামটিও কাগজের ভাল হয়েছে। হাউই। ভেরি অ্যাট্রাকটিভ।

জয়ন্ত ॥ এই পুজোর জন্য একটা উপন্যাস পেয়েছি—সম্পূর্ণ অপরিচিত লেখক—নাম নবারুণ চট্টোপাধ্যায়। তোকে বলছি এমন ট্যালেন্টেড লেখক সচরাচর চোখে পড়ে না। আমি তো পড়ে তাজ্জব। ভদ্রলোক থাকেন আবার বাগবাজারে—না হলে একবার ডেকে এনে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল।

তরুণ ॥ কী ধরনের উপন্যাস?

জয়ন্ত ॥ অ্যাডভেঞ্চার। যেমন সব চরিত্র, তেমনি পরিবেশ, তেমনি সাসপেন্স। লাদাখ-এর ব্যাকগ্রাউন্ড। লোকটা হয় নিজে গেছে, না হয় প্রচুর পড়াশোনা করে লিখেছে। আমি তো পড়ে মোহিত।

ডানদিকে দপ্তরের রাস্তার দিকের দরজায় টোকা পড়ে। একজন বেঁটে, নিরীহ ভদ্রলোক, মাথায় টাক, পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি এবং খাটো ধুতি, দরজার মুখটায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এঁর নাম তিনকড়ি ধাড়া।

তিনকড়ি ॥ এটা কি হাউই পত্রিকার আপিস?

জয়ন্ত ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনকড়ি ॥ আমার একটু সম্পাদক মশাইয়ের সঙ্গে দরকার ছিল।

জয়ন্ত ॥ আমিই সম্পাদক—আপনার কী দরকার?

তিনকড়ি ॥ সেটা, মানে, বসে বলতে পারলে ভাল হত।

জয়ন্ত ॥ আপনি ভিতরে আসুন।

তিনকড়িবাবু ভিতরে আসেন।

জয়ন্ত ॥ আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন। আমি একটু ব্যস্ত আছি।

তিনকড়িবাবু টেবিলের চেয়ে একটু দূরে রাখা একটা কাঠের চেয়ারে বসে ধুতির খুঁট দিয়ে ঘাম মোছেন। জয়ন্ত তরুণের দিকে ফেরে।

জয়ন্ত ॥ হ্যাঁ—যা বলছিলাম। এখন সমস্যা হয়েছে আর্টিস্ট নিয়ে। এই গল্পের বেশ জোরদার ছবি না হলে চলবে না। তোর তো অনেক বই আছে—লাদাখ সম্পর্কে কিছু আছে কি—ছবির বই?

তরুণ ॥ তা থাকতে পারে। আমি দেখব'খন।

জয়ন্ত ॥ আমাকে যদি দিন সাতেকের জন্য ধার দিতে পারিস। এখন ছবিতে গোঁজামিল দিলে চলে না। ভাল রেফারেন্স দেখে আঁকা চাই। আশিস মিত্র ছেলেটির হাত বেশ ভাল। তোর কাছ থেকে যদি বইটা পেয়ে যাই, তা হলে ইলাসট্রেশন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

তরুণ ॥ তুই যে রকম বলছিল তাতে তো লেখাটা আমার এখনই পড়তে ইচ্ছে করছে। সত্যি বলতে কিশোরদের লেখা পড়তে বেশ লাগে এই বয়সেও।

রঘুনাথ মুৎসুদ্দীর প্রবেশ। তরুণের পাশেই আরেকটা চেয়ারে বসে ঘাম মোছেন।

রঘুনাথ ॥ ভেরি সাক্সেসফুল মর্নিং। শারদীয়া সংখ্যার জন্য কোনও চিন্তা নেই। ৬টা কালার বিজ্ঞাপন পাওয়া যাচ্ছে—আর এখন অবধি ২৪টা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়েছে—ভারত ইনসিওরেন্স আর পোদ্দার বিস্কিট কথা দিয়েছে, মনে হয় হয়ে যাবে।

জয়ন্ত ॥ রেট নিয়ে কেউ গাঁইগুঁই করেনি তো?

রঘুনাথ ॥ নাঃ। আজকাল তো সব কাগজেই একরকম রেট হয়ে গেছে—আমাদেরটা যে খুব একটা অতিরিক্ত বেশি তা তো নয়, কাজেই আপত্তি করার তো কোনও কারণ নেই।

জয়ন্ত ॥ ম্যাটারগুলো সব ঠিক সময় পাঠিয়ে দেবে তো? গতবার বিজ্ঞাপন প্রমিস করে পাঠাতে লেট করেছিল বলে আমাদের কাগজ বেরোতে দেরি হয়ে গেল।

রঘুনাথ ॥ আমি তো পই পই করে বলে এসেছি, এখন দেখা যাক। ইয়ে ধনঞ্জয়!

পিছনের ঘর থেকে ধনঞ্জয় বেয়ারার গলা পাওয়া যায়।

ধনঞ্জয় ॥ বাবু

রঘুনাথ ॥ চট করে এক পেয়ালা চা করো তো।

রঘুনাথ পিছনের ঘরে চলে যায়।

লেখক তন্ময় সেনগুপ্ত রাস্তার দিকে দরজা দিয়ে ঢোকে।

তন্ময় ॥ (জয়ন্তকে) গুড মর্নিং স্যার।

জয়ন্ত ॥ গুড মর্নিং।

তন্ময় ॥ আমার লেখাটার বিষয় জানতে এসেছিলাম।

জয়ন্ত ॥ আপনার উপন্যাসটা?

তন্ময় ॥ হ্যাঁ।

জয়ন্ত ॥ কেন—ওটা আপনি এখনও পাননি? ওটা তো ফেরত চলে গেছে—আপনার তো স্ট্যাম্প দেওয়া ছিল।

তন্ময় ॥ তার মানে কি পছন্দ হল না?

জয়ন্ত ॥ আজ্ঞে না, ভেরি সরি। ওতে আপনার বিস্তর গণ্ডগোল—বিশ্বাসযোগ্যতার একান্ত অভাব। দশ-বারো বছরের ছেলেরা ওরকমভাবে কথা বলে না। আর অত সাহসও ওদের হয় না। কিছু মনে করবেন না—কিন্তু এ গল্প ছাপলে আপনার সুনাম হত না। আমি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে একটা স্লিপ অ্যাটাচ করে আমার মন্তব্য দিয়ে দিয়েছি। আপনার তো দুটো লেখা এর আগে ছাপা হয়েছে। এটা না হয় নাই হল।

তন্ময় ॥ তা হলে আপনারা কি এবার উপন্যাস দিচ্ছেন না?

জয়ন্ত ॥ দিচ্ছি বই কী।। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এরকম উপন্যাস এবারের আর কোনও পুজো সংখ্যায় ছাপা হবে না।

তন্ময় ॥ নামকরা লেখক?

জয়ন্ত ॥ একেবারেই না। আমার তো মনে হয় এটিই এনার প্রথম লেখা।

তন্ময় ॥ কী নাম লেখকের?

জয়ন্ত ॥ নবারুণ চট্টোপাধ্যায়। শুনেছেন নাম?

তন্ময় ॥ না। তা শুনিনি বটে।

জয়ন্ত ॥ আমিও নামই শুনেছি, আর লেখা পড়েছি। পরিচয় হয়নি। ভদ্রলোক থাকেন সেই বাগবাজারে।

তন্ময় ॥ ভেরি লাকি বলতে হবে।

জয়ন্ত ॥ এ তো আর লাকে হয় না, ভেতরে ক্ষমতা থাকা চাই। ইদানীং কিশোরদের লেখা যা দেখেছি তার মধ্যে এঁরটাই যে বেস্ট বাই ফার তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তন্ময় ॥ আমি তা হলে উঠি।

জয়ন্ত ॥ আসুন। আপনার লেখা দু-একদিনেই পেয়ে যাবেন। কলকাতার ডাক তো! বালিগঞ্জ টু শ্যামবাজার চিঠি যেতে সাতদিন লাগে।

তিনকড়িবাবু তাঁর জায়গা থেকে গলা খাকরানি দেন।

তিনকড়ি ॥ ইয়ে, মানে—

জয়ন্ত ॥ আপনি আরেকটু বসুন না। শুনছি আপনার কথা।

তিনকড়ি ॥ না, মানে—যদি একটু খাবার জল পাওয়া যেত।

জয়ন্ত ॥ ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয় আসে।

ধনঞ্জয় ॥ বাবু?

জয়ন্ত ॥ ওই ভদ্রলোককে এক গেলাস জল দাও তো।

ধনঞ্জয় জল এনে দেয়। ভদ্রলোক ঢক্ ঢক্ করে গেলাস শেষ করে আবার ধুতির খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন। জয়ন্তর টেবিলের উপর একটা পাখা চলছে বটে, কিন্তু তার হাওয়া তিনকড়িবাবুর কাছে পৌঁছচ্ছে না। জয়ন্ত আবার তরুণের দিকে মন দেয়।

জয়ন্ত ॥ কাগজের কথা বলতে গিয়ে আসল কথাই ভুলে যাচ্ছিলাম। তোর ভাগনির তো বিয়ে।

তরুণ ॥ হ্যাঁ। এই তো আসছে মাসে। তোরা আসিস। তোর নামে চিঠি যাবে।

জয়ন্ত ॥ তা তো যাব, কিন্তু এই পুজো সংখ্যার চাপে টাইম করে উঠতে পারব কি না জানি না।

তরুণ ॥ ও সব শুনছি না। একটা সন্ধে দুটি ঘণ্টা তোর কাজের মধ্যে থেকে বার করে নিতে হবে।

জয়ন্ত ॥ কী বলছিস—এখন যে ক্রিকেট, তাই দেখা হল না টেলিভিশানে।

তরুণ ॥ ওয়ান-ডের খেলাটাও দেখিসনি?

জয়ন্ত ॥ কোথায় আর দেখলাম!

তরুণ ॥ এঃ—খুব মিস করেছিস। এরম খেলা চট করে দেখা যায় না। তোর উপন্যাসের সাসপেন্স কোথায় লাগে!

তরুণ তার সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে দেয়।

তরুণ ॥ যাক গে—আমি আর তোর সময় নেব না।

জয়ন্ত ॥ লেখার কথাটা ভুলবি না তো?

তরুণ ॥ দেব লেখা—তবে পয়সা দিতে হবে কিন্তু। বন্ধু বলে হবে না।

জয়ন্ত ॥ তা দেব'খন। তোর এক প্যাকেট সিগারেট হয়ে যাবে।

তরুণ ॥ আসি—

তরুণ দপ্তর থেকে বেরিয়ে যায়। জয়ন্ত তিনকড়িবাবুর দিকে ঘুরতে যাবে এমন সময় দপ্তরে আরেকজন প্রবেশ করেন। ইনি অর্দ্ধেন্দু রায়। জয়ন্ত তাঁর দিকে ফেরে।

জয়ন্ত ॥ আপনার— ?

অর্দ্ধেন্দু ॥ আমি এসেছিলাম আপনাদের কাগজের চাঁদা দিতে—আমার ছেলেকে গ্রাহক করতে চাই। এই যে এই কাগজে আপনি পার্টিকুলার্স পাবেন, আর এই হল টাকা—

অর্দ্ধেন্দু পকেট থেকে কাগজ আর টাকা বার করে জয়ন্তকে দেন। জয়ন্ত সেগুলো নেয়।

জয়ন্ত ॥ থ্যাঙ্কস—দাঁড়ান, আমি রসিদ দিয়ে দিচ্ছি। মুকুল !

পিছন দিকের ঘর থেকে একজন তরুণ বেরিয়ে আসে—দপ্তরের কর্মচারী মুকুল।

জয়ন্ত ॥ এঁকে একটা রসিদ করে দাও তো। এক বছরের চাঁদা। এই যে পার্টিকুলার্স।

জয়ন্তর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে মুকুল রসিদ লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। টাকাটা জয়ন্ত দেরাজ খুলে ভিতরে রেখে দেয়।

অর্দ্ধেন্দু ॥ আপনাদের পত্রিকা ডাকে পাঠাতে হবে না—আমি প্রতি মাসে এসে হাতে করে নিয়ে যাব। এটা আমার কাজের জায়গার খুব কাছে পড়ে।

জয়ন্ত ॥ আপনি বসুন না।

অর্দ্ধেন্দু ॥ ঠিক আছে। আসলে আমার ছেলে অনেকদিন থেকে ধরেছিল ওকে গ্রাহক করে দেবার জন্য।

জয়ন্ত ॥ বয়স কত ?

অর্দ্ধেন্দু ॥ এই দশে পড়ল।

মুকুল রসিদ লিখে দেয়। সেটা নিয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু বেরিয়ে যান। মুকুল পিছনের ঘরে চলে যাবার পর জয়ন্ত তিনকড়ির দিকে ঘোরে।

জয়ন্ত ॥ আপনি কি লেখা দিতে এসেছেন ?

তিনকড়ি ॥ আজ্ঞে না।

জয়ন্ত ॥ তবে ?

তিনকড়ি ॥ লেখা আমার আগেই দেওয়া আছে।

জয়ন্ত ॥ সেটা মনোনীত হয়েছে ?

তিনকড়ি ॥ চিঠি এখনও পাইনি—তবে আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে হয়েছে।

জয়ন্ত ॥ তার মানে ?

তিনকড়ি ॥ আমার আসল নাম তিনকড়ি ধাড়া, কিন্তু লেখায় নাম ছিল নবারুণ চট্টোপাধ্যায়।

জয়ন্তর চক্ষু চড়কগাছ

জয়ন্ত ॥ বলেন কী ?

তিনকড়ি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

জয়ন্ত ॥ ওই লাদাখের উপন্যাস আপনার লেখা ?

তিনকড়ি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—অনেক মেহনতের ফসল আমার। অনেক পড়াশুনা করতে হয়েছে ওটা লেখার জন্য।

জয়ন্ত ॥ কী আশ্চর্য—তা আপনি নবারুণ চট্টোপাধ্যায় না বলে তিনকড়ি ধাড়া বলতে গেলেন কেন ? ওই নাম বললে কি কোনও ফল হয় ?

তিনকড়ি ॥ তা অবশ্য ঠিক। ও নামে লেখা পাঠালে আপনি হয়তো সে লেখা পড়তেনই না। কিন্তু আপনার যখন লেখাটা ভাল লেগেছে, তখন আমি আমার নিজের নামই ব্যবহার করতে চাই। কারণ লেখা যদি ভাল লাগে তা হলে নামের কথা কেউ ভাববে না। আর ভেবে দেখলাম নামটা আমার পিতৃদত্ত নাম, আর পদবি আমার বংশের পদবি। নবারুণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়োজন হয়েছিল শুধু আপনাকে লেখাটা পড়াবার জন্য। এখন সেটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

জয়ন্ত ॥ দেখুন তো—আমি না জেনে আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।

তিনকড়ি ॥ তাতে কী হয়েছে। সে না হয় এবার যখন আপনি আমার কাছে লেখার জন্য তাগাদা করতে যাবেন তখন আমি আপনাকে বসিয়ে রাখব। তা হলেই শোধবোধ হয়ে যাবে।

দুজনে হাসিতে ফেটে পড়ে।

সন্দেশ, শারদীয় ১৪০১। রচনাকাল ২ অক্টোবর, ১৯৮৬

প্রতিকৃতি

রঞ্জন পুরকায়স্থ কলকাতার একজন নামকরা চিত্রকর। শুধু কলকাতা কেন, তাঁর খ্যাতি পশ্চিমবাংলার বাইরে সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছে—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেছে। ছবি বিক্রি করেই পুরকায়স্থ মশাইয়ের রোজগার, এবং সে রোজগার রীতিমতো ভাল। গতমাসেই বোম্বাইতে তাঁর একখানা অয়েল পেন্টিং পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।

পুরকায়স্থ মশাইয়ের আঁকার ঢং যাকে বলে আধুনিক, তার সঙ্গে বাস্তব জগতের সাদৃশ্য সামান্যই পাওয়া যায়। তাঁর মানুষগুলিকে মনে হয় অক্ষম কারিগরের হাতের তৈরি পুতুল, গাছগুলিকে মনে হয় খ্যাংরা কাঠির ঝাঁটা, আকাশের মেঘগুলিকে মনে হয় ভাসমান মাংসপিণ্ড, আর তার পশুপক্ষীর সঙ্গে প্রকৃতি বা চিড়িয়াখানার মিল নেই। কিন্তু আজকাল এই রীতিতে শিল্পরসিকরা অভ্যস্ত, তাই এমন ছবি এঁকেও পুরকায়স্থর রোজগারে কোনও খামতি নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও জুড়ি যে মানুষের প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট আঁকার ব্যাপারেও পুরকায়স্থের জুড়ি মেলা ভার। এখানে তিনি আধুনিক রীতি ব্যবহার করেন না, ছবি দেখলে মানুষ বলেই মনে হয়, এবং যাঁর ছবি আঁকা হয় তাঁর সঙ্গে চমৎকার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই পোর্ট্রেট আঁকতেও রঞ্জনবাবুকে মাঝেসাঝে হিল্লি দিল্লি করতে হয়, এবং এতেও তাঁর রোজগার হয় ভালই। প্রমাণ সাইজের একটি অয়েল পেন্টিং-এ তিনি পনেরো হাজার টাকা করে নেন। ইচ্ছে আছে আগামী বছর থেকে সেটা পঁচিশে তুলবেন। ফোটোগ্রাফির যুগেও যে কোনও কোনও ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের ছবি আঁকাতে ভালবাসে সেটা রঞ্জনবাবুর ক্ষেত্রে বারবার প্রমাণ হয়ে গেছে।

এক রবিবার সকালে রঞ্জনবাবুর রিচি রোডের সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে এক ব্যক্তির আগমন হল। দেখেই বোঝা যায় ইনি অর্থবান, লম্বা দশাসই চেহারা, পরনে র' সিল্কের স্যুট, হাতের পাঁচ আঙুলে আংটি। চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ পরিষ্কার। ভদ্রলোক বললেন তাঁর নাম শ্রীবিলাস মল্লিক।

মল্লিকমশাইয়ের শখ রঞ্জন পুরকায়স্থকে দিয়ে নিজের একটি পোর্ট্রেট আঁকেন, এবং সেটি হবে লাইফ-সাইজ পূর্ণাঙ্গ পোর্ট্রেট। তার জন্য যা খরচ লাগে তা তিনি দিতে রাজি আছেন। রঞ্জনবাবু ভদ্রলোকের নাম শুনে চিনলেন তিনি কলকাতার সবচেয়ে অর্থবান ব্যবসায়ীদের অন্যতম। 'কত মূল্য লাগবে?' জিজ্ঞেস করলেন শ্রীবিলাস মল্লিক। 'পঞ্চাশ হাজার', সোজাসুজি বললেন রঞ্জন পুরকায়স্থ। খদ্দের এককথায় রাজি।

রঞ্জনবাবুর হাতে একটা অসমাপ্ত ছবি ছিল—একটা বড় পেন্টিং—যেটা শেষ করতে লাগবে আরও সাতদিন। সেই হিসেব করে মল্লিকমশাইকে দিনক্ষণ বলে দিলেন শিল্পী। রোজ সকালে ন'টায় এক ঘণ্টার জন্য সিটিং দিতে হবে।

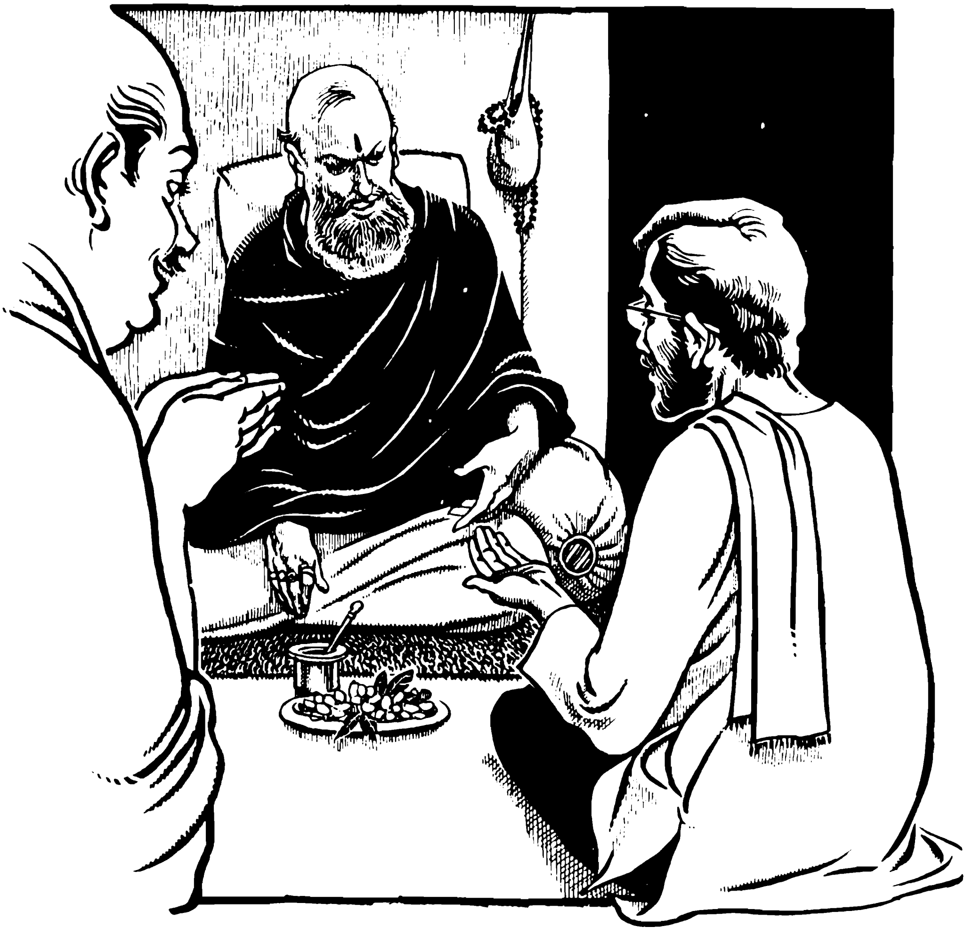

'ছবি শেষ হবে কতদিনে?' জিজ্ঞেস করলেন শ্রীবিলাস মল্লিক।

'দিন পনেরো,' বললেন রঞ্জনবাবু।

'ভেরি ওয়েল,' বললেন মল্লিকমশাই, 'সেটলড্।...ইয়ে, আপনার আগাম কিছু লাগবে কি?'

'আজ্ঞে না।'

কোনও বড় কাজে হাত দেওয়ার আগে রঞ্জনবাবু তাঁর গুরুর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতেন। বাবাজির নাম সরলানন্দ স্বামী, দশ বছর আগে রঞ্জনবাবু এনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, অনেক ব্যাপারেই এঁর পরামর্শ নেন, স্বামীজিও তাঁর শিষ্যকে খুবই স্নেহ করেন। ভদ্রলোকের অনেক ক্ষমতা, তার মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী একটি।

শিষ্যের কাছে সব শুনেটুনে মিনিট তিনেক ধ্যানস্থ থেকে স্বামীজি বললেন, 'সংকট আছে।'

'কী সংকট, স্বামীজি?'

'অনেক বিপত্তি। এ কাজটা নিয়ে তুই ভাল করিসনি।'

'তবে কি ভদ্রলোককে বারণ করে দেব?'

'দাঁড়া।'

বাবাজি আবার চোখ বুঁজলেন, আর বসে বসে আগুপিছু দুলতে লাগলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট এইভাবে চলার পর বাবাজি আবার চোখ খুললেন। রঞ্জনবাবু উৎকণ্ঠিত চিত্তে

গুরুর দিকে চেয়ে আছেন। গুরু বললেন, 'শেষ পর্যন্ত সব বিপত্তি উতরে সাফল্যই দেখতে পাচ্ছি। না, লেগে পড় কাজে।'

রঞ্জন পুরকায়স্থ পরম নিশ্চিন্তে বাবার পদধূলি নিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

শনিবার সাতই মাঘ শ্রীবিলাস মল্লিকের পোর্ট্রেট আঁকার কাজ শুরু হল। মল্লিকমশাই আমুদে মানুষ—আগেই জেনে নিলেন মাঝে মাঝে কথা বলা চলবে কিনা। সচরাচর এ ব্যাপারে পুরকায়স্থ অনুমতি দেন না, কিন্তু এতবড় খদ্দেরের বেলা তাঁকে হ্যাঁ বলতে হল। 'তবে ঘাড় ঘোরানো চলবে না। কথা বললে একদিকে, অর্থাৎ আমার ডান কাঁধের দিকে চেয়ে বলতে হবে।'

ক্যানভাসে চারকোলের প্রথম টান যখন পড়ল তখন সকাল সোয়া ন'টা।

দিনে দিনে ক্যানভাসে শ্রীবিলাস মল্লিকের চেহারা ফুটে উঠতে লাগল। অত্যন্ত নিপুণ শিল্পী তাতে সন্দেহ নেই, তবে এই অবস্থায় তাঁর কাজ দেখার লোক একমাত্র শিল্পী নিজেই। যাঁর ছবি আঁকা হচ্ছে তিনি দেখবেন ছবি একেবারে শেষ হলে। এই শর্তটার কথা আগে বলা হয়নি। মল্লিকমশাইও এই শর্তে আপত্তি করেননি।

বারোদিনের দিন পোর্ট্রেট যখন প্রায় হয়ে এসেছে তখন সিটিং দেওয়ার মাঝখানে আধ ঘণ্টার মাথায় শ্রীবিলাস মল্লিক বলে উঠলেন তাঁর মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। রঞ্জনবাবু কাজ থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি তা হলে বাড়ি চলে যান। আর তো প্রায় হয়েই এসেছে, কাল সুস্থ বোধ করলে আবার আসবেন।'

কিন্তু পরদিনও সুস্থ বোধ করলেন না শ্রীবিলাস মল্লিক। শুধু তাই নয়, তাঁর জ্বর এল প্রায় ১০৩ ডিগ্রি।

তিনদিনের দিন বোঝা গেল ব্যারাম গুরুতর, নার্সিংহোমে চালান দিতে হবে রুগিকে। রঞ্জন পুরকায়স্থ ইজেল থেকে পোর্ট্রেট নামিয়ে পাশে সরিয়ে রেখে একটা আনকোরা নতুন ক্যানভাস চাপিয়ে তাতে আধুনিক ঢঙে একটি ল্যান্ডস্কেপ শুরু করলেন।

দেড়মাস নার্সিংহোমে থেকে ব্যারাম-মুক্ত হয়ে শ্রীবিলাস মল্লিক যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর চেহারার সঙ্গে আগের চেহারার কোনও মিলই নেই। ওজন ৯০ কিলো থেকে নেমে হয়েছে ৭২ কিলো। গাল বসে গেছে, চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। রঞ্জন পুরকায়স্থকে খবর পাঠালেন—ছবি এখন থাক। চেহারা আরেকটু ভাল হলে আবার নতুন করে সিটিং দেওয়া যাবে।

এক মাস পরে শ্রীবিলাস মল্লিকের চেহারা আরেকটু ভদ্রস্থ হল। তবে আগের চেহারার সঙ্গে এখনও কোনও মিল নেই। মল্লিক বললেন, 'এই অবস্থাতেই আবার নতুন করে ছবি আঁকা হোক।' ডাক্তারেরা তাঁকে ডায়াট কন্ট্রোল করতে বলেছেন, তাই আশি কিলোর চেয়ে ওজন আর তাঁর বাড়বে না।

রঞ্জন পুরকায়স্থ ইজেলে আবার নতুন ক্যানভাস লাগালেন। মল্লিকমশাইয়ের জামাকাপড় আবার সবই নতুন করে খাটো করে করতে হয়েছে। তবে এটা ঠিকই যে, মানুষটাকে এখন দেখলে আর অসুস্থ বলে মনে হয় না।

চারদিন আঁকার পর একদিন বিকেলে রঞ্জনবাবু তাঁর ফিয়াট গাড়িতে করে নিউমার্কেট গিয়েছিলেন একটু বাজার করতে। বাড়ি ফেরার পথে পার্ক স্ট্রিটের মোড় ছাড়িয়ে খানিকদূর যেতেই একটা মিনি বাস দ্রুতবেগে বেপরোয়া ভাবে এসে তাঁর গাড়ির ডান দিকে মারল ধাক্কা। গাড়ি তো ড্যামেজ হলই, সেইসঙ্গে রঞ্জনবাবুর ডান হাতটা গুরুতর ভাবে আঘাত পেল।

হাসপাতালে গিয়ে এক্স-রে করে দেখা গেল, কনুই গেছে, কবজি গেছে আর বুড়ো আঙুলটা গেছে।

প্লাস্টারে দু' মাস থেকে যা দাঁড়াল তাতে এইটুকুই বোঝা গেল যে রঞ্জন পুরকায়স্থ তাঁর অঙ্কনের দক্ষতা আর কোনওদিন ফিরে পাবেন না। যত গোলমাল ওই বুড়ো আঙুলে। তর্জনী আর মাঝের আঙুলে তুলি বেঁধে ছবি এঁকে মডার্ন আর্ট হয়, কিন্তু স্বাভাবিক পোর্ট্রেট হয় না।

রঞ্জনবাবু এতই ঘা খেলেন যে, তিনি কাজকর্ম ছেড়ে কিছুকালের জন্য তীর্থভ্রমণে চলে গেলেন। তিন মাস কাশী হরিদ্বার হৃষীকেশ লছমনঝুলা ঘুরে বাড়িতে ফিরে ওই দুই আঙুলেই আবার ছবি আঁকা শুরু করলেন। তার ফলে কাজ ঢিমে হয়ে এল, ছবির চেহারাই পালটে গেল। এ ছবির জন্য আর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা চাওয়া যায় না। রঞ্জনবাবু বুঝলেন যে, তাঁকে আবার নতুন করে বাজার তৈরি

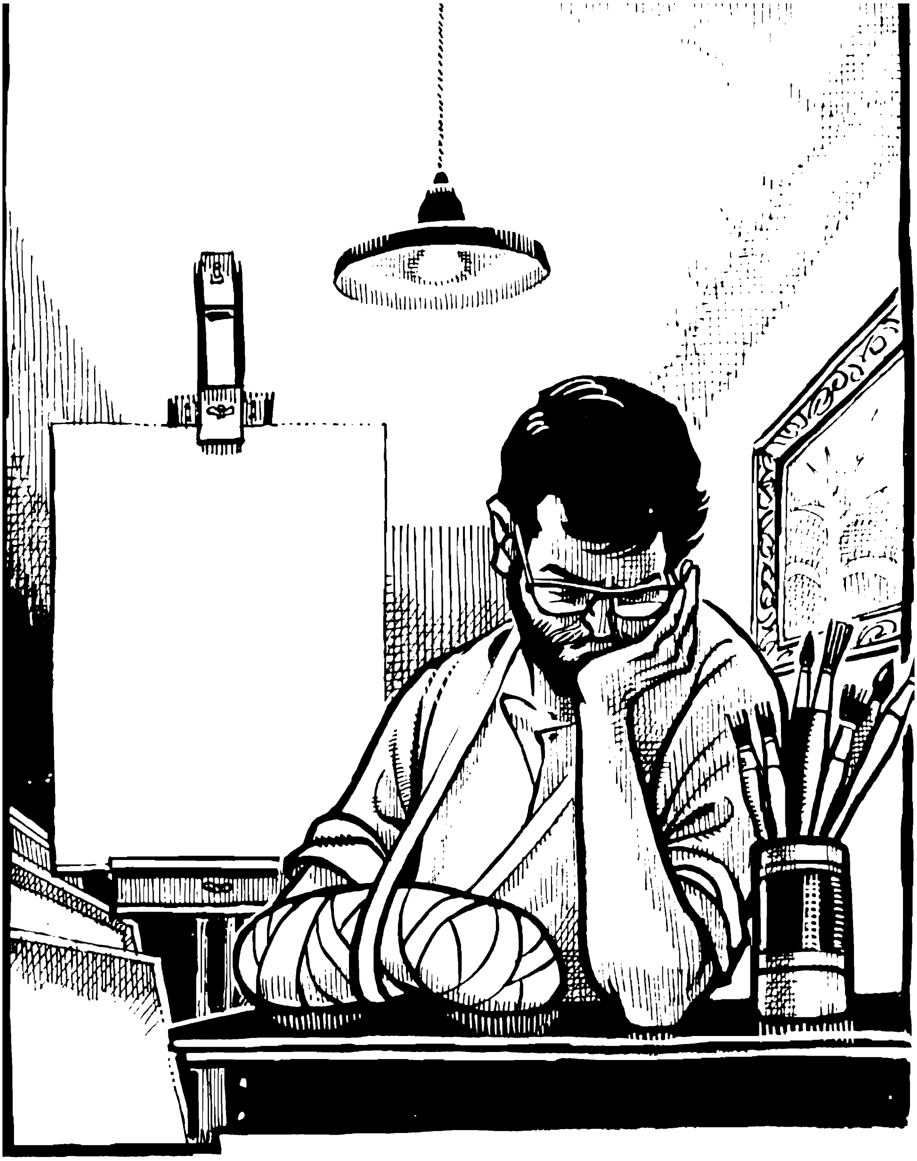

করতে হবে। ইতিমধ্যে শ্রীবিলাস মল্লিক তাঁর খোঁজ নিয়েছেন, তাঁকে সমবেদনা জানিয়েছেন, এবং আক্ষেপ জানিয়েছেন যে পুরকায়স্থমশাই-এর করা একটি পোর্ট্রেট তাঁর বাড়িতে রইল না।

আরও তিন মাস পরিশ্রম করে দু' আঙুলে তুলি চালিয়ে রঞ্জন পুরকায়স্থ মোটামুটি একটা নিজস্ব স্টাইল উদ্ভব করেছেন, এবং ক্রমে তাঁর আঁকার কদর বাড়ছে। এর মধ্যে একদিন রবিবার সকালে চাকর এসে তাঁর স্টুডিওতে খবর দিল যে, একজন ভদ্রলোক পুরকায়স্থমশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

'এঁকে আপনি চেনেন,' বলল চাকর।

রঞ্জনবাবু নীচে নেমে এলেন। বৈঠকখানায় ঢুকে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সেই দশাসই বপু এবং হুবহু আগের সেই চেহারা নিয়ে শ্রীবিলাস মল্লিক।

'কী ব্যাপার বলুন তো?' জিজ্ঞেস করলেন রঞ্জন পুরকায়স্থ।

'কিছুই না,' বললেন শ্রীবিলাস মল্লিক, 'আমি অত্যন্ত ভোজনপ্রিয় মানুষ। ডাক্তারের কথা রাখতে পারলাম না—ডায়াট কন্ট্রোল আমার দ্বারা হল না, তাই দেখতে দেখতে আগের চেহারায় এসে গেছি। আমার সেই ছবিটা নষ্ট করে ফেলেননি তো?'

'মোটেই না। তবে তাতে দু-একটা আঁচড় দিতে হবে—সেটা আমি দু' আঙুলেই পারব। আপনি একবার কাল সকালে ঘণ্টাখানেকের জন্য আসতে পারেন কি?'

'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। আর ইয়ে, আপনার রেটটাও এতদিনে নিশ্চয়ই বেড়েছে। ওই পোর্ট্রেটের জন্য যা দর ধরা হয়েছিল, আমি এখন তার চেয়ে কিছু বেশি দিতে চাই। আশা করি আপনার কোনও আপত্তি হবে না।'

সন্দেশ, শারদীয় ১৪০০; রচনাকাল ১১ অক্টোবর, ১৯৮৬

তারিণীখুড়ো ও ঐন্দ্রজালিক

'কই, আর সব কই?' বললেন তারিণীখুড়ো। 'সব্বাইকে খবর দে, নইলে গপ্প জমবে কী করে?'

আমি বললাম, 'খবর পাঠানো হয়ে গেছে খুড়ো। এই এসে পড়ল বলে!'

'তা হলে এই ফাঁকে চা-টা বলে দে।'

বললাম, 'তাও বলা হয়ে গেছে—দুধ চিনি ছাড়া চা।'

'ভেরি গুড।'

মিনিট তিনেকের মধ্যেই ন্যাপলারা এসে পড়ল। বলল, ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিল। অর্ণব দি গ্রেট। খুব ভাল লেগেছে।

খুড়ো বলল, 'ম্যাজিকের কথাই যদি বলিস, তা হলে তোদের বলেই ফেলি—কিছুকাল ম্যাজিশিয়ানের ম্যানেজার ছিলাম। অবিশ্যি তোরা তখনও জন্মাসনি।'

'কী নাম ম্যাজিশিয়ানের?' ন্যাপলা জিজ্ঞেস করল।

'আসল নাম জানি না, তবে স্টেজের নাম ছিল চমকলাল। বাঙালি না, পশ্চিমের লোক। বছর পঁচিশেক আগের কথা। খুব নাম করেছিল। ম্যানেজারের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। আমি একবার ভদ্রলোকের ম্যাজিক দেখে নিয়ে তারপর অ্যাপ্লাই করি। যেমন তেমন খেলোয়াড় না হলে তার ম্যানেজারি করতে যাব কেন? তবে এ দেখলাম খাঁটি মাল। যাকে বলে 'স্টেজ ইলিউশন' তা তো আছেই, আবার তার সঙ্গে আছে 'থট রিডিং'। সে এক অবাক করা ব্যাপার। সবচেয়ে শেষে আসত এই খেলা। জাদুকরের চোখ বেঁধে দেওয়া হত। তারপর স্টেজের দিকে ফিরে বসে এক-একজন দর্শকের সিটের নাম্বার বলে তার সম্বন্ধে ঝুড়ি ঝুড়ি তথ্য বলে যেতেন চমকলাল। সে লোক কী চাকরি করে, তার কোনও ব্যারাম আছে কিনা, সে কী খেতে ভালবাসে, সম্প্রতি কী থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখেছে—একেবারে একধার থেকে সব। এমন আশ্চর্য খেলা আমি কখনও দেখিনি।

'এই খেলা দেখে ইম্প্রেসড্ হয়ে আমি ভদ্রলোককে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাই। তারপর ডাক পড়ল, গিয়ে কথা বললুম, সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হয়ে গেল। আমার নিজেরও একটু শখ ছিল দু-একটা—সেটা শুনে ভদ্রলোক বোধহয় আরও খুশি হলেন।

'ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের বেশি না, বেশ বনেদি চেহারা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর গোঁফ, টিকলো নাক, আর চোখ দুটো যাকে বলে দেদীপ্যমান। ওরকম জ্বলজ্বলে চোখ আমি খুব কম মানুষের দেখেছি।'

চা এল, তাই তারিণীখুড়োর কথা কিছুক্ষণের জন্য থামল। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি, আর মনে মনে ভাবছি কতরকম কাজই না করেছেন ভদ্রলোক জীবনে। এইটেই হল তারিণীখুড়োর বিশেষত্ব। এক জায়গায় বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি। এখন অবিশ্যি আর কাজ-টাজ করেন না। বেনেটোলা লেনে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে রয়েছেন, আর সেইখান থেকে হেঁটে আসেন এই বালিগঞ্জে আমাদের গল্প শোনাতে। বলেন বুড়োদের কোম্পানি নাকি ওঁর ভাল লাগে না। খুড়ো অবিশ্যি বিয়ে করেননি, তাই সংসারের চিন্তা যাকে বলে সেটা ওঁর নেই।

চায়ে পর পর দুটো চুমুক দিয়ে একটা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ি ধরিয়ে খুড়ো আবার বলতে শুরু করলেন।

'চমকলালের সঙ্গে গোড়া থেকেই আমার একটা ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তেমন মুডে থাকলে আমাকে দু-একটা ছোটখাটো ম্যাজিকও শিখিয়ে দিতেন। ওঁর টুরের প্রোগ্রাম আমিই করতাম—আর সে বিরাট টুর। ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশ বাদ নেই। আর সব জায়গাতেই সাকসেস। চমকলাল

বলতে ছেলে বুড়ো সবাই অজ্ঞান।

একদিন বস্ আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি তারাপুর স্টেটের নাম শুনেছ?' নামটা চেনা চেনা লাগলেও বললাম, শুনিনি। চমকলাল বললেন, 'ফৈজাবাদ থেকে ৫৬ মাইল দক্ষিণে! ভাল মোটরের রাস্তা আছে।'

আমি বললাম, 'হঠাৎ তারাপুর কেন?'

'তারাপুর একটা নেটিভ স্টেট,' বললেন চমকলাল, 'সেখানকার রাজার খুব ম্যাজিকের শখ এটা আমি জানি। তাই একবার আমার জাদু দেখানোর ইচ্ছে করছে। দেখো যদি পারো অ্যারেঞ্জ করতে। রাজার ম্যানেজারকে একটা চিঠি ছেড়ে দাও, তারপর দেখো কী হয়।'

আমি তাই দিলুম। সাতদিনের মধ্যেই জবাব চলে এল। রাজা চমকলালের নাম শুনেছেন, এবং তার ম্যাজিক দেখতে খুবই আগ্রহী।

আমরা তো লটবহর নিয়ে একটা বিশেষ দিনে ফৈজাবাদ পৌঁছে গেলুম। এগারোটা ট্রাঙ্ক, তার জন্য একটা লরির ব্যবস্থা করার কথা আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছিলুম। ফৈজাবাদেই রাজার ম্যানেজার মাধো সিং হাজির ছিলেন, আমাদের খুব আপ্যায়ন করে একটা বড় স্টুডিবেকার গাড়িতে তুলে দিলেন।

রাজবাড়ি পৌঁছে প্রথমে যে যার নিজের ঘরে একটু বিশ্রাম করলুম, তারপর ডাক পড়লে রাজার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, বেশ ধারালো চেহারা, বললেন ছেলেবেলা থেকে ম্যাজিকের শখ। প্রাসাদের বাইরে আলাদা স্টেজ আছে। তাতে গান বাজনা থিয়েটার ম্যাজিক সবই হয়, সেখানেই চমকলাল তাঁর খেলা দেখাবেন।

প্রথম দু' দিন গাড়িতে ঘুরে তারাপুরের দৃশ্য, পুরনো কেল্লা, জঙ্গলের মধ্যে তারাসুন্দরীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি দেখেই কেটে গেল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা শো। স্টেজটা একবার ভাল করে দেখে নিলুম—সব ঠিক আছে। আটশো লোক ধরে থিয়েটারে; হাউস যে ফুল হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ম্যাজিক দারুণ হল। এখানের লোকে যে এ জিনিস কখনও দেখেনি সেটা তাদের হাবেভাবেই বুঝতে পারছিলুম। ম্যাজিকে এংকোর দেয় শুনেছিস কখনও? তারাপুরে তাও হয়েছিল। একই ম্যাজিক দু'বার করে দেখাতে হল।

সবশেষে এল থট রিডিং-এর খেলা। জনা চার-পাঁচ লোকের বিষয় আশ্চর্য সব তথ্য বলে দিয়ে চমকলাল হঠাৎ বললেন, 'আমি এবার হিজ হাইনেস-এর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আশা করি তাঁর কোনও আপত্তি হবে না।'

রাজা একটু যেন উসখুস করে তারপর বললেন, 'গো অ্যাহেড।'

চমকলাল অবশ্য প্রথমেই অ্যাপলজাইজ করে নিলেন রাজাকে বাছাই করার জন্য। তারপর চলল রাজা সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন। বারো বছর বয়সে রাজার টাইফয়েড হয়েছিল, বাঁচার কোনও আশা ছিল না, শেষে এক ফকিরের ঝাড়ফুঁকে ভাল হয়ে ওঠেন। রাজা ব্যাপারটা স্বীকার করলেন। তারপর চমকলাল বললেন যে, রাজার একটা আশ্চর্য গুণ হল যে তিনি দু' হাতেই লিখতে পারেন। এটাও রাজা স্বীকার করলেন। তারপর জানা গেল রাজা একবার একটা বাঘ মারতে গিয়ে সেই বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পিঠে আঁচড় খান। তারপর শিকারের দলের এক সাহেব, নাম ডানকান কুক্, বাঘটাকে গুলি করে মারেন। রাজা এই ঘটনাও অস্বীকার করলেন না। তারপর চমকলাল বললেন, 'আপনার সম্পত্তির মধ্যে যেটিকে আপনি সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে করেন, সেটা যদি একবার সকলকে দেখান তা হলে আজকের সন্ধ্যার আমোদটা পরিপূর্ণ হয়। এতে আপনি রাজি হবেন কি? আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন আমি কোন জিনিসটার কথা বলছি। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেটাকে, আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে, আমি চাই এই সভায় উপস্থিত সকলকে সেটা আপনি একবার দেখান।'

রাজা দেখলাম খুব স্পোর্টিং। কী সম্পত্তির কথা বলছেন চমকলাল সেটা আমিও জানি না, কিন্তু বুঝতেই পারছি মহামূল্য কোনও জিনিস।

রাজা বললেন, 'যে সম্পত্তিটার কথা জাদুকর বলছেন সেটা আমি কখনও কাউকে দেখাই না, কিন্তু আজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন। আজ আমার জন্মতিথি, তাই জাদুকরের অনুরোধ আমি রাখছি।'

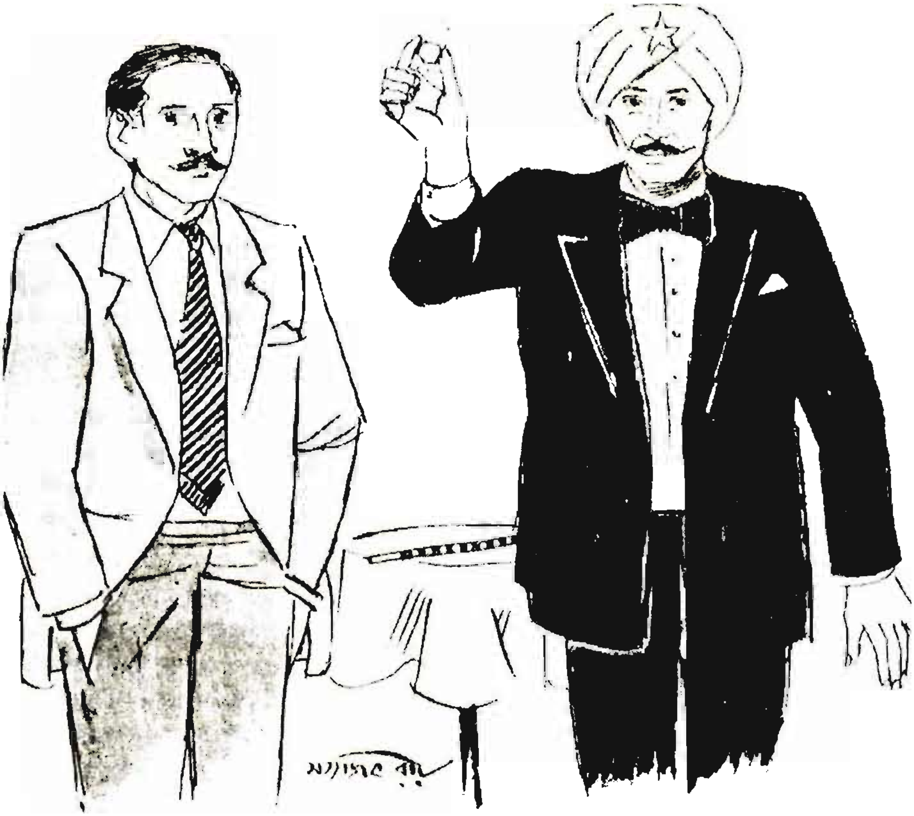

রাজা তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গিয়ে আবার দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। চমকলালের থট রিডিং-এর খেলা শেষ হয়ে গেছে, তাই তিনি চোখের বাঁধন খুলে ফেলেছেন। রাজা তাঁর হাতে একটা জিনিস দিয়ে বললেন, 'এটা আমি জাদুকরকেই অনুরোধ করছি সভার সকলকে দেখাতে।'

চমকলাল যে জিনিসটা তুলে ধরলেন, এবং যেটা স্টেজ লাইটের আলোতে ঝলমল করছিল সেটা একরকম মহামূল্য পাথর। রঙ সবুজ, কাজেই মরকত বলেই মনে হয়, কিন্তু এত বড় মরকত আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

এদিকে সভায় হাততালির চোটে কান পাতা যায় না। রাজা চমকলালের হাত থেকে মণিটা নিয়ে আবার চলে গেলেন সেটাকে রাখতে। তারপর ফিরে এসে চমকলালের হাতে এক থলি মুদ্রা ইনাম দিয়ে শোয়ের কাজটা সারলেন। পরে দেখেছিলাম মুদ্রাগুলি সোনার।

কেন সেটা বলতে পারব না, আমার মনের মধ্যে একটা খট্‌কা লাগছিল। সেটা অবিশ্যি চমকলাল বুঝতে পারলেন, থট রিডিং-এর জোরে। ট্রেনে যখন ফিরছি, তখন আমাকে বললেন, 'কী ব্যানার্জি, এত কী ভাবছ?'

আমি আর কী বলি? বললাম যে, 'তারাপুরের সমস্ত ব্যাপারটা আমার মনে একটা খটকার সৃষ্টি করছে। প্রথমত, এত জায়গা থাকতে তারাপুর কেন?'

চমকলাল বললেন, 'তার কারণ জানতে চাও?'

বললাম, 'খুবই কৌতূহল হচ্ছে।'

'তা হলে তোমাকে একটা গল্প বলতে হয়।'

'তা বলুন না।'

'তোমার ধৈর্যচ্যুতি হবে না তো?'
'মোটেই না।'
'তবে শোনো। ওই যে পাথরটা দেখলে সেটা কোথায় পাওয়া যায় জানো?'
'কোথায়?'
'তারাসুন্দরীর মন্দিরে বিগ্রহের গলা থেকে খুলে নেওয়া।'
'তাই বুঝি?'
'তারাপুরের রাজা মহেন্দ্র সিং তখন বেঁচে। তাঁর দুই ছেলে ছিল। বড় হল সূরয আর ছোট চন্দ্র। তারা দু'জনেই ছিল ওস্তাদ শিকারি। দুই ভাই একদিন শিকার করতে যায় তারাপুরের জঙ্গলে। গভীর বন, তাতে দিনের আলো প্রায় প্রবেশ করে না বললেই চলে। সেই বনে শিকার খুঁজতে খুঁজতে বড় ভাই সূরয সিং তারাসুন্দরীর মন্দিরটা দেখতে পায়, এবং ওর ভাইকে দেখায়। দু'জনে একসঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করে। সূরয সিং ছিল সভ্যভব্য, কিন্তু চন্দ্র সিং অত্যন্ত লোভী প্রকৃতির। সে বিগ্রহের গলায় মরকত মণিটা দেখেই সেটাকে হাত করে নেয়। এ ব্যাপারে সূরয আপত্তি করেছিল, কিন্তু চন্দ্র তাতে কান দেয়নি।
'তারপর কিছুকাল কেটে যায়। রাজা মহেন্দ্র সিং এই মরকত মণির বিষয় কিছুই জানেন না; এদিকে চিরকালের লোভী চন্দ্র সিং এখন গদিতে বসার লোভ করছে। কিন্তু নিয়মমতো সিংহাসন পাবার কথা বড় ছেলে সূরয সিং-এর।
'চন্দ্র সিং তখন চূড়ান্ত উপায় অবলম্বন করল। বড় ভাইয়ের শরবতে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করল। সূরয সিং-এর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হল। পাছে ডাক্তার কিছু সন্দেহ করে সূরয সিং-এর লাশ পরীক্ষা করেন তাই চন্দ্র সিং চটপট তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা করে লাশ শ্মশানে পাঠিয়ে দিল।
'সেটা ছিল শ্রাবণ মাস। বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হল শ্মশানে। যারা শবযাত্রায় গিয়েছিল তারা সকলেই শব ফেলে দিয়ে পালাল—যেমন হয়েছিল ভাওয়াল রাজকুমারের বেলায়।
'এদিকে বৃষ্টিতে ভিজেই হোক, আর যে কোনও কারণেই হোক, চিতায় শোয়ানো সূরয সিং-এর দেহে আবার প্রাণ ফিরে এল। আসলে সে মরেনি; ডাক্তারের ভুলে তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে চন্দ্র সিং আগেই ডাক্তারকে মোটা ঘুষ দিয়ে রেখেছিল, কারণ সূরয সিং-এর স্বাস্থ্য ছিল অত্যন্ত ভাল।
'যাই হোক, সূরয সিং এখন চিতা থেকে উঠে পড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগল। কী হয়েছে সেটাও সে ঠিক করে বুঝতে পারল না।
'শ্মশানের কাছেই এক কুটির, সে কুটিরে থাকত এক তান্ত্রিক। তিনি ছিলেন পিশাচসিদ্ধ; তন্ত্রের অনেক কায়দাকানুন তাঁর জানা ছিল। তিনি সূরয সিংকে দেখে চিনতেও পারলেন, এবং অনুকম্পাবশত তাঁর কুটিরে আশ্রয় দিলেন। তারপর তিনিই মন্ত্রবলে সব ঘটনা বুঝতে পেরে সূরযকে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'তুই নতুন জীবন পেয়েছিস, আমার কাছে এখন কিছুদিন থাক, এখনও তোর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয়—তারপর এই নতুন জীবনের সদ্ব্যবহার কর। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি তোর কপালে যশলাভ আছে। তোকে কী করতে হবে সেটা আমি বাতলে দেব। রাজা হওয়া তোর কপালে নেই; সেটা তোর ছোট ভাই-ই হবে।'
'সূরয সিং রইল তান্ত্রিকের কাছে দেড় বছর। সেই সময় সে একটা জিনিস শিক্ষা করল; সেটা হল ইন্দ্রজাল। তান্ত্রিক তাঁর সমস্ত ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা সূরযকে দিয়ে দিলেন। তারপর সূরয একদিন সাধুকে ছেড়ে নিজের পথ দেখল। সে পথে সে অনেকদূর এগোল, এবং নতুন পাওয়া জীবনের সে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল।'
চমকলাল থামলেন। আমি তো ব্যাপারটা বুঝেই ফেলেছি। বললাম, 'সূরয সিং আর চমকলাল তো একই লোক, তাই নয় কি?'
চমকলাল মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছ।'
আমি বললাম, 'কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না; আপনার উপর যে লোক এত অত্যাচার করল, আপনাকে হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করল—তাঁকে আপনি শুধু ম্যাজিক দেখিয়ে ছেড়ে

দিলেন? আপনার মধ্যে কি প্রতিহিংসার ভাব ছিল না মোটেই?'

'তা থাকবে না কেন—আমি তো মানুষ।'

'তা হলে?'

'তা হলে আর কী? তা হলে এই!'

এই বলে চমকলাল তাঁর পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে আমার সামনে ধরলেন। তাঁর তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে থেকে চোখ-ধাঁধানো রশ্মি আমাকে প্রায় অন্ধ করে দিল।

'এই হল তারাসুন্দরীর অলঙ্কারের মরকত। রাজার কাছে এখন যেটা রয়েছে সেটা ভুয়ো, জাল। সেটা আমি তৈরি করিয়ে রাখি তারাপুর যাবার আগে। সামান্য হাত সাফাইয়ের ব্যাপার আর কি!'

সন্দেশ, কার্তিক ১৩৯৩

অনুকূল

'এর একটা নাম আছে তো?' নিকুঞ্জবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বইকী!'

'কী বলে ডাকব?'

'অনুকূল।'

চৌরঙ্গিতে রোবট সাপ্লাই এজেন্সির দোকানটা খুলেছে মাস ছয়েক হল। নিকুঞ্জবাবুর অনেকদিনের শখ একটা যান্ত্রিক চাকর রাখেন। ইদানীং ব্যবসায় বেশ ভাল আয় হয়েছে, তাই শখটা মিটিয়ে নেবার জন্য এসেছেন।

নিকুঞ্জবাবু রোবটটার দিকে চাইলেন। এটা হচ্ছে যাকে বলে অ্যান্ড্রয়েড, অর্থাৎ যদিও যান্ত্রিক, তাও চেহারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের চেহারার কোনও তফাত নেই। দিব্যি সুশ্রী দেখতে, বয়স মনে হয় বাইশ-তেইশের বেশি নয়।

'কী ধরনের কাজ করবে এই রোবট?' জিজ্ঞেস করলেন নিকুঞ্জবাবু। ডেস্কের উলটো দিকের ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'সাধারণ চাকর যা পারে, ও তার সবই পারবে। কেবল রান্নাটা জানে না। তা ছাড়া, ঘর ঝাড়পোঁছ করা, বিছানা পাতা, কাপড় কাচা, চা দেওয়া, দরজা-জানলা খোলা বা বন্ধ করা—সবই পারবে। তবে হ্যাঁ—ও যা কাজ করবে সবই বাড়িতে। ওকে দিয়ে বাজার করানো চলবে না, বা পান-সিগারেট আনাতে পারবেন না। আর ইয়ে—ওকে কিন্তু তুমি বলে সম্বোধন করবেন। তুইটা ও পছন্দ করে না।'

'এমনি মেজাজ-টেজাজ ভাল তো?'

'খুব ভাল। সে-দিক দিয়ে ট্রাবল আসবে যদি আপনি কোনও কারণে ওর গায়ে হাত তোলেন। আমাদের রোবটরা ওটা একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না।'

'সেটার অবিশ্যি কোনও সম্ভাবনা নেই; কিন্তু ধরুন, যদি কেউ ওকে একটা চড় মারল, তা হলে কী হবে?'

'তা হলে ও তার প্রতিশোধ নেবে।'

'কীভাবে?'

'ওর ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে ও হাই-ভোল্টেজ ইলেকট্রিক শক দিতে পারে।'

'তাতে মৃত্যু হতে পারে?'

'তা পারে বইকী! আর আইন এ-ব্যাপারে কিছু করতে পারে না, কারণ রক্ত-মাংসের মানুষকে যে শাস্তি দেওয়া চলে, যান্ত্রিক মানুষকে তা চলে না। তবে এটা বলতে পারি যে, এখনও পর্যন্ত এরকম কোনও কেস হয়নি।'

'রাত্তিরে কি ও ঘুমোয়?'

'না। রোবটরা ঘুমোয় না।'

'তা হলে এতটা সময় কী করে?'

'চুপ করে বসে থাকে। রোবটের ধৈর্যের অভাব নেই।'

'ওর কি মন বলে কোনও বস্তু আছে?'

'ওরা এমন অনেক কিছু বুঝতে পারে, যা সাধারণ মানুষ পারে না। এ গুণটা সব রোবটের যে সমান পরিমাণে থাকে তা নয়; এটা খানিকটা লাকের ব্যাপার। এ গুণটা সময়ে প্রকাশ পায়।'

নিকুঞ্জবাবু রোবটটার দিকে ফিরে বললেন, 'অনুকূল, আমার বাড়িতে কাজ করতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'কেন থাকবে?' ষোলো আনা মানুষের মতো গলায় বলল অনুকূল। তার পরনে একটা নীল ডোরা কাটা শার্ট আর কালো হাফপ্যান্ট, বাঁ পাশে টেরি আর পাট করে আঁচড়ানো চুল, গায়ের রঙ বেশ ফরসা, দাঁতগুলো ঝকঝকে আর ঠোঁটের কোণে সবসময়ই যেন একটা হালকা হাসি লেগে আছে। চেহারা দেখে মনে বেশ ভরসা আসে।

'তা হলে চলো।'

নিকুঞ্জবাবুর মারুতি ভ্যান দোকানের বাইরেই অপেক্ষা করছিল, অনুকূলের জন্য চেকটা দিয়ে রসিদ নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তিনি লক্ষ করলেন যে, ভৃত্যের হাঁটাচলা দেখেও সে যে যান্ত্রিক মানুষ, সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই।

নিকুঞ্জবাবু বাড়ি করেছেন সল্ট লেকে। বিয়ে করেননি, তবে বন্ধুবান্ধব কয়েকজন আছে, তারা সন্ধ্যাবেলা আসে তাস খেলতে। তাদের আগে থেকেই বলা ছিল যে, বাড়িতে একটি যান্ত্রিক চাকর আসছে। কেনার আগে অবিশ্যি নিকুঞ্জবাবু খোঁজ নিয়ে নিয়েছিলেন। এই ক' মাসে কলকাতার বেশ কিছু উপরের মহলের বাড়িতে রোবট-ভৃত্য বহাল হয়েছে। মানসুখানি, গিরিজা বোস, পঙ্কজ দত্তরায়, মিঃ ছাবরিয়া—সকলেই বললেন তাঁরা খুব স্যাটিসফাইড, এবং তাঁদের চাকর কোনও ট্রাবল দিচ্ছে না। 'মুখ খুলতে না খুলতেই ফরমাশ পালন করে আমার জীবনলাল', বললেন মানসুখানি। 'আমার তো মনে হয় ও শুধু যন্ত্র নয়, ওর মাথার মধ্যে মগজ আছে আর বুকের মধ্যে কলিজা আছে।'

সাতদিনের মধ্যে নিকুঞ্জবাবুরও সেই একই ধারণা হল। আশ্চর্য পরিপাটি কাজ করে অনুকূল। শুধু তা-ই নয়, কাজের পারম্পর্যটাও সে বোঝে। বাবু স্নানের জল চাইলে সেটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সাবান তোয়ালে যথাস্থানে রেখে বাবু কী কাপড় পরবেন, কী জুতো পরবেন স্নান করে এসে, সেটাও পরিপাটি করে ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রেখে দেয়। আর সব ব্যাপারেই সে এত ভব্য যে তাকে তুমি ছেড়ে তুই বলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

নিকুঞ্জবাবুর বন্ধুদের অনুকূলকে মেনে নিতে একটু সময় লেগেছিল—বিশেষত বিনয় পাকড়াশি নিজের বাড়ির চাকরদের তুই বলে এমন অভ্যস্ত যে, অনুকূলকেও একদিন তুই বলে ফেলেছিলেন। তাতে অনুকূল গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমাকে তুই বললে কিন্তু তোকেও আমি তুই বলব।'

এর পর থেকে বিনয়বাবু আর কোনওদিন এ-ভুলটা করেননি।

নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে অনুকূলের একটা বেশ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল। অনুকূল বেশির ভাগ কাজই হুকুম দেবার আগেই করে ফেলে। এটা অবিশ্যি নিকুঞ্জবাবুর বেশ আশ্চর্য বলে মনে হয়, কিন্তু রোবট সাপ্লাই এজেন্সির মিঃ ভৌমিক বলেছিলেন যে, তাঁদের কোনও-কোনও রোবটের মস্তিষ্ক বলে একটা পদার্থ আছে, চিন্তাশক্তি আছে। অনুকূল নিশ্চয়ই সেই শ্রেণীর রোবটের মধ্যেই পড়ে গেছে। ঘুমোনোর ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিকুঞ্জবাবু ভৌমিকের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। যে এতটাই মানুষের মতো, সে সারারাত জেগে বসে থাকবে, এও কি সম্ভব? ব্যাপারটা যাচাই করতে তিনি একদিন মাঝরাত্তিরে চুপিসারে অনুকূলের ঘরে উঁকি দিতেই অনুকূল বলে উঠল, 'বাবু, আপনার কি কোনও

দরকার আছে?' নিকুঞ্জবাবু অপ্রস্তুত হয়ে 'না' বলে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

অনুকূলের সঙ্গে কাজের কথা ছাড়াও অন্য কথা বলে দেখেছেন নিকুঞ্জবাবু। তিনি দেখে আশ্চর্য হয়েছেন অনুকূলের জ্ঞানের পরিধিটা কত বিস্তীর্ণ। খেলাধূলা বায়স্কোপ থিয়েটার নাটক নভেল, সব কিছু নিয়েই কথা বলতে পারে অনুকূল। আর সত্যি বলতে কি, অনুকূল এসব বিষয় যত জানে, নিকুঞ্জবাবু তার অর্ধেকও জানেন না। বাহাদুরি বলতে হবে এই রোবট প্রস্তুতকারকদের। কত কী জ্ঞান পুরতে হয়েছে ওই যন্ত্রের মধ্যে।

কিন্তু সুসময়েরও শেষ আছে।

অনুকূল আসার এক বছরের মধ্যে নিকুঞ্জবাবু তাঁর ব্যবসায়ে কতকগুলো বেচাল চেলে তাঁর আর্থিক অবস্থার বেশ কিছুটা অবনতি করে ফেললেন। অনুকূলের জন্য মাসে তাঁর ভাড়া লাগে দু' হাজার টাকা। সে-টাকা এখনও তিনি নিয়মিত দিয়ে আসছেন, কিন্তু কতদিন পারবেন সেটাই হল প্রশ্ন। এবার একটু বেশি হিসেব করে চলতে হবে নিকুঞ্জবাবুকে। রোবট এজেন্সির নিয়ম হচ্ছে যে, এক মাসের ভাড়া বাকি পড়লেই তারা রোবটকে ফেরত নিয়ে নেবে।

কিন্তু হিসেবে গণ্ডগোল করে দিল একটা ব্যাপার।

ঠিক এই সময় নিকুঞ্জবাবুর সেজোকাকা এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'চন্দননগরে একা-একা আর ভাল লাগছে না, তাই ভাবলুম তোর সঙ্গে ক'টা দিন কাটিয়ে যাই।'

নিকুঞ্জবাবুর এই সেজোকাকা—নাম নিবারণ বাঁড়ুজ্যে—মাঝে-মাঝে ভাইপোর কাছে এসে ক'টা দিন থেকে যান। নিকুঞ্জবাবুর বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, তিন কাকার মধ্যে একমাত্র ইনিই অবশিষ্ট। খিটখিটে মেজাজের মানুষ, শোনা যায় ওকালতি করে অনেক পয়সা করেছেন, তবে বাইরের হালচালে তা বোঝার কোনও উপায় নেই। আসলে ভদ্রলোক বেজায় কঞ্জুষ।

'কাকা, এসেই যখন পড়েছেন তখন থাকবেন বইকী,' বললেন নিকুঞ্জবাবু, 'কিন্তু একটা ব্যাপার গোড়াতেই আপনাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। আমার একটি যান্ত্রিক চাকর হয়েছে। আজকাল কলকাতায় কয়েকটা রোবট কোম্পানি হয়েছে জানেন তো?'

'তা তো জানি,' বলেন নিবারণ বাঁড়ুজ্যে, 'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে! কিন্তু চাকরের জাতটা কী শুনি। আমার আবার ওদিকে একটু কড়াকড়ি জানোই তো। এ কি রান্নাও করে নাকি?'

'না না না,' আশ্বাস দিলেন নিকুঞ্জবাবু। 'রান্নার জন্য আমার সেই পুরনো বৈকুণ্ঠই আছে। কাজেই আপনার কোনও ভাবনা নেই। আর ইয়ে, এই চাকরের নাম অনুকূল, আর একে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে হয়। 'তুই'টা ও পছন্দ করে না।'

'পছন্দ করে না?'

'না।'

'ওর পছন্দ-অপছন্দ মেনে চলতে হবে বুঝি আমাকে?'

'শুধু আপনাকে না, সকলকেই। তবে ওর কাজে কোনও ত্রুটি পাবেন না।'

'তা তুই এই ফ্যাসাদের মধ্যে আবার যেতে গেলি কেন?'

'বললাম তো—ও কাজ খুব ভাল করে।'

'তা হলে একবার ডাক তোর চাকরকে; আলাপটা অন্তত সেরে নিই।'

নিকুঞ্জবাবু ডাক দিতেই অনুকূল এসে দাঁড়াল। 'ইনি আমার সেজোকাকা,' বললেন নিকুঞ্জবাবু, 'এখন আমাদের বাড়িতে কিছুদিন থাকবেন।'

'যে আজ্ঞে।'

'ও বাবা, এ তো দেখি পরিষ্কার বাংলা বলে', বললেন নিবারণ বাঁড়ুজ্যে। 'তা বাপু দাও তো দেখি আমার জন্য একটু গরম জল করে। চান করব। বাদলা করে হঠাৎ কেমন জানি একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, তবে আমার আবার দু' বেলা স্নান না করলে চলে না—সারা বছর।'

'যে আজ্ঞে।'

অনুকূল ঘর থেকে চলে গেল আজ্ঞাপালন করতে।

নিবারণবাবু এলেন বটে, কিন্তু নিকুঞ্জবাবুর অবস্থার কোনও উন্নতি হল না। মাঝখান থেকে সান্ধ্য

আড্ডাটি ভেঙে গেল। একে তো খুড়োর সামনে জুয়াখেলা চলে না, তার উপর নিকুঞ্জবাবুর সে সংস্থানও নেই।

এদিকে কাকা কতদিন থাকবেন তা জানা নেই। তিনি মর্জিমাফিক আসেন, মর্জিমাফিক চলে যান। এবার তাঁর হাবভাবে মনে হয় না তিনি সহজে এখান থেকে নড়ছেন। তার একটা কারণ এই যে, অনুকূল সম্বন্ধে তাঁর একটা অদ্ভুত মনোভাব গড়ে উঠেছে। তিনি এই যান্ত্রিক ভৃত্যটি সম্পর্কে যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনুভব করছেন। চাকর যে ভাল কাজ করে, সেটা তিনি কোনওমতেই অস্বীকার করতে পারেন না, কিন্তু চাকরের প্রতি ব্যবহারে এতটা সতর্কতা অবলম্বন করাটাও তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। একদিন ভাইপোকে বলেই ফেললেন, 'নিকুঞ্জ, তোর এই চাকরকে নিয়ে কিন্তু মাঝে-মাঝে আমার খুব মুশকিল হচ্ছে।'

'কেন কাকা?' নিকুঞ্জবাবু ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'সেদিন সকালে গীতার একটা শ্লোক আওড়াচ্ছিলাম, ও ব্যাটা আমার ভুল ধরে দিলে। ভুল যদি হয়েই থাকে, সেটা সংশোধন করা কি চাকরের কাজ? ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি? ইচ্ছা করছিল ওর গালে একটা থাপ্পড় মেরে দিই, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম।'

'ওই থাপ্পড়টা কখনও মারবেন না কাকা—ওতে ফল খুব গুরুতর হতে পারে। ওর ওপর হাত তোলা একেবারে বারণ। আপনি তার চেয়ে বরং ও কাছাকাছি থাকলে গীতা-টিতা আওড়াবেন না। সবচেয়ে ভাল হয় একেবারে চুপ থাকলে।'

নিবারণবাবু গজগজ করতে লাগলেন।

এদিকে নিকুঞ্জবাবুর অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। অনুকূলের জন্য মাসে দু' হাজার করে দিতে এখন ওঁর বেশ কষ্টই হচ্ছে। একদিন অনুকূলকে ডেকে কথাটা বলেই ফেললেন।

'অনুকূল, আমার ব্যবসায় বড় মন্দা চলেছে।'

'সে আমি জানি।'

'তা তো জানো, কিন্তু তোমাকে আমি আর কদ্দিন রাখতে পারব জানি না। অথচ তোমার উপর আমার একটা মায়া পড়ে গেছে।'

'আমাকে একটু ভাবতে দিন এই নিয়ে।'

'কী নিয়ে?'

'আপনার অবস্থার যদি কিছু উন্নতি করা যায়।'

'সে কি তুমি ভেবে কিছু করতে পারবে? ব্যবসাটা তো আর তোমার লাইনের ব্যাপার নয়।'

'তবু দেখি না ভেবে কিছু করা যায় কি না।'

'তা দেখো। কিন্তু সেরকম বুঝলে তোমাকে আবার ফেরত দিয়ে আসতে হবে। এই কথাটা তোমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলাম।'

'যে আজ্ঞে।'

দু' মাস কেটে গেল। আজ আষাঢ় মাসের রবিবার। নিকুঞ্জবাবু বুঝতে পারছেন, টেনেটুনে আর দুটো মাস তিনি অনুকূলের ভাড়া দিতে পারবেন। তারপর তাঁকে মানুষ চাকরের খোঁজ করতে হবে। সত্যি বলতে কি, খোঁজ তিনি এখনই আরম্ভ করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগছে না। তার উপর আবার সকাল থেকে বৃষ্টি, তাই মেজাজ আরও খারাপ।

খবরের কাগজটা পাশে রেখে অনুকূলকে ডাকতে যাবেন এক পেয়ালা চায়ের জন্য, এমন সময় অনুকূল নিজেই এসে হাজির।

'কী অনুকূল, কী ব্যাপার?'

'আজ্ঞে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কী হল?'

'নিবারণবাবু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা বর্ষার গান করছিলেন, এমন সময় কথার ভুল করে ফেলেন। আমি ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলাম, বাধ্য হয়ে ওঁকে সংশোধন করতে হয়। তাতে উনি আমার উপর খেপে গিয়ে আমাকে একটা চড় মারেন। ফলে আমাকে প্রতিশোধ নিতে হয়।'

'প্রতিশোধ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা হাইভোল্টেজ শক ওঁকে দিতে হয় ওঁর নাভিতে।'

'তার মানে—?'

'উনি আর বেঁচে নেই। অবিশ্যি যেই সময় আমি শক্‌টা দিই, সেই সময় কাছেই একটা জোরে বাজ পড়েছিল।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছিলাম।'

'কাজেই মৃত্যুর আসল কারণটা কী, সেটা আপনার বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু—'

'আপনি চিন্তা করবেন না। এতে আপনার মঙ্গলই হবে।'

আর হলও তাই। এই ঘটনার দু'দিন পরেই উকিল ভাস্কর বোস নিকুঞ্জবাবুকে ফোন করে জানালেন যে, নিবারণবাবু তাঁর সম্পত্তি উইল করে রেখে গিয়েছেন তাঁর ভাইপোর নামে। সম্পত্তির পরিমাণ হল সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা।

আনন্দমেলা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩ (২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬)

কাগ্‌তাড়ুয়া

মৃগাঙ্কবাবুর সন্দেহটা যে অমূলক নয় সেটা প্রমাণ হল পানাগড়ের কাছাকাছি এসে। গাড়ির পেট্রল ফুরিয়ে গেল। পেট্রলের ইনডিকেটরটা কিছুকাল থেকেই গোলমাল করছে, সে-কথা আজও বেরোবার মুখে ড্রাইভার সুধীরকে বলেছেন, কিন্তু সুধীর গা করেনি। আসলে কাঁটা যা বলছিল তার চেয়ে কম পেট্রল ছিল ট্যাঙ্কে।

'এখন কী হবে?' জিজ্ঞেস করলেন মৃগাঙ্কবাবু।

'আমি পানাগড় চলে যাচ্ছি', বলল সুধীর, 'সেখান থেকে তেল নিয়ে আসব।'

'পানাগড় এখান থেকে কতদূর?'

'মাইল তিনেক হবে।'

'তার মানে তো দু-আড়াই ঘণ্টা। শুধু তোমার দোষেই এটা হল। এখন আমার অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখেছ?'

মৃগাঙ্কবাবু ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, ভৃত্যস্থানীয়দের উপর বিশেষ চোটপাট করেন না, কিন্তু আড়াই ঘণ্টা খোলা মাঠের মধ্যে একা গাড়িতে বসে থাকতে হবে জেনে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল।

'তা হলে আর দেরি কোরো না, বেরিয়ে পড়ো। আটটার মধ্যে কলকাতা ফিরতে পারবে তো? এখন সাড়ে তিনটে।'

'তা পারব বাবু।'

'এই নাও টাকা। আর ভবিষ্যতে এমন ভুলটি কোরো না কখনও। লং জার্নিতে এসব রিস্কের মধ্যে যাওয়া কখনওই উচিত নয়।'

সুধীর টাকা নিয়ে চলে গেল পানাগড় অভিমুখে।

মৃগাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা জনপ্রিয় সাহিত্যিক। দুর্গাপুরে একটি ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকা হয়েছিল মানপত্র দেওয়া হবে বলে। ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি, তাই মোটরে যাত্রা। সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছেন, আর ফেরার পথে এই দুর্যোগ। মৃগাঙ্কবাবু কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না, পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করাটা তাঁর মতে কুসংস্কার, কিন্তু আজ পাঁজিতে যাত্রা নিষিদ্ধ বললে তিনি অবাক হবেন না। আপাতত গাড়ি থেকে নেমে আড় ভেঙে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি তাঁর চারদিকটা ঘুরে দেখে নিলেন।

মাঘ মাস, খেত থেকে ধান কাটা হয়ে গেছে, চারদিক ধু-ধু করছে মাঠ, দূরে, বেশ দূরে, একটিমাত্র কুঁড়েঘর একটি তেঁতুলগাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এ ছাড়া বসতির কোনও চিহ্ন নেই। আরও দূরে রয়েছে একসারি তালগাছ, আর সবকিছুর পিছনে জমাট বাঁধা বন। এই হল রাস্তার এক দিক, অর্থাৎ পুব

দিকের দৃশ্য।

পশ্চিমেও বিশেষ পার্থক্য নেই। রাস্তা থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে একটা পুকুর রয়েছে। তাতে জল বিশেষ নেই। গাছপালা যা আছে তা—দু-একটা বাবলা ছাড়া—সবই দূরে। এদিকেও দুটি কুঁড়েঘর রয়েছে, কিন্তু মানুষের কোনও চিহ্ন নেই। আকাশে উত্তরে মেঘ দেখা গেলেও এদিকে রোদ। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাগ্‌তাড়ুয়া।

শীতকাল হলেও রোদের তেজ আছে বেশ, তাই মৃগাঙ্কবাবু গাড়িতে ফিরে এলেন। তারপর ব্যাগ থেকে একটা গোয়েন্দা কাহিনী বার করে পড়তে আরম্ভ করলেন।

এর মধ্যে দুটো অ্যাম্বাসাডর আর একটা লরি গেছে তাঁর পাশ দিয়ে, তার মধ্যে একটা কলকাতার দিকে। কিন্তু কেউ তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করার জন্য থামেনি। মৃগাঙ্কবাবু মনে মনে বললেন, বাঙালিরা এ ব্যাপারে বড় স্বার্থপর হয়। নিজের অসুবিধা করে পরের উপকার করাটা তাদের কুষ্ঠিতে লেখে না। তিনি নিজেও কি এদের মতোই ব্যবহার করতেন? হয়তো তাই। তিনিও তো বাঙালি। লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে ঠিকই, কিন্তু তাতে তাঁর মজ্জাগত দোষগুলোর কোনও সংস্কার হয়নি।

উত্তরের মেঘটা অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত এগিয়ে এসে সূর্যটাকে ঢেকে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া। মৃগাঙ্কবাবু ব্যাগ থেকে পুলোভারটা বার করে পরে নিলেন। এদিকে সূর্যও দ্রুত নীচের দিকে নেমে এসেছে। পাঁচটার মধ্যেই অস্ত যাবে। তখন ঠাণ্ডা বাড়বে। কী মুশকিলে ফেলল তাঁকে সুধীর!

মৃগাঙ্কবাবু দেখলেন যে, বইয়ে মন দিতে পারছেন না। তার চেয়ে নতুন গল্পের প্লট ভাবলে কেমন হয়? 'ভারত' পত্রিকা তাঁর কাছে একটা গল্প চেয়েছে, সেটা এখনও লেখা হয়নি। একটা প্লটের খানিকটা মাথায় এসেছে এই পথটুকু আসতেই। মৃগাঙ্কবাবু নোটবুক বার করে কয়েকটা পয়েন্ট লিখে ফেললেন।

নাঃ, গাড়িতে বসে আর ভাল লাগে না।

খাতা বন্ধ করে আবার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালেন মৃগাঙ্কবাবু। তারপর কয়েক পা সামনে এগিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে তাঁর মনে হল বিশ্বচরাচরে তিনি একা। এমন একা তিনি কোনওদিন অনুভব করেননি।

না, ঠিক একা নয়। একটা নকল মানুষ আছে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে।

ওই কাগ্‌তাড়ুয়াটা।

মাঠের মধ্যে এক জায়গায় কী যেন একটা শীতের ফসল রয়েছে একটা খেতে, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কাগ্‌তাড়ুয়াটা। একটা খাড়া বাঁশ মাটিতে পোঁতা, তার সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে একটা বাঁশ ছড়ানো হাতের মতো দু'দিকে বেরিয়ে আছে। এই হাত দুটো গলানো রয়েছে একটা ছেঁড়া জামার দুটো আস্তিনের মধ্যে দিয়ে। খাড়া বাঁশটার মাথায় রয়েছে একটা উপুড় করা মাটির হাঁড়ি। দূর থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু অনুমান করলেন সেই হাঁড়ির রঙ কালো, আর তার উপর সাদা রং দিয়ে আঁকা রয়েছে ড্যাবা ড্যাবা চোখ মুখ। আশ্চর্য—এই জিনিসটা পাখিরা আসল মানুষ ভেবে ভুল করে, আর তার ভয়ে খেতে এসে উৎপাত করে না। পাখিদের বুদ্ধি কি এতই কম? কুকুর তো এ ভুল করে না। তারা মানুষের গন্ধ পায়। কাক চড়ুই কি তা হলে সে গন্ধ পায় না?

মেঘের মধ্যে একটা ফাটল দিয়ে রোদ এসে পড়ল কাগ্‌তাড়ুয়াটার গায়ে। মৃগাঙ্কবাবু লক্ষ করলেন যে, যে জামাটা কাগ্‌তাড়ুয়াটার গায়ে পরানো হয়েছে সেটা একটা ছিটের শার্ট। কার কথা মনে পড়ল ওই ছেঁড়া লাল-কালো ছিটের শার্টটা দেখে? মৃগাঙ্কবাবু অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না। তবে কোনও একজনকে তিনি ওরকম একটা শার্ট পরতে দেখেছেন—বেশ কিছুকাল আগে।

আশ্চর্য—ওই একটি নকল প্রাণী ছাড়া আর কোনও প্রাণী নেই। মৃগাঙ্কবাবু আর ওই কাগ্‌তাড়ুয়া। এই সময়টা খেতে কাজ হয় না বলে গ্রামের মাঠেঘাটে লোকজন কমই দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু এরকম নির্জনতা মৃগাঙ্কবাবুর অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

মৃগাঙ্কবাবু ঘড়ি দেখলেন। চারটে কুড়ি। সঙ্গে ফ্লাস্কে চা রয়েছে। সেইটের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।

গাড়িতে ফিরে এসে ফ্লাস্ক খুলে ঢাকনায় চা ঢেলে খেলেন মৃগাঙ্কবাবু। শরীরটা একটু গরম হল।

কালো মেঘের মধ্যে ফাঁক দিয়ে সূর্যটাকে একবার দেখা গেল। কাগ্‌তাড়ুয়াটার গায়ে পড়েছে লালচে রোদ। সূর্য দূরের তালগাছটার মাথার কাছে এসেছে, আর মিনিট পাঁচেকেই অস্ত যাবে।

আরেকটা অ্যাম্বাসাডর মৃগাঙ্কবাবুর গাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মৃগাঙ্কবাবু আরেকটু চা ঢেলে খেয়ে আবার গাড়ি থেকে নামলেন। সুধীরের আসতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। কী করা যায়?

পশ্চিমের আকাশ এখন লাল। সেদিক থেকে মেঘ সরে এসেছে। চ্যাপটা লাল সূর্যটা দেখতে দেখতে দিগন্তের আড়ালে চলে গেল। এবার ঝপ করে অন্ধকার নামবে।

কাগ্‌তাড়ুয়া।

কেন জানি মৃগাঙ্কবাবু অনুভব করছেন প্রতি মুহূর্তেই ওই নকল মানুষটা তাঁকে বেশি করে আকর্ষণ করছে।

সেটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে মৃগাঙ্কবাবু কতকগুলো জিনিস লক্ষ করে একটা হৃৎকম্প অনুভব করলেন।

ওটার চেহারায় সামান্য পরিবর্তন হয়েছে কি?

হাত দুটো কি নীচের দিকে নেমে এসেছে খানিকটা?

দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কি আরেকটু জ্যান্ত মানুষের মতো?

খাড়াই বাঁশটার পাশে কি আরেকটা বাঁশ দেখা যাচ্ছে?

ও দুটো কি বাঁশ, না ঠ্যাঙ?

মাথার হাঁড়িটা একটু ছোট মনে হচ্ছে না?

মৃগাঙ্কবাবু বেশি সিগারেট খান না, কিন্তু এই অবস্থায় তাঁকে আরেকটা ধরাতে হল। তিনি এই তেপান্তরের মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চোখে ভুল দেখছেন।

কাগ্‌তাড়ুয়া কখনও জ্যান্ত হয়ে ওঠে?

কখনওই না।

কিন্তু —

মৃগাঙ্কবাবুর দৃষ্টি আবার কাগ্‌তাড়ুয়াটার দিকে গেল।

কোনও সন্দেহ নেই। সেটা জায়গা বদল করেছে।

সেটা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেছে।

এসেছে না, আসছে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা, কিন্তু দু'পায়ে চলা। হাঁড়ির বদলে একটা মানুষের মাথা। গায়ে এখনও সেই ছিটের শার্ট; আর তার সঙ্গে মালকোঁচা দিয়ে পরা খাটো ময়লা ধুতি।

'বাবু!'

মৃগাঙ্কবাবুর সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা শিহরন খেলে গেল। কাগ্‌তাড়ুয়া মানুষের গলায় ডেকে উঠেছে, এবং এ গলা তাঁর চেনা।

এ হল তাঁদের এককালের চাকর অভিরামের গলা। এইদিকেই তো ছিল অভিরামের দেশ। একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। অভিরাম বলেছিল সে থাকে মানকড়ের পাশের গাঁয়ে। পানাগড়ের আগের স্টেশনই তো মানকড়।

মৃগাঙ্কবাবু চরম ভয়ে পিছোতে পিছোতে গাড়ির সঙ্গে সেঁটে দাঁড়ালেন। অভিরাম এগিয়ে এসেছে তাঁর দিকে। এখন সে মাত্র দশ গজ দূরে।

'আমায় চিনতে পারছেন বাবু?'

মনে যতটা সাহস আছে সবটুকু একত্র করে মৃগাঙ্কবাবু প্রশ্নটা করলেন।—

'তুমি অভিরাম না?'

'অ্যাদ্দিন পরেও আপনি চিনেছেন বাবু?'

মানুষেরই মতো দেখাচ্ছে অভিরামকে, তাই বোধহয় মৃগাঙ্কবাবু সাহস পেলেন। বললেন, 'তোমাকে চিনেছি তোমার জামা দেখে। এ জামা তো আমিই তোমাকে কিনে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ বাবু, আপনিই দিয়েছিলেন। আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন, কিন্তু শেষে এমন হল কেন

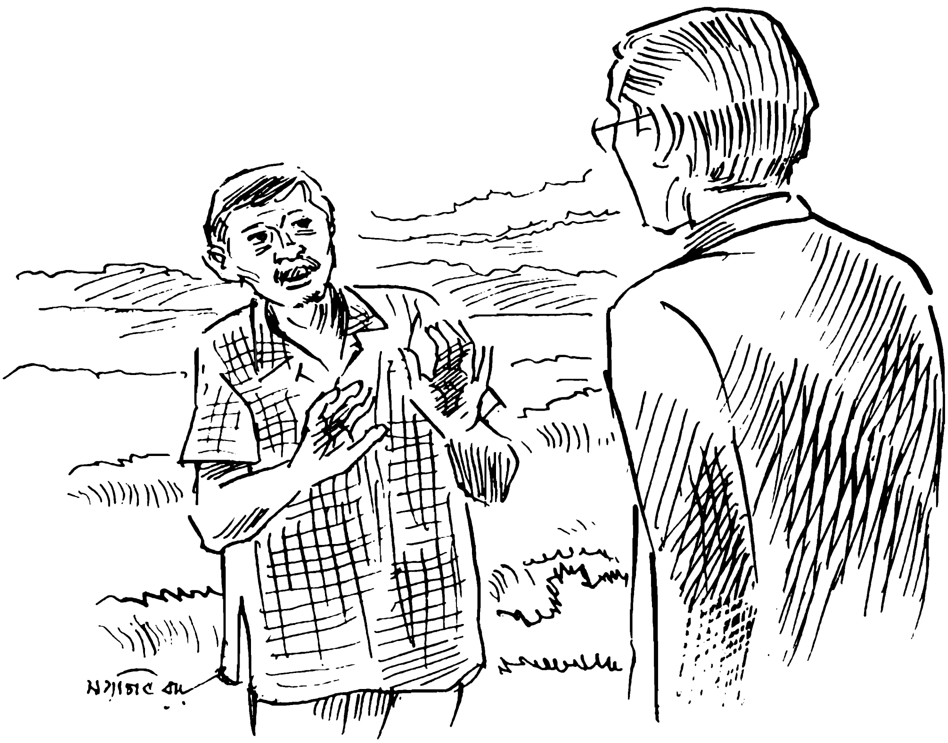

বাবু? আমি তো কোনও দোষ করিনি। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না কেন?'

মৃগাঙ্কবাবুর মনে পড়ল। তিন বছর আগের ঘটনা। অভিরাম ছিল মৃগাঙ্কবাবুদের বিশ বছরের পুরনো চাকর। শেষে একদিন অভিরামের ভীমরতি ধরে। সে মৃগাঙ্কবাবুর বিয়েতে পাওয়া সোনার ঘড়িটা চুরি করে বসে। সুযোগ সুবিধা দুইই ছিল অভিরামের। অভিরাম নিজে অবশ্য অস্বীকার করে। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুর বাবা ওঝা ডাকিয়ে কুলোতে চাল ছুড়ে মেরে প্রমাণ করিয়ে দেন যে, অভিরামই চোর। ফলে অভিরামকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

অভিরাম বলল, 'আপনাদের ওখান থেকে চলে আসার পর আমার কী হল জানেন? আর আমি চাকরি করিনি কোথাও, কারণ আমার কঠিন ব্যারাম হয়। উদুরি। টাকা-পয়সা নাই। না ওষুধ, না পথ্যি। সেই ব্যারামই আমার শেষ ব্যারাম। আমার এই জামাটা ছেলে রেখে দেয়। সে নিজে কিছুদিন পরে। তারপর সেটা ছিঁড়ে যায়। তখন সেটা কাগ্‌তাড়ুয়ার পোশাক হয়। আমি হয়ে যাই সেই কাগ্‌তাড়ুয়া। কেন জানেন? আমি জানতাম একদিন না একদিন আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমার প্রাণটা ছটফট করছিল—হ্যাঁ, মৃত লোকেরও প্রাণ থাকে—আমি মরে গিয়ে যা জেনেছি সেটা আপনাকে বলতে চাইছিলাম।'

'সেটা কী অভিরাম?'

'বাড়ি ফিরে গিয়ে আপনার আলমারির নীচে পিছন দিকটায় খোঁজ করবেন। সেইখানেই আপনার ঘড়িটা পড়ে আছে এই তিন বছর ধরে। আপনার নতুন চাকর ভাল করে ঝাড়ু দেয় না তাই সে দেখতে পায়নি। এই ঘড়ি পেলে পরে আপনি জানবেন অভিরাম কোনও দোষ করেনি।'

অভিরামকে আর ভাল করে দেখা যায় না—সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মৃগাঙ্কবাবু শুনলেন অভিরাম বলছে, 'এতকাল পরে নিশ্চিন্ত হলাম বাবু। আমি আসি। আমি আসি...'

মৃগাঙ্কবাবুর চোখের সামনে থেকে অভিরাম অদৃশ্য হয়ে গেল।

'তেল এনেছি বাবু।'

সুধীরের গলায় মৃগাঙ্কবাবুর ঘুমটা ভেঙে গেল। গল্পের প্লট ফাঁদতে ফাঁদতে কলম হাতে গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ঘুম ভাঙতেই তাঁর দৃষ্টি চলে গেল পশ্চিমের মাঠের দিকে। কাগতাড়ুয়াটা যেমন ছিল তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়িতে এসে আলমারির তলায় খুঁজতেই ঘড়িটা বেরিয়ে পড়ল। মৃগাঙ্কবাবু স্থির করলেন ভবিষ্যতে আর কিছু গেলেও ওঝার সাহায্য আর কখনও নেবেন না।

সন্দেশ, পৌষ ১৩৯৩

নরিস সাহেবের বাংলো

তারিণীখুড়োকে ঘিরে আমরা পাঁচ বন্ধু বসেছি, বাদলা দিন, সন্ধে হব-হব, খুড়োর চা খাওয়া হয়ে গেছে। এবার বিড়ি ধরিয়ে হয়তো গল্প শুরু করবেন। খুড়ো এলে সন্ধেতেই আসেন, আর এলেই একটি করে গল্প লাভ হয় আমাদের। সবই খুড়োর জীবনেরই ঘটনা, কিন্তু সে ঘটনা গল্পের চেয়েও মজাদার। একজন লোকের এতরকম অভিজ্ঞতা হতে পারে সেটা আমার ধারণা ছিল না।

খুড়ো বললেন, 'আমি যে সবসময় চাকরির ধান্দায় দেশ-বিদেশে ঘুরছি তা কিন্তু নয়; মাঝে মাঝে রোজগারের উপর বিতৃষ্ণা এসে যায়, তখন ঘুরি কেবল ভ্রমণের নেশায়। নতুন জায়গা দেখার শখ আমার ছেলেবেলা থেকে। সেইভাবেই একবার গিয়ে পড়েছিলাম ছোটনাগপুর। ও অঞ্চলটা তখনও দেখা হয়নি। আর ওখানেই ঘটে এক আশ্চর্য ঘটনা। সেই গল্পই আজ তোদের বলব।'

খুড়ো বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়ে তাঁর গল্প শুরু করলেন।

আমি তখন হাজারিবাগে। একটা হোটেলে আছি, নাম ডি লাক্স হোটেল, কিন্তু ব্যবস্থা চলনসইয়ের বেশি নয়। তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যটাকে আমি কখনও খুব উঁচুতে স্থান দিই না। নানান অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটাই আমার অভ্যেস। হাজারিবাগে কাউকে চিনি না, সেটা আরও ভাল লাগছে, কারণ মাঝে মাঝে একটা অবস্থা আসে যখন প্যাঁচাল পাড়তে একদম ভাল লাগে না। চুপচাপ একা একা বিছানায় শুয়ে কল্পনার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। তবে এটাও ঠিক যে, ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই যেখানে বাঙালি নেই। বিশেষ করে হাজারিবাগে তো বিস্তর বাঙালি। তাদের মধ্যে এক-আধজনের সঙ্গে যে আলাপ হয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

যাঁর সঙ্গে প্রথমে আলাপ হল তাঁর নাম অর্ধেন্দু বসু। ইনি ইতিহাসের লোক, পাবনার একটা জমিদার বংশ—হালদার বংশ—নিয়ে পড়াশুনা করছেন, ইচ্ছে আছে বই লেখার। এই বংশে নাকি অনেক বাঘা বাঘা চরিত্রের পরিচয় মেলে। এঁদেরই এক আদিপুরুষ, নাম রামগতি হালদার, রামমোহনের নাকি খুব কাছের লোক ছিলেন। তা ছাড়া এঁর পরেও বেশ কিছু সমাজ সংস্কারক নির্ভীক চরিত্রের পরিচয় নাকি এ বংশে মেলে। আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই পরিবার সম্বন্ধে লিখতে আপনার হাজারিবাগ আসতে হল কেন?' ভদ্রলোক বললেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই পরিবারের একজন নাকি হাজারিবাগে একটা বাড়ি করেন। সে ছুটি কাটানোর জন্য, না অন্য কোনও কারণে, সেটা এখনও বুঝতে পারিনি। এই বিশেষ ব্যক্তিটির নাম ছিল মহেশ হালদার। এই মহেশ হালদার অবধি আমি হালদার বংশের ইতিহাস পাচ্ছি, যদিও এঁর সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানতে বাকি আছে। এঁর পরে সব যেন কেমন ব্ল্যাঙ্ক।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এঁর হাজারিবাগের বাড়িটা আপনি

দেখেছেন?' অর্ধেন্দুবাবু বললেন, 'দেখেছি, কিন্তু সেখানেও এক রহস্য। এই বাড়িটাকে এখানকার সকলেই উল্লেখ করে নরিস সাহেবের বাংলো বলে! অথচ মহেশ হালদার যে বিয়ে করেছিলেন সে খবর আমি পেয়েছি, কিন্তু মহেশ হালদারের পরে বংশটার যে কী হল সে খবর পাইনি। সম্ভবত মহেশবাবু নরিস সাহেবকে বাংলোটা বিক্রি করে দেন কোনও কারণে।'

'কলকাতায় তাঁদের আর কোনও বংশধর নেই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

অর্ধেন্দুবাবু বললেন, 'মহেশ হালদার ছিলেন তাঁর বাবা যোগেশ হালদারের একমাত্র সন্তান। তাই তাঁর যদি আর ছেলেপিলে না থাকে তা হলে হয়তো হালদার বংশ মহেশেই শেষ হয়ে গেছে। প্রশাখা আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই। আমি শুধু শাখাতেই ইন্টারেস্টেড।'

'এই বংশ সম্বন্ধে খবর দিতে পারে এমন কোনও লোকের সন্ধান পাননি হাজারিবাগে?'

'এখানে এক ভদ্রলোক আছেন, আজন্ম এখানেই বাস, তাঁর বয়স নব্বুই, নাম কালীকিঙ্কর বাঁড়ুজ্যে। একবার ভাবছিলাম, তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করব।'

'তা চলুন না আজই বিকেলে যাওয়া যাক।'

কালীকিঙ্করবাবুকে সকলেই চেনে, তাই তাঁর বাড়ি বার করতে অসুবিধা হল না। গিয়ে শুনি ভদ্রলোক

বৈকালিক ভ্রমণেই বেরিয়েছেন। বুঝে দেখো কীরকম স্বাস্থ্য! নব্বুই বছরেও বিকেলে হাঁটা চাই।

আমরা একটু অপেক্ষা করতেই ভদ্রলোক এসে পড়লেন। আমরা নিজেদের পরিচয় দিলাম। ভদ্রলোক বললেন, 'আমার কাছে তো বড় একটা কেউ আসে না। আপনাদের কোনও প্রয়োজন আছে বুঝি?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন,' বললেন অর্ধেন্দুবাবু। 'আমি পূর্ববঙ্গের এক জমিদার বংশ নিয়ে রিসার্চ করছি। হালদার বংশ। তাঁদের একজন ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হাজারিবাগে একটা একতলা বাংলো বাড়ি করেছিলেন। সেই বাড়িকে এখানকার লোকেরা নরিস সাহেবের বাংলো বলে।'

'ও—তাই বলুন। ওসব হালদার-ফালদার জানি না; তাঁরা এখানে এসে থাকতে পারেন। আমার যখন সাত কি আট বছর বয়স তখন আমি নরিস সাহেবকে দেখেছি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতে। আমায় দেখে মাথা হেঁট করে গুড আফটারনুন বলতেন। তবে তাঁর শেষটা জানেন তো?'

আমরা দু'জনেই মাথা নেড়ে বললাম জানি না।

'ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেন,' বললেন কালীকিঙ্করবাবু। 'কারণ জানা যায়নি। লোকে বলে বাড়িটা নাকি হানাবাড়ি। সাহেবের ভূত দেখা যায় এখনও। আমি অবশ্য দেখিনি। খুব জবরদস্ত সাহেব ছিলেন নরিস সাহেব।'

'তাঁর বাড়িটা কোথায় গেলে দেখা যায় বলতে পারেন?'

'বাড়ি তো এই কাছেই।'

কালীকিঙ্করবাবু আমাদের রাস্তা বাতলে দিলেন। আমরা দু'জনে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে অর্ধেন্দুবাবুকে বললাম, 'আপনি এতদিন সে বাড়ি দেখেননি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'দেখেছি বইকী, কিন্তু লোকে ঠিক বলছে কিনা একবার যাচাই করে নিলাম। ইনি যা বলবেন সে তো আর ভুল বলবেন না।'

'আমারও যে বাড়িটা দেখার জন্য কৌতূহল হচ্ছে।'

'আসুন না, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

মাথায় টালি বসানো ঢালু ছাতওয়ালা বাড়ি, বাংলোই বলা চলে, যেমন হাজারিবাগে আরও দেখা যায়। টালির অধিকাংশই অবশ্য খসে গিয়ে ছাত ফাঁক হয়ে গেছে। চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা চার-পাঁচ বিঘে জমির উপর জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে বাংলোটা। কেউ থাকে না সেখানে, শেষ কবে ছিল তাও কেউ বলতে পারে না।

আমি অর্ধেন্দুবাবুকে বললাম, 'আপনার হালদার বংশের কথা জানি না মশাই, কিন্তু এই নরিস সাহেবকে নিয়ে আমার বিলক্ষণ কৌতূহল হচ্ছে। আর সত্যি বলতে কি, এই সাহেবের প্রেতাত্মার সঙ্গে যদি যোগস্থাপন করা যায়, তা হলে তো ইনি মহেশ হালদার সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিতে পারেন। তাই নয় কি?'

'তা অবিশ্যি ঠিক।'

কথাটা খুব জোরের সঙ্গে বললেন না অর্ধেন্দুবাবু। বুঝলাম তিনি সাহেবের প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগস্থাপনের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ বোধ করছেন না। আমি না হয় ভূতকে তোয়াক্কা করি না, কিন্তু সবাই তো সেরকম নয়।

দুটো দিন পেরিয়ে গেল।

তিনদিনের দিন আমি অর্ধেন্দুবাবুকে বললাম, 'এইভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে আপনার কী লাভ আছে? আসুন একটা কিছু করা যাক। না হয় বাংলোটায় একটা রাত কাটিয়ে আসা যাক।'

অর্ধেন্দুবাবু একটু চুপ থেকে বললেন, 'এখানে বাঙালিদের একটা আড্ডা আছে শশী ডাক্তারের বাড়ি। আমি কাল সেখানে গিয়েছিলাম। তারা বলল, নরিস সাহেবের বাংলোকে হানাবাড়ি বলা হলেও এখনও পর্যন্ত কেউ কোনও ভূতের সাক্ষাৎ পায়নি। তবে ওই আড্ডাতেই উৎপলবাবু বলে এক নিরীহ গোছের ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি নাকি খুব ভাল মিডিয়ম। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে দিয়ে ভূতের আবির্ভাব ঘটেছে নাকি অনেকবার। ভদ্রলোক একটা বিশেষ অবস্থায় এলে তাঁর গলা থেকে নাকি ভূতের গলায়

কথা বেরোয়, আর তখন নাকি ভূতের সঙ্গে কথাবার্তা বলা চলে। অন্ধকার ঘরে তেপায়া টেবিলের উপর হাত রেখে নাকি ব্যাপারটা করতে হয়। কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ।'

আমি বললাম, 'দেখুন কীরকম যোগাযোগ। এই মিডিয়ম পাওয়া কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়। আপনি এই উৎপলবাবুকে বলুন আমরা কালই রাত্রে বসছি। তেপায়া টেবিল জোগাড় করতে পারবেন?'

'আমার হোটেলের ঘরেই একটা আছে।'

'তা হলে তো কথাই নেই। আসুন লেগে পড়া যাক।'

অর্ধেন্দুবাবু শশী ডাক্তারের আড্ডায় নিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে উৎপলবাবুর আলাপ করিয়ে দিলেন। সকলের সামনে আর ভূতের প্রসঙ্গটা তুললাম না, কারণ প্ল্যানচেটে আমাদের তিনজনের বেশি কেউ থাকে এটা আমি চাইছিলাম না। আড্ডার পরে বাইরে বেরিয়ে এসে উৎপলবাবুকে প্রস্তাবটা দেওয়া হল। ভদ্রলোক এককথায় রাজি। বললেন, নরিস সাহেবের বাংলোয় প্ল্যানচেট করার ওঁর অনেকদিনের শখ, কিন্তু এতদিন কাউকে সঙ্গী পাননি বলে হয়ে ওঠেনি। 'তা হলে পরশু বুধবার বসা যাক,' বললেন উৎপলবাবু। 'পরশু অমাবস্যা, সেই কারণে কাজটা সহজে হবার সম্ভাবনা।' কী কী জিনিস লাগবে জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক বললেন, তিনটে চেয়ার, একটা তেপায়া টেবিল আর একটা মোমবাতি। মোমবাতিটা লাগবে কাজ শেষ হয়ে যাবার পর।

আমি আর অর্ধেন্দুবাবু দিন থাকতে দুটো সাইকেল রিকশায় করে চেয়ার টেবিল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম বাংলোতে। সেই ফাঁকে বাড়িটা একটু ঘুরে দেখে নিলাম। বহুকাল কেউ থাকে না, তাই ঘরগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমরা স্থানীয় লোক লাগিয়ে একটা ঘর বেছে নিয়ে সেটাকে ঝাড়পোঁছ করিয়ে একটু ভদ্রস্থ করে নিলাম। এটাই বোধহয় ছিল বৈঠকখানা। বাড়িটা পাহারা দেবার জন্যও একটি লোককে জোগাড় করা হয়েছিল, সে প্রথমে সাহেবের ভূত সাহেবের ভূত করে একটু আপত্তি তুলেছিল, তারপর হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিতেই চুপ মেরে গেল।

রাত দশটার একটু আগেই আমরা তিনজন বাড়িটার সামনে জমায়েত হলাম। কথা হল ভূত এলে প্রশ্ন করবেন অর্ধেন্দুবাবু, আর উত্তর তো উৎপলবাবুর মুখ দিয়ে সাহেবের ভাষাতেই বেরোবে— অবিশ্যি সব যদি ঠিকমতো হয়। অর্ধেন্দুবাবু ইংরেজিটা মোটামুটি ভালই বলেন। সেদিক দিয়ে সুবিধে আছে। উৎপলবাবুকে দেখলাম সঙ্গে করে একটা কৌটো এনেছেন। জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'ওতে কর্পূর আছে। প্ল্যানচেটের ব্যাপারে খুব সাহায্য করে।'

মোমবাতির আলোয় সব তোড়জোড় হল। তিনজনে তেপায়া টেবিলের তিনদিকে বসে টেবিলের উপর হাত উপুড় করে রাখলাম। তারপর বাতি নিভিয়ে চোখ বন্ধ করে সাহেবের চিন্তায় মগ্ন হলাম।

গাছপালায় ঘেরা বাংলো, বাইরে বাতাস দিচ্ছে তার ফলে মাঝে মাঝে পাতার শোঁ শোঁ শব্দ পাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে বোধহয় বাতাস থেমে যাওয়ায় আর কোনও শব্দ পাওয়া গেল না। অমাবস্যার রাত, তার উপরে আকাশে মেঘ; রাস্তায় আলোও নেই যে জানলা দিয়ে ঢুকবে। তাই ঘরের ভিতর দুর্ভেদ্য অন্ধকার।

কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না। হঠাৎ অনুভব করলাম টেবিলটা মৃদু মৃদু নড়ছে। সেটা একটু বেড়ে যাওয়ায় খট্‌খট্‌ শব্দ শুরু হল। আমি জানি এ ধরনের প্ল্যানচেটে সেটা ভূত নামার লক্ষণ।

আমরা টেবিলের উপর থেকে হাত সরাচ্ছি না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি হাত আর অনড় নেই, টেবিলের সঙ্গে সঙ্গে উঠছে নামছে।

'আঁ—া-া-া—'

শব্দটা উৎপলবাবুর গলা থেকে বেরোলো। আগে থেকেই অর্ধেন্দুবাবুকে বলা ছিল। উনি কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন,—

'ইজ এনিওয়ান হিয়ার?'

উৎপলবাবুর মুখ থেকে সম্পূর্ণ সাহেবি গলায় উত্তর এল—

'ইয়েস।'

'হু ইজ ইট?'

'মাই নেম ইজ নরিস।'

বাকি কথাও ইংরেজিতেই হল, এবং নরিস সাহেবের ইংরেজি যাকে বলে বেশ চোস্ত ইংরেজি। আমি কথোপকথনটা মোটামুটি বাংলাতেই বলছি।

অর্ধেন্দুবাবু বললেন, 'এই বাংলো কি তোমার বাসস্থান ছিল?'

'ইয়েস।'

'তুমি কী করতে হাজারিবাগে?'

'আমার অভ্রের খনি ছিল।'

'শহরে আরও সাহেব ছিল?'

'ইয়েস। অভ্রের খনির মালিকদের একটা ক্লাব ছিল, ভিক্টোরিয়া ক্লাব! আমি সে ক্লাবের সভ্য ছিলাম।'

'এই বাড়িতে তোমার আগে হালদার বলে একজন ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ছিলেন!'

'তিনি কি এই বাড়ি তোমাকে দিয়ে যান?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর তিনি কোথায় যান?'

'কলকাতায়। সেখানেই মৃত্যু হয়।'

'তুমি কি আত্মহত্যা করেছিলে?'

উত্তর আসতে একটু সময় লাগল।

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে?'

'রিভলভার দিয়ে মাথায় গুলি মেরে।'

'কেন?'

'আমার আর বাঁচার ইচ্ছে ছিল না।'

'বুঝেছি! কিন্তু এমন মনের ভাব হল কেন?'

'আজ এই পর্যন্তই থাক। বড় ক্লান্ত লাগছে।'

বুঝতে পারলাম উৎপলবাবুরই আসলে ক্লান্ত লাগছে। আমি লাইটার দিয়ে মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিলাম। উৎপলবাবুর মাথা হেঁট হয়ে বুকের উপর নুইয়ে পড়েছে। কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে তাঁর জ্ঞান আবার ফিরে এল। মাথাটা ঝাড়া দিয়ে হঠাৎ নিজের গলায় প্রশ্ন করলেন—

'কেমন হল?'

'খুব ভাল,' বললেন অর্ধেন্দুবাবু। 'বোঝাই যাচ্ছে মহেশ হালদার এখানকার পাট উঠিয়ে দিয়ে বাংলোটা নরিসকে বিক্রি করে কলকাতা চলে যান। আর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। অর্থাৎ যতদূর মনে হল হালদার বংশের ওখানেই শেষ।...অনেক ধন্যবাদ, উৎপলবাবু।'

আমার কিন্তু মনে একটা খট্‌কা লেগেছে যেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। নরিস সাহেবের মৃত্যুর কারণটা ঠিক পরিষ্কার হল না। আমার এখন হালদারের চেয়ে নরিসের উপরই ঝোঁকটা বেশি। অবিশ্যি উৎপলবাবুকে যা যা প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তর তিনি ঠিক ভাবেই দিয়েছেন।

আমি রাত্তিরে অনেকক্ষণ ধরে এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম, তারপর সকালে উঠে অর্ধেন্দুবাবুর হোটেলে গিয়ে সোজাসুজি বললাম যে আমি আর একবার প্ল্যানচেট করতে চাই, এবং এবার প্রশ্নগুলি আমি করব। অর্ধেন্দুবাবু বললেন, 'আমার আপত্তি নেই, তবে আপনি হালদার বংশ সম্বন্ধে আর কী নতুন তথ্য জানার আশা করছেন তা জানি না।'

আমি বললাম, 'সত্যি বলতে কি, আমি নরিস সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে চাই। লোকটিকে বেশ ইন্টারেস্টিং বলে মনে হল।'

উৎপলবাবু আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন।

আমরা আবার দশটার সময় সাহেবের বাংলোতে জমায়েত হলাম। আমি উৎপলবাবুকে ঠাট্টা করে বললাম, 'আজ তো অমাবস্যা নয়। প্ল্যানচেট ঠিকমতো হবে তো?'

উৎপলবাবু বললেন, 'মনে তো হয়। এ ভদ্রলোকের আত্মা বেশ সহজেই ধরা দেয়।'

অর্ধেন্দুবাবু বললেন, 'আমি সবই বরদাস্ত করতে পারি, কিন্তু আপনার গলা দিয়ে যখন অন্য লোকের স্বর বেরোয় তখন মেরুদণ্ডটা কেমন যেন শিরশির করে।'

আমরা সোয়া দশটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। পনেরো মিনিটের মধ্যেই টেবিল নড়া আর উৎপলবাবুর গলা থেকে 'আঁ' শব্দ শুনে বুঝলাম যে প্রেতাত্মা হাজির।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম—'ইজ এনিবডি হিয়ার?'

নরিসের কণ্ঠস্বরে উত্তর এল—

'ইয়েস।'

'আর ইউ মিস্টার নরিস?'

'ইয়েস।'

'মিস্টার নরিস, তোমাকে দু'বার বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি; কিন্তু কাল একটা প্রশ্নের ঠিক জবাব মেলেনি, তাই আবার তোমাকে ডাকলাম।'

'কী প্রশ্ন?'

'তোমার জীবনের উপর এতটা বিতৃষ্ণা এল কেন যে, আত্মহত্যা করলে?'

একটুক্ষণ কোনও কথা নেই। তারপর ইংরিজিতে উত্তর এল—

'আমাকে প্রচণ্ডভাবে অপমান করা হয়েছিল।'

'কে করেছিল অপমান?'

'মেজর টমসন।'

'ঘটনাটা কোথায় হয়?'

'আমাদের ক্লাবে।'

'কিন্তু অপমানের কারণটা কী?'
'তা হলে অনেক কথা বলতে হয়।'
'বলুন। আমরা শুনতেই এসেছি।'
'আমি এক বেয়ারাকে একদিন হিন্দিতে একটা কথা বলেছিলাম। সেটা মেজর টমসন শুনে ফেলেছিলেন।'
'তাতে কী হল?'
'তাতে তিনি বুঝে ফেলেছিলেন আমি সাহেব নই।'
'আপনি সাহেব নন?'
'না। তবে আমার চেহারায় সাহেবের সঙ্গে কোনও পার্থক্য ছিল না। আমার চুল ছিল কটা, চোখ নীল, আর গায়ের রঙ সাহেবের মতো ফরসা। আমি মিশনারি স্কুলে পাদ্রীদের কাছে ইংরিজি শিখেছিলাম। সেই ইংরিজি শুনে আমার চেহারা দেখে কারুর বোঝার সাধ্যি ছিল না যে আমি সাহেব নই। আমাদের ক্লাবে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু আমি নরিস নাম নিয়ে ক্লাবে ঢুকতে পেরেছিলাম। এই ক্লাবে আমি সাড়ে তিন বছর মেম্বার ছিলাম। তারপর টমসনের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। সে সকলের সামনে আমাকে নেটিভ বলে ক্লাব থেকে লাথি মেরে বার করে দেয়।'
'আসলে তুমি কী ছিলে?'
'আমি ছিলাম বাঙালি। আমার নাম ছিল নরেশ। নরেশ থেকে নরিস।'
আমি হঠাৎ যেন চোখের সামনে একটা আলো দেখতে পেলাম। বললাম,
'তুমি কি মহেশ হালদারের কোনও আত্মীয় ছিলে?'
'আমি ছিলাম মহেশ হালদারের একমাত্র ছেলে। বাবা তাঁর অভ্রের খনির ভার আমার উপর দিয়ে কলকাতায় চলে যান। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি বিয়ে করিনি। আমি হালদার বংশের শেষ প্রতিনিধি।'
বাকি কথাটা নরেশ বাংলাতেই বললেন।
'আজ তা হলে আমি আসি, কারণ এ ধরনের কথোপকথন আমার পক্ষে বড় ক্লান্তিকর।'
'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'
'আমারও অনেক হালকা লাগছে। অ্যাদ্দিন পরে বাংলা বলে আরাম পাচ্ছি, আর সাহেব সেজে কী যে ভুল করেছিলাম সেটা নতুন করে বুঝতে পেরেছি।'

মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলাম।
এখন আর আমার মনে কোনও খটকা রইল না, আর অর্ধেন্দুবাবুর হালদার বংশের ইতিহাসের শেষপর্ব শেষ হল।
তবে এটাও বুঝতে পারলাম যে, উৎপলবাবুকে না পেলে মিঃ নরিসের রহস্য রহস্যই থেকে যেত!

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৯৪

কুটুম-কাটাম

'কোথায় পেলি এটা?'

'আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল,' বলল দিলীপ। 'একটা জমি পড়ে আছে কাঠা তিনেক, তাতে কয়েকটা গাছ আর ঝোপঝাড়। একটা গাছের নীচে এটা পড়ে ছিল। অলোকের বাড়িতে সেদিন দেখছিলাম একটা গাছের গুঁড়িকে কেটে তার উপর গোল কাচ বসিয়ে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করছে। দেখে আমারও শখ হয়েছিল। গুঁড়ির বদলে এইটে পেলাম।'

ব্যাপারটা আর কিছুই না—একটা গাছের ডালের অংশ, সেটাকে একভাবে ধরলে একটা চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো দেখতে লাগে। জিনিসটাকে চার পায়ে দাঁড় করানো যায়—যদিও একটা পা একটু বেঁটে বলে কাত হয়ে থাকে। পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা। একটা লম্বা গলাও আছে, আর তার শেষের অমসৃণ অংশটাকে একটা মুখ বলে কল্পনা করে নেওয়া যায়। এ ছাড়া আছে একটা এক ইঞ্চি লম্বা মোটা লেজ। সব মিলিয়ে জিনিসটাকে বেশ দেখবার মতো। দিলীপের যে চোখে পড়েছে সেটাই আশ্চর্য। অবিশ্যি আশ্চর্যই বা বলি কী করে—দিলীপ চিরকালই একটু আর্টিস্টিক মেজাজের। স্কুলে থাকতে বইয়ের পাতার ভিতর ফুলের পাপড়ি আর ফার্ণ গুঁজে রাখত। ওর সারা বাড়িতে ছোটখাটো শিল্পদ্রব্য ছড়ানো রয়েছে যাতে সুরুচির পরিচয় মেলে। ঢোকরা কামারদের কাজ দেখতে একবার বোলপুর থেকে ঘুসকরা চলে গিয়েছিল—সেখান থেকে আমাদের সকলের জন্যই একটা করে ঢোকরার কাজের নমুনা নিয়ে এসেছিল—প্যাঁচা, মাছ, গণেশ, পাত্র—যেগুলো ভারী চমৎকার।

আমি বললাম, 'এ ধরনের জিনিস কিন্তু তুই-ই প্রথম সংগ্রহ করছিস না। গাছের ডালের পুতুল তোর আগে আরেকজন জমিয়ে গেছেন।'

'অবনীন্দ্রনাথ তো? জানি। তিনি এগুলোকে বলতেন কুটুম-কাটাম। এটাকে কী বলা যায় বল তো? কী জানোয়ার এটা? শেয়াল না শুয়োর না কুকুর?'

'নাম একটা ভেবে বার করা যাবে। আপাতত কোথায় রাখছিস জিনিসটাকে?'

'আমার শোয়ার ঘরের তাকে। কালই তো সবে পেয়েছি। তুই এসে গেলি বলে তোকে দেখালাম।'

আমি আছি একটা বিজ্ঞাপনের আপিসে, আর দিলীপ কাজ করে একটা ব্যাঙ্কে। দিলীপ বিয়ে করেনি এখনও; আমার একটা সংসার আছে; একটি পাঁচ বছরের ছেলে আছে, তাকে সবে স্কুলে ভর্তি করেছি। দিলীপের বাড়িতে মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা আড্ডা হয়, আমাদের আরও দুই বন্ধু সীতাংশু আর রণেন আসে। ব্রিজ খেলা হয়। দিলীপ গাছের ডালটা পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই আড্ডায় সকলকে দেখাল। রণেন প্রচণ্ড বেরসিক, তার চোখে জানোয়ার ধরা পড়ল না, বলল, 'মিথ্যে আবর্জনা এনে বাড়ি বোঝাই করছিস কেন? এতে কতরকম জার্মস থাকতে পারে জানিস? তা ছাড়া পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জিনিসটার গায়ে।'

সেদিন আড্ডা চলল সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। তারপর দিলীপ আমার দিকে ইশারা করে আমাকে কিছুক্ষণ থাকতে বলে অন্যদের দরজার মুখে পৌঁছে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করে আমার কাছে আসতে আমি বললাম, 'কী ব্যাপার? আজ তোকে যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে?'

দিলীপ উত্তর দেবার আগে একটু দম নিয়ে নিল।

'তুই তো শুনলে হেসে উড়িয়ে দিবি, কিন্তু আমি না বলে পারছি না।'

'কী ব্যাপার?'

'এই গাছের ডালটা। আমি অলৌকিক বিশ্বাস করি না, কিন্তু এটাকে অলৌকিক ছাড়া আর কী বলা

যায় জানি না।'

'ব্যাপারটা খুলে বলবি?'

'মাঝরাত্তিরে তাকের উপর থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাই—যেখানে জানোয়ারটা থাকে।'

'কীসের শব্দ?'

'একটা ফুটোর মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইলে যেরকম শিসের মতো শব্দ হয়, কতকটা সেইরকম কিন্তু তার সঙ্গে যেন একটা কান্নার ভাব মেশানো।'

'তুই তখন কী করিস?'

'আওয়াজটা বেশিক্ষণ চলে না, কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আছে। ওটাকে আমি দাঁড় করিয়ে রাখি, কিন্তু আজ সকালে উঠে দেখি কাত হয়ে পড়ে আছে।'

'সে তো হাওয়ায় পড়ে যেতে পারে।'

'তা পারে, কিন্তু কান্নার ব্যাপারটা? আমি আমার সাহসের বড়াই করতাম, কিন্তু এখন আর করি না। অবিশ্যি ওটাকে ফেলে দিয়ে আসতে পারি, কিন্তু জিনিসটাকে আমার সত্যিই ভাল লেগে গেছে।'

'আরও দু'দিন দ্যাখ, তারপর আমাকে বলিস। আমার মনে হয় তুই ভুল শুনেছিস, কিংবা স্বপ্ন দেখেছিস।'

দিলীপের ব্যাপারটা আমার কাছে পাগলের প্রলাপের মতো মনে হল। ছেলেটা একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ এটা চিরকালই লক্ষ করে এসেছি। যাই হোক, তাকে রাজি করানো গেল যে সে আরও কিছুদিন দেখবে।

কিন্তু দু'দিন পরেই আপিসে দিলীপের টেলিফোন পেলাম।

'কে, প্রমোদ?'

'হ্যাঁ— কী ব্যাপার?'

'একবার চলে আয়—কথা আছে।'

কী আর করি—বিকেলবেলা আপিসের পর দিলীপের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। দিলীপ বলল, 'বউদিকে একটা ফোন করে দে।'

'কেন? কী ব্যাপার?'

'বলবি আজ রাত্রে আমার বাড়িতে থাকছিস। কেন থাকছিস সেটা পরে বুঝিয়ে বললেই হবে।'

দিলীপ কথাগুলো বলল অত্যন্ত সিরিয়াস ভাবে, তাই তার অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না।

দিলীপকে জিজ্ঞেস করেও কারণটা জানা গেল না। তবে আন্দাজে বুঝলাম ওই জানোয়ারটা নিয়েই সমস্যা।

নিউ আলিপুরে বিংশ শতাব্দীতে এমন ঘটনা ঘটছে ভাবতে অদ্ভুত লাগে, কিন্তু অলৌকিকের যে স্থান কাল পাত্র বিচার নেই, সেটা আমি অনেক জায়গায় পড়েছি।

খাওয়াদাওয়া সেরে শোয়ার ঘরে এসে দিলীপ বলল, 'মুশকিল হচ্ছে কি, জানোয়ারটাকে যত দেখছি তত বেশি ভাল লাগছে—শুধু ওই গোলমালটা যদি না থাকত।'

'আমরা কি জেগে থাকব না ঘুমোব?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'তোর যদি অসুবিধা না হয় তা হলে জেগেই থাকি। আমার ধারণা, বেশিক্ষণ জাগতে হবে না। আমি গত ক'দিন রাত্রে প্রায় ঘুমোইনি বললেই চলে।'

আমি আর দিলীপকে ঘাঁটালাম না। যা দেখবার তা তো দেখতেই পাব স্বচক্ষে।

আমরা দু'জনে খাটে বসলাম, দিলীপ ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিল। বাইরে চাঁদের আলো রয়েছে। ত্রয়োদশীর চাঁদ, পরশু লক্ষ্মীপুজো। সেই চাঁদের আলো জানলা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছে, আর মেঝে থেকে প্রতিফলিত হয়ে সেই আলোয় দিব্যি দেখতে পাচ্ছি তাকের উপরে রাখা জানোয়ারটাকে।

'সিগারেট খাওয়া চলতে পারে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম দিলীপকে।

'স্বচ্ছন্দে।'

দিলীপ নিজে পান সিগারেট চা কিচ্ছু খায় না।

এগারোটা নাগাদ প্রথম সিগারেট খেয়ে সাড়ে বারোটায় দ্বিতীয়টা ধরাতে যাব এমন সময় হাওয়ার

শব্দটা পেলাম। মিহি শব্দ, আর তাতে একটা সুর আছে। সে সুরকে কান্নার সুর বললেই তার সবচেয়ে যথাযথ বর্ণনা হয়।

আমি আর দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরালাম না।

শব্দটা যে তাকের দিক থেকেই আসছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এবার আরেকটা জিনিস লক্ষ করলাম।

জানোয়ারটা যেন নড়াচড়া করছে। বারবার সামনের দিকে নিচু হয়ে পিছনের পা দুটো তাকের উপর আছড়ে ফেলছে। তার ফলে একটা খট খট শব্দ হচ্ছে।

দিলীপের কথা আর অবিশ্বাস করার উপায় নেই। আমি স্বচক্ষে দেখছি ঘটনাটা। বেশ বুঝতে পারছি দিলীপ আমার পাশে কাঠ হয়ে বসে আছে, তার বাঁ হাত দিয়ে আমার শার্টের আস্তিনটা খামচে ধরে। দিলীপ এতটা ভয় পেয়েছে বলেই হয়তো আমার ভয়টা অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু নিজের মধ্যে ঢিপঢিপানি আমি নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু এর পরেই যেটা হল সেটার জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, এবং সেটা চরম ভয়াবহ।

হঠাৎ তাকের উপর থেকে জানোয়ারটা এক লাফে সোজা একেবারে দিলীপের বুকের উপর এসে পড়ল। দিলীপ চিৎকার করে উঠেছে, আর আমি গাছের ডালটাকে খামচে ধরে দিলীপের বুক থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি সেটা আমার মুঠোর মধ্যে ছটফট করছে। আমি তবু মনে যতটা সাহস আনা যায় এনে সেটাকে মুঠোর মধ্যেই ধরে রাখলাম। এখন বুঝলাম সেটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

এবার জানোয়ারটাকে নিয়ে গিয়ে আবার তাকের উপর রেখে দিলাম।

বাকি রাত আর কোনও গণ্ডগোল নেই। না হলেও দু'জনের কারুরই ঘুম এল না। সকাল হতেই দিলীপ বলল, 'ওটা যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে আসি।'

আমি বললাম, 'আমার মাথায় কিন্তু অন্যরকম একটা চিন্তা এসেছে।'

'সেটা কী?'

'ফেলে আসবার কথাটা আমার মনে হয়নি, তবু তুই যেখানে ডালটা পেয়েছিলি সেখানে একবার যাওয়া দরকার—এক্ষুনি।'

দিলীপ এখনও ঠিক প্রকৃতিস্থ হয়নি। এর মধ্যে তাকে দু-একবার শিউরে উঠতে দেখেছি। সে বলল, 'সেখানেই তো যাব, গিয়ে জিনিসটাকে ফেলে আসব।'

'ফেলব কিনা সেটা পরে স্থির করা যাবে—আগে একবার জায়গাটায় চল।'

'ওই গাছের ডালটাকে নিয়ে?'

'সেটার এখনও দরকার নেই।'

আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ি থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ। তিনদিক বাড়িতে ঘেরা একটা পোড়ো জমি, তাতে একটা তাল, একটা কাঁঠাল, আর একটা অজানা গাছ, আর কিছু ঝোপঝাড়। এটা যে এখনও কেন পড়ে আছে তা জানি না।

দিলীপ আমাকে নিয়ে গেল কাঁঠাল গাছটার নীচে। একটা বিশেষ ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওর পাশেই পেয়েছিলাম ডালটা।'

আমি তার আশেপাশে খুঁজতে লাগলাম।

বেশি খুঁজতে হল না। তিন মিনিটের মধ্যেই আমি হাতে করে তুলে ধরলাম একটা গাছের ডাল, যেটা বলা চলে দিলীপের বাড়িতে যেটা আছে সেটার প্রায় যমজ। তফাত কেবল যে এটার লেজ নেই।

দিলীপ প্রশ্ন করল, 'কী করবি এটা নিয়ে?'

বললাম, 'আমি করব না, তুই করবি। তুই এটাকে অন্যটার পাশে রাখবি। আজও রাত্রে আমি তোর বাড়িতে থাকব। দেখি কী হয়।'

দুই জানোয়ার সারারাত ধরে দিলীপের ঘরের তাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল; কোনও গোলমাল নেই।

আমি বললাম, 'বোঝাই যাচ্ছে দ্বিতীয়টা ওর দোস্ত। তুই দুটোর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলি বলে যত

গণ্ডগোল।'

'কিন্তু এমনও হয় বিংশ শতাব্দীতে?'

আমি শেকসপিয়র আউড়ে দিলাম—'স্বর্গে মর্তে এমন অনেক কিছুই ঘটে, হোরেশিও, যা তোমাদের দার্শনিকেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।'

'এগুলোর নাম—?'

'কুটুম আর কাটাম।'

সন্দেশ, আষাঢ় ১৩৯৪

টেলিফোন

ক্রিং-ক্রিং...ক্রিং-ক্রিং...ক্রিং-ক্রিং...

বীরেশবাবু বিরক্ত হয়ে খাটের পাশের টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটার দিকে দেখলেন। টেলিফোনের পাশেই ঘড়ি, তাতে বারোটা বাজে। রাত বারোটা। বীরেশবাবু সবে হাতের বইটা বন্ধ করে ঘরের বাতিটা নেভাতে যাচ্ছিলেন। এদিকে টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। বীরেশবাবু রিসিভারটা তুলে নিলেন।

'হ্যালো—'

'ফোর সিক্স ফাইভ ওয়ান সেভেন সিক্স?'

'ইয়েস—'

'বীরেশবাবু আছেন? বীরেশচন্দ্র নিয়োগী?'

'কথা বলছি।'

'ও। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'এত রাত্রে ফোন করছি বলে কিছু মনে করবেন না।'

'ঠিক আছে। কী ব্যাপার?'

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।'

'আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি?'

'আমার নাম গণপতি সোম।'

বীরেশবাবুর বিরক্তিটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বললেন, 'কিন্তু এখন তো কথা বলার সময় হবে না। আমি শুতে যাচ্ছিলাম। আর, তা ছাড়া আপনাকে তো চিনিও না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। আপনার পেশা ডাক্তারি। তিন মাস হল এই বাড়িতে এসেছেন। আগের বাড়িতে আগুন লেগে প্রচুর ক্ষতি হয়। তাই আপনাকে এখানে উঠে আসতে হয়। আপনার স্ত্রী গত হয়েছেন আজ এগারো বছর হল। আপনার বয়স পঞ্চান্ন। আপনার একটি ছেলে আছে—ইঞ্জিনিয়ার—সে ভূপালে থাকে। কেমন ঠিক বলিনি?'

বীরেশবাবু যারপরনাই বিস্মিত হলেন। বললেন, 'আপনি এত কথা জানলেন কী করে?'

'ধরে নিন এটা আমার একটা বিশেষ ক্ষমতা। এখন বলুন আপনি আমার কথাগুলো শুনতে চান কিনা।'

'বেশি সময় লাগবে না তো?'

'না। অবিশ্যি কথার পর যদি কথোপকথন চলে তা হলে কিছুটা সময় লাগতে পারে।'

'ঠিক আছে। বলুন।'

'আজ থেকে সাত বছর আগের কথা বলছি। আমার পেশা ছিল ওকালতি। আপনি সেই সময় মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে থাকতেন, তাই নয় কি?'

'ঠিকই বলেছেন।'

'আপনার ছেলের নাম অরূপ।'

'হ্যাঁ।'

'সে তখন সিটি কলেজে পড়ত।'

'হ্যাঁ।'

'এটাও আপনি জানেন কিনা দেখুন—আপনার ছেলের একটি বন্ধু ছিল, নাম শ্রীপতি।'

'তা হতে পারে। ছেলের বন্ধুদের খবর আমি সবসময় রাখতাম না।'

'এই শ্রীপতি ছিল আমার মেজো ছেলে। খুব ভাল ছেলে ছিল—যেমন পড়াশুনায়, তেমনই স্বভাব-চরিত্রে। তার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল আপনার ছেলে অরূপ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ছেলে কুসঙ্গে পড়ে। তার ফলে ক্রমে তার মধ্যে অনেক বদ অভ্যাস দেখা দেয়। অরূপ অনেক চেষ্টা করেছিল তাকে বুঝিয়ে বলে এই কুসঙ্গ ত্যাগ করাতে, কিন্তু তাতে সে সফল হয়নি। অথচ শ্রীপতির উপর থেকে অরূপের টান যায়নি। অরূপ বদ্ধপরিকর ছিল যে, শ্রীপতিকে আবার সৎপথে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু তার চেষ্টা বৃথা হয়। এসব কি আপনার জানা?'

'অরূপের এই বন্ধুকে আমি দেখেছি, কিন্তু সে যে কুসঙ্গে পড়েছিল সেটা জানতাম না।'

'এবার একটা দুর্ঘটনার কথা বলি। আমার ছেলেকে জুয়ার নেশায় ধরে। সে রেসের মাঠে যেতে শুরু করে। তার ফলে তার অনেক হার হয় এবং বিস্তর দেনা হয়ে যায়। তখন সে অরূপের কাছে হাত পাতে। বলে, তাকে উদ্ধার না করলে আত্মহত্যা ছাড়া তার আর গতি নেই। অরূপ তাকে সাহায্য করে কীভাবে সেটা আপনি জানেন কি?'

'এখন বুঝতে পারছি।'

'কী বুঝছেন?'

'আমার বাড়িতে সিন্দুকে একটা অতি মূল্যবান জিনিস ছিল। এটা আমার ঠাকুরদার সম্পত্তি। একটা হিরের আংটি।'

'হ্যাঁ। আপনার ঠাকুরদাদা ছিলেন চণ্ডীপুর স্টেটের রাজার গৃহচিকিৎসক। রাজাকে একবার দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন বলে রাজা খুশি হয়ে তাঁকে এই আংটিটি দেন। ঠিক বলিনি?'

'ঠিক।'

'এই আংটিটি সিন্দুক থেকে বার করে আপনার ছেলে আমার ছেলেকে দিয়ে দেয়।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! আমরা এই আংটি অন্তর্ধান রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারিনি। পুলিশও পারেনি।'

'পারবে কী করে? আপনার ছেলে এত ভাল, তাকে আপনারা সন্দেহ করবেন কী করে?'

'তা তো বটেই।'

'সেই আংটি কিন্তু আমার ছেলের কাছেই থেকে যায়। আংটিটা তার এত ভাল লাগে যে, সেটা সে হাতছাড়া করতে চায় না। শেষটায় আমি ছেলের অবস্থা জানতে পেরে মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার দেনা শোধের ব্যবস্থা করি।'

'সেই আংটি কি এখনও আপনার ছেলের কাছেই আছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা সে আপনাকে ফেরত দিতে চায়। তার আংটির শখ মিটে গেছে। আংটি ফেরত দিয়ে সে কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। তা ছাড়া আপনার ছেলের মনেও একটা গ্লানি রয়েছে, সেটাও দূর করা দরকার।'

'আপনার ছেলে কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?'

'হ্যাঁ—এবং এখনই। সে রওনা হয়ে গেছে। এতক্ষণে সে প্রায় আপনার বাড়ি পৌঁছে গেছে।'

'তার নাম যেন কী বললেন?'

'শ্রীপতি।'

'আর আপনার নাম গণপতি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাদের নাম কি সম্প্রতি খবরের কাগজে বেরিয়েছে?'

'তা বেরিয়েছে।'

'দাঁড়ান, মনে করতে দিন।'

'করুন। সময় নিন।'

বীরেশবাবুর একটু ভাবতেই মনে পড়ল। বললেন, 'মনে পড়ছে। কালকের কাগজেই বেরিয়েছে আপনাদের নাম। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে একটা গাড়ি আর লরিতে সংঘর্ষের ফলে গাড়ির তিনজন যাত্রী তৎক্ষণাৎ মারা যান। তার মধ্যে একজন গাড়ির চালক, আর দু'জন বাপ ও ছেলে—নাম গণপতি সোম আর শ্রীপতি সোম।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিই সেই গণপতি সোম।'

'আ-আপনি...তার মানে...'

'তার মানে আপনি যা ভাবছেন তাই।'

'কিন্তু এ যে অসম্ভব!'

'কেন অসম্ভব হবে? দেখুন তো আপনি কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কিনা।'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি।'

'কী শব্দ?'

'কে যেন আমার নীচের দরজায় টোকা মারছে।'

নিস্তব্ধ রাত্রে বীরেশবাবু স্পষ্ট শুনতে পেলেন সে শব্দ—টক্-টক্...টক্-টক্...টক্-টক্...। তারপর টেলিফোনে শুনলেন—

'দরজাটা খুলে দিন। আমার ছেলে অপেক্ষা করছে।'

'না না—আমি দরজা খুলব না।'

বীরেশবাবু বুঝলেন তাঁর গলা শুকিয়ে আসছে। তাঁর ডান হাতে রিসিভারটা কাঁপছে। আবার টেলিফোনে কথা—

'দরজা না খুললেও সে ঢুকতে পারবে। সে ক্ষমতা তার আছে। এবার শুনুন তো কোনও আওয়াজ পাচ্ছেন কিনা।'

'সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে পায়ের শব্দ।'

'আপনি কোনও চিন্তা করবেন না বীরেশবাবু। সে আপনাকে বিরক্ত করবে না। শুধু আপনার পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের উপর রেখে আসবে আংটিটা।'

চরম আতঙ্কে বীরেশবাবু বললেন, 'না না—আপনি আপনার ছেলেকে ডেকে নিন, ডেকে নিন!'

'তার তো উপায় নেই বীরেশবাবু। সে আপনার দোতলায় পৌঁছে গেছে।'

বীরেশবাবু স্পষ্ট শুনলেন পাশের ঘরে পায়ের শব্দ। শব্দটা এক মুহূর্তের জন্য থামল, তারপর আবার শোনা গেল। এবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার শব্দ। টেলিফোনে কথা এল—

'এবারে আপনি নিশ্চিন্ত। আপনি টেলিফোন রেখে পাশের ঘরে গিয়ে দেখুন। আমি আসি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল। গুড নাইট।'

বীরেশবাবু রিসিভারটা রেখে দিলেন। তাঁর কপাল এই পৌষ মাসেও ঘর্মাক্ত। কিছুক্ষণ বিছানায় চুপ করে বসে থেকে তিনি উঠলেন। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকে বাতিটা জ্বালালেন।

হ্যাঁ, সত্যিই পড়ে আছে টেবিলের উপর। এই অল্প আলোতেও ঝলমল করছে তার দ্যুতি—সাত বছর পরে ফিরে পাওয়া তাঁর ঠাকুরদাদার হিরের আংটি।

আনন্দ, বার্ষিকী ১৩৯৪

গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্ট্রেট

সুখময় সেনের বয়স পঁয়ত্রিশ। এই বয়সেই সে চিত্রকর হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। পোর্ট্রেটেই তার দক্ষতা বেশি। সমঝদারেরা বলে সুখময় সেনের আঁকা কোনও মানুষের প্রতিকৃতি দেখলে সেই মানুষের জ্যান্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বহু প্রদর্শনীতে তার আঁকা পোর্ট্রেট দেখানো হয়েছে, শিল্প সমালোচকেরা তার প্রশংসা করেছে।

কিন্তু শিল্পীরা সবসময় এক পথে চলতে ভালবাসে না। সুখময় এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি তার মনে হয়েছে—পোর্ট্রেট তো অনেক হল, এবার একটু অন্য ধরনের কিছু আঁকলে কেমন হয়। এই অন্য ধরনটা সুখময়ের ক্ষেত্রে হল ল্যান্ডস্কেপ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার উদ্দেশ্যেই সুখময় হাজির হয়েছে শিলং শহরে।

সুখময় এখনও বিয়ে করেনি, তার বাপ-মা দু'জনেই জীবিত। দুটি বোন আছে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সুখময় শিলং-এ একাই এসেছে, কারণ শিল্পীর জীবনের একাকিত্বের প্রয়োজনীয়তা সে প্রবলভাবে অনুভব করে। যখন সে ছবি আঁকে তখন তার পাশে কেউ উপস্থিত থাকলে সেটা সে মোটেই পছন্দ করে না। অবিশ্যি পোর্ট্রেট আঁকা হলে যার ছবি আঁকা হচ্ছে তাকে থাকতেই হয়, কিন্তু আর কেউ নয়। সব শিল্পীর মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়, কিন্তু সুখময়ের মধ্যে এর মাত্রাটা একটু বেশি।

তাই শিলং-এ এসে সেখানকার বিখ্যাত লোকের ছবি সে যখন আঁকছিল ঘাসের উপর ইজেল রেখে, তখন একটি দ্বিতীয় প্রাণীর আবির্ভাবে সে মোটেই সন্তুষ্ট হল না।

'বাঃ, আপনার আঁকার হাত তো খাসা মশাই!' হল আগন্তুকের প্রথম মন্তব্য।

এর কোনও উত্তর হয় না, তাই সুখময় স্মিতহাস্য করে তার তুলি চালিয়ে চলল।

'আমি চিত্রকরদের খুব উঁচুতে স্থান দিই,' বললেন আগন্তুক। 'একজিবিশনে যাই সুযোগ পেলেই। আপনার কি কখনও কোনও প্রদর্শনী হয়েছে?'

এটা একটা প্রশ্ন, কাজেই এর উত্তর দিতে হয়। সুখময় সংক্ষিপ্ততম উত্তরটি বেছে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

সুখময় নাম বলল।

আগন্তুকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'বলেন কী মশাই। আপনার নাম তো আমার বিলক্ষণ জানা। আমি যতদূর জানি আপনি তো ল্যান্ডস্কেপ আঁকেন না। আপনার ছবির প্রদর্শনীতে আমি গিয়েছি। সেগুলো সবই পোর্ট্রেট। আপনি হঠাৎ সাবজেক্ট চেঞ্জ করলেন কেন?'

'স্বাদ বদলের জন্য।' বলল সুখময়। এ ভদ্রলোক তার পাশ সহজে ছাড়বেন বলে মনে হয় না। সুখময় অভদ্রতা এড়ানোর জন্য বাধ্য হয়েই একটা প্রশ্ন করল।

'আপনি কি শিলং-এই থাকেন?'

'আজ্ঞে না। আমার এক শালা থাকে, লাবানে, আমি তার বাড়িতে দিন দশেকের জন্য এসে উঠেছি। আমার নাম গণেশ মুৎসুদ্দি। কলকাতায় থাকি; একটা ইনশিওরেন্স কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।'

সুখময় যে এতক্ষণ এই ভদ্রলোককে বরদাস্ত করেছে তার একটা কারণ হল এই যে, ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, কণ্ঠস্বর ভাল, নাক চোখা, চাহনি বুদ্ধিদীপ্ত। এইরকম চেহারা দেখলে আপনা থেকেই সুখময়ের পোর্ট্রেট করার ইচ্ছেটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

'তা আপনি কি মানুষের ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন?' গণেশ মুৎসুদ্দি প্রশ্ন করলেন।

'পোর্ট্রেট তো অনেক হল,' বলল সুখময়, 'তাই এবার ল্যান্ডস্কেপের দিকে ঝুঁকেছি।'

'আপনি আমার একটা ছবি এঁকে দেবেন?'

সুখময় রীতিমতো বিস্মিত। এ ধরনের প্রস্তাব ভদ্রলোকের কাছ থেকে সে আশা করেনি। গণেশ মুৎসুদ্দি ঘাসের উপর বসে পড়ে বললেন, 'আমি একটা অভিনব অফার দিচ্ছি আপনাকে। আপনি পোর্ট্রেট আঁকবেন, তবে সাধারণ পোর্ট্রেট নয়।'

'কীরকম?'

সুখময়ের মনে এখন বিরক্তির জায়গায় কৌতূহল দেখা দিয়েছে। তার হাতের তুলি হাতেই রয়ে গেছে; সে তুলি আর কাজ করছে না।

গণেস মুৎসুদ্দি বললেন, 'আমার প্রস্তাবটা শুনুন, তারপর আপনার যা বলার বলুন। আমার মনে হয় এটা আপনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না।'

সুখময় এখনও কোনও আন্দাজ করতে পারছে না ভদ্রলোক কী বলতে চান। ভদ্রলোকও একটু সময় নিয়ে তাঁর প্রস্তাবটা দিলেন।

'ব্যাপারটা হল এই—আপনি আমার একটা ছবি আঁকুন, কিন্তু সেটা হবে এখনকার চেহারা নয়। আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর পরে আমার যে চেহারা হবে সেইটে আপনার অনুমান করে আঁকতে হবে। আজ হল ১৫ অক্টোবর ১৯৭০। আপনার ছবিটা আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে আপনার কাছ থেকে কিনে নেব। তারপর আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে—অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর ১৯৯৫—আমি আবার ছবিটি নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আমার কথার নড়চড় হবে না। যদি দেখা যায় যে আপনার অনুমান ঠিক হয়েছে এবং ছবির সঙ্গে আমার তখনকার চেহারা মিলে গেছে, তা হলে আমি আপনাকে আরও কিছু টাকা পুরস্কার দেব। রাজি?'

প্রস্তাব যে অভিনব তাতে সন্দেহ নেই। এমন প্রস্তাব কোনও ব্যক্তি কোনও শিল্পীকে করেছে বলে সুখময়ের জানা নেই। সুখময় প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিতে পারল না। এটা একটা চ্যালেঞ্জই বটে! একজন লোকের আজকের চেহারা পঁচিশ বছরে কী রূপ নেবে সেটা অনুমান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তাও সুখময় একটা আকর্ষণ অনুভব করল। সে বলল, 'ছবি না হয় আমি আঁকলাম, কিন্তু পঁচিশ বছর পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হবে কী করে?'

'আমিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি। 'আপনার এখনকার ঠিকানা আপনি আমাকে দিন, আমিও আমার ঠিকানা দিচ্ছি। যার ঠিকানা বদল হবে, সে অন্যকে জানাবে। এই ব্যাপারে যেন অন্যথা না হয়, নইলে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এইভাবে ঠিক পঁচিশ বছর পর আপনার পোর্ট্রেটটি সঙ্গে নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। যদি চেহারা মেলে তা হলে আপনি আরও পাঁচ হাজার পাবেন! না হলে অবশ্য টাকার আর কোনও প্রশ্ন উঠছে না; কিন্তু এটাও বুঝুন যে, আপনার কোনও লোকসান হচ্ছে না, কারণ আপনার পারিশ্রমিক আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি।'

সুখময় একটু ভেবে বলল, 'আমি রাজি আছি। শিলং-এই কাজটা হবে তো?'

'তা তো হতেই পারে। আমি এখানে আরও দশদিন আছি। তার মধ্যে আপনার পোর্ট্রেট হয়ে যাবে না?'

'পোর্ট্রেট করতে দিন পাঁচেকের বেশি লাগবে না। আমি আরও সাতদিন আছি। কালই শুরু করা যাবে তো!'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু এমন উদ্ভট প্ল্যান আপনার মাথায় এল কী করে?'

'আমি মানুষটাই একটু রগুড়ে আর খামখেয়ালি। আমাকে যারা চেনে তারা আমার এদিকটা জানে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি, তাই আপনার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে।'

'আপনার বয়স এখন কত?'

'সাঁইত্রিশ। পঁচিশ বছর পরে আমার বয়স হবে বাষট্টি। আপনি তো বোধহয় আমার চেয়ে ছোট?'

'আমার বয়স পঁয়ত্রিশ', বলল সুখময়।

'আশা করি আমরা দু'জনেই আরও পঁচিশ বছর জীবিত থাকব।'

'সেটা কি জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে?'

'আমার মন তাই বলছে। তারপর দেখা যাক কী হয়!'

'তা হলে কাল থেকেই কাজ শুরু।'

'হ্যাঁ। আপনি যদি বলেন তা হলে আমি আপনার বাড়িতে আসতে পারি।'

'আঁকার সরঞ্জাম—রঙ, তুলি, ক্যানভাস, ইজেল—সেখানে পাওয়া যাবে! আমি থাকি লাইমখ্‌রা—বাংলো বাড়ি, নাম "কিসমত"। এখানে সকলেই ওটাকে স্মিথ সাহেবের বাংলো বলে।'

গণেশ মুৎসুদ্দির আজ থেকে পঁচিশ বছর পরের পোর্ট্রেট আঁকতে সুখময় সেনের লাগল পাঁচদিন। ছবিটা এঁকে সুখময় বুঝেছে যে, এমন চিত্তাকর্ষক কাজ সে কোনওদিন করেনি। অন্য পোর্ট্রেট আঁকতে শুধু পর্যবেক্ষণেরই প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রে একটা দূরদৃষ্টি সুখময়ের সবসময়ই প্রয়োগ করতে হচ্ছিল, যেটা এর আগে কখনওই প্রয়োজন হয়নি। গণেশ মুৎসুদ্দির মাথা ভর্তি চুল, কিন্তু সুখময় লক্ষ করেছে যে, সে চুলের জাত পাতলা। তাই পঁচিশ বছর পরে তার মাথায় একটা বিস্তীর্ণ টাক দিয়েছে সুখময়। তা ছাড়া সুখময়ের মন বলেছে, এ ব্যক্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মোটা হবে না, রোগাই থাকবে। তাই ছবিতে মুখের ভাবটা শীর্ণ করেছে। গাল বসা, চোখের কোণে বলিরেখা, কানের পাশে চুলে পাক, থুতনির নীচে ঈষৎ লোল চর্ম—এই সবই সুখময় এঁকেছে। তা ছাড়া ঠোঁটের কোণে একটা হাসির আভাস দিয়েছে। কারণ তার মন বলেছে, গণেশ মুৎসুদ্দির জীবনটা মোটামুটি সুখের হবে।

ছবি দেখে গণেশ মুৎসুদ্দি বললেন, 'বাঃ, এ অদ্ভুত ব্যাপার। কিছুটা আমার বাবার এখনকার চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আর মনে হয় আমাকে মেক-আপ দিলেও এই চেহারা দাঁড় করানো যায়। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আবার পঁচিশ বছর পরে দেখা হবে, আপাতত আপনার পারিশ্রমিকটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

শিলং লেকের ছবি শেষ করার জন্য সুখময়কে আরও ক'দিন থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এ ক'দিনে আর গণেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে দেখা হয়নি। লোকটা যে ভারী অদ্ভুত, এ চিন্তা সুখময়ের মনে অনেকবার উদয় হয়েছে। পঁচিশ বছর পরে কি সে সত্যিই আবার আসবে? সেটা বলার কোনও উপায় নেই। এই পঁচিশ বছরে যে কত কী ঘটতে পারে এটা ভেবে সুখময়ের মাথা বোঁ বোঁ করে উঠল।

সুখময় সেন পোর্ট্রেট এঁকে যেমন নাম করেছিল, ল্যান্ডস্কেপ এঁকে তেমন করেনি। সমালোচকের মন্তব্য তাকে পীড়া দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে তার কিছুটা সে না মেনেও পারেনি। দৈনিক বার্তা কাগজের চিত্রসমালোচক অম্বুজ সান্যাল সুখময় সেন সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আলোচনায় অনুযোগ করলেন যে, প্রাচীন পথ ধরে চলাই হচ্ছে সুখময়ের উদ্দেশ্য। অথচ তার তুলির জোর আছে। রঙের উপর দখল আছে, টেকনিকে সে দক্ষ; তা হলে সে পুরনো পথ ছেড়ে আজকের রীতি অবলম্বন করবে না কেন? আর্ট তো চিরকাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রীতিনীতি পরিবর্তন হয়। সুখময়কে মডার্ন হতেই হবে। নইলে তার কাজে অবসাদের ছায়া আসতে বাধ্য।

১৯৭৫-এর মে মাসের প্রদর্শনীতে সুখময়ের নতুন ঢং-এর কাজের নমুনা দেখা গেল। দু-একজন প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু ছবি বিক্রি হল না। অথচ সুখময় পেশাদারি চিত্রকর, ছবি এঁকেই তাকে পেট চালাতে হয়।

এদিকে গোলমাল যা হবার তা হয়ে গেছে। মডার্ন আর্ট করতে গিয়েই সুখময়ের কাল হল। জীবনে সে প্রথম টের পেল অর্থাভাব কাকে বলে। নবীন নস্কর লেনে তার ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘরে সে বাস করে। তার সঙ্গে এতদিন ছিলেন তার মা ও বাবা। ১৯৮০-র ডিসেম্বর সুখময়ের বাপের মৃত্যু হল। মার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সুখময় বিয়ে করেনি। ভাগ্যিস!—কারণ ১৯৭০-এর সুখময় আর ১৯৮০-র সুখময়ে অনেক পার্থক্য। শিল্পী হিসাবে তার যে আত্মপ্রত্যয় ছিল সেটা সে হারিয়েছে। মডার্ন আর্ট সে এখনও করছে এবং স্বল্পমূল্যে কয়েকটা বিক্রিও হয়, কিন্তু তাতে সংসার চলে না।

১৯৮৫-তে সুখময়কে মাঝে মাঝে ফিল্মের বিজ্ঞাপন আঁকতে শুরু করতে হল। তেলরঙের আঁকা বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন রাস্তায় টাঙানো হবে; কে সে ছবি এঁকেছে তা কেউ জানতে চাইবে না। অত্যন্ত হীন জীবিকা, কিন্তু এ ছাড়া গতি নেই। ফ্ল্যাটের তিনটে ঘরের একটা ভাড়া হয়ে গেল। তাতে এক জ্যোতিষী এসে উঠলেন, নাম ভবেশ ভট্টাচার্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল সুখময়ের। সুখময়ের

ভবিষ্যৎ গণনা করে কিন্তু জ্যোতিষী মশাই কোনও আশার আলো দেখতে পেলেন না।

১৯৮৬-র কোনও একটা সময়ে জীবন সংগ্রামের চাপে পড়ে সুখময়ের স্মৃতি থেকে শিলং-এর ঘটনাটা বেমালুম লোপ পেয়ে গেল। এই স্মৃতি লোপ পাওয়ার ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত; কখন যে সেটা ঘটে তা কেউ বলতে পারে না।

১৯৮৯-তে সুখময়ের মা মারা গেলেন। এখন সুখময় একেবারে একা। তার সুদিনে তার যে কিছু বন্ধু জুটেছিল—প্রণব, সাত্যকি, অরুণ—এরা সকলেই সুখময়ের দুর্দিনে সরে পড়েছে। সুখময়ের বয়স এখন বাহান্ন। এই বয়সেই রাত্তিরের টিমটিমে আলোতে সাইনবোর্ড এঁকে এঁকে তার চোখে ছানির উপক্রম

দেখা দিয়েছে। অথচ বাড়িওয়ালার তাগাদা এড়াতে তাকে ক্রমাগত কাজ করে যেতেই হচ্ছে। বাড়িওয়ালা আগে যিনি ছিলেন তিনি মোটামুটি ভদ্র ছিলেন, কিন্তু তিনি মরে গিয়ে তাঁর বড় ছেলে এখন তাঁর স্থান অধিকার করেছেন। ইনি পয়লা নম্বর চামার; এঁর মুখে কিছু আটকায় না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, গালিগালাজও সুখময়ের গা সওয়া হয়ে গেছে!

সময় কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। দেখতে দেখতে ১৯৯৫ সাল এসে পড়ল। সুখময়ের এখন আর একটি কাঁচা চুলও অবশিষ্ট নেই।

অক্টোবরের পনেরোই—সেদিন বিজয়া দশমী—সুখময়ের ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। সুখময় দরজা খুলে দেখল—একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মাথায় ঢেউ খেলানো পাকা চুল আর নাকের নীচে একটি জাঁদরেল গোঁফ। ভদ্রলোকের হাতে একটি বেশ বড় চতুষ্কোণ খবরের কাগজের মোড়ক, দেখলে মনে হয় হয়তো ছবি আছে। সুখময় ভদ্রলোককে দেখে সন্তুষ্ট হল না। এখন তার অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলার মেজাজ নেই। বাড়িভাড়া সাত মাসের বাকি পড়েছে, বাড়িওয়ালা শাসিয়ে গেছেন এবারে মিটিয়ে না দিলে তিনি জোর করে তাকে ঘরছাড়া করবেন। গুণ্ডার সাহায্যে সবই সম্ভব।

আগন্তুকের মুখে কিন্তু হাসি। ঘরের ভিতর ঢুকে বললেন, 'ভুলে গেছেন বুঝি?'

সুখময় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আজ কী তারিখ?'

'পনেরোই অক্টোবর।'

'কী সন?'

'১৯৯৫।'

'তাও কিছু মনে পড়ছে না। শিলং-এর সেই ঘটনা বেমালুম ভুলে গেলেন?'

প্রশ্নটা করতেই—আর হয়তো ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনেই—সুখময়ের মনে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এক ঝলকে তার সব কথা মনে পড়ে গেল—কেবল ভদ্রলোকের নামটা ছাড়া।

'মনে পড়েছে', বলে উঠল সুখময়। আপনার একটা পোর্ট্রেট করেছিলাম আমি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু আমি তো হেরে গেলাম। আপনার মাথা ভর্তি চুল, আপনার গোঁফ, আপনার ঝুলপি এসব তো কিছুই আমি আঁকিনি।'

'আমার চেহারা দেখে কারুর কথা মনে পড়ছে?'

এটা সত্যি কথা বটে! ভদ্রলোককে দেখেই সুখময়ের কেমন যেন চেনা চেনা লেগেছিল।

'আপনি বাংলা ফিল্ম দেখেন?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'তা দেখি না, তবে বাংলা ছবির বিজ্ঞাপন আঁকি।'

'মণীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামটা চেনা লাগছে কি?'

ঠিক কথা। এই মণীশ গঙ্গোপাধ্যায় নামকরা চলচ্চিত্র অভিনেতা। বয়স হয়েছে, নায়কের অভিনয় করেন না, তবে জাঁদরেল চরিত্রাভিনেতা হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। সুখময় বলল, 'এবার চিনেছি। আপনি ক্যারেকটার রোল করেন। খুব জনপ্রিয় অভিনেতা। আমি ফিল্মের বিজ্ঞাপনে আপনার ছবি এঁকেছি।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'সেটা হল আমার আজকের পরিচয়। মণীশ গঙ্গোপাধ্যায় আমার আসল নাম নয়। আমার আসল নামে আপনি আমাকে চিনতেন পঁচিশ বছর আগে। সে নাম হল গণেশ মুৎসুদ্দি।'

'ঠিক কথা,' বলল সুখময়। 'আমি আপনার একটি পোর্ট্রেট করি—পঁচিশ বছর পরে আপনার যে চেহারা হবে সেটা অনুমান করে। সে ছবির কথা আমার এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে। কিন্তু সে চেহারার সঙ্গে আপনার আজকের চেহারার কোনও মিল নেই। কাজেই আমি কৃতকার্য হইনি। হলে আপনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু সে টাকাও আমি দাবি করতে পারি না! কাজেই—'

'দাঁড়ান, আপনাকে সে ছবিটা দেখাই', বলে ভদ্রলোক মোড়ক খুলে ছবিটা টেবিলের উপর দাঁড় করালেন। তারপর বললেন, 'ভুলবেন না, আমি অভিনেতা। এবার দেখুন আমার দিকে।

সুখময় ভদ্রলোকের দিকে চাইল। ভদ্রলোক এক টানে তার গোঁফ আর মাথার চুল খুলে ফেললেন। সুখময় অবাক হয়ে দেখল তার সামনে হুবহু তার পোর্ট্রেটের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গণেশ মুৎসুদ্দি।

'এটাই আমার আসল চেহারা,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি। 'এই চেহারা আপনি অদ্ভুত ক্ষমতাবলে পঁচিশ বছর আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। আমি তখন ছিলাম ইনশিওরেন্স কোম্পানির চাকুরে। কিন্তু অভিনয়ের শখ আমার তরুণ বয়স থেকেই। একবার এক বন্ধু পরিচালকের অনুরোধে পড়ে একটা বাংলা ছবিতে অভিনয় করি। প্রচুর সুনাম হয়। সেই থেকেই আমি অভিনেতা। নামটা বদলে নিই প্রথমেই। অর্থাৎ সবটাই আমার মুখোশ। টাক পড়ে যাচ্ছিল দেখে ফিল্মে পরচুলা ব্যবহার করতে শুরু করি। একটা গোঁফও নিই সেইসঙ্গে। আমার এই চেহারাটাই দর্শক পছন্দ করে। কিন্তু আমার আসল চেহারা হল এই ছবির চেহারা। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম চেহারা মিললে পুরস্কার দেব। এই নিন সেই পুরস্কার।'

সুখময় দেখল যে, তার হাতে চলে এসেছে একটি কুড়ি হাজার টাকার চেক। এবার গণেশ মুৎসুদ্দি বললেন, 'শুনুন, আমি অভিনয় করি বলে যে আর্টের প্রদর্শনীতে যাই না তা নয়। আপনার এ মতিভ্রম হল কেন? আপনার পোর্ট্রেটে এত সুন্দর হাত—আপনি সেই ছেড়ে অন্য লাইনে গেলেন কেন?'

সুখময় আর কী বলবে, চুপ করে রইল।

'আমি আপনাকে বলছি,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি, 'আপনি সমালোচকের কথা ভুলে যান। আপনি আবার পোর্ট্রেট আঁকতে শুরু করুন। আমার ধারণা, আপনার হাত এখনও নষ্ট হয়নি।'

গণেশ মুৎসুদ্দি ছবিটা আবার মোড়কে পুরে নিয়ে বললেন, 'আমি তা হলে আসি। আমার অ্যাডভাইসটা অগ্রাহ্য করবেন না।'

সুখময় করেনি অগ্রাহ্য, এবং তাতে আশ্চর্য ফল পেয়েছিল। ১৯৯৫-এর ডিসেম্বরে তার আঁকা পোর্ট্রেটের প্রদর্শনীতে নতুন করে তার দক্ষতার সুখ্যাতি হল। আর সেইসঙ্গে ছবি বিক্রিও হল ভাল।

সন্দেশ, কার্তিক ১৩৯৪

মৃগাঙ্কবাবুর ঘটনা

মৃগাঙ্কবাবু তাঁর সহকর্মী সলিল বসাকের কাছ থেকে প্রথম জানতে পারলেন যে বাঁদর থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। এ খবর আজকের দিনে শিক্ষিত লোকমাত্রই জানে, কিন্তু ঘটনাচক্রে খবরটা মৃগাঙ্কবাবুর গোচরে আসেনি। আসলে তাঁর জ্ঞানের পরিধিটা নেহাতই সংকীর্ণ। ইস্কুলে মাঝারি ছাত্র ছিলেন, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোনও বই পড়তেন না, পরেও বই পড়ার অভ্যাসটা একেবারেই হয়নি।

'বলেন কী মশাই। তাজ্জব ব্যাপার! বাঁদর থেকে মানুষ হয়েছে?' মৃগাঙ্কবাবু চরম বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

'ঠিক তাই', বললেন সলিলবাবু, 'লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষ ছিল এক শ্রেণীর চতুষ্পদ বাঁদর। বাঁদর জাতটা অবিশ্যি এখনও আছে, কিন্তু যে শ্রেণীর বাঁদর থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে সে শ্রেণী লোপ পেয়ে গেছে।'

মৃগাঙ্কবাবু এবং সলিলবাবু দু'জনেই হার্ডিঞ্জ ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কেরানিগিরি করেন। মৃগাঙ্কবাবু বাইশ বছর হল কাজ করছেন, আর সলিল পনেরো; দু'জনে পাশাপাশি টেবিলে বসেন, তাই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, না হলে মৃগাঙ্কবাবু মোটেই মিশুকে লোক নন।

বাঁদর থেকে মানুষ হওয়ার খবরটা মৃগাঙ্কবাবুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। তিনি কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের দোকান ঘেঁটে একটা বিবর্তনের বই জোগাড় করে পড়ে ফেললেন। সলিল ভুল বলেনি। ছাপার অক্ষরে তথ্যটা দেখে মৃগাঙ্কবাবু আর সেটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। আশ্চর্য—বাঁদর থেকে মানুষের আসতে এত লক্ষ বছর লেগেছে! আদিম অবস্থাটা, এবং পরিবর্তনের ব্যাপারটা এখনও কিছুটা অন্ধকারে রয়েছে, তবে এ-ব্যাপারে প্রাণিবিদ্‌রা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। মানুষ ও বাঁদর, এই দুই-এর মাঝামাঝি অবস্থাকে যে বলা হয় মিসিং লিঙ্ক, এ খবরও মৃগাঙ্কবাবু জানলেন।

কিন্তু এতেই মৃগাঙ্কবাবুর আশ মিটল না। তিনি প্রথমে জাদুঘর গেলেন আদিম মানুষের মূর্তি আর তার হাড়গোড় দেখতে। দেখে বুঝলেন যে, আদিম দ্বিপদ মানুষের চেহারার সঙ্গে বাঁদরের চেহারার বিশেষ মিল ছিল। তারপর মৃগাঙ্কবাবু গেলেন চিড়িয়াখানায়। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। এক হল লেজবিশিষ্ট 'মাঙ্কি', আর আরেক হল লেজবিহীন 'এপ'। এর মধ্যেও নানারকম শ্রেণী। দিশি বাঁদর আর হনুমানের বাইরে রয়েছে আফ্রিকার গোরিলা, শিম্পাঞ্জি, বেবুন ইত্যাদি, আর তা ছাড়া আছে সুমাত্রার ওরাং ওটাং বা বনমানুষ। এই যে মানুষ কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে এটা মৃগাঙ্কবাবুর কাছে খুব অর্থপূর্ণ বলে মনে হল।

তাঁর আরও মনে হল যে, সবরকম বাঁদরের মধ্যে আফ্রিকার শিম্পাঞ্জির সঙ্গেই মানুষের সবচেয়ে বেশি মিল। শুধু তাই না, একটি বিশেষ শিম্পাঞ্জি তো মৃগাঙ্কবাবুর সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী বলে মনে

হল। বারবার তাঁর দিকে চাওয়া, এগিয়ে এসে খাঁচার শিক ধরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিয়ে চেয়ে মুখভঙ্গি করা, এমনকী দাঁত বার করে হাসা পর্যন্ত। মৃগাঙ্কবাবুর মনে হচ্ছিল যেন জানোয়ারটিকে তিনি অনেকদিন থেকেই চেনেন।

চিড়িয়াখানায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মৃগাঙ্কবাবুর হঠাৎ কালুমামার কথা মনে পড়ে গেল। মৃগাঙ্কবাবুর যখন বছর পঁচিশেক বয়স তখন কালুমামা একবার কিছুদিনের জন্য তাঁদের বাড়িতে এসে ছিলেন। তখন তিনি মৃগাঙ্কবাবুকে মাঝে মাঝে মর্কট বলে সম্বোধন করতেন। 'এই মর্কট, মোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আন তো।'

মৃগাঙ্কবাবু একদিন না জিজ্ঞেস করে পারেননি। 'আচ্ছা কালুমামা, তুমি আমায় মর্কট বলো কেন?'

কালুমামার উত্তর দিতে সময় লাগেনি।

'তোর চেহারাটা মর্কটের মতো তাই। আয়নায় নিজের মুখ দেখেও বুঝতে পারিস না? কপাল ছোট, কুতকুতে চোখ, নাক আর ঠোঁটের মাঝখানে এতবড় ফাঁক—মর্কট বলব না তো কী বলব? তোর হাতের আংটিটায় যে 'এম' লেখা রয়েছে সেটা আসলে মৃগাঙ্ক নয়—ওটা মর্কট। অথবা মাঙ্কি। তোর আর চাকরি খুঁজতে হবে না—চিড়িয়াখানায় খাঁচায় তোর জন্য ভেকেন্সি রয়েছে সবসময়।'

মৃগাঙ্কবাবু অবিশ্যি এর পরে আয়নায় নিজের চেহারাটা খুব ভাল করে দেখেছিলেন। কালুমামা খুব ভুল বলেননি। একটা বাঁদুরে ভাব আছে বটে তাঁর চেহারার মধ্যে। তখন মনে পড়ল ইস্কুলেও মহেশ স্যার তাঁকে 'এই বাঁদর, তোর বাঁদরামো থামা' জাতীয় কথা বলে ধমক দিতেন। তখন মৃগাঙ্কবাবুর বয়স বারো-তেরো। নিজের চেহারা যে বাঁদরের মতো হতে পারে এ খেয়াল তাঁর হয়নি।

শুধু মুখে নয়, পিঠে একটা কুঁজো ভাব, তার শরীরের লোমের আধিক্য—এ দুটোও তাঁকে কিছুটা বাঁদরের কাছাকাছি এনে দেয়। সলিলের কথাটা তাঁর আবার মনে পড়ল। সুদূর অতীতে যে বানর থেকে মানুষের উদ্ভব হয় তার কিছুটা ছাপ এখনও মৃগাঙ্কবাবুর চেহারায় রয়ে গেছে। চিন্তাটা তাঁকে বিব্রত করতে লাগল। আপিসে টাইপ করতে করতে মনে হয়—আমার মধ্যে বিবর্তন পুরো হয়নি, আমার মধ্যে খানিকটা বাঁদর এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে—বাঁদর কি আপিসে ডেস্কে বসে টাইপ করতে পারে? তাঁর চেহারার সঙ্গে বাঁদরের যেটুকু সাদৃশ্য সেটা সম্পূর্ণ আকস্মিক। সেরকম তো অনেক লোকের চেহারার সঙ্গেই জানোয়ারের মিল আছে। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সুরেশবাবুর মুখের সঙ্গে তো ছুঁচোর আশ্চর্য সাদৃশ্য। মৃগাঙ্কবাবু ষোলো আনাই মানুষ। এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার কোনও কারণ থাকতে পারে না।

এরই মধ্যে একদিন মৃগাঙ্কবাবুর খেয়াল হল যে তিনি কলা আর চিনেবাদামের বিশেষ ভক্ত। আপিস থেকে ফেরার পথে রোজই দুটোর একটা কিনে খান। আর এ দুটোই হল বাঁদরেরও প্রিয় খাদ্য। 'এই বাঁদর তুই কলা খাবি? জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?'—ছেলেবেলার এই ছড়াটা তাঁর মাথায় ঘুরতে লাগল। এই মিলটাও কি আকস্মিক? নিশ্চয়ই তাই। কলা তো অনেকেই খায়, আর চিনেবাদামও খায়। মৃগাঙ্কবাবু চিন্তাটা জোর করে মন থেকে দূর করে দিলেন।

কিন্তু যতই স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করুন না কেন, মৃগাঙ্কবাবুর চিন্তাটা কিছুতেই যেতে চায় না। 'বাঁদর থেকে মানুষ...বাঁদর থেকে মানুষ...আমি কি তা হলে পুরোপুরি মানুষ হইনি? আমার মধ্যে কি বাঁদরত্ব খানিকটা রয়ে গেছে?'

টাইপিং-এ ভুল হতে লাগল, আর এবার মেজোসাহেবের কাছ থেকে ডাক পড়ল।

'আপনার কী হয়েছে বলুন তো?' মেজোসাহেব জিজ্ঞেস করলেন। 'আগে তো আপনার টাইপিং-এ ভুল থাকত না। আজকাল এটা হচ্ছে কেন?'

মৃগাঙ্কবাবু আর কী বলবেন। বললেন, 'কদিন শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল স্যার।'

'তা হলে ডাক্তার দেখান। আপিসের ডাক্তার তো রয়েইছে। ডাঃ গুপ্তকে বলুন।'

'না স্যার। তার দরকার হবে না। আর ভুল হবে না, আমি কথা দিচ্ছি। আমার ত্রুটি মাফ করবেন স্যার।'

মেজোসাহেব মৃগাঙ্কবাবুর কথা মেনে নিলেন, কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু নিজে মনে শান্তি পেলেন না। তিনি ডাঃ গুপ্তের শরণাপন্ন হলেন। বললেন, 'আমায় একটা কোনও ওষুধ দিন তো, যাতে আমার

অন্যমনস্কতা কিছুটা কমে। কাজে বড় অসুবিধা হচ্ছে।'

ডাঃ গুপ্ত মৃগাঙ্কবাবুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'আপনার চেহারাটাও দেখে ভাল লাগছে না। আপনার ওজন কমেছে, চোখের তলায় কালি পড়েছে। শুধু ওষুধে তো কাজ হবে না। আপনার ছুটি পাওনা আছে?'

'তা আছে। আমি গত দু' বছর ছুটিই নিইনি।'

'তা হলে দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে আসুন। আপনার চেঞ্জের দরকার। অবিশ্যি আমি একটা ওষুধও লিখে দিচ্ছি, কিন্তু শুধু ওষুধে কাজ হবে না।'

মৃগাঙ্কবাবু দশদিনের ছুটি নিলেন। কোথায় যাওয়া যায়?

কাশীতে তাঁর এক খুড়তুতো ভাই থাকেন। চৌষট্টি ঘাটের উপরেই বাড়ি। চব্বিশ ঘণ্টা গঙ্গার হাওয়ায় উপকার হবার সম্ভাবনা আছে। ভাই মৃগাঙ্কবাবুকে অনেকবার যেতে লিখেছেন, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। মৃগাঙ্কবাবু কাশীই যাওয়া স্থির করলেন।

কাশীতে যে চতুর্দিকে এত বাঁদর সেটা মৃগাঙ্কবাবুর খেয়াল ছিল না। রাস্তায় ঘাটে বাড়ির ছাদে গাছের ডালে মন্দিরের গায়ে সর্বত্র বাঁদর। ভাই নীলরতনকে বলাতে তিনি বললেন, 'এখানে কী বাঁদর দেখছেন! চলুন আপনাকে দুর্গাবাড়ি দেখিয়ে আনি। বাঁদর কাকে বলে বুঝতে পারবেন।'

ভাইয়ের সঙ্গে দুর্গাবাড়িতে গিয়ে মৃগাঙ্কবাবুর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। ফটক দিয়ে চত্বরে ঢুকতেই

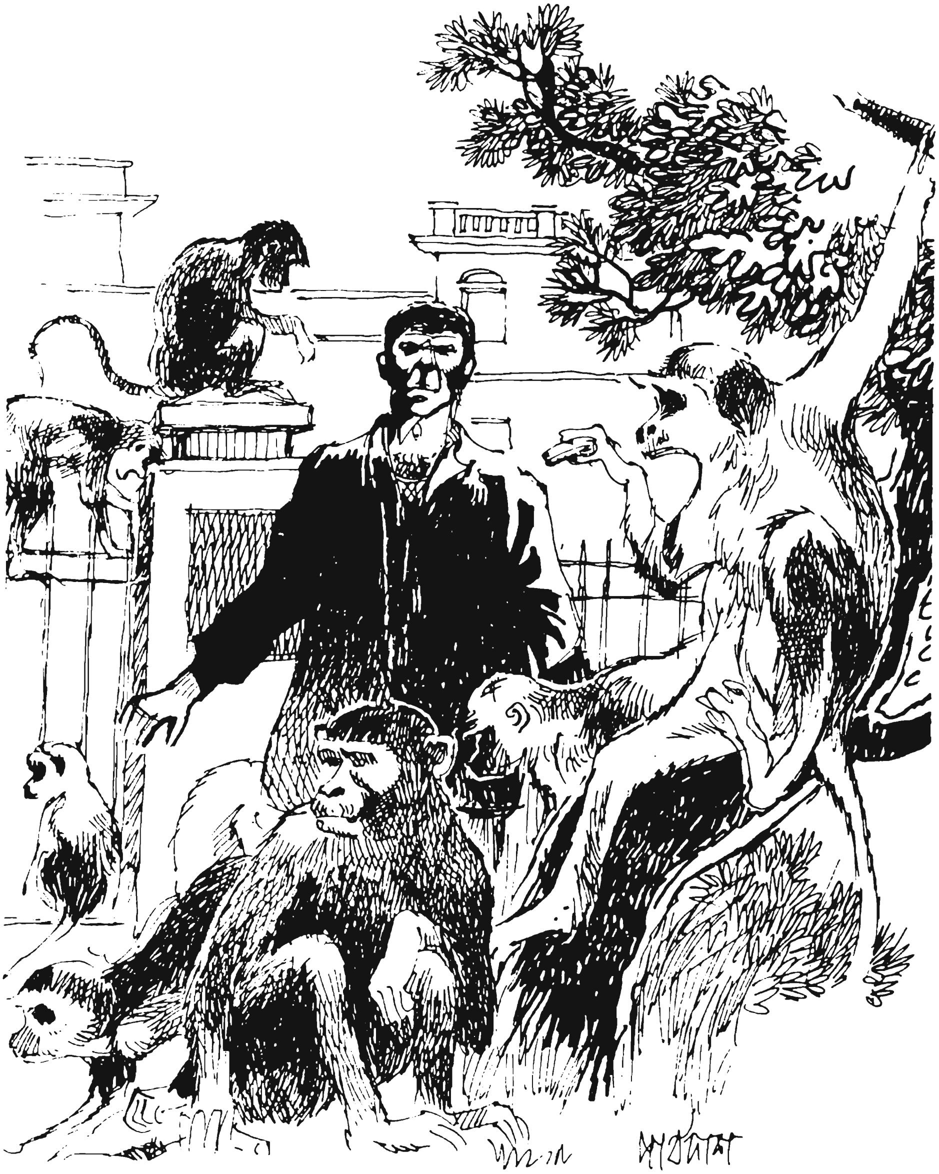

প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা বাঁদর এদিক থেকে ওদিক থেকে ছুটে এসে মৃগাঙ্কবাবুকে ঘিরে ধরল—তাদের কিচির মিচির শব্দে কান পাতা যায় না।

'দাঁড়ান— চিনেবাদাম কিনে আনি', বললেন নীলরতন।

আশ্চর্য এই যে, বাঁদরের মধ্যে পড়েও মৃগাঙ্কবাবুর অসোয়াস্তি লাগছিল না। এসব বাঁদর যেন সকলেই তাঁর চেনা! অনেকদিন পরে বহু আপনজনের মধ্যে এসে পড়েছেন তিনি।

মৃগাঙ্কবাবু দুর্গাবাড়িতে গিয়েছিলেন কাশী আসার তিনদিন পরে। পঞ্চম দিন তিনি প্রথম অনুভব করলেন যে তিনি কথা বলার সময় খেই হারিয়ে ফেলছেন। তাঁকে বার বার 'ইয়ে' বলতে হচ্ছে। অতি সহজ সাধারণ বাংলা কথাও তিনি ভুলে যাচ্ছেন। নীলরতন শুধু বলেছেন, 'মৃগাঙ্কদা, আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে ভাল কের্তন আছে। আমি আপিস থেকে ফিরে তোমায় নিয়ে যাব।' নীলরতন একটা ব্যাঙ্কে চাকরি

করেন।

মৃগাঙ্কবাবুর কানে 'কের্তন' কথাটাও যেন কেমন অচেনা মনে হল। বললেন, 'কোথায় যাবার কথা বলছিস?'

'দশাশ্বমেঘ ঘাট। যাবে?'

'ইয়ে—দশা-দশাশ্বমেধ ঘাট। কেন? সেখানে কী আছে?'

'বললাম যে—আজ সন্ধ্যায় ভাল কের্তন আছে। তোমার খুব ভাল লাগবে। তুমি তো কের্তনের খুব ভক্ত ছিলে।'

'ও—কের্তন। ইয়ে—তা যারা করবে কের্তন তারা মানুষ তো?'

'এ আবার কী কথা মৃগাঙ্কদা—মানুষ ছাড়া কি বাঁদরে করবে নাকি কের্তন?'

'ইয়ে—মানুষ তো মানে, এককালে বাঁদরই ছিল।'

'যাঃ, তুমি বড় আজেবাজে বকছ, মৃগাঙ্কদা। এ ধরনের রসিকতা ভাল লাগে না। আমি চলি আপিসে। সাড়ে পাঁচটায় এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

সন্ধ্যায় নীলরতনের সঙ্গে কীর্তন শুনতে গিয়ে মৃগাঙ্কবাবু একটা আশ্চর্য জিনিস অনুভব করলেন। তাঁর বারবার মনে হতে লাগল যেন বাঁদরের দলই খোল করতাল বাজিয়ে গান গাইছে। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

কীর্তন থেকে ফিরে এসে খাওয়াদাওয়া সেরে নীলরতন বললেন যে, তাঁকে একবার মাধববাবুর কাছে যেতে হবে বাঙালিটোলায়।

'আধঘণ্টার মধ্যেই ঘুরে আসছি, মৃগাঙ্কদা। আমার হোমিওপ্যাথিক ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে। উনি ডাক্তার—নিজেই ওষুধ বানিয়ে দেন।'

নীলরতন চলে যাবার পর মৃগাঙ্কবাবু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর একবার বাঁদরের মতো হেঁটে দেখতে ইচ্ছে করছে। খাটের পাশে মেঝের উপর উপুড় হয়ে সামনের হাত দুটোকে পায়ের মতো ব্যবহার করে মৃগাঙ্কবাবু ঘরে কয়েকটা চক্কর মারলেন। বার চারেক চক্কর খাবার পর ঘরের দরজায় চোখ পড়তে দেখলেন নীলরতনের চাকর রামলাল চোখ ছানাবড়া করে মুখ হাঁ করে চৌকাঠের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মৃগাঙ্কবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর রামলালের দিকে চেয়ে বললেন, 'ইয়ে—অত অবাক হবার কী আছে? কাশীতে থাকিস আর বাঁদর দেখিসনি কখনও?'

রামলাল কিছু না বলে ঘরে ঢুকে বিছানা করতে লাগল।

মৃগাঙ্কবাবু বাকি যে ক'দিন ছিলেন কাশীতে, সে ক'দিন প্রায় কথাই বলেননি। নীলরতন একবার বললেন, 'কী হল, মৃগাঙ্কদা—আপনি অমন চুপ মেরে গেলেন কেন? শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'শরীর—ইয়ে—কই শরীর তো ঠিকই আছে। মানে, আসলে—ইয়ে—বাঁদর থেকে মানুষ যেমন হয়—তেমনই মানুষ থেকেও বাঁদর—মানে, বিবর্তনের উলটো আর কী।'

নীলরতন বেশ অবাক হয়ে গেলেন—যদিও খুলে কিছু বললেন না। মৃগাঙ্কদার মাথাটা ঠিক আছে তো? একবার মাধব ডাক্তারকে দেখালে হত না?

দুদিন পরে মৃগাঙ্কবাবু কলকাতায় ফিরে এলেন। হাতে সুটকেস নিয়ে হাজরা লেনে তাঁর বাড়িতে ঢুকতেই সামনে চাকর দাশরথি পড়ল। পুরনো চাকর, একগাল হেসে বলল, 'বাবু ফিরেছেন? সব মঙ্গল তো?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'হুপ্।'

দাশরথি হো হো করে হেসে বলল, 'কাশীতে খুব বাঁদর—না বাবু? আমি একবার গেসলাম ছেলেবেলায়।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'হুপ্।'

এই ঘটনার চারদিন পরে কলকাতার সব খবরের কাগজেই খবরটা বেরোল। চিড়িয়াখানার একজন

কর্মচারী গতকাল ভোরে শিম্পাঞ্জির খাঁচার সামনে মাটিতে একটি বাঁদর শ্রেণী জীবকে পড়ে থাকতে দেখে। জানোয়ারটা ঘুমোচ্ছিল। বোধ হয় মাঝরাত্তিরে পাঁচিল টপকে ঢুকেছে। চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানিয়েছেন এই শ্রেণীর বাঁদর আগে দেখা যায়নি। ঘোড়া ও গাধার সংমিশ্রণে যেমন নতুন জানোয়ার খচ্চরের সৃষ্টি হয়, এও হয়তো দুই শ্রেণীর বাঁদরের সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি নতুন প্রাণী। প্রাণীটি বেঁচে আছে—এবং বাঁদরের মতোই হুপ্ হাপ্ কিচির মিচির শব্দ করছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে বাঁদরটির বাঁ হাতের অনামিকায় একটি আংটি পরানো—তাতে নীলের উপর সাদা দিয়ে মিনে করে লেখা ইংরিজি অক্ষর 'এম'।

সন্দেশ, বৈশাখ ১৪০০। রচনাকাল ২৭, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

নতুন বন্ধু

বর্ধমান স্টেশনের রেস্টোর‍্যান্টে ভদ্রলোক নিজেই যেচে এসে আলাপ করলেন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর গোঁফ, মোটামুটি আমারই বয়সী—অর্থাৎ বছর চল্লিশ-বেয়াল্লিশ—বেশ হাসিখুশি অমায়িক হাবভাব। বারোটা বাজে, তাই লাঞ্চটা সেরে নিচ্ছিলাম। আসলে চলেছি শান্তিনিকেতন, আমার সদ্য কেনা মারুতি ভ্যান-এ। ড্রাইভার সন্তোষকেও বলেছি খেয়ে নিতে।

একটা চারজনের টেবিলে বসেছি আমি একা। সবে ভাত আর মাংস অর্ডার দিয়েছি এমন সময় ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনার টেবিলে বসতে পারি?' আমি বললাম, 'বিলক্ষণ। আমি তো একা। আপনিও একা বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললেন। 'আপনি কোথায় চললেন?'

'শান্তিনিকেতন।'

'বাঃ—ভালই হল। আমিও শান্তিনিকেতনেই যাচ্ছি। সেখানে আমার ছেলে আর মেয়ে পড়ে। ওদের দেখতে যাচ্ছি। গিন্নিরও আসার শখ ছিল, কিন্তু আমার শ্বশুরমশাইয়ের শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়াতে শেষ মুহূর্তে আর আসতে পারল না। আপনি কি ওখানে থাকবেন কিছুদিন?'

'দিন দুয়েক,' বললাম আমি। 'আমি ওখানে একটা জমি দেখতে যাচ্ছি। একটা ছোট্ট বাড়ি করার ইচ্ছে আছে, যাতে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতে পারি। আমি একজন লেখক। উপন্যাস-টুপন্যাস লিখি।'

'আপনার নামটা—?'

'অমিয়নাথ সরকার।'

'ও হো! আপনার লেখা তো আমি পড়েছি। আপনি তো সাকসেসফুল রাইটার মশাই! দিব্যি লেখেন। একবার ধরলে ছাড়া যায় না।'

'আপনি শান্তিনিকেতনে ক'দিন থাকবেন?'

'আমিও ওই দিন দুয়েক।'

'আপনার পরিচয়টা—?'

'আমাকে নামে চিনবেন না। আমি ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে কাজ করি; নাম 'জয়ন্ত বোস।'

আমাদের খাবার এসে গেল। ভদ্রলোক দেখলাম অমলেট আর টোস্ট খেলেন, আর তার সঙ্গে এক কাপ চা। দশ মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করে আবার রওনা দেওয়ার উদ্যোগ করছি, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, 'এতটা পথ একা একা যাওয়া কেন—আপনি আমার অ্যাম্বাসাডারে আসুন না; আপনার গাড়ি পেছন পেছন আসুক। বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'

প্রস্তাবটা আমার ভালই লাগল। ড্রাইভারকে বলে দিলুম, তারপর জয়ন্তবাবুর গাড়িতে উঠলাম। এই গাড়িটাও মোটামুটি নতুন বলেই মনে হল। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে বললেন বছরখানেক হল কিনেছেন। আমরা পৌনে একটা নাগাদ রওনা দিয়ে দিলাম।

'সিগারেট চলে?' জয়ন্তবাবু প্রশ্ন করলেন।

'তা চলে। তবে আপনি আমার একটা খান না!'

'সে হবে এখন। আপাতত আমারটাই চলুক।'

'আপনি দেখছি আমারই ব্র্যান্ড খান। উইল্‌স।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকদিনের অভ্যাস। তবে আজকাল খাওয়া অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি।'

'আমিও। দিনে এক প্যাকেট। তার বেশি না।'

'আমারও তাই। ক্যানসার-ক্যানসার বলে যা ভয় দেখাচ্ছে।'

আমাদের গাড়ি চলতে লাগল। এতখানি পথ কথা না বলে এসেছি, এখন বাক্যালাপের সুযোগ পেয়ে ভালই লাগছে।

'আপনার আদি নিবাস কোথায়?' জয়ন্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'পৈতৃক বাড়ি পূর্ববঙ্গে—ফরিদপুর। তবে সে বাড়ি আমি কখনও দেখিনি। আমি কলকাতাতেই মানুষ।'

'আমিও পূর্ববঙ্গ। নোয়াখালি। পার্টিশনের সময় বাবা চলে আসেন। তখন অবিশ্যি আমি শিশু।'

'কলকাতায় কোথায় থাকেন?'

'নিউ আলিপুর।'

'আমি থাকি জনক রোড।'

'পড়াশুনা কলকাতাতেই করেছেন বোধহয়?'

'হ্যাঁ। মিত্র ইনস্টিটিউশন আর আশুতোষ কলেজ। আমার সায়ান্স ছিল। সিক্সটি-ফাইভে বি-এসসি পাশ করি।'

'আমিও, তবে বি-এসসি নয়, বি-এ। আর আমার স্কুল ছিল সাউথ সাবারব্যান মেন, আর কলেজ সেন্ট জেভিয়ার্স।'

'খেলাধুলোর শখ ছিল?'

'ক্রিকেট খেলতাম। খেলা দেখার খুব নেশা ছিল। তখন তো আর টেলিভিশন ছিল না যে বাড়িতে বসে দেখব। তখন মাঠে যেতে হত। বিশেষত ফুটবল দেখতে।'

'ফুটবলই যদি বললেন, তা হলে কোন দলের সাপোর্টার সেটাও জেনে নিই। ইস্টবেঙ্গল না মোহনবাগান?'

'মোহনবাগান। এ বিষয় আর কোনও কথা নেই।

'আসুন, হাতে হাত মেলাই।'

জয়ন্তবাবু সিগারেটটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। আমরা দুজনে করমর্দন করলাম। দু'জনে এত মিল দেখে আশ্চর্য লাগছিল। জয়ন্তবাবু বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যিই ভাল লাগছে। এতখানি পথ একা চুপচাপ বসে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া দু'জনে এত মিল, সেটাও তো একটা আশ্চর্য ব্যাপার।'

'এরকম মিল হয়তো অনেকের মধ্যেই থাকে, কিন্তু তাদের পরস্পরে আলাপ হয় না।'

'আমাদের যে আলাপ হয়ে গেল সেটাই বড় কথা।'

শান্তিনিকেতন যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। দু'জনেরই বুকিং ছিল বোলপুর টুরিস্ট লজে। তার ওপর আবার পাশাপাশি ঘর—একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ঘরে মালপত্তর রেখে হাতমুখ ধুয়ে দুজনেই যে যার কাজে বেরিয়ে পড়লাম। শান্তিনিকেতনে অনেকদিনের এক বাসিন্দার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তিনিই আমাকে জমির কথাটা বলেছিলেন। তাঁকে সঙ্গে করে দেখে এলাম জমিটা। পছন্দ হল। জমির মালিকের সঙ্গেও কথা হয়ে গেল। কিছু

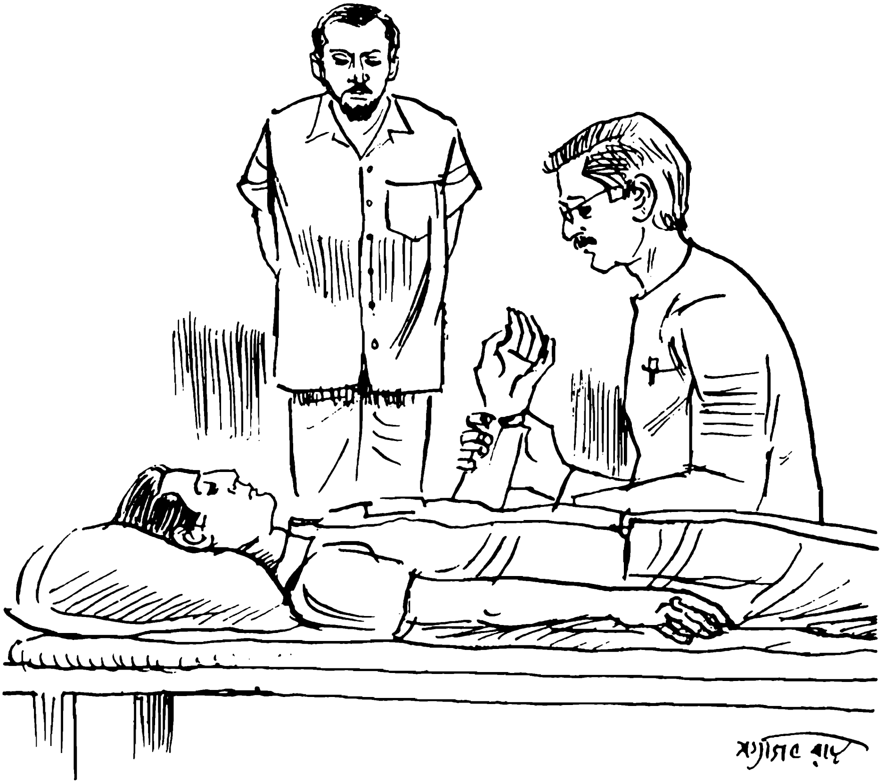

আগাম দিয়ে জমিটাকে বুক করে নিলাম। তারপর আমার আলাপীর—নাম ভবতারণ দত্ত—বাড়িতে গিয়ে চা খেয়ে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ লজে ফিরলাম। জয়ন্তবাবু দেখলাম তখনও ফেরেননি।

ভাবছি বেয়ারাটাকে ডেকে আরেক কাপ চা দিতে বলি, এমন সময় অনুভব করলাম মাথাটা বেশ ধরেছে। সঙ্গে অ্যাসপ্রো ছিল, একটা খেয়ে নিয়ে বিছানায় শুলাম। ঘণ্টাখানেক শুয়ে থেকেও মাথাধরাটা গেল না। এবার অনুভব করলাম শুধু মাথাধরা নয়। তার সঙ্গে চোখ জ্বালা করছে আর গা ম্যাজম্যাজ করছে। নাড়িটা টিপে দেখলাম যে বেশ দ্রুত। এ দিকে থার্মোমিটার সঙ্গে নেই, তাই জ্বর দেখতে পারছি না।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। গলাটা তুলে বললাম, 'ভেতরে আসুন।'

দরজা ঠেলে জয়ন্তবাবু ঢুকলেন। আমাকে দেখেই ভদ্রলোকের মুখে একটা উদ্বিগ্নভাব দেখা দিল।

'সে কী, আপনি বিছানায় কেন? বেরোননি?'

'বেরিয়েছিলাম। কাজ হয়ে গেছে। ফিরে এসে দেখি শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। আর মাথাটাও ধরেছে।'

ভদ্রলোক আমার কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'এ কী, আপনার তো বেশ জ্বর। দাঁড়ান, আমার কাছে থার্মোমিটার আছে।'

ভদ্রলোক তাঁর ঘর থেকে থার্মোমিটার নিয়ে এলেন। জ্বর উঠল ১০২। জয়ন্তবাবু বললেন, 'দাঁড়ান, নিজে থেকে কিছু ডিসাইড না করে ব্যাপারটা ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দেওয়া ভাল।'

'ডাক্তার—?'

'কোনও চিন্তা নেই। বোলপুরে কাছেই ডাক্তার আছে। আমার চেনা। আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার চলে এল। তিনি আমাকে পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন, আর বললেন যেন রাত্রে শুধু মুরগির স্টু খাই। আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে তাঁর ভিজিট দিয়ে দিলাম। সেটাও জয়ন্তবাবু অফার করেছিলেন, কিন্তু আমি রাজি হলাম না।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর জয়ন্তবাবু বললেন, 'এই প্রেসক্রিপশনটা আমি নিলুম। ওষুধ আমি এনে দিচ্ছি, আর কিচেনেও বলে দিচ্ছি রাত্রে যেন আপনার জন্য মুরগির স্টু করে।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'ওষুধ আপনি আনবেন কেন, আমার ড্রাইভারই তো রয়েছে।'

ভদ্রলোক কথাটা কানেই তুললেন না।

বচসা করে লাভ নেই, তাই ভদ্রলোকের সহৃদয় সহায়তা মেনে নিলাম, আর মনে মনে বললাম—ইনি না থাকলে সত্যিই আতান্তরে পড়তে হত।

জয়ন্তবাবু ওষুধ এনে দিলেন, আমি একটা বড়ি খেয়ে নিলাম। ভদ্রলোক বললেন, 'আমার ছেলে মেয়ে ভাল আছে, কাজেই আমি নিশ্চিন্ত। আমার এমন কোনও কাজ নেই, আমি এখানেই বসছি। আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন। যদি ঘুম পায় তো ঘুমোন। আমার বিশ্বাস, আপনার কলকাতা থেকেই শরীরটা একটু বেসামাল হয়ে ছিল।'

আমি আবার আপত্তি করে বললাম, 'আপনার থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি একা থেকে একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করি।'

'তা বেশ। আমি বরং ঘণ্টাখানেক পরে এসে একবার খোঁজ নিয়ে যাব। দরজাটা আর ভিতর থেকে ছিটকিনি দেবেন না। এখানে চোরের কোনও ভয় নেই।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আর আমার সঙ্গে ধনদৌলতও কিছু নেই।'

জয়ন্তবাবু চলে গেলেন। পরোপকারটা সকলের আসে না। অধিকাংশ মানুষই স্বার্থপর হয়—অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। কিন্তু জয়ন্তবাবুকে দেখলাম তিনি শুধু পরোপকারীই নন, যা করেন তা হাসিমুখে করেন।

ঘুম এল না। ঘণ্টাখানেক পরে জয়ন্তবাবু আবার এসে বললেন, 'জেগেই যখন আছেন তখন চটপট খেয়ে নিন। আপনার স্টু তৈরি—আমি খোঁজ নিয়েছি। আপনার তো ডাইনিং রুমে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না, আমি বেয়ারাকে বলছি আপনার ঘরেই খাবারটা এনে দেবে।'

আমি অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম।

রাত্রে ঘুম ভালই হল। সকালে বুঝতে পারলাম শরীরটা বেশ হালকা বোধ হচ্ছে। ডাক্তারের ওষুধ তা হলে কাজ দিয়েছে।

আমি বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে দাড়িটা পর্যন্ত কামিয়ে ফেললাম। দেখলাম কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

আটটা নাগাদ জয়ন্তবাবু এলেন। বললেন, 'বাঃ—দিব্যি ফ্রেশ লাগছে। দেখি তো টেম্পারেচারটা।'

টেম্পারেচার উঠল ৯৮.৮। অর্থাৎ জ্বর নেই বললেই চলে।

আমি একটা কথা জয়ন্তবাবুকে না বলে পারলাম না, এবং সেটা অন্তর থেকেই বললাম। ভদ্রলোকের ডান হাতটা আমার দু'হাতে চেপে বললাম, 'আপনি আমার জন্য যা করলেন, এ ঋণ পরিশোধ হওয়ার নয়। সত্যি, বিপদে আপনার মতো বন্ধু না পেলে কী করতাম জানি না।'

'বন্ধুই যদি বললেন তা হলে আর "আপনি" কেন?' বললেন জয়ন্তবাবু। '"তুমি"-তে নেমে আসা যাক না। আড়ষ্টভাবটা তা হলে একেবারে কেটে যায়।'

এত অল্প সময়ে আপনি থেকে তুমিতে নামাটা বোধহয় স্বাভাবিক নয়, কিন্তু প্রস্তাবটায় আমি আপত্তি করতে পারলাম না। বললাম, 'বেশ তো, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো আমারও নেই। তুমিই চলুক।'

'তা হলে আজকের দিনটা এখানে থেকে কালকে রওনা হওয়া যাক, কী বলো? আজ একটা গানবাজনার ব্যাপার আছে সিংহসদনে, সেটা সন্ধ্যায় দেখা যেতে পারে। আমার মেয়ে অনেক করে বলে দিয়েছে।'

আমি বললাম, 'তথাস্তু।'

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। জ্বরের লেশমাত্র নেই।

এবার জয়ন্তকে মারুতিতে তুলে আমরা আগে গেলাম, পিছনে অ্যাম্বাসাডার। পথে নানান গল্পে, রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে নেমে চা খাওয়ায়, পাণ্ডুয়াতে নেমে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ঘুরে দেখায়, বন্ধুত্বটা আরও জমে উঠল। মনে মনে বললাম, এ লোকটা এতদিন কোথায় ছিল? কী আশ্চর্যভাবে মানুষে মানুষে আলাপ জমে ওঠে। এর সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে অনেক দেখা হবে, সুখ দুঃখের কথা হবে, দু'জনে সন্ধ্যায় বসে দাবা খেলব, ভাবতেও মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

কলকাতা পৌঁছে স্বভাবতই জয়ন্তকে আগে নিউ আলিপুরে পৌঁছে দিয়ে বললাম, 'বাড়ি তো চিনে গেলাম; এবার একদিন সপরিবারে আসব।'

বাড়িতে এসে স্ত্রী মনোরমাকে সব ঘটনা বললাম, 'অতি মূল্যবান জিনিস লাভ হল। একটি নতুন, খাঁটি বন্ধু।'

চিঠিটা এল তিনদিন পরে। লেখা হয়েছে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরেছি সেইদিনই, কিন্তু স্থানীয় ডাকের সাহায্যে এই অল্প পথটুকু আসতে লেগেছে তিনদিন। চিঠিটা এই—

ভাই অমিয়,

পঁচিশ বছর পরেও তোকে আমার চিনতে অসুবিধা হয়নি, কিন্তু আমার দাড়ির জন্য তুই বোধহয় আমাকে চিনতে পারিসনি। আমার আসল নামটা আমি তোকে বলিনি, আর সেই সঙ্গে আরও কিছু কথা বানিয়ে বলেছি, কারণ আমার আসল পরিচয়টা জানলে তোর সঙ্গে বন্ধুত্বটা হত না, আর সেইসঙ্গে আমার প্রায়শ্চিত্তটাও হত না। আমি হলাম তোর স্কুলের সহপাঠী কৌশিক মিত্র—ডাকনাম রেণ্টু। তোকে নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দিতে হবে না যে, তোর সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্পর্ক ছিল আমার। তুই ছিলি ক্লাসের ভাল ছেলে, আর আমি ছিলাম সেরা শয়তান। তোর পিছনে যে কতদিন ধরে কতরকম ভাবে লেগেছি, সেটা আজ ভাবতে অবাক লাগছে। তোর যদি সেইসব দিনের কথা মনে করে কোনও তিক্ত ভাবও থেকে থাকে, আশা করি এই দু'দিনের বন্ধুত্বে সেটা কেটে গেছে। মনে রাখিস, আমরা দু'জনেই এখন অন্য মানুষ, স্কুল হল সুদূর অতীতের ব্যাপার। এই নতুন সম্পর্কটাই আসল, পুরনোটা কিছু না।

ইতি তোর বন্ধু
রেণ্টু

পুনঃ "তুমি" থেকে "তুই"য়ে নামতে আপত্তি নেই তো?

আমি চিঠিটা পেয়ে তখনই উত্তর দিয়েছিলাম—

ভাই রেণ্টু,
তোর চিঠিটা পেয়ে খুব খুশি হলাম। আগামী রবিবার সন্ধ্যায় আমি তোর বাড়িতে আসছি। তখন কথা হবে।

সন্দেশ, পৌষ ১৩৯৪

শিশু সাহিত্যিক

ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'বহুরূপী' এক বছর হল বেরোচ্ছে। সম্পাদক সুপ্রকাশ সেনগুপ্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেন কাগজটাকে ভাল করতে। টাকার জোর নেই, তাই কাজটা সহজ নয়। গ্রাহক সংখ্যা দেড় হাজারের মতো; বিজ্ঞাপন যা আসে তার থেকেই টেনেটুনে চলে যায়। লাভ থাকে না মোটেই। তবে সুপ্রকাশ আদর্শবাদী, তাঁর বিশ্বাস, কাগজটা দাঁড়িয়ে যাবে, এবং তার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেন না তিনি।

সবচেয়ে মুশকিল হল গল্প নিয়ে। ভাল ছোটদের গল্প প্রায় আসে না বললেই চলে। এমনকী সুপ্রকাশ দু-একবার নামী লেখকের লেখাও জোগাড় করেছেন, কিন্তু সে লেখাও দায়সারা। নামকরা জনপ্রিয় পত্রিকার লেখাও সুপ্রকাশ পড়ে দেখেছেন, তারও গল্পের মান তেমন উঁচু নয়। আসলে ভাল গল্প আর তেমন লেখাই হচ্ছে না এই হল সুপ্রকাশের ধারণা।

অথচ পাণ্ডুলিপির অভাব নেই। প্রতি মাসে ষাট-সত্তরটা করে লেখা ডাকে আসে—গল্প, ছড়া, প্রবন্ধ। গল্পের উপরেই সুপ্রকাশ বেশি জোর দেন, কাজেই সেই পাণ্ডুলিপিগুলোই তিনি আগে পড়েন। দুঃখের বিষয় বেশিরভাগ লেখাই বাতিল হয়ে যায়। নতুন লেখকের অনেক লেখা আসে, এবং সে লেখা পড়েই বোঝা যায় কাঁচা। মাঝে মাঝে সে লেখা পড়বারও দরকার হয় না। পাণ্ডুলিপির চেহারা দেখেই সুপ্রকাশ তাকে বাতিল করে দেন। শুধু পাণ্ডুলিপির চেহারা কেন, সময় সময় লেখকের নাম থেকেই বোঝা যায় সে লেখা পড়ে কোনও লাভ নেই। নদেরচাঁদ ভড় বলে এক ভদ্রলোক তিন-চারখানা গল্প পাঠিয়েছেন, সঙ্গে ডাকটিকিট। সুপ্রকাশ সেগুলো না পড়েই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। নদেরচাঁদ ভড় যার নাম সে লেখকের কাছ থেকে সুপ্রকাশ কিছু আশা করেন না। তা ছাড়া পাণ্ডুলিপিও অপরিচ্ছন্ন। লেখা ফেরত পাঠাবার সময় সঙ্গে ছাপা চিঠি যায়—'আপনার অমুক রচনা মনোনীত না হওয়ায় ফেরত পাঠানো হল। নমস্কারান্তে ইতি'—ইত্যাদি।

তেমনই বটকেষ্ট হোড়, নকুড়চন্দ্র হাতি, গজানন আইচ—এদের সকলের লেখাই সুপ্রকাশ না পড়ে ফেরত দিয়েছেন। তার মন বলেছে লেখকের নামের সঙ্গে লেখার উৎকর্ষের একটা সামঞ্জস্য থাকে। উৎকট নামের ভাল লেখক আশা করা ভুল। এখনও পর্যন্ত গল্পের দিক দিয়ে কাগজটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন দুটি লেখক—অমিয়নাথ বসু আর সঞ্জয় সরকার। দু'জনেই সুপ্রকাশের আবিষ্কার, দু'জনেই নিয়মিত গল্প পাঠান, এবং দু'জনেই ভাল লেখেন। গল্পের বিষয় এবং ভাষা দুইই ভাল। সুপ্রকাশের গরিব কাগজ, কিন্তু তাও এ দু'জন লেখককে তিনি নিয়মিত পারিশ্রমিক দেন।

লেখা যে সবসময় ডাকে আসে তা নয়। মাঝে মাঝে লেখক নিজেই লেখা সমেত এসে উপস্থিত হন। হয়তো এঁদের ধারণা যে, নিজে নিয়ে এলে লেখা মনোনীত হবার সম্ভাবনা বেশি। সুপ্রকাশ তাঁদের বলেন লেখা রেখে যেতে—মতামত যথাসময়ে জানানো হবে।

একদিন দুপুরের দিকে সুপ্রকাশ তাঁর ছোট্ট অফিসে বসে পাণ্ডুলিপি দেখছেন, এমন সময় একটি ধুতি-পাঞ্জাবি পর রোগা ফরসা ভদ্রলোক একটা লেখার বান্ডিল নিয়ে তাঁর আপিসে এলেন। সুপ্রকাশ মুখ তুলে চাইতে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি একজন শিশু সাহিত্যিক; আমার নাম উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি কয়েকটা গল্প এনেছি আপনার পত্রিকার জন্য। আপনি অন্তত একটি যদি এখন পড়ে দেখেন।'

'এখনই?' সুপ্রকাশ কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলেন।

''আজ্ঞে হ্যাঁ। আজকাল ডাকের বড় গোলমাল হয়। তাই আমি নিজেই সঙ্গে করে লেখাগুলো নিয়ে

এসেছি। তিনটে ছোটগল্প। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার পছন্দ হবে। আমি সেই প্রথম থেকে বহুরূপী দেখছি। কাগজটার উপর আমার মায়া পড়ে গেছে। কিন্তু কিছুদিন থেকে লক্ষ করছি পত্রিকার গল্পগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। আমি থাকি সেই নাকতলায়। আপনি যদি অন্তত একটা গল্প এখনই পড়ে আপনার মতামত দেন তা হলে বাধিত হব। আমি এই চেয়ারটায় বসছি; আমার তাড়া নেই।'

'সচরাচর আমি এ জিনিসটা করি না,' বললেন সুপ্রকাশ।

'আমি জানি, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ। গল্প ছোট; আপনার বেশি সময় লাগবে না।'

'বসুন।'

সুপ্রকাশ অগত্যা বান্ডিলটা ভদ্রলোকের হাত থেকে নিয়ে নিলেন। তিনটে গল্প, বেশ ঝরঝরে পাণ্ডুলিপি। সুপ্রকাশ একটা গল্প পড়তে শুরু করলেন।

দশ মিনিট লাগল গল্পটা পড়তে। খাসা লেখা। এত ভাল গল্প সুপ্রকাশের দপ্তরে কখনও আসেনি। সুপ্রকাশ নিজের আগ্রহেই বাকি দুটো গল্প পড়ে ফেললেন। এ দুটোও চমৎকার। ভদ্রলোকের ক্ষমতা আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'ভাল গল্প', বললেন সুপ্রকাশ। 'আমি তিনটে গল্পই নিচ্ছি। পর পর ছাপব। 'ভবঘুরে' গল্পটা সবথেকে ভাল, ওটা আমি পুজো সংখ্যার জন্য নির্বাচন করলাম। আপনাকে যথাসময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাঠিয়ে দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ। ইয়ে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল।'
'বলুন।'
'আপনি কি সত্যভামা ইনস্টিটিউশনে পড়তেন?'
'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'
'আমিও একই ইস্কুলে পড়েছি। আপনার চেয়ে এক ক্লাস নীচে।'
'তাই বুঝি?'
'হ্যাঁ—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না, কারণ আমি অনেক রোগা হয়ে গেছি।'
'তা হবে। তা ছাড়া প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা তো।'
'কিন্তু আপনি খুব বেশি বদলাননি। শুধু আপনার একটা জিনিস বদলেছে।'
'কী?'
'আপনার নাম। আপনাকে আমি নিধুদা বলে ডাকতাম। আপনার নাম ছিল নিধিরাম ধাড়া।'
'আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে, সে নামে কি আর কাগজের সম্পাদক হওয়া যায়?' বললেন সুপ্রকাশ। 'তাই কাগজটা বার করার সময় নামটা বদলে নিই।'
উজ্জ্বলবাবু উঠে পড়লেন।
'আমি তা হলে আসি। আপনাকে গল্পগুলো পড়িয়ে সত্যিই আনন্দ পেলাম, নিধুদা। আপনাকে নিধুদা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না।'
ভদ্রলোক বান্ডিল নিয়ে এসেছিলেন, এখন খালি হাতেই বেরিয়ে গেলেন বহুরূপীর আপিস থেকে। আসল ব্যাপারটা উনি ধরে ফেলেছেন। বহুরূপীর সম্পাদক তাঁর লেখাগুলো না পড়েই ফেরত দিয়েছিলেন। এই একই গল্প, এবং তার জন্য তাঁর নামই দায়ী। নদেরচাঁদ ভড়! গোড়া থেকেই নামটা বদলে নেওয়া উচিত ছিল, আর নিজে না লিখে তাঁর ভাগনিকে দিয়েই পাণ্ডুলিপি লেখানো উচিত ছিল।
যাক, এখন থেকে তাঁর লেখা বহুরূপীতে ছাপা হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সন্দেশ, ফাল্গুন ১৩৯৪

মহিম সান্যালের ঘটনা

তারিণীখুড়ো তাকিয়াটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'চমকলালের কথা তো তোদের বলেছি, তাই না?'
'হ্যাঁ হ্যাঁ,' বলল ন্যাপলা। 'সেই ম্যাজিশিয়ান তো? যাঁর আপনি ম্যানেজার ছিলেন?'
'হ্যাঁ। কিন্তু আরেকজন জাদুকর আছেন—অবিশ্যি যখনকার কথা বলছি তখন তিনি রিটায়ার করেছেন—যাঁর আমি সেক্রেটারি ছিলাম।'
'রিটায়ার করলে আবার সেক্রেটারির কী দরকার?' বলল ন্যাপলা।
'তাঁর ক্ষেত্রে দরকার ছিল। সেটা ব্যাপারটা শুনলেই বুঝতে পারবি।'
'তা হলে বলুন সে গল্প।'
'বলছি—আগে এই জানলাটা বন্ধ করে দে তো। বৃষ্টির ছাট আসছে।'
আমি উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম।
তারিণীখুড়ো দুধ চিনি ছাড়া গরম চায়ে একটা সশব্দ চুমুক দিয়ে তাঁর গল্প আরম্ভ করলেন।

বছর পনেরো আগের ঘটনা। আমি তখন সবে কানপুরে একটা ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসেছি। হাতে কাজ নেই, কিন্তু পকেটে পয়সা জমেছে বেশ কিছু। নতুন কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় আমার এক পুরনো আলাপী জগন্নাথ পাকড়াশির সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'তোমাকেই খুঁজছিলুম।' আমি বললাম, 'কেন, কী ব্যাপার?' 'মহিম সান্যালের নাম শুনেছ?' 'জাদুকর মহিম সান্যাল?' 'হ্যাঁ হ্যাঁ। তিনি অবিশ্যি এখন রিটায়ার করেছেন, কিন্তু কেন জানি তাঁর একজন সেক্রেটারির দরকার পড়েছে। ইংরিজি আর টাইপিং জানা চাই। আমার তোমার কথা মনে পড়ল।'

আমি বললাম, 'চাকরি একটা হলে মন্দ হত না। কিন্তু এ ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করব কী করে?'

'মহিম সান্যাল থাকেন পাম এভিনিউতে। দাঁড়াও দেখি, আমার কাছে হয়তো তাঁর ঠিকানা রয়েছে।'

পাকড়াশির নোটবুকে মহিম সান্যালের ঠিকানাটা ছিল, সেটা আমার নোটবুকে টুকে নিলাম।

দু'দিন পরে ছিল রোববার। সকালে সোজা চলে গেলুম সান্যাল মশাইয়ের বাড়ি। বেশ গোছালো, ছিমছাম একতলা বাড়ি, যদিও বেশি বড় না।

ভদ্রলোককে দেখেই ভাল লেগে গেল। বয়স ষাট-বাষট্টি, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, চেহারায় একটা শান্ত গাম্ভীর্য, অথচ ঠোঁটের কোণে একটা হাসি লেগে আছে সব সময়।

আমি নিজের পরিচয় দিলাম। ভদ্রলোক মিনিট পনেরো ধরে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করে একটু বাজিয়ে দেখে নিলেন। বোধহয় ভালই ইমপ্রেশন দিলাম, কারণ ভদ্রলোক বললেন, 'তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে বলে মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'কাজটা কী সেটা জানতে পারি কি?'

'আমার ম্যাজিক দেখেছ কখনও?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রায় কুড়ি বছর আগে,' আমি বললাম। 'একটা পুজো প্যান্ডেলে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ছে।'

'হ্যাঁ,' বললেন মহিম সান্যাল। 'আমি অনেক পুজো প্যান্ডেলে ম্যাজিক দেখিয়েছি। শুধু দিশি ম্যাজিক দেখাতুম, তাই আমার বড় স্টেজের দরকার হত না। আমার যখন বছর পঞ্চাশ বয়স তখন থেকে আমি ম্যাজিক দেখানো ছেড়ে দিয়ে ভারতীয় ম্যাজিক সম্বন্ধে চর্চা আরম্ভ করি। তার জন্য আমাকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এমন জায়গা নেই যেখানে আমি যাইনি। এমনিতে আমি হোমিওপ্যাথি করতাম, তাতে রোজগার ছিল ভাল। হাজারের উপর ম্যাজিক সংগ্রহ করেছি। শুধু হাত সাফাই-ই আছে তিনশো ছাপ্পান্ন রকম। আমার গবেষণার ফল হল একটা সাড়ে চারশো পাতার হাতে লেখা ইংরিজি পাণ্ডুলিপি। নাম দিয়েছি ইন্ডিয়ান ম্যাজিক। সেই পাণ্ডুলিপি এখন টাইপ করতে হবে, কারণ বিদেশের একজন নামকরা প্রকাশক আমার পাণ্ডুলিপি ছাপার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এ কাজ পারবে তো?'

'একবার পাণ্ডুলিপিটা দেখতে পারি?'

ভদ্রলোক তিনটে মোটা ফাইল আমাকে এনে দিলেন। দেখলাম বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে লেখা, টাইপ করতে কোনও অসুবিধা হবে না। তখনই সব কথাবার্তা হয়ে গেল। যা মাইনে অফার করলেন ভদ্রলোক, তাতে আমার দিব্যি চলে যাবে। বুঝলাম, ভদ্রলোক ম্যাজিক দেখিয়ে আর ডাক্তারি করে বেশ ভাল পয়সা করেছেন।

এবার আমি একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'আপনার বাড়িতে কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না—আপনি কি এখানে একা থাকেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমার স্ত্রী গত হয়েছেন দশ বছর হল। আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সে ব্যাঙ্গালোরে থাকে। আমার ছেলে অনীশ বাইরে চাকরি করে।'

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বুঝলাম একাকিত্বটা যে তিনি খুব উপভোগ করেন তা নয়।

আমি আমার কাজের টাইম জেনে নিলাম। সকাল দশটায় আসতে হবে, দুপুরে সান্যাল মশাইয়ের সঙ্গেই খাওয়া, আর সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কাজ।

কাজে লেগে পড়লাম। পাণ্ডুলিপিটা যতই পড়ছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। আশ্চর্য সংগ্রহ ভদ্রলোকের। ভারতীয় জাদু যতরকম হতে পারে—মাদারি কা খেল, ভোজবাজি, ভেলকি—সবকিছুই আছে। বই হলে একটা অতি মূল্যবান জিনিস হবে সেটাও বুঝতে পারলাম।

দুপুরে খাওয়ার সময় ভদ্রলোক তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেন, শুনতে গল্পের মতো লাগে। যখন জাদুকর ছিলেন তখন বেশিরভাগই নেটিভ স্টেটে রাজারাজড়াদের ম্যাজিক দেখাতেন। সব খেলাই হত ফরাসের উপর। স্টেজের কোনও বালাই নেই। এমনি ম্যাজিক ছাড়াও ভদ্রলোক যেটা খুব ভাল পারতেন সেটা হল হিপ্‌নটিজম বা সম্মোহন। বিদেশি ম্যাজিক ভদ্রলোক ভাল চোখে দেখতেন না, কারণ তাতে হাত সাফাই-এর চেয়ে যন্ত্রপাতির ব্যবহারটাই বেশি। সেখানে জাদুকর হচ্ছে একজন শো-ম্যান। ভারতীয় ম্যাজিক বিদেশির চেয়ে অনেক বেশি খাঁটি। সেটা ফুটপাথে বসেও দেখানো যায়। তাতে যন্ত্রপাতির দরকার লাগে না। যেটার প্রয়োজন হয় সেটা হল জাদুকরের দক্ষতা।

এই সময়—তখন আমার টাইপিং প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে—একটা ব্যাপার হল।

কলকাতায় এক ম্যাজিশিয়ান এলেন শো দিতে। আসন নাম সূর্যকান্ত লাহিড়ী, কিন্তু তিনি নিজেকে The great Soorya বলে প্রচার করেন। তাঁর পোস্টার বা বিজ্ঞাপনে ওই নামই থাকে। মহিমবাবু কাগজে এই জাদুকরের বিজ্ঞাপন দেখে বললেন, 'এঁর নাম তো শুনিনি। ইনি নতুন আমদানি বলে মনে হচ্ছে।' আমার একটু একটু ইচ্ছে করছিল এই ছোকরার ম্যাজিক দেখতে, কিন্তু সেটা আর সান্যাল মশাইকে বললাম না।

দু'দিন পরে একটা টেলিফোন এল দুপুরবেলা। আমার টেবিলেই টেলিফোন থাকে, তুলে হ্যালো বলতে উলটো দিক থেকে কথা এল—'আমি সূর্যকান্ত লাহিড়ী কথা বলছি; জাদুকর দ্য গ্রেট সুরিয়া বলে আমি পরিচিত। একবার মহিম সান্যালের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?'

আমি বললাম, 'আপনার প্রয়োজনটা কী জানতে পারি? আমি ওঁর সেক্রেটারি কথা বলছি।'

উত্তর এল—'আমি ভদ্রলোকের নাম অনেক শুনেছি। তিনি দিশি ম্যাজিক দেখাতেন সেটা আমি জানি। তাঁকে আমার শোয়ে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আসতে বলতে চাই।'

আমি সান্যালমশাইকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি পরদিন সকালে সময় দিলেন। আমি সে কথা সূর্যকান্তকে জানিয়ে দিলাম।

পরদিন সূর্যকান্ত সকাল সাড়ে দশটার সময় এল। আমি তাকে বৈঠকখানায় বসালাম। বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, বেশ ব্রাইট চেহারা। আর চোখেমুখে কথা বলে। মহিমবাবু আসতেই তাঁকে নমস্কার করে বলল, 'আমি জানি আপনি বিদেশি জাদু পছন্দ করেন না, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ যদি একটিবার আমার শো-এ আসেন। আমি ছেলেবেলা থেকে আপনার নাম শুনেছি, আপনার খ্যাতির কথা জানি। আমার গুরু সুলতান খাঁ আপনার ম্যাজিক দেখেছিলেন, তিনিও খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। আশা করি আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। আপনাদের জন্য দু'খানা ঠিকিট আমি নিয়ে এসেছি—একেবারে সামনের সারির মাঝখানে। আপনারা এলে আমি কৃতার্থ হব। কালই সন্ধ্যায় শো—মাত্র দু' ঘণ্টা সময় আপনার যাবে।'

আমি ভেবেছিলাম মহিমবাবু হয়তো আপত্তি করবেন, কিন্তু দেখলাম তিনি রাজি হয়ে গেলেন। সূর্যকান্ত অত্যন্ত খুশিমনে বিদায় নিল।

পরদিন সন্ধ্যা ছ'টায় মহাজাতি সদনে শো, আমরা ঠিক পাঁচ মিনিট আগে গিয়ে হাজির হলাম। লোক বেশ ভালই হয়েছে, প্রায় হাউসফুল।

দ্য গ্রেট সুরিয়া দেখলাম পাংচুয়ালিটিতে বিশ্বাস করে, কারণ ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ছ'টার সময় পর্দা সরে গেল।

বিদেশি ম্যাজিক যেমন হয়, তার তুলনায় সূর্যকান্তের শো নেহাত নিন্দের নয়। ম্যাজিক ছাড়াও দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য নানারকম বন্দোবস্ত রয়েছে, তার মধ্যে এক হল রঙচঙে সেট সেটিং, দুই হল বাজনা, আর তিন হল ছ'জন মেয়ে সহকারী—তারা সকলেই বেশ সুশ্রী।

সবচেয়ে অবাক লাগল মহিম সান্যালের প্রতিক্রিয়া দেখে। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শো দেখছিলেন এবং প্রত্যেক আইটেমের পর হাততালি দিচ্ছিলেন। আমি একবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার বেশ ভাল লাগছে বলে মনে হচ্ছে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরে এ জিনিস দেখছি। শেষ দেখেছি চিনে জাদুকর

চ্যাং-এর ম্যাজিক। যৌবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, মন্দ লাগছে না। তবে সবই যন্ত্রের কারসাজি আর রঙতামাশা দিয়ে লোকের মন ভোলানো। আসল ম্যাজিক যাকে বলে সে জিনিস এটা নয়। আর এ দেখছি হিপ্‌নটিজম জানে না।'

শেষ আইটেমের আগে সূর্যকান্ত একটা ব্যাপার করল। মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশ করে বলল, 'আজ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে, সামনের সারিতে উপস্থিত রয়েছেন এমন একজন জাদুকর, যাঁর নাম আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে লোকের মুখে মুখে ফিরত। ইনি ভারতীয় জাদুর জন্য যা করেছেন তার তুলনা হয় না। আমি মহিম সান্যালকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি উনি মঞ্চে তাঁর অন্তত একটা জাদু দর্শকদের দেখান। তিনি সরঞ্জাম কিছুই আনেননি। কিন্তু সরঞ্জাম উনি ব্যবহার করতে চাইলে আমি অত্যন্ত গর্ব বোধ করব, এবং তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করলে আমার আনন্দের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। মহিমবাবু!'

মহিমবাবু আমার হাতে একটা মৃদু চাপ দিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠে মঞ্চে হাজির হলেন। দর্শকরা সকলে চুপ। কী ঘটতে চলেছে তা কারুরই ধারণায় নেই। আমিও চুপ।

মহিমবাবু দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন, 'বহুদিন পরে এ জিনিস করছি, কিন্তু ত্রুটি হলে আশা করি আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি আপনাদের দুটো খেলা দেখাব। দুটোই দিশি। তার প্রথমটা হল হাত সাফাই। সূর্যকান্ত, তোমার তিনটি বল যদি আমাকে দাও।'

সূর্যকান্তর এক সহকারী তৎক্ষণাৎ দুটো লাল এবং একটা সাদা বল মহিমবাবুকে এনে দিল।

সেই বল নিয়ে মহিমবাবু যা করলেন তার চমৎকারিত্ব বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই। হাত সাফাই যে এমন হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

এখন হলে হাততালির চোটে কান পাতা দায়, এবং সে হাততালিতে সূর্যকান্তও যোগ দিল।

হাত সাফাই দেখিয়ে মহিমবাবু বলগুলো সূর্যকান্তকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'এবার আমি আমার দ্বিতীয় জাদু দেখাতে চাই। আমি সম্মোহন বা হিপ্‌নটিজম শিখেছিলাম অমৃতসরে এক ফুটপাথের জাদুকরের কাছ থেকে। তারই সামান্য নিদর্শন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। আমি সূর্যকান্তবাবুর অনুরোধ রক্ষা করেছি। আশা করি তার প্রতিদানে তিনিও আমার একটি সামান্য অনুরোধ রক্ষা করবেন। আমি তাঁকেই সম্মোহিত করতে চাই।'

সূর্যকান্ত দেখলাম বেশ স্পোর্টিং; সে রাজি হয়ে গেল।

মহিমবাবু সূর্যকান্তকে একটা চেয়ারে বসিয়ে তার সামনে নিজেও একটা চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, 'আপনি আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকুন।'

সূর্যকান্ত আদেশ পালন করল। তিন মিনিটের মধ্যে লক্ষ করলাম সূর্যকান্তর চোখের চাউনি বদলে গেছে। তার চোখ দুটো যেন পাথরের চোখ। সে যেন সামনের জিনিস দেখেও দেখতে পারছে না।

মহিম সান্যাল এবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। সূর্যকান্তর দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'করুন,' ভাবলেশহীন কণ্ঠে উত্তর দিল সূর্যকান্ত।

'আপনি কতদিন হল ম্যাজিক দেখাচ্ছেন?'

'পাঁচবছর।'

'কার কাছে আপনি ম্যাজিক শিখেছেন?'

'সুলতান খাঁ।'

'কবে থেকে শিখতে আরম্ভ করেছেন?'

'আমার যখন পঁচিশ বছর বয়স!'

'আপনার এখন বয়স কত?'

'পঁয়ত্রিশ।'

'ম্যাজিক দেখানোর আগে আপনি কী করতেন?'

'দিল্লিতে চাকরি করতাম।'

'কী চাকরি?'
'খবরের কাগজের রিপোর্টার।'
'তার আগে?'
'আমি কলকাতায় থাকতাম।'
'কোথায়?'
'চব্বিশ নম্বর ল্যান্সডাউন রোড।'
'কার সঙ্গে থাকতেন আপনি?'
'আমার বাবা।'
'আপনার বাবার নাম কী?'
'মহিম সান্যাল।'
আমি স্তম্ভিত। হলে পিন পড়লে তার আওয়াজ পাওয়া যেত।
'আপনার আসল নাম কী?' প্রশ্ন করলেন মহিমবাবু।
'অনীশ সান্যাল।'
'আপনি আপনার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান?'
'হ্যাঁ।'
'এখনও বাবার উপর রাগ আছে?'
'না, আর নেই। আমি ভুল করেছিলাম, অন্যায় করেছিলাম।'

এর পরে সূর্যকান্ত ওরফে অনীশের চোখের সামনে হাত নেড়ে তাকে হিপ্‌নোটাইজ্‌ড অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন মহিম সান্যাল।

দর্শক কিছুক্ষণ হতভম্ব থেকে হঠাৎ তুমুল হাততালিতে ফেটে পড়ল। এদিকে অনীশও হতভম্ব। সে

তো কিছুই জানে না এতক্ষণ কী হয়েছে। এবার মহিমবাবু তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কেমন বোধ করছ, অনীশ—কোনও কষ্ট হয়নি তো?'

এতক্ষণে অনীশ বুঝতে পারল। সে তার বাবাকে প্রণাম করে তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

পরে মহিমবাবু আমাকে বলেছিলেন যে, সূর্যকান্তর গলার আওয়াজ আর কানের লতি থেকেই ছেলেকে চিনতে পেরেছিলেন তিনি। পরদিন সকালে অনীশ আবার এসেছিল। বলল, এর পরে ওর উত্তরপ্রদেশে টুর আছে। তারপর পনেরো দিন অবসর। সেই সময়টা সে পাম এভিনিউতে বাবার কাছে এসেই থাকবে।

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৯৫

গণৎকার তারিণীখুড়ো

তারিণীখুড়োর এক ভাইপো এক চা কোম্পানিতে ভাল কাজ করে, সে খুড়োকে এক টিন স্পেশাল কোয়ালিটির চা দিয়েছে। খুড়ো টিনটা আমার হাতে চালান দিয়ে বললেন, 'এটা খোলাবার ব্যবস্থা কর; আজ তোদের চা না খেয়ে এইটে খাব।'

বৈশাখ মাসের এক রবিবারের সন্ধে। দুপুরের দিকে কালবৈশাখী হয়ে গেছে, এখন সব শান্ত। আমাদের ঘরে খুড়োর শ্রোতারা সব জমায়েত হয়েছে, তার মধ্যে অবিশ্যি ন্যাপলাও আছে। ন্যাপলা বলল, 'ভূতের গল্প অনেক হয়েছে খুড়ো; আজ একটা অন্য কিছু হোক। আপনি একবার বলেছিলেন আপনি কিছুদিন গণৎকারী করেছিলেন, তখন একটা আশ্চর্য ঘটনা হয়। সে গল্প কিন্তু আজ অবধি শোনা হয়নি।'

'ও, সে গল্প বলিনি বুঝি?'

আমরা সবাই একসঙ্গে না বললাম।

খুড়ো বললেন, 'আগে ওই নতুন চা-টায় একটা চুমুক দিয়ে নিই। কাপে ঠোঁট ঠেকাতে না পারলে গল্প খোলে না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চা এসে গেল, ভুরভুরে সুগন্ধ, খুড়ো ওই গরম চাতেই একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'বাঃ, খাসা চা।' তারপর একটা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে গল্প আরম্ভ করলেন।

ঘটনাটা ঘটে নাগপুরে। আমি বোম্বাই গেস্‌লাম যদি ফিল্মে কিছু কাজ পাওয়া যায়। তার মানে মনে করিস না যে আমার ফিল্মে অভিনয় করার ইচ্ছে ছিল। তা নয় মোটেই। আমি প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাজটা ভাল জানতাম; টালিগঞ্জে দুটো ছবিতে ওই কাজ করেছি, তাই সেইদিকেই চেষ্টা করছিলাম। একটা ছবিতে কাজ জুটেও গেল।

আমি থাকি ভিলে পার্লেতে একটা দোতলা বাড়ির একতলায় একটা ছোট ফ্ল্যাটে। পুরো দোতলাটা নিয়ে থাকেন বম্বের এক বিখ্যাত জ্যোতিষী মুকুন্দ পটবর্ধন। দিশি মতে হাত দেখিয়ে হিসেবে তার খুব নামডাক। আমার প্রতিবেশী, তাই আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। কেন জানি না, ভদ্রলোকের আমাকে খুব ভাল লেগে গেল। বললেন, 'তোমাকে আমি পামিস্ট্রি শিখিয়ে দেব।'

যে কথা সেই কাজ। কাজের পর রাত্তিরে ভদ্রলোকের ঘরে বসে হস্তরেখা গণনা শিখতে আরম্ভ করলাম। অদ্ভুত সাবজেক্ট। নেশা ধরে গেল। দু' মাসের মধ্যে দেখি আমিও বেশ হাত দেখতে পারছি।

স্টুডিওর কয়েকজনের হাত দেখে অতীত ভবিষ্যৎ বলে দিলাম, এক প্রোডিউসারের ছবি হিট হবে সেটা বলে দিলাম, আর ফলেও গেল।

শেষটায় একটা সময় এল যখন মনে হল আমি নিজেই এ কাজ করে রোজগার করতে পারি। এক কাজে বেশিদিন টিকতে পারি না সেটা তো তোদের বলেইছি, তাই ফিল্মের লাইন ছেড়ে পামিস্ট্রি ধরলাম। কিন্তু বম্বেতে নয়। বম্বেতে এ কাজে পটবর্ধন একচ্ছত্র অধিপতি। আমাকে অন্য জায়গা দেখতে হবে। চলে গেলুম নাগপুর। পাচপাগুলি অঞ্চলে রাস্তার উপর একটা ঘর নিয়ে দরজার পাশে নোটিশ লটকে দিলুম—'এখানে সুলভে হস্তরেখা দেখে ভবিষ্যৎ গণনা করা হয়। বেঙ্গলের বিখ্যাত গণৎকার' ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে পসার জমে উঠল। এরকম র‍্যাপিড সাকসেস হবে তা আশা করিনি। এক বছরের মধ্যে একটা বড় ফ্ল্যাটে উঠে যেতে হল, একটা বি.এ. পাশ ছোকরা সেক্রেটারি রাখতে হল। সারা ভারতবর্ষ থেকে হাতের ছাপ আসে, সেই ছাপ দেখে আমি ইংরিজিতে গণনা করি, সেক্রেটারি সেগুলো টাইপ করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়। বেশিরভাগ মক্কেলই হচ্ছে ব্যবসাদার, আর তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মাড়োয়ারি। মাসে রোজগার তখন আমার প্রায় তিন হাজার টাকা, আর আমার বয়স তখন বত্রিশ। তা হলে কদ্দিন আগের কথা বুঝতেই পারছিস।

এর মধ্যে একদিন এক ভদ্রলোক এলেন, ফর্সা একহারা চেহারা, চোখে চশমা, পরনে বিলিতি পোশাক। বয়স আন্দাজ ত্রিশেক। তিনি তাঁর হাতটা দেখিয়ে বললেন, 'আমি শুধু একটা জিনিস জানতে চাই। আমি একটা নতুন চাকরিতে জয়েন করেছি। সে কাজটা ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে?'

আমি হাতের রেখা দেখে বললাম, 'যা করতে যাচ্ছ করো। তোমার নতুন চাকরিতে উন্নতি হবে।'

'ভেরি গুড,' বললেন ভদ্রলোক। 'এবার আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

আমি আগেই লক্ষ করেছিলাম যে ভদ্রলোকের কাঁধে একটা নকশাদার কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে।

ভদ্রলোক তার মধ্যে থেকে একটা বেশ বড় খাম বার করে তার ভিতর থেকে এক শিট কাগজ টেনে বার করলেন। কাগজটা পুরনো, তা দেখলেই বোঝা যায়। সেই কাগজে রয়েছে কালো কালিতে একটা রেখা সমেত হাতের ছাপ। ভদ্রলোক সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কাগজের উপর দিকে ডান কোনায় একটা তারিখ লেখা রয়েছে সেটা পনেরো বছর আগে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কার হাতের ছাপ?'

'আমার বাবার,' বললেন ভদ্রলোক। একটা পুরনো বাক্স ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেরিয়ে পড়ল। মনে হয় এটা উনি দিয়েছিলেন বম্বের গণৎকার পটবর্ধনকে পাঠানোর জন্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটা আর হয়ে ওঠেনি।'

'আমাকে কি এখন এই হস্তরেখা দেখে গণনা করতে হবে?'

'হ্যাঁ। বিশেষ কয়েকটা তথ্য।'

'আপনার বাবার বয়স তখন কত ছিল?'

'পঞ্চাশ।'

আমি হাতের রেখা বিচার করে একটা অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করলাম। ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে ওই পঞ্চাশ বছর বয়সেই। সেটা আমি বললাম আমার মক্কেলকে।

'স্বাভাবিক মৃত্যু কি?' জিজ্ঞেস করলেন মক্কেল।

আমি আবার ভাল করে দেখলাম ছাপটা। তারপর বললাম, 'রেখা স্পষ্ট বলছে অপঘাত মৃত্যু, স্বাভাবিক নয়।'

'এ বিষয় আপনি নিশ্চিত?'

'অ্যাবসোলিউটলি,' আমি জোর দিয়ে বললাম।

'তা হলে আপনাকে ঘটনাটা একটু খুলে বলি,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমার বাবার নাম ছিল প্রকাশচন্দ্র মাথুর। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। আমার মা আমাকে জন্ম দিতে মারা যান; আমি মানুষ হই এক বিধবা পিসির কাছে। আমার নাম সুরেশ মাথুর। বাবা ব্যবসাদার ছিলেন। বাবার একজন অংশীদার ছিল, নাম গজানন আপ্টে। আজ থেকে পনেরো বছর আগে—তখন আমার বয়স সতেরো—বাবা একটা বিশেষ কারণে খুব কষ্ট পান। বাবাকে এত বিচলিত হতে আমি কখনও দেখিনি। আমি কারণ জিজ্ঞেস করতে বাবা বলেন, 'যাকে আপনার জন বলে মনে করা যায়, সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তা হলে যত কষ্ট পেতে হয় তেমন আর কিছুতে হয় না।' আমার স্বভাবতই বাবার বিজনেস পার্টনারের কথা মনে হয়; কিন্তু বাবা এই নিয়ে আর কিছু বলতে চান না। এর কিছুদিন পরেই একদিন বিকেলে আপিসে বাবাকে চেয়ারে বসা অবস্থায় তাঁর টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখনই ডাক্তার ডাকা হয়। ততক্ষণে বাবা মারা গেছেন। ডাক্তার বলেন হার্ট অ্যাটাক। আমার ইচ্ছা ছিল পুলিশ ডাকার, কারণ আমার সন্দেহ হয়েছিল বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। বাবা তাঁর অংশীদারের কীর্তি ধরে ফেলেছেন, তাই তাঁকে মেরে তাঁর মুখ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আমার তখন মাত্র সতেরো বছর বয়স—আমার কথা কে শুনবে? আজ আপনার গণনায় জানতে পারছি যে, আমার ধারণাই ঠিক ছিল, বাবাকে খুনই করা হয়েছিল।'

আমি বললাম, 'যাই হোক, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এতদিন আগের খুনের ব্যাপারে আজকে তো আর তুমি কিছু করতে পারবে না।'

সুরেশ মাথুর ধন্যবাদ দিয়ে আমার পারিশ্রমিক চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এই ঘটনার প্রায় ছ' মাস পরে একদিন হঠাৎ আমার কাছে এক মক্কেল এসে হাজির, বছর ষাট-বাষট্টি বয়স, ঘি খাওয়া চেহারা, বললেন তিনি একজন ব্যবসাদার, একটা নতুন ব্যবসায়ে টাকা ঢালতে যাচ্ছেন, তার ফলাফল কী হবে সেটা জানতে চান। সামনে তাঁর কোনও আর্থিক বিপর্যয় আছে কি?

আমি জিজ্ঞেস করতে বললেন তাঁর নাম গজানন আপ্টে। আমি তো শুনে অবাক!

যাই হোক, মক্কেল যখন, তখন তাঁকে অ্যাটেন্ড করতেই হবে। আমি তাঁকে আমার ফরাসে বসালাম। তারপর আমার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা করলাম।

'আপনার বয়স কত?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ছেষট্টি।'

আমি হাতের রেখার দিকে মন দিলাম। দেখি যে নতুন ব্যবসা ফাঁদার কোনও প্রশ্ন আসছে না। এই বছরই ভদ্রলোকের মৃত্যু এবং সেটা অপঘাত মৃত্যু। সে-কথা তো আর তাঁকে বলতে পারি না; বললাম, 'তোমার নতুন ব্যবসায়ে টাকা ঢেলে কোনও সুফল হবে না; তুমি যা করছ তাই করো।'

'তুমি ঠিক বলছ?' ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন। 'আমি কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে এই পন্থা স্থির করেছি।'

আমি ভদ্রলোককে আবার বারণ করলাম। তাঁর হাতের তেলো আমার সামনে খোলা, আমি তখনও মনে মনে গণনা করে চলেছি। হঠাৎ একটা ব্যাপার দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোকের হাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিনি পনেরো বছর আগে একটা খুন করেছেন। সাংঘাতিক ফাঁড়া, কিন্তু সে ফাঁড়া তিনি কাটিয়ে উঠেছেন, সে-কথাও হাতে রয়েছে।

আমি অবিশ্যি এ বিষয়ে আর কিছু বললাম না। ভদ্রলোক আমাকে টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি আবার বলে দিলাম যে, নতুন ব্যবসায়ে টাকা ঢেলে কোনও ভাল ফল হবে না।

এর সাতদিন পরে সুরেশ মাথুর আবার এসে হাজির। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার?'

মাথুরকে বিশেষভাবে উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছিল। সে বলল যে, এর মধ্যে নাকি গজানন আপ্টের আপিসে গিয়েছিল। আপ্টে ছিলেন না কিন্তু তাঁর সেক্রেটারি ছিল। সেটা জেনে-শুনেই নাকি মাথুর গিয়েছিল। সেক্রেটারি নাকি বিশ বছর ধরে ওই আপিসে চাকরি করছে। তার সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল মাথুরের। মাথুর তাকে তার বাপের মৃত্যুর কথা জিজ্ঞেস করে। সেক্রেটারি বলে, তার ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে। সে প্রকাশ মাথুরের বিশেষ অনুরক্ত ছিল। সে বলে বিকেলে কফি খাওয়ার পরই নাকি প্রকাশ মাথুর মারা যান। সেক্রেটারি সন্দেহ করেছিল যে, কফিতে বিষ মেশানো হয়েছে, কিন্তু ডাক্তারের মুখের উপর সে কোনও কথা বলতে পারেনি।

'তা হলে এখন তোমার কী মতলব?' আমি সুরেশ মাথুরকে জিজ্ঞেস করলাম।

সুরেশ চাপা স্বরে বলল, 'আমি বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।'

'সে কী? কী করে?'

'যে করে হোক।'

আমি যে ইতিমধ্যে গজানন আপ্টের হাত দেখেছি আর জেনেছি যে তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, সে বিষয়ে আর কিছু বললম না। সুরেশ মাথুর প্রতিশোধের সংকল্প নিয়ে আমার আপিস থেকে বেরিয়ে গেল।

এর তিনদিন পরে খবরটা খবরের কাগজে বেরোল। গজানন আপ্টে খুন হয়েছেন। তিনি ইটওয়ারি রোডে থাকতেন। রোজ সন্ধ্যায় আপিসের পর জুমা তালাও-এর পাশে হাঁটতে যেতেন। সেই হাঁটা অবস্থায় পিছন থেকে কেউ এসে তাঁকে কোনও ভারী অস্ত্র দিয়ে মাথায় মেরে খুন করেছে। পুলিশ আততায়ীর অনুসন্ধান করছে।

কিন্তু আমি তো সুরেশ মাথুরের হাত দেখেছি। আমি জানি তার এখন একটা ফাঁড়া আছে, কিন্তু এ ফাঁড়া সে কাটিয়ে উঠবে।

শেষ পর্যন্ত হলও তাই। পুলিশ খুনিকে ধরতে পারল না, এবং গজানন আপ্টের খুন 'আনসল্‌ভ্‌ড ক্রাইম্‌স'-এর পর্যায়ে ফেলে দেওয়া হল।

সুরেশ মাথুর যে শুধু পারই পেল তা নয়। আমি জানি যে বিরাশি বছরের আগে তার মৃত্যু নেই, এবং সে মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু অন্তত তার হাতের রেখা তাই বলে।

সন্দেশ, আষাঢ় ১৩৯৫

গল্পবলিয়ে তারিণীখুড়ো

'তোরা তো আমাকে গল্পবলিয়ে বলেই জানিস', বললেন তারিণীখুড়ো, 'কিন্তু এই গল্প বলে যে আমি এককালে রোজগার করেছি সেটা কি জানিস?'

'না বললে জানব কী করে?' বলল ন্যাপলা।

'সে আজ থেকে বাইশ বছর আগের কথা,' বললেন তারিণীখুড়ো। 'বম্বেতে আছি, ফ্রি প্রেস জার্নাল কাগজে এডিটরের কাজ করছি, এমন সময় একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম—আমেদাবাদের এক ধনী ব্যবসায়ী একজন গল্পবলিয়ের সন্ধান করছে। ভারী মজার বিজ্ঞাপন। হেডলাইন হচ্ছে "ওয়ানটেড এ স্টোরি টেলার।" তারপর লেখা আছে যে আমেদাবাদের একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী বলবন্ত পারেখ একটি ব্যক্তির সন্ধান করছেন যে তাঁকে প্রয়োজনমতো একটি করে মৌলিক গল্প শোনাবে। সে লোক বাঙালি হলে ভাল হয়, কারণ বাঙালিরা খুব ভাল গল্প লেখে। বুঝে দেখ—"মৌলিক" গল্প। অন্যের লেখা ছাপা গল্প হলে চলবে না। সেরকম গল্প তো পৃথিবীতে হাজার হাজার আছে। কিন্তু এ লোক চাইছে এমন গল্প, যা আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কী, আমার পক্ষে গল্প তৈরি করা খুব কঠিন নয়। আমার জীবনের এতরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতেই একটু-আধটু রঙ চড়িয়ে রদবদল করে বলে নিলেই সেটা গল্প হয়ে যায়। তাই কপাল ঠুকে অ্যাপ্লাই করে দিলুম। এটাও জানিয়ে দিলুম যে, আমি গুজরাতি জানি না, তাই গল্প বললে হয় ইংরিজিতে না হয় হিন্দিতে বলতে হবে। হিন্দিটা আমার বেশ ভাল রকমই রপ্ত ছিল আর ইংরিজি তো কলেজে আমার সাবজেক্টই ছিল। সাত দিনে উত্তর এসে গেল। পারেখ সাহেব জানালেন ওঁর ইনসমনিয়া আছে, রাত সাড়ে তিনটে-চারটের আগে ঘুমোন না, সেই সময়টা গল্প শুনতে চান। রোজ নয়, যেদিন মন চাইবে। মাইনে মাসে হাজার টাকা।'

'আমি আমার বম্বের খবরের কাগজের চাকরি ছেড়ে দিলুম। দেড় বছর করছি এক কাজ, আর এমনিতেই ভাল লাগছিল না।'

বুড়ো থেমে দুধ চিনি ছাড়া চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আবার শুরু করলেন।

আমেদাবাদ গিয়ে জানলুম পারেখ সাহেবের কাপড়ের মিল আছে, বিরাট ধনী লোক। বাড়িটাও পেল্লায়, অন্তত বারো-চোদ্দখানা ঘর। তার একটাতেই আমাকে থাকতে দিলেন। বললেন, 'তোমার ডিউটির তো কোনও ধরাবাঁধা সময় নেই। মাঝরাত্তিরে তোমায় ডাকব—অন্য জায়গায় থাকলে চলবে কী করে। তুমি আমার বাড়িতেই থাকো।' ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি না। অর্থাৎ আমারই বয়সি। দুই ভাইপো আছে, হীরালাল আর চুনীলাল—তারা কাকার ব্যবসায় লেগে গেছে। এর মধ্যে হীরালালের বিয়ে হয়ে গেছে, সে বউ আর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ওই একই বাড়িতে থাকে।

খাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনও ঝামেলা নেই। পারেখ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন আমি কোনও স্পেশাল রান্না খাব কিনা, আমি বলে দিলুম যে আমি গুজরাতি রান্নায় অভ্যস্ত।

মোট কথা, মাসখানেকের মধ্যেই বেশ গ্যাঁট হয়ে বসলাম। গল্প দেখলাম মাসে দশ দিনের বেশি বলতে হচ্ছে না। বাকি সময়টা খাতায় গল্পের প্লট নোট করে রাখতাম। ইচ্ছে করলে আমি নিজেই একজন গল্পলিখিয়ে হয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু তাতে মাসে হাজার টাকা আয় হত না। ভূতের গল্প, শিকারের গল্প, ক্রাইমের গল্প—সাধারণত এইগুলোই ভদ্রলোক বেশি ভালবাসতেন শুনতে। তোরা তো জানিসই ভূতের অভিজ্ঞতা আমার অনেক হয়েছে। তেমনি রাজারাজড়াদের সঙ্গে শিকারও করেছি কম না। ক্রাইমের গল্পটা মাথা থেকে বার করে বলতুম, সেটা বেশ ভালই উতরিয়ে যেত। মোটামুটি

ভদ্রলোক আমার কাজে খুশিই ছিলেন।

মাস ছয়েক হয়ে গেছে এমন সময় একদিন সকালে এক ভদ্রলোক পারেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পারেখ সাহেব সেদিন একটু বেরিয়েছিলেন। আমি ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় বসিয়ে জিজ্ঞেস করলুম তাঁর কী দরকার। উনি বললেন ওঁর নাম মহাদেব দুতিয়া, উনি একটা বিশেষ জনপ্রিয় গুজরাতি মাসিক পত্রিকা ললিতার সম্পাদক। ললিতার নাম আমি শুনেছিলাম। ওটার নাকি প্রায় এক লাখ সার্কুলেশন। আমি বললাম, 'মিঃ পারেখের ফিরতে আধঘণ্টাখানেক হবে, আপনি যদি বলেন, আপনার কী দরকার ছিল আমি সেটা ওঁকে জানিয়ে দিতে পারি।'

দুতিয়া বললেন, 'আমি ওঁর কাছ থেকে গল্প চাইতে এসেছি। 'সাহিত্য' পত্রিকায় উনি নিয়মিত লিখছেন কয়েক মাস থেকে। আমার গল্পগুলো খুব ভাল লেগেছে, তাই ভাবছিলাম আমাদের কাগজে যদি লেখা দেন। আমাদের পাঠকসংখ্যা সাহিত্যর প্রায় দেড়া।'

'উনি গল্প লিখছেন?' আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

'আপনি জানেন না?' ভদ্রলোকও অবাক!

'না। একেবারেই জানি না।'

'ভেরি গুড স্টোরিজ। আর ওঁর গল্পের খুব ডিমান্ড হয়েছে। সাহিত্যর গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে গেছে। আপনি গুজরাতি পড়তে পারেন?'

'একটু একটু। হিন্দির সঙ্গে সামান্য মিল আছে তো।'

'এই দেখুন ওঁর একটা গল্প।'

দুতিয়া একটা থলি থেকে একটা পত্রিকা বার করে একটা পাতা খুলে দেখাল। লেখকের নামটা পড়তে আমার কোনও অসুবিধা হল না।

'এ গল্প তুমি পড়েছ?'

'সার্টেনলি। খুব ভাল গল্প।'

'গল্পের মোটামুটি ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপে আমাকে বলতে পারো?'

দুতিয়া বললেন, এবং আমি বুঝলাম যে, সেটা আমারই বলা একটা গল্প। ভদ্রলোকের কাহিনীকার হবার শখ হয়েছে, কিন্তু নিজের মাথায় প্লট আসে না, তাই অন্যের কাছ থেকে শোনা মৌলিক গল্প নিজের বলে চালাচ্ছেন। গল্পবলিয়ে বাঙালি হবার প্রয়োজনও এখন বুঝলাম। আমি গুজরাতি হলে তো এ ব্যাপারটা অনেক আগেই জেনে ফেলতাম। এভাবে ঘটনাচক্রে দুতিয়ার কাছ থেকে জানার কোনও প্রয়োজন হত না।

আমি বললাম, 'আপনি কি বসবেন? না আরেকদিন আসবেন? অবিশ্যি আমিও ওঁকে ব্যাপারটা বলে দিতে পারি।'

'আমি নিজেই আসব। কাল সকালে এলে দেখা হবে কি?'

'এগারোটা নাগাদ এলে নিশ্চয়ই হবে। মিঃ পারেখ একটু দেরিতে ওঠেন।'

মিঃ দুতিয়া চলে গেলেন।

আমি আবার মন দিয়ে ব্যাপারটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলাম। ব্যাপার খুব সোজা। লোকটা স্রেফ

আমাকে না জানিয়ে আমার নাম ভাঙিয়ে নিজে নাম করছে।

নাঃ—এর একটা বিহিত না করলেই নয়! এ জিনিস বরদাস্ত করা যায় না। অথচ লোকটাকে দেখে একবারও বুঝতে পারিনি যে সে এত অসৎ হতে পারে।

পরদিন দোতলায় আমার ঘরের জানলা থেকে দেখলাম এগারোটার সময় একটা পুরনো ফোর্ড গাড়ি এসে পারেখের বাড়ির সামনে থামল আর তার থেকে দুতিয়া নামলেন। এবার থেকে ললিতা পত্রিকায় চোখ রাখতে হবে। পারেখের কোনও গল্প বেরোয় কিনা সেটা দেখতে হবে। কিন্তু এর প্রতিকার হয় কী করে? এ জিনিস তো চলতে দেওয়া যায় না।

রাত্তিরে ডাক পড়ল। গেলুম। পারেখ বললে গল্প শুনবে। আমার ভাবাই ছিল। আমি বলে গেলুম। গল্পের শেষে আমায় তারিফও করলে। বললে, 'দিস ইজ ওয়ান অফ ইওর বেস্ট।'

এক মাস পরের কথা। এর মধ্যে আরও আট-দশটা গল্প বলা হয়ে গেছে। একদিন সকালে পারেখ বেরিয়েছে, আমি আমার ঘরে বসে আছি। এমন সময় পারেখের ভাইপো হীরালাল এসে বলল আমার টেলিফোন আছে।

আমি নীচে আপিসে গেলুম। ফোন তুলে হ্যালো বলে দেখলুম ললিতার সম্পাদক দুতিয়া কথা বলছেন। বললেন, 'মিঃ পারেখ নেই শুনছি।'

'না, উনি একটু বেরিয়েছেন।'

'বিশেষ জরুরি দরকার ছিল। তা আপনি কি একবার আমার আপিসে আসতে পারবেন? ঠিকানাটা টেলিফোন ডিরেক্টরিতেই পাবেন।'

আমি বললাম, 'এখান থেকে কতদূর আপনার আপিস?'

'ট্যাক্সিতে এলে দশ মিনিটে পৌঁছে যাবেন।'

'বেশ, আমি আসছি।'

ললিতার আপিস দেখলেই বোঝা যায় তাদের অবস্থা খুব সচ্ছল। বেশ বড় ঘরে একটা বড় টেবিলের পিছনে দুতিয়া তিনটে টেলিফোন সামনে নিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কেলেঙ্কারি ব্যাপার।'

'কী হল?'

'মিঃ পারেখ আমাদের একটা গল্প পাঠিয়েছিলেন—চমৎকার গল্প। আমরা সেটা ছাপিয়েছিলাম। তারপর থেকে অন্তত দেড়শো চিঠি পেয়েছি—পাঠকরা বলছে গল্পটা চুরি—এর মূল লেখক হচ্ছেন তোমাদের বাংলাদেশের শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি।'

আনন্দমেলা, পূজাবার্ষিকী ১৪০১। রচনাকাল ১৯৮৮

নিতাইবাবুর ময়না

নিতাইবাবুর অনেকদিনের শখ একটা ময়না কেনার। তাঁর বন্ধু শশাঙ্ক সেনের বাড়িতে একটা ময়না আছে। সেটা হেন বাংলা কথা নেই যে বলে না। তার কথা শুনতেই নিতাইবাবু মাসে অন্তত তিনবার করে শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে যান। সেদিন তো শশাঙ্কবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকতেই নিতাইবাবু শুনলেন ময়না বারান্দা থেকে বলে উঠল, 'আসুন, বসুন।'

একেবারে মানুষের গলা। কেবল একটু খোনা, যেমন সর্দি হলে হয়। চার বছর ধরে ময়নাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন শশাঙ্ক সেন। তাঁর ছেলে আর গিন্নিও বাদ যাননি। সুতরাং পাখির কথার স্টক এখন বিশাল। নিতাইবাবু মুগ্ধ হয়ে শোনেন, আর মনে মনে ভাবেন—এমন একটা পাখি থাকলে নিরানন্দ সন্ধ্যাগুলি চমৎকার কেটে যায়। শশাঙ্কবাবু বন্ধুকে দোকানের সন্ধানও দিয়ে দিয়েছেন। 'নিউ মার্কেটে পাখির সেকশন জানো তো? সেখানে গিয়ে লতিফের দোকানে খোঁজ করবে। আমার এই ময়নাও লতিফের দোকান থেকে কেনা।'

নিতাইবাবু ন্যাশনাল ইনশিওর‍্যান্স কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। বিয়ে করেননি। থাকেন ভবানীপুরে বেণীনন্দন স্ট্রিটের একটা ফ্ল্যাটে। অফিস টাইমে মার্কেট যাওয়ার উপায় নেই; অফিস ফেরতও যাওয়া হয় না, কারণ মার্কেট বন্ধ হয়ে যায়। তাই গুড ফ্রাইডের ছুটিতে সকাল দশটায় নিতাইবাবু মার্কেটে গিয়ে হাজির হলেন। পাখির বাজার কোথায় জানাই ছিল, সেখানে গিয়ে লতিফের কথা জিজ্ঞেস করতেই এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'কেন স্যার? লতিফ কেন? আপনার পাখি চাই তো?' নিতাইবাবু হ্যাঁ বলতে ভদ্রলোক বললেন, 'তা আমার দোকানে আসুন না। আমার স্টক কারুর থেকে কম না।'

দোকানটা বড় তাতে সন্দেহ নেই, আর পাখিতে বোঝাই। কিচিরমিচির শব্দে কান পাতা যায় না।

'কী পাখি খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'ময়না।'

'তা ক'টা চাই আপনার? এই দেখুন খাঁচার সারি। সবকটা ময়না।'

'কথা বলে?'

'ময়না কথা বলবে না? শিখিয়ে নিলেই বলবে। টকিং বার্ডের মধ্যে ময়নার পোজিশন অ্যাগবারে টপে। তবে একটা কথা—ময়না কিন্তু দু'রকমের হয়। নেপালি আর আসামি।'

'দুটোয় তফাত কী?'

'আসামির দাম বেশি, কারণ কথা বলে বেশি ভাল।'

নিতাইবাবু মনে মনে আসামি ময়না নেওয়াই স্থির করে ঘুরে ঘুরে পাখি দেখতে লাগলেন।

'আমার নামটা মনে রাখবেন স্যার,' বললেন দোকানের মালিক 'মণিলাল কর্মকার। ছাপ্পান্ন বছরের ব্যবসা আমাদের। গ্র্যান্ডফাদার এস্টার্ট করেন।'

'খাঁচাসমেত ময়না পাওয়া যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই। তবে খাঁচার দাম আলাদা। আপনি আগে চয়েস করুন না! এইগুলো আসামি, আর এইগুলো নেপালি।'

নিতাইবাবু আর সময় নষ্ট না করে একটা আসামি ময়নার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'এইটে আমি নেব।'

কিছু দরাদরির পর তিনশো টাকায় রফা হল—পাখি দুশো কুড়ি, আর খাঁচা আশি। নিতাইবাবু খাঁচাসমেত পাখি নিয়ে নিউ মার্কেটের সামনে দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বাড়িমুখো রওনা দিলেন।

ছোট ফ্ল্যাট। দু'খানা ঘর আর একটা অপরিসর বারান্দা। একা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। চাকর গনশার হাতে খাঁচাটা চালান দিয়ে নিতাইবাবু বললেন, 'এটাকে বারান্দায় টাঙিয়ে রাখার ব্যবস্থা কর।'

পাখিকে কী খেতে দিতে হবে সেটা বলে দিয়েছিল মণিলাল কর্মকার। সে ব্যাপারেও চাকরকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন নিতাইবাবু।

'বল দেখি রাধাকেষ্ট!'

নিতাইবাবুর তর সইছিল না। নাওয়া-খাওয়া হয়নি, তাও পাখির বাকশক্তি পরীক্ষা না করে তাঁর সোয়াস্তি নেই।

'রাধাকেষ্ট, রাধাকেষ্ট। বল দেখি রাধাকেষ্ট।' খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে পাখির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আবার বললেন নিতাইবাবু।

এর পর ময়না ঘাড়টা একটু নাড়ল। তারপর পরিষ্কার গলায় কথা এল—'হ্যালো গুড মর্নিং।'

সে কী! পাখি যে ইংরিজি বলে!

নিতাইবাবুর বিস্ময় কাটার আগেই পাখি আবার কথা বলল।—'ইউ রাসক্যাল!' আর পরক্ষণেই কণ্ঠস্বরে বেশ বিরক্তি এনে পাখি বলে উঠল—'শাট আপ! শাট আপ!'

নিতাইবাবু চমৎকৃত হলেও তাঁর মনটা কেমন যেন ভারী হয়ে উঠল। মণিলাল কর্মকার এমন ভুল

করল কী করে? এ ময়না যে সাহেব বাড়িতে ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পাখির কথা থেকে সাহেব যে কেমন লোক সেটাও খানিকটা আঁচ করতে পারলেন নিতাইবাবু। খিটখিটে মেজাজ, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সম্ভবত দো-আঁশলা, অর্থাৎ ফিরিঙ্গি। এ ময়না কি বাংলা শিখবে কোনওদিন, না কি তিনি এখনই গিয়ে এটাকে বদলে অন্য ময়না নিয়ে আসবেন?

অনেক ভেবে নিতাইবাবু একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন। ক'টা দিন দেখাই যাক না! এই ময়না শশাঙ্ক সেনের ময়নার চেয়েও বেশি স্পষ্ট কথা বলে। অর্থাৎ এটা যে বাকশক্তির বিচারে অতি উঁচুদরের ময়না তাতে সন্দেহ নেই। এ কতরকম ইংরিজি কথা বলতে পারে সেটা সম্বন্ধেও কৌতূহল হল নিতাইবাবুর।

নাঃ, এটা থাক কিছুদিন। আর ময়না তো ইংরিজি বাংলায় তফাত করতে পারে না, কানে যা শোনে তাই বলে। এটা এতদিন ইংরিজি শিখেছে, এবার বাংলা শিখবে।

তিনদিনেই নিতাইবাবু আবিষ্কার করলেন যে, ময়নার ইংরিজি কথার পুঁজি অফুরন্ত। আর সেইসব কথার বেশিরভাগই গালাগালি আর ধমকানি। স্টুপিড, ফুল, সিলি অ্যাস, ইউ ইডিয়ট, ড্যাম ইট, শাট আপ, গেট আউট এই জাতীয় কথাই বেশি। আর এইসব কথা শুনলে মনে হয় ময়নারই মেজাজ যেন তিরিক্ষি।

এদিকে বাংলা শেখানোর চেষ্টাতেও বিরতি নেই। রাধাকেষ্ট, জয় মা তারা, দুর্গা, ঠাকুর ভাত দাও, আসুন, নমস্কার, কেমন আছেন—এইসব এবং আরও অনেক ছোট-বড় কথা নিতাইবাবু সকালে অফিসে যাওয়ার আগে এবং সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে তাঁর ময়নাকে শেখাতে চেষ্টা করেন। আধঘণ্টার চেষ্টার পর ময়না যখন তীক্ষ্নস্বরে 'স্টপ ইট, স্টপ ইট' বলে ওঠে, তখন হতাশায় নিতাইবাবুর বুকটা ভরে ওঠে। পাখি জিভ দিয়ে কথা বলে কিনা সেটা নিতাইবাবু জানেন না, কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে এ পাখির জিভ যে ইংরিজি বলার জন্যই তৈরি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

দু' মাস চেষ্টার পর নিতাইবাবু হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তবে ময়নার শখ এখনও মেটেনি! তাই তিনি স্থির করলেন যে, মণিলালের দোকানে গিয়ে এই ময়না ফেরত দিয়ে অন্য ময়না নিয়ে আসবেন, আর আনার আগে পরীক্ষা করে নেবেন সে ময়না বাংলা না বলে অন্য কোনও ভাষা বলে কিনা।

সামনে ছুটি নেই, তাই একদিন অসুস্থতার অজুহাতে আপিস কামাই করে নিতাইবাবু ময়না সমেত নিউ মার্কেটে গিয়ে হাজির হলেন।

মণিলালের দোকানে গিয়ে ঢুকতেই কর্মকার মশাই চোখ কপালে তুলে বলেন, 'এ কী আপনি? এ যে আশ্চর্য ব্যাপার মশাই!'

দোকানে যে আরেকজন খদ্দের রয়েছে সেটা নিতাইবাবু ঢুকেই লক্ষ করেছিলেন। মণিলালবাবু এবার বললেন, 'কী কেলেঙ্কারি মশাই—ভুল করে ফেরিস সাহেবের ময়না আপনাকে বেচে দিয়েছিলাম। এখন সাহেব এখানে এসেছেন সেই ময়নার খোঁজে। না পেয়ে আমায় এই মারে তো সেই মারে!'

ফেরিস সাহেবকে দেখেই নিতাইবাবুর মনে হয়েছিল যে তাঁর অনুমান মিথ্যে হয়নি। এ লোক যে অত্যন্ত বদ মেজাজের লোক সেটা তাকে দেখেই বোঝা যায়। সাহেব নিতাইবাবুর হাতের খাঁচাটা দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন—'হোয়াই, দ্যাটস মাই মাইনা!' নিতাইবাবু ভাঙা ভাঙা ইংরিজির সঙ্গে হিন্দি মিশিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি ময়নাটা ফেরত দিতে এসেছেন, কাজেই সেটা নিতে পারেন। সাহেব তাতে যে ঘটনাটা বললেন তা হল এই—একটা বিশেষ কাজে তাঁকে হঠাৎ অস্ট্রেলিয়া চলে যেতে হয় তিন মাসের জন্য। সেই ফাঁকে তাঁর হতচ্ছাড়া জুয়াড়ি ছেলেটির হঠাৎ কিছু ক্যাশের দরকার পড়ায় সে তার বাপের ময়নাটি বেচে দেয়। 'হি ইজ এ স্কাউন্ড্রেল!' চোখ পাকিয়ে বললেন ফেরিস সাহেব। 'আমি গতকাল ফিরে এসে ময়না নেই দেখে মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছিলাম, তখন পিটার বলল যে মণিলালের দোকানে সে ময়নাটা বেচেছিল, সেটা এখনও সেখানে থাকতে পারে। তখন আমি হন্তদন্ত হয়ে এখানে এসে দেখি যে দিস ফুল ম্যানিলাল হ্যাজ সোলড ইট টু এ বেঙ্গলি কাস্টমার। আমি তো মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছিলাম। তা, তুমি ময়নাটা ফেরত দিচ্ছ তো?'

নিতাইবাবু বললেন, 'ইয়েস, আই শ্যাল বাই অ্যানাদার ওয়ান।'

'ভেরি গুড। কিন্তু তোমার কি এ ময়নাটা পছন্দ হয়নি?'

'না, সাহেব। খুব চতুর পাখি, কিন্তু ও ইংরিজি ছাড়া কিছু বলে না। দু' মাস চেষ্টা করেও আমি ওকে বাংলা শেখাতে পারিনি।'

মণিলাল কর্মকার নিতাইবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'তা হলে আপনি কি অন্য একটা ময়না নেবেন? আমার কাছে একটা ফার্স্ট কেলাস নতুন আসামি ময়না এসেছে—চোস্ত বাংলা বলে।'

'কই দেখি।'

মণিলাল একটা খাঁচার সামনে গিয়ে বললেন, 'এই সেই ময়না।'

নিতাইবাবু খাঁচার দিকে ঝুঁকে পড়তেই ময়না বলে উঠল, 'চিন্তামণি, চিন্তামণি!'

নিতাইবাবু আর দ্বিধা না করে বললেন, 'এই পাখিটাই আমি নেব।'

'তুমি আমার ময়নাটা কত দিয়ে কিনেছিলে?' নিতাইবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ফেরিস সাহেব।

'খাঁচা সমেত তিনশো টাকা,' বললেন নিতাইবাবু।

ফেরিস সাহেব মানিব্যাগ বার করে তার থেকে তিনটে একশো টাকার নোট বার করে নিতাইবাবুকে দিয়ে বললেন, 'আমার গুণধর পুত্রটির জন্য আমার নিজের পাখি আমাকে দ্বিতীয়বার পয়সা দিয়ে কিনতে হল। এনিওয়ে, অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল। আশা করি এই দু' মাসে আমার পাখি ইংরিজি ভুলে যায়নি।'

সাহেবের মুখে এই প্রথম হাসি দেখা দিল।

নিতাইবাবু এবার ফেরিসের কাছ থেকে পাওয়া তিনশো টাকা মণিলালবাবুর হাতে তুলে দিলেন। মণিলালবাবু বাংলায় ফিসফিস করে বললেন, 'পাখি নেই দেখে সাহেব আমাকে যা গাল দিলেন, আমার কান এখনও ভোঁ ভোঁ করছে।'

ফেরিস সাহেব এবার তাঁর হাতের ময়নাটার দিকে চেয়ে বললেন, 'টুটসী—সে হ্যালো গুড মর্নিং, সে হ্যালো গুড মর্নিং!'

খাঁচার পাখি কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে নাকিসুরে প্রায় মানুষের গলায় পরিষ্কার উচ্চারণে বলল, 'রাধাকেষ্ট। ঠাকুর ভাত দাও। দুর্গা দুর্গা।'

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৯৬

রণ্টুর দাদু

রণ্টুর বয়স পনেরো, কিন্তু এর মধ্যেই তার গানের গলা হয়েছে চমৎকার। সে সকালে ওস্তাদের কাছে একঘণ্টা গান শেখে। যে তার গান শোনে সেই বলে, 'এ ছেলে আর কয়েক বছরের মধ্যেই আসরে গান গাইবে।' এ গুণটা যে সে কোথা থেকে পেল সেটা বলা শক্ত, কারণ রণ্টুর বাবা-মা কেউই গাইতে পারেন না। বাবা খুব ভাল ছাত্র ছিলেন, সে গুণ রণ্টু পেয়েছে, আর মা-র কাছ থেকে পেয়েছে মিষ্টি স্বভাব আর ফরসা রঙ। কিন্তু গান?

রণ্টুর বাড়িতে থাকে তার মা-বাবা, একটা সাত বছরের বোন আর বাহাত্তর বছরের বুড়ো দাদু। এই দাদুর বিষয়ে কিছু বলা দরকার, কারণ এঁকে নিয়েই গল্প। দাদু অমিয়কান্তি লাহিড়ী বিশ বছর বয়সে বি.এ. পাশ করে তাঁর বাবার পেশা হোমিওপ্যাথি ধরেন। ছাব্বিশ বছরে তাঁর ছেলে জন্মানোর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর এক কঠিন ব্যারাম হয়, যা থেকে তিনি কোনওরকমে বেঁচে উঠলেও, তাঁর চিন্তাশক্তি আর সেইসঙ্গে তাঁর স্মরণশক্তি প্রায় লোপ পেয়ে যায়। ফলে তিনি কাজের অযোগ্য হয়ে পড়েন।

ভাগ্যিস বাবা অনেক পয়সা রেখে গিয়েছিলেন, তাই অমিয়কান্তিকে বেকারত্বের দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়নি। তারপর একমাত্র ছেলে বিনয় যখন বি.এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ভাল চাকরি পায়, তখন থেকে রণ্টুদের আর খাওয়া-পরার ভাবনা ভাবতে হয়নি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রণ্টুর দাদুর চিন্তাশক্তি কিছুটা বেড়েছে, সেইসঙ্গে স্মরণশক্তিও। অতীতের অনেক কথাই তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। এরই মধ্যে কয়েকটা স্মৃতি হঠাৎ হঠাৎ জেগে ওঠে। কিন্তু দাদুর পুরনো দিনের কথা রণ্টু বিশ্বাস করে না। সে বলে, 'তুমি সব বানিয়ে বানিয়ে বলছ। আসলে তুমি সব কথাই ভুলে গেছ।' দাদু-নাতি সম্পর্কটা বেশ রসালো। মাঝে মাঝে দাদুর মাথায় দুষ্টুবুদ্ধিও খেলে; তবে তাঁর একটা আফসোস এই যে, তাঁর এমন কোনও গুণ নেই যেটা নাতির মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে।

রণ্টুদের প্রতিবেশী বৃদ্ধ সীতানাথ বাগচি মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় রণ্টুদের বাড়িতে গল্পগুজব করতে আসেন। একদিন তিনি সঙ্গে তাঁর বন্ধু প্রমথ দত্তকে নিয়ে এলেন। রণ্টুর দাদুর পরিচয় পেয়ে এই ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি বললেন, 'অমিয়কান্তি লাহিড়ী? আপনার গান তো গ্রামোফোন রেকর্ডে ছিল—তাই না?' রণ্টুর দাদু বললেন, 'তা তো বলতে পারব না। এক অসুখের ফলে আমার অনেক পুরনো স্মৃতি মন থেকে লোপ পেয়ে গেছে।'

প্রমথ দত্ত বললেন, 'কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে। অমিয়কান্তি লাহিড়ী—হ্যাঁ, এই নাম। শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন। বছর পঞ্চাশ আগের কথা। সে রেকর্ড ছিল আমাদের বাড়িতে। এখন অবিশ্যি আর নেই।'

সীতানাথ বাগচি বললেন, 'মণিলালের কাছে খোঁজ করে দেখতে পারেন। তার রেকর্ড সংগ্রহের বাতিক ছিল।'

দুই বুড়ো চলে যাওয়ার পর রণ্টুর দাদু চোখ বড় বড় করে নাতিকে বললেন, 'শুনলি তো—এককালে আমি গাইতে পারতুম। আমার গানের রেকর্ড ছিল।'

রণ্টু বলল, 'যদ্দিন পর্যন্ত না সে রেকর্ড নিজের চোখে দেখছি, তদ্দিন বিশ্বাস করব না।'

রণ্টু তার বাবাকে কথাটা বলাতে বিনয় লাহিড়ী বললেন, 'বাবা যদি কোনওদিন গান গেয়েও থাকেন তবে সে আমার জন্মের আগে। আমার চেতনা হওয়ার পর বাবা গলা খোলেননি কখনও।'

এদিকে রণ্টুর দাদু কিন্তু জেদ ধরলেন যে, তাঁর গাওয়া গানের একটা রেকর্ড জোগাড় করে তাঁর নাতিকে শোনাতেই হবে। আশ্চর্য—এমন একটা ব্যাপার মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল!

সীতানাথ বাগচি যে সেদিন এক রেকর্ড সংগ্রাহকের উল্লেখ করেছিলেন সে-কথা রণ্টুর দাদুর মনে ছিল। তিনি বাগচি মশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর নাম-ঠিকানা জেনে নিলেন। মণিলাল সেন, ছাব্বিশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিট। বাগচি মশাই তাঁকে খুব আশা দিয়েছেন। বলেছেন, 'মণিলালের বাড়িতে তারাসুন্দরীর নাটক শুনেছি; দিনু ঠাকুরের গান শুনেছি; আপনার রেকর্ড তার বাড়িতে থাকা কিছুই আশ্চর্য না। অবিশ্যি তার সে বাতিক এখনও আছে কিনা জানি না। আমার সঙ্গে তার বহু বৎসর দেখা নেই।

পরদিনই রণ্টুর দাদু ছাব্বিশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটে গিয়ে হাজির হলেন। মণিলাল সেন বাড়িতেই ছিলেন, অমিয়কান্তিকে তিনি বৈঠকখানায় এনে বসালেন। ইনিও বৃদ্ধের দলেই পড়েন, সত্তরের কাছাকাছি বয়স। অমিয়কান্তি আর সময় নষ্ট না করে একেবারে আসল প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

'আপনার গ্রামোফোন রেকর্ডের ভাল সংগ্রহ আছে বলে শুনেছি।'

'তা আছে। প্রায় আট-নশো রেকর্ড আছে। অবিশ্যি এখন আর শোনার আগ্রহ নেই; এককালে ছিল।'

'অমিয়কান্তি লাহিড়ীর কোনও রেকর্ড আপনার আছে কি?'

'আপনি নিজের কথা বলছেন কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি যুবা বয়সে রেকর্ডে গান গেয়েছি। এখন বার্ধক্যে সেগুলো শোনার বিশেষ আগ্রহ বোধ করছি।'

'এ ব্যাপারে আমি আপনাকে হেল্‌প করতে পারলাম না। এই নামে কোনও গাইয়ের রেকর্ড আমার সংগ্রহে নেই।'

'আর কারুর সংগ্রহে থাকতে পারে বলে জানেন?'

'বাগবাজারের বিশ্বনাথ ভট্‌চায. ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। সে আর আমি প্রায় একসঙ্গেই রেকর্ড সংগ্রহ আরম্ভ করি।'

রণ্টুর দাদু বাগবাজারে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। প্রাচীন, জীর্ণ বাড়ি, তবে মালিক যে অর্থবান তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'অমিয়কান্তি লাহিড়ী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মানে, আপনি নিজের কথা বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তরুণ বয়সে রেকর্ডে গান গেয়েছিলাম। সে রেকর্ড আমার কাছে নেই।'

'সে রেকর্ড তো অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য!'

'তাই বুঝি?'

'তবে আমার কাছে তিনখানা আছে। দুটো শ্যামাসঙ্গীত আর একটা কীর্তন।'

'এবারে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'কী?'

'এই তিনখানার অন্তত একখানা যদি আমাকে দু'দিনের জন্য ধার দেন তা হলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব। আমি রেকর্ডের যতটা যত্ন করা দরকার ততটা করব, এবং অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেব কথা দিচ্ছি।'

'তা আপনি যখন চাইছেন তখন দিচ্ছি—যদিও এমনিতে আমি রেকর্ড ধার দিই না।'

এবার ভদ্রলোক একটা আলমারি থেকে বাক্সের পর বাক্স রেকর্ড বার করতে আরম্ভ করলেন। প্রত্যেকটি বাক্সের গায়ে তার ভিতর কী রেকর্ড আছে তা লেখা রয়েছে। পাঁচ নম্বর বাক্সে বেরোল অমিয়কান্তি রেকর্ড। তার মধ্যে একটি রণ্টুর দাদু নিয়ে নিলেন। তারপর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে ভালভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বাড়িমুখো রওনা দিলেন।

'কই, রণ্টু কোথায়?' বাড়ি এসে হাঁক দিলেন অমিয়কান্তি। রণ্টু তার পড়ার ঘরে পড়ছিল, সে দাদুর ডাক শুনে বেরিয়ে এল।

'এটা দ্যাখ—নামটা ভাল করে পড়ে দ্যাখ।'

রণ্টু রেকর্ডটা হাতে নিয়ে লেবেলে নাম দেখে বলল, 'সত্যিই তো! তুমি তা হলে ইয়াং বয়সে গান গাইতে?'

'কীরকম গাইতুম সেটা শুনে দ্যাখ।'

সেই ঘরেই গ্রামোফোন ছিল, রণ্টু রেকর্ডটা চালিয়ে দিল। দরাজ সুরেলা গলায় গাওয়া শ্যামাসঙ্গীতে ঘরটা ভরে গেল। রণ্টু অবাক হয়ে দাদুর দিকে চাইল। দাদুর ঠোঁটের কোণে হাসি।

'কী? বিশ্বাস হল?'

রণ্টুর অবাক ভাবটা যায়নি; তবু সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। তারপর বাবা-মাকে খবরটা দিতে বাড়ির ভিতরে ছুটে গেল।

পরদিন বিকেলে অমিয়কান্তি বাগবাজারে গেলেন রেকর্ডটা ফেরত দিতে। ভট্‌চায মশাই রেকর্ডটা হাতে নিয়ে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন।

'আপনি পেনেটি ছাড়লেন কবে?'

'পেনেটি? সেখানে তো আমি কোনওদিন ছিলাম না।'

'তা হলে এই রেকর্ডের অমিয়কান্তি আপনি নন। ইনি পেনেটির এক জমিদার বাড়ির ছেলে। শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে খুব নাম করেছিলেন।'

রণ্টুর দাদুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

বাড়ি ফিরে এসে রণ্টুকে তিনি ব্যাপারটা বলেই ফেললেন।

'কাল যে রেকর্ডটা শুনলি, সেটা আমার গাওয়া নয়; আমারই নামের আরেকজন গাইয়ের।'

রণ্টু খুব বেশি অবাক হল না। বলল, 'আমি জানতাম তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ। তুমি এককালে গান গাইলে এখনও মাঝে মাঝে গুনগুন করতে।'

ঘটনাটা আর এগোলো না। রণ্টুর দাদু দুঃখটা কোনওরকমে সামলে নিলেন।

এর পর দু'মাস কেটে গেছে। অমিয়কান্তির অতীতের টুকরো টুকরো স্মৃতি ফিরে আসে যখন তিনি রাত্রে বিছানায় শোন। আজও তাই হল। সবে তন্দ্রার ভাব আসছে, এমন সময় বায়স্কোপের ছবির মতো একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। বিকেলের পড়ন্ত রোদে হেদোর ধারে দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধু মোহিতলালের সঙ্গে কথা হচ্ছে। মোহিত বলছে, 'সেনোলাও রাজি হল না।'

'তা হলে আর কোন কোম্পানি বাকি রইল? হিজ মাস্টারস ভয়েস, টুইন, কোলাম্বিয়া, ওডিয়ন—সবাই-এর সঙ্গেই তো তুই কথা বলেছিস?'

'হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম তোকে যে, ওস্তাদি গানের বাজার ভাল না। আর বাঙালি হিন্দু ওস্তাদকে কেউ পাত্তা দেয় না। তুই মুসলমান হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যেত। আর তা ছাড়া আরেকটা ব্যাপার আছে।'

'কী?'

'তোর নামে আরেক গাইয়ের রেকর্ড বাজারে বেরিয়েছে। সে শ্যামাসঙ্গীত গায়। ভাল বিক্রি। এক নামে দু'জন গাইয়ে একসঙ্গে বাজারে চালানো খুব মুশকিল।'

'বুঝেছি।'

অমিয়কান্তি বাধ্য হয়ে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর আর গান রেকর্ড করা হয়নি।

এই স্মৃতির কথাটা কি তিনি রণ্টুকে বলবেন?

অনেকে ভেবে অমিয়কান্তি নাতিকে কিছু না বলাই স্থির করলেন। সে হয়তো বিশ্বাসই করত না। আসল কথা হল এই যে, তিনি এককালে ওস্তাদি গান গাইতেন—তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক।

অর্থাৎ আজ যে রণ্টু গাইতে পারে তার একটা কারণ হল তার দাদু। এটা ভেবেই অমিয়কান্তির বুকটা খুশিতে ভরে উঠল।

শুকতারা, শারদীয়া ১৩৯৬

সহযাত্রী

ত্রিদিববাবুর সাধারণত একটা হালকা বই পড়েই সময়টা কেটে যায়। কলকাতা থেকে দিল্লি ট্রেনে যাওয়া। কাজের জন্যই যেতে হয় দু মাসে অন্তত একবার। একটা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিনি, হেড আপিস দিল্লিতে। প্লেনটা একদম পছন্দ করেন না ত্রিদিববাবু, অতীতে একবার ল্যান্ডিং-এর সময় কানে তালা লেগে গিয়েছিল, সেই তালা ছাড়াতে তাঁকে ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয়েছিল। সেই থেকে তিনি ট্রেনেই যাতায়াত করছেন। কলকাতায় তাঁর বাড়িতে খালি তাঁর স্ত্রী আছেন। একটিমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে গত মাসে, ছেলে আমেরিকায় বায়ো কেমিস্ট্রি পড়ছে। আপিস আর বাড়ি, এই দুটোর মধ্যেই ত্রিদিববাবুর গতিবিধি। অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে বিশেষ কেউ নেই, তবে কাছেই রডন স্ট্রিটের চৌধুরীরা স্বামীস্ত্রীতে মাঝে মাঝে আসেন গল্পগুজব করতে, ত্রিদিববাবুরাও তাঁদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যান।

হাতের বইটা বন্ধ করে রেখে দিলেন ত্রিদিববাবু। একেবারে অপাঠ্য। এবারে হয়তো ঘুমিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিতে হবে। ঘরে আরও তিনটি বার্থে তিনজন লোক, তার মধ্যে তাঁর পাশের লোয়ার বার্থের ভদ্রলোকটি ছাড়া অন্য দুজনেই অবাঙালি। বইটা রেখে ত্রিদিববাবু তাঁর পাশের বার্থের দিকেই চেয়ে ছিলেন; তার ফলে বাঙালি ভদ্রলোকটির সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল। মোটামুটি তাঁরই বয়সী হবেন,

মাঝারি রঙ, চুলে এর মধ্যেই অল্প পাক ধরেছে। ভদ্রলোক বোধহয় আলাপের জন্য উৎসুক হয়েছিলেন, কারণ দৃষ্টি বিনিময় হতেই তিনি একটা প্রশ্ন করে বসলেন।

'আপনি দিল্লিতে থাকবেন ক'দিন?'

ত্রিদিববাবুর কথা বলতে আপত্তি নেই, কারণ সত্যি বলতে কী তাঁর এখন আর কিছু করার নেই। বললেন, 'দুদিন। বুধবার ফিরে আসব।'

'আমারও ঠিক একই ব্যাপার। আপনি কোনও মিটিং অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমিও একই ব্যাপারে। আমার হল বিজ্ঞাপনের কারবার। দিল্লিতে হেড আপিস। আমাদের আপিসের নাম শুনে থাকতে পারেন। এভারেস্ট অ্যাডভারটাইজিং।'

'হ্যাঁ। শুনেছি। আমার এক শালা এক সময় ওখানে চাকরি করত।'

'আই সি। কী নাম বলুন তো?'

'অমরেশ চ্যাটার্জি।'

'বাঃ— তাকে তো খুব চিনতুম। সে দিব্যি ছিল—বেশ করিৎকর্মা ছেলে। বেটার অফার পেয়ে চলে গেল। ইয়ে, আমার নামটা আপনাকে বলা হয়নি। সঞ্জয় লাহিড়ী।'

'ও। আমার নাম ত্রিদিব ব্যানার্জি।'

'আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছিল।'

'তা হতে পারে।'

'আপনি কি গান বাজনা শুনতে যান?'

'তা ওস্তাদি গান বাজনা, মাঝে মাঝে যাই।'

'গতমাসে কলামন্দিরে গেস্‌লেন কি—আমজাদ খাঁর সরোদ শুনতে?'

'হ্যাঁ, তা গিয়েছিলাম বটে। আপনিও গিয়েছিলেন বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওখানেই দেখেছি। খাসা বাজিয়েছিল সেদিন।'

'হ্যাঁ। আমজাদ তো আজকাল ভালই বাজাচ্ছে।'

'এখন ডিভিওর দৌলতে তো সিনেমা যাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে, গান বাজনা শুনতেই যাই মাঝে মাঝে।'

'তা ছাড়া সিনেমা গেলেও, হাউসের যা দুর্দশা, মাটিতে ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভ্যাপসা গরম...'

'যা বলেছেন। অথচ ইয়াং বয়সের লাইটহাউস, মেট্রোর কথা ভেবে দেখুন।'

'ওসব দিন চলে গেছে।'

'মনে আছে কলেজ থেকে মাঝে মাঝে চলে আসতুম চৌরঙ্গি। মেট্রোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম। ঠাণ্ডায় প্রাণটা জুড়িয়ে যেত।'

'আমারও ওই হ্যাবিট ছিল।'

'ঠাণ্ডা বলতে মনে পড়ল—দার্জিলিং আর সে দার্জিলিং নেই।'

'জানি। সেই জন্যে তো এবার আমরা মানালি গেলাম। আগে তিন বছরে অন্তত দুবার করে দার্জিলিং যেতাম।'

'আমরাও। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো দৃশ্য তো আর কোথাও নেই। ওই একটা জিনিস পুরনো হবার নয়।'

'আর আধুনিক সভ্যতাও ওর কোনও পরিবর্তন করতে পারবে না।'

মোগলসরাইতে দুজন ভাঁড়ে চা খেলেন। কথা আরও চলল। ত্রিদিববাবুর বেশ লাগছিল সঞ্জয়বাবুকে। তা ছাড়া কিছু কিছু মিলও বেরিয়ে যাচ্ছিল দুজনের মধ্যে, তাতে আলাপটা জমতে সুবিধে হচ্ছিল। সন্ধের দিকে সঞ্জয়বাবু বললেন, 'একটা আসল প্রশ্নই করা হয়নি। আপনি থাকেন কোথায়?'

'লী রোড।'

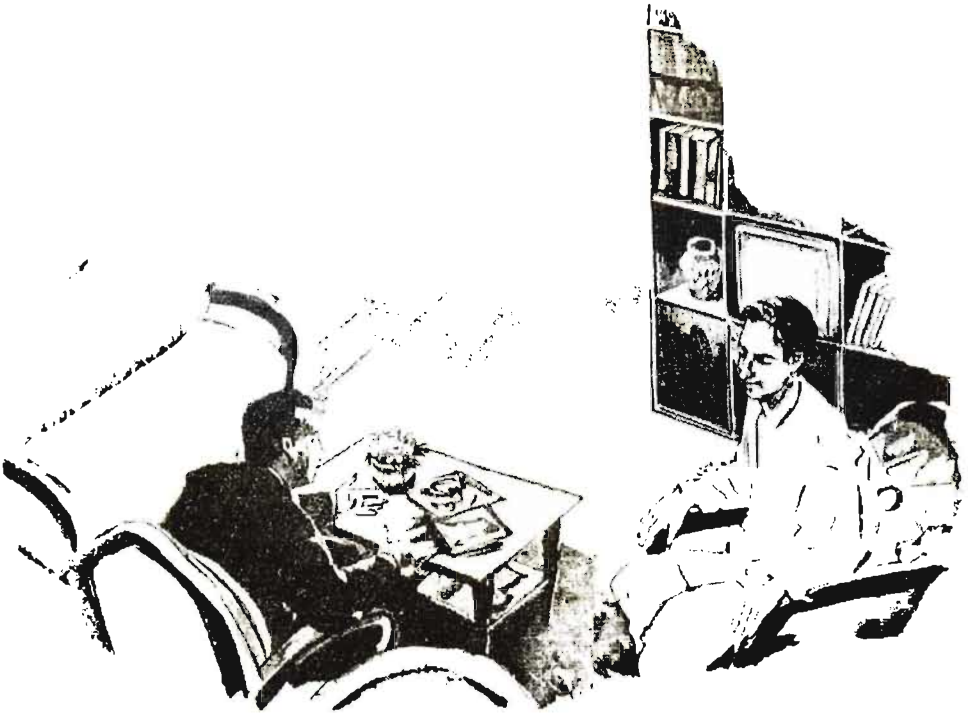

'কত নম্বর লী রোড? তিন নম্বরে আমার এক পাঞ্জাবি বন্ধু থাকে।'

'আমার বাড়ির নম্বর সেভেন বাই ওয়ান।'

'দাঁড়ান, আমি ডায়রিতে নোট করে নিচ্ছি। কলকাতায় ফিরে গিয়েও আলাপটা চালু রাখবার ইচ্ছে হতে পারে।'

'তা তো বটেই।'

দিল্লিতে এসে অবশ্য দুজনে যে যার পথ ধরলেন। দুজনেই হোটেলে থাকবেন, তবে দুই হোটেলে দুস্তর ব্যবধান। সঞ্জয়বাবু একটা ট্যাক্সিতে চাপবার আগে হাত নেড়ে বলে গেলেন, 'আশাকরি কলকাতায় গিয়েও দেখা হবে।'

দিল্লির মিটিং সেরে কলকাতায় ফিরে এসে ত্রিদিববাবু তাঁর কাজের বাঁধা ছকের মধ্যে পড়ে গেলেন। স্ত্রী শিপ্রাকে একবার সঞ্জয়বাবুর কথা উল্লেখ করেছিলেন। 'এইসব আলাপগুলো ভারী মজার', বলেছিলেন ত্রিদিববাবু, 'ওই একটি দিনের জন্য ব্যস্‌। কিন্তু ওই একদিনেই কত কথা, কত আলোচনা। তারপর যে যার নিজের জগতে চলে যাও। দ্বিতীয়বার আর দেখা হয় না।'

ত্রিদিববাবু কিন্তু কথাটা ঠিক বলেননি, কারণ কলকাতায় ফেরার তিন সপ্তাহের মধ্যেই সঞ্জয়বাবু এক রবিবারের সন্ধ্যায় এসে হাজির, হাতে বাক্সে মিষ্টি।

'দেখলেন তো, আলাপটাকে গেঁজে যেতে দিলুম না। ভাল আছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—আসুন বসুন।' টিভিতে একটা ভাল প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু ত্রিদিববাবুর তাতে আক্ষেপ নেই, কারণ সঞ্জয় লাহিড়ীর আসাটা তিনি পছন্দই করলেন। ত্রিদিববাবু বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন সঞ্জয়বাবুকে।

'আজ থেকে তুমিতে চলে গেলে হত না?' বললেন সঞ্জয় লাহিড়ী।

'তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই।'

'ভেরি গুড। বেশ বাড়ি তোমার। কদিন আছ এখানে?'

'বছর সাতেক হল। তুমি থাকো কোথায়?'

'এখান থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়। মিডলটন রো—পঁচিশ নম্বর।'

'আই সি।'

'আসছে শনিবার যাচ্ছ কি?'

'রবীন্দ্রসদনে?' ত্রিদিববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ। ভীমসেন যোশীর গান আর চৌরাসিয়ার বাঁশি।'

'ইচ্ছে তো আছে যাবার। উদ্যোক্তারা দুখানা টিকিটও পাঠিয়েছেন।'

'চলো, আর তারপর চলো ক্যালকাটা ক্লাবে খাওয়া যাক—আমরা চারজনে।'

'আমি তো মেম্বার নই,' বললেন ত্রিদিববাবু।

'তাতে কী হয়েছে? তোমরা যাবে আমার গেস্ট হয়ে।'

'তা বেশ তো। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'তুমি এখনও মেম্বার হওনি কেন? এই বেলা হয়ে পড়ো—দেখবে হয়তো অনেক পুরনো বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়ে যাবে।'

'তা তো হতেই পারে।'

'আমার তো তাই হল। তিন-তিনজন স্কুলের বন্ধু। ত্রিশ বছর পর দেখা। আমরা হচ্ছি নাইনটিন সিক্সটির ব্যাচ। মিত্র ইনস্টিটিউশন। সেই সব পুরনো দিনের পুরনো শিক্ষকদের কথা হচ্ছিল।'

আরও মিনিট পনেরো থেকে কলকাতার ট্র্যাফিক জ্যাম, লোডশেডিং ইত্যাদি নিয়ে কথা বলে ত্রিদিববাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে চা খেয়ে সঞ্জয়বাবু উঠে পড়লেন।

'আমার আবার ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তোমার বাড়ি পথে পড়ল, তাই একবার না এসে পারলুম না। এবার কিন্তু ভাই তোমার আসার পালা—পঁচিশ নম্বর মিডলটন রো। না এলে আমি আর আসছি না।'

'নিশ্চয়ই যাব।'

'আসি তা হলে—'

'গুড নাইট।'

ত্রিদিববাবু দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বসবার ঘরে ফিরে এলেন। আশ্চর্য! তাঁর এখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। তিনিও যে ওই একই স্কুলের একই ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। সঞ্জয় ওরফে ফটিক লাহিড়ী ছিল ক্লাসের পয়লা নম্বর বিচ্ছু, আর ত্রিদিব ব্যানার্জির পরম শত্রু, কারণ ত্রিদিব ওরফে দিবু ছিলেন ভাল ছেলের দলে। কী অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে ফটিকের। এর সঙ্গে কি বন্ধুত্ব করা যায়? বেশ কিছুক্ষণ ভেবে ত্রিদিববাবু স্থির করলেন যে সঞ্জয় আজ আর সেই সঞ্জয় নেই, একেবারে সভ্যভব্য নতুন মানুষ হয়ে গেছে। আর তাকে যখন ত্রিদিববাবুর ভালই লেগেছে, তখন বন্ধুত্বতে কোনও আপত্তি নেই। তবে এটা ঠিক যে ত্রিদিব কখনও বলবেন না যে তিনি সঞ্জয়ের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন। সেই অতীতকে চাপা রাখাই ভাল, আজ যেটা সত্যি সেটাকেই মানতে হবে।

ত্রিদিববাবু টিভিটা চালু করে দিলেন।

আনন্দমেলা, পূজাবার্ষিকী ১৪০২ রচনাকাল: ১২ জুন, ১৯৮৯

---

*'সন্দেশ' পত্রিকায় 'নতুন বন্ধু' নামে বাবার একটি গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালের জানুয়ারিতে। আর তার ঠিক দেড় বছর পরের এক খসড়া খাতা থেকে বেরোল 'সহযাত্রী'। একই চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে এই দ্বিতীয় গল্পটি লেখার কারণ যে কী হতে পারে, তা আজ অনুমান করা কঠিন। হয়তো লেখার সময় প্রথমটির কথা উনি ভুলে গিয়েছিলেন, এবং 'ফেয়ার' করতে গিয়ে হঠাৎই মনে পড়ে যায়। সেইজন্যই বোধহয় 'সহযাত্রী' অপ্রকাশিত থেকে গেছে।

সন্দীপ রায়

২৭.৭.৯৫

ব্রজবুড়ো

শঙ্কর চৌধুরী আধখানা হাতের রুটি ছিঁড়ে ডালে চুবিয়ে মুখে পুরে একবার পাশে বসা ছেলের দিকে চেয়ে নিলেন। তারপর চিবোতে চিবোতে বললেন, 'তোকে একটা কথা বলব-বলব করেও বলা হয়নি। আমাদের ডাইনে একটা বাড়ির পরে একটা দোতলা বাড়িতে এক বুড়ো থাকে দেখেছিস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ', বলল সুবু। 'রোজ ইস্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি। একতলার বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে থাকেন। আমার দিকে চেয়ে হাসেন।'

'হাসিটা কি বেশ খোশ মেজাজের হাসি?'

সুবু একটু ভেবে বলল, 'একটু দুষ্টু দুষ্টুও হতে পারে।'

'ওই বুড়ো সম্বন্ধে এখানে এসে অবধি অনেক কথা শুনছি', বললেন শঙ্করবাবু। 'উনি নাকি তন্ত্রটন্ত্র জানেন; তুকতাক করে যাদের পছন্দ নয় তাদের অনিষ্ট করতে পারেন। মোট কথা, উনি ডাকলেও ওঁর কাছে যাস-টাস না।'

সুবুর ভাল নাম সুবীর। বয়স বারো। তিন মাস হল সুবীরেরা কলকাতা থেকে এই শহরে এসেছে। এখানকারই এক কলেজে শঙ্কর চৌধুরী ইংরিজির প্রোফেসরের চাকরি পেয়েছেন। সুবীর কলকাতার স্কুল ছেড়ে এখানে সেন্ট টমাসে ভর্তি হয়েছে। সবাই বলে এই জায়গাটা স্বাস্থ্যকর। শীতকালে যে বেশ শীত পড়ে সেটা এই নভেম্বরের গোড়াতেই সকাল-সন্ধ্যায় টের পাওয়া যাচ্ছে। সুবীরের মা-র জায়গাটা খুব পছন্দ। বলেন, 'এখানকার বাতাসই আলাদা। প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়া যায়।'

এই ক'মাসেই ইস্কুলে সুবীরের দু-একজন বন্ধু হয়েছে; তার মধ্যে দিব্যেন্দুকেই ওর সবচেয়ে ভাল লাগে। সুবু-দিবু ক্লাসে পাশাপাশি বসে, দুজনেই পড়াশুনায় ভাল, খেলাধুলোয় দু'জনেরই খুব উৎসাহ।

দিবু একদিন কথায় কথায় সুবীরকে বলল, 'ব্রজবুড়ো তো তোদের একটা বাড়ি পরেই থাকে।'

'ব্রজবুড়ো?' সুবীর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'সে আবার কে?'

'দেখিসনি? মাথায় টাক, ফরসা রঙ, দাড়ি, গোঁফ কামানো—গলাবন্ধ কোট আর ধুতি পরে বারান্দায় বসে থাকে?'

সুবীর বলল, 'ওঁকে বুঝি লোকে ব্রজবুড়ো বলে? ওঁকে তো রোজ দেখি।'

'সাবধান!' বলল দিব্যেন্দু। 'ওকে চটাসনি। ও হাসলে তুইও হাসিস।'

'তা তো হাসিই।'

'তা হলে ঠিক আছে। ও যদি তোর ওপর খেপে যায়, তা হলে ওর বাড়িতে বসেই স্রেফ মন্ত্র পড়ে তোর সর্বনাশ করে ছাড়বে।'

'বাবাও আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন,' বলল সুবীর।

'একদিন পঞ্চাকে ডেকে একটা ঘুড়ি দিয়েছিল। কোথায় পেল কে জানে! খুব রহস্যজনক ব্যাপার।'

'ওঁর পুরো নাম কী?'

'তা জানি না।'

এর কিছুদিন পরে সুবীরদের প্রতিবেশী অনুকূল সাহা সন্ধ্যায় এলেন সুবীরের বাবার সঙ্গে আলাপ করতে। আগে আসেননি কখনও—এই প্রথম। বয়সে সুবীরের বাবার চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড়। বসবার ঘরে সোফার একপাশে বসে বললেন, 'ডিসটার্ব করলুম না তো?'

'না না,' বললেন শঙ্করবাবু। 'আমিই ভাবছিলাম একদিন আপনার ওখানে ঢুঁ মারব। আপনি অ্যালাহাবাদ ব্যাঙ্কে আছেন না?'

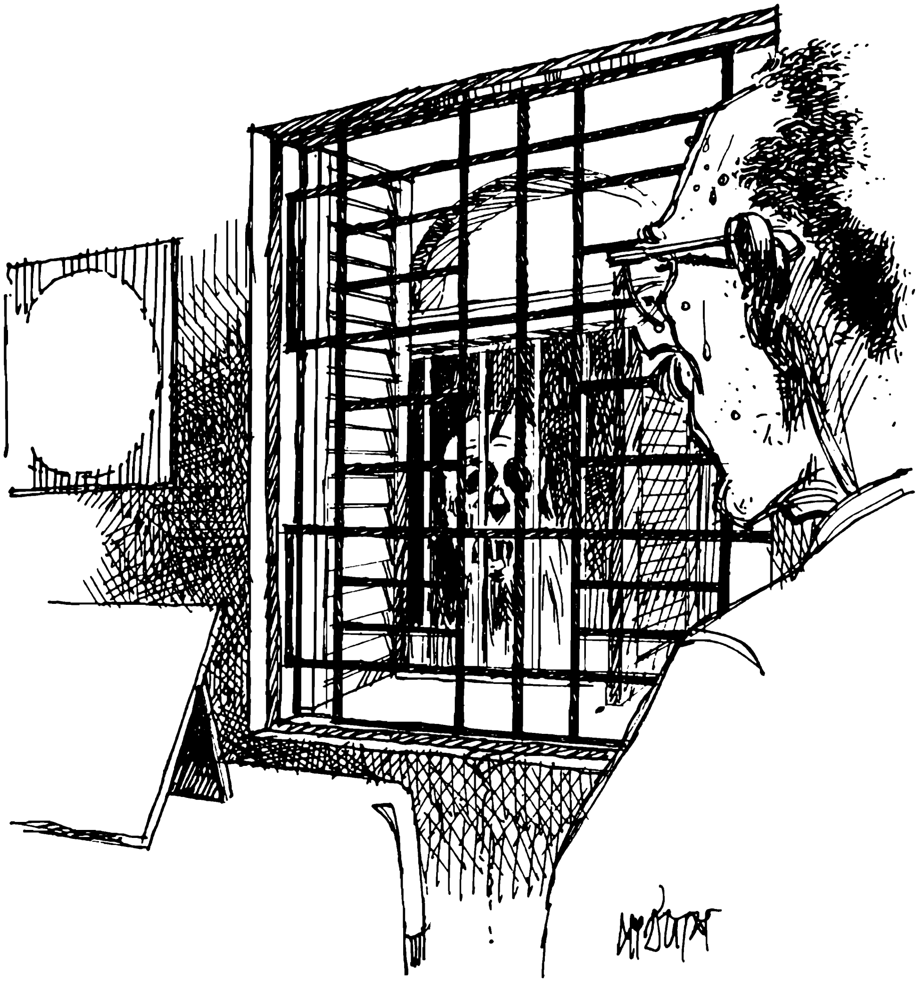

'আজ্ঞে হ্যাঁ।—আমি সংসার করিনি। এখানে আমার বাড়িতে আমি একা। কলকাতায় এক ভাই আছে, লোহালক্কড়ের ব্যবসা করে। আপিস থেকে ফিরে পাড়ার কারুর না কারুর বাড়িতে গিয়ে গল্পসল্প করি। অবিশ্যি একজন বাদে।'

'কে?'

'ব্রজকিশোর বাঁড়ুজ্যে। নাম শুনেছেন?'

'যাকে ব্রজবুড়ো বলে? আমাদের বাড়ির একটা বাড়ি পরে থাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ভদ্রলোকের তো অনেক গোলমাল শুনেছি।'

'বিস্তর। বুড়ো এখানে আসে বছর পনেরো আগে। আমি তখনও আসিনি, কিন্তু বুড়োর দক্ষিণের লাগোয়া বাড়ির নরেশ মল্লিক ছিলেন। তিনি ত্রিশ বছর হল এখানে আছেন—সদানন্দ রোডে গয়নার দোকান আছে। তিনি বলেন সুটকেস হোল্ডল ছাড়াও বুড়োর সঙ্গে নাকি একটা সবুজ রঙের বাক্স ছিল, সে এক আলিসান ব্যাপার। সঙ্গে একজন লোকও ছিল, সে পরের দিন চলে যায়। ওই সবুজ বাক্সের কথা এখন শহরের সকলেই জানে। আমাদের তো বিশ্বাস, ওতেই বুড়োর তন্ত্রমন্ত্রের সব সরঞ্জাম

রয়েছে। উনি আসার আগে নাকি বাড়িটা খালিই পড়ে থাকত।'

'তন্ত্রের ব্যাপারটা কি সত্যি বলে মনে হয়?'

'আমি বলতে পারব না, তবে নরেশবাবুর কাছেই শুনেছি, বুড়োর দোতলার ঘর থেকে মাঝরাত্তিরে নানারকম সব শব্দ শুনেছেন। করতালের আওয়াজ, ডুগি পেটানোর আওয়াজ, বিড়বিড় করে বলা সব মন্ত্র, মাঝে মাঝে হাসির শব্দ। ...এটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কারণ বলছি—বুড়োর উত্তরের বাড়িতে যিনি থাকেন—ভদ্রলোকের নাম বোধহয় জানেন?'

'বাড়ির দরজায় কাঠের ফলকে দেখেছি—এন. কে. মজুমদার।'

'হ্যাঁ। নিশিকান্ত মজুমদার। ইনসিওরেন্স আপিসে চাকরি করেন। ইনিও মাঝরাত্তিরে ওইসব শোনেন—এমনকী একদিন জানলায় একটা বীভৎস মুখ দেখেন। মজুমদার মশাই সোজা গিয়ে বুড়োকে বলেন যে এইভাবে প্রতিবেশীর শান্তিভঙ্গ করলে তিনি পুলিশে খবর দেবেন। এটা বিকেলবেলা। বুড়ো তখন বারান্দায় বসে।'

'শাসানোর ফল কী হল?'

'সেই তো বলছি। গোলমাল তো বন্ধ হলই না, মাঝখান থেকে নিশিকান্তবাবু ব্যারাম বাধিয়ে বসলেন। হাই ফিভার—১০৬ ডিগ্রি অবধি উঠেছিল। ডাক্তার বললেন ভাইরাস ইনফেকশন। সাতদিনে জ্বর ছাড়ল। নিশিকান্তবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস, বুড়ো তুক করেছিলেন। নীলোৎপলবাবুর একটি ছেলে আছে, বছর পনেরো বয়স, নাম রতন। আমাদের বাড়ির কাছেই কাগমারার মোড়টাতে থাকে। বুড়ো নাকি তার সঙ্গে ভাব করার জন্য খুবই ব্যগ্র। হাসিমুখ করে হাতছানি দিয়ে ডাকে। রতন ওর ব্যাপার জানে, তাই কোনও আমল দেয় না।'

সুবীরকে তার বাবা বারণ করেছেন, কিন্তু দিব্যেন্দুকে কেউ বারণ করেনি। দিব্যেন্দুর বাবা এইসব তন্ত্রমন্ত্র তুকতাক বিশ্বাস করেন না। বলেন, 'একটা নিরীহ বুড়োকে উদ্দেশ করে মিথ্যে গালমন্দ করা হচ্ছে। ওঁকে দেখলেই বোঝা যায় ওঁর মধ্যে কোনও গণ্ডগোল নেই।'

দিব্যেন্দু যদিও সুবুকে বুড়ো সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল, কিন্তু বাপের কাছ থেকে সে যে একটা বেপরোয়া ভাব পেয়েছে সেটা যাবে কোথায়? সে একদিন সুবুকে বলল, 'আজ তোর সঙ্গে ফিরব। তোর বাড়িও যাওয়া হবে, আর বুড়ো কী করে তাও দেখা যাবে।'

সুবু ভুরু কুঁচকে বলল, 'কিন্তু তুই নিজেই তো সেদিন বললি বুড়োর কাছ থেকে দূরে থাকতে।'

'তা বলেছিলাম,' বলল দিবু, 'কিন্তু বাবা বলেন বুড়োর মধ্যে কোনও দোষ নেই। তাই একবার গিয়ে দেখি না কী হয়। এও একরকম অ্যাডভেঞ্চার তো।'

সুবু তার বাবার নিষেধ উড়িয়ে দিতে পারে না; সে বলল, 'কাছে যেতে পারি, এমনকী কথাও বলতে পারি, কিন্তু ওঁর বাড়ির ভেতরে ডাকলে যাব না।'

'ঠিক আছে। তাই হবে।'

ইস্কুল থেকে ফেরার পথে ব্রজবুড়োর বাড়ি দেখা যেতেই সুবুর বুকের ভিতর একটা ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সে যে ভয় পেয়েছে সেটা তো দিবুকে কিছুতেই জানতে দেওয়া চলে না, তাই সে মনে সাহস এনে এগিয়ে চলল দিবুর সঙ্গে।

হ্যাঁ—কোনও সন্দেহ নেই। রোজকার মতো আজও বুড়ো বসে আছে বারান্দায়।

সুবু-দিবু এগিয়ে আসতে ঠিক অন্যদিনের মতোই ব্রজবুড়ো হাসি মুখে তাদের দিকে চাইলেন। আজ সুবু বুড়োর হাসির মধ্যে সত্যিই একটা শয়তানি ভাব লক্ষ করল।

'হাসছেন কেন? কিছু বলবেন?' দিবু বুড়োর সামনে থেমে পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, বলব,' বললেন ব্রজবুড়ো। 'আমি ডাকলে আসো না কেন?'

দিবু বলল, 'আমাকে কোনওদিন ডাকেননি। আর ডাকলেই বা যাব কেন? ওরকম যার-তার ডাকে আমি যাই না।'

সুবু মনে মনে ভাবল—বাপ্‌রে, দিবুর কী সাহস।

আবার দিবুই কথা বলল।

‘আপনার সবুজ বাক্সে কী আছে?’

‘কেন বলব?’ বুড়ো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মিচকে হেসে বলল। ‘আমার সঙ্গে আমার বাড়ির দোতলায় গেলেই জানতে পারবে।’

বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে দেখে সুবু এক নিশ্বাসে বলে দিল, ‘আরেকদিন যাব। আজ বাড়িতে কাজ আছে।’

দু’জনে চলে এল পিছন দিকে না তাকিয়ে।

দিবু সুবুর বাড়িতেই বিকেলের খাওয়া সারল। খেতে-খেতেই সুবুর বাবা কলেজ থেকে এসে গেলেন। সুবু কোনও কিছু না লুকিয়ে ব্রজবুড়োর সঙ্গে যা হয়েছে পুরো ব্যাপারটা বাবাকে বলে দিল।

শঙ্করবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, ‘একবার করেছ এ জিনিস—আর কোরো না। দিব্যেন্দু,

তোমাকেও বলছি, এসব ব্যাপারে সাহস দেখানো কোনও কাজের কথা নয়। বুড়োর মধ্যে অনেক গোলমাল। ওঁর প্রতিবেশীদের কথা অবিশ্বাস করা যায় না। কালই নিশিকান্তবাবু আমার বাড়ি এসেছিলেন। ব্রজ ব্যানার্জির ঘর থেকে মাঝরাত্তিরে নাকি পিস্তলের আওয়াজ পেয়ে বুড়োর বাড়িতে গিয়ে দরজা ধাক্কা দেন। কেউ দরজা খোলে না।'

এর সপ্তাহখানেক পরে এক রবিবার সকালে সুবুদের বাড়ির সামনের দরজায় টোকা পড়ল। সুবুর বাবা খবরের কাগজ পড়ছিলেন, ছেলেকে বললেন, 'দ্যাখ তো কে এল।'

সুবু দরজা খুলে দেখে খয়েরি সুট পরা একজন বেশ ভাল দেখতে ভদ্রলোক, বয়স ত্রিশের খুব বেশি না। তাঁর পিছনে রাস্তায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে—এটাও সুবুর চোখে পড়েছে।

'ব্রজকিশোর ব্যানার্জির বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?'

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন সুবুর বাবাকে। 'চুয়াত্তর নম্বর সেটা জানি, কিন্তু এখানে তো দেখছি কোনও বাড়িতেই নম্বর লেখা নেই।'

শঙ্করবাবু দাঁড়িয়ে উঠে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এইদিকে আমার বাড়ির পরের বাড়িটা।'

'থ্যাঙ্কস।'

ভদ্রলোক যাবার জন্য ঘুরেছিলেন, কিন্তু শঙ্করবাবুর একটা প্রশ্নে থেমে গেলেন।

'আপনি কি ওঁর আত্মীয়?'

'হ্যাঁ। আমি ওঁর ভাইপো। ছোট ভাইয়ের ছেলে। আসি।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। শঙ্করবাবু আবার সোফায় বসে বললেন, 'হাইলি ইন্টারেস্টিং। আমার ধারণা ছিল ব্রজবুড়োর তিন কুলে কেউ নেই।'

বিকেলে সুবুরা চা খাচ্ছে, এমন সময় দরজায় আবার টোকা পড়ল। সুবু খুলে দেখে আবার সেই সকালের ভদ্রলোক।

'একটু আসতে পারি কি?'

শঙ্করবাবুও উঠে এসেছেন, বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আসুন আসুন।'

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন।

'বসুন। চা খাবেন?'

'নো, থ্যাঙ্কস। এইমাত্র খেয়ে আসছি।'

'ব্রজবাবুকে কেমন দেখলেন?'

'সেইটে নিয়েই একটু কথা বলতে এলাম,' বললেন ভদ্রলোক। 'আগে আমার পরিচয়টা দিই। আমার নাম অমিতাভ ব্যানার্জি। আমার পেশা হচ্ছে মনের ব্যারামের চিকিৎসা করা। সাইকায়াট্রি। কলেজে পড়ার সময় থেকেই শখটা হয়েছিল; বাবা রাজি হয়ে গেলেন। আমি বিলেত গিয়ে পাশ করে ওখানে তিন বছর প্র্যাকটিস করছিলাম—কিছুদিন হল কলকাতায় এসেছি। বাবার কাছ থেকেই জ্যাঠার কথাটা শুনেছিলাম। বাবা লখ্‌নৌয়ে ওকালতি করতেন, আমার জন্ম, পড়াশুনা সবই ওখানে। আমি ব্রজ জ্যাঠাকে কোনওদিন দেখিনি। যখন কলকাতায় গিয়েছি, ততদিনে ব্রজ জ্যাঠা আপনাদের এখানে চলে এসেছেন। এটা শুনেছিলাম যে কলকাতায় থাকতে জ্যাঠা চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকতেন, কারুর সঙ্গে মিশতেন না। ডাক্তার দেখে বলেছিলেন শরীরে কোনও ব্যারাম নেই।'

'যে বাড়িতে রয়েছেন, সেটা কার?'

'ওটা আমার ঠাকুরদা তৈরি করেছিলেন। উনি ব্যবসা করতেন, অনেক পয়সা করেছিলেন। মারা যাবার আগে তিন ছেলেকে উইল করে টাকা সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে যান। কাজেই ব্রজ জ্যাঠার টাকার অভাব নেই।'

'উনি কি তন্ত্র-টন্ত্র চর্চা করেছেন নাকি?'

'কী যে করেছেন তা কেউ সঠিক বলতে পারবে না। আমরা থাকতাম লখ্‌নৌয়ে, মেজো জ্যাঠার কাজ ছিল ব্যাঙ্গালোরে। ব্রজ জ্যাঠা কলকাতাতেই থাকতেন, তবে গোটা তিনেক চাকর ছাড়া দেখবার আর কেউ ছিল না। তন্ত্রের ব্যাপার জানি না, তবে ওঁর যে মানসিক ব্যারাম রয়েছে তাতে অন্তত আমার

কোনও সন্দেহ নেই। কথা হচ্ছে—কী ব্যারাম?'

'সেটা এখনও ধরতে পারেননি?'

'ধরব কী করে? আমার সঙ্গে তো কথাই বলছেন না।...তবে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'কী?'

'ওঁর চাকর বলছিল উনি নাকি ছোটদের উপর কখনও রাগ করেন না। তাই ভাবছিলাম, যদি আপনার ছেলেকে একবার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি, তা হলে হয়তো উনি মুখ খুলতে পারেন।'

সুবু বলল, 'ওঁর একটা সবুজ বাক্স আছে কি?'

অমিতাভবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, 'বাক্স মানে কী—সে তো এক বিশাল ট্রাঙ্ক। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওতে কী আছে। উনি কোনও জবাবই দিলেন না।'

শঙ্করবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। আমার ছেলে যাবে; কিন্তু তার সঙ্গে তার বাবাও যাবে।'

'নিশ্চয়ই। সে তো খুব ভাল কথা। আমি খানিকটা জোর পাব।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনজনে বেরিয়ে পড়ল। ব্রজবুড়োর বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিতেই একটা বুড়ো চাকর এসে দরজা খুলে দিল। 'বাবু কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন অমিতাভবাবু।

'দোতলায় শোবার ঘরে', বলল চাকর।

'আজ বাইরে বসবেন না?'

'আজ্ঞে, আপনি আসার পর থেকেই উনি কেমন যেন হয়ে গেছেন। আজ বিকেলে চাও খেলেন না।'

'ঠিক আছে। আমরা ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করব। আসুন মিস্টার—'

'চৌধুরী।'

তিনজনে দোতলায় গিয়ে হাজির হল। ডান দিকে একটা দরজা, সেটাই ব্রজবুড়োর শোবার ঘর। ডাঃ ব্যানার্জির পিছন পিছন শঙ্করবাবু আর সুবুও ঘরে ঢুকল।

ব্রজবুড়ো বালিশে পিঠ দিয়ে খাটে আধশোয়া। সুবুকে দেখেই তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল।

'তোমার সঙ্গে আবার এঁরা কেন?' অভিমানের সুরে বললেন ব্রজবুড়ো।

সুবু বলল, 'আপনি সবুজ বাক্সটার কথা বলেছিলেন—সেটা দেখতে এলাম।'

প্রকাণ্ড সবুজ ট্রাঙ্কটা সুবু ঘরে ঢুকেই দেখেছিল। খাটের উলটোদিকে দেয়ালের সামনে রাখা হয়েছে। বোঝাই যায় আদ্যিকালের ট্রাঙ্ক।

'নিশ্চয়ই দেখাব', বললেন ব্রজবুড়ো। 'কিন্তু এখন না। এঁরা ঘর থেকে বেরোলে দেখাব।'

ডাঃ ব্যানার্জি শঙ্করবাবুকে বললেন, 'চলুন মিস্টার চৌধুরী—আমরা পাশের ঘরে যাই।'

দুজন বেরিয়ে যেতে বুড়োর মুখে আবার হাসি ফুটল। সুবুর বুকের ভিতর আবার ধুকপুকুনি।

ব্রজবুড়ো খাট থেকে নেমে ট্যাঁক থেকে একটা চাবি বার করে ট্রাঙ্কটা খুলে ডালাটা উপরে তুলে দিলেন।

'দ্যাখো!'

এ কী! এ যে খেলনায় ভর্তি! রেলগাড়ি, বন্দুক, রাক্ষসের মুখোশ, বিল্ডিং ব্লক্স, মেকানো, লুডো, লটো, করতাল-বাজানো সং, খেলার ড্রাম, খেলার গ্রামোফোন, তা ছাড়া আরও কত খেলা যেসব সুবু কোনওদিন চোখেই দেখেনি—নাম শোনা তো দূরের কথা।

'এগুলো কার?' সুবু ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল। ব্রজবুড়ো দু'হাত মাথার উপর তুলে তুড়ি বাজিয়ে দুলিয়ে গান করছিলেন—'আমি রামখেল তিলক সিং, তাই নাচি তিড়িং তিড়িং'—এবার গান বন্ধ করে নিজের বুকে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'আমার!'

সুবু বুঝল এই খেলার বন্দুকের আওয়াজ শুনেই পাশের বাড়ির লোক ভেবেছে পিস্তল, ওই মুখোশ পরে বুড়ো জানলায় দাঁড়াতেই ভেবেছে রাক্ষস, আর এই সব খেলনার নানারকম আওয়াজ শুনেই ভেবেছে বুড়ো তুকতাক করছে।

সুবু বলল, 'বাবা আর ডাক্তারবাবুকে ডাকি?'

‘ওরা যদি আমার খেলনা নিয়ে নেয়?’ বুড়ো কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

‘মোটেই নেবে না। ওরা খুব ভাল লোক। আপনার কোনও অনিষ্ট করবে না।’

‘তবে ডাকো।’

দু’জনে এলেন। ট্রাঙ্কের ডালা এখনও খোলা।

অমিতাভ ব্যানার্জি ভিতরের জিনিসগুলো দেখে চাপা গলায় বললেন, ‘সব ব্রিটিশ আমলের বিলিতি খেলনা। ওঁর নিজের ছেলেবেলার জিনিস। এর জুড়ি আজকাল আর এদেশে পাওয়া যাবে না।’

তারপর ব্রজবুড়োর দিকে চেয়ে বললেন, ‘আপনি বসুন জ্যাঠা, বসুন। আমরা আপনার ভাল করতেই এসেছি।’

‘যে ভাল রয়েছে, তাকে আবার ভাল করবে কী?’ কড়া সুরে জিজ্ঞেস করলেন ব্রজ বুড়ো।

‘ঠিক বলেছেন,’ বললেন ডাঃ ব্যানার্জি। ‘আমি ভুল বলেছিলাম। আপনার কোনও চিন্তা নেই। আমি কালকেই চলে যাব।’

'যাবে বইকী, নিশ্চয়ই যাবে।'

অমিতাভ ব্যানার্জির সঙ্গে সুবু আর শঙ্করবাবু নীচে নেমে এলেন। 'এও একরকম মনের ব্যারাম, জানেন তো?' বললেন ডাঃ ব্যানার্জি। 'শরীরে বার্ধক্যের পুরো ছাপ, কিন্তু মন সেই বালক অবস্থার পরে আর বাড়েনি। বড়দের তাই সহ্য করতে পারেন না; নিজের বয়সের সাথী খোঁজেন। অথচ কোনও ছেলে ওঁর কাছে যাবে না। কী করুণ অবস্থা ভেবে দেখুন তো!'

'আপনি সত্যিই কাল চলে যাবেন?' শঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ। আমি গেলে উনি ভাল থাকবেন। তা ছাড়া এই ব্যারামের চিকিৎসা বলে তো কিছু নেই।'

শঙ্করবাবু ছেলের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'তুই মাঝে মাঝে ব্রজবুড়োকে সঙ্গ দিস। তোর বন্ধুদেরও বলিস।'

সুবুরা অমিতাভবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করল। দোতলার ঘর থেকে তখন করতালের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে—

'বাদুড় বলে ওরে ও ভাই শজারু
আজকে রাতে দেখবি একটা মজারু—
আজকে রাতে চামচিকে আর প্যাঁচারা...'

সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৯৯, রচনাকাল ১৬, ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৯

দুই বন্ধু

মহিম বাঁ হাতের কবজি ঘুরিয়ে হাতের ঘড়িটার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিল। বারোটা বাজতে সাত। কোয়ার্টজ ঘড়ি—সময় ভুল হবে না। সে কিছুক্ষণ থেকেই তার বুকের মধ্যে একটা স্পন্দন অনুভব করছে, যেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশ বছর! আজ হল ১৯৮৯-এর সাতই অক্টোবর। আর সেটা ছিল ১৯৬৯-এর সাতই অক্টোবর। পঁচিশ বছরে এক পুরুষ হয়। তার থেকে মাত্র পাঁচ বছর কম। কথা হচ্ছে—মহিম তো মনে রেখেছে, কিন্তু প্রতুলের মনে আছে কি? আর দশ মিনিটের মধ্যেই জানা যাবে।

মহিমের দৃষ্টি সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে। সে দাঁড়িয়েছে লাইটহাউস বুকিং কাউন্টারের সামনের জায়গাটায়। যাকে বলে লবি। এখানেই প্রতুলের আসার কথা। মহিমের সামনের দরজার কাঠের ভিতর দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ওপারে গলির মুখে একটা বইয়ের দোকানের সামনে জটলা। রাস্তায় চারটে বিভিন্ন রঙ-এর অ্যাম্বাসাডর দাঁড়ানো। আর একটা রিকশা। এবার দরজার ওপরে দৃষ্টি গেল মহিমের। হাতে আঁকা চালু হিন্দি ছবির বিজ্ঞাপন। তাতে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে যার জোরে ছবি হিট করেছে সেই চাড়া-দেওয়া গোঁফওয়ালা ভিলেন কিশোরীলালকে। মহিম অবিশ্যি হিন্দি ছবি দেখে না। আজকাল ভিডিও হওয়াতে সিনেমা দেখাটা একটা ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে গেছে। আর সিনেমা হাউসগুলোর যা অবস্থা! মহিম তার বাবার কাছে শুনেছে যে, এককালে লাইটহাউস ছিল কলকাতার গর্ব। আর আজ? ভাবলে কান্না পায়।

বুকিং কাউন্টারের সামনে লোকের রাস্তায় আসা যাওয়া দেখতে দেখতে মহিমের মন চলে গেল অতীতে।

তখন মহিমের বয়স পনেরো, আর প্রতুল তার চেয়ে এক বছরের বড়। সেই বিশেষ দিনটার কথা *মহিমের স্পষ্ট মনে আছে। ইস্কুলে টিফিন-টাইম। দুই বন্ধুতে ঘাটের একপাশে জামরুল গাছটার নীচে*

বসে আলুকাবলি খাচ্ছে। দু'জনের ছিল গলায় গলায় ভাব। আর দু'জনে ছিল তাদের ক্লাসে সবচেয়ে বড় দুই বন্ধু। কোনও মাস্টারকে তারা তোয়াক্কা করত না। এমনকী অঙ্কের মাস্টার করালিবাবু—যাঁর ভয়ে সারা ইস্কুলের ছাত্ররা তটস্থ—তাঁর ক্লাসেও মহিম প্রতুলের শয়তানির কোনও কমতি ছিল না। অবিশ্যি করালিবাবুর মতো মাস্টার তা সহ্য করবেন কেন? এমন অনেকদিন হয়েছে যে, ক্লাসের সব ছেলে বসে আছে। কেবল মহিম আর প্রতুল বেঞ্চির উপর দাঁড়ানো। কিন্তু কী হবে?—পরের ক্লাসেই আবার যে-কে-সেই।

তবে বিচ্ছু হলেও দু'জনেই ছিল বুদ্ধিমান। ফেল করবে এমন ছেলে নয় তারা। সারা বছর ফাঁকি দিয়েও পরীক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে মহিমের স্থান থাকত মাঝামাঝি। আর প্রতুলের নীচের দিকে।

প্রতুলের বাবার রেলওয়েতে বদলির চাকরি। ১৯৬৯-এ তাঁর হুকুম এল ধানবাদ যাওয়ার। প্রতুলেরও অবিশ্যি বাবার সঙ্গে যেতে হবে, ফলে তার বন্ধুর সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেই নিয়েই দু'জনের কথা হচ্ছিল।

'আবার কবে দেখা হবে কে জানে,' বলল প্রতুল। 'কলকাতার পাট একবার তুলে দিলে ছুটিছাটাতেও এখানে আসার চান্স খুব কম। বরং তুই যদি ধানবাদে আসিস তা হলে দেখা হতে পারে।'

'ধানবাদ আর কে যায় বল?' বলল মহিম। 'বাবা তো ছুটি হলেই হয় পুরী, না হয় দার্জিলিং। আজ অবধিও এ নিয়ম পালটায়নি।'

প্রতুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর কিছুক্ষণ ঘাসের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তুই বড় হয়ে কী করবি ঠিক করেছিস?'

মহিম মাথা নাড়ল। 'সেসব এখন ভাবতে যাব কেন? ঢের সময় আছে। বাবা তো ডাক্তার, উনি অবিশ্যি খুশি হবেন যদি আমিও ডাক্তার হই। কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই। তুই কিছু ঠিক করেছিস?'

'না।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। তারপর প্রতুলই কথাটা পাড়ল—'শোন, একটা ব্যাপার করলে কেমন হয়?'

'কী ব্যাপার?'

'আমরা তো বন্ধু—সেই বন্ধুত্বের একটা পরীক্ষার কথা বলছিলাম।'

মহিম ভুরু কুঁচকে বলল, 'পরীক্ষা মানে? কী আবোল-তাবোল বকছিস?'

'আবোল-তাবোল নয়,' বলল প্রতুল। 'আমি গল্পে পড়েছি। এরকম হয়।'

'কী হয়?'

'ছাড়াছাড়ির মুখে দু'জন দু'জনকে কথা দেয় যে, এক বছর পরে অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক জায়গায় আবার মিট করবে।'

মহিম ব্যাপারটা বুঝল। একটু ভেবে বলল, 'ঠিক হ্যায়, আমার আপত্তি নেই। তবে ক'দিন পরে মিট করব সেই হচ্ছে কথা।'

'ধর, কুড়ি বছর। আজ হল সাতই অক্টোবর, ১৯৬৯। আমরা মিট করব সাতই অক্টোবর ১৯৮৯।'

'কখন?'

'যদি দুপুর বারোটা হয়?'

'বেশ, কিন্তু কোথায়?'

'এমন জায়গা হওয়া চাই যেটা আমরা দু'জনেই খুব ভাল করে চিনি।'

'সিনেমা হাউস হলে কেমন হয়? আমরা দু'জনেই একসঙ্গে এত ছবি দেখেছি।'

'ভেরি গুড। লাইটহাউস। যেখানে টিকিট বিক্রি করে তার সামনে।'

'তাই কথা রইল।'

দু'জনের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেল। এই বিশ বছরে কত কী ঘটবে তার ঠিক নেই, কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, মহিম আর প্রতুল মিট করবে যে বছর যে তারিখ যে সময়ে ঠিক হয়েছে, সেই বছর সেই তারিখে সেই সময়ে।

মহিমের সন্দেহ হয়েছিল সে ব্যাপারটা এতদিন মনে রাখতে পারবে কিনা; কিন্তু আশ্চর্য —এই বিশ বছরে একদিনের জন্যও সে চুক্তির কথাটা ভোলেনি। প্রতুল চলে যাবার পর—হয়তো বন্ধুর

অভাবেই—মহিম ক্রমে বদলে যায়। ভালর দিকে। ক্লাসে তার আচরণ বদলে যায়, পরীক্ষায় ফল বদলে যায়। সে ক্রমে ভাল ছেলেদের দলে এসে পড়ে। কলেজে থাকতেই সে লিখতে আরম্ভ করেছিল—বাংলায় পদ্য, গল্প, প্রবন্ধ। সে সব ক্রমে পত্রিকায় ছেপে বেরোতে আরম্ভ করে। তার যখন তেইশ বছর বয়স—অর্থাৎ ১৯৭৭-এ—সে তার প্রথম উপন্যাস লেখে। একটি নামকরা প্রকাশক সেটা ছাপে। সমালোচকরা বইটার প্রশংসা করে, সেটা ভাল বিক্রিও হয়। এমনকী শেষ পর্যন্ত একটা সাহিত্য পুরস্কারও পায়। আজ সাহিত্যিক মহলে মহিমের অবাধ গতি, সকলে বলে একালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মহিম চট্টোপাধ্যায়ের স্থান খুবই উঁচুতে।

এই বিশ বছরে প্রথমদিকে কয়েকটা চিঠি ছাড়া প্রতুলের কোনও খবরই পায়নি মহিম। প্রতুল লিখেছিল, ধানবাদ গিয়ে তার নতুন বন্ধু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মহিমের জায়গা কেউ নিতে পারেনি। ছ'মাসে গোটা চারেক চিঠি—ব্যস। তারপরেই বন্ধ। মহিম এতে আশ্চর্য হয়নি। কারণ এইসব ব্যাপারে প্রতুলের মতো কুঁড়ে বড় একটা দেখা যায় না। চিঠি লিখতে হবে?—ওরেব্বাবা! মহিমের অবিশ্যি চিঠি লেখায় আপত্তি ছিল না। কিন্তু একতরফা তো হয় না ব্যাপারটা!

বারোটা বেজে দু' মিনিট। নাঃ—প্রতুল নির্ঘাত ভুলে গেছে। আর যদি নাও ভুলে থাকে, সে যদি ভারতবর্ষের অন্য কোনও শহরে থেকে থাকে, তা হলে সেখান থেকে কী করে কলকাতায় ছুটে আসবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে? তবে এটাও ভাবতে হবে যে কলকাতার ট্র্যাফিকের যা অবস্থা, তাতে প্রতুল কলকাতায় থাকলেও, এবং চুক্তির কথা মনে থাকলেও, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এখানে পৌঁছে যাওয়া প্রায় অসম্ভব!

মহিম ঠিক করল যে, আরও দশ মিনিট দেখবে, তারপর বাড়ি ফিরে যাবে। ভাগ্যে আজকে রবিবার পড়ে গেছে। নাহলে তাকে আপিস থেকে কেটে পড়তে হত লাঞ্চের এক ঘণ্টা আগে! উপন্যাস থেকে তার ভাল রোজগার হলেও মহিম সওদাগরি আপিসে তার চাকরিটা ছাড়েনি! তার বন্ধুও যে নতুন-নতুন হয়নি তা নয়। কিন্তু ইস্কুলের সেই দুষ্টুমি-ভরা দিনগুলোর কথা ভুলতে পারেনি।

'শুনছেন?'

মহিমের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। সে পাশ ফিরে দেখে একটি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে তার দিকে চেয়ে আছে, তার হাতে একটি খাম।

'আপনার নাম কি মহিম চ্যাটার্জি?'

'হ্যাঁ। কেন বলো তো?'

'এই চিঠিটা আপনার।'

ছেলেটি খামটা মহিমের হাতে দিল। তারপর 'উত্তর লাগবে' বলে অপেক্ষা করতে লাগল।

মহিম একটু অবাক হয়ে চিঠিটা বার করে পড়ল। সেটা হচ্ছে এই—

'প্রিয় মহিম,

তুমি যদি আমাদের চুক্তির কথা ভুলে না গিয়ে থাকো, তা হলে এ চিঠি তুমি পাবে। কলকাতায় থেকেও আমার পক্ষে লাইটহাউসে যাওয়া কোনওমতেই সম্ভব হল না। সেটা জানানো এবং তার জন্য মার্জনা চাওয়াই এর উদ্দেশ্য। তবে তোমাকে আমি ভুলিনি। আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাও ভুলিনি—এতে আশা করি তুমি খুশি হবে। ইচ্ছা আছে একবার তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি। তুমি এই চিঠিরই পিছনে যদি তোমার ঠিকানা, এবং কোন সময়ে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সেটা লিখে দাও। তা হলে খুব খুশি হব।

শুভেচ্ছা নিও। ইতি—

তোমার বন্ধু প্রতুল।

মহিমের পকেটে কলম ছিল। সে চিঠিটার পিছনে তার ঠিকানা এবং আগামী রবিবার সকাল ন'টা থেকে বারোটা সময় দিয়ে চিঠিটা ছেলেটিকে ফেরত দিল। ছেলেটি দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মহিমের আর এখানে থাকার দরকার নেই, তাই সে বাইরে বেরিয়ে এসে হুমায়ুন কোর্টে রাখা তার সদ্য-কেনা নীল অ্যাম্বাসাডারটার দিকে এগিয়ে গেল। প্রতুল ভোলেনি এটাই হল বড় কথা। কিন্তু

রবিবার, তাও সে কলকাতায় থেকে কেন লাইটহাউসে আসতে পারল না সেটা মহিমের কাছে ভারী রহস্যজনক বলে মনে হল। তার সঙ্গে যে মহিম যোগাযোগ করবে সে উপায়ও নেই, কারণ চিঠিতে কোনও ঠিকানা ছিল না। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যেত, কিন্তু সেটা তখন মহিম খেয়াল করেনি। চিঠিটা খাতার পাতা থেকে ছেঁড়া কাগজে। তা হলে কি প্রতুলের এখন দৈন্যদশা? তার অবস্থাটা সে তার বন্ধুকে জানতে দিতে চায় না? কিন্তু সে তো মহিমের বাড়িতে আসতে চেয়েছে। এলে পরে সব কিছু জানা যাবে।

বাড়ি ফিরতে স্ত্রী শুভ্রা জিজ্ঞেস করল, 'কী, দেখা হল বন্ধুর সঙ্গে?'

'উহুঁ। তবে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল একটি ছেলের হাতে। সে যে মনে রেখেছে এটাই বড় কথা। এ জিনিস যে সম্ভব সেটা এ ঘটনা না ঘটলে বিশ্বাস করতাম না। যখন চুক্তিটা করেছিলাম তখনও বিশ্বাস

করিনি যে, দু'জনেই এটার কথা মনে রাখতে পারব।'

পরের রবিবার, সকাল দশটা নাগাদ মহিম বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে। এমন সময় দরজায় রিং হল। চাকর পশুপতি গিয়ে দরজা খুলল। 'বাবু আছেন?' প্রশ্ন এল মহিমের কানে। চাকর হ্যাঁ বলতে দরজা দিয়ে একটি ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে এলেন। তাঁর মুখে হাসি। ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়ানো। মহিমও তার ডান হাতটা বাড়িয়ে ভদ্রলোকের হাতটা শক্ত করে ধরে অবাক হাসি হেসে বলল, 'কী ব্যাপার প্রতুল? তুই দেখছি শুধু গতরে বেড়েছিস—চেহারা একটুও পালটায়নি। বোস, বোস।'

প্রতুলের মুখ থেকে হাসি যায়নি, সে পাশের সোফায় বসে বলল, 'বন্ধুত্বের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?'

'এগজ্যাক্টলি,' বলল মহিম, 'আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছি।'

'তুই তো লিখিস, তাই না?'

'হ্যাঁ—তা লিখি।'

'একটা পুরস্কারও তো পেলি। কাগজে দেখলাম।'

'কিন্তু তোর কী খবর? আমার ব্যাপার তো দেখছি তুই মোটামুটি জানিস।'

প্রতুল একটুক্ষণ মহিমের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আমারও চলে যাচ্ছে।'

'কলকাতাতেই থাকিস নাকি?'

'সবসময় না। একটু ঘোরাঘুরি করতে হয়।'

'ট্র্যাভেলিং সেলসম্যান?'

প্রতুল শুধু মৃদু হাসল, কিছু বলল না।

'কিন্তু একটা কথা তো জানাই হয়নি,' বলল মহিম।

'কী?'

'সেদিন তুই ব্যাটাচ্ছেলে এলি না কেন? কারণটা কী? অন্য লোকের হাতে চিঠি পাঠালি কেন?'

'আমার একটু অসুবিধা ছিল।'

'কী অসুবিধা? খুলে বল না বাবা!'

কথাটা বলতে বলতেই মহিমের দৃষ্টি জানলার দিকে চলে গেল। বাইরে গোলমাল। অনেক ছেলে ছোকরা কেন জানি একসঙ্গে হল্লা করছে।

মহিম একটু বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে জানলার পর্দা ফাঁক করে অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'ওই গাড়ি কি তোর?'

এতবড় গাড়ি মহিম কলকাতায় দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

'আর এইসব ছেলেরা হল্লা করছে কেন?' মহিমের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

এবার বন্ধুর দিকে ফিরে মহিমের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

প্রতুল নাকের নীচে একজোড়া চাড়া দেওয়া পুরু গোঁফ লাগিয়ে তার দিকে চেয়ে মিটমিট হাসছে।

'কিশোরীলাল!' মহিম প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

প্রতুল গোঁফ খুলে পকেটে রেখে বলল, 'এখন বুঝতে পারছিস তো কেন লাইটহাউসে যেতে পারিনি? খ্যাতির বিড়ম্বনা। রাস্তাঘাটে বেরোনো অসম্ভব।'

'মাই গড।'

প্রতুল উঠে পড়ল।

'বেশিক্ষণ থাকলে আর ভিড় সামলানো যাবে না। আমি কাটি। আমার ছবি একটাও দেখিসনি তো?'

'তা দেখিনি।'

'একটা অন্তত দেখিস। লাইটহাউসের দুটো টিকিট পাঠিয়ে দেব।'

প্রতুল বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল—মহিম তার পিছনে।

দরজা খুলতে একটা বিরাট হর্ষধ্বনির সঙ্গে 'কিশোরীলাল! কিশোরীলাল!' চিৎকার শুরু হয়ে গেল। প্রতুল কোনওরকমে জনস্রোতের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল, আর

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও রওনা দিয়ে দিল। মহিম দেখল প্রতুল তার দিকে হাত নাড়ছে। মহিমের হাতটা ওপরে উঠে গেল।

ভিড় ঠেলে একটা ছেলে মহিমের দিকে এগিয়ে এসে চোখ বড় বড় করে বলল, 'কিশোরীলাল আপনার বন্ধু।'

'হ্যাঁ ভাই, আমার বন্ধু।'

মহিম বুঝল, এবার থেকে পাড়ায় তার আসল নাম মুছে গিয়ে তার জায়গায় নতুন নাম হবে— 'কিশোরীলালের বন্ধু।'

সন্দেশ, পৌষ ১৩৯৬

শিল্পী

অবনীশ ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। অয়েল পেন্টিং। একজন মাঝবয়সি সুপুরুষ ভদ্রলোকের পোর্ট্রেট। অবনীশের স্টুডিওর এক কোনায় আরও আট-দশটা ছবির পিছনে দাঁড় করানো ছিল। অবনীশের আঁকা প্রথম অয়েল পোর্ট্রেট। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে সে দু' বছর হল পাশ করে বেরিয়েছে। ছাত্র অবস্থায় অবিশ্যি সে আরও পোর্ট্রেট করেছে। এবং তাতে বেশ নামও হয়েছিল। অবনীশের ইচ্ছা সে ছবি আঁকাকেই পেশা হিসেবে নেবে। কিন্তু কীভাবে শুরু করবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

অবনীশের বাড়িতে তার বাবা-মা আছেন। একটি বোন ছিল, তার সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। বাবা হিমাংশু বোস ব্যারিস্টার এবং ভাল প্র্যাকটিস। ছেলেকে তিনি চিরকালই উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। তিনি একদিন অবনীশকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই তো আর্টিস্ট হবি?'

'তাই তো ইচ্ছে আছে,' বলল অবনীশ।

'তোর আঁকার সরঞ্জাম সব রয়েছে?'

'কিছু ক্যানভাস, একটা ইজেল, আর কিছু রঙ কিনতে পারলে ভাল হত।'

'বেশ তো—কিনবি'খন। কত লাগবে বলিস। আমি টাকা দিয়ে দেব।'

সেসব সরঞ্জাম কেনা হয়ে গেছে, কিন্তু অবনীশ এখনও ছবি আঁকতে শুরু করেনি। ইজেলে সাদা ক্যানভাস খাটানো রয়েছে, তাতেই ছবি ফুটে উঠবে, কিন্তু কবে বা কী ছবি তা অবনীশ এখনও ভেবে পায়নি।

অম্বিকা সেনগুপ্তর পোর্ট্রেট আঁকার আইডিয়াটা নিখিলই দেয়। নিখিল অবনীশের অনেকদিনের বন্ধু, যদিও সে আর্টিস্ট নয়। তারা দু'জনে একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে। তারপর দু'জনের পথ আলাদা হয়ে গেলেও বন্ধুত্ব রয়েই গেছে। নিখিলের বাবা রজনী দত্ত ডাক্তার। নিখিল একদিন এসে সাদা ক্যানভাস দেখে বলল, 'কী রে, এখনও আঁকা আরম্ভ করিসনি?'

অবনীশ মাথা চুলকে বলল, 'কী আঁকব সেটা ঠিক করলে তবে তো আঁকা শুরু হবে।'

'কেন? পোর্ট্রেট। তোর যেটা স্পেশালিটি।'

'কার পোর্ট্রেট? রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে তো পোর্ট্রেট করা যায় না। আর আজকাল ফোটোগ্রাফিক যুগে অয়েল পোর্ট্রেট করানোর রেওয়াজ প্রায় উঠেই গেছে।'

'আমাকে দু'দিন ভাববার সময় দে।'

দু'দিন বাদে নিখিল এসে অবনীশকে জিজ্ঞেস করল, 'অম্বিকা সেনগুপ্তর নাম শুনেছিস?'

অবনীশ শোনেনি।

'স্টিফেন অ্যান্ড গিলফোর্ড কোম্পানির একজন চাঁই। বাবার বিশেষ বন্ধু। একদিন ক্লাবে নাকি আক্ষেপ করে বাবাকে বলেছিলেন, 'পুরনো রেওয়াজ সব উঠে যাচ্ছে—এটা অত্যন্ত আফসোসের ব্যাপার। বাবার একট পোর্ট্রেট আছে আমাদের ড্রইং রুমে—পঞ্চাশ বছর আগে বিখ্যাত প্রবোধ চৌধুরীর করা। চমৎকার। ফোটোতে ওই আভিজাত্যই নেই।' বাবা তাতে বললেন, 'তুমি একটা নিজের পোর্ট্রেট করাও না। বাধাটা কোথায়?' সেনগুপ্ত নাকি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'সেরকম আর্টিস্ট কোথায়?'

এ গল্প নিখিল গতকাল বাবার মুখে শোনার পরেই তার মাথায় বুদ্ধিটা খেলে।

'পোর্ট্রেট তুই খুব ভাল পারবি—একেবারে ভেটারেন আর্টিস্টের মতো। আমি বাবাকে তোর কথা বলেছি। বাবা বলেছেন সেনগুপ্তকে বলবেন।'

তিনদিন বাদে নিখিল অবনীশের কাছে এল। বলল, 'তোর ডাক পড়েছে।'

'কোথায়?'

'সাত নম্বর রয়েড স্ট্রিট। অম্বিকা সেনগুপ্তের বাড়ি।'

'কবে, কখন যেতে হবে?'

'রবিবার সকাল ন'টায়।'

দুরু দুরু বুকে যথাসময়ে অবনীশ গিয়ে হাজির হল সাত নম্বর রয়েড স্ট্রিটে। বেয়ারা বসবার ঘরে বসালো অবনীশকে। তিন মিনিটের মধ্যেই আসল লোকের আবির্ভাব। সত্যিই ছবি আঁকার মতো চেহারা।

'তুমি অয়েল পোর্ট্রেট করো?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার খুব প্রশংসা করছে আমার বন্ধু ডাক্তার রজনী দত্তর ছেলে। ক'দিন নাও তুমি একটা পোর্ট্রেট করতে?'

'দিন দশেকের বেশি লাগে না।'

'তা হলে কালই শুরু করে দাও। আমার আবার কলকাতার পাট গুটিয়ে দিল্লির আপিসে চলে যেতে হতে পারে। আমার এখানেই আসবে। সকাল আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত টাইম দেব তোমায়। তোমার রেট কত?'

'আমি তো প্রোফেশনাল কাজ শুরুই করিনি; কাজেই যা ভাল বোঝেন তাই দেবেন।'

'শ পাঁচেক?'

'ঠিক আছে।'

'আরেকটা কথা—তিনদিনের দিন যদি দেখি ছবি আমার পছন্দ হচ্ছে না, তা হলে সেইখানেই থামতে হবে। তোমার এক্সপেনসেস আমি দিয়ে দেব। তবে স্বভাবতই পুরো পারিশ্রমিক পাবে না।'

এতেও অবনীশ বলল, 'ঠিক আছে।'

পরের দিনই কাজ শুরু হয়ে গেল। অবনীশকে একটা রিকশা ভাড়া করতে হয়েছিল সরঞ্জাম আনবার জন্য। অম্বিকা সেনগুপ্ত ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আটটার সময় হাজির হলেন বৈঠকখানায়।

'কোথায় বসাবে আমাকে?' ভদ্রলোক এসেই জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে এই উত্তরের জানলাটার পাশে হলে ভাল হয়। নর্থ লাইটটা পোর্ট্রেটের পক্ষে সবচেয়ে ভাল লাইট।'

'হাতে বই-টই কিছু লাগে না? পাশে টেবিল থাকবে না?'

'আজকাল ওসব উঠে গেছে। আমি আপনার যাকে বলে আবক্ষ পোর্ট্রেট করব। আপনি এই চেয়ারটায় বসবেন। দাঁড়াবার দরকার নেই।'

'বাঃ—এ তো তেমন কঠিন ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না।'

তিনদিনেই দেখা গেল ছবিতে মিস্টার সেনগুপ্তকে চেনা যাচ্ছে। ভদ্রলোক কাজ দেখে অবনীশের পিঠে দুটো মৃদু চাপড় মেরে বললেন, 'এক্সেলেন্ট! ক্যারি অন।' অবনীশের কাঁধ থেকে একটা বোঝা নেমে গেল।

কিন্তু তার পরের দিনই এক দুঃসংবাদ। 'তোমাকে আর তিনদিনের বেশি সময় দিতে পারছি না,

অবনীশ।' বললেন অম্বিকা সেনগুপ্ত। 'আমাকে বুধবার—অর্থাৎ আজ থেকে চারদিন পরে—দিল্লি চলে যেতে হচ্ছে। তলপি-তলপা গুটিয়ে। ক'দিনের জন্য তা বলতে পারব না। বছর দু-এক তো বটেই। আমকে মাঝে মাঝে আসতে হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে তোমায় সময় দিতে পারব না।'

অবনীশের মনটা ভেঙে গেল। সে নিজেও বুঝতে পারছিল যে কাজটা খুব ভাল এগোচ্ছে! তিনদিনে যে ছবি শেষ হবে না তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'তা হলে আপনি কি অসমাপ্ত ছবিই সঙ্গে নিয়ে যাবেন?'

'সে আর কী করে হয়। যতদূর করতে পারো সেই অবস্থাতেই তোমার কাছে থাকবে ছবিটা। অবিশ্যি তোমার পারিশ্রমিক তুমি পাাবে।'

তিনদিনে মনের জোরের সঙ্গে হাতের জোর মিলিয়ে অবনীশ ছবির বারো আনা শেষ করে ফেলল। অম্বিকা সেনগুপ্ত এবার দেখে বললেন, 'ব্রিলিয়ান্ট, ব্রিলিয়ান্ট! তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, অবনীশ। আমি টাকা সঙ্গেই এনেছি। এই নাও তোমার পারিশ্রমিক।'

অবনীশ দেখল মিস্টার সেনগুপ্ত তাকে পাঁচশোর জায়গায় সাতটা করকরে একশো টাকার নোট দিয়েছেন।

অম্বিকা সেনগুপ্তর পোর্ট্রেটের পর্ব এখানেই শেষ হল।

এবার অবনীশ তার পেশাদারি শিল্পীজীবনের জন্য তৈরি হল। ছবি এঁকে রোজগার তাকে করতেই হবে। বাপের অনুগ্রহে আর কতদিন চলে? কী ঢঙে ছবি আঁকবে সে; সাবেকি না আধুনিক—সেই নিয়ে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে, যদিও তার উত্তর সে এখনও খুঁজে পায়নি।

অম্বিকাবাবুর চলে যাওয়ার মাসখানেক পরে চিত্রকূট গ্যালারিতে আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের একটা প্রদর্শনী হল। অবনীশ গেল দেখতে, এবং দেখে সে হতবাক হয়ে গেল। যে ছবির না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু, তার দাম আকাশছোঁয়া। আর সেই দামে লোকে সে ছবি কিনছে বাড়িতে টাঙিয়ে রাখার জন্য। চল্লিশটার মধ্যে উনিশটা ছবির ফ্রেমে লাল গোল কাগজ আঁটা। তার মানে ছবি বিক্রি হয়ে গেছে, অথচ আজ সবে প্রদর্শনীর চতুর্থ দিন।

মিনিট পনেরো থেকে অবনীশ গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এল। সে মনস্থির করে ফেলেছে। চুলোয় যাক মডার্ন আর্ট। সে তার নিজের ঢঙেই ছবি আঁকবে—সে ছবি লোকে নিক বা না নিক।

ছ'মাসে অবনীশ বত্রিশখানা ছবি আঁকল। কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার জন্য তাকে বাইরেও যেতে হয়েছিল—পুরী, ঘাটশিলা, গ্যাংটক। সে বুঝেছে ল্যান্ডস্কেপেও তার হাত খারাপ নয়।

নিখিল এল একদিন ছবি দেখতে। দেখে-টেখে বলল, 'দুর্দান্ত হয়েছে তোর ছবি। তবে ভয় হয় কী জানিস?—আজকাল ছবির চেহারা আর লোকের রুচি এত পালটে গেছে যে, তোর ছবি বাজারে চলবে কিনা তাই ভাবছি। তুই একজিবিশন করবি তো?'

'ইচ্ছে তো আছে। ছবি বিক্রি না হলে রোজগার হবে কী করে?'

'একটা গ্যালারির নাম হয়তো তুই শুনেছিস—রূপম। তার মালিক পুরুষোত্তম মেহ্‌রা বাবার পেশেন্ট। খুব কঠিন ব্যারাম থেকে বাবা ওঁকে সারিয়ে তুলেছিলেন। মেহ্‌রা মোটামুটি সেকেলে লোক, যদিও ছবি যা দেখায় সবই মডার্ন। আমি ওঁকে ফোন করে রাখছি। তুই তোর গোটা দু-এক ছবি নিয়ে গিয়ে এঁকে দেখা। ভদ্রলোক হয়তো প্রদর্শনী করতে রাজিও হয়ে যেতে পারেন।'

অবনীশ নিখিলের কথামতো মেহ্‌রার সঙ্গে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তিনটে বাছাই ছবি সঙ্গে নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করল।

মিঃ মেহ্‌রা ছবিগুলোর দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ তো দেখছি সবই চিনতে পারছি—মানুষের মতো মানুষ। বাড়ির মতো বাড়ি। গাছের মতো গাছ। আজকাল তো আর কেউ এমন আঁকে না।'

অবনীশ মৃদুস্বরে বলল, 'আজ্ঞে, আমি এরকমই আঁকতে ভালবাসি।'

মেহ্‌রা বললেন, 'দেখেন অবনীশবাবু—আমি আপনাকে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আমরা নামকরা আর্টিস্টের ছাড়া কারও ছবি এগজিবিট করি না। ছবি বিক্রি হবে এই গ্যারান্টি আমাদের চাই, কারণ কি ছবি বিক্রির তিন ভাগের এক ভাগ টাকা আমরা কমিশন নিই; এ থেকে আমাদের ব্যবসা চলে। শুধু আমাদের নয়—

অল কমার্শিয়াল গ্যালারিজ।'

'আর যদি ছবি বিক্রি না হয়?'

'তা হলে আমাদের লোকসান। বিক্রি হবে জেনেই তো আমরা ওয়েলনোন আর্টিস্ট ছাড়া কারুর ছবি দেখাই না।'

'তা হলে আমার ছবি আপনি দেখাবেন না?' নৈরাশ্যের সুরে বলল অবনীশ।

মিঃ মেহ্‌রা অবনীশের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি অন্য কেউ হলে আপনাকে রিফিউজ করে দিতাম, কিন্তু ডক্টর দত্তর ছেলে আমাকে রিকুয়েস্ট করেছে বলে আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারছি না। তা ছাড়া এরকম ছবির মার্কেট আছে কিনা সেটাও দেখা যাবে। তবে আপনাকে কিন্তু আমাদের টার্মস মেনে নিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

এই ঘটনার এক মাস পর অবনীশের প্রদর্শনী শুরু হল রূপম গ্যালারিতে। দশ দিন চলবে, বত্রিশখানা ছবি। তার মধ্যে অম্বিকা সেনগুপ্তর পোর্ট্রেটটাও ছিল, তবে সেটা নট ফর সেল। তার জীবনের প্রথম পেশাদারি কাজ অবনীশ হাতছাড়া করবে না।

প্রদর্শনীতে প্রথম তিনদিন বিশেষ লোক হয়নি। তারপর থেকে দর্শকের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে লাগল। অবনীশ অবাক হয়ে দেখল যে, তার ছবি বিক্রিও হচ্ছে। প্রথমবার বলে সে ছবির দাম বেশ কমই রেখেছিল, তাও চোদ্দখানা ছবি বিক্রি হয়ে কমিশন বাদে তার হাতে এল সাড়ে চার হাজার টাকা। মিঃ মেহ্‌রাও তাকে কনগ্র্যাচুলেট করলেন এবং কথা দিলেন যে ভবিষ্যতেও রূপম অবনীশের ছবির এগজিবিশন করবে।

কিন্তু একটা ব্যাপারে অবনীশকে চোট পেতে হল। সেটা হল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার প্রদর্শনীর সমালোচনা। বেশিরভাগ সমালোচকই বলেছে যে অবনীশের মস্ত দোষ হল সে সময়ের সঙ্গে তাল

রেখে চলছে না। একজন বলেছে, 'আজ যদি কোনও লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ঢঙে উপন্যাস লেখে তা হলে কি সেটা একটা প্রশংসনীয় ব্যাপার হবে?'

এইসব সমালোচকের নাম অনেকেই জানে না। যার নাম জানে, এবং যার সমালোচনা সকলেই পড়ে সে হল 'কৃষ্টি' সাপ্তাহিকের সমালোচক আনন্দ বর্ধন। অবনীশ জানে যে নামটা ছদ্মনাম, কিন্তু এই নামের পিছনে আসল ব্যক্তিটি কে সেটা সে জানে না। এঁর সমালোচনার শিরোনাম হল 'মান্ধাতার আমল'। তীরের মতো চোখা চোখা শব্দের ব্যবহারে সমালোচক অবনীশের প্রদর্শনীকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছেন। 'যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে আর্টের চেহারাও যে আমূল পালটেছে, সে খবর যে এই শিল্পী রাখেন না সেটা এঁর ছবিগুলির দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়,' লিখছেন আনন্দ বর্ধন। 'ক্যানভাস ও তেল রঙ আজকাল দুর্মূল্য। তাদের এই অপব্যবহার কোনওমতেই বরদাস্ত করা যায় না। প্রদর্শনীর কথা চিন্তা না করে শিল্পী যদি আজকের শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়াস করেন তা হলে হয়তো এঁর একটা ভবিষ্যৎ গড়ে উঠতে পারে, কারণ রঙ তুলির ব্যবহার যে উনি একেবারে জানেন না তা নয়।'

এই সমালোচনা শুধু অবনীশ নয়, তার বাবা এবং তার বন্ধু নিখিলও পড়ল। বাবা বললেন, 'শিল্পীকে গালমন্দ করাটা, সমালোচকদের একটা হ্যাবিট, কারণ পাঠক প্রশংসার চেয়ে নিন্দাটা বেশি উপভোগ করে। তুই নিরুদ্যম হোস না।'

নিখিল বলল, 'এই আনন্দ বর্ধন ছদ্মনামের আড়ালে কে লুকিয়ে রয়েছে সেটা বার করে সেই ব্যক্তিকে ধোলাই দিতে হবে।'

অবনীশ কিন্তু সমস্যায় পড়ে গেল। সে অনুভব করল আনন্দ বর্ধনের বাক্যবাণ অনবরত তার মনে বিঁধছে। সে অত্যন্ত গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগল তার আঁকার ঢং পালটিয়ে সে আধুনিকের দলে চলে আসবে কি না। বারবার সমালোচকের তিরস্কার ও বিদ্রূপ সে সহ্য করতে পারবে না। মডার্ন আর্ট জিনিসটা কী ও কেন, সেটা সে এতদিন জানার চেষ্টা করেনি, এবার করবে।

প্রদর্শনীর পর ছ'টা মাস অবনীশ ছবিই আঁকল না; তার বদলে রোজ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে মডার্ন আর্ট সম্বন্ধে যত বই পাওয়া যায়, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল এবং পড়ল। তার ফলে সে জানল যে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই প্রধানত ফ্রান্সে কিছু শিল্পীর প্রভাবে আর্টের জগতে এক বিপ্লব ঘটে। তার ফলে ছবির চেহারা একেবারে বদলে যায়, এবং বিপ্লবের প্রভাব ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এইসব বইয়ে তার নিজের ঢং-এর একটি ছবিও খুঁজে পেল না অবনীশ।

এর পরে অবনীশ লাইব্রেরিতে যাওয়া বন্ধ করে ড্রইং-এর খাতায় প্যাস্টেল দিয়ে নতুন রীতিতে ছবি আঁকার চেষ্টা আরম্ভ করল। এভাবে প্রায় ত্রিশখানা খাতা ছবিতে ভরে গেল। ইজেলে সাদা ক্যানভাস খাটানো রয়েছে, কিন্তু তাতে একটা আঁচড়ও পড়েনি।

নিখিল একদিন এসে বলল, 'কী রে, তুই কি ছবি আঁকা ছেড়ে দিলি নাকি?'

অবনীশ বলতে বাধ্য হল যে, সে তার ছবির ভোল পালটে আজকের দিনের শিল্পীদের দলে আসার চেষ্টা করছে।

'মডার্ন আর্ট তো খুব সোজা,' বলল নিখিল, 'একটা ক্যানভাস খাটিয়ে তাতে কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং এঁকে ভরিয়ে দে—ব্যস। হয়তো হাজার টাকায় বিক্রিও হয়ে যেতে পারে সেই ছবি।'

অবনীশ তার বন্ধুর কথা খুব পছন্দ করল না। সে বুঝেছে মডার্ন আর্ট অত সোজা নয়। সেটা ঠিকভাবে করতে গেলে শিল্পীর দেশ-বিদেশের সাবেকি আর্ট ও লোকশিল্পের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। সে পরিচয়ের জন্য সময় লাগে, অধ্যবসায় লাগে। তা হোক—অবনীশ বুঝেছে যে তাকে এই পথেই যেতে হবে। আনন্দ বর্ধনকে বলতে হবে—হ্যাঁ, অবনীশ বোস সার্থক শিল্পী। তার ছবিকে আর অবজ্ঞা করা চলে না।

দু' বছর ধরে অবনীশ আধুনিক ছবি আঁকল। একবার ইজেলে ক্যানভাস খাটিয়ে অয়েল পেন্টিং। এই সময়ের মধ্যে স্বভাবতই তার কোনও রোজগার হয়নি। বাবা আবার তাকে সাহায্য করলেন। বললেন, 'তোর ছবি এখন আর বুঝতে পারছি না, কিন্তু এটা বুঝেছি যে তুই একটা তাগিদ অনুভব করছিস। তুই যদ্দিন আবার এগজিবিশন না করছিস, তদ্দিন কী খরচ লাগছে না-লাগছে সেটা আমাকে জানাতে দ্বিধা করিস না।' অবনী বুঝল এমন বাপ না থাকলে তার শিল্পীজীবন এখানেই শেষ হয়ে যেত।

আজকাল অবনীশের এক-একটা ছবি আঁকতে বেশ সময় লাগে। একটু বড় ক্যানভাস হলে দু' মাসও লেগে যায়। তাই দু' বছরে তার ছবির সংখ্যা হল মাত্র বাইশ।

এই সময় একদিন মেহ্‌রার কাছ থেকে একটা ফোন এল। 'কী খবর অবনীশবাবু? আপনি কি ছবি আঁকা স্টপ করে দিয়েছেন?' অবনীশ বলল সে এখনও নিয়মিত ছবি আঁকছে। 'তা হলে একদিন আপনার বাড়ি গিয়ে দেখি আপনার নতুন ছবি।'

মেহ্‌রা এলেন এক রবিবার সকালে। অবনীশ তাঁকে তার স্টুডিওতে নিয়ে গেল।

'এ আপনার কাজ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন মিঃ মেহ্‌রা।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি স্টাইল একদম চেঞ্জ করে ফেলেছেন?'

'কেমন লাগছে বলুন।'

'আমি তো নিজে আর্ট বুঝি না। তবে দ্য কালারাস আর ভেরি গুড। আজকাল বড় খদ্দেররা এরকম জিনিসই চায়। এগুলোর সঙ্গে তাদের মডার্ন ফার্নির্চার খুব ভাল ম্যাচ করে।'

সব ছবির উপর মেহ্‌রা একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। কিছু বেশ বড় ছবিও ছিল। এই বাইশটাতেই যে রূপম ভরে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

অবনীশের প্রদর্শনীর দিন ঠিক হয়ে গেল। এবারও দশদিনের মেয়াদ। এই দশদিনে বাইশটার মধ্যে সতেরোখানা ছবিই বিক্রি হয়ে গেল। বেপরোয়া হয়ে অবনীশ ছবিগুলোর দাম বেশ চড়াই রেখেছিল; সেই দাম দিতেও লোকে দ্বিধা করল না। যা টাকা এল, তাতে অবনীশের দু' বছরের সংস্থান হয়ে গেল।

আর সমালোচনা? অবনীশ দেখল তার বাবাই ঠিক বলেছিলেন। 'পথে এসো বাবা।' লিখেছেন আনন্দ বর্ধন। 'তবে এই নতুন পথে চলাটা শিল্পীর পক্ষে এখনও সহজ হয়নি। এইভাবে আরও পাঁচ বছর লেগে থাকলে হয়তো অবনীশ বোস শিল্পী আখ্যা পেতে পারেন।'

অবনীশ পত্রিকাটা ছুড়ে ফেলে দিল। সেই সঙ্গে এই ছদ্মনামধারী ব্যাক্তিটির আসল পরিচয়টা জানবার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। নিখিল বলল, "কৃষ্টি"-র একজনের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। সে যদি এখনও থেকে থাকে, তা হলে তাকে ভজিয়ে ছদ্মনামের পেছনে লোকটা কে সেটা হয়তো জানা

যেতে পারে।'

এর মাসখানেক পরে একদিন সকালে অবনীশ তার স্টুডিওতে কাজ করছে, এমন সময় চাকর গোবিন্দ এসে ঘরে ঢুকল।

'কী ব্যাপার, গোবিন্দ?' জিজ্ঞেস করল অবনীশ।

'আজ্ঞে একটি বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

কে এল আবার? খদ্দের নাকি? ইতিমধ্যে অবনীশের বাড়িতে লোক এসে তার ছবি কিনে নিয়ে গেছে। গুজরাতি ভদ্রলোক।

'নাম বলেছেন?'

'আজ্ঞে না, বললেন জরুরি দরকার।'

'বসবার ঘরে বসাও, আমি আসছি।'

অ্যাপ্রন খুলে নিয়ে একটা ন্যাকড়ায় হাতের রঙটা মুছে অবনীশ বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হল। সোফা থেকে একজন চশমা পরা বছর পঁয়ত্রিশ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

নমস্কার করে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার পরিচয় দিলে হয়তো আপনি চিনবেন। আমার নাম হিমাংশু সেনগুপ্ত। আমি অম্বিকা সেনগুপ্তর বড় ছেলে।'

'আপনার বাবার মৃত্যুসংবাদ সেদিন কাগজে পড়লাম।'

'আপনি আমার বাবার একটা অয়েল পোর্ট্রেট করেছিলেন।'

'হ্যাঁ—কিন্তু সে সময় তো আপনাকে দেখিনি।'

'আমি তখন দিল্লি ছিলাম। আমিও ফিরলাম আর বাবাও গেলেন।'

'আই সি।'

'এই পোর্ট্রেটটা নিয়েই একটু কথা বলতে এসেছি।'

'কী ব্যাপার?'

'কাল সন্ধ্যায় বাবার স্মৃতিসভা আছে শিশির মঞ্চে। অনেক খুঁজেও বাবার এমন একটাও ফোটো পাইনি যেটা এনলার্জ করে সভায় রাখা যেতে পারে। তাই ভাবছিলাম আপনি যদি একদিনের জন্য আপনার ওই ক্যানভাসটা ধার দেন।'

'নিশ্চয়ই,' বলল অবনীশ। 'এ নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনি কি এটা এখনই নিয়ে যেতে চান?'

'হাতের কাছে আছে কি? আমার ঠিক একদিনের জন্য দরকার।'

'আপনি পাঁচ মিনিট বসুন। আমি নিয়ে আসছি।'

অবনীশ জানত ছবিটা কোথায় আছে। সেটা বার করে আবার ধুলো ঝেড়ে একটা খবরের কাগজে মুড়ে এনে হিমাংশু সেনগুপ্তর হাত দিল। ভদ্রলোক সেটা নিয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন।

অবনীশ স্টুডিওতে ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় নিখিল এসে ঢুকল।

'কাকে বেরোতে দেখলাম রে?' প্রশ্ন করল নিখিল।

অবনীশ একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, 'আমার প্রথম অয়েল পোর্ট্রেটের সাবজেক্টের ছেলে। অর্থাৎ অম্বিকা সেনগুপ্তর ছেলে।'

'বটে? নাম বলেছে?'

'হ্যাঁ। হিমাংশু।'

'ছবিটা নিল কেন?'

'ওঁর বাবার স্মৃতিসভা আছে, ভাল ফোটোগ্রাফ পায়নি, তাই ও পোর্ট্রেটটা রাখবে।'

'তুই খুব ভুল করেছিস।'

'কীসে?'

'ছবিটা দিয়ে।'

'কেন?'

'ও-ই বলেছিল মান্ধাতার আমল।'

'অ্যাঁ!'

'ইয়েস স্যার। আনন্দ বর্ধন হিমাংশু সেনগুপ্তর ছদ্মনাম।'

অবনীশের মুখ থেকে অবাক ভাবটা কেটে গিয়ে একটা বিশেষ ধরনের হাসি ফুটে উঠল। তারপর চাপা স্বরে কথাটা বেরোল—

'পথে এসো বাবা, পথে এসো!'

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৯৭

অক্ষয়বাবুর শিক্ষা

অক্ষয়বাবু ছেলের হাত থেকে লেখাটা ফেরত নিলেন।

'কী রে—এটাও চলবে না?'

ছেলে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল—না, চলবে না। এটা অক্ষয়বাবুর পাঁচ নম্বর গল্প যেটা ছেলে নাকচ করে দিল।

অক্ষয়বাবুর ছেলের নাম অঞ্জন। তার বয়স চোদ্দ। অতি বুদ্ধিমান ছেলে, ক্লাসে সে সব সময় ফার্স্ট হয়, পড়ার বাইরে তার নানা বিষয়ে কৌতূহল। অক্ষয়বাবু নিজে লেখক নন; তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন মধ্যপদস্থ কর্মচারী। তবে তাঁর বহুকালের শখ ছোটদের জন্য গল্প লেখার। অঞ্জন যখন আরও ছোট ছিল, তখন অক্ষয়বাবু তাকে বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প বলেছেন। তখন ছেলের ভালই লাগত, কিন্তু এখন সে সেয়ানা হয়েছে, সহজে সে খুশি হবার পাত্র নয়।

'তা হলে এটা ফুলঝুরি-তে পাঠাব না বলছিস?'

'পাঠাতে পারো। সম্পাদকের পছন্দ হলে নিশ্চয়ই ছাপবেন। তবে আমাকে এ গল্প তুমি তিন-চার বছর আগে বলেছ। আমার কাছে এতে নতুন কিছু নেই।'

'তা হলেও পাঠিয়ে দেখি না!'

'দেখো—কিন্তু তার আগে আমি লেখাটা কপি করে দেব। তোমার হাতের লেখা পড়া যায় না।'

ছোটদের জন্য ফুলঝুরি মাসিক পত্রিকা বছরখানেক হল বেরোতে আরম্ভ করেছে, আর এর মধ্যেই ছেলেমেয়েদের মন কেড়ে নিয়েছে। অক্ষয়বাবু শুনেছেন কাগজটার নাকি ৭৫,০০০ কপি ছাপা হয়, আর একটাও বাজারে পড়ে থাকে না। প্রেসের যন্ত্রপাতি নাকি সদ্য বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। সম্পাদকের নাম সুনির্মল সেন। তিনি নাকি সব লেখা নিজে পড়েন, এবং যা বাছাই করেন তা একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। ছেলেদের পত্রিকা তো সব সময়ই ছিল, এখনও আছে। তা হলে ফুলঝুরি-তে লেখা ছাপানোর জন্য অক্ষয়বাবু এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন? তার কারণ তিনি খবর নিয়ে জেনেছেন যে, ফুলঝুরি একটা গল্পের জন্য পাঁচশো টাকা দেয়। অক্ষয়বাবুর রোজগার তো অঢেল নয়, তাই মাঝে মাঝে এই বাড়তি আয়টা হলে মন্দ কী?

অঞ্জন গল্পটা বাবার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে তার পরিষ্কার হাতের লেখায় কপি করে দিল।

গল্প পাঠানোর এক মাসের মধ্যে অক্ষয়বাবু ফুলঝুরি আপিস থেকে চিঠি পেলেন। চার লাইনের চিঠি, সম্পাদক মশাই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, অক্ষয়বাবুর গল্পটি মনোনীত হয়নি। কারণ-টারণ কিচ্ছু নেই; একেবারে ছাঁচে ঢালা বাতিল-করা চিঠি—যাকে ইংরিজিতে বলে রিজেকশন স্লিপ।

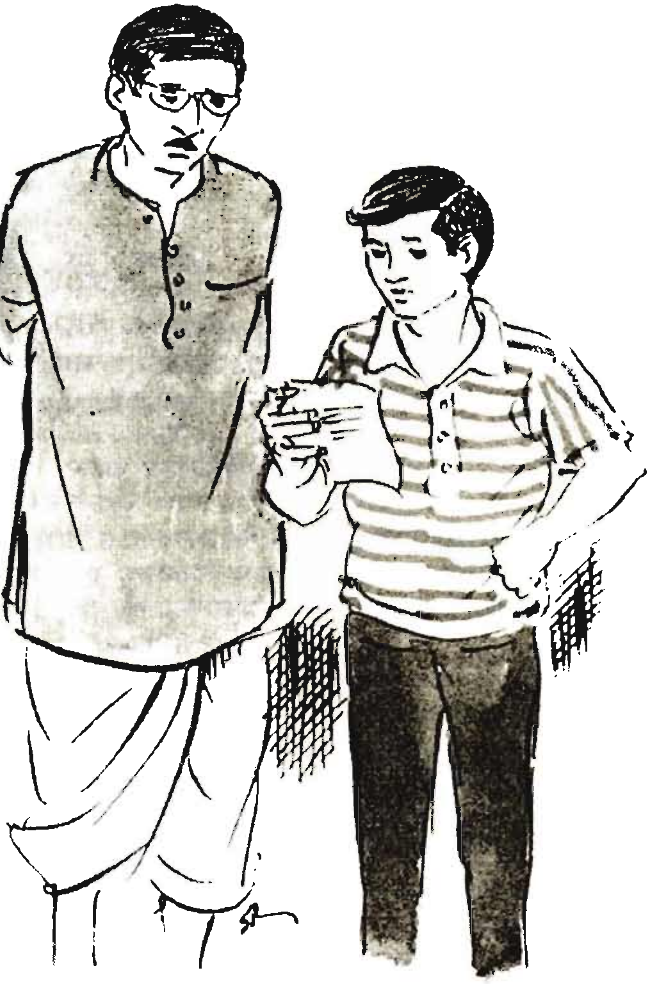

অক্ষয়বাবু চিঠিটা নিয়ে ছেলের কাছে গেলেন। অঞ্জন সবে খেলার মাঠ থেকে ফিরেছে; পড়াশুনার মতোই খেলাতেও তার প্রচণ্ড উৎসাহ।

'তুই ঠিকই বলেছিলি', বললেন অক্ষয়বাবু। 'গল্পটা ফুলঝুরি নিল না।'

'তাই বুঝি?'

'আমার দ্বারা কি তা হলে এ জিনিস হবে না?'

'গল্প কেন নেয়নি সেটা বলেছে?'

'নাথিং। এই তো চিঠি।'

অঞ্জন চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'তুমি সুনির্মলবাবুর সঙ্গে দেখা করে ওঁকে জিজ্ঞেস করতে পারো। আমার মনে হয় উনি খুব ভাল লোক। আমি ফুলঝুরিকে দুটো চিঠি লিখেছি, উনি দুটোই ছেপেছেন।'

কথাটা ঠিক। অঞ্জন তার প্রথম চিঠিটা লিখেছিল ধাঁধাগুলো একটু বেশি সহজ হচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়ে। ফুলঝুরিতে চিঠির জন্য আলাদা পাতা থাকে। সেখানে অঞ্জনের চিঠি বেরোয়, আর তারপর

থেকে ধাঁধাগুলোও অঞ্জনের মনের মতো হয়।

দ্বিতীয় চিঠিটা অঞ্জন লেখে ফুলঝুরিতে ছাপা একটা গল্প সম্বন্ধে। অঞ্জন বলে গল্পটার সঙ্গে একটা বিদেশি গল্পের আশ্চর্য মিল দেখা যাচ্ছে। এ চিঠিও ছাপা হয়, আর সেইসঙ্গে গল্পের লেখকের চিঠিও বেরোয়। তিনি স্বীকার করেছেন যে গল্পটা একটা বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা, আর সে-কথাটা উল্লেখ না করার জন্য তিনি মার্জনা চেয়েছেন।

অক্ষয়বাবু ছেলের কথায় স্থির করলেন তিনি সোজা গিয়ে সুনির্মলবাবুর সঙ্গে কথা বলবেন।

শরৎ বোস রোডে ফুলঝুরির আপিস। পত্রিকা থেকে ঠিকানা নিয়ে এক শনিবার বিকেলে অক্ষয়বাবু সোজা গিয়ে হাজির হলেন সম্পাদকের ঘরে। ছোটদের পত্রিকার দপ্তর যে এত ছিমছাম হতে পারে সেটা অক্ষয়বাবু ভাবতে পারেননি। সুনির্মল সেনের চেহারাও আপিসের সঙ্গে মানানসই। বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর, ফরসা রঙ, চোখদুটো বেশ জ্বলজ্বলে।

'বসুন।' সুনির্মলবাবু তাঁর উলটোদিকের হালফ্যাশানের চেয়ারটার দিকে হাত দেখালেন।

অক্ষয়বাবু বসলেন।

'আপনার পরিচয়টা—?'

অক্ষয়বাবু নিজের নাম বললেন, এবং সেইসঙ্গে বললেন যে তিনি সম্প্রতি 'অপরাধ' নামে একটি ছোটগল্প ফুলঝুরিতে পাঠিয়েছিলেন, সেটা মনোনীত হয়নি বলে তাঁকে জানানো হয়েছে।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে', বললেন সুনির্মলবাবু।

'কিন্তু গল্পটা কী কারণে বাতিল হল সেটা যদি বলেন, তা হলে ভবিষ্যতে সুবিধা হতে পারে।'

সুনির্মলবাবু সামনে ঝুঁকে দু' হাতের কনুই টেবিলের উপর রেখে বললেন, 'দেখুন অক্ষয়বাবু, আপনার মুশকিল হচ্ছে কি, আপনি যে আজকালকার ছেলেমেয়েদের মন জানেন, তার কোনও পরিচয় আপনার গল্পে নেই। আমার কাছে সেকালের বাঁধানো সন্দেশ-মৌচাক আছে; তাতে যেরকম গল্প বেরোত, আপনার গল্প সেই ধাঁচের। আজকের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে, অনেক বেশি জানে, অনেক বেশি স্মার্ট। আমি পাঁচ বছর ইস্কুল মাস্টারি করেছি; তখন আমি এইসব ছেলেমেয়েদের খুব ভাল করে স্টাডি করেছি। তাদের মনের মতো গল্প যদি লিখতে পারেন তা হলে তা নিশ্চয়ই আমাদের কাগজে স্থান পাবে। অল্প-বিস্তর ত্রুটি থাকলে ক্ষতি নেই; সেটা আমি শুধরে দিতে পারি। সম্পাদকের এ অধিকারটা আছে, জানেন বোধহয়?'

'জানি', মাথা হেঁট করে বললেন অক্ষয়বাবু।

এর পরে আর কিছু বলার নেই, তাই অক্ষয়বাবু উঠে পড়লেন। বাড়ি ফিরে ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস বললেন, 'ফুলঝুরিতে কার গল্প তোর ভাল লাগে রে?'

অঞ্জন একটু ভেবে বলল, 'দু'জন আছে—সৈকত ব্যানার্জি আর পুলকেশ দে।'

অক্ষয়বাবু ছেলের বইয়ের তাক থেকে একগোছা ফুলঝুরি নিয়ে গিয়ে নিজের খাটের পাশের টেবিলে রাখলেন। তারপর সাতদিন ধরে তিনি রাত্রে খাওয়ার পর এই দুই লেখকের একগুচ্ছ গল্প পড়ে ফেললেন। এদের গল্পের মেজাজ যে তাঁর নিজের গল্পের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদের বিষয়ও আলাদা, ভাষাও আলাদা।

অক্ষয়বাবু বুঝলেন যে, তাঁকে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হবে। প্রথমে তাঁর নিজের ছেলেকে আরও ভাল করে চিনতে হবে। অঞ্জনকে তিনি চোখের সামনে বড় হতে দেখেছেন, তার সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করেছেন, কিন্তু সত্যি কি ছেলের মনের খুব কাছে পৌঁছতে পেরেছেন? অক্ষয়বাবু মিনিটখানেক চিন্তা করেই বুঝলেন তিনি শুধু পারেননি নয়, সে চেষ্টাই করেননি। ছেলে ক্লাসে ফার্স্ট হয় এটা জেনেই তিনি খুশি; ছেলে কী দেখে, কী শোনে, কী পড়ে, কী ভাবে—এসব তিনি কোনওদিন জানতে চেষ্টা করেননি।

ছ' মাস অক্ষয়বাবু কোনও গল্প লিখলেন না। সেই সময়টাতে ছেলেকে আরও ভাল করে চিনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। অঞ্জন আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিশোরদের জন্য লেখা বহু ইংরিজি বই কিনে পড়ে ফেলেছে। কম্পিউটারের সব খবর তার কাছে আছে, সৌরজগতের গ্রহগুলোর স্যাটিলাইট সম্বন্ধে যা জানা গেছে, সব সে জানে। খেলার ব্যাপারেও অঞ্জনের সমান উৎসাহ। দেশ-বিদেশের ক্রিকেট ফুটবল টেনিস ব্যাডমিন্টন ইত্যাদির খেলোয়াড়দের নাম তার মুখস্থ। অক্ষয়বাবু খবরের কাগজের

খেলাধুলোর পাতাটার দিকেই দেখেন না।

অক্ষয়বাবু বুঝলেন এবার থেকে বেশ খানিকটা সময় দিয়ে তাঁকে তাঁর ছেলের জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। গল্পের প্লট ভাবা তিনি অবিশ্যি এখনও থামাননি। কারণ ফুলঝুরিতে তাঁর গল্প ছেপে বেরিয়েছে—এ স্বপ্ন তিনি এখনও দেখেন। একটা গল্পের আইডিয়া মাথায় এলেই তিনি ছেলেকে শোনান।

'কেমন হয়েছে বল তো।'

'একটু একটু করে ইমপ্রুভ করছে', বলে অঞ্জন।

অক্ষয়বাবু যে ক্রমশ তাঁর ছেলের মনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন সেটা মাঝে মাঝে তাঁর কথায় প্রকাশ পায়। যেমন, একদিন তিনি রাত্রে খাবার টেবিলে বসে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেকার, লেন্ডল, ম্যাকেনরো—এই তিনজনের মধ্যে তোর মতে কে শ্রেষ্ঠ?'

'ম্যাকেনরো', বলল অঞ্জন, 'তারপর বেকার, তারপর লেন্ডল।'

আরেকদিন অক্ষয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ফ্যাক্স কাকে বলে জানিস?'

'জানি।'

'কী বল তো?'

'ফ্যাক্সের সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গা থেকে যে-কোনও জায়গায় একটা কাগজে কিছু লিখে বা এঁকে পাঠালে সেটা এক সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যায়।'

অক্ষয়বাবু বুঝলেন ছেলেকে নতুন কোনও জ্ঞান তিনি দিতে পারবেন না। তিনি যা জানেন, ছেলে তার চেয়ে বেশি জানে। তবে এটা ঠিক যে তিনি ছেলেকে এখন আগের চেয়ে ঢের বেশি ভাল করে চেনেন।

'তা হলে কি আবার গল্প লেখা শুরু করা যায়?'

তিনি কথাটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন। অঞ্জন বলল, 'লেখো না। অবিশ্যি ছাপার মালিক হলেন সুনির্মলবাবু। গল্প ভাল হলে উনি নিশ্চয়ই ছাপবেন।'

'এবার না ছাপলে কিন্তু মরমে মরে যাব।' বললেন অক্ষয়বাবু। 'অন্তত একবার সূচিপত্রে আমার নামটা দেখতে চাই।'

অঞ্জন কিছু মন্তব্য করল না।

দিন সাতেক মাথা খাটিয়ে অক্ষয়বাবু 'ডানপিটে' নামে একটা গল্প লিখে ফেললেন। তারপর সেটা ছেলেকে পড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন হয়েছে?'

অঞ্জন বলল, 'পাঠিয়ে দাও। আমি কপি করে দিচ্ছি।'

পরদিন লেখাটা পেয়ে তৎক্ষণাৎ ফুলঝুরির আপিসে গিয়ে সেটা নিজের হাতে দিয়ে এলেন অক্ষয়বাবু।

পনেরো দিনের মধ্যে সুনির্মল সেনের চিঠি এল। 'ডানপিটে' মনোনীত হয়েছে। আগামী কার্তিকের ফুলঝুরিতে ছাপা হবে।

অক্ষয়বাবু সগর্বে চিঠিটা ছেলেকে দেখালেন। অঞ্জন বলল, 'ভেরি গুড।'

এটা ভাদ্র মাস, তাই আরও দু' মাস অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে নতুন উদ্যমে অক্ষয়বাবু আরও গল্পের প্লট ভাবতে লাগলেন। এখন তিনি চাবিকাঠি হাতে পেয়ে গেছেন, তাই ছেলেকে শোনানোর আর কোনও প্রয়োজন নেই।

এই দু' মাসটাকে অক্ষয়বাবুর দু' বছর বলে মনে হল। অবশেষে কার্তিক মাসের দোসরা অঞ্জনের নামে খয়েরি খামে এল নতুন ফুলঝুরি। ছেলে তখন পাড়ার মাঠে খেলতে গেছে। অক্ষয়বাবু সবে আপিস থেকে ফিরেছেন। তিনি আর ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে খাম থেকে পত্রিকাটা বার করলেন।

প্রথমেই দেখলেন সূচিপত্র।

হ্যাঁ—'ডানপিটে' রয়েছে তেরোর পাতায়।

সেই পাতায় কাগজটা খুলে অক্ষয়বাবু দেখলেন পাতার উপর দিকে ফুলঝুরির আর্টিস্ট মুকুল গোস্বামীর কাজ—গল্পের নাম, লেখকের নাম, আর গল্পের একটা ঘটনার ছবি।

ছাপার অক্ষরে তাঁর লেখা দেখতে অক্ষয়বাবুর অদ্ভুত লাগছিল। তিনি দশ মিনিটে গল্পটা পড়ে ফেলে বেশ একটু অবাক হলেন। তিনি যা লিখেছেন তার বারো আনাই আছে, কিন্তু নতুন যে চার আনা অংশ—সেটা একেবারে মোক্ষম। তাতে গল্প অনেক গুণে ভাল হয়ে গেছে। সুনির্মল সেনের বাহাদুরি আছে।

এই কথাটা ভদ্রলোককে না জানিয়ে পারবেন না অক্ষয়বাবু।

পত্রিকাটা আবার খামের মধ্যে পুরে ছেলের পড়ার টেবিলের উপর রেখে একটা ট্যাক্সি নিয়ে অক্ষয়বাবু সোজা চলে গেলেন ফুলঝুরির আপিসে।

আবার সেই ছিমছাম ঘর, সেই হালফ্যাশানের চেয়ার।

'এবার খুশি তো?' জিজ্ঞেস করলেন সুনির্মল সেন।

'তা তো বটেই', বললেন অক্ষয়বাবু। 'কিন্তু আমার আসার কারণ হচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ জানানো। আপনার নিপুণ হাতের ছোঁয়া যে গল্পকে আরও কত বেশি ভাল করে দিয়েছে তা বলতে পারব না।'

সুনির্মলবাবু ভুরু কুঁচকে তাঁর পাশের তাক থেকে একটা বক্স ফাইল টেনে এনে টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর তার থেকে একটা পাণ্ডুলিপি বার করে অক্ষয়বাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

'আমার ছোঁয়া কোথায় আছে বার করুন তো দেখি।'

অক্ষয়বাবু পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক পাতায় একবার চোখ বুলিয়ে দেখলেন কোথাও কোনও কাটাকুটি নেই।

'ওটা আপনারই হাতের লেখা তো?' জিজ্ঞেস করলেন সুনির্মলবাবু। 'ওটাই আপনি পাঠিয়েছিলেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—এটাই পাঠিয়েছিলাম। তবে হাতের লেখা আমার নয়।'

'তবে কার?'

অক্ষয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'আমার ছেলের।'

শুকতারা, শারদীয়া ১৩৯৭

প্রসন্ন স্যার

অর্ধেন্দু সেনগুপ্ত সাতদিনের ছুটি নিয়ে শিমুলতলায় এসেছে। সে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে ভাল চাকরি করে, যদিও মাত্র পঁচিশ বছর বয়স। চেহারা সুশ্রী, চলনে বলনে রীতিমতো স্মার্ট। ব্যাচেলার হিসেবে তার এই শেষ ছুটি ভোগ, কারণ ফিরে গিয়ে দু'মাসের মধ্যেই তার বিয়ে, পাত্রী ঠিক করেছেন তার মা নিজে। অর্ধেন্দুর একটু কাব্যচর্চার বাতিক আছে, সে শিমুলতলায় সেটার পিছনে কিছুটা সময় দিতে চায়, কলকাতায় কাজের চাপে আর হয়ে ওঠে না।

দ্বিতীয় দিনই বিকেলে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে বেড়াতে গিয়ে প্রসন্ন স্যারের সঙ্গে দেখা। প্রসন্ন চক্রবর্তী অর্ধেন্দুর ইস্কুলে ইংরিজি পড়াতেন। তাঁর স্মরণশক্তির কথা সকলেই জানে, তিনি পুরনো ছাত্রদের কখনও ভোলেন না—সে ভাল ছেলেই হোক আর মন্দ ছেলেই হোক। অর্ধেন্দু তাঁকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পেয়েছিল—একটানা ছ'বছর—তারপর প্রসন্ন স্যার চাকরি ছেড়ে দেন শারীরিক অসুস্থতার জন্য। এখনও তাঁকে দেখে খুব সুস্থ বলে মনে হল না। বারো বছর হয়ে গেছে, কিন্তু তাও প্রসন্ন স্যার অর্ধেন্দুকে দেখেই চিনে ফেললেন।

'কী রে, মাকাল ফল, তোকে এখানে দেখব ভাবিনি তো!' বললেন প্রসন্ন স্যার। শুধু চেনা নয়;

অর্ধেন্দুকে তিনি যে মাকাল ফল বলে ডাকতেন সে-কথাও মনে আছে। তখন মাকাল ফল নামকরণে একটা সার্থকতা ছিল। মাকাল ফল দেখতে লাল টুকটুকে, কিন্তু অখাদ্য। ক্লাস নাইন পর্যন্ত অর্ধেন্দুর চেহারাটাই শুধু ভাল ছিল, অন্যদিক দিয়ে সে খুব সাধারণ ছাত্রের পর্যায়ে পড়ত। প্রসন্ন স্যার ছাত্রদের মানানসই নামকরণ করতে খুব ভালবাসতেন। এবং এ-ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতাও ছিল। এক অর্ধেন্দুর ক্লাসেই ছিল রামগরুড়ের ছানা, কুমড়ো পটাশ, ঈদের চাঁদ (রাধিকারঞ্জনের নাম, কারণ সে কামাই করত কথায় কথায়), খাঞ্জা খাঁ, যশুরে কৈ ইত্যাদি আরও অনেকে। সত্যি বলতে কি, খুব কম ছাত্রদেরই আসল নাম ধরে ডাকতেন প্রসন্ন স্যার। অবিশ্যি ছাত্ররাও তাঁর অগোচরে তাঁকে 'অপ্রসন্ন স্যার' বলত, কারণ প্রসন্ন চক্রবর্তীর মেজাজখানাও ছিল কড়া। সেটা অবিশ্যি সবসময়ে ধমকে প্রকাশ না পেয়ে ব্যঙ্গোক্তিতে পেত। সে খোঁচা বড় সাংঘাতিক খোঁচা।

অর্ধেন্দু তার পুরনো মাস্টারকে প্রণাম করল।

'আজকাল কিছু করা হচ্ছে, নাকি ফ্যাফ্যাগিরি?' জিজ্ঞেস করলেন প্রসন্ন স্যার।

অর্ধেন্দু বলল, 'আপনাদের আশীর্বাদে একটা চাকরি করছি, তা সে তেমন কিছু নয়।'

প্রসন্ন স্যারের ধারণাটা যাতে বজায় থাকে সেইদিকেই দৃষ্টি রেখে অর্ধেন্দু কথাটা বলল। মাকাল ফল আর ভাল চাকরি পায় কী করে? আসলে প্রসন্ন স্যার ইস্কুল ছেড়ে দেবার পরে অর্ধেন্দুর অনেক পরিবর্তন হয়। হায়ার সেকেন্ডারিতে সে রীতিমতো ভাল রেজাল্ট করে। কলেজে গিয়েও কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে সে হাই সেকেন্ড ক্লাস পায়। সে খবর অবশ্য প্রসন্ন স্যারের জানবার কথা নয়, কারণ তিনি কলকাতা ছেড়ে দেশে গিয়ে সেখানে একটা ইস্কুলে চাকরি নেন এবং সেখান থেকেই রিটায়ার করেন।

'যাক, তা হলে একটা হিল্লে হয়েছে তোর। ইস্কুলে তোর হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল যে বায়স্কোপে অ্যাকটিং করা ছাড়া তোর আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। যত গবেট সব ওই লাইনেই যায় তো!'

দিনে অন্তত দু'বার করে 'বায়স্কোপে'র বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বলতেন প্রসন্ন স্যার। তিনি নাকি জীবনে দু'খানা ছবি দেখেছেন। তাতেই তাঁর সাধ মিটে গেছে।

'আপনার শরীর এখন কেমন?' অর্ধেন্দু জিজ্ঞেস করল।

'সেই তো মাইল্‌ড স্ট্রোক হয়ে ইস্কুল ছাড়লাম।' বললেন প্রসন্ন স্যার। 'তারপর নানান ব্যারামে ভুগেছি। নৈহাটি চলে গেসলাম নিজের দেশে। সেইখানেই একটা ইস্কুলে চাকরি নিই। বছর চারেক হল সেখান থেকে রিটায়ার করেছি। এখন তবু খানিকটা ভাল আছি, কেবল হাঁপের কষ্ট। তাই তো শিমুলতলায় এলাম—একটু আরামে নিশ্বাস নেব বলে।'

'পুরনো ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়?'

'এই তো তোর সঙ্গে হয়ে গেল। তুই ছাড়া আর কেউ এসেছে নাকি এখানে?'

'আর তো কাউকে দেখিনি। তবে আমিও সবে এসেছি।'

রোদ পড়ে আসছে দেখে হাতের ছাতাটা বন্ধ করে প্রসন্ন স্যার বললেন, 'আসি, মাকাল ফল। আছিস যখন, তখন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।'

প্রসন্ন স্যার ছাতা বগলে নিয়ে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে বাজারে অর্ধেন্দুর কিরণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—কিরণ বিশ্বাস। কিরণ অর্ধেন্দুর সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত। নীচের দিকের ক্লাসে সে ছিল ভাল ছেলের দলে। প্রসন্ন স্যার তাকে 'সানশাইন' বলে ডাকতেন। তাঁর বড় প্রিয় ছাত্র ছিল কিরণ। অবিশ্যি পরের দিকে কিরণের ইতিহাস অর্ধেন্দুর ঠিক উলটো। উঁচু ক্লাসে উঠে সে অসৎসঙ্গে পড়ে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। হায়ার সেকেন্ডারিতে একবার ফেল করে। কিরণের এ পরিণাম কেউ আশা করেনি। অবিশ্যি প্রসন্ন স্যার কিরণের নৈতিক অবনতির কথা জানেন না।

'কী করছিস আজকাল?' অর্ধেন্দু জিজ্ঞেস করল। 'ম্যাকফারসন কোম্পানির চাকরিটা আছে?'

কিরণ মাথা নাড়ল।

'আমার কপালে চাকরি নেই।'

'এখনও রেসের মাঠে যাস?'

'ওটা একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না।'

'তা হলে সংসার চলছে কী করে?'
'বাবা মারা গেছেন তিন বছর হল। তার ফলে হাতে কিছু টাকা এসেছে।'
'সে আর ক'দিন?—ভাল কথা, প্রসন্ন স্যার এখানে রয়েছেন।'
'তাই বুঝি?'
'কাল স্টেশনে দেখা হয়েছিল। তুই আছিস জানলে খুব খুশি হবেন। আমাকে এখনও মাকাল ফল বলে ডাকেন।'
'তার মানে আমাকে সানশাইন বলবেন।'
'তা তো বটেই। ওঁর মেমরি তো জানিস। ইস্কুলের কোনও কথাই ভোলেননি।'
'তুই কোথায় উঠেছিস?' কিরণ জিজ্ঞেস করল।
অর্ধেন্দু তার ডেরার অবস্থান বুঝিয়ে দিল।—'এক বন্ধুর বাড়ি। এখন শুধু একটা মালি আর একটা চাকর আছে।'
কিরণ বিদায় নিল।
বিকেলে চা খেয়ে অর্ধেন্দু বেরোতে যাবে এমন সময় হন্তদন্ত কিরণ এসে হাজির।
'কেলেঙ্কারি ব্যাপার!'
'কী হল?' অর্ধেন্দু জিজ্ঞেস করল।
'প্রসন্ন স্যারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'
'সে তো হবেই—এতটুকু জায়গা! কী বললেন?'
'এখনও সানশাইন নাম ধরে বসে আছেন। কী করছি জিজ্ঞেস করতে একঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হল। ভেরেন্ডা ভাজছি আর ঘোড়ার পিছনে পয়সা ঢালছি, সে তো আর বলা যায় না।'
'কী বললি?'
'বললুম চাকরি করছি। তুই তোর আপিসের কথা বলিসনি তো?'
'নাম বলিনি। কেন—তুই বলেছিস নাকি?'
'আর কিছু মাথায় এল না। ভদ্রলোক আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তিনি ইস্কুলেই জানতেন যে, আমি জীবনে উন্নতি করব। তোর কথাও বললেন। বললেন, 'মাকাল ফলটা এখনও সেইরকমই আছে। বললে, একটা চাকরি করছে, কিন্তু সে চাকরি যে কীরকম সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"
অর্ধেন্দু হেসে উঠল।
'এখানেই শেষ না,' বলল কিরণ। 'আরও ব্যাপার আছে।'
'কী ব্যাপার?'
'ওঁর একটি ছেলে আছে। বাইশ বছর বয়স। ওঁর ছোট ছেলে। বি. কম. পাশ করেছে, কিন্তু চাকরি পায়নি এখনও। চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারছে না। প্রসন্ন স্যার বললেন, যদি তার জন্যে একটা কিছু করে দিতে পারি।'
'তুই কী বললি?'
'আমি বললাম, চেষ্টা করব। কী আর বলব বল!'
'ঠিক আছে। প্রসন্ন স্যারের ধারণাটা বজায় রাখতে হবে। নাহলে লোকটা মনে বড় কষ্ট পাবে। হাজার হোক, অভাবী লোক তো, তার উপরে অসুস্থ। আর এককালে ক্লাসে ভাল পড়াতেন সেটা বলতেই হবে। ওঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি।'
'তা হলে কী করা যায় বল তো?'
'ওঁর ছেলেকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে হবে। ছেলেটা লেখাপড়ায় কেমন?'
'বললেন তো ভাল, কিন্তু ব্যাকিং ছাড়া নাকি কিচ্ছু হচ্ছে না।'
'তা হলে এক কাজ কর। ওঁর সঙ্গে দেখা করে বল, তোর আপিসে, অর্থাৎ আমার আপিসে গিয়ে দেখা করতে। আমি চেষ্টা করে দেখি ওর জন্য কিছু করা যায় কিনা।'
'তাই বলব তো? তুই ঠিক বলছিস?'

‘ঠিক বলছি। ওঁর ছেলের জন্য যদি কিছু করতে হয় তা হলে সানশাইনই করবে। মাকাল ফলের দ্বারা কিছু হবে না।’

‘যাক, তুই আমাকে বাঁচালি!’

‘তবে একটা কথা ভুলিস না।’

‘কী?’

‘প্রসন্ন স্যার এককালে তোর কী নাম দিয়েছিলেন, আর আজকাল তোর কী অবস্থা হয়েছে।’

কিরণের মাথা হেঁট হয়ে গেল। সে বলল, ‘বাবা মারা যাবার আগে ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন।’

‘তা হলে?’

‘তোর কথাটা মনে রাখব।’

‘ঠিক তো?’

‘ঠিক। কথা দিচ্ছি। কিরণ বিশ্বাস যে একেবারে শেষ হয়ে গেছে তা নয়।’

পরদিন বিকেলে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে আবার প্রসন্ন স্যারের সঙ্গে দেখা। বললেন, ‘সানশাইন এখানে রয়েছে, জানিস তো?’

‘জানি, কাল দেখা হয়েছে।’

‘ছেলেটা একটুও বদলায়নি। বলল, আমার ছেলের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। তোকে আর দীপ্তেনের কথাটা বলিনি, কারণ জানি তোর দ্বারা কিছু হবে না।’

‘আপনি ঠিক লোককেই ধরেছেন স্যার। আর আপনার নামকরণের কোনও তুলনা নেই!’

শুকতারা, বৈশাখ ১৩৯৮

অভিরাম

‘তোমার নাম কী?’

‘অভিরাম সাউ, বাবু।’

‘তোমার বাড়ি কোথায়?’

‘উলুইপুর গাঁয়ে বাবু। উড়িষ্যা।’

‘বাড়িতে আছে কে?’

‘আমার দাদা আছে, বউদি আছে, দুই ভাইপো আছে।’

‘তোমার বাড়ি যেতে হয় না?’

‘কালে ভদ্রে বাবু। আমি তো সংসার করিনি। ধানজমি আছে কিছু, দাদাই দেখে।’

‘তুমি বাড়ি গেলে বদলি দিয়ে যাবে তো?’

‘নিশ্চয়ই। তবে সে দরকার আমার হবে না বাবু। হলে, বদলি দিয়ে যাব নিশ্চয়ই।’

‘বদলির কথা কেন উঠল সেটা বলছি তোমায়, আমার সন্ধেবেলা একা থাকতে ভয় হয়। আমার ভূতের ভয় আছে। আমি রান্নার লোক যাকে পেয়েছি, সে ঠিকে; সন্ধেবেলা রেঁধে দিয়ে চলে যাবে। তখন আমার কাছে আরেকজন লোক থাকা চাই।’

‘সে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না বাবু, ও হয়ে যাবে। আমার নিজের মনে কোনও ভূতের ভয় নেই।’

'ঠিক আছে, অভিরাম।'

লোকটিকে বেশ ভালই লাগল শঙ্করবাবুর। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, বেশ হাসিখুশি, চালাক চতুর চেহারা। স্টেটব্যাঙ্কের কর্মচারী শঙ্করবাবু এই সাতদিন হল বদলি হয়ে পশ্চিম বাংলা আর উড়িষ্যার বর্ডারে এই ছোট শহর কাঞ্চনতলায় এসেছেন। নিজে একা মানুষ। দু'খানা ঘরসমেত একতলা একটি ছোট বাড়ি পেয়েছেন। তাতে তার চলে যাবে। তবে বাড়ির পরিবেশ নিরিবিলি, তাই একজন চাকর সবসময় থাকা দরকার। শঙ্করবাবুর ভূতের ভয়টা একটা খাঁটি ভয়। অনেক বছর ধরে, অনেক চেষ্টা করেও সেটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

অভিরামকে শঙ্করবাবুর দিনে দিনে বেশি ভাল লাগতে লাগল। এমনি কাজ তো ভাল করেই, খাটতেও পারে। আর সন্ধেবেলা সে সত্যি করে শঙ্করবাবুকে সঙ্গ দেয়।

আরেকটা জিনিস শঙ্করবাবুকে অবাক করে, সেটা হল অভিরামের গল্পের স্টক। সে বলে যে, সব গল্প সে ছেলেবেলায় তার দিদিমার মুখে শুনেছে। উড়িষ্যার অফুরন্ত রূপকথা আর উপকথা। অভিরাম ভূতের গল্প বলার মন্ত্রণাও শঙ্করবাবুকে দিয়েছে। কিন্তু শঙ্করবাবু তাতে আমল দেননি।

'আমি কিন্তু অনেক ভূতের গল্প জানি বাবু', অভিরাম বলল।

'তা হোক, ও জিনিসটা তুমি বাদ দাও।'

'তা বেশ বাবু, তাই হোক। তবে যদি কোনওদিন মনে হয় ভূতের ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তো আমায় বলবেন, তখন আমি আপনাকে ভূতের গল্প শোনাব। দেখবেন কেমন মজাদার গল্প।'

'তুমি নিজে ভূত মানো, অভিরাম?'

'আমার আর মানা না মানার কী আছে বাবু। ভূত থাকলে আছে, না থাকলে নেই, ব্যস্ ফুরিয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, ভূত মানেই যে খারাপ লোক হবে এটা আমি মানি না। ভাল ভূত হলে ক্ষেতি কী?'

কথা আর বেশি আগালো না।

এই ঘটনার তিন মাস পরে এক বর্ষাকালের সকালে অভিরাম শঙ্করবাবুর কাছে এসে বলল, 'বাবু, দাদার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। বেশি বর্ষা হবার ফলে আমাদের ফসলের খুব ক্ষেতি হয়েছে। দাদা একা সামলাতে পারছেন না। আমাকে তিন-চারদিনের জন্য যেতে দিতে পারবেন বাবু?'

শঙ্করবাবু এই অবস্থায় না করতে পারলেন না। 'কিন্তু তুমি যে যাবে, লোক দিয়ে যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই। খুব ভাল লোক দেব। তবে সে বোধ হয় আমার মতো কথা বলতে পারবে না।'

'তা হোক। সন্ধেবেলাটা আমাকে একটু সঙ্গ দিতে পারলেই হল।'

'তা খুব পারবে। আপনি যতক্ষণ না শুতে যাবেন ততক্ষণ ও আপনার কাছে থাকবে।'

অভিরাম চলে গেল। তিনদিন পরে শঙ্করবাবু এক পোস্টকার্ড পেলেন তার ভৃত্যের কাছ থেকে। খবর ভাল নয়। আরও তিনদিন লাগবে সামাল দিতে, তারপর অভিরাম ফিরবে। শঙ্করবাবু কী আর করেন! এদিকে বদলি চাকরটিকে তাঁর বিশেষ পছন্দ নয়। মুখটা যেন বড় বেশি গোমড়া। যদিও কাজ করে ভালই।

পরদিন সকালে রেডিওতে খবর শুনে শঙ্করবাবু স্তম্ভিত। তাঁর চাকরের গাঁ এবং তার চারপাশে বেশ অনেকখানি এলাকা জুড়ে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির ফলে হাজার হাজার লোক মারা গেছে, এবং আরও অনেক বেশি লোক গৃহহীন।

শঙ্করবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এ অবস্থায় কী করা উচিত তা তিনি স্থির করতে পারলেন না। চিঠি লিখে লাভ নেই। অভিরামও যে লিখবে এমন কোনও ভরসা নেই।

অভিরামের বদলি নিতাইও এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারল না। রাত দশটা পর্যন্ত বাবুকে সঙ্গ দিয়ে নিতাই উঠে পড়ল।

শঙ্করবাবু একা তাঁর শোয়ার ঘরে প্রবেশ করলেন। বিছানায় শুয়ে বুঝলেন যে, তাঁর ঘুম আসার সম্ভাবনা কম। অভিরামের অভাব তিনি তীব্রভাবে অনুভব করছেন।

ক্রমে রাত নিঝুম হয়ে এল। একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। এবার তার সঙ্গে শেয়ালের ডাক যোগ হল, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া!

হুয়া আবার কেয়া, শঙ্করবাবুর মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়েছে। ভূতের ভয়ে এর মধ্যেই তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

ওটা কী?

পায়ের শব্দ না?

শঙ্করবাবু বুঝলেন; তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

'বাবু!'

সেকী! এ যে অভিরামের গলা!

'অভিরাম নাকি?' চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'হাঁ বাবু! আমি এসেছি, ফিরে এসেছি!'

'আমার ধড়ে প্রাণ এল অভিরাম, দাঁড়া, দরজা খুলি।'

'না বাবু, খুলবেনিনি।'

'মানে?'

'খুলে কিছু দেখতে পাবেনিনি।'

'সে কী!'

'আমি অভিরাম বাবু, কিন্তু আসল অভিরাম নই। আমি অভিরামের ভূত। আমায় বন্যায় টেনে নিয়ে

গেছে, আমি আর বেঁচে নেই।'

কোনও উত্তর নেই শঙ্করবাবুর দিক থেকে।

'কী বাবু? শুনলেন আমার কথা?'

তবু কোনও উত্তর নেই।

'বাবু!' আবার ডাক এল বাইরের অন্ধকার থেকে।

এবার কথা এল বাড়ির ভিতর থেকে।

'তোকে কীভাবে দেখতে পাব?'

'শুধু একটা ব্যাপার হলে পাবেন।'

'কী?'

'আপনিও যদি ভূত হন।'

'তা সে আর তোকে বলছি কী! তুই ভূত হয়েছিস শুনেই তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে। আমার দেহ ওই পড়ে আছে খাটের উপর, দৃষ্টি ঘরের ছাতের উপর, দেহে প্রাণ নেই।'

'তবে চলে আসুন বাবু!'

'এই এলুম বলে! আমাকে গল্প শোনাতে পারবি, ভূতের গল্প? কারণ, এখন আর ভয় নেই। বাকি মরণটা গল্প শুনে কাটিয়ে দেব, কী বলিস?'

'যা বলেছেন বাবু, যা বলেছেন!'

সন্দেশ, শ্রাবণ ১৩৯৮

অনুবাদ

আর্থার কনান ডয়েল

ব্লু-জন গহ্বরের বিভীষিকা

১৯০৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সাউথ কেনসিংটনের ৩৬ নং আপার কভেন্ট্রি ফ্ল্যাটে যক্ষ্মা রোগে ডাঃ জেম্‌স হার্ডকাস্‌লের মৃত্যুর পর, তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত কাহিনীটি পাওয়া যায়। যাঁরা হার্ডকাস্‌লকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, তাঁরা এ-কাহিনী সম্পর্কে কোনও মন্তব্য না করলেও, অন্তত এটুকু একবাক্যে স্বীকার করেন যে, হার্ডকাস্‌ল একজন সুস্থমস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন ; তাঁর পক্ষে নিছক মনগড়া কতগুলো আজগুবি ঘটনাকে বাস্তব বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা খুবই অস্বাভাবিক ছিল।

লেখাটা পাওয়া যায় একটা খামের মধ্যে। তার শিরোনামায় বলা হয়েছে—'গত চৈত্র মাসে উত্তর-পশ্চিম ডার্বিশায়ারে অ্যালারটনদের ফার্মের নিকটবর্তী স্থানের একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।' বন্ধ খামের পিছনে ছিল পেনসিলে লেখা এই চিঠি—

প্রিয় সিটন,

> শুনে আঘাত পাবে কিনা জানি না—আমার কাহিনী তুমি অবিশ্বাস করার ফলে আমি সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত আর কারুর কাছে কোনও উল্লেখ করিনি। হয়তো বা আমার মৃত্যুর পর শেষ পর্যন্ত কোনও অপরিচিত ব্যক্তি এই কাহিনীর উপযুক্ত মর্যাদা দেবে, যে মর্যাদা থেকে আমার বন্ধু আমায় বঞ্চিত করেছিল।

এই সিটন ব্যক্তিটি যে কে, সেটা অনুসন্ধান করেও জানা যায়নি। ইতিমধ্যে, মৃত ব্যক্তি যে অ্যালারটনদের ফার্মে সত্যিই গিয়েছিলেন, এবং তাঁর থাকাকালীন যে ভয়াবহ ঘটনা সেখানে ঘটেছিল, এবং সেই ঘটনার যে আনুমানিক কারণ তিনি তাঁর লেখায় ব্যক্ত করেছেন, সে সবই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই সামান্য ভূমিকাটুকু দিয়ে, ডায়েরির আকারে বর্ণিত হার্ডকাস্‌লের বিচিত্র কাহিনীটি অবিকল ভাবে নীচে উদ্ধৃত করা হল :

১৭ এপ্রিল

এই জায়গাটির জলবায়ুর গুণ এর মধ্যেই বেশ অনুভব করছি। অ্যালারটনদের ফার্মের উচ্চতা ১৪২০ ফুট, সুতরাং এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর হওয়াই স্বাভাবিক। সকালে সেই কাশির ভাবটা ছাড়া অন্য কোনও অসোয়াস্তি নেই, আর টাট্‌কা দুধ ও মাংস খাওয়ার ফলে ওজন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও সুস্পষ্ট। স্যান্ডারসন আমার অবস্থা শুনলে খুশিই হবে।

অ্যালারটন ভগিনীদ্বয় দু'জনেই বেশ মজার ও অমায়িক প্রকৃতির মহিলা। দু'জনেই অবিবাহিতা। ফলে, স্বামী ও সন্তানের অভাবে দু'জনেরই স্নেহের শেষ কণাটুকু বর্ষিত হচ্ছে এই রুগ্‌ণ ব্যক্তিটির উপর। অবিবাহিতা মহিলারা সংসারে অপ্রয়োজনীয়, এ ধরনের একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে বলে জানি ; কিন্তু আমি ভাবি, এদের অভাবে আমাদের মতো অকৃতদার অপ্রয়োজনীয় পুরুষদের দশা কী হত। স্যান্ডারসন যে কেন আমায় এখানে আসতে বলেছিল, তার কারণটা দুই বোনের কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়ে গেছে। আসলে, আজ অধ্যাপকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেও, স্যান্ডারসনের জীবনের শুরু হয়েছিল এই গ্রাম্য পরিবেশেই। হয়তো ছেলেবেলায় সে এই খামারের আশেপাশে কাক-চড়ুই তাড়িয়ে বেড়িয়েছে।

অসমতল উপত্যকার মাঝখানে অবস্থিত এই গ্রামটি ভারী নির্জন, নিস্তব্ধ। এর পথঘাটগুলি ছবির

মতো সুন্দর। দু'পাশে খাড়াই উঠে গেছে লাইমস্টোনের পাহাড়। এই পাহাড়ের পাথর এতই নরম যে, হাতের চাপে আলগা হয়ে খসে আসে। এখানকার জমির ভিতরটা মনে হল ফাঁপা। একটা অতিকায় হাতুড়ি নিয়ে যদি এই জমির উপর ঘা দেওয়া হয়, তা হলে বোধহয় তা থেকে গুরুগম্ভীর জয়ঢাকের মতো শব্দ বেরোবে। তেমন জোরে ঘা দিলে হয়তো বা জমি ধসে গিয়ে ভূগর্ভস্থিত কোনও বিশাল সমুদ্রের সন্ধান মিলবে। এসব পাহাড়ের ভিতর জলাশয়ের অস্তিত্ব মোটেই অসম্ভব নয়—কারণ বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, অজস্র জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে নানান ফাটলের মধ্য দিয়ে আবার পাহাড়েরই ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। এমন বড় বড় ফাটলও কিছু রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হলে মনে হয় যেন আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথ দিয়ে তারা সোজা একেবারে পৃথিবীর অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছেছে। আমার সাইক্লের ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে এসব গহ্বরের আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে আমি গভীর আনন্দ পাই। গহ্বরের ছাতে আলো ফেললে দেখা যায় স্ট্যাল্যাক্টাইটের কালোর ফাঁকে ফাঁকে রুপালির ঝলমলানি। আলো নেভালে দুর্ভেদ্য অন্ধকার, জ্বালালে আরব্যোপন্যাসের মায়াপুরীর বর্ণচ্ছটা।

এইসব ফাটলের মধ্যে একটির বিশেষত্ব হল এই যে, সেটা মানুষের কীর্তি, প্রকৃতির নয়। ব্লু-জনের কথা আমি এখানে আসার আগে শুনিনি। এক জাতীয় নীল রঙের খনিজ পদার্থের নাম হল ব্লু-জন। এই ধাতু এতই দুষ্প্রাপ্য যে, এর তৈরি একটা ফুলদানিই বিক্রি হয় আগুনের দামে। আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রোমানরাই প্রথম এই অঞ্চলে ব্লু-জনের অস্তিত্ব অনুমান করে পাহাড়ের গায়ে একটা গভীর সুড়ঙ্গ খনন করে। আগাছার জঙ্গলে আবৃত এই সুড়ঙ্গের মুখটাকেই বলা হয় ব্লু-জন গ্যাপ। রোমানদের এই কীর্তির তারিফ না করে উপায় নেই। নোনা-ধরা অনেক গহ্বর ভেদ করে চলে গেছে এই সুড়ঙ্গ। অতি সন্তর্পণে, অনেক মোমবাতি হাতে মজুত রেখে এই সুড়ঙ্গে প্রবেশ না করলে, এর অন্ধকার জগৎ থেকে আবার বাইরের আলোয় বেরিয়ে আসা একেবারে অসম্ভব। আমি এখন পর্যন্ত বেশিদূর এগোইনি, তবে আজই সকালে এর মুখটায় দাঁড়িয়ে গহ্বরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার স্বাস্থ্য ফিরে পেলে কোনও এক ছুটির দিনে এসে, রোম্যানরা ডার্বিশায়ারের পাহাড় ভেদ করে কতদূর ঢুকতে পেরেছিল, সেটা যাচাই করে দেখব।

এখানকার লোকেরা যে কী পরিমাণ কুসংস্কারে বিশ্বাসী তা ভাবলে অবাক লাগে। এমনকী আর্মিটেজ ছোক্রাটিও দেখলাম বাদ যায় না। অথচ সে তো বেশ সুস্থ সবল শিক্ষিত লোক, আর মানুষ হিসেবেও চমৎকার। আমি গহ্বরটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি সে সামনের মাঠ পেরিয়ে আমারই দিকে আসছে। এসে বলল, 'ডাক্তারবাবুর দেখছি এ ব্যাপারে তেমন ভয়ডর নেই।'

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'ভয় ? কীসের ভয় ?'

আর্মিটেজ গহ্বরের অন্ধকারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যিনি থাকেন ওর ভিতরে—তাঁর !'

এইসব পাণ্ডববর্জিত গ্রামদেশে উদ্ভট সব কিংবদন্তি গড়ে ওঠা বোধহয় খুব সহজ, আমি আর্মিটেজকে জেরা করে তার এই অদ্ভুত ধারণার কারণ জানলাম। সে বলল প্রায়ই নাকি গ্রামের এখান-সেখান থেকে একটি-আধটি করে ভেড়া উধাও হয়ে যায়। আর্মিটেজের মতে নাকি সেগুলোকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা যে আপনা থেকেই ভুল পথে চলে গিয়ে পাহাড়ের খাদে-খন্দে হারিয়ে যেতে পারে, সে-কথা বলতে আর্মিটেজ বলল, একবার নাকি এক চাপ রক্ত ও একগোছা ভেড়ার লোম পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। এই ঘটনারও যে একটা অত্যন্ত সাধারণ কারণ থাকতে পারে, সেটা বলতে আর্মিটেজ পালটা জবাব দিল যে, ভেড়াগুলো উধাও হয় নাকি কেবলমাত্র অমাবস্যার রাত্রে। তাতে আমি বললাম যে, এসব অঞ্চলে যদি ভেড়া-চোর থেকে থাকে, তা হলে তারা তাদের কাজের জন্য যে অমাবস্যার রাতটাই বেছে নেবে, তাতে আর আশ্চর্য কী ? জবাবে আর্মিটেজ বলল, একবার নাকি দেখা গিয়েছিল গ্রামের একটা পাঁচিলের গা থেকে কে যেন বড় বড় পাথরের ইট সরিয়ে সেগুলোকে বহুদূরে ছড়িয়ে ফেলে রেখে এসেছে। আমার মতে এ কাজও অবিশ্যি মানুষের অসাধ্য নয়। কিন্তু সবশেষে আর্মিটেজ এক তুরুপ মেরে বসল। সে বলল

সে নাকি এই অদৃশ্য প্রাণীটির গর্জন শুনতে পেয়েছে। গহ্বরের মুখে একটানা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই নাকি সে-শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। আর বহুদূর থেকে এলেও সে-শব্দের জোর নাকি সহজেই অনুমান করা যায়। কথাটা শুনে আমি না হেসে পারলাম না। আমি জানতাম যে পাহাড়ের ভিতর যদি জল চলাচল করে, তা হলে লাইমস্টোনের ফাঁকে ফাঁকে সেই জলপ্রবাহের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে বাইরে থেকে গর্জনের মতো শোনানো কিছুই আশ্চর্য নয়। এভাবে বারবার তার কথার প্রতিবাদ করায় আর্মিটেজ শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমায় ছেড়ে চলে গেল।

আর তার পরমুহূর্তে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। আমি গহ্বরের মুখটায় দাঁড়িয়ে, আর্মিটেজের কথাগুলো কত সহজে হেসে উড়িয়ে দেওয়া গেল তাই ভাবছি, এমন সময় সত্যিই গহ্বরের ভিতর থেকে এল এক অদ্ভুত শব্দ। সে-শব্দের সঠিক বর্ণনা দেব কী করে? প্রথমত, শুনে মনে হল সেটা আসছে বহুদূর থেকে—যেন পৃথিবীর একেবারে গভীরে অবস্থিত কোনও জায়গা থেকে। কিন্তু দূর থেকে এলেও শব্দটা রীতিমতো জোরে। জলধারা বা পাথর গড়িয়ে পড়া থেকে যে শব্দ হয়, এটা সে জাতের নয়। এ-যেন এক তীব্র, তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনির মতো। এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার ফলে কিছুক্ষণের জন্য আর্মিটেজের কথাগুলো আমাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলল। আমি আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সে-শব্দ শোনা গেল না। বাড়ি ফিরলাম মনে গভীর বিস্ময়ের ভাব নিয়ে। আর্মিটেজের কথায় আমল দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু এটা অস্বীকার করা চলে না যে, যে-শব্দটা আমি নিজের কানে শুনেছি, সেটা ভারী অদ্ভুত। এখনও লিখতে লিখতে যেন কানে সে-শব্দটা শুনতে পাচ্ছি।

এপ্রিল ২০

গত তিন দিনে আমি বার কয়েক ব্লু-জন গ্যাপের দিকে গিয়েছি। এমনকী, সুড়ঙ্গের ভিতরেও কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু আমার ল্যাম্পের আলো যথেষ্ট জোরালো না হওয়ায় বেশিদূর যেতে সাহস পাইনি। এবারে আরও আঁটঘাট বেঁধে যেতে হবে। শব্দটা আর দ্বিতীয়বার শোনার সৌভাগ্য হয়নি। এক-একবার মনে হয়েছে যে, প্রথমবারে শোনাটা হয়তো আমার আর্মিটেজের সঙ্গে কথাবার্তার ফলে আমার কল্পনাপ্রসূত। সমস্ত ব্যাপারটাই যে আজগুবি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ

নেই। যদিও এটা না বলে পারছি না যে, গ্যাপের মুখে ঝোপঝাড়ের অবস্থা দেখে এক-এক সময় মনে হয়েছে যে, কোনও অতিকায় জীব হয়তো তার মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে যাতায়াত করছে। মোট কথা, আমার মনে একটা তীব্র কৌতূহল জেগে উঠেছে। অ্যালারটনদের আমি এখনও কিছু বলিনি, কারণ এঁরাও কুসংস্কার থেকে মুক্ত নন। কিন্তু আমি নিজে আরও অনুসন্ধান করব, আর তার জন্য কিছু মোমবাতিও কিনে রেখেছি।

আজ সকালে গ্যাপের কাছাকাছি ঝোপের আশেপাশে কিছু ভেড়ার লোম পড়ে থাকতে দেখলাম। একটা লোমের গোছায় দেখি রক্ত লেগে রয়েছে। বেশ বুঝতে পারি যে, পাথুরে জায়গায় চরে বেড়ালে ভেড়াগুলো আপনা থেকেই জখম হতে পারে, কিন্তু তাও হঠাৎ ওই লালের ছোপ চোখে পড়াতে কেমন যেন চমকে উঠলাম। রোমানদের কারুকার্যে শোভিত গহ্বরের ওই প্রবেশদ্বার মনের মধ্যে একটা অজানা আতঙ্কের সঞ্চার করল। গহ্বরের অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন আদ্যিকালের একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। সত্যিই কি কোনও নাম-না-জানা প্রাণী ওই অন্ধকারের মধ্যে বাস করে ? সুস্থ অবস্থায় হয়তো এসব চিন্তা মাথায় আসত না। অসুখে মানুষের স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে, আর তাই তার মনে নানান অসম্ভব কল্পনা দানা বাঁধতে পারে।

এইসব ভীতিজনক চিন্তা আমার সঙ্কল্পকে শিথিল করে দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, গহ্বরের রহস্য রহস্যই থাক, এ নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। কিন্তু আজ রাত্রে আবার নতুন করে উৎসাহ জেগে উঠেছে, আর মনেও অনেকটা জোর পাচ্ছি। আশা করি, কাল এ-ব্যাপারে আরও কিছুদূর অগ্রসর হতে পারব।

এপ্রিল ২২

আমি যথাসাধ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে কালকের অদ্ভুত অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। কাল যখন আমি ব্লু-জন গ্যাপের উদ্দেশে রওনা দিই, তখন বিকেল। বলতে দ্বিধা নেই, সেখানে পৌঁছে গহ্বরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে চাইতেই আবার যেন সেই আশঙ্কার ভাবটা আমার মনে জেগে উঠল। মনে হল, একা না এসে একজন সঙ্গী আনা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মনে সাহস ফিরিয়ে এনে মোমবাতি জ্বেলে কাঁটা-ঝোপের জঙ্গল ভেদ করে গহ্বরের ভিতর ঢুকলাম।

আলগা পাথরের ঢাকা জমির উপর দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নামার পর একটা রাস্তা পেলাম, যেটা একেবারে পাহাড় ভেদ করে সোজা সামনের দিকে চলে গেছে। যদিও আমি জিওলজিস্ট নই, তবু এটুকু বুঝতে পারলাম যে, এ পাথর লাইমস্টোনের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত জাতের কোনও পাথর, কারণ এর গায়ে প্রাচীন শাবলের দাগ রয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন এই সবেমাত্র খোঁড়া হয়েছে। আমি কোনওমতে হোঁচট খেতে খেতে এই প্রাচীন পাথরের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। আমার হাতের মোমবাতি আমাকে ঘিরে একটা ক্ষুদ্র আলোর গণ্ডি রচনা করেছে। তার ফলে সামনের সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় পৌঁছে দেখি সেটা গিয়ে পড়েছে একটা বিশাল নোনা-ধরা পাথরের গহ্বরে, যার ছাত থেকে ঝুলে আছে চুনে-ঢাকা অসংখ্য লম্বা-লম্বা আইসিক্‌ল। আবছা আলোয় আরও লক্ষ করলাম যে, গহ্বরের দেওয়াল ভেদ করে চারদিক দিয়ে আরও অনেকগুলো জলে-ক্ষয়ে-যাওয়া রাস্তা এঁকেবেঁকে কোথায় যেন গিয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরও এগোব না ফিরে যাব তাই ভাবছি, এমন সময় আমার পায়ের কাছে একটা জিনিস প্রবলভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

গহ্বরের মেঝেয় অধিকাংশটাই হয় পাথর না হয় চুনের আবরণে ঢাকা ; কিন্তু একটা জায়গায় বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে ছাত থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে কাদা হয়ে আছে। সেই কাদার ঠিক মাঝখানে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ছাপ, অস্পষ্ট অথচ গভীর। উপর থেকে পাথরের চাঁই পড়লে যেরকম হয় অনেকটা সেইরকম। কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে কোনও আল্‌গা পাথর বা এমন কিছু লক্ষ করলাম না, যাকে ওই ছাপের জন্য দায়ী করা চলে। অথচ কোনও পরিচিত জন্তুর এতবড় পায়ের ছাপ পড়া সম্ভব নয়। আর জন্তুই যদি হয়, তা হলে মাত্র একটা পায়ের ছাপ কেন ? যতখানি জায়গা জুড়ে

কাদা হয়েছে, কোনও চেনা জন্তু অন্তত আর-একটা ছাপ না ফেলে অতখানি জায়গা পেরোতে পারে না। যাই হোক, আমি ওই আশ্চর্য ছাপটা পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়িয়ে, চারদিকে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলাম আমার বুকের ভিতরে একটা দুরু দুরু কাঁপুনি শুরু হয়েছে, আর তার সঙ্গে আমার হাতের মোমবাতিটাও কিছুতে স্থির রাখতে পারছি না।

অবশেষে নিজের মনকে বোঝালাম যে, অতবড় ছাপ যখন কোনও পরিচিত জানোয়ারের হতে পারে না—এমনকী হাতিরও নয়, তখন এ ধরনের অমূলক কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটানো ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও এগোনোর আগে আমি একবার যে সুড়ঙ্গটা দিয়ে গহ্বরে এসে পৌঁছেছি, তার মুখের চেহারাটা ভাল করে দেখে চিনে রাখলাম। এ কাজটা খুবই দরকারি, কারণ এটা ছাড়া আরও অনেকগুলো রাস্তা গহ্বর থেকে বেরিয়েছে। কোথায় ফিরতে হবে সেটা জেনে নিয়ে, অবশিষ্ট মোমবাতি ও দেশলাই-এর কাঠিগুলো একবার পরীক্ষা করে, আমি অসমতল পাথরের উপর দিয়ে গহ্বরের ভিতর এগিয়ে চললাম।

রওনা হওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আচমকা এক চরম বিপদের সামনে পড়তে হল। আমার সামনে দিয়েই বয়ে চলেছিল প্রায় বিশ ফুট চওড়া একটা নালা। সেটাতে পা না ভিজিয়ে টপকে পার হওয়া যায় কোনখান দিয়ে, সেটা দেখবার জন্য আমি জলের ধার দিয়ে হেঁটে চলেছি, এমন সময় নালার উপর একটা পাথরের ঢিপি চোখে পড়ল। আন্দাজে মনে হল এক লাফে সেই ঢিপিটার উপর পৌঁছনো যায়। কিন্তু পাথরের তলার দিকটা জলে ক্ষয়ে যাওয়ার ফলে সেটার উপর লাফ দিয়ে পড়তেই পাথরটা কাত হয়ে আমায় ফেলে দিল একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা নালার জলে। মোমবাতিটা নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গেই, আর আমি ঘুটঘুটে অন্ধকারে জলের মধ্যে পড়ে অসহায়ভাবে এদিক ওদিক হাতড়াতে লাগলাম।

শেষটায় কোনওরকমে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের গোঁয়ার্তুমির কথা ভেবে ভয়ের চেয়ে হাসিই পেল বেশি। জ্বলন্ত মোমবাতিটা অবশ্যই জলে পড়ে খোয়া গেছে, কিন্তু আমার পকেটে রয়েছে আরও দুটো, কাজেই চিন্তা নেই। একটা মোমবাতি বার করে সেটা জ্বালাতে গিয়ে বুঝতে পারলাম বিপদটা কোথায় ; জলে পড়ার ফলে আমার দেশলাইয়ের বাক্সটা ভিজে একেবারে সপ্‌সপে হয়ে গিয়েছে, ফলে সেটাতে আর কোনও কাজই হবে না।

এবার সত্যি করেই আমার রক্ত হিম হয়ে এল। অন্ধকারের নমুনাটাও এবার বেশ বুঝতে পারলাম। চারদিক থেকে সে অন্ধকার যেন আমায় ঘিরে চেপে ধরেছে ; হাত দিয়ে যেন সে অন্ধকারের ঘনত্ব অনুভব করা যায়। আমি কোনওরকমে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম। গহ্বরের কোন্‌দিকে কী আছে সেটা প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে চেষ্টাও বৃথা—কারণ চিনে রাখার মতো যা কিছু দেখে রেখেছিলাম, তা সবই দেওয়ালের উপর দিকে—সুতরাং মেঝে হাতড়ে কোনও ফলই হবে না। তাও, হয়তো দেওয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে সাবধানে এগোলে আবার রোমান সুড়ঙ্গর মুখটায় পৌঁছনো যেতে পারে, এই মনে করে আমি এক পা দু' পা করে দেওয়ালের দিক আন্দাজ করে এগোতে লাগলাম। অচিরেই বুঝতে পারলাম, এ চেষ্টায় কোনও ফল হবে না। ওই বেয়াড়া অন্ধকারে দশ-বারো পা হাঁটার পরেই বুঝলাম যে, এ অবস্থায় দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান বজায় রাখা অসম্ভব। নালার কুলকুল শব্দ থেকে অবশ্য বুঝতে পারছিলাম সেটা কোনখান দিয়ে বইছে—কিন্তু সেটা থেকে সামান্য দূরে গেলেই নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে হচ্ছিল। বুঝলাম এ অবস্থায় গহ্বর থেকে বেরোনোর কোনও উপায় নেই।

আমি আবার সেই পাথরটার উপর বসে আমার শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করলাম। আমি যে ব্লু-জন গহ্বরে অভিযানের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম, সে-কথা আমি কাউকে বলিনি। সুতরাং আমি হারিয়ে গেলেও আমাকে খুঁজতে কোনও সার্চ-পার্টি যে এদিকে আসবে এমন কোনও আশা নেই। একমাত্র নিজের উপস্থিত বুদ্ধি ছাড়া আমার আর কোনও অবলম্বন নেই। মুক্তির উপায় যেটা রয়েছে, সেটা হল কোনও একটা পন্থা বার করে দেশলাইগুলোকে শুকিয়ে নেওয়া। আমি যখন জলে পড়েছিলাম, তখন আমার শরীরের একটা দিকই ভিজেছিল। বাঁ দিকের কাঁধটা জলের উপরে ছিল। আমি দেশলাইয়ের বাক্সটা বার করে সেটাকে আমার বাঁ বগলের তলায় চেপে বসে রইলাম।

শরীরের উত্তাপ সেটাকে শুকোনোর কাজে নিশ্চয়ই কিছুটা সাহায্য করবে। তবে কমপক্ষে ঘণ্টাখানেকের আগে মোমবাতি জ্বালানোর কোনও সম্ভাবনা নেই—এবং এই ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোনও গতি নেই।

আসবার সময় কিছু বিস্কুট পকেটে পুরে এনেছিলাম, তারই একটা মুখে পুরে চিবোতে লাগলাম। বিস্কুটের শুকনো ভাবটা কাটানোর জন্য যে নালায় আমার পতন হয়েছিল, তারই খানিকটা জল আঁজলা করে তুলে মুখে ঢেলে দিলাম।

খাওয়া শেষ হলে পর নিজের শরীরটাকে ঢিপির উপর একটু এদিক-ওদিক নেড়ে ঠেস দেওয়ার একটা জায়গা বার করে, পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। গহ্বরের স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডাটা বেশ তীব্রভাবেই অনুভব করছিলাম, কিন্তু মনকে বোঝালাম যে, আধুনিক চিকিৎসকদের মতে আমার যে রোগ, তাতে জানলা খুলে শোয়া, এবং শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণ—এ দুটোর কোনওটাই নিষিদ্ধ নয়। ক্রমে গহ্বরের দুর্ভেদ্য অন্ধকার ও নালার একঘেঁয়ে কুলকুলুনি আমায় তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলল।

কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না। ঘণ্টাখানেক কিংবা তারও হয়তো কিছু বেশি হবে। এমন সময় হঠাৎ আমাকে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে ঢিপির উপর সোজা হয়ে উঠে বসতে হল। আমার কানে একটা শব্দ এসেছে, যেটা নালার শব্দের চেয়ে একেবারে আলাদা। শব্দটা এখন আর নেই, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি এখনও আমার কানে বাজছে। এটা কি মানুষের পায়ের শব্দ ? আমাকে খুঁজতে এসেছে কি কোনও দল ? কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে তো তারা আমার নাম ধরে ডাকবে। যা শুনেছি তা তো মানুষের গলার শব্দ নয় ! আমি দুরু দুরু বক্ষে দম প্রায় বন্ধ করে বসে রইলাম। ওই যে—আবার সেই শব্দ ! ওই—আবার ! এবার আর থামা নেই। একটানা শব্দ আসছে—কোনও জানোয়ারের পদক্ষেপের শব্দ—দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ ! কী বিশাল এই পদধ্বনি ! জানোয়ারটি যে আয়তনে বিরাট, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে হয় পায়ের তেলোগুলো নরম হওয়ার ফলে শব্দটা খানিকটা চাপা। এই অন্ধকারেও সেই পদক্ষেপে বিন্দুমাত্র ইতস্তত ভাব নেই। আর এতেও কোনও সন্দেহ নেই যে, সেটা আমার দিকেই আসছে।

পায়ের আওয়াজ শুনতে শুনতে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। কোনও অজ্ঞাত প্রাণী অন্ধকারের বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসছে। আমি পাথরের উপর সটান শুয়ে পড়ে নিজেকে যথাসম্ভব অদৃশ্য করে ফেলার চেষ্টা করলাম। শব্দটা এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর শুরু হল একটা সপাৎ সপাৎ আওয়াজ। জন্তুটা নালার জল খাচ্ছে। তারপর একটুক্ষণ চুপচাপ, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, আর নাক টেনে গন্ধ শোঁকার শব্দ। জন্তুটা কি আমার অস্তিত্ব টের পেয়ে গেল নাকি ? আমার নিজের নাক তখন একটা বিশ্রী বুনো গন্ধে ভরে আছে। তারপর আবার শুরু হল পায়ের শব্দ, আর সেটা যেন নালার এদিকে—আমার কাছেই। আমার হাতকয়েকের মধ্যে কিছু আলগা পাথর খড়বড় করে উঠল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে পাথরের উপর ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। তারপর শুনলাম পায়ের শব্দ পিছিয়ে যাচ্ছে। জলের ছপ্‌ছপানি শুনে বুঝলাম, জন্তুটা নালা পেরিয়ে উলটো দিকে চলে যাচ্ছে। ক্রমে যেদিক দিয়ে শব্দটা এসেছিল সেইদিকেই আবার সেটা মিলিয়ে গেল।

আমি বেশ কিছুক্ষণ পাথরের উপর পড়ে রইলাম। ভয়ে নড়বার শক্তি ছিল না। শব্দটার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল, আর আর্মিটেজের আতঙ্কের কথা, আর নরম কাদার উপর সেই বিরাট পায়ের ছাপের কথা।

এখন আর কোনও সন্দেহ নেই যে, পাহাড়ের এই গহ্বরে কোনও এক নাম-না-জানা, ভয়াবহ, অতিকায় প্রাণী বাস করছে। সেটা যে কেমন দেখতে, তা এখনও অনুমান করতে পারিনি, তবে এটুকু জানি যে, সেটা আয়তনে বিরাট এবং আশ্চর্য দ্রুতগতি। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, এমন জানোয়ার অসম্ভব, কিন্তু আমার আজকের অভিজ্ঞতা এর বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব আমার মনকে অস্থির করে তুলল। অবশেষে মনকে বোঝালাম যে, আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছি। আমার রুগ্‌ণ অবস্থাই আমার মনে এক কাল্পনিক বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু, এবার যে ঘটনাটা ঘটল,

তাতে আমার মনে আর সন্দেহের কোনও কারণই রইল না।

আমার দেশলাই এতক্ষণে শুকিয়েছে মনে করে আমি বগল থেকে সেটা বার করে একটা কাঠি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। গহ্বরের ফাটলে হাত ঢুকিয়ে বাক্সের গায়ে কাঠি ঘষতেই সেটা ফস্ করে জ্বলে ইঠল। মোমবাতি জ্বালিয়ে, যেদিকে জানোয়ার গেছে সেদিকে একবার ভয়ে ভয়ে দেখে নিয়ে রোমান সুড়ঙ্গের দিকে রওনা দিলাম। যাওয়ার পথে জমির নরম অংশটাতে চোখ পড়তেই দেখলাম, আগের ছাপের মতো আরও তিনটে টাটকা ছাপ সেখানে পড়েছে, সেইরকমই গভীর আর সেইরকমই বিরাট। এ-দৃশ্যে আবার নতুন করে যেন ভয়ে আমার হৃৎকম্প শুরু হল। আমি মোমবাতির শিখাটাকে হাত দিয়ে আড়াল করে প্রাণপণে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে, এক নিশ্বাসে দরজার মুখ দিয়ে বেরিয়ে কাঁটাঝোপ ভেদ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বাইরের ঘাসের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। মাথার উপর আকাশে তখন অজস্র তারা ঝলমল করছে।

বাড়ি পৌঁছলাম রাত তিনটায়। আজ এখন পর্যন্ত আমার স্নায়ুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে আতঙ্ক ও উত্তেজনার শিহরন রয়েছে। কিন্তু এখনও আমি কাউকে কিছু বলিনি। এ-ব্যাপারে খুব সাবধানে এগোতে হবে। এখানকার সরল গ্রাম্য অধিবাসীরা, বা নিরীহ অ্যালারটন ভগিনীদ্বয়, আমার এ ঘটনা শুনলে কী মনে করবে জানি না। আমার এখন এমন কারুর কাছে যাওয়া উচিত, যাকে ঘটনাটা বললে সে একটা উপায় বাতলাতে পারবে।

এপ্রিল ২৫

গহ্বরের অভিজ্ঞতার পর দু'দিন আমি শয্যাশায়ী ছিলাম। গত ক' দিনের মধ্যে আমার এমন আর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, যাতে অন্যটার চেয়ে কিছু কম ধাক্কা খাইনি। আগেই বলেছি, আমি এমন একজনের অনুসন্ধান করছিলাম, যে আমাকে কিছুটা পরামর্শ দিতে পারবে। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে মার্ক জনসন বলে এক ডাক্তার থাকেন। প্রফেসর স্যান্ডারসন এই ডাক্তারটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে একটা চিঠি আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। আমি একটু সুস্থ হয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ঘটনাটা খুলে বললাম। তিনি মনোযোগ সহকারে সবকিছু শোনার পর আমার স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া ও আমার চোখের মণি খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখা শেষ হলে পর তিনি কোনও আলোচনার দিকে না গিয়ে সোজাসুজি বললেন যে, আমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাঁর আওতার বাইরে। তবে কাস্‌লটনে মিঃ পিক্‌টন বলে এক ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার ঘটনাটা তাঁকে আদ্যোপান্ত জানানো দরকার। তিনিই নাকি একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আমাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।

অগত্যা, স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে একটা ছোট্ট শহরে গিয়ে হাজির হতে হল। শহরের এক প্রান্তে একটা সম্ভ্রান্ত অট্টালিকার সামনে গেটের গায়ে পিতলের ফলকে পিক্‌টনের নাম দেখে বুঝলাম তিনি এখানকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। দরজায় বেল-টা টেপার সময় মনে কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগল। কাছাকাছি একটা দোকানে গিয়ে মালিককে পিক্‌টন সাহেব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি একগাল হেসে বললেন, 'সে কী, জানেন না? উনি যে এ-তল্লাটে সবচেয়ে নামকরা মাথার-ব্যামোর ডাক্তার! ওই তো ওর পাগলা গারদ।' বলা বাহুল্য, আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে না থেকে সোজা আমার গ্রামে ফিরে এলাম। চুলোয় যাক এইসব পণ্ডিত লোক। এঁরা যেন এঁদের জ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে কোনও কিছুই স্বীকার করতে চান না। অবশ্য, এখন ঠাণ্ডা মাথায় বুঝতে পারছি যে, আমি আর্মিটেজের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি, জনসনও আমার সঙ্গে ঠিক সেই একই ব্যবহার করেছেন।

এপ্রিল ২৭

ছাত্রাবস্থায় সাহস ও উদ্যমের জন্য আমার বেশ খ্যাতি ছিল। একবার কোল্টব্রিজের এক হানাবাড়িতে রাত কাটাবার কথা উঠলে আমিই প্রথম এগিয়ে গিয়েছিলাম। এখন আমার বয়স

পঁয়ত্রিশ। তা হলে কি বয়স বাড়ার ফলেই আমার সাহস কমেছে, না কি আমার রোগই এর কারণ ? গহ্বর আর তার অধিবাসীর কথা ভাবলে এখনও আমার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় কী করা যায়, এ প্রশ্ন প্রতি মুহূর্তেই আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। কাউকে কিছু না বলে যদি চুপচাপ বসে থাকি, তা হলে হয়তো গহ্বরের রহস্য চিরকাল রহস্যই থেকে যাবে। আবার যদি সকলের কাছে সব কিছু প্রকাশ করে ফেলি, তা হলে হয়তো সারা গ্রাম জুড়ে একেবারে আতঙ্কের বন্যা বয়ে যাবে। আর না হয় তো এরা আমাকে পাগল ভেবে সেই গারদেই চালান দেবে। সবচেয়ে ভাল পন্থা বোধহয় আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে আরও ভালভাবে আঁটঘাট বেঁধে আর একবার গহ্বরে অভিযান। আমি এর মধ্যেই কাস্‌লটনে গিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে এনেছি। তার মধ্যে প্রধান হল একটা অ্যাসিটিলিন ল্যাম্প ও একটা দোনলা বন্দুক। দ্বিতীয়টা অবশ্য ধার করতে হয়েছে, কিন্তু এক ডজন ভাল কার্তুজ আমি নিজে পয়সা খরচ করে কিনেছি। যা আছে, তাতে একটা আস্ত গণ্ডার অনায়াসে ধরাশায়ী করা চলে। মোট কথা, আমার গুহাবাসী বন্ধুটির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি প্রস্তুত। কিছুটা স্বাস্থ্যোন্নতি ও আরও খানিকটা মনের জোর পেলেই আমি 'যুদ্ধং দেহি' বলে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু আপাতত, এই জানোয়ারটি ঠিক কোন জাতের সে প্রশ্নে আমার ঘুম নষ্ট হতে চলেছে। একের পর এক নানান জবাব আমি নিজেই বাতিল করে দিয়েছি। ভেবে ভেবে কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছি না। এটা যে একটা রক্তমাংসের জ্যান্ত জানোয়ার, সেটা তো তার চিৎকার আর তার পায়ের ছাপ থেকেই প্রমাণ হয়। তা হলে কি হিংস্র ড্রাগন জাতীয় যেসব প্রাণীর কথা আমরা রূপকথায় পড়েছি, সেগুলো আসলে কাল্পনিক নয় ? তাদের খানিকটা অংশ কি আসলে সত্যি, এবং সেই সত্যটুকু প্রমাণ করার ভার কি শেষটায় আমার উপর পড়ল ?

৩ মে

ক'দিন যাবৎ এখানকার বসন্তকালের খামখেয়ালি আবহাওয়াটা আমাকে বেশ কাবু করেছে। আর এই ক'দিনের ভিতরই এমন কিছু উদ্ভট ঘটনা ঘটেছে, যার তাৎপর্য কেবল আমিই বুঝি। রাতগুলো মেঘলা হওয়ায় তিনদিন চাঁদের আলো ছিল না। এর আগে ঠিক এমন রাত্রেই একটি ভেড়া উধাও হয়েছে। গত কয়েক রাত্রেও ভেড়া লোপ পেয়েছে—অ্যালারটনদের দুটি, ক্যাটওয়াকের বুড়ো পিয়ার্সনের একটি ও মিসেস মুলটনের একটি। তিন রাত্রে চারটি ভেড়া উধাও। কোনও চিহ্নই পাওয়া যায়নি সেগুলোর, ফলে চতুর্দিকে নানারকম গুজব রটছে। কেউ বলে এটা ভেড়া-চোরের কাজ, কেউ বলে আশেপাশে নাকি বেদেরা আস্তানা গেড়েছে—এ হল তাদেরই কীর্তি।

কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর একটা ঘটনা ঘটেছে গত ক'দিনের মধ্যে ; আর্মিটেজ নিখোঁজ। গত বুধবার রাত্রে সে নাকি তার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ; তারপর থেকে তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর্মিটেজের আত্মীয়স্বজন নেই, তাই তার অন্তর্ধান তেমন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেনি। লোকে বলছে সে নাকি অনেক টাকা ধারত, তাই অন্য কোনও জায়গায় চাকরি নিয়ে চলে গেছে—সেখান থেকে ক'দিনের মধ্যেই হয়তো তার জিনিসপত্র চেয়ে পাঠাবে। আমার নিজের কিন্তু অন্যরকম আশঙ্কা হচ্ছে। আমার বিশ্বাস ভেড়া-চুরির ব্যাপারটার কোনও একটা বিহিত করতে গিয়েই সে প্রাণ হারিয়েছে। হয়তো সে ওই অজ্ঞাত জীবটির অপেক্ষায় ওত পেতে বসে ছিল, আর সেটা উলটে তাকেই আক্রমণ করে তার গহ্বরের ডেরায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। বিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের মতো সভ্য দেশে এ ধরনের ঘটনা ভাবতেও অবাক লাগে, যদিও আমার মতে এটা মোটেই অসম্ভব নয়। আর সত্যিই যদি তাই হয়, তা হলে কি আমার এ-ব্যাপারে একটা দায়িত্ব নেই ? আমি যখন এতদূরই জেনেছি, তখন আমার কর্তব্য এটার একটা প্রতিকারের চেষ্টা করা—সম্ভব হলে নিজেই। আজকের একটা ঘটনার পর আমি স্থির করেছি, নিজেই এ-ব্যাপারে একটা কিছু করব। সকালে স্থানীয় পুলিশ-স্টেশনে গিয়েছিলাম। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব গম্ভীর ভাবে আমার বক্তব্য একটা মোটা খাতায় তুলে নিয়ে আমাকে নমস্কার করে বিদায় দিলেন। বাইরে বেরোতে না বেরোতে শুনতে পেলাম তাঁর অট্টহাসি। বুঝতে পারলাম, তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে আমার কাহিনীটা বেশ

রসিয়ে পুনরাবৃত্তি করছেন।

ঠিক দেড় মাস পর আমার খাটে বালিশের ওপর পিঠ দিয়ে বসে আমি আবার ডায়রি লিখছি। শরীর ও মন বিপর্যস্ত বিহ্বল হয়ে আছে। যে সংকটের সামনে পড়তে হয়েছিল, আর কোনও মানুষের ভাগ্যে তেমন হয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ব্লু-জন গ্যাপের বিভীষিকা চিরকালের মতো বিদায় হয়েছে, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আমার মতো রুগ্‌ণ ব্যক্তির পক্ষেও কিছু করা সম্ভব হয়েছে। এইবারে যথাসম্ভব পরিষ্কার ভাবে যা ঘটেছিল, তার বিবরণ দিই।

৩ মে-র রাতটা ছিল অন্ধকার ও মেঘাচ্ছন্ন—ঠিক যেমন-রাত্রে নাম-না-জানা জানোয়ারটা হানা দিতে বেরোয়। রাত এগারোটায় হাতে লণ্ঠন ও বন্দুক নিয়ে আমি বাড়ি থেকে রওয়ানা দিলাম। যাওয়ার আগে টেবিলের উপর একটা কাগজে লিখে গেলাম যে, আমি যদি না ফিরি, তা হলে যেন ব্লু-জন গ্যাপের আশেপাশে আমার অনুসন্ধান করা হয়। রোমান সুড়ঙ্গের মুখটাতে পৌঁছে, কাছাকাছি একটা পাথরের ঢিপি বেছে নিয়ে লণ্ঠনের ঢাকনাটা বন্ধ করে হাতে বন্দুক নিয়ে ঢিপিটার উপর ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

এই বসে থাকার যেন আর শেষ নেই। উপত্যকাটার চারদিকে টিপটিপ করছে কৃষকদের বাড়ির বাতিগুলো। দূর থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভেসে আসছে চ্যাপ্‌ল-লি-ডেল গির্জার ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ। আশেপাশে অন্য লোকজন যে রয়েছে, তার চিহ্নগুলো যেন আমার একাকিত্বকে আরও করুণ ও দুর্বিষহ করে তুলছিল। এক-এক সময় মনে হচ্ছিল, আমার অভিযানে জলাঞ্জলি দিয়ে সব ছেড়ে-ছুড়ে বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু মানুষের মনে আত্মসম্মান বোধটা এত গভীর ও বদ্ধমূল যে, একটা কোনও সংকল্প নিয়ে একবার অগ্রসর হলে মাঝপথে ফিরে আসা ভারী মুশকিল।

সেই কারণেই সেদিন আমি গহ্বরের মুখ থেকে ফিরে আসতে পারিনি। আর যাই হোক, আমি কাপুরুষ, এ অপবাদ আমাকে কেউ দিতে পারবে না।

দূরের গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজল। তারপর একটা, তারপর দুটো। এই সময়টা অন্ধকার সবচেয়ে গভীর। তারাহীন আকাশের নীচ দিয়ে মেঘ ভেসে চলেছে। পাহাড়ের ফাটলে কোথায় যেন একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। এ ছাড়া শুধু এক ঝিরঝিরে হাওয়ার শব্দ। আর সব চুপ। এমন সময় হঠাৎ কানে এল এক পরিচিত আওয়াজ—দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌—আর তার সঙ্গে পায়ের ধাক্কায় পাথর গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। ক্রমে এদিকে আসছে শব্দটা। কাছে—আরও কাছে। এবার সুড়ঙ্গের মুখের ঝোপঝাড় খচমচ করে উঠল। পরমুহূর্তেই আবছা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সৃষ্টিছাড়া নাম না জানা অতিকায় কী যেন একটা প্রায় নিঃশব্দ দ্রুতপদে গুহা থেকে বেরিয়ে আমার ঠিক পাশ দিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভয়ে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। বুঝতে পারলাম, এতক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও, আমার মনটা এই অপ্রত্যাশিত ও ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

এবার আমার সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে জানোয়ারটার ফেরার অপেক্ষায় বসে রইলাম। গহ্বরের বাইরের শান্তিময় নিরুদ্বেগ পরিবেশ থেকে বোঝবার কোনও উপায় নেই যে, এক বিপুল বিদ্‌ঘুটে প্রাণী এই সবেমাত্র সেখানে হানা দিতে বেরিয়েছে। সেটা কতদূর যাবে, কী মতলবে গেছে, কখন ফিরবে, সেসব জানার কোনও উপায় নেই। পাথরের উপর বন্দুকের নলটাকে বসিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, দ্বিতীয়বার আর সংকট-মুহূর্তে সাহস হারাব না। যত বড় দুশমনই হোক না কেন, এবার তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে।

সজাগ থাকা সত্ত্বেও জানোয়ারটা যে কখন ফিরে এল, সেটা টেরই পাইনি। হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখি—আবার সেই অতিকায় জানোয়ার—ঘাসের উপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে ব্লু-জন সুড়ঙ্গের দিকে আসছে। আবার অনুভব করলাম বন্দুকের ঘোড়ার উপর রাখা আমার ডান হাতের তর্জনীটা অবশ হয়ে আসছে। প্রাণপণ চেষ্টা করে কোনওরকমে আমার জড় ভাবটাকে কাটিয়ে উঠলাম। ঝোপঝাড় ভেদ করে জানোয়ারটা গুহার ভিতর ঢুকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছে, এমন সময় আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলাম। বারুদের ঝলসানিতে মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম এক প্রকাণ্ড, লোমশ ছাই রঙের

জানোয়ার, নীচের দিকে রঙটা ফিকে হয়ে এসেছে—বেঁটে বেঁটে বাঁকানো পায়ের উপর তার আলিসান শরীরটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এক ঝলকের দেখা—আর তারপরেই শুনলাম খড়বড় শব্দ। আল্‌গা পাথরের উপর দিয়ে নেমে জানোয়ারটা চলেছে তার গর্তের দিকে। আমার মাথায় হঠাৎ যেন খুন চাপল। ভয়ডর সব দূর করে দিয়ে এক লাফে পাথরের উপর থেকে নেমে বন্দুক ও লণ্ঠন হাতে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ছুটে চললাম জানোয়ারটার উদ্দেশে।

আমার লণ্ঠনের উজ্জ্বল রশ্মি সামনের অন্ধকার ভেদ করে চলেছে। এ সেই দু' সপ্তাহ আগের টিমটিমে মোমবাতির আলো নয়। কিছুটা পথ দৌড়নোর পরই জানোয়ারটাকে দেখতে পেলাম—সুড়ঙ্গের এ-পাশ ও-পাশ জুড়ে থপ্‌থপিয়ে এগিয়ে চলেছে, তার পায়ের লম্বা ও রুক্ষ লোম চলার সঙ্গে সঙ্গে দুলছে। লোম দেখে যদিও ভেড়ার কথা মনে হয়, আয়তনে জানোয়ারটা সবচেয়ে বড় হাতির চেয়েও বেশ খানিকটা বড়— আর যত লম্বা, ততই যেন চওড়া। পাহাড়ের সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে এই বিরাট বীভৎস জানোয়ারের পিছনে ধাওয়া করার সাহস আমি কোথা থেকে পেলাম জানি না। আদিম শিকারের নেশা যখন মানুষকে পেয়ে বসে, আর সেই শিকার যদি চোখের সামনে পালায়, তা হলে মানুষ যেন দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে তার পিছনে ছোটে। দোনলা বন্দুক হাতে তাই আমি ছুটে চলেছি এই দানবের পিছনে।

জানোয়ারটা যে রীতিমতো দ্রুতগতি, সেটা আমি আগে লক্ষ করেছিলাম। এবারে বুঝলাম যে তার আর একটি মারাত্মক গুণ আছে, সেটা হল শয়তানি বুদ্ধি। হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, সে বুঝি প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে। সে যে আবার উলটোমুখে ঘুরে রুখে দাঁড়াতে পারে, সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আগেই বলেছি, সুড়ঙ্গটা গিয়ে পড়েছে একটা বিরাট গহ্বরে। কিছুক্ষণ দৌড়নোর পর সেই গহ্বরটাতে পৌঁছতে হঠাৎ জানোয়ারটা থমকে থেমে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

লণ্ঠনের সাদা আলোতে তার যা চেহারা দেখলাম, তা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। ভাল্লুকের মতো হিংস্র ভঙ্গিতে সামনের দু' পা শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতপ্রমাণ জানোয়ারটা, আয়তনে ভাল্লুকের দশগুণ, উঁচানো দুই পায়ের থাবায় লম্বা তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখ, বীভৎস বিকৃত হাঁ করা লাল মুখে ধারালো দাঁতের সারি। ভাল্লুকের সঙ্গে পার্থক্য কেবল একটা ব্যাপারে—যে ব্যাপারে এটার সঙ্গে পৃথিবীর আর কোনও জানোয়ারের কোনও মিল নেই—সেটা হল জানোয়ারটার ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসা, দৃষ্টিহীন, মণিহীন, জ্বলন্ত বলের মতো দুটো চোখ। কী দেখলাম সেটা ভাল করে বোঝার আগেই জানোয়ারটা থাবা উঁচিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর পরে আমার হাত থেকে লণ্ঠনটা ছিটকে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমি অ্যালারটনদের বাড়িতে আমার খাটের উপর শুয়ে আছি। ব্লু-জন গ্যাপের ঘটনাটার পর দু'দিন কেটে গেছে। মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে, বাঁ পায়ের হাড় ও পাঁজরের দুটো হাড় ভাঙা অবস্থায় আমি সারারাত ওই গুহার মধ্যে পড়ে ছিলাম। পরদিন সকালে আমার লেখা চিঠি খুঁজে পেয়ে জনাদশেক চাষা দল বেঁধে গিয়ে আমায় খুঁজে বার করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। সেই থেকে সমানে নাকি আমি প্রলাপ বকেছি। জানোয়ার জাতীয় কিছুই নাকি এদের চোখে পড়েনি। আমার বন্দুকের গুলি যে কোনও প্রাণীকে জখম করেছে, তার প্রমাণ হিসাবে কোনও রক্তের চিহ্নও নাকি এরা দেখতে পায়নি। আমার নিজের অবস্থা, এবং জমিতে কিছু অস্পষ্ট দাগ ছাড়া আমার কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করার মতো কিছুই নাকি পাওয়া যায়নি।

এই ঘটনার পর দেড় মাস কেটে গেছে। আমি এখন বাইরের বারান্দায় বসে রোদ পোয়াচ্ছি। আমার ঠিক সামনেই খাড়া পাহাড়—তার পাংশুটে পাথরের গায়ে ওই যে দেখা যাচ্ছে ব্লু-জন সুড়ঙ্গের মুখ। কিন্তু ওটা আর আমার মনে ভীতিসঞ্চার করে না। আর কোনওদিনও ওই সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে কোনও ভয়ঙ্কর প্রাণী মনুষ্যজগতে হানা দিতে বেরোবে না। বিজ্ঞানবিদ্ অথবা বিদ্যাদিগগজ অনেক সম্ভ্রান্ত বাবুরা হয়তো আমার কাহিনীকে হেসে উড়িয়ে দেবেন—কিন্তু এখানকার দরিদ্র সরল গ্রামবাসীরা আমার কথা এক মুহূর্তের জন্যও অবিশ্বাস করেনি। এ সম্পর্কে 'কাস্‌লটন কুরিয়ার' পত্রিকার মন্তব্য তুলে দিলাম :

'আমাদের পত্রিকার, অথবা ম্যাটলক, বাক্সটন ইত্যাদি অঞ্চলের যেসব পত্রিকার সংবাদদাতা উক্ত

ঘটনার তদন্ত করিতে আসিয়াছেন, তাহাদের কাহারও পক্ষে গহ্বরে প্রবেশ করিয়া ডাঃ জেম্‌স হার্ডকাস্‌লের বিচিত্র কাহিনীর সত্যমিথ্যা বিচার করিবার কোনও উপায় ছিল না। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে কী করণীয় তাহা স্থানীয় অধিবাসীগণ নিজেরাই স্থির করিয়া প্রত্যেকেই গুহার প্রবেশদ্বারটি প্রস্তর দ্বারা বন্ধ করিতে তৎপর হইয়াছিল। গহ্বরের সম্মুখস্থ ঢালু রাস্তা দিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া লইয়া সুড়ঙ্গ-দ্বারটি তাহারা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটির পরিসমাপ্তি ঘটে এইভাবেই। স্থানীয় বাসিন্দাগণ ঘটনাটি সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন, রুগ্‌ণ অবস্থাই ডাঃ হার্ডকাস্‌লের মস্তিষ্কবিকৃতি ও তজ্জনিত উদ্ভট কল্পনাদির কারণ। ইহাদের মতে, কোনও ভ্রান্ত অথচ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাকে গহ্বরে প্রবেশ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, এবং গহ্বরের প্রস্তর ভূমিতে পদস্খলন হেতু তিনি আহত হইয়াছিলেন। গহ্বরের ভিতর যে এক অদ্ভুত জীব বাস করে, এরূপ একটা জনপ্রবাদ বহুকাল হইতে এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। স্থানীয় কৃষকদিগের বিশ্বাস যে, ডাঃ হার্ডকাস্‌লের বিবরণ ও তাঁহার দেহের ক্ষত এই প্রবাদকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছে। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে ইহার অধিক কিছু মন্তব্য করা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইহার সমর্থন আদৌ সম্ভবপর বলিয়া আমরা মনে করি না।'

'কুরিয়ার' পত্রিকা এই মন্তব্যটি প্রকাশ করার আগে একবার আমার সঙ্গে আলাপ করলে বুদ্ধিমানের কাজ করত। আমি অনেক ভেবে ঘটনাটার একটা বৈজ্ঞানিক কারণ অনুমান করে এর অবিশ্বাস্যতা খানিকটা দূর করেছি। অন্তত আমার নিজের অভিজ্ঞতার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসাবে আমি এখানে সেটা পেশ করছি।

আমার মতে (যে মত আমি ঘটনাটা ঘটবার আগেই ডায়েরিতে ইঙ্গিত করেছি) ইংল্যান্ডের এই সব অঞ্চলে ভূগর্ভে বিস্তীর্ণ জলাশয় রয়েছে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বাইরের জলস্রোত ভিতরে ঢুকেই এইসব জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে। জলাশয় থাকলেই বাষ্পের উদ্ভব হয়, এবং বাষ্প থেকে বৃষ্টি ও বৃষ্টি থেকে উদ্ভিদের জন্ম সম্ভব। পৃথিবীর আদি যুগে হয়তো বা এই ভূগর্ভ জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের একটা যোগাযোগ ছিল, এবং সেই অবস্থায় হয়তো বাইরের জগতের গাছপালার কিছু বীজ ও তার সঙ্গে কোনও কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী এই ভূগর্ভজগতে এসে পড়েছিল। এইসব প্রাণীদেরই একটির বংশধর হয়তো এই জানোয়ার—যাকে দেখে মনে হয় আদিম ভাল্লুকের এক বর্ধিত সংস্করণ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হয়তো এই ভূগর্ভজগৎ আমাদের পরিচিত জগতের পাশাপাশি একই সঙ্গে অবস্থান করেছে। রোমান সুড়ঙ্গটি খোঁড়ার সময় হয়তো এই ভূগর্ভজগতের কোনও প্রাণী বাইরের জগতের সন্ধান পায়। অন্ধকারবাসী অন্য সব প্রাণীর মতোই এও দৃষ্টিশক্তিহীন জীব। অথচ অন্য সব ইন্দ্রিয় এতই সজাগ যে, চোখের অভাব পূরণ হয়ে যায়। না হলে সে ভেড়ার সন্ধান পাবে কী করে? এরা যে কেবল অন্ধকার রাত্রে চলাফেরা করে, তার কারণ বোধহয়, মণির অভাবে আলো সহ্য হয় না। আমার লণ্ঠনই হয়তো চরম সংকটের মুহূর্তে আমার প্রাণরক্ষা করেছিল। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। এসব তথ্য আমি লিখে গেলাম আপনাদের বিবেচনার জন্য। একে সমর্থন করা সম্ভব কিনা তা আপনারা বিচার করে দেখবেন। যদি মনে হয় সবটাই অবিশ্বাস্য, তা হলেও আমার কিছু বলার নেই। মূল ঘটনা আপনাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অনেক ঊর্ধ্বে। আর আমার ব্যক্তিগত মতামতের প্রশ্ন যদি তোলেন, তা হলে বলব যে, তারও আর বিশেষ কোনও মূল্য নেই, কারণ আমার কাজ ফুরিয়ে এল।

ডাক্তার জেম্‌স হার্ডকাস্‌লের ডায়রির শেষ এখানেই।

দি টেরর অফ ব্লু জন গ্যাপ
সন্দেশ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প

১

নাসিরুদ্দিনের বন্ধুরা একদিন তাকে বললে, 'চলো, আজ রাত্রে আমরা তোমার বাড়িতে খাব।'

'বেশ, এসো আমার সঙ্গে', বললে নাসিরুদ্দিন।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সে বললে, 'তোমরা একটু সবুর করো, আমি আগে গিন্নিকে বলে আসি ব্যবস্থা করতে।'

গিন্নি তো ব্যাপার শুনে এই মারে তো সেই মারে। বললেন, 'চালাকি পেয়েছ? এত লোকের রান্না কি চাট্টিখানি কথা? যাও, বলে এসো ওসব হবে-টবে না।'

নাসিরুদ্দিন মাথায় হাত দিয়ে বললে, 'দোহাই গিন্নি, ও আমি বলতে পারব না। ওতে আমার ইজ্জত থাকবে না।'

'তবে তুমি ওপরে গিয়ে ঘরে বসে থাকো। ওরা এলে যা বলার আমি বলব।'

এদিকে নাসিরুদ্দিনের বন্ধুরা প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষটায় তার বাড়ির সামনে এসে হাঁক দিল, 'ওহে নাসিরুদ্দিন, আমরা এসেছি, দরজা খোলো।'

দরজা ফাঁক হল, আর ভিতর থেকে শোনা গেল গিন্নির গলা।

'ও বেরিয়ে গেছে।'

বন্ধুরা অবাক! 'কিন্তু আমরা তো ওকে ভিতরে ঢুকতে দেখলাম। আর সেই থেকে তো আমরা দরজার দিকেই চেয়ে আছি। ওকে তো বেরোতে দেখিনি।'

গিন্নি চুপ। বন্ধুরা উত্তরের অপেক্ষা করছে। নাসিরুদ্দিন দোতলার ঘর থেকে সব শুনে আর থাকতে না পেরে বললে, 'তোমরা তো সদর দরজায় চোখ রেখেছ; সে বুঝি খিড়কি দিয়ে বেরোতে পারে না?'

২

নাসিরুদ্দিন তার বাড়ির বাইরে বাগানে কী যেন খুঁজছে। তাই দেখে এক পড়শি জিজ্ঞেস করলে, 'ও মোল্লাসাহেব, কী হারালে গো?'

'আমার চাবিটা', বললে নাসিরুদ্দিন।

তাই শুনে লোকটিও বাগানে এসে চাবি খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজার পর সে জিজ্ঞেস করলে, 'ঠিক কোনখানটায় ফেলেছিলে চাবিটা, মনে পড়ছে?'

'আমার ঘরে।'

'সে কী! তা হলে এখানে খুঁজছ কেন?'

'ঘরটা অন্ধকার', বললে নাসিরুদ্দিন। 'যেখানে খোঁজার সুবিধে সেইখানেই তো খুঁজব!'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ৩ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

নাসিরুদ্দিনের পোষা পাঁঠাটার উপর পড়শিদের ভারী লোভ, কিন্তু নানান ফিকির করেও তারা সেটাকে হাত করতে পারে না। শেষটায় একদিন তারা নাসিরুদ্দিনকে বললে, 'ও মোল্লাসাহেব, বড় দুঃসংবাদ। কাল নাকি প্রলয় হবে। এই দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তা হলে পাঁঠাটাকেও ধ্বংস করা হোক', বললে নাসিরুদ্দিন।

সন্ধেবেলা পড়শিরা দলেবলে এসে দিব্যি ফুর্তিতে পাঁঠার ঝোল খেয়ে গায়ের জামা খুলে নাসিরুদ্দিনের বৈঠকখানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা দেখে তাদের জামা উধাও।

'প্রলয়ই যদি হবে,' বললে নাসিরুদ্দিন, 'তা হলে জামাগুলো আর কোন কাজে লাগবে ভাই? তাই আমি সেগুলোকে আগুনে ধ্বংস করে ফেলেছি।

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ৪ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

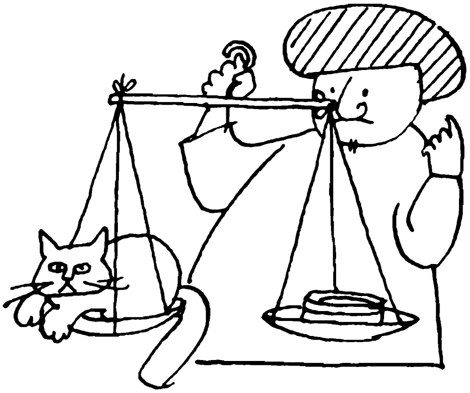

নাসিরুদ্দিন বাজার থেকে মাংস কিনে এনে তার গিন্নিকে দিয়ে বললে, 'আজ কাবাব খাব; বেশ ভাল করে রাঁধো দিকি।'

গিন্নি রান্নাটান্না করে লোভে পড়ে নিজেই সব মাংস খেয়ে ফেললে। কর্তাকে তো আর সে-কথা বলা যায় না, বললে, 'বেড়াল খেয়ে ফেলেছে।'

'এক সের মাংস সবটা খেয়ে ফেলল?'

'সবটা।'

বেড়ালটা কাছেই ছিল, নাসিরুদ্দিন সেটাকে দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে দেখলে ওজন ঠিক এক সের।

'এটাই যদি সেই বেড়াল হয়', বললে নাসিরুদ্দিন, 'তা হলে মাংস কোথায়? আর এটাই যদি সেই মাংস হয়, তা হলে বেড়াল কোথায়?'

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ৫ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

নাসিরুদ্দিনের যখন বয়স খুব কম তখন একদিন তার বাপ তাকে বললেন, 'ওরে নসু, এবার থেকে খুব ভোরে উঠিস।'

'কেন বাবা?'

'অভ্যেসটা ভাল,' বললেন নসুর বাপ। 'আমি সেদিন ভোরে উঠে বেড়াতে গিয়ে রাস্তার মধ্যিখানে পড়ে থাকা এক থলে মোহর পেয়েছি।'

'সে থলে তো আগের দিন রাত্রেও পড়ে থাকতে পারে, বাবা।'

'সেটা কথা নয়। আর তা ছাড়া আগের দিন রাত্রেও ওই পথ দিয়ে হাঁটছিলুম আমি; তখন কোনও মোহরের থলে ছিল না।'

'তা হলে ভোরে উঠে লাভ কী বাবা?' বললে নাসিরুদ্দিন। 'যে লোক মোহরের থলি হারিয়েছিল সে নিশ্চয় তোমার চেয়েও বেশি ভোরে উঠেছিল।'

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ৬ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

শিকারে বেরিয়ে পথে প্রথমেই নাসিরুদ্দিনের সামনে পড়ে রাজামশাই খেপে উঠলেন। 'লোকটা অপয়া। আজ আমার শিকার পণ্ড। ওকে চাবকে হটিয়ে দাও।'

রাজার হুকুম তামিল হল।

কিন্তু শিকার হল জবরদস্ত।

রাজা নাসিরুদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন।

'কসুর হয়ে গেছে নাসিরুদ্দিন। আমি ভেবেছিলাম তুমি অপয়া। এখন দেখছি তা নয়।'

নাসিরুদ্দিন তিন হাত লাফিয়ে উঠল।

'আপনি ভেবেছিলেন আমি অপয়া? আমায় দেখে আপনি ছাব্বিশটা হরিণ মারলেন, আর আপনাকে দেখে আমি বিশ ঘা চাবুক খেলাম। অপয়া যে কে, সেটা বুঝতে পারলেন না?'

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ৭ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

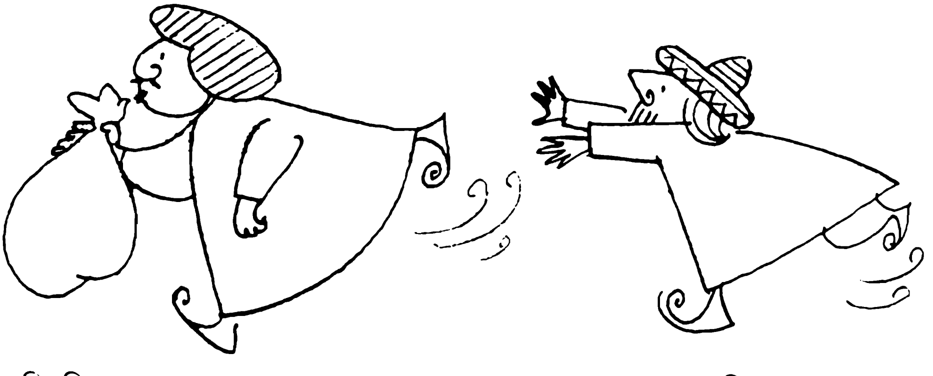

নাসিরুদ্দিন একজন লোককে মুখ ব্যাজার করে রাস্তার ধারে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলে, তার কী হয়েছে। লোকটা বললে, 'আমার জীবন বিষময় হয়ে গেছে মোল্লাসাহেব। হাতে কিছু পয়সা ছিল,

তাই নিয়ে দেশ ঘুরতে বেরিয়েছি, যদি কোনও সুখের সন্ধান পাই।'

লোকটির পাশে তার বোঁচকায় কতগুলো জিনিসপত্র রাখা ছিল। তার কথা শেষ হওয়ামাত্র নাসিরুদ্দিন সেই বোঁচকাটা নিয়ে বেদম বেগে দিলে চম্পট। লোকটাও হাঁ হাঁ করে তার পিছু নিয়েছে, কিন্তু নাসিরুদ্দিনকে ধরে কার সাধ্য! দেখতে দেখতে সে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে হাওয়া। এইভাবে লোকটিকে মিনিটখানেক ধোঁকা দিয়ে সে আবার সদর রাস্তায় ফিরে বোঁচকাটাকে রাস্তার মাঝখানে রেখে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। এদিকে সেই লোকটিও কিছুক্ষণ পরে এসে হাজির। তাকে এখন আগের চেয়েও দশগুণ বেশি বেজার দেখাচ্ছে। কিন্তু রাস্তায় তার বোঁচকাটা পড়ে আছে দেখেই সে মহাফুর্তিতে একটা চিৎকার দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গাছের আড়াল থেকে নাসিরুদ্দিন বললে, 'দুঃখীকে সুখের সন্ধান দেবার এও একটা উপায়।'

৮

তর্কবাগীশ মশাই নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে তর্ক করবেন বলে দিনক্ষণ ঠিক করে তার বাড়িতে এসে দেখেন মোল্লাসাহেব বেরিয়ে গেছেন। মহা বিরক্ত হয়ে তিনি মোল্লার সদর দরজায় খড়ি দিয়ে লিখে গেলেন 'মূর্খ'।

নাসিরুদ্দিন বাড়ি ফিরে এসে কাণ্ড দেখে এক হাত জিভ কেটে এক দৌড়ে তর্কবাগীশ মশাইয়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে বললে, 'ঘাট হয়েছে পণ্ডিতমশাই, আমি বেমালুম ভুলে গেসলুম আপনি আসবেন। শেষটায় বাড়ি ফিরে দরজায় আপনার নামটা লিখে গেছেন দেখে মনে পড়ল।'

৯

গাঁয়ের লোকে একদিন ঠিক করল নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে একটু মশকরা করবে। তারা তার কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে বললে, 'মোল্লাসাহেব, আপনার এত জ্ঞান, একদিন মসজিদে এসে আমাদের তত্ত্বকথা শোনান না!' নাসিরুদ্দিন এককথায় রাজি।

দিন ঠিক করে ঘড়ি ধরে মসজিদে হাজির হয়ে নাসিরুদ্দিন উপস্থিত সবাইকে সেলাম জানিয়ে বললে, 'ভাই সকল, বলো তো দেখি আমি এখন তোমাদের কী বিষয় বলতে যাচ্ছি?'

সবাই বলে উঠল, 'আজ্ঞে সে তো আমরা জানি না।'

মোল্লা বলল, 'এটাও যদি না জানো তা হলে আর আমি কী বলব! যাদের বলব তারা এত অজ্ঞ হলে চলে কী করে?'

এই বলে নাসিরুদ্দিন রাগে গজগজ করতে করতে মসজিদ ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এল।
গাঁয়ের লোক নাছোড়বান্দা। তারা আবার তার বাড়িতে গিয়ে হাজির।
'আজ্ঞে, আসছে শুক্রবার আপনাকে আর একটিবার আসতেই হবে মসজিদে।'
নাসিরুদ্দিন গেল, আর আবার সেই প্রথম দিনের প্রশ্ন দিয়েই শুরু করল। এবার সব লোকে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।'
'সবাই জেনে ফেলেছ? তা হলে তো আর আমার কিছু বলার নেই',—এই বলে নাসিরুদ্দিন আবার বাড়ি ফিরে গেল। গাঁয়ের লোক তবুও ছাড়ে না। পরের শুক্রবার নাসিরুদ্দিন আবার মসজিদে হাজির হয়ে তার সেই বাঁধা প্রশ্ন করল। এবার আর মোল্লাকে রেহাই দেবে না গাঁয়ের লোক, তাই অর্ধেক বলল 'জানি', অর্ধেক বলল ' জানি না।'
'বেশ, তা হলে যারা জানো তারা বলো, আর যারা জানো না তারা শোনো'—এই বলে নাসিরুদ্দিন আবার ঘরমুখো হল।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১০ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

নাসিরুদ্দিন বাড়ির ছাতে কাজ করছে, এমন সময় এক ভিখিরি রাস্তা থেকে হাঁক দিল, 'মোল্লাসাহেব, একবারটি নীচে আসবেন?'
নাসিরুদ্দিন ছাত থেকে রাস্তায় নেমে এল। ভিখিরি বলল, 'দুটি ভিক্ষে দেবেন মোল্লাসাহেব?'
'তুমি এই কথাটা বলার জন্য আমায় ছাত থেকে নামালে?'
ভিখিরি কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'মাফ করবেন মোল্লাসাহেব,—গলা ছেড়ে ভিক্ষে চাইতে শরম লাগে।'
'হুঁ...তা তুমি ছাতে এসো আমার সঙ্গে।'
ভিখিরি তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে ছাতে ওঠার পর নাসিরুদ্দিন বললে, 'তুমি এসো হে; ভিক্ষেটিক্ষে হবে না।'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১১ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

নাসিরুদ্দিন লেখাপড়া বেশি জানে না ঠিকই, কিন্তু তার গাঁয়ে এমন লোক আছে যাদের বিদ্যে তার চেয়েও অনেক কম। তাদেরই একজন নাসির-দ্দিনকে দিয়ে নিজের ভাইকে একটা চিঠি লেখালে। লেখা শেষ হলে পর সে বললে, 'মোল্লাসাহেব কী লিখলেন একবারটি পড়ে দেন, যদি কিছু বাদটাদ গিয়ে থাকে।'

নাসিরুদ্দিন 'প্রিয় ভাই আমার' পর্যন্ত পড়ে ঠেকে গিয়ে বললে, 'পরের কথাটা 'বাক্স' না 'গরম' না 'ছাগল' সেটা বোঝা যাচ্ছে না।'

'সে কী মোল্লাসাহেব, আপনার লেখা চিঠি আপনিই পড়তে পারেন না তো অপরে পড়বে কী করে?'

'সেটা আমি কী জানি?' বললে নাসিরুদ্দিন। 'আমায় লিখতে বললে আমি লিখলাম। পড়াটাও কি আমার কাজ নাকি?'

লোকটা কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বললে, 'তা ঠিকই বললেন বটে! আর এ চিঠি তো আপনাকে লেখা নয়, কাজেই আপনি পড়তে না পারলে আর ক্ষতি কী?'

'হক কথা', বললে নাসিরুদ্দিন।

১২

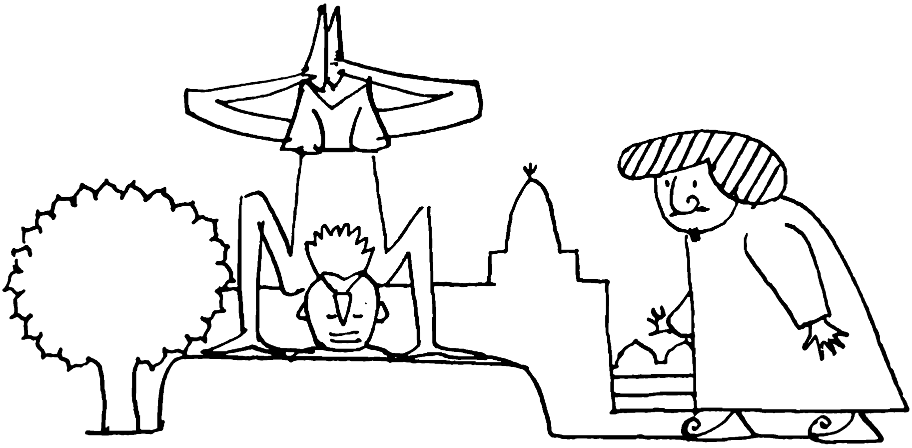

নাসিরুদ্দিন একবার ভারতবর্ষে এসে এক সাধুর দেখা পেয়ে ভাবলে, 'আমার মতো জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে সাধুর সাক্ষাৎ পাওয়া পরম সৌভাগ্য। এঁর সঙ্গে আলাপ না করলেই নয়!'

তাঁকে জিজ্ঞেস করতে সাধু বললেন তিনি একজন যোগী; ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে সকলের সেবাই তাঁর ধর্ম।

নাসিরুদ্দিন বললে, 'ঈশ্বরের সৃষ্টি একটি মৎস্য একবার আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিল।'

এ-কথা শুনে যোগী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, 'আমি এত দীর্ঘকাল প্রাণীর সেবা করেও তাদের এত অন্তরঙ্গ হতে পারিনি। একটি মৎস্য আপনার প্রাণরক্ষা করেছে শুনে এই দেখুন আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না তো কে থাকবে?'

নাসিরুদ্দিন যোগীর সঙ্গে থেকে তার কাছ থেকে যোগের নানা কসরত শিক্ষা করলে। শেষে একদিন যোগী বললেন, 'আর ধৈর্য রাখা সম্ভব নয়। অনুগ্রহ করে যদি সেই মৎস্যের উপাখ্যানটি শোনান।'

'একান্তই শুনবেন?'

'হে গুরু!' বললেন যোগী, 'শোনার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।'

'তবে শুনুন,' বললে নাসিরুদ্দিন, 'একবার খাদ্যাভাবে প্রাণ যায় যায় অবস্থায় আমার বঁড়শিতে একটি মাছ ওঠে। আমি সেটা ভেজে খাই।'

১৩

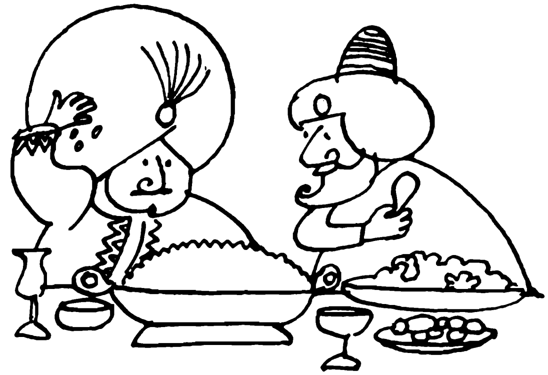

এক ধনীর বাড়িতে ভোজ হবে খবর পেয়ে নাসিরুদ্দিন সেখানে গিয়ে হাজির।

ঘরের মাঝখানে বিশাল টেবিলের উপর লোভনীয় সব খাবার সাজানো রয়েছে রুপোর পাত্রে। টেবিল ঘিরে কুরসি পাতা, তাতে বসেছেন হোমরা-চোমরা সব খাইয়েরা। নাসিরুদ্দিন সেদিকে এগোতেই কর্মকর্তা তার মামুলি পোশাক দেখে তাকে ঘরের এক কোনায় ঠেলে দিলেন। নাসিরুদ্দিন বুঝলে সেখানে খাবার পৌঁছতে হয়ে যাবে রাত কাবার। সে আর সময় নষ্ট না করে সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে তোরঙ্গ থেকে তার ঠাকুরদাদার আমলের একটা ঝলমলে আলখাল্লা আর একটা মণিমুক্তো বসানো আলিশান পাগড়ি বার করে পরে আবার নেমন্তন্ন বাড়িতে ফিরে গেল।

এবার কর্মকর্তা তাকে একেবারে খাস টেবিলে বসিয়ে দিলেন, আর বসামাত্র নাসিরুদ্দিনের সামনে এসে হাজির হল ভুরভুরে খুশবুওয়ালা পোলাওয়ের পাত্র। নাসিরুদ্দিন প্রথমেই পাত্র থেকে খানিকটা পোলাও তুলে নিয়ে তার আলখাল্লায় আর পাগড়িতে মাখিয়ে দিলে। পাশে বসেছিলেন এক আমীর। তিনি ভারী অবাক হয়ে বললেন, 'জনাব, আপনি খাদ্যদ্রব্য যেভাবে ব্যবহার করছেন তা দেখে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অর্থ জানতে পারলে আমি বিশেষ বাধিত হব।'

'অর্থ, খুবই সোজা', বললে নাসিরুদ্দিন। 'এই আলখাল্লা আর এই পাগড়ির দৌলতেই আমার সামনে এই ভোজের পাত্র। এদের ভাগ না দিয়ে আমি একা খাব সে কি হয়?'

১৪

একদিন রাত্রে দু'জনের পায়ের শব্দ পেয়ে নাসিরুদ্দিন ভয়ে একটা আলমারিতে ঢুকে লুকিয়ে রইল।

লোক দুটো ছিল চোর। তারা বাক্সপ্যাঁটরা সবই খুলছে, সেইসঙ্গে আলমারিটাও খুলে দেখে তাতে মোল্লাসাহেব ঘাপটি মেরে আছেন।

'কী হল মোল্লাসাহেব, লুকিয়ে কেন?'

'লজ্জায়', বললে নাসিরুদ্দিন। 'আমার বাড়িতে তোমাদের নেবার মতো কিছুই নেই তাই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না ভাই।'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১৫ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

এক চাষা নাসিরুদ্দিনের কাছে এসে বললে, 'বাড়িতে চিঠি দিতে হবে মোল্লাসাহেব। মেহেরবানি করে আপনি যদি লিখে দেন।'

নাসিরুদ্দিন মাথা নাড়লে। 'সে হবে না।'

'কেন মোল্লাসাহেব?'

'আমার পায়ে জখম।'

'তাতে কী হল মোল্লাসাহেব?' চাষা অবাক হয়ে বললে, 'পায়ের সঙ্গে চিঠির কী?'

নাসিরুদ্দিন বললে, 'আমার হাতের লেখা কেউ পড়তে পারে না। তাই চিঠির সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সে চিঠি পড়ে দিতে। জখম পায়ে সেটা হবে কী করে শুনি?'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১৬ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

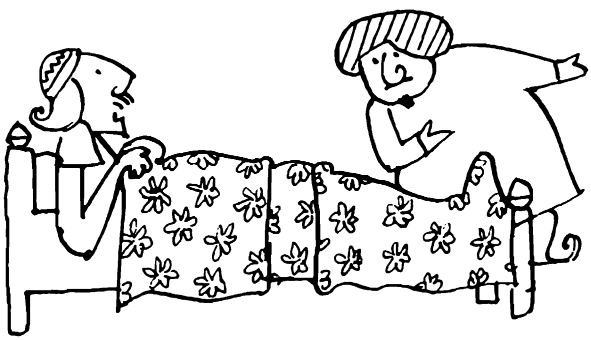

নাসিরুদ্দিন এক বাড়িতে চাকরের কাজ করছে। মনিব তাকে একদিন ডেকে বললেন, 'তুমি অযথা সময় নষ্ট করো কেন হে বাপু? তিনটে ডিম আনতে কেউ তিনবার বাজার যায়? এবার থেকে একবারে সব কাজ সেরে আসবে।'

একদিন মনিবের অসুখ করেছে, তিনি নাসিরুদ্দিনকে ডেকে বললেন, 'হাকিম ডাকো।'

নাসিরুদ্দিন গেল, কিন্তু ফিরল অনেক দেরিতে, আর সঙ্গে একগুষ্টি লোক নিয়ে।

মনিব বললেন, 'হাকিম কই?'

'তিনি আছেন, আর সঙ্গে আরও আছেন,' বললে নাসিরুদ্দিন।

• 'আরও কেন?'

'আজ্ঞে হাকিম যদি বলেন পুলটিশ দিতে, তার জন্য লোক চাই। জল গরম করতে কয়লা লাগবে, কয়লাওয়ালা চাই। আপনার শ্বাস উঠলে পর কোরান পড়ার লোক চাই, আর আপনি মরলে পরে লাশ বইবার লোক চাই।'

সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৮৪

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের আরো গল্প

১

একদিন এক জ্ঞাতি এসে নাসিরুদ্দিনকে একটা হাঁস উপহার দিলে। নাসিরুদ্দিন ভারী খুশি হয়ে সেটার মাংস রান্না করে জ্ঞাতিকে খাওয়ালে।

কয়েকদিন পরে মোল্লাসাহেবের কাছে একজন লোক এসে বললে, 'আপনাকে যিনি হাঁস দিয়েছিলেন, আমি তাঁর বন্ধু।'

নাসিরুদ্দিন তাকেও মাংস খাওয়ালে।

এর পর আরেকদিন আরেকজন এসে বলে, 'আপনাকে যিনি হাঁস দিয়েছিলেন, আমি তার বন্ধুর বন্ধু।' নাসিরুদ্দিন তাকেও খাওয়ালে।

তারপর এল বন্ধুর বন্ধুর বন্ধু। মোল্লাসাহেব তাকেও খাওয়ালে।

এর কিছুদিন পরে আবার দরজায় টোকা পড়ল। 'আপনি কে?' দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলে নাসিরুদ্দিন।

'আজ্ঞে মোল্লাসাহেব, যিনি আপনাকে হাঁস দিয়েছিলেন, আমি তার বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুর বন্ধু।

'ভেতরে আসুন,' বললে নাসিরুদ্দিন, 'খাবার তৈরিই আছে।'

অতিথি মাংসের ঝোল দিয়ে পোলাও মেখে একগ্রাস খেয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কীসের মাংস মোল্লাসাহেব?'

'হাঁসের বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুর', বললে নাসিরুদ্দিন।

২

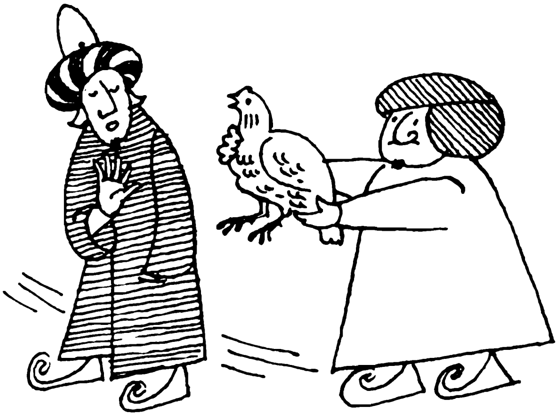

নাসিরুদ্দিন বাজারে গিয়ে দেখে সারি সারি খাঁচায় ময়না বিক্রি হচ্ছে, সেগুলির দাম একেকটা পঞ্চাশ টাকা।

পরদিন সে তার ধাড়ি মুরগিটাকে নিয়ে বাজারে হাজির, ভাবছে সেটাকে বিক্রি করে মোটা টাকা

পাবে।

যখন দেখল যে পাঁচ টাকার বেশি দাম দিতে চায় না কেউ, তখন সে তম্বি শুরু করলে। তাই দেখে একজন লোক এসে তাকে বললে, 'মোল্লাসাহেব, কালকের পাখিগুলো যে কথা বলতে পারে, তাই এত দাম। তোমার মুরগি কথা বলে কি?'

নাসিরুদ্দিন চোখ রাঙিয়ে বললে, 'পুঁচকে পাখি বকবক করে কানের পোকা নড়িয়ে দিলে তার হয়ে গেল পঞ্চাশ টাকা দাম, আর আমার এতবড় মুরগি নিজের ভাবনা নিয়ে চুপচাপ থাকে বলে তার কদর নেই? যতসব ইয়ে!'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ৩ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

নাসিরুদ্দিন বাজার থেকে খাবার আনে, আর তার গিন্নি সেগুলো লুকিয়ে এক বন্ধুকে দিয়ে দেয়।

'ব্যাপার কী বলো তো?' একদিন মোল্লা বললে—'খাবারগুলো যায় কোথায়?'

'বেড়ালে চুরি করে', বললেন গিন্নি।'

কথাটা শুনেই নাসিরুদ্দিন তার সাধের কুড়ুলটা এনে আলমারির ভিতর লুকিয়ে ফেললে।

'ওটা কী হল?' জিজ্ঞেস করলেন গিন্নি।

'বেড়াল যদি দশ পয়সার খাবার চুরি করতে পারে' বললে নাসিরুদ্দিন, 'তা হলে দশ টাকার কুড়ুলটা বাইরে ফেলে রাখি কোন ভরসায়?'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ৪ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

এক সন্ধ্যায় নির্জন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে নাসিরুদ্দিন কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রমাদ গুনলে। নির্ঘাত এরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শাহেন শা-র ফৌজে ভর্তি করে দেবে।

রাস্তার পাশেই গোরস্থান; নাসিরুদ্দিন এক দৌড়ে তাতে ঢুকে ঘাপটি মেরে রইল।

ঘোড়সওয়াররা কৌতূহলী হয়ে গোরস্থানে ঢুকে দেখে নাসিরুদ্দিন একটা কবরের ধারে কাঠ হয়ে

পড়ে আছে। 'এখানে কী হচ্ছে মোল্লাসাহেব?' তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

নাসিরুদ্দিন বুঝলে তার আঁচে গলতি হয়েছে। সে বললে, 'সব প্রশ্নের তো আর সহজ উত্তর হয় না। যদি বলি যে তোমাদের জন্যই আমার এখানে আসা, আর আমার জন্যই তোমাদের এখানে আসা, তা হলে কিছু বুঝবে?'

৫

নাসিরুদ্দিন তার পুরনো বন্ধু জামাল সাহেবের দেখা পেয়ে ভারী খুশি। বললে, 'বন্ধু, চলো পাড়া বেড়িয়ে আসি।'

'লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমার এই মামুলি পোশাক চলবে না', বললে জামাল সাহেব। নাসিরুদ্দিন তাকে একটি বাহারের পোশাক ধার দিলে।

প্রথম বাড়িতে গিয়ে নাসিরুদ্দিন গৃহকর্তাকে বললে, 'ইনি হলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু জামাল সাহেব। এঁর পোশাকটা আসলে আমার।'

দেখা সেরে বাইরে বেরিয়ে এসে জামাল সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার কেমনতরো আক্কেল হে! পোশাকটা যে তোমার সেটা কি না বললেই চলত না?'

পরের বাড়িতে গিয়ে নাসিরুদ্দিন বললে, 'জামাল সাহেব আমার পুরনো বন্ধু। ইনি যে পোশাকটা পরেছেন সেটা কিন্তু ওঁর নিজেরই।'

জামাল সাহেব আবার খাপ্পা। বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'মিথ্যে কথাটা কে বলতে বলেছিল তোমায়?'

'কেন?' বললে নাসিরুদ্দিন, 'তুমি যেমন চাইলে তেমনই তো বললাম।'

'না', বললেন জামালসাহেব, 'পোশাকের কথাটা না বললেই ভাল।'

তিন নম্বর বাড়িতে গিয়ে নাসিরুদ্দিন বললে, 'আমার পুরনো বন্ধু জামাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি যে পোশাকটা পরেছেন সেটার কথা অবিশ্যি না বলাই ভাল।'

নাসিরুদ্দিন নাকি বলে বেড়াচ্ছে যারা নিজেদের বিজ্ঞ বলে তারা আসলে কিচ্ছু জানে না। এই খবর শুনে সাতজন সেরা বিজ্ঞ নাসিরুদ্দিনকে রাজার কাছে ধরে এনে বললে, 'শাহেন শা, এই ব্যক্তি অতি দুর্জন। ইনি আমাদের বদনাম করে বেড়াচ্ছেন। এর শাস্তির ব্যবস্থা হোক।'

রাজা নাসিরুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কিছু বলার আছে?'

'আগে কাগজ-কলম আনা হোক, জাঁহাপনা,' বললে নাসিরুদ্দিন।

কাগজ-কলম এল।

'এদের সাতজনকে একটি করে দেওয়া হোক।'

তাও হল।

'এবার সাতজনে আলাদা করে আমার প্রশ্নের জবাব লিখুন। প্রশ্ন হল—রুটির অর্থ কী?'

সাত পণ্ডিত উত্তর লিখে রাজার হাতে কাগজ দিয়ে দিলেন, রাজা পর পর উত্তরগুলো পড়ে গেলেন।

পয়লা নম্বর লিখেছেন—রুটি একপ্রকার খাদ্য।

দুই নম্বর—ময়দা ও জলের সংমিশ্রণে তৈয়ারি পদার্থকে বলে রুটি।

তিন নম্বর—রুটি ঈশ্বরের দান।

চার নম্বর—একপ্রকার পুষ্টিকর আহার্যকে বলে রুটি।

পাঁচ নম্বর—রুটির অর্থ করতে গেলে আগে জানা দরকার, কোনপ্রকার রুটির কথা বলা হচ্ছে।

ছয় নম্বর—রুটির অর্থ এক মূর্খ ব্যক্তি ছাড়া সকলেই জানে।

সাত নম্বর—রুটির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।

উত্তর শুনে নাসিরুদ্দিন বললে, 'জাঁহাপনা, যে জিনিস এঁরা প্রতিদিন খাচ্ছেন, তার মানে এঁরা সাতজন সাতরকম করলেন, অথচ যে লোককে এঁরা কখনও চোখেই দেখেননি তাকে সকলে একবাক্যে নিন্দে করছেন। এক্ষেত্রে কে বিজ্ঞ কে মূর্খ সেটা আপনিই বিচার করুন।'

রাজা নাসিরুদ্দিনকে বেকসুর খালাস দিলেন।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ৭ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

নাসিরুদ্দিনের দজ্জাল গিন্নি ফুটন্ত সুরুয়া এনে কর্তার সামনে রাখল তার জিভ পুড়িয়ে তাকে জব্দ করবে বলে, কিন্তু ভুলে সে নিজেই দিয়ে ফেলেছে তাতে চুমুক। ফলে তার চোখে জল এসে গেছে।

নাসিরুদ্দিন তাই দেখে বলে, 'হল কী? কাঁদছ নাকি?'

গিন্নি বললেন, 'মা মারা যাবার ঠিক আগে সুরুয়া খেয়েছিলেন, আহা! সেই কথাটা মনে পড়ে গেল।'

এবার নাসিরুদ্দিনও সুরুয়ায় চুমুক দিয়েছে, আর তার ফলে তারও চোখ ফেটে জল।

'সে কী, তুমিও কাঁদছ নাকি?' শুধোলেন গিন্নি।

নাসিরুদ্দিন বললে, 'তোমায় জ্যান্ত রেখে তোমার মা মারা গেলেন, এটা কি খুব সুখের কথা?'

সন্দেশ, পৌষ ১৩৮৪

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের আরো গল্প

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

রাজদরবারে নাসিরুদ্দিনের খুব খাতির।

একদিন খুব খিদের মুখে বেগুন ভাজা খেয়ে ভারী খুশি হয়ে রাজা নাসিরুদ্দিনকে বললেন, 'বেগুনের মতো এমন সুস্বাদু খাদ্য আর আছে কি?'

'বেগুনের জবাব নেই,' বললে নাসিরুদ্দিন।

রাজা হুকুম দিলেন, 'এবার থেকে রোজ বেগুন খাব।'

তারপর পাঁচদিন দু'বেলা বেগুন খেয়ে ছ'দিনের দিন রাজা হঠাৎ বেঁকে বসলেন। খানসামাকে ডেকে বললেন, 'দূর করে দে আমার সামনে থেকে এই বেগুন ভাজা।'

'বেগুন অখাদ্য', সায় দিয়ে বললে নাসিরুদ্দিন।

রাজা এ-কথা শুনে ভারী অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী মোল্লাসাহেব, তুমি যে এই সেদিনই বললে বেগুনের জবাব নেই!'

'আমি তো আপনার মোসাহেব, জাঁহাপনা,' বললে নাসিরুদ্দিন, 'বেগুনের তো নই।'

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ২ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

নাসিরুদ্দিন সরাইখানায় ঢুকে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলে, 'সূর্যের চেয়ে চাঁদের উপকারিতা অনেক বেশি।'

'কেন মোল্লাসাহেব?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে সবাই।

'চাঁদ আলো দেয় রাত্তিরে', বললে নাসিরুদ্দিন, 'দিনে আলোর দরকারটা কী শুনি?'

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ৩ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

নাসিরুদ্দিন তার এক বন্ধুকে নিয়ে সরাইখানায় ঢুকেছে দুধ খাবে বলে। পয়সার অভাব, তাই এক গেলাস দুধ দু'জন আধাআধি করে খাবে।

বন্ধু বললে, 'তুমি আগে খেয়ে নাও তোমার অর্ধেক। বাকিটা আমি পরে চিনি দিয়ে খাব।'

'চিনিটা আগেই দাও না ভাই', বললে নাসিরুদ্দিন, 'তা হলে দু'জনেরই দুধ মিষ্টি হবে।'

বন্ধু মাথা নাড়লে। 'আধ গেলাসের মতো চিনি আছে আমার সঙ্গে, আর নেই।'

নাসিরুদ্দিন সরাইখানার মালিকের সঙ্গে দেখা করে খানিকটা নুন নিয়ে এল। 'ঠিক আছে', সে বললে বন্ধুকে, 'এই নুন ঢাললাম দুধে। আমি অর্ধেক নোনতা খাব, বাকি অর্ধেক মিষ্টি খেও তুমি।'

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ৪ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

মোল্লা এক ছোকরাকে মাটির কলসি দিয়ে পাঠালে কুয়ো থেকে জল তুলে আনতে। 'দেখিস, কলসিটা ভাঙিসনি যেন', বলে একটা থাপ্পড় মারলে ছোকরার গালে।

এক পথচারী ব্যাপারটা দেখে বললে, 'কলসি না ভাঙতেই চড়টা মারলেন কেন মোল্লাসাহেব?'

'তোমার যা বুদ্ধি', বললে নাসিরুদ্দিন, 'ভাঙার পরে চড় মারলে কি আর কলসি জোড়া লেগে যাবে?'

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ৫ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

নাসিরুদ্দিন একটা মনিহারী দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'এখানে পেরেক পাওয়া যায়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বললে দোকানদার।

'আর চামড়া?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যায়।'

'আর সুতো?'

'যায়, আজ্ঞে।'

'আর রঙ?'
'তাও যায়।'
'তা হলে তুমি বসে না থেকে একটা জুতো তৈরি করে ফেলো না বাপু!'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ৬ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

নাসিরুদ্দিন এক পড়শির কাছে গিয়ে হাত পাতলে। 'এক গরিব তার দেনা শোধ করতে পারছে না। তার সাহায্যে যদি কিছু দেন।'

পড়শির মনটা দরাজ, সে খুশি হয়ে তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললে, 'আহা বেচারি! এই ঋণগ্রস্ত অভাগাটি কে, মোল্লাসাহেব?'

'আমি', বলে নাসিরুদ্দিন হাওয়া।

কিছুদিন পরে নাসিরুদ্দিন আবার সেই পড়শির কাছে এসে হাত পেতেছে। পড়শি একবার ঠকে সেয়ানা হয়ে গেছে। বললে, 'বুঝেছি। দেনাদারটি এবারও তুমিই তো?'

'আজ্ঞে না। বিশ্বাস করুন। এবার সত্যিই আমি না।'

পড়শির আবার মন ভিজল। নাসিরুদ্দিনের হাতে টাকা দিয়ে বললে, 'এবার কার দুঃখ দূর করতে যাচ্ছ মোল্লাসাহেব?'

'আজ্ঞে, আমার।'

'কীরকম?'

'আজ্ঞে এই অধম এবার পাওনাদার।'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ৭ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

সুসংবাদ দিলে বকশিশ পায় জেনে একজন লোক নাসিরুদ্দিনকে গিয়ে বললে, 'তোমার জন্য খুব ভাল খবর আছে, মোল্লাসাহেব।'

'কী খবর?'

'তোমার পাশের বাড়িতে পোলাও রান্না হচ্ছে।'

'তাতে আমার কী?'

'তোমাকে সে পোলাওয়ের ভাগ দেবে বলছে।'

'তাতে তোমার কী?'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ৮ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

নাসিরুদ্দিন নদীর ধারে বসে আছে, এমন সময় দেখে ন'জন অন্ধ নদী পেরোবার তোড়জোড় করছে।

নাসিরুদ্দিন তাদের কাছে প্রস্তাব করলে যে, জনপিছু এক পয়সা করে নিয়ে সে ন'জনকে পর পর কাঁধে করে পার করে দেবে। অন্ধরা রাজি হয়ে গেল।

নাসিরুদ্দিন আটজনকে পার করে ন'নম্বরের বেলায় মাঝনদীতে হোঁচট খেতে পিঠের অন্ধ জলে তলিয়ে গেল।

বাকি আটজন দেরি দেখে ওপার থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী হল মোল্লাসাহেব?'

'এক পয়সা বাঁচল তোমাদের,' বললে নাসিরুদ্দিন।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ৯ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

নাসিরুদ্দিন আর তার গিন্নি একদিন বাড়ি ফিরে এসে দেখে চোর এসে বাড়ি তছনছ করে দিয়ে গেছে। গিন্নি তো রেগে আগুন। বললে, 'এ তোমার দোষ। সদর দরজায় তালা দাওনি, তাই এই দশা।'

পড়শিরাও সেই একই সুর ধরলে। একজন বললে, 'জানলাগুলোও তো ভাল করে বন্ধ করোনি দেখছি।'

আরেকজন বললে, 'চোর আসতে পারে সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

আরেকজন বললে, 'দরজার তালাগুলোও পরীক্ষা করে দেখা উচিত।'

'কী আপদ!' বললে নাসিরুদ্দিন, 'তোমরা দেখছি শুধু আমার পিছনেই লাগতে শুরু করলে!'

'দোষ তো তোমারই মোল্লাসাহেব', পড়শিরা বললে।

'বটে?' বললে নাসিরুদ্দিন, 'আর চোরের বুঝি দোষ নেই?'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১০ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

নাসিরুদ্দিনের ভারী শখ একটা নতুন জোব্বা বানাবে, তাই পয়সা জমিয়ে দরজির দোকানে গেল ফরমাশ দিতে। দরজি মাপ নিয়ে বললে, 'আল্লা করেন তো এক সপ্তাহ পরে আপনি জোব্বা পেয়ে যাবেন।'

নাসিরুদ্দিন এক সপ্তাহ কোনওরকমে ধৈর্য ধরে তারপর আবার গেল দরজির দোকানে।

'একটু অসুবিধা ছিল মোল্লাসাহেব', বললে দরজি, 'আল্লা করেন তো কাল আপনি অবশ্যই জোব্বা পেয়ে যাবেন।'

পরদিন গিয়েও হতাশ। 'মাফ করবেন মোল্লাসাহেব', বললে দরজি, 'আর একটি দিন আমাকে সময় দিন। আল্লা করেন তো কাল সকালে নিশ্চয় রেডি পাবেন আপনার জোব্বা।'

নাসিরুদ্দিন এবার বললে, 'আল্লা না করে তুমি করলে জোব্বাটা কবে পাব সেটা জানতে পারি কি?'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১১ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

এক প্রবীণ দার্শনিক সরাইখানায় বসে বিলাপ করছেন, 'বিচিত্র জীব এই মানুষ। কোনও কিছুতেই তৃপ্তি নেই। শীতকালে বলে ঠাণ্ডায় মলাম, গ্রীষ্মে বলে গরমে প্রাণ আইঢাই।'

সবাই তার কথায় সায় দিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'বসন্তের বিরুদ্ধে যার নালিশ আছে সে হাত তোলো', বললে নাসিরুদ্দিন।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১২ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

নাসিরুদ্দিনের গানবাজনা শেখার শখ হয়েছে। এক জবরদস্ত ওস্তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি বাদ্যযন্ত্র শেখাতে কত নেন?'

'প্রথম মাসে তিন রৌপ্যমুদ্রা, তারপর থেকে প্রতি মাসে এক রৌপ্যমুদ্রা।'

'বেশ, তা হলে দ্বিতীয় মাস থেকেই শুরু করব আমি', বললে নাসিরুদ্দিন।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১৩ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

এক চোর নাসিরুদ্দিনের বাড়িতে ঢুকে তার প্রায় সর্বস্ব চুরি করে রওনা দিল নিজের বাড়ির দিকে।

নাসিরুদ্দিন রাস্তা থেকে সব দেখে একটি কম্বল কাঁধে নিয়ে চোরের পিছু ধাওয়া করে তার বাড়িতে ঢুকে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে।

'কে হে তুমি?' চোর জিজ্ঞেস করলে, 'আমার বাড়িতে কেন?'

'আমার জিনিস যখন সবই এখানে', বললে নাসিরুদ্দিন, 'এখন থেকে এটাই আমার বাড়ি নয় কি?'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১৪ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

সরাইখানায় ক'জন সৈনিকের আগমন হয়েছে। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বীরত্বের বড়াই করছে। একজন বললে, 'খোলা তলোয়ার হাতে এমন তেজের সঙ্গে ছুটলাম আমি দুশমনের দিকে যে-তারা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমায় রোখে কার সাধ্য!'

সবাই এ-কথা শুনে সমস্বরে বাহবা দিলে। নাসিরুদ্দিনও এককালে যুদ্ধ করেছে। সে বললে, 'তোমার কথা শুনে আমার নিজের একটা যুদ্ধের ঘটনা মনে পড়ছে। এক শত্রুর পা কেটে ফেলেছিলাম তলোয়ারের এক কোপে।'

তাই শুনে এক প্রবীণ যোদ্ধা বললে, 'ওইখানেই তো ভুল। কাটা উচিত ছিল মুণ্ডুটা।'

'মুণ্ডুটা না থাকলে আর মুণ্ডু কাটব কোত্থেকে?' বললে নাসিরুদ্দিন।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১৫ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

এক পড়শি মোল্লাসাহেবের কাছে একগাছ দড়ি ধার চাইতে এসেছে।

'পাবে না' বললে নাসিরুদ্দিন।

'কেন মোল্লাসাহেব?'

'দড়ি কাজে লাগছে।'

'ওটা তো মাটিতে পড়ে আছে আজ ক'দিন থেকে মোল্লাসাহেব।'

'ওটাই কাজ।'

পড়শি তবু আশা ছাড়ে না। বললে, 'ক'দিন চলবে কাজ মোল্লাসাহেব?'

'যদ্দিন না ওটা ধার দেওয়া দরকার বলে মনে করি' বললে নাসিরুদ্দিন।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১৬ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

নাসিরুদ্দিন হামামে গেছে গোসল করতে। পরিচারক তার ছেঁড়া পোশাক দেখে আধখানা সাবান আর একটা ময়লা তোয়ালে ছুড়ে দিলে তার দিকে।

নাসিরুদ্দিন কিন্তু যাবার সময় তাকে ভালরকম বকশিশ দিয়ে গেল। পরিচারক ভাবলে, 'এ কেমন হল? খাতির না করেই যদি এত পাওয়া যায় তা হলে খাতির করলে না জানি কত মিলবে!'

পরের সপ্তাহে নাসিরুদ্দিন আবার গেছে হামামে। এবার তাকে দেখেই পরিচারক একেবারে বাদশার হালে তার তোষামোদ করেছে। আচ্ছা রকম দলাই-মালাই করে, গায়ে আতর ছিটিয়ে দিয়ে, কাজের শেষে হাত পাততেই নাসিরুদ্দিন তাকে একটি তামার পয়সা দিয়ে বললে, 'গতবারের জন্য এই বকশিশ। এবারেরটা তো আগেই দেওয়া আছে।'

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ১৭ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

নাসিরুদ্দিন এক আমীরের বাড়ি গেছে দুর্ভিক্ষের চাঁদা তুলতে। দরোয়ানকে বললে, 'তোমার মনিবকে গিয়ে বলো মোল্লাসাহেব চাঁদা নিতে এসেছেন।'

দরোয়ান ভিতরে গিয়ে মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বললে, 'আজ্ঞে, মনিব একটু বাইরে গেছেন।'

'তা হলে তোমায় একটা কথা বলে যাই,' বললে নাসিরুদ্দিন, 'তোমার মনিব এলে তাঁকে বোলো যে, বেরোবার সময় তাঁর মুণ্ডুটা যেন জানলার ধারে রেখে না যান। কখন চোর আসে বলা কি যায়!'

সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৮৫

আবার মোল্লা নাসিরুদ্দিন

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ১ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

রাজামশাই একদিন নাসিরুদ্দিনকে ডেকে বললেন, 'বনে গিয়ে ভাল্লুক মেরে আনো।'

নাসিরুদ্দিন রাজার আদেশ অমান্য করে কী করে? অগত্যা তাকে যেতেই হল।

বন থেকে ফেরার পর একজন তাকে জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন হল শিকার, মোল্লাসাহেব?'

'চমৎকার', বললে নাসিরুদ্দিন।

'ক'টা ভাল্লুক মারলেন?'
'একটিও না।'
'বটে? ক'টাকে ধাওয়া করলেন?'
'একটিও না।'
'সে কী! ক'টা দেখলেন?'
'একটিও না।'
'তা হলে চমৎকারটা হল কী করে?'
'ভাল্লুক শিকার করতে গিয়ে সে জানোয়ারের দেখা না পাওয়ার চেয়ে চমৎকার আর কী হতে পারে?

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ২ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

এক পড়শি এসেছে নাসিরুদ্দিনের কাছে এক আর্জি নিয়ে।
'মোল্লাসাহেব, আপনার গাধাটা যদি কিছুদিনের জন্য ধার দেন তো বড় উপকার হয়।'
'মাফ করবেন', বললে নাসিরুদ্দিন, 'ওটা আরেকজনকে ধার দিয়েছি।'
কথাটা বলামাত্র বাড়ির পিছন থেকে গাধা ডেকে উঠে তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে দিল।
'সে কী মোল্লাসাহেব, ওটা আপনারই গাধার ডাক শুনলাম না?'
নাসিরুদ্দিন মহারাগে লোকটার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সময় বললে, 'আমার কথার চেয়ে আমার গাধার ডাককে যে বেশি বিশ্বাস করে, তাকে কোনওমতেই গাধা ধার দেওয়া চলে না।'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ৩ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

এক বেকুবের শখ হয়েছে সে পণ্ডিত হবে। সে মনে মনে ভাবলে মোল্লার তো নামডাক আছে পণ্ডিত হিসেবে, তার কাছেই যাওয়া যাক, যদি কিছু শেখা যায়।
অনেকখানি পথ পাহাড় ভেঙে উঠে সে খুঁজে পেলে নাসিরুদ্দিনের বাসস্থান। ঢোকবার আগে জানলা দিয়ে দেখলে মোল্লাসাহেব ঘরের এককোণে ধুনুচির সামনে বসে নিজের দু' হাতের তেলো মুখের সামনে ধরে তাতে ফুঁ দিচ্ছে।
ঘরে ঢুকে বেকুব প্রথমেই হাতে ফুঁ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে। 'ফুঁ দিয়ে হাত গরম করছিলাম', বলে নাসিরুদ্দিন চুপ করলে। বেকুব ভাবলে, একটা জিনিস তো জানা গেল। আর কিছু জানা যাবে কি?
কিছুক্ষণ পরে নাসিরুদ্দিনের গিন্নি দু'বাটি গরম দুধ এনে কর্তা আর অতিথির সামনে রাখলেন।

নাসিরুদ্দিন তক্ষুনি দুধে ফুঁ দিতে শুরু করলে।

এবার বেকুব সম্ভ্রমের সঙ্গে শুধোলে, 'হে গুরু, এবারে ফুঁ দেবার কারণটা কী?'

' দুধ ঠাণ্ডা করা', বললে নাসিরুদ্দিন।

বেকুব বিদায় নিলেন। যে লোক বলে ফুঁ দিয়ে জিনিস গরম হয়, আবার ঠাণ্ডাও হয়, তার কাছ থেকে জ্ঞানলাভের কোনও আশা আছে কি?

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ৪ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

মোল্লা এখন কাজি, সে আদালতে বসে। একদিন এক বুড়ি তার কাছে এসে বললে, 'আমি বড়ই গরিব। আমার ছেলেকে নিয়ে বড় ফ্যাসাদে পড়েছি কাজিসাহেব। সে মুঠো মুঠো চিনি খায়, তাকে আর চিনি জুগিয়ে কূল পাচ্ছি না। আপনি হুকুম দিয়ে তার চিনি খাওয়া বন্ধ করুন। সে আমার কথা শোনে না।'

মোল্লা একটু ভেবে বললে, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এক হপ্তা পরে এসো, আমি একটু বিবেচনা করে তারপর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।'

বুড়ি হুকুমমতো এক হপ্তা পরে আবার এসে হাজির! মোল্লা তাকে দেখে মাথা নাড়লে।—'এ বড় জটিল মামলা। আরও এক হপ্তা সময় দিতে হবে আমাকে।'

আরও সাতদিন পরেও সেই একই কথা। অবশেষে ঠিক এক মাস পরে মোল্লা বুড়িকে বললে, 'কই, ডাকো তোমার ছেলেকে।'

ছেলেটি আসতেই মোল্লা তাকে হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'দিনে আধ ছটাকের বেশি চিনি খাওয়া চলবে না। যাও।'

বুড়ি মোল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল, কাজিসাহেব।'

'বলো।'

'এই নিয়ে চারবার ডাকলেন কেন আমাকে? এর অনেক আগেই তো আপনি এ হুকুম দিতে পারতেন।'

'তোমার ছেলেকে হুকুম দেবার আগে আমার নিজের চিনি খাওয়ার অভ্যেস কমাতে হবে তো!' বললে নাসিরুদ্দিন।

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ৫ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

রাস্তার কয়েকটি ছোকরা ফন্দি করেছে তারা মোল্লাসাহেবের জুতোজোড়া হাত করবে। একটা লম্বা গাছের দিকে দেখিয়ে তারা মোল্লাসাহেবকে বললে, 'ওই যে গাছ দেখছেন, ওটায় চড়ার সাধ্যি কারুর নেই।'

'আমার আছে', বলে মোল্লাসাহেব জুতোজোড়া পা থেকে না খুলেই গাছটায় চড়তে শুরু করলেন।

বেগতিক দেখে ছেলেরা চেঁচিয়ে বলল, 'ও মোল্লাসাহেব, ওই গাছে আপনার জুতো কোনও কাজে লাগবে কি?'

মোল্লাসাহেব গাছের উপর থেকে জবাব দিলেন, 'গাছের মাথায় যে রাস্তা নেই তা কে বলতে পারে?'

৬

নাসিরুদ্দিন বাজারে গিয়ে এক নিলামদারের হাতে তার গাধাটিকে তুলে দিলে। সেটাকে দিয়ে আর কাজ চলে না, তাই একটা নতুন গাধা কেনা দরকার।

আর পাঁচরকম জিনিস পাচার হয়ে যাবার পর গাধা যখন নিলামে উঠল, নাসিরুদ্দিন তখন কাছাকাছির মধ্যেই রয়েছে। নিলামদার হাঁক দিলে, 'এবার দেখুন এই অসামান্য, অতুলনীয় গাধা। পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা কে দেবেন এর জন্য? মাত্র পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা!'

এক চাষা হাত তুললে। দর এত কম দেখে মোল্লাসাহেব নিজেই হেঁকে বসলেন, 'ছয় স্বর্ণমুদ্রা।'

ওদিকে অন্য লোকেও ডাকতে শুরু করেছে, আর নিলামদারও গাধার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দর যত বাড়ে ততই বাড়ে গুণের ফিরিস্তি।

চাষা ও মোল্লাসাহেবের মধ্যে ডাকাডাকিতে গাধার দাম চড়ে চল্লিশ স্বর্ণমুদ্রায় পৌঁছে শেষটায় মোল্লাসাহেবেরই জিত হল। গাধার আসল দাম ছিল বিশ স্বর্ণমুদ্রা, অর্থাৎ লোকসান হল দ্বিগুণ।

কিন্তু তাতে কী এসে গেল? 'যে গাধার এত গুণ', বললে মোল্লাসাহেব, 'তার জন্য চল্লিশ স্বর্ণমুদ্রা তো জলের দর!'

৭

নাসিরুদ্দিন মওকা বুঝে একজনের সবজির বাগানে গিয়ে হাতের সামনে যা পায় থলেতে ভরতে শুরু করেছে।

এদিকে মালিক এসে পড়েছেন। কাণ্ড দেখে তিনি হন্তদন্ত নাসিরুদ্দিনের দিকে ছুটে এসে বললেন, 'ব্যাপারটা কী?'

নাসিরুদ্দিন বললে, 'ঝড়ে উড়িয়ে এনে ফেলেছে আমায় এখানে।'

'আর খেতের সবজিগুলোকে উপড়ে ফেলল কে?'

'ওড়ার পথে ওগুলিকে খামচে ধরে তবে তো রক্ষা পেলাম।'

'আর সবজিগুলো থলের মধ্যে গেল কী করে?'

'সেই প্রশ্নই তো আমাকেও চিন্তায় ফেলেছিল, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ৮ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

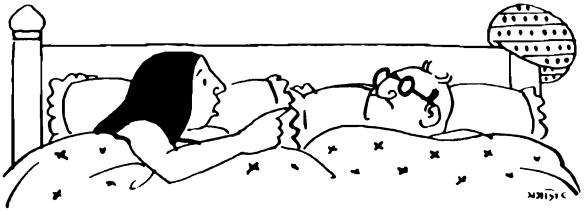

মোল্লাগিন্নি মাঝরাত্তিরে নাসিরুদ্দিনের ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, 'ব্যাপার কী? চশমা পরে ঘুমোচ্ছ কেন?'

মোল্লা নতুন চশমা নিয়েছে। খাপ্পা হয়ে বললে, 'চোখে চালশে পড়েছে, চশমা ছাড়া স্বপ্ন দেখব কী করে?'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ৯ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

থলেতে একঝুড়ি ডিম লুকিয়ে নিয়ে নাসিরুদ্দিন চলেছে ভিনদেশে। সীমানায় পৌঁছতে শুল্ক বিভাগের লোক তাকে ধরলে। নাসিরুদ্দিন জানে ডিম চালান নিষিদ্ধ।

'মিথ্যে বললে মৃত্যুদণ্ড' বললে শুল্ক বিভাগের লোক। 'তোমার থলেতে কী আছে বলো।'

'প্রথম অবস্থার কিছু মুরগি', বললে মোল্লাসাহেব।

'হুম—সমস্যার কথা। মুরগি চালান নিষিদ্ধ কিনা খোঁজ নিতে হবে, তারপর ব্যাপারটার মীমাংসা হবে। ততদিন এ থলি রইল আমাদের জিম্মায়। ভয় নেই, তোমার মুরগিকে উপোস রাখব না আমরা।'

'কিন্তু আমার মুরগির জাত যে একটু আলাদা', বললে নাসিরুদ্দিন।

'কীরকম।'

'আপনারা তো শুনেছেন অবহেলার দরুন মুরগির অকাল বার্ধক্য আসে।'

'তা শুনেছি বটে!'

'আমার মুরগিকে ফেলে রাখলে সেগুলো অকালে শিশু হয়ে যায়!'

'শিশু মানে?'

'একেবারে শিশু', বললে নাসিরুদ্দিন, 'যাকে বলে ডিম।'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ১০ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

মোল্লা মসজিদে গিয়ে বসেছে, তার জোব্বাটা কিঞ্চিৎ খাটো দেখে তার পিছনের লোক সেটাকে টেনে খানিকটা নামিয়ে দিলে। মোল্লা তৎক্ষণাৎ তার সামনের লোকের জোব্বাটা ধরে নীচের দিকে দিলে এক টান। তাতে লোকটি পিছন ফিরে চোখ রাঙিয়ে বললে, 'এটা কী হচ্ছে?'

মোল্লা বললে, 'এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে আমার পিছনের লোক।'

১১

কারও মৃত্যু হলে শোক জানানোর জন্য কালো পোশাক পরে মোল্লার দেশের লোকেরা। মোল্লাকে সেই পোশাকে হাঁটতে দেখে একজন জিজ্ঞেস করলে, 'কেউ মরল নাকি, মোল্লাসাহেব?'

'সাবধানের মার নেই', বললে মোল্লাসাহেব, 'কোথায় কখন কে মরছে তা কি কেউ বলতে পারে?'

১২

নাসিরুদ্দিন রাজাকে একটা সুখবর দেবে, তাই অনেক কসরৎ করে রাজসভায় গিয়ে হাজির হয়েছে। রাজা খবর শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'কী বকশিশ চাও বলো।'

'পঞ্চাশ ঘা চাবুক', বললে নাসিরুদ্দিন।

রাজা অবাক! তবে নাসিরুদ্দিন যে মশকরা করছে না সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। হুকুম হল পঞ্চাশ ঘা চাবুকের।

পঁচিশ ঘায়ের পর নাসিরুদ্দিন বললে, 'থামো!'

চাবুক থামল। 'বাকি পঁচিশ ঘা পাবে আমার অংশীদার', বললে নাসিরুদ্দিন। 'রাজপেয়াদা আমার সঙ্গে কড়ার করেছিল সুখবর পেয়ে রাজা বকশিশ দিলে তার অর্ধেক তাকে দিতে হবে।'

সন্দেশ, মাঘ ১৩৮৭

আর এক দফা মোল্লা নাসিরুদ্দিন

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ১ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

নাসিরুদ্দিন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, পাশে ফুলে ফলে ভরা বাগিচা দেখে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। প্রকৃতির শোভাও উপভোগ করা হবে, শর্টকাটও হবে।

কিছুদূর যেতে না যেতেই নাসিরুদ্দিন এক গর্তের মধ্যে পড়ল, আর পড়তেই তার মনে এক চিন্তার উদয় হল।

'ভাগ্যে পথ ছেড়ে বনে ঢুকেছিলাম,' ভাবলে নাসিরুদ্দিন। 'এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশেই যদি এমন বিপদ লুকিয়ে থাকে, তা হলে না-জানি ধুলো-কাদায় ভরা রাস্তায় কত নাজেহাল হতে হত!'

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ২ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

মোল্লাগিন্নি একটা শব্দ পেয়ে ছুটে গেছে তার স্বামীর ঘরে।

'কী হল? কীসের শব্দ?'

'আমার জোব্বাটা মাটিতে পড়ে গেস্‌ল', বললে মোল্লাসাহেব।

'তাতেই এত শব্দ?'

'আমি ছিলাম জোব্বার ভেতর।'

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ৩ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

নাসিরুদ্দিন একদিন রাজসভায় হাজির হল মাথায় এক বিশাল বাহারের পাগড়ি নিয়ে। তার মতলব সে রাজাকে পাগড়িটা বিক্রি করবে।

'তোমার ওই আশ্চর্য পাগড়িটা কত মূল্যে খরিদ করলে মোল্লাসাহেব?' রাজা প্রশ্ন করলেন।

'সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, শাহেন শা!'

এক উজির মোল্লার মতলব আঁচ করে রাজার কানে ফিসফিস করে বললে, 'মূর্খ না হলে কেউ ওই পাগড়ির জন্য অত দাম দিতে পারে না, জাঁহাপনা।'

রাজা মোল্লাকে বললেন, 'অত দাম কেন? একটা পাগড়ির জন্য এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা যে অবিশ্বাস্য।'

'মূল্যের কারণ আর কিছুই না, জাঁহাপনা', বললে নাসিরুদ্দিন, 'আমি জানি দুনিয়ায় কেবল একজন বাদশাই আছেন যিনি এই পাগড়ি খরিদ করতে পারেন।'

তোষামোদে খুশি হয়ে রাজা তৎক্ষণাৎ মোল্লাকে দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবার ব্যবস্থা করে নিজে পাগড়িটা কিনে নিলেন।

মোল্লা পরে সেই উজিরকে বললে, 'আপনি পাগড়ির মূল্য জানতে পারেন, কিন্তু আমি জানি রাজাদের দুর্বলতা কোথায়।'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ৪ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

বোগদাদের খালিফের প্রাসাদে ভোজ হবে, তিন হাজার হোমরা-চোমরার নেমন্তন্ন হয়েছে। ঘটনাচক্রে নাসিরুদ্দিনও সেই দলে পড়ে গেছে।

খালিফের বাড়িতে ভোজ, চাট্টিখানি কথা নয়! অতিথি সৎকারে খালিফের জুড়ি দুনিয়ায় নেই। তেমনি তাঁর বাবুর্চিটিও একটি প্রবাদপুরুষ। তার রান্নার যেমনি স্বাদ, তেমনি গন্ধ, তেমনি চেহারা।

সব খাদ্যের শেষে বিরাট পাত্রে এল একেকটি আস্ত ময়ূর। দেখে মনে হবে ময়ূর বুঝি জ্যান্ত, যদিও আসলে সেগুলো রোস্ট করা। ডানা, ঠোঁট, পুচ্ছ সবই আছে, আর সবকিছুই তৈরি রঙবেরঙের উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে।

নিমন্ত্রিতেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছে রন্ধনশিল্পের এই অপূব নিদর্শনের দিকে, কেউই যেন আর খাবার কথা ভাবছে না।

নাসিরুদ্দিনের খিদে এখনও মেটেনি। সে কিছুক্ষণ ব্যাপার-স্যাপার দেখে আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'এই বিচিত্র প্রাণীটি আমাদের ভক্ষণ করার আগে আমাদেরই এটিকে ভক্ষণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি?'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ৫ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

নাসিরুদ্দিন একটি সরাইখানার তত্ত্বাবধায়কের কাজে বহাল হয়েছে। একদিন সেখানে স্বয়ং সম্রাট সদলবলে এসে বললেন, তিনি ডিমভাজা খাবেন।

খাওয়া শেষ করে শাহেন শা নাসিরুদ্দিনকে বললেন, 'এবার শিকারে যাব। বলো কত দিতে হবে তোমাদের?'

'জাঁহাপনা', বললে নাসিরুদ্দিন, 'ডিমভাজার জন্য লাগবে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।'

সম্রাটের চোখ কপালে উঠল। 'ডিম কি এখানে এতই দুষ্প্রাপ্য?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে না জাঁহাপনা', বললে নাসিরুদ্দিন। 'ডিম দুষ্প্রাপ্য নয়। দুষ্প্রাপ্য সম্রাটের মতো খদ্দের।'

সন্দেশ, আষাঢ় ১৩৮৯

'মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প' গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে সত্যজিৎ রায়ের লেখা ভূমিকা—

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের নামে অনেক গল্প প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানান দেশে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের মতে এইসব গল্পের জন্ম তুরস্কদেশে, কারণ সেখানে এখনো প্রতি বছর মোল্লা নাসিরুদ্দিনের জন্মোৎসব পালন করা হয়।

মোল্লা নাসিরুদ্দিন যে ঠিক কেমন লোক ছিলেন সেটা তার গল্প পড়ে বোঝা মুশকিল। এক এক সময় তাকে মনে হয় বোকা, আবার এক এক সময় মনে হয় ভারী বিজ্ঞ। তোমাদের কী মনে হয় সেটা তোমরাই বুঝে নিও।

আর্থার কনান ডয়েল

ব্রেজিলের কালো বাঘ

মেজাজটা বনেদি, প্রত্যাশা অসীম, অভিজাত বংশের রক্ত বইছে ধমনীতে, অথচ পকেটে পয়সা নেই, রোজগারের কোনও রাস্তা নেই—একজন যুবকের পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে ? আমার বাবা ছিলেন সহজ, সরল মানুষ। তাঁর দাদা, অকৃতদার লর্ড সাদারটন, বিশাল সম্পত্তির মালিক। এই দাদার বদান্যতার উপর বাবার এমনই আস্থা ছিল যে তাঁর একমাত্র সন্তান হয়ে আমার যে কোনওদিন অন্নসংস্থানের চিন্তা করতে হবে এটা তিনি ভাবতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল, হয় সাদারটনের বিস্তীর্ণ জমিদারি এস্টেটে, না হয় নিদেনপক্ষে সরকারের কূটনৈতিক বিভাগে আমার একটা স্থান হবেই। তাঁর অনুমান যে সম্পূর্ণ ভুল সেটা তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে বাবা আর জেনে যেতে পারেননি। যেমন আমার জ্যাঠা, তেমনই ব্রিটিশ সরকার, আমার সংগতির জন্য কিছুই করলেন না, বা আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও তাপ উত্তাপ প্রকাশ করলেন না। ক্বচিৎ কদাচিৎ কিছু ফেজান্ট পাখি বা গুটিকয়েক খরগোশ উপঢৌকন হিসেবে জ্যাঠার কাছ থেকে আসে, আর সেই থেকেই বোঝা যায় যে আমি ইংল্যান্ডের অন্যতম সবচেয়ে সমৃদ্ধ জমিদারিতে অবস্থিত অটওয়েল প্রাসাদের উত্তরাধিকারী। যাই হোক, আমি নিজে বিয়ে করিনি, লন্ডনের গ্রোভনর ম্যানসন্সে ঘর নিয়ে নাগরিক জীবন যাপন করি। কাজের মধ্যে আছে পায়রা শিকার ও হার্লিং হ্যামে পোলো খেলা। আমার ঋণ যে মাসে মাসে বেড়েই চলেছে, কিছুদিন পরে আর তা শোধ করার কোনও উপায়ই থাকবে না, এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আমার এই শোচনীয় অবস্থাটা আরও প্রকট হয়ে উঠছে এই কারণেই যে লর্ড সাদারটন ছাড়াও আমার আরও বেশ কয়েকজন ধনী আত্মীয় রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে নিকট হলেন আমার খুড়তুতো ভাই এভারার্ড কিং। বেশ কিছুদিন ব্রেজিলে অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ জীবন কাটিয়ে সে সম্প্রতি দেশে ফিরে দিব্যি গুছিয়ে বসেছে। তার উপার্জনের পন্থাটা কী সেটা আমার জানা নেই, তবে তার অবস্থা যে রীতিমতো সচ্ছল সেটা বোঝা যায়ই, কারণ সে এখন সাফোকের ক্লিপ্টন-অন-দ্য-মার্শে গ্রেল্যান্ডসের জমিদারির মালিক। ইংল্যান্ডে আসার পর প্রথম বছরটা সে আমার কঞ্জুস জ্যাঠার মতোই আমার কোনও খোঁজখবর নেয়নি, কিন্তু এক গ্রীষ্মের সকালে মনটা খুশিতে ভরে উঠল, যখন দেখলাম, সে একটি চিঠি মারফত গ্রেল্যান্ডস কোর্টে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসার জন্য আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমি তখন দেউলে হবার আশঙ্কায় অন্যরকম কোর্টে যাবার কথা ভাবছিলাম, আর ঠিক সেই সময় দৈবক্রমে এসে গেল এই চিঠি। আমার এই অচেনা ভাইটিকে যদি হাত করতে পারি, তা হলে হয়তো একটা উদ্ধারের পথ পেলেও পেতে পারি। অন্তত বংশমর্যাদার খাতিরেও তো তার আমাকে পথে বসতে দেওয়া উচিত নয়। চাকরকে বলে আমার বাক্স গুছিয়ে নিয়ে সেইদিনই সন্ধ্যায় আমি ক্লিপটন্-অন-দ্য-মার্শের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

ইপ্সিচে গাড়ি বদল করে একটি লোক্যাল ট্রেন আমাকে অসমতল তৃণপ্রান্তরের মাঝখানে একটি জনবিহীন ছোট্ট স্টেশনে নামিয়ে দিল। আমার জন্য কোনও গাড়ি আসেনি (পরে জেনেছিলাম আমার টেলিগ্রাম পৌঁছতে দেরি হয়েছিল), তাই আমি কাছেই একটি পান্থনিবাস থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে রওনা দিয়ে দিলাম। গাড়ির সহিস দিব্যি লোক—সে আমার ভাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বুঝলাম এ অঞ্চলে এর মধ্যেই এভারার্ড কিং-এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য সে পার্টি দিয়েছে, জনসাধারণ যাতে তার বিস্তীর্ণ বাগান ঘুরে দেখতে পারে তার ব্যবস্থা করেছে, নানান জনহিতকর কাজে সে অর্থসাহায্য করেছে। মোটকথা,

এতভাবে সে তার দরাজ মনের পরিচয় দিয়েছে যে, আমার সহিসের ধারণা হয়েছে, সে পার্লামেন্টে পদক্ষেপ করার জন্য জমি তৈরি করছে।

পথে যেতে যেতে সহিসের দিক থেকে আমার দৃষ্টি হঠাৎ চলে গেল এক বিচিত্রবর্ণ পাখির দিকে। রাস্তার ধারে টেলিগ্রাফ পোস্টের উপর বসেছে পাখিটা। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি নীলকণ্ঠ জাতীয় কোনও পাখি, কিন্তু কাছে আসতে দেখলাম আয়তনে তার চেয়ে বেশ খানিকটা বড়, আর পালকে রঙের বাহারও অনেক বেশি। সহিস বলল, আমরা যে ব্যক্তির কাছে চলেছি, এটা তাঁরই পাখি। ইনি নাকি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে নানারকম পশুপাখি এনে এখানকার আবহাওয়ায় সেগুলো প্রতিপালনের চেষ্টা করছেন। গ্রেল্যান্ডস পার্কের গেট দিয়ে প্রবেশ করার পর এই কথার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেল। ছোট ছোট বুটিদার হরিণ, এক ধরনের শুয়োর-জাতীয় জানোয়ার—নাম বোধহয় পেকারি—একটি ঝলমলে রঙ বিশিষ্ট ওরিয়োল পাখি, এক শ্রেণীর পিপীলিকাভুক, আর একরকম স্থূল ব্যাজার-জাতীয় জানোয়ার চোখে পড়ল গাছপালায় ঘেরা আঁকাবাঁকা পথটা দিয়ে যেতে।

আমার খুড়তুতো ভাইটি গাড়ির শব্দ পেয়ে আমি এসেছি বুঝে বাড়ির বাইরে সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছিল। চেহারায় একটা অমায়িক ভাব ছাড়া তেমন কোনও বিশেষত্ব নেই। আকারে বেঁটে ও মোটা, বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, রোদে পোড়া গোল মুখে অজস্র বলিরেখা। পরনে সাদা লিনেনের জামা—যেমন প্লান্টাররা পরে থাকে—মুখে চুরুট ও মাথায় পানামা টুপি। দেখে মনে হয় ইনি প্রাচ্যের কোনও উপনিবেশের বাংলো বাড়ির বাসিন্দা, ইংল্যান্ডের এই সুউচ্চ পালাডিও স্তম্ভ-বিশিষ্ট সুবিশাল অট্টালিকায় ইনি বেমানান।

'শুনছ!' ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ করে বলেন, 'উনি এসে গেছেন—আমাদের অতিথি! গ্রেল্যান্ডসে তোমায় স্বাগত জানাচ্ছি, মার্শাল ভায়া! তোমার সঙ্গে আলাপের সুযোগে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই ঘুমিয়ে-আসা পল্লীগ্রামে আমার এই বাসস্থানে তোমার যে পায়ের ধুলো পড়ল তাতে আমি সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি।'

তাঁর এই সাদর অভ্যর্থনায় মুহূর্তের মধ্যে আমার সব সঙ্কোচ কেটে গেল। আর এটার প্রয়োজন ছিল একান্তভাবেই, কারণ স্বামীর ডাকে যে বিবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গিনীটি বেরিয়ে এলেন, তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক রকম রূঢ়। আমার ধারণা হল ইনি ব্রেজিলের মেয়ে, যদিও ইংরাজিটা বলেন ভালই। হয়তো আমাদের দেশের আদব-কায়দার সঙ্গে পরিচয়ের অভাবই তাঁর এই রুক্ষস্বভাবের কারণ। তাঁর আচরণ থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, গ্রেল্যান্ডস কোর্টে আমার উপস্থিতিতে তিনি আদৌ প্রসন্ন নন। তাঁর কথায় কোনও অশালীনতার পরিচয় না পেলেও, তাঁর ভাবব্যঞ্জক চোখের চাহনিই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, আমি লণ্ডনে ফিরে না যাওয়া অবধি তাঁর শান্তি নেই।

কিন্তু আমার ঋণের ভার এত বেশি, এবং আমার এই ধনী আত্মীয়টি আমার ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, এ সম্পর্কে আমি এতই আস্থাবান যে, আমি স্ত্রীর রূঢ়তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে স্বামীর হৃদ্যতার ষোলো আনা সুযোগ নেওয়া স্থির করলাম। আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দেখলাম তাঁর সজাগ দৃষ্টি। যে ঘরটি আমায় দেওয়া হয়েছে সেটি চমৎকার। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক বারবার বললেন আমার সুবিধার জন্য যা কিছু দরকার তা তিনি করতে রাজি আছেন। আমি প্রায় বলেই ফেলেছিলাম সবচেয়ে সুবিধা হয় কিছু অর্থসমাগম হলে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল সেটার সময় এখনও আসেনি। নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল পরিপাটি, আর ভোজনান্তে ছিল হাভানা চুরুট আর কফির ব্যবস্থা। চুরুট নাকি তাঁর নিজের বাগানের তামাক থেকে তৈরি। আসার পথে সহিস যা বলছিল তা যে একটুও বাড়িয়ে বলা নয় সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। এঁর মতো মহানুভব, অতিথিবৎসল ব্যক্তি আমি আর দুটি দেখিনি।

কিন্তু এই ব্যক্তির মধ্যেও যে একটি আত্মম্ভর অগ্নিগর্ভ মানুষ বাস করে তার পরিচয় পেলাম পরদিন সকালে। কিং গৃহিণী আমার প্রতি এতই বিমুখ যে, প্রাতরাশের সময় সেটা প্রায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। স্বামী ঘর থেকে বেরোনোমাত্র তাঁর মনের ভাবটা পরিষ্কার ফুটে বেরোল।

'লণ্ডন ফিরে যাবার সবচেয়ে ভাল ট্রেন হচ্ছে দুপুর সাড়ে বারোটায়,' হঠাৎ বললেন ভদ্রমহিলা।

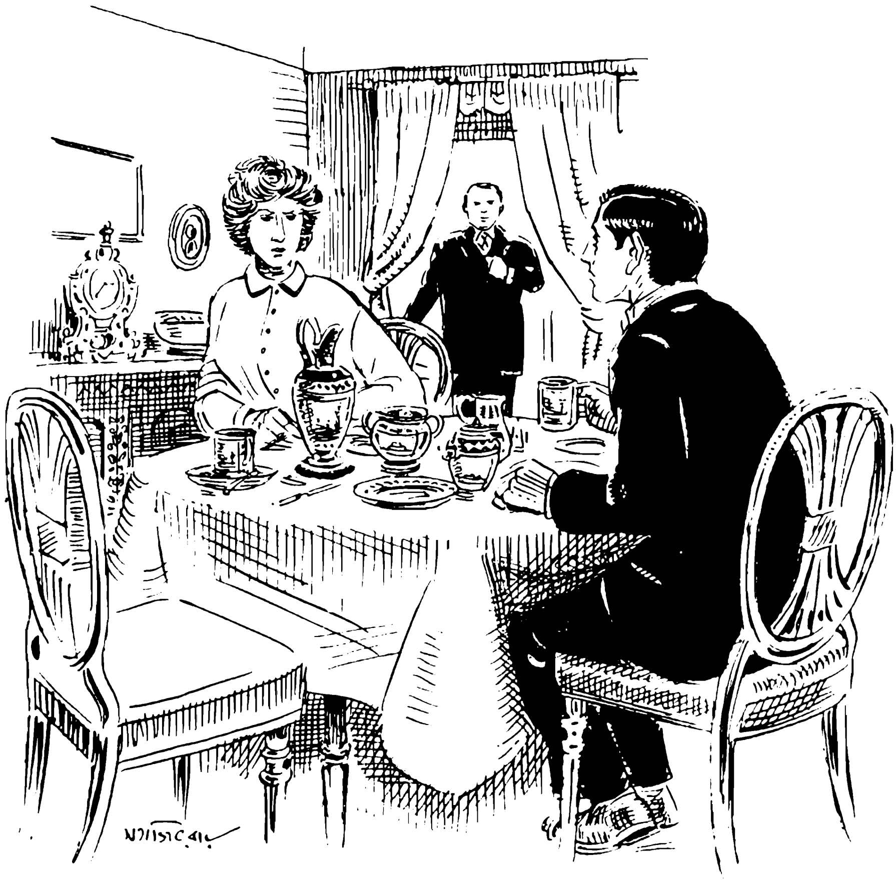

আমি খোলাখুলি বললাম, 'আমি কিন্তু আজ ফেরার কথা ভাবছি না।'

এই মহিলার দ্বারা বিতাড়িত হবার কোনও বাসনা ছিল না আমার।

'আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরই যদি সেটা নির্ভর করে—' কথাটা শেষ না করে অত্যন্ত উদ্ধতভাবে ভদ্রমহিলা চাইলেন আমার দিকে।

আমিও ছাড়বার পাত্র নই। বললাম, 'আমার বিশ্বাস এভারার্ড যদি মনে করে আমি তার আতিথেয়তার অন্যায় সুযোগ নিচ্ছি তা হলে সে কথা সে নিশ্চয়ই আমাকে বলবে।'

'ব্যাপার কী?'

ঘরে ফিরে এসেছে এভারার্ড। মনে হল আমার কথাগুলো সে শুনেছে, এবং আমাদের দু'জনের দিকে চেয়ে সে পরিস্থিতিটা আঁচ করে নিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে তার খুশিতে ভরা গোল মুখটায় এক অনির্বচনীয় হিংস্রভাব ফুটে উঠল।

'তুমি একটু বাইরে যাবে কি, মার্শাল?' (আমার নাম যে মার্শাল কিং সেটা এইবেলা বলে রাখি)।

আমি বেরোতে আমার পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল এভারার্ড, আর তারপরেই শুনলাম তীব্র ভর্ৎসনার সুরে সে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। আতিথেয়তার অবমাননায় সে যে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ তাতে সন্দেহ নেই। আড়ি পাতার কোনও অভিসন্ধি ছিল না আমার, তাই আমি বারান্দা থেকে নেমে এলাম বাগানে। কিছুক্ষণ পরে দ্রুত পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুরে দেখি মহিলা বাইরে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁর মুখ বিবর্ণ, দৃষ্টি বিস্ফারিত।

'আমার স্বামী আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন, মিঃ মার্শাল', দৃষ্টি না তুলে বললেন মহিলা।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'দোহাই মিসেস কিং, এ নিয়ে আর কিছু বলবেন না।'
তাঁর কালো চোখদুটো হঠাৎ ঝলসে উঠল।
'মূর্খ!'
চাপা অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে কথাটা বলে সদর্পে ঘরের ভিতর চলে গেলেন মহিলা।
অপমানটা এতই অপ্রত্যাশিত, এত অসহ্য যে, আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম দরজার দিকে। এমন সময় এভারার্ড এল বারান্দায়।
'আশা করি আমার স্ত্রী তার অবচীন ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়েছে তোমার কাছে।'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ—চেয়েছেন বইকী!' এভারার্ড কনুইটাকে তার হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।
'তুমি ব্যাপারটা গায়ে মেখো না', বলল এভারার্ড। 'তোমার মেয়াদের একটি ঘণ্টাও কম যদি থাকো তুমি এখানে তা হলে আমি অত্যন্ত দুঃখ পাব। ব্যাপারটা হচ্ছে কী—ভাইয়ের কাছে গোপন করার কোনও মানে হয় না—আমার স্ত্রী অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ। আমাদের দু'জনের মাঝখানে কেউ এসে দাঁড়ালেই সেটা ও আর বরদাস্ত করতে পারে না, তা সে লোক পুরুষই হোক আর মহিলাই হোক। ও সবচেয়ে কীসে খুশি হয় জানো?—স্বামী-স্ত্রীতে সমুদ্রের মাঝখানে কোনও জনবিহীন দ্বীপে বসে গল্প করে যদি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই, তা হলে। এর থেকেই বুঝতে পারবে ও মানুষটা কেমন। আসলে এটা একটা ব্যারামের শামিল। তুমি কথা দাও, এ নিয়ে আর চিন্তা করবে না।'
'মোটেই না।'
'তা হলে এই চুরুটটা ধরিয়ে আমার সঙ্গে এসো। আমার পশুসংগ্রহটা দেখাই তোমাকে।'
সারা বিকেলটা কেটে গেল এই কাজে। বাইরের থেকে আনা যত পাখি, যত সরীসৃপ, সবই দেখা হল। এদের মধ্যে কিছু রয়েছে খাঁচায়, কিছু খাঁচার বাইরে, আর কিছু একেবারে বাড়ির ভিতর ছাড়া-অবস্থায়। চলতে চলতে সামনে ঘাস থেকে হঠাৎ কোনও রঙবেরঙের পাখি লাফিয়ে উঠতে দেখে, বা কোনও অচেনা জানোয়ারকে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে দেখে ছেলেমানুষের মতো উল্লসিত হয়ে উঠছিল এভারার্ড। সবশেষে প্রাসাদের এক প্রান্তে একটি লম্বা প্যাসেজের ভিতর গিয়ে পৌঁছলাম আমরা। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটি খড়খড়ি লাগানো ভারী দরজা, আর তার পাশেই একটা হাতল লাগানো চাকা। সেইসঙ্গে লক্ষ করলাম, লোহার ফ্রেমে লাগানো এক সারি খাড়াখাড়ি লোহার শিক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্যাসেজের ভিতর।
'এবার যেটা দেখাব সেটা হল আমার সংগ্রহের একেবারে সেরা জিনিস', বলল এভারার্ড। 'ইউরোপে আর একটিমাত্র নমুনা আছে এই জিনিসের। রটারড্যামে একটা বাচ্চা ছিল, সেটা মরে গেছে। জিনিসটা হল একটা ব্রেজিলিয়ান বাঘ।'
'তার সঙ্গে অন্য বাঘের তফাত কোথায়?'
'সেটা এখুনি দেখতে পাবে', হেসে বলল কিং। 'খড়খড়িটা তুলে একবার ভিতরে দেখবে কি?'
দরজার গায়ের খড়খড়ি ফাঁক করে চোখ লাগাতেই দেখলাম একটি বেশ বড় ঘর। তার মেঝেতে পাথর বসানো, তার দেয়ালের উপর দিকে শিক দেওয়া ছোট্ট জানলা। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর বসে রোদ পোয়াচ্ছে একটি জানোয়ার। সেটা বাঘের মতোই বড়, যদিও গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। আয়তন বিশাল হলেও ভঙ্গিটা দেখে পোষা বেড়ালের কথাই মনে হয়। তার দেহের সুঠাম, পেশল গড়ন, বীর্যের সঙ্গে কমনীয়তার আশ্চর্য সমাবেশ, আমাকে এমন মুগ্ধ করল যে, আমি জানোয়ারের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।
'জাঁদরেল জানোয়ার, নয় কি?' প্রশ্ন করল এভারার্ড।
'নিঃসন্দেহে', বললাম আমি। 'এমন আশ্চর্য জানোয়ার দেখিনি কখনও।'
'কেউ কেউ এটাকে পুমা বলে। কিন্তু আসলে এটা মোটেই পুমা নয়। এটা মাথা থেকে লেজের ডগা অবধি আঠারো ফুট। চার বছর আগে এটা ছিল দুটো ড্যাবড্যাবে হলদে চোখ বসানো একটি কালো পশমের বল। রিও নিগ্রো নদীর কাছে এক আদিম অরণ্যে একজন এটা বিক্রি করেছিল আমাকে, মা-টাকে বল্লম দিয়ে মেরে ফেলে, যদিও তার আগে এগারোটি মানুষ গেছে তার পেটে।'

'তার মানে এরা বুঝি খুব হিংস্র হয় ?'

'এমন শয়তান, এমন রক্তপিপাসু জানোয়ার আর দুটি নেই। দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের এই বাঘের কথা বললে দেখবে তারা কীরকম চমকে ওঠে। এই জানোয়ারের চেয়ে মানুষের উপর তাদের বিশ্বাস অনেক বেশি। ইনি এখনও মানুষের রক্তের স্বাদ পাননি, কিন্তু একবার পেলে এঁর চেহারাই বদলে যাবে। এখন পর্যন্ত আমাকে ছাড়া আর কাউকে বরদাস্ত করে না ওর ঘরে। ওর পরিচর্যা করে যে লোক—বল্‌ডউইন—সেও ওর কাছে যেতে সাহস পায় না। ওর বাপ, মা দুই-ই হচ্ছি আমি।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ও আমাকে চমকে দিয়ে দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকে আবার তৎক্ষণাৎ সেটা বন্ধ করে দিল। তার কণ্ঠস্বর শুনে বিশাল জানোয়ারটা উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে নিজের মাথাটা এভারার্ডের গায়ে ঘষতে লাগল, আর এভারার্ডও জানোয়ারটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

'এবার দেখি টমি বাবু, খাঁচায় ঢোকো তো !'

আদেশ শোনামাত্র কৃষ্ণকায় জীবটি ঘরের একপাশে গিয়ে একটি গরাদের ছাউনির তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসল। তারপর এভারার্ড বাইরে এসে হাতলটা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে প্যাসেজে বেরিয়ে থাকা ফ্রেম-বদ্ধ লোহার শিকের সারি দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে বাঘের ঘরে ঢুকে ছাউনির সঙ্গে লেগে গিয়ে দিব্যি একটি খাঁচার সৃষ্টি করল। এবার এভারার্ড দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ডাকল। এই বিশেষ শ্রেণীর শ্বাপদের ঘরে যে বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়, এই ঘর এখন সেই গন্ধে ভরপুর।

'এটাই ব্যবস্থা', বলল এভারার্ড। 'দিনের বেলা ও সমস্ত ঘরটাতেই পায়চারি করে, রাত্রে একপাশে খাঁচাটায় পুরে দেওয়া হয়। বাইরে থেকে হাতল ঘোরালেই খাঁচার দেয়াল সরে গিয়ে ও ছাড়া পেয়ে যায়। আর যদি তা না চাও তো ওকে ওইভাবেই বন্দি করে রাখতে পারো। উঁহুঁ উঁহুঁ—ওরকম কোরো না।'

আমি গরাদের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বাঘের গায়ে রাখতে গিয়েছিলাম, সে এক হ্যাঁচকা টানে আমার হাতটা বার করে আনল।

'ওকে বিশ্বাস নেই। আমি যা করি, আর পাঁচজনের তা করা চলে না। সবাইকে ও বন্ধু বলে মানতে রাজি নয়। তাই না টমি ? হুঁ, এবারে লাঞ্চের গন্ধ পেয়েছেন বাবু। তাই না, টমি ?'

বাইরে প্যাসেজে পায়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে অপরিসর খাঁচাটার মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। তার হলুদ চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ ও অস্থির, তার লেলিহান জিভ বেরিয়ে পড়েছে হাঁ-করা মুখের অসমান দাঁতের সারির ফাঁক দিয়ে। একজন পরিচারক পাত্রে একটি মাংসখণ্ড নিয়ে ঘরে এসে গরাদের মধ্যে দিয়ে সেটাকে খাঁচার ভিতর গলিয়ে দিল। বাঘ থাবা দিয়ে আলতো করে সেটাকে তুলে নিয়ে খাঁচার এক কোণে বসে সেটার সদ্ব্যবহার করতে শুরু করল। মাংস টেনে ছেঁড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে রক্ত মাখা মুখটা তুলে আমাদের দিকে চাইছে। আমিও একদৃষ্টে দেখছি এই বন্য দৃশ্য।

'টমির উপর আমার টানের কারণটা বুঝলে তো ?' ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল এভারার্ড। 'হাজার হোক, আমার হাতেই তো ও মানুষ। কম ঝক্কি গেছে ওকে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এখানে আনতে ? অবিশ্যি এখানে এসে ও ভালই আছে। যা বলছিলাম, এই বিশেষ বাঘের এর চেয়ে ভাল নমুনা ইউরোপে আর নেই। চিড়িয়াখানার কর্তারা একে নেবার জন্য ঝুলোঝুলি করছে। কিন্তু আমি ওকে ছাড়ছি না। যাক গে, আমার মনের কথা ঢের বলা হল, এবার চলো টমির মতো আমরাও গিয়ে লাঞ্চ করি।'

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসা আমার এ ভাইটি তার জন্তুজানোয়ার নিয়ে এতই মশগুল যে, সে-জগতের বাইরে যে আর একটা জগৎ থাকতে পারে সেটা ভাবাই মুশকিল। কিন্তু সেটা যে রয়েছে সেটা বুঝতে পারতাম তার পাওয়া টেলিগ্রামের বহর থেকে। দিনের যে কোনও সময় আসত এই টেলিগ্রাম, আর তার প্রত্যেকটি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে খুলত এভারার্ড নিজেই। একেকবার মনে হত সেগুলো হয়তো ঘোড়ার মাঠ বা স্টক মার্কেট সংক্রান্ত কোনও খবর। মোট কথা, এটা বোঝাই যেত যে এমন কিছু কারবারের সঙ্গে সে জড়িত রয়েছে যেটা ঘটছে সাফোকের বাইরে। আমি যে,

ছ'দিন ছিলাম তার মধ্যে দিনে চারখানা করে টেলিগ্রাম তো এসেইছে, একদিন এল সাতখানা।

এই ছ'দিন এত ভালভাবে কেটেছে যে ভাইয়ের সঙ্গে একটা চমৎকার সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। প্রতি রাতে বিলিয়ার্ড রুমে বসে এভারার্ড তার আশ্চর্য ভ্রমণকাহিনী শোনাত আমাকে। শুনে বিশ্বাস করা বেশ কঠিন হত যে, আমার এই নিরীহ ভাইটিই এইসব রোমহর্ষক ঘটনার নায়ক। তার অভিজ্ঞতার পরিবর্তে আমি তাকে শোনাতাম গ্রোভনর ম্যানসন্সের জীবনযাত্রার খবর। তাতে সে এতই মুগ্ধ হত যে, বারবার বলত একবার লন্ডনে এসে আমার বাসস্থানে ক'টা দিন কাটিয়ে যাবে। লন্ডনের চঞ্চল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে দেখতাম তার একটা অদম্য কৌতূহল রয়েছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে ভাল গাইড সে পাবে না।

শেষ দিনে আমি আর কথাটা না বলে পারলাম না। সরাসরি বলে দিলাম যে আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এবং সম্পূর্ণ দেউলে হতে আমার আর বেশিদিন বাকি নেই। আমি যদিও তার কাছে পরামর্শই চাইলাম, যেটা আসলে দরকার ছিল সেটা হল বেশ খানিকটা ক্যাশ টাকা।

'কিন্তু তুমিই তো লর্ড সাদারটনের উত্তরাধিকারী, তাই না ?' প্রশ্ন করল এভারার্ড।

'আমার তো তাই ধারণা, কিন্তু তিনি আমাকে এক কপর্দকও দেননি কখনও।'

'জানি', বলল এভারার্ড। 'সে যে কত কঞ্জুস সে কথা আমি শুনেছি। সত্যি তো, তোমার অবস্থা বেশ কাহিল বলে মনে হচ্ছে। ভাল কথা, সাদারটনের স্বাস্থ্য এখন কেমন ?'

'ছেলেবেলা থেকেই তো শুনে আসছি সে অত্যন্ত রুগ্ণ।'

'হুঁ...তাও ট্যাঙস ট্যাঙস করে চালিয়ে যাচ্ছে। বেচারা তুমি !'

'আমার বড় আশা ছিল তুমি সব শুনে-টুনে হয়তো কিছু—'

'আর বলতে হবে না', হেসে বলল এভারার্ড। 'আজ রাত্রে এ-বিষয়ে কথা হবে। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব করব, কথা দিচ্ছি।'

আমার যে বিদায় নেবার সময় এসে গেছে তাতে আমার আক্ষেপ নেই, কারণ জানি যে এ-বাড়িরই একজন বাসিন্দা আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। কিং গৃহিণীর বিষদৃষ্টি আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনি যে আগ বাড়িয়ে আমাকে অপমান করেন তা নয় ; সেখানে স্বামীর ভয় তাঁকে বেশিদূর এগোতে দেয় না। কিন্তু চরম ঈর্ষার বশে তিনি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন, এবং গ্রেল্যান্ডসে আমার অবস্থান যাতে সবদিক দিয়ে অস্বস্তিকর হয়, সে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেন না। বিশেষত শেষ দিনে তাঁর ব্যবহার এমনই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেল যে, এভারার্ডের কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না পেলে আমি সেইদিনই দুপুরের গাড়িতে রওনা দিয়ে দিতাম।

ঘটনাটা ঘটতে বেশ রাত হল। আমার আশ্রয়দাতা আজ অন্যদিনের তুলনায় অনেক বেশি টেলিগ্রাম পেয়েছে। সেগুলো নিয়ে সে চলে গেল তার কাজের ঘরে। যখন বেরোল ততক্ষণে বাড়ির আর সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি শুনতে পেলাম সে রোজকার অভ্যাসমতো ঘুরে ঘুরে নীচের দরজাগুলো বন্ধ করছে। অবশেষে সে বিলিয়ার্ড রুমে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিল, তার স্থূল দেহ ড্রেসিং গাউনে আবৃত, পায়ে একজোড়া টার্কিশ স্লিপার। আরাম কেদারায় বসে গেলাসে পানীয় ঢেলে সে নিজের সামনে টেনে নিল ; লক্ষ করলাম তাতে জলের চেয়ে হুইস্কির মাত্রাই বেশি।

'কী রাত রে বাবা !' মন্তব্য করল এভারার্ড।

কথাটা ভুল বলেনি। সারা বাড়িটাকে ঘিরে ঝোড়ো বাতাস বইছে, তার শব্দ যেন প্রকৃতির আর্তনাদ। জানলাগুলো থরথর করে কাঁপছে, বাইরে অন্ধকারের ফলে ঘরের হলদে বাতিগুলো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে।

'শুনি তোমার কাহিনী', বললেন আমার আশ্রয়দাতা। 'আমরা দু'জনে এখন একা। এই দুর্যোগের রাতে কেউ আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না। তুমি বলো, তারপর দেখি তোমার একটা হিল্লে করা যায় কিনা।'

এইভাবে উৎসাহ দেবার ফলে আমি আদ্যোপান্ত বললাম আমার ব্যাপারটা। যেসব লোকের সঙ্গে আমার কারবার, আমার পাওনাদারেরা, আমার বাড়িওয়ালা, আমার চাকর-বাকর—কেউই সে বর্ণনা থেকে বাদ পড়ল না। সঙ্গে আমার নোটবুক ছিল, সব তথ্য গুছিয়ে নিয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে

আমার শোচনীয় অবস্থাটা তাকে বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু দেখে খারাপ লাগল যে, শ্রোতা আমার কথায় মনোযোগ দিচ্ছে না। যে দু-একটা মন্তব্য সে করছিল সেগুলো এতই মামুলি ও অপ্রত্যাশিত যে, আমার সন্দেহ হল সে আদৌ আমার কথা শুনছে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে আমার কোনও উক্তির পুনরাবৃত্তি করতে বলে সে আগ্রহের একটা ভান করছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারছিলাম তার মন অন্যদিকে চলে গেছে। অবশেষে চেয়ার ছেড়ে উঠে চুরুটের অবশিষ্টাংশ ফায়ার প্লেসে ফেলে দিয়ে সে বলল, 'তোমায় বলি শোনো—হিসেব জিনিসটা কোনওদিন আমার মাথায় ঢোকে না। তুমি বরং পুরো ব্যাপারটা একটা কাগজে লিখে ফেলো, তারপর তোমার কত হলে চলে সেটাও লিখে দাও। চোখের সামনে জিনিসটা দেখতে পেলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে।'

প্রস্তাবটা শুনে আমার ভালই লাগল। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

'চলো এইবেলা শুয়ে পড়া যাক। ওই শোনো হলঘরের ঘড়িতে একটা বাজছে।'

'ঘড়ির ঘণ্টা ঝড়ের গোঙানি ছাপিয়ে শোনা গেল। বাতাসের শব্দ শুনে মনে হয়, যেন একটা উত্তাল নদী বয়ে চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে।

'শোবার আগে বাঘটাকে একবার দেখে যেতে চাই', বলল এভারার্ড। 'ঝড় জিনিসটা ও ঠিক পছন্দ করে না। তুমি আসবে?'

'চলো।'

'চুপচাপ শব্দ না করে এসো। আর সবাই ঘুমোচ্ছে।'

পারস্যের গালিচা বিছানো হলঘরে ল্যাম্প জ্বলছে; সে ঘর পেরিয়ে একটা দরজার মধ্যে দিয়ে গিয়ে ঢুকলাম প্যাসেজে। অন্ধকার প্যাসেজ, দেয়ালে একটি লণ্ঠন ঝুলছে। এভারার্ড সেটাকে নামিয়ে জ্বালিয়ে নিল। লোহার গরাদগুলো দেখা যাচ্ছে না, বুঝলাম বাঘ এখন খাঁচায় বন্দি।

'এসো ভিতরে,' বাঘের দরজা খুলে দিয়ে বলল এভারার্ড।

ঘরে ঢোকামাত্র একটা গর্জন শুনে বুঝলাম ঝড়ে বাঘের মেজাজ বেশ বিগড়ে দিয়েছে। ল্যাম্পের কম্পমান আলোয় দেখলাম বিশাল কৃষ্ণকায় জীবটিকে, খাঁচার এক কোণে খড়ের গাদার উপর বসে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। পিছনের সাদা দেয়ালে পড়েছে তার প্রকাণ্ড ছায়া। বাঘের লেজটা মাঝে মাঝে নড়ে উঠে মেঝের খড়গুলোকে ইতস্তত ছড়িয়ে দিচ্ছে।

'বেচারি টমির মেজাজ তেমন সুবিধের নয়', হাতের ল্যাম্পটাকে এগিয়ে ধরে বলল এভারার্ড কিং। 'একটি আস্ত কেলে শয়তানের মতো দেখতে লাগে ওকে, তাই না? ওর জন্য কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা না করলে ওর মেজাজ ভাল হবে না। দেখি ভাই, একটু ধরো তো লণ্ঠনটা।'

আমি তার হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'বাইরেই আছে ওর খাবার', বলল এভারার্ড, 'আমি এক মিনিটে ঘুরে আসছি।' ও কথাটা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর সেই মুহূর্তে একটা ধাতব খুট্ শব্দের সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শব্দটা কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ করে দিল। আমার সর্বাঙ্গে একটা আতঙ্কের ঢেউ খেলে গেছে, একটা চরম বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় রক্ত হিম হয়ে গেছে। আমি দরজার উপর লাফিয়ে পড়লাম—কিন্তু দেখলাম ঘরের ভিতর দিকে দরজার কোনও হাতল নেই।

'দরজা খোলো!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'দরজা খোলো!'

'হল্লা কোরো না', প্যাসেজ থেকে উত্তর এল—'তোমার কাছে আলো রয়েছে তো।'

'এভাবে একা বন্দি থাকতে চাই না আমি!'

'বটে?' একটা বিশ্রী হাসির সঙ্গে উত্তর এল। 'বেশিক্ষণ একা থাকতে হবে না তোমায়।'

'দরজা খোলো বলছি!' আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম। 'এ ধরনের রসিকতা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।'

এবারে একটা বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে শুনলাম একটা যান্ত্রিক ঘড় ঘড় শব্দ। সর্বনাশ! হাতল ঘুরিয়ে লোহার ঝাঁঝরিটাকে টেনে বাইরে বার করে নিচ্ছে এভারার্ড কিং।

অর্থাৎ বাঘ আর খাঁচায় বন্দি থাকবে না।

লণ্ঠনের আলোতে দেখতে পাচ্ছি লোহার শিকগুলো ক্রমশ সামনে থেকে সরে যাচ্ছে।

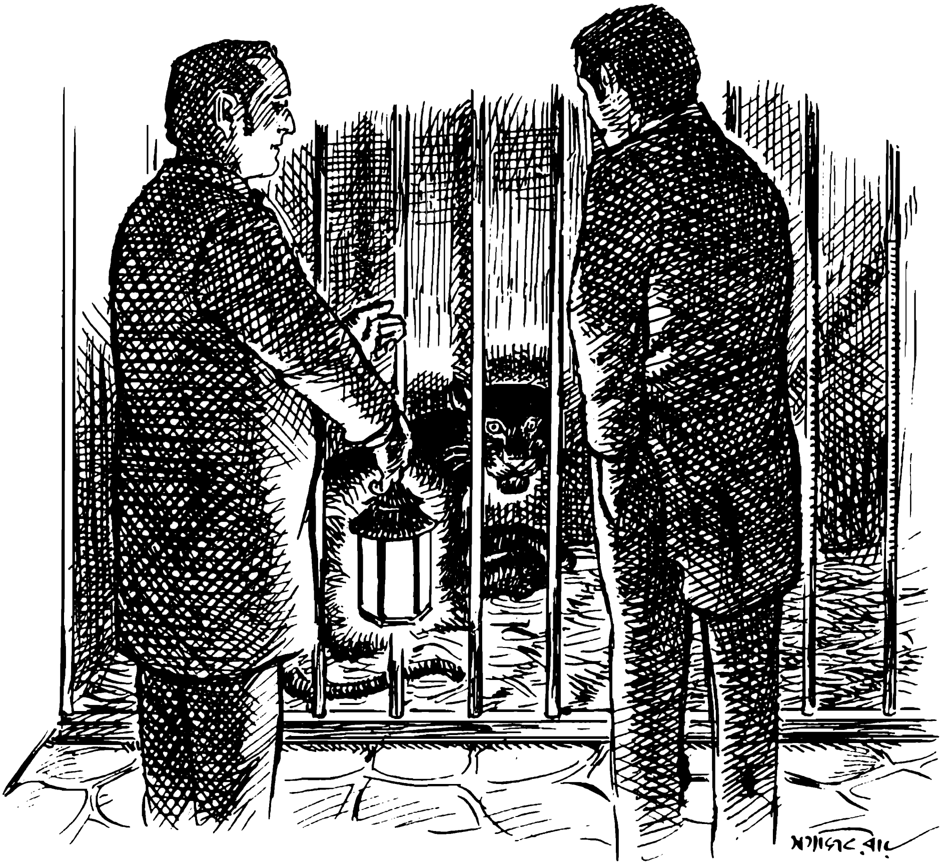

শিকওয়ালা দেয়াল যেখানে ঘরের দেয়ালের সঙ্গে গিয়ে ঠেকেছিল, সেখানে এর মধ্যেই প্রায় এক হাত ফাঁক দেখা দিয়েছে। মরিয়া হয়ে আমি শেষ শিকটা আঁকড়ে ধরে উলটো দিকে টানতে লাগলাম। রাগ ও আতঙ্কে তখন আমি দিশেহারা। দরজাটা দু'দিক থেকে টানার ফলে মিনিটখানেক অনড় হয়ে রইল। বেশ বুঝতে পারছি ও সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে হাতলটা ঘোরাবার চেষ্টা করছে, এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমার শক্তি তার কাছে হার মানবে। এবার শিকটার সঙ্গে সঙ্গে আমিও হড়কাতে শুরু করেছি পাথরের মেঝের উপর দিয়ে। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি এই পৈশাচিক মানুষটির হাতে যেন আমায় মরতে না হয়। অনেক অনুনয় করে তাকে বোঝালাম যে, আমার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক। আমি তার অতিথি। আমি তার কী ক্ষতি করেছি যে, সে আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছে!—কিন্তু জবাবে সে আরও বলপ্রয়োগ করে চলেছে হাতলের উপর, এবং একটি একটি করে লোহার শিক বেরিয়ে চলেছে ঘরের বাইরে। টানের চোটে আমিও এগিয়ে চলেছি খাঁচার সামনে দিয়ে।

অবশেষে আমার কবজি যখন যন্ত্রণায় অসাড়, আমার আঙুল ক্ষতবিক্ষত, তখন নিরুপায় হয়ে হাল ছাড়তে হল। একটা ঘটাং শব্দ করে খাঁচার দেওয়ালটা পুরো সরে গেল, আর তারপর শুনলাম টার্কিশ চটি পরা পায়ের শব্দ মিলিয়ে গিয়ে প্যাসেজের শেষ প্রান্তের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আর শব্দ নেই।

এতক্ষণ জানোয়ারটা অনড় ভাবেই বসে ছিল খাঁচার এক কোণে। তার লেজ আর নড়ছে না। তার সামনে দিয়ে একটা মানুষকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—এ দৃশ্য নিশ্চয়ই তার ভারী

অদ্ভুত লেগেছিল। তার বিশাল চোখ দুটি এখন আমার দিকে চাওয়া। শিকটা ধরার সময় লণ্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে রেখেছিলাম। মনে হল সেটা হাতে থাকলে তার আলোটা হয়তো আত্মরক্ষায় কিছুটা সাহায্য করবে ; কিন্তু সেটা তুলতে যেই হাত নামিয়েছি অমনই বাঘটা একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি তৎক্ষণাৎ আতঙ্কে পাথর। বাঘের থেকে আমার দূরত্ব এখন মাত্র দশ ফুট। তার চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে। অদ্ভুত সে চাহনি ; মনের গভীরে ত্রাসের সঞ্চার করলেও চোখ ফেরানো যায় না। চরম সংকটের মুহূর্তে প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়ালে মনে হয় জ্বলন্ত গোলক দুটি যেন একবার আয়তনে বাড়ছে, একবার কমছে। আবার মনে হয় যে, অন্ধকারে দুটি উজ্জ্বল বিন্দু ক্রমে বড় হতে হতে ঘরের ওই বিশেষ অংশটিতে একটা ভৌতিক আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর তারপরেই দেখি আলো নেই।

অর্থাৎ জানোয়ার চোখ বন্ধ করেছে। মানুষের অপলক দৃষ্টিতে এক অমোঘ শক্তি আছে, এমন একটা প্রচলিত ধারণায় কোনও সত্য আছে কিনা জানি না ; হয়তো বা জানোয়ারটার মধ্যে একটা তন্দ্রার ভাব এসেছিল। মোট কথা, আক্রমণের কোনও চেষ্টার বদলে সেটা দিব্যি পায়ের উপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে বলেই মনে হয়। পাছে তার মধ্যে আবার হিংস্রভাব জেগে ওঠে, তাই আমিও সম্পূর্ণ অনড় হয়ে রইলাম। ওই ভয়ংকর চোখ দুটো আমার চোখের সামনে না থাকায় এখন তবু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে পারছি। এই পৈশাচিক জানোয়ারের সঙ্গে সারারাত সহবাস করতে হবে আমাকে। আমার নিজের মন বলছে, এবং যার জন্য আমার এই দশা তার কথাতেও বুঝেছি যে, এই জানোয়ার তার মনিবের মতোই মারাত্মক। কাল সকাল পর্যন্ত একে ঠেকিয়ে রাখব কী করে ? দরজা তো খুলবেই না, আর ওই শিকওয়ালা খুপচি জানলাও আমার কোনও কাজে আসবে না। 'আমাকে বাঁচাও' বলে তারস্বরে চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই, কারণ আমি এখন যে অংশটাতে রয়েছি সেটা বাড়ির বাইরে ; সেই বাড়ি আর ব্যাঘ্রাবাসের মধ্যে যে প্যাসেজটা রয়েছে সেটা প্রায় একশো ফুট লম্বা। তা ছাড়া এই ঝড়বাদলের শব্দের মধ্যে আমার চিৎকার শুনবে কে ? একমাত্র ভরসা আমার সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধি।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার অসহায়ভাব দ্বিগুণ বেড়ে গেল লণ্ঠনের দিকে চোখ পড়াতে। বাতির যে এখন শেষ অবস্থা সেটা শিখার অস্থিরতা থেকেই বোঝা যায়। এর আয়ু দশ মিনিট। যা করার এর মধ্যেই, কারণ অন্ধকারে ওই জানোয়ারের সঙ্গে একা পড়লে তখন আর সুস্থমস্তিষ্কে কিছু করার অবস্থা থাকবে না। কথাটা ভাবতেই আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে এল। দিশেহারা ভাবে এদিক-ওদিক চাইতে একটা জিনিসের উপর চোখ পড়াতে একটা ক্ষীণ আশার উদ্রেক হল। এতে সংকট থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি না পেলেও, অন্তত সাময়িক নিরাপত্তার একটা সম্ভাবনা আছে।

আগেই বলেছি যে, খাঁচার দুটো অংশ ছিল—একটা ছাত ও একটা সামনের দেয়াল। দেয়ালটা বাইরে বার করে নিলেও, ছাতের অংশটা ভিতরেই থেকে যায়। এই ছাতেও কয়েক ইঞ্চি অন্তর অন্তর একটা করে লোহার শিক, আর শিকের মধ্যে ফাঁকগুলো ভরা লোহার জাল দিয়ে। সেই আচ্ছাদনের নীচে খাঁচার এক কোনায় এখন বসে আছে বাঘটা। খাঁচার ছাত আর ঘরের সিলিং-এর মধ্যে হাত দুয়েকের ব্যবধান। যদি কোনওরকমে ওই ছাতের উপর উঠতে পারি, তা হলে অন্তত পিছন থেকে, মাথার দিক থেকে, আর দু'পাশ থেকে আমি নিরাপদ। খোলা থাকবে শুধু সামনের দিকটা। সেদিক থেকে বাঘ আমায় আক্রমণ করতে পারে ঠিকই, কিন্তু তা হলেও বলব যে, বাঘ যদি হঠাৎ ঘরে পায়চারি শুরু করে তা হলে আমাকে তার সামনে পড়তে হবে না। আমার নাগাল যদি তাকে পেতে হয় তা হলে কিছুটা কসরত করতে হবে। যা করার এইবেলা, কারণ বাতি নিভে গেলে কাজটা আমার পক্ষে অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়বে।

যা থাকে কপালে করে, এক লাফে ছাউনির পাশটা দু'হাতে খামচে ধরে দেহটাকে কোনওমতে উপরে নিয়ে গিয়ে ফেললাম। আমার মুখ তখন দুই শিকের মাঝখানে জালের উপর ; দেখতে পাচ্ছি বাঘের মুখ হাঁ, আর তার ভয়ংকর চোখ দুটো চেয়ে আছে সটান আমার দিকে, তার নিশ্বাসের বোঁটকা গন্ধে আমার নাক জ্বলছে।

জানোয়ারের ভাব দেখে কিন্তু মনে হল, রাগের চেয়ে তার কৌতূহলটাই যেন বেশি। এবারে সে

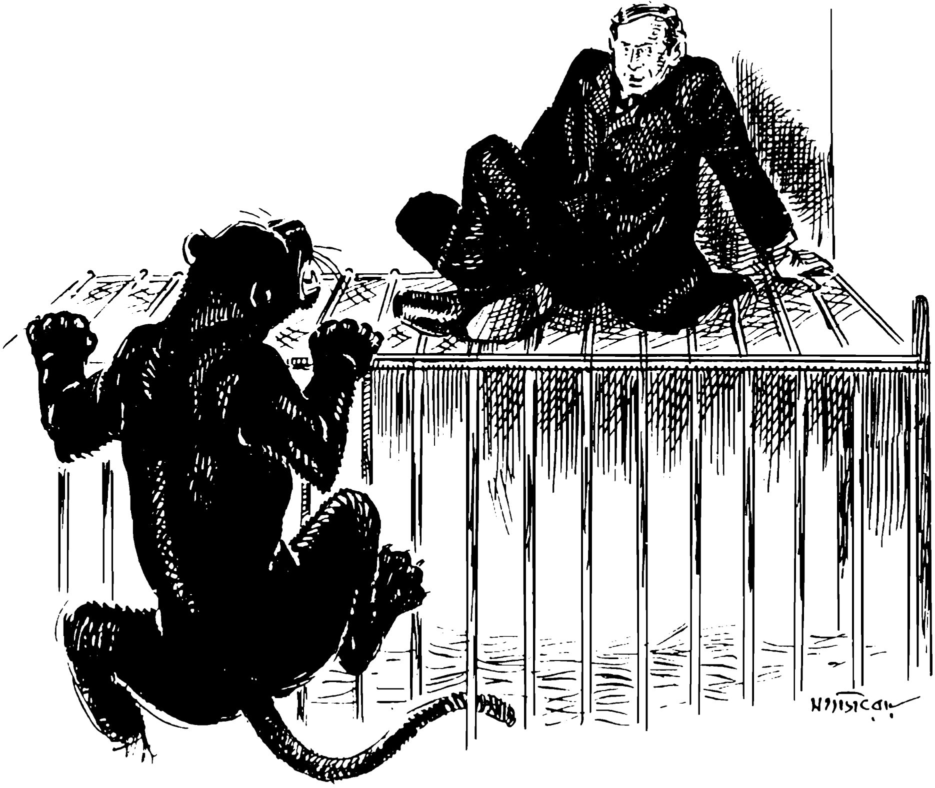

তার দেহের মাংসপেশিতে ঢেউ খেলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পিছনের দু'পায়ে ভর করে একটা থাবা পিছনের দেয়ালে রেখে অন্যটা দিয়ে খাঁচার ছাতের জালের উপর দিয়ে একটা লম্বা আঁচড় টানল। তার ফলে তার নখ আমার পাতলুন ভেদ করে আমার হাঁটুতে একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করল । এটাকে আক্রমণ বলা চলে না, বরং আক্রমণের মহড়া মাত্র, কারণ আমার আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে সে থাবা নামিয়ে নিয়ে এক লাফে খাঁচা থেকে বেরিয়ে সারা ঘর জুড়ে দ্রুত পায়চারি শুরু করে দিল। তারই ফাঁকে ফাঁকে তার দৃষ্টি বারবার চলে আসছে আমার দিকে। আমি দেহ সঙ্কুচিত করে নিজেকে একেবারে দেয়ালের সঙ্গে সিঁটিয়ে দিলাম। যত পিছিয়ে থাকব, ততই তারপক্ষে আমার নাগাল পাওয়া কঠিন হবে।

বাঘের উত্তেজনা যেন ক্রমেই বাড়ছে, হাঁটার গতিও বাড়ছে সেইসঙ্গে, তার অস্থির পদক্ষেপ বারবার তাকে নিয়ে আসছে আমার লৌহাসনের ঠিক নীচে। আশ্চর্য এই ছায়াসদৃশ বিশাল শ্বাপদের নিঃশব্দ গতি! এদিকে লণ্ঠনের আলো এতই মৃদু যে, তাতে বাঘকে প্রায় দেখাই যায় না। অবশেষে একবার দপ্ করে জ্বলে উঠে লণ্ঠনটা নিভেই গেল। সূচিভেদ্য অন্ধকারে এখন শুধু আমি আর বাঘ।

বিপদের সামনে পড়ে যদি বুঝতে পারি যে, আমার যথাসাধ্য আমি করেছি, তা হলে শুধু পরিণতির অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। বর্তমান ক্ষেত্রে আমি যেখানে যে অবস্থায় আছি, সেটাই হল আমার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। আমি সেইভাবেই হাত-পা গুটিয়ে প্রায় দমবন্ধ করে পড়ে রইলাম। আশা আছে আমার অস্তিত্ব জানান না দিলে বাঘ হয়তো আমার কথা ভুলে যাবে। আন্দাজে মনে হয় দুটো বাজতে চলল। ভোর হবে চারটায়। দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও দু ঘণ্টা।

বাইরে ঝড় চলেছে পুরোমাত্রায়। বৃষ্টির জল এসে আছড়ে পড়ছে জানলার গায়ে। ঘরের ভিতরে বিশ্রী জান্তব গন্ধে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। বাঘ এখন আমার কাছে অদৃশ্য। তার কোনও শব্দ

আসছে না আমার কানে। আমি বাঘের চিন্তা মন থেকে দূর করে অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করলাম। একটি চিন্তাই স্থান পেল মনে ; সেটা হল আমার খুড়তুতো ভাইটির শয়তানি, তার চরম বিশ্বাসঘাতকতা, আর আমার প্রতি তার গভীর বিদ্বেষের ভাব। ওই গালভরা হাসির পিছনে লুকিয়ে আছে এক নৃশংস খুনি। যতই ভাবলাম, ততই তার পরিকল্পনার চাতুরিটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে এল। সকলের সঙ্গে সেও চলে গিয়েছিল শুতে, তারপর গোপনে ফিরে এসে আমাকে তার বাঘের ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রেখে চলে যায়। অত্যন্ত সহজেই সে ঘটনাটা বুঝিয়ে দেবে আর পাঁচজনকে। বিলিয়ার্ড রুমে বসে চুরুটটা শেষ করে তবে আমি উঠব ; সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গুডনাইট করে চলে যায়। আমি নিজের খেয়ালবশত দিনের শেষে একবার বাঘটা দেখতে যাই, খাঁচা খোলা আছে না জেনে ঘরে ঢুকি, আর তার ফলেই ফাঁদে পড়ি। এর জন্য তাকে দায়ী করবে কে ? আর যদি বা তার উপর সন্দেহ হয়—প্রমাণ তো নেই !

দু' ঘণ্টা সময় যেন কাটতেই চায় না। একবার একটা খস্ খস্ শব্দে বুঝলাম বাঘ তার নিজের গায়ের লোম চাটছে। বার কয়েক একজোড়া সবুজ আলো দেখে মনে হল সে আমার দিকে চাইছে, কিন্তু তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। ক্রমে একটা বিশ্বাস দানা বাঁধতে লাগল যে, সে হয়তো আমার অস্তিত্ব ভুলে গেছে ; কিংবা আমাকে অগ্রাহ্য করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশেষে জানলা দিয়ে একটা ক্ষীণ আলো ঘরে প্রবেশ করল। প্রথমে দেখলাম দেয়ালের গায়ে এক জোড়া ধূসর চতুষ্কোণ ; তারপর সে-দুটো ক্রমে সাদায় পরিণত হল ; তারপর আমার সহবাসিন্দাটি প্রতীয়মান হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম বাঘও আমার দিকে চেয়ে আছে।

দৃষ্টি বিনিময়ের পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম যে শেষ দেখার সময় যা মনে হয়েছিল, বাঘের মেজাজ তার চেয়ে শতগুণে বেশি ভয়ংকর। ভোরের শীত তার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না ; তার উপর সে হয়তো ক্ষুধার্ত। ঘরের ওপাশটায় অনবরত গর্জনের সঙ্গে সে দ্রুত পায়চারি করছে। পাথরের মেঝের উপর বার বার আছড়ে পড়ছে তার লেজ। কোণ অবধি গিয়ে উলটো মুখে ঘোরার সময় তার নির্মম দৃষ্টি চলে আসছে আমার দিকে। বুঝতে পারলাম আমাকে সে আস্ত রাখবে না। কিন্তু এইরকম হতাশার মুহূর্তেও এই ভয়াল পশুর গতিবিধির আশ্চর্য সাবলীলতা, তার পেশল দেহের ভাস্কর্যসুলভ সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ না করে পারল না। এদিকে চাপা গর্জন ক্রমে অসহিষ্ণু হুঙ্কারে পরিণত হচ্ছে, বেশ বুঝতে পারছি আমার অন্তিম সময় উপস্থিত।

এইভাবেই কি শেষে মরতে হবে—এই লোহার গরাদের উপর শুয়ে শীতে কম্পমান অবস্থায় ? আমার অন্তরাত্মাকে এই শোচনীয় অবস্থার ঊর্ধ্বে উত্তরণের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির চিন্তায় যে স্বচ্ছতা আসে তার সাহায্যে ভাবতে চেষ্টা করলাম আত্মরক্ষার কোনও উপায় আছে কিনা। ভেবে একটা জিনিসই মনে হল যে, খাঁচার দেয়ালটা কোনওরকমে বাইরে থেকে আবার ভিতরে এনে বসিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে সেটাই হবে বাঁচার একমাত্র পথ। ওটাকে কি টেনে আনা যায় ? এদিকে এও বুঝতে পারছি যে, অঙ্গ সঞ্চালনার সামান্য ইঙ্গিতেই বাঘ হয়তো আমাকে আক্রমণ করে বসবে।

অত্যন্ত সন্তর্পণে ডান হাতটা বাড়িয়ে খাঁচার দেয়ালের যে দিকটা ঘরের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল সেটাকে ধরলাম। আশ্চর্য এই যে, একটা টান দিতেই সেটা খানিকটা এগিয়ে এল আমার দিকে। কিন্তু আমি যে অস্বস্তিকর অবস্থায় রয়েছি তাতে খুব বেশি জোর দিয়ে টানা সম্ভব নয়। আরেকবার টান দিতে ইঞ্চি তিনেক ঢুকে এল দেয়ালটা। এবার বুঝলাম দেয়ালের তলায় চাকা লাগানো রয়েছে। আরেকবার দিলাম টান—সেই মুহূর্তেই বাঘটা দিল লাফ।

ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটল যে, আমি টেরই পাইনি। শুধু কানে এল একটা হুঙ্কার, আর সেইসঙ্গে আমার চোখের সামনে দেখলাম এক জোড়া জ্বলন্ত হলুদ চোখ ও মিশকালো মুখে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরোনো একটা লক্‌লকে লাল জিভ। বাঘ লাফিয়ে পড়ার ফলে আমার লৌহাসন থরথর করে কেঁপে উঠেছে—মনে হয় এই বুঝি সবসুদ্ধ ভেঙে পড়ল। বাঘটা কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় রইল, তার মাথা ও সামনের থাবা আমার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে, আর পিছনের থাবা খাঁচার দেয়ালে একটা অবলম্বন খোঁজার চেষ্টায় অস্থির। কিন্তু লাফটা ঠিক জুতসই হয়নি। বাঘ সেই অবস্থায়

বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। প্রচণ্ড রাগে দাঁত খিঁচিয়ে জালে আঁচড় দিতে দিতে সে সশব্দে লাফিয়ে নেমে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু তার পরেই আবার আমার দিকে ফিরে দ্বিতীয়বার লম্ফের জন্য প্রস্তুত হল।

আমি জানি আমার চরম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। বাঘ একবার ঠেকে শিখেছে, দ্বিতীয়বার আর সে ভুল করবে না। আমার বাঁচতে হলে যা করার তা করতে হবে এই মুহূর্তে। এক ঝলকে পন্থা স্থির করে নিলাম। চোখের নিমেষে আমার কোটটা খুলে নিয়ে সেটাকে জানোয়ারটার মাথার উপর ছুড়ে ফেললাম, আর প্রায় একই মুহূর্তে এক লাফে খাঁচার ছাত থেকে লাফিয়ে নেমে দেয়ালের শিকটা ধরে প্রাণপণে দিলাম টান।

যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক সহজেই দেয়ালটা ঘরের মধ্যে চলে এল। আমি যত দ্রুত সম্ভব সেটাকে খাঁচার অপর প্রান্তে টেনে নিয়ে গেলাম, কিন্তু সেইভাবে টানার ফলে আমি নিজে রয়ে গেলাম খাঁচার বাইরে। ভিতরে থাকলে হয়তো আমি রেহাই পেতে পারতাম, কিন্তু সেটা করার চেষ্টায় আমাকে যে কয়েক মুহূর্ত থামতে হল তাতে বাঘটা তার মাথা থেকে কোটটা ফেলে দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি খাঁচার সামনেটা বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে এসেছি, কিন্তু তার আগে বাঘটা তার থাবার এক চাপড়ে আমার পায়ের ডিমের বেশ খানিকটা অংশ তুলে নিয়েছে র‍্যাঁদা দিয়ে চাঁছা কাঠের মতো করে। পরমুহূর্তেই যন্ত্রণায় প্রায় বেহুঁশ হয়ে আমি খাঁচার ভিতরে খড় বিছানো মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম। আমার সামনে খাঁচার গরাদ, আর তার উপর নিষ্ফল ক্রোধে বারবার আঘাত করছে ব্রেজিলের বাঘ। অর্ধমৃত অবস্থায় আমার মন থেকে আতঙ্কের ভাব দূর হয়ে গেছে, আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখছি বাঘ তার কালো বুকটা গরাদের উপর রেখে তার থাবা দিয়ে আমার নাগাল পাবার চেষ্টা করছে, ঠিক যেমন কলে ধরা-পড়া ইঁদুরের নাগাল পেতে চেষ্টা করে বেড়াল। আমার জামায় এসে ঠেকছে তার নখগুলো, কিন্তু গায়ের চামড়া পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। শুনেছিলাম বাঘ বা ওই জাতীয় জানোয়ারের দ্বারা জখম হলে মানুষের মধ্যে কেমন যেন একটা অসাড় ভাব আসে। সেটা এখন দিব্যি অনুভব করছি। আমি যেন আর আমি নই, কোনও এক তৃতীয় ব্যক্তি যেন কৌতূহলের সঙ্গে দেখে চলেছে বাঘটা তার চেষ্টায় কৃতকার্য হয় কিনা। তারপর ক্রমে আমার চেতনা লোপ পেয়ে আমি যেন এক দুঃস্বপ্নের জগতে চলে গেলাম, যেখানে আমার চোখের সামনে রয়েছে কেবল বাঘের সেই কালো মুখ আর তার থেকে বেরিয়ে আসা লক্‌লকে লাল জিভ। সবশেষে আমার লাঞ্ছনার শেষ হল এক মোহাচ্ছন্ন প্রলাপের অবস্থায়।

এখন ভাবলে মনে হয় আমি অন্তত ঘণ্টা দুই এইভাবে অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। জ্ঞান হল সেই তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দে, যাতে আমার বিপদের সূত্রপাত। খাঁচার দেয়াল আবার বাইরে বেরিয়ে তার খাপে বসল। তারপর সম্পূর্ণ জ্ঞান হবার আগেই দেখলাম আমার ভাইয়ের সেই গোল হাসিভরা মুখ খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মারছে। সে যা দেখল তাতে সে নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিল। বাঘ বসে আছে খাঁচার বাইরে ঘরের মেঝেতে, আর আমি ছিন্নভিন্ন পাতলুনে কোটবিহীন অবস্থায় রক্তাপ্লুত দেহে পড়ে আছি খাঁচার ভিতর। সকালের রোদ পড়া মুখে তার চরম বিস্ময়ের ভাবটা এখনও দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। সে একবার দেখল আমার দিকে, তারপর আবার। তারপর ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খাঁচার দিকে এগিয়ে এসে আবার দেখল আমি সত্যি মরে গেছি কিনা।

ঘটনার সঠিক বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন যা অবস্থা তাতে সবকিছু সম্যক অনুধাবন করার সামর্থ্য ছিল না আমার। শুধু এইটুকু দেখলাম যে, তার দৃষ্টিটা হঠাৎ আমার দিক থেকে সরে গিয়ে গেল বাঘের দিকে।

'শাবাশ, টমি, শাবাশ!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল এভারার্ড কিং।

তারপর সে হঠাৎ খাঁচার দিকে পিছিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল—'সরে যাও বলছি, সরে যাও! মূর্খ জানোয়ার—তোমার মনিবকে চেনো না তুমি?'

এই মুহ্যমান অবস্থাতেও কিং-এর একটা উক্তি আমার হঠাৎ মনে পড়ল। মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে নিরীহ জানোয়ারও রাক্ষসে পরিণত হয়। এই পরিণতির জন্য আমার রক্তই দায়ী, কিন্তু তার মাশুল দিতে হবে আমাকে নয়, আমার এই ভাইটিকে।

'সরে যাও বলছি !' চিৎকার করে উঠল এভারার্ড কিং। 'সরে যাও শয়তান !—বল্ডউইন ! বল্ডউইন !—ওরে বাবা রে !'......

তারপর দেখলাম সে মাটিতে পড়ল। পড়ল, উঠল, আবার পড়ল, আর সেইসঙ্গে এক রক্ত-হিম করা শব্দ—যেন কাপড় ছেঁড়া হচ্ছে ফালা ফালা করে। আর্তনাদের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এসে শেষে যে শব্দটা রইল সেটা মানুষের নয়, জানোয়ারের ! আর তারপর, যখন ভাবছি সে মরে গেছে, তখন এক বিভীষিকাময় মুহূর্তে দেখলাম একটি অর্ধমৃত, প্রায়ান্ধ, রক্তাক্ত মানুষ পাগলের মতো ঘরের চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। তারপর আমিও সংজ্ঞা হারালাম।

বেশ কয়েক মাস লেগেছিল আমার সুস্থ হয়ে উঠতে। সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি, কারণ সেই ব্রেজিলীয় শার্দুলের সঙ্গে রাত্রিযাপনের চিহ্নস্বরূপ আজও আমাকে একটি লাঠি হাতে চলতে হয়। বল্ডউইন, বাঘের পরিচারক এবং অন্যান্য চাকরবাকর যখন এভারার্ডের আর্তনাদ শুনে বাঘের ঘরে এসে খাঁচার মধ্যে আমায় এবং বাঘের কবলে তাদের মনিবের অবিশিষ্টাংশ দেখতে পায়, তখন কেমন করে এ ঘটনা ঘটল সেটা তারা অনুমান করতে পারেনি। তপ্ত লোহার শিকের সাহায্যে বাঘকে কোণঠাসা করে দরজার ফাঁক দিয়ে গুলি করে তাকে মেরে আমাকে খাঁচার ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। তারপর বেশ কয়েক সপ্তাহ আমার শত্রুর বাড়িতে থেকেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হয়েছিল আমাকে। ক্লিপটন থেকে এসেছিলেন এক সার্জন, আর লন্ডন থেকে নার্স। এক মাস পরে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয় স্টেশনে, আর সেখান থেকে আমি চলে আসি আমার বাসস্থান গ্রোভনর ম্যানসনসে।

আমার অসুখের সময়ের একটা ঘটনা আমার মনে আছে। অত্যন্ত স্পষ্ট হওয়াতে এই স্মৃতিটাকে আমার স্বরবিকারজনিত দুঃস্বপ্নের অঙ্গ বলে মনে হয় না। এক রাত্রে—নার্স তখন আমার ঘরে নেই—দরজা খুলে প্রবেশ করলেন এক দীর্ঘাঙ্গিনী, তাঁর পরনে বিধবার কালো পোশাক। তিনি কাছে এসে আমার উপর ঝুঁকে পড়াতে দেখলাম এভারার্ড যে ব্রেজিলীয় মহিলাটি বিবাহ করেছিল, ইনি তিনিই। তাঁর চাহনিতে যে করুণা ও সহানুভূতি দেখলাম, তেমন আর কোনওদিন দেখিনি।

'আপনার জ্ঞান আছে ?' জিজ্ঞেস করলেন মহিলা।

আমি তখন খুবই দুর্বল, তাই মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানালাম।

'আমি এইটুকু বলতে এসেছি যে, আপনার এই দুর্দশার জন্য আপনিই দায়ী। আমি তো চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি। প্রথম থেকেই চেয়েছিলাম যাতে আপনি না থাকেন। আপনি যাতে তাঁর কবলে না পড়েন তার জন্য আমার স্বামীকে বঞ্চনা করে যতটা করা সম্ভব সবই করেছিলাম আমি। আমি জানতাম সে আপনাকে কেন ডেকে এনেছিল। আমি জানতাম সে আর কোনওদিন আপনাকে ফিরে যেতে দেবে না। আমি যত ভাল করে চিনতাম তাকে, তেমন তো আর কেউ চিনত না ! আমি নিজে যে ভুক্তভোগী ! সে কথা তো আর আপনাকে বলা যায় না। কিন্তু আপনার যাতে মঙ্গল হয় তার চেষ্টার ত্রুটি করিনি আমি। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আপনি আমার বন্ধুর কাজ করেছেন। আমি ভাবতাম আমার মৃত্যু না হলে আমার মুক্তি নেই, কিন্তু আপনি আমার মুক্তি দিয়েছেন তাঁর কবল থেকে। আপনার এত কষ্টভোগ করতে হল বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি তো বলেইছিলাম—আপনি মূর্খ, এবং মূর্খের মতোই কাজ করেছিলেন আপনি।

কথাটা বলে চলে গেলেন সেই আশ্চর্য মহিলা, যাঁকে আর কোনওদিন দেখিনি আমি। স্বামীর সম্পত্তি থেকে তাঁর যা প্রাপ্য তাই নিয়ে তিনি দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, এবং পরে নাকি সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছিলেন।

লন্ডনে ফেরার বেশ কিছুদিন পরে ডাক্তার আমাকে জানালেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, এবং আবার কাজ শুরু করতে পারি। কথাটা শুনে আমার মনটা যে খুব প্রসন্ন হল তা নয়, কারণ কাজ মানেই পাওনাদারের স্রোত রোধ করার চেষ্টা। আসল খবরটা প্রথম দিল আমার উকিল সামার্স।

'আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন এটা খুবই আনন্দের কথা', বলল সামার্স। 'আপনাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি।'

'অভিনন্দন ? তুমি কী বলছ সামার্স ! মশকরা করার সময় নয় এটা।'

'যা বলছি ঠিকই বলছি', বলল সামারস। 'গত দেড় মাস হল আপনি লর্ড সাদারটন হয়েছেন। পাছে অসুস্থ অবস্থায় খবরটা পেলে আপনার রোগমুক্তিতে ব্যাঘাত ঘটে, তাই এতদিন বলিনি।'

লর্ড সাদারটন! ইংল্যান্ডের অন্যতম সবচেয়ে বিত্তবান অভিজাত বংশের প্রতিভূ। আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপর মনে পড়ল যে, অনেকটা সময় তো পেরিয়ে গেছে এর মধ্যে, আর আমি তো এই সময়টা ছিলাম শয্যাশায়ী। বললাম, 'তাহলে লর্ড সাদারটন মারা গেছেন আমি অসুস্থ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই?'

'ঠিক সেই একই দিনে,' আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বলল সামারস্। সে বুদ্ধিমান লোক, সে কি আর অনুমান করতে পারেনি আমার দুর্দশার কারণটা? কিন্তু আমি তাকে কিছু বললাম না। তার কাছে আগ বাড়িয়ে পারিবারিক কুৎসা রটাতে যাব কেন?

'হুঁ, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য, আমার দিকে সেই একই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে বলল। 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আপনার অবর্তমানে এই এভারার্ড কিংই পেতেন ওই খেতাব। তিনি না হয়ে আপনি যদি ওই বাঘের কবলে পড়তেন তা হলে উনিই হতেন লর্ড সাদারটন।'

'তা তো বটেই', বললাম আমি।

'আর ভদ্রলোক এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন', বলল সামার্স। 'আমি জানি লর্ড সাদারটনের চাকরের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল, আর সেই চাকর ঘন ঘন টেলিগ্রাম করে কিংকে জানাত তার মনিবের অবস্থা। সেই সময়টা আপনি কিং-এর বাড়িতে। আপনি উত্তরাধিকারী, অথচ বারবার সে খোঁজ নিচ্ছে লর্ড সাদারটনের—ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত নয় কি?'

'নিঃসন্দেহে', বললাম আমি। 'আর শোনো, সামার্স—এবার তো কাজকর্ম শুরু করে দিতে হয়। দাও তো দেখি আমার বিলগুলো আর আমার নতুন চেক বইটা!'

দি ব্রাজিলিয়ান ক্যাট
সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৮৯

রে ব্র্যাডবেরি

মঙ্গলই স্বর্গ

মহাকাশ থেকে রকেটটা নেমে আসছে তার গন্তব্যস্থলের দিকে। এতদিন সেটা ছিল তারায় ভরা নিঃশব্দ নিকষ কালো মহাশূন্যে একটি বেগবান ধাতব উজ্জ্বলতা। অগ্নিগর্ভ রকেটটা নতুন। এর দেহ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে উত্তাপ। এর কক্ষের মধ্যে আছে মানুষ—ক্যাপ্টেন সমেত সতেরোজন। ওহাইয়ো থেকে রকেটটা যখন আকাশে ওঠে, তখন অগণিত দর্শক হাত নাড়িয়ে এদের শুভযাত্রা কামনা করেছিল। প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গারের সঙ্গে সঙ্গে রকেটটা সোজা উঠে ছুটে গিয়েছিল মহাশূন্যের দিকে। মঙ্গল গ্রহকে লক্ষ্য করে এই নিয়ে তৃতীয়বার রকেট অভিযান।

এখন রকেট মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছে। তার গতি ক্রমশ কমে আসছে। এই মন্থর অবস্থাতেও তার শক্তির পরিচয় সে বহন করছে। এই শক্তিই তাকে চালিত করেছে মহাকাশের কৃষ্ণসাগরে। চাঁদ পেরোনোর পরেই তাকে পড়তে হয়েছিল অসীম শূন্যতার মধ্যে। যাত্রীরা নানান প্রতিকূল অবস্থায় বিধ্বস্ত হয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছিল। একজনের মৃত্যু হয়। বাকি ষোলোজন এখন স্বচ্ছ জানলার ভিতর দিয়ে বিমুগ্ধ চোখে মঙ্গলের এগিয়ে আসা দেখছে।

'মঙ্গল গ্রহ!' সোল্লাসে ঘোষণা করল রকেটচালক ডেভিড লাস্টিগ।

‘এসে গেল মঙ্গল’ বলল প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যামুয়েল হিংস্টন।

‘যাক!’ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন ক্যাপ্টেন জন ব্ল্যাক।

রকেটটা একটা মসৃণ সবুজ ঘাসে ঢাকা লনের উপর এসে নামল। যাত্রীরা লক্ষ করল, ঘাসের উপর দাঁড়ানো একটি লোহার হরিণের মূর্তি। তারও বেশ কিছুটা পিছনে দেখা যাচ্ছে রোদে ঝলমল একটা বাড়ি, যেটা ভিক্টোরীয় যুগের পৃথিবীর বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। সর্বাঙ্গে বিচিত্র কারুকার্য, জানলায় হলদে নীল সবুজ গোলাপি কাচ। বাড়ির বারান্দার সামনে দেখা যাচ্ছে জেরেনিয়াম গাছ আর বারান্দায় মৃদু বাতাসে আপনিই দুলছে ছাত থেকে ঝোলানো একটি দোলনা। বাড়ির চুড়োয় রয়েছে জানলা সমেত একটি গোল ঘর, যার ছাতটা যেন একটা গাধার টুপি।

রকেটের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে মঙ্গলের এই শান্ত শহর, যার উপর বসন্ত ঋতুর প্রভাব স্পষ্ট। আরও বাড়ি চোখে পড়ে, কোনওটা সাদা, কোনওটা লাল,—আর দেখা যায় লম্বা এল্‌ম্‌ মেপল্‌ ও হর্স চেস্টনাট গাছের সারি। গির্জাও রয়েছে দু-একটা, যার সোনালি ঘণ্টাগুলো এখন নীরব।

রকেটের মানুষগুলি এ দৃশ্য দেখল। তারপর তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে আবার বাইরে দৃষ্টি দিল। তারা সকলেই এ-ওর হাত ধরে আছে, সকলেই নির্বাক, শ্বাস নিতেও যেন ভরসা পাচ্ছে না তারা।

‘এ কী তাজ্জব ব্যাপার!’ ফিসফিসিয়ে বলল লাস্টিগ।

‘এ হতে পারে না!’ বলল স্যামুয়েল হিংস্টন।

‘হে ঈশ্বর!’ বললেন ক্যাপ্টেন জন ব্ল্যাক। রাসায়নিক তাঁর গবেষণাগার থেকে স্পিকারে একটি তথ্য ঘোষণা করলেন—‘বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আছে। শ্বাস নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।’

লাস্টিগ বলল, ‘তা হলে আমরা বেরোই।’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও’, বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক, ‘আগে তো ব্যাপারটা বুঝতে হবে।’

‘ব্যাপারটা হল এটি একটি ছোট্ট শহর, যাতে মানুষের শ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট অক্সিজেন আছে—ব্যস।’

প্রত্নতাত্ত্বিক হিংস্টন বললেন, ‘আর এই শহর একেবারে পৃথিবীর শহরের মতো। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু তাও সম্ভব হয়েছে।’

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক হিংস্টনের দিকে চেয়ে বললেন, ‘তুমি কি বিশ্বাস করো যে, দুটি বিভিন্ন গ্রহে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঠিক একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে গড়ে উঠতে পারে?’

‘সেটা সম্ভব বলে আমার জানা ছিল না।’

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক বাইরের শহরের দিকে চেয়ে বললেন, ‘তোমাদের বলছি শোনো,—জেরেনিয়াম হচ্ছে এমন একটি গাছ, যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল না। ভেবে দেখো, কত হাজার বছর লাগে একটি উদ্ভিদের আবির্ভাব হতে! এবার তা হলে বলো এটা যুক্তিসম্মত কিনা যে, আমরা মঙ্গল গ্রহে এসে দেখতে পাব—এক, রঙিন কাচ বসানো জানলা; দুই, বাড়ির মাথায় গোল ঘরের উপর গাধার টুপি; তিন, বারান্দার ছাত থেকে ঝুলন্ত দোলনা চার, একটি বাদ্যযন্ত্র, যেটা পিয়ানো ছাড়া আর কিছু হতে পারে না আর পাঁচ—যদি তোমার এই দূরবিনের মধ্যে দিয়ে দেখো তা হলে দেখবে পিয়ানোর উপর একটি গানের স্বরলিপি রয়েছে, যার নাম “বিউটিফুল ওহাইয়ো”। তার মানে কি মঙ্গলেও একটি নদী আছে, যার নাম ওহাইয়ো?’

‘কিন্তু ক্যাপ্টেন উইলিয়াম্‌স্‌ কি এর জন্য দায়ী হতে পারেন না?’

‘তার মানে?’

‘ক্যাপ্টেন উইলিয়াম্‌স্‌ ও তাঁর তিন সহযাত্রী! অথবা ন্যাথেনিয়াল ইয়র্ক ও তাঁর সহযাত্রী। এটা নিঃসন্দেহে এঁদেরই কীর্তি।’

‘এই বিশ্বাস যুক্তিহীন’, বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। ‘আমরা যতদূর জানি ইয়র্কের রকেট মঙ্গলে পৌঁছনোমাত্র ধ্বংস হয়। ফলে ইয়র্ক ও তাঁর সহযাত্রীর মৃত্যু হয়। উইলিয়াম্‌সের রকেট মঙ্গল গ্রহে পৌঁছনোর পরের দিন ধ্বংস হয়। অন্তত দ্বিতীয় দিনের পর থেকে তাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উইলিয়াম্‌সের দল যদি বেঁচে থাকত, তা হলে তারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর

সঙ্গে যোগাযোগ করত। ইয়র্ক মঙ্গলে এসেছিল এক বছর আগে, আর উইলিয়াম্‌স্‌ গত অগস্ট মাসে। ধরো যদি তারা এখনও বেঁচে থাকে, এবং মঙ্গল গ্রহে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী বাস করে, তা হলেও কি তাদের পক্ষে এই ক' মাসের মধ্যে এমন একটা শহর গড়ে তোলা সম্ভব ? শুধু গড়ে তোলা নয়,—সেই শহরের উপর কৃত্রিম উপায়ে বয়সের ছাপ ফেলা সম্ভব ? শহরটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটা অন্তত বছর সত্তরের পুরনো। ওই বাড়ির বারান্দার কাঠের থামগুলো দেখো। গাছগুলোর বয়স একশো বছরের কম হওয়া অসম্ভব। না—এটা ইয়র্ক বা উইলিয়াম্‌সের কীর্তি হতে পারে না। এর রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজতে হবে অন্য জায়গায়। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। এই শহরের অস্তিত্বের কারণ না জানা পর্যন্ত আমি এই রকেট থেকে বেরোচ্ছি না!'

লাস্টিগ বলল, 'এটা ভুললে চলবে না যে, ইয়র্ক ও উইলিয়াম্‌স নেমেছিল মঙ্গলের উলটোপিঠে। আমরা ইচ্ছে করেই এ পিঠ বেছে নিয়েছি।'

'ঠিক কথা', বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। 'হিংস্র মঙ্গলবাসীদের হাতে যদি ইয়র্ক ও উইলিয়ামসের দলের মৃত্যু হয়ে থাকে, তাই আমাদের বলা হয়েছিল ল্যান্ডিং-এর জন্য অন্য জায়গা বেছে নিতে, যাতে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। তাই আমরা নেমেছি এমন একটি জায়গায়, যার সঙ্গে ইয়র্ক বা উইলিয়ামসের কোনও পরিচয়ই হয়নি।'

হিংস্টন বলল, 'যাই হোক, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে শহরটা একবার ঘুরে দেখতে চাই। এমনও হতে পারে যে, দুই গ্রহ ঠিক একই সঙ্গে একই নিয়মের মধ্যে গড়ে উঠেছে। একই সৌরজগতের গ্রহে হয়তো এটা সম্ভব। হয়তো আমরা এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।'

'আমার মতে আর একটুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। হয়তো এই আশ্চর্য ঘটনাই সর্বপ্রথম ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করবে।'

'ঈশ্বরের বিশ্বাসের জন্য এমন একটা ঘটনার কোনও প্রয়োজন হয় না, হিংস্টন।'

'আমি নিজেও ঈশ্বরে বিশ্বাসী', বলল হিংস্টন, 'কিন্তু এমন একটা শহর ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত গড়ে উঠতে পারে না। শহরের প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ করুন। আমি তো হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না।'

'আসল রহস্যটা কী, সেটা জানার আগে হাসি-কান্না কোনওটারই প্রয়োজন নেই।'

লাস্টিগ এবার মুখ খুলল।

'রহস্য ? দিব্যি মনোরম একটি শহর, তাতে আবার রহস্য কী ? আমার তো নিজের জন্মস্থানের কথা মনে পড়ছে!'

'তুমি কবে জন্মেছিলে লাস্টিগ ?' ব্ল্যাক প্রশ্ন করলেন।

'১৯৫০ সালে, স্যার।'

'আর তুমি, হিংস্টন ?'

'১৯৫৫। আমার জন্ম আইওয়ার গ্রিনেল শহরে। এই শহরটাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি আমার জন্মস্থানে ফিরে এসেছি।'

'তোমাদের দু'জনেরই বাপের বয়সী আমি', বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। 'আমার বয়স আশি। ইলিনয়ে ১৯২০ সালে আমার জন্ম। বিজ্ঞানের দৌলতে গত পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধদের নবযৌবন দান করার উপায় আবিষ্কার হয়েছে। তার জোরেই আমি আজ মঙ্গল গ্রহে আসতে পেরেছি, এবং এখনও ক্লান্তি বোধ করছি না। কিন্তু আমার মনে সন্দেহের মাত্রা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। এই শান্ত শহরের চেহারার সঙ্গে ইলিনয়ের গ্রিন ব্লাফ শহরের এত বেশি মিল যে, আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছি। এত মিল স্বাভাবিক নয়।'

কথাটা বলে ব্ল্যাক রেডিও অপারেটরের দিকে চাইলেন।

'শোনো—পৃথিবীতে খবর পাঠাও। বলো যে, আমরা মঙ্গল গ্রহে ল্যান্ড করেছি। এইটুকু বললেই হবে। বলো, কালকে বিস্তারিত খবর পাঠাব।'

'তাই বলছি স্যার।'

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক এখনও চেয়ে আছেন শহরটার দিকে। তাঁর চেহারা দেখলে তাঁর আসল বয়সের অর্ধেক বলে মনে হয়। এবার তিনি বললেন, 'তা হলে যেটা করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে এই—লাস্টিগ, হিংস্টন আর আমি একবার নেমে ঘুরে দেখে আসি। অন্যেরা রকেটেই থাকুক ; যদি প্রয়োজন হয়, তখন তারা বেরোতে পারে। কোনও গোলমাল দেখলে তারা এর পরে যে রকেটটা আসার কথা আছে, সেটাকে সাবধান করে দিতে পারে। এর পর ক্যাপ্টেন ওয়াইলডারের আসার কথা। আগামী ডিসেম্বরে রওনা হবেন। যদি মঙ্গল গ্রহে সত্যিই অমঙ্গল কিছু থাকে, তা হলে তাদের সে বিষয়ে তৈরি হয়ে আসতে হবে।'

'আমরাও তো সে ব্যাপারে তৈরিই আছি। আমাদের তো অস্ত্রের অভাব নেই।'

'তা হলে সকলে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুক।—চলো, আমরা নেমে পড়ি।'

তিনজন পুরুষ রকেটের দরজা খুলে নীচে নেমে গেল।

দিনটা চমৎকার। তার উপর আবার বসন্তকালের সব লক্ষণই বর্তমান। একটি রবিন পাখি ফুলে ভরা আপেল গাছের ডালে বসে আনমনে গান গাইছে। মৃদুমন্দ বাতাসে ফুলের পাপড়ি মাঝে মাঝে ঝরে পড়ছে মাটিতে। ফুলের গন্ধও ভেসে আসছে সেই সঙ্গে। কোথা থেকে যেন পিয়ানোর মৃদু টুং-টাং শোনা যাচ্ছে, আর সেইসঙ্গে অন্য কোনও বাড়ি থেকে ভেসে আসছে সেই আদ্যিকালের চোঙাওয়ালা গ্রামোফোনে বাজানো আদ্যিকালের প্রিয় গাইয়ে হ্যারি লডারের গান।

তিনজন কিছুক্ষণ রকেটের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তারা হাঁটতে শুরু করল খুব সাবধানে, কারণ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ পৃথিবীর চেয়ে কিছু কম, তাই বেশি পরিশ্রম করা চলবে না।

এবারে গ্রামোফোনের রেকর্ড বদলে গেছে। এবার বাজছে, 'ও, গিভ মি দ্য জুন নাইট।'

লাস্টিগের স্নায়ু চঞ্চল। হিংস্টনেরও তাই। পরিবেশ শান্ত। দূরে কোথা থেকে যেন একটা জলের কুল কুল শব্দ আসছে, আর সেইসঙ্গে একটা ঘোড়ায় টানা ওয়াগনের অতি পরিচিত ঘড় ঘড় শব্দ।

হিংস্টন বলল, 'স্যার, আমার এখন মনে হচ্ছে, মঙ্গল গ্রহে মানুষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই আসতে আরম্ভ করেছে।'

'অসম্ভব !

'কিন্তু তা হলে এইসব ঘরবাড়ি, এই লোহার হরিণ মূর্তি, এই পিয়ানো, পুরনো রেকর্ডের গান—এগুলোর অর্থ করবেন কী করে ?' হিংস্টন ক্যাপ্টেনের হাত ধরে গভীর আগ্রহের সঙ্গে তার মুখের দিকে চাইল।—'ধরুন যদি এমন হয় যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কিছু যুদ্ধবিরোধী লোক একজোট হয়ে বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে একটা রকেট বানিয়ে এখানে চলে আসে ?'

'সেটা হতেই পারে না, হিংস্টন।'

'কেন হবে না ? তখনকার দিনে পৃথিবীতে ঢাক না পিটিয়ে গোপনে কাজ করার অনেক বেশি সুযোগ ছিল।'

'কিন্তু রকেট জিনিসটা তো আর মুখের কথা নয় ! সেটা নিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা তখনকার দিনেও অসম্ভব হত।'

'তারা এখানেই এসে বসবাস শুরু করে,' হিংস্টন বলে চলল, 'এবং যেহেতু তাদের রুচি, তাদের সংস্কৃতি তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, তাই তাদের বসবাসের পরিবেশও তৈরি করে নিয়েছিল পৃথিবীর মতো করেই।'

'তুমি বলতে চাও, তারাই এতদিন এখানে বসবাস করছে ?'

'হ্যাঁ, এবং পরম শান্তিতে। হয়তো তারা আরও বার-কয়েক পৃথিবীতে ফিরে গিয়েছিল আরও লোকজন সঙ্গে করে আনার জন্য। একটা ছোট শহরে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, এমন সংখ্যক লোক এনে তারা যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল। পৃথিবীর লোকে তাদের কীর্তি জেনে ফেলে এটা নিশ্চয়ই তারা চায়নি। এই কারণেই এই শহরের চেহারা এত প্রাচীন। এ শহর ১৯২৭-এর পর আর এক

দিনও এগিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তাই নয় কি ? অথবা এমনও হতে পারে যে, মহাকাশ অভিযান ব্যাপারটা আমরা যা মনে করছি, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন। হয়তো পৃথিবীর কোনও একটা অংশে কয়েকজনের চেষ্টায় এটার সূত্রপাত হয়েছিল। তাদের লোক হয়তো মাঝে মাঝে পৃথিবীতে ফিরে গেছে।'

'তোমার যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে।'

'হতেই হবে স্যার। প্রমাণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এখন শুধু দরকার এখানকার কিছু লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া।'

পুরু ঘাসের জন্য তিনজনের হাঁটার শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। ঘাসের গন্ধ তাজা। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মনে যতই সন্দেহ থাকুক না কেন, একটা পরম শান্তির ভাব তাঁর দেহ-মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ত্রিশ বছর পরে তিনি এমন একটা শহরে এলেন। মৌমাছির মৃদু গুঞ্জন তাঁর মনে একটা প্রসন্নতা এনে দিয়েছিল। আর পরিবেশের সুস্থ সবলতা তাঁর আত্মাকে পরিতুষ্ট করছিল।

তিনজনেই বাড়িটার সামনের বারান্দায় গিয়ে উঠল। দরজার দিকে এগোনোর সময়ে কাঠের মেঝেতে ভারী বুটের শব্দ হল। ভিতরের ঘরটা এখন দেখা যাচ্ছে। একটা পুঁতির পরদা ঝুলছে। উপরে একটা ঝাড়লণ্ঠন। দেওয়ালে ঝুলছে উনবিংশ শতাব্দীর এক জনপ্রিয় শিল্পীর আঁকা একটা বাঁধানো ছবি। ছবির নীচে একটা চেনা ঢঙের আরাম কেদারা। শব্দও শোনা যাচ্ছে—জাগের জলের বরফের টুং টাং। ভিতরের রান্নাঘরে কে যেন পানীয় প্রস্তুত করছে। সেইসঙ্গে নারীকণ্ঠে গুনগুন করে গাওয়া একটি গানের সুর।

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক কলিং বেল টিপলেন।

ঘরের মেঝের উপর দিয়ে হালকা পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। একটি বছর চল্লিশেকের মহিলা—যাঁর পরনে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পোশাক—পরদা ফাঁক করে তিনজন পুরুষের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

'আপনারা ?'

'কিছু মনে করবেন না।'—ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের কণ্ঠস্বরে অপ্রস্তুত ভাব—'আমরা,—মানে এ ব্যাপারে আপনি কোনও সাহায্য করতে পারেন কিনা...'

ভদ্রমহিলা অবাক দৃষ্টিতে দেখলেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দিকে।

'আপনারা কি কিছু বিক্রিটিক্রি করতে এসেছেন ?'

'না—না ! ইয়ে...এই শহরের নামটা যদি—'

'তার মানে ?' মহিলার ভ্রূ কুঞ্চিত। 'এখানে এসেছেন আপনারা, অথচ এই শহরের নাম জানেন না ?'

ক্যাপ্টেন বেশ বেকায়দায় পড়ছেন তা বোঝাই যাচ্ছে। বললেন, 'আসলে আমরা এখানে আগন্তুক। আমরা জানতে চাইছি, এ শহর এখানে এল কী করে, আর আপনারাই বা কী করে এসেছেন ?'

'আপনারা কি সেন্সাস নিতে বেরিয়েছেন ?

'আজ্ঞে না।'

'এখানে সবাই জানে যে, এ শহর তৈরি হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। আপনারা কি ইচ্ছা করে বোকা সাজছেন ?'

'না—না—মোটেই না', ব্যস্তভাবে বললেন ক্যাপ্টেন, 'আসলে আমরা আসছি পৃথিবী থেকে।'

'পৃথিবী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পৃথিবী। সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ। রকেটে করে এসেছি আমরা। আমাদের লক্ষ্যই ছিল চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল।'

মহিলা যেন কতগুলি শিশুকে বোঝাচ্ছেন, এইভাবে উত্তর দিলেন, 'এই শহর হল ইলিনয়ে। নাম গ্রিন ব্ল্যাক। আমরা থাকি যে মহাদেশে, তার নাম আমেরিকা। তাকে ঘিরে আছে অতলান্তিক আর প্রশান্ত মহাসাগর। আমাদের গ্রহের নাম পৃথিবী। আপনারা এখন আসতে পারেন। গুডবাই।'

ভদ্রমহিলা বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তিনজন হতভম্বভাবে পরস্পরের দিকে চাইল।

লাস্টিগ বলল, 'চলুন, সোজা ভিতরে গিয়ে ঢুকি।'

'সে হয় না। এটা প্রাইভেট প্রপার্টি। কিন্তু কী আপদ রে বাবা!'

তিনজন বারান্দার সিঁড়িতে বসল।

ব্ল্যাক বললেন, 'এমন একটা কথা কি তোমাদের মনে হয়েছে যে, আমরা হয়তো ভুল পথে আবার পৃথিবীতেই ফিরে এসেছি?'

'সেটা কী করে সম্ভব?' বলল লাস্টিগ।

'জানি না! তা জানি না! মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবার শক্তি দাও। হে ভগবান!'

হিংস্টন বলল, 'আমরা সমস্ত রাস্তা হিসাব করে এসেছি। আমাদের ক্রোনোমিটার প্রতি মুহূর্তে বলে দিয়েছে, আমরা কতদূর অগ্রসর হচ্ছি। চাঁদ পেরিয়ে আমরা মহাকাশে প্রবেশ করি। এটা মঙ্গল গ্রহ হতে বাধ্য।'

লাস্টিগ বলল, 'ধরো যদি দৈবদুর্বিপাকে আমাদের সময়ের গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে—আমরা ত্রিশ চল্লিশ বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে এসেছি?'

'তোমার বকবকানি বন্ধ করো তো লাস্টিগ!' অসহিষ্ণুভাবে বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক।

লাস্টিগ উঠে গিয়ে আবার কলিং বেল টিপল। ভদ্রমহিলার পুনরাবির্ভাব হতে সে প্রশ্ন করল, 'এটা কোন সাল?'

'এটা যে উনিশশো ছাব্বিশ, সেটাও জানেন না?'

ভদ্রমহিলা ফিরে গিয়ে একটা দোলনা-চেয়ারে বসে লেমনেড খেতে শুরু করলেন।

'শুনলেন তো?' লাস্টিগ ফিরে এসে বলল। 'উনিশশো ছাব্বিশ। আমরা সময়ে পিছিয়ে গেছি। এটা পৃথিবী।'

লাস্টিগ বসে পড়ল। তিনজনেরই মনে এখন গভীর উদ্বেগ। হাঁটুর উপর রাখা তাদের হাতগুলো আর স্থির থাকছে না। ক্যাপ্টেন বললেন, 'এমন একটা অবস্থায় পড়তে হবে, সেটা কি আমরা ভেবেছিলাম? এ কী ভয়াবহ পরিস্থিতি! এমন হয় কী করে? আমাদের সঙ্গে আইনস্টাইন থাকলে হয়তো এর একটা কিনারা করতে পারতেন!'

হিংস্টন বলল, 'আমাদের কথা এখানে কে বিশ্বাস করবে? শেষকালে কী অবস্থায় পড়তে হবে কে জানে! তার চেয়ে ফিরে গেলে হয় না?'

'না। অন্তত আর একটা বাড়িতে অনুসন্ধান করার আগে নয়।'

তিনজনে আবার রওনা দিয়ে তিনটে বাড়ির পরে ওক গাছের তলায় একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

'রহস্যের সন্ধান যুক্তিসম্মত ভাবেই হবে', বললেন, ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক, 'কিন্তু সে যুক্তির নাগাল আমরা এখনও পাইনি। 'আচ্ছা, হিংস্টন—ধরা যাক তুমি যেটা বলেছিলে, সেটাই ঠিক; অর্থাৎ মহাকাশ ভ্রমণ বহুকাল আগেই শুরু হয়েছে, ধরা যাক পৃথিবীর লোকে এখানে এসে থাকার কিছুদিন পরেই তাদের নিজেদের গ্রহের জন্য তাদের মন ছটফট করতে শুরু করেছিল। সেটা ক্রমে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় একজন মনোবিজ্ঞানী হলে তুমি কী করতে?'

হিংস্টন কিছুক্ষণ ভেবে বললে, 'আমি মঙ্গল গ্রহের জীবনযাত্রাকে ক্রমে বদলিয়ে পৃথিবীর মতন করে আনতাম। যদি এক গ্রহের গাছপালা নদ-নদী মাঠ-ঘাটকে অন্য আর-এক গ্রহের মতো রূপ দেওয়া সম্ভব হত, তা হলে আমি তাই করতাম। তারপর শহরের সমস্ত লোককে একজোটে হিপনোসিসের সাহায্যে বুঝিয়ে দিতাম যে, তারা যেখানে রয়েছে সেটা আসলে পৃথিবী, মঙ্গল গ্রহ নয়।'

'ঠিক বলেছ হিংস্টন। এটাই যুক্তিসম্মত কথা। ওই মহিলার ধারণা, তিনি পৃথিবীতেই রয়েছেন। এই বিশ্বাসে তিনি নিশ্চিন্ত। ওঁর মতো এই শহরের প্রত্যেকটি অধিবাসী এক বিরাট মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাসে দিন কাটাচ্ছে।'

'আমি এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।' বলল লাস্টিগ।

'আমিও।' বলল হিংস্টন।

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। 'যাক, এতক্ষণে কিছুটা সোয়াস্তি বোধ করছি। রহস্যের একটা কিনারা হল। সময়ে এগিয়ে। পেছিয়ে যাওয়ার ধারণাটা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু এইভাবে ভাবতে বেশ ভাল লাগছে।'—ক্যাপ্টেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। 'আমার তো মনে হচ্ছে, এবার আমরা নিশ্চিন্তে এদের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে পারি।'

'তাই কি ?' বলল লাস্টিগ। 'ধরুন যদি এরা এখানে এসে থাকে পৃথিবী থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমরা পৃথিবীর লোক জানলে এরা খুশি নাও হতে পারে।'

'আমাদের অস্ত্রের শক্তি অনেক বেশি। চলো দেখি, সামনের বাড়ির লোকে কী বলে !'

কিন্তু মাঠটা পেরোনোর আগেই লাস্টিগের দৃষ্টি হঠাৎ রুখে গেল সামনের রাস্তার একটা অংশে।

'স্যার'—

'কী হল লাস্টিগ ?'

'স্যার, এ কী দেখছি চোখের সামনে !' লাস্টিগের দৃষ্টি উদ্ভাসিত, তার চোখে জল। সে যেন তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে এই মুহূর্তেই আনন্দের আতিশয্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। সে বেসামাল ভাবে হোঁচট খেতে খেতে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি ?' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক সঙ্গে সঙ্গে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

লাস্টিগ দৌড়ে গিয়ে একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে পড়ল। বাড়ির ছাতে একটা লোহার মোরগ।

তারপর শুরু হল দরজায় ধাক্কার সঙ্গে চিৎকার। হিংস্টন ও ক্যাপ্টেন ততক্ষণে তার কাছে পৌঁছে গেছে। দুজনেই ক্লান্ত।

'দাদু ! দিদিমা ! দিদিমা !' চেঁচিয়ে চলেছে লাস্টিগ।

বারান্দার দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। তাঁরা দু'জনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ডেভিড !!' তারপর তাঁরা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন লাস্টিগকে।

'ডেভিড ! কত বড় হয়ে গেছিস তুই ! ওঃ, কতদিন পরে দেখছি তোকে ! তুই কেমন আছিস ?'

ডেভিড লাস্টিগ কান্নায় ভেঙে পড়েছে। 'দাদু ! দিদিমা ! তোমরা তো দিব্যি আছো !' বার বার বুড়ো-বুড়িকে জড়িয়ে ধরেও যেন লাস্টিগের আশ মেটে না। বাইরে সূর্যের আলো, মন-মাতানো হাওয়া, সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ আনন্দের ছবি।

'ভেতরে আয় ! বরফ দেওয়া চা আছে—অফুরন্ত !'

'আমার দুই বন্ধু সঙ্গে আছে দিদিমা।' লাস্টিগ দু'জনের দিকে ফিরে বলল, 'উঠে আসুন আপনারা।'

'এসো ভাই এসো', বললেন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। 'ভিতরে এসো। ডেভিডের বন্ধু মানে তো আমাদেরও বন্ধু। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?'

বৈঠকখানাটা দিব্যি আরামের। ঘরের এক কোণে একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক চলছে টিক টিক করে, চারিদিকে সোফার উপর নরম তাকিয়া, দেওয়ালের সামনে আলমারিতে বইয়ের সারি, মেঝেতে গোলাপের নকশায় ভরা পশমের গালিচা। সকলের হাতেই এখন গেলাসের বরফ-চা তাদের তৃষ্ণা উপশম করছে।

'তোমাদের মঙ্গল হোক।' বৃদ্ধা তাঁর হাতের গেলাসটা ঠোঁটে ঠেকালেন।

'তোমরা এখানে কদিন আছ ?' লাস্টিগ প্রশ্ন করল।

'আমাদের মৃত্যুর পর থেকেই।' অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বললেন মহিলা।

'কীসের পর থেকে ?' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের হাতের গেলাস টেবিলে নেমে গেছে।

'ওঁরা মারা গেছেন প্রায় ত্রিশ বছর হল', বলল লাস্টিগ।

'আর সে কথাটা তুমি অম্লানবদনে উচ্চারণ করলে ?' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক চেঁচিয়ে উঠলেন।

বৃদ্ধা উজ্জ্বল হাসি হেসে চাইলেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দিকে, তাঁর দৃষ্টিতে মৃদু র্ভৎসনা। 'কখন কী

ঘটে, তা কে বলতে পারে বলো। এই তো আমরা রয়েছি এখানে। জীবনই বা কী আর মৃত্যুই বা কী, তা কে বলবে ? আমরা শুধু জানি যে, আমরা আবার বেঁচে উঠেছি। বলতে পারো আমাদের একটা দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়েছে।'

বৃদ্ধা উঠে গিয়ে ক্যাপ্টেনের সামনে তাঁর ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন। 'ধরে দেখো।' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক বৃদ্ধার কবজির উপর হাত রাখলেন।

'এটা যে রক্তমাংসের হাত, তাতে কোনও সন্দেহ আছে কী ?'

বাধ্য হয়েই ব্ল্যাককে মাথা নেড়ে স্বীকার করতে হল যে নেই।

'তাই যদি হয়', বৃদ্ধা বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'তা হলে আর সন্দেহ কেন ?'

'আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কি, মঙ্গল গ্রহে এসে এমন একটা ঘটনা ঘটবে, সেটা আমরা ভাবতেই পারিনি।'

'কিন্তু এখন তো আর সন্দেহের কোনও কারণ নেই,' বললেন মহিলা। 'আমার বিশ্বাস প্রত্যেক গ্রহেই ভগবানের লীলার নানান নিদর্শন রয়েছে।'

'এই জায়গাকে কি তা হলে স্বর্গ বলা চলে ?' হিংস্টন প্রশ্ন করল।

'মোটেই না। এটা একটা গ্রহ এবং এখানে আমাদের দ্বিতীয়বার বাঁচার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সেটা কেন দেওয়া হয়েছে, তা কেউ আমাদের বলেনি। কিন্তু তাতে কী এসে গেল ? পৃথিবীতেই বা কেন আমরা ছিলাম তার কারণ তো কেউ বলেনি। আমি অবিশ্যি সেই অন্য পৃথিবীর কথা বলছি—যেখান থেকে তোমরা এসেছ। সেটার আগেও যে আর একটা পৃথিবীতে আমরা ছিলাম না, তার প্রমাণ কোথায় ?'

'তা বটে।' বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক।

লাস্টিগ এখনও হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে তার দাদু-দিদিমার দিকে। 'তোমাদের দেখে যে কী ভাল লাগছে!'

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক উঠে পড়লেন।

'এবার তা হলে আমাদের যেতে হয়। আপনাদের আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।'

'আবার আসবে তো?' বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন। 'রাত্রের খাওয়াটা এখানেই হোক না?'

'দেখি, চেষ্টা করব। কাজ রয়েছে অনেক। আমার লোকেরা রকেটে রয়েছে, আর—'

ক্যাপ্টেনের কথা থেমে গেল। তাঁর অবাক দৃষ্টি বাইরের দরজার দিকে। দূর থেকে সমবেত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। অনেকে সোল্লাসে কাদের যেন স্বাগত জানাচ্ছে।

ব্ল্যাক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দূরে রকেটটা দেখা যাচ্ছে। দরজা খোলা, ভিতরের লোক সব বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সবাই হাত নাড়ছে আনন্দে। রকেটটাকে ঘিরে মানুষের ভিড়, আর তাদের মধ্য দিয়ে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে রকেটের তেরোজন যাত্রী। জনতার উপর দিয়ে যে একটা ফূর্তির ঢেউ বয়ে চলেছে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

এরই মধ্যে একটা ব্যান্ড বাজতে শুরু করল। তার সঙ্গে ছোট ছোট মেয়েদের সোনালি চুল দুলিয়ে নাচ, 'হুররে! হুররে!' ছোট ছোট ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল। বুড়োরা এ-ওকে চুরুট বিলি করে তাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করল।

এরই মধ্যে মেয়র সাহেব একটি বক্তৃতা দিলেন। তার পর রকেটের তেরোজন প্রত্যেকে তাদের খুঁজে-পাওয়া আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল।

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক আর থাকতে পারলেন না। সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে তাঁর চিৎকার শোনা গেল, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

ব্যান্ডবাদকেরাও চলে গেল। এখন আর রকেটের পাশে লোক নেই, সেটা ঝলমলে রোদে পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'দেখেছ কাণ্ড,' বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। 'রকেটটাকে ছেড়ে চলে গেল! ওদের ছাল-চামড়া তুলে নেব আমি। আমার হুকুম অগ্রাহ্য করে'—

'স্যর, ওদের মাফ করে দিন,' বলল লাস্টিগ। 'এত পুরনো চেনা লোকের দেখা পেয়েছে ওরা।'

'ওটা কোনও অজুহাত নয়!'

'কিন্তু জানলা দিয়ে বাইরে চেনা লোক দেখলে তখন ওদের মনের অবস্থাটা কল্পনা করুন!'

'কিন্তু তাই বলে হুকুম মানবে না?'

'এই অবস্থায় আপনার নিজের মনের অবস্থা কী হত সেটাও ভেবে দেখুন!'

'আমি কখনই হুকুম অগ্রাহ্য—'

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হল না। বাইরে রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আসছে একটি দীর্ঘাঙ্গ যুবক, বছর পঁচিশ বয়স, তার অস্বাভাবিক রকম নীল চোখ দুটো হাসিতে উজ্জ্বল।

'জন!' যুবকটি এবার দৌড়ে এল ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দিকে।

'এ কী ব্যাপার!' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের যেন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

'জন! তুই ব্যাটা এখানে হাজির হয়েছিস?'

যুবকটি ক্যাপ্টেনের হাত চেপে ধরে তার পিঠে একটা চাপড় মারল।

'তুই!' অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন এল ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মুখ থেকে।

'তোর এখনও সন্দেহ হচ্ছে?'

'এডওয়ার্ড!' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক এবার লাস্টিগ ও হিংস্টনের দিকে ফিরলেন, আগন্তুকের হাত তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে।

'এ হল আমার ছোট ভাই এডওয়ার্ড। এড—ইনি হলেন হিংস্টন, আর ইনি লাস্টিগ।'

দুই ভাইয়ে কিছুক্ষণ হাত ধরে টানাটানির পর সেটা আলিঙ্গনে পরিণত হল।

'এড!'

'জন—হতচ্ছাড়া, তোকে যে আবার কোনও দিন দেখতে পাব— ! তুই তো দিব্যি আছিস, এড। কিন্তু ব্যাপারটা কী বল তো ? তোর যখন ছাব্বিশ বছর বয়স, তখন তোর মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন উনিশ। কত কাল আগের কথা—আর আজ...'

'মা অপেক্ষা করছেন,' হাসিমুখে বলল এডওয়ার্ড ব্ল্যাক।

'মা !'

'বাবাও !'

'বাবা !' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক যেন মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। তাঁর গতি টলায়মান।—'মা-বাবা বেঁচে আছেন ? কোথায় ?

'আমাদের সেই পুরনো বাড়ি। ওক নোল অ্যাভিনিউ !'

'সেই পুরনো বাড়ি।' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

'শুনলে তোমরা ?' হিংস্টন ও লাস্টিগের দিকে ফিরলেন জন ব্ল্যাক। কিন্তু হিংস্টন আর নেই। সে তার নিজের ছেলেবেলার বাসস্থানের দেখা পেয়ে সেই দিকে ছুটে গেছে। লাস্টিগ হেসে বলল, 'এইবার বুঝেছেন ক্যাপ্টেন—আমাদের বন্ধুদের আচরণের কারণটা ? হুকুম মানার অবস্থা ওদের ছিল না।'

'বুঝেছি, বুঝেছি !' জন ব্ল্যাক চোখ বন্ধ করে বললেন। 'যখন চোখ খুলব তখন কি আবার দেখব তুই আর নেই ?' জন চোখ খুললেন। 'না তো ! তুই তো এখনও আছিস। আর কী খোলতাই হয়েছে তোর চেহারা !'

'আয়, লাঞ্চের সময় হয়েছে। আমি মাকে বলে রেখেছি।'

লাস্টিগ বলল, 'স্যর, আমি আমার দাদু ও দিদিমার কাছে থাকব। প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।'

'অ্যাঁ ? ও, আচ্ছা, ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।'

এডওয়ার্ড জনের হাত ধরে এগিয়ে গেল একটা বাড়ির দিকে। —'মনে পড়ছে বাড়িটা ?'

'আরেব্বাস্ ! আয় তো দেখি, কে আগে পৌঁছতে পারে !'

দুজনে দৌড়ল। চারপাশের গাছ, পায়ের নীচের মাটি দ্রুত পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এডওয়ার্ডেরই জয় হল। বাড়িটা ঝড়ের মতো এগিয়ে এসেছে সামনে।—'পারলি না, দেখলি তো !' বলল এডওয়ার্ড। 'আমার যে বয়স হয়ে গেছে রে,' বলল জন। 'তবে এটা মনে আছে যে কোনও দিনই তোর সঙ্গে দৌড়ে পারিনি।'

দরজার মুখে মা, স্নেহময়ী মা, সেই দোহারা গড়ন। মুখে উজ্জ্বল হাসি। তাঁর পিছনে বাবা, চুলে ছাই রঙের ছোপ, হাতে পাইপ।

'মা ! বাবা !'

শিশুর মতো হাত বাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন জন ব্ল্যাক।

দুপুরটা কাটল চমৎকার। খাওয়ার পর জন তাঁর রকেট, অভিযানের গল্প করলেন আর সবাই সেটা উপভোগ করলেন। জন দেখলেন যে তাঁর মা একটুও বদলাননি, আর বাবাও ঠিক আগের মতো করেই দাঁত দিয়ে চুরুটের ডগা ছিঁড়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে দেশলাই সংযোগ করছেন। রাত্রে টার্কির মাংস ছিল। টার্কির পা থেকে মাংসের শেষ কণাটুকু চিবিয়ে খেয়ে ক্যাপ্টেন জন পরম তৃপ্তি অনুভব করলেন। বাইরে গাছপালায় আকাশে মেঘে রাত্রির রঙ, ঘরের মধ্যে ল্যাম্পগুলোকে ঘিরে গোলাপি আভা। পাড়ায় আরও অন্য শব্দ শোনা যাচ্ছে—গানের শব্দ, পিয়ানোর শব্দ, দরজা-জানালা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ।

মা গ্রামোফোনে একটা রেকর্ড চাপিয়ে নতুন করে ফিরে পাওয়া ছেলের সঙ্গে একটু নাচলেন। মা-র গায়ে সেই সেন্টের গন্ধ। এ গন্ধ সে দিনও ছিল, যে দিন ট্রেন দুর্ঘটনায় বাপ-মা দুজনেরই একসঙ্গে মৃত্যু হয়। জন যে মা-কে জড়িয়ে ধরে নাচছে, সেটা যে খাঁটি— সেটা জন বেশ বুঝতে পারছে। মা নাচতে নাচতেই বললেন, 'বল্ তো জন, দ্বিতীয়বার জীবন-ধারণের সুযোগ ক'জনের আসে ?'

'কাল সকালে ঘুম ভাঙবে,' আক্ষেপের সুরে বলল জন, 'তার কিছু পরেই রকেটে করে আমাদের

এই স্বর্গরাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'ও রকম ভেবো না,' বললেন মা। কোনও অভিযোগ রেখো না মনে। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য। আমরা তাতেই সুখী।'

'ঠিক বলেছ, মা!'

রেকর্ডটা শেষ হল।

'তুমি আজ ক্লান্ত,' জনের দিকে পাইপ দেখিয়ে বললেন বাবা। 'তোমার শোবার ঘর তো রয়েইছে, তোমার পিতলের খাটও রয়েছে।'

'কিন্তু আগে আমার দলের লোকদের খোঁজ নিতে হবে তো।'

'কেন?'

'কেন মানে....ইয়ে, বিশেষ কোনও কারণ নেই। সত্যিই তো। ওরাও হয়তো দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছে। একটা রাত ভাল করে ঘুমিয়ে নিলে ওদের বরং লাভই হবে।'

'গুড নাইট জন,' মা তার ছেলের গালে চুমু দিয়ে বললেন। 'তোমাকে পেয়ে আজ আমাদের কত আনন্দ।'

'আমারও মন আনন্দে ভরে গেছে।'

চুরুট আর সেন্টের গন্ধে ভরা ঘর ছেড়ে জন ব্ল্যাক সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করল, তার পিছনে এডওয়ার্ড। দুজনে কথায় মশগুল। দোতলায় পৌঁছে এডওয়ার্ড একটা ঘরের দরজা খুলে দিল। জন দেখল তার পিতলের খাট, দেয়ালে টাঙানো তার স্কুল-কলেজের নানা রকম চিহ্ন, সেই সময়কার একটা অতি-পরিচিত র‍্যাকুনের লোমের কোট, যাতে হাত না বুলিয়ে পারল না জন। 'এ যেন বাড়াবাড়ি', বললেন জন। 'সত্যি, আমার আর অনুভবের শক্তি নেই। দু'দিন সমানে বৃষ্টিতে ভিজলে শরীরের যা অবস্থা হয়, আমার মনটা তেমনই সপ্‌সপে হয়ে আছে অজস্র বিচিত্র অনুভূতিতে।'

এডওয়ার্ড তার নিজের বিছানায় ও বালিশে দুটো চাপড় মেরে জানালার কাচটা উপরে তুলে দিতে জ্যাসমিন ফুলের গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। বাইরে চাঁদের আলো। দূরে কাদের বাড়িতে যেন নাচ-গান হচ্ছে।

'তা হলে এটাই হল মঙ্গল গ্রহ—', তাঁর পোশাক ছাড়তে ছাড়তে বললেন জন ব্ল্যাক।

এডওয়ার্ডও শোবার জন্য তৈরি হচ্ছে। শার্ট খুলে ফেলতেই তার সুঠাম শরীরটা বেরিয়ে পড়ল।

এখন ঘরের বাতি নেবানো হয়ে গেছে। দু'জন পাশাপাশি শুয়ে আছে বিছানায়। কত বছর পরে আবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মন নানান চিন্তায় ভরপুর।

হঠাৎ তাঁর ম্যারিলিনের কথা মনে হল।

'ম্যারিলিন কি এখানে?'

জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় শোওয়া এড্ওয়ার্ড কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে উত্তরটা দিল।

'সে এখানেই থাকে, তবে এখন শহরের বাইরে। কাল সকালেই ফিরবে।'

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক চোখ বন্ধ করে প্রায় আপনমনেই বললেন, 'ম্যারিলিনের সঙ্গে একটিবার দেখা হলে বেশ হত।'

ঘরটায় এখন কেবল দুজনের নিশ্বাসের শব্দ।

'গুড নাইট, এড।'

সামান্য বিরতির পর উত্তর এল, 'গুড নাইট, জন।'

জন ব্ল্যাক নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে ভাবতে লাগলেন।

এখন দেহ-মনে আর অবসাদ নেই, মাথাও পরিষ্কার। এতক্ষণ নানান পরস্পরবিরোধী অনুভূতি তাকে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে দিচ্ছিল না। কিন্তু এখন...

প্রশ্ন হচ্ছে—কীভাবে এটা সম্ভব হল? এবং এর কারণ কী? শুধুই কি ভগবানের লীলা! ভগবান কি তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এত চিন্তা করেন?

হিংস্টন ও লাস্টিগের কথাগুলো তাঁর মনে পড়ল। নানান যুক্তি, নানান কারণ তাঁর মনের

অন্ধকারে আলেয়ার আলোর মতো জেগে উঠতে লাগল। মা। বাবা। এডওয়ার্ড। মঙ্গল। পৃথিবী। মঙ্গলগ্রহের অধিবাসী...

হাজার বছর আগে কারা এখানে বাস করত ? তারা কি মঙ্গলগ্রহের প্রাণী, নাকি এদেরই মতো পৃথিবীতে মরে-যাওয়া সব মানুষ !

মঙ্গলগ্রহের প্রাণী ! কথাটা দু'বার মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন জন ব্ল্যাক।

হঠাৎ তাঁর চিন্তা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হল। সব কিছুর একটা মানে হঠাৎ তাঁর মনে জেগে উঠেছে। রক্ত হিমকরা মানে। অবিশ্যি সেটা বিশ্বাস করার কোনও যুক্তি নেই, কারণ ব্যাপারটা অসম্ভব। নিছক আজগুবি কল্পনা মাত্র। ভুলে যাও, ভুলে যাও...মন থেকে দূর করে দাও।

কিন্তু তবু তাঁর মন বলল—একবার তলিয়ে দেখা যাক না ব্যাপারটা। ধরা যাক যে, এরা মঙ্গলগ্রহেরই অধিবাসী। ওরা আমাদের রকেটকে নামতে দেখেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে। ধরা যাক, এরা তৎক্ষণাৎ স্থির করেছে এই পৃথিবীবাসীদের ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু ঠিক সোজাসুজি নয়, একটু বাঁকা ভাবে। যেন তাতে একটু চালাকি থাকে, শয়তানি থাকে ; যাতে সেটা পৃথিবীর প্রাণীদের কাছে আসে অপ্রত্যাশিতভাবে, আচমকা। এক্ষেত্রে আণবিক মারণাস্ত্রের অধিকারী মানুষের বিরুদ্ধে এরা কী অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে ?

এ প্রশ্নেরও উত্তর আছে। টেলিপ্যাথির অস্ত্র, সম্মোহনের অস্ত্র, কল্পনাশক্তির অস্ত্র।

এমন যদি হয় যে, এই সব গাছপালা বাড়িঘর, এই পিতলের খাট—আসলে এর কোনওটাই বাস্তব নয়, সবই আমার কল্পনাপ্রসূত, যে কল্পনার উপর কর্তৃত্ব করছে টেলিপ্যাথি ও সম্মোহনী শক্তির অধিকারী এই মঙ্গলবাসীরা—হয়তো এই বাড়ির চেহারা অন্য রকম, যেমন বাড়ি শুধু মঙ্গল গ্রহেই হয়, কিন্তু এদের টেলিপ্যাথি এবং হিপ্‌নোসিসের কৌশলে আমাদের চোখে এর চেহারা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীরই একটি ছোট পুরনো শহরের বাড়ির মতো। ফলে আমাদের মনে একটা প্রসন্নভাব এসে যাচ্ছে আপনা থেকেই। তার উপর নিজেদের হারানো বাবা-মা ভাইবোনকে পেলে কার না মন আনন্দে ভরে যায় ?

এই শহরের বয়স আমি ছাড়া আমাদের দলের সকলের চেয়ে বেশি। আমার যখন ছ' বছর বয়স তখন আমি ঠিক এই রকম শহর দেখেছি, এই রকম গান-বাজনা শুনেছি, ঘরের ভিতর ঠিক এইরকম আসবাব, এই ঘড়ি, এই কার্পেট দেখেছি। এমন যদি হয় যে, এই দুর্ধর্ষ চতুর মঙ্গলবাসীরা আমারই স্মৃতির উপর নির্ভর করে ঠিক আমারই মনের মতো একটি শহরের চেহারা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। শৈশবের স্মৃতিই সবচেয়ে উজ্জ্বল, এমন কথা শোনা যায়। আমার স্মৃতির শহরকে বাস্তব রূপ দিয়ে তারপর তারা আমার রকেটের অন্য যাত্রীদের স্মৃতি থেকেও তাদের মৃত প্রিয়জনদের এই শহরের বাসিন্দা করে দিয়েছে।

ধরা যাক পাশের ঘরে যে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা শুয়ে আছেন, তাঁরা আসলে মোটেই আমার মা-বাবা নন। আসলে তাঁরা ক্ষুরধার-বুদ্ধিসম্পন্ন দুই মঙ্গলগ্রহবাসী, যারা আমার মনে তাঁদের ইচ্ছামতো ধারণা আরোপ করতে সক্ষম।

আর রকেটকে ঘিরে আজকের ওই আমোদ ও ব্যান্ড-বাদ্য ? কী আশ্চর্য বুদ্ধি কাজ করছে ওর পিছনে—যদি সত্যিই এটা টেলিপ্যাথি হয়। প্রথমে লাস্টিগকে হাত করা গেল,—তার পর হিংস্টনকে, তার পর রকেটের বাকি সব যাত্রীদের ঘিরে ফেলা হল গত বিশ বছরের মধ্যে হারানো তাদের আত্মীয় ও প্রিয়জনদের দিয়ে, যাতে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার হুকুম অগ্রাহ্য করে রকেট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কী হতে পারে ? এখানে মনে সন্দেহ প্রবেশ করার সুযোগ কোথায় ? তাই তো এখন দলের সকলেই শুয়ে আছে বিভিন্ন বাড়িতে, বিভিন্ন খাটে, নিরস্ত্র অবস্থায় ; আর রকেটটাও খালি পড়ে আছে চাঁদনি রাতে। কী ভয়াবহ হবে সেই উপলব্ধি, যদি সত্যিই জানা যায় যে, এই সমস্ত ঘটনার পিছনে রয়েছে আমাদের সকলকে হত্যা করার অভিসন্ধি। হয়তো মাঝরাত্রে আমার পাশের খাটে আমার ভাইয়ের চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে যাবে ভয়ঙ্কর একটা কিছু—যেমন চেহারা সব মঙ্গলবাসীরই হয়। আর সেইসঙ্গে অন্য পনেরোটা বাড়িতে আমার দলের লোকদের প্রিয়জনদেরও চেহারা যাবে পালটে, আর তারা শুরু করবে ঘুমন্ত পৃথিবীবাসীদের সংহার...

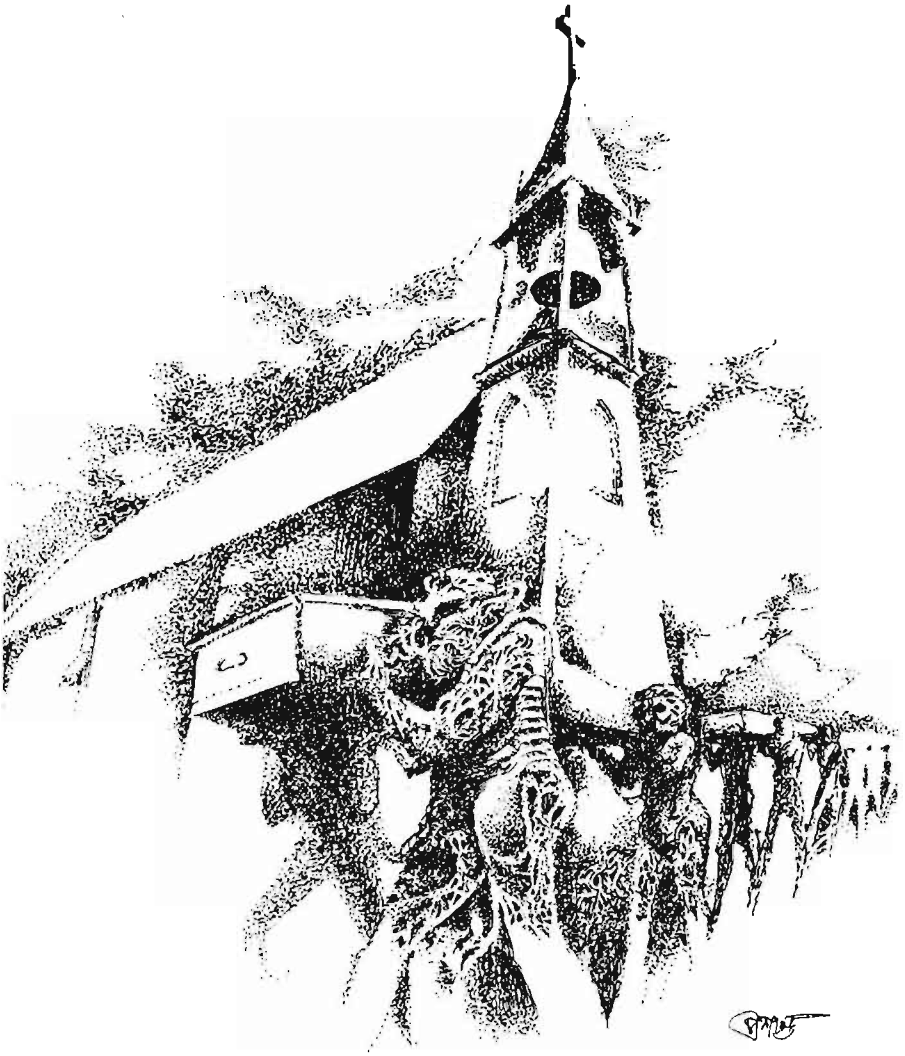

চাদরের তলায় ক্যাপ্টেন জনের হাত দুটো আর স্থির থাকছে না। আর তাঁর সমস্ত শরীর হয়ে গেছে বরফের মতো ঠাণ্ডা। যা এতক্ষণ ছিল কল্পনা, তা এখন বাস্তব রূপ ধরে তাঁর মনে গভীর আতঙ্কের সঞ্চার করছে।

ধীরে ধীরে ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক বিছানায় উঠে বসলেন। রাত এখন নিস্তব্ধ। বাজনা থেমে গেছে। বাইরে বাতাসের শব্দও আর নেই। পাশের খাটে ভাই শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

অতি সন্তর্পণে গায়ের চাদরটা গুটিয়ে পাশে রাখলেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। তারপর খাট থেকে নেমে কোনও শব্দ না করে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই ভাইয়ের কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়ালেন।

'কোথায় যাচ্ছ দাদা ?'

'কী বললে ?'

'এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ ?'

'জল খেতে যাচ্ছিলাম।'
'কিন্তু তোমার তো তেষ্টা পায়নি।'
'হ্যাঁ, পেয়েছে।'
'আমি জানি পায়নি।'
ক্যাপ্টেন জন পালাবার চেষ্টায় দৌড়ে গেলেন দরজার দিকে। কিন্তু দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না।
পরদিন সকালে মঙ্গলবাসীদের ব্যান্ডে শোনা গেল করুণ সুর। শহরের অনেক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল লম্বা লম্বা কাঠের বাক্স বহনকারীর দল। মৃত ব্যক্তিদের বাপ-মা-ভাই-বোন সকলের চোখেই জল, তারা চলেছে গির্জার দিকে, যেখানে মাটিতে ষোলোটি নতুন গর্ত খোঁড়া হয়েছে।
মেয়র আর একটি বক্তৃতা দিলেন—এবার দুঃখ প্রকাশ করার জন্য, যদিও তাঁকে আজ চিনতে পারা মুশকিল, কারণ তাঁর চেহারা দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে। যেমন হচ্ছে এই শহরের সমস্ত প্রাণীই। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মা, বাবা ও ভাইয়ের চোখে জল হলেও তাদের চেহারা দ্রুত বিকৃত হয়ে আসছে, ফলে তাদের এখন চেনা প্রায় অসম্ভব।
কাঠের কফিনগুলো গর্তের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল। কে যেন মন্তব্য করল, 'রাতারাতি লোকগুলো শেষ হয়ে গেল।'
এখন কফিনের ঢাকনার ওপর মঙ্গলের মাটি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।
এই শুভদিনে আজ এখানে সকলের ছুটি।

মারস্ ইজ হেভেন
সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৯১

আর্থার সি. ক্লার্ক

ঈশ্বরের ন' লক্ষ কোটি নাম

'আপনাদের অর্ডারটা একটু অস্বাভাবিক ধরনের', বিস্ময়ের মাত্রাটা যথাসম্ভব কমিয়ে বললেন ডাঃ ওয়াগনার— 'আমি যতদূর জানি, এর আগে কোনও তিব্বতি গুম্ফা থেকে অটোমেটিক সিকুয়েন্স কম্পিউটারের জন্য অর্ডার আসেনি। আপনাদের ঠিক এই ধরনের মেশিনের প্রয়োজন হতে পারে সেটা আমি ভাবিনি। আপনারা কী কাজের জন্য যন্ত্রটা চাইছেন, সেটা একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?'
'নিশ্চয়ই', তাঁর সিল্কের আলখাল্লাটিকে সামলে নিয়ে, স্লাইড রুলের সাহায্যে ডলার ও তিব্বতি মুদ্রার পারস্পরিক সম্পর্কের হিসাবটা স্থগিত রেখে বললেন লামা। 'নিশ্চয়ই বলব। আপনাদের মার্ক-৪ কম্পিউটার সবরকম গণনারই কাজ করতে পারে, যদি না একসঙ্গে দশটার বেশি সংখ্যার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের কাজের জন্য আমরা সংখ্যার কথা ভাবছি না—আমরা ভাবছি অক্ষরের কথা। আপনারা যদি যন্ত্রের সার্কিটে কিছু অদল-বদল করে সেটাকে এমন একটা অবস্থায় এনে দিতে পারেন, যাতে তার সাহায্যে সংখ্যার বদলে অক্ষর ছাপা হবে, তা হলেই আমাদের কাজ হয়ে যায়।'
'ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে এখনও ঠিক—'
'আমরা এই কাজটা বিনা যন্ত্রে গত তিনশো বছর ধরে করে আসছি। অর্থাৎ আমাদের গুম্ফা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকে। হয়তো কাজটা আপনি এখনও ঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না, কিন্তু

যদি একটু মন দিয়ে শোনেন, তা হলেই পারবেন।'

'বেশ তো।'

'আসলে ব্যাপারটা খুবই সহজ। আমরা একটা তালিকা প্রস্তুত করছি, যাতে ঈশ্বরের যতরকম নাম হয়, তার সবগুলিই থাকবে।'

'মানে— ?'

লামা নিরুদ্বিগ্নভাবে বলে চললেন, 'আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের কোনও নাম লিখতেই ন'টির বেশি অক্ষরের প্রয়োজন হয় না। অবিশ্যি, নাম লিখতে যে বর্ণমালা ব্যবহার হবে, সেটা নতুন এবং আমাদেরই তৈরি।'

'এই কাজ আপনারা তিনশো বছর ধরে করছেন ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা অনুমান করি, কাজটা সম্পূর্ণ হতে লাগত আরও পনেরো হাজার বছর।'

ডাঃ ওয়াগনার এখনও খেই পাচ্ছেন না। তিনি বললেন, 'বুঝলাম। এখন বুঝতে পারছি, কেন আপনারা কম্পিউটার ব্যবহার করার কথা ভাবছেন। কিন্তু এই কাজের আসল উদ্দেশ্যটা কী ?'

লামার মধ্যে যেন কিঞ্চিৎ ইতস্তত ভাব। ডাঃ ওয়াগনারের আশঙ্কা হল, তিনি বুঝি অজান্তে অপমানসূচক কিছু বলে ফেলেছেন। কিন্তু লামার উত্তরে কোনও বিরক্তি প্রকাশ পেল না।

'এই কাজটা আমাদের আচারানুষ্ঠানের একটা অঙ্গ। আমরা এটাকে একটা কর্তব্য বলে মনে করি। যতরকম নামে মানুষ ঈশ্বরকে জানে—গড়, জেহোভা, আল্লা, ইত্যাদি—এগুলো সবই মানুষের দেওয়া নাম। এখানে অবিশ্যি কতগুলো দার্শনিক প্রশ্ন এসে পড়ছে যেগুলো আমি আলোচনা করতে চাই না, কিন্তু ন'টি অক্ষরে সীমাবদ্ধ রেখে যদি আমরা সেগুলিকে পারমিউটেশন কম্বিনেশনের সাহায্যে পাশাপাশি বসিয়ে চলি, তা হলে আমার বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের সবক'টি নামই লিখে ফেলতে পারব। সেই বিন্যাসের কাজটা আমরা এতদিন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই করে আসছি।'

'বুঝেছি—আপনারা AAAAAAAA থেকে শুরু করে ZZZZZZZZZ পর্যন্ত যেতে চান।'

'ঠিক তাই। যদিও—যে কথাটা বললাম—এক্ষেত্রে অক্ষরগুলো আমরাই তৈরি করেছি। সংখ্যা থেকে অক্ষরে পরিবর্তন করার কাজটা আপনাদের পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। তবে এমন সার্কিট করা দরকার, যাতে অক্ষরগুলো যুক্তিসম্মতভাবে পরপর সাজানো হয়। যেমন, কোনও শব্দে একই অক্ষর পরপর তিনবারের বেশি ব্যবহার করা চলবে না।'

'তিনবার ? না দু' বার ?'

'তিনবার। কেন তিনবার সেটা বোঝাতে গেলে বৃথা সময় নষ্ট হবে।'

'ওঃ', বললেন ডাঃ ওয়াগনার। 'আর কিছু বলার আছে কি ?'

'আমার বিশ্বাস, আপনাদের যন্ত্রটিকে আমাদের কাজের উপযুক্ত করে তৈরি করে দিতে বেশি সময় লাগবে না। তার পরেই সংখ্যার বদলে অক্ষর-বিন্যাসের কাজটা শুরু হয়ে যেতে পারবে। আমার ধারণা, যে কাজটা আমাদের লাগত পনেরো হাজার বছর, সেটা যন্ত্রের সাহায্যে হয়ে যাবে একশো দিনে।'

ডাঃ ওয়াগনারের ঘরের খোলা জানলা দিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরের ট্র্যাফিকের মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সে শব্দ তাঁর কানে প্রবেশই করছে না। তাঁর মন এখন সম্পূর্ণ অন্য জগতে বিচরণ করছে। যেখানে গগনচুম্বী পাহাড়গুলি প্রকৃতির সৃষ্টি, মানুষের নয়। সেই পাহাড়ের চুড়োয় গুম্ফায় বসে এই তিব্বতি সাধকেরা যুগের পর যুগ ধরে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাদের অর্থহীন তালিকা তৈরি করে যাচ্ছে ! মানুষের পাগলামির কি কোনও সীমা নেই ? যাই হোক, তাঁর মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করা চলবে না। কথাই তো আছে—'দ্য কাস্টমার ইজ নেভার রং।'

ডাঃ ওয়াগনার বললেন, 'এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আমাদের মার্ক-৫ কম্পিউটারকে আপনাদের কাজের উপযুক্ত করে তৈরি করে দিতে পারি আমরা। আমি এখন যে কথাটা ভেবে চিন্তিত হচ্ছি, সেটা হল— আপনাদের গুম্ফাতে যন্ত্রটিকে বসানো, চালানো এবং তার পরিচর্যা নিয়ে। ওটাকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়াটাও তো একটা দুরূহ কাজ।'

'সে ব্যবস্থা আমরা করব। আপনাদের কম্পিউটারের অংশগুলো তেমন কিছু বড় নয়—যে

কারণে আপনাদের মডেলটা বাছাই করেছি। ওটাকে একবার ভারতবর্ষে পৌঁছে দিতে পারলে বাকি পথটুকুর ব্যবস্থা আমরাই করব।'

'আর আপনি বলছিলেন, আমাদের এখান থেকে দু'জন লোক নেওয়ার কথা ?'

'হ্যাঁ। তিন মাসের জন্য। তার বেশি সময় নিশ্চয়ই লাগবে না।'

'সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে', বিষয়টা প্যাডে নোট করে নিয়ে বললেন ডাঃ ওয়াগনার। 'অবিশ্যি আরও দুটো ব্যাপার—'

কথা শেষ করার আগেই লামা তাঁর আলখাল্লার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ওয়াগনারের হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা হল এশিয়াটিক ব্যাঙ্কে আমার কত টাকা জমা আছে তার সার্টিফিকেট।'

'ধন্যবাদ। হ্যাঁ—তা, এতে যথেষ্ট হবে বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় ব্যাপারটা এতই মামুলি যে, সেটা উল্লেখ করতেও আমার সঙ্কোচ হচ্ছে—অথচ না করলেও নয়। আপনাদের ইলেকট্রিসিটির কী ব্যবস্থা ?'

'১১০ ভোল্টে ৫০ কিলোওয়াট উৎপাদনকারী ডিজেল জেনারেটর। বছর পাঁচেক হল এটা বসানো হয়েছে এবং কাজ দিচ্ছে ভালই। এটা আসার পর থেকে গুম্ফার জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়ে গেছে। অবিশ্যি ওটা আনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বড় বড় জপ-যন্ত্রগুলোকে চালানো।'

'তা তো বটেই', বললেন ডাঃ ওয়াগনার। 'এটা আমার অনুমান করা উচিত ছিল।'

গুম্ফার ছাতের বেঁটে পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে নীচের দিকে চাইলে প্রথমে মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঠিকই, কিন্তু ক্রমে সবই অভ্যাস হয়ে যায়। এই তিন মাসেও দু' হাজার ফুট নীচে খাদের দৃশ্য বা দূরে উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের নানারকম জ্যামিতিক নক্শা জর্জ হ্যানলির মনকে নাড়া দিতে পারেনি। সে এখন ছাতের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দূরের পর্বতশৃঙ্গগুলোর দিকে চেয়ে আছে। সেগুলোর নাম জানার কোনও ঔৎসুক্য সে বোধ করেনি। এমন বেয়াড়া অবস্থায় তাকে কোনও দিন পড়তে হয়েছে কি ? নিশ্চয়ই না। গত তিন মাস ধরে মার্ক-৫ কম্পিউটারে উদ্ভট অক্ষরের সমষ্টি ছাপা রোলের পর রোল কাগজ বেরিয়ে আসছে। অক্ষরগুলির যতরকম সম্ভাব্য বিন্যাস হতে পারে, যান্ত্রিক টাইপরাইটারে তার প্রত্যেকটি ছেপে চলেছে অক্লান্তভাবে। কাগজের রোল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে লামারা প্রত্যেকটি শব্দ কাঁচি দিয়ে কেটে সেগুলোকে বিরাট বিরাট খাতায় সযত্নে সেঁটে ফেলছে। আর এক সপ্তাহে কাজ শেষ হওয়ার কথা। কোন্ হিসাবের ভিত্তিতে যে এরা কথাগুলোকে ন'-অক্ষরে সীমাবদ্ধ রেখেছে, তার রহস্য জর্জ হ্যানলির অজানা। একটা আশঙ্কা মাঝে মাঝে হ্যানলির বুক কাঁপিয়ে দেয়, সেটা হল এই যে, লামারা হয়তো হঠাৎ একদিন স্থির করবে যে কাজটা ২০৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালানো দরকার। এদের পক্ষে সবই সম্ভব।

একটা ভারী কাঠের দরজা খোলার শব্দের সঙ্গে চাক্ ছাতে এসে জর্জের পাশে দাঁড়াল। চাকের মুখে চুরুট—যে চুরুট লামাদের ভারী প্রিয় হয়ে উঠেছে। ধর্মযাজক হলেও এরা অল্পবিস্তর ফুর্তির স্বাদ গ্রহণ করতে বিমুখ নয়। এরা ছিটগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু গোঁড়া নয়।

চাক্ এসেছে একটা জরুরি বক্তব্য নিয়ে। —'যা শুনছি জর্জ, তাতে কিন্তু ব্যাপার গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে।'

'কী শুনছ ? যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করছে না ?' জর্জের মতে এর চেয়ে বেশি গোলমেলের আর কিছু হতে পারে না। যন্ত্রের গণ্ডগোল হলে তাদের যাওয়া পিছিয়ে যেতে পারে, আর সেটাই হবে চরম বিপর্যয়। ইদানীং টেলিভিশনের রদ্দি-মার্কা বিজ্ঞাপনের ছবিগুলোর কথা ভেবেও জর্জের মন কেমন করে, কারণ সেগুলোও তো দেশের কথাই মনে করিয়ে দেয় !

'না না', বলল চাক্, 'সে ধরনের গোলমাল নয়।' চাক্ সাধারণত ছাতের পাঁচিলে বসে না, কারণ তাতে তার বুক ধড়ফড় করে, কিন্তু আজ ও সেখানেই বসে বলল, 'আমি আসল ব্যাপারটা জেনে ফেলেছি।'

'তার মানে ? ব্যাপার তো সবই আমাদের জানা।'

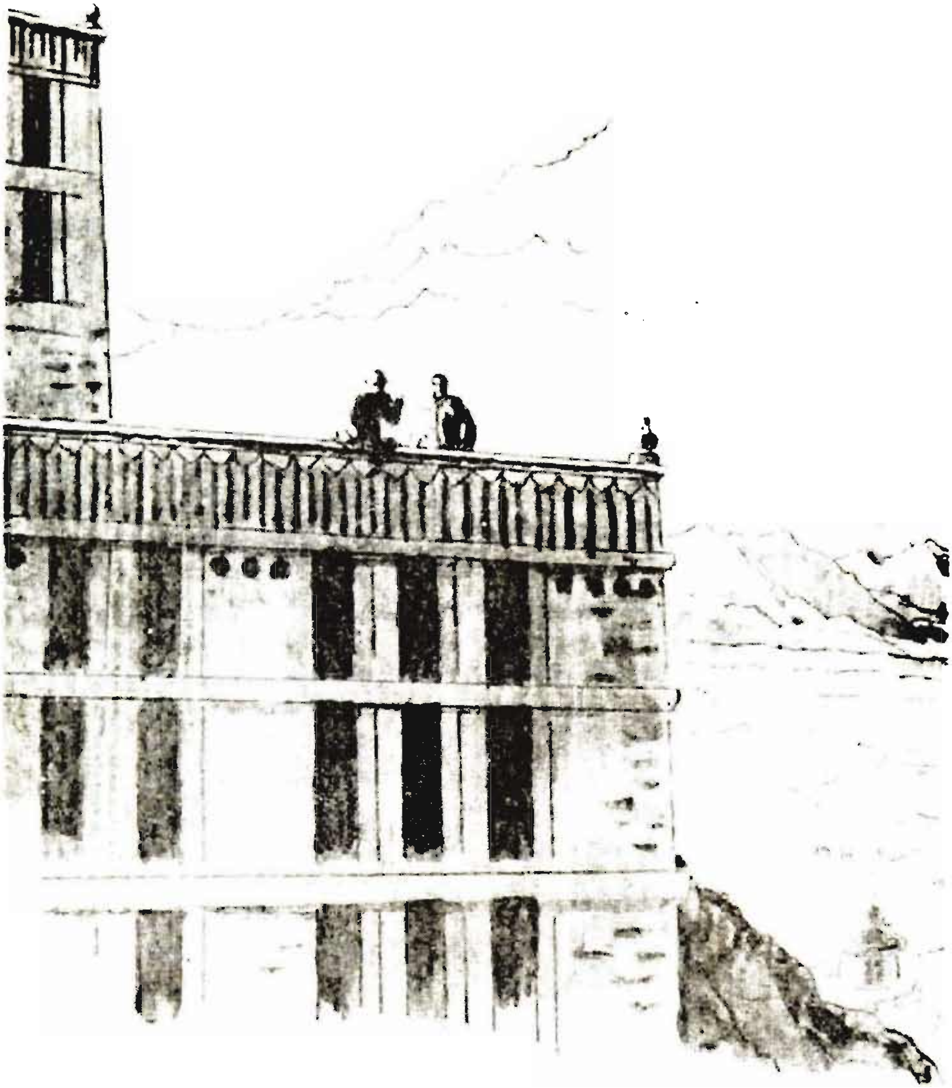

'আমরা যেটা জানি সেটা হল লামারা কী করতে যাচ্ছে, কিন্তু কেন করতে যাচ্ছে, সেটা তো জানতাম না। এখন সেটা জেনেছি, এবং সে এক অভাবনীয় ব্যাপার!'

'তোমার ওসব বাজে কথা ছাড়ো তো?'

'কিন্তু লামা যে আমায় নিজে বলেছেন! তুমি তো জানো, উনি রোজ এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কম্পিউটার থেকে টাইপ করা কাগজের রোল বেরিয়ে আসা দেখেন। আজও এসেছিলেন এবং আজ কেন যেন অন্যদিনের তুলনায় ওঁকে বেশি উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছিল। আমি যখন বললাম যে আমাদের কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে, উনি আমাকে তাঁর অদ্ভুত ইংরিজি উচ্চারণে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোনওদিন এই কাজটার পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা সম্বন্ধে কিছু অনুমান করেছি কিনা। আমি বললাম—সেরকম উদ্দেশ্য কিছু আছে নাকি? তখন ভদ্রলোক ব্যাপারটা বললেন।'

'কী বললেন?'

'এঁরা বিশ্বাস করেন যে, যখন ঈশ্বরের নামের তালিকা তৈরি হয়ে যাবে—এঁদের মতে নামের সংখ্যা হচ্ছে ন' লক্ষ কোটি—তখন ঈশ্বরের কাজও ফুরিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল যে কাজ করার জন্য, তাও শেষ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়—এর পরে মানুষের পক্ষে কিছু করতে যাওয়াটাই হবে ঈশ্বরবিরোধী কাজ।'

'তা হলে আমরা এখন করছিটা কী ? আত্মহত্যা ?'

'সেটার প্রয়োজন কোথায় ? তালিকা শেষ হলে পর ঈশ্বর নিজেই যা করার করবেন। অর্থাৎ—খেল খতম !'

'বুঝলাম। আমাদের কাজ শেষ হওয়া মানে পৃথিবীর কাজও খতম !'

চাক্ একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, 'আমি ঠিক সেই কথাটাই বলেছিলাম লামাকে। কিন্তু তার ফল কী হল জানো ? উনি আমার দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে বললেন—'ব্যাপারটাকে অত হালকাভাবে নিও না।'

জর্জ একটুক্ষণ চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু এ ব্যাপারে কী করা উচিত, সেটা তো বুঝতে পারছি না। অবিশ্যি সেভাবে দেখতে গেলে যাই করি না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। এরা যে বদ্ধ পাগল, সে তো জানাই আছে।'

'কিন্তু একটা জিনিস ভেবে দেখো জর্জ—তালিকা শেষ হওয়ার পর যদি কিছু না ঘটে, পৃথিবী যেমন আছে তেমনই থেকে যায়, তা হলে দোষটা আমাদের ঘাড়ে পড়বে না তো ? আমাদেরই যন্ত্র তো কাজটা করছে ! ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই ভাল লাগছে না।'

'কথাটা খুব ভুল বলোনি', জর্জ গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল। 'কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার তো আগেও ঘটেছে। লুইসিয়্যানায় আমাদের ছেলেবেলায় এক ছিটগ্রস্ত পাদরি হঠাৎ একদিন বলে বসলেন—আসছে রবিবার পৃথিবীর শেষ দিন। বহু লোক তাঁর কথা বিশ্বাস করল। এমনকী, সেই বিশ্বাসে তাদের ঘরবাড়ি সব বিক্রি করে দিল। শেষটায় যখন কিছুই হল না, তখন কিন্তু তারা এই নিয়ে কোনওরকম মাতামাতি করল না। তারা ধরে নিল, পাদরির হিসেবে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। আসলে ঘটনাটা ঘটবে ঠিকই, কিন্তু পরে।'

'যাই হোক, এটা যে লুইসিয়্যানা নয়, সে খেয়াল আশা করি তোমার আছে। এখানে কেবল আমরা দু'জন শ্বেতাঙ্গ, বাকি হল তিব্বতি সাধকদের বিরাট দল। এঁরা লোক ভালই এবং সত্যিই যদি লামার ভবিষ্যদ্বাণী না ফলে, তা হলে আমার ওঁর জন্য একটু কষ্টই হবে। কিন্তু তাও বলছি, এ সময়টা এখানে না থেকে অন্য কোথাও থাকলে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করতাম।'

'সে-কথাটা আমার কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমরা যে চুক্তি সই করেছি ! আর আমাদের ফেরত যাবার প্লেন না আসা পর্যন্ত তো আমরা কিছুই করতে পারছি না।'

চাক্ চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল। তারপর প্রায় আপনমনেই বলল, 'অবিশ্যি আমরা ব্যাপারটা ভণ্ডুল করে দিতে পারি।'

'খেপেছ ? ওতে আরও বিপদ।'

'আমি যেভাবে ভাবছি, তাতে বিপদ নেই। শোনো। মেশিন চলবে আর চারদিন—দিনে চব্বিশ ঘণ্টা করে। আমাদের প্লেন আসবে এক হপ্তা পরে। বেশ। এখন ধরো যদি এর মধ্যে যন্ত্রে কোনও গণ্ডগোল হয়, দু'দিন কাজ বন্ধ থাকে। গণ্ডগোল আমরা শুধরিয়ে দেব ঠিকই ; কিন্তু সেটা করব একেবারে শেষ মুহূর্তে। আমরাও প্লেনে উঠব, আর ঈশ্বরের শেষ নামটিও উঠবে তালিকায়। তখন আমরা লামাদের আওতার বাইরে।'

'ব্যাপারটা আমার মনঃপূত হচ্ছে না', মাথা নেড়ে বলল জর্জ। 'এ ধরনের কারচুপি আমার ধাতে নেই ভায়া। তা ছাড়া এতে ওদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। নাঃ, যেমন চলছে চলুক, তাতে যা হওয়ার হবে।'

সাতদিন পরে খচ্চরের পিঠে চড়ে প্যাঁচানো রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে জর্জ বলল, 'আমার এখনও ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। এটা ভেবো না যে, আমি ভয় পেয়েছি বলে পালাচ্ছি। আমার ওই

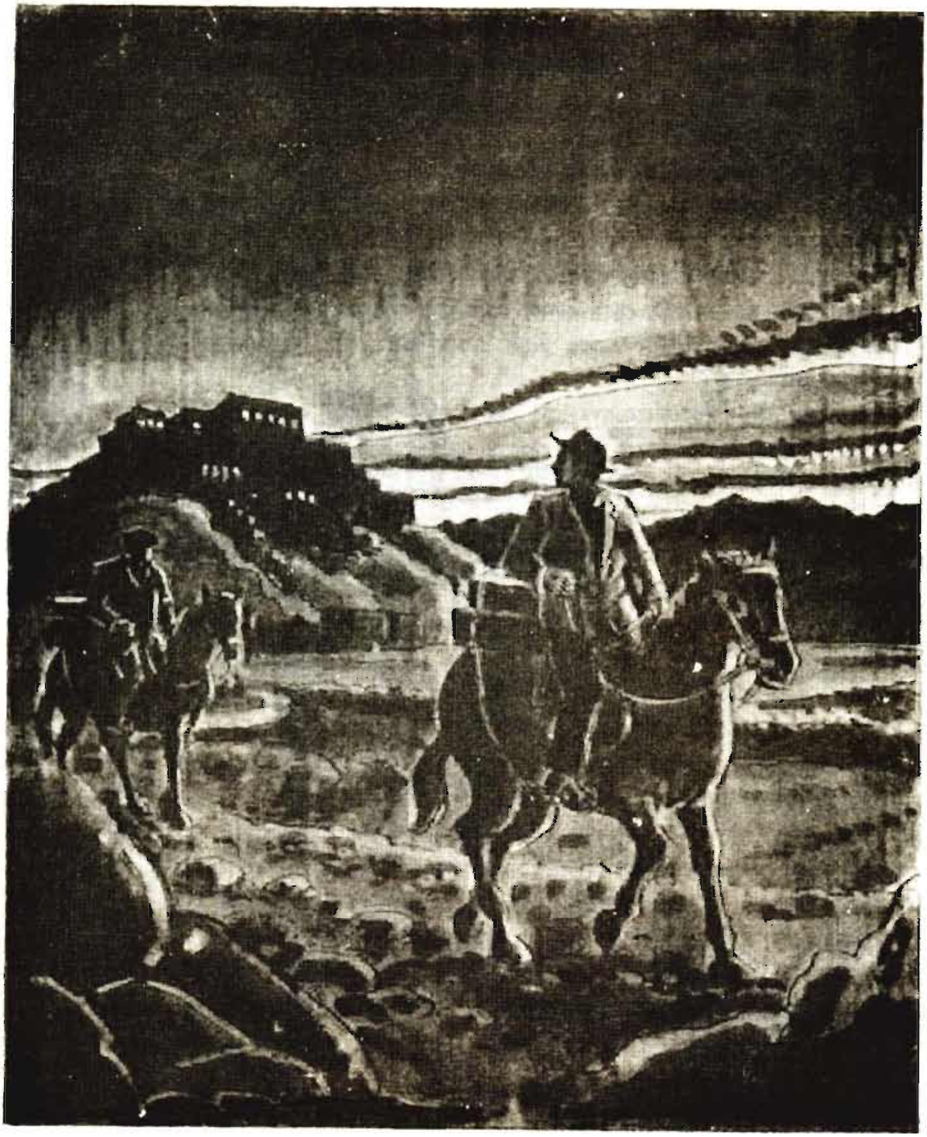

বুড়ো লামাগুলোর জন্য মমতা হচ্ছে। তারা যখন দেখবে যে, তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলল না, তখন তাদের অবস্থা কী হয়, সেটা আমি দেখতে চাই না। আর আমাদের হেড লামার যে কী প্রতিক্রিয়া হবে, কে জানে।'

চাক্ বলল, 'আশ্চর্য। —ওঁকে যখন গুডবাই করলাম, তখন কেন যেন মনে হল যে, উনি আমাদের মনের কথা সব জানেন, কিন্তু তাই নিয়ে কোনও উদ্বেগ বোধ করছেন না, কারণ মেশিন আবার ঠিকমতো চলছে, আর কাজও অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর—অবিশ্যি ওঁর মতে তারপর বলে আর কিছু নেই।'

জর্জ ঘোড়ার পিঠে উলটোমুখে ঘুরে পাহাড়ের দিকে চাইল। এর পরে মোড় ঘুরে আর গুম্ফাটাকে দেখা যাবে না। সূর্যাস্ত হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। আকাশের শেষ রঙের সামনে বিরাটাকৃতি গুম্ফাটাকে দেখা যাচ্ছে। কালো প্রাসাদের গায়ে এখন সেখানে জানলার ভিতরে আলো, যেমন দেখা

যায় সমুদ্রগামী জাহাজের গায়ে পোর্টহোলের ভিতরে। ওগুলো সবই জেনারেটর চালিত বৈদ্যুতিক আলো, এবং একই জেনারেটরে চলছে কম্পিউটার। আর কতক্ষণ চলবে যন্ত্র ? ভবিষ্যদ্বাণী না ফললে লামারা কি তাদের আক্রোশ প্রকাশ করবে ওই যন্ত্রকে ধ্বংস করে ? না কি তারা আবার নিরুদ্বেগে শুরু করবে তাদের হিসাব ?

গুম্ফায় ঠিক এই মুহূর্তে কী হচ্ছে সেটা অবিশ্যি জর্জের জানতে বাকি নেই। লামাপ্রবর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে যন্ত্রটার কাছে বসে আছেন। অপেক্ষাকৃত কম-বয়স্করা তাঁদের সামনে এনে হাজির করছে যন্ত্র থেকে নতুন বেরিয়ে-আসা নামের তালিকা। লামারা নামগুলোর উপর চোখ বোলাচ্ছেন, তারপর সেগুলো কেটে কেটে খাতায় সেঁটে ফেলছেন। কারও মুখে কোনও কথা নেই, একমাত্র শব্দ হচ্ছে যান্ত্রিক টাইপরাইটারের, কারণ মার্ক-৫ কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে হাজার হিসাবের কাজ করে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। জর্জ ও চাক্ তিন মাস ধরে এই কাজ দেখেছে। তাদের যে মাথা খারাপ হয়ে যায়নি, এটা পরম ভাগ্যি।

'ওই দেখো', বলে উঠল চাক্ সামনের উপত্যকার দিকে হাত বাড়িয়ে। 'আহা, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে বলো তো !'

জর্জ মনে মনে ভাবল—সত্যিই সুন্দর। পুরনো ডি-সি-থ্রি বিমানটা রানওয়ের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি রুপালি ক্রুশের মতো। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ওদের দু'জনকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সভ্য জগতে, যেখানে তারা পাবে মুক্তি। উৎকৃষ্ট সুরাপানে যে আনন্দ হয়, চিন্তাটা মাথায় আসতে জর্জ সেই আনন্দ অনুভব করল।

হিমালয়ের হঠাৎ-রাত্রি এখনই তাদের গ্রাস করবে। তবে সৌভাগ্যক্রমে রাস্তা ভাল, আর দু'জনের কাছেই রয়েছে টর্চ। একমাত্র যদি না শীত হঠাৎ বেড়ে গিয়ে অস্বস্তির কোনও কারণ ঘটায়, এ ছাড়া কোনও চিন্তা নেই। মাথার উপরে মেঘমুক্ত আকাশে অগণিত অতি পরিচিত নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। জর্জের একমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল যে, প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য হয়তো প্লেন না উড়তে পারে ; কিন্তু এখন সে দুশ্চিন্তাও দূর হয়েছে।

জর্জের গলা দিয়ে গান বেরিয়ে এল ; তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। পর্বত পরিবেষ্টিত এই বিশাল প্রান্তরে গানটা যেন কিঞ্চিৎ বেমানান। সে রিস্টওয়াচের দিকে চাইল।

'আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত', সে চেঁচিয়ে জানাল পিছনে চাক্-এর উদ্দেশে। তারপর আরও কতগুলো কথা সে জুড়ে দিল। 'কম্পিউটারের কাজ শেষ হল কিনা কে জানে। এখনই তো হওয়ার কথা।'

চাক্-এর কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে জর্জ উলটোমুখে ঘুরল। সে দেখল ঘোড়ার পিঠে চাক্‌কে—তার দৃষ্টি আকাশের দিকে।

'ওপরে চেয়ে দেখো', বলল চাক্।

জর্জ চাইল —হয়তো শেষবারের মতো।

মাথার উপরে সন্ধ্যার আকাশ থেকে নির্বিবাদে একটি একটি করে তারা মুছে যাচ্ছে।

দি নাইন বিলিয়ন নেমস্ অফ গড
সন্দেশ, কার্তিক ১৩৯১

আর্থার কনান ডয়েল

ইহুদির কবচ

॥ ১ ॥

প্রাচ্যের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে আমার বিশিষ্ট বন্ধু ওয়র্ড মর্টিমারের জ্ঞান ছিল অসামান্য। সে এ বিষয়ে বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছিল, মিশরের ভ্যালি অফ দ্য কিংস-এ খননকার্য তদারকের সময় একটানা দু' বছর থিবিসের একটি সমাধিগৃহে বাস করেছিল, আর যে কাজটা করে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল, সেটা হল ফাইলিতে হোরাসের মন্দিরের একটি ভিতরের ঘরে ক্লিওপ্যাট্রার মমি আবিষ্কার। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে যে লোক এত কিছু করতে পেরেছে, তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হতে বাধ্য, সেটা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করত। তাই মর্টিমার যখন বেলমোর স্ট্রিট মিউজিয়মের তত্ত্বাবধায়কের কাজটা পেল, তখন কেউই বিশেষ অবাক হয়নি। এই পদ যিনি পাবেন, তিনি সেইসঙ্গে ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যাপকের পদেও অধিষ্ঠিত হবেন, এবং তার ফলে তাঁর মাসিক রোজগার যা হবে, তাতে সচ্ছল জীবনযাত্রার সঙ্গে গবেষণার কাজও চালানো যায়।

শুধু একটা কারণেই ওয়র্ড মর্টিমার কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করছিল। সেটা হল, যে-তত্ত্বাবধায়কের স্থান সে দখল করেছিল, তাঁর অতুল খ্যাতি। প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াসের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, এবং খ্যাতি সারা ইউরোপ জোড়া। দেশ-বিদেশ থেকে তরুণ ছাত্ররা আসত তাঁর বক্তৃতা শুনতে। তা ছাড়া মিউজিয়মের মহামূল্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা করেছিলেন, সকলেই একবাক্যে তার প্রশংসা করত। ফলে পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি হঠাৎ এমন একটি চাকরি ছেড়ে দেওয়াতে সকলেই বেশ অবাক হয়েছিল। ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্ড্রিয়াস স্বভাবতই তাঁর মেয়েকে নিয়ে মিউজিয়ম-সংলগ্ন তাঁর বাসস্থান ত্যাগ করে চলে যান, আর তাঁর ঘরগুলি দখল করে আমার অকৃতদার বন্ধু ওয়র্ড মর্টিমার। চাকরিটা পাবার কয়েকদিনের মধ্যেই মর্টিমারকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানালেন প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াস। যেদিন প্রথম এই দু'জনের পরিচয় হয় পরস্পরের সঙ্গে, সেদিন আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। অ্যান্ড্রিয়াস সেদিন তাঁর সংগ্রহশালার আশ্চর্য জিনিসগুলি আমাদের দেখালেন। প্রোফেসরের সুন্দরী মেয়ে এবং উইলসন নামে একটি যুবক (বোঝাই যাচ্ছিল ইনি অধ্যাপক-দুহিতার পাণিপ্রার্থী) আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সংগ্রহশালায় সবসুদ্ধ পনেরোটি ঘর ; তার মধ্যে ব্যাবিলন ও সিরিয়ার সভ্যতা সংক্রান্ত দুটি, আর সংগ্রহশালার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত প্রাচীন মিশরীয় ও ইহুদি সভ্যতা সংক্রান্ত একটি ঘরই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াস এমনিতে চুপচাপ মানুষ, কিন্তু তাঁর সংগ্রহের প্রিয় জিনিসগুলি দেখাবার সময় তাঁর শ্মশ্রুগুম্ফহীন শুকনো মুখখানা উৎসাহে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পুরাতত্ত্বের এই মহামূল্য নিদর্শনগুলির উপর থেকে তাঁর হাত যেন আর সরতে চায় না। বেশ বোঝা যায় সেগুলি তাঁর গর্বের বস্তু, এবং সেগুলি অন্যের আওতায় চলে যাওয়াটা যেন তাঁর পক্ষে এক মর্মান্তিক ঘটনা।

তাঁর সংগ্রহশালার মমিগুলি, তাঁর প্রাচীন পুঁথির সম্ভার, তাঁর স্ক্যারাবের সংগ্রহ, ইহুদি সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শন, আর টাইটাস কর্তৃক রোম শহরে আনা বিখ্যাত সপ্তপ্রদীপের অবিকল প্রতিরূপ (আসলটি টাইবার নদীগর্ভে নিমজ্জিত)—এ সবই একের পর এক আমাদের দেখালেন প্রোফেসর

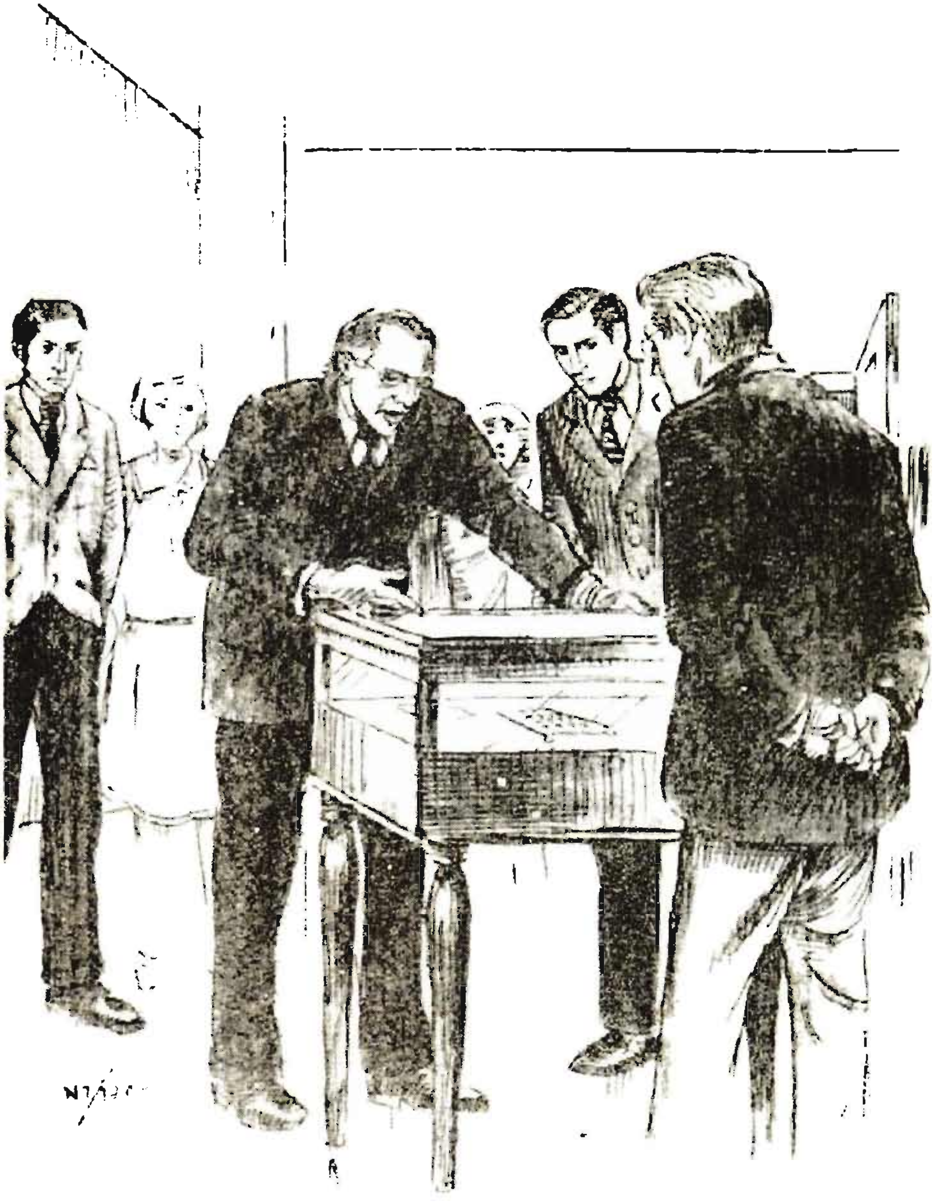

অ্যাড্রিয়াস। তারপর তিনি হলঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা একটি শো-কেসের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে তার উপর ঝুঁকে পড়লেন।

'আপনার মতো বিশেষজ্ঞের পক্ষে এ জিনিসটা হয়তো তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়', মর্টিমারকে উদ্দেশ করে বললেন প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াস, 'কিন্তু আপনার বন্ধু মিঃ জ্যাকসনের পক্ষে হওয়া উচিত।'

এবার আমিও কাচের আবরণের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, কেসের ভিতর রাখা রয়েছে হাতের তেলোর মতো বড় সূক্ষ্ম কারুকার্য করা একটি চতুষ্কোণ সোনার পাত, যার উপর তিন সারিতে চারটি-চারটি করে পাথর বসানো। পাতটির একদিকে দুই কোণে দুটি সোনার আংটা। সমান

আয়তনের পাথরগুলো প্রত্যেকটি আলাদা জাতের এবং রঙের। রঙের বাক্সে পাশাপাশি খোপে খোপে যেমন বিভিন্ন রঙ সাজানো থাকে, এ যেন কতকটা সেইরকম। এও দেখলাম যে, প্রত্যেকটি পাথরের উপর একটি করে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন খোদাই করা আছে।

'মিঃ জ্যাকসন, আপনি কি উরিম ও থুমিমের কথা জানেন ?'

'নামগুলো আমার চেনা, কিন্তু তাদের মানে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না।'

প্রোফেসর বললেন, 'ইহুদিদের প্রধান পুরোহিতের বুকে যে কবচটা ঝুলত, তাকেই বলা হত উরিম ও থুমিম। ইহুদিরা এই কবচের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করত, যেমন রোমানরা করত ক্যাপিটলে রাখা সিবিলাইন পুঁথিগুলির প্রতি। সাংকেতিক চিহ্ন-আঁকা বারোটি মহামূল্য রত্ন দেখতে পাচ্ছেন। উপরে বাঁ দিক থেকে শুরু করে পাথরগুলি হল কার্নেলিয়ান, পেরিডট, এমারেল্ড, রুবি, ল্যাপিস ল্যাজুলি, অনিক্স, অ্যাগেট, অ্যামেথিস্ট, টোপ্যাজ, বেরিল আর জ্যাসপার।'

আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম মণিমুক্তোখচিত মহামূল্য কবচটার দিকে। শেষে প্রশ্ন করলাম, 'এই কবচের সঙ্গে কি কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত আছে ?'

'জিনিসটা যে অতি প্রাচীন এবং অতি মূল্যবান, তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বললেন, প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াস। 'অকাট্য প্রমাণ না থাকলেও আমরা নানা কারণে বিশ্বাস করি যে, এটা সেই সলোমনের মন্দিরের আদি ও অকৃত্রিম উরিম ও থুমিম। এ জিনিস ইউরোপের কোনও মিউজিয়মে নেই। আমার তরুণ বন্ধু ক্যাপ্টেন উইলসন মণিমুক্তো সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। উনিই বলবেন এই পাথরগুলো কত খাঁটি।'

তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক্যাপ্টেন উইলসন দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর ভাবী পত্নীর পাশেই। অল্প কথায় তিনি তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করলেন।

'সত্যি কথা। আমি এর চেয়ে ভাল পাথর আর দেখিনি।'

'স্বর্ণকারের কাজও দেখার মতো', বললেন অ্যান্ড্রিয়াস। 'অতীতে স্বর্ণকারেরা—'

প্রোফেসরের কথার উপর কথা চাপিয়ে উইলসন বললেন, 'ওর চেয়ে ভাল সোনার কাজের নিদর্শন দেখা যাবে এই মোমবাতিদানে।' তাঁর দৃষ্টি এখন অন্য একটি টেবিলের দিকে। আমরা সকলেই শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট সোনার বাতিদানটার আশ্চর্য কারুকার্যের প্রশংসায় উইলসনের সঙ্গে গলা মেলালাম।

অ্যান্ড্রিয়াসের মতো বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে এইসব আশ্চর্য জিনিস দেখা পরম সৌভাগ্যের কথা। সত্যি বলতে কি, সবকিছু দেখা শেষ হলে পর প্রোফেসর যখন আমার বন্ধুকে জানালেন যে, এখন থেকে এ সবই তার জিম্মায় চলে যাচ্ছে, তখন ভদ্রলোকের জন্য বেশ কষ্টই হচ্ছিল, আর সেইসঙ্গে আমার বন্ধুর সৌভাগ্যকে খানিকটা ঈর্ষার চোখে না দেখে পারছিলাম না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ওয়র্ড মর্টিমার বেলমোর স্ট্রিট মিউজিয়মের অধিকর্তা হিসাবে তার নতুন বাসস্থানে উঠে গেল।

এর দিন পনেরো পর মর্টিমার তার জনা-ছয়েক অকৃতদার বন্ধুদের সঙ্গে তার নতুন বাড়িতে একটা ভোজের আয়োজন করল। শেষে যখন সবাই যাবার জন্য উঠে পড়েছে, তখন মর্টিমার আমার কোটের আস্তিন ধরে একটা ছোট্ট টান দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে, সে চায় আমি আর একটুক্ষণ থাকি।

'তোমার বাড়ি তো এখান থেকে দশ-পা', বলল মর্টিমার (আমি তখন অ্যালব্যানিতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি)—'তুমি একটু থেকে যাও। চুরুট সহযোগে দুজনে নিরিবিলি কথা হবে। একটা ব্যাপারে তোমার পরামর্শের দরকার।'

অগত্যা আমি একটি আরাম কেদারায় বসে মর্টিমারের একটি উৎকৃষ্ট 'ম্যাট্রোনাস' চুরুট ধরালাম। সবাই চলে যাবার পরে সে পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে আমার সামনে বসল।

'এই নামবিহীন চিঠিটা আজই সকালে এসেছে,' বলল মর্টিমার। 'আমি পড়ে শোনাচ্ছি, তারপর তুমি বলো এ ব্যাপারে আমার কী কর্তব্য।'

'বেশ তো— আমার সাধ্যমতো পরামর্শ দিতে আমি প্রস্তুত।'

'চিঠিটা হচ্ছে এই— "মহাশয়, আপনার জিম্মায় যে সমস্ত মহামূল্য সম্পদ রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে আপনাকে বিশেষ সাবধান হতে বলি। বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী একটিমাত্র পাহারাদারে কাজ

হবে বলে আমি মনে করি না। আপনি এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে অপূরণীয় ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে।"'

'এই কি পুরো চিঠি ?'

'হ্যাঁ।'

'অন্তত এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, তোমাদের ওখানে রাত্রে যে একটিমাত্র পাহারাদার থাকে, সে-খবরটা মুষ্টিমেয় যে ক'জন জানে, তাদেরই একজন লিখেছে এ চিঠি।'

মর্টিমার এবার একটা রহস্যজনক হাসি হেসে চিঠিটা আমার হাতে দিল।

'হস্তলিপি ব্যাপারটা নিয়ে তুমি কোনও চর্চা করেছ ?' প্রশ্নটা করে মর্টিমার আর-একটা চিঠি আমার সামনে রেখে বলল, 'এটার "কনগ্র্যাচুলেটে" "সি"-এর সঙ্গে ওটার "কমিটেড"-এর "সি" মিলিয়ে দেখো। ক্যাপিটাল "আই"-টাও লক্ষ করো, আর ফুলস্টপের জায়গায় ড্যাশ-চিহ্ন ব্যবহার করাটা।'

আমি বললাম, 'দুটো চিঠি নিঃসন্দেহে একই লোকের লেখা, যদিও প্রথমটায় হাতের লেখা গোপন করার একটা প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে।'

'দ্বিতীয় চিঠিটা হচ্ছে আমার এই নতুন চাকরিটা পাবার খবর পেয়ে প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াসের অভিনন্দন পত্র।'

আমি অবাক হয়ে চাইলাম মর্টিমারের দিকে, তারপর দ্বিতীয় চিঠিটা ওলটাতেই 'মার্টিন অ্যান্ড্রিয়াস'

সইটা চোখে পড়ল। যে লোক হাতের লেখা নিয়ে সামান্যতম চর্চাও করেছে, তার মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াসই মিউজিয়মের সদ্য-ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ককে চুরির ব্যাপারে সাবধান হতে বলে এই নামহীন চিঠিটা লিখেছেন। ঘটনাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

'কিন্তু ভদ্রলোক এমন চিঠি লিখবেন কেন ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ঠিক এই প্রশ্নই আমি করতে চাই তোমাকে। তাঁর মনে যদি এ-ধরনের আশঙ্কা থেকেই থাকে, তা হলে তো তিনি নিজে এসে আমাকে বলতে পারতেন।'

'তুমি কি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাও ?'

'সেখানেও তো গণ্ডগোল। উনি তো সোজাসুজি অস্বীকার করতে পারেন যে, চিঠিটা উনি লেখেননি।'

'যাই হোক— এ চিঠির উদ্দেশ্য যে সৎ, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। উনি যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেটা মানতে কোনও বাধা আছে কি ? এখন যে ব্যবস্থা চালু আছে, সেটা কি সতর্কতার দিক দিয়ে যথেষ্ট ?'

'আমার তো তাই বিশ্বাস। দর্শকদের জন্য মিউজিয়ম খোলা থাকে দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। সেই সময়টা পাশাপাশি দুটো ঘরের জন্য একটি করে গার্ড মোতায়েন থাকে। দুটো ঘরের মাঝখানে যে দরজা— সেখানে দাঁড়ায় গার্ড, ফলে একসঙ্গে দুটো ঘরেই সে চোখ রাখতে পারে।'

'কিন্তু রাত্রে ?'

'পাঁচটার পর লোহার গেটগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে গেট খোলার সাধ্যি কোনও চোরের নেই। যে পাহারা দেয়, সে অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক। সে তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সারা মিউজিয়মটা টহল দেয়। প্রত্যেকটি ঘরে একটি করে বিজলিবাতি সারারাত জ্বলে।'

'তা হলে একমাত্র উপায় হচ্ছে গার্ডগুলিকে রাত্রেও রেখে দেওয়া।'

'সেটা খরচে পোষাবে না।'

'অন্তত পুলিশে খবর দিয়ে বলো যে, বেলমোর স্ট্রিটে তারা যেন একটি বিশেষ কনস্টেবলের ব্যবস্থা করে। এই চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি যদি তাঁর পরিচয় গোপন করতে চান, তা হলে কিছু বলার নেই। কেন তিনি এটা চাইছেন, সেটা আশা করি এর পর কী ঘটে তার থেকেই বোঝা যাবে।'

এর পর অবিশ্যি এ বিষয়ে আলোচনা করার আর কিছু রইল না। আমি বাড়ি ফেরার পর সারারাত মাথা ঘামিয়েও প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াসের চিঠির পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা কী, সেটা বুঝতে পারলাম না। এ চিঠি যে তাঁরই লেখা সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মিউজিয়মে যে চোরের উপদ্রব হতে পারে, সেটা তিনি আঁচ করেছিলেন ; সেই কারণেই কি তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন ? কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে সরাসরি মর্টিমারকে সতর্ক করলেন না কেন ? আমি অনেক ভেবেও রহস্যের কিনারা করতে না পেরে শেষরাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, ফলে আমার উঠতেও দেরি হয়ে গেল।

ঘুমটা ভাঙলও আশ্চর্যভাবে। ন'টা নাগাদ মর্টিমার হন্তদন্ত হয়ে এসে আমার দরজায় টোকা মেরে ঘরে ঢুকল। তার চাহনিতে গভীর উদ্বেগ। এমনিতে পোশাক-আশাকের ব্যাপারে মর্টিমার খুব পরিপাটি। কিন্তু আজ দেখি তার শার্টের কলার প্রায় খুলে এসেছে, গলার টাই আর মাথার টুপিরও প্রায় সেই দশা। তার সন্ত্রস্ত দৃষ্টি থেকে মোটামুটি বোঝা যায় কী ঘটেছে।

আমি তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বললাম, 'মিউজিয়মে চোর এসেছিল বুঝি ?'

'ঠিকই ধরেছ। সেই পাথরগুলো— উরিম আর থুমিমের সেই অমূল্য পাথরগুলো !' দৌড়ে আসার ফলে মর্টিমার হাঁফাচ্ছে। 'আমি চললাম থানায়। তুমি যত শিগগির পারো চলে এসো জ্যাকসন— গুড বাই !'

উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মর্টিমার, আর পরক্ষণেই শুনলাম তার দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নামার শব্দ।

আমি ওর কথামতো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিউজিয়মে পৌঁছে দেখি, মর্টিমার এর মধ্যেই একটি

ইন্‌স্পেক্টর ও আর একটি ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছে। ভদ্রলোকটি হলেন মিঃ পার্ভিস— বিখ্যাত হীরক ব্যবসায়ী মবসন অ্যাণ্ড কোং-এর একজন অংশীদার। নামকরা জহুরি হিসাবে ইনি পাথর চুরির ব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত। ইহুদির কবচটা যে শো-কেসের মধ্যে ছিল, সেটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনজন। কবচটা এখন বাইরে বার করে কাচের আচ্ছাদনটার উপর রাখা হয়েছে, আর তিনজনে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেটাকে পরীক্ষা করছে।

'কবচটার উপর যে মানুষের হাত পড়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই', বলল মর্টিমার। 'আজ সকালে এটার দিকে চোখ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সন্দেহ হয়। কাল রাত্রেও আমি এটা দেখেছি, তখন ঠিকই ছিল। অর্থাৎ কুকীর্তিটা হয়েছে মাঝরাত্রে।'

মর্টিমার ঠিকই বলেছে; কবচটা নিয়ে কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। প্রথম সারির চারটে পাথরকে ঘিরে সোনার উপর ক্ষতচিহ্ন। পাথরগুলো তাদের জায়গাতেই রয়েছে; ক্ষতি যা হয়েছে, সেটা সোনার সূক্ষ্ম কারুকার্যে— যার সৌন্দর্যের তারিফ আমরা এই ক'দিন আগেই করেছি।

ইনস্পেক্টর সাহেব বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে, কেউ যেন পাথরগুলোকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল।'

মর্টিমার বলল, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, শুধু চেষ্টাই করেনি, কৃতকার্যও হয়েছিল। আমার ধারণা, প্রথম সারির চারটে পাথরই নকল, যদিও চোখে দেখে ধরার উপায় নেই।'

জহুরি মশাইয়েরও মনে হয়তো একই সন্দেহের উদয় হয়েছিল, কারণ তিনি এখন আতশ কাচের সাহায্যে অতি মনোযোগের সঙ্গে পাথরগুলো যাচাই করছেন। কাচের সাহায্য ছাড়াও নানাভাবে সেগুলোকে পরীক্ষা করে অবশেষে মর্টিমারের দিকে চেয়ে একগাল হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার কপাল ভাল। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, প্রথম সারির চারটে পাথরই খাঁটি। এত নিখুঁত পাথর সচরাচর দেখা যায় না।'

আমার বন্ধুর মুখ থেকে ফ্যাকাশে ভাবটা চলে গেল। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘যাক, বাবা !— কিন্তু তা হলে চোরের উদ্দেশ্যটা ছিল কী ?’

‘হয়তো পাথরগুলো নেওয়ার মতলবেই এসেছিল, কিন্তু সে-কাজে বাধা পড়ে।’

‘কিন্তু নেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হবে, তা হলে তো একটা একটা করে খুলে নেওয়া উচিত। এখানে দেখছি চারটে পাথরকেই আলগা করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু একটাকেও নেওয়া হয়নি।’

‘ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক’, বললেন ইনস্পেক্টর সাহেব। ‘ঠিক এরকম ঘটনা আর একটাও মনে পড়ছে না। চলুন, একবার পাহারাদারের সঙ্গে কথা বলা যাক।’

প্রহরীকে ডেকে আনানো হল। মজবুত, মিলিটারি গড়ন, চেহারায় সততার ছাপ, গত রাত্রের ঘটনায় সে তার মনিবের মতোই বিচলিত।

‘না স্যার, আমি কোনও আওয়াজ পাইনি।’ ইনস্পেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল। ‘আমি যেমন রোজ করি, তেমনই কাল রাত্রেও তিনবার টহল দিয়েছি, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু দেখিনি। আমি গত দশ বছর এই কাজ করছি ; এমন ঘটনা আমার আমলে এর আগে কখনও ঘটেনি।’

‘কোনও জানলা দিয়ে চোর ঢুকতে পারে কি ?’

‘অসম্ভব স্যার !’

‘তোমার ঘরের সামনে দিয়ে কেউ গিয়ে থাকতে পারে ?’

‘না স্যার। টহল দেবার সময়টুকু ছাড়া আমি সারাক্ষণ আমার ঘরের বাইরে বসে থাকি।’

‘মিউজিয়মে ঢোকার আর কী পথ আছে ?’

‘মিঃ মর্টিমারের কোয়ার্টার্সের একটা প্রাইভেট দরজা দিয়ে মিউজিয়মে ঢোকা যায়।’

‘সে দরজা রাত্রে চাবি দিয়ে বন্ধ থাকে’, বলল মর্টিমার। ‘আর সেটায় পৌঁছতে হলে আগে মিউজিয়মের সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়।’

‘আপনার চাকর-বাকর ?’

‘তাদের থাকবার জায়গা একেবারে আলাদা।’

‘ব্যাপারটা বেশ ঘোলাটে, তাতে সন্দেহ নেই’—বললেন ইনস্পেক্টর। ‘অবিশ্যি মিঃ পার্ভিসের মতে আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি।’

‘আমি শপথ করে বলতে পারি, প্রথম সারির চারটে পাথর একেবারে খাঁটি’, আবার বললেন মিঃ পার্ভিস।

‘তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে, চোরের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কবচটাকে জখম করা’, বললেন ইনস্পেক্টর সাহেব, ‘তা সত্ত্বেও একবার দালানটা ঘুরে দেখায় কোনও ক্ষতি আছে বলে মনে করি না। হয়তো তার ফলে কে এই রহস্যময় চোর, তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।’

সারা সকাল পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানেও কোনও ফল হল না। মিউজিয়মে ঢোকার যে আরও দুটো সম্ভাব্য পথ আছে, সেটা ইনস্পেক্টর সাহেব আমাদের দেখালেন। একটা হল মাটির নীচে সেলারের মাথায় একটা চোরা দরজা, আর দ্বিতীয় হল মাথার উপরে একটি অকেজো জিনিসপত্র রাখার ঘর বা লাম্বার রুমের স্কাইলাইট। এই ঘরের একটা বিশেষ স্কাইলাইট দিয়ে নীচে মিশরীয় ও ইহুদি জিনিসের ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। তবে এই দুটো প্রবেশপথের যে-কোনও একটা ব্যবহার করতে গেলেই চোরকে আগে ঢুকতে হবে দালানের মধ্যে। কিন্তু সে পথ যেহেতু বন্ধ, আর সেলার এবং লাম্বার রুম দুটোতেই যে পরিমাণ ধুলো জমে রয়েছে, এই দুটো প্রবেশপথের কথাই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত কে, কখন, কেন কুকীর্তিটা করেছে সে রহস্যের কোনও কিনারা হল না।

আর একটিমাত্র পথ মর্টিমারের সামনে খোলা আছে, এবং শেষ পর্যন্ত সে সেটাই নিল। পুলিশদের তাদের কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে সে আমাকে অনুরোধ করল সে দিনই বিকেলে তার সঙ্গে প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াসের ওখানে যেতে। যাবার সময় সে সঙ্গে চিঠি দুটো নিয়ে নিল, উদ্দেশ্য, প্রোফেসরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা তিনি কেন নামবিহীন চিঠিটা লিখেছিলেন এবং কী করে তিনি অনুমান করলেন যে, মিউজিয়মে এইরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। আপার নরউডে একটা ছোট বাড়িতে প্রোফেসর থাকেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে বাড়ির এক পরিচারিকার কাছ থেকে জানলাম যে,

প্রোফেসর শহরে নেই। এই খবরে আমরা দু'জনেই খুব হতাশ হয়েছি দেখে পরিচারিকা বললেন, আমরা যদি বৈঠকখানায় গিয়ে বসি, তা হলে তিনি প্রোফেসরের মেয়ের সঙ্গে আমাদের দেখা করিয়ে দেবেন।

আগেই বলেছি যে, অ্যান্ড্রিয়াসের কন্যাটি সুন্দরী। দীর্ঘ ছিমছাম তার গড়ন, মাথার চুল সোনালি, গায়ের রঙ ও মসৃণতা গোলাপের পাপড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সে যখন ঘরে ঢুকল, তখন এই দু'-সপ্তাহে তার কত পরিবর্তন হয়েছে দেখে আমি প্রায় চমকে উঠলাম। তার চাহনিতে গভীর সংশয়ের ছাপ।

'বাবা গেছেন স্কটল্যান্ডে', বললেন মহিলা। 'উনি বড় ক্লান্ত বোধ করছিলেন, তার উপর দুশ্চিন্তারও কারণ ছিল। উনি কালই চলে গেছেন।'

'আপনাকেও যেন ক্লান্ত দেখছি, মিস অ্যান্ড্রিয়াস', বলল আমার বন্ধু।

'সেটা হয়েছে বাবার সম্বন্ধে চিন্তা করেই।'

'ওঁর স্কটল্যান্ডের ঠিকানা আপনার কাছে আছে কি ?'

'হ্যাঁ। উনি রয়েছেন ওঁর ভাই রেভারেন্ড ডেভিড অ্যান্ড্রিয়াসের বাড়িতে। ঠিকানা, এক নম্বর অ্যারাম ভিলা, আরড্রোস্যান।'

মর্টিমার ঠিকানাটা লিখে নেবার পর আমরা আমাদের আসার উদ্দেশ্যটা না জানিয়েই বিদায় নিলাম। সন্ধ্যায় আমরা দু'জনে ঠিক সকালের মতোই আবার বেলমোর স্ট্রিটে মিলিত হলাম। প্রোফেসরের চিঠিই আমাদের একমাত্র ক্লু। মর্টিমার স্থির করেছিল পরদিনই আরড্রোস্যানে গিয়ে প্রোফেসরকে চিঠিটা দেখিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবে, এমন সময় একটা ঘটনার ফলে তার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল।

পরদিন ভোরে আমার দরজায় টোকার শব্দে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দেখি, একটি লোকের হাতে মর্টিমারের একটা চিঠি। সে লিখছে, 'অবিলম্বে চলে এসো। রহস্য আরও জটিল হয়ে উঠেছে।'

আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই মিউজিয়মে পৌঁছে দেখলাম মর্টিমার মাঝের ঘরটায় উদ্বিগ্নভাবে পায়চারি করছে, আর ঘরের একপাশে পল্টনের মতো দাঁড়িয়ে আছেন প্রহরীমশাই।

'ওঃ জ্যাকসন ! তোমায় আমার বিশেষ প্রয়োজন। এ-রহস্যের কূলকিনারা করা আমার কম্ম নয়।'

'আবার কী হল ?'

মর্টিমার কাচের শো-কেসটার দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'যাও, নিজেই দেখো গিয়ে।'

আমি যা দেখলাম, তাতে আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। এবার মাঝের সারির পাথরগুলোর অবস্থাও হুবহু উপরের সারির মতো। বারোটার মধ্যে আটটা পাথরের উপর দুর্বৃত্তের হাত পড়েছে। শেষের সারির পাথরগুলো যেমন ছিল তেমনই আছে।

'পাথরগুলো কি বদলানো হয়েছে ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'না। মাঝের চারটের মধ্যে এমারেল্ডের রঙে সামান্য একটু বৈষম্য ছিল। এখনও সেটা রয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে, উপরের সারির মতো এগুলোও বদলানো হয়নি। আচ্ছা সিম্পসন, তুমি তো বলছ সন্দেহজনক কোনও শব্দ পাওনি।'

'না স্যার', প্রহরী জবাব দিল, 'কিন্তু সকাল হলে পর আমি এই ঘরে এসে কবচটা দেখেই বুঝলাম যে, ওটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ আপনাকে খবর দিই। কিন্তু আমি যতক্ষণ পাহারা দিয়েছি ততক্ষণ কাউকে দেখিনি, কোনও শব্দও পাইনি।'

মর্টিমার আমার দিকে ফিরে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে, একটু ব্রেকফাস্ট করা যাক।' তার ঘরে পৌঁছতেই সে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করল, 'এসব কী ঘটছে বলো তো জ্যাকসন ?'

সত্যি বলতে কি, এমন অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা আমার অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে। আমি বললাম, 'আমার মতে এ কোনও উন্মাদের কীর্তি।'

'এর মধ্যে কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছ না তুমি ?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'এই প্রাচীন কবচটা ইহুদিদের কাছে একটি অতি পবিত্র জিনিস। ধরো, যদি ইহুদি-বিরোধী কোনও দলের কেউ কবচটাকে নষ্ট—'

'না, না, না !' চেঁচিয়ে বলে উঠল মর্টিমার। 'ওটা কোনও কথাই হল না। এমন লোক হয়তো আছে যে কবচটাকে নষ্ট করতে চাইতে পারে, কিন্তু পাথরের চারধারে কুরে কুরে সেগুলোকে আলগা করার চেষ্টা করবে কেন ? এর কারণ খুঁজতে হবে অন্য কোথাও। এখন বলো তো, টহলদার সিম্পসন সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা।'

'ওকে সন্দেহ করার কোনও কারণ আছে কি ?'

'কারণ একমাত্র এই যে, রাত্রে এক সিম্পসন ছাড়া কেউ এ তল্লাটে থাকে না।'

'কিন্তু এমন অর্থহীন ধ্বংসের কাজ সে করবে কেন ? কোনও জিনিস তো চুরি যায়নি।'

'ধরো যদি তার মাথা খারাপ হয়ে থাকে।'

'উঁহুঁ। সিম্পসনের মাথায় কোনও গণ্ডগোল নেই, এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।'

'তুমি নিজে অন্য কাউকে সন্দেহ করো ?'

'তুমিই তো রয়েছ !' আমি হালকা হেসে বললাম। 'ঘুমের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করার ব্যারাম-ট্যারাম আছে নাকি তোমার ?'

'মোটেই না।'

'তা হলে এ রহস্য সমাধানের কাজে আমি ইস্তফা দিলাম।'

'কিন্তু আমি দিচ্ছি না। একটা পন্থা আছে, যার সাহায্যে আমরা এর কিনারা করতে পারব।'

'প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াসের সঙ্গে দেখা করে ?'

'না। স্কটল্যান্ড যাবার দরকার নেই। কী করব সেটা বলছি তোমাকে। ওপরের লাম্বার রুমের একটা স্কাইলাইট দিয়ে মাঝের হলঘরটা দেখা যায়, সেটা তো দেখলে। আমরা হলঘরে বাতি জ্বালিয়ে রেখে ওপরের স্কাইলাইটে চোখ লাগিয়ে বসে থাকব। তুমি আর আমি। দু'জনে একজোটে রহস্যের সমাধান করব। যদি এই রহস্যময় ব্যক্তিটি এক-একদিনে চারটে করে পাথরের উপর কাজ করে, তা হলে সে নিশ্চয়ই আজ রাত্রে আবার এসে শেষ সারির চারটে পাথর নিয়ে পড়বে।'

'উত্তম প্রস্তাব।'

'আমরা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখব। পুলিশ বা সিম্পসন, কাউকেই কিছু বলব না। রাজি ?'

'অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রাজি।'

॥ ২ ॥

রাত দশটা নাগাদ আমি মর্টিমারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। তাকে দেখেই বুঝলাম, সে একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। হাতে সময় আছে, তাই আমরা দু'জনে মর্টিমারের ঘরে বসে ঘণ্টাখানেক ধরে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম। অবশেষে একটা সময় এল, যখন রাস্তায় গাড়িঘোড়া পথচারী ইত্যাদির শব্দ কমে গিয়ে পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়ে এল। প্রায় বারোটার সময় মর্টিমার আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অকেজো জিনিসপত্র রাখার ঘরটাতে।

ইতিমধ্যে দিনের বেলায় একবার ঘরটাতে এসে মর্টিমার আমাদের বসার সুবিধার জন্য মেঝেতে চট বিছিয়ে রেখেছে। স্কাইলাইটের শার্সিগুলো স্বচ্ছ কাচের তৈরি হলেও তার উপর ধুলো পড়ে এমন দশা হয়েছে যে, আমরা নীচের ঘরটা মোটামুটি দেখতে পেলেও, নীচ থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। কাচের উপর দুটো ছোট্ট অংশ থেকে ধুলো মুছে ফেলে সেইখানে আমাদের চোখ লাগানোর ব্যবস্থা করলাম। বিজলি বাতির উজ্জ্বল আলোতে হলঘরের সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এমনকী শো-কেসের ভিতরের জিনিসগুলো পর্যন্ত। ঘরে একপাশে দরজার ধারে দাঁড়-করানো মিশরীয় মমি-কেস থেকে শুরু করে কাচের শো-কেসে রাখা ইহুদির কবচের প্রত্যেকটি ঝলমলে পাথর—সবকিছুই আমরা দেখছি সমান আগ্রহের সঙ্গে। ঘরে মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি। কিন্তু কবচের

উরিম ও থুমিমের বারোটা পাথরের জেল্লা অন্য সব কিছুকে ম্লান করে দিয়েছে। সিকারার সমাধি মন্দিরের ছবি, কার্ণাকের প্রাচীরচিত্র, মেমফিসের ভাস্কর্য, থিবিসের প্রস্তরলিপি— সবই তন্ময় হয়ে দেখার জিনিস ; কিন্তু তা সত্ত্বেও চোখ বারবার চলে যায় কাচের নীচে কবচটার দিকে, আর মন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে ওর রহস্য ভেদ করার জন্য। আমি এই রহস্যের কথাই ভাবছি, এমন সময় আমার বন্ধুটি হঠাৎ নিশ্বাস টেনে আমার কোটের আস্তিনটা সজোরে খামচে ধরল। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম এর কারণ।

হলঘরের দরজার পাশে রাখা মমি-কেসটার কথা আগেই বলেছি। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, দাঁড়-করানো মমি-কেসটার ডালাটা খুলতে শুরু করেছে! খোলার ফলে যে সরু কালো ফাঁকটার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা অতি ধীরে ধীরে চওড়া হচ্ছে। এই খোলার ব্যাপারটা এত সন্তর্পণে ঘটছে যে, ভাল করে না দেখলে চোখে ধরাই পড়ে না। একটু পরেই দেখলাম যে, ফাঁক দিয়ে একটা শীর্ণ হাত বেরিয়ে এসে নকশাদার ডালাটাকে ধরে সেটা আরও সামনে এগিয়ে দিল। তারপর বেরিয়ে এল অন্য হাতটা, আর তারপরেই— একটা মুখ। এ-মুখ আমাদের দু'জনেরই খুব চেনা। ইনি হলেন স্বয়ং প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াস। এবার তাঁর পুরো শরীরটা শবাধার থেকে বেরিয়ে এল, শেয়াল যেমন বেরিয়ে আসে তার গর্ত থেকে। ভদ্রলোকের দৃষ্টি ঘুরছে এদিক-ওদিক, পা-দুটো একবার সামনে এগোচ্ছে, পরমুহূর্তেই থামছে, আবার দৃষ্টি ঘুরছে এদিক-ওদিক, আবার এগোচ্ছে পা। একবার রাস্তা থেকে আসা একটা অস্ফুট শব্দে তিনি থেমে গেলেন, কানখাড়া করে শুনতে লাগলেন, ভাবটা এই, যেন দরকার হলে তৎক্ষণাৎ আবার ফিরে যাবেন তাঁর লুকোনোর জায়গায়। কিন্তু সেটার প্রয়োজন হল না। প্রোফেসর গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে শো-কেসটার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বার করলেন। তারই একটা চাবি দিয়ে খোলা হল শো-কেসের ঢাকনা, বাইরে বেরিয়ে এল ইহুদির কবচ, আর সেটাকে ঢাকনার উপর রেখে একটা ছোট ধাতব যন্ত্র দিয়ে তার উপর কাজ শুরু করলেন প্রোফেসর। আমাদের একেবারে সরাসরি নীচে দাঁড়ানোর ফলে তাঁর ঝুঁকে-পড়া পিঠটা কবচটাকে ঢেকে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর হাত যেভাবে চলছিল তাতে বুঝতেই পারছিলাম, যে-নষ্টামির পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেই একই কাজে তিনি মগ্ন!

আমার বন্ধুর দ্রুত নিশ্বাসের আর আমার হাতের উপর তার হাতের চাপ থেকেই বুঝতে পারছি প্রোফেসরের এই কুকীর্তিতে তার মনে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। অপকর্মের জন্য যে ইনিই দায়ী, সেটা যে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এই সেদিনই ইনি আমাদের কাছে ওই কবচের গুণগান করেছেন, আর আজ ইনিই সেই আশ্চর্য বস্তুটির সর্বনাশ করে চলেছেন! রাতদুপুরে এই কুকীর্তি যে কী অমানুষিক ভণ্ডামির পরিচয় বহন করে এবং তাঁর উত্তরাধিকারীর প্রতি কী পরিমাণ আক্রোশ যে এতে প্রকাশ পাচ্ছে, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কাজটা ভাবতেও যেমন, দেখতেও ঠিক তেমনই পীড়াদায়ক। আমি নিজে এ ব্যাপারে মোটেই বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু তাও এই আশ্চর্য কবচের এহেন দুর্গতি আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল। আমার সঙ্গীটি আমার হাতে একটা টান দিয়ে নিঃশব্দে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। নিজের ঘরে ফিরে আসার পর মর্টিমার মুখ খুলল।

'লোকটা কতবড় শয়তান! এ জিনিস কি স্বপ্নেও ভাবা যায়?'

'ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য।'

'হয় শয়তান, না হয় পাগল। এই দুটোর একটা হতেই হবে। আসল ব্যাপারটা শিগগিরই জানা যাবে। এসো আমার সঙ্গে ; এখনই একটা এস্‌পার ওস্‌পার করা দরকার।'

একটা প্যাসেজের শেষ প্রান্তে একটা দরজা দিয়ে সোজা মিউজিয়মে ঢোকা যায়। এটা একমাত্র তত্ত্বাবধায়কের ব্যবহারের জন্যই তৈরি। মর্টিমারের দেখাদেখি আমিও আগে পায়ের জুতো-জোড়া খুলে ফেললাম। তারপর নিঃশব্দে চাবি দিয়ে দরজাটা খুলে মিউজিয়মে ঢুকে ঘরের পর ঘর পেরিয়ে অবশেষে আসল ঘরে পৌঁছলাম। ভদ্রলোক এখনও তাঁর দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা নিঃশব্দে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছনোর আগেই তিনি আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে ঘুরে একটা চাপা চিৎকার দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'সিম্পসন ! সিম্পসন !' মর্টিমার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলি দরজা পেরিয়ে শেষ দরজার মুখে বৃদ্ধ প্রহরী মশাইকে আবির্ভূত হতে দেখা গেল। প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াসও একই সঙ্গে তাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই তাঁর পিঠে দু' দিক থেকে আমাদের দু'জনের হাত পড়ল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ভদ্রলোক ! 'আমি যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে। আপনার ঘরেই চলুন মিঃ মর্টিমার। জবাবদিহির ব্যাপারটা ওখানেই সারা যাবে।'

মর্টিমার ক্রোধে এত অধীর যে, তার মুখ দিয়ে কথাই বেরোল না। প্রোফেসরকে মাঝখানে রেখে আমরা তিনজন প্রথমে হলঘরে ফিরে এলাম, সিম্পসন আমাদের পিছনে। শো-কেসের উপর ঝুঁকে পড়ে মর্টিমার কাচটা পরীক্ষা করে দেখল। নীচের সারির প্রথম পাথরটা এর মধ্যেই খানিকটা আলগা হয়ে এসেছে। কবচটা হাতে নিয়ে মর্টিমার প্রোফেসরের দিকে ফিরল— তার দৃষ্টি যেন অগ্নিবর্ষণ করছে।

'কী করে পারলেন আপনি, কী করে পারলেন !'

'কাজটা অত্যন্ত ঘৃণ্য আমি জানি,' বললেন প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াস। 'আপনার মনের ভাব আমি বুঝতে পারছি। আমি অনুরোধ করছি, আপনার ঘরে নিয়ে চলুন আমাকে।'

'কিন্তু এটাকে তো এভাবে ফেলে রাখা যায় না', বলল মর্টিমার। তারপর গভীর দরদের সঙ্গে সে কবচটাকে হাতে তুলে নিল। আমরা রওনা দিলাম। প্রোফেসরের পাশে আমি হাঁটছি, যেন পুলিশ চলেছে হাতেনাতে ধরা-পড়া চোরের পাশে। আমরা সোজা মর্টিমারের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। হতভম্ব সিম্পসন বাইরে রয়ে গেল তার নিজের বুদ্ধি দিয়ে ঘটনাটা অনুধাবন করবার জন্য ; প্রোফেসর একটা সোফায় বসলেন। তাঁর শোচনীয় অবস্থা দেখে রাগের পরিবর্তে আমরা দু'জনেই তাঁর সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত বোধ করছিলাম। ব্র্যান্ডি খাবার পর তিনি খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন।

'এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছি,' বললেন ভদ্রলোক। 'গত ক'দিনের ধকল আমাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। আমি আর পেরে উঠছিলাম না। আমার পক্ষে এ এক চরম বিভীষিকা। একদিন যে-মিউজিয়ম আমারই জিম্মায় ছিল, সেই মিউজিয়মের ঘরেই আমাকে ধরা দিতে হল চোরের মতো ! অথচ আপনাকেই বা দোষ দেব কী করে ? আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন। আমি শুধু এটাই চেয়েছিলাম যে, কেউ টের পাবার আগে আমি যেন আমার কাজটা শেষ করতে পারি। সেটা আজ রাত্রেই হয়ে যেত, কিন্তু...'

'আপনি ভিতরে ঢুকলেন কী করে ?' প্রশ্ন করল মর্টিমার।

'আপনি যে দরজা ব্যবহার করেন, সেই দরজা দিয়ে', বললেন প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াস। 'কাজটা অত্যন্ত গর্হিত, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ সৎ। সেখানে কোনও দোষ ধরতে পারবে না কেউ। আসল ঘটনাটা জানলে আপনিও আমাকে আর গাল দেবেন না। আপনার বাসস্থানের দরজার একটা চাবি আর মিউজিয়মে ঢোকার একটা চাবি আমার কাছে ছিল। চাকরি ছাড়ার সময় সেগুলি ফেরত দিইনি। মিউজিয়ম থেকে দর্শকের দল বাইরে বেরোনো মাত্র আমি হলঘরে ঢুকে মমি-কেসটার ভিতর লুকিয়ে পড়তাম। তার পর নিরাপদ বুঝে বেরিয়ে এসে যা করার তা করতাম। যতবার সিম্পসনের পায়ের শব্দ পেতাম, তত বারই আমাকে মমি-কেসের ভিতর আশ্রয় নিতে হত। তারপর কাজ শেষ হলে, যেভাবে ঢুকেছি সেই পথেই বেরিয়ে আসতাম।'

'তার মানে আপনি একটা মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিলেন ?'

'নিতেই হয়েছিল।'

'কিন্তু কেন ? কোন্ উদ্দেশ্যে আপনাকে এরকম একটা জঘন্য কাজ করতে হল ?' পাশেই টেবিলের উপর রাখা কবচটার দিকে হাত দেখিয়ে বলল মর্টিমার।

'এ ছাড়া কোনও রাস্তা ছিল না। অনেক ভেবেও আর কোনও উপায় খুঁজে পাইনি। এ না করলে লোকমুখে আমার বদনাম ছড়িয়ে পড়ত আর সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনেও আমাকে গভীর শোক ভোগ করতে হত। আমি যা করেছি তা মঙ্গলের জন্যই, যদিও আপনার পক্ষে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আমি চাই আমার কথা সত্য প্রমাণ করার সুযোগ আপনি দেবেন।'

'আপনার কী বলার আছে শোনার পর আমি আমার কর্তব্য স্থির করব', দৃঢ়স্বরে বলল মর্টিমার।

'আমি কিছুই গোপন রাখব না, সব কথা অকপটে আপনাকে বলব। তারপর আপনি কী করেন, সেটা আপনার মর্জি।'

'আসল ব্যাপারটা তো আর আমাদের জানতে বাকি নেই।'

'আসল ব্যাপার আপনি কিছুই জানেন না। প্রথমে কয়েক সপ্তাহ আগের একটা ঘটনায় ফিরে যেতে দিন, তারপর আমি সব বুঝিয়ে বলব। এটুকু বিশ্বাস করুন যে, আমি যা বলছি তার মধ্যে একবর্ণ মিথ্যে নেই।

'যে ব্যক্তি ক্যাপ্টেন উইলসন বলে নিজের পরিচয় দেন, তার সঙ্গে আপনাদের আলাপ হয়েছে। আমি এইভাবে বলছি, কারণ আমি এখন জানতে পেরেছি যে, এটা তার আসল পরিচয় নয়। ওর সঙ্গে আমার কী করে আলাপ হল, কী করে সে আমার বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠল, এবং কী করে সে আমার মেয়ের ভালবাসা আদায় করল, এসব বুঝিয়ে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। সে এখানে আসার সময় বিদেশের অনেক জ্ঞানী-গুণীর কাছ থেকে প্রশংসাপত্র নিয়ে এসেছিল ; তাই তাকে আমার আমল দিতে হয়। তা ছাড়া তার নিজেরও যে গুণ নেই, তা নয়। তাই শেষ পর্যন্ত আমি খুশি হয়েই তাকে নিয়মিত আমার বাড়িতে আসতে দিই। যখন জানলাম যে আমার মেয়ে এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট, তখন মনে হয়েছিল যে ঘটনাটা যেন একটু বেশি দ্রুত ঘটে গেল। কিন্তু আমি অবাক হইনি, কারণ উইলসনের স্বভাব আর কথাবার্তায় এমন একটা মাধুর্য ছিল যে, সমাজের উঁচু স্তরে নিজের জন্য একটা জায়গা করে নেওয়া তারপক্ষে ছিল সহজ ব্যাপার।

'প্রাচ্যের প্রাচীন শিল্পবস্তু সম্পর্কে তার উৎসাহ ছিল, এবং এ বিষয়ে জ্ঞানও ছিল যথেষ্ট। অনেক সময় সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে সময় কাটাতে এসে সে আমার অনুমতি নিয়ে মিউজিয়মে গিয়ে একা ঘুরে ঘুরে সব দেখত। বুঝতেই পারছেন, এ ব্যাপারে আমি নিজে উৎসাহী হওয়াতে তার অনুরোধে খুশি হয়েই সম্মত হতাম, আর আমার বাড়িতে তার ঘন ঘন আগমনে কোনও বিস্ময় বোধ করতাম না। এলিজের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়ে যাবার পর প্রায় প্রতি সন্ধ্যা ছেলেটি আমার বাড়িতে কাটাত, এবং তার মধ্যে ঘণ্টাখানেক কাটাত মিউজিয়মে। সেখানে সে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করত। এমনকী আমি যেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি থাকতাম না, সেদিনও সে এসে মিউজিয়মে কিছুটা সময় কাটিয়েছে। এই অবস্থার অবসান হয় তখনই, যখন আমি চাকরি ছেড়ে নরউডে চলে যাই, এবং নানা বিষয় নিয়ে বই লেখার তোড়জোড় শুরু করি।

'চাকরি ছাড়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি যে লোককে নির্দ্বিধায় আপন করে নিয়েছিলাম, তার আসল চেহারাটা বুঝতে পারি। আমার বিদেশি বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া কয়েকটা চিঠি থেকে আমি জানতে পারি যে, যেসব পরিচয়পত্র উইলসন আমাকে দেখিয়েছিল, তার অধিকাংশই জাল। অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, এই ধাপ্পাবাজির পিছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সে যদি অর্থলোভী হয়ে থাকে তা হলে আমাকে দিয়ে তার কোনও কাজ হবে না, কারণ আমি ধনী নই। তা হলে সে এল কেন ? তখন আমার খেয়াল হল যে, পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান পাথরের বেশ কিছু রয়েছে আমার জিম্মায়, এবং নানান অজুহাতে একা মিউজিয়মে গিয়ে সেসব পাথরের কোন্‌টা কোথায় আছে সেটা উইলসন দেখে এসেছে। অর্থাৎ সে হচ্ছে এক অতি ধূর্ত ব্যক্তি, যে আমার মিউজিয়মে চুরির সুযোগ খুঁজছে। এই অবস্থায়, তাকে অন্ধের মতো ভালবাসে আমার যে মেয়ে, তাকে কষ্ট না দিয়ে কী করে আমি উইলসনকে জব্দ করব ? আমি অনেক ভেবে যে-পন্থা স্থির করলাম, সেটা বেয়াড়া তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কার্যকরী কোনও পন্থা আমার মাথায় এল না। আমি যদি আপনাকে নিজের নামে চিঠি লিখতাম, তখন আপনি নিশ্চয়ই আমাকে নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন করতেন— যার উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হত না। তাই আমি নাম ছাড়াই চিঠি লিখে আপনাকে সতর্ক করে দিই।

'আমি বেলমোর স্ট্রিট থেকে নরউড চলে আসার পরেও এই যুবকের আমার বাড়িতে আসা একটুও কমেনি। হয়তো সে সত্যিই আমার মেয়েকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল। আর আমার মেয়ের কথা যদি বলেন, তা হলে আমি এটুকু বলব যে, কোনও মেয়ে যে একজন পুরুষের দ্বারা

এমনভাবে প্রভাবিত হতে পারে, এটা আমি কল্পনা করতে পারিনি। উইলসনের ব্যক্তিত্ব যেন এলিজকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছিল। এটা যে কতদূর সত্যি এবং ওদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা যে কত গভীর, সেটা আমি বুঝতে পারি এক সন্ধ্যায়, আর তখনই উইলসনের আসল রূপটা ধরা পড়ে। সেদিন আমি আগে থেকে হুকুম দিয়ে রেখেছিলাম যে, উইলসন এলে যেন সোজা আমার কাজের ঘরে চলে আসে— বৈঠকখানায় যেন তাকে বসানো না হয়। সে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি সোজাসুজি বলে দিলাম যে, তার স্বরূপ জানতে আর আমার বাকি নেই, আর সেটা জেনেই তার দুরভিসন্ধির পথ আমি বন্ধ করেছি, এবং আমি আর আমার মেয়ে তার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না। সেইসঙ্গে এও বললাম যে, আমার পরম সৌভাগ্য সে মিউজিয়মের মহামূল্য জিনিসগুলোর কোনও ক্ষতি করার আগেই আমি তার আসল পরিচয়টা পেয়ে গেছি।

'ছেলেটির বুকের পাটা যে অসামান্য, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমার কথা সে শেষ পর্যন্ত শুনে কোনও বিস্ময় বা বিরুদ্ধভাব প্রকাশ না করে ঘরের উলটোদিকে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে ডেকে পাঠাল। চাকর এলে পর তাকে বলল, "মিস্ অ্যান্ড্রিয়াসকে গিয়ে বলো, তিনি যেন অনুগ্রহ করে এখানে আসেন।"

'আমার মেয়ে এল। উইলসন এগিয়ে গিয়ে তার হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, "এলিজ, তোমার বাবা এইমাত্র আবিষ্কার করেছেন যে, আমি একটি দুশ্চরিত্র ব্যক্তি— যেটা তুমি আগেই জানতে।"

"এলিজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

' "উনি বলছেন যে আমাদের পরস্পরকে ত্যাগ করতে হবে, চিরকালের জন্য।"

'এলিজ কিন্তু এখনও তার হাত ছাড়িয়ে নেয়নি।

' "তোমার উপর কি আমি ভরসা রাখতে পারি, না কি একমাত্র যে আমাকে সৎপথে চালাতে পারে, সেও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে ?"

' "জন !" আমার মেয়ে গভীর আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, "আমি কোনওদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না। দুনিয়ার সব লোক যদি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তা হলেও না।"

'আমি আমার মেয়েকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনও ফল হল না। সে যেন এই যুবকটির সঙ্গে তার জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। আমার মেয়ে আমার চোখের মণি ; যখন দেখলাম যে তাকে সর্বনাশের হাত থেকে উদ্ধার করার কোনও উপায় নেই, তখন আমার যে কী অবস্থা হল তা বলতে পারি না। আমার অসহায় ভাব দেখে মনে হল উইলসনের কিছুটা দয়া হল। সে বলল, "আপনি যতটা ভাবছেন, অবস্থা ততটা খারাপ নয়। এলিজের প্রতি আমার ভালবাসা এতই গভীর যে, হয়তো সেটাই আমাকে কলঙ্কের হাত থেকে উদ্ধার করবে। আমি কালই ওর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, জীবনে আর কখনও এমন কোনও কাজ করব না যাতে সে কষ্ট পাবে। কথা দিয়ে কথা না রাখার লোক আমি নই।"

'উইলসনের কথায় মনে হল সে যা বলছে সেটা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। কথাটা বলে সে পকেট থেকে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বার করে বলল, "আমি যা বলছি তা যে সত্যি তার প্রমাণ আমি দিতে চাই। এলিজ, আমার উপর তোমার প্রভাব যে মঙ্গলকর সেটা এবার বুঝতে পারবে। প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াস, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন যে আপনার সংগ্রহশালার অমূল্য সম্পদ আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল। যে কাজে লাভের সম্ভাবনার সঙ্গে বিপদের আশঙ্কা জড়িয়ে থাকে, সে কাজের প্রতি চিরকালই আমি একটা আকর্ষণ বোধ করি, তাই ইহুদির কবচের পাথরগুলোকে হাত করার জন্য আমি বদ্ধপরিকর হই।"

"'সেটা আমি অনুমান করেছিলাম।"

"'কিন্তু একটা ব্যাপার আপনি অনুমান করতে পারেন নি।"

"'কী ?"

"'যে সেগুলো হাত করতে আমি সক্ষম হয়েছিলাম। এই বাক্সের মধ্যে রয়েছে সেই পাথরগুলো।"

'এই বলে সে বাক্সটা খুলে আমার ডেস্কের উপর উপুড় করে ধরল। দৃশ্য দেখে আমার হাত-পা হিম হয়ে এল। সংকেত চিহ্ন আঁকা বারোটা মহামূল্য পাথর বেরিয়ে পড়েছে আমার টেবিলের উপর। এগুলোই যে উরিম ও থুমিমের পাথর, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

"'সর্বনাশ!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। "তুমি ধরা না পড়ে এ কুকীর্তি করলে কী করে?"

"আসলের জায়গায় নকল পাথর বসিয়ে", বলল উইলসন, "নকলগুলো এতই নিখুঁত যে, দুইয়ের মধ্যে তফাত করা অসম্ভব।"

"'এখন যে পাথরগুলো কবচে লাগানো রয়েছে, সেগুলো নকল?"

"'হ্যাঁ, এবং বেশ কিছুকাল আগেই ঘটেছে এই ঘটনা।"

'আমরা তিনজন কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মেয়ের মুখ বিবর্ণ হলেও সে তখনও তার হাত ছাড়িয়ে নেয়নি।

'উইলসন এলিজের দিকে ফিরে বলল, "আমার সাধ্যের মাত্রা কতদূর সেটা তো এবার বুঝলে?"

'এলিজ বলল, "এটাও বুঝলাম যে দুষ্কর্ম করেছ, তার জন্য অনুতপ্ত হওয়াটাও তোমার অসাধ্য নয়।"

'"সেটা তোমার প্রভাবের ফল" বলল উইলসন, "আমি পাথরগুলো আপনাকেই দিচ্ছি, প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াস। আপনি এ ব্যাপারে যা করা উচিত মনে করবেন, তাই করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার বিরুদ্ধে কিছু করা মানেই আপনার মেয়ের ভবিষ্যৎ স্বামীর বিরুদ্ধে করা। এলিজ, কিছুদিন পরেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। এর পরে আর কোনওদিন আমার জন্য তোমাকে কষ্টভোগ করতে হবে না।" এই বলে উইলসন প্রস্থান করল।

'আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। অমূল্য পাথরগুলো এখন আমার হাতে, কিন্তু ধরা না পড়ে কী করে সেগুলো যথাস্থানে ফেরত দিই? এটা বুঝতে পারছি যে, আমার মেয়ে যে রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাকে উইলসন-এর হাত থেকে কোনওমতেই রক্ষা করতে পারব না। আর উইলসনের প্রভাব যদি তার উপর সত্যিই মঙ্গলকর হয়, তা হলে তাকে রক্ষা করার প্রশ্নই বা আসবে কেন? উইলসনের মুখোশ খুলে দিলেই বা কী ফল হবে, বিশেষ করে সে যখন আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে?

'আমি অনেক ভেবে একটা রাস্তা বার করলাম, যেটা হয়তো আপনাদের কাছে খুব অবচীন বলে মনে হবে, কিন্তু আমার মতে এ ছাড়া আর কোনও রাস্তা ছিল না। আমি স্থির করলাম, কাউকে জানতে না দিয়ে আমি নিজেই গিয়ে পাথরগুলো যথাস্থানে বসিয়ে দেব। আমার চাবির সাহায্যে আমি যে কোনও সময় মিউজিয়মে ঢুকতে পারি, আর সিম্পসনের গতিবিধি যখন জানা আছে, তখন ধরা পড়ারও কোনও আশঙ্কা নেই। যা করতে যাচ্ছি সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলব না— আমার মেয়েকেও না— এটাও স্থির করলাম। মেয়েকে বললাম, আমি স্কটল্যান্ডে আমার ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি। ক'টা রাত কারুর সন্দেহ উদ্রেক না করে আমি নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারি, এটাই ছিল আমার লক্ষ্য। সেই রাত্রেই হার্ডিং স্ট্রিটে একটা ঘর ভাড়া করলাম। বাড়িওয়ালাকে বললাম আমি খবরের কাগজে কাজ করি, আমাকে রাত্রেও কাজে বাইরে যেতে হতে পারে।

'সেই রাত্রে মিউজিয়মে গিয়ে আমি প্রথম সারির চারটে নকল পাথর খুলে ফেলে আসল পাথর বসিয়ে দিলাম। কাজটা সহজ নয়, এবং সেটা করতে আমার সারারাত লেগে গেল। সিম্পসনের পায়ের শব্দ পেলেই আমি মমি-কেসের মধ্যে লুকিয়ে পড়তাম। স্বর্ণকারের কাজ সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান আছে, কিন্তু উইলসন ছিল আমার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ। সে যেভাবে মেকি পাথরগুলো বসিয়েছিল, তাতে সোনার কারুকার্য একটুও রদবদল হয়নি। কিন্তু আমার ছিল কাঁচা এবং বুড়ো হাতের কাজ। আমি চাইছিলাম যে যে-ক'দিন আমি কাজটা করব, সে-ক'দিন যেন কেউ বেশি মনোযোগ দিয়ে কবচটাকে না দেখে। যাই হোক, একইভাবে দ্বিতীয় রাত্রে দ্বিতীয় সারির পাথরগুলো বসিয়ে ফেললাম। আজ কাজটা শেষ হয়ে যেত, কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে সেটা হল না, এবং সেইসঙ্গে আমাকে এমন সব কথা বলে ফেলতে হল, যেগুলো একান্তই গোপনীয়। এখন আপনারা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে স্থির করুন, এখানেই ঘটনার পরিসমাপ্তি হবে, না এটাকে আরও কিছুদূর টেনে নেবেন। আমার নিজের শান্তি, আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ এবং তার ভাবী পতির সংস্কার— সবই নির্ভর করছে আপনাদের সিদ্ধান্তের উপর।'

মর্টিমার বলল, 'সিদ্ধান্ত হল এই যে, যেহেতু সব ভাল যার শেষ ভাল, এই মুহূর্তে সমস্ত ঘটনাটির উপর চিরকালের মতো যবনিকা ফেলে দেওয়া হোক। কালই একজন পাকা স্বর্ণকারকে দিয়ে পাথরগুলো ঠিক করে বসিয়ে কবচটাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। এবারে আপনার হাতটা দিন, প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াস, আর আশীর্বাদ করুন যেন এরকম অবস্থায় যদি কোনওদিন পড়তে হয় আমাকে, আমিও যেন আপনার মতো নিঃস্বার্থ আচরণ করতে পারি।'

কাহিনী শেষ করার আগে একটা কথা বলা দরকার। এক মাসের মধ্যেই এলিজের বিয়ে হয়ে গেল তার সঙ্গে— যার আসল নামটা বললে পাঠক বুঝতে পারতেন যে, তিনি এখন সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। কিন্তু সত্যি কথাটা হল এই যে, সম্মান তার চেয়েও বেশি প্রাপ্য সেই শান্তস্বভাবা তরুণীর, যিনি তাঁর স্বামীকে পাপের পঙ্কিল পথ থেকে উদ্ধার করে ভদ্রসমাজে তার স্থান করে দিয়েছিলেন।

দি জু'স ব্রেস্টপ্লেট
সন্দেশ, অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩৯১

পিকুর ডায়রি ও অন্যান্য

ময়ূরকণ্ঠি জেলি

শশাঙ্ক টেবিলের উপর থেকে খাতাটা তুলে নিল।

নীল মলাটের ছোট সাইজের সাধারণ নোটবুক! দাম বোধহয় আজকের দিনে আনা আষ্টেক। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে শশাঙ্ক এরকম নোটবুক ব্যবহার করেছে, তখন দাম ছিল দু'আনা। মনে আছে তখন হঠাৎ ডায়রি লেখার শখ হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ ডায়রির পাতায় কুলিয়ে উঠত না, কারণ শশাঙ্ক কেবল দৈনন্দিন কার্যকলাপের বর্ণনাই লিখত না। সে সম্পর্কে দার্শনিক মন্তব্য, আপন চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণ, এমনকী মাঝে মাঝে রাত্রে দেখা স্বপ্নের বিবরণ পর্যন্ত লিখে অস্তিত্বের ব্যাপারটাকে একটা সাহিত্যিক মর্যাদা ও স্থায়িত্ব দেওয়ার প্রবৃত্তি তখন শশাঙ্কর মনে জেগেছিল।

কিন্তু অভ্যাসটা এক বছরের বেশি টেকেনি। একাগ্রতা জিনিসটা শশাঙ্ককে চিরকালই এড়িয়ে গেছে—যে কারণে মেধাবী ছাত্র হয়েও পরীক্ষায় চমকপ্রদ ফললাভের সৌভাগ্য থেকে সে চিরকালই বঞ্চিত হয়েছে। যাকে বলে গুড সেকেন্ড ক্লাস—শশাঙ্কর স্থান আজীবন সেই পঙ্‌ক্তিতেই রয়ে গেছে। তার ডায়রিটিও শশাঙ্ক হারিয়ে ফেলেছে—কবে কীভাবে তা মনে নেই।

এ খাতাটা অবিশ্যি দিনপঞ্জি নয়। শশাঙ্ক প্রথম পাতাটার দিকে চাইল। সরু কলমে কালো কালিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা—Some Notes on Longevity—P. Sarkar, 14 July, 1970.

প্রদোষের খাতা। প্রদোষের জিনিয়াসের সর্বশেষ নিদর্শন। খাতার অর্ধেক পাতায় কালির আঁচড় পড়েনি। আয়ুবৃদ্ধি সম্পর্কে তার শেষ কথা প্রদোষ বলে যেতে পারেনি। ১৯৭১ সনের ১৭ই ডিসেম্বর বিয়াল্লিশ বছর তিন মাস বয়সে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রদোষের মৃত্যু হয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বায়োকেমিস্ট হিসেবে প্রদোষ তার জীবনের শেষ দুটি বছর কোন বিশেষ গবেষণায় লিপ্ত ছিল, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মহলে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল, কিন্তু তার কোনও সঠিক সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আজ সে সন্ধান জানে কেবল একটিমাত্র ব্যক্তি—শশাঙ্কশেখর বোস।

'আপনি বাবার বন্ধু ছিলেন, তাই মা-র ইচ্ছে আপনি বাবার কাগজপত্রগুলো দেখে, সেগুলোকে গুছিয়ে-টুছিয়ে যদি একটা...মানে...'

প্রদোষের চৌদ্দ বছরের ছেলে মণীশ ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝাতে না পারলেও, শশাঙ্কর বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি। প্রদোষের কাগজপত্রের অবিন্যস্ত সম্ভারে শৃঙ্খলা আনয়ন, তার অপ্রকাশিত রচনাবলীর একটি তালিকা প্রস্তুত করায় শশাঙ্কর কোনও আগ্রহের অভাব ছিল না। প্রদোষের জীবদ্দশায়, কলেজে সহপাঠের সময় থেকেই শশাঙ্ক প্রদোষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও তাকে ঈর্ষা না করে পারেনি। প্রথমে ঈর্ষা করেছে তার মেধাকে, পরে তার খ্যাতি ও লেখনীশক্তিকে।

ঈর্ষার আরেকটি কারণ—নিভা মিত্রকে প্রদোষের পত্নীরূপে লাভ। অধ্যাপক ভাস্কর মিত্রের কন্যা নিভার সঙ্গে দুই বন্ধুরই একসঙ্গে আলাপ হয় অধ্যাপকের বাড়িতেই। অপেক্ষাকৃত সুপুরুষ হয়েও একদিনের আলাপেই শশাঙ্ক প্রদোষের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়—কারণ নিভার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ক্ষণিকের আলাপেই মানুষের বাইরের আবরণ ভেদ করে অন্তরের রূপটি ধরে ফেলার।

তিন মাস কোর্টশিপের পর নিভার সঙ্গে প্রদোষের বিবাহ হয়। প্রদোষ বলেছিল, 'খ্রিস্টান বিয়ে হলে তোকে বেস্টম্যান করতুম।' শশাঙ্ক নিজে আর বিয়ে করেনি। না করার কারণ তার নিজের কাছে স্পষ্ট—নিভাকে সে ভুলতে পারেনি। এমন অন্য কোনও মেয়েও তার চোখে পড়েনি যে, স্মৃতি তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারে।

কিন্তু আজ যখন প্রদোষ মৃত, তখন তো আর ঈর্ষার প্রশ্ন ওঠে না। তাই মণীশের অনুরোধ শশাঙ্ক ঠেলতে পারেনি। প্রদোষের বাড়ির তিনতলার পূর্ব দিকের স্বল্পায়তন ঘরটিতে বারোদিন অহোরাত্র পরিশ্রম করে শশাঙ্ক তার পরলোকগত বন্ধুর লেখা প্রবন্ধগুলি রচনাকাল অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে দিয়েছিল।

নীল নোটবইটি চোখে পড়ে অষ্টম কিংবা নবম দিনে। একটি বুক শেল্‌ফের সবচেয়ে উপরের তাকে মেচ্‌নিকফের একটা বইয়ের পিছনে খাতাটি আত্মগোপন করে ছিল। মনে পড়ে, খাতাটি পেয়ে এবং তার বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত পেয়ে উত্তেজনায় শশাঙ্কর শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। আয়ুবৃদ্ধি সম্পর্কে প্রদোষের এ-গবেষণার কথা কেউ জানে না—এমনকী প্রোফেসর বাগচিও না। প্রদোষকে নিয়ে বাগচির সঙ্গে শশাঙ্কর আলোচনা হয় প্রদোষের মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই। বাগচি তখন বলেন, 'কিছুদিন থেকেই প্রদোষ যেন কী একটা ভাবছে। এটা তার অন্যমনস্কতা থেকেই বুঝেছি। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না। তোমায় কিছু বলেছে কি?...'

বাগচি তাঁর তেইশ বছরের অধ্যাপক জীবনে প্রদোষের মতো ছাত্র পাননি। প্রদোষ যে অনেক আগেই অনেক বিষয়েই তার শিক্ষককে অতিক্রম করে গিয়েছে, সেটা বাগচি নিজেও স্বীকার করতেন। বাগচির গভীর বিশ্বাস ছিল যে, বায়োকেমিস্ট্রির জগতে প্রদোষ কোনও একটা যুগান্তকারী অবদান রেখে যাবে। তাই তার ভাবনাচিন্তা গবেষণা ইত্যাদি সম্পর্কে বাগচির কৌতূহল ছিল অপরিসীম। কিন্তু বাগচি এই খাতাটি সম্পর্কে জানতেন না।

বাগচি ছাড়া আর যে দু'জনের জানার সম্ভাবনা ছিল, সে হল শশাঙ্ক নিজে এবং প্রদোষ ও শশাঙ্কর বন্ধু অমিতাভ। অমিতাভ আজ পাঁচ বছর হল লন্ডনের ফ্রীডম্যান ল্যাবরেটরিজ-এর কাজ নিয়ে দেশছাড়া। তাই খাতার ব্যাপারটা তার কাছেও অজ্ঞাত বলে অনুমান করা যেতে পারে।

খাতাটি পাওয়ার পরেও শশাঙ্ককে সেটি পড়ার লোভ সংবরণ করতে হয়েছিল কয়েকদিন, কারণ প্রদোষের রচনা নির্বাচনের কাজ তখনও শেষ হয়নি। বারোদিনের দিন কাজ শেষ হবার পর খাতাটি আদ্যোপান্ত পড়ে নিয়ে শশাঙ্ক প্রফেসর বাগচিকে তাঁর অনুরোধ অনুযায়ী খবর দিল।

'আপনি এবারে আসতে পারেন স্যার। আমার কাজ খতম।'

'সাকসেসফুল?'

'আসুন। এসে দেখুন!'

'আই উইল বি দেয়ার ইন অ্যান আওয়ার।'

টেলিফোন রাখার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নিভা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। রোজই এই সাড়ে চারটের সময় নিভা তাকে চা এনে দিয়েছে, এবং রোজই এই মুহূর্তটিতে শশাঙ্ক একটা হৃৎস্পন্দন অনুভব করেছে। নিভা থান পরে না। তার পরনের সরু কালো পাড়ের মিলের শাড়ি তার অজ্ঞাতসারেই যেন তার রূপকে একটি স্নিগ্ধ আভিজাত্য দান করেছে।

'কাজ শেষ?'

'হ্যাঁ।'

'কত পরিশ্রম করলেন আপনি!'

'সব সার্থক। আশ্চর্য সব লেখা আবিষ্কার করেছি।'

কেন জানি শশাঙ্ক ঠিক এই মুহূর্তে নীল খাতাটির কথা আলাদা করে বলতে পারল না নিভাকে। কিন্তু সত্য গোপন করা তো আর মিথ্যাভাষণ নয়—আর সত্য উদ্ঘাটনের সময় তো পড়েই আছে সামনে। বাগচি এলে তখন তো কথা হবেই।

নিভাকে দেখে একটি প্রশ্নই কেবল শশাঙ্কর মনে জাগে। সে কি বিয়ে করে সুখী হয়েছিল? এ ক'দিনে এতবার দেখেও শশাঙ্ক এ-প্রশ্নের উত্তর পায়নি। কিন্তু প্রদোষকে বিবাহ করে সে সুখী হয়নি, এমন সন্দেহ তার মনে উদয় হবে কেন? জিনিয়াসের স্ত্রীর জীবনে শূন্যতা থাকতে বাধ্য, এমন একটা প্রচলিত বিশ্বাসই কি এই সন্দেহের উৎস?

বাগচি এলেন প্রায় ছ'টা।

'কীরকম বুঝেছ হে?'

'রিমার্কেবল। যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও অনেক বেশি। রচনার সংখ্যাও বেশি, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও যা আন্দাজ করেছিলাম তার চেয়ে বেশি।'

'আমি একটা মেমোরিয়াল ভল্যুমের কথা ভাবছি! সেটা হল ইমিডিয়েট কাজ। তোমার সাহায্য চাই—বলাই বাহুল্য।'

শশাঙ্কর প্যান্টের ডান পকেটে সেই নীল খাতা। মানুষের আয়ুবৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে যুগান্তকারী গবেষণা।

পশ্চিমের আধুনিকতম গবেষণা ও প্রাচ্যের সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদিক জ্ঞানের সংমিশ্রণে লব্ধ এলিক্সির অফ লাইফ, অথবা আয়ুবৃদ্ধিকর ড্রাগ প্রস্তুত প্রণালীর বর্ণনা। প্রদোষের মতে এই ড্রাগ ইঞ্জেকশনের ফলে মানুষ বাঁচবে অন্তত দেড়শো বছর। ব্যক্তিবিশেষের মেটাবলিজম অনুযায়ী আয়ুর তারতম্য হবে অবশ্যই—তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুশো-আড়াইশো বছর বাঁচাও অসম্ভব নয়। এই ড্রাগের অবশ্যম্ভাবী সাফল্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছে প্রদোষ।

শশাঙ্কর ডান হাতটা অন্যমনস্ক ভাবেই তার প্যান্টের ডান পকেটে প্রবেশ করল।

বাগচি এতক্ষণ প্রদোষের লেখাগুলি নেড়েচেড়ে দেখছিলেন।

'১৯৭০ পর্যন্ত ওর কাজের ও চিন্তাধারার বেশ একটা ধারাবাহিক ছবি পাওয়া যাচ্ছে হে।'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কিন্তু এই কি সব? আর কোনও খাতা নেই?'

শশাঙ্কর হঠাৎ গরম লাগছে। সে হাতের কাছে পাখার রেগুলেটারটা তিন থেকে পাঁচের ঘরে ঠেলে দিল।

বাগচি আবার বললেন, 'তুমি সব জায়গায় খুঁজে দেখেছ?'

নিভা আবার ঘরে এসেছে। এবার প্রফেসর বাগচির জন্য চা ও মিষ্টি।

শশাঙ্ক একটা গলা খাক্‌রানি দিয়ে বলল, 'দেখেছি স্যার।'

'কিছু পাওনি? হয়তো আলগা ফুলস্ক্যাপ কাগজে কিছু থাকতে পারে। ওর মাথাটা যে পরিমাণে পরিষ্কার ছিল, কাজের পদ্ধতিটা তো সবসময়ে ঠিক সেরকম...'

শশাঙ্ক ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে পকেটের খাতাটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

'আর কিছুই পাইনি স্যার।'

পরিষ্কার গলায় অস্বীকারোক্তিটা ঘুপচি ঘরে অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর শোনালো।

'হুঁ' বলে বাগচি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বাগচি কি তাকে সন্দেহ করছেন? কিন্তু এ-সন্দেহ যে দূর করতে হবে। শশাঙ্ক তার গলার স্বর আরও দৃঢ় করল।

'এ ঘরে আর কোথাও কিচ্ছু নেই।'

বাগচি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'অবিশ্যি এই তেতাল্লিশ বছরের জীবনে প্রদোষ যা করে গেছে তার কোনও তুলনা নেই, কিন্তু তাও...' বাগচি নিভার দিকে চাইলেন। 'বউমা কিছু হেল্‌প করতে পারো?'

নিভা তার শান্ত আয়ত চোখ দুটি বাগচির দিকে তুলল।

বাগচি প্রশ্নটিকে আরেকটু বিশদভাবে ব্যক্ত করলেন, 'প্রদোষ তার জীবনের শেষ দুটো বছর কী নিয়ে ভেবেছে তার কোনও লিখিত ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। তোমায় সে মুখে কখনও কিছু বলেছে কি? বুঝতেই তো পারছ—তার চিন্তার সামান্য কণাটুকুরও আজ মূল্য অনেক।'

নিভা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ধীর সংযত কণ্ঠে বলল, 'তাঁর কাজ সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি আমাকে।'

বাগচি এবার বললেন, 'তাকে ইদানীং কিছু লিখতেও দেখোনি?'

এ প্রশ্নের উত্তর শশাঙ্কই দিল।

'আমি তো বলছি স্যার। কোনও জায়গা বাদ রাখিনি। তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।'

শশাঙ্ক মন স্থির করে ফেলেছে। প্রদোষের শেষ রচনাটি আর প্রদোষের থাকবে না। এটা হবে তার নিজেরই লেখা, নিজেরই গবেষণা, নিজেরই জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার ফল। দ্বন্দ্ব তো কেবল নিজের মনের

সঙ্গে, বিবেকের সঙ্গে—আর তো কেউ জানবেও না, বুঝবেও না। আজ থেকে ছ'মাস—হ্যাঁ, অন্তত ছ'মাস সে কাউকে কিছু জানাবে না। ছ'মাস সময়টার প্রয়োজন আছে। কারণ মিথ্যাটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। এই ক'টা মাস তাকে আয়ুবৃদ্ধি সম্পর্কে পড়াশুনা করতে হবে। বাগচির মতো লোকের মনে যাতে কোনও সন্দেহ না স্থান পায়। মাঝে মাঝে তাকে বাগচির সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দেবে যে, আয়ুবৃদ্ধির প্রশ্নটা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে, সে নিয়ে সে পড়াশুনা করছে, রিসার্চ করছে। তারপর সময় হলে সে খাতাটা বাগচিকে দেখাবে।

কার খাতা? প্রদোষের খাতা? অবশ্যই না। প্রদোষের খাতার প্রতিটি অক্ষর সে অন্য খাতায় কপি করে নেবে। সে খাতার প্রথম পাতায় সে লিখবে—Some Notes on Longevity by S. S. Bose. তারপর তার প্রথম কাজ হবে প্রদোষের ফরমুলা অনুযায়ী আয়ুবৃদ্ধির ড্রাগটি প্রস্তুত করা। একটা বাদে কোনও উপাদানই দুষ্প্রাপ্য নয়। যেটি দুষ্প্রাপ্য সেটিও অর্থ আর ব্যক্তিগত প্রভাবের বিনিময়ে লভ্য।

আজ তারিখ ৩রা অগস্ট ১৯৭২। আজ শশাঙ্ক তার ড্রাগ প্রস্তুতের কাজ শুরু করবে। কিন্তু তার আগে প্রদোষের খাতাটি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা দরকার। অন্য কাজ সমস্ত করা হয়ে গেছে। একটি বড় সাইজের কালো খাতায় শশাঙ্ক প্রদোষের লেখা কপি করে নিয়েছে। বাগচির মনে যাতে কোনও সন্দেহের উদ্রেক না হয় তার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। এই ছ'মাসে একাধিকবার শশাঙ্ক তাঁর সঙ্গে বসে আয়ুবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেছে। বাগচি প্রথমে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, পরে আনন্দিত হয়েছেন ও তাকে উৎসাহ দিয়েছেন, 'বুঝেছি, প্রদোষের ব্যক্তিত্বই এতদিন তোমার নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ হতে দেয়নি। বন্ধুবিচ্ছেদে উপকার হয়েছে তোমার। এটা অস্বাভাবিক নয়। মানুষের মন বড় বিচিত্র জিনিস।...করে যাও তোমার কাজ। সাহায্যের প্রয়োজন হলে চাইতে দ্বিধা কোরো না।' ফরমুলাটির কথা বাগচিকে বলেনি সে। অনেক ভেবেই সে স্থির করেছে যে, একেবারে ড্রাগটি প্রস্তুত করে তবে সে সবকিছু প্রকাশ করবে।

এত করেও আজ প্রদোষের খাতাটি নষ্ট করার পূর্ব মুহূর্তে সে কেন দ্বিধা বোধ করছে?

শশাঙ্ক বুঝল যে, বিবেক বলে যে বস্তুটি মানুষের অন্তরের একটি নিভৃত কক্ষে বাস করে, সেই বিবেকই এই সংশয়ের কারণ। কিন্তু আজকের দিনে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গেলে সত্যিই কি ওই বস্তুটির কোনও প্রয়োজন আছে? গত কয়েক দশকের পৃথিবীর ইতিহাসে কতগুলি প্রধান ঘটনা বিশ্লেষণ করলে কি এই সত্যটাই প্রমাণ হয় না যে, বিংশ শতাব্দীতে বিবেক জিনিসটার কোনও মূল্য নেই? হিটলারকে আজ যারা নিন্দা করে, সাময়িক হলেও হিটলারের মতো প্রতিপত্তি তাদের ক'জনের ভাগ্যে জুটেছে? হিরোশিমার উপর আণবিক বোমা বর্ষণ করেও আমেরিকার সম্মানে কোনও হানি হয়েছে কি? আসলে আজকের দিনে বিজ্ঞানের প্রসারই যখন মানুষের মন থেকে পরলোক পরজন্ম ইত্যাদির চিন্তা মুছে ফেলে দিয়েছে, তখন বিবেক জিনিসটার সত্যিই আর কোনও প্রয়োজন নেই।

শশাঙ্ক মনে জোর পেল।

পকেট থেকে দেশলাই বার করে প্রদোষের খাতার মলাটের একটি কোণে অগ্নিসংযোগ করে খাতাটা হাত থেকে মেঝেতে ফেলে দিল।

হাতের ঘড়িতে হিসাব করে শশাঙ্ক দেখলে খাতাটি পুড়তে সময় লাগল সাড়ে তিন মিনিটের কিছু বেশি।

ড্রাগ-প্রস্তুত পর্বের বিস্তারিত বিবরণ এ কাহিনীতে কেন নিষ্প্রয়োজন, সেটা যথাস্থানে প্রকাশ্য। আপাতত অন্য একটি ঘটনাকে প্রাধান্য দিতে হয়।

৩রা অগস্ট সকাল সাড়ে ন'টায় প্রদোষ শশাঙ্কর খাতাটি পুড়িয়ে ফেলে। দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে সে তার বালিগঞ্জের সর্দার শশাঙ্ক রোডের ফ্ল্যাট থেকে যাবে বেলঘরিয়া। সেখানে তার এক মামার একটি প্রায়-পরিত্যক্ত বাগানবাড়ির একটি ঘরে, গত ছ'মাসের মধ্যে সে একটি ল্যাবরেটরি তৈরি করেছে। ড্রাগটি প্রস্তুত হবে এই ল্যাবরেটরিতেই—তবে দিনের বেলা নয়—মধ্যরাত্রে।

খেতে বসার মুখটিতে শশাঙ্ক একটি টেলিফোন পেল।

'কে, শশাঙ্ক?...চিনতে পারছিস?'

'সে কী? কবে এলি?'
অমিতাভ বিলেত থেকে ফিরে এসেছে—অপ্রত্যাশিত ভাবে।
'কাল সকালে।'
'কী ব্যাপার?'
'বোনের বিয়ে। ভাবতে পারিস? যাবার সময় দেখে গেছি ফ্রক পরছে!'
শশাঙ্ক হাসে। 'কেমন আছিস?'
'আমি তো ভালই। তুই কেমন?'
'সো-সো?...কিন্তু খবর জানিস তো?'
'প্রদোষের ব্যাপার তো? টেরিব্‌ল! আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি।—"Whom the Gods love..." জানা আছে তো?'
'খুব জানি। যে কারণে আমার বিশ্বাস আমাদের কপালে অনেক দুঃখভোগ আছে।'
'আশ্চর্য! মৃত্যুর মাসখানেক আগেও ওর একটা চিঠি পেয়েছি। আগে কোনওদিন লেখেনি। ওই প্রথম, আর ওই শেষ।'
শশাঙ্কর গলাটা ধরে গেল।
'তোকে চিঠি...তুই...?'
'কী হল?'
'না না। মানে—তোকে চিঠি লিখেছিল?'
'আর বলিস না! তখন কাজে বেরোচ্ছি—ভীষণ তাড়া। চিঠিটা এল, একবার কোনওরকমে চোখ বুলিয়ে হাতে একটা পেপারব্যাক ছিল, তার মধ্যে রেখে দিলুম, আর সেটা কোথায় যে হাত থেকে স্লিপ করে পড়ল। বোধহয় টিউবেই।'
'সে কী রে?'
'এত আফসোস হল! বেশ বড় চিঠি, জানিস! আর ফুল্ অফ ইন্টারেস্টিং থিংস্। কী জানি কী একটা নিয়ে রিসার্চ করছিল। সামথিং টু ডু উইথ...উইথ...'
শশাঙ্কর গলায় শ্লেষ্মা। একবার কেশে নিয়ে সে বলল, 'লন্ডনের হাওয়ায় তোর স্মৃতিশক্তিটা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?'
'ও ইয়েস ইয়েস! মনে পড়েছে। লঞ্জিভিটি, লঞ্জিভিটি! আসল ব্যাপারটা কী জানিস? আমার নিজের আবার আয়ুবৃদ্ধির ব্যাপারে খুব বেশি ইন্টারেস্ট নেই। ঠাকুরদাকে দেখেছি তো—আশি বছর বয়স অবধি কী জ্বালান জ্বালিয়েছেন! আরও পঞ্চাশটা বছর যদি ও জ্বালানি সইতে হত—উঃ।'
সমস্ত ব্যাপারটা হালকা করার উদ্দেশ্যে শশাঙ্ক একটা হাসির চেষ্টা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হল। তারপর সে বলল, 'এমন একটা ব্যাপার নিয়ে সে ভাবছিল, আর তার একটা নোট পর্যন্ত নেই!'
'নোট নেই? কিন্তু ও যে—তুই ঠিক বলছিস তো?'
'আমিই তো ওর লেখাপত্তর সব ঘেঁটেঘুঁটে গুছিয়ে দিলুম।'
'কিচ্ছু পাসনি? অন লঞ্জিভিটি?'
'নাথিং। তুই বোধহয় গণ্ডগোল করছিস।'
'কিন্তু..ভেরি স্ট্রেঞ্জ! তা হলে কি লঞ্জিভিটি নয়? সামথিং এল্‌স? হবেও বা!...যাই হোক, এগারোই সন্ধ্যা সাতটা।'
'কী?'
'ডলির বিয়ে—বললাম না। আসা চাই। অবিশ্যি, তোর বাড়ি একবার যাবই। কাল তো রোববার। সকালের দিকে আছিস?'
'আছি। ইয়ে—তোর বাগচির সঙ্গে দেখা হয়েছে?'
'পাগল! ফোনও করিনি। সময় কোথায়? শুধু নিভাকে একটা ফোন করে সমবেদনা জানিয়েছি।'
'ওকে প্রদোষের চিঠিব কথা—?'
'না না। হারিয়ে ফেলেছি শুনলে কষ্ট পাবে। চলি ভাই। বাই বাই!'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে শশাঙ্ক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে বসে রইল।

তা হলে কি তাকে সত্যটা প্রকাশ করে দিতে হবে? কিন্তু গত ছ'মাসের এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, রাত্রিজাগরণ, অর্থ ও খ্যাতির এত রঙিন স্বপ্ন—সব কি ব্যর্থ হবে? এই স্বপ্নসৌধ যদি তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়, তা হলে সে বাকি জীবনটা কী নিয়ে থাকবে! এখন তো তার আর অন্য কোনও কাজে মন নেই। সত্যি বলতে কি, আয়ুবৃদ্ধি সম্পর্কে পড়াশুনার ফলে তার ও বিষয়ে রীতিমতো জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার সঞ্চার হয়েছে।

নাঃ, এ কাজ তাকে করতেই হবে। যেভাবে প্ল্যান করেছিল সেভাবেই। অমিতাভর মনে যেটুকু সন্দেহ আছে, দূর করতে হবে। আর ও তো এসেছে বোনের বিয়ের ব্যাপারে। মাসখানেকের বেশি থাকবে না নিশ্চয়ই। তারপর ও চলে গেলে ড্রাগের খবরটা প্রকাশ করলেই হবে।

বিকেলে বেলঘরিয়া যাবার মুখে মণীশ এল—তার হাতে একখানা চিঠি।

'এটা মা দিলেন।'

শশাঙ্ক হালকা সবুজ রঙ-এর খামটা খুলে চিঠিটা পড়ল।

'মাননীয়েষু,

সেই যে কাজ করে দিয়ে গেলেন, তারপর তো কই আর এলেন না। আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি একদিন এসে আমাদের এখানে খান। কোনদিন সুবিধে হবে সেটা হয় মনুকে, না হয় আমাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবেন। আশা করি ভাল আছেন।

ইতি
বিনীতা
নিভা সরকার।'

চিঠিটা পড়া শেষ হলে শশাঙ্ক সেটাকে ভাঁজ করে মণীশের পিঠে ছোট্ট একটা চাপড় মেরে বলল, 'মাকে বোলো—যেদিন আসব তার দু'দিন আগে টেলিফোন করে জানিয়ে দেব, কেমন?'

মণীশ চলে গেলে পর শশাঙ্ক নিভার চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিল।

ড্রাগ-প্রস্তুত পর্বের বিবরণ এই কারণে নিষ্প্রয়োজন যে, প্রদোষের নির্দেশ অনুযায়ী উপাদান মিশিয়ে যে পদার্থটি তৈরি হল, প্রদোষের আনুমানিক বর্ণনার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। রাত বারোটার সময় কাজ শুরু করে ভোর পাঁচটায় শশাঙ্কর কাচের পাত্রটিতে যে বস্তুটি আবির্ভূত হল তেমন বস্তু শশাঙ্ক এর আগে কখনও দেখেনি। প্রদোষ তার খাতায় লিখেছিল তরল পদার্থের কথা। যেটি পাওয়া গেল সেটি হল ভিস্‌কাস্‌—অর্থাৎ চিট্‌চিটে থক্‌থকে।

পদার্থটির প্রথম অবস্থা অবিশ্যি তরলই ছিল, কিন্তু পাঁচ মিনিটের জন্য ঘরের বার হয়ে ফিরে এসে শশাঙ্ক দেখল সেটি জমতে শুরু করেছে।

যে অবস্থায় এসে জমা থামল, সেটা দেখে কেবল একটি জিনিসের কথাই মনে হয়—জেলি। রঙ যদি লাল হত, তবে সেটাকে পেয়ারার জেলি বলে ভুল করা অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু এখন সে ভুলের প্রশ্নই ওঠে না। জেলি জাতীয় কোনও পদার্থের যে এমন রঙ হতে পারে তা শশাঙ্ক ভাবতেও পারেনি। বৈদ্যুতিক আলোতে রঙ-এর বাহার ঠিক ধরা পড়েনি। ভোরবেলা পূর্বদিকের খোলা জানলাটা দিয়ে সূর্যের রশ্মি এসে জেলির গায়ে পড়াতে সমস্ত ঘর যেন আলোয় আলো হয়ে উঠল।

শশাঙ্ক উপরের দিকে চেয়ে দেখলে জেলি থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে সিলিং-এর উপর ছড়িয়ে পড়ে নয়নাভিরাম নীলাভ চাঁদোয়ার সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু শুধুই কি নীল?

শশাঙ্ক লক্ষ করল দৃষ্টিকোণের সামান্যতম পরিবর্তনেই জেলির রঙ বদলাচ্ছে। নীলই প্রধান। কিন্তু সবুজ ও লালের আভাসও পাওয়া যায়। এ রঙকে ময়ূরকণ্ঠি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

বিস্ময়ের মধ্যেও শশাঙ্কর হাসি পেল। ময়ূরকণ্ঠি জেলি! প্রদোষ এ কীসের ফরমুলা দিয়ে গেল? এ

কি ড্রাগ, না অন্য কিছু? জীব-রসায়নের ইতিহাসেই কি এর স্থান, না প্রাতরাশের মেনুতে?

যাই হোক না কেন—এমন চমকপ্রদ বর্ণচ্ছটা শশাঙ্কর অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। নাই বা থাকুক এর কোনও আয়ুবৃদ্ধির শক্তি, এর অনির্বচনীয় সৌন্দর্যই ধৈর্য ও শ্রম সার্থক করছে।

শশাঙ্ক তন্ময় হয়ে পাত্রটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে লক্ষ করল জেলির মধ্যে যেন একটা মৃদু স্পন্দনের ভাব।

মুহূর্তকাল বিস্ময়ের পর শশাঙ্ক এই স্পন্দনের একটা কারণ অনুমান করল। জেলি এতই সেন্‌সিটিভ যে, ভোরের সূর্যালোকের মৃদু উত্তাপই এতে উত্তেজনা সঞ্চার করতে সক্ষম। অর্থাৎ, জেলি গরমে ফুটছে।

শশাঙ্ক পূর্বদিকের জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে টেবিলের কাছে ফিরে এসে পাত্রটির গায়ে হাত দিয়েই তার অস্বাভাবিক উষ্ণতা অনুভব করল।

তারপর অতি সন্তর্পণে পাত্রের মুখের কাছে হাতের তেলোটা আনামাত্র বিদ্যুদ্বেগে হাতটা সরিয়ে নিয়ে লম্ফ দিয়ে শশাঙ্ককে তিন হাত পিছিয়ে যেতে হল।

হাতের তেলোতে অসহ্য যন্ত্রণা।

শশাঙ্ক চেয়ে দেখল—ফোস্‌কা।

সৌভাগ্যক্রমে ফার্স্ট এডের বাক্সটি আনতে ভোলেনি শশাঙ্ক। বার্নল দিয়ে নিজের হাতে নিজেই ব্যান্ডেজ করে আরেকবার টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে শশাঙ্ক দেখল, জেলি এখন নিস্পন্দ, পাত্রও ঠাণ্ডা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয়।

সূর্যের আলোর অভাবেও জেলিটি থেকে আপনা হতেই একটা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মাথার উপরে এখনও নীলাভ চাঁদোয়া।

এতে কি তবে ফস্‌ফরাস্ আছে? কিন্তু সে জাতীয় কোনও পদার্থ তো উপাদানে ছিল না।

শশাঙ্ক এবার সাহস করে পাত্রটি হাতে তুলে নিল। জেলির ওজন মন্দ নয়। দেখে তো মনে হয়নি। জেলির বদলে পারা থাকলেও এর চেয়ে বেশি ওজন হত না। শশাঙ্ক এবার ধীরে ধীরে পাত্রটিকে কাত করতে লাগল। পাত্রের পাশ টেবিলের উপর পড়ে একটি কম্পমান গোলকের আকার ধারণ করল।

আধারমুক্ত হবার ফলে জেলির ঔজ্জ্বল্য যেন আরও বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে গোলকের অস্থিরতা দূর হল। এখন সেটি, একটি নিটোল নিষ্কলঙ্ক ময়ূরকণ্ঠি-বর্ণযুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত আলোক-পিণ্ড।...

সাড়ে আটটায় শশাঙ্ক তার বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে ফিরে এল। ব্যান্ডেজবদ্ধ ডান হাতের তেলোয় এখনও সে মৃদু যন্ত্রণা অনুভব করছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। তার সমস্ত সত্তা এখন নবাবিষ্কৃত অপরূপ বর্ণচ্ছটা-সম্পৃক্ত জেলির ভাবনায় আচ্ছন্ন। আয়ুবৃদ্ধির প্রশ্নটা এখন তার কাছে বড় নয়। যে পদার্থটি এখন তার গবেষণাগারে বন্দি অবস্থায় রয়েছে, পার্থিব জগতে তার রূপের তুলনা বিরল। গুণও যদি কিছু থাকে সেটার, মানুষের প্রয়োজনে যদি আসে সেটা, তবে সেটা হবে ফাউ।

এগারোটার কিছু পরে অমিতাভ এল। তার চাহনির অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা শশাঙ্কর দৃষ্টি এড়াল না। শশাঙ্কর খাটে ধপ্ করে বসে খোলা খবরের কাগজের উপর একটা চাপড় মেরে অমিতাভ বলল, 'আই ওয়াজ রাইট!'

শশাঙ্ক উৎকণ্ঠা দমন করে চেয়ারে বসে সিগারেটের টিনটা অমিতাভর দিকে এগিয়ে দিল।

অমিতাভ বলল, 'ওসব রাখ। এই দ্যাখ।'

পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে অমিতাভ শশাঙ্কর দিকে এগিয়ে দিল।

'আজ নিভার ওখানে গেসলাম। এই অসমাপ্ত চিঠিটা প্রদোষের শোয়ার ঘরের টেবিলের দেরাজে পাওয়া গেছে। আই ওয়াজ রাইট!'

চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা। তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়—

'প্রিয় অমিতাভ,

এত অল্প সময়ের মধ্যেই আরেকখানা চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই খুব অবাক লাগবে তোমার। কিন্তু না লিখে পারলাম না। গত চিঠিতেই আয়ুবৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণার কথা উল্লেখ করেছিলাম, মনে আছে

বোধহয়। তাতে একটা নতুন ড্রাগ আবিষ্কারের সম্ভাবনার কথা লিখেছিলাম। এবারে তার ফরমুলাটা তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই, কারণ আমি নিজে এ-কাজ শেষ করে উঠতে পারব কিনা জানি না। ক'দিন থেকেই আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে, আমার নিজের আয়ু বোধহয়—'

চিঠিটা একবার শেষ করে দ্বিতীয়বার পড়ার সময় শশাঙ্ক শুনল অমিতাভ বলছে, 'এখন কথা হচ্ছে—হোয়ার ইজ দ্যাট ফরমুলা? অ্যান্ড হোয়্যার ইজ দ্যাট নোটবুক?'

শশাঙ্ক চিঠিটা ফিরিয়ে দিল।

'কী করে জানব বল! আর এমনও তো হতে পারে প্রদোষ শেষকালে সে খাতা ডেস্ট্রয় করে ফেলেছে। হয়তো মনে হয়েছে সে ভুল পথে চলেছে—তার গবেষণার কোনও মূল্য নেই। তা ছাড়া—' শশাঙ্কর মাথায় হঠাৎ একটা পৈশাচিক বুদ্ধি খেলে গেল—'তা ছাড়া আমিও যে ও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি সেটা তো আমি প্রদোষকে বলেছিলাম। হয়তো সে কারণেই—'

'তুইও ভাবছিস মানে?' অমিতাভর দৃষ্টিতে যুগপৎ বিস্ময় ও অবিশ্বাস।

'মানে যা বুঝছ তাই। আমি সে-কথা প্রদোষকে বলেছিলাম। প্রদোষ জানত। তুই তো চিনতিস প্রদোষকে। সেন্টিমেন্টাল। বন্ধুর যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য নিজে স্যাক্রিফাইস করতে দ্বিধা করত না—তাই নয় কি?'

অমিতাভ কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে শশাঙ্কর দিকে চেয়ে বলল, 'তুইও লঞ্জিভিটি নিয়ে রিসার্চ করছিস? তোর নোট্স আছে?'

'আছে বইকী! তুই কি ভাবছিস আমি বসে কেবল পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করছি—আর আমার ভাগ্যে লবডঙ্কা?'

'না না, তা কেন!' অমিতাভ যেন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত, অনুতপ্ত। 'তোর যে বুদ্ধি নেই এ-কথা তো কোনওদিন বলিনি, ভাবিওনি। তোর যেটার চিরকালই অভাব ছিল সেটা হচ্ছে একাগ্রতা, অ্যাপ্লিকেশন। তা ছাড়া তোর চিন্তায় কোনওদিন ডিসিপ্লিন ছিল না। কিন্তু চিন্তাশক্তিটাই যে নেই এসব কথা কি কখনও বলেছি?'

শশাঙ্ক একটা সহজ হাসি হেসে বলল, 'যাই হোক, ধরে নে যে, শশাঙ্ক আর সে শশাঙ্ক নেই।'

অমিতাভ খাট থেকে উঠে পায়চারি শুরু করেছে। তার অস্থিরতা যে ষোলো আনা বিশ্বাসের অভাবেই, তা শশাঙ্ক জানে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কী? কী করতে পারে অমিতাভ। সন্দেহ যতই হোক না কেন, জিনিসটার সম্ভাব্যতা সে উড়িয়ে দিতে পারে না কখনওই। আর তাকে মিথ্যাবাদীই বা প্রমাণ করবে সে কীভাবে?

'তুই প্রদোষের বাড়িতে গিয়ে কাজ শুরু করার আগে আর কেউ ওর কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছিল?'

'ঠিক তা জানি না।'

অমিতাভ থেমেছে। জানলা থেকে মুখ ফেরাতে শশাঙ্ক লক্ষ করল তার কপালে স্বেদবিন্দু। অমিতাভ কণ্ঠস্বর দৃঢ় করে বলল, 'কিছু মনে করিস না—কিন্তু তোর কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

শশাঙ্ক বিবেক-বস্তুটিকে আগেই বর্জন করেছে। সুতরাং এমন সংকটময় মুহূর্তেও সে বিচলিত হল না। উপযুক্ত কাঠিন্য ও শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে সে বলল, 'তা হলে তুই বলতে চাস আমি মিথ্যেবাদী?'

অমিতাভ হঠাৎ যেন ভেঙে পড়ল। খাট থেকে সিগারেটের টিনটা তুলে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সরি ভাই। ভেরি সরি। মাথাটা গণ্ডগোল হয়ে গেস্‌ল। কাজের কাজ বলতে তো কিছুই করিসনি অ্যাদ্দিন, তাই ছাত্র হিসেবে যে তুই ভালই ছিলি সে কথাটা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। যাক্‌গে—আমি উঠি।'

শশাঙ্ক হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করে দিল।

'তোর ঝামেলা মিটুক। একদিন তোকে বেলঘরিয়া নিয়ে যাব।'

'তোর সেই মামাবাড়ি?'

'মামা আর থাকেন না। এখন একটা ল্যাবরেটরি করেছি ওখানে। কাজ করছি।'

‘এক্সলেন্ট !...এই দ্যাখ—তোকে নেমন্তন্ন চিঠিটাই দেওয়া হয়নি!’

অমিতাভকে সিঁড়ির মুখটাতে পৌঁছে দিয়ে ঘরের দিকে ফিরে আসার পথে শশাঙ্কর মনে হল—একবার নিভার বাড়ি যাওয়া দরকার। প্রথম চিঠিটার কথা না জানলেও, অসমাপ্ত চিঠিটার বিষয় নিভাই প্রথম জেনেছে। চিঠির বিষয়বস্তু কী অমিতাভ জানে। নিভার মনেও যদি কোনও সন্দেহের বীজ প্রবেশ করে থাকে, তবে সেটাকে অঙ্কুরিত হতে দেওয়া চলে না।

নিভা সবে স্নান খাওয়া শেষ করে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের আয়োজন করছে, এমন সময় শশাঙ্ক গিয়ে উপস্থিত।

নিভার রুচির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় প্রদোষের বৈঠকখানায়। এখানে সর্বত্র সচেতন শিল্পীর ছাপ—আপনভোলা বৈজ্ঞানিকের নয়। টেবিলের উপর স্বহস্তে এমব্রয়ডারি করা ঢাকনি, দরজা-জানলায় সুদৃশ্য পরদা, সোফার কুশনে নাগা লোকশিল্পের বাহার। ফুলদানিতে রজনীগন্ধাগুচ্ছের স্নিগ্ধ শুভ্রতা যেন নিভার নিরাভরণ সৌন্দর্যেরই প্রতিধ্বনি।

‘বসুন।...এভাবে খবর না দিয়ে তো আসার কথা ছিল না।’

শশাঙ্ক নিভার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। আজানুলম্বিত এলোচুলে আজ সে বুঝি প্রথম দেখল নিভাকে।

‘আপনি বলাটা আর ছাড়তেই পারলে না।’

শান্তভাবে কোলের উপর হাতদুটি জড়ো করে বসে আছে নিভা। শশাঙ্কর কথায় তার ঠোঁটের কোণে একটা ম্লান হাসির আভাস ফুটে উঠল।

শশাঙ্কর বক্তব্য তার মনে পরিষ্কার ভাবে দানা বেঁধেছে। কোনও জড়তাই আজ আর সে অনুভব করবে না।

‘একটা কথা তোমাকে জানানো দরকার, নিভা।’

‘বলুন।’

‘বললে তুমি দুঃখ পাবে জানি। কিন্তু না বললে আমার নিজের বিবেক-যন্ত্রণা। দুঃখটা হয়তো তুমি সয়ে উঠতে পারবে—মৃত্যুশোকই যখন এভাবে বহন করছ—কিন্তু আমার বিবেকের দংশন বড় সাংঘাতিক। আর না-বলে পারছি না।’

‘বলুন না!’

‘অমিতাভর কাছে প্রদোষের শেষ চিঠির কথা জানলাম। তাতে আয়ুবৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণার উল্লেখ আছে।’

‘জানি। অমিতাভবাবু বলেছেন।’

‘তার খাতাটা কেন পাওয়া যায়নি তার কারণ আমি জানি।’ নিভার দৃষ্টিতে কৌতূহল।

‘কী কারণ?’

‘আমিও ওই একই বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছিলুম। সে-কথা আমি প্রদোষকে বলি—ওর...ইয়ের...মাস দু-এক আগে। আমার বিশ্বাস সে নিজের গবেষণা বিসর্জন দিয়ে আমার পথ খোলসা করে দিয়েছে।’

নিভা এখনও শশাঙ্কর দিকে চেয়ে আছে। কী বলতে চায় তার চাহনি? শশাঙ্কর মনে হল এমনভাবে একদৃষ্টে নিভা কোনওদিন তার দিকে চায়নি। ভাগ্যবান প্রদোষ! আজ সে নেই—কিন্তু বিশ বৎসর সে নিভার সান্নিধ্যলাভ করেছে।

শশাঙ্ক বলল, ‘তার অন্তঃকরণ যে কত মহৎ ছিল, এ থেকেই তা বোঝা যায়।’

এবার নিভা কথা বলল।

‘আগে বলেননি কেন?’

‘ভেবেছিলাম প্রদোষের গবেষণা আর আমার গবেষণা একত্র করে একটা কিছু করব—কিন্তু যখন বুঝলাম যে, সে নিজে তার গবেষণার কোনও চিহ্ন রাখতে চায়নি—’

‘আশা করি আপনার কাজ সফল হবে।’

‘প্রদোষের গবেষণার ইঙ্গিত পেলে হয়তো আরও সহজে হত। তবে এ-বিশ্বাস আছে যে, এতদিনে হয়তো সত্যিই একটা কাজ, একটা প্রতিষ্ঠা হবে। বিফলতাই তো জীবনের মূল সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যা চেয়েছি তার কোনওটাই পাইনি—কোনওদিনই।'

নিভা তার দৃষ্টি নত করল। কয়েক মুহূর্তের গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে এবার শশাঙ্ক গাঢ়স্বরে বলল, 'আমি কেবল জানতে চাই—আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস আছে কি না।'

নিভার উত্তর যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল।

'সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

এর পরের কথাটির জন্য শশাঙ্ক নিজেই যেন প্রস্তুত ছিল না।

'নিভা—তোমার মনে আমার প্রতি এতটুকুও প্রসন্নভাব...আকর্ষণ...কি স্থান পেতে পারে?'

ক্ষণিকের জন্য নিভার দৃষ্টি শশাঙ্কর দিকে নিবদ্ধ। তারপর সে দৃষ্টি নত করে আবার সেই শান্ত গলায় বলল, 'ও প্রশ্ন আজ থাক। এখন থাক।'

শশাঙ্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। নিভার যেন ব্যস্ত ভাব।

'শরবত—?'

শশাঙ্কর ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধ হাসি।

'আজ থাক। এখন থাক।'

'আপনার হাতে...?' নিভার চোখ ব্যান্ডেজের দিকে।

'চায়ের জল। ফুটন্ত। চাকরটা ছুটিতে। আমি আবার ব্যাচেলার—জানোই তো...'

নিভার লেক প্লেসের বাড়ি থেকে ট্যাক্সি করে বেলঘরিয়া পৌঁছতে শশাঙ্কর লাগল পঞ্চাশ মিনিট। সারা পথ সে তার জেলির মনোমুগ্ধকর রূপটি মনে করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু সকালে অল্প সময়ের মধ্যেই তার এত বিচিত্র পরিবর্তন সে দেখেছে যে, পদার্থটির কোনও একটি বিশেষ আকৃতি বা বর্ণ তার পক্ষে মনে করা সম্ভব হল না। কেবল এইটুকুই সে বুঝল যে, অস্পষ্টতা সত্ত্বেও ময়ূরকণ্ঠি জেলি তাকে আকর্ষণ করেছে এক অমোঘ সম্মোহনী শক্তির মতো।

হাতের তেলোটায় সামান্য জ্বালা এখনও রয়েছে। বাঁ হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে চাবিটা বার করে শশাঙ্ক ল্যাবরেটরির দরজা খুলল। বাইরে মেঘের ঘনঘটা, ঘরের জানলা সব বন্ধ। শশাঙ্ক জানে ঘরের সুইচবোর্ড ঠিক ডানদিকেই।

দরজা খুলে অভ্যাসমতো সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই শশাঙ্ক বুঝল আলোর কোনও প্রয়োজন হবে না।

জেলি-প্রসূত ময়ূরকণ্ঠি আলোই তার ঘরটিকে আলোকিত করে রেখেছে।

টেবিলের উপর সকালের সেই গোলাকার পিণ্ড অবস্থাতেই জেলি এখনও অবস্থান করছে, কেবল তার আভা সকালের চেয়ে অন্তত চারগুণ বেশি।

শশাঙ্ক মন্ত্রমুগ্ধের মতো টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। নীল আলো এত তীব্র হয় কী করে? শশাঙ্কর চোখে জল আসছে। আনন্দাশ্রু? হবেও বা!

টেবিল থেকে যখন তিন হাত দূরে, তখন শশাঙ্ক দেখল জেলিপিণ্ডের মধ্যে মৃদুস্পন্দন আরম্ভ হয়েছে। তবে স্পন্দনটা জেলির সর্বাঙ্গে নয়—কেবল মাথার উপরের একটি অংশে। সেই স্পন্দমান অংশটি থেকেই যেন একটা উত্তাপ নির্গত হচ্ছে। শশাঙ্ক সে উত্তাপ তার দেহে অনুভব করল। বড় সর্বনেশে এ-উত্তাপ, কারণ এতে বিকর্ষণ নেই। শীতের দিনে আর্তের হাত যেমন আগুনের দিকে এগিয়ে যায়, এই ভর গ্রীষ্মের গুমোট অপরাহ্ণে শশাঙ্ক ঠিক সেইভাবেই তার দেহের উত্তমার্ধ জেলির দিকে এগিয়ে দিল।

তারপর যেটা ঘটল সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত—এবং সেটা হৃদয়ঙ্গম করার আগেই তীব্র যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায় শশাঙ্ক দেখল সে মেঝেতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

জেলির স্পন্দমান অংশটি থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ সদৃশ জেলির কণা তীরবেগে ধাবিত হয়ে তার ডান গালে একটি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই আক্রমণ সত্ত্বেও শশাঙ্ক জেলির প্রতি কোনও বিরূপ ভাব অনুভব করল না। সে জানে, সে পড়েছে, শুনেছে যে, নতুন কোনও আবিষ্কারের পথে বৈজ্ঞানিককে অনেক বাধা,

অনেক বিপত্তি সহ্য করতে হয়, অতিক্রম করতে হয়। আপাতত তার কাজ হওয়া উচিত জেলির জাত ও ধর্ম নির্ণয় করা। তা হলেই এর অপ্রত্যাশিত কার্যকলাপ বৈজ্ঞানিক নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়বে।

শশাঙ্ক তার প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বার করে গালের ক্ষতের উপর চাপা দিয়ে রক্তের স্রোত অবরোধ করে মেঝে থেকে উঠে পড়ল।

তারপর টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটি স্বচ্ছ কাচের আবরণ জেলিপিণ্ডের উপর ফেলে সেটিকে আচ্ছাদিত করল। সাবধানের মার নেই।

গালের ক্ষতে মলম লাগিয়ে স্টিকিং প্লাস্টার চাপা দেওয়ার সময় শশাঙ্ক একটি গাড়ির আওয়াজ পেল। তারই বাড়ির গেটের ভিতর দিয়ে গাড়িটা ঢুকছে।

অমিতাভর ফিয়াট।

ত্রস্তপদে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এসে ল্যাবরেটরির দরজা তালা দিয়ে বন্ধ করে শশাঙ্ক বিপরীত দিকের বৈঠকখানার দরজাটি খুলে দিয়ে ঘরে ঢুকে বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। সিঁড়িতে অমিতাভর বিলাতি

জুতোর শব্দ।

শশাঙ্ক সিঁড়ির মুখটাতে গিয়ে বন্ধুকে স্বাগত জানাল। এই ব্যস্ততার মধ্যে এতদূর আসার কারণ একটাই হতে পারে। অমিতাভর মুখের ভাবও শশাঙ্কের অনুমানের সত্যতাই প্রমাণ করে।

বৈঠকখানায় গিয়ে সোফায় বসার পর অমিতাভ মুখ খুলল। তার কণ্ঠস্বরে ইস্পাতসুলভ কাঠিন্য।

'তুই মিথ্যা কথা বলেছিস।'

শশাঙ্ক স্থির, নির্বাক।

'প্রদোষ স্যাক্রিফাইস করতে পারে—কিন্তু করবার আগে তার ফাইন্ডিংস্ সে তোকে দিয়ে যেত—নিশ্চয়ই। তার মনে সংকীর্ণতা ছিল না বলেই সে এটা করত—এবং তার সাহায্যের জন্যই।'

'তুই কী বলতে চাস?'

'প্রদোষের খাতা কোথায়?'

'বলেছি তো, সে নষ্ট করে ফেলেছে।'

অমিতাভর বুদ্ধিদীপ্ত চোখে তীব্র বিদ্বেষ জ্বলে উঠল।

'তোর লজ্জা করে না? যে লোকটা মরে গেছে তার জিনিস...শুধু জিনিস নয়—তার এতবড় একটা কাজ—তার শেষ কাজ—সেটা তুই বেমালুম—'

অমিতাভর কথা শেষ হল না। ষোড়শ শতাব্দীর একটি ইতালীয় চিনামাটির ফুলদানি তার মস্তকের উপর সজোরে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে সে একটি সামান্য 'আঁ' শব্দ করে সোফার উপর কাত হয়ে পড়ল। শশাঙ্ক উঠে এসে তার নাড়ি অনুভব করার সময় লক্ষ করল অমিতাভর ব্রহ্মতালু থেকে একটি তরল ধারা নির্গত হয়ে মেঝের গালিচায় চুঁইয়ে পড়ে তাতে একটি রক্তিম স্ফীতিমান নকশা আরোপ করছে।

সংকটকালে তার বুদ্ধির স্থির তীক্ষ্ণতায় শশাঙ্ক নিজেই বিস্মিত অনুভব করল।

তিন ঘণ্টার মধ্যেই শশাঙ্ক তার প্রাক্তন বন্ধুর মৃতদেহ বন্ধুরই ফিয়াট গাড়িতে নিয়ে গিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে একটি নির্জন স্থানে গাড়িসমেত রেখে বেলঘরিয়ায় ফিরে এল। গাড়ি জখম করতে গিয়ে সে নিজেও কিঞ্চিৎ জখম হয়েছে—কিন্তু সেটা যাকে বলে 'মাইনর ইন্‌জুরি'। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে দেড় মাইল পথ হেঁটে সিক্ত অবস্থায় বাস ধরে তাকে ফিরতে হয়েছে। বৃষ্টিতে পথঘাটের জনশূন্যতা তাকে অবশ্য সাহায্য করেছে। মালিকে ছুটি দিয়েছিল আগেই। সে ফিরবে রাত দশটার পর। বাঁ হাতেও শশাঙ্ককে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়েছে—দস্তানার অভাব পূরণ করার জন্য। ছাত্রাবস্থায় গোয়েন্দা কাহিনী পড়ার অভ্যাস আজ তার কাজে লেগেছে।

বেলঘরিয়ার বাড়িতে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় শশাঙ্ক ঘড়ির দিকে দেখল—আটটা বেজে তেরো মিনিট।

বাঁ হাতে ব্যান্ডেজবদ্ধ অবস্থাতেই শশাঙ্ক চাবি দিয়ে ল্যাবরেটরির দরজা খুলল।

সারাদিন বন্ধ ঘরের ভ্যাপসা গন্ধের বদলে তার থেকে এল মাদকতাপূর্ণ এক অনির্বচনীয় সৌরভ। সত্তর বছরের পুরনো ঘর যেন সহস্র ফুলের সুবাসে মশগুল হয়ে আছে।

শশাঙ্ক প্রায় নেশায় বিভোর হয়ে ঘরে প্রবেশ করল। টেবিলের দিকে চাইতে এক অভাবনীয় দৃশ্য তার চেতনাকে বিহ্বল করে দিল।

কাচের আবরণটি টেবিলের একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে, আর জেলির আকারে এক আশ্চর্য পরিবর্তন। সেটা এখন আর গোলাকৃতি নয়। গোলকের দেহ থেকে অজস্র নীলাভ পাপড়ি নির্গত হয়েছে, এবং প্রতিটি পাপড়ি যেন মৃদু সমীরণে হিল্লোলিত হচ্ছে।

গন্ধ যে এই সহস্রদল ময়ূরকণ্ঠি জেলিপুষ্প থেকেই নিঃসৃত হচ্ছে, শশাঙ্কর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইল না। দুরু দুরু বক্ষে ধীর পদক্ষেপে সে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। এমনই এই সৌরভের মহিমা যে, শশাঙ্কর মন থেকে আজই সন্ধ্যার কালিমালিপ্ত ঘটনাটি সম্পূর্ণ মুছে গেছে।

শশাঙ্ক এবার লক্ষ করল যে, টেবিলের যত কাছে সে এগিয়ে আসছে, পাপড়ির আন্দোলন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আরেকটি আশ্চর্য জিনিস শশাঙ্ক লক্ষ করল—এবারে উত্তাপের পরিবর্তে একটি পরম স্নিগ্ধ শীতলতা জেলি থেকে নিঃসৃত হয়ে তার দেহমনের সমস্ত অবসাদ দূর করে দিচ্ছে। শশাঙ্কর

অজ্ঞাতসারেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'কী অদ্ভুত! কী সুন্দর!'

এবারে ফুলের একটি বিশেষ পাপড়িকে যেন লম্বিত হতে লক্ষ করল শশাঙ্ক। ফুলের সমস্ত জ্যোতিটুকু যেন সেই লম্বমান পাপড়ির অগ্রভাগে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

পাপড়িটি ক্রমশ একটি সাপের আকার ধারণ করল—তার উজ্জ্বল নীলাভ ফণাটি যেন কোনও অদৃশ্য সাপুড়ের বাঁশির সঙ্গে তাল রেখে দুলছে।

শশাঙ্ক অনুভব করল যে, ক্রমবর্ধমান শৈত্যে তার স্নায়ু সব অসাড় হয়ে আসছে।

জেলিসর্পের ফণার অগ্রভাগের অত্যুজ্জ্বল নীল জ্যোতি তার দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করছে।

শশাঙ্ক এখন শক্তিহীন, অনড়। জেলিসর্পের ফণা তার গলদেশ লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে এখন শশাঙ্কর—কারণ ফণা তার গলদেশে বেষ্টন করে চাপ দিতে শুরু করেছে। ব্যান্ডেজবদ্ধ ডানহাতটা তুলে শশাঙ্ক ফাঁসমুক্ত হবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করল। কিন্তু এ নাগপাশে সহস্র অজগরের শক্তি।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শশাঙ্কর নিষ্প্রাণ দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

ফণা তখন শশাঙ্ককে মুক্তি দিয়ে টেবিলের বিপরীত দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। ফণার অগ্রভাগ থেকে এখন পাঁচটি নীলাভ আঙুল উদ্গত হয়েছে। সেই অঙ্গুলিবিশিষ্ট জেলিহস্ত শশাঙ্কর পেনসিলটি টেবিলের উপর থেকে অনায়াসে তুলে নিয়ে শশাঙ্করই কালো খাতার খোলা পাতার দিকে অগ্রসর হল।

মালি দুঃখীরাম যখন বেলঘরিয়া থানা থেকে ইনস্পেক্টর বসাককে তার মনিবের মৃতদেহ দেখতে নিয়ে এল তখন প্রায় রাত বারোটা। বসাক অবশ্য জেলিজাতীয় কোনও পদার্থর চিহ্ন দেখতে পাননি। শশাঙ্কর মৃতদেহ ছাড়া যে জিনিসটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি হল শশাঙ্কর নোটবুকের পাতায় শশাঙ্করই হস্তাক্ষরে একটি স্বীকারোক্তি—

'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমারই বিবেক।'

শারদীয়া আশ্চর্য: ১৩৭২ (১৯৬৫)

সবুজ মানুষ

আমি যার কথা লিখতে যাচ্ছি তার সঙ্গে সবুজ মানুষের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তা আমার সঠিক জানা নেই।

সে নিজে পৃথিবীরই মানুষ, এবং আমারই একজন বিশিষ্ট বন্ধু—স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক—প্রফেসর নারায়ণ ভাণ্ডারকার।

ভাণ্ডারকারের সঙ্গে আমার পরিচয় দশ বছরের—এবং এই দশ বছরে আমি বুঝেছি যে, তার মতো শান্ত অথচ সজীব, অমায়িক অথচ বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ খুব কমই আছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন জীবিত, ভাণ্ডারকার তখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন তাকে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষত, বিশ্বমৈত্রীর যে বাণী রবীন্দ্রনাথ প্রচার করেছিলেন, সে-বাণী ভাণ্ডারকার তার জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিল। সে বলত, 'যতদিন না জাতিবিদ্বেষের বিষ মানুষের মন থেকে দূর হচ্ছে ততদিন শান্তি আসবে না। আমার অধ্যাপক জীবনে সবটুকু আমি আমার ছাত্রদের মনে বিশ্বমৈত্রীর বীজ বপন করে কাটিয়ে দিতে চাই।'

সুইডেনে উপসালা শহরে সম্প্রতি যে দার্শনিক সম্মেলন হয়ে গেল, ভাণ্ডারকার তাতে আমন্ত্রিত

হয়েছিল। কাল বিকেলে উপসালা থেকে ফিরে এসে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

এখানে আমার নিজের পরিচয়টা একটু দিয়ে রাখি।

আমি যে জগৎটাকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জানি এবং ভালবাসি, সেটাকে সবুজ বলা বোধহয় খুব ভুল হবে না। আমার জগৎ হল গাছপালার জগৎ। অর্থাৎ আমি একজন বটানিস্ট। আমার দিনের বেশিরভাগ সময়টা কাটে গ্রিনহাউসের ভিতর। দুষ্প্রাপ্য ক্যাকটাস ও অর্কিডের যে সংগ্রহ আমার গ্রিনহাউসে আছে, ভারতবর্ষে তেমন আর কারুর কাছে আছে কিনা সন্দেহ।

ভাণ্ডারকার যখন এল, তখন আমি আমার গ্রিনহাউসেই আমার প্রিয় লোহার চেয়ারটিতে বসে টবে রাখা একটি এপিফাইলাম-ক্যাকটাসের বিচিত্র গোলাপি ফুলের শোভা উপভোগ করছিলাম।

বিকেলের রোদ কাচের ছাউনি ভেদ করে এসে গাছের পাতার উপর পড়েছে, আর তার ফলে সমস্ত গ্রিনহাউসের ভিতরটা স্নিগ্ধ সবুজ আভায় ছেয়ে গেছে। ভাণ্ডারকারকে দেখলাম সেই আলোতে। তাকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, 'তোমাকে সবুজ রঙটা ভারী ভাল মানিয়েছে।'

সে যেন একটু চমকে উঠেই বলল, 'সবুজ রঙ? কোথায় সবুজ?'

আমি হেসে বললাম, 'তোমার সর্বাঙ্গে। তবে ওটা ক্ষণস্থায়ী। সূর্যের আলো যতক্ষণ আছে ততক্ষণ। কিন্তু ওটা তোমাকে মানায় ভাল। তোমার মনটা যে কত তাজা সে তো আমি জানি! রবীন্দ্রনাথ বোধহয় তোমাকে লক্ষ্য করেই তাঁর 'সবুজের অভিযান' লিখেছিলেন।'

ভাণ্ডারকারকে দেখে মনে হচ্ছিল, বিদেশ সফরের ফলে তার যেন কতগুলি সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়েছে। তার চাহনিটা যেন আগের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ, অঙ্গচালনা আগের চেয়ে বেশি চঞ্চল।

ভাণ্ডারকার অন্য চেয়ারটায় বসে পড়ল। বললাম, 'তোমার খবর বলো। বাইরে কেমন কাটল?'

ভাণ্ডারকার কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে বলল, 'অবনীশ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীর সন্ধান পেয়েছি উপসালাতে।'

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'কার কথা বলছ বলো তো।'

সে বলল, 'নাম বললে চিনবে না। তার নাম বিশেষ কেউ জানে না—ও দেশেও না। তবে অদূর ভবিষ্যতে জানবে। কিন্তু নামের আগে যেটার সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার, সেটা হল তার চিন্তাধারা। আমার নিজের চিন্তাধারা সে সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছে।'

আমি এবার একটু হাল্‌কাভাবেই বললাম, 'সে কী হে! তোমার চিন্তাধারা পালটানোর প্রয়োজন আছে বলে তো আমার মনে হয়নি কখনও।'

ভাণ্ডারকার আমার ঠাট্টায় কর্ণপাত করল না। একটা হাতের উপর আর একটা হাত মুঠো করে রেখে আমার দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে, তার অস্বাভাবিক রকম পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণে সে বলল, 'অবনীশ—মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, সৌহার্দ্যে আর আমি বিশ্বাস করি না। দুর্বলের সঙ্গে সবলের, ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের, মূর্খের সঙ্গে মনীষীর সৌহার্দ্য হবে কী করে? আমরা মানবিকতা বলে একটা জিনিসে বিশ্বাস করি, যেটার আসলে কোনও ভিত্তিই নেই। ইকুয়েটর-এর মানুষের সঙ্গে মেরুর দেশের মানুষের মিল হবে কোত্থেকে! মঙ্গোলয়েড আর এরিয়ান-এ যা মিল, বা নর্ডিক ও পলিনেশিয়ান-এ যা মিল, বাঘে আর গোরুতেও ঠিক ততখানি মিল। 'হেরেডিটি', 'এনভাইরনমেন্ট' ও অদৃষ্ট—এই তিনে মিলে মানুষে মানুষে যে প্রভেদের সৃষ্টি করে—সেখানে মৈত্রীর বুলি কোন কাজটা করতে পারে? কালো মানুষ নির্যাতিত হবে না কেন? তাদের চেহারা দেখোনি, 'ফিজিওগনোমি' লক্ষ করোনি? মানুষের চেয়ে বানরের সঙ্গেই যে তাদের মিলটা বেশি, সেটা লক্ষ করোনি?'

ভাণ্ডারকার উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে এমন দৃষ্টি এর আগে কখনও দেখিনি।

আমার কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করে বললাম, 'ভাণ্ডারকার, তুমি নেশা করেছ কিনা জানি না। কিন্তু তোমার কথার তীব্র প্রতিবাদ না করে আমি পারছি না। এতগুলো ছাত্রের ভবিষ্যৎ হাতে নিয়েও যার এমন মতিভ্রম হতে পারে, তাকে আমি বন্ধু বলে মানতে রাজি নই। আমার এখনও একটা ক্ষীণ আশা আছে যে, এটা তোমার একটা রসিকতা; যদিও তাই বা হবে কেন জানি না, কারণ আজ তো পয়লা এপ্রিল নয়।'

ভাণ্ডারকার এক পা পিছিয়ে গিয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, "অবনীশ, তোমাদের মতো লোকের সারা জীবনটাই হল পয়লা এপ্রিল, কারণ তোমরা বোকা বনেই আছ। আমিও তোমাদের দলেই ছিলাম

এতদিন, কিন্তু এখন আর নেই। আমার চোখ খুলে গেছে। আমার ছাত্ররা যাতে আমার পথে চলতে পারে, এখন থেকে সেটাই হবে আমার লক্ষ্য। আমি ওদের বুঝিয়ে দেব যে, আজকের দিনেও যে কথাটা সত্যি সেটা হল সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা—'সারভাইভ্যাল অফ দি ফিটেস্ট।' যারা সবল, তারা যদি তাদের শক্তি প্রয়োগ করে দুর্বলদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, তবেই জগতের মঙ্গল।

'যে শক্তির কথা আমি বলছি সেটা অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর লোকে অনুভব করবে—তুমিও করবে। বিশ্ব-মৈত্রীর ধোঁয়াটে অবাস্তব বুলিতে যারা বিশ্বাস করে, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, অবনীশ। কিন্তু আমরা আছি, আমরা থাকব। আর আমাদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে, এবং বাড়বে। আমরাই হব পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি। আমি চললুম। গুড বাই।'

কথা শেষ করে উলটোদিকে ঘুরে দৃপ্ত পদক্ষেপে গ্রিনহাউসের দরজার দিকে এগিয়ে যাবার সময়, একটা সাধারণ ফণীমনসার গায়ে ভাণ্ডারকারের বাঁ হাতটা ঘষে গেল।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ভাণ্ডারকার তার কোটের পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে হাতের ওপর চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করলাম রুমালে রক্তের ছোপ লেগেছে। ভাণ্ডারকারও দেখল সে রক্ত, তারপর তার বিস্ফারিত দৃষ্টি আমার দিকে মুহূর্তের জন্য নিক্ষেপ করে সে ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে রক্তের কথা আমি কোনওদিনও ভুলব না, কারণ তার রঙ ছিল সবুজ।

ভাণ্ডারকার চলে যাবার পর আমি যে কতক্ষণ গ্রিনহাউসে বসে ছিলাম জানি না। কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। আজ সকালে আমার প্রিয় সবুজ ঘরে গিয়ে যে দৃশ্য দেখেছি, তারপর আমার আর বেঁচে থাকার কোনও সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না।

গিয়ে দেখি, আমার গাছপালার একটিও আর বেঁচে নেই। শুধু তাই নয়, প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সবুজ রঙটিও যেন কে শুষে নিয়েছে। যা রয়েছে, সেটা পাংশুটে—ভস্মের রঙ।...

আকাশবাণীর সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠানে প্রচারিত। ১৬.২.৬৬, রাত্রি ৮টা।

আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু

অনেকের মতে আর্যশেখর ছিলেন যাকে ইংরাজিতে বলে চাইল্ড প্রডিজি। তাঁর যখন দশ বছর বয়স তখন একদিন স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রথম পাতায় নীচের দিকে এক লাইন লেখা তাঁর চোখে পড়ল—সান রাইজেজ টুডে অ্যাট সিক্স থার্টিন এ এম। আর্যশেখর কাগজ হাতে নিয়ে পিতা সৌম্যশেখরের কাছে উপস্থিত হলেন।

'বাবা।'

'কী রে?'

'কাগজে এটা কী লিখেছে।'

'কী লিখেছে?'

'ছ'টা বেজে তেরো মিনিটে সূর্য উঠবে।'

'তা তো লিখবেই। সেই সময়ই তো সূর্য উঠেছে।'

'তুমি ঘড়ি দেখেছিলে?'

'ঘড়ি দেখতে হয় না।'

'কেন?'

'জানাই থাকে।'
'কী করে?'
'বিজ্ঞানের ব্যাপার। অ্যাস্ট্রনমি।'
'আর যদি ঠিক সময় না ওঠে।'
'ঘড়ি ভুল।'
'যদি ভুল না হয়?'
'তা হলে আর কী। তা হলে প্রলয়।'

সেদিন থেকে আর্যশেখরের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সূত্রপাত। এর দু' বছর পরে আবার আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আর্যশেখরকে পিতার কাছে যেতে হল।

'বাবা।'
'হুঁ।'
'চাঁদ আর সূর্য কি এক সাইজ?'
'দূর বোকা।'
'তা হলে?'
'সূর্য ঢের বড়।'
'কত বড়?'
'লক্ষ লক্ষ গুণ।'
'তা হলে এক সাইজ মনে হয় কেন?'
'সূর্য অনেক দূরে, তাই।'
'ঠিক যতখানি দূর হলে এক সাইজ মনে হয়, তত দূরে?'
'হুঁ।'
'কী করে হল?'
'জানি নে বাপু। আমি তো আর সৃষ্টিকর্তা বিধাতা নই।'

এখানে বলা দরকার, সৌম্যশেখর বৈজ্ঞানিক নন। তাঁর পেশা ওকালতি।

বাপের সঙ্গে কথা বলে আর্যশেখর বুঝলেন চন্দ্র-সূর্যের আয়তন আপাতদৃষ্টিতে এক হওয়াটা একটা আকস্মিক ঘটনা। তাঁর মনে এই আকস্মিকতা প্রচণ্ড বিস্ময় উৎপাদন করল। পাঠ্যপুস্তকের কথা ভুলে গিয়ে তিনি বাপের আলমারি খুলে দশ খণ্ডে সমাপ্ত হার্মওসয়ার্থ পপুলার সায়েন্স থেকে গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে পড়তে আরম্ভ করলেন। বলা বাহুল্য, এ কাজে তাঁকে ঘন ঘন অভিধানের সাহায্য নিতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে নিরুদ্যম হননি, কারণ কল্পনাপ্রবণতার সঙ্গে একাগ্রতার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে।

তাঁর চতুর্দশ জন্মতিথিতে আর্যশেখর পিতার টেবিলের দেরাজ খুলে তিনখানা অব্যবহৃত ডায়রি বার করে তার মধ্যে সবচেয়ে যেটি বড় তার প্রথম পাতায় লিখলেন—আমার মতে সৌরজগতের অন্য কোনও গ্রহে প্রাণী থাকলেও তা মানুষের মতো কখনওই হতে পারে না, কারণ এমন চাঁদ আর এমন সূর্য অন্য কোনও গ্রহে নেই। যদি থাকত, তা হলে আমাদের মতো মানুষ সেখানে থাকত। কারণ আমার মতে চন্দ্রসূর্য আছে বলেই মানুষ মানুষ।

এর পরের বছর আর্যশেখর হঠাৎ একদিন খেলাচ্ছলে মুখে মুখে দুরূহ গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে শুরু করলেন। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তো আছেই, তা ছাড়া আরও আছে যা একেবারে উচ্চমান গণিতের পর্যায়ে পড়ে। যেমন আকাশে ঘূর্ণায়মান চিল দেখে তার গতির মাত্রা, মাটি থেকে তার উচ্চতা এবং তার বৃত্তপথের পরিধি নির্ণয় করে ফেললেন আর্যশেখর। গৃহশিক্ষক মণিলাল মজুমদার ছাত্রের এই অকস্মিক ব্যুৎপত্তিতে অপ্রস্তুত হয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। সৌম্যশেখরও ছেলের এই কাণ্ডে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হলেন। তাঁর এবং তাঁর কয়েকটি বন্ধু ও মক্কেলের উদ্যোগে ক্রমে শহরের বিশিষ্ট গণিতজ্ঞদের দৃষ্টি আর্যশেখরের প্রতিভার দিকে আকৃষ্ট হল। প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপক জীবনানন্দ ধর নিজে এসে সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে আর্যশেখরকে নানারকম ভাবে পরীক্ষা করে তাঁকে দীর্ঘ প্রশংসাপত্র লিখে দিয়ে গেলেন। তিনি লিখলেন, 'মুখে মুখে গণিতের সমস্যা সমাধানে উত্তরকালে আর্যশেখর সোমেশ বসুকে

অতিক্রম করে গেলে আমি আশ্চর্য হব না। আমি এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন বালকের দীর্ঘজীবন কামনা করি।'

অতিরিক্ত আয়ের একটা সম্ভাবনা সামনে পড়লে অনেক অর্থবান ব্যক্তিও সহজে সেটাকে উপেক্ষা করতে পারে না। সৌম্যশেখরের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল, সুতরাং পুত্রের অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে আয়ের পথটা কিঞ্চিৎ সুগম করে নেবার পরিকল্পনা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তবে ছেলেকে না জানিয়ে কিছু করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, তিনি আর্যশেখরকে ডেকে পাঠালেন।

'ইয়ে, একটা কথা ভাবছিলাম বাবা।'

'কী?'

'আমার তো জানিসই—মানে, আজকাল যা দিন পড়েছে—সেই অনুপাতে তো খুব একটা ইয়ে হচ্ছে না—মোটামুটি চলে যায় আর কি। তা তোর যখন এমন একটা ইয়ে দেখা যাচ্ছে, সবাই বাহবা দিচ্ছে, মানে এও তো ধর গিয়ে একটা ম্যাজিক! তা সেটা যদি আর পাঁচজনকে দেখাবার সুযোগ দেওয়া যায়—মানে বেশ ভাল একটা জায়গা-টায়গা দেখে ভাল ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা...'

বলতে বলতে এবং সেইসঙ্গে ছেলের ক্ষুব্ধ বিস্মিত ভাব দেখে সৌম্যশেখর নিজেই লজ্জা বোধ করলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা থামিয়ে তারপর সুর পরিবর্তন করে বললেন, 'তোর যদি আপত্তি থাকে তা হলে কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

'তামাশা আর প্রতিভা এক জিনিস নয় বাবা।'

পিতার ব্যবহারে আর্যশেখরের মনে নতুন প্রশ্নের উদয় হল। এমন প্রতিভাবান পুত্রের এমন হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন বাবা হয় কী করে? পিতাপুত্রের চরিত্রের এই বৈপরীত্যই কি স্বাভাবিক, না এটা একটা ব্যতিক্রম?

আর ব্যতিক্রমই যদি হয়, তা হলে তার বৈজ্ঞানিক কারণ কী? আর্যশেখরের অবসরের অভাব ছিল না, কারণ তাঁর গাণিতিক প্রতিভা প্রকাশ পাবার কিছুদিনের মধ্যেই সৌম্যশেখর তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই অবসরে আর্যশেখর হেরিডিটি ও প্রজনন সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন আরম্ভ করে দিলেন। অচিরেই তিনি জীবনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করলেন। মানুষের শরীরে কয়েকটি পরমাণুর মধ্যে তার নিজের এবং তার ঊর্ধ্বতম ও অধস্তন পুরুষ পরম্পরার আকৃতি ও প্রকৃতির নির্দেশ লুকিয়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য!

আর্যশেখর আরেকবার বাপের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

'বাবা, আমাদের বংশলতিকা নেই?'

'বংশলতিকা? কেন?'

'আছে?'

'থাকলেও তা উইয়ে খেয়েছে। কেন, তুই কি জাতিস্মর-টাতিস্মর হলি বলে মনে হচ্ছে?'

'না, ভাবছিলাম, আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ প্রতিভাবান ছিলেন কিনা। তোমার আর ঠাকুরদাদার কথা তো জানি। তার আগে?'

'সাতপুরুষের মধ্যে কেউ ছিলেন না, এ গ্যারান্টি দিতে পারি। তার আগের কথা জানি না।'

ঘরে ফিরে এসে আর্যশেখর চিন্তা শুরু করলেন। বাপের দিকে সাতপুরুষের মধ্যে কেউ নেই। মাতৃকুলেও তথৈবচ—বরং সেখানে সম্ভাবনা আরও কম। গুণের দিক দিয়ে নীহারিকা দেবী অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর মহিলা। তিনি এখনও তাঁকে খোকা বলে সম্বোধন করেন বলে আর্যশেখর পারতপক্ষে তাঁর কাছে ঘেঁষেন না।

হেরিডিটির প্রভাব অনিশ্চিত। পরিবেশ? এনভায়রনমেন্ট? তেত্রিশ নম্বর পটুয়াটোলা লেন কি সেদিক দিয়ে খুব প্রশস্ত বলা চলে? বোধহয় না। তা হলে?

কিন্তু শুধুমাত্র হিসেব দিয়েই কি সত্যিকার কিছু প্রমাণ হয়? বাবার বাবা তার বাবা করে বংশলতিকা জিনিসটাকে তো টেনে একেবারে সৃষ্টির আদিতে নিয়ে যাওয়া যায়। জিনের প্রভাব কি তখন থেকেই প্রবাহিত হয়ে আসছে না? কে জানে আজ থেকে বিশ হাজার বছর আগে আর্যশেখরের পূর্বপুরুষ কে বা কেমন ছিলেন! এমনও তো হতে পারে তিনি আলতামিরার গুহায় দেয়ালে বাইসনের ছবি এঁকেছিলেন।

এইসব আদিম গুহা চিত্রকরদের জিনিয়াসের পর্যায়ে ফেলা যায় না? অথবা হরপ্পা মহেনজোদরোর মতো শহরের পরিকল্পনা করেছিলেন যাঁরা তাঁদের? অথবা বেদ উপনিষদের রচয়িতাদের? এঁদের মধ্যে কেউ যদি আর্যশেখরের পূর্বপুরুষ হয়ে থাকেন তা হলে আর চিন্তার কোনও কারণ থাকে না। কিন্তু তবু তাঁর মনটা খচখচ করতে লাগল। সৌম্যশেখরের মতো কল্পনা-বিমুখ বৈষয়িক-চিন্তাসর্বস্ব স্থূল ব্যক্তি যে তাঁর জন্মদাতা হতে পারেন, এর কোনও বৈজ্ঞানিক সমর্থন তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ভাবতে ভাবতে সহসা একটি সম্ভাবনা এসে তাঁর মনে দুরমুশের মতো আঘাত করল।

তিনি যদি জারজ সন্তান হয়ে থাকেন? যদি সৌম্যশেখরের ঔরসে তাঁর জন্ম না হয়ে থাকে?

কথাটা মনে হতেই আর্যশেখর বুঝলেন, এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তাঁর বাবাই দিতে পারেন এবং সে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। সত্যান্বেষণের খাতিরে পুত্র পিতাকে প্রশ্ন করবে, এটা আর্যশেখরের কাছে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হল।

নশো চব্বিশ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ ল ডাইজেস্টে নিমগ্ন সৌম্যশেখর পুত্রের প্রশ্ন প্রথমবার অনুধাবন করতে পারলেন না।

'যমজ সন্তান? কার কথা বলছিস?'

'যমজ নয়, জারজ। আমি জানতে চাই আমি জারজ সন্তান কিনা।'

এ-কথায় সৌম্যশেখরের ওষ্ঠদ্বয় বিভক্ত হল। তারপর তাতে কম্পনের আভাস দেখা দিল। তারপর সে কম্পন তাঁর সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হল। তারপর তাঁর কম্পমান ডান হাত কাছে আর কিছু না পেয়ে একটি ভারী কাচের পেপারওয়েট তুলে আর্যশেখরের দিকে নিক্ষেপ করল। আর্যশেখর আর্তনাদ করে রক্তাক্ত মস্তকে ভূলুণ্ঠিত হলেন।

আরোগ্যলাভের পর বোঝা গেল আর্যশেখরের অলৌকিক গাণিতিক প্রতিভাটি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

আর্যশেখরের যখন উনিশ বছর বয়স, তখন একদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে একটি শিরীষ গাছের নীচে উপবিষ্ট অবস্থায় বৃক্ষস্থিত কোনও পক্ষীর বিষ্ঠা তাঁর বাম স্কন্ধে এসে পড়ায় তিনি সহসা মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে সচেতন হলেন। যথারীতি তিনি এ বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করলেন। তাঁর ধারণা ছিল নিউটনের আপেলের ঘটনাটা বুঝি কিংবদন্তি। প্রিন্সিপিয়াতে নিউটনের নিজের লেখায় সে ঘটনার উল্লেখ দেখে তাঁর ধারণার পরিবর্তন হল। তাইকো ব্রাহি গ্যালিলিও থেকে শুরু করে কোপারনিকাস, কেপলর, লাইবনিৎস-এর রাস্তা দিয়ে ক্রমে আর্যশেখর আইনস্টাইনে পৌঁছে গেলেন। আর্যশেখরের বিদ্যায় আইনস্টাইন জীর্ণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু পাঠ্য-অপাঠ্য বোধ্য-দুর্বোধ্য সবরকম পুস্তকই আদ্যোপান্ত পাঠ করার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল আর্যশেখরের। অবিশ্যি বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁর পড়ার আগ্রহের একটা কারণ ছিল এই যে, তিনি জানতে চেয়েছিলেন মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে শেষ কথা বলা হয়ে গেছে কিনা। আইনস্টাইন পড়ে এইটুকু তিনি বুঝলেন যে মাধ্যাকর্ষণ কী তা জানা গেলেও মাধ্যাকর্ষণ কেন, তা এখনও জানা যায়নি। তিনি স্থির করলেন, এই 'কেন'-র অন্বেষণই হবে আপাতত তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

সেইদিনই আর্যশেখর স্থির করলেন যে, তিনি যাবতীয় তুচ্ছ ঘটনার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। অনেক আবিষ্কারের পশ্চাতেই যে নিউটনের আপেলের মতো একটি করে তুচ্ছ ঘটনা রয়েছে, এটা তাঁর জানা ছিল।

দুঃখের বিষয়, প্রায় তিন মাস ধরে সহস্রাধিক তুচ্ছ ঘটনা লক্ষ করেও তিনি তাদের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেলেন না, যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেক আগেই হয়ে যায়নি। অগত্যা আর্যশেখরকে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হল। উপলব্ধির আদিতে ধ্যান—এই বিশ্বাসে তিনি তাঁর বাড়ির তিনতলার ছাতে চিলেকোঠায় গিয়ে ধ্যানস্থ হতে মনস্থ করলেন।

প্রথম দিনই—সেদিন ছিল রবিবার, ছাতে উঠে চিলেকোঠার তক্তপোশে বসে চক্ষু মুদ্রিত করার অব্যবহিত পূর্বে জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির ছাতে একটি তুচ্ছ ঘটনা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রতিবেশী ফণীন্দ্রনাথ বসাকের সপ্তদশ বর্ষীয়া কন্যা ডলি বাহু উত্তোলন করে ধৌতবস্ত্র রজ্জুতে আলম্বিত করছে। এই দৃশ্যে মুহূর্তের মধ্যে আর্যশেখরের মন মাধ্যাকর্ষণ-সম্পর্কিত এক আশ্চর্য নতুন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সাতদিনের মধ্যে ফুলস্ক্যাপ কাগজের একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করলেন। বর্তমান সংক্ষিপ্ত জবানিতে তার বিস্তারিত বিবরণ সম্ভব নয়, তবে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব নিম্নগামী। মাধ্যাকর্ষণের মতো জীবনবিরোধী শক্তি সত্ত্বেও প্রাণ সৃষ্টি হল কী করে? তার কারণ সূর্য। কিন্তু সূর্যের প্রভাব চিরস্থায়ী নয়, পার্থিব মাধ্যাকর্ষণের নৈকট্য ও অবিরাম প্রভাব ক্রমে সূর্যের প্রভাবকে পরাভূত করে। ফলে প্রথমে জরার প্রকোপ এবং শেষে মৃত্যু এসে প্রাণশক্তিকে গ্রাস করে। শুধু যে জড়পদার্থেই এই দুই প্রভাবের পরস্পর বিরোধ দেখা যায় তা নয়; মানুষের কাজে, চিন্তায়, হৃদয়াবেগে, মানুষে মানুষে সম্পর্কে—সবকিছুতেই এটা বর্তমান। মানুষের যত হীন প্রবৃত্তি, সমাজের যত অনাচার অবিচার দুঃখ দারিদ্র্য যুদ্ধবিগ্রহ, সবই মাধ্যাকর্ষণজনিত। আর যা কিছু সুন্দর ও সতেজ, যা কিছু উন্নত, যা কিছু মঙ্গলকর, সবই সূর্যের প্রভাবে। মাধ্যাকর্ষণ আছে বলেই কোনওদিন পৃথিবীর কলঙ্ক দূর হবে না। অনেকদিন আগেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত—কিন্তু সূর্য তা হতে দেয়নি। ধ্বংসের পাশে সৃষ্টির কাজ চলে এসেছে আবহমান কাল থেকে।

প্রবন্ধটি শেষ করে আর্যশেখর চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে সূর্যের উদ্দেশে, তারপর প্রতিবেশী ডলির উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। ঠিক সেই সময় চাকর ভরদ্বাজ এসে বলল তাঁর বাপ নীচে ডাকছেন।

সৌম্যশেখর ক'দিন থেকেই ছেলে সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। স্ত্রী নীহারিকার মৃত্যু হয়েছে গত বছর। ছেলের একটা হিল্লে দেখে যেতে পারলেন না বলে মৃত্যুশয্যায় তিনি আক্ষেপ করেছিলেন।

হাতের কাগজ পাকিয়ে নিয়ে আর্যশেখর বাপের সামনে এসে দাঁড়ালেন

'তুই কী হচ্ছিস বল তো? সাপ না ব্যাঙ না বিচ্ছু?'

'সেটা আমার জিনের স্বরূপ না বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে না।'

'কীসের স্বরূপ?'

'জিন।'

'তোর তো অর্ধেক কথার মানেই বুঝি না।'

'সবাই তো সবকিছু বোঝে না। আমি কি ওকালতির কিছু বুঝি?'

'আমার ওকালতির জোরে খাচ্ছ সেটা বোঝো তো? তবে তোমার যা বয়স তাতে বসে বসে বাপের পয়সায় খাওয়াটায় কোনও বাহাদুরি নেই। কাজেই ওসব জিনফিন বলতে এসো না আমার কাছে। তুমি ছাতের ঘরে বসে যাই করো না কেন, এটা জেনে রেখো যে, আর পাঁচটা বাউণ্ডুলে বখাটে বেকারের সঙ্গে তোমার কোনও প্রভেদ নেই। আর এক বছর সময় দিলাম। তার মধ্যে যা হোক একটা চাকরি দেখে নেবে। ডিগ্রি-ফিগ্রি যখন হল না তখন বেশি কিছু আশা করি না আমি। তবে স্বাবলম্বী তোমায় হতে হবে। তারপর অন্য কাজ।'

'অন্য কী কাজ?'

'বংশবৃদ্ধির কথাটাও তো ভাবতে হবে। না কি তুমি বিয়ে করবে না বলে ঠিক করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'করবে না?'

'না।'

'কেন, সেটা জানতে পারি?'

'প্রথমত, আমার প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।'

সৌম্যশেখরের বিষম লাগল। আর্যশেখর তাঁকে প্রকৃতিস্থ হবার সময় দিলেন।

'দ্বিতীয়ত, আমার জীবনের মধ্যাহ্নে যখন সূর্যের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল, তখন আমার কাজ ও চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে এটা আমি চাই না।'

'তুই কি কোনও ধর্মে-টর্মে দীক্ষা নিয়েছিস নাকি?'

'তা বলতে পারো।'

'কী ধর্ম?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ধর্ম। নামকরণ এখনও হয়নি।'

মুহূর্তকালের জন্য সৌমশেখরের আশা হয়েছিল যে, তিনি বুঝি পুত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন। এখন বুঝলেন, সেটা ঠিক না। কিছুক্ষণ তিনি ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। বিশেষ করে তার চোখের দিকে দৃষ্টিতে পাগল হবার কোনও লক্ষণ আছে কি? সৌম্যশেখরের প্রপিতামহ শেষজীবনে উন্মাদ হয়ে এক মহাষ্টমীর দিন উলঙ্গ অবস্থায় গ্রামসুদ্ধ লোকের সামনে পুজামণ্ডপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর্যশেখরকে এ ঘটনা তিনি কখনও বলেননি। সৌম্যশেখরের মনে পুত্র সম্বন্ধে একটা স্নিগ্ধ করুণার ভাব জেগে উঠল। হাজার হোক একমাত্র ছেলে, সবেধন নীলমণি। যা করছে করুক—বেঁচে থাকলেই হল। আর মাথাটা খারাপ না হলেই হল!

'ঠিক আছে। তুমি এসো'খন।'

আর্যশেখর প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ইংরাজিতে—কারণ এ জাতীয় লেখার কদর কোনও বাঙালি পাঠক করবে এ-কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। এবার তিনি সৌম্যশেখরের পুরনো রেমিংটনের সাহায্যে অপটু হাতে অনেক পরিশ্রমে প্রবন্ধটির চার কপি টাইপ করলেন। শেষ হলে পর তিনি অনুভব করলেন, তাঁর হাত-পা কোমর-পিঠে টান ধরে ব্যথা হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া একটানা ঘরের মধ্যে থেকে-থেকে দমও প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে।

আর্যশেখর ছাত থেকে নেমে এলেন। গোলদিঘির ধারে একটু হেঁটে আসবেন মনে করে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেখলেন, গেরুয়া পাঞ্জাবি পায়জামা পরিহিত শ্মশ্রুগুম্ফ-লম্বাকেশবিশিষ্ট একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে।

আর্যশেখরকে দেখে যুবক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল মহাবোধি সোসাইটির অবস্থানটা তাঁর জানা আছে কিনা। আর্যশেখর বললেন, 'চলো তোমায় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি ওদিকেই যাচ্ছি।'

যাবার পথে আর্যশেখর যুবকের পরিচয় পেলেন। তাঁর নাম বব গুডম্যান। নিবাস টোলিডো ওহায়ো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো ত্যাগ করে ভারতবর্ষে এসেছেন প্রেম ও আলোর সন্ধানে।

আর্যশেখরের ছেলেটিকে ভাল লাগল। সেইদিনই রাত্রে তাঁকে তাঁর প্রবন্ধটি পড়তে দিলেন। বললেন, তুমিই প্রথম আমার এ লেখা পড়ছ। তোমার মন্তব্য জানার আগ্রহ রইল।

পরদিন সকালে গুডম্যান ফুলস্ক্যাপের তাড়া ঝোলায় নিয়ে চিনাবাদাম খেতে খেতে এসে বললেন—ইটস্ গ্রেট, গ্রেট। ইয়্যা—ইউ গট সামথিং দেয়ার—ইয়্যা।

আর্যশেখর চাপা গলায় তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর গুডম্যান বললেন, 'কিন্তু তোমার লেখায় এত পেসিমিজম্ কেন? মাধ্যাকর্ষণকে পরাস্ত করার কত উপায় তো তোমার দেশেই রয়েছে। তুমি লেভিটেশনের কথা জানো না? তোমাদের দেশের যোগী পুরুষদের কথা তুমি জানো না?'

গুডম্যান এবার তাঁর ঝোলা থেকে একটি কাগজের মোড়ক বার করে আর্যশেখরের হাতে দিলেন। মোড়ক খুলে দেখা গেল তাতে রয়েছে একটি চারচৌকো চিনির ডেলা। অন্তত দেখলে তাকে চিনি বলেই মনে হয়। গুডম্যান বললেন, 'এটা সুগার কিউবই বটে, কিন্তু এর মধ্যে এককণা অ্যাসিড রয়েছে। মাধ্যাকর্ষণকে জব্দ করার মতো এমন জিনিস আর নেই। তুমি খেয়ে দেখো। নানান প্রতিক্রিয়া হবে—ভয় পেয়ো না। আমার মনে হয় এটা খেলে পর তোমার মন থেকে পেসিমিজম্ দূর হয়ে যাবে।'

গুডম্যান প্রদত্ত মোড়কটি হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে আর্যশেখর সটান চলে গেলেন তিনতলার ছাতে। আশ্বিনের অপরাহ্ণে স্নিগ্ধ পড়ন্ত রোদে মাদুরে বাবু হয়ে বসে তিনি চিনির ডেলাটি মুখে পুরে চিবোতে আরম্ভ করলেন।

কয়েক ঘণ্টা কিছুই হল না। তারপর এক সময়ে আর্যশেখর অনুভব করলেন তিনি সূর্যের দিকে উত্থিত হচ্ছেন। এক অনির্বচনীয় মাদকতায় তাঁর দেহমন আচ্ছন্ন হল। নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন ধূলি-ধূম্রধূসর কলকাতা শহরকে তেহেরানের গালিচার মতো বর্ণাঢ্য ও মনোরম দেখাচ্ছে। মাথার উপরের আকাশ সর্পিল গতিবিশিষ্ট অজস্র বিচিত্র বর্ণখণ্ডে সমাকীর্ণ। আর্যশেখর বুঝলেন সেগুলো ঘুড়ি, কিন্তু এমন ঘুড়ি তিনি কখনও দেখেননি। একটি বর্ণখণ্ড তাঁর দিকে এগিয়ে এল। আর্যশেখর পরম আত্মীয়তাবোধে বাহু সম্প্রসারিত করে সেই বর্ণখণ্ডের দিকে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তাঁর আর কিছু মনে নেই।

ডাক্তার বাগচির নির্দেশমতো ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে মিহিজাম যাবার আগে আর্যশেখর একজন

পেশাদার টাইপিস্টকে দিয়ে তাঁর মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত প্রবন্ধটি পঞ্চাশ কপি টাইপ করিয়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের বাছাই-করা বিজ্ঞানী ও মনীষীদের পাঠালেন। এই ভাগ্যবানদের মধ্যে একজনের উত্তর মিহিজাম যাবার ঠিক আগের দিন আর্যশেখরের হস্তগত হল। ইংল্যান্ডের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থবিদ প্রফেসার কারমাইকেল প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছেন—'আই ফাউন্ড ইট মোস্ট ইন্ট্রিগিং।'

মিহিজাম পর্বের ঘটনা সংক্ষিপ্ত, সুতরাং তার বিবরণও সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

১৯শে অক্টোবর—অর্থাৎ মিহিজাম পৌঁছবার পরের দিন আর্যশেখর ডায়রিতে লিখলেন—'পাখি পাখি পাখি পাখি। পাখি ইজ পাখি। মোস্ট ইন্ট্রিগিং; সূর্যের সবচেয়ে কাছে যায় কোন প্রাণী? পাখি। ও বার্ড, হাউ ইয়োর ফ্লাইট ফ্লাউটস মাধ্যাকর্ষণ!'

২রা নভেম্বর চাকর ভরদ্বাজ দেখল আর্যশেখর কোত্থেকে জানি একটা বাবুইয়ের বাসা নিয়ে এসে বিছানার উপর পা ছড়িয়ে বসে গভীর মনোযোগে বাসার বুনন-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

পরের দিন আর্যশেখর নিজেই খড়কুটো সংগ্রহ করে এনে নিজের হাতে একটি বাবুইয়ের বাসা তৈরি করতে শুরু করলেন। সেদিন রাত্রে তাঁর ডায়রিতে লেখা হল—

'ম্যানস হাইয়েস্ট অ্যাচিভমেন্ট উড বি টু রাইজ টু দ্য লেভেল অফ বার্ডস।'

১৩ই নভেম্বর বাবুর ফেরার দেরি দেখে ভরদ্বাজ তাঁকে খুঁজতে বেরোলো। আধঘণ্টা খোঁজার পর আর্যশেখরকে সে পেল অজ্ঞান অবস্থায় ধানখেতের পাশে একটি বাবলা গাছের নীচে। গাছে একটি কাঁটার সঙ্গে বাঁধা তৈরি বাবুইয়ের বাসা।

স্থানীয় ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, সানস্ট্রোক। সৌম্যশেখর কলকাতা থেকে চলে এলেন। তিনদিন ঘোর বিকারের পর পিতা ও ভৃত্যের সামনে আর্যশেখরের মৃত্যু হল।

শেষনিশ্বাস ত্যাগ করার ঠিক আগে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন আর্যশেখর—'মাগো!'

শারদীয়া অমৃত ১৩৭৫

পিকুর ডায়রি

আমি ডাইরি লিখছি। আমি আমার নীল নতুন নীল খাতায় ডাইরি লিখছি। আমি আমার বিছানার উপর বসে লিখছি। দাদুও ডাইরি রোজ লেখে কিন্তু এখন না এখন অসুক করেছিল তাই। সেই অসুকটার নাম আমি জানি আর নামটা করোনানি থমবোসি। বাবা ডাইরি লেখে না। মাও ডাইরি লেখে না দাদাও না খালি আমি আর দাদু। দাদুর খাতারচে আমার খাতা বড়। ওনুকুল এনে দিয়েছে বল্লো কুড়ি পয়সা দাম মা আগেই পয়সা দিয়েছে। আমি রোজ ডাইরি লিখবো রোজ যেদিন ইসকুল থাকে না। আজ ইসকুল নেই কিন্তু রবিবার না কিন্তু খালি আজ স্ট্রাইকের জন্য ছুটি। প্রাই স্ট্রাইকের জন্য ছুটি বেশ মজা তাই জন্য। ভাগগিস লাইন টানা খাতা তাই লেখা বেকে যাচ্ছে না দাদা কিন্তু লাইন ছাড়াই সোজাই লেখে আর বাবাতো লেখেই বাবার কিন্তু ছুটি নেই। দাদারো নেই। মারো নেই। মাতো কাজ করে না আপিসে বাড়িতে খালি কাজ। এখন মা নেই মা হিতেসকাকুর সঙ্গে গেছে আর বলেছে আমায় একটা জিনিস একটা দেবে নিউ মারকেট থেকে এনে দেবে। আজকাল মা খুব জিনিস দেয়। একটা পেনসিল কাটার একটা রিসটাচ তাতে খালি তিনটেই বেজেছে একটা হকিস টিক আর একটা বল। ও আর একটা বই সেটা গৃম ফেয়ারি টেল তাতে অনেক ছবি। আজ কি আনবে তা সেটা ভগবান জানে হয়তো বোধয় এআরগানটান তাইতো বলেছি দেখা যাক। ধিংড়া একটা সালিখ মেরেছে এআরগান দিয়ে আমিও একটা চড়াই রোজ বসে রেলিংয়ে সেটাকে মারবো টিপ করে দম করে মরেই যাবে। কাল রাততিরে খুব জোরসে বম ফাটলো বাবা বল্লো বম মা বোল্ল না না গুলি বোধহয় পুলিস-টুলিস বাবা বল্লো না বম আজকাল প্রায়ই দুম দুম আওয়াজ হয় জালনা দিয়ে। ওই যে গাড়ির হর্ন এটা নিশ্চয় হিতেসকাকুর আমি জানি স্টেনডাড হেরাল তাহলে নিশ্চই মাই এলো।

কাল মা এআর গান দিলেন নিউ মারকেট থেকে সেটা হিতেসকাকু দিলো বল্ল পিকুবাবু আমি এটা দিলাম কিন্তু তোমার মা কিন্তু না। হিতেসকাকু ঘড়ির একটা ব্যান কিনেছে ঘড়ির নামটা আমি বল্লাম টিসট আর হিতেসকাকু বোল্ল উহু টিশো শেসের টিটা উচ্চারণ হয় না তাই। আমার এআর গানটা খুব ভালো আর খুব বড় একটা কৈটোতে ছররা আছে অনেক একসোটারো বেসি। আমায় সিখিয়ে দিয়েছে হিতেসকাকু আমি মেরেছি এমনি আকাসে আর ওনুকুল চমকে গেলো। চড়াইটা কাল আসেইনি আজো আসেনি বদমাইস আছে কাল আসবেই আসবে আর আমিতো রেডি হয়ে থাকবো। বাবা আপিস থেকে বাবা এসে বল্লেন আবার বোনদুক কেন মা বল্লেন তাতে কি বাবা বল্লেন এমনিতেই দুমদাম লেগেই আছে আবার কেন বোনদুক বাড়িতে মা বোল্লেন তাতে কি হয়েছে বাবা বল্লেন তোমার কোনো সেনস নেই মা বল্লেন চেচামেচি আপিস থেকে এসেই কেন বাবা বল্লেন না বাবা হ্যা বাবা বল্লেন ইংরিজিতে মাও ইংরিজিতে। মা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক সিনেমার মত। আমি জেরি লুইস দেখেছি আর ক্লিনট ইসটুড আরেকটা একটা হিন্দি সেটা মিলুদিদের সঙ্গে সেটায় ফাইটিং নেই এই যা বোধহয় কলমে

আমার ফাউনটেন পেনে বাবার সবুজ কালিটা যেটা কুইং সেটা ভরেছি ড্রপা দিয়ে মার মিসটলের মার সরদি হয়েছিল সেটা দিয়ে! আজকে বাবার টেবিলে লিখছি বসে বসে ডাইরিটা। টেলিফোন একটু আগেই কিরিং কিরিং কিরিং হল আর আমি দৌড়ে এলাম আর এসে হ্যাল বল্লাম ওমা দেখি বাবা বাবা বল্লেন কে পিকু আমি বল্লাম হ্যা আমি বাবা বল্লেন মা নেই আমি বল্লাম না মা নেই বাবা বল্লেন কোথায় মা আমি বল্লাম মা হিতেসকাকুর সংগে সিনেমা বড়দের যেটা সিনেমা সেটা দেখতে গেছে তাই মা নেই

বাবা বল্লেন ও বলে কড়াক করে ফোনটা রেখে দিলেন আমি আওজ পেলাম। তারপর আমি একবার ডায়েল করলাম ওয়ান সেভেন ফোর আর তাতে টাইম বল্ল আমি টাইম মাঝে মাঝে সুনি কি যে বলে বোঝাই ছাই যায় না। আজ চড়াইটা এসেছিল। আমি জালনার ধারে এআরগান আর চড়াইটা ঠিক এলো আমি দম করে মারলাম আর ছররাটা দেআলে ধিংড়ার বাড়ির দেআলে দেখলাম একটা ফুটো। চড়াইটা খুব ভিশন ভয়পে উড়ে পালিয়ে গেলো। দাদা কাল ছাতে টিপ দারুণ টিপ ট্যাংকের উপর দইএর একটা ভাড় ছোটো খুব সবচে ছোটটো ভাড় রাখলো আর অনেক দূর থেকে টিপ করে দম করে আর ভাড়টা

টুকরো টুকরো কয়েকটা আবার টুকরো রাস্তায় গিয়ে পড়ল যদি কারো মাথায় টাথায় লাগে তাহলেই হয়েছে আমি বল্লাম। দাদা অনেক বড় আমারচে বারো বছর তাই দাদার টিপ। দাদা কলেজে পড়ে আর আমি ইসকুলেতো। দাদা রোজ বাইরে বার আর আমিতো বাড়িতেই থাকি মাঝে মাঝে খালি সিনেমা দেখি আর সি এল টি একটা দেখেছি। দাদাতো কাল অনেক রাততিরে ফিরেছে আর তাই বাবাতো খুব বকলেন দাদাও খুব জোরসে বল্লো কথা আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে এত জোরসে একটা তাই খুব ভালো সপনো আর শেস হলই না। দেখলাম আমি দেখছিলাম টগবগ টগবগ খুব জোরসে যাচ্ছি ঘোড়ায় আর ধিংড়া আমাকে ধরতেই পারছে না আর হিতেসকাকু আমাকে নোতুন বোনদুক সেটা রিভলবার দিয়েই বল্ল এটার নাম ফিসো আর দাদু একটা কাউবয় বলছে দাদুভাই চল যাই ভিকটোরিয়া মেমোরিয়া আর তখনি সপনোটা ভেঙে গেল। এবার যাই একটু বাতরুমে।

কাল আমাদের বাড়িতে একটা পারটি ছিল। কিন্তু আমার জন্মদিন না কিন্তু এমনি পারটি। সবাই খালি বড়রা তাই আমি যাইনি খালি মাঝে মাঝে একটু খালি দেখছিলাম। খালি বাবার বন্ধু আর মার বন্ধু আর কিন্তু দাদারো বন্ধু না। দাদা নেই পরসু কিমবা তরসু থেকেই নেই তা জানি না কোথায়। দাদাতো পলিটিস করে তাই হোপলেস বাবা খালি খালি বলে আর মাও বলে। মাতো বারণ করে তাই আমি পারটিতে যাইনা কিন্তু কাল তিনটে সসেজ খেয়েছি আর একটা কোকাকোলা। একজন সাহেব ছিল সে খুব জোরে হাসে হো হো হো হা হা হো হো হা হা হা আর আরেকজন মেমসাহেব। আর মিষ্টার মেনান আর মিসেস মেনান আর সিখ একজন নিশ্চই আমি পাগড়িতেই বুঝে গেছি। একবার আমি ঘর থেকে শুনলাম খুব জোরে হাসল সবাই। একবার মা চলে এলো ঘরে আর এসে বাতরুমে গেল আর আয়নায় একবার দেখল আর একবার একজন আরেকজন মেয়ে বাতরুমে গেল আর মিসেস মেনান আর খুব জোরে তার সেনটের গন্ধে একটা নতুন সেনট কিন্তু মার সেটা নেই। আরেকবার মা এলো আর বল্ল একি সোনা জেগে আছো ঘুমো ঘুমো আর আমি বল্লাম একা একা ভয় আর মা বল্ল কিসের ভয় বোকা ছেলে ঘুমো এগারটা বাজে চোখ বোজ আপনি ঘুম আমি বল্লাম দাদা কোথায় মা বল্ল ঢের হয়েছে ঘুমো বলে চলে গেল। বাবা কিন্তু আসেনি ঘরে বাবা এখন বাবা মা এখন খুব ঝগড়া ইংরিজিতে করে আর মাঝে মাঝে বাংলা। কিন্তু পারটি তেতো ঝগড়াই না তাই পারটি ভালো পারটিতে খালি ড্রিং আর একদিন একজন বমি করল মা বল্ল অসুক আমাকে কিন্তু ওনুকুল বলেছে মদ তাই। আমাদের ফৃজের ভিতর আছে আর খালি হোলে জল রাখে ঠানডা আর যখন গন্ধো থাকে মাঝে মাঝে মা তখন বকে সুখদেওকে বল্ল আচ্ছা করকে ধোতা নেই। আর সুখদেও বল্ল মেমসাব কেন বলে মাকে মা কি মেম নাকি আর মা কি সাহেব নাকি খুব মজার বেপারটা। তারপরত ঘুম এল কখন যে এসে যায় ঘুম কেউ জাননো দাদু বলে মরে গেলেই নাকি লম্বা ঘুম আর খালি সপনো আর যা দেখতে চাই তাই সপনো খালি।

আমার ডাইরিটা একটা জায়গায় যেখানে লুকিয়ে রাখি কেউ জানে না কিন্তু। সেটা আমাদের পুরোন গ্রামোফোন সেটা হাত দিয়ে দম দেয় আর যেটা আর কেউ বাজায় না কারণ নোতুনটাতো ইলেকট্রিকে আর লং প্লেং বাজে তাই আর পুরোনটা বাজায় না সেই সেটার মধ্যেই ডাইরিটা আর তাই কেউ জানে না যে আমি ডাইরি লিখি। আমিতো অনেক লিখি তাই আমার আঙুলটায় একটু বেথা তাই মা যখন নোক কাটছে আমি বল্লাম আঃ আর মা বল্ল্ কি হয়েছে বেথা নাকি আমি বল্লাম না না তাহলে যে জেনেই যাবে মা আমি ডাইরি লিখি। ডাইরি দাদু বলেছে যে কেউ কাউকেই দেখাবে না খালি নিজে লেখে আর পড়ে খালি নিজেই আর কেউ না। আমার ছররা আর বাইসটা আছে আমি শুনেছি কিন্তু চড়াইটা খুব বদমাইস আসেইনি আর। আমি ছাতে খালি ট্যাংকে গুলি মারি টং টং আওয়াজ হয় আর ছোট ছোট ছোট গোল গোল গোল গোল দাগ হয়ে যায় তাই তাহলে ভাবছি পায়রাই মারব। পায়রারা চুপচাপ খুব বসে থাকে আর হাটে আর বেশি ওড়েনা। দাদা পাচদিনতো আসেনি দাদার তাই ঘরটাই খালি আর আলনায় একটা সাট সেটা সাদা আর একটা নিল প্যান্ট ঝুলছে খালি আর বইটই সব। কাল আমি যখন বুদবুদ করছিলাম খুব বড় একটা তখন ঠিক শুনলাম ফ্রন পেলাম আর বল্লাম হিতেসকাকু আর মা বল্লেন ডারলিং তুমি ধিংড়ার বাড়ি যাওনা আজ ধিংড়ার তো ছুটি। আমি বল্লাম ধিংড়া আমার কানের পাশে

যেটা ঝুলপি খালি উপরে টানে আর বেথা লাগে তাই যাবো না মা বোল্লেন তাহলে ছাতে এআর গানটা নিয়ে আমি বোল্লাম তাহলে পায়রা মারবো মা বল্লে ছি ছি ছি তা কেন এমনি মারো আকাসে যাও আমি বল্লাম ধেত আকাসে আবার কোথায় টিপ করব মা বোল্ল তাহলে ওনুকুলের কাছে যাওনা আমি বল্লাম ওনুকুলতো তাসই খেলে আর দারোআন আর সুখদেও আরেকটা লোক সব তাস খেলে আমি তাই কোথাও যাব না। আর মা তখখুনি ঠাস করে একটা মারলো জোরসে তাই আমি খাটের ডানডায় আমার ধাককাই লেগে গেল। আমি একটু কানলাম কিন্তু বেশি না একটু আর তারপর তো মা চলে গেলো আর আমি আরেকটু কানলাম বেশি কিন্তু না আর তারপর ভাবলাম কি তাহালে করি। তখন তারপর ভাবলাম ফৃজে গিয়ে দেখা যাক কি আছে তাই দেখি দুটো লেডিকেনি আর একটা সেটা টৃংকার কৃম রোল সেটা সব খেলাম তারপর তো বোতল থেকে ঢক ঢক ঢক একেবারে গেলাসেই ঢালিনি। তারপর একটা ইলাসটেট উকলি সেটা বাবার টেবিলে দেখলাম তাতে ভালো ছবিটবি নেই খালি একটা ডনেল ডাক। আর তারপর বারান্দায় দৌড়ালাম আর একটু হাইজাম একটা মোড়ার উপর দিয়ে একটা আগে ছোট সেটা খুব সহজ আর তারপর বড়টা সেটায় একবার খ্যাচ করে লাগল তাই দেখলাম ছোড়ে গেছে আর একটু একটু রক্ত তাই বাতরুমেতো ডেটোল ছিল ডেটোলে লাগে না কিন্তু টিনারাইডিনে লাগে তাই ডেটোলই দিলাম। আর তখখুনি দৌড়ে দেখলাম জেঠ প্লেনটা খুব জোরসে চলে গেল বাবা যখন গেল জেঠে তখন দমদমে আমি গেলাম আর বাবা লানডান থেকে একটা ইলেকটিক সেভা আনল সেটা নিজের আর আমার জন্যে যুতো দুটো আর একটা আসটোনট সেটা খেলার কিন্তু খুব বড় সেটা তো রনিদা খারাপি করে দিল। তারপর যাই আর কি একটু অংকটংক করি।

আমি আবার আজকে ডাইরি লিখছি। আমার ছররা ফুরিয়ে গেছে আর পায়রাটার গায়ে কেন লাগলো না নিশ্চই বোন্দুকটা বাজে তাহালে। আমি ভাবছি এটাকে ফেলেই দেবো তাহালে। দাদার ড্রআরে আজ একটা দেখলাম টেক্কা দেশলাই তাহালে দাদাতো সিগারেট খায় নিশ্চই নাহালে কেন দেশলাই। কিন্তু দাদা আসেনি কোথায় গেছে ভগবান জানে কি বোধয় ভগবানো জানে না। যদি এবার মা যদি যায় তাহালেই মুশকিল একবার কাল রাততিরে মা বল্লেন যে চলে যাবেন বাবাকে আমি তো দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম একটু তাই জেগেছিলাম চোখটা জোরসে বন্ধো করে তাই মা জানে পিকুতো ঘুমোচ্ছে আর বাবাও ভাবছিলেন তাই তাই ওরা খুব জোরসে কথা বলছিলেন। এখন বাড়িতে আমি আর দাদু খালি আর ওনুকুল বোধয় নিশ্চয়ই তাস খেলছে আর তাই বাড়ির ভিতরে আর কেউ নেই খালি আমি আর দাদু। দাদু নিচে থাকে দাদু ডকটার বেনারজিতো বলেছিলেন সিড়ি দিয়ে ওঠা না দাদুরত কনোরারি থমবোসি তাই। দাদুর তাই একটা ঘন্টা সেটা নিয়ে যদি টিং টিং টিং টিং টিং করলেই শোনা যায়। আজ একবার তাই শুনলাম দাদু বাজাচ্ছে তখন আমি জানলা দিয়ে থুতু ফেলছিলাম থুক থুক থুক যাতে অনেকদূর যায় আর তখখুনি টিং টিং টিং শুনলাম আর তখখুনি বুঝলাম যে এটা দাদু তখন আমি আরো চারটে থুথু ফেললাম একটা পাচিলের ওদিকে আর তারপর ভাবলাম যে যাই দাদু ডাকছে। আর গেলাম সিড়ি দিয়ে দুম দুম কাঠের তো সিড়ি তাই দুম দুম আওজ হয়। গিয়ে দেখি চুপচাপ দাদু শুয়ে আছে আর কিন্তু ঘুমোচ্ছে না তাই বল্লাম দাদু কি বেপার কিন্তু দাদু কিন্তু কিছু বল্লনা খালি উপরের দিকেই দেখছে পাখাটার উসা ফ্যানটার দিকে দাদুর ঘরেই খালি উসা সবইতো জিইসি আর তখখুনি আবার টেলিফোনটা শুনলাম বাজলো তাই দৌড়ে এসে উপরে এলাম তখন অনেকবার বেজেছে বোল্লাম হ্যালো আর শুনলাম মিস্টার সারমা হায় আমি তখখুনি বল্লম সারমাটারমা নেই হ্যায় রং নাম্বার বলে কড়াক করে রেখে দিলাম আর তারপর দৌড়েতো খুব হাঁপিয়েছি তাই সোফায় গিয়ে শুলাম আর পাটা তুলেই দিলাম মাতো নেই তাই পাটা তুলেই দেখলাম ময়লা কিন্তু মা তো নেই। আর এখন আবার আমার বিছানাতেই লিখছি ডাইরি আর পাতাই কিন্তু নেই এখন আর কেউ নেই খালি আমি আর দাদু আর একটা খালি মাছি আছে খালি খালি আসছে জালাতোন ভারি বদমাইস মাছিটা আর বাস এইবার পাতা শেস, খাতা শেস, বাস শেস।

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৭৭